সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সেই সময়

শিশুটির জন্ম মাত্র সাত মাস দশ দিন গর্ভবাসের পর। মাতৃজঠরেই তার চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছিল। সেই অন্ধকার জলধিতে সে বেশীদিন থাকতে চায়নি।

বাবু রামকমল সিংহ তখন উড়িষ্যায় মহাল পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। প্রাক্-সন্ধ্যেবেলা তিনি মহানদীর বুকে বজরার ওপর বসে সূর্যাস্তের শোভা দেখছেন। এমন সময় একটা ছোট ছিপনৌকো তীরবেগে ছুটে এলো বজরার দিকে। সেটা থেকে লাফিয়ে নামলো তাঁর গোমস্তা দিবাকর। অকস্মাৎ দিবাকরকে দেখেই রামকমলের হৃৎকম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল। নদীবক্ষে পবিত্র নির্মল বাতাসের মধ্যে দিবাকর দুঃসংবাদের গন্ধ নিয়ে এসেছে। রামকমল ধরেই নিলেন বিম্ববতী আর নেই। দিবাকরেরও সেই রকম ধারণা, গৃহকর্ত্রীকে সে সংজ্ঞাহীন মুমূর্ষু দেখে এসেছে। প্রভুকে সে ঠিক মতন সান্ত্বনা দিতে পারলো না। শুধু বললো, হুজুর আজই ফেরার গতিক কত্তে হবে। উকিলবাবু আমাকে পাটালেন।

রামকমলের চক্ষু থেকে অবিরল অশ্রু বর্ষণ হতে লাগলো। বিম্ববতী তাঁর সংসারের সৌভাগ্যলক্ষ্মী।

বজরার ছাদ থেকে নীচের প্রকোষ্ঠে নেমে এসে রামকমল কমলাসুন্দরীকে বললেন, আজ হতে আমি নিঃস্ব হলেম! পৃথিবীর কোনো দ্রব্যেই আর আমার সুখ হবে না।

কমলাসুন্দরী রামকমলকে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। বিম্ববতীর স্মরণে সেও চোখের জল ফেললো কয়েক ফোঁটা। গঙ্গার ঘাটে দূর থেকে সে বিম্ববতীকে দেখেছে দু' একবার। সাক্ষাৎ জগজ্জননী দুর্গার মতন রূপ! কমলাসুন্দরী তাঁর দাসী হবারও যোগ্য নয়। অমন রূপবতী স্ত্রী থাকতেও রামকমল কেন অপর নারীদের কাছে যান বা দু' তিন বছর অন্তর অন্তর রক্ষিতা বদল করেন, তা বোঝা ভার। কমলাসুন্দরীর গায়ের রঙ মসৃণ কষ্টিপাথরের মতন। নিজের স্ত্রীর দুধে-আলতা মেশানো গাত্রবর্ণ বলেই বোধহয় রামকমল শুধু কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েদের মধ্য থেকেই উপপত্নী নির্বাচন করেন। পুরুষ মানুষ এমনই অদ্ভুত হয়।

রৌপ্য পাত্রে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ঢেলে এনে কমলাসুন্দরী বললো, এটুকু পান করে নিন, নইলে আরও দুর্বল হয়ে পড়বেন।

রামকমল বাঁ হাত দিয়ে সেই পাত্র ঠেলে দিয়ে বললেন, আমার আর কিছুতে রুচি নেই। আমাকে জ্বালাতন করিস নি, কমল। তুই আমার সম্মুখ থেকে এখন সরে যা— !

কমলাসুন্দরী ক্ষুদ্র গবাক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে চুল এলো করে দিল। বাইরে নদীর জলে লকলক করছে অস্ত সূর্যের লাল শিখা। সেদিকে তাকিয়ে সে ভাবলো, এবার বুঝি এ বাবুর কাছ থেকে পাট উঠলো। আবার নিয়তি তাকে কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে!

রামকমল কোমল শয্যায় শুয়ে প্রবল হুতাশের সঙ্গে আঃ আঃ শব্দ করতে লাগলেন। ততক্ষণে বজরা চলতে শুরু করেছে।

তিনদিন পর কলকাতার যোড়াসাঁকো পল্লীতে তাঁর অট্টালিকার সদর দেউড়িতে পা দিয়েই রামকমল শুনলেন নতুন শিশুর কান্না। তিনি ভুরু উত্তোলন করে তাকালেন দিবাকরের দিকে। দিবাকরও বিমূঢ়। বিম্ববতীর রোগ-যন্ত্রণা যে আসলে প্রসব-বেদনা, তা সে-ও জানতো না। তা ছাড়া, সাত মাস গর্ভের সন্তান জন্মের কথা কে-ই বা কখন শুনেছে। আট মাস পুরলেও না হয় কথা ছিল।

রামকমলের বয়েস এখন সাতচল্লিশ। পনেরো বছর আগে তিনি বিম্ববতীকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর তৃতীয় বিবাহ। এর আগে তাঁর দুই স্ত্রীই মারা গেছে নিতান্ত বালিকা বয়েসে। প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীমণিকে রামকমলের একটু একটু মনে আছে কিন্তু দ্বিতীয়া স্ত্রী হেমবালার মুখখানিও তাঁর মনে পড়ে না এখন। বিম্ববতী নতুন বধূ হয়ে এ বাড়িতে আসেন ন' বছর বয়েসে। তখন এ বাড়ির চেহারা অবশ্য অন্যরকম ছিল। বিম্ববতী আসার পর এই সিংহ পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। রামকমল যে ব্যবসায়ে হাত দেন, সেখানেই সোনা ফলে। বিম্ববতী এই সংসারে এত সমৃদ্ধি এনে দিলেও একটি সন্তাপ সর্বক্ষণ ছিল তাঁর মনে। তাঁর স্বামী অপুত্রক। কিন্তু, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়পরিজন এমনকি

বিম্ববতীর অশ্রুসজল সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও রামকমল আর দার পরিগ্রহ করেননি।

রামকমল লাফিয়ে উঠতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। দোতলায় সিঁড়ির মুখে তাঁর বাল্যবন্ধু ও আজীবন সুহৃদ বিধুশেখর দাঁড়িয়ে। কার্যোপলক্ষে রামকমল প্রবাসে গেলে বিধুশেখরই এ গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেন। বিধুশেখর একজন দক্ষ আইনজীবী, অতি সূক্ষ্ম তাঁর বুদ্ধি, হৃদয়খানি সমুদ্রের মতন বিশাল। এই বন্ধুর ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করে রামকমল নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন সব সময়।

রামকমল জিজ্ঞেস করলেন, সব শেষ?

বিধুশেখর বন্ধুকে আলিঙ্গন করে বললেন, তুই এসিচিস, আর কোনো চিন্তা নাই। আগে হাত মুখ ধো, পরে সব শুনবি!

রামকমল ব্যগ্রভাবে বিধুশেখরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আগে বল্, বিম্ববতীকে আর দেকতে পাব কি না।

প্রায় আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই দুই বন্ধু এসে দাঁড়ালেন বিম্ববতীর শয়নকক্ষের দরজার কাছে। বিরাট পালঙ্কের ওপর বিম্ববতী চোখ মুদে শুয়ে আছেন চিৎ হয়ে, করতল দুটি বুকের ওপর প্রণামের ভঙ্গিতে যুক্ত। মুখখানি অস্বাভাবিক পাণ্ডুর।

তিনজন সাহেব ডাক্তার পালঙ্কের ডান পাশে মখমলমোড়া কৌচে নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে। বাঁ পাশে বসে আছেন বিখ্যাত কবিরাজ দীনদয়াল ভেষগ্‌শাস্ত্রী। তাঁর চোখ দুটি বন্ধ, চিবুক ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর, তিনি ঘুমন্ত কিনা বোঝা যায় না। তবে এটাই তাঁর সুপরিচিত ভঙ্গি। একজন দক্ষিণ দেশীয় আয়ার কোলে একটি কাঁথার পুঁটুলি, সেই পুঁটুলি থেকে শব্দ আসছে কান্নার। বেশ জোর আছে গলায়। জন্মের পর যে শিশু কাঁদে, তার প্রাণশক্তি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

বিধুশেখর ব্যবস্থার কোন ত্রুটি রাখেননি। কিন্তু রামকমল পিতৃত্ব অর্জনের কোনোরকম সুখানুভূতি বোধ করলেন না। তাঁর মন উদ্বেল হয়ে আছে বিম্ববতীর জন্য। বিম্ববতী তাঁর হৃদয়মণি।

রামকমল ধরা গলায় আবার জিজ্ঞেস করলেন, সব শেষ?

বিধুশেখর বললেন, না। এখনো প্রাণ রয়েচে। সতীলক্ষ্মী তোর অপেক্ষাতেই আচে, তোকে শেষ দেখা না দেখে সে আমাদিগের ছেড়ে যাবে না!

বিচলিত পায়ে রামকমল ছুটে আসতে যাচ্ছিলেন, সাহেব ডাক্তারদের মধ্য থেকে সার্জেন গর্ডন উঠে এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালেন। গম্ভীর গলায় খানিকটা ধমকের সুরে তিনি বললেন, ডোণ্ট ডিস্টার্ব হার নাও...প্লীজ....দেয়ার আর এনাফ চান্সেস দ্যাট শী উইল সারভাইভ।

রামকমল উদ্‌ভ্রান্তের মতন বললেন, একবার শুধু পাশে গিয়ে বসি, একবার শুধু স্পর্শ করব....কতা কইবো না।

বিধুশেখর সাহেবকে অনুরোধ করলেন। সার্জেন গর্ডন সরে দাঁড়িয়ে তাঁর জেব থেকে সোনার ঘড়ি বার করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন সেদিকে।

রামকমল পা থেকে নাগরা জোড়া খুলে ফেলে নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালেন স্ত্রীর পাশে। তাঁর বুক কাঁপছে। ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছেন তিনি, এটাই মৃত্যুর গন্ধ কিনা তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। বিম্ববতীর শয়নকক্ষে এরকম গন্ধ তিনি আগে পাননি।

বিম্ববতীর ললাটে তিনি হাত রেখে আরও চমকে উঠলেন। কী ঠাণ্ডা! প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে তিনি ধরা গলায় বলতে লাগলেন, বিম্ব, বিম্ব একবার চোখ তুলে চাও, দ্যাখো, আমি এসিচি।

বিম্ববতীর কানে সে ডাক পৌঁছোলো না, শরীরে কোনো স্পন্দন দেখা দিল না।

সার্জেন গর্ডন প্লীজ প্লীজ করতে লাগলেন। কবিরাজ মশাই চোখ খুলে বললেন, সিংগিমশায়, ভগবানকে ডাকুন। বৌমাকে এখন ডাকবেন না। ভগবানের দয়া হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

নিজেকে সামলে নিয়ে রামকমল বিম্ববতীর শয্যার পাশ থেকে সরে এলেন। এতগুলি বাঘা বাঘা ডাক্তার কবিরাজ রয়েছেন, এখানে তাঁর শিশুপনা দেখানো শোভা পায় না।

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন, এসময় বিধুশেখর বললেন, পুত্রমুখ দেক্‌লি না?

দক্ষিণ দেশীয়া আয়াটির দিকে তাকিয়ে তিনি ইঙ্গিত করলেন। সে রামকমলের কাছে এসে কলকল করে কত কী যেন বললো, তার একটি অক্ষরও বোঝা যায় না।

কাঁথার পুঁটুলির মধ্যে ছোট্ট একটা বাচ্চা, সে এত ছোট্ট যে মানুষের ছানা বলে বোঝাই যায় না। মনে হয় যেন চোখ নেই, নাক নেই, শুধু মাংসের পুতুল। কিন্তু জীবন্ত যে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তারস্বরে কেঁদে যাচ্ছে আর ক্ষুদে ক্ষুদে দুটি হাত নাড়ছে।

রামকমল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এই শিশু তার জননীকে খেতে এসেছে। কোনো প্রয়োজন ছিল না এর আসার। রামকমল তো পুত্রের অভাব বোধ করেননি কখনো। বিম্ববতীর জীবনের বিনিময়ে তিনি কিছুই চান না।

আয়াটির হাতে দুটি মুদ্রা গুঁজে দিয়ে তিনি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

সাতদিন যমে-মানুষে লড়াই চললো। তারপর বিম্ববতী চোখ মেললেন। প্রথমেই তিনি বললেন, আমি কোতায় ?

তখন মধ্যাহ্ন। রামকমল সবেমাত্র আহারে বসেছিলেন, খবর পেয়ে তিনি পাত্র ত্যাগ করে উঠে এলেন। বিম্ববতী বারবার একই প্রশ্ন করছেন শুনে রামকমল বললেন, এ তো তোমার ঘব, এ তোমার শয্যা, এই দ্যাখো আমি রয়িচি, তুমি জানো, তোমার একটি পুত্র সন্তান হয়েচে ?

বিম্ববতীর চক্ষে ঘোর। তিনি আবার বললেন, হ্যাঁগো, আমি কি মরে গিইচিলুম ?

রামকমল বললেন, বালাই ষাট, তুমি মরবে কেন ? তোমার····

বিম্ববতী বললেন, আমার যেন মনে হলো, আমি কত দেশ ঘুরে এলুম, কত পাহাড়, নদী, বন, বিরাট বিরাট অন্ধকার সুড়ঙ্গ, তার ওধারে আলো, সেই আলো, সেই আলোর এত জোর যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়····

হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসে বিম্ববতী বললেন, আমার ছেলে কই ? আমার ছেলে—

আয়া কাঁথার পুঁটুলিটা তুলে দিল বিম্ববতীর কোলে। তিনি চমকে উঠে বললেন, এ কে ? এ তো আমার ছেলে না ? আমার ছেলে তো অনেক বড়।

রামকমল স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, বিম্ব, তোমার মনে নাই, তুমি পোয়াতি হয়েছিলে, এই তো তোমার গর্ভের সন্তান।

শিশুটি এখন কাঁদছে না, ঘুমিয়ে আছে। বিম্ববতী এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। ক্রমশ তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে এলো। তিনি কয়েক ফোঁটা চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেন সন্তানের মুখ। তারপর তার ললাট চুম্বন করলেন।

—গঙ্গা কোথায় ? গঙ্গা ? সে কেন আসেনি ?

আত্মীয়পরিজন দাসদাসীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। রামকমল বললেন, এই, কেউ গঙ্গাকে ডাক তো ! সে কোথায় ?

রামকমলের মনে পড়লো, গত দু'তিনদিন তিনি গঙ্গানারায়ণকে দেখেননি। সে এ ঘরে একবারও আসেনি। রামকমল একটু অনুতপ্ত বোধ করলেন।

একজন ভৃত্য এসে খবর দিল গঙ্গানারায়ণ ফিরিঙ্গি পাঠশালায় পড়তে গেছে।

বিম্ববতী উতলা হয়ে বললেন, ওগো, তাকে ডেকে আনো। আমি তাকে এক্ষুনি দেকবো।

রামকমল হুকুম দিলেন, এই, কেউ একজন যা, দৌড়ে গিয়ে তাকে ডেকে আনগে যা !

ফিরিঙ্গি পাঠশালা বেশী দূরে নয়। লোক ছুটে গেল সেখানে। রামকমল স্ত্রীকে বললেন, তুমি শোও। সে আসচে। এখুনি আসচে !

বিম্ববতী বললেন, তোমরা বুঝি ভেবেছিলে আমি মরে গ্যাচি। আমার কী এক মহানিদ্রা পেয়েচিল, তার মধ্যে আমি কত দেশ ঘুরে এলুম।

বিম্ববতীর বিধবা বড় জা হেমাঙ্গিনী এগিয়ে এসে বললেন, তোর কী খিদে পেয়েচে, কিছু খাবি ? এ ক'টা দিন তো ওষুধ ছাড়া কিছু পেটে যায়নি।

যেন তাঁর কোলের সন্তানকে কেউ কেড়ে নেবে, এইভাবে পুঁটুলিটা আঁকড়ে ধরে বিম্ববতী বললেন, আমার একদম খিদে নেই গো, আমি যেন অমৃত খেয়িচি, আমার শরীর মন একেবারে ভরে আচে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গঙ্গানারায়ণকে নিয়ে আসা হলো ঘরের মধ্যে। চোদ্দ বছরের একটি সুদর্শন কিশোর। তার মুখখানি লাজুক ধরনের। সে বিম্ববতীর পালঙ্কের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বিম্ববতী তাকে আরও কাছে ডাকলেন। তার মাথায় মুখে আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, আমার কাছে বসে থাক। তুই-ও কি ভেবেছিলি, তোর মা মরে গ্যাচে ?

গঙ্গানারায়ণ মুখ নীচু করে নিঃশব্দ হয়ে রইলো।

হেমাঙ্গিনী বললেন, ওলো, এখন বেশী কতা ক'স নি। একটু বিশ্রাম নে। চোখ মুখ যা টেনে গ্যাচে, আবার ভির্মি খেয়ে পড়বি।

রামকমলও ভয় পেলেন। প্রদীপের সলতে নিভবার আগে একবার দপ করে জ্বলে ওঠে, পট পট

শব্দ হয়, বিম্ববতীরও সেই অবস্থা নয় তো ?

তিনি বললেন, বিম্ব, তুমি এখন শোও, কোবরেজ মশাইকে খপর দিইচি, উনি এসে একবার দেখুন।

বিম্ববতী বললেন, আর কোনো ভয় নেই গো! কতদিন তোমাদের দেখিনি, কতদিন গঙ্গাকে দেখিনি। আহা, গঙ্গার মুখ শুকিয়ে গ্যাচে। তুই আজ খেইচিস তো ? কেউ তোকে খাবার দিয়েছেল ?

গঙ্গানারায়ণ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

—আমাকে একবার মা বলে ডাক তো। কতদিন তোর মা ডাক শুনিনি।

গঙ্গানারায়ণ কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, মা—

—আয়, খাটের ওপর উঠে বোস। বাবা গঙ্গা, তোর একটি ছোট ভাই হয়েচে, তুই তাকে ভালোবাসবি তো ?

গঙ্গানারায়ণের ক্ষুদ্র জীবনের কাহিনীটি এই প্রকার।

রামকমল সিংহের পৈতৃক ভিটে হুগলি জেলার বাকসা-গ্রামে। রামকমলের পিতামহ সেই গ্রাম ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন কলকাতায়, কালক্রমে নুনের দেওয়ানি লাভ করে এখানকার অভিজাত সমাজে স্থান করে নেন। পিতামহের অপর দুই ভাই থেকে যান সেই গ্রামেই। এই বংশের কলকাতা শাখাটির যতই উন্নতি হতে থাকে, গ্রামের শাখাটি ততই জীর্ণ হয়ে যায়। রামকমল ঐ গ্রামের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্কই রাখেননি। একদিন রামকমল হঠাৎ লোকমুখে খবর পান যে বাকসা-গ্রামে শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউ'র যে সুবৃহৎ নবরত্নের মন্দির আছে, সেই মন্দিরের চত্বরে এক রমণী তার একবছরের শিশুপুত্রকে রাত্রিবেলা ফেলে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পুরোহিতদের নজরে পড়ে যায়। ধরা পড়ার পর রমণীটি স্বীকার করে যে, ক্ষুধার জ্বালাতেই সে উদ্যত হয়েছিল এমন নৃশংস কাজে। পুত্রকে আহার জোগাতে পারে না বলেই সে শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউ-এর চরণে পুত্রকে সমর্পণ করে নিজে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করা মনস্থ করেছিল। এই কাহিনী মুদ্রিতও হয়েছিল ইংরেজি সংবাদপত্রে।

রমণীটি বিধবা। রামকমল জানতে পারেন যে সেই রমণীটি তাঁরই এক সম্পর্কিত ভাইয়ের স্ত্রী। লোকাপবাদের ভয়ে পুত্রসমেত সেই রমণীটিকে আনিয়ে রামকমল ঠাঁই দিলেন তাঁর কলকাতার বাড়িতে। সব বড় মানুষের বাড়িতেই এরকম কিছু দুঃস্থ আত্মীয়স্বজন আশ্রয় নেয়। যোড়াসাঁকোর এই সিংহবাড়িতে প্রত্যেকবেলা অন্তত পঞ্চাশটি পাত পড়ে। গৃহকর্তা অনেকের নামই জানেন না। তাঁর জননী অতি দানশীলা। কেউ এসে আশ্রয় চাইলে তিনি ফেরান না। জননীর অনুমতি নিয়েই রামকমল বাকসা-গ্রামের সেই রমণীকে সন্তানসমেত এনেছিলেন এ বাড়িতে। অনেক দিন এ বাড়িতে কোনো শিশু ছিল না, তাই সকলেই সেই শিশুটিকে কাড়াকাড়ি করে আদর করতো। তার মা কিন্তু এ বাড়িতে এসেও খুব স্বচ্ছন্দে মনের সুখে থাকতে পারেনি। অন্যান্য আশ্রিতরা থাকে একতলায়, তাকে স্থান দেওয়া হয়েছিল ওপরে। বিম্ববতী দেখেছেন, প্রায়ই সে বিরলে বসে কাঁদে। তার মন-মরা রোগ হয়েছিল, বিশেষ কথা বলতো না, আর বোধহয় সেই রোগের জন্যই সে বেশী দিন বাঁচলো না। মাত্র ছ' মাস পরেই সে চলে গেল পৃথিবী ছেড়ে, যাবার আগে সে তার ছেলেকে দিয়ে গেল বিম্ববতীর কোলে। সজল চক্ষে বলে গিয়েছিল, দিদি, তুমি ওকে দেখো।

সেই শিশুই গঙ্গানারায়ণ। বিম্ববতীর একেই দয়ার শরীর, তার ওপর হৃদয় ছিল সন্তান-তৃষিত, তিনি ছেলেটিকে আপন করে নিলেন। ছেলেটির দেহে তাঁদের পরিবারের রক্ত আছে, একথা নিশ্চিতভাবে জানার পর, রামকমল ঐ ছেলেটিকে দত্তক নেবার প্রস্তাব দিলেন বিম্ববতীর কাছে। ততদিনে ধরেই নেওয়া হয়েছিল, বিম্ববতীর সন্তান হবে না। বিম্ববতী তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে গঙ্গানারায়ণকে দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন রামকমল। সে প্রায় পাঁচ বছর আগেকার কথা।

বিস্ময়ের কথা এই যে বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের মুখের গড়নে আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যেতে লাগলো রামকমলের সঙ্গে। যেন সে রামকমলেরই ঔরসজাত পুত্র। যে দেখে, সে-ই ঐ কথা বলে।

লোকে এমন কথাও বলে যে ঐ দত্তক নেবার ব্যাপারটা নিছকই ভড়ং! রামকমলের নারীলোলুপতার কথা সর্বজনবিদিত, তিনি নিশ্চয়ই নিজের গ্রামেও একটি উপপত্নী রেখেছিলেন, প্রতি বৎসর পূজোর সময় একবার সেখানে যান তিনি। ঐ গঙ্গানারায়ণ সেই উপপত্নীরই সন্তান, তাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার জন্য দত্তক নেওয়া হলো। কেউ কেউ এ রটনা বিশ্বাস করে। রামকমলের ঘনিষ্ঠতম সুহৃদ বিধুশেখরের কানেও এই রটনা এসে পৌঁছেছে, তিনি শুনে উচ্চহাস্য করে

উঠেছিলেন। আর যেই বিশ্বাস করুক, বিধুশেখর কিছুতেই এটা বিশ্বাস করতে পারেন না।

বিম্ববতীর ধারণা, শ্রীশ্রীরঘুনাথ জিউ-ই ছেলেটিকে পাঠিয়েছেন তাঁদের কাছে। এমন উপযুক্ত সন্তান মানুষ বহু ভাগ্যে পায়। ছেলেটি ধীর স্থির, বুদ্ধিমান। পড়াশুনোয় মতি আছে। সংস্কৃত, ফার্সী ও ইংরেজি শিখছে নিয়মিতভাবে। এই ছেলের হাতে যে বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা পাবে ও বৃদ্ধি পাবে, এ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন রামকমল।

কয়েকদিন পর বিম্ববতীর সঙ্গে দুই পুত্র বিষয়ে খানিক আলোচনা করলেন রামকমল।

তাঁর তখনও আশঙ্কা তাঁর নিজের সন্তানটি শেষ পর্যন্ত বাঁচবে কিনা। এত ক্ষুদ্র মানবশিশু তিনি কখনো দেখেননি। এর সব কিছুই যেন অদ্ভুত। জন্মের পর বেশ কিছুদিন বাচ্চারা অধিকাংশ সময় ঘুমিয়েই কাটায়। নিদারুণ অন্ধকার থেকে এসে এই পৃথিবীর আলো চক্ষে সইয়ে নিতে যথেষ্ট সময় লাগে। কিন্তু এ তেমন ঘুমোয় না, যখন তখন জাগে আর কান্না জুড়ে দেয়। হাসতেও শিখেছে এরই মধ্যে। মুখের সামনে একটা আঙুল নিয়ে গেলেই হেসে ওঠে খটখটিয়ে। দেড় দু' মাসের মধ্যে শিশুরা নাকি ভালো করে দেখতেই পায় না, কিন্তু যে-কেউ সামনে গেলেই এ দিব্যি তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

নিজের সন্তান সম্পর্কে রামকমলের মনোভাব প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে। এখন দিনের মধ্যে বহুবার তিনি ছেলের মুখ দেখতে আসেন। প্রথম দু' একদিন তিনি নতুন শিশুটিকে বেশী মনে স্থান দেননি, বিম্ববতীর সঙ্গে দেখা করতে এসেও ছেলের দিকে তাকাতেন না। যেন বেশী মায়ায় বাঁধা পড়তে চান না, ও যদি চলে যায়, তাহলে যেন বিস্মৃতি আসে খুব দ্রুত। গঙ্গানারায়ণ তাঁর বংশধর, তাকে নিয়েই তিনি তৃপ্ত থাকবেন। তারপর একটা একটা দিন যেতে লাগলো আর তাঁর নিজের সন্তান যেন তাঁকে টানতে লাগলো চুম্বকের মতন। মাত্র সাত মাস দশ দিন গর্ভবাসের পর জন্মেছে যে বাচ্চা, এতখানি জীবনীশক্তি দেখলে, বিশেষত তার খটখটে হাসি শুনলে যেন খানিকটা গা ছম ছম করে।

আর একটা বিস্ময়বোধও যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছে রামকমলকে। এতদিনে তাঁর এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর সন্তান উৎপাদনক্ষমতা নেই। বিম্ববতী অবশ্য নিজেকে বাঁজা ভাবতেন এতদিন। কিন্তু রামকমল আরও অনেক রমণীর গর্ভে বীর্য নিষেক করেছেন, তারা কেউই তাঁকে একটিও সন্তান উপহার দিতে পারেনি। যদি কেউ দিত, তাহলে সেই সন্তানকে তিনি নিজের বংশধর হিসেবে স্বীকৃতি না দিলেও তার ভরণপোষণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করে দিতেন নিশ্চিত। শেষ পর্যন্ত বিম্ববতীর কাছেই সার্থক হলো তাঁর পৌরুষ। এ কথা চিন্তা করলেই রামকমলের সারা শরীরে গুপ্ত খুশীর জোয়ার এসে যায়।

বিম্ববতীর শরীর এখনো দুর্বল, তবু তিনি পুত্র কোলে নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকেন। রাস্তার দিকের সব ক'টি জানলা বন্ধ। কাছেই এক জায়গায় চড়কের মেলা বসেছে। অনেক রাত পর্যন্ত পথ দিয়ে মানুষজন হল্লা করতে করতে যায়। গতকাল রাত্তিরেই একদল মাতাল এমন গান জুড়েছিল ঋষভরাগিণীতে যে আর একটু হলেই ধোপারা ছুটে আসতো দড়িদড়া নিয়ে। একজন পাহারাওয়ালা মজা দেখছিল সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। শেষ পর্যন্ত রামকমলই তাঁর পাইকদের পাঠিয়ে মাতালগুলোকে গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করে দেন।

রামকমল শুতে যাবার আগে এসে দাঁড়ালেন পত্নীর পাশে। চার চক্ষুর দৃষ্টি একসঙ্গে নিবদ্ধ হলো ঘুমন্ত শিশুটির ওপর। বিম্ববতী বললেন, চোখ দুটো দেকেচো ? ঠিক তোমারই মতন হবে। ঠোঁটের কাটটাও তোমার মতন। শুধু কপালের এইটুকু জায়গায় আমার সঙ্গে মিল আচে।

রামকমল হাসলেন। স্ত্রীলোকেরা এসব কী করে বোঝে কে জানে। শিশুর মুখ চোখ কিছুই তো এখনো চেনা যায় না।

—তুমি কেমন আচো, বিম্ব ?

বিম্ববতীর ঠোঁটে গাঢ় পরিতৃপ্তির হাসির আভাস পাওয়া গেল। তিনি বললেন, আমি ভালো আচি···তুমি তোমার শরীরের যত্ন নিও গো, আমি কিচু দেকতে পারি না।

—আমার জন্য চিন্তা করো না। মা রয়েচেন, বড় বৌঠান রয়েচেন।

—গঙ্গা শুয়ে পড়েচে ? ওর খাওয়াদাওয়া ঠিকমতন হচ্চে তো ?

—দেক্‌লুম তো শুয়ে আচে। তোমার ক'চে আসেনি ?

—এ বেলা আসেনি কো, একবার খপর নিয়ে শুনলুম পড়াশুনা কচ্চে !

—ও কি তোমার ঘরে বেশী আসে না ?

—লজ্জা পায় বোধহয়। আমাকে এমনভাবে শুয়ে থাকতে তো কখনো দ্যাকেনি, বহু বচরের মধ্যে আমার কোনো রোগভোগ হয়নি।

—নতুন ভাইবোন জন্মালে ছেলেমেয়েদের এরকম একটু অভিমান হয়ই। কুসুমকুমারী যেবারে জন্মালো, আমার তখন ন' বচর বয়েস, আমি ভাবতুম মা বুঝি আমা অপেক্ষা কুসুমকুমারীকেই বেশী ভালোবাসেন। কুসুমের তখন কত আদর।

—গঙ্গার তো আর ন' বচর বয়েস নয়। সে বড় হয়েচে, সে বুজবে।

—কিন্তু বিম্ব, তুমি কি দু'জনকে সমান ভালোবাসতে পারবে?

—কেন পারবো না? গঙ্গাকে পেটে ধরিনি বটে, কিন্তু সে কি কিচু কম?

—বিধু আমার মনের মধ্যে একটা কথা ঢুক্যে দিয়েচে। দত্তক নেবার পর নিজের সন্তান জন্মালে সে বংশে নাকি একটা বড় রকম বিরোধ বাধে। আদালতে সে এমন অনেক দেকেচে।

—গঙ্গা অতি ভালো ছেলে, সে কক্ষনো তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ করবে না।

—গঙ্গা না হয় না-ই করলো, কিন্তু তোমার এ ছেলে যদি বড় হয়ে গঙ্গাকে সহ্য করতে না পারে?

বিম্ববতী আহত হয়ে বললেন, তুমি আগে থেকেই এরকম গাইচো কেন? ওসব কিচু হবে না। আমি বলচি দেখো, ওদের দু' ভাইয়ের মধ্যে কখনো অসৈরণ হবে না।

রামকমল বললেন, না হয় তো মঙ্গল। আমার বিষয় সম্পত্তি যথেষ্ট আচে, আমি ওদের মধ্যে সমান ভাগ করে দিয়ে যাবো....লিখিত পড়িতভাবে....আগে থেকেই, তাতেও ওরা যা পাবে—

কথাটা বলতে বলতেই রামকমলের মনের মধ্যে একটা খটকা লাগলো। সমান? তাঁর নিজের রক্ত বইছে এই ছেলের শরীরে, সে গঙ্গানারায়ণের সমান পাবে? বড় হয়ে যখন সে সব জানবে, তখন বাপ-মায়ের ওপর তার অভিমান জন্মাবে না?

রামকমল শব্দ করে হাসলেন।

—কী হলো?

—আমি নিজেই এর মধ্যে ভাবতে শুরু করিচি, ওদের সমান সমান সম্পত্তি দেওয়া হবে কিনা....আমার রক্ত বইচে এর শরীরে....রক্তে এত টান যে আমিও দুর্বল হয়ে পড়চি।

—আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, আমি দু'জনকেই সমান করে দেকবো।

—ভালো। তুমি মা হয়ে যদি তা পারো, আমিই বা তাহলে পারবো না কেন?

আরও কয়েকদিন পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন বিম্ববতী। বাড়িতে এতদিন ডাক্তার কবিরাজের আনাগোনা লেগেই ছিল। তাঁরা কেউই বিশ্বাস করতে পারেন নি যে শেষ পর্যন্ত জননী ও সন্তান দু'জনেই বেঁচে থাকবে। এটা রীতিমতন একটা বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে। রামকমলের মা সৌদামিনী ইতিমধ্যে বহু পুজোআচ্চা, ব্রাহ্মণ বিদায় ও কাঙালী ভোজন করিয়েছেন এই শিশুর মঙ্গল কামনায়।

কুলপুরোহিত এসে জাতকের জন্মলগ্নের রাশি নক্ষত্র বিচার করে কোষ্ঠি রচনা করে দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, এ শিশুর যশোভাগ্য সাঙ্ঘাতিক। একদিন সারা দেশ এরই জন্য এই বংশের সুনাম গাইবে। বিম্ববতী রত্নপ্রসবিনী।

শিশুর নাম রাখা হলো নবীনকুমার।

একুশ দিনের দিন বিম্ববতী নবীনকুমারকে কোলে নিয়ে সারাবাড়ি ঘুরে এলেন। তারপর শিশু ঘুরতে লাগলো এ কোল থেকে ও কোলে।

সন্ধ্যেবেলা বৈঠকখানা ঘর থেকে ওপরে এসে রামকমল দেখলেন বারান্দায় বিম্ববতী আসনপিঁড়ি হয়ে বসে স্তন্য পান করাচ্ছেন নবীনকুমারকে। আর গঙ্গানারায়ণ বসে আছে মায়ের পিঠে গাল ঠেকিয়ে। রামকমল মুগ্ধ হয়ে গিয়ে ভাবলেন, অহো, কী সুন্দর দৃশ্য!

তিনি তখনি আবার নীচে নেমে এসে দিবাকরকে নির্দেশ দিলেন যুড়িগাড়ি বার করবার জন্য। আজ তাঁর মনে খুব আনন্দ। অনেক দিন পর আজ তিনি জানবাজারে কমলাসুন্দরীর বাড়িতে যাবেন।

দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, তবু ভেতরে বসে গুপী স্যাকরা দুর্গাপ্রদীপ জ্বেলে রাংঝালের কাজে মগ্ন। সেই সময় ঝাঁপ ঠেলে ঢুকলো রাইমোহন। সে এতই লম্বা যে ছোট দোকান ঘরটিতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, মাথা ঝুঁকিয়ে রইলো। তার পরণে সিমলের ফিনফিনে ধুতি, হলুদ রঙের বেনিয়ান, গলায় শান্তিপুরের ডুরে উড়ুনি আর পায়ে ইংলিশ জুতো। বাঁ হাতের মণিবন্ধে এক ছড়া গোরের মালা জড়ানো। সে মাঝে মাঝে এই রকম সময়েই দোকানে আসে, তাই গুপী স্যাকরা অবাক হলো না, একটা ছোট কাঠের টুল এগিয়ে দিয়ে বললো, বসুন ঘোষালমশাই।

রাইমোহন বসলো, হাঁটু দুটো উঁচু হয়ে রইলো। জেব থেকে পিতলের পানের কৌটো বার করে তার থেকে একটা পান মুখে পুরলো, একটা গুপীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, নিবি নাকি?

বহুক্ষণ আগুনের শিখার সামনে বসে থাকার জন্য গুপীর কপাল থেকে টপটপ করে ঘাম ঝরছে। বাঁ হাত দিয়ে ঘাম মুছে, ডান হাত বাড়িয়ে বললো, দেন একটা। আর কী সংবাদ বলেন। অনেকদিন আপনি ইদিকে আসেননি, তাই পাড়া-বেপাড়ার অনেক খবরও শুনিনি।

রাইমোহন বললো, সবচে জবর খবর হলো গে চূড়ো দত্তর রাঁঢ়কে কাল কে যেন ছুরি মেরে পালিয়েচে, আজ সকালে দেখা গেল সে মুখ ভেটকে পড়ে আচে।

গুপী বললো, চূড়োবাবুর কোন্ রাঁঢ়? তেনার তো একটি নয়, গণ্ডাখানেক।

—ইটি হলো গে বৌবাজারের। আমার হীরেমনির পাশের কোঠায় থাকতো।

—আহা হা, সে তো শুনিচি অপরূপ সুন্দরী ছেল।

—হ্যাঁ, কলকেতা থেকে একটা তারা খসে গেল। চূড়ো দত্তর কি ভেউ ভেউ করে কান্না! নিজের বাড়ির মাগ্ মলেও কেউ অমন কাঁদে না।

—কে মারলে? চূড়োবাবুর রাঁঢ়ের কাছ ঘেঁষা তো কম সাহসের কথা নয়।

—তুই কখনো ঘ্যাঁষবার চেষ্টা করিছিস, নাকি?

—আরে রাম রাম! আমি তো চুনোপুঁটিস্য চুনোপুঁটি! আপনার মুখেই শুনিচি এসব।

—চূড়োর কান্নার বহর দেখে মনে হচ্চে, সে-ই গুণ্ডা ভাড়া করে মারিয়েচে। পাখি নাকি উড়ু উড়ু কচ্চিল, রসিক দত্তরও চোখ পড়েচিল ঐ মেয়েছেলেটির ওপর। চূড়োবাবুর হাত ছাড়িয়ে কারুর পালাবার সাধ্য আচে?

—রাম কহো, রাম কহো! এসব নোংরা কথা শুনলেও পাপ। আর কী সংবাদ বলেন!

—চেতলাগঞ্জে আজ অনেকগুলো চালের নৌকো ভিড়েচে দেকলুম, চালের দর এবার একটু পড়বে মনে হয়।

—এয়েচে চালের নৌকো? দু'-তিন মাস ধরে যা অখাদ্য চাল জুটছিল।

—না রে, বাঙালদেশ থেকে বেশ ভালো চাল এয়েচে।

—আজ বিকেলে কেল্লা থেকে গুপুস গুপুস করে অনেকবার তোপ দাগলো। বিলেত থেকে কেউকেটা একজন এলো মনে হয়।

—কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের একজন জবর মেম্বর এয়েচে। কী নাম যেন, ভুলে গেলুম ছাই।

—আপনি কি এখন বেরুচ্চেন না বাড়ি ফিরচেন, ঘোষালমশাই?

—এই সন্ধেরাতে বাড়ি ফিরবো কি রে! আমার কি নোনা লেগেচে যে বাড়িতে বসে কাঁচা থোড় চিবুবো! একটা বাজনা শুনতে পাচ্চিস?

—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ থেকে শুনচি। কিসের বাজনা বলুন তো!

—আজ যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে খুব ধূমধাম। দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতি হয়েচে, তাই গোড়াদের ব্যাণ্ড পার্টি আনিয়েচে।

—তা আপনার নেমন্তন্ন নেই?

—আজ শুধু সাহেবদের। বাঈ নাচ হবে। দিশি লোকদের নেমন্তন্ন হলো গে কাল। আমার তো নেমন্তন্ন লাগে না, খাওয়া-দাওয়া দেখলেই ঢুকে পড়ি।

—ছেলে হলো কার?

—দেবেন্দ্রবাবুর। দ্বারকানাথের বড় ছেলে। দেবেন্দ্রর এক মেয়ে হয়ে মারা গিইছিল। এবার প্রথম ছেলে জন্মালো। নতুন বংশধর এলো, খুব ধূমধাম তো হবেই।

—দেবেন্দ্রবাবু তো বড়মানুষীতে বাপকেও ছাড়িয়ে যাবেন বোধহয়।

—বাপকে টেক্কা না দিলে আর বড়মানুষী কী? মনে নেই, একবার শুধু সরস্বতী পুজো করেই এক লাখ টাকা ওড়ালো? খরচের বহর দেখে দ্বারকানাথ পর্যন্ত হাঁ!

—উনি তো আবার হীরে মুক্তো গলায় পরেন না, পায়ে।

—পায়ে কি বলচিস? জুতোয়। জুতোর ওপর হীরে মুক্তো বসিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন!

—কালে কালে কত কী দেকবো!

—ওরা তো টাকার ওপর গড়াগড়ি দেয়। দ্বারকানাথের বাড়িতে টাকার গোনাগুণতি হয় না, দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে। দেবেন্দ্র হিঁদু কালেজে ভত্তি হয়েছেন। ও কালেজটা তো একটা ম্লেচ্ছদের আড্ডা। কেউ জাত ধম্মো মানে না। দুজো সাহেব মারা গেলেও তেনার চেলা-চামুণ্ডোগুলান রয়ে গ্যাচে। সেগুলো আবার এককাঠি বাড়া। দেবেন্দ্র যাতে বয়াটে হয়ে না যায়, তাই দ্বারকানাথ ছেলেকে কালেজ ছাড়িয়ে এনে বিষয়কম্মে লাগালেন, আর ছেলেও পুজো-আচ্চার নাম করে দু' হাতে দেদার টাকা উড়াচ্চে। বয়েস তো সবে তেইশ চব্বিশ, এর মধ্যেই দেবেন্দ্র যা খেল দেখাচ্চে, কাপ্তেনীতে সবাইকে ছাপিয়ে যাবে।

গুপী বললো, তাতে আপনাদেরই লাভ।

রাইমোহন বললো, এদিকে আমাদের রামকমল সিংগীরও এক ছেলে হলো। এতকাল তো পরের ধনে পোদ্দারি কচ্ছেল, এবার নাকি নিজের মুরদেই—

—নাকি বলছেন কেন?

—যা শুনবো, তাই বিশ্বেস করবো, এমন বান্দা আমি নই! রামকমল সিংগীর বোয়ের ছেলে হয়েচে কিন্তু সে ছেলে রামকমল সিংগীর না কার, তা কে জানে!

—আরে ছি ছি ছি ছি। রাম কহো। ও-কতা বলবেন না। পাড়াশুদ্ধু সকলে জানে, আর যেখানে যাই গণ্ডগোল থাক, রামকমল সিংগী মশায়ের পরিবার অতি সতী সাধ্বী মেয়েছেলে।

—আরে রাখ রাখ। সতী! বেণ্টিঙ্ক সাহেব এমন কানুন করে গেলেন তা গোটা দেশটার পোঙা মারা গেল।

—কী করেচেন, সে সাহেব?

—ঐ যে খানাকুলের ম্লেচ্ছটি সাহেবদের জপালো আর সাহেবরাও তার কতা শুনে নেচে উঠলো। সতীদাহ রদ করে গেলেন বেণ্টিঙ্ক, তার ফলে দেশ থেকে সতীই উধাও হয়ে গেল। একটা সতী মেয়ে আমায় দেকা তো?

গুপী চুপ করে গেল। এ-সব কথা নিয়ে আলোচনা করতে সে ভয় পায়। রাইমোহন ঘোষালের না হয় জিভের আড় নেই। কিন্তু সে ছাপোষা মানুষ।

—এবার আপনার নিজের সংবাদ বলেন ঘোষালমশাই।

অন্য জেব থেকে এক ছড়া সোনার হার বার করে রাইমোহন বললো, এটা দ্যাক্ তো, এটার জন্য কত দিতে পারবি?

হার ছড়া হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে গুপী বললো, এটা আবার কোথ্ থেকে আনলেন? আপনার কি জিনিস ফুরোয় না?

—এটা আমার নাতির।

—নাতির জিনিসটে বিককিরি করবেন? আহা, সে বেচারি মনে দুঃখু পাবে না?

—সে দুঃখু পেল তো আমার বয়েই গেল। সে কি এখানে আচে, গত বছর সে স্বগ্গে গ্যাচে,

সেখেনে সোনাদানার কত ছড়াছড়ি ! নে, ওজন করে দ্যাক্ !

এটা একটা খেলা। গুপী বেশ ভালোই জানে যে এটা রাইমোহনের নাতির গয়না নয়, আর রাইমোহনও জানে যে বিক্রির জন্য যে-সমস্ত গয়না সে আনে তা কোথা থেকে আসে, গুপীর জানতে বাকি নেই। তবু প্রত্যেকবারই একটু এ-রকম গল্প কথা হয়।

গুপী নিক্তি বার করলো। সেদিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইলো রাইমোহন। এই লোকটির বয়েসের গাছ-পাথর নেই। কেউ বয়েস জিজ্ঞেস করলে রাইমোহন হাসে। কিংবা রসিকতা করে বলে, এই ধরো না কেন বারো কি তেরো ! দেকছো না, বগলে চুল গজায় নি এখনো ?

রাইমোহন মাকুন্দ, শরীরখানা শুধু শক্ত হাড়ের ওপর চামড়া দিয়ে মোড়া, সেইজন্যই তার উচ্চতা যতখানি, তার চেয়েও ঢ্যাঙা দেখায়। খড়্গনাসা, অতিশয় ধূর্তের মতন চোখ, কথাবার্তায় দারুণ তুখোড়। রাইমোহন এ শহরে যজ্ঞের বিড়াল।

—আপনার সোনা আচে ডেড় ভরি টাক্ !

রাইমোহন অমনি ধমক দিয়ে উঠলো, কতটা হাত ঝোলালি ? অ্যাঁ ?

গুপী বললে, হাত ঝুলিয়েচি ? এই দেকুন না।

—আরে রাখ রাখ। কতায় আচে, স্যাকরার ওজন আর মামুদপুরের গাজন। মারামারি কাটাকাটি হবেই ! ভালো করে দ্যাক !

—পুরো ডেড় ভরি ! তা আপনার উনিশ টাকা দর ধরলে—

—উনিশ টাকা কি রে ব্যাটা ? বিশ টাকা দর উঠেচে।

—সে হলো পাকা সোনার দর।

—আমি কি তোর কাচে কাঁচা সোনা এনেচি !

অনেকক্ষণ দরাদরি হলো। গুপী কিছুতেই সাড়ে আঠাশ টাকার বেশী দেবে না, রাইমোহনও তিরিশ টাকা না নিয়ে ছাড়বে না, শেষ পর্যন্ত উনত্রিশে রফা হলো। টাকাগুলো গুণে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই রাইমোহন গুঁতো খেল ঘরের চালে। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বেরিয়ে পড়লো।

শনিবারের রাত, রাস্তায় বেশ ভিড়। জ্যোৎস্না রাত বলে অন্ধকার তেমন মিশমিশে নয়, কাছাকাছি বাড়িগুলো থেকেও আলোর রেশ এসে পড়েছে, অনেক পথচারীর হাতে লণ্ঠন। দুই গরুর গাড়ির মাঝখানে আটকা পড়েছে একটা ফিটন গাড়ি, তার ওপর থেকে চ্যাঁচাচ্ছে সহিস আর ভেতরে বসে এক সৌখিনবাবু বলছেন, আঃ সর না, কী আপদ ! গরু এমন ল্যাজের ঝাপটা মারছে, তা প্রায় বাবুর মুখে এসে লাগে। গাড়োয়ানের জোর ছপটি খেয়ে হঠাৎ একটা বলদ এত জোরে ছুটলো যে গাড়িশুদ্ধু গিয়ে পড়লো রাস্তার ধারের পুকুরে। লোকেরা 'আরে মলো মলো, গ্যালো গ্যালো, ধর ধর' বলে চেঁচিয়ে উঠলো। সেই সুযোগে ফিটন গাড়ি বেরিয়ে গেল খপখপিয়ে। চিৎপুরের রাস্তার দু' পাশে বিরাট বিরাট নর্দমা। গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ ছাপিয়েও শোনা যায় মানুষের গলা। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় কেউ চুপচাপ হাঁটে না, কে কার কথা শুনছে ঠিক নেই, তবু সকলেই কিছু না কিছু বলছে।

এরই মধ্যে চলেছে একটা ছোট মিছিল, তাতে দু'জন ঢোল বাজাচ্ছে। একজনের হাতে একটা দাউ দাউ করা মশাল আর বাকি লোকরা গান জুড়েছে, 'ভোলা বোম্ ভোলা বড় রঙ্গিলা লেংটা ত্রিপুরারি শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা।'

রাইমোহনের ঠোঁটে সব সময় একটা বাঁকা হাসি থাকে। সে ভিড়ের মধ্য দিয়ে চলেছে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে। হঠাৎ একজন লোকের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে গেল। সে রাইমোহনের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে স্খলিত গলায় বললো, আমি ছিকেষ্ট বাগানের পেয়ারা, না না, ভুল বল্লুম গো, আমি পেয়ারা বাগানের ছিকেষ্ট, তুমি কে বাবা, তাল গাছ ?

লোকটির মুখ দিয়ে ভুরভুরিয়ে বেরুচ্ছে সরাবের গন্ধ। তার কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠলো অদূরে দাঁড়ানো তিনটি মেয়ে। তাদের তিনজনেরই হাতে লাল রঙের রুমাল।

রাইমোহন জিজ্ঞেস করলো, মশায়ের লেগেচে ?

লোকটি বললো, না, না, লাগবে কেন ? যেন গাদা বোটের গায়ে নদীর ঢেউ, একটু দুলে উঠিচি শুধু।

রাইমোহন ডিবেটা বার করে বললো, নিন একটা পান আজ্ঞা করুন।

অমনি মেয়ে তিনটি আমায় দাও, আমায় দাও বলে এগিয়ে এলো। খালি হয়ে গেল রাইমোহনের

ডিবে। সে এক হাতে চেপে জেব সামলে রইলো যাতে টাকাগুলো না এই তালে-গোলে অদৃশ্য হয়ে যায়।

একটি মেয়ে বললো, হাতে গোরের মালা, কার গলায় পরাবে গো ?

অন্য একটি মেয়ে তার হাত চেপে ধরে বললো, আমার ঘরে চলো।

আর একটি অন্য হাত চেপে ধরে বললো, না গো, আমার ঘরে এসো, আমার ঘর খুব কাচে।

মাতালটি বললো, যাব্ বাবা ! আমি কি এঁটো কলাপাতা ? আমায় কেউ দেকচে না।

মেয়েগুলোর কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তাদের থুতনি ধরে একটু আদর করে আবার এগিয়ে গেল রাইমোহন।

হেদোর কোণে কুচকুচে কালো রঙের একটি দিশি খৃস্টান প্রভু যীশুর মহিমা কীর্তন করছে। তার পাশে হাতে বিলিতি লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোলগাল মুখ একজন সাহেব। কাছেই ভুর করে রাখা আছে অনেকগুলো বাইবেল। একটু পরেই যখন ঐ বাইবেল বিলি হবে, তখন এক অক্ষরও ইংরেজি পড়তে পারে না এমন লোকেরা ওগুলো নেবার জন্য কাড়াকাড়ি করবে। অনেক সময় রাস্তার ধারের নর্দমায় ডানা উল্টে পড়ে থাকতে দেখা যায় ভালো মরোক্কো চামড়ায় বাঁধানো বাইবেল। তবু পাদ্রীদের উৎসাহে ঘাটতি নেই।

বউবাজার পাড়ার একটি দোতলা বাড়িতে ঢুকে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রাইমোহন হাঁকলো, হীরেমনি, ও হীরেমনি ! আসবো ?

নীল রঙের জমকালো শাড়ি পরা একটি মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললো, তুমি আজ এয়েচো ? তোমার কি ভয় ডর নেই গা ?

রাইমোহন হাসতে হাসতে ওপরে উঠে এসে বললো, ভয় পেলে আর কোথায় নুকোবো ? তোমার কাচে ছাড়া ? কেন, কী হয়েচে ? পাড়া একদম ফাঁকা দেকচি যে !

হীরেমনি বললো, কাল রেতে অমন কাণ্ড হলো, আজ আর কেউ এ পাড়ায় আসবে ? এক তুমিই আচো ঘাটের মড়া।

রাইমোহন বললো, কেউ আসবে না, বা বা বা বা। শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেল, তা হলে আজ আমি একাই জমাবো।

ঘরের মধ্যে জাজিমের ওপর ফরাস পাতা। দরজার ঠিক সামনের দেয়ালে ঝুলছে একটি কালীঘাটের পট, একটা বেড়াল মাছ মুখে নিয়ে পালাচ্ছে। ফরাসের ওপর তিন চারটে লাল ভেলভেট মোড়া তাকিয়া, তার একটাতে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে একটি এক বছরের বাচ্চা ছেলে।

বেশ মৌরসীপাট্টা করে বসে রাইমোহন বললো, সকালে একবার উঁকি মারতে এয়েছিনু এদিকে। অনেক পাহারোলা দেকলুম। পাহারোলা পাহারোলায় ছয়লাপ একেবারে।

হীরেমনি বললো, দু'জন সাহেব পুলিশও এয়েছিল !

—তা আসবে না ? একি তোর আমার মরণ, চূড়ো দত্তর রাঁঢ়, স্বয়ং গবর্ণর জেনারেল যে আসেননি....মোতিবিবির কত বড় ভাগ্য বল্, সাহেবরা পর্যন্ত তার লাশ দেখতে এয়েছেল !

—আহা গো, সে চোকে দেকা যায় না ! কী নিদ্দয়ের মত মেরেচে, শরীলটা একেবারে ফালা-ফালা করে দিয়েচে।

—ঐ জন্যই তো তোকে বলি, কখনো বাঁধা বাবু রাকবি না। ছাড়া পাখি হয়ে থাকবি, এ ডালে বসবি, ও ডালে ঠোকরাবি।

—আমি মোতিকে বলিচিলুম, চূড়োবাবু বড্ড বদরাগী লোক, ওঁয়াকে চটাতে যাসনি—তা তো শুনলো না, ফাঁট দেখিয়ে বললো, কোন্ পরোয়া করে তুহার চূড়োবাবুকা ! এখন বোঝ্ !

—যাক গে, গেচে তো গেচে। আচ্ছা হীরেমনি, তুই যে বললি আজ আর কেউ আসবে না ভয়ে, তা হলে তুই অ্যাত সেজেগুজে বসেছিলি কোন্ নাগরের জন্যে র‍্যা ? আমার জন্যে বুঝি ?

—আহা হা, সাজ করেচি, সে আমার অব্যেশ। ওনার জন্যে ! ভারী মুরোদ ! হাতে নেই কানাকড়ি দরজা খোলো বিদ্যেধরী।

রাইমোহন বেনিয়ানের ওপর হাতের থাবড়া মারতেই রূপোর টাকা ঝনঝনিয়ে উঠলো। এক গাল হেসে বললো, মুরোদ নেই ! আজ একশো সিক্কা টাকা এনিচি। নোকরকে ডাক, বোতল আনা।

হীরেমনি বললো, আবগারির দোকান বন্ধ হয়ে গেচে, এখন আবার কোতায় বোতল পাবে ?

রাইমোহন হেসে বললো, ওর কাচেই বোতল রাকা থাকে, একটু ঘুরে ঘেরে এসে নিজেরই নুকোনো

বোতল বার করে দেবে। দুটো পয়সা বেশী নেবে, এই যা!

—দাঁড়াও বাপু, ছেলেটাকে রেখে আসি পাশের ঘরে। তুমি তো পেটে একটুখানি পড়লেই অমনি হল্লা শুরু করবে।

—হল্লা কি রে, গান শোনাবো। তোকে নিয়ে আমি নতুন গান বেঁধেছি!

—থাক, আর আমায় নিয়ে গান বাঁধতে হবে না। বড় বড় বাবুদের নিয়ে গান বাঁধো, তাই করো গে।

—বাবুদের নিয়ে গান বাঁধি তো রোজগারের জন্য, আর তোকে নিয়ে বাঁধবো রসের গান। তোকে শিকিয়ে দেবো, তুই গাইবি। তোর গলাটি এত মধুর।

হীরেমনি ঘুমন্ত ছেলেকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। রাইমোহন বললো, দিব্যি চাঁদপানা মুখখানি হচ্চে দিন দিন। হ্যাঁরে হীরেমনি, এ ছেলে কার রে?

—কার আবার, আমার!

—সে তো বুঝলুম। ওর বাপ কে?

—তা জেনে তোমার কী দরকার। ভগমান আমাকে দিয়েচেন ছেলে।

—ভগবান.? কোন্ বাড়ির ভগবান? দত্তবাড়ি, ঠাকুরবাড়ি, শীলবাড়ি, দেবেদের বাড়ি, মল্লিকদের বাড়ি, কত ভগবান আচে। এর ওপর আবার আচে সাহেব-ভগবান! তা কোন্ ভগবান তোকে দিলে?

—তুমি চুপ মারো তো।

—ছেলে আমার নয় তো রে? আমি অবশ্য ভগবান নই, আমি ওনাদের পায়ের কুকুর।

—মুখে মারবো মুড়ো ঝ্যাঁটা!

ঘরের মাঝখানে একটা কাটা দরজা, সেখানে ঝুলছে ভারি মখমলের পর্দা। সেই পর্দা ঠেলে হীরেমনি ছেলেকে নিয়ে গেল পাশের ঘরে।

একটু পরেই এলো মদের বোতল। অন্য দিনের তুলনায় আজ এ পাড়া সত্যি বেশ নিস্তব্ধ। প্রত্যেক সন্ধ্যেতে এদিকে হাসির ফোয়ারা আর ঘুঙুরের ঝমঝমানিতে বাতাস কাঁপে।

রাইমোহন সাধারণত কোনো কাপ্তেনের স্যাঙাত হয়ে এ সব জায়গায় আসে। খরচ খর্চা সব সেই কাপ্তেনের। তাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে রাইমোহনের এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে সন্ধ্যেরাতে আর কিছুতেই নিজের বাড়িতে মন টেঁকে না। একমাত্র হীরেমনির কাছেই সে মাঝে মাঝে একা আসে। হীরেমনি এ পাড়ায় এসেছে বছর চারেক, বয়েস মাত্র সতেরো-আঠারো।

আজ নিজেই কাপ্তেনের ভঙ্গিতে তাকিয়া হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে হাতের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে রাইমোহন বললো, একটা গান ধর না—

হীরেমনি বললো, তুমিই তো আজ গান শোনাবে বললে—

রাইমোহন চোখ বুজে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তান ধরলো, সোনার বৃক্ষে রূপোর পাতা, সেথা বসেছে এক হীরেমন পাখি—

হাতটা এগিয়ে এনে সে হীরামনির গাল টিপে আদর করলো।

কিন্তু এই আসর ভেঙে গেল অকস্মাৎ।

হীরেমনিকে সবে মাত্র দু'-এক লাইন গানের আখর শুনিয়েছে রাইমোহন, এই সময় বাড়ির সদরে একটা গাড়ি থামার আওয়াজ হলো। হীরেমনির নোকর রামদাস ছুটতে ছুটতে ওপরে এসে দরজায় ঘা দিয়ে বললো, সরকারবাবু আয়ে হেঁ, সরকারবাবু!

রাইমোহন শায়িত অবস্থা থেকে ধড়মড় করে উঠে বসে বললো, নিশ্চয়ই জগমোহন সরকার!

হীরেমনি ভুরু কুঁচকে বললো, তুমি উঠচো কেন, তুমি বসো!

রাইমোহন জিভ কেটে উত্তর দিল, মাতা খারাপ! আর এখানে আমার ঠাঁই আচে! জগমোহন সরকার এয়েচে, আমি তো তার তুলনায় একটা ছারপোকা।

হীরেমনি তার হাত চেপে ধরে বললো, না তুমি বসো। রামদাস, বাবুকে বলে দে, আজ দেকা হবে না। আজ আমার শরীল খারাপ।

—অমন করিস নি, হীরে! বাবু ফেরাতে নেই। বাবু হলো গে লক্ষ্মী, এমন হাতের লক্ষ্মী কি পায়ে ঠেলতে আচে?

—ওসব বাবু আজ ফিরে গেলে আবার কাল আসবে। তুমি সোন্দর গান শোনাচ্চিলে, আজ তুমিই থাকো।

—আরে আমি কি কখনো বাবু হতে পারি ? আমার বাপ ঠাকুরদা তো আর নুনের দেওয়ানি করেনি বা সাহেবদের তল্পি বইতেও পারেনি। আমি তো তোর পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। তুই টাকার খোঁটা দিচ্চিলি, আমি বল্লুম, এক শো টাকা এনিচি। আরে এক শো টাকা একসঙ্গে কি আমি চোখে দেকিচি কখনো ? আমি বড়জোর বিশ-পঁচিশের খদ্দের !

—এই, নিমকহারামের মতন কতা বলো না। তোমার ঠেঙে কখনো আমি টাকা নিইচি ? ভগমানের দয়ায় আমার টাকার অভাব নেই।

—কতার কতা বললুম। আমি পালাই, তুই বাবুকে ডাক। জুতো জোড়া আবার কোতায় গেল !

—তুমি পালাতে চাইচো কেন ? আমার টাকার দরকার নেই। আমি বলচি তুমি থাকো।

—জগমোহন সরকারকে ফেরাসনি। উনি আবার ফিমেল উদ্ধারের ব্রত নিয়েচেন, মনে বড় দুঃখু পাবেন। মানী লোক !

—তবে যাও, বেরোও ! দূর হও !

—আহা, তা বলে অমনভাবে ভাগিয়ে দিসনি। সবাই নাতি ঝ্যাঁটা মারে বলে কি তুইও মারবি ? একটু আদর করে যেতে বল। এখন আমি যাই-ই বা কী করে। জগমোহন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসচেন, নামতে গেলে ওঁর ঘাড়ে পড়বো।

সিঁড়িতে দুপদাপ শব্দ হচ্ছে। জগমোহনের বিশাল বপু, নেশার ঝোঁকে পা দুটিও এখন টলমল, রামদাসের কাঁধে হাত দিয়ে উঠছেন উনি। ওপরে এসে হীরেমনির ঘরের বন্ধ দরজায় দুম দুম করে কিল মারতে লাগলেন।

হীরেমনি বললো, যাও, দরজা খুলে দাও গে ?

রাইমোহন ফিসফিস করে বললো, বাবু আমাকে এখানে দেকলে মহা চটিতং হয়ে যাবেন রে ! পক্ষী হলে জানলা দিয়ে উড়ে যেতুম। এখন কী করি !

—শালিক পাখির মতনই তো ভয়ে কাঁপচো।

রাইমোহন চোখ বুজে ঠোঁট ফাঁক করে নিঃশব্দে হাসলো একটুক্ষণ। তারপর কোমর দুলিয়ে নাচতে শুরু করলো।

—ভয়ে তোমার মাতাটাতা খারাপ হয়ে গেল নাকি গো ?

—ভয়ে নয় রে, ভয়ে নয়, আনন্দে। আজ জগমোহন সরকারকে বাগে পেয়িচি। শোন, আমি পাশের ঘরে নুকিয়ে থাকবো, তুই যেন কিছু ফাঁস করে দিসনি।

জগমোহন হেঁড়ে গলায় বললো, কইগো হীরেমনি, দরজা খোলো !

হীরেমনি বললো, আজ আপনি ফিরে যান। আজ আমার শরীল ভালো নেই।

জগমোহন সরকার বললেন, আমি তোমার শরীর মন সব ভালো করে দোবো। আমার কাছে মোক্ষম দাওয়াই আছে।

হীরেমনিকে চোখ দিয়ে দরজা খোলার ইঙ্গিত করে রাইমোহন সুড়ুৎ করে চলে গেল পাশের ঘরে। ভেজিয়ে দিল দরজাটা।

জগমোহন সরকার ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে একটি মস্ত বড় ঢেঁকুর তুললেন। হাতের ছড়িটা মাটিতে ফেলে ভুঁড়ির ওপর দু' হাত রেখে পরম তৃপ্তির মুখভঙ্গি করে বললেন, কই হীরেমনি, তোমার শরীর তো কিছু খারাপ নয়। বদনকমলটি যেন আরও প্রস্ফুটিত হয়েছে, ইচ্ছে হয় ভ্রমর হয়ে গিয়ে আমি বসি। আমি অনেকদিন পর এলুম, অনেক দিন পর তোমায় দেকলুম।

হীরেমনি বললো, তাই তো ভাবচি। কলকেতা শহরে মেয়েমানুষ গিসগিস কচ্চে, হঠাৎ এই অধীনাকে আপনার মনে পড়লো ?

জগমোহন সরকার বললেন, মনে তো সততই পড়ে। কিন্তু বড় বেশী কাজে জড়িয়ে পড়েছি এদানি। মুখ তুলবারও সময় পাই না। আজ তোমার সঙ্গে দুটি মনের কথা কইতে এলুম।

—বসুন। বাতাস করবো ? একটু সরবৎ বানিয়ে এনে দোবো ?

—সরবৎ ! সুধাপান করতে এলুম, আর তুমি বলছো সরবতের কথা ! শরীর খারাপের কথা তুলে আমাকে ফেরাতে চাইছিলে কেন, প্রিয়ে ?

—অনেক রাত হয়েচে তো, শোবার উয্যুগ কচ্চিলুম !

—বেশী রাত না হলে আমি আবার বেরুতে পারি না। ছোঁড়ার দল ঘোরাঘুরি করে, কে কখন দেকে ফেলবে। মহৎ কাজে নামার অনেক বিপদ, বুঝলে হীরেমনি, সব সময় পেছনে ফেউ লেগে থাকে।

জগমোহন সরকার বসলেন। হীরেমনি তখনো দূরে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললেন, এসো, কাছে এসো, একটু আলিঙ্গন দাও, বুকটা জুড়োক। বুকটা বড় খাঁ খাঁ করে আজকাল।

ভেজানো দরজাটা চুলের মতন ফাঁক করে সেখানে চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রাইমোহন।

শোনা যায় নবীনকুমারের যখন মাত্র পাঁচ মাস বয়েস, সেই সময়েই সে একটি বিস্ময়কর কাণ্ড করেছিল। একদিন সে খাট থেকে গড়িয়ে পড়ে যায় মাটিতে। বিম্ববতী সেদিন পাল্কি চেপে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন, পুত্রের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন অতি বিশ্বস্ত চিন্তামণি দাসীর ওপর। শিশুকে ঘুমন্ত ভেবে চিন্তামণি সবেমাত্র একবার ঘরের বার হয়েছে, অমনি শিশু সেই শয্যা থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল ভুঁয়ে।

শব্দ পেয়েই চিন্তামণি ছুটে এলো হাঁকুপাঁকু করে। এসে, ঐটুকু ছেলের কাণ্ড দেখে তার চোখ কপালে উঠলো। অত উঁচু থেকে পড়ে গিয়েও নবীনকুমার কাঁদেনি, বরং হামাগুড়ি দিয়ে সে পালঙ্কের নীচে লুকোবার চেষ্টা করলো যেন। হামাগুড়ি! ভয়ে বুক টিপটিপ করতে লাগল চিন্তামণির। পাঁচ মাসের শিশুকে হামাগুড়ি দিতে দেখেছে কেউ কখনো? পালঙ্কের নীচে হাত বাড়িয়ে চিন্তামণি ব্যাকুলভাবে ডাকতে লাগলো, অ ছোটবাবু! ছোটবাবু!

চিন্তামণি নবীনকুমারকে ধরে তুলতে সাহস পাচ্ছিল না। তার ধারণা হলো, এ ছেলের ওপর অপদেবতার দৃষ্টি পড়েছে নিশ্চিত। চ্যাঁচামেচি করে বাড়িশুদ্ধ লোককে সে ডেকে জড়ো করলো সেখানে।

নবীনকুমার গুটিসুটি মেরে বসে আছে পালঙ্কের নীচে। মুখ দেখলে মনে হয়, ঠিক যেন দুষ্টুমী করে হাসছে সে। তার কপালের বাঁদিক কেটে গেছে। সরু ধারায় রক্ত গড়াচ্ছে সেখান থেকে। পাঁচ মাসের শিশু হামাগুড়ি দেয় এবং কপাল কেটে রক্ত বেরুলেও না কেঁদে হাসে। এ দৃশ্য প্রায় অলৌকিকেরই মতন।

আট মাস বয়েসে নবীনকুমার একদিন আপনি আপনিই উঠে দাঁড়ায়। এবং দিব্যি গুড়গুড়িয়ে হেঁটে একলা একলা ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে আবার চমকে দেয় সকলকে।

নবীনকুমারের পরবর্তী কীর্তিটি আরও চমকপ্রদ।

বিম্ববতীর পাখি পোষার শখ। বাড়িতে অনেকগুলি ময়না, চন্দনা, হিরামন ও কোকিল আছে। তিন দিকের বারান্দায় সার দিয়ে সেই সব পাখির দাঁড়গুলি সাজানো। অন্দর মহলের মধ্যখানে উঠোন। তিন মহলা বাড়ি। একতলার ঘরগুলি আশ্রিত-পোষ্য ও কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দ। এছাড়া বাড়ির সংলগ্ন কয়েকটি গোলপাতার ঘরও আছে, সেখানে থাকে দাস-দাসীরা। দোতলার বারান্দাটির নীচের অর্ধেক রেলিং-এ ঘেরা, বাকি অর্ধেক অংশে গ্রীষ্মকালে খসখসের পর্দা ফেলা থাকে। বিম্ববতী এই বারান্দায় দাঁড়িয়েই দাস-দাসীদের প্রয়োজন মতন নির্দেশ দেন। সব দাস-দাসীর ওপরে আসার হুকুম নেই।

পাখিগুলির দাঁড়ে বসানো বাটিতে রোজ সকালে ছোলা আর জল দেন বিম্ববতী নিজে। পাখিগুলি নানা রকম সুরে ডাকে। কিন্তু কোনো পাখির মুখে বোল ফোটেনি, বিম্ববতীর শুধু এই একটা দুঃখ। তিনি প্রতিদিন তাঁর ঘরের সামনের ময়নাটির কাছে দাঁড়িয়ে পাখি পড়ান: ময়না, বল রাধেকৃষ্ণ! বল রাধেকৃষ্ণ! রাধেকৃষ্ণ!

বিম্ববতীর কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট। তাঁর মুখনিঃসৃত রাধাকৃষ্ণ নামে যেন এ বাড়ি পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু বোকা ময়নাটা কিছু বোঝে না। ঘাড় ঘুরিয়ে লাল লাল চোখ মেলে সে শুধু দেখে বিম্ববতীকে।

শিশু নবীনকুমারও মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সেই সময়। পাছে দুরন্তপনা করে সে কোনো পাখিকে ধরতে যায় কিংবা কোনো পাখি হঠাৎ ঠুকরে দেয় তাকে, তাই বিম্ববতী এক হাত দিয়ে ছেলের মাথা ঢেকে রাখেন।

ময়না বুলি শিখলো না। তার আগেই নবীনকুমার একদিন বলে উঠলো, রাধেকৃষ্ণ!

প্রায় পরিষ্কার উচ্চারণ। মায়ের দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে সে বারবার বলতে লাগলো ঐ কথা।

'মা' বললো না, দুধ বললো না, যাই বললো না, শিশুর মুখের প্রথম কথাই হলো রাধেকৃষ্ণ। তখন ঠিক আট মাস সতেরো দিন বয়েস। বিম্ববতীর সর্বাঙ্গে এক দারুণ শিহরন হলো। চিন্তামণির কথা শুনে তাঁরও মনে মনে একটু আশঙ্কা ছিল যে ছেলের ওপর অপদেবতার নজর পড়েছে হয়তো। অকালে ভূমিষ্ঠ সন্তানকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা থাকেই। কিন্তু সেদিন তিনি আনন্দে কাঁপতে লাগলেন। রাধাকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করেছে যে শিশু, কোন্ অপদেবতার সাধ্য তার ধার ঘেঁষে।

ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বিম্ববতী দৌড়োলেন তাঁর স্বামীর ঘরের দিকে।

রামকমল সিংহের ঘুম ভাঙে বেশ বেলায়। চোখ মেলে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। বিম্ববতীর প্রায় পাগলিনীর মতন অবস্থা। হেসে কেঁদে তিনি একেবারে অস্থির। চুমোয় চুমোয় বালকের গাল সম্পূর্ণ ভিজিয়ে দিয়েছেন। বিম্ববতী যে স্বামীকে কী বলতে ছুটে এসেছেন, তা প্রথমে বুঝতেই পারলেন না রামকমল।

ছেলেই বুঝিয়ে দিল বাবাকে। সে আবার বললো, রাদে কিস্স-ও! ঠিক যেন যন্ত্র পুতুলের মতন আওয়াজ।

ক্রমে ক্রমে বহু জায়গায় রটে গেল যে, যোড়াসাঁকোর সিংহ বাড়িতে এক ক্ষণজন্মা শিশুর আবির্ভাব হয়েছে। এক বছর বয়েসেই সে নাচে, গায়, ছড়া বলে। বাড়িতে অতিথিরা এলে তাঁরা গোল হয়ে ঘিরে বসেন মজলিশ কক্ষে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে নবীনকুমার হাত পা নেড়ে, চোখ উল্টে নানা রকম কৌতুক দেখায়। সকলেই যে এ দৃশ্য উপভোগ করে, তা নয়। কেউ কেউ অস্বস্তিতে মুখ ফিরিয়ে রাখে। এ শিশুর কিছুই যেন স্বাভাবিক নয়। হাত-পায়ের গড়ন যেন কাঠ কাঠ, ঠোঁটে নাকে তীক্ষ্ণতা আছে কিন্তু লালিত্যের বেশ অভাব। তার চোখ দুটি বেশী উজ্জ্বল। তার ব্যবহারে এতখানি অকালপক্কতা দেখলে গা ছমছম করে। মনে হয়, এ শিশু বেশীদিন বাঁচবে না। প্রকৃতির খেয়ালে এ রকম একটি দুটি শিশু জন্মায় আবার হঠাৎ চলে যায়।

শ্রীরামপুরের মার্শম্যান সাহেবের সাপ্তাহিক পত্রিকা সমাচার দর্পণে ছাপাও হয়েছিল এই শিশুর খবর। 'যুগল সেতু নিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু রামকমল সিংহের বহু সুকৃতির ফলে পরিপক্ক বয়সে এক পুত্রসন্তান লাভ হইয়াছে। ঐ পুত্রের নাম নবীনকুমার। সে তাহারদের গৃহ উজ্জ্বল করতঃ মাতা পিতাকে সুখসাগরে নিমজ্জিত রাখিয়াছে। বিশেষ কথা এই যে ঐ পুত্র অতি ভক্তিমান। দেব-দেবীর মূর্তি দেখিলেই সে দর ২ ধারে অশ্রুবর্ষণ করে ও গীত গাহে। বালকের বয়ঃক্রম এক বৎসর দুই মাস মাত্র।'

এদিকে গঙ্গানারায়ণ দিন দিন আরও নিভৃতচারী হয়ে উঠছে। এমনিতেই সে লাজুক, বাড়িতে আত্মীয় সমাগম হলে সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, হাঁটাচলা করে নিঃশব্দে। এখন তাকে আরও দেখতে পাওয়া যায় না। নিজেকে প্রায় সব সময় আবদ্ধ করে রাখে নিজের কক্ষে। বছরখানেক আগে সে ফিরিঙ্গি পাঠশালা ছেড়ে ভর্তি হয়েছে হিন্দু কলেজে। তার মনে এসেছে নতুন জোয়ার। চোখের সামনে খুলে গেছে কল্পনার এক অপরূপ জগৎ।

একা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে সে আবৃত্তি করে :

নট ম্যাড, বাট বাউণ্ড মোর দ্যান আ ম্যাডম্যান ইজ ;
শাট আপ ইন প্রিজন, কেপ্ট উইদাউট মাই ফুড
হুইপ্ড অ্যাণ্ড টরমেণ্টেড....

রোমিওর সংলাপ উচ্চারণ করতে করতেও সে শুনতে পায় ক্যাপটেন রিচার্ডসনের কণ্ঠস্বর। ক্যাপটেন সাহেব কাব্যকে একেবারে জীবন্ত করে তোলেন। ক্লাসে পড়াতে পড়াতে কখনো তিনি সিংহের মতন গর্জন আবার কখনো বাঁশীর মতন মধুর সুরেলা স্বর বার করেন। রোমিও'র কথা বলতে বলতে তিনি নিজেই রোমিওভাবে ভাবিত হয়ে যান। আবার তিনিই ক্যাপিউলেট, তিনিই মারকুশিও,

এমনকি জুলিয়েট পর্যন্ত। জুলিয়েটের কথা চোখ বুঁজে শুনলে মনে হবে, ক্লাসের মধ্যে সত্যিই বুঝি কোনো নারী এসে উপস্থিত হয়েছে।

রিচার্ডসনের ক্লাসে একটি পিনের শব্দ পড়লেও শোনা যায়। এমনকি মধুর মতন অত দুরন্ত ছেলেও সে সময় তন্ময় হয়ে থাকে।

গঙ্গানারায়ণের বিবাহের কথাবার্তা চলছে। রামকমল চান খুব শীঘ্রই গঙ্গাকে বিষয়-কর্মে লাগিয়ে দিতে। অনেক পাত্রী দেখার পর বাগবাজারের গোকুল বসুর কন্যা লীলাবতীকে মোটামুটি পছন্দ করা হয়েছে। লীলাবতীর বয়েস সাত। গঙ্গানারায়ণের এখন বিবাহের এতটুকুও ইচ্ছে নেই। কিন্তু সে কথাও সে মুখ ফুটে বলতে পারে না কারুকে। অতটুকু একটা মেয়ের সঙ্গে সে কী কথা বলবে ? তা ছাড়া, বিবাহের চিন্তাতেই গঙ্গানারায়ণের কর্ণমূল আরক্ত হয়। ঐ ব্যাপারটির মধ্যে কী যেন একটা রহস্য আছে, তা সে এখনো ঠিক বোঝে না। ইদানীং ঐ কথা তুলে বিন্দুবাসিনী প্রায়ই খুব রঙ্গ করে।

বিন্দুবাসিনী বিধুশেখরের তৃতীয়া মেয়ে। গঙ্গানারায়ণ বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে যায় ঐ বাড়িতে। আগে প্রায় প্রত্যহই যেত, এখন বিশেষ করে শনিবার ও রবিবার সে যেতে ভোলে না। বিধুশেখরের বাড়ির আশ্রিতদের মধ্যে একজন হচ্ছেন শিবরাম আচার্য, তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত সংস্কৃত ও বাংলার পাঠ নিতে যেত গঙ্গানারায়ণ। কিছুদিন হলো আচার্যমশাই মার্শম্যান সাহেবের কাগজে পণ্ডিতের চাকুরি নিয়েছেন। সারা সপ্তাহ শ্রীরামপুরে থেকে শনিবার কলকাতায় আসেন।

বিন্দুবাসিনীও পাঠ নেয় ঐ আচার্যের কাছে। বিন্দুবাসিনীর পড়াশুনায় বড় আগ্রহ, সেখানেই তার সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের মিল। বিধবা হয়ে পিত্রালয়ে ফিরে এসে বিন্দুবাসিনী পড়াশুনোয় বেশী করে মন দিয়েছে।

বিধুশেখরের কন্যার সংখ্যা পাঁচ, তিনি অপুত্রক। পুত্রসন্তান নেই বলেই বিধুশেখরের বাড়িতে গঙ্গানারায়ণের বেশী আদর। বিধুশেখরের পঞ্চম কন্যাটির বয়েস আট, তারও বিবাহ এই সামনের অগ্রহায়ণে। সেই কন্যার সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের বিবাহ হলে ব্যাপারটি সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারতো, কিন্তু তা হবার নয়। বিধুশেখররা ব্রাহ্মণ।

বৈদিক কুলীন বলে ঐ পরিবারের মেয়েদের বিবাহ হয় কুল সম্বন্ধ করে। কন্যাসন্তান জন্মাবার দু'-এক মাসের মধ্যেই স্বজাতের মধ্যে কোনো পাত্র নির্বাচন করে তার সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করে রাখতে হয়। তারপর যথাসময়ে সেই নির্দিষ্ট পাত্রের সঙ্গেই বিবাহ।

বাল্য থেকেই বিন্দুবাসিনীর কপাল পোড়া। কৃষ্ণনগরের যে ছেলেটির সঙ্গে তার কুলসম্বন্ধ করা ছিল, বিন্দুবাসিনীর বয়েস সাত না পুরতেই মরে গেল সেই ছেলেটি। ফলে বিন্দুবাসিনী অন্যপূর্বা হয়ে গেল, তার আর কুলীন ঘরে বিবাহ সম্ভব নয়। এক মৌলিক ঘরের পাত্র ঠিক করা হলো তার জন্য। বিন্দুবাসিনী প্রায় গঙ্গানারায়ণের সমবয়সী। গঙ্গানারায়ণের মনে আছে বিন্দুবাসিনীর বিবাহের দিনটির কথা। সেদিন আকাশের রঙ ছিল রক্তবর্ণ। পাথুরিয়াঘাটায় সাংঘাতিক আগুন লেগেছিল, পুরো দু'দিন ধরে জ্বলেছিল সেই আগুন। সেই লাল আকাশের নীচ দিয়ে খেলাঘর ও পুতুলের সংসার ছেড়ে আট বছরের বালিকা বিন্দুবাসিনী চলে গেল শ্বশুরালয়ে। সেদিন সে গিয়েছিল কাঁদতে কাঁদতে, আবার সেই রকমই কাঁদতে কাঁদতে ঠিক দেড় বছরের মাথায় সে ফিরে এলো সিঁথির সিঁদুর মুছে।

পুত্রসন্তান না থাকলেও বন্ধুর মতন দত্তক নেননি বিধুশেখর। পঞ্চম কন্যা সুহাসিনীর সঙ্গে যার বিবাহ ঠিক করেছেন, তাকে তিনি ঘরজামাই করে রাখবেন। সদর দেওয়ানি আদালতে ওকালতি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন বিধুশেখর, উকিল হিসেবে তাঁর প্রতিপত্তি প্রায় রাজনারায়ণ দত্তের সমান সমান। সুহাসিনীর কুলসম্বন্ধ ছিল যার সঙ্গে, সে ইতিমধ্যেই আরও দুটি বিবাহ করায় ক্রুদ্ধ বিধুশেখর সেই পাত্রের সঙ্গে নিজ কন্যার সম্বন্ধ ছিন্ন করেছেন। এর ফলে সমাজে কিছু গুঞ্জন উঠেছিল, কিন্তু বিধুশেখর অর্থের জোরে সমাজের মুখ চাপা দেবেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে একটি দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে তিনি সুহাসিনীর বর হিসেবে ঠিক করেছেন, এই ছেলেটিও খাটি দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলীন বংশীয়।

বিধবা হয়ে ফিরে আসার পর বিন্দুবাসিনী আর পুতুল খেলায় মন দেয়নি। যথা নিয়মে অবশ্য তাকে প্রথমে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল আরও বৃহৎ একটি পুতুল খেলার ঘরে। আবেগকম্পিত গলায় বিধুশেখর বলেছিলেন, মা, আর কাঁদিস নে, আজ থেকে গৃহদেবতার সেবার সব ভার তোর ওপরেই দিলাম। মনে করিস, স্বয়ং জনার্দনই তোর স্বামী। আমরা সকলে তোর সন্তান।

কিন্তু সাড়ে ন' বছরের একটি বালিকার সর্বক্ষণ ঠাকুরঘরে মন বসবে কেন ? গোড়ায় কিছুদিন সে

একটা সাদা থান আলুথালুভাবে শরীরে জড়িয়ে ঠাকুরঘরে গিয়ে গম্ভীরভাবে চোখ বুজে বসে থাকতো। কখনো কখনো তার মা গিয়ে দেখেছেন যে মেয়ে কুশের আসনের ওপরই কাৎ হয়ে ঘুমিয়ে আছে।

এখন বিন্দুবাসিনী দু'বেলা নমো নমো করে কোনোক্রমে পুজো সেরে আসে, আর বাকি সময় পড়ে। সংস্কৃত ও বাংলায় তার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মেছে। কূট প্রশ্নে সে গঙ্গানারায়ণকেও হারিয়ে দেয়। বিন্দুবাসিনী প্রশ্ন করে, বল তো গঙ্গা, 'বিজ্ঞানার্থং মনুষ্যানাং মনঃ পূর্বং প্রবর্ততে'-এর মানে কী ?

গঙ্গানারায়ণ কোনক্রমে উত্তর দেয়, মানুষের মন সব কিছু জানবার জন্য ব্যস্ত।

বিন্দুবাসিনী মাথা দুলিয়ে হাসে আর বলে, হলো না, হলো না ! অত কী সহজ। মানুষের মন প্রথমে বস্তুর স্বরূপ জানবার জন্য প্রবৃত্ত হয়। তারপর মানুষের মন এর ওপরে উঠে যায়, আর সেই বস্তুকে অনুভব করার সংকল্প করে—আর তাতে বাধা পেলে চটে যায়।....'তৎ প্রাপ্য কামং ভজতে রোষঞ্চ দ্বিজসত্তম !'

বিন্দুবাসিনীর মুখে এত বড় বড় কথা শুনে গঙ্গানারায়ণেরও হাসি পায়। সে বলে, এ তো কাব্য নয়। এ সব শুকনো দর্শন আর আমার ভালো লাগে না।

বিন্দুবাসিনী ফোঁস করে ওঠে।

—এ সব শুকনো দর্শন ? তুই বুজিস ছাই ! দু'পাতা ইংরেজি পড়েই তুই সব বুজে গিয়েচিস। তাই না ?

সংস্কৃত সম্পর্কে গঙ্গানারায়ণের আগ্রহ সত্যিই অনেক কমে গেছে। আর বাংলায় তো পড়বার মতন একখানাও বই নেই।

—তুই তো ইংরাজি পড়লি না বিন্দু ! তুই বুঝবি কী করে যে কত সুন্দর রসের কাব্য ওরা লিকেচে। মেকলে সাহেব কী বলেচেন, জানিস ? আমাদের দেশের যে কটা ভালো বই, তা আঙুলে গোনা যায়। ইওরোপীয় লাইব্রেরির একখানা তাকও ভরবে না। আর ওদের সাহিত্যের কী বিরাট ভাণ্ডার !

—তোর সেই মাকালু সাহেবকে জিজ্ঞেস করিস তো, শুধু গোটা মহাভারতখানা রাখতেই ক'টা তাক লাগে।

—তুই যে এত সংস্কৃত পড়াশুনো করিস, এতে তোর কী লাভ, বিন্দু ? তুই তো আর টোল খুলবি না।

—আমি পড়ি আমার নিজের আনন্দের জন্য।

শিবরাম আচার্য অত্যন্ত শীর্ণকায়, কথা বলার সময় সব সময় হাঁটু দুটো নাড়তে থাকেন আর তাঁর হাতের হুঁকোয় মটমট শব্দ হয়। একতলায় তাঁর ঘরখানি দিনের বেলাতেও বেশ অন্ধকার, চতুর্দিকে ডাঁই করা পুঁথিপত্র। ঐ রকম রোগা চেহারা হলেও তাঁর গলাখানা বাজখাঁই। একখানা পুঁথি খুলে তার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে পাঠ উদ্ধার করেন। পড়াতে ভালোবাসেন তিনি, গঙ্গানারায়ণ ও বিন্দুবাসিনীর মতন দুটি মনোযোগী ছাত্র-ছাত্রী পেয়ে তিনি বেশ উৎসাহের সঙ্গেই পড়ান। বিন্দুবাসিনীর অন্য বোনেদের কখনো পড়াশুনোয় এমন আগ্রহ দেখা যায়নি। তবে সকলেই বাংলা লিখতে ও পড়তে জানে। গঙ্গানারায়ণ লক্ষ্য করেছে যে ব্রাহ্মণবাড়ির মেয়েরা মোটামুটি লিখতে পড়তে সবাই শিখে যায়। তার মা বিম্ববতীর অক্ষর জ্ঞান নেই। ছোটভাইটি জন্মাবার আগে পর্যন্ত সে প্রত্যেকদিন মাকে বই পড়ে শুনিয়েছে।

শনিবার শ্রীরামপুর থেকে একটু আগে ফিরেছেন শিবরাম আচার্য। হাত-পা ধুয়ে জপ সেরে নিলেন। চোখ খুলেই দেখেন দুই ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত। প্রথমেই তিনি গঙ্গানারায়ণের কাছ থেকে তার বাড়ির কুশল সংবাদ জানলেন। বিশেষত গঙ্গার কনিষ্ঠ ভাইটি সম্পর্কে তাঁর বেশী আগ্রহ।

তারপর তিনি হুঁকো ধরিয়ে টানতে লাগলেন আরাম করে, পুঁথি খুললেন না।

বিন্দুবাসিনী বললো, পণ্ডিতমশাই, আপনি আজ আমাদের কালিদাস পড়াবেন বলেচিলেন, মেঘদূত....

শিবরাম আচার্য বললেন, মেঘদূতম্....হুঁ।

চিন্তিতভাবে জোরে জোরে খানিকক্ষণ হাঁটু নাচালেন তিনি। তারপর বললেন, মা বিন্দু, কিছুদিন ধরিয়াই তোমাকে একটি কথা বলিব বলিব করিয়াছি, কিন্তু বলা হইয়া উঠে না। আমার নিকট তুমি যথেষ্ট শিখিয়াছ, আর কিছু তোমার শিখিবার প্রয়োজন দেখি না।

বিন্দু অবাক হয়ে বললো, আর কিছু শেকার নেই ? আপনিই তো বলেচেন, মানুষের শিক্ষার কখনো

শেষ হয় না। তাছাড়া, আমি তো এখনো কিছুই শিকিনি।

শিবরাম বললেন, যাহা শিখিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট। আর প্রয়োজন নাই। স্ত্রীলোকের পক্ষে যতখানি শিক্ষা করা উচিত, তুমি তাহা অপেক্ষা বেশীই পড়িয়াছ।

—না পণ্ডিতমশাই। ও কথা আমি শুনবো না। পড়াশুনো না করলে আমি সময় কাটাবো কেমন করে?

—বেশ তো, যদি পাঠাভ্যাস রাখিতে চাও, নিজে নিজেই তাহা পারিবে। আমার সাহায্য লাগিবে না।

—নিজে নিজে পড়বো? আপনি তো মুগ্ধবোধ শেষ করেননি। সংস্কৃত ব্যাকরণ আমি এখনো সব বুজতে পারি না। গঙ্গা বলচিল, ওর দর্শন ভালো লাগে না, কাব্য ভালো লাগে। ইংরেজিতে নাকি ভালো কাব্য আচে। মেঘদূতের চেয়েও কি ভালো কাব্য ইংরেজিতে আচে? আপনি আমাদের মেঘদূত পড়ান।

—শুন, মা বিন্দু, মেঘদূতম্ স্ত্রীলোকের পাঠ করা উচিত হয় না।

কথাটা বলে ফেলে শিবরাম আচার্য নিজেই যেন লজ্জা পেলেন, মুখটা নীচু করলেন মাটির দিকে। বিন্দুবাসিনীর মুখখানা এবার বিবর্ণ হয়ে গেল। সে অস্পষ্টভাবে জানে যে কোথাও কোথাও একটা কিছু সীমারেখা আছে, যা সে লঙ্ঘন করতে পারবে না।

গঙ্গানারায়ণ চুপ করে বসে ছিল। শিক্ষাদানের ব্যাপারে অত্যুৎসাহী পণ্ডিতের হঠাৎ এই মন পরিবর্তনের কারণটা সে ঠিক বুঝতে পারলো না। বিন্দু কেন আর পড়বে না?

সে জিজ্ঞেস করলো, পণ্ডিতমশাই, আপনি আমাকেও আর পড়াবেন না?

পণ্ডিত বললো, তোমাকে কেন না পড়াইব? তোমার যখন ইচ্ছা আসিও।

—তা হলে বিন্দু কী দোষ করলো?

—স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা দিবার অধিকার আমাদের নাই। ইহা লোকাচারসম্মত নহে। বিন্দু যাহা শিখিয়াছে তাহাতেই সে নিজে ধর্মগ্রন্থাদি যথেষ্ট পড়িতে পারিবে। বিশেষত মেঘদূতম্ পাঠ স্ত্রীগণের পক্ষে অতি গর্হিত।

—ঠিক আছে, মেঘদূত না হয় থাক। আপনি মহাভারত পড়াচ্ছিলেন, সেটিও তো এখনো শেষ হয়নি।

—শুন, তাহা হইলে সত্য কথাটি বলি। শুন, বিন্দু। তোমার পিতা মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন যে, কন্যার পাঠ যথেষ্ট হইল। আর অধিক কী! সে এখন পঞ্চদশবর্ষীয়া হইয়াছে।

বিন্দু রাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আপনি তাহলে আমাকে আর পড়াবেন না?

—তোমার পিতার অনিচ্ছা, আমি কী করি বলো!

সমস্ত মুখখানা কুঁকড়ে গেছে বিন্দুর। ঠোঁট চেপে সে কান্না সামলাচ্ছে। এই আকস্মিক আঘাতে তার সরল অন্তঃকরণখানি যেন তছনছ হয়ে গেছে। বিনা দোষে শাস্তি পেলেই মানুষের মনে বেশী আঘাত লাগে। বিন্দু আর একটি কথাও বললো না। হঠাৎ দৌড়ে বেরিয়ে চলে গেল ঘর থেকে।

অপরাধীর মতন চুপ করে বসে রইলো গঙ্গানারায়ণ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিবরাম আচার্য বললেন, এ গৃহ হইতে আমার এবার বুঝি পাট উঠিল। আমারও আর এত দূর যাতায়াত পোষায় না। শ্রীরামপুরেই বাসা ভাড়া লইব মনস্থ করিয়াছি।

গঙ্গানারায়ণের মন খারাপ লাগলো। বিধুশেখর হঠাৎ এ রকম নির্দেশ দিলেন কেন? বিন্দু বলেছিল, সে পড়াশুনো করে নিজের আনন্দের জন্য, তার বাবা কেন সে আনন্দটুকু কেড়ে নিতে চান? সারল্যে ভরা হাসিখুশী স্বভাবের মেয়ে বিন্দু, তাকে দুঃখ দিয়ে কী লাভ! শিবরাম আচার্যের জন্যও একটু কষ্ট হলো তার। উনি চলে গেলে গঙ্গানারায়ণের খারাপ লাগবে। মানুষটি মৃতদার এবং ছন্নছাড়া স্বভাবের, সংসারে নাকি ওঁর কেউ নেই। তিনবার বিবাহ করেছিলেন, তিন স্ত্রীই অকাল মৃতা, তাই নিজেকে অপয়া মনে করে উনি আর বিবাহ করবেন না ঠিক করেছেন। নিজেই উনি ওঁর বিবাহের গল্প করেছেন বিন্দু আর গঙ্গানারায়ণের কাছে। মানুষটির মনটি খুব ফর্সা।

—তোমার কি আজ পাঠের মন আছে?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আপনি চলে যাবেন, আমারও তো আর পড়া হবে না।

—তুমি কালেজে পড়িতেছ, তোমার চিন্তা কী! সংস্কৃতের যুগ ফুরাইয়াছে। আমি আর কিছুদিন থাকিলে তোমার নিকট হইতে গোটা দুই-চারি ইংরাজি শব্দ শিক্ষা করিতাম। ম্লেচ্ছভাষার এখন জয়-

জয়কার। ইংরাজি না শিখিলে আর কোনোদিকেই কোনো সুবিধা নাই। আচ্ছা বলো তো, নর শব্দের প্রথমার একবচনের ইংরাজি কী হইবে ?

একটু পরে গঙ্গানারায়ণ পণ্ডিতমশাইয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে পড়লো।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, এখন তার বাড়ি ফিরে যাবার কথা। সন্ধ্যের পর পথঘাট দিয়ে একা একা চলা নিরাপদ নয়। অবশ্য বাড়ি কাছেই, গঙ্গানারায়ণ এক ছুটে চলে যেতে পারে।

কিন্তু যাবার আগে একবার বিন্দুর সঙ্গে দেখা করে যেতে ইচ্ছে হলো তার। বিন্দুর অভিমান বড় তীব্র। তাকে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, এই অভিমানে সে হয়তো বই-খাতাপত্র সব ছিঁড়ে ফেলে দেবে। আর কোনোদিন কোনো বই স্পর্শ করবে না। তাহলে বিন্দু কী নিয়ে থাকবে ? গঙ্গানারায়ণ এইটুকু বোঝে যে বিন্দুর সামনে এক সুদীর্ঘ নিঃসঙ্গ জীবন পড়ে আছে। স্ত্রীলোকের মেঘদূত পড়া নিষেধ। কী আছে মেঘদূতে ? গঙ্গানারায়ণকে পড়ে দেখতেই হবে।

সুহাসিনী দোতলার বারান্দায় দাসীর কোলে বসে দুধভাত খাচ্ছে। সুহাসিনী নিজে কিছুই খেতে চায় না, তাকে জোর করে খাইয়ে দিতে হয়। সেইজন্য বিধুশেখর সুহাসিনীর জন্য একটি আলাদা ব্রাহ্মণী দাসী রেখেছেন।

—এই, বিন্দু কোথায় রে ?

সুহাসিনী বললো, কী জানি ! দেখিনি তো !

দাসীটি বললো, ঠাকুরঘরের দিকে যেতে দেকলুম তো একবার।

গঙ্গানারায়ণ সেদিকে এগোলো। সুহাসিনী তার সরু রিনরিনে গলায় জিজ্ঞেস করলো, গঙ্গাদাদা, তোমার আগে বিয়ে হবে, না আমার আগে বিয়ে হবে ?

দাসীটি বললো, মেয়ে একেবারে বিয়ের জন্য পাগল !

গঙ্গানারায়ণ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, দাঁড়া, তোর বরকে আমি বলে দেবো, তুই দুধভাত খেতে দেরি করিস। তাহলে সে গুম গুম করে তোর পিঠে কিল মারবে।

সুহাসিনী তার ছোট্ট মুঠি তুলে বললো, আমিও তাকে মারবো।

ঠাকুরঘরের ভেতরে ঢুকবে না গঙ্গানারায়ণ। দরজার কাছে গড় হয়ে আগে প্রণাম করলো, তারপর ডাকলো, বিন্দু, বিন্দু !

কোনো সাড়া নেই। গঙ্গানারায়ণ একটু মুখ ঝুঁকিয়ে উঁকি মেরে দেখলো বিন্দু নেই এখানে।

বিন্দু তার নিজের ঘরেও নেই। হয়তো মায়ের কাছে গিয়ে বসে থাকতে পারে। কিন্তু কান্নার সময় বিন্দু একা থাকতে চায়, গঙ্গানারায়ণ আগে দেখেছে। গঙ্গানারায়ণ ছাদে খুঁজতে গেল।

পশ্চিম দিকের আলসের কাছে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে বিন্দু। আকাশে তখনও বর্ণ পরিবর্তনের পর্ব শেষ হয়নি। একদিকের আকাশ তখন প্রায় অন্ধকার, মাঝে মাঝে রয়ে গেছে কয়েকটি রূপালি রেখা। অন্যদিকের আকাশে ঝলকাচ্ছে সোনার রঙ, কোথাও কোথাও তা সিঁদুরের মতন লাল। বিন্দু তাকিয়ে আছে সেই সূর্যাস্তের সমারোহের দিকে। শুভ্রবসনা বিন্দুকে সেই লাল রঙের পটভূমিকায় দেখে গঙ্গানারায়ণের মনে হলো, এ রকম রক্তিম আকাশের সঙ্গে বিন্দুর জীবনের যেন কোনো যোগ আছে।

গঙ্গানারায়ণ ভাবলো, পিছন থেকে চুপি চুপি গিয়ে বিন্দুর পিঠে হাত রেখে চমকে দেবে। বিন্দুর চোখে যদি এখনো জল থাকে, তাহলে সে তাকে বলবে, তুই কাঁদিস নি, বিন্দু। এখন থেকে আমি তোকে পড়াবো। আমি কালেজ থেকে যা শিখে আসবো, সে সব আবার শোনাবো তোকে।

খুব কাছে গিয়ে হাত তুলেও থেমে গেল গঙ্গানারায়ণ। তার মনে হলো, সব কিছু আর আগেকার মতন নেই। এক একটা কথায় অনেক কিছু ভেঙে যায়। পণ্ডিতমশাই আজ বারবার বিন্দুকে বলছিলেন স্ত্রীলোক। বিন্দু ঠিক কবে থেকে স্ত্রীলোক হয়ে গেল ? এই তো কাল পর্যন্তও সে ছিল একটি কিশোরী, গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে কত কৌতুক করেছে। আজ যদি সে স্ত্রীলোক হয়ে যায়, তাহলে তার পিঠে হাত রাখা কি ঠিক হবে ?

গঙ্গানারায়ণ উদ্যত হাতটা ফিরিয়ে নিল।

গঙ্গানারায়ণ পদব্রজেই রোজ কলেজ যায়। তার সহপাঠীরা অনেকেই আসে পাল্কিতে কিংবা ভাড়া করা কেরাঞ্চি গাড়িতে, জমিদারপুত্র হিসেবে তার জুড়িগাড়িতেই আসা উচিত, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ হাঁটতেই ভালোবাসে। তাদের বাড়ি থেকে পটলডাঙা খুব বেশী দূর নয়। পথের দৃশ্য দেখতে দেখতে সে আধঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যায় কলেজে।

সেদিন সে পটলডাঙার মোড়ে পৌঁছে দেখলো কলেজের সামনে থেকে অনেক ছেলে দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে গোলদীঘির দিকে। সেখানে এক কোণে রীতিমতন একটা জটলা। কৌতূহলী হয়ে গঙ্গানারায়ণও সেই দিকে ধাবিত হলো।

গোলদীঘির উল্টোদিকে মাধব দত্তের বাজারে মাঝে মাঝে চোর ধরা পড়ে, তখন শুধু দোকানদাররা নয়, পথচারীরাও সেই চোরকে উত্তম মধ্যম ঠ্যাঙায়। চোর ছাড়াও আছে নানারকম লুটেরা। কাবাবের দোকান থেকে কোনো মাতাল হয়তো এক থাবা কাবাব তুলে নিয়ে পালালো। গাঁজার দোকানের আশেপাশে গেঁজেলরা থাকে তক্কে তক্কে, দোকানদার জলত্যাগ করার কারণে বা অন্য কিছুর জন্য একটু দোকানের বার হলেই কোনো ঘুঘু গেঁজেল সুট করে ঢুকে পড়ে দোকান তছনছ করতে। কখনো কখনো এই সব ঘটনায় কলেজের কোনো ছাত্রও ধরা পড়ে, তখন বাজারের লোকদের সঙ্গে কলেজের ছেলেদের কাজিয়া বেঁধে যায়। হেয়ার সাহেব গাঁজার দোকানদারদের নিষেধ করে দিয়েছেন যেন কোনো কলেজের ছাত্রকে তারা গাঁজা না বেচে, তাই তাদের দোকানেই হামলা হয় বেশী।

দোকানদাররা উত্ত্যক্ত হয়ে একদিন একটি গাঁজা-চোর কলেজের ছাত্রকে হাতেনাতে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল হেয়ার সাহেবের কাছে। হেয়ার সাহেব এমনিতে আলাভোলা নরম মানুষ হলে কী হবে, তাঁর নির্দেশের ব্যত্যয় হলে এক একদিন ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন সাঙ্ঘাতিক। দোকানীর অভিযোগ শুনে তিনি হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন, কাশী, চাবুক লাও! কাশী মালি চাবুক এনে দিল, তিনি উগ্র মূর্তি ধরে দশ-বারো ঘা চাবুক কষালেন ছেলেটিকে।

গঙ্গানারায়ণেরই সহপাঠী বঙ্কু দত্তকে এরকমভাবে আর একদিন চাবুক মেরেছিলেন হেয়ার সাহেব। বঙ্কু অবশ্য গাঁজা চুরি করেনি, সে মীর্জাপুর মিশনে সেণ্ডিস সাহেবের কাছে বাইবেল পাঠ শোনবার জন্য যাতায়াত শুরু করেছিল। সে খবর পেয়ে হেয়ার সাহেব একদিন বঙ্কুকে নিজের কামরায় ডেকে পাঠালেন। সেদিনও তাঁর হাতে চাবুক মজুত। মুখের চেহারা বিকট। মেরে বঙ্কুর পিঠে রক্ত বার করে দেবার পর হেয়ার সাহেব নিজেই কাঁদতে শুরু করেছিলেন, গরম জলে বঙ্কুর ক্ষতস্থান ধুয়ে দিতে দিতে কোমল ইংরাজিতে বলেছিলেন, বাবা সকল, এখন পাঠে মন দাও। ধর্ম নিয়ে এখন মস্তক না ঘামাইলেও চলিবে!

ডিরোজিও সাহেব বরখাস্ত হবার পর থেকে হেয়ার সাহেব সাবধান হয়ে গেছেন। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে খৃষ্টানী প্রভাব ছড়াতে দেখলেই অভিভাবকরা ক্ষেপে উঠবেন আবার। ইতিমধ্যেই কিছু কিছু ভালো পরিবারের ছেলে হিন্দু কলেজ ছেড়ে গৌর আঢ্যির ইস্কুল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হচ্ছে।

আজ আবার নতুন কী মামলা তা দেখবার জন্য ছুটে গেল গঙ্গানারায়ণ। ভিড়ের মধ্যে তার অনেক সহপাঠীও রয়েছে। ভোলানাথ, বেণী, বঙ্কু, ভূদেব দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি, তাদের মুখে দারুণ উদ্বেগের ছাপ।

গঙ্গানারায়ণ তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কিসের গোলযোগ রে?

বেণী বললো, আজ আবার মধু ক্ষেপেছে!

—মধু!

স্বচক্ষে দেখবার জন্য গঙ্গানারায়ণ নিজে ভিড় ঠেলে উঁকি মারলো। গোল জনতার মাঝখানে ঘাসের ওপরে বসে আছে মধু। তার হাতে সুরার বোতল, জড়িত গলায় সে চ্যাঁচাচ্ছে, আই অ্যাম লাইক দা

আর্থ, রিভলভিং এভার রাউণ্ড দা সেল্ফ-সেইম সান, বয়—

গঙ্গানারায়ণ শিউরে উঠলো। কিছুদিন ধরে মধু খুবই বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। আগে সে সন্ধ্যের পর সুরাপান করতো, এখন দিনের বেলাতেও বাদ থাকে না। ক্লাসেও তার মুখ দিয়ে প্রায়ই ভকভক করে দুর্গন্ধ বেরোয়, কথা বলার সময় জিভ এলিয়ে যায়। কয়েকদিন আগে কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেব এজন্য খুব ধমক দিয়েছেন মধুকে।

অদূরে রাস্তায় মধুর বাড়ির পালকি দাঁড় করানো। মধুর সঙ্গে সব সময় দুজন গৃহভৃত্য আসে। তারা অসহায়ভাবে দু'পাশে দাঁড়িয়ে। মধুর হাত ধরে টেনে তোলার সাধ্য এদের নেই। যখন তখন মধু ওদের লাথি ঘুঁষি মারে আবার মুঠো-মুঠো পয়সা দেয়।

মধুর গায়ে ইংরাজি কোট। দারুণ গ্রীষ্মেও সে এই কোট খোলে না। কিছুদিন আগে সে বুট-পায়জামা ও আচকান ছেড়ে হঠাৎ এই কোট ধরেছে, তারপর থেকে তার সুরাপানের মাত্রাও বেড়েছে। গঙ্গানারায়ণকে দেখতে পেয়ে সে বাঁ চোখ কুঁচকে বললো, কি রে গঙ্গা, তুই এখনো রয়িচিস ? ভূদেব, বন্ধুরা সব পালিয়েচে বুঝি ? সীজনস্, বোথ্ অব জয় অ্যাণ্ড সরো, আই হ্যাভ, লাইক হার, অ্যাজ আই রান, বয়—

ভিড় ঠেলে এসে বেণী বললো, মধু, এসব কী করতেছিস ! শিক্ষক মহাশয়রা এ পথ দিয়ে যাতায়াত করেন, তোকে এ অবস্থায় দেকলে—

মধু ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, দেখলে তো আমার ভারী পাঁচ পুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল। সিলি, বেণী-লাইক টক্ !

হাতের বোতলটি দেখিয়ে ইঙ্গিত করে বললো, কাম হিদার, ইফ ইউ হ্যাভ ক্যারেজ, হ্যাভ এ সিপ !

তারপর নিজেই সে নির্জলা ব্র্যাণ্ডি খানিকটা ঢকঢক করে ঢেলে দিল গলায়।

ভূদেব বললো, এখুনি এ খবর কার সাহেবের কানে গিয়ে পঁহুছাবে ! কার সাহেব কড়া ধাতুর লোক, হয়তো এমন ব্যবস্থা লবেন...

তাকে থামিয়ে দিয়ে মধু হুঙ্কার দিয়ে বললো, আই হেইট দা ড্যামন্ড্ ফেলো কার ! দিস উইল ডু মী নো হার্ম ! নান্ হোয়াট এভার !

বেণী বললো, চুপ ! চুপ ! কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান একেবারে গ্যাচে দেকচি ! স্যারের নামে ও-কথা বলতে আচে !

বঙ্কু বললো, মধু ওঠ ! কালেজ যাবি না ?

মধু ফরাসী কায়দায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, নো-ও-ও !

বঙ্কু বললো, গত এক হপ্তা তুই আসিস নাই, তুই কি আর পড়বি না ?

ভূদেব বললো, কেন পড়বে না ? চল মধু, আমাদিগের সঙ্গে চল।

মধু বললো, তোরা যা ! ইউ গুডি গুডি বয়িজ, ইউ গো টু দ্য ক্লাস ! আমি আর যাবো না।

ভোলানাথ ফিসফিস করে বললো, এই চুপ, চুপ ! রীজ সাহেব যাচ্ছেন।

অন্যরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো, তাদের কলেজের অঙ্ক শিক্ষক রীজ সাহেব গোলদীঘির রেলিং-এর পাশ দিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন ধীর পায়ে। চোখ দুটি চিন্তামগ্ন।

মধু বললো, ও, দ্যাট ফেলো ! ভয়ের কী আছে ? আমি আর ভয় পাই না।

রীজ সাহেব দূরে চলে যাবার পর ভূদেব হাসতে হাসতে বললো, যতই মুখে সাহস দেখা, মধু, রীজ সাহেবকে তুই ভয় পাস ঠিকই !

ভয় যে পায় না সেটা দেখাবার জন্যই মধু আবার ব্র্যাণ্ডির বোতলে ঠোঁট ছোঁয়ালো। তারপর তার সরু চিবুকে চাপড় মারতে মারতে বললো, আমি মধুসূদন দত্ত এস্কোয়ার, আমি কাহাকেও ভয় পাই না !

ভোলানাথ বললো, স্যারকে ডাকবো ? রীজ সাহেব সম্রাট নেপোলিয়ানের সৈন্যবাহিনীতে থেকে লড়াই দিয়েচেন, এখুনি এসে তোকে চ্যাংদোলা করে লয়ে যাবেন !

মধু বললো, ডাক, ডাক দেখি !

ভূদেব বললো, ওরকম করিসনি মধু। তুই ক্লাসে না গেলে আমাদিগেরও ভালো লাগে না।

মধু চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, কেন, তোরাই তো সব এক একটা স্টার রইচিস।

বঙ্কু বললো, আমরা স্টার হতে পারি, কিন্তু মধু, তুই হচ্ছিস জুপিটার।

ভূদেব বললো, আবার অ্যাসে কমপিটিশান হতেছে, এবারেও মধু তুই প্রাইজ পেতে পারিস।

মধু বললো, এ ফিগ্ ফর ইওর স্কলাস্টিক ফেম্।

—তুই সত্যিই আর কালেজে যাবি না?

—নো! আই হেইট কালেজ! আই হেইট কার।

—কালেজের ওপর তোর এত রাগ হলো কেন? তুই অপরাধ করিচিলি, তাই কার সাহেব তোকে ধমক দিয়েচেন।

—ডি আল আর না এলে ও কালেজে আর আমি যাবো না! আমাকে পড়াবার মতন বিদ্যাবুদ্ধি আর কারো নাই!

—রিচার্ডসন সাহেব তো আবার ফিরে আসচেন। তিনি না আসা পর্যন্ত তুই পড়াশুনা বন্ধ রাখবি?

—ইয়েস!

—ওঠ মধু, আমার কথা শোন্।

—ইউ বী ড্যাম্‌নড!

গঙ্গানারায়ণ এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। এবার সে ভূদেবের কানে কানে বললো, গৌরকে ডেকে আনবো? ও নিশ্চয়ই গৌরের কথা শুনবে।

ভূদেব বললো, ঠিক বলিছিস। দ্যাখ তো সে এসেচে কি না?

গঙ্গানারায়ণ কলেজের দিকে ছুটে চলে গেল। গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল গৌর, সংস্কৃত কলেজের দুটি ছেলের সঙ্গে কথা বলছিল। গঙ্গানারায়ণ তাকে ডেকে একটু দূরে এনে বার্তাটি জানালো।

গৌর উদাসীনভাবে বললো, আমি গিয়ে কী করবো?

গৌরের ফর্সা ছিপছিপে চেহারা, টানা টানা চোখ, যুগ্ম ভুরু, ঠোঁটের রেখা ও থুতনিতে নারীসুলভ কমনীয়তা রয়েছে। ভিড়ের মধ্যে থাকলেও সে সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

গঙ্গনারায়ণ গৌরের আপত্তি শুনলো না, জোর করে টেনে নিয়ে এলো। জনতা ভেদ করে মাঝখানে এসে গৌর বিষণ্ণ গলায় বললো, মধু, তুই ফের ব্র্যাণ্ডির বোতল নিয়ে কালেজে এসিচিস?

তাকে দেখেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো মধু। দু'হাতে জাপটে ধরে দু' গালে ফটাফট করে দুখানা চুমো দিয়ে বললো, গৌর, গৌর, কতদিন তোকে দেখি নাই! তোর জন্যই আমি এসিচি। মেকানিকাল ইনস্টিটিউশ্যানে যাই, সেখানেও তোকে দেখি না। তোকে পর পর সাতখানা লম্বা লম্বা লেটার লিকলুম, তুই উত্তরে মাত্র একখানা পিগমি লেটার পাট্যেচিস। কেন, গৌর, কেন?

গৌর বিব্রতভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু মধু কিছুতেই ছাড়বে না। মধু গৌরের চেয়ে একটু লম্বা, রোগা চেহারা হলেও তার গায়ে বেশ জোর আছে, গৌরকে সে বুকে চেপে আছে মাতালের ভীম আলিঙ্গনে।

গৌর বললো, তুই আবার দিনের বেলা মদ খেয়িচিস?

—বেশ করিচি। কেন খাবো না? রিচার্ডসন মদ খান না? তিনি মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করেন না? সেইজন্যই তো তিনি পোয়েট্রি এত ভালোবাসতে পারেন। সেইজন্যই তাঁর কাছে পৃথিবী এত সুন্দর! তিনি কী বলিছিলেন, মনে নেই! টু কোল্ড অ্যাণ্ড ভালগার মাইণ্ডস হাউ লার্জ আ পোরশান অব দিস বিউটিফুল ওয়ার্লড ইজ আ ড্রিয়ারি ব্ল্যাঙ্ক! গৌর, কবিতা ছাড়া আমার আর কিছুই ভালো লাগে না। পোয়েট্রি ওয়াইডেনস দা স্ফিয়ার অব আওয়ার পিওরেস্ট অ্যাণ্ড মোস্ট পার্মানেণ্ট এনজয়মেণ্টস। দেখিস, একদিন আমি কত বড় হবো! বায়রণ, বায়রণের সমান, তোরা তখন আমার জীবনী লিকবি।

গৌর বললো, বেশ তো, বড় কবি হবি। কিন্তু তুই আমাকে কথা দিয়িছিলি, মদ খেয়ে কালেজ পানে আসবি না।

—কথা! আমি কোনো কথা রাখতে পারি না। ইট ইজ ট্রু, গৌর, আমি কথা রাখতে পারি না। ভূদেব পারে, বঙ্কু পারে, গঙ্গা পারে। রাজনারায়ণ পারে, আমি পারি না! তা বলে তুই আমার ওপর রাগ করবি? তোর বিহনে যে আমি বাঁচতে পারিনে! তুই তো কথা রাখিস গৌর, তবু কেন তুই আমার বাড়িতে আসবি বলেও আসিস নে!

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন চেঁচিয়ে বললো, এ যে কেষ্ট রাধার মান অভিমান!

ভূদেব বললো, লোকে সঙ দেখছে। গৌর, মধুকে এখান থেকে নিয়ে চল।

মধু কোনোদিকেই ভ্রূক্ষেপ করছে না। গৌরের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললো, শুধু একটা প্রমিজ আমি রাখবোই! আই উইলগো টু ইংল্যাণ্ড। আই উইল! আই উইল। আই সাই ফর অ্যালবিয়ানস ডিসট্যাণ্ট শোর···

গৌর ধীর স্বরে বললো, আমাকে এবার ছাড়, মধু। আমি কবি হবো না, তাই আমি এখন কালেজে যাবো।

মধু অবিকল রিচার্ডসন সাহেবের গলা নকল করে কাতরভাবে গর্জন করে উঠলো, ওহ নো ! আই বিসীচ ইউ ! লো, রেইজড আপান দিস ভাস্ট এরিয়াল হাইট, দিস রিয়েল্‌ম্‌ অব এয়ার...আজ কেউ কালেজে যাবে না। না, আজ তোরা আমার সঙ্গে চল, ভূদেব, বেণী, বঙ্কু, গঙ্গা চল, সবাই চল।

এক হাতে গৌরকে ধরে রেখে অন্য হাতে সে অন্য বন্ধুদের ধরবার চেষ্টা করলো। ভিড় ক্রমশ বাড়ছে এবং আমোদ গেঁড়ে লোকেরা নানারকম টিটকিরি শুরু করেছে। ভিড়ের মধ্যে সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররাও রয়েছে।

সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ সন্নিহিত বাড়িতে বসলেও দু' দল ছাত্রের মধ্যে রেষারেষি আছে। হেয়ার সাহেবের সুপারিশের কিছু ফ্রি ছাত্র ছাড়া হিন্দু কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই আসে বিশিষ্ট ধনী পরিবার থেকে। সেই তুলনায় সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের গেঁয়ো গেঁয়ো চেহারা। তারা এখনো জামা পরতে শেখেনি, উড়ুনি গায়ে জড়িয়ে আসে। কিন্তু তাদের জিভগুলি ক্ষুরধার, হুল ফোটানো মন্তব্য করতে তারা ওস্তাদ। মধুর গায়ের রঙ কালো আর গৌর খুবই ফর্সা বলে তারা নানারকম উপমা মিশিয়ে কটুকাটব্য করছে।

ভূদেব এসব পছন্দ করে না। মধুর পাল্লা থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না বুঝে সে দ্রুত ভিড় ছাড়িয়ে এসে উঠে বসলো মধুর পাল্কিতে।

গৌরদাসকে মধু তখনো ছাড়েনি। এক হাতে ব্র্যাণ্ডির বোতল, অন্য হাতে গৌরের কব্জিটা শক্ত করে চেপে ধরে সেও টলতে টলতে বেরিয়ে এলো ভিড় ছেড়ে। এক পাল্কিতে সব বন্ধুদের জায়গা হবে না বলে মধু খুব জোরে শিস দিয়ে উঠলো দু'বার। জিভের তলায় আঙুল দিয়ে ফিরিঙ্গিদের মতন সে চমৎকার শিস দিতে শিখেছে।

পটলডাঙ্গার মোড়ে পাল্কি বেহারাদের আড্ডা। দু'খানি পাল্কি ছুটে এলো তৎক্ষণাৎ। সবাই মধুকে চেনে আর খাতিরও করে খুব। এই ছোকরা বাবু পাল্কি নিলে আশাতীত বখশিশ পাওয়া যায়।

বন্ধুবান্ধব সবাইকে তুলে মধু বললো, চালাও খিদিরপুর।

মধুদের বিশাল বাড়িতে অধিবাসীর সংখ্যা যৎসামান্য। মধুর বাবা রাজনারায়ণ দত্ত অত্যন্ত বিলাসী পুরুষ। বাড়িতে তিনি আত্মীয়-স্বজনের ভিড় পছন্দ করেন না। তাঁর গাঁ সাগরদাঁড়ির জনা দুয়েক স্ত্রীলোক আছে তাঁর পত্নী জাহ্নবী দেবীর সেবার জন্য। এ ছাড়া অন্য দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজন আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এলে তাদের জন্য আলাদা বাড়ি ভাড়া করে দেওয়া হয়। রাজনারায়ণ এ বাড়ি শখ করে বানিয়েছেন এবং এ বাড়ির আদবকায়দার কথা তিনি পাঁচ কান করতে চান না।

বাড়িতে দাসদাসীর সংখ্যা চোদ্দটি। রাজনারায়ণ দত্ত রীতিমতন খাদ্যরসিক, প্রত্যেকদিন তাঁর নতুন স্বাদের খাদ্য চাই। সেইজন্য তিনি সাহেববাড়ি থেকে বাবুর্চি খানসামাদের বেশী বেতন দিয়ে ভাঙিয়ে আনেন। কোনো রান্না তাঁর পছন্দ না হলে তিনি পাত্রসমেত ছুঁড়ে ফেলে দেন। এ বাড়ির পাঁঠার মাংসের পোলাউ যে একবার খেয়েছে, সে জীবনে আর সে স্বাদ ভুলতে পারবে না। মধুর বন্ধুরা এ বাড়িতে এসে প্রায়ই নানান সুস্বাদু দ্রব্য খেয়ে যায় কিন্তু সেই পাঁঠার পোলাউয়ের প্রসঙ্গে উঠলেই তারা বলে, রাজাদের মধ্যে যেমন রাশিয়ার জার, তেমনি খাদ্যের মধ্যে এই পোলাউ !

মধুর আর কোনো ভাই বোন নেই। বাড়িতে তার অপরিমিত প্রশ্রয়। মধুর যে-কোনো হুকুম তামিল করার জন্য পাঁচ-সাতজন ভৃত্য সব সময় মুখিয়ে থাকে। জাহ্নবী দেবীর কড়া নির্দেশ, আর যে কোন কাজই থাক, মধু কোনো জিনিস চাইলে, মুখ থেকে কথাটি খসানো মাত্র যেন তা পায়।

রাজনারায়ণ দত্তও পুত্র-স্নেহে অন্ধ। বেঙ্গল স্পেকটেটর, ক্যালকাটা লিটারারি গেজেট, কমেট প্রভৃতি কাগজে তাঁর সতেরো আঠারো বছরের ছেলের পদ্য ছাপা হচ্ছে, সেজন্য তাঁর গর্বের অন্ত নেই। আদালতে তাঁর সহকর্মী বিধুশেখর একদিন বলেছিলেন, তোমার ছেলে যা দারুণ ইংরেজি শিখেচে দু'দিন বাদে তো সাহেবদের মাতায় হাগবে ! একথা শুনে পরম পরিতৃপ্তি পেয়েছিলেন রাজনারায়ণ। সাহেবরা দেখুক, নেটিবরা তাদের চেয়ে কোনো অংশে কম যায় না। বাড়িতে কৌচে বসে তামাক টানতে টানতে তিনি অনেক সময় আদর করে ছেলের হাতে বাড়িয়ে দেন আলবোলার নল। আবগারির দোকান থেকে মধুর জন্য মদের বোতল আসে, রাজনারায়ণ বিনা বাক্যব্যয়ে বিল মিটিয়ে দেন। এ ছাড়াও আরও কত দোকান থেকে যে মধু ধারে জিনিস আনে তা সে নিজেই মনে রাখতে পারে না, রাজনারায়ণকেই তার খোঁজ রাখতে হয়। হ্যামিল্টন সাহেবের দোকানে তাঁর বলা আছে যে বিলেত

থেকে প্রত্যেকবার জাহাজ এলে যে-সব নতুন নতুন সুগন্ধ প্রসাধন দ্রব্য আসবে, সেগুলি যেন প্রত্যেকটি এক বোতল করে মধুর নামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাড়ির লোকদের জব্দ করার জন্য মধুরও বাতিকের শেষ নেই। প্রায়ই নতুন নতুন জিনিসের জন্য বায়না ধরে সে নিজের ঘরে বসে মিটিমিটি হাসে। রাজনারায়ণ বিভিন্ন দিকে লোক পাঠান সেই জিনিসের সন্ধানে। টাকার কোনো পরোয়া নেই, জিনিসটি চাই যে-কোনো উপায়ে। সংগ্রহ করা হলে রাজনারায়ণ নিজে সেটি মধুর কাছে নিয়ে এসে হাসতে হাসতে বলেন, এবার আরও কিছু বল দেখি!

এইভাবে বাপ ছেলেতে খেলা চলে। অবশ্য, মধুর প্রধান নেশা বই কেনা।

বন্ধুদেরও মধু নানারকমে তাক লাগিয়ে দেয় প্রায়ই। নিজের ঘরে বসিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করে, কে কোন্ খাবার খেতে চাস বল চোখ মুদে। যে-কোনো জিনিসের নাম কর। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোদের জন্য তা এনে দেব! গরম গরম।

সত্যি সে তা পারে। মুর্গী, মটন, ছানার ডালনা, ডিমের হালুয়া, যে-কোনো কিছুর নাম করলেই হলো। সঙ্গে সঙ্গে হাজির। এবং গরম। মধুর জন্য নাকি প্রত্যেকদিন চার পাঁচটি উনুনে অনেক রকম খাবার সব সময় তৈরি থাকে। তার যেটা ইচ্ছে খাবে, যেটা ইচ্ছে হবে না, খাবে না। কোন্‌দিন তার কোন্‌টি খেতে ইচ্ছে হবে, তা আগের থেকে জানবার উপায় নেই।

অবশ্য এমন দিনও যায়, মধু কিছুই খায় না। পাশে সুরার পাত্র ও চোখের সামনে বই খুলে সে কাটিয়ে দেয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তখন কেউ তার ঘরে ঢুকবে না। এক সময় নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় সে তার বিছানায় মূর্ছিত হয়ে পড়ে। সেইভাবে সারারাত কেটে যায়।

বাড়ির সামনে পাল্কি থেকে সদলবলে নামলো মধু, তারপর সাড়ম্বরে ভেতরে ঢুকলো। চার-পাঁচজন ভৃত্য সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে দ্বারের কাছে। মধু কোটের পকেট থেকে এক মুঠো টাকা বার করে একজন ভৃত্যের হাতে দিয়ে বললো, ওদের মিটিয়ে দে!

তারপর সে দু'হাত ছড়িয়ে চিৎকার করলো, হেই হো! হেই হো! যেন সে জানান দিচ্ছে যে সে বাড়িতে ফিরেছে। অথচ উল্লাসভরা গলার স্বরটি এমন যেন নতুন কোনো দ্বীপে পদার্পণ করছে কোনো দুঃসাহসী রাজকুমার।

প্রশস্ত চত্বরের চার পাশে ঘেরা বারান্দা। একদিক দিয়ে উঠে গেছে মর্মর প্রস্তরের সিঁড়ি। সেই সিঁড়িতে পা দিয়ে মধু একটু থমকে দাঁড়ালো। তারপর আপনমনে বিড়বিড় করে বললো, ইফ ইউ মীট মাই ফাদার···

বন্ধুরা অন্য কথায় মগ্ন ছিল তাই মধুর কথা শুনলো না। মধু এবার বেশ চেঁচিয়ে বললো, ইফ ইউ মীট মাই ফাদার, পে নো অ্যাটেনশান টু হিম!

বন্ধুরা অবাক হয়ে গেল। মধু এরকম কথা বলছে কেন? রাজনারায়ণ দত্তের সঙ্গে বন্ধুদের দেখা হয়েছে বেশ কয়েকবার। রাশভারী রাজনারায়ণ ছেলের বন্ধুদের সঙ্গে বেশ প্রসন্ন ব্যবহার করেন। প্রত্যেকের বাড়ির খবর নেন। গঙ্গানারায়ণের বাবাকে তো তিনি বিশেষভাবে চেনেন, তাই গঙ্গাকে দেখলে স্নেহভরে অনেক কথা বলেন। মধুরও তো বাবার সঙ্গে বেশ মাই-ডিয়ারি আছে।

মধু চোয়াল কঠিন করে বললো, বাবার সঙ্গে দেখা হলে তোরা কথা বলবিনি। তোরা বুঝিয়ে দিবি যে তোরা আমার দলে।

বন্‌খু জিজ্ঞেসা করলো, বাবার সঙ্গে তোর কী হয়েচে রে, মধু?

—অনেক ক্রিছু!

রাজনারায়ণ দত্ত এই সময় আদালতে থাকেন, সুতরাং তাঁর সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। তবু বন্ধুরা সবাই বিস্মিত হয়ে রইলো।

ওপরে উঠে এসে মধু নিজের ঘরের ভেজানো দরজায় এক লাথি কষালো। দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা। ভেতরে ঢুকে মধু বললো, বোস।

সঙ্গে সঙ্গে সে আলমারি খুলে বার করলো কয়েকটি বিলিতি কাচের গেলাস। সেগুলিতে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে বললো, নে। নিজে একটি গেলাস তুলে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করলো।

অন্যরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কেউ গেলাস ছুঁলো না। গৌর দুঃখিত গলায় বললো, তুই আরও খাবি, মধু?

মধু বললো, কেন খাবো না! আজ আমার আনন্দ, খুব আনন্দ হচ্ছে, তোরা এয়িচিস। বঙ্কু নে, ভোলা নে, গঙ্গা নিবি না?

ভূদেব শেষ পর্যন্ত আসেনি, কৌশল করে মাঝ রাস্তায় নেমে গেছে। ভূদেব অত্যন্ত বুদ্ধিমান। সে প্রায়ই বলে, আমি গরীব বামুনের ছেলে, এত বড় মানুষদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা আমার সহ্য হবে না। এর আগে যে কয়েকদিন গঙ্গানারায়ণ এবাড়িতে এসেছে, কোনোদিনই ভূদেবকে দেখেনি। যদিও ভূদেব মধুকে খুব ভালোবাসে। বাড়িতে নিয়ে এলেই মধু মদ্যপানের জন্য সবাইকে জোরাজুরি করে। ভূদেব এই সব সময়ে মধুর সঙ্গ বর্জন করে।

মধু জোর করে গঙ্গানারায়ণের হাতে একটি গেলাস ধরিয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা কেঁপে উঠলো গঙ্গানারায়ণের। তার মনে পড়ে গেল বিন্দুবাসিনীর কথা।

বিন্দুবাসিনী একদিন গঙ্গানারায়ণকে জিজ্ঞেস করেছিল, হিন্দু কালেজের তো সব ছেলেই মদ খায়। তুই-ও খাবি নিশ্চয়ই? গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, না, কিছুতেই না। বিন্দু বলেছিল, রাস্তায় মাতালদের দেখি আর আমার ঘেন্না করে। কালেজের শিক্ষিত ছেলেরাও এমন মাতাল হয়! ছি! মদ খেলে তুই আর আমার কাছে আসিস না গঙ্গা! গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, বললাম তো, আমি কোনোদিন সুরা পান করবো না। তুই দেখে নিস। বিন্দু বলেছিল, তুই আমার হাত ছুঁয়ে শপথ নে!

আজ কি গঙ্গানারায়ণ শপথ রাখতে পারবে? গৌর একটি গেলাস তুলে ওষ্ঠে সামান্য স্পর্শ করে বললো, বাবার সঙ্গে তোর কী গোল হয়েচে রে মধু? সত্যি করে বল্!

মধু বললো, আমাকে জোর করে বিয়ে দিতে চাইছে। কোথাকার একটা আট-ন' বছরের খুকি মেয়ে, তাকে আমি বিয়ে করবো? নেভার! রাজনারায়ণ দত্তের সাধ্য নেই!

বেণী, বঙ্কু আর ভোলানাথের বিয়ে হয়ে গেছে এর মধ্যেই। গৌরেরও যেন কার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। ওরা মধুর কথায় গুরুত্ব দিল না।

বেণী বললো, বিয়ে করতে বলচেন, চোখ বুজে বিয়ে করে ফেলবি! এতে আর কথা কী আচে!

মধু বললো, আট-ন' বছরের মেয়েকে? ইমপসিবল! সে আমার কোনো কথা বুঝবে? নাক নিয়ে সিকনি গড়াবে আর ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদবে।

ভোলানাথ বললো, এর চেয়ে বড় মেয়ে আর তুই পাবি কোথায়? কায়স্থ ঘরে কি সোমত্থ মেয়ে কুমারী থাকে? সারা দেশ খুঁজলেও পাবি না। এখন বিয়ে করে ফেলে রাখ, দু'-চার বছরের মধ্যেই সে মেয়ে লায়েক হয়ে যাবে!

—বাপ মায়ের পছন্দ করা মেয়ে আমি বিয়েই করবো না! না! না, না, না। এলাস্!—দে নো নট দ্যাট আই ডাই অব পেইনস্ দ্যাট নান ক্যান হিল।

গঙ্গানারায়ণ হঠাৎ খুব বিমর্ষ বোধ করলো, মধুর মতন তারও ঠিক একই অবস্থা। সেও কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না এখন। কিন্তু মধুর মতন সে তো এত দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করতে পারে না। তাকে নিয়তি মেনে নিতেই হবে।

বেণী বললো, সব ছেলেই বিয়ের আগে মধুর মতন একটু চেঁচামেচি করে, তারপর মেনে নেয়। মধুও মেনে নেবে। বংশরক্ষার জন্য আমরা সবাই বিয়ে করতে বাধ্য।

মধু হুঙ্কার দিয়ে বললো, বাধ্য! আচ্ছা তোরা দেখিস!

—তোর বাবা জোর করলে, তুই কী করবি? কতদিন এড়িয়ে থাকবি!

মধু আবার ব্র্যাণ্ডির বোতল হাতে তুলে নিয়ে বললো, রাজনারায়ণ দত্ত আমার ওপর জোর করবেন? বেশী জোর করলে রাজনারায়ণ দত্তকে আমি এমন পানিশমেণ্ট দেবো যে তা তিনি জীবনেও ভুলতে পারবেন না।

মধু ঝট করে গায়ের কোটখানা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে, তারপর দেওয়াল সংলগ্ন একটি কাঠের আলমারির পাল্লা খুলে গৌরকে জিজ্ঞেস করলো, এবার কোন্ পোশাকটি পরি বল তো ?

আলমারিতে অন্তত কুড়ি পঁচিশ রকমের কোট ঝুলছে, বিভিন্ন বর্ণ ও গড়নের। অনেক দোকানেও এক মাপের এত রকমারি কোট দেখা যায় না। আলমারিটা রঙের শোভায় ঝলমল করছে।

বেণী জিজ্ঞেস করলো, এখন আবার কোট পরবি ? তুই কি কোথাও যাবি নাকি এক্ষুনি ?

মধু বললো, না, কোথাও যাবো না। তোরা এসিচিস তাতেই আমার সুখ হয়েচে।

—তাহলে কোট পরবি কেন ?

—তবে কি বর্বরের মতন খালি গায়ে বসে থাকবো ?

—নিজেই তো আগের কোট খুলে ফেললি।

—বেশীক্ষণ এক পোশাক পরে থাকা···ডিসগাস্টিং ! তোরা কী করে পারিস ? রঙ বদলালেই মুড বদলায়, কোন্‌টা পরবো বল, গৌর ?

—তোর যেটা খুশী।

—তুই পছন্দ করে দিবি না ? এই সোনালীটা ? এটা তোর পছন্দ ?

যদিও মধু শুধু গৌরেরই মতামত চায়, তবু বেণী মাঝে মাঝে কথা না বলে পারে না। বেণীর সঙ্গে মধুর খানিকটা রেষারেষি আছে, ক্লাসে প্রায়ই টক্কর লেগে যায়। বেণী নিজেও বেশ বড় মানুষের ছেলে, কিন্তু তার বাবার কৃপণ হিসেবে খ্যাতি আছে। মধুর মতন বেণী পয়সা ওড়াবার আরাম পায় না।

বেণী বললো, এই দুপুরবেলা সোনালী কোট ? বাবাঃ ! কী রুচি তোর, মধু ?

মধু বললো, তোর রুচির সঙ্গে আমার রুচি কোনোদিন মিলবে না, বেণী ! আই লাভ টু সী দোজ ক্লাউডস্ অব গোল্ডেন ডাই ফ্লোট গ্রেসফুল ওভার ইয়ন ব্লু এক্সপ্যান্স···আকাশের দিকে চোখ চেয়ে দ্যাক—কেমন গোল্ডেন কালার হয়েচে।

বেণী জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললো, কোতায় বাবা গোল্ডেন কালার ? এ তো কোন্নগরের কালো মেঘ আকাশ ছাইচে, বিকেলে ঝড় বৃষ্টি হবে।

বঙ্কু বললো, কবিরা অমন অনেক কিছু দ্যাকে।

কোটটা গায়ে দিয়ে মধু সগর্বে মঞ্চ অভিনেতার মতন পায়চারি করতে লাগলো। নেশার জন্য তার চোখ দুটি অত্যুজ্জ্বল। মুখখানাও চকচক করছে। অন্য দিনের চেয়েও আজ তাকে বেশী অস্থির দেখাচ্ছে।

বেণী বললো, অত ছটফটাচ্ছিস কেন মধু ? একটু বোস না স্থির হয়ে !

অভিনেতার ভঙ্গিতেই মধু হাসলো হা হা করে। রিচার্ডসন সাহেব হ্যামলেট পড়াবার সময় যেমন থুতনিটা উঁচু করে কথা বলেন, ঠিক সেই রকম মুখ করে মধু বললো, আমি স্থির হতে পারি না, পারি না, পারি না ! আই অ্যাম লাইক দা আর্থ, রিভলভিং এভার রাউণ্ড দা সেলফ-সেম সান, বয়— ! এই তোরা খাচ্ছিস নি কেন ? গেলাস সব ভর্তি। নে, নে, এই বঙ্কু, এই ভোলা।

গঙ্গানারায়ণ মধুর পেড়াপেড়িতে ব্র্যাণ্ডি ভর্তি গেলাস হাতে নিয়ে চুপ করে বসে আছে, একবারও ওষ্ঠে ছোঁয়ায়নি। অন্যরা সবাই একটু একটু করে পান করছে।

একজন বাবুর্চি দু' প্লেট ভর্তি কাবাব নিয়ে এলো। খুব নরম, এখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। মধু, দু' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, আহ্ মাই ফেভারিট ! তোরা এটা টেস্ট করে দ্যাক, কচি বাছুরের মাংস···ওনলি থ্রি মান্থস্ ওল্ড···ডেলিশাস···

গঙ্গানারায়ণ শিউরে উঠলো। হঠাৎ একটা দৃশ্য মনে পড়ে গেল তার। তাদের বাড়ির পেছনে গোয়াল ঘর আছে। কিছুদিন আগেই সেখানে একটি গাভী প্রসব করেছে। জন্মাবার পরই বাছুরটা তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাগলো। আর একটু পরেই ছুটে গেল পুকুর ধারে। সে এক আশ্চর্য

ব্যাপার। গঙ্গানারায়ণ আগে কখনো এমন দেখেনি। সেই বাছুরটার বয়েস এখন তিন মাস হবে বোধহয়। সাদা ধপধপে গা, টানা টানা চোখ, গভীর কালো, ঠিক মনে হয় যেন কাজল পরানো, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। সেই রকমই একটা বাছুরের মাংসের কাবাব দেখে মধু আহ্লাদ কর্‌ছে!

অন্যরা সবাই খানিকটা করে কাবাব তুলে নিল।

বেণী সবচেয়ে প্রথমে অনেকখানি একসঙ্গে পুরে দিল মুখে। আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো আসন থেকে। মুখে হাত চাপা দিয়ে আ-ফু ফু ফু শব্দ করতে লাগলো। অসম্ভব গরম মাংস, সে গিলতেও পারছে না, ফেলতেও পারছে না। সবাই হেসে উঠলো। বেণী সামলে নিয়ে ঢোঁক গিলে বললো, সত্যি ডেলিশাস···কী নরম।

গৌর জিজ্ঞেস করলো, তোর বাবা বাড়িতেই বীফ অ্যালাউ করেন, মধু?

মধু বললো, এ বাড়িতে আমি যা চাইবো তাই চলবে!

বঙ্কু বললো, মধুর বিয়েতে আমরা দারুণ কাণ্ড করবো। বাঈ নাচ লাগাবি তো, মধু?

মধু বললো, বাঈ নাচ দেখতে চাস যেদিন খুশী লাগাতে পারি, কিন্তু সেজন্য বিয়ে করার দরকার কী? বিয়ে আমি এখন কিছুতেই করবো না!

বঙ্কু বললো, আরে রাখ রাখ! ওরকম কথা সবাই বলে! তোর বাবা যখন স্থির করেচেন—

মধু বললো, বললুম না, আমার বাবার বাপের সাধ্য নেই আমার ওপর জোর করে!

বঙ্কু সে কথাও উড়িয়ে দিয়ে বললো, তোর বাবাকে বলবো, এই শীতেই বিয়েটা লাগিয়ে দিতে! একটা বজরা ভাড়া নিয়ে ফুর্তি করবো ক'দিন···কমলা বলে একটা মেয়ে চমৎকার নাচে, তাকে আনবো।

কমলার নাম করে বঙ্কু আড়চোখে একবার তাকালো গঙ্গানারায়ণের দিকে। গঙ্গানারায়ণ জানে তার বাবা কমলাসুন্দরী নাম্নী একটি মেয়ের বাড়িতে প্রায়ই যাতায়াত করেন, মেয়েটির বয়েস মাত্র সতোরো-আঠারো, পাথর কোঁদা চেহারা। বঙ্কু ইচ্ছে করেই খোঁচা মারলো গঙ্গাকে। গঙ্গা মুখ নীচু করে রইলো।

বেণী বললো, একটা গুড়ের নাগরির মতন মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে মধু জব্দ হবে।

মধু ক্রোধে চিৎকার করে বললো, তোরাও আমার বাবার দলে ভিড়তে চাস?

গৌর বললো, মধু, আস্তে।

মধু সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত হয়ে গিয়ে বললো, বঙ্কু আর বেণী কেন আমার মনে ব্যথা দিচ্চে? ওরা কি আমার মন বোঝে না?

—তুই বাবাকে কী শাস্তি দিবি, মধু? বাবা মাকে কখনো শাস্তি দেওয়া যায়?

—যায়! আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো! তখন ঠ্যালা বুঝবে রাজনারায়ণ দত্ত!

বেণী ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললো, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি? তখন তোর এত রঙ-বেরঙের পোশাক আর বোতল বোতল ব্র্যাণ্ডি আর দিনে পাঁচ রকমের খাবারের খরচ জোগাবে কে? হেঃ হেঃ হেঃ! কবিবর, তখন কি কোপ্তা কাবাবের বদলে আকাশের মেঘ আর ব্র্যাণ্ডির বদলে হাওয়া খেলেই চলবে?

—আই কেয়ার এ ড্যাম্। হ্যাঁ, হাওয়া খেয়েই থাকবো।

গৌর বললো, মধু, পাগলামি করিসনি। আমরা তো দেখিচি, তোর বাবা, তোর মা তোকে কত ভালোবাসেন, তুই তাদের মনে দুঃখ দিস না।

—দিতে হবেই। মহান কবি পোপ কী বলেছেন জানিস? "টু ফলো পোয়েট্রি, ওয়ান মাস্ট লীভ বোথ ফাদার অ্যাণ্ড মাদার।"

বেণী বললো, পোপ তো বলেছেলেন ও কথা, কিন্তু নিজের জীবনে কি পালন করেছেলেন? কবিরা মুখে অমন বলে, সব কতার কতা।

—দেকিস, দেকিস, আমি পারি কিনা।

গঙ্গানারায়ণ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি এবার বাড়ি যাবো।

মধু বললো, কেন? একি গঙ্গা, তুই কিছু খাসনি? গেলাস ফুরোয়নি।

বঙ্কু বললো, ফুরোবে কি, ও তো একটা চুমুকও দেয়নি।

মধু এক লম্ফে গঙ্গানারায়ণের কাছে এসে বললো, আমার বাড়ি থেকে কেউ না খেয়ে যায় না। খা, খা।

গঙ্গা বললো, না, মধু ! আজ আমি কিছু খাবো না, আমার প্রবৃত্তি নেই।
—এক চুমুক দে আগে।
—না, আমি সুরা পান করবো না।
মধু জোর করে গেলাসটা গঙ্গার মুখের কাছে আনার চেষ্টা করলো,গঙ্গাও জোর করে ছাড়িয়ে নিতে গেল নিজের হাত, সেই ধাক্কাধাক্কিতে গেলাস পড়ে গেল মাটিতে। মদে ভিজে গেল মেঝেতে পাতা লাল রঙের পারস্য-গালিচা, গেলাসটা গড়াতে গড়াতে চলে গেল টেবিলের তলায়।
মধু ভ্রূক্ষেপও করলো না, এবার নিজের গেলাসটা তুলে এনে বললো, নে।
গঙ্গানারায়ণ হাত জোড় করে বললো, আমাকে ছেড়ে দে মধু। আমি কিছুতেই মদ খাবো না।
—তবে কাবাব খা খানিকটা...ঠাণ্ডা মেরে গেল যে ছাই।
—আমাদের বাড়িতে একটা বাছুর আছে, আমি তাকে ভলোবাসি, আমি বাছুরের মাংসও খেতে পারবো না।
বেণী বললো, বাছুর বলিস না, শুনতে খারাপ লাগে। বল বীফ !
বঙ্কু বললো, কাবাবটা একটু খেয়ে দেখলে পারতি, গঙ্গা। এমন ভালো কাবাব লাইফ-টাইমে খাইনি।
মধু বললো, এই জন্যই তোদের কিছু হবে না ! তোদের হিন্দু ধর্মের ওপর এইজন্য আমার ঘেন্না ধরে যায়। বীফ অ্যাণ্ড ওয়াইন...স্ট্রং পিপ্‌লদের সব সময় দরকার। দ্যাক ইংরেজ, ফরাসী, রুশ, যবন সবাই গোমাংস খায়, সবাই ড্রিংক করে...এইজন্যই দে আর মাইটি, দে আর কঙ্কারার্স, ওরা ভালো কবিতাও লেকে ! শুধু হিন্দুরাই মিনমিনে, নিরামিষ খায় আর ন্যাড়ামুণ্ডি হয়ে বসে থাকে, সেইজন্যই অন্য জাত যখন তখন এসে হিন্দুদের গালে থাপ্পড় মেরে যায়।
বেণী বললো, আমার তো বীফ ছাড়া আর কোনো মীটই ভালো লাগে না।
গঙ্গা বললো, তোরা বীফ খাচ্চিস, ব্র্যাণ্ডি খাচ্চিস, তোরা হিন্দু সমাজকে উদ্ধার করবি, আমি না হয় বাদই রইলুম।
—ফুঃ ! কাওয়ার্ড !
—সবাই কি সোসিয়াল রিফর্মার হয় ? সবাই সাহসী হয় ?
এই গঙ্গাটার মধ্যে কোনো নিউ আইডিয়াজ নেই ! তুই কি চিরকাল গোবেচারা ভালো মানুষই থেকে যাবি গঙ্গা ?
—কী করবো বল ! আমি তোদের মতন ব্রাইট নই ! গো-মাংস খেতে আমার রুচি হয় না।
অন্য বন্ধুরা গঙ্গানারায়ণকে কোণঠাসা করছে দেখে মধু হঠাৎ এক সময় হো-হো করে হেসে উঠলো। তারপর গঙ্গানারায়ণের পিঠে এক চাপড় মেরে বললো, ওদের ঠকিয়েচি রে গঙ্গা ! তুই-ও ঠকে গেলি ! এ গুলো বীফের কাবাব নয় রে, বিশুদ্ধ খাসীর। বাড়িতে মা রয়েচে না, বাড়িতে কি গো-মাংস ঢোকার জো আচে ? আই লাইক বীফ, কিন্তু বাইরে খেতে হয়। এগুলো খাসীর মাংস, ট্রাস্ট মী, রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে মিথ্যে বলে না, নে, একটু টেস্ট কর—
গঙ্গানারায়ণকে আর আটকে রাখা গেল না। সে চলে যাবেই। ভোলা আর বঙ্কুও আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবে না। ওরাও যেতে চাইলো গঙ্গার সঙ্গে। সকলেই উঠে দাঁড়ালো।
মধু গৌরের হাত চেপে ধরে বললো, না, তুই যাবি না। তুই থাক।
গৌর বললো, আমি ফিরবো না ? সেই কতদূর যেতে হবে।
মধু কাতরভাবে বললো, না, গৌর, তুই যাস না। আমি একা একা থেকে কী করবো ? তুইও যদি চলে যাস আমি তবে আরও ড্রিংক করবো...অ্যানাদার ফুল বট্‌ল।
গৌর বললো, আচ্ছা, আচ্ছা বাবা, আমি থাকচি আর একটু।
বেণী বললো, মধু, আমিও থাকচি। আমি না হয় পরে গৌরের সঙ্গে ফিরবো। ওরা যাক।
মধুর মুখটা শুকিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। অন্যরা চলে যাবার পরও বেণীর বসে থাকা সে পছন্দ করলো না। গৌর আর মধু চুপ করে রইলো, বেণী একাই বক বক করতে লাগলো কিছুক্ষণ।
দেয়ালের পাশে একটি বড় শ্বেত পাথরের টেবিলে মধুর অনেক বই এলোমেলো করে ছড়ানো। এক সময় বেণী উঠে গিয়ে দেখতে লাগলো সেই সব বই। যদিও বেণী খুব ভালোভাবেই জানে, মধু তার বই ঘাঁটাঘাঁটি একদম পছন্দ করে না।
দু'খানা বই বেছে নিয়ে বেণী বললো, মধু, আমি এ দুটো তোর কাছ থেকে বরো করতে পারি ?

মধু বললো, টেক অ্যাজ মেনি অ্যাজ ইউ উইশ। শুধু বায়রন'স লাইফটা নিস না। ওটা আমি পড়চি।

জানলা দিয়ে নীচে উঁকি মেরে মধু আবার বললো, আমার পাল্কি বেহারারা এখুনি নাইতে যাবে, বেণী, তুই যদি বাড়ি যেতে চাস, যেতে পারিস, ওরা তোকে পৌঁছে দেবে। নইলে পরে গেলে তোকে পাল্কি ভাড়া করতে হবে।

বেণী সচকিত হয়ে বললো, না, না, তা হলে আমি এখুনি যাবো। কিন্তু গৌর যাবে না ? কি রে, গৌর ?

গৌরের বদলে মধুই বললো, না, গৌর এখন যাবে না। ও সারাদিন থাকবে আমার সঙ্গে। ইভ্‌ন মে বী সারারাত !

বেণী ভুরু তুলে বললো, সারারাত !

গৌর বললো, মাথা খারাপ নাকি ! সারারাত থাকবো কে বললে ! তুই এগো বেণী, ও একটু ঠাণ্ডা হলেই আমি তারপর যাবো। এখন ওকে ফেলে গেলে ও আরও মদ খাবে।

বেণী মুচকি হেসে বললো, তুই ছাড়া কেউ ওকে সামলাতে পারবে না। তুই একটু আদর-যত্ন কর···হ্যাঁ রে মধু, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, তুই রাগ করবি না ?

—কী ?

—তুই যে অ্যাক্রসটিক কবিতাটা লিখেচিস গৌরকে নিয়ে, সেটাতে গৌরকে তুই হী না বলে শী বলিচিস কেন রে ? গৌরের অবশ্য ভারী সুন্দর চেহারা, মেয়ে বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

মধু গম্ভীর স্বরে বললো, ওটা গৌরকে নিয়ে লেখা কে বললো ? আমার বেশীর ভাগ কবিতাই তো গৌরকে ডেডিকেট করা, তা বলে কি সবই ওর উদ্দেশে লেখা ?

—কিন্তু অ্যাক্রসটিক তো লাইনের প্রথম অক্ষর মিলিয়ে যার নাম হয়, তাকে নিয়েই লেখা হয় ! ডি এল আর একদিন বলেচিলেন না ? তারপরই তো তুই ওটা লিখলি। আমার মনে আছে এখনো ক'টা লাইন, গো-ও ! সিম্‌পল লে ! অ্যাণ্ড টেল দ্যাট ফেয়ার, ও-হ ! টিজ ফর হার, হার লাভার ডাইজ !

—ভালো করে পড়তে শেখ, বেণী ! ওভাবে কবিতা পড়ে না ! মনে রাখিস, তুই বায়রন কিংবা পোপের মতন একজন মহাকবির লেখা পড়চিস।

—আমার হাতে কবিতা আসে না, নইলে গৌরকে নিয়ে আমারও ওরকম লিখতে ইচ্ছে করে···

—বেহারারা নাইতে চলে গেলে পরে কিন্তু ওদের ডেকে ডেকে আর পাওয়া যাবে না।

—না, না, আমি যাচ্চি, যাচ্চি।

বেণী তাড়াতাড়ি উঠে বেরিয়ে গেল। তাকে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিল মধু। ভুরু থেকে বিরক্তি উধাও করে সে বললো, কৃপণের ব্যাটা কৃপণ ! পাল্কি ভাড়া দিতে হবে শুনেই পালালো। গুড রিডেন্স।

গৌর আরক্ত মুখে নতনেত্র হয়ে বসে আছে।

মধু ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে ফটাফট চুমো দিতে দিতে বললো, এবার শুধু তুই আর আমি। আমি আর তুই। গৌর আর মধু। মধু আর গৌর। আহ্ ! বড় আনন্দ।

গৌর নিজেকে অতি কষ্টে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, তুই কী পাগলামি করিস, মধু ! সকলের সামনে আমায় এমন লজ্জায় ফেলিস !

মধু বললো, কিসের লজ্জা ! আই অ্যাম প্যাশানেটলি ফণ্ড অফ ইয়োর কম্পানি, অ্যাজ আই অ্যাম অফ ইউ !

—বেণী কি রকম বিশ্রীভাবে কথা বলে গেল !

—বেণী বী ড্যাম্‌নড।

—না মধু, তুই মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্চিস। আজকাল তুই অন্যের কোনো কথা শুনিস না।

—শুধু তোর কথা শুনি।

—তুই এমন ছেলেমি করলে আমিও আর কখনো আসবো না।

—ওকথা বলিস নি গৌর, ওকথা বলিস নি। তোকে না দেখে আমি থাকতে পারবো না। এইজন্যই কি সম্প্রতি তুই আমাকে অ্যাভয়েড করিস ?

—আমাদের আরও কত বন্ধু আচে, তুই আর কারো নামে কবিতা ডেডিকেট করিস না, শুধু তুই আমার নামে করিস কেন ?

—বেশ করি ! আমার শুধু তোকেই ভালো লাগে। তোর জন্য আমি কী এনে রেখিচি দ্যাক। টেবিলের ঐ টানাটা খোল।

—আবার কী এনিচিস ?

মধু নিজেই টেবিলের ড্রয়ার খুলে ফেললো হ্যাঁচকা টানে। তার মধ্যে রয়েছে দুটি সুদৃশ্য প্রসাধন সামগ্রীর বোতল। মধু সে দুটি তুলে নিয়ে বললো, এই দ্যাক, সবচেয়ে বড় ফরাসী কম্পানির পমেটম্। আর এটা ল্যাভেণ্ডার !

—তুই আবার এসব আনিয়েচিস আমার জন্য ?

—তুই সেদিন বলিছিলিস না, তুই ল্যাভেণ্ডার খুব ভালোবাসিস ?

—সে তো কতার কতা !

—ল্যাভেণ্ডারটা অতি কষ্টে জোগাড় করিচি···সব সময় পাওয়া যায় না।

—তুই আমার জন্য কত খরচ করবি, মধু ? এই তো সেদিন 'ফরগেট মী নট' পাঠালি !

—স্টিল ইউ ফরগেট মী ! খরচের কথা কেন বলচিস, গৌর ? তোর জন্য আমি সর্বস্ব দিতে পারি। তোর একটা ছবি আমি আমার কাচে রাখতে চাই, সে ছবি গড়াবার জন্য যদি আমার সব জামা-কাপড় বিক্রি করে দিতেও হয়, তাতেও আমি রাজি।

দু' হাত ছড়িয়ে চোখ বুজে মধু আবেগের সঙ্গে বললো, অ-ল কাইণ্ড, টু দিজ ফণ্ড আর্মস অব মাইন। কা-ম ! অ্যাণ্ড লেট মী নো লঙ্গার সাই !···বেণী স্টুপিডটা ঠিকই ধরেচে, এই অ্যাক্রসটিকটা তোকে নিয়েই লেকা !

মধু আলিঙ্গনের জন্য এগিয়ে আসতেই গৌর টেবিলের অন্য দিকে চলে গিয়ে প্রসঙ্গ ঘোরাবার চেষ্টা করে বললো, তুই কি আর সত্যিই কালেজে যাবি না মধু !

মধু বললো, রিচার্ডসন যদি আবার পড়াতে আসেন, তখন ভেবে দেখতে পারি।

—পড়াশুনো মানে কি শুধু কাব্য-পাঠ ? তুই অঙ্কের ক্লাসে যাস না অনেকদিন।

—অঙ্ক আমি ঘৃণা করি। অঙ্ক শিখে কী হবে ? অঙ্ক তো যে-সে শিখতে পারে, আমি পোয়েট, আমার অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। শেক্সপীয়ার ইচ্ছে করলে নিউটন হতে পারতেন কিন্তু নিউটনের সাধ্য ছিল না শেক্সপীয়ার হওয়ার।

—আর বাংলা ক্লাসে যাওয়া তো একেবারে ছেড়েই দিয়িচিস !

—ঐ চাকর-বাকরদের ল্যাঙ্গোয়েজ শিখে আমি সময় নষ্ট করবো বলতে চাস ? ফাই আপঅন ইট।

—আমরা বাড়িতে এখনো বেঙ্গলিতে কথা বলি। শুধু চাকর-বাকরদের ল্যাঙ্গোয়েজ বলচিস কেন ?

—কথা বলার জন্য ল্যাঙ্গোয়েজ শিখতে হয় না। মুটে-মজুরও কথা বলে।

—হেয়ার সাহেব বলেছিলেন, যারা বেঙ্গলি শিখবে না, তাদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না।

—আমি পরীক্ষা গ্রাহ্য করি না। আর হেয়ার সাহেব ! বাদ দে, বাদ দে ! মাগুর মাছের ঝোল আর ঝিঙে-পোস্ত খেয়ে খেয়ে হেয়ার সাহেব তো এখন পুরোপুরি ভেতো হিঁদু হয়ে গেচে।

—হেয়ার সাহেব আমার নমস্য। ওঁর কথাতেই আজকাল আমি বাংলায় মন দিয়েচি।

—ঐ ল্যাঙ্গোয়েজে আর কতটুকু শেখার আচে রে ? ওতে আচে কী ? যে ভাষায় কবিতা লেখা যায় না, সেটা আবার একটা ভাষা ?

—ভারতচন্দ্র তো বেঙ্গলিতেই লিখেচেন। আজকাল ঈশ্বর গুপ্ত লিখচে।

—ভারতচন্দ্র আবার কবি ? বায়রন, ওয়ার্ডস্বার্থ-এর পায়ের নখের যোগ্য নয়। আর ঐ ঈশ্বর গুপ্তর মতন পদ্য আমি যখন তখন লিখতে পারি।

—তুই বেঙ্গলিতে কবিতা লিখতে পারিস ? লিখে দেকা তো !

—এক্ষুনি লিখে দেখাচ্চি ! কাগজ কলম নে।

—আমি লিখবো ?

—আমি বলচি, তুই লিখে যা। বেঙ্গলির স্পেলিংটেলিংগুলো আমার মনে থাকে না। ঐ রেফ আর র-ফলা আর যুক্তাক্ষর, বীভৎস ল্যাঙ্গোয়েজ ! ঐ ল্যাঙ্গোয়েজ নিজের হাতে লিখতে আমার ঘেন্না হয় ! তুই তো একটা মেয়ে, তাই বেঙ্গলি ভালোবাসিস।

—এই মধু !

—আমি বেঙ্গলি ভালোবাসি না, তবু তোকে ভালোবাসি, গৌর ! তুই লেখ, আমি বলে যাচ্চি···কী নিয়ে লিখবো বল ? পাহাড় ? সমুদ্র ? সুন্দরী রমণী ? বাঙালীদের মধ্যে আবার সুন্দর কোতায় ? মেঘ

করেচে, আচ্ছা বর্ষাকাল নিয়ে লেখা যাক।

পেছনে হাত দিয়ে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ মুখ তুলে মধু বললো, লেখ, 'গম্ভীর গর্জন সদা করে জলধর/উদবিল নদ নদী...'

গৌর বললো, 'উদবিল' ? তার মানে কী ?

—মানে নেই বুঝি ? তা হলে লেখ, উথলিল। 'উথলিল নদ নদী ধরণী উপর'—মিলেচে ? জলধর আর উপর, ঠিক মেলেনি ? তোদের বাঙলায় তো আবার মিল ছাড়া পদ্য হয় না। এর পরের লাইন :

'রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে'

গৌর জিজ্ঞেস করলো, রমণ লয়ে ? তার মানে ? রমণীরা কার সঙ্গে সুখে কেলি করবে ?

—কেন, রমণের সঙ্গে ?

—রমণ কে ? ওঃ হো ! তুই বুঝি ভেবেচিস রমণীর ম্যাসকুলিন রমণ ?

—তা নয় ? ঠিক আচে, পরের লাইনে মিলিয়ে দিচ্চি !

"রমণী রমণ লয়ে সুখে কেলি করে
দানবাদি দেব যক্ষ সুখিত অন্তরে"

—সুখিত ? সুখিত কথাটা হয় ?

—কেন হবে না ? আমি মধুসূদন দত্ত বলচি, হয় ! দুঃখিত যদি হয় তাহলে সুখিত হবে না কেন ?

—আচ্ছা মানলুম। এখানেই শেষ ?

—না, আরো আচে। লেখ্...

"সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রবল প্রবল প্রতাপ"

—মিললো না !

—মেলেনি ? প্রবল, প্রবল, আচ্ছা লেখ, প্রবল প্রভাব।

—"বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব ?"

—হ্যাঁ ! তারপর, আচ্ছা, স্বাধীন বানান কি রে ?

—দন্তেয় স-এ ব-ফলা আকার...

—ব-ফলা আছে ? এই ফলাগুলি নিয়েও আর এক ঝামেলা ! শোন, ঐ ব-ফলা দিতে হবে না, শুধু স দিয়ে লেখ।

—সাধীন ?

—হ্যাঁ।

—দূর তা আবার হয় নাকি ? সাধীন কথাটার কোনো মানে হয় না।

—তুই লেখ না। এখানে ব-ফলা দিলে চলবে না। কারণ আছে। শুধু স দিয়ে লেখ্।

"সাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়
কলহ করয়ে কোনো মতে শান্ত নয় ॥"

—ব্যস, শেষ।

—কবিতার কী মানে হলো ?

—মানে হলো না ? তোর ঐ ঈশ্বর গুপ্তর চেয়ে ভালো হয়েচে। আমি যা লিখবো, তাই ভালো হবে। কবিতাটা আট লাইন হয়েচে তো ঠিক ? এবার তুই সবটা একসঙ্গে পড়। আর প্রত্যেক লাইনের প্রথম অক্ষর জুড়ে দ্যাখ কী হয় !

গৌর মাথা নীচু করে কবিতাটা পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তার ফর্সা মুখটা রাঙা হয়ে গেল। মুখ তুলে সে বললো, আবার ? তোকে নিয়ে যে আর পারি না !

মধু হাসতে হাসতে বললো, গউরদাস বসাক ! ঠিক হয়েচে কি না ! বাঙলাতেও আমি একটা অ্যাক্রসটিক লিখে দেখিয়ে দিলুম ! বেণীকে বলিস, এটাও অ্যাক্রসটিক, এটারও সব লাইনের প্রথম অক্ষর নিয়ে তোর নাম হয়। কিন্তু এটা তোকে নিয়ে লেখা নয়, বর্ষাকাল নিয়ে লেখা। ইচ্ছে করলে আমি সব পারি, বুঝলি ? তবে, তোদের এই ডার্টি ল্যাঙ্গোয়েজের কোনো বই আমার ছুঁতেই ইচ্ছে করে না ! স্যাংস্কৃটে বামুন বামুন গন্ধ আর বাঙলায় চাকর-বাকরের গন্ধ !

—এসব কথা তুই কার কাচ থেকে শিখলি রে মধু ?

—কার কাচ থেকে আবার শিখবো ?

—শুনলুম তুই নাকি আজকাল কেষ্ট বাঁড়ুজ্যের কাচে ঘোরাঘুরি কচ্চিস ?

—হ্যাঁ, গেচি কয়েকবার। কেন ?

—ওনার কোনো সুন্দরী মেয়েটেয়ে রয়েচে বুঝি ? তার দর্শন লাভের বাসনায় যাস ?

—এঃ হে হে ! গৌর, তোর হিংসে হয়েচে দেখচি ? হ্যাঁ, ঠিক বুঝতে পেরেচি, মুখ রক্তিম বর্ণটি ধারণ করেচে, আমি কোনো উওম্যান-এর কাচে গেলে তোর রাগ হয়, সেটা বলবি তো ?

মধু এবার গৌরকে ধরে ফেলে বুকে জড়ালো। চুমো দিতে দিতে বলতে লাগলো, কিন্তু আমি তোকেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসি, গৌর, রাগ করিস নি, রাগ করিস নি।

—আঃ মধু, ছাড়, ছাড়।

ডান দিকের দেয়ালে একটি দরজা, তার ওপাশে মধুর শয়ন কক্ষ। মধু গৌরকে টানতে টানতে নিয়ে এলো সেখানে। জোর করে তাকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বললো, দাউ হ্যাস্ট ফরগটন দাই প্রমিজ অব অনারিং মাই পুয়োর কট উইথ দা সেক্রেড ডাস্ট অব ইওর ফিট !... আজ সেই প্রমিজ ফুলফিল কর। আমার খাটে একটু তোর পায়ের ধুলো দে।

গৌর বিব্রতভাবে বললো, আমি এবার যাবো !

—না, না, গৌর, তুই যাবি না।

মধু নিজে মাটিতে বসে পড়ে গৌরের উরুর ওপর দুই হাত রেখে বললো, তোর কোল পেতে দে, আমি মাথা রাখবো।

—কী পাগলের মতন কচ্চিস মধু ?

—সেদিন আমি তোর কোলের ওপর কাগজ রেখে লিখতে গেসলাম, কিন্তু তুই কাগজ ফেলে দিলি—

আই থট আই শ্যাল বী এবল্
(মেকিং দাই ল্যাপ মাই টেবল্)
টু রাইট দ্যাট নোট উইথ ঈজ :—
বাট হা ! ইয়োর শেকিং
গেভ মাই পেন আ কোয়েকিং ;—
রুডনেস নেভার আই স লাইক দিস—

—কেন, কেন, কেন, কেন, গৌর ? আমি তোকে এত ভালোবাসি, অথচ, তুই কেন আমাকে ভালোবাসিস না ? কেন আমাকে ফিরিয়ে দিস তুই ? এত কবিতা লিখি তোকে নিয়ে, তবু তোর মন পাই না ? আজ তোকে কাচে পেয়েচি অনেকদিন পর।

—মধু, মাতলামি করিস না। ছাড় আমাকে।

—না, না, না।

মধুর বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় না দিয়ে গৌর দু' হাত দিয়ে জোর করে ঠেলে দিল তার মাথাটা। ভারসাম্য হারিয়ে মধু মেঝেতে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল, দড়াম করে শব্দ হলো মাথা ঠোকার। গৌর সত্যিকারের কুপিত হয়েছে, সে মধুকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়ালো না।

একটু বাদে মধু উঠে বসে অত্যন্ত নিঃস্ব গলায় বললো, গৌর, তুইও আমায় দূরে ঠেলে দিলি ? আমার আর কেউ রইলো না। আমি আর তোকে জ্বালাতন করবো না। দেকিস, একদিন আমি হঠাৎ কোথায় চলে যাবো, তোরা আর আমাকে খুঁজেও পাবি না !

বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল এক পুরুষেই প্রচুর টাকা রোজগার করেছেন। অন্য অনেকের মতন তাঁরও ভাগ্য ফিরেছে নুনে।

লুণ্ঠনপর্বের গোড়ার দিকে ইংরেজ কোম্পানি কাতারে কাতারে জাহাজে এ-দেশ থেকে মালপত্র ভরে নিয়ে যেত নিজের দেশে। ফেরার সময় তার অধিকাংশ জাহাজই খালি আসতো। ও-রকম খালি জাহাজ নিয়ে গভীর সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া বিপজ্জনক, ঝড়ের সময় সেগুলো খেলনার মতন পলকা হয়ে যায়, উল্টে যায় হঠাৎ। তাই সাহেবরা সেই জাহাজগুলি সবচেয়ে সস্তা জিনিস, নুন দিয়ে ভর্তি করে আনতে শুরু করে। প্রথম প্রথম সেই নুন এমনি ফেলে দেওয়া হতো। কিন্তু অচিরেই বণিক জাতির চৈতন্যোদয় হলো। ফেলে দেবার দরকার কী, এই নুনও বিক্রি করা যায়। সাত সমুদ্র তের নদীর পাড় থেকে নুন আমদানী করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না যদিও বিলিতি নুন ও ভারতীয় নুন একই রকমের নোনতা, তবু এ-দেশের ডামাডোলের মধ্যে ইংরেজ নানা কৌশলে সেই নুন বিক্রি করা শুরু করলো। দিশী বাজারে নুন চালাবার জন্য সাহায্য নিল কিছু কিছু দিশী লোকের।

ক্রমে ক্রমে এখানকার সমগ্র লবণ ব্যবসাটিই ইংরেজ একচেটিয়াভাবে গ্রহণ করে। লবণ অর্থাৎ করকচ, যা শুধু সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য এবং নতুন ব্যবসায়ীদের কেরামতিতে যার দাম যখন তখন লম্ফ দিয়ে বাড়ে। দেশী উৎপাদকদের বঞ্চিত করে বিদেশী বণিকদের লভ্য বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে নিজেদেরও সংস্থান করে নিয়েছিল কিছু দেওয়ান ও উপদেওয়ানরা। আদি যুগের কলকাতার অনেক ধনীই প্রকৃতপক্ষে এই নুনের গোলাম।

বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল বড়লোক হবার পর শেষ বয়েসে গান-বাজনা, হাফ-আখড়াই আর শখের যাত্রা নিয়ে খুব মেতেছিলেন। তাঁর অগাধ বিষয় সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়েছিলেন উত্তরাধিকারীদের মধ্যে। বাড়ির কাছেই তিনি যে একটি মস্ত বড় বাজার বসিয়েছিলেন, সে বাজারের মালিকানা তিনি লিখে দিয়েছিলেন তাঁর এক ছেলের বউয়ের নামে। সেই বউরাণীর বাজারের নামই লোকের মুখে মুখে হয়ে যায় বউবাজার। ক্রমে পুরো পল্লীটিরই ঐ নাম হয়।

বউবাজার পাড়াটি বড় বিচিত্র। অনেককাল থেকেই এ পল্লীতে বারবনিতাদের রবরবা। বড় মানুষরা তাদের রক্ষিতাদের জন্য আলাদা বাড়ি করে দিয়েছে। ভাগ্যান্বেষণে অনেক মুসলমান ও পশ্চিমা বাঈজীরাও তাদের জীবন্ত শিল্পসরা সাজিয়ে বসেছে এখানে। পাইকার, ব্যাপারী আর ইজারাদারদের রাত্রিবাসের জন্য সরাইখানাও গজিয়ে উঠেছে অনেক, যেখানে শয্যা ও শয্যাসঙ্গিনী দুই-ই মেলে।

তাছাড়া এখানে আছে এমন কালীমন্দির যেখানে সাহেবরাও আসে পুজো দিতে। সব ব্যাপারেই সাহেবদের অগ্রাধিকার বলে, যেদিন সাহেবরা কোনো কিছুর মানত করে ডালি সাজিয়ে পুজো দিতে আসে সেদিন পুরুতরা অতি উৎসাহে নেটিভ নিত্য-পূজার্থীদের হাত দিয়ে ঠেলে দিতে দিতে বলে, হঠ যাও, হঠ যাও, আগে গোরা পূজা, আগে গোরা পূজা। সাহেবরা ভক্তিভরে পায়ের জুতো খুলে মাথা নীচু করে কালী মূর্তির দিকে এগিয়ে যায়।

হাফ-আখড়াই, শখের যাত্রা, বুলবুলির লড়াইতে এ পাড়া প্রায়ই জমজমাট থাকে। ইদানীং উড়িষ্যা থেকে আগত গোপাল নামে একটি ছেলে বিদ্যাসুন্দরের গান গেয়ে সবাইকে খুব মাতিয়ে রেখেছে। শোনা যায়, ঐ গোপাল আগে পথে পথে কলা বিক্রি করতো। একদিন সে বাবু বিশ্বনাথ মতিলালের বাড়ির বাইরে হাঁক দিয়েছে, চাই কলা, চাঁপা কলা-আ-আ—অমনি বাড়ির মালিক বৈঠকখানা ঘরে বসে কান খাড়া করলেন। দু'-তিনবার সেই কলাওয়ালার হাঁক শুনে বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল তাঁর বয়স্য রাধু সরকারকে বললেন, শুনচো, রাধু, লোকটার গলা শুনচো? খাঁটি কোমল গান্ধার লাগ্যেচে। কেমন খেলাচ্চে সুরটাকে। ওরে কে কোথায় আচিস, ধরে আন। লোকটাকে ধরে আন।

সেই গোপালকে নিয়ে গড়া হলো যাত্রা পার্টি। তার গলার গান এখন লোকের মুখে মুখে ফেরে।

"মদন আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী" !

বউবাজার পাড়ার নানা গলির মধ্যে পুরোনো আমলের অনেক বাবুদের বাড়ি রয়েছে। শহরে জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, তাই সেই সব অনেক বাড়ির বৈঠকখানা এখন ভাড়া দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বহিরাগতদের। একখানা দু'খানা ঘরে কোনো রকমে মাথা গুঁজে থাকে দশ-বারো জন পুরুষ মানুষ। নিত্য নতুন গজিয়ে উঠছে এ রকম এক একটা মেসবাড়ি। সাধারণত একজন কেউ কলকাতার চাকরি পেয়ে ও রকম ঘর ভাড়া নেয়, তারপর গাঁ থেকে ছেলে, ভাই, ভাগ্নেদের আনিয়ে কলকাতার ইস্কুলে ভর্তি করে দেয় কিংবা চাকরির উমেদারিতে লাগায়। ক্রমে ক্রমে দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন কিংবা তাদের সুপারিশ নিয়ে কেউ কেউ চাকরির ধান্ধায় এসে জুটে যায় সেখানে। থাকা তো বিনামূল্যে বটেই, খাওয়াও প্রায় আধলা না খরচ করে, তার বদলে রান্না করা, বাসন মাজার কাজগুলো করে দিতে হয়, এই যা!

বউবাজারের পঞ্চাননতলা গলিতে এ রকম কাছাকাছি দুটি মেসবাড়ি আছে। একটি চালান জয়রাম লাহিড়ী। দু'খানি ঘর ও এক চিলতে ছাদে মোট তের জন মনুষ্য থাকে। জয়রাম ধীর, স্থির, নিষ্ঠাচারী ভদ্রমানুষ। কিন্তু জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁকে সারাদিন প্রায় মুখের রক্ত তুলে শ্রম করতে হয়। সকালে নাকে মুখে কিছু অন্ন গুঁজে তিনি বেরিয়ে যান, ফিরতে ফিরতে রাত্রি ন'টা-দশটা বেজে যায়। তিনি কাজ করেন খিদিরপুরে এক সাহেবের অধীনে। মাঝে মাঝে সাহেবের সঙ্গে তাঁকে দু-চার দিনের জন্য মফঃস্বলে যেতে হয়। স্বগ্রামের যে-সব লোকেরা তাঁর কাছে এসে আশ্রয় চায়, তিনি কারুকেই বিমুখ করেন না, এত বড় একটা সংসারের খরচ তিনি একা জোগান, এছাড়া কারুর স্কুলের বেতন, কারুর যাতায়াতের ভাড়াও তিনি দিয়ে যান নিয়মিত। অতিশয় ভালো মানুষ বলেই তিনি খেয়াল করেন না যে, এত রক্ত-জল-করা পরিশ্রমের টাকায় তিনি কতকগুলো কুলাঙ্গার পুষছেন।

জয়রাম লাহিড়ীর পোষ্যরা পাড়ার মধ্যে একটি আতঙ্কবিশেষ। তাদের গোদাগোদা চেহারা, বিকট গলার আওয়াজ। জয়রামের সামনে তারা চুপেচাপে থাকে, আর জয়রাম বাসা থেকে বেরুলেই তারা নিজমূর্তি ধরে। তাদের মধ্যে তিনজন মোটে সামান্য চাকরি জুটিয়েছে, বাকিরা সর্বক্ষণ বাসায় বসে গুলতানি করে আর মদ গাঁজা খায়। এমন কি যে তিনটি কিশোর আছে দলের মধ্যে, স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলেও তারা ক্লাসে যায় না। বড়োরা তাদের দিয়ে জোর করিয়ে বেশী কাজ করায়। এমনও দেখা গেছে, বুড়োধাড়িরা সারা গায়ে তেল মেখে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে কুয়োর ধারে, আর সেই তিনটি কিশোর অবিরাম জল তুলে তুলে তাদের মাথায় ঢালছে। সারা দুপুর ধরে চলে এই স্নানপর্ব।

কিশোরদের মধ্যে একটির নাম রামচন্দ্র। পল্লীর লোকে বলে, বাবাঃ, এ আপদের নাম রামচন্দ্র কে রেখেছে ? এর নাম হওয়া উচিত ছিল হনুমানচন্দ্র ! সেই রামচন্দ্রের উপদ্রবে প্রতিবেশীরা অস্থির। চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়েস হলেও তার বেশ ঢ্যাঙা চেহারা, গায়েও যথেষ্ট শক্তি আছে। আরপুলির গলিতে একটা ইস্কুলে তার নাম লেখানো আছে বটে, কিন্তু সেখানে সে যায় কদাচিৎ। পাড়ার মধ্যে কোনো ফেরিওয়ালা এলে সে কিছু না কিছু চুরি করে পালাবেই। জামরুল, আম, কলা যাই হোক না। এক থাবা দিয়ে তুলে নিয়ে সে দৌড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

ও বাড়ির বয়স্কদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যক্তিটির নাম হরবল্লভ। তার কীর্তি-কাহিনী এমনই ছড়িয়ে গেছে যে, এমন কি তার কিছু কিছু জয়রামেরও কানে গেছে। এর মধ্যে দু-বার জয়রাম নিজের চেষ্টায় সেই হরবল্লভকে চাকরি জুটিয়ে দিয়ে বলেছেন, বাপু, তুমি এবার নিজে পৃথক বাসা ভাড়া নেও। হরবল্লভ দু-চার দিনের মধ্যেই সেই চাকরি খুইয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে ফের জয়রামের পা জড়িয়ে ধরে। জয়রাম আর কিছু বলতে পারেন না।

হরবল্লভের আসল কাজ, অন্য যারা চাকরি করে তাদের কাছ থেকে টেকসো আদায় করা। কে কোন্‌দিন বেতন পায়, সেই হিসেব তার নখদর্পণে, সেই সেই দিন সে তাকে তাকে থাকে। সেদিন তার ওপরে হামলে গিয়ে পড়ে, বলে, দে শালা, টাকা দে। ফুর্তি করবো, তুইও ফুর্তির ভাগ পাবি।

ফুর্তি করার নিত্য নতুন উপায় বের করে হরবল্লভ। তার প্রধান সাগরেদ ঐ কিশোর রামচন্দ্র। বিকেল হলে ছাদে খোলা হাওয়ায় খালি গায়ে বসে থাকে হরবল্লভ, আর রামচন্দ্র ছিলিমে গাঁজা সেজে দেয়। দু'জনে ভাগাভাগি করে ছিলিম টানতে টানতে নানা রকম ফন্দী-ফিকির আঁটে। হরবল্লভের গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, বুকে পিঠে বড় বড় লোম। লোকে বলে জাম্বুবান আর হনুমান পাশাপাশি বসে আছে।

মেসবাড়িতে কোনো স্ত্রীলোক থাকে না বলে পুরুষগুলোর জিভেরও কোনো বল্গা নেই। ছোটবড়

ভেদও মানে না। যে-কোনো রকম কুকথা তারা অনর্গল বলে যায়। যখন তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, তখন এমন সব কুৎসিত বাক্যের স্রোত বইতে থাকে যে পথচলতি লোকেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে শোনে।

জয়রাম কার্য উপলক্ষে মফঃস্বলে গেলে এ বাড়ির লোকদের পোয়া বারো। তখন তারা একাধিক সস্তা বেশ্যাকে পথ থেকে ডেকে নিয়ে আসে বাড়ির মধ্যে। তারপর সারারাত ধরে চলে হল্লা। আশপাশের বাড়ির শিশুরা হঠাৎ ঘুম ভেঙে ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে। মায়েরা চুপ চুপ চুপ করে সেই শিশুদের পিঠ চাপড়ে আবার ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করে। স্বামীদের দিকে তারা জ্বলন্ত চোখে তাকায়। স্বামীরা মুখ ফিরিয়ে থাকে। হরবল্লভ আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের সবাই ডরায়।

একদিন মাঝরাতে ও বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো একটি মেয়ে। মেয়েটি স্বৈরিণী হলেও বোধ হয় ওদের অতখানি অত্যাচার সহ্য করতে পারেনি, তাই পালিয়ে আসতে চেয়েছিল। তার পেছন পেছন তেড়ে এলো হরবল্লভ হাতে একটা গোল করে পাকানো মোটা দড়ি, স্খলিত গলায় সে গান গাইছে "আমার এ বিনোদ মালা, পরাবো সখী তোর গলায়"।

হরবল্লভের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মেয়েটি একবার এ-বাড়ি একবার ও-বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে দুম দুম করে। যদিও মেয়েটি জানে, কেউই তাকে আশ্রয় দেবে না। যে মেয়ে একবার পথে বেরোয়, কোনো বাড়িতে তার আর স্থান নেই।

পাড়ার প্রায় সব বাড়িই তখন অন্ধকার। গোলমালে কেউ কেউ জেগে উঠলেও সাড়া শব্দ করছে না। শুধু আলো জ্বলছে একটি বাড়িতে। সেজবাতি জ্বেলে একটি রোগা পাতলা চেহারার একুশ-বাইশ বছরের যুবক গভীর মনোযোগের সঙ্গে কিছু লিখছিল। স্ত্রীলোকের আর্ত চিৎকারে তার একাগ্রতা নষ্ট হলো। প্রথমে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বোঝার চেষ্টা করলো ব্যাপারটা। ঘরের মধ্যে আরও কয়েকজন ঘুমিয়ে আছে। তাদের পাশ কাটিয়ে সে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। রাস্তায় কোনো বাতি নেই, তাই সহসা কিছু দেখা যায় না। তারপর সে দেখলো, পথের মোড়ে একটি স্ত্রীলোককে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে একজন পুরুষ। হরবল্লভ গান ছেড়ে এখন কর্কশ গলায় চিৎকার করছে, চল মাগী! আগে পয়সা নিইচিস, এখন ছেনালী! আজ বেঁধে রাখবো তোকে!

কণ্ঠস্বর শুনেই হরবল্লভকে চিনতে পারলো যুবকটি। নতুন কিছু নয়, এ রকম প্রায়ই ঘটে। যুবকটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। একবার সে ভাবলো ছুটে যাবে মেয়েটিকে সাহায্য করবার জন্য, কিন্তু ততক্ষণে ও বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

সেই যুবকটিও একটি পারিবারিক মেসবাড়িতেই থাকে। এ বাড়িতে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটির নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে তাঁর নিজের তিন ছেলে, তাঁর ভাইয়ের দুই ছেলে, বোনের দুই ছেলে, শ্যালিকার এক ছেলে এবং পুরোনো ভৃত্য শ্রীরাম নাপিত। এছাড়াও মাঝে মাঝেই গ্রাম থেকে তাঁর অন্য ছেলে এবং আরও আত্মীয়-স্বজন এসে থাকে। ঠাকুরদাস মাইনে পান দশ টাকা, তাই দিয়েই অনেকদিন পর্যন্ত তিনি কলকাতার বাসা খরচ এবং ছেলেদের শিক্ষার খরচ চালিয়েছেন। তাঁর ছেলেরা পড়াশুনোয় ভালো, বড় ছেলে ঈশ্বর সংস্কৃত কলেজের নামকরা ছাত্র, মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক রচনা প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব দেখিয়ে পঞ্চাশ-একশো টাকা পুরস্কার পেয়ে সে টাকা তুলে দিয়েছে বাবার হাতে। মাসে আট টাকা ছাত্রবৃত্তিও পেয়েছে সে। এ বাড়িতে একমাত্র বিলাসিতা মাঝে মাঝে বিকেলবেলা বাতাসা খাওয়া।

ঈশ্বর পড়াশুনোয় ভালো হলেও ছেলেবেলা থেকে দারুণ গোঁয়ার। কোনো একটা কিছু জেদ ধরলে কিছুতেই ছাড়বে না। তার জেদের জন্য এক এক সময় ঠাকুরদাস ওকে মারতে মারতে আধমড়া করে ফেলেছেন, তবু ছেলে জেদ ছাড়েনি। ঠাকুরদাস এখন মারধোর বন্ধ করলেও মাঝে মাঝেই বলেন, আমার এই ছেলেটা একটা ঘাড় বেঁকা এঁড়ে গরু!

সংস্কৃত কলেজের পাঠ সেরে সম্প্রতি ঈশ্বর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সেরেস্তাদারের চাকরি পেয়েছে। মাইনে বেশ ভালোই, পঞ্চাশ টাকা। তার কাজ সাহেব সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া। এ-দেশ শাসন করতে এসে সাহেবরা বুঝেছে, এ দেশের ভাষা না শিখলে এ দেশবাসীর মর্মে প্রবেশ করা যাবে না। সাহেবদের সংস্পর্শে এসে ঈশ্বরও বুঝেছে যে তাকেও ইংরেজি ভাষাটা শিখতে হবে। রাজভাষা না শিখলে রাজ সংসর্গে থাকা যায় না। সকালে ও সন্ধ্যেবেলা সে নিয়ম করে ইংরেজি ও হিন্দী শিখছে। প্রায়ই তার রান্না করার পালা থাকে। চাকরি সেরে এসে সে রান্নাবান্না সেরে নেয় দ্রুত, খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে সে ছোট ভাইদের পড়া বলে দেয়। তারপর সকলে ঘুমিয়ে পড়লে

সে নিজের পড়াশুনো নিয়ে বসে। খুব গভীর রাত্রে সে লেখে। রাত জাগার ব্যাপারে তার কোনো ক্লান্তি নেই। বাইশ বছর বয়েস হলেও তার রোগা পাতলা ছোট্টখাট্টো চেহারা, শরীরের তুলনায় মাথাটা বড়।

একদিন বিকেলে কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে ঈশ্বর এক মুদিখানা থেকে আধ পয়সার ছোলা কিনছে এমন সময় তার কাঁধে কে যেন থাবড়া মারলো। ঈশ্বর ফিরে দেখলো, তার বন্ধু মদনমোহন।

মদনমোহন ঈশ্বরের চেয়ে বয়েসে কিছু বড় হলেও দু'জনে বাল্যকালে সহপাঠী ছিল বলে গভীর বন্ধুত্ব জন্মে গেছে। মদনমোহনের মাথা কামানো, মাঝখানে মস্ত বড় টিকি। স্বভাবটা তার দিলদরিয়া ধরনের। মদনমোহন সেই মুদিখানায় মুড়ি কিনতে এসেছিল।

মদনমোহন বললো, কি হে বাঁড়ুজ্যের পো! অ্যাতখানি ছোলা কোন্ কাজে লাগবে? ছোলার চাষ দিবে নাকি?

ঈশ্বর হেসে বললো, হ্যাঁ, চাষের কাজটা আমি ভালো পারি বটে। ছেলেবয়েসে কাস্তে হাতে নিয়ে চাষাদের সঙ্গে মাঠে ধান কাটতে যেতাম।

মদনমোহন বললো, নাও, মুড়ি খাও! আমি ভেবেছিলাম, তোমার রসনাই কাস্তের সমান, সত্যকারের কাস্তে হাতে নেবার তোমার দরকার নাই! তা অ্যাতখানি ছোলা কিনলে কোন কম্মে?

—বাড়িতে তো খাবার লোক কম নাই। আমাদের ওদিককার লোকদের পেট বড়ো হয়। আমার ভাইগুলো একদিক থেকে হালুম হালুম করে খায় আর সমানে হাগে।

—এত পরিমাণ ছোলা তো বিশ-পঁচিশজনেও খেয়ে শেষ করতে পারবে না।

—ধরো, এখন আমাদের বাড়িতে এগারোটা পেট। সকালে এই ছোলা ভিজিয়ে রাখলে বিকেলে বেশ ডুমো ডুমো হয়। সেই দিয়ে বিকেলের জলখাবারটা বেশ চলে যায়। সব শেষ করতে পারে না, যতগুলো বাঁচে তা রাতের কুমড়োর তরকারির মধ্যে মিলিয়ে দেই। অমনি সেটা কুমড়োর ছক্কা হয়ে যায়, আর তাতে স্বাদও বাড়ে। শুধু একঘেয়ে কুমড়োর ডালনা আর রোজ ভালো লাগে না।

—বিকালেও ছোলা আর রাত্রেও ছোলা? আর সকালে কী খাও?

—আদা!

—হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ! সেইজন্যই স্বাস্থ্যটি চমৎকার!

গল্প করতে করতে দুই বন্ধু হাঁটতে লাগলো রাস্তা দিয়ে। ঈশ্বরের বাড়িই কাছে। ঈশ্বর মদনমোহনকে অনুরোধ করলো, তার বাড়িতে একটু বসে যেতে। পঞ্চাননতলার গলিতে সেদিনও হরবল্লভ আর তার চ্যালারা হুড়োহুড়ি লাগিয়েছে। রামচন্দ্র এক দইওয়ালার বাঁকে ঝোলানো দইয়ের ভাঁড় থেকে এক খাবলা দই চুরি করতে গিয়ে পুরো ভাঁড়টিই ভেঙে ফেলেছে। সে বেচারা জুড়ে দিয়েছে মড়াকান্না। খেসারত না নিয়ে সে কিছুতেই যাবে না। তাকে কিছু দেবার বদলে উল্টে তার ওপরেই হম্বিতম্বি শুরু করেছে হরবল্লভ। কোমরে হাত দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার আরও দু' তিন স্যাঙাত।

কী হয়েছে, কী হয়েছে বলে ঈশ্বর সেদিকে যেতে গেল। মদনমোহন তার হাত ধরে টেনে বললো, করো কী, করো কী, এসব বর্বরদের সঙ্গে বিবাদ করতে যেও না।

ঈশ্বর বললো, ওরা ঐ গরীব বেচারির ওপর হামলা কচ্ছে। এদের অত্যাচারে এ পল্লীতে তেষ্টানো মুশকিল।

মদনমোহন বললো, তুমি উহাদের দিকে তাকায়ো না। উহাদের কথা শুনিও না। তা হলে আর কে তোমাকে বিরক্ত করবে?

—ভাই, পথ চলবার সময় চোখ বন্ধ করা যায় না। আর কান বন্ধ করার ক্ষমতা মনুষ্যগণের পক্ষে সম্ভব?

ঈশ্বর সেইখান থেকেই হাঁক দিয়ে বললো, এই দইওয়ালা, তুই আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে যাস। আজ পারবো না, পরশু আসিস। ঐ যে সাদা রঙের বাড়ি।

হরবল্লভ ঈশ্বরের দিকে ফিরে বললো, ঐ যে লাটের ব্যাটা এসে গ্যাচে? তবে আর ভাবনা কী!

রামচন্দ্র সেই সঙ্গে যোগ করলো, বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন!

মদনমোহন ঈশ্বরের হাত ধরে বাড়ির দিকে নিয়ে চলে গেল। ঈশ্বরের নাকের পাটা ফুলে গেছে, চোখে ক্রোধের আগুন। ঘাড়টিও বেঁকে গেছে। হাতে বিশেষ পয়সা নেই বলে সে অসহায় বোধ করছে এখন।

মদনমোহন বললো, দইওয়ালার ভাঁড়ের দাম তুমি মিটাবে। আরও কত গরীব দুঃখী আছে, সকলের দুঃখ তুমি ঘুচাতে পারবে কি?

ঈশ্বর বললো, সাধ্য মতন ঘুচাবো।

—এখন তা হলে বেশ বড় মানুষ হয়েছো মনে হয়?

ঈশ্বর অহংকারের সঙ্গে বললো, আমি গরীব, তবু আমি বড় মানুষ।

বাড়ির মধ্যে এসে মদনমোহনকে নিজের বিছানার ওপর বসিয়ে বললো, কী খাবে বলো?

মদনমোহন বললো, আমি বাপু তোমার ঐ ভিজানো ছোলা খেতে পারব না। ভালো চাকুরি করতেছ, আজ মণ্ডামেঠাই খাওয়াও।

ঈশ্বর বললো, নিশ্চয়ই খাওয়াবো।

পয়সার অনটন থাকলেও ঈশ্বর বন্ধুবান্ধবদের খাওয়ানোর ব্যাপারে খুব উদার। ছাত্র অবস্থায় জলপানির টাকায় প্রায়ই বন্ধুদের খাইয়েছে। এমনকি, এজন্য মিঠাইওয়ালার দোকানে ধার করতেও দ্বিধা করে না। সে ছোট ভাই শম্ভুচন্দ্রকে ডেকে বললো, যা, মোড়ের মিঠাইওয়ালাকে আমার নাম করে বল, মতিচুর আর সন্দেশ নিয়ে আয়।

ঠাকুরদাস কয়েকদিনের জন্য দেশের বাড়িতে গেছেন। ঈশ্বরই এখন এ বাড়ির কর্তা। কিছুদিন আগে মেজো ভাইটির বিবাহ দেওয়া হয়েছে, সেইজন্য ঋণ করতেও হয়েছে অনেক। ঈশ্বর এখন সংসারের হাল ধরে খরচ চালাচ্ছে টেনে টুনে। অতি সামান্য শাক ব্যঞ্জন রান্না করতে গিয়ে ছোট ভাইরা দিশা পায় না বলে আজকাল রান্নার ভার ঈশ্বর পুরোপুরি নিজেই নিয়েছে।

মদনমোহন বললো, মতিচুর নামটা শুনে আমার একটা কথা মনে পড়ল। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে তুমি একবার একটি শ্লোক রচে ছিলে, মনে আছে? আমার কিন্তু মনে আছে, ভারি সরস ছিল শ্লোকটি :

লুচি কচুরি মতিচুর শোভিতং
জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম্।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ।
সরস্বতী মা জয়তান্নিরন্তম্।

ঈশ্বর বললো, তুমি ঠিক মনে রেখেছো তো! আমি ভুলে গিসলাম।

মদনমোহন বললো, তুমি অপরের রচনা রাশি রাশি মুখস্ত করো, তাই নিজের রচনা মনে রাখতে পারো না।

ঈশ্বর বললো, এক কাজ করা যাক। আমি রসুইটা ধাঁ করে সেরে নিই। তুমি রান্নাঘরের দোরে এসে বসো না, তাহলে আমি কাজ করতে করতে গল্পও করতে পারি।

রান্নাঘরটি অত্যন্ত নোংরা আর স্যাঁতসেতে। একটি মাত্র দরজা, কোনো জানলা নেই। এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়ালে ফর্‌র ফর্‌র করে উড়ে যাচ্ছে আরশোলা।

সেই আরশোলার বহর দেখে মদনমোহন বললো, বাপরে, এত তেলাপোকা! কোন্‌দিন যে ওর দু' একটা ব্যঞ্জনের সঙ্গে পাক হয়ে যাবে!

ঈশ্বর মুচকি হাসলো। একদিন যে সত্যিই আরশোলা রান্না হয়ে গিয়েছিল এবং সকলের খাওয়া নষ্ট হবার ভয়ে ঈশ্বর নিজেই কচর মচর করে চিবিয়ে সেই আরশোলা খেয়ে নিয়েছিল, তা তো মদনমোহন জানে না। অবশ্য তাতে দোষই বা কী হয়েছে, চিনেম্যানরা নাকি ওগুলো খায়। কেউ কেউ বলে আরশোলা খেলে হাঁপানি রোগ হয় না।

রান্না অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীরাম ধাঁ করে উঠোনে গিয়ে কিছু কাঠ চ্যালা করে আনলো। তারপর সেই কাঠে সাজিয়ে ফেললো উনুন। চকমকি ঠুকে ঠুকে সেই উনুনে আগুন ধরিয়ে ফেললো ঈশ্বর। মদনমোহন বললো, বাপরে বাপ। কী ধোঁয়া!

শম্ভুচন্দ্র চাল ধুয়ে এনে মাটির হাঁড়িতে মাপমতন জল নিয়ে চাপিয়ে দিল উনুনে। খানিকবাদে ভাত ফুটে উঠতেই ঈশ্বর হাঁড়ি নামিয়ে ফ্যান গাললো। তারপর হলো ডাল। সেই ভিজে ছোলা দিয়ে কুমড়োর ছক্কা। আর পোস্তর বড়া ভাজা।

মদনমোহন বললো, মিছেই সন্দেশ মতিচুর খেলাম। ঈশ্বর, এখন তোমার হাতের রান্না খেতে আমার লোভ হতেছে।

ঈশ্বর বললো, খাও না! বেশী রাত করে আর বাড়ি ফিরেই বা কী করবে। এখানেই আজ শোও বরং।

তাই হলো, খাওয়া দাওয়ার পর অনেক রাত পর্যন্ত দুই বন্ধু গল্প করতে লাগলো। এক সময় সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন ঈশ্বর চুপি চুপি বললো, ভাই মদন, আমি একটা লেখা তোমাকে পড়িয়ে শোনাতে চাই। তুমি শুনবে?

মদনমোহন একটু আশ্চর্য হয়ে বললো, কার লেখা? তোমার?

ঈশ্বর তখন যে-কোনো নবীন লেখকেরই মতন আরক্ত মুখ করে লাজুক গলায় বললো, হ্যাঁ।

—কী লিখেছ? নতুন সংস্কৃত শ্লোক?

—না, সংস্কৃতও নয়, শ্লোকও নয়। বাংলা। গদ্য ভাষায় কিছুটা বাংলা লিখেছি।

—বাংলা? তাও গদ্যে? তুমি বলো কী, ঈশ্বর? বাংলা গদ্য অতি অপাঠ্য ও নিরস বস্তু। উহা লিখে লাভ কী?

—ফোর্ট উইলিয়াম কালেজে যেসব বাংলা টেক্‌সট আছে, তা পড়াতে আমার ভক্তি হয় না। অতি উৎকট ভাষা। সেইজন্যই নতুনভাবে কিছু বাংলা রচনার প্রয়োজন অনুভব করি।

—ছাত্রপাঠ্য কিছু যদি লিখে থাকো তো তা আলাইদা কথা। নচেৎ ও লেখা পণ্ডশ্রম।

—কেন, সর্বসাধারণের পাঠ্য কিছু বাংলায় লেখা যায় না?

—সর্বসাধারণের কী দায় ঠেকেছে বাংলা পড়বার। যে রসশাস্ত্র পাঠ করতে চায়, তাহার জন্য সংস্কৃতের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। আর কাজ চালাবার জন্য রয়েছে ইংরাজি। এখন তো সকলেই ইংরাজি পড়ে—

—আমি কিন্তু সর্বসাধারণের কথা চিন্তা করেই লিখতে শুরু করেছিলাম।

—পড়ো, শুনি।

বালিশের তলা থেকে ঈশ্বর টেনে বার করলো লম্বা খাতা। খাগের কলম ছেড়ে সে সম্প্রতি ইংলিশ নিব ব্যবহার করতে শুরু করেছে। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই সে বড় এক শিশি বিলিতি কালি কিনে এনেছিল হ্যামিল্টনের দোকান থেকে।

খাতাখানি হাতে নিয়ে ঈশ্বর বললো, বাসুদেব চরিত লিখবো ভেবে শুরু করিছি। একটু শুনে বিচার করে দ্যাখো দেখি।

ঈশ্বর পড়তে শুরু করলো,....নারদ মথুরায় আসিয়া কংসকে কহিলেন মহারাজ তুমি নিশ্চিন্ত রহিয়াছ কোনও অনুসন্ধান করো না এই যাবৎ গোপী ও যাদব দেখিতেছ....

মদনমোহন বললো, আস্তে, একটু আস্তে পড়ো, একেবারে যে পাল্কি বেহারাদের মতন তুর্কি নাচন শুরু করলে।

ঈশ্বর একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, আমি ঠিক গতিতেই পড়ছি, কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো না, কারণ অভ্যাস নাই। ইংরাজি গদ্য পড়তে গিয়ে আমি দেখেছি, ওরা কমা, সেমিকোলন, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়বোধক চিহ্ন ব্যবহার করে। পদ্যে এগুলির তেমন দরকার না থাকলেও গদ্যে খুব উপকারী। আমি ভাবছি বাংলা গদ্যে এগুলির ব্যবহার করলে কেমন হয়?

মদনমোহন বললো, ঈশ্বর, তুমি দুই চারিদিন মাত্র সাহেবদের সঙ্গে গতায়াত করেই যে উহাদের সব কিছুর গুণগান করতে শুরু করলে দেখি! ইংরাজি চিহ্ন আমাদের দেশীয় ভাষায় লাগবে কেন?

—ওসবের প্রয়োজন নাই, তুমি মনে করো?

—কোনো প্রয়োজন নাই।

—আমার কিন্তু মনে হয়, ঐসব চিহ্নে পাঠের সুবিধা হয়। যা হোক, বাকিটা পড়ি?

ঈশ্বর আবার পড়তে শুরু করলো,....ইতিমধ্যে বলরাম প্রভৃতি গোপনন্দনেরা নন্দমহিষীর নিকটে গিয়া কহিল ওগো কৃষ্ণ মাটী খাইয়াছে আমরা বারন করিলাম শুনিল না। তখন পুত্রবৎসলা যশোদা অস্তব্যস্তে আসিয়া কৃষ্ণের গণ্ড ধরিলেন এবং তর্জন করিয়া কহিলেন রে দুষ্ট তুই মাটী খাইয়াছিস রহ আজ আমি তোকে মাটী খাওয়া ভালো করিয়া শিখাইতেছি....

মদনমোহনের ক্রমশ ভুরু কুঁচকে যাচ্ছিল, এক সময় বললেন, থামো, থামো! ঈশ্বর, এসব কী ছাইমাটী লিখিয়াছ! এসব তো চাষাভূষার মতন কথাবার্তা। সব বোঝা যায়। ইহার মধ্যে রস কোথায়?

ঈশ্বরের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললো, এর মধ্যে রস নাই?

—কোথায় রস ? লোকে চিঠি চাপাটিও এমন সরল লেখে না। ঈশ্বর, তুমি এ কাজে ক্ষান্ত দেও। এ তোমার উপযুক্ত নয়। এমত ছেলেখেলায় কেন সময় নষ্ট করছো ?

—ভাই মদন, ছেলেখেলা বললে !

—তা নয় তো কী ?...."তুই মাটী খাইয়াছিস রহ আজ আমি তোকে মাটী খাওয়া ভালো করিয়া শিখাইতেছি...." হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ....এই নাকি রচনা ? তুমি এতবড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, তুমি এরকম স্ত্রীলোকদের মতন অশিক্ষিত ভাষা লিখলে সবাই তোমায় উপহাস করবে যে !

—তাই ?

—আমাকে দেখিয়েছ দেখিয়েছ, আর কাহাকেও দেখিও না ! এ সব হাবিজাবি রচনা গুড়গুড়ে ভট্‌চাজের মতন লঘু লোকেদের মানায়। এ তোমার উচিত কাজ হয় না। কালেজে পড়বার সময় তুমি উত্তম শ্লোক রচনা করতে, তোমার কাছ থেকে সকলে সে রকম আরও রচনা আশা করে।

ঈশ্বরের ঘাড়খানি পাশে বেঁকে গেছে। চোয়াল কঠিন। মদনমোহনের কথা তার পছন্দ হয়নি। অন্য কেউ এ রকম মন্তব্য করলে সে ক্রুদ্ধ উত্তর দিত। কিন্তু মদনমোহনের কথা সে মান্য করে।

সে গম্ভীরভাবে বললো, তুমি বাঙলা রচনার পক্ষপাতী নও ?

মদনমোহন বললো, বাঙলায় পদ্য রচা যায়। শিশু ও স্ত্রীলোকদের নীতি শিক্ষার জন্য বাঙলা পদ্য খুব উপকারী। কিন্তু গদ্যের উপযুক্ত গাম্ভীর্য এ ভাষায় সহে না।

—আমি এই বাসুদেব চরিতখানি ছাপাবো ঠিক করেছিলাম !

—সেটা তোমার মতন পণ্ডিতের যোগ্য কাজ হবে না।

খাতাখাতা মুড়ে রেখে ঈশ্বর বললো, থাক, ছাপাবো না তা হলে। ছিঁড়ে ফেলে দেব। তোমার কথাই বুঝি ঠিক। বাঙলা ভাষায় সাহিত্য হয় না।

বিন্দুবাসিনী ঠাকুরঘরের মেঝেতে আঁচল ছড়িয়ে শুয়ে আছে। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। বেলা এখন তিন প্রহর। বাড়ির সকলে এই সময় খেয়েদেয়ে ঘুমোয়। নীচতলার দাস-দাসীদের কোলাহলও এখন কিছুক্ষণের জন্য শান্ত। বাইরে রাস্তায় ঠা ঠা পোড়া রোদ্দুর, লোকজন বেশী হাঁটে না, গাড়ি-ঘোড়াও কম। মাঝে মাঝে কাকের কা-কা আর চিলের চি-হি-হি-তে শুধু স্তব্ধতায় একটুখানি চিড় ধরে।

ঠাকুরঘরের একটা জানলা খোলা। তা দিয়ে হাওয়া আসছে হু হু করে। আর সেই জানলার ওপর বসে দুটো কাক একমনে দেখছে বিন্দুবাসিনীকে। তারা খুব চিন্তিত ভঙ্গিতে কিছু একটা আলোচনা করছে পরস্পরের সঙ্গে। আমরা কাকের ভাষা জানি না, কিন্তু তারা যে বিন্দুবাসিনী সম্পর্কেই কথা বলছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই মেয়েটিকে ক'দিন আগেও তারা কত উচ্ছলা-চঞ্চলা দেখেছিল, আজ সেই মেয়েটি একা মাটিতে শুয়ে আছে অশ্রুসজলা হয়ে।

আজ বিন্দুবাসিনীর একা থাকবারই দিন। আজ একাদশী। এর আগেও তো কত একাদশী গেছে, সাড়ে ন' বছর বয়েসে বিধবা হওয়ার পর থেকে বিন্দুবাসিনী নিয়মিত একাদশী করে আসছে। ক্ষিদের জন্য তার কষ্ট হয় না। একাদশীর দিন না খেয়ে থেকেও সে তার বোনেদের সঙ্গে দৌড়োদৌড়ি করে কত রকম খেলেছে। সকাল বিকেলে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে মুখস্থ করেছে পড়া। মায়ের কাছে সে জাঁক করে বলেছে, একদিন কেন, আমি সাতদিনও উপোস দিতে পারি মা। তুমি দেখতে চাও ? আগেকার দিনে মুনি-ঋষিরা বছরের পর বছর না খেয়ে তপস্যা করতো। মহাভারতের অম্বাও এ রকম তপস্যা করেছিল।

মা হেসে বলতেন, মেয়ে আমার একেবারে গুরু ঠাকুর ! কথায় কথায় বেদ-পুরাণের তুলনা।

বিন্দুবাসিনীর পরের বোন কুন্দমালার তখনো বিয়ে হয়নি, সে বলতো, তুই কার জন্য তপস্যা করবি রে, সেজদি ?

মা বলতেন, তুই চুপ কর, কুন্দ। পরের জন্মে আমাদের বিন্দু শিবের মতন স্বোয়ামী পাবে।

বিন্দুবাসিনী বলতো, রক্ষে কর। আমার আর পরের জন্মে শিবের মতন স্বোয়ামী দরকার নেই, আমি পরের জন্মে পুরুষ মানুষ হবো।

কুন্দমালা আর বিন্দুবাসিনী পিঠোপিঠি বোন। কথায় কথায় টক্কর লাগতো। সে একদিন বলেছিল, জানো মা, প্রত্যেক একাদশীতে সেজদি পাছপুকুরে তিন চারবার ডুব দিয়ে আসে। সেজদি ডুবে ডুবে জল খায়।

বিন্দুবাসিনী রাগ করে বলেছিল, কী অখাদ্য কথা! পাছপুকুরে শ্রীভদ্দর গাড়োয়ান গোরু-মোষ চান করায়, আমি সেই জল খেতে যাবো? ওয়াঃ!

মা বলেছিলেন, তুই থাম তো কুন্দ! কড়ে রাঁঢ়ী, একাদশীর দিন জল খাবে কী? ওকথা শুনলেও অকল্যাণ হয়।

কুন্দমালা বয়েসের তুলনাতেও বেশী ছেলেমানুষ। বৈধব্যের দুঃখ সে ঠিক বুঝতো না। শ্বশুরবাড়ি নামক একটা অচেনা জায়গায় থাকবার বদলে দিদি যে আবার বাবা-মায়ের কাছে ফিরে এসেছে, এটাকে সে একটা সুখের বিষয় জ্ঞান করতো।

সে বলেছিল, অমন একাদশী আমরাও করতে পারি, মা! পরের দিন দিদির কত খাতির! কত রকম মেঠাই, সন্দেশ, পেস্তার সরবৎ....

বিধুশেখর-জায়া হেসে ফেলে কুন্দর মাথায় একটা চাপড় মেরে বলেছিলেন, এ মেয়েটা আমার একেবারে হাবা! পরক্ষণেই তাঁর চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু চিকচিক করে ওঠে। বিন্দুবাসিনীর দিকে তাকিয়ে তিনি দীর্ঘশ্বাস গোপন করেন।

কুন্দমালাকে বৈধব্য যাতনা সহ্য করতে হয়নি। যথা সময়ে তার বিয়ে হয় উত্তরপাড়ার জমিদারদের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে সে সব সময় মায়ের কাছে আসবার জন্য কান্নাকাটি করতো। দয়ালু শ্বশুরকে ভুলিয়ে সে চলেও এসেছিল বেশ কয়েকবার। তারপর তার বারো বছর বয়েসে তাকে পাকাপাকিভাবে চলে যেতে হলো এবং সাড়ে চার মাস ধরে জমিদারগিন্নী সাজবার প্রাণপণ চেষ্টা করে সে হঠাৎ-ই মরে গেল একদিন। বছর না ঘুরতেই তার সৌভাগ্যবান স্বামী প্রচুর যৌতুক সমেত আর একটি অষ্টম বর্ষীয়াকে ঘরে আনলো। পৃথিবী থেকে একেবারে বিলীন হয়ে গেছে কুন্দমালা।

বিন্দুবাসিনী তার বৈধব্যকে কখনো গ্রাহ্য করেনি। ছোটখাটো জিনিস থেকেই সুখ খুঁজে নেবার একটা প্রবণতা ছিল তার স্বভাবের মধ্যে। তার চরিত্রের নির্মল তেজস্বিতার জন্য কেউ কখনো খবরদারি করেনি তার ওপরে। কিন্তু হঠাৎ এ কী হলো? যেন একদিন সহসা ঘুম ভেঙে জেগে উঠে তার বাড়ির লোক আবিষ্কার করলো, সে আর বালিকাটি নেই, সে এখন স্ত্রীলোক। আর সেইজন্যই সে এখন থেকে আর ইচ্ছে মতন চলাফেরা করার স্বাধীনতা পাবে না, এমনকি এই বাড়ির মধ্যেও না।

বিধবা হবার বছর তিনেক বাদে বিন্দুবাসিনী একবার ভয় পেয়েছিল, যেদিন সে রক্ত দর্শন করে। রজঃস্বলা হওয়ার ব্যাপারটা সে জানতো না। জানবেই বা কী করে, সাধারণত বিবাহিতা বালিকাদের বয়স্থা ননদ-ভাজরাই ঐ সব গূঢ় কথা জানিয়ে দেয়। বিন্দু তো ওদের সঙ্গে থাকেনি। ভয় পেয়ে বিন্দুবাসিনী লুকিয়ে ছিল নিজের ঘরে, ভেবেছিল তার কোনো কঠিন অসুখ হয়েছে, এবার কুন্দমালার মতন সে-ও মরে যাবে। টানা দেড়দিন বিন্দুবাসিনী ঘরের বার হয়নি।

শেষ পর্যন্ত তার মায়ের কানে খবর যায়। বৃহৎ সংসার, সৌদামিনীর সঙ্গে তাঁর সন্তানদের প্রতিদিন দেখাও হয় না। স্বামীর সেবাতেই তিনি ব্যস্ত থাকেন, সন্তানদের তত্ত্বাবধানের ভার দাস-দাসীর ওপর। খবর পেয়ে তিনি এসে মেয়েকে এক পলক দেখেই আসল ব্যাপারটি বুঝেছিলেন। বিন্দুবাসিনীর পিঠে হাত বুলিয়ে তিনি বলেছিলেন, পাগলী আমার, এইজন্য বুঝি নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে শুয়ে থাকতে হয়? এতে ভঁয়ের কী আছে? মেয়েমানুষের অমন হয়। ভগবান মেয়েমানুষদের যেমন ভাবে গড়েছেন, তেমনি তো হবে!

যে মেয়েরা স্বামীকে ভালো করে চিনবার আগেই বিধবা হয়, ঋতুমতী হয় তারাও, প্রকৃতির এমনই আশ্চর্য বিধান!

সেদিন থেকে বিন্দু মেয়েমানুষ হয়েছিল, কিন্তু স্ত্রীলোক হয়নি। কেন না, তখনো খর্ব করা হয়নি তার স্বাধীনতা। তারপরও সে পুকুর পাড়ে গিয়ে গাছে চড়েছে, ভর দুপুরবেলা ভূত-তাড়ানি খেলা খেলেছে, আবার পুঁথিপত্তর নিয়ে আচার্য মশাইয়ের কাছে পাঠ নিতেও গেছে। মা কখনো বড়জোর সস্নেহ ভর্ৎসনায় বলেছেন, অত আর দস্যিপনা করিস না, বিন্দু। মেয়েমানুষের একটু নরম সরম হতে হয়। আদালতে বেরুবার মুখে কিংবা ফেরবার সময় বিধুশেখর কতদিন দেখেছেন সিঁড়ি দিয়ে দুদ্দাড়

করে নেমে যাচ্ছে বিন্দুবাসিনী কিংবা নীচের দালানে বসে গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে তর্ক করছে, তিনি সকৌতুকে হেসেছেন। বিন্দুবাসিনী তার পিতার মুখে কখনো কঠোর কথা শোনেনি।

মাত্র সেই এক শনিবার সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেল। আচার্য মশাই বললেন, তিনি আর বিন্দুবাসিনীকে পড়াবেন না। কারণ, বিন্দু স্ত্রীলোক হয়ে গেছে। বিন্দু পরে হিসেব করে দেখেছে, সেই দিনটিতে তার বয়েস হয়েছিল চোদ্দ বছর সাত মাস এগারো দিন। ঠিক চোদ্দ বছর সাত মাস এগারো দিনের দিনই এই দুনিয়ায় সব মেয়েরা স্ত্রীলোক হয়ে যায় ? সেই রাতে বিধুশেখরও গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, মা বিন্দু, তুমি আর নীচতলায় যখন তখন যেও না। পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে তোমার আর পাঠ নেবারও দরকার নাই, তাতে লোকাপবাদ হবে। ভগবত পাঠ করতে শিকোচো, চণ্ডী শিকোচো, তাই যথেষ্ট। এখন বড় হয়েচো, এবার জনার্দনের পাদপদ্মে মন দাও।

রাগে অভিমানে বিন্দুবাসিনীর ইচ্ছে হয়েছিল নিজের শরীরটাই কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলতে। সে কেন স্ত্রীলোক হলো ? ঈশ্বর কেন এত নিষ্ঠুর যে তার বয়েস বাড়িয়ে দিলেন ?

বিধুশেখরের মুখের কথাই আদেশ। পরদিনই বিন্দু দেখলো তার ঘর থেকে সব বইপত্র উধাও হয়ে গেছে। কয়েক খণ্ড মহাভারতের হাতে লেখা পুঁথি, আর শ্রীরামপুরে ছাপা কিছু বাঙলা সংস্কৃত বই সংগ্রহ করেছিল বিন্দু, সেগুলি ছিল তার প্রাণাধিক প্রিয় ! সেগুলি হারিয়ে সে যেন নিঃস্ব হয়ে গেল।

বিধুশেখরের নীতিজ্ঞান অতি কঠোর। কুলশ্রেষ্ঠ কুলীন ঘরে জন্মেও তিনি একাধিক দার পরিগ্রহ করেননি। সন্ধ্যেবেলা ল্যাণ্ডো হাঁকিয়ে তিনি বারযোষিৎ সংসর্গের জন্য বের হন না কোনোদিন। আবাল্য সুহৃৎ রামকমল সিংহ কয়েক বার কূটকৌশল করেও পারেননি বিধুশেখরকে তাঁর স্ফূর্তির স্থানে নিয়ে যেতে। অবশ্য বিধুশেখরও পারেননি রামকমলকে পণ্যা রমণী-গমন থেকে নিবৃত্ত করতে।

দুই বন্ধুর ব্যক্তিত্বে বৈপরীত্য অনেক। রামকমল সিংহ দুর্বল ও উদার, বিলাসী ও পরনির্ভরশীল। তাঁর সবচেয়ে বেশী নির্ভরতা ভাগ্যের ওপরে। অপর দিকে বিধুশেখর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও হিসেবী, তাঁর ললাট ও চিবুকে রয়েছে আত্মবিশ্বাসের ধারালো রেখা। খাদ্য-পানীয়ে অসংযমের জন্য রামকমলের শরীর, মধ্যবয়েসে পৌঁছোবার আগেই, শিথিল ও মেদবহুল। বিধুশেখর জীবনে কখনো সুরা স্পর্শ করেননি, এবং তাঁর ঋজু দীর্ঘ শরীরখানি এখনো তলোয়ারের মতন ঝকঝকে। সুরার কারণেই বিধুশেখর রামমোহন রায়ের ওপর চটা। রামমোহন সুদূর ইংলণ্ডে দেহরক্ষা করার পরই এদেশে তাঁর নামে অনেক সোরগোল ওঠে। জীবিতকালে যারা রাজার বিরোধী ছিল, তারাও অনেকে এখন মত বদলে নিয়েছে। কিন্তু বিধুশেখর তাঁর মতবাদ থেকে এখনো টলেননি। কোনো মজলিসে রামমোহনের প্রসঙ্গ উঠলে সবাই যখন তাঁর প্রশস্তি শুরু করে, তখনো বিধুশেখর জিবে আফসোসের শব্দ করে বলেন, কিন্তু রাজা ভদ্রসমাজে মদের স্রোত বহায়ে দেওয়াটা ভালো কর্লেন কি ? আমার বিবেচনায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের এমত ব্যবহার উচিত হয় না। রাজা নিজে সেয়ানা ছিলেন, অল্প পানে সংযম রক্ষা কত্তেন, কিন্তু অপরে তাহা পারে কি ? রাজা ফেসিয়ান চালু করে দিলেন, এখন দেখ পথে পথে মুক্তকচ্ছ মাতালরা গড়াগড়ি যায়।

রামকমল এ সব শুনে হাসতে হাসতে বলেন, বিধু, তুমি তো এ রসের মর্ম বুঝলে না ! একদিন না হয় বোতল টেনে গড়াগড়ি করেই দ্যাকো না ! দেকবে, তাতেও সুখ আচে !

হাত নেড়ে রামকমলের কথাটা নিতান্ত তুচ্ছভাবে অগ্রাহ্য করে বিধুশেখর অপ্রসন্নমুখে বলেন, তোমরা যত ইচ্ছে রাজার গুণগান কত্তে চাও করো, আমি তাঁকে সমর্থন করতে পারি না। সংস্কৃতকে হেয় করে রাজা যে ম্লেচ্ছ বিদ্যা চালু করে গেলেন, তার ফল ভালো হবে বলতে চাও ? দু'পাত ইংরিজি পড়েই ছেলেগুলান বাপ-পিতেমোর অবাধ্য হয়ে যাচ্চে। কী কুক্ষণেই যে রাজার সঙ্গে ঐ খরগোশটার বন্ধুত্ব হলো !

অন্য একজন তখন বলেছিল, বিধুভায়া, ঐ ইংরিজির জন্য তুমিও তো বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় কচ্চো !

• • •

কয়েক বছর আগে আদালতে সরকারীভাবে ফার্সীর বদলে ইংরেজি চালু হয়েছে। বিধুশেখর ফার্সীতে কৃতবিদ্য ছিলেন, ইদানীং এক ফিরিঙ্গি শিক্ষক রেখে কাজ চালানো গোছের ইংরেজি শিখে নিয়েছেন।

এত গরমিল সত্ত্বেও কোনো এক অনির্দেশ্য কারণে বিধুশেখর ও রামকমলের মধ্যে এক গভীর

অন্তরের টান রয়েছে। সুখে-সঙ্কটে, আপদে-আহ্লাদে দু'জনে সব সময় পাশাপাশি থাকেন। বিষয়কর্মের ব্যাপারে বিধুশেখরের পরামর্শ ছাড়া রামকমল এক-পা চলেন না। সমবয়েসী হলেও রামকমলের প্রতি বিধুশেখরের ব্যবহার অনেকটা অনুজের মতন। অনেক দিন আগে বারানসী থেকে আগত এক জ্যোতিষী বলেছিল, রামকমল সিংহ অল্পায়ু হবেন। সেই জ্যোতিষী-উক্ত নির্দিষ্ট সময় সীমা পার হয়ে এসেও রামকমল এখনো বেঁচে-বর্তে আছেন যদিও কিন্তু একটা সিরসিরে মৃত্যুভয় প্রায়ই তাঁর বুকে এসে ধাক্কা মারে। সেইজন্য তিনি আগে থেকেই বন্ধুকে বলে রেখেছেন, আমি চক্ষু মুদলে তুই-ই তো আমার সংসারের ভার লবি, বিধু। যে ক'দিন আছি, তোর বকলমাতেই আছি।

সত্যই, রামকমলের সংসারের বিলি ব্যবস্থার ভার অনেক দিনই বিধুশেখরের হাতে। সিংহ-বাড়িতে কোনো দাস-দাসীর চুরি করা ধরা পড়লেও সালিশীর জন্য বিধুশেখরের ডাক পড়ে। বিধুশেখরেরও এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে সময় পেলেই তিনি ও বাড়িতে চলে যান। ও বাড়ির বৈঠকখানায় তাঁর জন্য পৃথক আলবোলা রাখা আছে। তাঁর স্ত্রী সৌদামিনী মাঝে মাঝে অনুযোগ করেন, তুমি তো বন্ধুর সংসার নিয়েই মেতে আচো, নিজের সংসারের ভালোমন্দ কিছুই দেকো না!

এ অনুযোগ অসত্য। নিজের সংসারের প্রতিও যে বিধুশেখরের তীক্ষ্ণ নজর আছে, তার প্রমাণ তিনি দেন সঠিক সময়ে। যেমন বিধবা কন্যা বয়স্থা হয়েছে বলে একদিনেই তিনি তার যথেচ্ছ ঘোরাঘুরি এবং পড়াশুনো বন্ধ করে দিলেন।

বিধুশেখর নিজে নির্দেশ দিয়েছেন, একাদশীর দিন বিন্দুবাসিনী যেন কোনো অব্রাহ্মণের মুখ না দেখে। বাড়িভরা দাস-দাসী। বাইরের লোকেরও সব সময় আনাগোনা, সেইজন্য ঐ দিনটা সর্বক্ষণ ওর পক্ষে ঠাকুরঘরে থাকাই শ্রেয়।

আগে কখনো বিন্দুবাসিনীর এমন খিদে পায়নি, এত তেষ্টা পায়নি। ক্ষুধা তৃষ্ণা ছাড়িয়েও তার শরীরে জ্বলতে থাকে রাগ। সেই রাগে তার চোখ দুটি বন-বিড়ালীর মতন ঝকঝক করে!

একাদশীর দিন বিন্দুবাসিনী আগে পড়াশুনো নিয়ে ভুলে থাকতো। বিশেষত এই দিনটি ছিল মুগ্ধবোধ মুখস্থ করার পক্ষে আদর্শ। কঠিন ব্যাকরণের নিয়মের মধ্যে মন নিবিষ্ট করে রাখলে মন আর অন্য কিছু চিন্তা করার সুযোগ পায় না। এখন বিন্দুবাসিনীর সারাদিনব্যাপী এক আগ্রাসী শূন্যতা।

গঙ্গানারায়ণও আর সেইদিন থেকে বিশেষ আসে না। শিবরাম আচার্যের কাছে সেও পাঠ নেওয়া বন্ধ করেছিল, তারপর আচার্যমশাই তো পাকাপাকিভাবে চলে গেলেন শ্রীরামপুরে। কখনো সখনো গঙ্গানারায়ণ এলেও নীচতলা থেকে ওপরে ওঠে না। এ-বাড়িতে তার অবারিত দ্বার। সে কি ওপরে এসে দেখা করে যেতে পারে না বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে? অকৃতজ্ঞ! এখন সে তার সহপাঠী বন্ধুদের নিয়েই মত্ত। অথচ এক সময় লাজুক মুখচোরা ছিল, বিন্দুবাসিনী ছাড়া আর কারুর সঙ্গে ভালো করে মিশতেই পারতো না। আজকাল সে নিশ্চয়ই লুকিয়ে চুরিয়ে মদ খায়, তাই ভয়ে বিন্দুবাসিনীর কাছে আসে না। বিন্দুবাসিনী সংবাদ প্রভাকরে পড়েছিল, হিন্দু কালেজের সব ছাত্রই নাকি ইদানীং মদ খেয়ে দেখানো-পনা করে। অথচ গঙ্গানারায়ণ বিন্দুবাসিনীকে ছুঁয়ে শপথ করেছিল যে সে কখনো সুরা পান করবে না। না রাখতে পারলে তেমন শপথ করা কেন? বিন্দুবাসিনী তক্কে তক্কে আছে, গঙ্গানারায়ণকে একদিন না একদিন তো সামনাসামনি পাবেই, সেদিন সে গায়ের ঝাল ঝেড়ে নেবে।

গঙ্গানারায়ণ আগে বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে তর্ক করতো, এখন মাঝে মাঝে সে এ-বাড়িতে এসে বিধুশেখরের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে মাতে। এখন তার মুখে দিব্যি বোল ফুটেছে। রামকমল সিংহকে সে অতিরিক্ত সমীহ করে বলে তাঁর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না। কিন্তু বিধুশেখরের সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই তার খুব সহজ সম্পর্ক। বিধুশেখর এক সময় নিজের মেয়েদের সঙ্গে গঙ্গানারায়ণকেও বসিয়ে কত স্তোত্র মুখস্থ করিয়েছেন। শৈশবে কতদিন কোলে কাঁধে নিয়ে আদর করেছেন ওকে। আজ সেই বিধুশেখরের সঙ্গে গঙ্গানারায়ণ নাস্তিকতা বিষয়ে আলোচনা করে।

রামকমল সিংহ বিষয় তদারকীতে আবার মফঃস্বলে গেছেন। এদিকে গঙ্গানারায়ণের সহপাঠী বন্ধুর কনিষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহ হবে ফরাসডাঙ্গায়, সেখানে যাবার জন্য বন্ধুরা সবাই তাকে পেড়াপেড়ি করছে খুব। এ ব্যাপারে জননী বিম্ববতীর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়াই যথেষ্ট নয়, তাই গঙ্গানারায়ণ এসেছিল বিধুশেখরের মতামত জানতে।

বিধুশেখর আপত্তি করলেন না। তবে যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ নেবার পর

সিদ্ধান্ত জানালেন যে ও বাড়ির গোমস্তা দিবাকরও তার সঙ্গে যাবে। ব্যাপারটা গঙ্গানারায়ণ খুব পছন্দ না করলেও মেনে নিতে হলো।

কথায় কথায় বিধুশেখর গঙ্গানারায়ণেরও বিবাহ প্রসঙ্গ তুললেন। হাসতে হাসতে বললেন, অন্যের বে'র নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াচ্ছিস, এবার তো তোর বে'টাও দিতে হয় রে, গঙ্গা। আর তো দেরি করা যায় না। বয়েস কত হলো?

গঙ্গানারায়ণ লজ্জায় মাথা নিচু করে রইলো।

বিধুশেখর বললেন, দাঁড়া, আমিই হিসাব করে বলে দিই। ভাদ্র মাসে জন্ম, তাহলে এই ভাদ্রে হলো গে...কত? সতেরো! অ্যাঁ? ষোলো পার হয়ে গেছে। এখনো বে হয়নি! লোকে বলবে কি? তোর বাপেরও যেমন হুঁস নেই, সবই আমার ওপর চাপায়! কন্যেপক্ষ তাড়া দিচ্চে, এখনো দিন ধার্য হলো না! গত সালে তো ওদের বাড়িতে কালাশৌচ গ্যালো, তারপর তো এক বচর পার হয়ে গ্যাচে, যায়নি? আফসোস করিসনি, এই শীতেই তোরটা লাগিয়ে দেবো!

আফসোস কি, গঙ্গানারায়ণের মনের মধ্যে গুনগুন করছে প্রতিবাদ, কিন্তু সেটা সে মুখ ফুটে বলতে পারবে না।

—বে'টা হয়ে গেলে তারপর তুই বিষয়কম্মে লেগে পড়। কালেজ-টালেজ আর যেতে হবে না। যা হয়েচে, যথেষ্ট হয়েচে!

গঙ্গানারায়ণ চমকে উঠলো। বিধুশেখর বিন্দুবাসিনীর পড়াশুনো বন্ধ করে দিয়েছেন। এবার কি তার পড়াও বন্ধ করতে চান? এর প্রতিবাদ করতেই হবে, চোখ-কান বুজে না হয় বিয়েটা করে ফেলা যাবে। বিয়ের সঙ্গে কলেজ ছাড়ার সম্পর্ক কী?

—খুড়োমশাই, আমার যে এখনো দু' ক্লাস পড়া বাকি আচে?

—যা হয়েচে যথেষ্ট হয়েচে! ইংরেজিতে অ্যাসে লিখতে শিখিচিস, বলতে কইতে শিখিচিস, আর কালেজে গিয়ে কী হাতি ঘোড়া শিখবি? না উট্‌কো লোকদের মতন তোকে চাকরি খুঁজতে হবে?

গঙ্গানারায়ণ জানে যে এ ব্যাপারে বিধুশেখরের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। উনি যদি এক কথায় না বলে দেন, তাহলে আর সে কথা ফেরাবার উপায় থাকবে না। সে অনুনয়ের পথ নিল।

—আপনি অনুমতি দিন, খুড়োমশাই। আমি আরও দু' বছর পড়বো।

—শোন গঙ্গা, আমার যখন চোদ্দ বছর বয়েস, তখন আমি শেরউড সাহেবের সেরেস্তায় কাজ নিয়িচিলুম। তখন থেকে রোজগার করি। তোর বাপ রামকমলের বয়েস যখন পনেরো, তখন থেকেই সে হাজার হাজার টাকার কারবার করে। আর তোর বয়েস এখন সতেরো, আজও তুই ছাড়া গোরুর মতন ঘুরে ঘুরে বেড়াস।

—আপনাদের আমলে তো লেখাপড়ার এত রেওয়াজ ছিল না।

—আমরা তোদের চেয়ে কম লেখাপড়া করিচি বলতে চাস?

—আজ্ঞে না! আপনারা নিজে নিজে শিক্ষিত হয়েচেন। খুড়োমশাই, আপনি যদি রিচার্ডসন সাহেবের লেকচার শুনতেন, তাহলে বারবার না গিয়ে কিছুতেই থাকতে পারতেন না।

—রিচার্ডসন? সেই মাতালটা? তার ওপর ছেলেদের পড়াবার ভার! স্কুল সোসাইটি যে ওকে এখনো রেখেচে, সেটাই এক কলঙ্ক!

—না, না, উনি এখন নেই। মান্দ্রাজ চলে গেছেন।

—হাঃ হাঃ হাঃ! তাহলে আর টান কিসের? শোন বাবা, আমি সত্যি কথাটা বলি। তোদের ঐ কালেজী শিক্ষা যে ছেলেগুলানের মাথা বিগড়োচ্চে, এ আমার মোটেই পছন্দ হয় না। ধর্মশিক্ষা ছাড়া আবার মানুষের শিক্ষা হয় না কি? সাদা খরগোশটা যেদিন থেকে খয়েরি হলো, সেদিন থেকেই দেশের সর্বনাশ শুরু হলো।

—সাদা খরগোশ? ও, হেয়ার সাহেব!

—তুই এসেছিলিস ঘড়ির ব্যবসা করতে, তাই কর। সাহেবসুবো লোক, তোর অত নেটিবদের সঙ্গে মেলামেশা করারই বা কী ঠ্যাকা? দিশী লোকদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যই বা তোর অত মাথা ব্যথা কেন? এ-দেশের লোক নিজের ভালো বোঝে না? হেয়ার যেদিন নিজের ঘড়ির ব্যবসা তুলে দিল গ্রে সাহেবের হাতে, সেদিন এক ইংরিজি কাগজে লিখেছিল, ওল্‌ড হেয়ার টার্নড গ্রে। লেখাপড়া তো লবডঙ্কা, আসলে নাস্তিকতা প্রচারের চেষ্টা। আমি বুঝি না? থাক ওসব কতা। আমরা তো বুড়ো হচ্চি, এখন তো তুই আমাদের একটু দায়দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিবি। কোন্‌দিন চোখ বুজবো....তোর

বাপ যা বিষয়সম্পত্তি রেখে যাবে, তাতে তোদের কয়েক পুরুষ অন্তত ইংরেজের গোলামী কত্তে হবে না....তবে আর ঐ ইংরেজের শিক্ষা নিয়ে অত মাতামাতি কেন ? আস্তে আস্তে কাজ বুঝে নে...

এইসব কথা যখন হচ্ছিল, তখন দোতলার বারান্দা থেকে শুনছিল বিন্দু। বাবা গঙ্গারও পড়াশুনো বন্ধ করে দিতে চান শুনে তার আনন্দ ও বিষাদ দু'রকমই বোধ হচ্ছিল। এক সময় সে দেখলো, গঙ্গা ম্লান মুখে বেরিয়ে যাচ্ছে, একবারও ওপর পানে চাইলো না।

ঠাকুরঘরের মেঝেতে শুয়ে শুয়ে বিন্দুর এই রকম নানা কথা মনে পড়ে। কিছুতেই তার ঘুম আসে না। তার মনে হয়, সে যেন বিশ্ব পরিত্যক্ত। অসহ্য তৃষ্ণায় গলাটা খরখর করে। বুকটা যেন যে-কোনো মুহূর্তে ফেটে যাবে। জানলায় বসে দুটি কাক অবিশ্রান্তভাবে ডেকে যাচ্ছে। সেই কা-কা ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। বিন্দুবাসিনী মুখখানা উঁচু করতেই তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগলো। কেন সে কাঁদছে, জানে না।

কান্নারও সীমা আছে। নির্জন ঘরে বসে কেউ তো অবিশ্রান্তভাবে কেঁদে যেতে পারে না। এক সময় বিন্দু চোখ মুছলো। তারপর সে দেখলো মেঝেতে কয়েকটি জলের ফোঁটা। কোনো কিছু না চিন্তা করে বিন্দু লোভীর মতন সেই জল চাটতে লাগলো। ক' ফোঁটা তো জল, জিভটাও ভিজলো না তাতে, শুধু একটু নোনতা স্বাদ। তবু পরক্ষণেই বিন্দু আঁচল দিয়ে ঘষে ফেললো জিভটা। তার কি পাপ হলো ? একাদশীর দিন সে জল খেয়ে ফেলেছে। নিজেরই চোখের জল, তা খেলে কী পাপ হয় ?

—বিন্দু ! বিন্দু !

বিন্দুবাসিনী আমূলভাবে চমকে উঠলো। কে ? কে ডাকছে তাকে ? খানিকটা চেনা, খানিকটা অচেনা কণ্ঠস্বর। এ সময় কোনো পুরুষমানুষ তো তাকে ডাকবে না।

বিন্দু ধড়মড় করে উঠে জানলার সামনে দাঁড়ালো। এ জানলা দিয়ে বাইরের পথ দেখা যায় না। এদিকে তাদের বাগান, গোয়ালঘর আর একটু দূরে পুকুর। পুকুর ধারের জামরুল গাছটা থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো ফুলের রেণু ঝরে পড়ছে, এদিকে কেউ নেই।

দরজা খুলে বিন্দু বাইরে এলো। সিঁড়ির কাছে এসে উঁকি মারলো নীচে। কেউ নেই, সব সুনসান। বিধুশেখর বাড়িতে নেই, ইচ্ছে করলে সে এখন নীচে যেতে পারে। কিন্তু তার অভিমান আছে, সে যাবে না।

ঠাকুরঘরে ফিরে আবার শুয়ে পড়তেই বিন্দু ফের শুনতে পেল সেই ডাক। এবার আর একটু ব্যাকুল গলায়, বিন্দু ! বিন্দু !

এই দারুণ নিদাঘের মধ্যেও বিন্দুর সারা শরীরে যেন শীতের অনুভূতি হলো। প্রতিটি রোমকূপে সেই স্পর্শ ঠিক এক ঝলক। বিন্দু চিনতে পেরেছে কণ্ঠস্বর। এ তো অঘোরনাথ। কতদিন আগে, মনে হয় যেন বহু যুগ আগে, রাজপুর গ্রামে ঐ রকম গলায় যেন একজন ডাকতো বিন্দুকে। মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরা, খালি গা, গোরাদের মতন গায়ের রঙ, মাথায় বাবরি চুল, চোদ্দ বছর বয়েসের এক কিশোর। ঐ চেহারাটাই শুধু মনে আছে বিন্দুর। ঐ চেহারা, ঐ কণ্ঠস্বর তার স্বামী অঘোরনাথের। গাছে চড়ায় ওস্তাদ ছিল অঘোরনাথ। পেয়ারা গাছের মগডালের ওপর দাঁড়িয়ে সে তার বালিকা বধূর দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতো পাকা পেয়ারা।

সে ডাকছে ? কিন্তু সে তো নেই। বিন্দু নিজে দেখেছে, মাত্র দেড়দিনের ভেদবমিতে তাকে ছটফটিয়ে মরে যেতে। সে কি ফিরে এসেছে বিন্দুর টানে, সে কি বিন্দুকে নিয়ে যেতে চায় মৃত্যুর অদৃশ্যলোকে। বিন্দু ভয় পেয়ে মুখ ঢেকে ফেললো। তার ইচ্ছে করলো, ছুটে গিয়ে মায়ের কোল ঘেঁষে শুয়ে পড়তে। ছেলেবয়েসে যেমন যেত। কিন্তু তীব্র অভিমান তার ভয়কেও ছাপিয়ে গেল। সে আবার কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

এই কান্নাও আবার এক সময় থামে। এবার আর সে নিজের অশ্রু পান করলো না, বরং জ্বলন্ত চোখে তাকালো জনার্দন মূর্তির দিকে। এক বিঘৎ পরিমাণ সোনার মূর্তি, শিল্পীর কারিগরিতে তার ওষ্ঠাধর সব সময় হাস্যময়। যে মানুষ বা যে মূর্তি সব সময় হাসে, তার মতন নিষ্ঠুর বুঝি আর কিছু হয় না। বিন্দুর সারা শরীরে বেরুচ্ছে ক্রোধের ছটা। সে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলো সেই মূর্তির দিকে।

অঘোরনাথ ডাকলেই বা বিন্দু কেন তার সঙ্গে যাবে মৃত্যুর অদৃশ্যলোকে ! বাবা বলেছেন, এখন

থেকে জনার্দনই তার স্বামী। বিন্দু ফুলমালার স্তুপ থেকে সেই মূর্তিটা তুলে নিল হাতে।

বিন্দু একবস্ত্রা। তার উরসে যৌবন সবে দৃশ্যমান হয়েছে। সেই কোমল, উষ্ণ, স্বর্ণাভ যৌবনময় বুকে কঠিন স্বর্ণমূর্তিটি চেপে ধরে বিন্দু ব্যাকুল গলায় বললো, তুমি আমায় কী দেবে ? ঠাকুর, বলো, কী দেবে তুমি আমায় ?
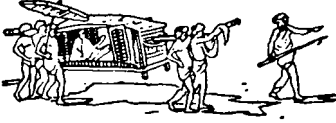
শহরটি প্রায় স্পষ্ট দুভাগে ভাগ করা। হুগলী নদীর ধার ঘেঁষে যেখানে পুরোনো কেল্লা ছিল, সেই অঞ্চলেই শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদের ঘনবসতি। গ্রেট ট্যাঙ্ক বা লাল দীঘির দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকে সাহেবদের সুন্দর সুন্দর বসত বাড়ি। এর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে কোর্ট হাউস স্ট্রিট নামে একটি প্রশস্ত রাস্তা। আর একটু দক্ষিণে গাছপালা ঘেরা চৌরঙ্গি এবং বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোডের পাশে পাশেও কয়েকটি বাগানবাড়ি রয়েছে ধনী সাহেবদের। নতুন কেল্লা তৈরি হয়েছে গভীর জঙ্গল সাফ করে এবং লড়াইয়ের সুবিধের জন্য রাখা হয়েছে অনেকখানি ফাঁকা ময়দান। তার নাম এসপ্লানেড। এই এসপ্লানেড শব্দটির মানেই হচ্ছে দুর্গ এবং নগরীর অট্টালিকা শ্রেণীর মাঝখানের জায়গা।

আদিবাসীদের পল্লী মোটামুটি শহরের উত্তরাঞ্চল জুড়ে। পাদ্রী, শিক্ষক ও কিছু কিছু দোকানদার ছাড়া অন্য সাহেবরা এই নেটিভপাড়ায় বেশী আসে না। অবশ্য ধনী নেটিভবাড়ির উৎসবে নিমন্ত্রণে সাহেবরা আসে মাঝে মাঝে। বেলগাছিয়ায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের রূপকথাতুল্য প্রমোদ ভবনে নেমন্তন্ন পাবার জন্য রাজপুরুষেরা পর্যন্ত লালায়িত হয়ে থাকে। নেটিভদেরও সাহেবপাড়ায় যাবার বিশেষ কোনো বিধিনিষেধ নেই যদিও, কিন্তু বিনা কাজে কেউ চট করে ওদিকে যেতে ভয় পায়। সন্ধ্যের পর গড়ের মাঠে মাতাল গোরারা দিশী লোকদের মেরে হাতের সুখ করে নেয়, এমন জনশ্রুতি আছে। কলকাতা থেকে যারা কালীঘাটে তীর্থ করতে যায় তারাও অন্ধকার নামবার আগেই বেলাবেলি ফিরে আসে অথবা রাত্রিবাস করে সেখানেই।

বউবাজার পার হয়ে লালবাজার দিয়ে সাহেবপাড়ায় ঢুকতে গেলেই প্রথমে চোখে পড়ে সুপ্রিম কোর্ট ভবনটির সুউচ্চ চূড়া। উপনিবেশ স্থাপনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আদালতের প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজ চমকে দিয়েছে ভারতবাসীকে। ন্যায়ের প্রতি আনুগত্য ইংরেজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং একথা ইংরেজ সগর্বে প্রচার করে। দিশী লোকদেরও ধারণা হয়ে গেছে যে ইংরেজ রাজত্বে সুবিচার পাওয়া যায়। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসীর স্মৃতি লোকের মন থেকে মুছে গেছে। সেও তো প্রায় ষাট সত্তর বছর আগেকার ঘটনা।

ইংরেজ দেশটা শাসন করলেও এখনো পর্যন্ত পাকাপাকি সনদ নিয়ে এদেশের রাজা হয়ে বসেনি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষটা ইজারা নিয়েছে, কিন্তু তাদের কার্যকলাপের জন্য মাঝে মাঝে বৃটিশ পার্লামেন্টের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। এদেশেও তাদের ব্যবহার অতি সতর্ক। নেটিভদের সঙ্গে পরামর্শ না করে ইংরেজ চট করে কোনো সামাজিক নীতি বদল করে না। প্রথম দিকে ক্ষৌরকার, ঝাড়ুদার, খানসামা, দালাল ও ফড়ে শ্রেণীর কিছু কিছু লোক সাহেবদের সংস্পর্শে এসে দু-চারটি ইংরেজি শব্দ শিখতে শুরু করে। সাহেবরা তাদের দিয়েই কাজ চালাতো। এখন সম্ভ্রান্ত, সম্পন্ন ঘরের লোকেরাও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং তাদের মাধ্যমে সাহেবরাও জানতে পারছে যে এ দেশটা শুধু কুৎসিত, কদর্য চেহারার নির্বোধ মানুষেই ভরা নয়, এদেশে আছে সুদীর্ঘকালের জ্ঞান-সম্পদ এবং আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এদেশের কোনো কোনো অতি দরিদ্র মানুষও বিনা কারণে অহংকারী হতে পারে।

আরও একটি ব্যাপার জানতে পেরে সাহেবদের আত্মশ্লাঘায় খানিকটা গোপন ঘা লেগেছে। অনেক সাহেব যেমন নেটিভদের স্পর্শ করতে ঘৃণা করে, তেমনি অনেক নেটিভও ঘৃণায় সাহেবদের ছোঁয় না কিংবা দৈবাৎ ছুঁয়ে ফেললেও গঙ্গায় স্নান করে আসে। আমি যাকে পায়ের তলায় রাখতে চাই এবং রাখতে পারি, সে কাতরভাবে আমার কাছে দয়া ভিক্ষা করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে যদি বিনা

প্রতিবাদে পায়ের তলায় শুয়ে থাকে এবং মনে মনে আমাকেও তার পায়ের তলায় রাখে, তাহলে সুখটা ঠিক সম্পূর্ণ হয় না।

যাই হোক, ভয় বা ঘৃণার চেয়ে ইংরেজদের সম্পর্কে এখন ভক্তি ভাবটাই অবশ্য বেশী প্রবল। কয়েক শতাব্দীর অরাজকতায় জনসাধারণ একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থায় পৌঁছেছিল। নবাবী আমল উচ্ছন্নে গেছে বলে কারুর মনে কোনো খেদ নেই। তখনকার জঘন্য অত্যাচারের স্মৃতি এখনো মানুষের মনে সজাগ। সিরাজ-উদ্দৌল্লা, মীরকাশীম, প্রতাপাদিত্য ইত্যাদি নামগুলি ভবিষ্যতের নাট্যকারদের হাতে গৌরবান্বিত হবার অপেক্ষায় আপাতত ইতিহাসের অবহেলিত অন্ধকার কক্ষের দলিল দস্তাবেজে নিহিত। এখন লোকের চোখে ওরা নারীলোলুপ, রক্তশোষণকারী এবং দস্যু। লম্পট এবং দস্যুরা যে এখনো নেই তা নয়, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে এখন নালিশ করা যায়। এবং সুবিচারও দুর্লভ নয়। ক্ষেত্রমণি নাম্নী একটি নাবালিকার ওপর পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগে সুবিখ্যাত বসাক পরিবারের সন্তান হরগোবিন্দর সম্প্রতি কারাদণ্ড হয়েছে। এমন কথা কয়েকশো বছরের মধ্যে কেউ শোনেনি। যার পিতার লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি আছে, সে কি না সামান্য একটি দরিদ্র বালিকার কারণে জেল খাটে! মাত্র কিছুদিন আগেও তো বিশ তঙ্কায় ওরকম একটি ক্রীতদাসী পাওয়া যেত।

ইংরেজের এই ন্যায়বিচারের প্রতীক ঐ সুপ্রিম কোর্টের চূড়া। লোকে এই পথ দিয়ে যাবার সময় ভক্তিভরে সেদিকে তাকায়। এখনো কেউ জানে না যে বিচার ব্যবস্থার এই আড়ম্বর ইংরেজ জাতির একটি বিলাসিতা মাত্র। প্রয়োজনের সময় এসব বিলাসিতা ছেঁটে ফেলতে তারা একটুও দ্বিধা করে না।

কোনো এক পর্ব উপলক্ষে আজ আদালতের ছুটি। সুপ্রিম কোর্ট ভবনের সিঁড়িতে একজন মধ্যবয়স্ক গ্রাম্য মানুষ তার স্ত্রী ও দুটি শিশু পুত্রকন্যা নিয়ে বসে আছে। তারা ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত এবং বিভ্রান্ত। পাঁচদিন পাঁচ রাত তারা হেঁটেছে, তারপর নৌকোয় হুগলী নদী পার হয়ে আজই দুপুরে পৌঁছেচে আর্মেনিয়ান ঘাটে। ওপরে উঠে কলকাতা শহরের রূপ দেখে তারা হতভম্ব হয়ে গেছে। একসঙ্গে এত সারিবদ্ধ পাকা বাড়ি তারা কখনো দেখেনি, দেখেনি এত বিচিত্র রকমের পোশাক পরা মানুষজন। এমনকি এর আগে স্বচক্ষে কোনো গোরা সাহেব দেখার সৌভাগ্যও হয়নি তাদের।

লোকটির নাম ত্রিলোচন দাস, স্ত্রীর নাম থাকোমণি, ছেলেটি ও মেয়েটির নাম দুলালচন্দ্র ও গোলাপী। ওরা এসেছে কুষ্টিয়ার ভিনকুড়ি গ্রাম থেকে। ত্রিলোচন বংশানুক্রমে রায়ত, চাষবাস ছাড়া কিছুই জানে না। পর পর দু বছরের আকালে সে বড়ই বিপাকে পড়েছিল। কয়েকদিন আগে তার বসতবাড়ি পুড়ে যাওয়ায় সে সর্বস্বান্ত হয়েছে। এই পরিবারটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাম্প্রতিকতম অবদান।

ত্রিলোচন দাস জানতেই পারেনি কবে তার জমিদার বদল হয়ে গেছে। সে জানে আকাশে কোন্ জাতের মেঘ উড়লে বৃষ্টি হয়, কখন ধানে পোকা লাগে, নদীতে কখন ষাঁড়াষাঁড়ির বান আসে। সে আকাশ, মাটি, রোদ, বৃষ্টি, নদী ও গাছপালার খবর রাখে, সে জানে না দেশ কাকে বলে, সে জানে না জমিদাররা কীভাবে বদলায়। তবে, সে এইটুকুও জানে যে জমিদারকে খাজনা না দেওয়াটাই বড়ই পাপের কথা। মুখের রক্ত তুলেও জমিদারের খাজনা মিটিয়ে দিতে হয়। পর পর দু বছর আকাল হলে কেঁদে পড়ে জমিদারের হাতে পায়ে ধরতে হয়। পাইক-বরকন্দাজের কাছ থেকে সে সময় কিছু উত্তম মধ্যম জোটে বটে, কিন্তু কিছু একটা ব্যবস্থাও হয়ে যায়।

এবার সে দেখলো নতুন একজন নায়েবকে এবং সঙ্গে নতুন পাইক বরকন্দাজদের। এবং সে শুনলো যে তাকে তিনগুণ খাজনা দিতে হবে। সে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলো না। তাদের গ্রামে দু-পাঁচঘর বামুন কায়েত ছাড়া আর সবাই চাষী। সব চাষীরই এক অবস্থা। কেউ কিছুই বুঝলো না। খাজনা না পেলে পাইক-বরকন্দাজরা জোরজুলুম করে লোকের ঘর থেকে ঘটিবাটি কেড়ে নিতে লাগলো। ত্রিলোচন দাসের ঘরে সেরকম বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না বলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো তার বাড়িতে। সেই আগুনের পাশে দাঁড়িয়েই নায়েবমশাই তামাক টানতে লাগলেন। ত্রিলোচন তার পা ছুঁতে গেল, তিনি পা ছাঁটা দিয়ে বললেন, আরে ছুঁসনি, ছুঁসনি। ব্যাটা ভগবানকে ডাক গিয়ে। ভগবান ছাড়া কেউ তোদের আর বাঁচাতে পারবে না।

আগে জমিদার অত্যাচারী, অর্থপিশাচ হলেও প্রজারা জানতে পারতো সেই মানুষটা কেমন। সেইসব জমিদার নিজেদের স্বার্থেই আকালের বছর চাষীকে ধান দাদন দিত। কারণ, চাষীকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে না রাখলে পরের বছর সে চাষ করবেই বা কী করে আর জমিদারের ঋণই বা শোধ হবে কীভাবে। মরা মানুষের কাছ থেকে তো খাজনা আদায় করা যায় না। কিন্তু এখন অবস্থা অন্যরকম

হয়ে গেছে। চাষীর কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে না পারলে জমিদারেরাও ঠিক সময়ে নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে পারতো না ইংরেজ কোম্পানির ভাঁড়ারে। তার ফলে লর্ড কর্নওয়ালিশ করে দিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। জমিদাররা যেভাবে হোক, যত ইচ্ছে হোক খাজনা আদায় করুক, বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিতে হবে কোম্পানিকে। বারবার জমিদারি হস্তান্তরে কোম্পানির ক্ষতি হয়। কোম্পানি নির্দিষ্ট টাকা পেলে আর জমিদারদের ব্যাপারে মাথা গলাবে না।

ফলে জমিদারির প্রতি আকৃষ্ট হলো নতুন ধনীরা। নুন, কাপড় এমনকি বোতলের ছিপির কারবার করে যারা হঠাৎ বড়লোক হয়েছিল, তারাও টপাটপ মহালের পর মহাল কিনে জমিদার হয়ে বসলো। খাজনা বাড়াবার অধিকার তাদের, যেমন করে হোক খাজনা আদায়ের অধিকারও তাদের। এই সব নতুন জমিদাররা বসে রইলো কলকাতায়, প্রজাদের সঙ্গে তাদের চাক্ষুষ দর্শনও হলো না, কর্মচারীরা টাকা আদায় করে আনতে লাগলো। নতুন জমিদাররা হর্ম্যমালা নির্মাণ করতে লাগলো শহরে এবং ডুবে রইলো বিলাসিতায়।

আধুনিকতম বিলাসিতা হলো সংস্কৃতি চর্চা। প্রজা নিপীড়নের টাকায় সঙ্গীত, শিল্প এবং ধর্ম সংস্কারের খুব হুজুগ দেখা দিল। এদিকে কর্মচারীরা খাজনা আদায় করতে না পারলে ছোট চাষীদের উচ্ছেদ করে সেই জমি খাস করে দিতে লাগলো বড় চাষীদের। বাঙলায় শুরু হলো ভূমিহীন কৃষকশ্রেণীর উদ্ভব। তাদের মধ্যে অনেকে আবার জীবিকার সন্ধানে আসতে লাগলো শহরে। কলকাতার দিকে প্রবাহিত হতে লাগলো অবিরাম এক জনস্রোত। আমাদের এ ত্রিলোচন দাস সেই নতুন ভূমিহীনদের একজন।

ইদানীং প্রজা-নিগ্রহের নানারকম কাহিনী বৃটিশ শাসকদের কানে পৌঁছেচে, এমনকি খোদ বিলেতেও সে খবর গেছে। তাই প্রজাদের তত্ত্বতল্লাশ করার জন্য জেলায় জেলায় পাঠানো হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট। জমিদাররাও নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য স্থাপন করেছে ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি। অ্যাসোসিয়েশন, সোসাইটি, সভা, সংবাদপত্র ইত্যাদি ইওরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ আলোকপ্রাপ্ত নেটিভরাও সত্বর ব্যবহার করতে শিখে নিয়েছে।

ত্রিলোচন দাস কোনোদিন ভগবানকে দেখেনি, সাধারণ মানুষ কখনো তাঁর দেখাও পায় না। কিন্তু তার ধারণা ছিল, খুব চেষ্টা করলে কোনোক্রমে জমিদারের দেখা পাওয়া যেতেও পারে। এই বংশানুক্রমিক বিশ্বাস তার মধ্যে বদ্ধমূল ছিল যে, কেঁদে পায়ে পড়তে পারলে জমিদারের দয়া হবেই। লাথি মারুন আর কয়েদ বেড়ি করেই রাখুন, নিজের প্রজাকে তিনি শেষ পর্যন্ত ফেলতে পারবেন না। কর্মচারীদের শরীরে দয়া মায়া থাকে না, কিন্তু হাজার হোক জমিদার একজন মানী লোক।

ত্রিলোচন দাসের ক্ষুদ্র কল্পনাশক্তিতে জমিদার বাড়ির একটাই ছবি ফুটে ওঠে। ছোট ছোট অনেক বাড়ির মধ্যে একটি বিশাল প্রাসাদ, সেখানে লোহার ফটক আর সেই ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে মাথায় পাগড়ি বাঁধা শান্ত্রী। কলকাতা শহরটিকেও সে সেইরকমই কল্পনা করে রেখেছিল। গিয়েই জমিদার বাড়ি দেখতে পাবে।

কিন্তু এখানে যে শয়ে শয়ে জমিদারবাড়ি। এখানে রাস্তায় বহু লোকের মাথায় পাগড়ি। এখানে কেই কারুকে চেনে না। এবং ত্রিলোচন দাস তার জমিদারের নামও জানে না। সে মাত্র শুনেছিল যে তার জমিদার প্রভু থাকেন কলকাতায়।

ভিড়ের মধ্যে দিশেহারা হয়ে গিয়ে ত্রিলোচন তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে এদিক ওদিক দৌড়েছে। যেখানেই একটু বসতে গেছে, অমনি লোকের তাড়া খেয়েছে। শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছে এখানে। ছুটির জন্য আদালত পাড়া ফাঁকা।

সুপ্রিম কোর্ট ভবনটিকেও ত্রিলোচন দাসের জমিদার বাড়ি বলেই মনে হয়, কিন্তু ভেতরে জনমনিষ্যি নেই। ত্রিলোচন এদিক ওদিক উঁকিঝুঁকি দেবারও সাহস পায়নি। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, এই নিরালাতেই তারা রাতটা কাটিয়ে দেবে ঠিক করেছে। কাল কী হবে, তার কিছুই জানে না। বাচ্চা দুটো ঘ্যান ঘ্যান করছে অনেকক্ষণ থেকে, থাকোমণি একগলা ঘোমটা দিয়ে বসে আছে, জেগে আছে না ঘুমোচ্ছে, বোঝা যায় না।

একটু অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁক ঝাঁক মশা এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মশা তো নয় যেন চড়ুই পাখির বাচ্চা। ত্রিলোচন দাস ঝপাঝপ করে চড় চাপড় চালাচ্ছে নিজের গায়ে। থাকোমণির এতেও হুঁশ বোধ নেই। পুঁটুলীটাতে মাথা দিয়ে ত্রিলোচন দাস শুয়ে পড়লো।

বাবা মা দু'জনকেই চুপচাপ হয়ে যেতে দেখে বাচ্চা দুটো কান্না আরও বাড়িয়ে দিল। ছেলেটির

থেকে মেয়েটির গলার জোর আরও বেশী। বিরক্ত হয়ে ত্রিলোচন দাস দু-জনের পিঠে কয়েকখানা বিরাশী সিক্কার কিল বসিয়ে দিল। এইবার নড়ে উঠলো থাকোমণি। হাত দিয়ে ছেলেমেয়ে দুটিকে আড়াল করে সে ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো, মেরোনি! মেরোনি বলচি! ভাত দেবার মুরোদ নেই, কিল মারার গোঁসাই!

ত্রিলোচন দাস বললো, চিঁড়ে গেলে না কেন? চিঁড়ে গিলতে বলো। ফের কাঁনলে আমি ঠেঙিয়ে শেষ করবো।

থাকোমণি বললো, আমাদের ক্যান নে এলে হেথায়? আমাদের ভিনকুড়ি ফিরে দে এসো।

গ্রাম ছেড়ে আসবার জন্য ত্রিলোচন দাস নিজেও এখন মনে মনে আফসোস করছে বটে, কিন্তু সেকথা স্বীকার করবে কেন। সে মুখঝামটা দিয়ে বললো, ভিটে মাটি চাঁটি হয়ে গিয়েছে, সেথায় থাকবে কি গাছতলায়?

এর উত্তরে থাকোমণি জানতে চায় যে এখানেই বা কোন্ রাজবাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আর উত্তর না দিয়ে ত্রিলোচন দাস রাগে গরগর করে। সে নিরীহ চাষী, নিজের স্ত্রী ছাড়া আর কারুর ওপর সে রাগ দেখাবার সুযোগ পায়নি কখনো।

দুটি বড় পুঁটলির মধ্যে রয়েছে তাদের যথাসর্বস্ব। বেশ কিছু চিঁড়ে আর পাটালি গুড়ও এনেছে সঙ্গে করে। ক'দিন ধরে ক্রমাগত শুকনো চিঁড়ে চিবুতে চিবুতে ছেলেমেয়ে দুটির গাল ছিঁড়ে গেছে। তারা আর চিঁড়ে খেতে চায় না, ভাত চায়। বিদেশ বিভুঁয়ে এসে ত্রিলোচন দাস ভাত জোটাবে কোথা থেকে।

একটু পরে ছেলেমেয়েরা খিদের জ্বালায় সেই চিঁড়ে গুড়ই খেয়ে নিলো খানিকটা। ছেলেটা সিঁড়ির ক'-ধাপ নেমে গিয়ে ছড়ছড় করে পেচ্ছাপ করে দিল সুপ্রিম কোর্টের দেয়ালের গায়। ফিরে এসেই বললো, জল খাবো।

ত্রিলোচন দাস বললো, হারামজাদ!

ছেলেটা তবু নাকি নাকি গলায় বলতে লাগলো, জঁল খাঁবো। জঁল খাঁবো!

মেয়েটা হেঁচকি তুললো একবার।

থাকোমণি বললো, আমারও তেষ্টা নেগেছে। সারারাত কি গলা শুঁষিয়ে থাকবো!

ত্রিলোচন দাস তিতিবিরক্ত হয়ে উঠলো। আবার একথাও বুঝলো যে এর পর থেকে ওরা অনবরত তাকে জল জল করে জ্বালিয়ে খাবে।

চিঁড়ে আর গুড় আনা হয়েছে দুটো মাটির হাঁড়িতে। একটা বোঁচকা খুলে একটা কাঁথার ওপর চিঁড়েগুলো সব ঢেলে, হাঁড়িটা খালি করে নিয়ে ত্রিলোচন দাস উঠে দাঁড়ালো। আসবার সময় কাছেই সে একটা বড় দীঘি দেখে এসেছে।

থাকোমণি বললো, দুলালকে সাথে নে যাও!

কিন্তু ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে না ত্রিলোচন দাসের। সে আর কিছুই না বলে হন হন করে হাঁটতে লাগলো।

শুক্লপক্ষ, তাই আকাশের আলো আছে, পথঘাট খুব অন্ধকার নয়। কিন্তু একটুখানি এসেই থমকে গেল ত্রিলোচন দাস। যদি পথ ভুল হয়ে যায়? পেছন ফিরে একবার দেখে নিয়ে সে সাবধানে আস্তে আস্তে চলতে লাগলো, প্রতিটি পদক্ষেপ গুণে গুণে। গ্রাম দেশে মাঠের মধ্যে আলেয়া দেখে পথ হারিয়ে ফেললে এই রকম পা গুণে গুণে হাঁটতে হয়।

দীঘিটার এক পারে বসে কয়েকটা শিয়াল মন দিয়ে ডাকছে তারস্বরে। আর একটা কী যেন বড় জানোয়ার খানিকটা দূরে খুব জোরে জোরে ভর-র ভস ভর-র ভস করে নিশ্বাস নিচ্ছে। কয়েকটা বগি গাড়ির ঘোড়া ঘাস খেতে এসেছে ওখানে, কিন্তু অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় দূর থেকে ত্রিলোচন দাস সেগুলোকে চিনতে পারলো না। তার গা ছমছম করতে লাগলো। রাশি রাশি জোনাকি বাতাসের ঝাপটায় কখনো আলো কখনো অন্ধকারের ঢেউ হয়ে দুলছে।

পুকুরে নেমে প্রথমেই জল থাবড়ে পানা সরানো অভ্যেস ত্রিলোচন দাসের। এ দীঘির জল স্বচ্ছ টলটলে, ইংরেজদের খুব সাধের গ্রেট ট্যাঙ্ক বা "লাল ডিগি", তারা এর জল পান করে না বটে কিন্তু ছুটির দুপুরে ছিপ ফেলে বসে অথবা সন্তরণ প্রতিযোগিতায় নামে। হঠাৎ কোথাও আগুন লাগলে এই জল ব্যবহার করা হবে বলে দীঘিটি সংরক্ষিত। নেটিভদের এখানে আসা নিষেধ।

হাঁটু পর্যন্ত নেমে জল থাবড়ে ত্রিলোচন দাস প্রথমে মুখ ধুয়ে ভালো করে কুলকুচো করলো

খানিকক্ষণ। নিজে জল পান করলো পেট ভরে। তারপর হাঁড়ি ভরে জল নিয়ে যেই উঠতে গেছে, অমনি রে রে করে তেড়ে এলো দুই যমদূত।

ইংরেজ রাজত্বের পাহারাওয়ালা হলেও তাদের চেহারা ও পোশাক অনেকটা নবাবী আমলের সেপাইদের মতন। মোচ আর জুলফি একসঙ্গে জোড়া। গাঁজার নেশায় চোখ টকটকে লাল। নিশুতি রাতে সাহেবপাড়ার মধ্যে এই দীঘিতে একজন হাবিজাবি চেহারার লোককে নামতে দেখে তারা যত না ক্রুদ্ধ তার চেয়ে বেশী অবাক। দুজনে মিলে ত্রিলোচন দাসের ঘাড় চেপে ধরে এমন হল্লা শুরু করে যে ত্রিলোচন দাস কিছুই বুঝতে পারে না। তারপর পিঠের ওপর দুম দাম শুরু হলে সে ভাবে এই বুঝি জমিদারের পেয়াদা এসেছে। তাতে সে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয় এবং এই গোলমালের মধ্যে মাটির হাঁড়িটা তার হাত থেকে পড়ে ভেঙে যায়।

মাতাল ধরার জন্য পাহারাওয়ালারা এখন সঙ্গে ডুলির মতন একটা জিনিস রাখে। কোনো মাতাল বেশী বেগড়বাঁই করলে সেই ডুলির মধ্যে ভরে প্রায় বোঁচকার মতন বেঁধে ফেলে ঝুলিয়ে নিয়ে যায়। ত্রিলোচন দাসের পা সোজা আছে দেখে তারা ওকে ডুলিতে না ভরে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে চললো।

ত্রিলোচন এবার কেঁদে কঁকিয়ে বলে উঠলো, ওগো আমার বউ ছেলে মেয়ে সঙ্গে আছে, তাদের নিয়ে আসি। ওগো—

কে শোনে কার কথা। ততক্ষণে পাহারাওয়ালাদ্বয় ত্রিলোচন দাসের ট্যাঁক হাতড়ে দেখে নিয়েছে যে সেখানে কিছু নেই, সুতরাং তারা আরও নির্দয় হয়ে তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল কোতোয়ালির দিকে। ত্রিলোচন দাস যত চিৎকার করে তারা তাকে তত বেশী প্রহার করে।

এদিকে থাকোমণি পক্ষীমাতার মতন দুই ডানায় ছেলে মেয়েকে আগলে বসে রইলো ঠায়। প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল, তার স্বামী এলো না। সে আর কী করবে, শুধু প্রতীক্ষা করা ছাড়া? শেয়ালগুলো ডাকতে ডাকতে তাদের কাছে চলে আসছে। এক সময় দূরে দু-তিন বার গুড়ুম গুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ হলো। কিসের যেন একটা শোরগোল উঠলো। এ সব কিছুতে থাকোমণির সর্বাঙ্গে ভয়ের কাঁটা দেয়। সাহেবদের বাড়ির বাগানে শেয়াল ঢুকে পড়লে সাহেবরা জানলা দিয়ে বন্দুক চালায়। দু-একটা শেয়াল মরলে উল্লাসের ধুম পড়ে যায়।

জল জল করে ছেলে-মেয়ে দুটো বেশ কিছুক্ষণ কাৎরে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়লো। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়লো আর মেয়েটা হেঁচকি তুলতে লাগলো। তারপর গীর্জার গম্বুজের আড়ালে চাঁদ ঢলে পড়লে মেয়েটি কয়েকবার ওয়াক তুলে শুরু করলো বমি। থাকোমণি তাড়াতাড়ি মেয়ের মুখ চাপা দিল নিজের হাতে। কিন্তু ওতে ভেদবমি থামে না। এর নাম ওলাওঠা।

শহরে এমন কোনো বাড়ি নেই যে বাড়িতে অন্তত একজন না একজন ওলাওঠায় মরেনি। তবু গ্রামের তুলনায় শহর নিরাপদ। শহরে বিলিতি দাওয়াই পাওয়া যায় এবং পয়সা দিলে চিকিৎসক বাড়িতে আসে। সে চিকিৎসকদের মুখ চোখ দেখলেই খানিকটা ভক্তি হয়। গ্রামে একবার ওলাবিবির নজর লাগলে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। ওলাওঠার ভয়ে বহু লোক গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এসে কলকাতায় আশ্রয় নিতে শুরু করেছে। গ্রাম থেকে যখন ভোর হতে লোকে পালায়, তখনও বারবার ভয়ে ভয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখে, ওলাবিবি তাড়া করে আসছে কিনা। এই ওলাবিবিই পরে এসিয়াটিক কলেরা নামে চিহ্নিত হয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম মানবধ্বংসকারীর ভূমিকা নিয়েছে।

বমির ফাঁকে ফাঁকে মেয়েটি জল জল বলে গোঙাতে লাগলো। তার ভাই দুলালচন্দ্র জেগে উঠেছে এবং বাবা বাবা বলে ডুকরে উঠলো কয়েকবার। তার বাবা সে ডাক শুনতে পেল না কিন্তু লাঠি ঠকঠকিয়ে এলো আর দুজন পাহারাওয়ালা। এ রকম জায়গায় একজন স্ত্রীলোককে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বসে থাকতে দেখে তারাও অবাক হলো কম নয়। তারা পথের পাহারাওয়ালা, আদালত ভবন পাহারা দেওয়া তাদের দায়িত্ব নয়। এর জন্য দুজন আলাদা সেপাই থাকে। কিন্তু সারাদিন তাদের পাত্তা নেই।

একজন পাহারাওয়ালা চেঁচিয়ে উঠলো, হুকুমদার!

সেই বাজখাঁই গলা শুনে দুলালচন্দ্র আরও জোরে ও বাবা, বাবাগো বলে কেঁদে উঠলো। থাকোমণি বললো, ওগো আমাদের ঘরের লোক কোথায় গেল! মেয়েটা কেমন কেমন করতিছে!

অচেনা স্ত্রীলোকের গলা শুনলে প্রথমে যে বিষয়ে কৌতূহল জাগে সেটি যাচাই করার জন্য পাহারাওয়ালা দুজন উঠে এলো সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ। হাতের জাহাজী লণ্ঠনটা উঁচিয়ে ধরলো থাকামণির মুখের কাছে। থাকোমণিকে যুবতী এবং স্বাস্থ্যবতী দেখে তারা পরস্পর চোখাচোখি করলো এবং এই বিষয়ে এক মত হলো যে, তাহলে একে কোতোয়ালিতে নিয়ে যাবার নাম করে ধরা যায়।

একজন হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, উঠা ! উঠা ! ওঠাকে আ ! রেন্ডি কাঁহিকা।

থাকোমণি আরও সিঁটিয়ে গেল দেয়ালের দিকে। তখন একজন পাহারাওয়ালা তার শাড়ির আঁচল ধরে টানলো, অন্যজন ধরতে গেল তার কোমর।

থাকোমণি বললো, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার মেয়েটারে বাঁচাও !

এবার পাহারাওয়ালাদের আলো পড়লো মেয়েটির ওপরে। মেয়েটি তক্ষুণি ওয়াক তুলে হুড় হুড় করে বমি করলো অনেকখানি। এই বমি পাহারাওয়ালা চেনে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে তাদের চোখ উঠলো কপালে।

আর দ্বিরুক্তিমাত্র না করে তারা পেছন ফিরে দৌড় লাগালো। তাদের সেই দৌড়োবার ভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন অবিকল দুটি ল্যাজ তোলা বলীবর্দ।

খানিকটা পরে মেয়েটির কণ্ঠস্বর অনেক ক্ষীণ হয়ে এলো, তখনো বলতে লাগলো, জল, জল।

ছোট বোনের কষ্ট দেখে ছ' বছরের শিশু দুলালচন্দ্র বললো, মা, আমি জল নে আসবো ?

দ্বিতীয় হাঁড়িটা খালি করে নিয়ে সে এগিয়ে গেল খানিকটা। কোন্ দিকে সে দীঘিটা দেখেছিল, ঠিক ঠাহর করতে পারলো না। তার ভয় করছে। তার ক্ষুদ্র বুকটিতে দারুণ অভিমান জন্মেছে বাবার ওপরে। কেন বাবা ফিরে এলো না। সে আবার প্রাণপণে ডাকলো, বাবা, বাবা !

সেই রিনরিনে শিশুকণ্ঠের ধ্বনি ঠিকরে ফিরে এলো শহরের কঠিন বাড়িগুলির দেয়াল থেকে। কেউ সাড়া দিল না। একটা বলগা ছাড়া একলা ঘোড়া এদিকে কপকপিয়ে ছুটে আসতেই সে ভয় পেয়ে দৌড়ে ফিরে এলো মায়ের কাছে। তার মা বললো, থাক, তোকে আর যেতি হবে না।

কথায় বলে, মাঝ রাতের ভেদবমি রাত শেষ হবার আগেই থেমে যায়। হলোও তাই। খানিক পরে মেয়েটি একেবারে নেতিয়ে গেল। সে ঘুমিয়েছে ভেবে একটু নিশ্চিন্ত হলো তার মা।

চাঁদ হেলে গেছে। আকাশে এখন খেলা করছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। এতক্ষণ অসহ্য গরমের পর শেষ রাতে ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসছে। এখন পৃথিবী কী শান্ত, সুন্দর। ভোগী, চোর এবং সাধু, যারা রাত জাগে, তারাও এই শেষ প্রহরে ঘুমকে আলিঙ্গনে জড়ায়। থেমে গেছে নর্তকীর পায়ের নূপুর। মাতালরাও এতক্ষণে গড়াগড়ি দিয়েছে। ঘুমন্ত নগরীর ওপর বিছিয়ে রয়েছে এক অনৈসর্গিক সৌন্দর্যের ওড়না।

থাকোমণি আর দুলালচন্দ্রও ঘুমিয়ে পড়েছিল এক সময়। দিনের আলো ফুটে গেলেও ঘুম ভাঙলো না।

ক্রমে পথে লোক চলাচল শুরু হলো। সাহেবরা এ দেশে এসে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়। আগে জেগে ওঠে তাদের নফর, বেহারা, খানসামা, দুধওয়ালা, ভিস্তিওয়ালার দল। যাতায়াতের পথে তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগলো।

পবিত্র ধর্মাধিকরণের সিঁড়িতে ছড়ানো রয়েছে চিঁড়ে, গুড়, ছেঁড়া কাঁথা। তার মধ্যেই শুয়ে আছে এক গ্রাম্য স্ত্রীলোক ও বালক। আর পাশেই বছর পাঁচেকের একটি বালিকা পুরীষ ও বমিতে মাখামাখি হয়ে মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। তার মুখের ওপর ভন ভন করছে নীল ডুমো ডুমো মাছি।

ধুড়ুম করে বিরাট শব্দে সাতটার তোপ পড়তেই থাকোমণি ধড়ফড় করে উঠে বসলো। সামনেই কিছু লোককে সারবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিল তার মৃত কন্যাকে।

থাকোমণিকে খুব সহজে স্থানচ্যুত করা গেল না। একেই তো গ্রাম্য রমণীর জেদ, তার ওপর ভয়ে ও পরাজয়ে সে একেবারে মরীয়া হয়ে উঠেছে। দেখতে দেখতে কৌতূহলী পথচারীদের ভিড় বাড়তে লাগলো, ওলাবিবির শিকার দেখে কেউ অবশ্য খুব কাছে আসছে না, কিন্তু তাদের কথাবার্তা ক্রমেই

উচ্চগ্রামে উঠছে। কেউ বলছে, এই মাগী, উঠে আয়! কোথায় বসিচিস খেয়াল নেই! এখুনি কোঁৎকা খাবি! কেউ বলছে, মুদ্দোফরাস ডেকে এখুনি সাফ করে দাও, নইলে সাহেবরা দারুণ ক্ষেপে উঠবে। কেউ বলছে, মত্তে আর জায়গা পেলে না। এখন মহল্লা সুদ্ধু রোগ ছড়াবে। কেউ এক মুঠো কড়ি ছুঁড়ে দিয়ে বললো, রক্ষে করো মা, ওলাবিবি, রক্ষে করো!

সব ভিড়ের মধ্যেই একজন আলাদা মানুষ থাকে। সে বললো, আহা রে, ছেলেটারও মুখ শুকিয়ে গ্যাচে, ওকেও রোগে ধরলো বোধহয়। এই ছেলে, পালা, এখনো পালা!

দুলালচন্দ্র এত লোক দেখে ঘাবড়ে গিয়ে তার মায়ের হাঁটু ধরে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে।

ঝমাঝম শব্দে বড় ঝাঁটার আওয়াজ করতে করতে এগিয়ে এলো দুজন ঝাড়ুদার। তাদের পেছনে পেছনে গাঁজাখোর চৌকিদার। সেই চৌকিদার শেষ রাতে ফিরে তার ঝুপড়িতে ঘুমিয়ে ছিল, কিছুই টের পায়নি। এখন সে শুরু করে দিল দারুণ হল্লা।

সুপ্রিম কোর্টের বারান্দায় এরকম একটা নোংরা ঘটনা অকল্পনীয় হলেও কী করে যেন ঘটে গেছে। চতুর্দিকে চিঁড়ে, গুড়, ছেঁড়া কাপড় আর বমি ছড়ানো, তার মধ্যে এক মৃত বালিকা।

—এই নিকালো, আভি নিকালো। কাঁহা কা বেহুদা।

জঙ্গল থেকে লোকালয়ে ছিটকে আসা কোনো বন্যপ্রাণী যেমন এক কোণে বসে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে, থাকোমণিও সেই রকম রোঁয়া ফুলিয়ে রইলো। বুকের ওপর শক্ত করে চেপে ধরে আছে তার মরা মেয়েকে।

ঝাড়ুদারদ্বয় সিঁড়ির ওপর দু চার ধাপ উঠে আবার হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে একটি নীতিগত আপত্তি তুললো। তারা মুর্দা ছোঁবে না, তাদের কাজ শুধু ঝাড়ু দেওয়া। তাছাড়া কোন্ না কোন্ জাতের মড়া তার কি কোনো ঠিক আছে? তারা থাকোমণি এবং তার দুই বাচ্চা সমেত খানিকটা জায়গা বাদ দিয়ে ঝাঁটা চালিয়ে প্রস্থান করলো।

মুদ্দোফরাসকে খবর দিয়ে নিয়ে আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে যাবে, তাই চৌকিদার দৌড়ে গিয়ে দুজন মেথরানীকে ধরে আনলো। এই মেথরানীরা এ শহরে রীতিমতন প্রতাপশালিনী। এদের মধ্যে যারা সাহেবপাড়ায় শৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখার ভার পেয়েছে, তাদের উপার্জন বেশ ভালোই। সকালে সন্ধ্যায় এরা সাহেবদের পুরীষের পাত্র মাথায় করে বয়ে নিয়ে গিয়ে পুণ্যসলিলা গঙ্গায় ঢেলে ফেলে দিয়ে আসে। বাকি সময়টা এদের ছুটি। এরা রঙীন ডুরে শাড়ি পরতে ভালোবাসে। এদের সরু কোমর, ভারী বুক এবং জিভগুলি ছুরির মতন। এদের জিভকে ভয় পায় না এমন মানুষ মেলা দুষ্কর। এরা পথেঘাটে নোংরা বইবার সময় মানুষজনকে ছুঁয়ে দিলেও, এবং প্রায়ই দেয়, তার কোনো সুরাহা নেই।

মেথরানী দুজন সিঁড়ির ওপর উঠে পর্যায়ক্রমে থাকোমণি, জনতা এবং চৌকিদারকে উদ্দেশ করে দুর্বোধ্য ভাষায় ঝড়ের বেগে কী যেন বলে গেল। যেন ওরা সবাইকে ধমকাচ্ছে। সেই সঙ্গে তাদের রঙীন শরীরে খেলে যাচ্ছে নানা তরঙ্গ। এমতপ্রকার রমণীদের কণ্ঠের ঝাল-বাক্যও দূর থেকে বেশ উপভোগ্য হয়। তাই বেশ কৌতুক পেয়ে গেল জনতা। থাকোমণি এবং তার মৃত শিশুর বদলে মেথরানী দুটিই তখন প্রধান লক্ষ্যবস্তু হলো।

হঠাৎ সকলের কণ্ঠ আবার থেমে গেল একসঙ্গে। পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে এক সাহেব। ইনি এই আদালতের প্রধান বেইলিফ, খুব কাছেই থাকেন। এঁর নাম অ্যান্ড্রুজ, কিন্তু সাধারণ নেটিভরা এঁকে ইদ্রুস সাহেব বলে ডাকে। ইনি নিষ্ঠুরতার জন্য বিখ্যাত। যে সব সাহেব নেটিভদের ঘৃণায় স্পর্শ করেন না, ইনি তাঁদের দলের নন। এঁর হাতের চড়-চাপড় অনেকেই খেয়েছে। একবার নিজের বাগানের মালির পেটে ইনি এমন লাথি মেরেছিলেন যে, সে লোকটি পরে দেড়দিন ধরে রক্ত বমি করেছিল। সেবার সকলেই খুব প্রশংসা করেছিল ইদ্রুস সাহেবের পায়ের জোরের।

ইদ্রুস সাহেবকে একটি কথাও খসাতে হলো না, তাঁর কটমট চক্ষুতেই কাজ হলো।

মেথরানী দুজন এবার তড়িৎগতিতে ছুটে গিয়ে একজন খপ করে ধরলো থাকোমণির মাথার চুল, অন্যজন মৃত কন্যাটিকে কেড়ে নিতে গেল। শুরু হয়ে গেল ঝটাপটি। তার স্বামী ফিরে না এলে থাকোমণি যে কিছুতেই এখান থেকে উঠতে পারে না, সে কথা কেউ বুঝলো না।

মাতৃস্নেহের শক্তি মেথরানীদের সবল বাহুর তুলনায় কিছুই নয়। অবিলম্বেই তাদের একজন থাকোমণির কোল থেকে মৃত কন্যাটি কেড়ে নিতে সমর্থ হলো এবং দৌড় লাগালো। মেয়েটি যে মারা গেছে সে বোধই এখনো হয়নি থাকোমণির। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। এ কেমন জায়গা, যেখানে

স্বামী জল আনতে গেলে আর ফেরে না, অচেনা লোকেরা দূরে দাঁড়িয়ে হাসে আর ডাকিনী যোগিনীরা এসে কোলের সন্তান কেড়ে নিয়ে যায়!

থাকোমণিও ছুটলো সেই মেথরানীর পিছু পিছু। তার পায়ে পায়ে লেগে রইলো দুলালচন্দ্র। এরপর এক একবার থাকোমণি সেই মেথরানীর কাছ থেকে মেয়েকে কেড়ে নেয়, আর মেথরানী ছিনিয়ে নেয় তার কাছ থেকে। পথের লোক এই দৃশ্য দেখছে, কেউ একটি কথাও উচ্চারণ করছে না। কয়লাঘাটা অঞ্চল পেরিয়ে তারা চলে এলো গঙ্গার ধারে। তিন চারবার কাড়াকাড়ির পর মেথরানীটি এক সময় মৃত শিশুটিকে জোরে আঁকড়ে ধরে খুব দ্রুত দৌড়ে শেষে ঝপাস করে সেটিকে ফেলে দিল নদীতে।

থাকোমণি সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার তাকে তুলে নিয়ে এলো। এবং এবার সে নিজেই ভয় পেয়ে ছুটতে লাগলো বিপরীত দিকে। যেন এইভাবেই ছুটতে ছুটতে এই শহর ছেড়ে সে ফিরে যাবে নিজের গ্রামে।

গঙ্গার পার জুড়ে একটানা শ্মশান। সাধারণ গরীবগুর্বো লোকেরা মৃতদেহ দাহ করে না, জলে ফেলে দেয়। প্রতিদিন নদীর বুকে এরকম অসংখ্য মৃতদেহ ভাসে। অনেকে যথেষ্ট কাঠের অভাবে মৃতদেহ অর্ধদগ্ধ অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়। সেইজন্যই এখানে হাড়গিলে আর শকুনির রাজত্ব। পরিত্যক্ত মৃতদেহ দেখলেই ওরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিশাল বিশাল হাড়গিলেগুলো মাটির ওপর দিয়ে খপাৎ খপাৎ করে লাফিয়ে চলে। এক এক সময় শকুনির দলের সঙ্গে হাড়গিলেদের লড়াই বেঁধে যায়। সে এক রোমহর্ষক দৃশ্য। আর মাঝে মাঝে কেল্লা থেকে যে সময়সূচক তোপ দাগা হয়, সেই শব্দে তারা ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য কালো করে দেয় আকাশ।

চতুর্দিকে মানুষের হাড় আর করোটি ছড়ানো। এখান দিয়ে হাঁটতে গেলে পায়ে হাড় বিঁধে যায় অনেক সময়। মাঝে মাঝে একটুখানি জায়গা সাফ্-সুতরো করে স্নানের ঘাটে যাবার পথ বানানো হয়েছে। সেই সব পথেও অনেক সময় পড়ে থাকতে দেখা যায় মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

গঙ্গার বুকে অসংখ্য জাহাজ। অধিকাংশই কাঠের তৈরি। অতি সম্প্রতি দু' একটি কলের জাহাজ আসতে শুরু করেছে। জাহাজের আনাগোনায় এই জলপথ এখন সদা ব্যস্ত। মাঝে মাঝে জাহাজে জাহাজে ঠোকাঠুকি লাগে, কিংবা ঝড়বাদলের জন্যও, এক একটা জাহাজ হঠাৎ উল্টে যায়। তখন সেই ডুবে যাওয়া জাহাজ সমস্ত মালপত্র সমেত নিলাম হয়, সেই নিলামে ডাক দেবার জন্য বেনীয়া আর শিপ-সরকাররা ভিড় করে জাহাজঘাটায়।

ভিজে কাপড়ে দৌড়তে দৌড়তে থাকোমণিও এক সময় ক্লান্ত হলো। দুলালচন্দ্রও অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। সুতরাং এক জায়গায় বসে পড়ে মা ও ছেলেতে গলা জড়াজড়ি করে কাঁদতে লাগলো।

কাছাকাছি এত শ্মশান, এখানে কারুর কান্নাই বিসদৃশ লাগে না। থাকোমণি বসে আছে একটি স্নানঘাটের পথের পাশে। সে পথ দিয়ে যাবার সময় কিছু কিছু লোক দুটো চারটে কড়ি বা একটা আধলা ছুঁড়ে দিয়ে যাচ্ছে থাকোমণির কোলে। এসব দয়ার দান নয়, স্বর্গলোভীদের পারানি।

মৃত সন্তানকে কোলে নিয়ে শ্মশানে বসে কাঁদছে থাকোমণি, চিৎকার করে আহ্বান জানাচ্ছে তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর উদ্দেশ্যে। এ যেন 'হরিশ্চন্দ্র' পালার এক দৃশ্য। কিন্তু চণ্ডালবেশী ত্রিলোচন দাস হঠাৎ দেখা দিল না, বরং অপরাপর চণ্ডালরা থাকোমণির প্রতি কুদৃষ্টি দিতে লাগলো।

একটু পরেই হুমহাম করে একটি চার বেহারার পাল্কি এসে থামলো সেখানে। পাল্কির দু ধারেই পর্দা ফেলা। বেহারারা পাল্কি একটু মাটিতে রাখতেই এক ধারের পর্দা একটু ফাঁক হলো। সেখান থেকে একটি শিশুকে কোলে করে নেমে এলো একজন দাসী।

পাল্কির মধ্যে বসে রয়েছেন বিম্ববতী। পূর্ণিমা-অমাবস্যায় তাঁর গঙ্গাস্নানে আসা চাই-ই। ইদানীং তিনি ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন। মাত্র দু' বছর বয়েস পেরিয়েছে নবীনকুমার, কিন্তু এর মধ্যেই তার দুরন্তপনার শেষ নেই। সেইজন্য বিম্ববতী এক মুহূর্তও ছেলেকে চোখের আড়াল করতে পারেন না। গঙ্গারঘাটে এনেও স্বস্তি নেই, যেটুকু সময় বিম্ববতী স্নান করতে নামেন একদিন তারই মধ্যে ছেলে দাসীর হাত ছাড়িয়ে জলের দিকে ছুট লাগিয়েছিল। সে কারণে এখন দাসী ছাড়াও পাল্কির পিছু পিছু আসে বাড়ির গোমস্তা দিবাকর এবং একজন পাইক। তারা সর্বক্ষণ নবীনকুমারের ওপর নজর রাখে।

দাসী ও শিশু নেমে যাবার পর বেহারারা আবার পাল্কি তুলে নেমে গেল ঘাটের দিকে। স্ত্রী-পুরুষের

আলাদা ঘাট নেই, যে-যেখানে পারে জলে নামে। বেহারারা লোকজন সরাবার জন্য চেঁচাতে লাগলো, হঠ যাও, হঠ যাও!

নিয়মিত স্নানার্থীরাও বড় বড় বাবুদের বাড়ির পাল্কি দেখে চিনে ফেলে। সিংগী বাড়ির পাল্কি এসেছে দেখে সবাই পথ ছেড়ে দিল। লোকেরা এই রকম ঘেরাটোপ দেওয়া পাল্কি দেখলেই বোঝে যে ভেতরে রয়েছে কোনো সুন্দরী রমণী। তাই তারা সেদিকে তাকিয়ে থাকে উৎসুক চোরা চোখে। যদি দৈবাৎ কখনো পর্দার ফাঁক দিয়ে সেই রূপবতীর দর্শন পাওয়া যায়। অনেক সময় ঠকতেও হয় তাদের। হাওয়ায় পর্দা উড়লো একটু, আর দেখা গেল ভেতরে বসে আছে দোমড়ানো মোচড়ানো চেহারার কোনো তিনকেলে বুড়ি।

পাল্কিসমেত বেহারারা নেমে গেল বুক জলে। তারপর বিম্ববতী সমেত সেই পাল্কি এক একবার করে জলে চুবিয়েই আবার তুলে নিতে লাগলো। গুনে গুনে ঠিক এরকম সাতবার করার পর তারা ডাণ্ডা কাঁধে নিয়ে দাঁড়ালো স্থির হয়ে। এখন একটুক্ষণ বিম্ববতী সূর্য প্রণাম করবেন।

স্বর্ণ প্রতিমার মতন স্থির হয়ে বসে বিম্ববতী যুক্ত কর ঠেকালেন ললাটে। তাঁর মুখমণ্ডলে প্রশান্ত তৃপ্তি। জীবনে তাঁর আর কোনো অপূর্ণতা নেই।

অকস্মাৎ দিকমণ্ডল কাঁপিয়ে পর পর তিনবার তোপের আওয়াজ হলো। নদীতে বান ডাকবে, তার সতর্কতা। বেহারারা চঞ্চল হয়ে উঠলো।

আবার পাল্কি উঠে এলো ওপরে। চিন্তা দাসী নবীনকুমারকে কোলে নিয়ে নদীর দৃশ্য দেখাচ্ছিল, দিবাকরের ডাক শুনে ফিরে এলো পাল্কির কাছে। পর্দা সরিয়ে সে ভেতরে ঢুকবার পর বিম্ববতী জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কে কাঁদে রে?

থাকোমণি চুপ করে গেছে কিন্তু দুলালচন্দ্র তখনো কেঁদে চলেছে। বিম্ববতী সেই কান্না শুনতে পেয়েছেন। কোনো শিশুর কান্না শুনলেই তাঁর বুক কাঁপে। নিজের একটি সন্তান জন্মাবার পর তিনি জগতের সব শিশুর প্রতিই জননীস্নেহ অনুভব করেন এখন।

চিন্তা দাসী বাইরে উঁকি দিয়ে বললো, এক মাগী মেয়ে কোলে নিয়ে পাতর হয়ে বসে আচে, আর তার কচি ছেলেটা কাঁনচে।

বিম্ববতী জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

এর আর কী উত্তর দেবে চিন্তা দাসী! সে ঠোঁট উল্টে বললো, খেতে পায় না বোধহয়।

বিম্ববতীর মুখে একটা পাতলা বেদনার ছায়া পড়লো। এই পৃথিবী এত সুন্দর, তবু এখানে মানুষ এত কষ্ট পায় কেন, কেন লোকে খেতে পায় না? বড়রা তবু না হয় না খেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু শিশুদের অনাহারে রাখা ভারী অন্যায়।

—দিবাকরকে ডাক।

চিন্তা দাসী মুখ বাড়িয়ে দিবাকরকে ডাকতেই সে এসে দাঁড়ালো পাল্কির পাশে। বিম্ববতী প্রত্যক্ষভাবে দিবাকরের সঙ্গে কথা বললেন না, কিন্তু তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, চিন্তে, তুই দিবাকরকে বল, ঐ যে ছেলেটি কাঁদচে, ওকে ওর মাকে আর সঙ্গে যারা আচে, সবাইকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসতে। আমার বেহারাদের যেতে বল, ওরা পরে আসুক।

দিবাকর বললো, যে আজ্ঞে।

বিম্ববতীর পাল্কি চলে গেল, কিন্তু দিবাকর পড়লো মহা বিপদে। রাস্তা থেকে যাকে তাকে তুলে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া এক বাতিক হয়েছে গিন্নীমার।

দিবাকর গিয়ে উবু হয়ে বসলো থাকোমণির সামনে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, অ মেয়ে, ঐ বাচ্ছাটা তো মরে গ্যাচে, ওকে কোলে নিয়ে বসে রোয়েচো কেন? কী হয়েছেল?

জুতো সেলাই থেকে ঠিক চণ্ডীপাঠ না হলেও দলিল দস্তাবেজ পড়া কাজ দিবাকরের। সে সাতঘাটের জল খেয়েছে। সে নানা রকম কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে থাকোমণি আর দুলালচন্দ্রের কাছ থেকে ওদের ঘটনাটা জেনে নিল। দুজন পুরুত এবং কয়েকজন স্নানার্থীকে জুটিয়ে এনে সে একথাও থাকোমণিকে বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হলো যে তার কোলের শিশুটি সত্যিই মরে গেছে। ওকে আর বেশীক্ষণ এমনভাবে ফেলে রাখলে ওর আত্মার অকল্যাণ হবে।

তখন থাকোমণি আর এক প্রস্থ কান্নাকাটি করলো ও কিছু পরে মেয়েকে জলে বিসর্জন দিয়ে এলো। এবং দিবাকরের দয়ালু বাক্যে বিশ্বাস করে তার সঙ্গে সঙ্গে চললো। অবশ্য একথা থাকোমণির

পক্ষে সুদূরতম কল্পনাতেও জানা সম্ভব নয় যে, তার স্বামী ত্রিলোচন দাস যে জমিদার প্রভুর দর্শন মানসে গ্রাম ছেড়ে এই শহরে এসেছিল, এখন সে আর তার ছেলে চলেছে সেই জমিদারেরই বাড়িতে।

জোড়াসাঁকোয় পৌঁছে দিবাকর দেখলো সিংহ বাড়ির সদর দেউড়ির কাছে একজন মোটাসোটা মধ্যবয়স্ক সাহেব দাঁড়িয়ে। হাতে একটি বড় লাঠি। দিবাকর চমকে উঠলো। সে বহুদর্শী লোক। সে এই সাহেবটিকে চেনে। ইনি হেয়ার সাহেব।

পাইক দারোয়ানদের চোখ এড়িয়ে কারুর পক্ষে ভিতরে ঢোকা সম্ভব নয়। অচেনা লোক দেখলে তারা ঘাড় ধাক্কা দেয় কিংবা আগেই কিছু সেলামী আদায় করে। সাহেব দেখে তারা একটু ঘাবড়ে গেছে। সাহেবের কথাও তারা বুঝতে পারছে না কিছুই।

দিবাকর দ্রুত গিয়ে সাহেবের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেললো।

হেয়ার সাহেব চমকে উঠে সরে গিয়ে বললেন, আরে, করো কী, করো কী!

—সার, আপনি এখানে?

হেয়ার সাহেব বললেন, ইহা গঙ্গানারায়ণের বাপের কুঠি? আমি তাহাকে চাই।

এদিকে থাকোমণি আর দুলালচন্দ্র এত বড় বাড়ির দেউড়ি দেখে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভেতরে ঢুকতে চাইছে না। দিবাকর তাদের দিকে ফিরে বললো, এসো, ভিতরে এসো, ভয় কী? গিন্নীমা তোমাদের আশ্রয় দিতে চেয়েচেন, তারপর আর কী কতা! যাও বাছা, ভেতরে যাও!

থাকোমণি আবার কেঁদে উঠলো, আমাদের সে নেই। ওগো, সে মানুষটা আমাদের কোতায় খুঁজে পাবে?

সাহেবের সামনে একটু বিব্রত হয়ে দিবাকর বললো, হবে, হবে, সব হবে, তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে, ভেতরে এসো, গিন্নীমার সঙ্গে কতা বলো।

হেয়ার সাহেবের সব ব্যাপারেই কৌতূহল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইহারা কাঁদে কেন? কী হইয়াছে?

দিবাকর বললো, হাজব্যাণ্ড লস্ট সার, গঙ্গার ঘাটে ক্রায়িং ক্রায়িং আর একটা ছোট মেয়ে, মানে ডটার সার, ডাই দিস মর্নিং··· ভেরী পুয়োর সার—

বাঁ পায়ের ওপর ডান পা রেখে কেষ্ট ঠাকুরের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে হেয়ার সাহেব সব শুনলেন। তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগলো। বয়েস হয়েছে, হেয়ার সাহেব আজকাল মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা একেবারে সহ্য করতে পারেন না।

দুলালচন্দ্র কান্না থামিয়ে হাঁ করে চেয়ে আছে। তার ক্ষুদ্র জীবনে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত রকম ঘটনার বিপর্যয়ে এক দারুণ আলোড়ন চলছে। সকালবেলা সে একটি রক্তচক্ষু সাহেব দেখেছিল, তার সামনে ডাকিনী যোগিনীরা তার মাকে মারছিল। আর এই একজন সাহেব কাঁদছে।

পকেট থেকে রুমাল বার করে হেয়ার সাহেব চোখ মুছলেন। ধরা গলায় বললেন, তোমরা ইহাদের আশ্রয় দিবে? অন্ন দিবে? ভেরি কাইণ্ড—মোস্ট গ্রেসাস···

অন্য পকেট থেকে একটি মুদ্রা বার করে দুলালচন্দ্রের হাতে দিয়ে বললো, লও! কয়েক বৎসর পর একটু লায়েক হইলে আমার নিকট আসিও, আমি তোমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া নিব।

দিবাকর পাইককে বললো, এদের ভেতরে নিয়ে যা। গিন্নীমা এরপর ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। আপনি আসুন সার। এদিকে আসুন। দয়া করে এ বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েচেন···

দিবাকর হেয়ার সাহেবকে নিয়ে এলো বৈঠকখানা ঘরে। সেখানে বিধুশেখর এবং রামকমল আলবোলার নল হাতে নিয়ে বিষমকর্মের আলোচনা করছিলেন। হেয়ারকে দেখে তাঁরা অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দিবাকর পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই তিনি হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, আমি ডেভিড হেয়ার। আপনাদের সেবক।

ঢোলা প্যাণ্ট, আর সাদা লম্বা কোট পরা, মাথার চুলগুলি প্রায় সব পেকে গেছে, তাতে চিরুনির ছোঁয়া লাগে না মনে হয়। প্রশস্ত কপালে তিনটি স্পষ্ট ভাঁজ। বয়েস যথেষ্ট হলেও এখনো বেশ বলশালী চেহারা হেয়ার সাহেবের।

হাতের লাঠিখানা দরজার পাশে রেখে তিনি একটি কৌচে বসে পড়ে বললেন, গঙ্গানারায়ণের খোঁজে আসিয়াছি। সে দুই সপ্তাহ কালেজে যায় না। সে কি ভুগিতেছে?

রামকমল বললেন, না তো, গঙ্গা তো সুস্থই আছে।

হেয়ার সাহেব বললেন, তবে সে কালেজে যায় না কেন?

রামকমল পুনরায় বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, কালেজে যায় না? কই জানি না তো!

বিধুশেখর চুপ করে আছেন। তিনি গঙ্গানারায়ণকে কলেজে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর বিরূপতা জানিয়েছিলেন, গঙ্গানারায়ণ যে তা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়েছে, তিনি জানতেন না। তিনি হেয়ার সাহেবকে এত সামনা-সামনি দেখেননি আগে। এঁর কার্যকলাপ তিনি বিশেষ সুনজরে দেখেন না। বলতে গেলে এঁরই প্ররোচনায় ইদানীং ডাক্তারি শেখার নামে অজাত-কুজাতের মড়া কাটছে হিন্দু ঘরের ছেলেরা। আর এদিকে কলেজে চালাচ্ছেন এক বিজাতীয় শিক্ষা, যেখানে ধর্মের কোনো স্থান নেই। ছেলেগুলি দিন দিন দুর্বিনীত আর উগ্র হয়ে উঠছে। এর ফল কখনো শুভ হতে পারে না।

কিন্তু এ সাহেবের মুখের ওপর তিনি সে ধরনের কোনো কথা বলতে পারলেন না। হাজার হোক সাহেবের জাত তো। তিনি বললেন, গঙ্গানারায়ণের বিবাহ হবে শীঘ্রই, তাই বুঝি সে কালেজে যায় না।

হেয়ার সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আজকাল তাঁর ধৈর্য কমে গেছে। বয়স্ক লোকদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দেখলে তিনি হঠাৎ মেজাজ গরম করে ফেলেন। এরা দুজন জানেই না যে এদের ছেলে কোনদিন কলেজে যায় কিংবা বাড়িতে বসে থাকে।

তিনি মাথা নীচু করে নিজেকে শান্ত করলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, গঙ্গার বিবাহ···খুব ভালো কথা···আমাদের মিঠাই দিতে ভুলিবেন না···কিন্তু সে কয়দিন বিবাহ করিবে, দুই সপ্তাহব্যাপী?

রামকমল বললেন, আজ্ঞা, না। বিবাহের এখনো কিছু দেরি আছে।

হেয়ার সাহেব বললেন, তবে কি বিবাহের চিন্তাতেই সে মজিল? এখন হইতেই কলেজে যাওয়া বন্ধ করিল?

রামকমল ব্যস্ত হয়ে বললো, না, না, কালেজ যাবে না কেন! সে কি কথা! নিশ্চয় যাবে।

বিধুশেখর একটু বিরক্ত হয়ে বন্ধুর দিকে তাকালেন। রামকমলের আগ বাড়িয়ে কথা বলার কী দরকার। সব কথাবার্তা তো তিনিই বলবেন।

রামকমল বললেন, মিঃ হেয়ার, স্যার, আপনি কী খাইবেন? প্রথমে একটু তামাকু সেবন করিবেন?

হেয়ার বললেন, আমি ধূমপান করি না।

—তবে কি একটু মদিরা ইচ্ছা করেন? ব্র্যাণ্ডি, বীয়ার, ওয়াইন?

—ধন্যবাদ, আমি মাদক গ্রহণ করি না।

—সে কি স্যার, আপনি ড্রিংক করেন না?

—সুরা ব্যতীত অন্য পানীয় গ্রহণ করি। কিন্তু এখন কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই।

রামকমল সিংহ চমৎকৃত হলেন। জাতিতে সাহেব, অথচ বলে কিনা সুরাপান করে না? কবে শোনা যাবে বাঘ-সিংগী নিরামিষ খায়! ডেভিড হেয়ার সাহেবটি সত্যিই বড় অদ্ভুত!

—তবে সামান্য কিছু মিঠাই?

হেয়ার সাহেব বললেন, একবার গঙ্গার সহিত দেখা হইতে পারে কী?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। বলে রামকমল তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে ভেতর বাড়ির দিকে মুখ করে ডাকলেন, গঙ্গা! গঙ্গা! ওরে, কে কোথায় আছিস, গঙ্গাকে একবার খপর দে!

ফিরে এসে রামকমল বললেন, আপনি এসেচেন বলে আমরা ধন্য হয়িচি। আপনি মহদাশয়, নিঃস্বার্থভাবে এ দেশীয় বালকদের শিক্ষার জন্য যা পরিশ্রম করচেন!

বিধুশেখর ভ্রূ কুঞ্চিত করে এক মনে আলবোলা টেনে যেতে লাগলেন।

হেয়ার সাহেব নিজের প্রশংসা শুনে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। তারপর হাত তুলে রামকমলকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আপনারা দেশের প্রধান ব্যক্তি, আপনাদের সাহায্য ছাড়া কিছুই সম্ভবে না। আপনারা আর একটু যত্ন লউন।

সাহেবদের সাহচর্যে এলেই রামকমল বিগলিত হয়ে যান। তিনি হাত জোড় করে বললেন, আমি তো কালেজ স্থাপনের সময় বড় ডোনেশান দিয়িচি। পুনরায় যদি বলেন···

হেয়ার সাহেব বললেন, সে কথা ঠিক, আপনারা সাহায্য দিতে কার্পণ্য করেন নাই। কিন্তু আরও প্রয়োজন নৈতিক সাহায্যের।

এই সময় লাজুক মুখে গঙ্গানারায়ণ এসে ঢুকলো। হেয়ার সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

চলো, তুমি আমার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে যাইবে। জেন্টেলমেন, আমি যদি ইহাকে সঙ্গে লই, আপনাদের আপত্তি আছে কি ?

এবারও বিধুশেখর কিছু বলার আগেই রামকমল বললেন, বিলক্ষণ না ! আপনার সঙ্গে যাবে, তা আবার আপত্তি !

হেয়ার সাহেব কড়া গলায় গঙ্গানারায়ণকে বললেন, বিনা খবরে তুমি কলেজ যাওয়া বন্ধ করিলে কেন ? চলো, আজ তোমার শাস্তি হইবে— ।

সাহেব এসেছে শুনে চিন্তা দাসী নবীনকুমারকে কোলে নিয়ে দেখতে এসেছে। নবীনকুমার হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে এলো, যেন সে হেয়ার সাহেবের কোলে উঠতে চায়।

হেয়ার সাহেব তাকে অমনি কোলে টেনে নিয়ে শিশু শরীরের গন্ধ শুঁকতে লাগলেন। তারপর খুশী হয়ে বললেন, এ কুঠিতে পরিচ্ছন্নতা আছে বটে ! এ কার সন্তান ?

রামকমল বললেন, আমার। এ আমার কনিষ্ঠ সন্তান।

হেয়ার সাহেব বললেন, বাঃ, বড় সুন্দর শিশুটি। ইহার খুব বুদ্ধি হইবে।

একটুক্ষণ নবীনকুমারকে আদর করে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন পিতার কাছে। তারপর গঙ্গানারায়ণের কাঁধে হাত রেখে বললেন, চলো !

সকলে সদর দেউড়ি পর্যন্ত গেল হেয়ার সাহেবের সঙ্গে। তিনি যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন কান্না জুড়ে দিল নবীনকুমার। সেও যেন হেয়ার সাহেবের সঙ্গে যেতে চায়।

হেয়ার সাহেব আবার ফিরে এসে নবীনকুমারের গাল টিপে দিয়ে বললেন, আবার আসিবো। আমি ঘোড়া হইলে তুমি আমার পিঠে চড়িতে পারিবে কি ?

নবীনকুমার হেয়ার সাহেবের স্কন্ধ শক্ত করে চেপে ধরলো। এই শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিটিকে তার খুব পছন্দ হয়েছে।

হেয়ার সাহেব নবীনকুমারকে দু' হাতে তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে। নবীনকুমার বেশ মজা পেয়ে হাসতে লাগলো। হেয়ার সাহেব বললেন, বাঃ, ভয় পায় না। আমি বলিতেছি, পরে মিলাইয়া দেখিবেন, এই সুশ্রী বালকটি কালে কালে অসাধারণ হইবে !

হেয়ার সাহেব শাস্তি দেবেন শুনে গঙ্গানারায়ণ তেমন ভয় পায়নি। ওঁর কাছ থেকে শাস্তি পাওয়া একটা মজার অভিজ্ঞতা। পিঠে দু' চার ঘা পড়ে বটে কিন্তু তারপর হেয়ার সাহেব নিজেই এমন ব্যাকুল হয়ে পড়েন যে তখন তাঁকেই সামলাবার জন্য বলতে হয়, না মহাশয়, অতি অল্পের ওপর হয়েছে, বিশেষ বেদনা বোধ নাই।

কিন্তু গঙ্গানারায়ণ বিস্মিত হয়েছে বেশী। এই সকালবেলা যে হেয়ার সাহেব স্বয়ং তাদের বাড়িতে উপস্থিত হবেন, সে ভাবতেই পারেনি। কলেজের বালকরা কেউ দু' চারদিন অনুপস্থিত হলে বা কেউ অসুস্থ হলে হেয়ার সাহেব খোঁজখবর নিতে গেছেন বা নিজের হাতে সেবা করেছেন, একথা গঙ্গানারায়ণ শুনেছে বটে। তবে হালে হেয়ার সাহেব ছোট আদালতের কমিশনার নিযুক্ত হওয়ায় কলেজে আগেকার মতন অত বেশী সময় দিতে পারছিলেন না। বহুদিন ধরে ডেভিড হেয়ার নিঃস্বার্থভাবে শিক্ষার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। নিজের ব্যবসাপত্র তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন। এক সময় বহু ধন উপার্জন করেছিলেন বটে কিন্তু এত বৎসরে তা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই তিনি কোনোদিন কোনো বেতন গ্রহণ করেননি, বরং নিজ অর্থ ব্যয় করেছেন। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর সেক্রেটারি হিসেবে তাঁর মোটা বেতন নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, সে অর্থও দান করে দিয়েছেন তিনি।

সরাসরি হেয়ারকে কিছুতেই আর্থিক সাহায্য করা যাবে না বুঝেই সরকার সুকৌশলে তাঁকে আদালতকর্মে নিযুক্ত করেছেন। সেইজন্য ইদানীং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁকে স্কুল পাড়াতে দেখা

যেত না। আবার বুঝি তিনি নবোদ্যমে উঠে-পড়ে লেগেছেন।

এক হাত গঙ্গানারায়ণের কাঁধে রেখে অন্য হাতে মোটা ছড়িটা ঠকঠকিয়ে হাঁটতে লাগলেন হেয়ার সাহেব। খানিক দূরে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতার সহিত যে দ্বিতীয় ব্যক্তি বসিয়াছিলেন, তিনি কে ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, উনি আমার খুড়া। আমার পিতার বাল্য সুহৃদ্।

—হুঁ। তুমি ফ্রান্সিস বেকনের প্রতিমূর্তি কখনো দেখিয়াছ কি ?

গঙ্গানারায়ণ দুদিকে মাথা নেড়ে জানালো যে সে দেখেনি।

হেয়ার আবার বললেন, দেখিলে বুঝিতে, ঐ লোকটির সহিত ফ্রান্সিস বেকনের মুখের আশ্চর্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। একই রকমের চোখ। আমি প্রায়শই অবাক হইয়া দেখি যে অনেক এ-দেশীয় ব্যক্তির সহিত অনেক উওরোপীয়ের মুখাকৃতির খুব মিল থাকে। শুধু গাত্রবর্ণের তফাৎ।

ফ্রান্সিস বেকনের নাম শেক্সপীয়ার পাঠের সময় দু-একবার শুনেছে মাত্র গঙ্গানারায়ণ। বিশেষ কিছু জানে না। হঠাৎ সেই সাহেবের সঙ্গে বিধুশেখরের কেন মিল খুঁজে পেলেন হেয়ার সাহেব, তা সে বুঝলো না।

খানিক পথ গিয়ে হেয়ার সাহেব আবার থমকে দাঁড়ালেন। সস্নেহে প্রশ্ন করলেন, তোমার ক্ষুধা লাগে নাই তো ? উপবাস-ভঙ্গ করিয়াছিলে ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, হাঁ, মহাশয়।

—সত্য বলো। ভয় নাই, আমার গৃহে খাওয়াইয়া তোমার জাত মারিব না। কোনো মিঠাইওয়ালার দোকানে ভোজন সারিয়া লইতে পারো।

গঙ্গানারায়ণ দৃঢ়ভাবে জানালো যে তার কোনো প্রয়োজন নেই। সে সত্যিই খেয়ে এসেছে। আসলে যদিও সে কিছুই খায়নি। খাবার দেওয়া হয়েছিল, হেয়ার সাহেবের আগমন বার্তা শুনে তাড়াতাড়ি উঠে এসেছে, খাওয়ার সময় পায়নি।

হেয়ার তবু দাঁড়ালেন না। আবার জিজ্ঞেস করলেন, তবে বলো, কোন্ কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছ ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, দুধ।

—শুধু দুধ ? ব্যাস, আর কিছু নহে ?

—আম, কলা, সন্দেশ।

—উত্তম। তবে এত ধীরে ধীরে হাঁটিতেছ কেন ? আমার সহিত দ্রুত পা মিলাও।

হেয়ার সাহেব হাঁটেন রীতিমতন ধুপধাপ শব্দ করে। বয়েস যথেষ্ট হয়েছে, এখনো পদব্রজে বেশ দড়। ওঁর হাবভাব দেখলে যেন ঠিক ধোপদুরস্ত সাহেব মনে হয় না, মনে হয় যেন কোনো বৃহৎ পরিবারের আপনভোলা বড় মামা।

—তোমাদের সহপাঠী ভোলানাথ সরকারের কুঠী কোথায় তুমি জানো ?

—হাঁ, জানি।

—বাহির সিমলায় জগমোহন সরকারের কুঠী কি ?

—জগমোহন সরকার ভোলানাথের জ্যাঠা। পাশাপাশি দুই পৃথক বাড়ি।

—চলো, সেখানে যাইব। ভোলানাথের কোনো সংবাদ জানো ? জানো না। শুনিয়াছি সে গুরুতর পীড়ায় পড়িয়াছে। তোমাদের কোনো সহপাঠী বাঁচিল কি মরিল, সে সংবাদও তোমরা রাখো না। আজ সারাদিন তুমি ভোলানাথের সেবা করিবে, এই তোমার শাস্তি।

গঙ্গানারায়ণের শরীরে দারুণ একটা সুখানুভূতি হলো। এই রকম কোনো মানুষের সংস্পর্শে এলেই মন উন্নত হয়ে যায়। হেয়ার সাহেব সর্বক্ষণ পরের জন্য চিন্তা করেন, নিজের কথা কিছুই ভাবেন না। সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হয়েও মানুষ যে কত আনন্দে থাকতে পারে, ইনি তার অবিশ্বাস্য উদাহরণ।

হেয়ার সাহেব বললেন, জগমোহন সরকারের সহিত আমার প্রয়োজনীয় কথা আছে। স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে উঁহার সাহায্য পাইব মনে হয়। সুতরাং ভোলানাথের নিকট আমি বেশীক্ষণ থাকিতে পারিব না। তুমি থাকিবে।

গঙ্গানারায়ণ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো, মহাশয় কি এবার স্ত্রীলোকদের জন্য বিদ্যালয় খুলচেন ?

হেয়ার সাহেব কৃত্রিম ধমক দিয়ে বললেন, কেন, তোমার আপত্তি আছে বুঝি ?

—আপত্তি দূরে থাক, আহ্লাদ করবো। কিন্তু এ-ও কি সম্ভব ?

—কেন সম্ভব নয়। তোমরা সাহায্য করিলেই সম্ভব। ফিমেল সোসাইটি স্থাপন করিয়া এক সময় বালিকাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শুরু হইয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাবে আর বড়মানুষদের আগ্রহের অভাবে তাহা বেশীদিন চলে নাই। তোমরা বালিকা-স্ত্রীলোকদের অন্ধকারে রাখিয়া দিতে চাও?

—আমি চাই না!

—জগমোহন সরকার উদ্যাগী হইয়াছেন। লোকটি অতি সদাশয়। উহার সাহায্যে শীঘ্রই একটি বালিকাদিগের স্কুল স্থাপন করিব। আমি যদি আর দশ বৎসর বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে এ-দেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঘটাইয়া যাইব নিশ্চয়।

গঙ্গানারায়ণের অমনি বিন্দুবাসিনীর কথা মনে পড়লো। পড়াশুনো করার কী তীব্র সাধ ছিল বিন্দুর। সে জিজ্ঞেস করলো, এইস্থলে কি বিধবা স্ত্রীলোকরাও পাঠ নিতে আসবে?

হেয়ার সাহেব মাথা নীচু করে প্রশ্ন করলেন, কী কহিলে, আবার কহো তো?

গঙ্গানারায়ণ তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। হেয়ার সাহেবের মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে গেছে। তিনি অভিমানের সঙ্গে বললেন, এ কথা কহিতে তোমার শরম বোধ হইল না? আমি স্কুল খুলিলেই কি তোমরা বিধবা বালিকাদের সেথা পাঠাইবে? তাহারা সূর্যালোক দেখে না, তাহাদের বিদ্যার আলোক দেখাইবে কে?

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, শোনো গঙ্গা, আমি হিন্দু নই, কিন্তু হিন্দুজাতির বিধবা বালাদের কথা মনে আসিলেই আমার চক্ষে জল আসে। স্ত্রী জাতি মাতৃজাতি, তবু তাহাদের এত কষ্ট দেওয়া কি মানুষের উচিত কাজ হয়?

গঙ্গানারায়ণ অধোবদন হয়ে রইলো।

হেয়ার সাহেব তার পিঠ চাপড়ে বললেন, বিদ্যাশিক্ষা করিতেছ, যদি পারো তো দেশবাসীকে বুঝাইয়ো। মাতৃজাতির দুঃখ দূর করিবার জন্য কিছু যত্ন করিয়ো! ও কাজ আমি পারিব না। তোমাদিগেরই কাহাকেও উদ্যোগ লইতে হইবে।

খানিকটা পথ আবার দুজনে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলো। মাঝে মাঝেই পথ চলতি কেউ কেউ হেয়ার সাহেবকে দেখে অভিবাদন জানাচ্ছে। প্রায় কুড়ি বাইশ বছর ধরে বহু ছাত্র হেয়ার সাহেবের অধীনে থেকে পড়াশুনো করে গেছে। শহরে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে হেয়ার সাহেবকে চেনে না। হেয়ার সাহেব কারুর সঙ্গেই দুটো একটার বেশী কথা বলছেন না। আজ যেন হেয়ার সাহেবকে একটু আলাদা রকম মনে হচ্ছে গঙ্গানারায়ণের। মুখে কেমন যেন একটা উদাসীন ভাব। রঙ্গপ্রবণ লঘু মেজাজটি একেবারেই নেই।

মে মাসের শেষের দিক। সকালবেলাতেই রোদ উঠেছে চড়চড়িয়ে। রোদের আঁচে হেয়ার সাহেবের মুখখানা লাল হয়ে গেছে, ঘামে ভিজে গেছে পিঠ তবু হেয়ার সাহেবের কোনো হুঁশ নেই।

প্রথমেই জগমোহন সরকারের বাড়ি পড়লো। জগমোহন আর বিরাজমোহন দুই ভাই। এঁদের মধ্যে জগমোহনই বেশী অর্থ ও খ্যাতি অর্জন করেছেন। পৈতৃক সম্পত্তি বিশেষ পাননি কিন্তু ভাগ্য খুলে গেছে আমদানি রপ্তানির ব্যবসা খুলে। সরকার, আঢ্য অ্যাণ্ড কোং এ শহরের নামকরা প্রতিষ্ঠান। শুধু অর্থ জুটলেই কৌলীন্য জোটে না। শেরবোর্ণ সাহেবের ইস্কুলে কিছুদিন পড়ে ইংরেজি ভাষাটা মোটামুটি রপ্ত করে নিয়েছেন জগমোহন। যুবা বয়েসে কিছুদিনের জন্য খৃস্টান হবার দিকে ঝুঁকেছিলেন, সেই খবর পেয়ে তাঁর মাতাঠাকুরানী বিষের পাত্র নিজের ওষ্ঠের সামনে ধরে বলেছিলেন, আর এক বার বল ও কথা! বল! তুই জাত খোয়াবি, আর আমি বেঁচে থাকবো?

এখন ওসব চুকেবুকে গেছে, জগমোহন মহা ধূমধাম করে বাড়িতে প্রতি বৎসর দোল দুর্গোৎসব লাগান, পাবলিক কাজে দান করেন মুক্ত হস্তে, দু-দশজন মোসাহেব প্রতিপালন করছেন, সভায় রামগোপাল ঘোষের পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন এবং মাঝে মাঝে ইংরেজি কাগজে কৃষকদের দুরবস্থা অথবা স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে জ্বালাময়ী আর্টিকেল লেখেন। শহরের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে তাঁর এখন বেশ নাম ছড়িয়েছে।

জগমোহন সপারিষদ বসেছিলেন বৈঠকখানা ঘরে। তার ঠিক ডান পাশেই বসে আছে একজন দীর্ঘকায়, শীর্ণ, খড়গনাশা মানুষ। এ আমাদের পূর্ব পরিচিত রাইমোহন। সুকৌশলে সে এ গৃহে নিজের স্থান করে নিয়েছে। জগমোহন বহু ব্যাপারে তার ওপরে নির্ভর করেন।

হেয়ার সাহেব আগে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দ্বারের কাছে হেয়ার সাহেবকে দেখে জগমোহন বিশালবপু নিয়ে প্রায় ছুটে এলেন সেদিকে। দু' হাত বাড়িয়ে বললেন, কী সৌভাগ্য! কী

সৌভাগ্য ! আপনি এশ্চেন ! মহামতি হেয়ার আজ আমার বাড়িতে ! আজই আপনার কথা স্মরণ কচ্চিলুম। আগামী মাস থেকেই আমি বালিকা বিদ্যালয় খুলে ফেলচি। আমারই এ বাড়িতে। শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রচুর উৎসাহ দিয়েচেন···সব বলচি আস্তে আস্তে, মহাশয় বসুন, বসতে আজ্ঞা হোক।

হেয়ার সাহেব বসলেন না, গঙ্গানারায়ণের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন, খুবই সুসংবাদ। আমার যথাসাধ্য সাহায্য করিব। আপনারই গৃহে স্কুল, কিন্তু শিক্ষিকা কোথায় পাইবেন ?

জগমোহন বললেন, লণ্ডনের ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটিতে পত্র পাটিয়িচি, দ্বারকানাথবাবু ওঁদের সঙ্গে নিজে কথা কইবেন, একজন লেডি টিচার পাওয়া যাবে মনে হয়। খরচ-খর্চা আমি দোবো। এ-দেশের মেয়ে শিক্ষিকা আর পাবো কোতায়। প্রথম দু-চার মাস বুড়ো বুড়ো পণ্ডিতদের দিয়ে কাজ চালিয়ে নোবো···নাম দিইচি ফিমেল পাঠশালা।—

হেয়ার সাহেব বললেন, আগে আর একটি কথা জানিয়া লই ! সে পাঠশালে ফিমেলরা আসিবে তো ? পূর্বে দেখিয়াছি, ছাত্রী জোটানোই ভার।

—আলবাৎ আসবে !

—আপনার নিজ পরিবারের কন্যারা যাইবে আশা করি।

—হায় হায় ! আমার তো কোনো কন্যা সন্তানই নেই। থাকলে নিশ্চয়ই যেত। আমি এ পল্লীর প্রতি বাড়ি বাড়ি ঘুরে গিন্নীদের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে বলিচি, মা জননীরা, দেশ আজ জেগেচে, অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হয়ে জ্ঞানের ঊষালোক প্রস্ফুটিত হচ্চে, আর দ্বিধা করবেন না, আমাদিগের কন্যাসমা, ভগ্নীসমা বালিকাদের জন্য জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করুন। মুশকিল কি জানেন, হেয়ার সাহেব, এখনো অনেক লোকের ধারণা, সেই অনেকের মধ্যে অনেক আচ্ছা আচ্ছা বড়মানুষ, শিক্ষিত লোক রয়েচে, যারা মনে করে, নেকাপড়া শিখুলে মেয়ে-সন্তানরা বিধবা হয় ! বুঝুন ! হাউ ইগনোরেন্ট !

—আর বিধবারা লেখাপড়া শিখিলে তাহাদের কী হয় ? তাহারা তো দ্বিতীয় বার বিধবা হইতে পারিবে না ! এই যুবকটি প্রশ্ন করিতেছিল যে বিধবারা লেখাপড়া শিখিতে পারিবে কি না।

—বিধবাদের লেখাপড়া শিখিয়ে লাভ কী হবে ? এই ছেলেটি···ইটি কে ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমি ভোলানাথের সহপাঠী। আমার নাম গঙ্গানারায়ণ সিংহ। পিতার নাম রামকমল সিংহ।

রামকমল সিংহর নাম শুনে জগমোহনের ভ্রূদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত হলো। রামকমল সিংহ জগমোহনের তুলনায় আরও তিন চার ধাপ উঁচু তলার বড় মানুষ। সেজন্য জগমোহনের খানিকটা ঈর্ষাবোধ আছে।

তিনি শুকনো গলায় বললেন, অ। তারপর হেয়ার সাহেবের মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে বললেন, ওসব ব্যাগড়ার কথা কানে তুলবেন না। বিধবাদের শিক্ষার কথা উচ্চারণ করাও পাপ। বিধবারা আমাদের সংসার পবিত্র করে। ওদের সংযম, ওদের সহনশীলতা কত মহান। এতখানি আত্মকৃছ্ কৃছ্ কৃছ্ কৃস্, ইয়ে কৃচ্ছ্রতা শুধু হিন্দু রমণীতেই সম্ভব। বিধবারা আছে বলেই আমাদের ধর্ম টিঁকে আছে।

রাইমোহন বকের মতন গলা উঁচিয়ে বললো, ঠিক কতা ! লাক কতার এক কতা।

জগমোহন আবার বললেন, রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে বই লিখে প্রমাণ করেচেন যে প্রাচীনকালে বড় ঘরের হিন্দু মেয়েদের মধ্যেও শিক্ষার চলন ছেল। মোছলমান আমলেই আমরা মেয়েছেলেদের ঘরে সেঁদিয়ে রেখিচি। বুঝলেন সার, তৈমুর লং ভারত আক্রমণ করবার পরই আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা অন্ধকারে ডুবে গ্যাচে। আবার আমরা মেয়েছেলেদের ঘরের বার করবো, তবে ধীরে ধীরে।

রাইমোহন বললো, রাজাবাহাদুর বেধবাদের নেকাপড়া শেকাবার কতা কিছু বলেননি !

জগমোহন গঙ্গানারায়ণের দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, ও সব কথা তুললে সর্ব কাজ ভণ্ডুল হয়ে যাবে। বুঝলেন, মিঃ হেয়ার, এমনিতেই পাঁচরকম কথা উঠবে। লোকে বলবে আমরা বুঝি ঘরের মেয়েদের মেম বানাবার হুজুগে মেতিচি। লোকে তো সু দ্যাকে না, কু-টাই বড় করে দ্যাকে, কেউ হয়তো আমাদের চরিত্রে কটাক্ষ করবে।

রাইমোহন জিভ কেটে বললো, না মশায়, ও কতা বলবেন না। আর যার সম্পর্কে যাই বলুক, আপনার মতন দেবতুল্য মানুষের চরিত্র তুলে কতা বললে ধর্মে সইবে না।

জগমোহন উদারভাবে বললেন, সবাই কি সব বোঝে।

হেয়ার সাহেব বললেন, আপনারা বিজ্ঞ, আপনারাই ভালো বুঝিবেন। বিধবাদের প্রয়োজন নাই।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকাদের লইয়াই কার্য শুরু হোক।

জগমোহন বললেন, বসুন মিঃ হেয়ার। অনেক কতা আচে। পুরুষেরা যেসব কেতাব পড়ে, বালিকারাও কি সেই একই কেতাব পড়বে? আমার তো মনে হয়, বালিকাদের জন্য নীতিশিক্ষার পৃথক পাঠ্যবই লেকানো দরকার। স্কুল বুক সোসাইটি কি এ কাজে সাহায্য করবে?

হেয়ার সাহেব বললেন, আমি আলোচনা করিব। পরে আসিয়া আপনার সহিত কথা কহিব, আগে ভোলানাথকে দেখিয়া আসি। তার কোন্ ব্যাধি হইয়াছে?

জগমোহন বললেন, ভোলানাথ? ও বাড়ির ভোলা? দুদিন ধরে তার অনেকবার দাস্ত পায়খানা হচ্চে শুনিচি।

জগমোহন বিষয়টিতে কোনো গুরুত্বই দিলেন না। তিনি অনেক বৃহৎ বৃহৎ সমস্যা নিয়ে চিন্তিত, ভাইপো ভাগ্নেদের সামান্য অসুখের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই তাঁর।

হেয়ার সাহেব বেরিয়ে এলেন গঙ্গানারায়ণকে নিয়ে। গঙ্গানারায়ণ মনে মনে বললো, বিন্দু তোর ভাগ্য খারাপ। এ জীবনে তুই আর কিছু পাবি না। পরজন্মে যেন বিধবা না হোস।

হেয়ার সাহেব যেন ঠিক তার মনের কথাটাই পড়ে ফেলে মুখ ঝুঁকিয়ে গঙ্গানারায়ণের কানে কানে বললেন, প্রিয় বৎস. দেখিয়া লইয়ো, ক্রমে ক্রমে বিধবা বালারাও বিদ্যালয়ে আসিবে। যদি আমি আর দশ বৎসর বাঁচি, তবে সকল শ্রেণীর বালিকাদের জন্যই শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া যাইব। এই আমার শেষ ইচ্ছা।

কথাটা শুনে গঙ্গানারায়ণের শরীরে খানিকটা রোমাঞ্চ হলেও সে তেমন খুশী হতে পারলো না। দশ বছর পর বিন্দুবাসিনীর কি আর পড়াশুনো করার আগ্রহ থাকবে? অত বেশী বয়েসে সে স্কুলে যাবেই বা কী করে!

পাশের গৃহটির দ্বার খোলা, বৈঠকখানাটি খাঁ-খাঁ করছে। গঙ্গানারায়ণ প্রথমে একলা ভেতরে ঢুকে ভোলানাথের নাম ধরে ডাকাডাকি করতে লাগলো। অচিরেই ভোলানাথের বাবা বিরাজমোহন নেমে এসে ওঁদের দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, হেয়ার সাহেবের হাত জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, সাহেব, আপনি এয়েচেন। কিন্তু ভোলা বুঝি বাঁচে না।

ভোলানাথ চলৎশক্তিহীন হয়ে দ্বিতলের এক কক্ষে শুয়ে আছে শুনে হেয়ার সাহেব বললেন, আমি কি উহাকে উপরে যাইয়া দেখিতে পারি?

হেয়ার সাহেবকে শুধু যে ওপরে নিয়ে যাওয়া হলো তাই না, ভোলানাথের মা ও পিসী উপস্থিত রইলেন সেখানে, হেয়ার সাহেব যেন এ গৃহের একজন পরমাত্মীয়।

ভোলানাথ একখানি পালঙ্কে দু হাত ছড়িয়ে শুয়ে আছে। মুখখানি দারুণ বিবর্ণ। চোখ বোজা। বিরাজমোহন তার মাথার কাছে গিয়ে বললেন, বাবা ভোলা, দ্যাকো, কে এয়েচেন! একবারটি চোখ ম্যালো—

ভোলানাথ অতিকষ্টে চোখ মেললো। চিনতে পারলো কি না বোঝা গেল না, কিন্তু কিছু একটা কথা বলতে গিয়েই ওয়াক তুলে বমি করলো। সেই বমি খানিকটা পড়লো বিছানায়, খানিকটা মেঝেতে।

হেয়ার সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, কলেরা! শহরে সর্বত্র কলেরার মহামারি শুরু হইয়াছে। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে এমন হয়। বৃষ্টি না নামিলে কমিবে না।

তারপর তিনি বিরাজমোহনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি একটি সম্মার্জনী ও একপাত্র জল চাই। সত্বর আনিয়া দিবেন কি?

গঙ্গানারায়ণকে তিনি নিম্নস্বরে বললেন, তোমাদিগের হিন্দুদিগের গৃহগুলি বড় অপরিচ্ছন্ন। রোগীর কক্ষ সর্বদা উত্তমরূপে পরিষ্কার রাখা কর্তব্য। তোমরা ইহা পালন করো না বলিয়াই রোগ বেশী ছড়ায়।

জল ও ঝাঁটা এসে পৌঁছোনো মাত্র হেয়ার সাহেব নিজে সেই বমি পরিষ্কারে প্রবৃত্ত হলেন। অমনি হা-হা করে উঠলো বাড়ির লোক। বিরাজমোহন সাহেবের হাত থেকে ঝাঁটা কেড়ে নিতে এলো। হেয়ার সাহেব কিছুই শুনলেন না। কাজ শেষ করে বললেন, আমি এই ছাত্রটিকে রাখিয়া যাইতেছি। ভোলা বমন করিবামাত্র সে পরিষ্কার করিবে। আমি উহাকে এই দায়িত্ব দিয়াছি। বোর এক খণ্ড পরিষ্কার বস্ত্র চাই—

দ্বারের কাছে দাঁড়িয়েছিল আট ন' বছরের এক বালিকা। সে তার শাড়ির আঁচলটা ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে ফেলে সেই টুকরোটা এগিয়ে দিল সাহেবের দিকে। মেয়েটিকে চিনতে পারলো গঙ্গানারায়ণ। মাত্র মাস

ছয়েক আগেই সে এ-বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে গেছে। এই মেয়েটি ভোলানাথের স্ত্রী মানকুমারী। ভোলানাথের অসুখের জন্যই নিশ্চয়ই তাকে আনানো হয়েছে পিতৃগৃহ থেকে।

হেয়ার সাহেব সেই বস্ত্রখণ্ড জলে ভিজিয়ে ভোলানাথের মুখখানা ভালো করে মুছে দিতে দিতে মৃদু স্বরে বলতে লাগলেন, ভোলা, মনে জোর আনো, তোমাকে বাঁচিতেই হইবে, ভোলা, জীবন বড় সুন্দর, ইহা ছাড়িয়া যাইতে নাই। না ভোলা, আমরা তোমাকে রাখিব।

ভোলানাথ চোখ বুজেই রইলো। অসহ্য যন্ত্রণায় তার শরীর কুঁকড়ে উঠছে, কিন্তু সে কোনো শব্দ করছে না। তার চোখের দু' পাশে বিন্দু বিন্দু জল।

হেয়ার সাহেব ভোলানাথের চিকিৎসার বিষয়ে কিছু খোঁজখবর নিলেন। বড় বড় কবিরাজরা ভোলানাথকে দেখে প্রায় জবাব দিয়ে গেছে। হেয়ার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, মেডিক্যাল কালেজের ছাত্রদের চিকিৎসার উপর আপনাদিগের ভরসা আছে কি ?

ভোলানাথের মা বললেন, সাহেব, আপনি যা বলবেন, আমরা তাই শুনবো।

হেয়ার সাহেব বললেন, তবে আমি পত্র দিতেছি, শীঘ্র কাহাকেও তথায় প্রেরণ করুন।

হেয়ার সাহেব আর সেখানে বেশীক্ষণ রইলেন না। যাবার সময় গঙ্গানারায়ণকে বলে গেলেন, আগামীকল্য কালেজে তুমি আমাকে ভোলার সংবাদ দিও।

হেয়ার সাহেব দ্বারের কাছে যেতেই মানকুমারী হঠাৎ আর্তস্বরে কেঁদে উঠলো। সকলেই থমকে গেল এক মুহূর্ত। হেয়ার সাহেব মুখ ফেরালেন, তাঁর দু' চোখে জল, খুব সম্ভবত ভোলার সম্পর্কে তিনি নিজেও খুব আশা পোষণ করেন না। ধরাগলায় তিনি বললেন, মন দুর্বল করিও না, মা। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

তারপর তিনি দ্রুত বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

কিন্তু পরদিন গঙ্গানারায়ণ কোনো সংবাদ দেবার আগে নিজেই এক সাঙ্ঘাতিক সংবাদ শুনলো।

গঙ্গানারায়ণ সেদিন ভোলানাথের সেবার জন্য বেশীক্ষণ থাকতে পারেনি। বিরাজমোহন খানিকবাদে প্রায় জোরাজুরি করেই তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। গঙ্গানারায়ণ যে বড়মানুষের ছেলে তা তিনি জানেন, সংক্রামক রোগীর পাশে বসে থেকে যদি সেও অসুখ বাধিয়ে বসে তাহলে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে। গঙ্গানারায়ণ যেতে চায়নি, কিন্তু ভোলানাথের মা পর্যন্ত বললেন, এবার তুমি বাড়ি যাও বাবা। আমরা তো রয়িচিই, তোমার জননী আবার তোমার জন্য চিন্তে করবেন। আবার না হয় কাল এসো।

পরদিন সকালে বঙ্কু গঙ্গানারায়ণের বাড়িতে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, মহা সর্বনাশ হয়েচে। শিগগির চ।

গঙ্গানারায়ণ শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করলো, ভোলা কি···

বঙ্কু বললো, ভোলার খবর জানি না। হেয়ার সাহেব মারা গেছেন।

একটুক্ষণ থমকে থেকে তারপর দুই বন্ধুই কেঁদে উঠলো ডুকরে।

দুই নবীন যুবকের মুখে আহত বিস্ময়। এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত শোকের মর্ম তারা যেন ঠিক বুঝতে পারছে না। শুধু চক্ষু দিয়ে অবিরাম জল পড়ছে। গঙ্গানারায়ণের মুখখানি বিবর্ণ, রক্তহীন হয়ে গেছে।

হেয়ার সাহেব থাকতেন লালবাজারের বাঁদিকে গ্রে সাহেবের বাড়িতে। পাল্কি ডাকার সময় হলো না, দুজনে ছুটতে লাগলো সেদিকে। ততক্ষণে শহরের বহু লোকই ছুটছে খবর শুনে। গঙ্গানারায়ণের কাছে খবরটা এত আকস্মিক যে কিছুতেই যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না। কাল যে মানুষটি তাদের বাড়িতে এসেছিল, অতক্ষণ যার সঙ্গে সে ছিল···

গ্রে সাহেবের ভবনের সম্মুখভাগে লোকে লোকারণ্য। কোনো বৃটিশ ব্যক্তির বাড়ির সামনে এর আগে এত দেশীয় মানুষ জড়ো হয়নি। বস্তুত, এ শহরের আর কোনো ঘটনাতেই বুঝি একসঙ্গে এত মানুষের সমাবেশ হয়নি কখনো।

হিন্দু স্কুলের বর্তমান, প্রাক্তন কোনো ছাত্রই বাদ যায়নি। এসেছেন ডিরোজিও'র শিষ্যরা। সম্ভ্রান্ত, বুনিয়াদী ঘরের ব্যক্তিরাও আসছেন এক এক করে। গঙ্গানারায়ণের বন্ধুরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে গোল হয়ে। এমনকি যে মধুর ঘুম ভাঙে বেশ বেলায়, সে-ও হাজির হয়েছে আজ। মধু মুখে অনেক লম্বা চওড়া কথা বলে, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধেয় উক্তি করতে ভালোবাসে। কিন্তু আসলে তার মনটি বড় নরম। সে-ও মুখ লুকিয়ে কাঁদছে ফুলে ফুলে। যারা দেরিতে এসেছে, তারা বারবার শুনতে চাইছে সব খবর। কীভাবে হেয়ার সাহেবের মৃত্যু হলো, সে কথা শতবার বলাবলি করে বা

শুনেও আশ মিটছে না।

রাত একটায় ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ হেয়ার সাহেব বমি করতে শুরু করলেন। পেটে অসহ্য ব্যথা। তবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি স্থিরভাবে রইলেন। তাঁর সর্দার বেহারাকে ডেকে তুলে তিনি বললেন, বাপু একবার গ্রে সাহেবের নিকট যাও তো! তাঁহাকে গিয়া বলো, আমার জন্য একটি শবাধার তৈয়ার করাইয়া নিয়া আসিতে। সে কথা শুনে বেহারা বাইরে গিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

সেই চেঁচামেচিতে জেগে উঠলো আরো অনেকে। ছুটে এলেন গ্রে সাহেব। সেই গভীর রাত্রেই চিকিৎসকের জন্য পাল্কি পাঠানো হলো। তাঁর প্রিয় ছাত্র মেডিক্যাল কলেজের সাব-অ্যাসিসট্যান্ট সার্জন প্রসন্ন মিত্তির রাত জেগে বসে রইলো পাশে। পেটের বেদনা প্রশমনের জন্য সে ব্লিস্টার লাগাচ্ছিল, এক সময় হেয়ার সাহেব বললেন, প্রিয় বৎস, ঐ বেলেস্তরা সরাইয়া লও। এবার আমি শান্তিতে মরি।

ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

জুড়ি গাড়ি, ল্যাণ্ডো; ফিটনে ভরে গেল পল্লী। আকাশে গুম গুম করে গজরাচ্ছে মেঘ। বাতাসের বেগ ক্রমেই প্রবল হচ্ছে। রেভারেণ্ড চার্লস আয়ার এসে পৌঁছবার পর শুরু হলো শবযাত্রা। অমনি সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো প্রবল ঝড় আর বৃষ্টি। কিন্তু মিছিল ছত্রভঙ্গ হলো না। একজনও কেউ বৃষ্টির ভয়ে শবানুগমন বন্ধ করলো না। নিঃশব্দে নতমস্তকে সবাই চললো গোলদীঘির দিকে। সাহেবদের জন্য নির্দিষ্ট বেরিয়াল গ্রাউণ্ডে নয়। ডেভিড হেয়ারের সমাধি হবে তাঁর স্বপ্নজগৎ হিন্দু কলেজের কাছেই। তাঁর শেষকৃত্যের ব্যয় বহন করবে জনসাধারণ।

গঙ্গানারায়ণের মনে পড়ছে অনেক কথা। বিশেষত গতকালের কথা। হেয়ার সাহেব বলেছিলেন, বৃষ্টি নামলে কলেরার প্রকোপ কমবে। উনি নিজে এ বৎসরের কলেরার শেষ শিকার হয়ে বৃষ্টি নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

রাস্তায় জল জমে গেছে। সেই জল ঠেলে যেতে যেতে গঙ্গানারায়ণের কানে অনবরত একটা কথা বাজতে লাগলো। হেয়ার সাহেব কাল অন্তত দু বার তাকে বলেছিলেন, যদি আর দশ বছর বাঁচি, যদি আর দশ বছর বাঁচি··· । উনি বাঁচতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন, জীবনটা কী সুন্দর, আরও অনেক কাজ করতে চেয়েছিলেন···

গঙ্গানারায়ণের চোখ থেকে টপ টপ করে জলের ফোঁটা মিশে যেতে লাগলো বৃষ্টির জলে।

সন্ধের মুখে আবার একদিন গুপী স্যাকরার দোকানের ঝাঁপ ঠেলে ঢুকলো রাইমোহন। গুপী তখন বেরুবার উদ্‌যোগ করছিল, রাইমোহনকে দেখে বসে গেল।

—ঘোষালমশাই যে! বহুৎদিন পায়ের ধুলো দ্যাননি ইদিকে। ভাবলুম বুঝি গরীবকে ভুলেই গ্যালেন।

বেতের মোড়ায় হাঁটু উঁচু করে বসে পানের ডিবে বার করলো রাইমোহন। গুপীকে একটি দিয়ে, নিজে একটি মুখে পুরে বললো, দিনদিন যত গরীব হচ্চিস গুপী, তেম্নি তোর ভুঁড়িখানাও তো দিব্যি নেওয়াপাতি হচ্চে বেশ!

—ওদিকে নজর দেবেন না! গরীবের তো এটাই সম্বল। আরও বেশী দুদিনের জন্য জমিয়ে রাখতে হয়।

—বসত বাড়িটে একতোলা থেকে দোতোলা করিচিস দেকলুম য্যানো!

—সেইজন্যই তো হাত একেবারে খালি। বাড়ি কত্তে গিয়ে একেবারে সর্বোস্বান্ত হলুম।

—এমন সর্বস্বান্ত হওয়াও ভাগ্যের কতা। তা একদিন বাড়িতে ডেকে নুচি মণ্ডা খাওয়া! তোর বাড়ি মানে তো আমাদের বাড়ি, আমাদেরই টাকায় করিচিস যখন—

—আপনাদের মতন লোক এই অধমের কুঁড়েতে আসবেন, এ তো মহাভাগ্যের কতা। কবে পায়ের ধুলো দেবেন, বলুন!

—সহজে দিতে পারবো না, অ্যাখন পায়ের ধুলো বড় আককারা, যা বৃষ্টি বাদলা চলছে। আমাদের এই চিৎপুরের রাস্তায় তো মেঘ ডাকলেই হাঁটু জল। পদ কাদা দিতে পারি।

—তাই-ই দেবেন না হয়। আপনার পা ধুয়ে একটু চরণামৃত খেয়ে নেবো।

—কী ব্যাপার রে, গুপী! এত খাতির কচ্চিস কেন রে আমাকে? অতি ভক্তি কিসের লক্ষণ য্যানো?

—আপনাকে খাতির করবো না তো করবো কাকে? আগে পায়ে হেঁটে ঘুরতেন, তারপর দেখলুম পাল্কি ধরেছেন, অ্যাখুন আবার দেখচি জুড়ি গাড়ি হাঁকাচ্চেন। গত মঙ্গলবার আমার পাশ দিয়ে ধাঁ করে চলে গেলেন, আমি কত ডাকাডাকি কল্লুম, আপনি গেরাহ্যিই কল্লেন না। তবে বড় খুশী হইচি, আপনার উন্নতি দেখলে আমাদেরও আনন্দ হয়।

—র, র, আর ক'টা দিন সবুর কর, আরও কত দেকবি! এই তো সবে ছিপ ফেলিচি। অ্যাখুন জুড়ি গাড়ি হাঁকাচ্চি, এরপর দেকবি তেঘুড়ি চৌঘুড়ি হাঁকাবো, নিজের, এক্কেবারে নিজের!

—সিদিনকে তবে কার গাড়িতে যাচ্চিলেন? আপনার নিজের নয়!

—না রে, পাগলা। ও গাড়ি রামকমল সিংগীর।

—সিংগী বাড়িতে আবার ভিড়লেন কবে? এই যে ক'দিন খুব সরকার মশায়ের সঙ্গে ঘোরাঘুরি কচ্চিলেন। তেনাকে ছেড়ে এবার বুঝি রামকমল সিংগীকে ধরলেন?

—ছাড়িনি, তেনাকেও ছাড়িনি। দুজনকে দু হাতে খেলাচ্চি বুজলি, পুকুরের দু ঘাটে চার ফেলিচি।

—তাহলে আপনাকে একটা কাজ কত্তেই হবে আমার জন্যে। বাবু রামকমল সিংগী শুনলুম শিগগীরই ছেলের বে দিচ্চেন। কিছু না হোক, লাখখানেক টাকা খরচা হবে নিশ্চয়!

—লাখখানেক কি রে ব্যাটা! এক লাখ তো আমার মতন বারো ভূতে লুটেপুটেই খাবে। শুনচি, গয়নার হিসেবই হয়েছে আড়াই লাখ।

—ঘোষালমশাই, ওর থেকে আমায় কিছু কাজ ধরে দিতেই হবে। হাজার পঞ্চাশেক পেলেই আমার যতেষ্ট।

নিঃশব্দ হাসিতে রাইমোহনের মুখখানা কুঁচকে গেল। তার হাসির মধ্যেও খানিকটা হিংস্রতা আছে। এই পৃথিবীর কাছে কখনো নিজে জব্দ হয়ে যাবার আগেই সে নানারকম বুদ্ধির প্যাঁচ খেলিয়ে দিতে চায়।

বাঁ হাতটি তুলে গুপীর দিকে অভয় মুদ্রা দেখিয়ে সে বললো, এই কতা! মোটে পঞ্চাশ হাজার পেলে তুই সন্তুষ্ট?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—যদি আরও বেশী কাজ দিই?

—সে আপনার দয়া।

—বিধু মুকুজ্যেও মেয়ের বে লাগাবে, সে খপর শুনিচিস?

—কোন্ বিধু মুকুজ্যে? যিনি বড় উকিল?

—হ্যাঁ, আমাদের রামকমল সিংগীর ফে ফি গা—

—কী বললেন?

—ফেরেণ্ড, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড। এটুকুও জানিস না?

—এসব জানলে তো আমিও বাজারে নেমে পড়তুম। মুখ্যু বলেই না সারাদিন আগুনের ধারে বসে হাঁপর চালাই।

—সেই বিধু মুকুজ্যের বাড়ির কাজেরও বায়না যদি জোগাড় করে দিই?

—তাহলে আপনাকে রোজ দু' বেলা পেন্নাম ঠুকবো!

—শুধু পেন্নাম! হিস্যে দিবি না ব্যাটা বজ্জাত!

—সেও আপনার দয়া। আপনি হিস্যে চাইলে কি আর আমি কখনো না বলতে পারি?

—টাকায় এক আনা বাট্টা দিবি তো বল এখন থেকেই কাজে লেগে যাই। সিংগী বাড়িতে মাধব স্যাকরার কাজ বাঁধা।

দপ করে জ্বলে উঠলো গুপী। আর পাঁচজন নিরীহ, দুর্বল মানুষের মতন সে-ও নিজের পেশায়

কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম সহ্য করতে পারে না। ইদানীং স্বর্ণকার হিসেবে মাধবের খুব খ্যাতি। আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতন রাইমোহন ওর নামটা তুলেছে।

—মাধব ! সে তো এক নম্বুরি চোর। বিষকুম্ভ, বুঝলেন ঘোষালমশাই, বিষকুম্ভ, এই বলে দিলাম আপনাকে। ও গুখেগোর ব্যাটাকে কেউ সেঁকো বিষ খাওয়াতে পারে না !

—তবেই বোজ ! মাধবকে সরানো চাট্টিখানি কতা নয়। দস্তুর মতন মেহনৎ করতে হবে, বুদ্ধি খর্চা করতে হবে। কিছু আগাম দে !

—আজ্ঞে ?

—একবার বললে বুঝি কতা বুঝিস না ? দু বার তিনবার করে বলতে হবে ? কিছু আগাম দে আমায়। এত বড় একটা কাজের পত্তন করবো, কিছু মালকড়ি ছাড়তে হবে না ?

—আগাম ! এখন তো আমার হাতে কিচু নেই। আগে কাজ করি, বাবুদের কাচ থেকে পয়সা পাই, তারপর কড়ায় ক্রান্তিতে আপনার হিস্যে বুঝে দেবো।

—আরে ব্যাটা, আগে দারোয়ানগুলোনকে হাত কত্তে হবে না ? সেজন্য খর্চাপাতি নেই ? এসব বড় বড় বাড়ির দারোয়ানরা এক একজন কাঁচাখেকো দেব্‌তা, এদের খুশী না করে কিচ্ছুটি করার উপায় নেই।

—ঘোষালমশাই, বিশ্বাস করুন, হাত একেবারে খালি।

—দে দে ব্যাটা, বেশী ভ্যানতাড়া করিস না, শুভ কাজে অমন ব্যাগড়া দিতে নেই, অন্তত পঞ্চাশটা টাকা বার কর।

—আজ নয়, আর একদিন বরং—

—তবে কি মাধবের কাচে যাবো বলতে চাস ? তোর ভালো চাই বলেই বলচি, নইলে আগ বাড়িয়ে আমার এত গরজ দেকাবার ঠ্যাকাটা কী ? সিংগী বাড়িতে একবার যদি ঢুকতে পারিস····টিকটিকি হয়ে ঢুকবি, পাঁচ বছর বাদে কুমির হয়ে বেরিয়ে আসবি !

—তবে আজ তিরিশ টাকা নিন !

—অ্যাই তো ! অমনি দরাদরি শুরু করে দিলি। স্বভাব যায় না মলে, অভাব যায় না ধুলে। স্বভাবটা যাবে কোতায় ! লাখ লাখ টাকার কারবার, আর তুই দশ-বিশ টাকা নিয়ে ঝামেলা কচ্চিস !

—পঁয়তিরিশ নিন। তার বেশী আজ আর কিছুতেই দিতে পারবো না !

—আর একটু ওঠ্‌। আর একটু বাড়। আচ্ছা বেশী কতার দরকার নেই। দে, পঁয়তাল্লিশই দে। বাকি পাঁচ টাকা তোর ছেলে-মেয়েদের আমি মোয়া মিছরি খেতে দিলুম।

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে গা মোচড়া-মুচড়ি করতে করতে গুপী কাঠের ক্যাশ বাক্সটা খুললো। ঘর থেকে টাকা বার করে দিতে গুপীর যেন হাড় পাঁজরা ভেঙে যায়। কিন্তু উপায়ও তো নেই, রাইমোহন ঘোষালের সঙ্গে সে কথায় এঁটে উঠতে পারবে না। কাজটাও বড় বেশী লোভনীয়। এই সব বড় মানুষদের বাড়ির একটা বিয়ের কাজ করেই অনেকে ভাগ্য ফিরিয়ে নেয় ! মাধবের নাম করেই রাইমোহন গুপীর একেবারে ঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছে। মাধবের কাছ থেকে কাজ কেড়ে নেবার আনন্দে গুপী পঞ্চাশ একশো টাকা অনায়াসে জলাঞ্জলি দিতে পারে।

টাকাগুলো গুণে বেনিয়ানের জেবে ভরে নিয়ে রাইমোহন তৃপ্তির হাসি হাসলো। নিজের কৃতিত্বে সে নিজেই মুগ্ধ। উদারভাবে সে আবার পানের ডিবেটা বাড়িয়ে দিল গুপীর দিকে।

—তাহলে কাজ ঠিক হাসিল হবে তো, ঘোষালমশাই ?

—তুই নিশ্চিন্তি থাক। তোর বাড়ি এবার তিনতোলা হলো বলে !

—আজ মাল আনেননি কিচু ?

—নাঃ !

—তাহলে এবার গা' তোলা যাক। আজ খবর-টবরও কিচু শোনালেন না।

—বোস্‌, আরও কাজ আচে। খবর আর কী, দেশে মড়ক লেগেচে, ওলাউঠোয় কত মানুষ পটাপট মরে যাচ্চে ! লোকে মড়া পুড়োবারও ফুর্সোৎ পাচ্চে না। গঙ্গায় হাজারে হাজারে শব ভাসচে। দেকে আয় গে, সে এক দ্যাকার-মতন জিনিস !

—রাম কহো ! ও আবার কেউ দেকতে যায় !

—ঘাটে এত মড়া ভাসচে যে সাহেবরা জাহাজ ভিড়োতেও পাচ্চে না। বড় বড় কত্তারা এই নিয়ে মিটিং কত্তে লেগেচে। এমন মড়কের কথা জম্মে শুনিনি। এর মধ্যে শুনলুম দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলেত

থেকে ফিরলেন।
গুপী চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলো, বলেন কী ? উনি বিলেত গেলেন কবে ? কিছুই শুনিনি তো ! কালাপানি পেরুলেন ? জাত ধম্মো সব জলাঞ্জলি দিলেন ?
—ওঁর আর জাত ধম্মো আচে কী ? বড় মানুষদের জাতে কখনো ফোস্কা পড়ে ? কেউ পাঁতি দিতে গেলে তাদের গায়ে চাঁদির জুতি কষাবেন, অমনি সব ঠিক হয়ে যাবে। ওঁর গুরুঠাকুর কালাপানি পেরিয়েছেল আর উনি পেরুবেন না ? যাকগে, শোন, এক ছড়া সোনার হার দে তো আমাকে। ছোট হলেই চলবে, বেশী বড়র দরকার নেই।
—হার ? আপনি কিনবেন ?
গুপী যদি অতিরিক্ত বিস্ময়াপন্ন হয়ে পড়ে, তা হলেও তাকে দোষ দেওয়া যাবে না। রাইমোহনই এদিক সেদিক থেকে হাত সাফাই করে আনা সোনার জিনিস বিক্রয় করে গুপীকে। বস্তুত সেই উপলক্ষেই তার এখানে পদার্পণ ঘটে। আজ ঠিক তার বিপরীত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হচ্ছে।
—হ্যাঁরে ব্যাটা, আমি কিনবো। কেন, ক্ষ্যামতা নেই নাকি আমার সোনা কেনার ?
—না, বলছিলুম কি, আপনি নিজেই আবার বে-শাদী কচ্চেন নাকি ?
—কতা বাড়াসনি। তোর কাচে হারটার কী আচে দ্যাকা, আমার তাড়া আচে।
গুপী ছোট বড় নানা মাপের চার পাঁচটি হার বার করলো। কোনোটিতে পাথরের লকেট বসানো, কোনোটি সাধারণ নক্সাকাটা। এর মধ্যে থেকে একটি ছোট মফচেন তুলে নিয়ে রাইমোহন জিজ্ঞেস করলো, এটা ওজন কর, দ্যাক কতোটা সোনা—
হারটি ছোট হলেও বেশ ভারী, পুরো দেড় ভরি। গুপী তার দর হাঁকলো পঁয়ত্রিশ টাকা। রাইমোহন তাই শুনে গুপীর থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বললো, বা বা বা বা বা বা ! বলিহারি আক্কেল রে ! আমি বেচতে এলে বলবি উনিশ টাকা ভরি, তার বেশী একটা আধলা না, আর আমাকে তুই বেচবি বেশী দরে ? অ্যাঁ ?
—আজ্ঞে আমার বানিটা ধরবেন তো !
—চশমখোর, আমার কাছ থেকেও বানি চাইচিস !
অনেক দরাদরি করে বত্রিশ টাকায় রফা হলো। গুপী তার কমে কিছুতেই দেবে না। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাইমোহন বললো, আচ্ছা দে ! আর পারি না তোর সঙ্গে।
ছোট বাক্সে হারটি ভরে দিতে দিতে গুপী বললো, কিন্তু ঘোষালমশাই, এত ছোট হার তো কোনো হুরী-পরীর গলায় মানাবে না। লাল পাতর বসানোটি নিলে পাত্তেন, বেশ দ্যাখনদার ছিল।
—তার দামটিও যে দ্যাখনদার ! দে, দে, ওতেই হবে ! তোকে আর ফোঁপরদালালি করতে হবে না।
—কার গলায় পরাবেন ?
—চুপ্ মার !
রাইমোহন যেন একটু লজ্জা পেয়েছে মনে হয়। আর কথা বাড়াতে চায় না। মোড়া থেকে টক করে উঠে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে গুঁতো খেল মাথায়। তার দৈর্ঘ্যের তুলনায় এ ঘরের ছাতটি যে নীচু, সে কথা তার প্রায়ই মনে থাকে না।
—চলি রে, গুপী !
—দামটা দিলেন না ?
—অ ! ভুলেই গিসলাম। আমি নগদানগদির কারবারই পছন্দ করি। ধারধোর রাখা আমার স্বভাব নয়।
বেশ সাড়ম্বরে রাইমোহন একটু আগে গুপীরই দেওয়া সিক্কাগুলি বার করলো জেব থেকে। গুণে গুণে বত্রিশ টাকা তুলে দিল গুপীর হাতে। তারপর কৌটোটি ট্যাঁকে গুঁজে নিষ্ক্রান্ত হলো।
এবার গুপীও মুচকি হাসলো একটু। সব দুঃখেরই সান্ত্বনা আছে। রাইমোহন চিনতে পারেনি। এই হারটিই রাইমোহন কিছুদিন আগে গুপীর কাছে বিক্রি করে গিয়েছিল আঠাশ টাকায়। গুপী তার ওপর চার টাকা লাভ রেখে দিল। ভাগ্যে না থাকলে এরকম দাঁও জোটে না।
রাইমোহনের গন্তব্য বউবাজার। গুপীর দোকান থেকে বেরিয়েই অদূরেই পথে পড়লো জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। সেদিকে তাকিয়ে রাইমোহন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।
এই বাড়িটির ওপর তার রাগ আছে। রাইমোহন এ বাড়িতে ভিড়তে গিয়েছিল, কিন্তু ঠোক্কর খেয়ে

ফিরে এসেছে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ি গতায়াত করতে পারলে দেশের দশটা লোকের কাছে ইজ্জত বাড়ে। রাইমোহনের কাকা দ্বারকানাথের বয়স্য ছিলেন। তিনি অকালে চোখ বুজেছেন। খুড়োর জায়গায় উপযুক্ত ভাইপোরই কাজ পাবার কথা। তা দ্বারকানাথ তো এখন আর দিশী লোকদের আমোলই দ্যান না। সাহেবসুবো ছাড়া কথা নেই, ঘুরে এলেন খোদ সাহেবদের মুল্লুক থেকে। সে যাই হোক, তাঁর ছেলে দেবেন্দ্র এখন লায়েক হয়েছে, বিষয়কর্ম দেখছে, তাঁরও এখন পারিষদের প্রয়োজন। গোড়ায় গোড়ায় দেবেন্দ্রবাবু যেরকম ফুর্তি-ফার্তা শুরু করেছিল, তাতে বেশ আশা হয়েছিল রাইমোহনের। কয়েকবার সে ঘুরঘুর করেছিল দেবেন্দ্রবাবুর আশেপাশে। কিন্তু ঠিক পাত্তা পায়নি। দেবেন্দ্রবাবুর নাকি মতিগতি বদলে গেছে, মদ মেয়েছেলেতে আসক্তি নেই, নাচ গানের আসর বসান না, পুরুষমানুষের যোগ্য কাজ কিছুই করেন না। সংস্কৃত শেখার খুব ঝোঁক হয়েছে নাকি। এটা একটা অন্যায় কথা নয় ? অত বড় বংশের ছেলে, একটু আধটু বখামি না করলে আর পাঁচজন লোকের অন্ন সংস্থান হবে কী করে ? দেবেন্দ্রবাবুকে বাইরে আর প্রায় দেখাই যায় না, কিছু মেনিমুখো মদ্দার সঙ্গে দিনরাত কী সব গুজুর গুজুর ফুসুর ফাসুর করেন। রাইমোহন ঠিক তাল ধরতে পারছে না। লোকে বলাবলি করছে, দ্বারকানাথের মোসাহেবরা এক একটি গড়ুর পক্ষী, আর সেই মানুষের ছেলে হয়ে দেবেন্দ্রবাবু চাট্টি বায়স পুষছেন।

রাইমোহন মনে মনে বললো, কেটে যাবে, এসবও কেটে যাবে। এসব নিরিমিষ্যি ভড়ং আর কতদিনের। জমিদার বাড়ির ছেলে রক্ত চাটবে না এ কখনো হয় ?

জানবাজারে কমলাসুন্দরীর বাড়িতে আজ দারুণ আসর জমেছে। লখনৌ থেকে কালোয়াতী গানের এক ওস্তাদ আর তবলা বাজনাদার আনিয়েছেন রামকমল সিংহ। এ সবই কমলাসুন্দরীর মনোরঞ্জনের জন্য। কমলাসুন্দরীর নৃত্যের খ্যাতি দিকবিদিক ছড়িয়েছে, সে আরও তালিম নিতে চায়। ব্যয়ের ব্যাপারে রামকমল সিংহের কোনো কার্পণ্য নেই। কমলাসুন্দরীর যে-কোনো আবদার তিনি রক্ষা করতে প্রস্তুত। বাবু তো বাবু রামকমল সিংহ। এ কথা স্বীকার করছে সকলে। পাঁচজন লোক ডেকে নিজের রক্ষিতার নাচ দেখানো এমন কাজ আগে কেউ কখনো করেনি। বাঈ নাচের আসর বসাতে হলে সকলেই বাঈজী ভাড়া করে আনে, নিজের মেয়েমানুষকে রাখে আড়ালে। কিন্তু কমলাসুন্দরীকে আর পাঁচজনে তারিফ করলে রামকমল সিংহ যেন আরও বেশী আনন্দে মেতে ওঠেন।

সন্ধ্যে থেকে বসে নাচ গানের আসর। জানবাজারের বাড়িটি সম্প্রতি রামকমল সিংহ কিনেই ফেলেছেন। ইয়ার বন্ধুদের সেখানে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনেন তিনি, খাদ্য মদ্য থাকে অঢেল, কিন্তু স্ত্রীলোক ঐ একটিই। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুর্তির মাত্রাও চড়তে থাকে। কমলাসুন্দরীর গাত্রবর্ণ ভ্রমরকৃষ্ণ, লাল রঙের ঘাঘড়া ও ওড়নাই তার পছন্দ, আসরের মাঝখানে তাকে মনে হয় একটি ঘুরন্ত রক্তবর্ণের শিখা। এক একবার নাচ থামলেই কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ এনকোর এনকোর চিৎকারে হুলুস্থুলু পড়ে যায়। উত্তেজনা যখন তুঙ্গে, তখনই এক সময় রামকমল সিংহ উঠে আসরের মাঝখানে এসে কমলাসুন্দরীর কোমর বেষ্টন করেন। সে সময় যুগল নৃত্যের জন্য সমস্বরে অনুরোধ আসে মুহুর্মুহু, কিন্তু রামকমল সিংহ সকলের সামনে নিজেকে এতটা খেলো করতে চান না। তাঁর মুখে ফুরফুরে হাসি, চক্ষু ঢুলুঢুলু, তিনি সেই অবস্থায় কমলাসুন্দরীকে পাশের শয়ন কক্ষে নিয়ে গিয়ে দ্বার বন্ধ করে দেন।

এই প্রকার ব্যবহারে রামকমল সিংহ বেশী আনন্দ পান। লাস্যময়ী কমলাসুন্দরী যখন উপস্থিত ভদ্র পঞ্চজনের কাছে কামনীয়া হয়ে ওঠে, যখন সে সকলেরই বুকে লালসা বহ্নি জ্বেলে দেয়, সেই সময়ই রামকমল সিংহ যেন তাদের বোঝাতে চান, দেখো, এই রমণী শুধু আমারই অঙ্কশায়িনী।

রাইমোহন এ আসরে নিয়মিতই উপস্থিত থেকে এই মজা দেখে। আজ সে সেই গৃহের কাছাকাছি গিয়েও অন্দরে প্রবেশ করলো না। প্রথমে ভেবেছিল, কিছুক্ষণ অন্তত বসে খানিকটা পরস্মৈপদী সুরা টেনে আসবে। কিন্তু মন বদল করে ফেললো। সে চললো বউবাজারের দিকে।

ছিপছিপ ছিপছিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা সঙ্গে রাখে না রাইমোহন, ভিজতেই লাগলো। লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগলো খানাখন্দ বাঁচিয়ে। তার মনের মধ্যে একটা দো-টানা চলছে। তার ফুর্তিপ্রিয় মনটা তাকে টানছে পেছনের দিকে, গান বাজনা সম্পর্কে তার একটা সহজাত প্রীতি আছে, প্রথম যৌবনে সে অনেক শখ করে সঙ্গীতের চর্চা করেছিল। তখন উদ্দেশ্য ছিল বিশুদ্ধ আনন্দ, এখন অবশ্য সে সঙ্গীতকে অন্য কাজে লাগায়। তবু এখনো উঁচু জাতের গান তাকে আকৃষ্ট করে, সঠিক তালের নাচের মধ্যে সে লাস্য ছাড়া আরও কিছু পায়। কমলাসুন্দরী রামকমল সিংহের বলতে গেলে ক্রীতা রমণী, সেদিকে রাইমোহনের নজর নেই, কিন্তু তার নাচ দেখলে তবু অন্তত নাচটাই দেখা হয়। তাছাড়া

সন্ধ্যের পর মজলিশে মজলিশে সময় কাটানো তার অনেক কালের অভ্যেস, দু' পাত্তর টানার জন্য গলার ভেতরটা শক শক করছে। অথচ এ কথা রাইমোহন বোঝে যে একবার ঐ মজায় মজলে সে আর সহজে বেরুতে পারবে না। প্রায় রাতেই রাইমোহন কমলাসুন্দরীর নাচঘরের ফরাসেই গড়াগড়ি দেয়।

আবার হীরেমনির কাছেও পাঁচ সাতদিন আসা হয়নি। সেজন্য রাইমোহন একটু একটু অপরাধী বোধ করে। শেষ পর্যন্ত পিছুটান উপেক্ষা করে সে জোরে জোরে পা চালালো।

পায়ের ইংলিশ জুতো জল কাদায় মাখামাখি। মসজিদের পাশের পুকুরে ভালো করে পা ধুয়ে নিয়ে সে এসে দাঁড়ালো হীরেমনির বাড়ির সামনে।

এ গৃহ আজ বর্ণহীন। জানলাগুলি বন্ধ, ভিতরে কোনো জনমনুষ্য আছে বলেই বোঝা যায় না। রাইমোহন অবাক হলো না। সদরদ্বার খোলাই ছিল, সে ভেতরে ঢুকে পড়লো। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে পা ঘষে ঘষে কোনোক্রমে সে উঠতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। হীরেমনির নোকরটি পালিয়েছে, রাইমোহন আগের দিন এসেই দেখেছিল, তার বদলে কাজ করছিল একটি পশ্চিমা স্ত্রীলোক। আজ বোধহয় সে-ও নেই। হীরেমনি আছে তো?

ওপরে উঠে এসে বড় ঘরটির দরজা ঠেলে সে সভয়ে ডাকলো, হীরে, হীরেমনি!

এ ঘরটিও অন্ধকার প্রায়। এক কোণে একটি মাটির মালসায় তুষের আগুন জ্বলছে ধিকিধিকি করে। ঘরে কেউ আছে কি না বোঝা যায় না।

দু' তিনবার ডাকবার পর ক্ষীণ গলায় সাড়া এলো, কে?

নিশ্চিন্ত হয়ে রাইমোহন ঢুকে পড়লো ঘরে। চক্ষু সঙ্কুচিত করে আঁধার সইয়ে নিয়ে সে দেখলো জাজিমের ওপর লম্বমান এক নারীকে।

—কেমন আচিস, হীরেমনি?

—তুমি ফের এয়েচো?

রাইমোহন চলে গেল তুষের মালসার কাছে। সে জানে, পাশেই গন্ধক মাখানো টুকরো টুকরো পাটখড়ি রাখা থাকে। হাতড়ে হাতড়ে সেইরকম একটি পাটখড়ি পেয়ে সে তুষের আগুনের মধ্যে ঠেসে ধরলো, অমনি ফস করে জ্বলে উঠলো সেটা। সেই জ্বলন্ত পাটখড়ি উঁচু করে ধরে সে জিজ্ঞেস করলো, মোমবাতি কোতায় রে?

বেশী খুঁজতে হলো না, মোমবাতি সে নিজেই পেল, সেটা ধরাবার পর সে বললো, একটা গামোছা কোতায় পাই বল দি'নি? মাতাটা ভিজে জবজবে হয়ে গ্যাচে।

ম্লান আলোয় মেঘলুপ্ত চাঁদের মতন দেখায় হীরেমনির মুখখানি। দু' চোখের নীচে মৃত্যুর পাণ্ডু রঙ। শরীর কঙ্কালসার। কণ্ঠে জোর নেই, তবু হীরেমনি বললো, পোড়ামুখো মনিষ্যি, তুমি ফের মরতে এয়োচো এখেনে! দূর হও! দূর হও!

রাইমোহন হেসে বললো, আসা মাত্তরই দূর দূর করচিস কেন রে? লোকে কুকুর বেড়ালকেও এমনিভাবে তাড়ায় না!

হীরেমনি বললো, তোমায় কতবার আসতে বারণ করিচি! আমি তো মরতে বসিইচি, তোমারও মরার সাধ হয়েচে বুঝি?

হীরেমনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে। তার ধারণা, তার সংস্পর্শে এলে রাইমোহনও পড়বে সেই অসুখে। তিন মাস হয়ে গেল হীরেমনিকে আঁকড়ে আছে এই কালরোগ, নিচ্ছেও না, ছাড়চেও না। হীরেমনির কাছে অনেকদিনই আর কেউ আসে না। তার জিনিসপত্রও ক্রমে ক্রমে উধাও হয়ে গেছে। যৌবন চলে গেলে বারবনিতার আর কিছুই থাকে না, কিন্তু হীরেমনির বয়েস এখনো কুড়ি পূর্ণ হয়নি, তবু তার এই দুরদৃষ্ট।

—চাঁদু কোতায়? চাঁদু?

—ঘুমুচ্চে পাশের ঘরে।

—এই সন্ধেবেলা ঘুমুচ্চে? খেয়েচে কিচু?

—তোমার অত কতার দরকার কী?

—আ মোলো, অমন কতায় কতায় মুখ ঝামটা দিচ্চিস কেন? ছেলেটা খেয়েচে কিনা জানবো না? সেদিন যে মাগীকে দেখে গেসলুম তোদের রান্না করে দিচ্চে, সে গেল কোতায়?

—কে জানে!

রাইমোহন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বেঘোরে মরতে বসেও হীরেমনির অহংকার যায়নি, সে কিছুতেই রাইমোহনের কাছ থেকে কোনো সাহায্য নিতে চায় না। রাইমোহন টাকা দেওয়ার চেষ্টা করলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। হীরেমনির ছেলে চন্দ্রনাথের বয়স এখন তিন বছর, মায়ের এই অসুখে তারও দুরবস্থার একশেষ হচ্ছে। কেই বা দেখাশুনো করবে। যা অবস্থা, তাতে চোর ডাকাতরা যে কোনোদিন মা-ছেলেকে কেটেকুটে বাকি সব জিনিসপত্রও নিয়ে চলে যাবে। রাইমোহনের সংসারে কেউ নেই, কবেই সব উৎসন্নে গেছে, সুতরাং চন্দ্রনাথকে সে নিজের কাছে নিয়ে রাখতেও ভরসা পায় না। আর কার কাছেই বা রাখবে, বেশ্যার ছেলেকে কে নেবে ?

পাশের ঘর থেকে ঘুমন্ত চন্দ্রনাথকে তুলে নিয়ে এলো রাইমোহন। ছেলেটার চোখের নীচে শুকনো জলের দাগ, তাই দেখে কঠিনহৃদয় রাইমোহনেরও বুকটা একটু মুচড়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে রাগও হলো তার।

হীরেমনির পাশে বসে সে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, তুই এখনো বল, হীরেমনি, এ ছেলে কার ? আমি তার গলায় গামছা দিয়ে এখানে হিড়হিড় করে টেনে আনবো ! গোটা কলকেতা শহরে খবর রটিয়ে দেবো !

হীরেমনি ফোঁস করে উঠে বললো, ফের ঐ কতা ? দূর হয়ে যাও আমার চোকের সুমুখ থেকে। ছেলে আমার, ভগমান আমায় দিয়েচেন।

এ কি বিস্ময়কর বিশ্বস্ততা হীরেমনির ! মৃত্যু শিয়রে রেখেও সে সততার জেদ ছাড়বে না। এই ব্যাপারটাই রাইমোহনকে বেশী টানে। তঞ্চকতাই তার পেশা ; ভণ্ডামি, জুয়াচুরি ও মিথ্যের অস্ত্রগুলি সে সারা জীবন শানিয়ে বেড়াচ্ছে ; আর একজন সামান্য স্ত্রীলোক হারিয়ে দিচ্ছে তাকে। সতীত্ব নেই অথচ সততা আছে, এমন স্ত্রীলোকও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে থাকে ?

—যদি জগমোহন সরকার হয় তো একবারটি বল, আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙবো। সে নচ্ছারটা ফিমেল উদ্ধারের নাম করে ভদ্দরলোকের বাড়ির অন্দরে টুঁ মেরে বেড়াচ্চে। মাথা ভরা কুমতলব, আর মুখে বড় বড় কতা ! কত পিরীত ছিল তোর সঙ্গে, এখুন আর ইদিকে আসবার নামটি নেই।

—হাজার বার বলিচি তিনি নন্।

—বেশ, তবে আজ থেকে আমিই চাঁদুর বাপ হলুম।

—না, তোমার মুরোদে কুলোবে না। ওর বাপ কেউ নয়। ওর বাপ নেই। আমি মরলে চাঁদুও আমার সঙ্গে মরবে।

—হীরে, আমার ওপর কেন অত রাগ করিস ? সুখের খোঁজে লোকে তোদের মতন মেয়েমানুষের কাচে আসে। অসুখে-পড়া মাগ দেখতে কেউ ভুলেও আসে না। কিন্তু আমি তো এসিচি।

—বেশ কোরেচো। এখন বিদায় হও।

—চাঁদুকে আমি আজ থেকে পুষ্যি নিলুম। এই দ্যাখ।

ট্যাঁক থেকে সোনার হারটা বার করে সে পরিয়ে দিল চন্দ্রনাথের গলায়। তারপর ছোট একটি হাততালি দিয়ে বললো, বাঃ দিব্যি মানিয়েচে।

—খুলে নাও, এক্ষুনি খুলে নাও। কার ঘর ঠেঙে চুরি করা মাল তুমি এখেনে গচাতে এয়োচো !

—চুরি করা ? তোকে কিরে কেটে বলচি, এ আমার হক্কের জিনিস। ওকে আজ ছেলে বলে ডাকলুম, খালি হাতে আসা যায় ? তোকে আর একটা কতাও বলচি, আজ থেকে আমি এখেনেই ঠাঁই নেবো। আর যাচ্চিনি। আমি এখুনি বেরিয়ে খাবারদাবার কিনে আনচি। তুই ভেবেচিস আমায় ফাঁকি দিয়ে পালাবি ?

চন্দ্রনাথের মুখশ্রী সুন্দর, গৌরবর্ণ, সোনার হারটি পরানোতে সেই শিশুকে আরও সুশোভন দেখায়। রাইমোহন সেদিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে রইলো। পুষ্যি নেওয়ার দিন একটা কিছু স্বর্ণালঙ্কার দেওয়া নিয়ে কথা। তারপর আবার টাকা পয়সার হঠাৎ ঘাটতি পড়লে ঐ হারটিই বেচে দিয়ে আবার দু' পাঁচদিন চালানো যাবে।

হীরেমনি আর পারলো না, নিঃশব্দে অশ্রু বর্ষণ করতে শুরু করলো। রাইমোহন হীরেমনির শীর্ণ গ্রীবায় হাত রেখে বললো, তোকে আমি সারিয়ে তুলবোই ! তুই ভালো হয়ে ওঠ, হীরে, তারপর তোতে আমাতে মিলে আগুন জ্বালাবো ! তোকে আমার খুব দরকার।

এবারে কিছু পুরোনো আমলের গালগল্প করা যাক।

দিল্লীর বাদশাহের সনদ নিয়ে খান জাহান আলী নামে একজন সেনাপতি এসেছেন যশোর শাসন করতে। এই খান জাহান আলীকে অবশ্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নেই, আমাদের আগ্রহ তাঁর এক কর্মচারী সম্পর্কে। তবু খান জাহান আলীর উল্লেখের প্রয়োজন হলো, কারণ এই ব্যক্তিটির নাম আছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, ইনি মারা যান ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে, তখনও চৈতন্যদেব জন্মাননি।

তৎকালে বাঙালীদের নামের সঙ্গে কোনো পদবী যুক্ত হওয়ার রেওয়াজ ছিল না। গোত্র এবং গ্রামের পরিচয়েই মানুষের পরিচয়। খান জাহানের সেই কর্মচারীটির সঠিক নামও আমরা জানি না। সে ব্রাহ্মণের ছেলে। নবদ্বীপের কাছে পিরল্যা গ্রামে তার জন্ম। সে এক সুন্দরী মুসলমান রমণীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হলো। সেই প্রণয় এমনই তীব্র যে তার জন্য সে জাত ধর্ম বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। হিন্দু ধর্ম এমনই কঠোরভাবে গণ্ডীবদ্ধ যে সেখানে অন্য ধর্মের মানুষের কোনোক্রমেই প্রবেশ অধিকার নেই। ব্রাহ্মণের ছেলে যবনী বিবাহ করলে তার স্ত্রীকে তো কোনোক্রমেই হিন্দুত্বে বরণ করা যাবে না, বরং সে ছেলেটিরই জাত যাবে। সুতরাং প্রণয় পরিণামে এই ব্রাহ্মণ সন্তানটি জাতিভ্রষ্ট হলেও তার নতুন নাম হলো মামুদ তাহির। সে পিরল্যা গ্রাম থেকে এসেছে বলে আগে তাকে পিরল্যীয়া বলে ডাকা হতো, এই নামটিরও একটি চমৎকার মুসলমানী রূপ পাওয়া গেল, পির আলী।

হিন্দু ধর্ম নতুন কারুকে গ্রহণ করে না বরং নিজের লোকদেরই পরধর্মের দিকে ঠেলে দেয়, পৃথিবীর অপর ধর্মগুলি কিন্তু নবাগতদের সাদরে অভ্যর্থনা জানায়। এমনকি অনেক সময় কিছু কিছু পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করে। ধর্মান্তরিত হবার পর পির আলী তার প্রভুর নেকনজরে পড়লো এবং বখশিস হিসেবে পেয়ে গেল একটি পরগণা। সেই পরগণাটির নাম চেঙ্গুটিয়া।

ক্রমে এই পরগণাদার পির আলী বেশ একটি মান্যগণ্য লোক হয়ে উঠলো এবং প্রায়ই ধূমধাম করে নানারকম উৎসবের আয়োজন করতো।

কথায় বলে, নতুন মুসলমান গোরু খাওয়ার যম। পির আলী নিজে তো খেতেনই, উপরন্তু সকলকে গো-মাংস ভক্ষণের উপকারিতা বিষয়ে নানা কথাবার্তা শোনাতেন। কিন্তু চেঙ্গুটিয়া পরগণাটি হিন্দুপ্রধান এবং এখানে বেশ কিছু ব্রাহ্মণের বাস। সুতরাং পির আলীর মতামত সহজে জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা ছিল না।

কামদেব ও জয়দেব নামে দুই ব্রাহ্মণ দেওয়ানী করতো এই পির আলীর অধীনে। একদিন তারা তাদের সহৃদয় প্রভুর সঙ্গে একটি অপ্রত্যাশিত রসিকতা করে ফেললো। সেইটিই তাদের জীবনের মহত্তম ভুল। অথবা, ভুলই বা বলছি কেন, এইসব ঘটনাই তো ইতিহাসের কৌতুক।

রোজার মাস, উপবাসী পির আলী তাঁর পাত্রমিত্রদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করছেন, তাঁর হাতে এক্‌টি গন্ধ লেবু। মাঝে মাঝে সেটি নাকের কাছে এনে শুঁকছেন তিনি। এমন সময়ে কামদেব ও জয়দেবের মধ্যে একজন কেউ বললো, উজির সাহেব, আপনার আজকের রোজা তো ভঙ্গ হয়ে গেল!

বিস্মিত পির আলীকে সে আরও বুঝিয়ে দিল যে, তাদের শাস্ত্রমতে ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনম্। সুতরাং রোজার মাসের নিয়মরক্ষা হলো না।

এই শুনে পির আলী হাসলেন। সেই হাসির মধ্যে গভীর মতলব ছিল।

এরপর একদিন পির আলী তাঁর দরবারে বহু হিন্দুকে নিমন্ত্রণ করে কথাবার্তার মাঝে হঠাৎ ভৃত্যদের কী এক ইঙ্গিত করলেন। অমনি ভৃত্যরা অনেকগুলি জ্বলন্ত উনুন নিয়ে এলো সভাকক্ষে, সেইসব উনুনের ওপর কড়াইতে গো-মাংস রান্না হচ্ছে। লোকশ্রুতি এই, সেদিন পির আলী এক শত গো বধ করেছিলেন।

গো-মাংসের গন্ধ পেয়ে অনেক হিন্দু নাকে কাপড় দিলেন, অনেকে সভা ছেড়ে পালালেন। কিন্তু পির আলী চেপে ধরলেন কামদেব আর জয়দেবকে। তিনি বললেন, তোমরা পালাচ্ছো কেন?

তোমাদেরই শাস্ত্রমতে তোমাদের অর্ধেক ভোজন হয়ে গেছে এবং সেই অনুযায়ী তোমাদের জাত গেছে। সুতরাং আর চক্ষুলজ্জা রেখে লাভ কী ? আমার পাশে বসে বাকি ভোজনটাও সেরে নাও !

ধর্মান্তরিত হবার পর কামদেব আর জয়দেবের নাম হলো কামালউদ্দিন ও জামালউদ্দিন। এবং উপহার পেল জায়গীর। কিন্তু ঘ্রাণে অর্ধ ভোজনের মতন, হিন্দু পরিবারের অর্ধেক মুসলমান হলে বাকি অর্ধেকও নিষ্কৃতি পায় না। কামদেব, জয়দেবের আর দুই ভাই ছিল, তাদের নাম রতিদেব আর শুকদেব। সমাজ খড়্গহস্ত হলো এদের প্রতি, আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে জল-অচল হলো এবং পির আলীর নামের সুবাদে এদের পরিবারের নামের সঙ্গে পিরালী অপবাদ যুক্ত হয়ে গেল। লোকে এদের পুরোপুরি ব্রাহ্মণ বলে না, বলে পিরালীর বামুন।

আত্মীয়স্বজনদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এই দুই ভাইয়ের মধ্যে রতিদেব গৃহত্যাগ করলো। খুব সম্ভব তার কোনো পুত্রকন্যা ছিল না, তাই বৈরাগ্য গ্রহণ তার পক্ষে সহজ হয়েছিল। কিন্তু শুকদেব পড়লো মহা বিপদে। তার নিজের বিবাহযোগ্যা কন্যা রয়েছে। এক ভগ্নীরও তখনো পর্যন্ত বিবাহ দেওয়া হয়নি। পরিবারে খুঁত লেগে গেছে বলে এই দুই কন্যার বিবাহের জন্য কোনো পাত্র পাওয়া যায় না। তখন শুকদেব সমাজের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করলো তার শেষ অস্ত্র, যার চেয়ে অমোঘ অস্ত্র আর হয় না। টাকা দিয়ে সে কিনে ফেললো দুজন ব্রাহ্মণকে। শুকদেবের ভগ্নীর বিবাহ হলো ফুলে গ্রামের মঙ্গলানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবং কন্যার স্বামী হলো পিঠাভোগ গ্রামের জগন্নাথ কুশারী। যৌতুক হিসেবে উভয়েই পেল প্রচুর জমি ও ধন। পরবর্তীকালে শুকদেব, মঙ্গলানন্দ, জগন্নাথদের সন্তানসন্ততিরা সকলেই পিরালীর ব্রাহ্মণ বলে চিহ্নিত হয়ে রইলো।

সকলের কথা থাক, আমরা শুধু জগন্নাথ কুশারীকেই অনুসরণ করি। যেমন গাঙ্গুল গ্রামের ব্রাহ্মণেরা গাঙ্গুলী, সেইরকমই কুশ গ্রামনিবাসীরা কুশারী। এই কুশ গ্রামটি বর্ধমান শহরের কাছে। ক্রমে এই কুশারীরা বাঁকুড়ার সোনামুখী, খুলনার পিঠাভোগ এবং ঢাকার কয়কীর্তন গ্রামেও বসতি নেয়। অথবা বলা যায়, সেইসব গ্রামের গ্রামীণ বা গাঞী হয়। আমাদের এই কাহিনীতে, পিঠাভোগের কুশারীদের গুরুত্ব অনেকখানি।

এই কুশারীরা সুদীর্ঘ বংশগৌরব দাবী করতে পারে। আদিশূর নামে গৌড়ের জনৈক রাজা, যিনি পৌরাণিক না ঐতিহাসিক তা বলা শক্ত, (আমরা এ পরিচ্ছেদের শুরুতেই এসব কাহিনীকে গালগল্প বলে অভিহিত করেছি) কনৌজ থেকে পাঁচজন খাঁটি ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন। ধরে নেওয়া যায়, গৌড় বাংলা তখন ছিল অনার্য অধ্যুষিত। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ থেকেই শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, বাৎস্য এবং সাবর্ণ গোত্রের উদ্ভব। উত্তরকালে এইসব গোত্র বিভাগ প্রচুর জটিলতার সৃষ্টি এবং অনাসৃষ্টি করেছিল।

শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রথম পুরুষ ক্ষিতীশের এক পুত্রের নাম ভট্টনারায়ণ, যিনি প্রখ্যাত সংস্কৃত নাটক বেণী সংহারের রচয়িতা বলে অনেকের ধারণা। সেই ভট্টনারায়ণের বংশধর আমাদের আলোচ্য কুশারীরা। মূল শাণ্ডিল্য গোত্রের জন্য এঁদের বন্দ্যঘটী বা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু গাঞী নিরিখে এঁরা কুশারী।

এমত বংশগৌরব থাকলেও যবন সংসর্গ হেতু পিঠাভোগের কুশারীদের পিরালী নাম অর্শে গেল। ধর্ম ও সমাজপতিদের অত্যাচার তাদের সইতে হয়েছে বহু প্রজন্ম ধরে। অনেক কাল পরে তারা এর শোধ নেয়।

এবার কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে আসা যাক। ঐ কুশারী বংশেরই এক সন্তান পঞ্চানন এবং তাঁর খুল্লতাত শুকদেব আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাদ করে স্বগ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন ভাগ্যান্বেষণে। ঘুরতে ঘুরতে এঁরা এসে পৌঁছোলেন গোবিন্দপুরের খাঁড়ির কাছে। খাটো জাতের ব্রাহ্মণ হলেও তাঁদের সাজ-পোশাকের কোনো ত্রুটি ছিল না। পরিধানে পট্টবস্ত্র, মাথায় স্থূল শিখা এবং ললাটে চন্দন, গাত্রবর্ণ অতিশয় গৌর। দেখলেই ব্রাহ্মণ বলে চেনা যায়। গোবিন্দপুরের খাঁড়ির পাশে তখন শুধু কয়েক ঘর জেলে, মালো, কৈবর্তের বাস। ব্রাহ্মণ দেখে তারা ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো এবং সেখানেই অধিষ্ঠিত হবার অনুরোধ জানালো। গ্রামের মধ্যে ব্রাহ্মণদের আশ্রয় দেওয়া একটি বড় পুণ্যকর্ম।

সেই গোবিন্দপুরের খাঁড়ির নামই ইদানীং আদি গঙ্গা বা টালির নালা। গোবিন্দপুর, সুতানটি এবং কলকাতা নামে তিনটি গ্রাম জুড়ে ইংরেজরা তখন নতুন একটি শহরের পত্তন করছে। এই খাঁড়ি দিয়ে জাহাজ চলাচলের সুবিধার জন্য এটিকে কেটে প্রশস্ত করা হচ্ছে এবং গ্রামের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য সাহেবরা যখন আসে তখন গ্রামের জেলেরা নিজেরা কথা বলার সাহস না পেয়ে ব্রাহ্মণ দুজনকে এগিয়ে দেয়। ব্রাহ্মণ দেবতুল্য, তাই গ্রামের মানুষ তাঁদের ঠাকুর বলে ডাকে।

সাহেবরা সঠিক উচ্চারণ করতে পারে না বলে, তারা বলে টেগোর। কুশারী ও পিরালী পরিচয় মুছে ফেলে পঞ্চানন ও শুকদেব ঠাকুর হয়ে গেলেন।

এই ঠাকুররাই কলকাতার আদিযুগের স্টিভেডর এবং কন্ট্রাক্টর। প্রথম প্রথম পঞ্চানন ও শুকদেব সাহেবদের জাহাজে মালপত্র সরবরাহ করতেন। তারপর সাহেবদের সঙ্গে ভালোমতন পরিচয় হয়ে যাওয়ার ফলে আরও নানারকম কাজের ভার পেতে লাগলেন তাঁরা। নতুন শহরে তখন অনেক প্রকার কর্মোদ্যম চলছে। বর্গীর হাঙ্গামা থেকে রক্ষা পাবার জন্য কাটা হলো মারহাট্টা ডিচ। সিরাজউদ্দৌল্লা হঠাৎ এসে কলকাতার কেল্লা গুঁড়িয়ে দেবার পর ইংরেজরা ময়দানের ফাঁকা জায়গায় মজবুত করে তৈরি করে নতুন কেল্লা বা ফোর্ট উইলিয়াম। এইসব কাজের ঠিকাদারির ভার পায় ঐ দুই ঠাকুরের পুত্র ও পৌত্রেরা। ঠাকুরদের তখন এতই ধনসম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, শোনা যায় দুর্গম বন জঙ্গল সাফ করে তাঁরা যেখানে একটি বাগানবাটি প্রস্তুত করেন, পরে সেখানেই তৈরি হয়েছিল ঐ নতুন কেল্লা।

পরবর্তীকালে এই বংশের আর দুই উল্লেখযোগ্য ভ্রাতার নাম নীলমণি এবং দর্পনারায়ণ। দুজনেই যথেষ্ট ধনাঢ্য, তবে নীলমণি অনেক বেশী কর্মবীর। গোবিন্দপুরের খাঁড়ির কিনারা ছেড়ে ঠাকুরেরা এখন চলে এসেছেন মেছোবাজারের পাথুরিয়াঘাটা নামের অভিজাত পল্লীতে। ছোট ভাইকে সংসার দেখাশুনোর ভার দিয়ে নীলমণি প্রায়ই বাইরে বাইরে কাটান। ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে তিনি চাকুরিসূত্রে আবদ্ধ। কখনো তিনি যান চট্টগ্রামে, কখনো উড়িষ্যায়। অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য ছাড়াও তাঁর চরিত্রে দুঃসাহস ছিল যথেষ্ট। দেওয়ানি কাজে সেকালে অর্থাগম হতো বিস্তর। সমস্ত টাকা নীলমণি পাঠিয়ে দিতেন ছোট ভাইয়ের কাছে।

এক সময় চাকরি ত্যাগ করে নীলমণি গৃহে ফিরলেন। সেখানে তাঁর জন্য এক বিরাট অশান্তি অপেক্ষা করে ছিল। তাঁদের গৃহে তখন অতুল বৈভব। কিন্তু ছোটভাই দর্পনারায়ণ দাবী করলেন যে এর অধিকাংশই তাঁর নিজের উদ্যোগ ও বিচারবুদ্ধির ফল, এর মধ্যে নীলমণির অংশ সামান্যই। নীলমণি বিদেশ থেকে টাকা পাঠিয়েছেন বটে, কিন্তু দর্পনারায়ণই নিজ কৃতিত্বে সম্পত্তি বহুগুণ করেছেন।

ভ্রাতৃবিরোধ এক সময় এমনই চরমে উঠলো যে এক বর্ষার রাতে নীলমণি তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে এবং গৃহদেবতা নারায়ণশিলা সঙ্গে নিয়ে পাথুরিয়াঘাটার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আর কোনোদিন ফিরবেন না। দর্পনারায়ণ তাঁর দাদার হাতে নগদ এক লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছেন এবং তাঁকে দিয়ে স্বীকার করে নিইয়েছেন যে বসতবাটি এবং ভূসম্পত্তির ওপর নীলমণির আর কোনো অধিকার রইলো না।

বৃষ্টিময় অন্ধকার রাতে নীলমণিকে অবশ্য সপরিবারে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হলো না। ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের পুণ্য অর্জনের জন্য তাঁদের আশ্রয় দিলেন কলকাতার এক বিখ্যাত ধনপতি। এঁর নাম শেঠ বৈষ্ণবচরণ। এ বৈষ্ণবচরণ ধনী হয়েছিলেন গঙ্গাজলের ব্যবসায়ে। হিন্দুদের বিবাহ থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত, এবং প্রতিদিনের পুজোআচ্চায় গঙ্গাজলের প্রয়োজন, এমনকি আদালতেও শপথ নেবার সময় গঙ্গাজল স্পর্শ করতে হয়। মুখবন্ধ মাটির হাঁড়ি ভর্তি গঙ্গাজল চালান যেত গঙ্গাবর্জিত অঞ্চলে। দুধে ভেজাল মিশ্রণের চল না হলেও তখনই নিশ্চিত গঙ্গাজলের ব্যবসায়ে নানারকম কারচুপি ছিল, যে-কারণে অন্যান্য গঙ্গাজল ব্যবসায়ীদের তুলনায় শেঠ বৈষ্ণবচরণের নামাঙ্কিত শিলমোহর করা গঙ্গাজলই ছিল বেশী বিশ্বাসযোগ্য। এমন কি সুদূর তেলেঙ্গানার রাজাও গঙ্গাজল নিতেন এঁর কাছ থেকে।

জোড়াসাঁকো অঞ্চলে শেঠ বৈষ্ণবচরণ প্রদত্ত জমিতে প্রতিষ্ঠিত হলো ঠাকুর বংশের দ্বিতীয় শাখাটি। নিজে আরও জমি কিনে ক্রমে ক্রমে নীলমণি সেখানে তৈরি করলেন তাঁর নিজস্ব প্রাসাদ।

নীলমণির তিনটি সন্তান। জ্যেষ্ঠের নাম রামলোচন। পিতার মৃত্যুর পর রামলোচনের ওপর পড়লো সংসারের ভার এবং তিনি দক্ষতার সঙ্গেই সে কার্য সম্পন্ন করতে লাগলেন। ছোট দু ভাইয়ের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণও করেন তিনি। এবং কিছু কিছু জমিদারি কিনে তিনি আস্তে আস্তে কলকাতার ধনী সমাজে নিজের স্থান করে নেন। রামলোচন ছিলেন শৌখিন এবং বিলাসী পুরুষ। সারাদিন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকলেও অপরাহ্নে তিনি একবার হাওয়া খেতে বের হবেনই। পরনে লম্বা কোর্তা দোপাট্টা ও তাজ, অর্থাৎ মুকুটের মতন পাগড়ি। গৃহের সামনে নিজস্ব তাঞ্জাম প্রস্তুত, সেই তাঞ্জামে চড়ে তিনি ময়দানের দিকে যান বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করার জন্য। পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে খবরাখবর নেওয়াও ছিল তাঁর অভ্যেস। ততদিনে দুই ঠাকুর পরিবারের বিবাদ মিটে গেছে, রামলোচন প্রায়ই যান পাথুরিয়াঘাটের বাড়িতে, পিতৃপুরুষের ভদ্রাসন দেখে আসেন। আসা-যাওয়ার

পথে যতগুলি দেবালয় পড়ে, সব জায়গাতেই নেমে তিনি ভক্তিভরে প্রণামী দেন।

মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে বসে মজলিশ। রামলোচন ঠাকুরের সাংস্কৃতিক রুচি সমসাময়িক ধনীদের চেয়ে অনেক উন্নত। শুধু বাঈ-নাচ দেখে প্রমোদ করার বদলে তিনি কালোয়াতি গায়কদেরও ডেকে আনেন, কোনোদিন বা দাঁড়া-কবি বা বসা-কবিদের নিয়ে আসর জমান। রাম বসু, হরু ঠাকুরের মতন কবিগণও এই আসরে এসেছেন।

রামলোচনের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। এক কন্যা জন্মেছিল, সেও অকালমৃতা। পত্নী অলকাসুন্দরীর সম্মতি নিয়ে তিনি তাঁর মেজ ভাইয়ের একটি ছেলেকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর সাধ ছিল ছেলেটিকে তিনি নিজের আদর্শে গড়ে তুলবেন। কিন্তু উপযুক্ত সময় পেলেন না, একদিন হঠাৎ পীড়িত হয়ে পড়ে তিনি বুঝলেন যে তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে। পুত্রটির যখন তের বছর বয়স, তখন রামলোচন ঠাকুর ইহধাম থেকে প্রস্থান করলেন।

রামলোচনের সেই দত্তক পুত্রের নাম দ্বারকানাথ। পালিকা মাতা অলকাসুন্দরী এবং নিজের বড় ভাই রাধানাথের তত্ত্বাবধানে দ্বারকানাথ মানুষ হতে লাগলেন। তখনো হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়নি। জোড়াসাঁকোতেই ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে শেরবোর্ন নামে একজন সাহেব একটা স্কুল খুলে বসেছিলেন। শেরবোর্নও পুরোপুরি সাহেব নন, এঁর মা ছিলেন ব্রাহ্মণী এবং সেকথা তিনি প্রকাশ্যে সগর্বে সকলকে জানাতেন। এই শেরবোর্নের ইস্কুলে দ্বারকানাথ পড়তে লাগলেন এনফিল্ডস স্পেলিং, রীডিং বুক, তুতিনামা বা তোতা কাহিনী, ইউনিভার্সাল লেটার রাইটিং, কমপ্লিট লেটার বুক এবং রয়াল ইংলিশ গ্রামার। আঠারো বছর বয়েস পূর্ণ হলেই দ্বারকানাথ স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পথ প্রস্তুত করতে উদ্যত হলেন।

পালক পিতার কাছ থেকে দ্বারকানাথ জমিদারী সম্পত্তি পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার আয় খুব বেশী কিছু নয়। সেই ছোট জমিদারী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার মতন মন নিয়ে তিনি জন্মাননি। এ মানুষ অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই কাছাকাছি অন্য সকলকে ছাড়িয়ে যেতে লাগলেন। সরকারের অধীনে তিনি দেওয়ানের চাকরি করেছেন, জমিদারদের মামলা-মোকদ্দমায় তিনি ল এজেন্ট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং বাড়িয়েছেন পরগণার পর পরগণায় নিজস্ব জমিদারী।

জমির মালিকানার প্রতি বঙ্গবাসীদের আকর্ষণ অত্যধিক, কিন্তু দ্বারকানাথ বুঝেছিলেন যে ভূমিরূপ ধন যক্ষে আগলালেও লক্ষ্মীর আনাগোনা চলে বাণিজ্যেই। বহু রকম ব্যবসায় দ্বারকানাথ নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন, ব্যাংকিং, ইন্সিওরেন্স, রেশম, নীল,কয়লা এবং জাহাজ চলাচল। দ্বারকানাথের পূর্বপুরুষ জাহাজে মালপত্র ওঠানো-নামানোর কাজে ভাগ্য ফিরিয়েছিলেন, দ্বারকানাথ স্বয়ং জাহাজ কিনে দেশ বিদেশে মালপত্র আমদানী রপ্তানি করতে লাগলেন। এমনকি স্বাধীনভাবে ইংরেজদের সঙ্গে অংশীদার হয়ে স্থাপন করলেন এক কোম্পানি। নেটিভদের পক্ষে এটা একটা চমকপ্রদ ঘটনা। দ্বারকানাথের উদ্যম ও ব্যক্তিত্বে এমনই ঔজ্জ্বল্য, যে 'কার টেগোর কোম্পানি'র প্রতিষ্ঠার পর মহামান্য বড়লাট বাহাদুর লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক এক চিঠি লিখে দ্বারকানাথকে অভিনন্দন জানালেন যে ইংরেজ ও দেশীয় লোকরা মিলে যৌথ কারবার পরিচালনায় আপনিই প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

অবশ্য একটু ভুল করেছিলেন বেণ্টিঙ্ক। এ ব্যাপারে দ্বারকানাথ প্রথম নন, দ্বিতীয়। বাণিজ্য ক্ষেত্রে তখন তাঁর একজন মাত্র যথার্থ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তাঁর নাম রুস্তমজী কাওয়াসজী। এঁরও প্রধানত জাহাজেরই ব্যবসা। কলকাতা বন্দর জাহাজ নির্মাণের জন্য বিখ্যাত, রুস্তমজী একের পর এক জাহাজ তৈরি করিয়ে জলে নামাচ্ছেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে অংশীদারত্বে 'রুস্তমজী টার্নার অ্যাণ্ড কোং' খুলে ফেলেছেন। বেণ্টিঙ্কের অভিনন্দন বার্তাটিকে সংবাদপত্রের লেখকরা একটু সংশোধন করে নিল। দ্বারকানাথ হিন্দুদের মধ্যে প্রথম। রুস্তমজী হিন্দু নন। তিনি ইরাণের অগ্নি উপাসক পারসী জাতীয়। আরবী মুসলমানরা ইরান দখল করে নেবার পর অনেক পারসী এসে আশ্রয় নেয় ভারতের পশ্চিম উপকূলে, তাদেরই বংশধর এই রুস্তমজী বোম্বাই থেকে জাহাজযোগে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এই নতুন শহরে, যে শহর ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ভারতের মধ্যে সবচেয়ে লোভনীয় স্থান। রুস্তমজী ব্যবসায়ীদের মধ্যে শীর্ষস্থানে উঠে গেলেন, একদিকে চীন, অন্য দিকে আফ্রিকা পর্যন্ত যাতায়াত করে তাঁর কোম্পানির জাহাজ। নতুন নতুন জিনিস উৎপাদনের দিকেও তাঁর ঝোঁক আছে। কলকাতা শহরের জন্য বরফ আনাতে হয় আমেরিকার বোস্টন শহর থেকে, এজন্য বরফ এখানে অগ্নিমূল্য। রুস্তমজী কলকাতায় বরফ প্রস্তুত করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন।

কোনো ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হয়ে দ্বারকানাথের সুখ হয় না। তাই দ্বারকানাথ তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন রুস্তমজীর দিকে। যথা সময়ে অবশ্য রুস্তমজীও ধরাশায়ী হয়েছিলেন।

ব্যবসাক্ষেত্রে এসে দ্বারকানাথ দু' রকম ইংরেজের সন্ধান পান। তাঁর শ্রদ্ধেয় বন্ধু রামমোহনই এদিকে প্রথম তাঁর মনোযোগ ফিরিয়ে দিলেন। এই ইংরেজ দেশ শাসন করে, তারা রাজার জাত, তারা প্রভু। কিন্তু এরা ইংলণ্ডের একটি ছোট শ্রেণী মাত্র, একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডার এবং তাদের বেতনভুক কর্মচারীগণ। এছাড়াও অন্য ইংরেজ আছে। যারা ভাগ্যান্বেষণে এসেছে ভারতবর্ষে, তাদের আছে স্বাধীন পেশা, রাজকর্মচারীদের সঙ্গে তাদেরও স্বার্থের সংঘাত হয়, আদর্শগত বিভেদ দেখা দেয়। এদের মধ্যে অনেকে অর্থপিশাচ, অনেকে নারীলোলুপ, অনেকে নীতিহীন নরপশু। আবার কেউ কেউ মুক্তমনা, উদার, একতরফা শোষণের প্রতিবাদকারী। তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ দেশের ভাষা ও প্রাচীন সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করে, শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহ দেখায়, সংবাদপত্রে সরকারী নীতির সমালোচনা করে।

রামমোহন ও দ্বারকানাথ দুজনেই বুঝেছিলেন অরাজক এবং নীতি-শিক্ষা-সংস্কৃতি ভ্রষ্ট ভারতের পক্ষে ইংরেজের শাসন আশীর্বাদ স্বরূপ। তবে, ইংরেজ যেন ভারতীয়দের আত্মসম্মানে আঘাত না দেয়। রামমোহনের তুলনায় দ্বারকানাথ আরও বেশী বুঝেছিলেন যে, ইংরেজদের কাছে ভারতীয়রা ক্রীতদাস। ভারতবাসী বহুকাল ধরে যুদ্ধবিদ্যায় অনভ্যস্ত, তাদের পক্ষে ইংরেজদের বিরোধিতা করা বাতুলতা। সেইজন্যই ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব ধন মান প্রাণের অধিকার আদায় করতে হলে ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজদের সাহায্য নিতেই হবে।

ইওরোপ ভ্রমণে গিয়ে দ্বারকানাথ এই সত্য আরো বেশী উপলব্ধি করলেন। ভারতে ইংরেজ-রাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের অন্য শ্রেণীর ইংরেজদের অনেক প্রভেদ। ভৃত্য বা প্রজার মতন নয়, তারা দ্বারকানাথের সঙ্গে ব্যবহার করেছে সমান সমান মানুষের মতন, কিংবা তারও বেশী সম্ভ্রমের সঙ্গে। স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁকে পাশে স্থান দিয়েছেন। বড় বড় ডিউক, লর্ড থেকে শুরু করে ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স পর্যন্ত দেখা করে গেছেন তাঁর বাড়িতে এসে।

ভারত থেকে ইংলণ্ডবাসীদের জন্য নানান উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বারকানাথ। ইংলণ্ড থেকেও তিনি ভারতীয়দের জন্য বিশেষ একটি উপহার নিয়ে এলেন। একটি মানুষ। এঁর নাম টমসন। এই টমসন পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ লড়াই-এ প্রস্তুত। এর আগে তিনি আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে অগ্নিস্রাবী ভাষণ দিয়ে এসেছেন বিভিন্ন জায়গায়। সেজন্য তাঁর প্রাণ বিপন্ন হবার সম্ভাবনা ছিল বারবার। এই বিশেষ মানুষটিকে দ্বারকানাথ ভারতে আমন্ত্রণ করে আনলেন এক গূঢ় উদ্দেশ্যে।

এক শীতের ভোরে দ্বারকানাথের জাহাজ এসে ভিড়লো কলকাতা বন্দরে। আগে থেকেই খবর পেয়ে শত শত ব্যক্তি সেই সকালেই সেখানে এসে সমবেত হয়েছেন তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য। জেটিতে জাহাজটি স্পর্শ করার পর দ্বারকানাথ তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন পোর্ট সাইড থেকে। তাঁর মুখখানি এক অদ্ভুত হাস্যে সমুজ্জ্বল। সকল অবিশ্বাসীরা এবার দেখুক ! বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে অনেকেই তাঁকে বলেছিল যে ইওরোপীয় জল হাওয়া ভারতবাসীর সহ্য হয় না। সেখান থেকে কেউ বেঁচে ফেরে না, যেমন রামমোহন ফেরেননি।

দ্বারকানাথ হাত তুলে বললেন, আমি বেঁচে আছি।

গোরা সৈন্য ও সিপাহীরা শহরের উপান্তে এক স্থলে বন্দুকের তাক অভ্যাস করে। দিনরাত গোলাগুলির শব্দের জন্য লোকে সেই অঞ্চলের নাম দিয়েছে দমদমা। এই দমদমা বা দমদমে যাবার পথেই এক জায়গার নাম বেলগাছিয়া। যে পল্লীতে যে গাছ বেশী দৃষ্ট হয় সেই গাছের নামেই পল্লীর নাম। যেমন বটতলা, কাঁকুড়গাছি, লেবুবাগান, পেয়ারাবাগান, তালতলা, ডালিমতলা ইত্যাদি।

বেলগাছিয়ায় দ্বারকানাথের মনোরম বিলাসপুরী বেলগাছিয়া ভিলা। এক বিশাল উদ্যানের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়েছে মতিঝিল, তার স্বচ্ছ নির্মল জল, সে জলে ফুটে আছে নীল পদ্ম ও রক্ত পদ্ম, যা কবিদের অতি প্রিয়। উদ্যানটিও সযত্নে কেয়ারি করা, এর মধ্যে রয়েছে গোলাপ, কদম্ব, স্থলপদ্ম, যুঁই, বেল, পিটুনিয়া, জিনিয়া, সাকসপার্স, আরও কত না বাহারী ফুল।

বাহির বাড়িটিতে অতি প্রশস্ত সব হলঘর। সেগুলির ত্রুটিহীন সৌষ্ঠবে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। দেয়ালগুলি আধুনিক শিল্পীদের চিত্রকলায় সজ্জিত। মধ্যে মধ্যে এক একটি ভাস্কর্যের নিদর্শন। কোনো কোনো কক্ষে দেয়ালজোড়া বেলজিয়াম আয়না। ওপর থেকে ঝুলছে এক শো দেড়শো মোমের ঝাড়বাতি, যার আলো ঠিকরে পড়ছে দর্পণে। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের মেঝেতে ছড়ানো রয়েছে মীর্জাপুরী গালিচা। বুটিদার লাল রঙের কাপড় ও সবুজ সিল্কে আসবাবগুলি মোড়া। মধ্যে মধ্যে শ্বেতপাথরের টেবিল, তার ওপরে সাজানো পুষ্পস্তবক। সিঁড়ির দু' পাশে ঝুলছে দুষ্প্রাপ্য অর্কিড, লোহার রেলিং ঢেকে দেওয়া হয়েছে লতাপাতায়।

বাইরে একটি মার্বেল পাথরের ফোয়ারা, তার ওপরে দণ্ডায়মান প্রেমের দেবতা কিউপিড। ফোয়ারাটিকেও আজ আলোকোদ্ভাসিত করা হয়েছে। এ যেন সত্যিই ইন্দ্রপুরী।

মতিঝিলের মাঝখানে একটি দ্বীপ, সেই দ্বীপের ওপরেও রয়েছে আর একটি গৃহ, এটির নাম গ্রীষ্মাবাস। একদিকে একটি ঝুলন্ত লোহার সেতু ও আর একদিকে একটি কাঠের সেতু দিয়ে এই গ্রীষ্মাবাসটি বাগানের সঙ্গে যুক্ত। অবশ্য এই দুই সেতুও সদ্য আনীত দেবদারু পাতায় মোড়া এবং স্থানে স্থানে উড়ছে বহুবর্ণ পতাকা। অতিথিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার তারতম্য অনুযায়ী কেউ বৈঠকখানায় কেউ ঐ গ্রীষ্মাবাসে বসেছেন। চতুর্দিক থেকে ভেসে আসছে যন্ত্রবাদ্য ও নৃত্যগীতের ধ্বনি। উদ্যানে অবিরাম বাজি পোড়ানো চলেছে।

শীতকাল, ফিনফিনে বাতাস বইছে। আকাশ পরিষ্কার, অজস্র নক্ষত্রের সভাসদ নিয়ে নিশাপতি আজ সেখানে পূর্ণ গৌরবে বিরাজমান। ধরণীতলে, এই বেলগাছিয়া ভিলাতেও যেন দ্বারকানাথ আজ তারকাদের মধ্যে চন্দ্র। ইওরোপ বিজয় করে এসেছেন তিনি, সেই উপলক্ষে আজ তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে মিলনোৎসব। তাঁর অভিজ্ঞতা শ্রবণের জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব।

বেলগাছিয়া ভিলা স্থাপনের প্রথম দিকে দ্বারকানাথ তাঁর শ্বেতাঙ্গ বন্ধু ও কৃষ্ণাঙ্গ বন্ধুদের পৃথক পৃথক দিনে নিমন্ত্রণ জানাতেন। ইদানীং তিনি সেই প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছেন। বিশিষ্ট রাজপুরুষ, কাউন্সিলের সদস্য, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, সামরিক কর্মচারী এবং জেলাশাসকরা যেমন আসেন, তেমনি ভারতীয়দের মধ্যে খ্যাতিমান বিদগ্ধ ব্যক্তি, জমিদার ও ব্যবসায়ীদেরও তিনি আমন্ত্রণ জানান। বিলাসিতায় দ্বারকানাথের কার্পণ্য নেই কিন্তু বেলেল্লা তিনি পছন্দ করেন না। ফুর্তি ও কৌতুক যদৃচ্ছা হতে পারে, কিন্তু কেউ বে-এক্তিয়ার হয়ে গেলেই জানবে যে ভবিষ্যতে আর কোনোদিন বেলগাছিয়া ভিলায় তার নিমন্ত্রণ হবে না।

ইওরোপ যাত্রার আগে থেকেই দ্বারকানাথ ফরাসী রুচির অনুরাগী। তাঁর বিলাসপুরীর নৈশভোজে ফরাসী রান্না এবং মোগলাই কাবাব, পোলাও, হোসেনীর—এই দুরকমই খাদ্য পরিবেশিত হয়। শ্রেষ্ঠ মদ্য আনয়ন করেন তিনি সরাসরি ফরাসী দেশ থেকে এবং তা অঢেল, অফুরন্ত। ভোগ বাসনার চেয়েও আড়ম্বরপ্রিয়তাই এই মানুষটির চরিত্র লক্ষণ।

মতিঝিলের মধ্যে দ্বীপের ওপরের গ্রীষ্মাবাসটির একটি কক্ষে দ্বারকানাথ নির্বাচিত বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে

দণ্ডায়মান। অতিথিরা উপবিষ্ট, তাঁদের হাতে সুরাপাত্র, কারুর আচরণেই কোনোরকম ব্যস্ততা নেই, কেননা উৎসব চলবে সারারাত।

দ্বারাকানাথের পরনে মখমলের পাজামা, তার ওপরে সোনার জরির কাজ করা একটি জানু-ছাড়ানো জোব্বা, কণ্ঠে মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণহার, মাথায় উষ্ণীষ। গায়ে স্বর্ণালঙ্কৃত একটি কাশ্মীরী শাল আলগাভাবে জড়ানো, পায়েও সেই অনুরূপ কারুকার্যখচিত সুঁড়তোলা নাগরা। তিনি খুব দীর্ঘকায় নন, কিন্তু উজ্জ্বল চোখ দুটিতে তাঁর ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট। নাসিকার নীচে লম্বা গুম্ফ, তিনি কথা বলেন ধীর স্বরে, প্রতিটি শব্দের ওপর আলাদাভাবে জোর দিয়ে। ইংরেজি বাহুল্যবর্জিত এবং পরিষ্কার। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একটি টেবিলে এক হাতের ভর দিয়ে, সেই টেবিলের ওপর রাখা একটি রূপোর আলবোলা এবং একটি মরোক্কো চামড়ায় বাঁধানো খাতা। খাতাটিতে তিনি তাঁর ভ্রমণকালীন দিনলিপি লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

মাঝে মাঝে খাতাটির পৃষ্ঠা উল্টে তিনি তাঁর ভ্রমণ বর্ণনা শোনাচ্ছেন অতিথিদের।

এক সময় এক ইংরেজ পুরুষ প্রশ্ন করলো, মহাশয়, ইহা কি সত্য যে আপনি যাবতীয় খ্রীষ্টান জগতের গুরু মহামান্য পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন?

দ্বারকানাথ মৃদু হেসে বিনীতভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, মহাশয়, ইহা সত্য। রোমের ইংলিশ কালেজের প্রিন্সিপাল মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পোপের সন্নিধানে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।

অপর একজন ইংরেজ বললো, ইহার পূর্বে কোনো পোপ কি কোনো অ-খ্রীষ্টানকে নিজ কক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন?

—তাহা আমি বলিতে পারি না।

প্রথম ইংরেজটি এবার একটু উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলো, তবে কি ইহাও সত্য যে আপনি পোপের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াও আপনার মস্তক হইতে উষ্ণীষ খোলেন নাই?

—হাঁ, ইহাও সত্য।

উপস্থিত ইংরেজ পুরুষ ও মহিলারা আহত বিস্ময়ের ধ্বনি করে উঠলো। পোপের সম্মুখে পৃথিবীর রাজাধিরাজরাও মস্তক নগ্ন করে।

দ্বারকানাথ বললেন, আপনারা বিচলিত হইবেন না। মহামান্য পোপ আমার উপর ক্ষুব্ধ হন নাই, তিনি সাদরেই আমাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলাম যে, কোনো ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য মস্তকে উষ্ণীষ রাখাই আমাদিগের দেশীয় প্রথা।

অনেকেই এ কথায় তেমন প্রসন্ন হলো না।

তখন ডিরোজিও-শিষ্য উচ্ছ্বাসপ্রবণ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, প্রিন্স দ্বারকানাথ উপযুক্ত ব্যবহারই করিয়াছেন। আমাদের দেশীয় প্রথায় তিনি মাননীয় পোপকে সম্মান জানাইয়াছেন।

আর একজন ইংরেজ প্রশ্ন করলো, ইংলণ্ডে গিয়াও কি আপনি আপনার দেশীয় প্রথা সর্বত্র মান্য করিতে পারিয়াছেন?

দ্বারকানাথ তৎক্ষণাৎ বললেন, হাঁ মহাশয়, যতদূর সম্ভব মান্য করিয়াছি। আমি স্বীকার করিতে বাধ্য, এ বিষয়ে আপনাদের স্বদেশবাসীদিগের মনোভাব যথেষ্ট উদার। প্রতিদিন স্নানের পূর্বে গায়ত্রী জপ করা আমার অভ্যাস। ইংলণ্ডে গিয়াও সে অভ্যাস ত্যাগ করি নাই। এমনও হইয়াছে, আমি গায়ত্রী জপে বসিয়াছি, এমন সময় কোনো সম্ভ্রান্তবংশীয় রমণী তাঁহার পতি সমভিব্যাহারে আমার সহিত সক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। আমি ভৃত্যদের দিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছি, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া একটু অপেক্ষা করেন। কেননা, আমি জপ ছাড়িয়া উঠিতে পারিব না।...আর একদিনের ঘটনা আমার স্মরণে আছে। সম্রাজ্ঞী ভিকটোরিয়ার আমন্ত্রণে আমি এক দিবস রাজপ্রাসাদের শিশুসদন পরিদর্শনে গিয়াছিলাম। সেস্থলে আপনাদিগের ভবিষ্যৎ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস এবং রাজকুমারী ছিলেন। মুক্তাখচিত শ্বেত মসলিন পরিহিত সেই অনিন্দ্যকান্তি বালক বালিকাকে দেখিয়া আমি পরম প্রীতি পাইয়াছিলাম। উহারা কখনো কোনো হিন্দু দেখে নাই, সে-কারণে অদ্ভুত বিস্ময়ভরা চক্ষে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। আমি প্রথমে উহাদের প্রতি কোনো সম্ভাষণ করি নাই। আমার সেদিনের পথ-প্রদর্শিকা লেডি লিটলটন আমায় প্রশ্ন করিলেন, অল্প বয়স্কদের আপনারা কোন্ প্রথায় অভিবাদন করেন? এবং উহারা আপনার সহিত করমর্দন করিতে পারে কি? আমি উত্তর করিলাম, বিলক্ষণ!

অল্প বয়েসীদের আমরা অঙ্গ স্পর্শ করিয়াই প্রীতি জানাই। তখন সেই বালক বালিকা আসিয়া করমর্দন করিল এবং আমিও তাদের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া আমার শুভাশিস অর্পণ করিলাম।

উপস্থিত ইংরেজগণ কেউই কোনোদিন ইংলণ্ডের যুবরাজকে চর্মচক্ষে দেখেনি, তার সঙ্গে করমর্দন করা তো স্বপ্নের বিষয়। এই নেটিভ ব্যক্তিটি সেই সৌভাগ্য তো অর্জন করেছে বটেই, এমনকি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঈশ্বরী মহামাননীয়া ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন পর্যন্ত সেরে এসেছে। কিন্তু সেজন্য এঁর মধ্যে গর্বরেখা নেই।

দ্বারকানাথের আত্মীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, সে দেশের তো বহুপ্রকার জাঁকজমকের কথা শুনিলাম। কিন্তু সেথায় এই বেলগাছিয়া ভিলার মতন এমন সুরম্য ভবন আছে কী?

এবার দ্বারকানাথ একটি দীর্ঘশ্বাস নীরবে গোপন করলেন। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ভাতঃ, এক সময় এই ভিলার জন্য আমার গর্ব ছিল, কিন্তু বিলাতে গিয়া সে গর্ব আমার চূর্ণ হইয়াছে। সেই কারণেই সে স্থল হইতে আমি আমার পুত্র দেবেন্দ্রকে এক পত্রে লিখিয়াছিলাম, মানুষের যদি ঐশ্বর্য থাকে, তাহা হইলে সে ঐশ্বর্য উপভোগ করিবার উপযোগী দেশ হইল এই। সে দেশের উদ্যানবাটিকাগুলি যে কী মনোরম তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমার এ বাগানটি এখন আমার চক্ষে দুয়োরানীর তুল্য অপ্রিয় বোধ হয়।

এক ইংরেজ প্রশ্ন করলো, আপনি ডিউক অব ডেভনশায়ারের কানন-সৌধটি পরিদর্শন করিয়াছেন কি?

দ্বারকানাথ এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, আ, আপনি যথার্থ নামটি উচ্চারণ করিয়াছেন। অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু উহার তুল্য আর দেখি নাই। চ্যাটসওয়ার্থে ডিউক অব ডেভনশায়ারের কানন, তাহাতে যে কত প্রকার দেশী বিদেশী বৃক্ষ রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কে জানিত, এই পৃথিবী এতপ্রকার বৃক্ষ ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যান্বিতা। আরও বড় বিস্ময়ের কথা, সেই শীতপ্রধান দেশেও ডিউক মহাশয় কতপ্রকার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বৃক্ষরাজি সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই উদ্যানের তুলনায় আমার এই ভিলা? যেন সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদ।

—ও দেশের আর কোন্ কোন্ বস্তু দেখিয়া আপনি বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন?

—আসল কথাটাই তো এখনো বলি নাই। একটি বিস্ময়ই আর সব কিছুকে ছাড়াইয়া বহুদূর গিয়াছে। শ্বেতাঙ্গজাতি এক অসাধ্য সাধন করিয়াছে। তাহারা এক মহাশক্তিশালী দৈত্যকে বন্দী করিয়া ভৃত্য করিয়াছে।

—মহাশয়, রহস্য না করিয়া একটু খুলিয়া বলিবেন কি?

—আমি ফারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছি। উহাতে কতকগুলান অত্যুৎকৃষ্ট কিস্যা রহিয়াছে। একটির নাম কলসীর দৈত্যের কিস্যা। কলসীর মধ্যে বন্দী এক দানবকে মুক্ত করিয়া এক ব্যক্তি তাহার সাহায্যে যাবতীয় কর্ম করাইয়া লইত। য়ুরোপে গিয়া দেখিলাম, তাহা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী এক দৈত্য এখন শ্বেতাঙ্গদের দাস! সেই দৈত্যের নাম বাষ্প। আপনারা কল্পনা করিতে পারেন কি, এক বিশাল লৌহ শকট, যাহাতে শতশত লোক বসিতে পারে, সেই শকট বাষ্পে টানিয়া লইতেছে? সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য বটে। বিলাতের কয়েক স্থলে এই শকট চলিতেছে, ইহার গমন পথকে রেইল রোড কহে। আমি জার্মানির কলোন নগরীতে, বিলাতের ম্যানচেষ্টারে স্বয়ং এই রেইলযোগে গমনাগমন করিয়াছি। সে যে কী বিস্ময়!

উপস্থিত ইওরোপীয়দের অনেকেরই রেলওয়ে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। বাঙালীরাও যে বাষ্পচালিত রেলের কথা আগে শোনেনি, তা নয়, সংবাদপত্রে প্রায়ই এ বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ থাকে, কিন্তু দ্বারকানাথ সবচক্ষে রেলগাড়ি দেখে প্রায় যেন শিশুর মতন মুগ্ধ। নিউ ক্যাসেল-এ কয়লাখনি পরিদর্শন করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে সেখানেও কয়লা উত্তোলনের ব্যাপারে বাষ্পশক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে, কয়লা বহন করা হচ্ছে রেলগাড়িতে। বাংলাদেশে রানীগঞ্জে সর্বশ্রেষ্ঠ কয়লাখনির প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ নিউ ক্যাসেল-এ গিয়ে আফসোস করেছিলেন, যদি তাঁর নিজের দেশেও কয়লা চালানের এমন সুবিধা থাকতো! এ দেশে রেললাইন পাতা যায় না?

দ্বারকানাথ বললেন, শুধু রেইলগাড়ি কেন, বাষ্প আরও কত অদ্ভুত কর্ম করিতেছে। আমি দেখিলাম, বাষ্পশক্তির সাহায্যে সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়, ব্যাঙ্ক নোট মুদ্রিত হয়।

একজন কেউ মন্তব্য করলো, জাহাজেও আজিকালি তো বাষ্প কল লাগান হইতেছে।

দ্বারকানাথ বললেন, লিভারপুলে আমি জাহাজ নির্মাণ করাখানাও দেখিতে গিয়াছিলাম। বিলাত গমনের পূর্বেই আমার দুইখানি জাহাজ নির্মাণের জন্য ফর্কেট কম্পানিকে বরাৎ দেওয়া ছিল। আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, সেই জাহাজদ্বয়ের এঞ্জিন নির্মিত হইতেছে। আমার আত্মীয়-বান্ধবদের আগ্রহে ও অনুরোধে একটি জাহাজের নামকরণ হইয়াছে, আমার নামে। সেই 'দ্বারকানাথ' জাহাজের এঞ্জিন তিন শো পঞ্চাশ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট। কল্পনা করুন একবার, সার্ধ তিনশত অশ্বের স্থান লইয়াছে শুধু বাষ্প। তাহা হইলে সে কত বড় দৈত্য?

ঈষৎ রঙীন নেশায় সকলে হঠাৎ চটপট করে করতালি ধ্বনি দিয়ে উঠলো।

গল্পে গল্পে ঘন হয়ে এলো রাত। দ্বারকানাথের ভ্রমণ বর্ণনা সাহেব ও নেটিভ উভয় দলের কাছেই খুব আকর্ষণীয়। এই প্রথম কোনো সম্ভ্রান্তবংশীয় নেটিভ ইওরোপ পরিভ্রমণ করে এসে চাক্ষুষ বিবরণ পেশ করছেন। এবং দ্বারকানাথ যে সব কিছুরই প্রশংসা করছেন, তা নয়। এবং দ্বারকানাথের বর্ণনার মধ্যে খুব সূক্ষ্মভাবে একটা কথাও ফুটে উঠছে যে ভারতের সম্পদ আহরণ করেই ইংলণ্ডের এতখানি উন্নতি। সাহেবরাও এই প্রথম একজন নেটিভের মুখ থেকে তাদের পিতৃভূমি সম্পর্কে নানা কথা শুনছে। এই এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। এবং সবচেয়ে বড় কথা, নেটিভ হয়েও এই ব্যক্তি এমন এমন স্থানে গমন করেছে, যেখানে যাওয়ার সুযোগ তাদের নিজেদেরই হয় না।

প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে যেতে কথা একটু অপ্রিয় দিকে বাঁক নিল এক সময়। সুরার প্রভাবে কারুর কারুর ব্যবহার আরও সুমিষ্ট হয়, কারুর বা ভেতরের তিক্ততা বেরিয়ে আসে।

'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার জনৈক লেখক হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, শ্রীযুক্ত ঠাকুর, আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ইংলণ্ড, গৌরবোজ্জ্বল ইংলণ্ড আপনাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আপনি কি সেখানে পুনরায় যাইতে পারিবেন?

দ্বারকানাথ দৃঢ়ভাবে বললেন, নিশ্চয়। ফিরিবার পথেই আমার মনে হইতেছিল যে কত কিছুই দেখা হইল না। অতৃপ্তি রহিয়া গেল। আবার আসিব। অনেক নবলব্ধ বন্ধুবর্গকে বলিয়া আসিয়াছি, আবার আসিব।

—কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া নিষিদ্ধ কালাপানি পাড়ি দিয়াছেন, আপনার সমাজ আপনাকে জাতিচ্যুত করিবে না? এ বিষয়ে যে একটি আন্দোলন উঠিয়াছে, তাহা আমরা জানি। আপনাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে নিশ্চয়? ইহা কি সত্য যে হিন্দুশাস্ত্র মতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে গেলে গোময় আহার করিতে হয়?

কেউ কেউ হেসে উঠলো, কেউ কেউ হাসি গোপন করলো। ভ্রূকুঞ্চিত করে দ্বারকানাথ একটুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' মাঝে মাঝেই তাঁকে কুটুস কুটুস করে দংশন করে। অবশ্য বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে তারা অভিনন্দন জানিয়েছিল। এখন এই ব্যক্তি তাঁর বেদনার জায়গায় ঘা দিয়েছে। এতকাল ধরে তিনি কত ব্রাহ্মণের ভরণপোষণ করেছেন, তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে এঁরা কখনো তাঁর বিরুদ্ধে যাবে। অথচ এঁরাই এখন তাঁকে সমাজচ্যুত করার জন্য কলকোলাহল শুরু করেছে। মূর্খ ও সংস্কারসর্বস্ব ব্রাহ্মণদের তিনি আজকাল দু' চক্ষে দেখতে পারেন না। হিন্দুধর্ম আর কতকাল কূপমণ্ডুক হয়ে রইবে? দেশ-বিদেশের জ্ঞান আহরণ, মানুষের সৃষ্ট এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য দর্শনেরও বাধা সৃষ্টি করে এই মূর্খরা!

ধীর গম্ভীর স্বরে দ্বারকানাথ প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্যে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন যে পরলোকগত রাজা রামমোহন রায় ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু। তাঁহার আদর্শে আমি এই সকল ক্ষুদ্র সংস্কার বর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছি। এ সমাজ যদি আমাকে পরিত্যাগ করে, তবে আমি স্বয়ং সুখী চিত্তে পৃথক সমাজ গড়িব। সে সাধ্য আমার রহিয়াছে।

—আপনার পরিবারের সকলে আপনার পক্ষে যাইবে কি?

দ্বারকানাথ একবার প্রসন্নকুমারের দিকে তাকালেন। তাঁর এই জ্ঞাতিভ্রাতা তাঁকে পরিত্যাগ করেনি। প্রসন্নকুমারের পিতা রামমোহন-দ্বেষী ছিলেন কিন্তু প্রসন্নকুমার রামমোহনের মুক্তচিন্তার অনুসারী। অথচ, দুঃখের বিষয়, তাঁর নিজের পিতৃব্য ও ভ্রাতারা সর্বাংশে তাঁকে সমর্থন করেননি, ম্লেচ্ছ-সংসর্গ দোষের জন্য তাঁরাও দ্বারকানাথের প্রায়শ্চিত্তের দাবি জানিয়ে গুনগুন করছেন।

দ্বারকানাথ বললেন, নিজ পরিবারের মধ্যে সাময়িক মনান্তর হয়ই, তাহাতে গুরুত্ব দিবার কিছু নাই। তবে আবার আপনাদের বলিতেছি, আমি কদাচ প্রায়শ্চিত্ত করিব না। আমি কোনো দোষ করি নাই, বরং দেশবাসীর সম্মুখে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছি।

—আপনার সুযোগ্য পুত্র বাবু দেবেন্দ্র কি আপনার সমর্থক ? আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি কতখানি নিঃসঙ্গ ?

—আমার পুত্র···অবশ্যই সে আমার সমর্থক···অদ্যকার উৎসব সার্থক করিবার ভার তো তাহারই উপর।

প্রকোষ্ঠের বাইরে অপেক্ষমান ভৃত্যদের উদ্দেশ্যে গলা চড়িয়ে দ্বারকানাথ বললেন, ওরে, কে আচিস ? দেবেন্দ্রকে একবার ডাক তো !

কেউ কোনো সাড়া দিল না।

অঙ্গের শালখানির একপ্রান্ত মাটিতে লুটিয়ে দ্বারকানাথ চলে এলেন দ্বারের পাশে। তাঁর ব্যক্তিগত দুজন ভৃত্য সেখানে নিথরভাবে দাঁড়িয়ে।

তিনি রুক্ষস্বরে বললেন, দেবেন্দ্র কোথায় ? সে এখানেই ছেল না ?

ভৃত্য দুজন অত্যন্ত ভীত স্বরে বললো, আজ্ঞা না হুজুর।

—সে কি বৈঠকখানা বাড়িতে রয়েচে ? যা দেকে আয়। আমার নাম করে বলবি এখুনি আসতে।

ভৃত্য দুজন তড়িৎগতিতে ছুটে চলে গেল। তবু ওদের ব্যবহারে কেমন একটা খটকা লাগলো দ্বারকানাথের মনে। কয়েক বছর আগের একটি ঘটনা তাঁর মনে পড়লো।

তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, রক্তের ঝলক এসে গেল তাঁর মুখে। তিনি কক্ষের অভ্যাগতদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা বিশ্রম্ভালাপ করুন, আমি অবিলম্বে আসিতেছি।

জুতো মসমসিয়ে দ্বারকানাথ সেতু পার হয়ে চলে এলেন বৈঠকখানা বাড়ির দিকে। তাঁর ললাটে কুঞ্চন রেখা। ফোয়ারার সামনে আর কয়েকজন ভৃত্যকে দেখে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তোরা কেউ দেবেন্দ্রকে দেকিচিস ?

ভৃত্যেরা উত্তর দিতে সাহস পায় না। তারা কর্তাবাবুর মেজাজ জানে। ওঁর অপছন্দমত সত্য কথাও উনি একেবারে সহ্য করতে পারেন না। ভৃত্যেরা সবাই জানে কর্তাবাবুর বড় ছেলে এখানে নেই, তবু তারা খোঁজ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেল। দেবেন্দ্রবাবু যাবার সময় ভৃত্যদের এবং বৈকুণ্ঠ নায়েবকে বলে গেছেন যে বাবামশাইকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়, তিনি সুস্থ বোধ করছেন না, তিনি চলে যাচ্ছেন।

বৈকুণ্ঠ নায়েব দূর থেকে দ্বারকানাথকে দেখেই দ্রুত উদ্যানের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। দ্বারকানাথ নিজে 'দেবেন্দ্র' 'দেবেন্দ্র' বলে ডাকতে ডাকতে প্রতিটি কক্ষে উঁকি দিতে লাগলেন। তারপর যখন তিনি বুঝলেন, তাঁর পুত্র বেলগাছিয়া ভিলার কোথাও নেই, তখন তাঁর মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তিনি বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন উন্মুক্ত আকাশের তলায়।

বৎসর কয়েক আগে বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ডের ভগিনী মিস ইডেনের সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে তিনি এই বেলগাছিয়া ভিলাতেই মহাসমারোহের সঙ্গে এক ভোজের আয়োজন করেছিলেন। সেদিনও তিনি দেবেন্দ্রকে দিয়েছিলেন পরিচালনার ভার। পুত্রকে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এইসব উৎসবের অর্থব্যয় কখনো বৃথা যায় না। ব্যবসা ও জমিদারি পরিচালনার জন্য মান্যগণ্য রাজপুরুষদের সঙ্গে সৌহার্দ্য রাখলে অনেক সুবিধে হয়। সেদিনও দেবেন্দ্র তার কাজে অবহেলা করেছিল, এক সময় দেখা গিয়েছিল যে সে অনুপস্থিত।

কিন্তু আজও সে চলে গেছে ? অতিথিরা এ-কথা জানলে সকলের সামনে তাঁর মাথা হেঁট হয়ে যাবে। তাঁর পুত্র পিতৃগৌরব সম্পর্কে উদাসীন !

পুত্রের মতিগতি তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। কলেজ ছাড়ার পর দেবেন্দ্র হঠাৎ অত্যন্ত বেশী বাবুয়ানি শুরু করেছিল। সে সংবাদ দ্বারকানাথের কানে গেলেও তিনি বাধা দেননি। তিনি বুঝেছিলেন, বয়েসকালে ও দোষ কেটে যাবে। একবার দেবেন্দ্র এমনই এক সরস্বতী পুজোর ধূম লাগালো যে সারা শহরে গাঁদা ফুল আর সন্দেশ বাকি ছিল না, সবই এসেছিল ঠাকুরবাড়িতে। এতটা বাড়াবাড়ি দ্বারকানাথ পছন্দ করেননি। পুজো উপলক্ষে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করার চেয়ে যে এইরূপ ভোজের আসরের উপযোগিতা বেশী, তা দেবেন্দ্র বুঝবে না। দেবেন্দ্রর চপলমতি কিছুটা সংশোধন করার অভিপ্রায়ে দ্বারকানাথ ছেলেকে ব্যাঙ্কের হিসাব রক্ষকের কাজে লাগিয়ে দিলেন।

দ্বারকানাথ লক্ষ করেছেন, দেবেন্দ্র সাহেব-সুবোদের সঙ্গে খুব একটা সংসর্গ করতে চায় না। সে ইংরাজিতে কিছু কাঁচা, সে তো শিক্ষক রেখে কিছুদিনের মধ্যেই আয়ত্ত করে নেওয়া যেতে পারে। দেবেন্দ্র বুদ্ধিমান যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পিতা এ দেশের শিরোমণি, জজ ম্যাজিস্ট্রেট থেকে

শুরু করে উচ্চতম পদের ইংরেজের সঙ্গে যাঁর শুধু পরিচয় নয়, বন্ধুত্বের সম্পর্ক, তাঁর পুত্র পারতপক্ষে ইংরেজদের সংস্পর্শেই যেতে চায় না। দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রকে কার টেগোর কোম্পানির অংশীদার করে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে দেবেন্দ্র সাহেবদের সঙ্গে মিলেমিশে সে কোম্পানি চালাবে কী করে ?

দেবেন্দ্রর সেই সাময়িক বাবুয়ানি ঘুচে গেছে। কিন্তু তার পরিবর্তে যা শুরু করেছে, তার চেয়ে বাবুয়ানি ছিল ভালো। বড় মানুষের ছেলে মাঝে মাঝে আমোদ-আহ্লাদ করবে সেটাই তো স্বাভাবিক, অথচ দেবেন্দ্র এখন দিনরাত সংস্কৃত চর্চা করে, আর কী এক পাঠশালা স্থাপন করে তাই নিয়ে মেতে আছে। একদিন তিনি এজন্য শাস্ত্রী মশায়কে ধমক দিয়েছিলেন। এতবড় বিষয় সম্পত্তির তদারকি করতে হবে যাকে, সে কেন ঐসব অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার নিয়ে পড়ে থাকছে! প্রবাস থেকে ফিরে তিনি এমন কথাও শুনেছেন যে কোনো কোনোদিন দেবেন্দ্র নাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেদারায় বসে থাকে, নাওয়া খাওয়ার ব্যাপারেও হুঁশ নেই, কেউ ডাকলেও সাড়া দেয় না। এসব কিসের লক্ষণ ?

দ্বারকানাথ নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখে বেদনার গাঢ় ছায়া। তাঁর ধারণা ছিল, তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই সব কিছু সঙ্ঘটিত হবে। কিন্তু আজ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ হলো। সামান্য অবস্থা থেকে কত কঠোর পরিশ্রমে ও জেদে তিনি প্রায় একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন। কিন্তু কী লাভ হলো ? ইংরেজ পুরুষটি প্রশ্ন করেছিল, তিনি আজ কতটা নিঃসঙ্গ। বস্তুত, তাঁর মতন নিঃসঙ্গ মানুষ বুঝি আর কেউ নেই! পিতা নেই, মাতা নেই, সহধর্মিণীও কয়েক বৎসর আগে গত হয়েছেন। আত্মীয় পরিজনরা তাঁর প্রতি হিংসুক। প্রিয়তম পুত্রকে তিনি নিজের আদলে গড়বেন ভেবেছিলেন, কিন্তু সে দূরে দূরে সরে থাকে, কখনো নিজে থেকে এসে ঘনিষ্ঠ বাক্য বলে না। বাড়ির সকলে তাঁকে সমীহ করে, ভয় করে, যেন তিনি একটা বাঘ। একটা স্নেহের কথা বলার মতন কেউ নেই। দেবেন্দ্র কি তাঁর জীবন প্রণালীর প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করে ?

দ্বারকানাথ অভিমানের সঙ্গে চিন্তা করলেন, তাহলে আর বাণিজ্য ও সমৃদ্ধির জন্য এত শ্রম করে কী হবে ? তাঁর জীবন তো শুষ্কই থেকে যাবে। মনে পড়লো, প্রবাসের দিনগুলি কত মনোরম ছিল। কত অভ্যর্থনা, কত স্তুতি। তিনি যেখানেই গেছেন, সকলের দৃষ্টি ঘিরে থেকেছে তাঁকে।

অর্থ উপার্জন তো অনেক হয়েছে, আর নয়, দ্বারকানাথ সঙ্কল্প করলেন যতশীঘ্র সম্ভব তিনি আবার সাগরপাড়ের দেশের উদ্দেশ্যে ভেসে পড়বেন। এ পোড়া দেশের জন্য আর মস্তক ঘর্মাক্ত করে লাভ কী ?
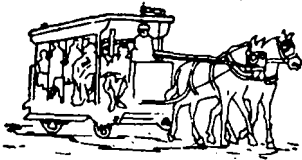
জোড়াসাঁকোর বাড়ির সম্মুখের অলিন্দে একটি আরাম কেদারায় বসে আছেন দেবেন্দ্র। সময় প্রায় মধ্যরাত্রি, সমস্ত গৃহটি অন্ধকার। বাতাসে ধারালো শীতের ভাব, কিন্তু দেবেন্দ্র শুধু পিরানের ওপর একটা মুগার চাদর জড়িয়ে আছেন, অন্তরের চাঞ্চল্যের জন্য তাঁর এখন শীতবোধ নেই।

দেবেন্দ্র এখন ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক যুবা পুরুষ। সবল, দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, আয়তচক্ষু। কিন্তু তাঁর মুখখানিতে বিষাদের ছায়া মাখা। মাথার ওপরে নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ, তিনি মধ্যে মধ্যে সেদিকে চোখ তুলে দেখছেন। এইরূপ আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি প্রায়ই প্রগাঢ় প্রশান্তি বোধ করেন, কিন্তু আজ মন কিছুতেই যেন স্ববশে আসছে না।

একটু আগেই তিনি বেলগাছিয়ায় তাঁর পিতার বিলাসপুরী থেকে চলে এসেছেন। এর ফলাফল কতদূর গড়াবে কে জানে। তাঁর পিতা সিংহবিক্রম পুরুষ, তাঁর অনুগতরা কেউ তাঁর ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ করছে, এ তিনি কিছুতেই সহ্য করেন না। কিন্তু দেবেন্দ্র আর কোনোক্রমেই থাকতে পারছিলেন না সেখানে, তাঁর অসহ্য বোধ হচ্ছিল। অতগুলি মানুষ নিছক লঘু আমোদে মত্ত। নৃত্য, গীত আর অবিরাম সুরার স্রোতে কারুর ক্লান্তি নেই। সেখানে অবস্থানের সময় একটি কথা বার বার দেবেন্দ্রর মস্তিষ্কে ঘুরছিল। কথাটি আছে কঠোপনিষদে। "প্রমাদী ও ধনমদে মূঢ় নির্বোধের নিকট পরলোক সাধনের উপায় প্রকাশ পায় না। ইহলোকই আছে, পরলোক নাই—যাহারা এ প্রকার মনে করে, তাহারা

পুনঃ পুনঃ আমার বশে (অর্থাৎ মৃত্যুর বশে) আসে।" চেষ্টা করেও দেবেন্দ্র কিছুতেই কথাগুলি মন থেকে বিতাড়ন করতে পারছিলেন না, ক্রমে দামামা ধ্বনির মতন এর প্রতিটি শব্দ যেন আঘাত করছিল তাঁকে। তিনি প্রায় দৌড়ে চলে এলেন সেখান থেকে।

পিতা ক্রুদ্ধ হবেন। তবু আজ দেবেন্দ্রর জীবনে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে। তিনি আজ সাবালক, তবু তাঁর পিতা তাঁকে সর্ববিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে চালিত করতে চান। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে বসে টাকাকড়ি গণনা করতে করতে তাঁর চিত্ত বিকল হয়ে যায়, তবু তাঁর পিতার আদেশে তাঁকে সেই কর্মই করতে হবে। পিতা চান সম্পদে ও ক্ষমতায় ভারতীয়দের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করবেন এবং তাঁর প্রিয়তম পুত্র তাঁর ছত্রছায়ায় থেকে এই অভিপ্রায় সিদ্ধির সহায়তা করবে। বস্তুতান্ত্রিক পিতা একেবারেই রাখেন না পুত্রের মনের খবর। প্রৌঢ় দ্বারকানাথ জানেন না তরুণ দেবেন্দ্রর মনে জেগেছে ঐহিক সম্পদের বদলে পারত্রিক জ্ঞানের জন্য আকুলতা। কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন যেমন জানতেন না তাঁর তরুণ পুত্র যুবরাজ শাক্য সিংহের বৈরাগ্য অনুভূতির কথা।

জীবনের উদ্দেশ্য কী?

এই প্রশ্ন দেবেন্দ্রর মনে এসেছিল এমনই এক মধ্য রাত্রে, গঙ্গার তীরে। এ জগতে সবচেয়ে যাঁকে তিনি ভালোবাসতেন, তাঁর সেই ঠাকুরমা তখন মৃত্যুপথযাত্রিনী। এই ঠাকুরমা দেবেন্দ্রকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন, শুনিয়েছেন কত রূপকথা, কত পুরান কাহিনী। ঠাকুরমাকে আনা হয়েছে অন্তর্জলী যাত্রার জন্য, শুইয়ে রাখা হয়েছে কাঁচা ঘরে। অর্ধেক শরীর তীরের ওপরে, পা দু-খানি জলমগ্ন, একদল কীর্তন গায়ক সেই মুমূর্ষুর কানে হরিনাম শোনাচ্ছে।

সেখান থেকে একটু দূরে একটা চাঁচের ওপর বসেছিলেন দেবেন্দ্র। তখন বয়েস একুশ, কী এক কার্যোপলক্ষে দ্বারকানাথ সে সময় এলাহাবাদে, দেবেন্দ্র সর্বক্ষণ রয়েছেন পিতামহীর সঙ্গে। গঙ্গার স্রোতের কুলুকুলু ধ্বনি, বাতাসে ভেসে আসা কীর্তনের সুর, মাথার ওপর জ্যোৎস্নাধৌত অনন্ত আকাশ—এইসব মিলেমিশে এক বিচিত্র অনুভূতি হলো তাঁর।

তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, জীবনের উদ্দেশ্য কী?

তিনি এ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনীর সন্তান, তাঁর অঙ্গুলি হেলনে যে-কোনো বিলাসদ্রব্য মুহূর্তে চলে আসবে তাঁর কাছে, ভোগের পরাকাষ্ঠা তিনি দেখিয়ে যেতে পারেন। কিছুদিন সব কিছুই চেখে দেখেছেন। কিন্তু এই ভোগবিলাস ও মৃত্যু, এই কি জীবনের চরম পরিণতি? পশুর জীবনের সঙ্গে এ জীবনের পার্থক্য কী? এ জীবন আর কি কোনো বৃহত্তর মহত্তর আনন্দের স্বাদ পাবার যোগ্য নয়?

শোক ও সংশয় নিয়ে বসে থাকা সেই একাকী যুবকের মনে হঠাৎ যেন একটা দিব্য আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। আকাশের জ্যোৎস্নায় যেন ধুয়ে গেল তাঁর চিত্ত। জীবনের উদ্দেশ্য কী, সে উত্তর তিনি তখুনি পেলেন না। কিন্তু এই নিশ্চিন্ত উপলব্ধি হলো যে, এই ভোগমত্ততাই জীবনের সব নয়। ঐশ্বর্য, আড়ম্বর, অপরের ওপর প্রভুত্ব করার দাপট, এসব অতি তুচ্ছ। সামান্য যে চাঁচের ওপর তিনি বসেছিলেন সেটাই যেন তাঁর যোগ্য স্থান, গালিচা দুলিচা সব হেয় বোধ হলো।

শেষ রাত্রে তিনি বাড়ি ফিরলেন, কিন্তু ঘুম হলো না। সারা শরীরের প্রবাহিত আনন্দে তিনি ছটফট করতে লাগলেন।

পরদিন সকালে আবার তিনি পিতামহীকে দেখতে এলেন শ্মশানঘাটে। বৃদ্ধার আজ শেষ সময় উপস্থিত। সকলে ধরাধরি করে তাঁকে গঙ্গাগর্ভে নামিয়ে চিৎকার করছে "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম"। দেবেন্দ্র জলে নেমে পাশে দাঁড়ালেন, তাঁর চোখে অশ্রু নেই। তখন দ্বারকানাথের পালিকা-জননী, পুণ্যশীলা অলকাদেবী প্রিয়তম নাতির দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একটি হাত নিজের বুকে রাখলেন, অন্য হাতের একটি আঙুল উঁচু করে ওপরের দিকে ঘোরাতে ঘোরাতে "হরিবোল" বলে ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন। দেবেন্দ্রর মনে হলো যেন ঠাকুরমা ঈশ্বর ও পরকালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন তাঁকে।

ঠাকুরমার শ্রাদ্ধের পর কল্পতরু সাজলেন দেবেন্দ্র। যে যা চায়, সবই তিনি বিলিয়ে দেবেন। সংক্ষিপ্ত বিলাসের আমলে যত সাজ-সজ্জা অলঙ্কার তিনি প্রিয়বোধে সংগ্রহ করেছিলেন, সে সব কিছু থেকে আবার মুক্ত হতে চান। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা সামান্য সুখ নিয়ে মত্ত, তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। এক একজন এক একটি দ্রব্য হাতে তুলে বলছে, নেবো? তিনি তৎক্ষণাৎ মাথা হেলিয়ে বলছেন, নাও। এক একজনের দু-হাতেও জিনিস ধরে না। তাঁর একজন জ্যাঠতুতো ভাই নিয়েছে তাঁর জড়ির পোষাক, দেয়াল থেকে খুলে নিচ্ছে মূল্যবান সব ছবি, তবু তার লোভ যায় না।

শ্বেত মর্মরের টেবিল, আবলুষ কাষ্ঠের কৌচ এগুলোর দিকে চেয়েও সে জিজ্ঞেস করে, নেবো ? দেবেন্দ্র ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করে বললেন, নাও ! সে তখন মুটে ডেকে সব নিয়ে গেল।

শ্মশানে যে তীব্র আনন্দ হয়েছিল, তা বেশীদিন স্থায়ী হলো না। আবার এক দুঃখবোধ তাঁকে ঘিরে ধরলো। তিনি নেতি পেয়েছেন, কিন্তু অস্তি পাননি। কিসে সুখ নেই, তা বুঝেছেন, কিন্তু যাতে চিরসুখ ও চিরশান্তি তা অবলম্বন করতে পারছেন না। ঈশ্বর অনন্ত সুখের আকর, কিন্তু ঈশ্বর কে ? তিনি কোথায় ? কী তাঁর স্বরূপ ?

প্রথম বয়েসে উপনয়নের পর তিনি মন দিয়ে শালগ্রাম শিলার পূজা দেখতেন। তখন বোধ হতো ঐ শিলাই ঈশ্বর। দুর্গাপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, সরস্বতী পূজায় তিনি আর পাঁচজনের মতই মেতে উঠতেন। প্রতিদিন কলেজ যাবার পথে ভক্তিভরে প্রণাম করতেন ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী দেবীকে, অপরাপর বালকদের মতন তিনিও পরীক্ষার আগে দুরুদুরু বক্ষে দেবীর কাছে পাশ করার বর প্রার্থনা করতেন। তখন জানতেন যে শালগ্রাম শিলার মতনই দশভুজা দুর্গা বা চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী—সবই ঈশ্বরের প্রকাশ।

এখন বুঝতে পারছেন, এই সব কাষ্ঠ লোষ্ট্র দিয়ে গড়া মূর্তি কখনো ঈশ্বর হতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ কী ? নব্য বঙ্গীয় যুবকরা এই কাষ্ঠ লোষ্ট্র পূজায় তিতিবিরক্ত হয়ে অনেকেই নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকেছে, আবার অনেকে খৃষ্টীয় ধর্ম বরণ করে নিচ্ছে। দেশের ভালো ভালো মেধা চলে যাচ্ছে খৃষ্টীয় ধর্মের দিকে। কিন্তু দেবেন্দ্র চান নিজেই নিজের ঈশ্বরকে খুঁজে বার করতে।

এই অনুসন্ধানের যাতনা যে কী তীব্র, তা আর অন্য কে বুঝবে ? বিষয় কর্মে একেবারেই মন টেঁকে না। মানুষের সংসর্গও ভালো লাগে না। এক একদিন অফিস ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যান, নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে চলে আসেন শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে। এ স্থান অতি নির্জন। কিড সাহেবের স্মৃতিস্তম্ভের ওপর একাকী বসে থেকে তিনি মনের বিষাদ অপনয়নের চেষ্টা করেন। কিছুতে যায় না সে বিষাদ। রোদ্দুরের রঙ-ও তাঁর ঘোর কালো বলে বোধহয়।

তীব্র অনুসন্ধিৎসায় তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের দর্শন গ্রন্থগুলি মন্থন করতে লাগলেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে হিউম ও লকের দর্শনের খুব প্রতপত্তি। এঁরা জড়বাদ ও সংশয়বাদের প্রবক্তা। আমাতেই আমি-র শেষ। আগুনের যে পোড়াবার ক্ষমতা আছে তা চিরসত্য কে বলেছে ? আমি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অগ্নিকে প্রত্যক্ষ করি, তার দাহিকা শক্তি আমি অনুভব করি, কিন্তু যেখানে আমি নেই, সেখানেও অগ্নির দাহিকা শক্তির কথা আমি স্বীকার করবো কী করে ? মানুষের মন একটা শূন্য পাতা, সেখানে শুধু অভিজ্ঞতার আঁচড় পড়ে। সমস্ত জ্ঞানই আমাদের অভিজ্ঞতা, এ ছাড়া আর কোনো জ্ঞান নেই। এই জড়বাদ দেবেন্দ্রকে তৃপ্তি দেয় না।

প্রকৃতিবাদীরা আবার অন্য কথা বলে। প্রকৃতির অধীনতাই মানুষের সর্বস্ব। এ তত্ত্বে শিউরে ওঠেন দেবেন্দ্র। প্রকৃতির অধীনতাই মানুষের সর্বস্ব ? এই পিশাচীর পরাক্রম দুর্নিবার।...এই পিশাচী প্রকৃতির হাতে তো কারুর নিস্তার নেই। এর কাছে নতশিরে বসে থাকাই যদি চরম কথা হয়, তাহলে আর আশা কৈ ভরসা কৈ ?

সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেও তিনি তৃপ্ত হন না। মাঝে মাঝে একটু একটু যেন আলোক দেখতে পান, আবার হারিয়ে যায়। মনের বিষাদ আর কিছুতেই দূর হয় না। তারপর একদিন অকস্মাৎ এলো সেই উন্মোচনের মুহূর্তটি।

একদিন তিনি উপর মহলের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছেন, এমন সময় দোতলার বারান্দায় দেখলেন কোনো একটি বইয়ের ছিন্ন পৃষ্ঠা উড়ছে। কৌতূহলী হয়ে তিনি কাগজটি তুলে নিলেন। তাতে কিছু সংস্কৃত শ্লোক লেখা আছে। দেবেন্দ্র মোটামুটি সংস্কৃত ভাষা রপ্ত করেছেন, কিন্তু সেই শ্লোকের অর্থ বুঝতে পারলেন না।

সংস্কৃত চর্চার জন্য তিনি একজন গৃহশিক্ষক রেখেছিলেন। সেই শ্যামাচরণ পণ্ডিতকে ডেকে তিনি বললেন, দেখুন তো, এই পৃষ্ঠাটি কোথা থেকেই বা এলো এবং এতে যা মুদ্রিত রয়েছে, তার অর্থই বা কী ?

পণ্ডিত ভ্রূ কুঞ্চিত করে রইলেন। এই শ্লোক তাঁর কাছেও অপরিচিত, সঠিক অর্থ তাঁর কাছেও পরিষ্কার হচ্ছে না।

দেবেন্দ্র তখন বেশী দেরি করতে পারছেন না। সকাল দশটা বেজে গেছে, এখন তাঁর ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে যাবার কথা। তিনি না গেলে ক্যাশ খোলা হবে না। পণ্ডিতকে বললেন, আপনি এর অর্থ করে রাখুন, আমি বৈকালে এসে দেখবোখন।

অফিসে গিয়েও তিনি সর্বক্ষণ ছটফট করতে লাগলেন। নিদারুণ ঔৎসুক্যে তাঁর মর্মপীড়া হতে লাগলো। কোথা থেকে এলো ঐ কাগজটা, কী ওতে লেখা আছে ? দ্বিপ্রহরের পর আর থাকতে পারলেন না তিনি। অন্য একজনকে ক্যাশ বুঝিয়ে দিয়ে তিনি দ্রুত গৃহে ফিরে এলেন।

শ্যামাচরণ পণ্ডিতের মুখখানি তখনও মলিন। তিনি শ্লোকের অর্থ উদ্ধার করতে পারেননি। খানিক ইতস্তত করে তিনি বললেন, আপনি বরং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ডাকাইয়া লউন। আমার মনে হয় এসব ব্রহ্মসভার কথা!

ব্রহ্মসভার নাম শুনেই দেবেন্দ্রর বুক ধড়াস করে উঠলো। সেই ব্রহ্মসভা এখনো আছে ? কে চালায় ? রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ? হ্যাঁ তাও তো বটে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁরই পিতার বেতনভুক। তৎক্ষণাৎ তিনি বিদ্যাবাগীশকে ডাকতে পাঠিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

রামমোহন ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একেশ্বরবাদীদের উপাসনার জন্য। হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান সকলেই এতে যোগ দিতে পারবে। বিদ্যাবাগীশ তার আগে থেকেই রামমোহনের সঙ্গে আছেন। তাঁর ইচ্ছে এই সভার পক্ষ থেকে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম প্রচার করা হোক। রামমোহন রাজি হননি। নতুন ধর্মের প্রয়োজন নেই, সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই যারা নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক, তাদের মিলনই চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর উপস্থিতিতে সেখানে সব ধর্মের লোকেরাই আসতো। সন্ধ্যেবেলা ফিরিঙ্গি ও মুসলমান বালকেরা ইংরেজি ও ফারসি ভাষায় স্তব গান করে যেত। বিষ্ণু ও কৃষ্ণ নামে দুই গায়ক ধরতেন গান, তাঁদের সঙ্গে পাখোয়াজ সঙ্গত করতেন গোলাম আব্বাস। বালক দেবেন্দ্র রামমোহনের পাশে বসে শুনতেন।

ব্রহ্মসভার জন্য আলাদা গৃহ নির্মাণ করেছিলেন রামমোহন। কিন্তু বছর দু-এক এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার পর তিনি পাড়ি দিলেন ইংলণ্ড। আর ফিরলেন না। রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ নিষ্ঠাবান হিন্দু, পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী, পিতার এই ধর্মসভাকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে তিনি আগ্রহী হলেন না। এই সভা বন্ধই হয়ে যেত, কিন্তু এগিয়ে এলেন দ্বারকানাথ। সারা দেশ রামমোহনের বিপক্ষে, ব্রহ্মসভা স্থাপনের পর থেকেই হিন্দু ধর্ম যায় যায় রব উঠেছিল, গোঁড়ার দল পালটা সভা স্থাপন করেছিল। সুতরাং বিবাদ এড়াবার জন্য দ্বারকানাথ রামমোহনের মতে পুরো মত মেলাননি। তবে বন্ধুর একটি বাসনা বা বাতিককে সম্মান প্রদর্শন করতে চেয়ে তিনি বললেন যে, ব্রহ্মসভা যদি চলে তো চলুক, তিনি এর ব্যয়ভার বহন করবেন।

দেবেন্দ্রনাথের মনে পড়লো একটি দিনের কথা। বালক বয়েসে তিনি মাণিকতলায় রামমোহন রায়ের গৃহে প্রায়ই যেতেন। একবার তিনি গিয়েছিলেন রাজাকে দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ করতে। দেবেন্দ্র যেই বললেন, 'রামমণি ঠাকুরের বাড়িতে আপনার দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ', অমনি চমকে উঠলেন রাজা। তিনি বললেন, 'আমাকে পূজায় নিমন্ত্রণ ?' তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এত প্রতিবাদ করছেন, তবু লোকে তাঁকে পূজায় ডাকে ? রামমোহন তাঁর বন্ধুপুত্র দেবেন্দ্রকে সম্বোধন করতেন 'বেরাদর' বলে। তিনি বললেন, 'বেরাদর, আমাকে নয়, আমার পুত্র রাধাপ্রসাদকে নিমন্ত্রণ করো গে।'

"আমাকে পূজায় নিমন্ত্রণ ?" সেই বিস্মিত স্বর যেন দেবেন্দ্রের কানে আবার ভেসে উঠেছিল, অথচ অনেকদিন ভুলে ছিলেন মাঝখানে। আর একটা কথাও মনে পড়লো তাঁর। বিলাত যাত্রার কিছুক্ষণ আগে রামমোহন এসেছিলেন দ্বারকানাথের কাছে বিদায় নিতে। খানিক কথাবার্তার পর তিনি বলেছিলেন, দেবেন্দ্র কোথায় ? দেবেন্দ্রকে ডাকো। তার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে আমি যাবো না।

কিশোর দেবেন্দ্র এলে রাজা সাগ্রহে তার হাত চেপে ধরেছিলেন। সেই ব্যবহারের কোনো গূঢ় অর্থ ছিল কি ? রাজা কি বোঝাতে চেয়েছিলেন, বেরাদর দেবেন্দ্র, আমি তোমার পিতাকে জানি। তিনি বৈষয়িক লোক। কিন্তু আমার কার্যভার তুমি লও!

অথচ প্রমোদে প্রমাদে সে কথা ভুলে ছিলেন দেবেন্দ্র। প্রবাসে রাজার মৃত্যুর পর দু-একবার মাত্র ব্রহ্মসভায় গিয়েছিলেন তিনি। নিছক কৌতূহল বশে। সেখানে তখন দারুণ দৈন্য দশা। প্রবল জেদে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ একাই সেখানকার দীপ জ্বেলে রেখেছেন। আর একজন দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ সেখানে

উপনিষদ পাঠ করেন। কোনো কোনো দিন তিনি না এলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ নিজেই একমাত্র উপাসক। নিজেই উপাচার্য এবং নিজেই শ্রোতা। বৃষ্টি বাদলার দিন কিছু লোক এমনিই হঠাৎ ঢুকে পড়ে সেখানে। তাদের কারুর হাতে বাজার ভর্তি ধামা, কারুর হাতে টিয়াপাখি। উৎসাহিত হয়ে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপদেশ শুরু করে দেন, শ্রোতারা গোল গোল চক্ষু করে শোনে এবং বৃষ্টি থামা মাত্র হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে চলে যায়।

এসব দেখে কৌতুক বোধ করেছিলেন দেবেন্দ্র। আর যাননি। মধ্যে কয়েক বৎসর তিনি ব্রহ্মসভার কথা একেবারেই বিস্মৃত হয়ে ছিলেন।

ডাক পেয়ে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়িতে এসে দেবেন্দ্রর সামনে আসন গ্রহণ করলেন। যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনের পর দেবেন্দ্র প্রশ্ন করলেন, মহাশয়, এই ছিন্ন পৃষ্ঠাটি কোন্ গ্রন্থের ? এই শ্লোকের অর্থ আপনি আমার নিকট ব্যাখ্যা করতে পারেন কি ?

বিদ্যাবাগীশ পৃষ্ঠাটি পরীক্ষা করে বললেন, ইহা তো ঈশোপনিষদের শ্লোক। ব্রহ্মসমাজ সংকলিত গ্রন্থ হইতে ছিন্ন হইয়াছে। এ কাগজ এ স্থলে আসিল কী প্রকারে ?

দেবেন্দ্র বললেন, তাহা আমি জানি না। আপনি শ্লোকের অর্থ আমাকে বুঝিয়ে দিন।

বিদ্যাবাগীশ শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং ॥

তারপর প্রথমে বললেন, আক্ষরিক অর্থ। ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত জগৎকে আচ্ছাদন করো। তিনি যাহা দান করেছেন, তাহাই উপভোগ করো।

এবার শুরু করলেন ব্যাখ্যা। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—তিনি যাহা দান করিয়াছেন, তাহাই উপভোগ করো···তিনি কী দান করিয়াছেন ? তিনি আপনাকেই দান করিয়াছেন। সেই পরম ধনকে উপভোগ করো। আর সকল ত্যাগ করিয়া সেই পরম ধনকে উপভোগ করো।···

দেবেন্দ্র যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ খুঁজছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ঈশ্বরকে কোথায় পাবেন ? এখন শুনলেন ঈশ্বরের দ্বারাই সমুদয় জগতকে আচ্ছাদন করো। তিনি আপনাকেই দান করেছেন—এর থেকে বেশী মানুষ আর কী চাইতে পারে ?

এই উড়ন্ত কাগজ যেন এক দৈববাণী বহন করে আনলো তাঁর কাছে। অভিভূতের মতন উঠে গিয়ে তিনি বিদ্যাবাগীশকে প্রণাম করলেন।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশও ব্যাকুল হয়ে খুঁজছিলেন একজন মন্ত্রশিষ্যকে। দেবেন্দ্রর মধ্যে তিনি তাকে পেয়ে গেলেন। এক প্রচারকের সঙ্গে মিলন হলো এক মুমুক্ষুর।

তাঁর এই নবলব্ধ জ্ঞানের চর্চা ও প্রসারের জন্য দেবেন্দ্র কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন তত্ত্বরঞ্জিনী সভা। দ্বিতীয় বৎসর সেই সভার নাম বদলে হলো তত্ত্ববোধিনী। বাড়ির একতলার একটি অন্ধকার ঘরে বসে এর অধিবেশন, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ নিয়মিত এখানে এসে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম বিষয়ে নানান উপদেশ দেন। দেবেন্দ্র ভেবেছিলেন এ কাজ চলবে তাঁর পিতার অজ্ঞাতসারে। কিন্তু তীক্ষ্ণধী দ্বারকানাথের কাছে কিছুই গোপন থাকে না। একদিন তিনি বেদান্তবাগীশকে ডেকে ধমক দিয়ে বললেন, একেই তো দেবেন্দ্রর বিষয়বুদ্ধি অল্প, তার ওপর তার মাথায় ব্রহ্ম ব্রহ্ম ঢুকিয়ে যে তার সর্বনাশ কচ্চো !

দেবেন্দ্র পিতার এই ভ্রূকুটি মান্য করলেন না। তত্ত্ববোধিনী সভার তরফ থেকে প্রকাশিত হলো পত্রিকা, স্থাপিত হলো বিদ্যালয়। বাণিজ্য-রাজ দ্বারকানাথের পুত্র হয়ে তিনি মেতে রইলেন নিছক যত অ-বাণিজ্যিক কাজে। এমন কি একবার তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক উৎসবে কলকাতায় তাঁদের পরিবারের যতগুলি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অফিস আছে তার সমস্ত কর্মচারীদের নামে তিনি আলাদা করে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন। তত্ত্ববোধিনী সভা ততদিন পর্যন্ত ছিল অনেকটা গুপ্ত ধরনের ব্যাপার, মাত্র একশত দেড়শত লোকের জ্ঞাত ছিল এ খবর। কর্মচারীরা এ সভার নামই শোনেনি, এমন কি নাম শুনেও অর্থ বুঝতে পারলো না। অবশ্য মালিকপুত্রের নিমন্ত্রণই আদেশের সমান, এসে উপস্থিত হলো সকলেই। শঙ্খ, ঘণ্টা ও শিঙা বাজিয়ে রাত্রি আটটায় দরজা খোলা হলো সভাকক্ষের। লাল রঙের বনাত গায় দিয়ে দশ জন দশ জন করে দুই সারিতে বিশ জন দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ সমস্বরে করলেন

বেদপাঠ। তারপর দেবেন্দ্র পুতুল পূজার পরিবর্তে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের তত্ত্ব ব্যাখ্যান করলেন। এরপর আরও বক্তৃতা। একের পর এক। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ একাই লাগিয়ে দিলেন দু ঘণ্টা। রাত দুটোর পর কর্মচারীরা বিমূঢ় বিহ্বল অবস্থায় বাড়ি ফিরলো। এ সব কী কাণ্ড হচ্ছে ওখানে, কিছুই তাদের মাথায় ঢুকলো না। কিন্তু তাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো দেবেন্দ্রর। তিনি তত্ত্ববোধিনী সভাকে প্রকাশ্যে, জনসমক্ষে নিয়ে এলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই দেবেন্দ্র বুঝলেন, তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রহ্মসমাজকে আলাদা করে রেখে লাভ নেই। দুই সভারই উদ্দেশ্য যখন এক, তখন একসঙ্গে মিলে যাওয়াই ভালো। তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক উপাসনা হতে লাগলো ব্রহ্মসভার উপাসনার সঙ্গে মিলিয়ে।

এই পর্যন্ত এগিয়ে দেবেন্দ্র একটু থমকে ছিলেন। রামমোহনের ব্রহ্মসভার সঙ্গে প্রকাশ্যে একাত্মতা স্থাপনের বহু রকম প্রতিকূলতা দেখা দেবার সম্ভাবনা। শুধু হিন্দুসমাজের কাছ থেকেই নয়, নিজেদের পরিবার থেকেও। স্বয়ং পিতা কী বলবেন ঠিক নেই। দ্বারকানাথ পুত্রকে মুখে রূঢ় বাক্য বলেন না, কিন্তু সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণে তিনি অবিচল।

কিন্তু দেবেন্দ্র তখনও অস্থির হয়ে আছেন। তাঁর নির্মল চিত্তে কোনোরূপ ছলনার স্থান নেই। বহুকালাবধি প্রচলিত ধর্মীয় আচার, সংস্কার ও পূজা পার্বণ সম্পর্কে তাঁর মন বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে। একথা সকলকে না জানানো পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই। যে সত্যের সন্ধান তিনি পেয়েছেন, সেই সত্যের স্বাদ তিনি দিতে চান অন্যকে। এই সত্য সাধনা যেন পৃথক এক ধর্ম, এর প্রচার প্রয়োজন। এবং তারও আগে প্রয়োজন এক ধর্মীয় দল স্থাপনের। দেশের মানুষকে খৃষ্টানী থেকে দূরে সরিয়ে আনার জন্য এই নব ধর্মের প্রচার ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এ ব্যাপারেই দ্বিধায় দুলছিলেন তিনি। বেলগাছিয়া ভিলা থেকে অকস্মাৎ চলে এসে বারান্দায় একলা বসে থেকে তাঁর বারংবার মনে হতে লাগলো, বৃথা সময় চলে যাচ্ছে। তাঁর পিতার বাহ্য আড়ম্বর ও জাঁকজমকের বিরুদ্ধে তাঁর একটা প্রতিবাদ রাখা দরকার। জীবনের উদ্দেশ্য নয় পার্থিব জগতে সবার ঊর্ধ্বে ওঠা, জীবনের উদ্দেশ্য সত্যের প্রতিষ্ঠা।

জ্যোৎস্নাময় আকাশের দিকে চেয়ে তিনি প্রেরণা চাইলেন, তাঁর মনে বল এলো, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ মনে মনে একটি শপথ নিয়ে নিলেন।

৭ই পৌষ দেবেন্দ্র তাঁর কুড়িজন বন্ধুর সঙ্গে এক নতুন ধর্মে দীক্ষা নিলেন। ব্রাহ্মসমাজের যে নিভৃত কুঠুরীতে বেদ পাঠ হতো, সেই কুঠুরী ঢেকে ফেলা হলো পর্দা দিয়ে, মধ্যে একটি বেদী, তার ওপরে বসলেন বৃদ্ধ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। সেদিন বৃহস্পতিবার, দুপুর তিনটের সময় দেবেন্দ্র অফিস ছেড়ে চলে এসেছেন। বিদ্যাবাগীশকে তিনি বললেন, হে আচার্য, বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্মব্রত গ্রহণ করিবার জন্য আমরা সকলে আপনার নিকট উপনীত হইয়াছি।...যাহাতে আমরা অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারি, যাহাতে সৎকর্মে আমাদের প্রবৃত্তি হয় এবং পাপ মোহে মুগ্ধ না হই, এরূপ উপদেশ দিয়া আমাদের সকলকে মুক্তির পথে উন্মুখ করুন।

বিদ্যাবাগীশের চক্ষে অশ্রু এসে গেল। বহুদিন পর তাঁর স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।

বয়েস অনুসারে প্রথমে শ্রীধর ভট্টাচার্য, পরে শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য এগিয়ে গিয়ে বেদীর সামনে প্রতিজ্ঞা পাঠ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। তৃতীয় ব্রাহ্ম হলেন দেবেন্দ্রনাথ। তারপর তাঁর ভাই গিরীন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমার দত্ত ও অন্যান্যরা। দীক্ষান্তে নবীন ব্রাহ্মরা প্রত্যেকে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। এক সামাজিক বিপ্লব ঘটতে চলেছে যে, সেই সচেতনতা থেকে তাঁদের শরীরে রোমাঞ্চ হতে লাগলো।

দেবেন্দ্র সকলকে বললেন, পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল। এখন ব্রাহ্মধর্ম হইল। ব্রহ্ম ব্যতীত ধর্ম থাকিতে পারে না এবং ধর্ম ব্যতীতও ব্রহ্ম লাভ হয় না।

এইভাবে রামমোহনের আদর্শ থেকে কিছু বিচ্যুত হয়ে বিদ্যাবাগীশ ও দেবেন্দ্র সূচনা করলেন এক পৃথক ধর্মের। রামমোহন চেয়েছিলেন সর্বধর্মের মধ্য থেকে সংস্কারমুক্ত একেশ্বরবাদী মানুষগুলিকে এক জায়গায় এনে জড়ো করতে, সেইজন্যই তিনি পৃথক নাম দিয়ে কোনো ধর্ম প্রচার করতে চাননি। আর দেবেন্দ্র স্থাপন করলেন, শুধু উচ্চবর্ণের হিন্দু ভদ্র সমাজের জন্য এক বিদ্রোহী ধর্মের। অবশ্য রামমোহনের মতটি ছিল একটি তত্ত্ব মাত্র, আর দেবেন্দ্রর অধ্যক্ষতায় নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্মটি বাস্তব পথ নিল অচিরেই।

সিংহদের অট্টালিকার নীচমহলের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দিবাকরের স্ত্রী সোহাগবালার হাতে।

দিবাকর এ বাড়ির গোমস্তাই শুধু নয়, রামকমল সিংহের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। সে দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করার কাজে পরম দক্ষ। আপনভোলা রামকমল সিংহকে সে পোস্তার হাটে বিক্রয় করে আবার কুলিবাজার থেকে ক্রয় করে আনার ক্ষমতা রাখে, নেহাৎ বিধুশেখরের তীক্ষ্ণ নজরের জন্যই তা সম্ভব হয় না। বিধুশেখরকে দিবাকরের মতন ধুরন্ধর ব্যক্তিও ডরায়। দিবাকর যে তার স্বগ্রাম জয়নগরে পাকা কোঠাবাড়ি বানিয়েছে এবং প্রতি বছরই বিঘের পর বিঘে জমি খাস করে ভূসম্পত্তি বাড়াচ্ছে, তা বিধুশেখরের অজানা নেই। বিধুশেখর মনে করেন, চাকর-কর্মচারীদের খানিকটা চুরির প্রশ্রয় না দিলে ঠিক কাজ আদায় করা যায় না। তবে মাঝে মাঝে হুঁশিয়ারি দিতে হয়।

অকস্মাৎ হয়তো একদিন দিবাকরকে ডেকে বিধুশেখর বলেন, এবার গাঁয়ে গিয়ে কি পুকুর কাটালে নাকি হে, দিবাকর?

দিবাকর কেঁপে ওঠে। এ বুড়োর কানে সে খবরও পৌঁছে গেছে? তার পশ্চাতে কাকে যে চর লাগানো হয়েছে, তা দিবাকর কিছুতেই ধরে উঠতে পারে না।

বিধুশেখর হাত তুলে তাকে অভয় দিয়ে বলেন, তা বেশ করেচো। গাঁয়ে একজন পুকুর কাটালে পাঁচজনের উবগার হয়। তা পুকুর উচ্ছুগ্যু করতে হয় জানো তো? কার নামে উচ্ছুগ্যু করলে?

দিবাকর চট করে উত্তর দেয়, আজ্ঞে, আমাদের কত্তার নামে!

—পাগল হোয়েচো নাকি! জ্যান্ত মানুষের নামে উচ্ছুগ্যু হয়? কেন, তোমাদের গৃহদেবতা নেই? পুকুর কেটোচো আর মা কালীর প্রতিষ্ঠা করোনি?

দিবাকররা বৈষ্ণব। তাদের বাড়িতে কালী পুজো হয় না, এমনকি অন্যত্র ঐ অনুষ্ঠানে সে প্রণাম দিতেও যায় না।

সে বললো, সাত পুরুষ ধরে আমাদের বাড়িতে নারায়ণের পুজো হয়।

—বলোনি তো সে কতা আগে কখনো। থাউকো খাতায় তোমার নামে পঞ্চাশ টাকা লিখিয়ে নিও, আমি রামকমলকে বলে দেবোখন। সেই টাকায় ঠাকুরের মাতায় একটা সোনার মুকুট গড়িয়ে দিও!

দিবাকর বুঝতে পারে না, বিধুশেখর কোন্‌দিক থেকে প্যাঁচটা কষলেন। তবে এটা যে এক প্রকার সতর্কীকরণ, তা বুঝতে কোনো ভুল হয় না। পুকুর কাটার খরচ কোথা থেকে জোগাড় করলো, সে প্রশ্ন না তুলে অযাচিতভাবে পঞ্চাশ টাকা বখশিস! দিবাকর চলে ডালে ডালে তো বিধুশেখর চলেন পাতায় পাতায়।

কিন্তু অন্দরমহলের নীচতলায় সোহাগবালার ক্রিয়াকলাপের হদিশ বিধুশেখরও পান না। সেটা একটা পৃথক জগৎ।

বাড়িতে শুধু দাসদাসীর সংখ্যাই আঠারো, এছাড়া রয়েছে নিজস্ব রজক, গোয়ালা, মালি, পাচক, দ্বারবান, পাল্কি-বেহারা ও সহিস। দাসদাসীরা পৃথক পৃথক কাজের জন্য নির্দিষ্ট। খোদ কর্তার জন্য তিনজন, গিন্নীমার তিনজন, দুই পুত্রের জন্য চারজন, এছাড়া কর্তার বিধবা ভ্রাতৃবধূ, পিসী ইত্যাদির জন্যও একজন করে রয়েছে। একজন অন্যের কাজ করবে না। এই তো কর্তার মা মারা গেলেন গত বছর, তাঁর দুজন নিজস্ব দাসী এখনো রয়ে গেছে। পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকে, তাদের জন্য কাজ খালি নেই।

এ বাড়িতে দুই হেঁসেল। একটি ওপরতলার কর্তাদের জন্য, অন্যটি আশ্রিত পরিজন ও দাসদাসীদের। এর মধ্যে দ্বিতীয় হেঁসেলটি সম্পূর্ণ সোহাগবালার করায়ত্তে। সোহাগবালার দাপটে তার মুখের ওপর কেউ রা কাড়তে পারে না।

বাড়ির পেছনে মস্ত বাগান, গোয়াল ঘর ও পুষ্করিণী। বাগানের এক পাশে সারি সারি গোলপাতার ঘর, তার পেছনে কয়েকটি খাটা পায়খানা। ঐ গোলপাতার ঘরগুলি দাসদাসীদের। তার একটি ঘর

থেকে প্রতিনিয়ত কান্নার স্বর ভেসে আসে।

গঙ্গার ঘাট থেকে বিম্ববতী এক মা আর ছেলেকে কুড়িয়ে এনেছেন। স্ত্রীলোকটির স্বামী হারিয়ে গেছে আর মেয়ে মারা গেছে শুনে চক্ষের জল ফেলেছেন তিনি। তারপব সোহাগবালাকে ডেকে নির্দেশ দিয়েছেন, এখন থেকে ওরা এ বাড়িতেই থাকবে।

প্রথম দিন থেকেই ওদের অপছন্দ করেছে সোহাগবালা। নতুন কোনো আশ্রিত এলেই তার এই মনোভাব হয়। অন্যান্য আশ্রিতরাও বিষচক্ষে দেখলো থাকোমণি আর দুলালচন্দ্রকে। আশ্রিতদের ধর্মই এই, ওপর মহল থেকে করুণা কণা পাবার প্রতিযোগিতায় তারা পরস্পরকে হিংসে করে। মরে গেলেও একজন আর একজনকে সাহায্য করবে না।

নবাগতদের শায়েস্তা করবার জন্য সোহাগবালার নিজস্ব কিছু প্রক্রিয়া আছে। গিন্নীমা তো কয়েকদিনের মধ্যেই ওদের কথা ভুলে যাবেন। তখন সোহাগবালা ওদের ওপর এমন অত্যাচার চালাবে যে কিছুদিনের মধ্যেই ওরা বাপ বাপ বলে পালাবার পথ পাবে না। তবে প্রথম কয়েকদিন একটু তোয়াজ করতে হবে, হঠাৎ গিন্নীমার টনক নড়লে আর রক্ষে নেই। মাগীটা দিনরাত পা ছড়িয়ে বসে ডুকরে ডুকরে অলক্ষুণের মতন কাঁদে। আর যেন কারুর স্বামী হারায় না দুনিয়ায়। আর যেন কারুর মেয়ে মরে না। স্বামীটা হারিয়েছে না ওদের ফেলে পালিয়েছে তার ঠিক কী ? আর ছেলেটাও মায়ের পাশে বসে ঘ্যানোর ঘ্যানোর করে। খেতে ডাকলেও আসে না। যেন নবাবের বেটী, ওদের ঘরে গিয়ে খাবার দিয়ে আসতে হবে।

লোক পাঠিয়ে ছেলেটাকে জোর করে ধরে আনালে সোহাগবালা। খালি গা, সামান্য একটি নেংটি পরা, বছর ছয়েক বয়েস দুলালচন্দ্রের, শরীরে এখনো গ্রাম্য শ্যাওলা লেগে আছে মনে হয়। চোখ দুটি জলে-পড়া বালকের মতন।

দালানে একটা ছোট জলচৌকির ওপর বসে সোহাগবালা, সামনে পানের সরঞ্জাম ছড়ানো। প্রতিদিন সকাল থেকে দু' প্রহর বেলা পর্যন্ত এখানে বসে থেকে সে সবদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে আর মুখের মধ্যে সমানে পানের জাবর কাটা চলতে থাকে। তার শরীরখানি অতিশয় পৃথুলা, পাতলা শাড়ি ভেদ করে তার বিশাল দুই বুক ও কোমরের চর্বির স্তর স্পষ্ট দেখা যায়। ফর্সা মুখখানিতে যেন গনগনে চুল্লির আঁচ।

দুই ভৃত্য দুলালচন্দ্রকে ধরে এনে সামনে দাঁড় করাবার পর সোহাগবালা একবার আপাদমস্তক দেখলো তাকে, তারপর পাশের পিকদানিতে লাল থুতু নিক্ষেপ করে বললো, তোরা মায়ে পুতে ভেবেচিস কী, অ্যাঁ ? ডেড় মাস হয়ে গেল, এখুনো বসে বসে কাঁদবি ? হাতে করে কুটোটি নাড়ারও নাম নেই !

দুলালচন্দ্র ভয়ে সিঁটিয়ে রইলো। কী উত্তর দেবে সে জানে না।

সোহাগবালা বললো, এই, তোরা এই ছোঁড়াকে কাজে লাগিয়ে দে আজ থেকে। এক গামলা জল আর একটা ন্যাতা দে ওকে, এই দালানটা পুঁছুক।

যদিও একাজের জন্য অন্য লোক আছে, তবু দাসদাসীরা এই বালকটিকে কাজে নিয়োগ করতে বেশ উৎসাহী হয়ে উঠলো। তক্ষুনি এসে গেল মাটির গামলায় জল ও পাটের ন্যাতা। এক দাসী জলে ভেজানো ন্যাতাটা দুলালচন্দ্রের হাতে তুলে দিয়ে বললো, আবাগীর ব্যাটা ডাঁইরে ডাঁইরে দেকচিস কী ! নে, পোঁছ। গোমস্তা-মা রেগে গেলে তোকে কাঁচা খেয়ে ফেলবেন !

দুলালচন্দ্র দালান মুছতে শুরু করে দিল। এ কাজে সে খুব একটা অসুখী হলো না, কারণ দিনের পর দিন অন্ধকার ঘরে বসে মায়ের কান্না শুনতে শুনতে তারও একঘেয়ে লাগছিল। এখানে তবু কতরকমের মানুষ।

উঠোনের ওপর ধপাস ধপাস করে ফেলা হলো দুটো বড় বড় কাতলা মাছ। মাছ দুটি দাপটের সঙ্গে লাফাতে লাগলো কয়েকবার। মস্ত বড় বঁটি নিয়ে বসে গেল দুজন। সোহাগবালা দূর থেকে বসে নির্দেশ দেয়, মুড়ো দুটো সরিয়ে রাখ···কত্তাবাবু বাড়ি নেই, ওপরের হেঁসেলে মুড়ো যাবে না। পেটি আর গাদার মাচ আলাদা রাখ, পরে টুকরোগুলো আমায় গুণে দেকাবি···দুর্যোধন, তুমি এখেনে হাঁ করে ডাঁড়িয়ে কী দেকচো ? দুধটা ক্ষীর করোচো ? যাও আগে সেটা করো গে···হ্যাঁ লা পাঁচী, গিন্নীমার পাখিদের ছোলা দিইচিলি ওপরে ? দিসনি এখনো···ওমা তোদের নিয়ে কি কর্বো···মরণ আমার···এক মন ছোলা এয়েচে এ মাসে। এর মধ্যে ফুইরে গ্যালো···পাখির বদলে কি হাতিকে ছোলা খাওয়াচ্চিস ?

পাঁচী উত্তর দিল, এক মণ কোতায় গো, ফড়ে মিনসে যে আদ মণ মেপে দিয়ে গ্যালো··· ।

সোহাগবালা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললো, তোর মাতা ! চুনীর বাপ নিজে এক মণের কতা বলেচে, আমি নিজে দেকে নিইচি আর তুই আমায় চোখ ঠারাবি ! ইদিকে আয়, আয় ইদিকে—

এইসব ডামাডোলের মধ্যে দুলালচন্দ্র এক কাণ্ড করে বসলো। জলভর্তি অত বড় মাটির গামলটা সে টেনে টেনে সরাতে পারে না, একবার জোরে হ্যাঁচকা টান দিতেই সেটি উল্টে গিয়ে দ্বিখণ্ড হলো, সমস্ত জল গড়িয়ে গেল উঠোনে, মাছ-কাটা লোকগুলো, আ মোলো, আ মোলো বলে চেঁচিয়ে উঠলো।

সোহাগবালা বললো, দেকেই বুঝিচিলুম অলুক্ষুণে ছেলে ! দিলে তো সব নষ্ট করে ! এই নকুড়, দে তো ওর কান ধরে দু' থাবড়া !

ছেলের টানে টানে এই সময় থাকোমণি এসে উপস্থিত সেখানে। তার ছেলে মার খাচ্ছে দেকে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং ছেলেকে সরিয়ে এনে জুড়ে দিল মড়াকান্না, ওগো, ওর বাপ নেই গো ! ওর বাপকে খুঁজে দাও তোমরা—

সোহাগবালা বিস্ময়ে আতঙ্কে চোখ কপালে তুলে ফেললো একেবারে। মাগীর এত বড় সাহস, অন্দরমহলের দালানে এসে কাঁদছে। এই কান্নার শব্দ একবার ওপর মহলে পৌঁছলে আর উপায় আছে ?

সোহাগবালা বলে উঠলো, ওরে, মাগীটাকে শিগগির থামা, মুখে নুড়ো গুঁজে দে, ওর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দে, কী সব্বনেশে রে বাবা, আমাদের সব্বাইকে ধমক খাওয়াবে।

সত্যিই দুজন ভৃত্য থাকোমণির মুখ চেপে ধরে চিৎ করে শুইয়ে ফেললো মাটিতে। থাকোমণি মুণ্ডকাটা পাঁঠার মতন ছটফট করতে লাগলো—

সোহাগবালা নিজের আসন ছেড়ে কখনো ওঠে না। আজ সেই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ওদের কাছে এসে বললো, দ্যাকো বাছা, এ বাড়িতে যদি প্রাণ নিয়ে টিঁকতে চাও, তাহলে কক্ষনো টুঁ শব্দটি কর্বে না। ফের যদি কোনোদিন চিল্লানি শুনি তাহলে জ্যান্ত হাত পা বেঁধে পুকুরে ফেলে দোবো। এই বলে রাকলুম।

চাকর দুটি তাকে ছেড়ে দেবার পর থাকোমণি চোখের সামনে সেই ভীমা মূর্তি দেখে আর কথা বলার সাহস পেলো না। বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে রইলো। এরা যে যে-কোনো মুহূর্তে তাকে বা তার ছেলেকে মেরে ফেলতে পারে, এই বোধ তার তৎক্ষণাৎ হয়ে গেল।

সোহাগবালা আবার বললো, দ্যাকো তোমার ছেলের কিত্তি ! সামান্য এই বারোণ্ডাটা পুঁছতে বলিচি আর অমনি এই গামলাটা ভেঙে ফেললে গা ? এর দাম কে দেবে ? গতর দিয়ে শুধতে পারো তো ভালো, নইলে তিনবেলা খাওয়া বন্ধ।

অর্থাৎ সেদিন থেকে থাকোমণিকে লাগিয়ে দেওয়া হলো দালান মোছার কাজে। তিন মহলা বাড়ির একতলায় মোট আটটি দালান, সবই মুছতে হবে তাকে। ঠিক ঝকঝকে তকতকে হলো কিনা, তা দেখবার জন্য সোহাগবালা মাঝে মাঝেই এক একজনকে তদারকে পাঠায়। সে আবার নিজের কাজ দেখাবার জন্য অদৃশ্য ছোপের দিকে আঙুল নির্দেশ করে থাকোমণিকে পুরো দালানটি আবার মুছতে বাধ্য করে। অথবা সে সোহাগবালার কাছে নালিশ জানায় যে থাকোমণি একই ময়লা জলে বারবার ন্যাতা ডোবায়, প্রত্যেকটি দালানে গিয়ে সে গামলার জল বদলে নেয় না।

বকুনি ও চড়চাপড় খেতে খেতে থাকোমণি ক্রমশ অভিজ্ঞ দাসী হয়ে উঠলো। সে বুঝে গেছে যে এ বাড়িতেই তার নিয়তি তার জন্য অন্ন বরাদ্দ করেছে। এ বাড়ির বাইরে সে এক পা দিতেও সাহস করে না। এই নগরীতে প্রথম দিন আসার স্মৃতি মনে পড়লেই তার বুক থরথর করে কাঁপে।

থাকোমণির বুকের অশ্রুসাগর শুকিয়ে গিয়ে এখন সেখানে খর মরুভূমি। সে আর কাঁদে না। সে আর তার স্বামী ত্রিলোচন দাসকে খুঁজে পাবে না, এমন বদ্ধমূল বিশ্বাস তার জন্মে গেছে। ভিনকুড়ি গ্রামের খালধারে একটি ছোট মাটির বাড়ি, তার স্বামী-শ্বশুরের ভিটে, পিছন দিকে এক লপ্তে ধান জমি, বাড়ির সামনে পাশাপাশি দুটি জাম গাছ, পেছন দিকে সার বাঁধা দু' গণ্ডা সুপুরি গাছ, একটি পারিবারিক গোরু, এবং বৃষ্টির দিনে এ সব কিছুরই ওপর কাছে নেমে আসা আকাশ ! এ সবই এখন স্বপ্নের মতন মনে হয়, যেন গতজন্মে ছিল। সেই স্বাধীন জীবনে সে আর কোনোদিন ফিরে যাবে না, এই অচেনা বাড়ির দাসীগিরি করেই তার সারা জীবন কাটবে। সে দাসী অথবা বাঁদী। তার পুত্র তার বাপ-পিতামহের বৃত্তি যে চাষবাস, তা আর শিখবে না, সে-ও দাস হবে।

সারাদিন পরিশ্রমের পর থাকোমণি এক একদিন সন্ধ্যেবেলা তার ঘরের দরজার কাছে থুম হয়ে বসে

থাকে। হয়তো তার মনে পড়ে ভিনকুড়ি গ্রামে তার নিজের সংসারের কথা, যত ছোটই হোক, তবু সে ছিল সেই সংসারের কর্ত্রী যত অভাবই থাক, তবু ছিল একটা অনির্দিষ্ট সুখ বোধ। কার অভিশাপে, কোন্ পাপে সেই সব কিছু ছারখার হয়ে গেল, তা সে আজও বুঝতে পারে না। কেন জমিদারের লোক এসে তাদের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়ে গেল একদিন ? কেন তার স্বামী সেই রাত্রে জল আনতে গিয়ে আর ফিরলো না ?

দুলালচন্দ্র অবশ্য এ সব আর ভাবে না কিছুই। বালকদের বাল্যস্মৃতি থাকে না। তারা উপস্থিতকে নিয়ে বাঁচে। মাকে একলা ফেলে সে এই সময় পুকুর ধারে গিয়ে হাঁসগুলিকে আ চৈ চৈ চৈ চৈ বলে ডাকে কিংবা একটা সদ্যোজাত বাছুরের পেছনে পেছনে অকারণে দৌড়োয়।

পাশাপাশি অন্য ঘরগুলিতে যে সব দাস-দাসীরা থাকে তাদের কারুর সঙ্গেই থাকোমণির ঘনিষ্ঠতা হয়নি। তারা এখনো থাকোমণির দিকে আড়চক্ষে তাকায় এবং কথার ছলে হুল ফোটায়। বাবুদের বাড়ি থেকে চুরি করা জিনিসপত্রের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে তারা সর্বক্ষণ ঝগড়ায় মেতে থাকে। বস্তুত, কোলাহল, কুকথা ও খেউড়ই তাদের জীবনের প্রধান ব্যসন। এদিককার গোলমাল বাবুদের মহলের ওপরতলা পর্যন্ত পৌঁছোয় না, তাই নিজেদের ঘরে এসেই তারা জিভের অর্গল খুলে দেয়।

এই সব অন্য দাস-দাসীরাও এসেছে কাছাকাছি গাঁ থেকে। যারা দু-এক পুরুষ আগে ভূমিহীন হয়ে শ্রমদাস হয়েছে, তারা অনেক পোড় খেয়ে এখন ঘাগী। ভৃত্যতন্ত্রে বেশী দিনের অভিজ্ঞতার জন্য তারা গর্বিত এবং এই জন্যই নতুন দাস-দাসীদের তারা অবজ্ঞা করে, নিজেদের গ্রামীণ পরিচয় মুছে ফেলে তারা থাকোমণির মতন স্ত্রীলোকদের মনে করে গাঁইয়া ভূত।

প্রাসাদের পিছনের এই ভৃত্য-উপনিবেশটিতে জন্ম, মৃত্যু কিছুই থেমে থাকে না। সব কিছু চলে আপন নিয়মে। বিবাহ এখানে একপ্রকার নিষিদ্ধ বলেই ব্যভিচার চলে প্রবলভাবে। ওসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। একমাত্র ঝগড়ার সময়ই জানা যায় যে, কে কার নাঙ্ আর কোন্ মাগী শতেক ভাতারী। তবে ব্যভিচার যতই চলুক, কোনো নারীর পক্ষে গর্ভবতী হওয়া এখানে সাঙ্ঘাতিক অপরাধ। এবং সে দায় শুধু নারীদের বলেই সব শাস্তি তাদেরই প্রাপ্য। কেউ গর্ভবতী হলেই অমনি সেই গোলপাতার ঘরের অন্ধকারেও সমাজ এসে উঁকি মারে। বিধবা কিংবা কুমারীর পেটে সন্তান ? ওকে দূর করে দাও, ওকে পিটিয়ে মারো ! অন্য দাস-দাসীরাই সমাজের প্রতিনিধি হয়ে এই শোরগোল তোলে এবং যথাসময়ে সে কথা সোহাগবালার কানে ঠিক পৌঁছে যায়।

মাতু মাতু বলে একটি মেয়েকে ডাকে সবাই, তার আসল নাম কী, তা থাকোমণি জানে না। আঠারো উনিশ বছর বয়েস, হাতে লোহা নেই এবং সাদা থান পরে বলে বোঝা যায় সে বিধবা, সেই মাতু একদিন ধরা পড়ে গেল। তার পেট হয়েছে, সে নাকি বাগানে বসে একটা ভাঙা মাটির হাঁড়ির চাড়া কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাচ্ছিল। তাহলে তো আর কোনো সন্দেহই নেই। ডুবে ডুবে জল খায় মেয়েটা, এতদিন কেউ কিছু টেরই পায়নি, আবার লোক দেখিয়ে একাদশীর দিন উপোস দেওয়া হতো ! কার সঙ্গে হলো তোর আশনাই, বল ? সবাই রসালো কাহিনীটি শুনতে চায়। মাতু প্রথমে কিছুতেই বলবে না। রান্নার ঠাকুর দুর্যোধন এই সব কথা বার করার ব্যাপারে খুব ওস্তাদ। মাতুর চুলের মুঠি ধরে সে তাকে দু-একবার শূন্যে তোলার চেষ্টা করতেই মাতুর প্রতিরোধ ভেঙে পড়লো। ভৃত্যদের মধ্যে কেউ নয়, রাখু নামে বাগানের মালিই মাতুর প্রেমিক। কোন্ রাখু ? যে তিন মাস আগে ছুটি নিয়ে দেশে যাবার নাম করে পালিয়েছে। তবে তো সে বখেরা চুকেই গেল !

সন্ধ্যেবেলা দেয়ালগিরি আর রেড়ির তেলের লণ্ঠনগুলো জ্বালার আগেই অন্ধকার দালানে সোহাগবালা একগাছা মোটা দড়ি এনে দুজন ভৃত্যকে বললো, তোরা দু দিকে এটা ধর !

তারপর মাতুকে বললো, এবার লাপা। এদিক ঠেঙে লাপিয়ে এদিকে এসে পড় !

মাতুর তখন মধ্যপ্রদেশ রীতিমত স্ফীত। গমনাগমন আলস্য মাখা। সে হাপুস নয়নে কেঁদে বললো, আমি পারবো না, পারবো না, গোমস্তা-মা তোমার পায়ে ধরচি।

সোহাগবালা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সেই অন্ধকারেও যেন চোখ জ্বালিয়ে বললো, ঠেঙিয়ে তোর বিষ ঝেড়ে দোবো ! হারামজাদী, তোর নজ্জা করে না ! ফের কতা ! লাপা বলচি, লাপা !

মাতু তখনও দ্বিধা করছে দেখে সোহাগবালা নিজেই ঠাঁই ঠাঁই করে দুখানা চড় মারলো তার গালে।

শাড়ি পরে লাফানো যাবে না বলে মাতুকে আগেই উলঙ্গ করা হয়েছে, এই অন্ধকারের মধ্যে কেউ তো দেখবে না, সুতরাং তার লজ্জারও কিছু নেই। আরও কয়েকবার চড়চাপড় খাওয়ার পর সে বাধ্য হয়েই লাফাতে শুরু করলো। সোহাগবালা গুণতে লাগলো, এক—দুই—তিন।

ভৃত্যদের শেখানো ছিল আগে থেকেই। প্রথমে নীচু করে ধরে থাকা দড়ি একটু একটু করে তোলা হতে লাগলো ওপরে। এবং এক একবার ইচ্ছে করেই হঠাৎ বেশী উঁচু করে মাতুর পায়ে জড়িয়ে দিতে লাগলো, যাতে সে ধপাস করে আছড়ে পড়ে মাটিতে। সেই রকম এক একবার মাতু পড়ে যায় আর সবাই হেসে ওঠে।

একদিন পর একদিন বাদ দিয়ে এক পক্ষকালব্যাপী চললো এই ব্যায়াম প্রক্রিয়া। প্রথমদিন কুড়িবার, পরদিন পঁচিশ, তার পরদিন তিরিশ এইভাবে বাড়তে থাকে। কিন্তু এত করেও কিছু হলো না, মাতুর উদর হেতমপুরের কুমড়োর মতন ক্রমেই প্রকাণ্ড হতে লাগলো। সোহাগবালা মাতুর সেই স্থলে হাত রেখে অনুভব করে বোঝে যে মা-খাগী সন্তানটা দিব্যি নড়াচড়া করছে।

মাতু কেঁদেকেটে বলে, আমায় ছেড়ে দাও গো, গোমস্তা-মা। যেদিকে দু' চোখ যায় আমি চলে যাই। তারপর আমার কপালে যা আছে হবে।

এত বড় অনাচারের কথা শুনে সোহাগবালা থ হয়ে যায়। কাঁচা বয়েসের বিধবা, পেটে একটা সন্তান নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে ? ওকে যে শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে ! তাছাড়া, ধর্ম বলে কি কিছু নেই ? যা খুশি করলেই হলো ? মাতুর ভালোর জন্যই যে তার পেটের কাঁটাটা খসানোর চেষ্টা হচ্ছে, সে কথাও ও বোঝে না ! ছোটলোকরা এমনই অকৃতজ্ঞ হয় বটে। সোহাগবালা বলে, তোর জিভ টেনে আমার ছিঁড়ে দিতে ইচ্ছে হয়, হারামজাদী ! আগে এ কতা মনে ছেল না !

মাতুর পরবর্তী ব্যায়াম হলো গরম ভাতের ফ্যান ভর্তি গামলা মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাওয়া। পেল্লায় আকারের গামলা, অত বড় জিনিসটা ভর্তি অবস্থায় একজনের পক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়াই দুষ্কর, সে গামলা তিনজন মিলে ধরাধরি করে চাপিয়ে দেয় মাতুর মাথায়, পুকুর ধার পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ফ্যান ফেলে আসতে হবে। এর দু' রকম সুযোগ। একে তো অত ভারী জিনিস বইলেই পেটের জিনিস নষ্ট হয়ে যায়, তা ছাড়াও, গামলা থেকে ফ্যান ছলকে পড়বেই মাটিতে আর সেই ফ্যানের ওপর পা দিলেই মাতু পা হড়কে পড়ে যাবে। গরম ফ্যান সমেত গামলা নিয়ে পড়ে গেলে আর মাতুর নিস্তার আছে ? ও যদিও বা প্রাণে বাঁচে, পেটেরটা কিছুতেই বাঁচবে না।

কিন্তু কোথা থেকে যেন অমানুষিক শক্তি পেয়ে গেছে মাতু। অত বড় গামলা সে ঠিক বয়ে নিয়ে যায়, এবং অসম্ভব জেদের ফলেই যেন এক ফোঁটা ফ্যানও ছলকে পড়ে না মাটিতে। দিনের পর দিন সে সোহাগবালা এবং অন্য সকলের প্রত্যাশা নষ্ট করে দেয়।

সোহাগবালা এবার নিল মোক্ষম ব্যবস্থা। আর দেরি করা চলে না, যে-কোনো দিন বাচ্চাটা ভূমিষ্ঠ হয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করতে পারে। চিত্তেশ্বরীর মন্দিরের কাছে একজন নামকরা দেয়াসিনী থাকে, তার কাছে এক বিশ্বস্ত ভৃত্যকে পাঠালো সোহাগবালা। সব দিক তো সোহাগবালাকেই সামলাতে হবে। কর্তাদের কানে যদি যায় যে, বাড়িতে বিধবা মেয়ে এমন অধর্ম করেছে, তাহলে তাঁরা সোহাগবালার ওপরেই দোষারোপ করবেন না ? ঐ দেয়াসিনীর জড়িবুটি আগেও পরখ করে দেখা আছে সোহাগবালার, ফল একেবারে অব্যর্থ। ভৃত্যটি নিয়ে এলো কিছু শেকড়বাকড় আর তামাকের গুলির মতন কয়েকটি কালো কালো বড়ি। সব বেটে খাওয়াতে হবে একসঙ্গে, অর স্বাদের জন্য মেশাতে হবে একটু এখোগুড়। এরই জন্য মূল্য দিতে হলো নগদ তিনটি টংকা।

মাতুকে ক'দিন ধরে চোখে চোখে রাখা হয়েছে, তবু সে পালিয়ে গিয়ে বসেছিল পুকুর পাড়ে। সেখান থেকে ধরে এনে তিন-চারজন মিলে তাকে চেপে মাটিতে শুইয়ে আর দুজনে জোর করে তার ঠোঁট ফাঁক করে ঢেলে দিল সেই ক্বাথ। এবং এই প্রথম একটু নরম গলায় সোহাগবালা বললো, আর কোনো ভয় নেই বাছা, চুপ করে ঘুমিয়ে থাক, কাল সকালেই পেট খালাস হয়ে যাবে, দু'দিন পরই আবার কাজকম্মো করতে পারবি।

সেই রাত্রেই মারা গেল মাতু। মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়েছে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে। শেষের দিকে সে ধড়ফড় করতে করতে বলছিল, ওগো, আমাকে একটু বাইরে নিয়ে যাও, আমি নাকে হাওয়া পাচ্ছি নি…ওগো…। কেউ নিয়ে যায়নি বাইরে। এক সময় সব শব্দ থেমে গেল। তার গর্ভের গোঁয়ার সন্তানটি তার পরেও কিছুক্ষণ বেঁচে ছিল কিনা কে জানে ! হয়তো সে মাতৃগর্ভ ফুঁড়ে বাইরে আসবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি।

এক দিন এক রাত সেই ঘরেই পড়ে রইলো মাতুর লাশ। তারপর ভোরবেলা ডেকে আনা হলো দুজন মুদ্দোফরাসকে। মাতুর দেহটা হোগলায় জড়িয়ে বাঁশে বেঁধে ঝুলিয়ে তারা ফেলে দিয়ে এলো গঙ্গায়। মাতুর ক্ষুদ্র জীবন কাহিনী এখানেই শেষ। কর্তাদের কানে এ খবর কিছুই পৌঁছালো না। শুধু

দিন সাতেক পরে বিম্ববতীর বড় জা হেমাঙ্গিনীর বাপের বাড়ি থেকে একজন আত্মীয় আসায় তার জন্য ধুতি কুচোতে দিয়ে হেমাঙ্গিনী তাঁর নিজস্ব দাসীকে বললেন, মাতু বলে একটা মেয়ে আচে না, তাকে ডাক বরং, সে বেশ ভালো কাপড় কুচোয়। হেমাঙ্গিনীর দাসী তখন সংবাদ দিল, সে তো নেই মা, সে মরে গ্যাচে ! হেমাঙ্গিনী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ওমা, সে কী কতা ! জলজ্যান্ত মেয়েটা ক'দিন আগেও দেখলুম যে ! দাসী তখন ফিসফিস করে জানালো যে মাতু কলঙ্কিনী হয়ে বিষ খেয়েছে ! হেমাঙ্গিনী নাক কুঁচকোলেন। এ সব অপবিত্র কথা কানে তোলাই পাপ। একটু পরেই তিনি প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। ব্যস, মাতু একেবারে মুছে গেল ওপর তলা থেকে।

মাতুর পরিণতি দেখে খুব একটা বিস্মিত বা ভীত হয়নি থাকোমণি। তারও অভিমত এই যে, একে বিধবা, তায় কুলটা, এমন মেয়েমানুষদের তো এমন গতিই হয়। তবু যে পেটের সন্তানটাকে মেরে মাতুকে বাঁচিয়ে রাখার অনেক চেষ্টা করেছিল সোহাগবালা, তাতে প্রমাণিত হয় যে, বাইরে যতই বকাঝকা করুক, সোহাগবালার অন্তরে দয়ামায়া আছে। সে যাই হোক, কিন্তু ভূতের ভয় ধরে গেল থাকোমণির। মাতুর ঘরখানা ছিল তার পাশেই, এখনো সেটা খালি পড়ে আছে। থাকোমণি যখন-তখন মাতুকে দেখতে পায়। এক মুহূর্তে সে থাকোমণির দিকে চেয়ে ভয়ঙ্করভাবে হাসে, আবার পরের মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়। এক একদিন মাঝ রাত্তিরে সে মাতুর ঘর থেকে গোঁ গোঁ শব্দ পায়। অমনি উঠে বসে থাকোমণি ভয়ে ঠকঠকিয়ে কাঁপে।

আশ্চর্য ব্যাপার, মাতুর প্রেতকে আর কেউ দেখতে পায় না। থাকোমণির চ্যাঁচামেচি শুনে অনেক সময় অন্য দাস-দাসীরা ছুটে আসে, মাতুর শূন্য ঘরে উঁকি মারে, কিন্তু কেউ কিছু প্রমাণ পায় না। এ বাড়িতে আগে থেকেই একটি বাঁধা ভূত আছে। সন্ধ্যের পর পাইখানার দিকে তাকে প্রায়ই দেখা যায়, অনেকেই দেখেছে। অধিকন্তু ন দোষায় হিসেবে মাতুর প্রেতকেও অনেকেই মেনে নিতে রাজি ছিল, কিন্তু কিছুতেই সে অন্যদের কাছে ধরা দেয় না। একমাত্র শুধু থাকোমণির সামনেই সে মাঝে মাঝে এসে হাজির হয়, বুক কাঁপানো স্বরে হি হি করে হাসে এবং তারপরই মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে বলে, ওগো, আমি নাকে হাওয়া পাচ্চিনি, ওগো, আমায় একটু হাওয়া দাও···।

সেইজন্যই থাকোমণি সন্ধ্যেবেলা আর পারতপক্ষে ঘরের বার হতে চায় না। দুলালচন্দ্রকেও সে কাছে রাখতে চায়। কিন্তু দুলালচন্দ্র শুনবে কেন ? একটু সুযোগ পেলেই সে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে পালায়।

থাকোমণি কোনোদিন এ বাড়ির ওপর মহলে যায়নি। হুকুম নেই। বাড়ির কর্তা এবং গিন্নীমাদেরও সে দূর থেকে কয়েকবার মাত্র দেখেছে। স্বর্গে থাকেন দেবতারা, বাবুরাও প্রায় সেই রকমই দূরের মানুষ। অবোধ দুলালচন্দ্র কিন্তু দু' একবার চুপি চুপি ওপরে উঠে গেছে সিঁড়ি দিয়ে। সন্ধ্যের পর ঝাড়লণ্ঠনগুলি যখন জ্বলে দোতলায়, তখন যেন ঠিক বাদলা পোকার মতন সেই আলোয় আকৃষ্ট হয়ে দুলালচন্দ্র ওপর মহলে একটু দেখতে যায়। এজন্য ওপর মহলের দাস-দাসীদের কাছ থেকে সে তাড়া খেয়েছে কয়েকবার।

একদিন সে নবীনকুমারের চোখে পড়ে গেল। চিন্তামণি নবীনকুমারকে সন্দেশ খাওয়াচ্ছিল এমন সময় কে রে ? কে রে ? বলে উঠলো। সিঁড়ির মুখে একটি বিহ্বল কালো বালকের মুখ।

নবীনকুমার বললো, ওকে ডাকো ! ওকে ডাকো !

চিন্তামণির কথায় দুলালচন্দ্র এগিয়ে এলো কাছে। নবীনকুমার বাটি থেকে একটা সন্দেশ তুলে বললো, এই নে !

চিন্তামণি তাকে নিষেধ করতেই নবীনকুমার তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, হ্যাঁ দোবো ! বেশ করবো ! দুটো দেবো, তিনটে দেবো, চারটে দেবো !

নবীনকুমার নিজে থেকেই দুলালচন্দ্রকে বেছে নিল তার খেলার সাথী হিসেবে। যদিও তাদের বয়েসের বেশ তফাত। নবীনকুমারের সদ্য তিন পেরিয়েছে, দুলালচন্দ্রের সাড়ে ছয়। কিন্তু এ বাড়িতে তো আর কোনো অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে নেই। নবীনকুমার তাকে নিয়মিত নিজের ভাগের সন্দেশ খেতে দেয়।

নবীনকুমারের খেলাগুলোও ভারী অদ্ভুত। কোনোদিন সে দুলালচন্দ্রকে মাটিতে শুয়ে পড়তে বলে। তারপর সে তার বুকের ওপর উঠে দাঁড়ায়। সে মা কালী সাজবে। দুলালচন্দ্রের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে সে দু' হাত ছড়িয়ে জিভ বার করে দেয়। কোনোদিন সে দুলালচন্দ্রকে উপুড় হয়ে শুয়ে ময়ূর সাজতে বলে। তখন তার পিঠের ওপর বসে নবীনকুমার হয় কার্তিক ঠাকুর। তার কোমরে গোঁজা

কাঠের তলোয়ার।

সহজাত বুদ্ধিতেই যেন এই দুই শিশু জানে, কে প্রভু, কে ভৃত্য। দুলালচন্দ্র খুশী মনেই প্রভু-পুত্রকে পিঠে তুলে নেয় বা বুকে দাঁড়াতে দেয়। তার বদলে সে পায় অমৃতের আস্বাদযুক্ত সন্দেশ।

চিন্তামণি দাসী একদিন একটি সোনার বালা চুরি করে ধরা পড়েছিল। বিম্ববতী বহুদিনের বিশ্বস্ত পুরোনো দাসীকে সেই প্রথম অপরাধের জন্য ছাড়িয়ে দেননি বটে, কিন্তু ক্ষমা চাইয়ে নাকে খৎ দিইয়েছিলেন। সেই দৃশ্যটি নবীনকুমার দেখে ফেলে ও বেশ মজা পায়।

পরদিনই সে বললো, এই দুলাল, নাক খৎ দে তো!

দুলালচন্দ্র নাকে খৎ দিতে জানে না। তখন নবীনকুমারই তাকে দেখিয়ে দিল, এই যে, এমনি করে...।

সেই সময় তিনতলা থেকে নেমে এলো গঙ্গানারায়ণ। ছোট ভাইটিকে মাটির ওপর নাক দিয়ে থাকা অদ্ভুত ভঙ্গিতে দেখে হেসে ফেললো সে। ও কি, ছোট্‌কু! ও কি! বলে ভাইকে কোলে তুলে নিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে খুব প্রীতি করে গঙ্গানারায়ণ। তার দু' গালে হামি দিয়ে আদর করলো।

নবীনকুমার বললো, আমি নাকখৎ শেকাচ্ছি ওকে!

গঙ্গানারায়ণ হো হো করে হেসে বললো, ও নাকে খৎ দিতে জানে না, আর তুই শিখে গেলি? এ তো ভারী মজার কথা!

গঙ্গানারায়ণের কোনো ব্যস্ততা ছিল, তাই বেশীক্ষণ না দাঁড়িয়ে সে চলে গেল।

নবীনকুমার দুলালচন্দ্রকে বললো, এইবার তুই দে!

দুলালচন্দ্র মেঝেতে একবার নাকটা ঠেকালো। কিন্তু এ খেলাটা তার ঠিক পছন্দ হলো না। সে বললো, না ছোটবাবু, অন্য খেলা বলো।

কিন্তু নবীনকুমারের জেদ। একবার কিছু ধরলে সে তো আর সহজে ছাড়বে না। অবিলম্বে তার চিৎকার শুনে দৌড়ে এলো চিন্তামণি। দুলালচন্দ্র নাকে খৎ দিতে রাজি হচ্ছে না শুনে সে বললো, হতচ্ছাড়া ছেলে, কতা শুনচিস নি? ছোটবাবু তোকে নাকে খৎ দিতে বলেচে, এক্ষুনি দিবি! তোর সঙ্গে খেলে, এই না তোর কত বাপের ভাগ্যি!

সেই সময় দিবাকরও আসছিল ওপরে। সেও মামলাটি শুনে দুই ধমক দিল দুলালচন্দ্রকে। কানটি ধরে মুলে দিয়ে বললো, ছোটবাবুর হুকুমের যদি কোনো নড়চড় হয় তো তোর গর্দান যাবে, মনে রাকিস।

দুলালচন্দ্র মসৃণ দুগ্ধ-ধবল শ্বেত পাথরের মেঝেতে নাক খৎ দিতে লাগলো। একটু দিয়েই থেমে গেলে চলবে না। বারান্দার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যেতে হবে। আবার সেইরকমভাবে ফেরা। নবীনকুমারের হাতে জগন্নাথ-ক্ষেত্রে থেকে আনা একটি রঙীন লাঠি, সেটা দিয়ে দুলালচন্দ্রের পেছনে মারতে মারতে সে খলখল করে হাসতে লাগলো। দুলালচন্দ্র একটু থামলেই সে আবার বলে, হ্যাট, হ্যাট। চল রে, ঘোড়া, চলরে গাধা, চলরে ঘোড়া...

কী সুন্দর নবীনকুমারের কণ্ঠস্বর। সুরেলা, রিনিঝিনি! যে শোনে, তারই ওকে আদর করতে ইচ্ছে করে।

এক সপ্তাহের মধ্যেই দুই বিবাহের লগ্ন। সোমে গঙ্গানারায়ণের আর বৃহস্পতিতে সুহাসিনীর। বিধুশেখর অনেক ভাবনা চিন্তা করেই এমন দিন ফেলেছেন। দুটি বিবাহেরই সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান করতে হবে বিধুশেখরকেই, কেননা রামকমল সিংহ ইদানীং সংসার থেকে প্রায় পুরোপুরি বিযুক্ত হয়ে পড়েছেন, সান্ধ্যকালীন ভোগ আহ্লাদ ছাড়া আর কোনো দিকেই মন নেই। বিধুশেখর অনেক চেষ্টা করেও বন্ধুকে ফেরাতে পারলেন না। কঠিন ভর্ৎসনা করলেও রামকমল মৃদু মৃদু হেসে বলেন, তুই তো এ রসে মজলি না বিধু, তুই এর মর্ম বুঝবি কি? কখনো মাঝ নদীতে স্রোতের মুখে গা ছেড়ে দিয়ে

দিখিচিস, কী আরাম ?

ব্যয় সঙ্কোচের অবশ্য কোনো প্রশ্নই নেই। বিশিষ্ট নিমন্ত্রিতদের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে দুখানি করে শাল, দুটি সোনা বাঁধানো লোহা, একজোড়া ঢাকাই কাপড় ও দু' শিশি গুলাবী আতর। সিংহ বাড়ি ও মুখুজ্জে বাড়িতে সার বেঁধে বসে গেছে দর্জি ও খলিফাগণ। ভৃত্য ও দ্বারবানেরা পাবে দু' প্রস্থ করে লাল বনাতের তকমা ও উর্দি। অধ্যক্ষ ভট্টাচার্যরা একবার এ বাড়ি একবার ও বাড়িতে গিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছে। নহবতের সানাই ও ঢুলী, বাজনাদাররা মাত করে দিয়েছে পাড়া। ভিয়েনের ধোঁয়ায় আকাশে মেঘ জমে যাচ্ছে, বাতাস একেবারে ম ম । হাতে একটি সোনা বাঁধানো ছড়ি নিয়ে শক্ত ঋজু চেহারার বিধুশেখর পরিদর্শন করছেন সব কিছু। তিনি যে কোথায় কখন উপস্থিত হবেন, তার কোনো ঠিক নেই।

রামকমল সিংহের ওপর কোনো দায়িত্ব না দিলেও তাঁকে বিধুশেখর অনুরোধ করেছেন যে উৎসবের ক'টি দিন তাঁকে থাকতে হবে বাড়িতে। কন্যাপক্ষের বাড়িতেও তাঁকে বেসামাল হলে চলবে না। গঙ্গানারায়ণকে বিবাহ বাসরে নিয়ে যাবার আগে কন্যাকর্তা যখন অনুমতি চাইতে আসবেন, তখন সে অনুমতি তো বিধুশেখর দেবেন না, রামকমল সিংহকেই দিতে হবে। আর একটি শর্ত, বিবাহ উপলক্ষে বাড়িতে বাঈ নাচের ব্যবস্থা না হয় হোক, কারণ সেটাই বড় মানুষদের প্রথা, কিন্তু কমলাসুন্দরীকে বাড়িতে আনা চলবে না।

বাগবাজারের বসু বাড়ির কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করে নির্বিঘ্নে স্বগৃহে ফিরে এলো গঙ্গানারায়ণ। লীলাবতীর বয়েস এখন আট বৎসর পাঁচ মাস। লাল বেনারসী চেলী ও ফুলের মালার মধ্যে তাকে যেন আর দেখাই যায় না। মনে হয় একটি চলন্ত পুঁটুলি। দাস-দাসী, পাইক-বরকন্দাজদের বিরাট মিছিল নিয়ে গঙ্গানারায়ণ থামলো বাড়ির সিংহদ্বারের সামনে। সেখানে একটি বিশাল উনুনের ওপর এক কড়া দুধ ফুটচে।

গঙ্গানারায়ণের জননী বিম্ববতী আত্মীয় আশ্রিত মহিলাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে। গঙ্গানারায়ণ বিম্ববতীর চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করলো। সেই দেখাদেখি লীলাবতীও টিপ করে মাথা ঠেকালো তাঁর পায়ের ওপর।

প্রথা অনুযায়ী বিম্ববতী পুত্রকে প্রশ্ন করলেন, এ কাকে এনিচিস রে গঙ্গা ?

গঙ্গানারায়ণ লজ্জারুণ মুখখানি নীচু করে বললো, মা, তোমার জন্য দাসী এনেচি।

অমনি সমবেত মহিলারা উলু দিয়ে উঠলেন, ফচকে ছোঁড়ারা হাততালি দিল আর ঢাক ঢোলের শব্দে কর্ণপটাহ ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হলো।

এবার বিম্ববতী দুধের কড়াইয়ের দিকে ইঙ্গিত করে নববধূকে জিজ্ঞেস করলেন, মা, কী দেখচো ?

পিত্রালয় থেকে সহস্রবার শিখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও এর উত্তর ভুলে গেছে লীলাবতী। অথবা লজ্জায় তার মুখ খুলছে না। চতুর্দিকের নানা শব্দে কান পাতা দায়।

বিম্ববতী আবার বললেন প্রশ্নটি। সাড়ে আট বৎসরের মেয়েটির মাথা নুইতে নুইতে যেন মাটির সঙ্গে ঠেকে যাবে। তখন একজন এয়ো স্ত্রী এগিয়ে এসে লীলাবতীর পাশে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে তার মুখটি তুলে ধরে বললেন, বল্ মা বল্, আমার সংসার উতলে পড়চে দেক্চি।

দু' তিনবারের চেষ্টায় লীলাবতী কোনোক্রমে মুনিয়া পাখির মতন সরু গলায় কথাগুলি উচ্চারণ করতেই আবার উলু, উল্লাসধ্বনি ও বাদ্যরবে ছেয়ে গেল অঙ্গন। বিম্ববতী পুত্রবধূকে কোলে টেনে নিলেন।

গাঁটছড়া খুলে এতক্ষণ পরে মুক্ত হলো গঙ্গানারায়ণ। ভৃত্যরা জল ঢেলে দিতে এলো, নাগরা খুলে পা ধুয়ে বাড়ির মধ্যে চলে এসে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। ওঃ, বিবাহ না যেন এক কঠিন পরীক্ষা। কয়েকদিন ধরে নানারকম আচার অনুষ্ঠানে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বাগবাজারের শ্বশুরালয়ে তো তাকে সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়েছে, নানারকম রঙ্গ রসিকতায় তাকে নাস্তানাবুদ করার জন্য সকলের কী চেষ্টা !

বাসরঘরে তো এক কাণ্ডই হয়েছিল। সেখানে গঙ্গানারায়ণের বন্ধুদের প্রবেশ অধিকার ছিল না, শুধু যত রাজ্যের অচেনা মহিলা সেখানে উপস্থিত। বন্ধুদের ছেড়ে আরও অসহায় বোধ করছিল গঙ্গানারায়ণ। একটি রত্নখচিত সিংহাসনে আসীন সে একমাত্র পুরুষ, নববধূ পাশে নেই, প্রায় দুশো জন নারী তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

হঠাৎ একজন যুবতী তার সামনে এসে থুতনিতে হাত দিয়ে প্রশ্ন করেছিল, এই যে, আমাদের

কালেজে পড়া বরমশাই, তোমার বউটি গেল কোথায় ? আমাদের মধ্যে কোন্‌টি তোমার বউ খুঁজে বার করো তো !

গঙ্গানারায়ণ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছিল। এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন। নানান বয়েসী স্ত্রীলোক সেখানে উপস্থিত, তাদের মধ্যে কোন্‌টি তার পত্নী তা খুঁজে বার করা সত্যিই খুব দুষ্কর। শুভদৃষ্টির সময় একবার মাত্র সে লীলাবতীকে দেখেছে, তাও ভালো করে দেখার সুযোগ পায়নি কিংবা সে চেষ্টাও সে করেনি। এদের মধ্যে কোন্‌জন সে ? বিবাহ উৎসবে নারীরা জমকালো সাজ-পোশাক করে আসে, অনেককেই সে কারণে এক রকম দেখায়।

গঙ্গানারায়ণ উদ্‌ভ্রান্তের মতন সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। বাসর কক্ষে অন্যান্য নারীদের প্রগলভা হতে কোনো বাধা নেই। কারুর দিকে চোখ পড়তেই সে হেসে ওঠে, কেউ বা ভ্রূভঙ্গি করে, কেউ বা এগিয়ে এসে বলে, ও, আমায় বুঝি মনে ধরেচে ? আহা, সে কথা আগে বলতে হয় !

গঙ্গানারায়ণকে ওরা কিছুতেই নিরুত্তর থাকতে দেবে না। সে যতই দিশাহারা হয়, ততই নারীরা অধিক কৌতুক পেয়ে কেউ তাকে ঠোনা মারে, কেউ কান মূলে দেয়। কেউ বলে, ওমা, বিয়ে কত্তে এসে বউ হারিয়ে ফেললে ? কাল মায়ের কাছে মুখ দেখাবে কী করে ? কেউ বলে, ভুল বাড়িতে এয়োচো নাকি গো ? শেষকালে কী, 'গোঁসাই ।ড়ার বর এলো গো কায়েৎ বাড়িতে, টোপর খুলে মুখ নুকোলো কালো হাঁড়িতে !' আর অমনি শত শত কাচের বাসন ভাঙার মতন হাসির শব্দে ঘর ভরে যায়।

এক এক সময় অতি নিরীহ ব্যক্তিও যেমন হঠাৎ খুন করে বসে. সেই রকমই অত্যন্ত লাজুক গঙ্গানারায়ণও এক সময় মরীয়া হয়ে তুখোড় হয়ে উঠলো। নানা রত্নালঙ্কারে সজ্জিতা ষোলো সতেরো বৎসরের এক সুন্দরী বিবাহিতা যুবতী, যে মাঝে মাঝেই এসে গঙ্গানারায়ণের কান মুলে দিয়ে যাচ্ছিল, গঙ্গানারায়ণ হঠাৎ খপ করে তার হাত চেপে ধরে বললো, এই তো পেয়েছি ! এই তো আমার বউ !

অমনি সারা কক্ষে আবার হাসির হুল্লোড়। সেই যুবতীটি ত্রস্তে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতেই গঙ্গানারায়ণ বললো, আর হারাচ্চি না, একবার পেয়ে গেচি. আর ছাড়বো না !

কৌতুকের বন্যায় সেই যুবতীটিই শেষ পর্যন্ত কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠলো। গঙ্গানারায়ণ জোর করে তার হাত চেপে ধরে আছে। দূর থেকে একজন বললো, ও গো, নতুন বর, আমাদের ঐ কনকলতার সোয়ামী কিন্তু কুস্তি করে, এখুনি এসে তোমায় ঠ্যাঙাবে ! ওকে ছাড়ো !

গঙ্গানারায়ণ চোখ পাকিয়ে বলেছিল, না !

তখন আড়াল থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল লীলাবতীকে। একজন তাকে সামনে এগিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, দেকিস লো, সাবধান ! তোর বর এখুনি তো সতীন আনতে চায়।

আজ বাড়ি ফেরার পর গঙ্গানারায়ণের ছুটি। আজ আর তার করণীয় কিছু নেই, এই রাতকে বলে কালরাত্রি, এখন সন্ধ্যে থেকে কাল প্রভাত পর্যন্ত নববধূর মুখ দেখা তার নিষেধ। এখন অন্দরমহলে মহিলারা নববধূকে নিয়ে মেতে থাকবে, ক্লান্তি অপনোদনের জন্য কর্তাবাবুরা এখন সুরাপানের আসরে বসে বাঈ নাচ দেখবেন, ঢাকী-ঢুলী বাজনাদাররা ধেনো ওড়াবে, আর ভট্টাচার্যির দল আর চাকরবাকররা লুচি মণ্ডা নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে। সেই এক কড়াই গরম দুধে মাটির ভাঁড় ডুবিয়ে ডুবিয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকজন শেষ করে দিয়েছে।

বরবেশ ছেড়ে একটা সাদা কামিজের ওপর একখানা কাশ্মীরী শাল জড়িয়ে গঙ্গানারায়ণ আবার নেমে এলো নীচে। ফেব্রুয়ারি মাস শুরু হয়ে গেছে, তবু বেশ শীত শীত ভাব। গঙ্গানারায়ণ তার সহপাঠী বন্ধুদের এই সময় আসতে বলেছিল।

কর্তারা বাগানে বসেছেন, তাই বৈঠকখানা ঘরটি এখন খালি। গঙ্গানারায়ণ সেখানেই বন্ধুদের নিয়ে এলো। গৌরদাস, ভূদেব, রাজনারায়ণ, গিরীশ, বঙ্কু, বেণী প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত। গতকালের বিবাহ বাসরের নানান ঘটনার উল্লেখ করে ওরা খুব আমোদ করতে লাগলো।

গঙ্গানারায়ণ সুরা পান করে না। সেইজন্য বন্ধুদের জন্য সে সুরার কোনো বন্দোবস্ত রাখেনি। কিন্তু রাজনারায়ণ ছটফট করছে। ইদানীং রাজনারায়ণ প্রায় মধুরই মত অতি সুরাপায়ী হয়ে উঠেছে।সে আগেই খানিকটা পান করে এসেছে, তাই বারবার বলছে, গেলাস কোতায় ? ব্র্যাণ্ডি কোতায় ? শুদু মুখে কি গপ্পো হয় ? তোরাও য্যামন ! এই গঙ্গা, তোর বাপের ভাঁড়ার থেকে দু' পাঁচ বোতল ব্র্যাণ্ডি নিয়ে আয় না !

কথা ঘোরাবার জন্য গঙ্গানারায়ণ প্রশ্ন করলো, হ্যাঁ রে, মধু কোথায় রে ! সে এলো না ? সে কালও আসেনি ।

রাজনারায়ণ ঠোঁট উল্টে বললো, মধু গোল্লায় গেছে ! কেন বাওয়া, মধু আসেনি বলে কি আমাদের ব্র্যাণ্ডি দেওয়া হবে না ?

গঙ্গানারায়ণ অন্যদের দিকে ফিরে ঈষৎ দুঃখিত স্বরে বললো, মধুকে এত করে আমি বলে এইচিলাম, তবু সে এলো না ?

বেণী বললো, মধুর কতা এখন আর নাই বা শুনলি ! শুভ কাজের মধ্যে আবার অশুভ জিনিস টেনে আনা কেন ?

গঙ্গানারায়ণ ক্ষুব্ধ হলো । নানা রকম বয়াটেপনা করলেও দুরন্ত স্বভাবের মধুকে সে ভালোবাসে । মধু যে কবি, সে বায়রন-মিল্টনের সমগোত্রীয়, সেইজন্য অনেক কিছুই তাকে মানায় । বেণী মধুকে পছন্দ করে না, সব সময় টক্কর লড়তে চায়, তা গঙ্গানারায়ণ জানে ।

মধুর নাম উঠতেই অন্যরা যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেছে মনে হলো । আবার নতুন কী কাণ্ড করেছে মধু ? একমাত্র গৌরদাসকে প্রশ্ন করলেই ঠিক জানা যাবে, গৌরদাস মধুর প্রাণের দোসর এবং সে অযথা মিথ্যে ভাষণ করে না ।

—গৌর, মধুর কী হয়েচে রে ?

গৌরের ফর্সা মুখখানিতে ম্লান ছায়া । সে অন্যমনস্ক । খুব আস্তে আস্তে থেমে থেমে সে বললো, তোকে কাল ইচ্ছে করেই খবরটা দিইনি, গঙ্গা ! মধু বাড়ি থেকে পালিয়েচে । মধু খৃষ্টান হবার জন্য পাদ্রীদের কাচে গিয়ে লুকিয়েচে !

রাজনারায়ণ জড়িত কণ্ঠে বললো, যে সে পাদ্রী নয় বাবা ! একেবারে লাট পাদ্রী । লর্ড বিশপ যাঁকে বলে । তিনি আবার মধুকে ফোর্ট উইলিয়ামের মধ্যে ঠুসে রেখেচেন । আর কেল্লার কত্তা ব্রিগেডিয়ার পৌনি নিজে পাহারা দিচ্চেন মধুকে ! এবার মধু গেল, তাকে আর পাবি না কোনোদিন !

গঙ্গানারায়ণ বললো, কেল্লার মধ্যে ? বলিস কী ?

বঙ্কু বললো, মধুর বাবা লাঠিয়াল পাইক আনিয়েচেন যে । পুলিসের হাত থেকে মধুকে তিনি কেড়ে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন । কিন্তু কেল্লার গোরাদের সঙ্গে তো আর তিনি লড়াই দিতে পারবেন না । স্বয়ং সেনাপতির তাঁবে রয়েচে সে । মধু নিজেই এই ফন্দী এঁটে বাপের ওপর এক হাত নিয়েচে !

—মধুকে জোর করে সেখানে ধরে রাখেনি তো ?

ভূদেব গম্ভীর স্বরে বললো, না, আমি আর গৌর দেখা করতে গেসলাম মধুর সঙ্গে ।

—তারপর ?

—আমার সঙ্গে অবশ্য সে দেখা করে নাই । সে নিজেই অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল, না পাদ্রীরাই আমাদের ভাগিয়ে দিল, তা জানি না । পরে গৌর একবার একা গেস্‌লো, ওর সঙ্গে দেখা হয়েচে ।

গঙ্গানারায়ণ গৌরের দিকে তাকালো । গৌর নিশ্চয় মধুর সমস্ত গোপন কথা জানে । মধু গৌরের সঙ্গে দেখা করবে না, এ কখনো হতেই পারে না । ভূদেব সঙ্গে গিয়েছিল বলেই বোধহয় মধু আগের দিন ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে দেখা করেনি । গোঁড়া নীতিবাগিশ ভূদেবকে বন্ধুরা অনেকেই ডরায় ।

গৌর বললো, আমার সঙ্গে দেখা হয়েচে বটে, কিন্তু আমাকে সে বিশেষ কথা বলতেই দেয়নি । নিজের উচ্ছ্বাসেই সে ডগোমগো । আমি একবার শুধু কইলাম, মধু, তুই বাপ মায়ের মনে এমন দুঃখও দিতে পারলি ? তোর মা যে মূর্চ্ছিতা হয়ে রয়েচেন, অন্ন-জল ত্যাগ করেচেন, তাতে মধু আমার ওষ্ঠে আঙুল দিয়ে বললো, চুপ চুপ, ওসব কথা কোস না এখন ! আমার মন অ্যাখুন পরমপিতার পায়ে আশ্রয় নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আচে । এই উপলক্ষে আমি একটা হিম রচেচি সেটা বরং তোকে শোনাই । তোকে না শোনানো পর্যন্ত আমার তৃপ্তি নেই ! ভাই, তারপর মধু যে পদ্যটা পড়ে শোনালো, মধুর লেখা অত খারাপ ইংরেজি পদ্য আমি কখনো পড়িনি বা শুনিনি ! সে একেবারে ভক্তিতে জ্যাবজেবে আর আমাদের ধম্মো যে কত খারাপ, সেই কতা ।

গঙ্গানারায়ণ বললো, কিন্তু মধুর মুখে এমন খৃষ্টভক্তির কথা তো আগে কখনো শুনিনি ! বরং থিয়োডোর পার্কারের বই পড়ার পর তার মধ্যে একটু নাস্তিক নাস্তিক ভাবই দেকেচিলুম ।

বেণী বললো, আরে মধু কেরেস্তান হচ্চে কি আর শুধু ভক্তিতে ? এর মধ্যে অন্য কোনো মতলব আচে । ও তো এক পা বিলেতের দিকে বাড়িয়েই ছেল, এবার পাদ্রীরা ওকে বিলেতে পাঠাবে ।

গঙ্গানারায়ণ বললো, মধুকে বাড়ি থেকে পালাবার এই বুদ্ধি দিল কে ? কৃষ্ণমোহন বাঁড়ুজ্যেই

নিশ্চয়ই ওর কানে মন্তোর দিয়েচেন।

বঙ্কু বললো, এই ক্যাটি কেষ্টর জ্বালায় আর পারা গেল না। নিজে তো জাত খুইয়েচেই, আবার কচি কচি ছেলেদের ধরে ধরে কেরেস্তান করাচ্চে! সাহেবদের পা-চাটা নচ্ছার কোথাকার!

ভূদেব বললো, শুধু শুধু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দোষ দিও না। তিনি নিজ বিশ্বাস লয়ে আছেন। মধুর বাবা তেনাকে চেপে ধরায় তিনি তো সাফ বলে দিয়েচেন, আপনার পুত্র তো দুধের বাছাটি নয়! রীতিমতন লেকাপড়া শিখে সাবালক হয়েচে, তার কি নিজের কোনো বুদ্ধি ভাষ্য নাই? আপনার ক্ষমতা থাকে তাকে ঠেকান!...আমার কী মনে হয় জানো, মধুদের পাড়ায় যে নবীন মিস্তিরি বলে একটা ছোঁড়া আছে না? সেই ছোঁড়াই মধুকে ফুসলেছে! ছোঁড়া তো অনেক আগেই খৃষ্টান হয়েছে। আমি অনেকবার শুনিছি, সেই ছোঁড়া মধুকে বলছে, খৃষ্টান হলেই বিলেত যেতে পারবে!

রাজনারায়ণ বললো, আরে না, ওসব কিছু না! মধু খেষ্টান হয়েচে হিঁদু বে করবে না বলে! হিঁদুর মেয়েগুলো লেকাপড়া শেখে না। তেমন মেয়েকে মধু কিচুতেই বউ করবে না। ওর বাপ জোর করে বে দিতে গেসলো, তাই মধু পাখি হয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল।

গঙ্গানারায়ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো! এইখানেই মধুর জয়। সে নিজে তো কিছুতেই পারলো না। এই বিবাহে তার তীব্র অসম্মতি ছিল তবু তো মেনে নিতে হলো তাকে। বিবাহ অনুষ্ঠানে সে বিন্দুমাত্র পুলক বোধ করেনি, বরং মনের মধ্যে বিরক্তি স্তূপীকৃত হয়েছে। নববধূর দিকে তার পূর্ণ দৃষ্টি মেলে চাইতেও ইচ্ছে করে না।

বন্ধুরা চলে যাবার পর রাত্রে একা শুয়ে শুয়ে গঙ্গানারায়ণ অনেকক্ষণ মধুর কথা চিন্তা করলো। তাহলে কি আর কোনোদিন মধুর সঙ্গে দেখা হবে না? খৃষ্টান হবার পর কি মধু এ শহরে টিঁকতে পারবে? তার দোর্দণ্ডপ্রতাপ পিতা সহ্য করতে পারবেন এই অপমান?

এক সময় গঙ্গানারায়ণ টের পেল, তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে অনেকক্ষণ ধরেই তার স্ত্রী লীলাবতীর কথাও ভাবছে। হঠাৎ গঙ্গানারায়ণ শয্যার উপরে উঠে বসলো। না, সে অন্যায় করছিল। মধুর সঙ্গে তার তুলনা হয় না। মধু মধুই, গঙ্গানারায়ণ কোনোদিন মধুর মতন হবে না। নিজ অভিলাষ সিদ্ধির জন্য গঙ্গানারায়ণ কখনো ধর্মত্যাগ করতে পারবে না, মা এবং পিতার মনে সে দুঃখও দিতে পারবে না। বিবাহ যখন করেছেই, তখন তার স্ত্রীর প্রতি বিরূপতা পোষণ করা অন্যায়। ধর্ম সাক্ষী করে সে একটি সরলা বালিকাকে নিজের জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বরণ করেছে, এখন সর্বপ্রকারে এ বালিকাকে খুশী করার চেষ্টায় তার যত্নবান হওয়া উচিত। সে কোনোদিন লীলাবতীর প্রতি অনাগ্রহ বা অনাদর দেখাবে না।

বৃহস্পতিবার বিধুশেখরের গৃহে সুহাসিনীর বিবাহ অনুষ্ঠানে গঙ্গানারায়ণের ওপর অতিথিদের সাদর সম্ভাষণের ভার পড়েছে। নিজ বিবাহের দিনের অভ্যাগতদের সকলকে ঠিক মতন দেখার সুযোগ হয়নি তার, আজ সে স্বয়ং দ্বারের কাছে দণ্ডায়মান। বিধুশেখরের পুত্র নেই, গঙ্গানারায়ণই তাঁর পুত্রবৎ। একে একে উপস্থিত হতে লাগলেন শহরের অভিজাত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বহুরকম শকটের ভিড়ে পথ একেবারে পরিপূর্ণ। সরকারী সেপাইরা মহামান্য ব্যক্তিদের অশ্বযানের পথ পরিষ্কার করে দেবার চেষ্টায় হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। বিধুশেখর এ শহরের বিশেষ প্রতিপত্তিশালী আইনজীবী, তাঁর সঙ্গে দেশের সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় আছে।

এলেন বর্ধমান-অধিপতি তেজেশচন্দ্রের দত্তকপুত্র মহাতাবচাঁদ বাহাদুর। তারপরই এলেন রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর, ইনি পোস্তার সুবিখ্যাত রাজা সুখময় রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। সপারিষদ এসে উপস্থিত হলেন শোভাবাজারের রাজা, বর্তমান হিন্দু সমাজের শিরোমণি রাধাকান্ত দেব। একটু পরেই এলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর ভ্রাতাগণ। এত রাজা-রাজড়াদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের পোশাকই সবচেয়ে অনাড়ম্বর, যদিও একটি সাদা শাল জড়ানো থাকায় তাঁর গৌরবর্ণ আরও বেশী গৌর দেখাচ্ছে। তাঁর ঠিক পরেই এলেন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রামকমল সেন। তিনি সঙ্গে তাঁর পাঁচ বছরের দৌহিত্র কেশবকে নিয়ে এসেছেন। পিতৃবন্ধু রামকমল সেনকে দেখে দেবেন্দ্রনাথ ক্ষণেক দাঁড়িয়ে দু' চারটি কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন এবং শিশু কেশবের থুতনি ছুঁয়ে আদর জানালেন একটু। তখুনি ভূকৈলাশের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল এসে পড়ায় ওঁরা কথা বলতে বলতে চলে গেলেন ভিতরে।

একসঙ্গে দল বেঁধে এলেন রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন

মুখোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী। এঁরা এক সময়ে ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল নামে কথিত ডিরোজিও-শিষ্য বিদ্রোহী যুবাবৃন্দ, এখন পরিণত বয়েসে সংসারী হয়ে বিশিষ্ট ভদ্রব্যক্তি হয়েছেন।

বিধুশেখর তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার জন্য জামাতাকে ধনী পরিবার থেকে আনেন নি। পাত্রটি দরিদ্র হলেও সংস্কৃত কলেজের উজ্জ্বল ছাত্র ছিল, এখন আইন অধ্যায়ন করে জজ পণ্ডিত হবার অপেক্ষায় আছে। বরের নাম দুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তার সঙ্গে এসেছে তার সহপাঠী এবং আত্মীয়দের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মহেশচন্দ্র শাস্ত্রী, রামনারায়ণ তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

গঙ্গানারায়ণের নিজের বন্ধুরা এলো কিঞ্চিৎ দেরি করে। গণ্যমান্য অতিথিদের আপ্যায়ন করার কাজে ব্যাপৃত থাকলেও সে তার বন্ধুদের সাক্ষাৎ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছিল।

ওরা এসে উপস্থিত হতেই গঙ্গানারায়ণ দ্বারের কাছ থেকে একটু সরে এসে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলো, খবর কী, বল! হয়ে গ্যাচে?

গৌর বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে জানালো, হ্যাঁ।

—তুই গিইছিলিস?

—হাঁ, কিন্তু কথা কিছু হলো না। এক ঝলক শুধু চোখের দেকা দেকিচি।

ভূদেব বললো, কোনোক্রমে কাছে ঘেঁষবার তো উপায় রাখে নাই। মিশন রো'র ওল্ড মিশন চার্চ তে সশস্ত্র সৈনিক দিয়ে একেবারে ঘিরে রেখেচিল। এত সেপাই শাস্ত্রী নিয়ে ধর্মান্তর গ্রহণের ব্যাপার আগে কেউ বাপের জন্মে দেকেচে! ইংরেজের যে-টুক্ চক্ষুলজ্জা ছিল, তাও আর নাই! এদেশে আর কেউ হিন্দু থাকবে না, দেশটা ম্লেচ্ছে ভরে যাবে!

—মধুকে কেমন দেকলি?

—দেকলুম আর কোথায়! কেল্লা থেকে ঢাকা গাড়ি করে বাঘা-বাঘা সাহেবরা মধুকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো। যেন কোনো ডিউক বা লার্ডের বিবি, পাছে কেউ কেড়ে নেয়, তাই এত সাবধানতা। আর কোনো নেটিভকে ওরা আগে কখনো আদর দেখিয়ে কোলে বসিয়ে আনেনি। গাড়ি থেকে নেমে গীর্জায় ঢোকার সময় আমরা মধুকে দূর থেকে দেকলুম এক ঝলক। মধু অবশ্য একবারও ফিরেও তাকায়নি।

—সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গ্যালো। সব সাহেব মেম গিজগিজ করছে, শুধু দুজন নেটিভ রইলো ভেতরে। এক মধু, আর আমাদের কালোমানিক কেষ্টমোহন। সেই তো রাজসাক্ষী হয়েচে গো! ঐ যে দেকচিস রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ীরা দাঁড়িয়ে আচে, ওদেরই তো বন্ধু ঐ ক্যাটিকেষ্ট। ওরা বন্ধুকে সামলাতে পারে না? নইলে আমরাই ওকে একদিন দোবো দু' ঘা!

ভিতর থেকে ডাক আসায় গঙ্গানারায়ণকে চলে যেতে হলো তখন। তারপর আর ঘণ্টা দু'এক সে ফুরসৎ পেল না।

এক সময়, অতিথিরা যখন আহারে বসেছে, বিবাহবাসরে সম্প্রদানের মন্ত্র উচ্চারণ শুরু হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ গঙ্গানারায়ণের একটা কথা মনে পড়লো। সারাদিনে সে এবাড়ির সমস্ত মহল চষে বেড়িয়েছে বেশ কয়েকবার, কিন্তু একবারও তো সে বিন্দুবাসিনীকে দেখেনি। এত উৎসবের মধ্যে বিন্দুবাসিনী কোথায়?

কথাটা মনে পড়া মাত্র গঙ্গানারায়ণের হৃদয় কম্পিত হতে লাগলো। এ জগতে যেন সে এক চরম ঘৃণ্য অপরাধী। শুধু আজ কেন, সপ্তাহব্যাপী দুই বাড়িতে যে এত সমারোহ, তার মধ্যে কোনো এক সময়েও তো বিন্দুবাসিনীর দেখা মেলেনি। এবং একথা একেবারের জন্যও গঙ্গানারায়ণের মনে আসেনি পর্যন্ত। গত কয়েক মাস ধরেই সে বিন্দুবাসিনীর কথা কখনো নিজ চিন্তায় স্থান দেয়নি। বিন্দুবাসিনী তার বাল্য সখী, তাকে সে বিস্মৃত হয়েছে।

নহবৎখানায় সানাইয়ের স্বরও গঙ্গানারায়ণের কাছে নিরানন্দ মনে হলো। চতুর্দিকে এত মানুষ, অথচ একজনের অভাবেই মনে হলো সব কিছু শূন্য।

সারা বাড়ি আর একবার তন্ন তন্ন করে খুঁজে গঙ্গানারায়ণ ত্রিতলে পূজার কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ালো। আর সব জায়গায় এত আলো, এত রঙের বাহার কিন্তু এখানে শুধু একটি রেড়ির তেলের বাতি জ্বলছে। সেই ম্লান আলোয় চতুর্দিকে ছড়ানো অজস্র বাসি ফুলের মধ্যে বসে আসে সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণা এক যুবতী। সে আজ প্রকৃতই একা, কেননা এ কক্ষে আজ জনার্দনমূর্তিও নেই, পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী সেই মূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে বিবাহ বাসরে।

গঙ্গানারায়ণের মনে হলো, বিন্দুবাসিনী যেন এক তপঃকৃষ্টা ব্রতচারিণী। পিঠের ওপর খোলা চুল, তার শ্বেত বসনও যেন রেড়ির তেলের আলোয় গেরুয়ামতন দেখায়। বিন্দুবাসিনীর চক্ষু দুটি মুদিত, সেই অবস্থায় বসে থেকে সে যেন একটু একটু দুলছে।

—বিন্দু!

বিন্দুবাসিনী চমকালো না। ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। স্নিগ্ধ হাস্যের সঙ্গে বললো, কে? গঙ্গা? তুই কেমন বউ আনলি? একদিন তোর বউ দেকতে যাবো!

অভিমান মিশ্রিত গলায় গঙ্গানারায়ণ বললো, তুই কেন আমার বিবাহে যাসনি? আমি নিজে এসে তোকে নেমন্তন্ন করিনি বলে? সে না হয় বুঝলুম, কিন্তু আজ সুহাসিনীর বে, তুই সেজে গুজে আহ্লাদ না করে এখানে এমন করে বসে রয়িচিস কেন? তোর বড় দেমাক, তাই না?

সেইরকম হাস্যমুখেই ছদ্মর্ভৎসনা করে বিন্দুবাসিনী বললো, যাঃ! অমন কতা বলতে আচে? তুই এখনো ছেলেমানুষ রয়ে গেলি! আমি কাঁচা বয়েসের রাঁঢ়, কোনো শুভকাজের সময় আমার মুখ দেখাতে নেই, তুই জানিস না?

গঙ্গানারায়ণ কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রস্তরমূর্তির মতন স্থির হয়ে রইলো। কী উত্তর দেবে সে জানে না।

পরক্ষণেই যেন এক প্রবল জোয়ারে সে প্লাবিত হয়ে গেল সহসা। আর সব কিছুই মিথ্যা বলে বোধ হলো। চোখের সম্মুখে এ কাকে সে দেখছে? এ যে বিন্দু, তার শৈশব কৈশোরের সমস্ত স্বপ্নের সঙ্গী। একে ঘিরেই তো সে এক স্বর্গ রচনা করতে পারতো, তার বদলে কোন মহত্তর ভুলে সে জড়িয়ে পড়লো? বিন্দুকে বাদ দিয়ে তার জীবন শূন্য, ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ব্রাহ্মণবাড়ির পূজার কক্ষে গঙ্গানারায়ণ প্রবেশ করে না। কিন্তু আজ এঘরে দেবতা নেই। গঙ্গানারায়ণ দ্রুত সেখানে ঢুকে সবলে বিন্দুকে আঁকড়ে ধরে আবেগমথিত কণ্ঠে বললো, বিন্দু, বিন্দু, তুই আমার! এতকাল বুঝিনি! তোকে ছেড়ে আমি কিছুতেই সুখ পাবো না।

বিন্দু গঙ্গানারায়ণকে মৃদু অথচ কঠিনভাবে ঠেলে দিয়ে বললো, ছিঃ গঙ্গা, এসব কথা উচ্চারণ কত্তে নেই! আমি তোর কেউ না। তুই সুখে থাক, তাহলেই আমি সুখী হবো।

রাজনারায়ণ দত্তের শয্যাকণ্টকী হয়েছে। একটুক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকলেই তাঁর সর্ব শরীরে জ্বালা ধরে, তৎক্ষণাৎ উঠে ছটফটিয়ে বেড়ান। সমস্তক্ষণ শরীরে এতটা অস্থিরতা, বসে থাকলে মনে হয় পায়চারি করলে ভালো লাগবে, আবার তাতেও একটু পরেই ক্লান্তি বোধ হয়, তখন ইচ্ছা হয় বিছানায় একটু গড়িয়ে নিতে। কিন্তু তারও উপায় নেই।

রাতের পর রাত ঘুম নেই। রাজনারায়ণ দত্তের বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ, তাঁর অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলছে ক্রোধ। এত অপমানিত তিনি জীবনে আর কখনো হননি।

আজ বৈকালেই রাখুটিয়ার জমিদার স্বয়ং এসেছিলেন তাঁর গৃহে। সেই মানুষটি মাত্র এই কয়েকদিনেই একেবারে শুষ্ক বিবর্ণ হয়ে গেছেন। শত অনুরোধেও তিনি বৈঠকখানায় এসে আসন গ্রহণ করলেন না। ল্যাণ্ডো থেকে নেমে এসে তিনি রূপোয় মোড়া ছড়িখানিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দ্বারের কাছে। রাজানারায়ণ দত্ত অতি বিনীতভাবে তাঁকে বলেছিলেন, যা হবার তা তো হয়ে গ্যাচেই, আসুন আপনার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে আমি একটু জুড়োই।

সেই শীর্ণকায় বৃদ্ধ বিষণ্ণ-ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, না, আপনাকে শুধু একটা কথা শুধোতে এলুম। দত্তজা, আপনি জেনে শুনে আমার এ সর্বনাশ করলেন কেন?

রাজনারায়ণ দত্ত স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। সহসা কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। 'জেনে শুনে'? রাজনারায়ণ দত্ত জেনে শুনে কথার খেলাপ করবেন? তিনি একজন সাধারণ ফড়ে-দালালের মতন মিথ্যাবাদী?

তিনি সেই বৃদ্ধের তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে যেন সোজা তাকাতে পারছেন না। কোনোক্রমে বললেন, মহাশয়, আপনার সর্বনাশ হয়েচে, আমার হয়নি ? আমার আর পুত্র নেই, যদি থাকতো, তবে আপনার সম্মান বাঁচাবার জন্য...

রাখুটিয়ারাজ পুরো কথা শুনলেন না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পেছন ফিরে ধীরে ধীরে গিয়ে আবার ল্যাণ্ডোতে চড়ে বসলেন। রাজনারায়ণ দত্ত তাঁকে বিদায় জানাতে পর্যন্ত পারলেন না, রাখুটিয়ারাজ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন। অভিমানী বৃদ্ধ তখন অশ্রু সংবরণের চেষ্টা করছেন প্রাণপণে।

দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ি বয়ে এসে কেউ এমনভাবে কখনো অপমান করে যাবার সাহস পায়নি। অথচ তিনি কিছুই করতে পারলেন না। তাঁর মস্তক ঘূর্ণিত হতে লাগলো। তিনি যেন জ্ঞান হারিয়ে সেখানেই পড়ে যাবেন।

রাখুটিয়ার জমিদারের সর্বনাশের জন্য রাজনারায়ণ দত্ত দায়ী তো বটেই। ওঁর কনিষ্ঠা কন্যার সঙ্গে রাজনারায়ণ নিজের পুত্র মধুর বিবাহ ঠিক করেছিলেন। পাটীপত্র হয়ে গেছে, বিবাহের দিনও ধার্য হয়েছে। আর মাত্র বাইশ দিন বাকি। কন্যাপক্ষ নিমন্ত্রণ পর্যন্ত শুরু করে দিয়েছিলেন।

বিবাহ ভেঙে যাওয়ায় সেই কন্যার নামে কলঙ্ক বর্তে গেল। আর ঐ কন্যার বিবাহ দেওয়া সম্ভব হবে ? এই অন্যপূর্বা পাত্রীর জন্য আর কোনো সদ্বংশজাত পাত্র পাওয়া যাবে না।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে রাজনারায়ণ দত্ত মধ্যে মধ্যে আঃ আঃ শব্দ করতে লাগলেন। যেন তাঁর সর্বাঙ্গে বৃশ্চিক দংশন হচ্ছে। এ সময় তাঁকে একটু সান্ত্বনা দেবারও কেউ নেই। পত্নী জাহ্নবী তো মূর্ছা যাচ্ছেন ঘন ঘন। তাঁকে আর বাঁচানো যাবে কিনা কে জানে ! এত স্নেহ, ভালোবাসা, প্রশ্রয় দিয়েছিলেন মধুকে, অথচ সে তার পিতার মানসম্মান সব ধুলোয় লুটিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করলো না ?

রাজনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীমোহন মধুর খোঁজে চতুর্দিকে ছুটোছুটি করছে কয়েকদিন ধরে। তিন দিন আগে মধু খৃষ্টান হয়ে গেছে, তা আর কিছুতেই রোধ করা যায়নি। প্যারীমোহন তবুও চেষ্টা করছে যদি মধুকে এখনো বাড়িতে ফিরিয়ে আনা যায়।

সকালবেলা সে এসে উঁকি মারলো রাজনারায়ণ দত্তের কক্ষে। সারারাত্রি চোখের পাতা জোড়েনি, বিধ্বস্ত চেহারায় একটি কৌচে শূন্য দৃষ্টি মেলে বসে আছেন তিনি।

প্যারীমোহন মৃদুকণ্ঠে বললো, বড়খুড়া, একটা কথা কইবো ? একবার কৃষ্ণমোহনবাবুকে ডাকি ? উনি আসতে রাজি হয়েছেন।

রাজনারায়ণ দত্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, কৃষ্ণমোহন ? ঐ কেলে কেরেস্তানটা ? ও আমার বাড়ির দিকে এলে আমি পাইক লেলিয়ে ওর হাড় গুঁড়ো করে দেবো !

প্যারীমোহন বললো, আজ্ঞে, এখন আর মিছামিছি রাগ করে কী হবে। যা হবার তো হয়েইচে। এখন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের সাহায্য নিলে মধুর খোঁজটা অন্তত পাওয়া যায়।

—রেভারেণ্ড ? ছোঃ ! ও ব্যাটা বামুনের ঘরের চাঁড়াল। পয়সার লোভে জাত খুইয়েচে।

—তবু ওনার কথা সাহেবরা মানে-গোণে !

—ওর নাম আমার সামনে আর কখনো উচ্চারণ করিস না, প্যারী ! আমার আর মাথা গরম করিয়ে দিসনি !

—যতদূর সন্ধান পেয়েচি, মধু অ্যাখুন পাদ্রী ডিয়ালট্রি সাহেবের বাড়িতে রয়েচে। আমি যদি পারি, একবার তাকে বাড়িতে নিয়ে আসবো ?

—না।

—বড়খুড়া, একবার মধুর জননীর কথা ভেবে দেখুন। তিনি যে দিনরাত হা মধু, কোথায় মধু কচ্চেন আর মুচ্ছো যাচ্ছেন। তেনাকে বাঁচাবার কথাটি একবার ভাববেন না ?

—তুই ছেলেমানুষ, প্যারী। তুই সব বুজ্জিস না, সে আসবে না। তুই কেন উপযাচক হয়ে মান খোয়াতে যাবি ? তুই জানিস না, কেল্লার মধ্যে সে যখন সাহেবদের কোলে বসেছেল, তখন আমি আমার বন্ধু ভূকৈলাশের রাজা সত্যশরণ ঘোষালকে পাটিয়েচিলুম। এমন বেয়াদপ ছেলে যে তাঁর সঙ্গে পর্যন্ত দেকা করলে না। অতবড় একটা মানী লোক মুখ চূন করে ফিরে এলেন !

—মধু আমাকে ফেরালে তো আর আমার মান যাবে না। সে আমার ভাই। সে আমি যেমন করে পারি তাকে ধরে নে আসবো। আপনি ওকে মারধোর করবেন না বলুন ? আপনি কথা দিন।

—তুই পারবি নি। কেন মিছিমিছি হয়রাণ হবি।

—সে দায়িত্ব আমার। চেষ্টা তো করতে হবে। এর মধ্যে মধু কবে ফস করে বিলেত পালিয়ে যায়, তার ঠিক আচে কি ? কৃষ্ণমোহনবাবুর বাড়িতে আর দু-তিন জন ভদ্দরলোক বসে ছেলেন। বলাবলি করছেলেন যে মধুর তো তেমন খৃষ্টান হবার আগ্রহ ছেল না। বিলেত যাবার দিকেই ওর ঝোঁক পাদ্রীরা ওকে বিলেত পাঠাবে বলেই...

রাজনারায়ণ দত্ত এবার গর্জে উঠলেন। সামান্য স্বার্থের জন্য কেউ বংশানুক্রমিক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারে, এই চিন্তাই তাঁকে বেশী পীড়া দেয়।

—পাদ্রীরা ওকে বিলেত পাঠাবে ? কেন, আমার পয়সা নেই ? আমি ওকে সাতবার বিলেত ঘুরিয়ে আনতে পারি, সে ক্ষমতা আমার আচে। কেন পাঠাইনি জানিস ? সে তার মাকে একদিন কী বলেছেল তুই শুনিসনি ? বাঙালী মেয়েদের চেয়ে নাকি ইংরেজ মেয়েদের রূপ-গুণ একশো গুণ বেশী। দিনের পর দিন স্নান করে না। গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, সেই ন্যাবা লাগা ইংরেজ মাগীগুলো আমাদের বাঙালী মেয়েদের চে ভালো ? হিন্দু মেয়েরা নেকাপড়া শেকে না। মাথায় ঘোমটা দেয়। পায়ে জুতো ইস্টাকিন দিয়ে বিবি সেজে পথে পথে ধেই ধেই করে বেড়ায় না বলে মধু তাদের বে করবে না বলেছেল। এই অবস্থায় ওকে বিলেত পাঠালে আর রক্ষে ছেল ? ও সেখানেই এক বেড়ালমুখীকে বে করে ফেলতো না ? তাহলেও তো সেই জাত খোয়ানোই হতো। সেইজন্যই আমি ভেবে রেকিচিলুম, আগে জোর করে ওর বে'টা দি, হিন্দু কালেজেও এক বছর পড়া বাকি আচে, সেটা সেরে নিক, তারপর না হয় বিলেত পাঠানো যাবে! তার আগেই ছেলে আমার মাথায় বজ্রাঘাত কল্লে!

প্যারীমোহন বললো, মধুর ঐ তো দোষ, বড় চঞ্চল। আমি যেমন ভাবে পারি বলে কয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক নিয়ে আসবো। খৃষ্টান হয়েচে বলে কি ওকে বাড়ি ছাড়া করতে হবে ? হাজার হোক, ও তো আমাদেরই মধু। প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে আবার মধুকে স্বজাতে নিয়ে আসবো। আপনি যেন অমত করবেন না। অন্তত খুড়ীমার মুখ চেয়ে—

এদিকে মধু আর্চবিশপ ডিয়ালট্রির বাড়িতে মহা আনন্দেই রয়েছে। এখন শহরের যাবতীয় মানুষ শুধু তার কথা নিয়ে মেতে আছে, এতেই মধুর রক্তে উত্তেজনার সঞ্চার হয়। সমস্ত সংবাদপত্রে তার খবর। খৃষ্টান তো আরও অনেকেই হয়েছে। কিন্তু নেটিভ ও সাহেব মহলে এতখানি হৈ চৈ-এর সৃষ্টি করতে পেরেছে আর কে, সে, মধুসূদন দত্ত ছাড়া ?

'কবিতার জন্য পিতামাতাকেও পরিত্যাগ করতে হয়', কবি পোপের এই বাণী সে তার জীবনে সার্থক করে তুলেছে। তার বন্ধুরা ভেবেছিল সে পারবে না। পারবে না ? ওরা মধুকে এখনো চেনে না। রাজনারায়ণ দত্ত ভেবেছিলেন জোর করে তার বিয়ে দেবেন। রাজনারায়ণ দত্ত ছেলেকে এখনো চেনেননি।

তবু বন্ধুদের জন্যই মধুর একটু একটু মন কেমন করে। বিশেষত গৌরের জন্য। গৌরকে একদিনও সে চোখের দেখা না দেখে থাকতে পারতো না। গৌরের সঙ্গে তার অনেক গল্প বাকি আছে। গঙ্গানারায়ণের বিবাহ হয়ে গেল এর মধ্যে, নিশ্চয়ই সেই উপলক্ষে বন্ধুরা দুশো মজা করেছে।

গৌরকে সে আসতে বলেছিল, তবু সে আসে না কেন ? গৌর কি তার উপরে এখনো ক্রুদ্ধ হয়ে আছে ? না, না, বাকি পৃথিবীর যে যাই বলুক, তাতে মধুর কিছু আসে যায় না। কিন্তু গৌর যদি তাকে ভুলে যায়, তাহলে সে আঘাত মধু সইতে পারবে না।

কাগজ-কলম নিয়ে মধু গৌরকে একটা চিঠি লিখতে বসলো।

আশ্চর্য, তার প্রথমেই মনে পড়লো একটা বাংলা কথা। 'ও গৌর। দুদিন চার দিনেতেই এত!' কথাটা বার বার উচ্চারণ করলো সে। এই কথার সঠিক ইংরেজি তার মনে এলো না। অথচ বাংলা অক্ষরও লিখবে না সে। এখন সে খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষা নিয়ে ইংরাজদের সমতুল্য হয়েছে, এখন তো আর ঐ নেটিভদের সামান্য ভাষা ব্যবহার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

'ও গৌর. দু-চার দিনেতেই এত !!!' এই বাক্যটি সে প্রথমে লিখলো রোমান হরফে। তারপর ইংরেজিতে চিঠি শুরু করলো; "তুই যদি সত্যিই আমায় দেখতে চাস, তাহলে এখানে, এই ওল্ড চার্চ মিশান রো-তে চলে আয়। তুই নিশ্চয় বলবি, তোর গাড়িভাড়া নেই। ঠিক আচে, একটা পাল্কি ভাড়া করে সোজা চলেই আয় না, আমি ভাড়া মিটিয়ে দেবো। আমার কাচে এখানে ঢের ঢের টাকা রয়েচে। মিঃ কার-এর কাচ থেকে ছুটি নিয়ে চলে আয়...।"

কাম, ব্রাইটেস্ট গৌর দাস, অন আ হায়ার্ড পাল্কি
অ্যাংড সি দাই অ্যাংকশাস ফ্রেণ্ড, এম এস ডি

সে চিঠি পেয়েও গৌর এলো না। মধুর মন খারাপ ক্রমশ পরিব্যাপ্ত হতে লাগলো। এক নতুন জগতে প্রবেশ করেছে সে, এত উৎসাহ উদ্দীপনা, এ সব কথা কি গৌরকে না জানালে চলে ?

সে আবার একটি চিঠি লিখলো :

প্রিয় বন্ধু আমার, এক কবি তাঁর প্রেয়সীকে বলেছিলেন, "ক্যান আই সীজ টু লাভ দী ! নো ! সেই কথাই আমি বলচি, আমার এক প্রিয়তর জনকে, এক বন্ধু, খাঁটি, (কী দুর্লভ এ জিনিস) ;খাঁটি বন্ধুকে ।...তুই কেমন আচিস ? কখনো ভাবিস না যে আমি তোকে ভুলে যাবো—তুইও যেন আমায় ভুলিস না। কবিতা লিকচি...কোথায় ছাপা হবে জানিস, খোদ লণ্ডনে ! ভাবতে পারিস ? বেণীর সঙ্গে দেখা হয় ? কী আশ্চর্য ব্যাপার, বেণীকে আমি পছন্দ করি না, বেণীও আমায় দেখতে পারে না, অথচ ক'দিন ধরে বেণীর কথা বার বার মনে পড়চে। অন্য বন্ধুদের কথাও প্রায়ই ভাবি...ভূদেব মেডেলটা পেয়েচে ?...তুই আসচিস নি কেন একবার। আয়, গৌর আয়, পাল্কি ভাড়া করে আসিস। আমি তো বলিচিই...

গৌরদাস এরপর এলো বটে, কিন্তু সঙ্গে প্যারীমোহনকে নিয়ে। প্যারীমোহন এর আগেও দু একবার এসেছে মধুর কাছে কিন্তু তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি। প্যারী খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছিল, গৌরদাসের কথাতেই মধু বশীভূত হতে পারে। সেইজন্য সে গৌরদাসের সঙ্গে এসেছে।

মধু ছুটে গিয়ে গৌরকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে পশ্চাতে প্যারীমোহনকে দেখে থমকে গেল। ছদ্ম কোপের সঙ্গে বললো, প্যারীদাদা, তুমি ফের এয়োচো ? আমি তো বলেই দিয়িচি, তোমাদের ও প্রস্তাব আমি মানবো না, মানবো না, মানবো না ! তোমাদের কথা মতন আমি বিলেত যাওয়া এখন স্থগিত রেখিচি, তোমরা আর কী চাও ?

প্যারীমোহন বললো, মধু, তুই একবারটি অন্তত বাড়ি চ।

মধু বললো, এ বাড়িতে আমায় মধু মধু বলে ডেকো না। এখন আমার নাম মাইকেল।

বলেই সে হা হা করে উচ্চশব্দে হেসে উঠলো। দুরন্ত শিশুর মতন হাসি। যেন সে কোনো অভিনব ফন্দীতে গুরুজনদের জব্দ করেছে।

গৌর বললো, মধু, তোর মাকে আমি কথা দিয়িচি, তোকে একবার নিয়ে যাবো।

মধু সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললো, গৌর, তুই অন্য যা কিচু অনুরোধ কর, শুধু ও কথা বলিসনি !

—কেন, এটা কি অন্যায় অনুরোধ ?

—এ সব তুই বুঝবিনি।

প্যারীমোহন বললো, খুড়ী ঠাকুরানীর কষ্ট যে আমরা চোখে দেখতে পারি না আর। শোকে দুঃখে একেবারে পাগলের মতন হয়ে গ্যাচেন। মধু, তোর একবারও ইচ্ছে করে না অমন স্নেহময়ী জননীকে দেখে আসতে ?

মধু উত্তর দিল, প্যারীদাদা, তুমি প্রতিদিন এই একই কথা বলো কেন ? এর উত্তর তো আমি অনেকবার দিয়িচি।

গৌর বললো, মিস্টার মাইকেল এম এস ডাট্, তুমি যদি আর আমার কথা না শোনো, তবে আমায় এখানে আসবার জন্য পেড়াপীড়ি করো কেন ? আমি আর আসবো না।

মধু গৌরের হাত চেপে ধরে বললো, তুই মিথ্যেই রাগ করচিস গৌর। তুই সব জানিস না। মাকে দেখতে আমার সাধ হবে না কেন ? আমিও তো মায়ের হাতের পাখার বাতাস খাবার জন্য ছটফট করচি। এই বসন্ত ঋতুতেই কেমন ঘাম ছুটচে দেকচিস তো। পাঙ্খা পুলার যতই হাওয়া করুক, কিন্তু আমার মায়ের হাতপাখার বাতাস যেমন ঠাণ্ডা, তেমন আর কিছুই না। কিন্তু আমি বাড়ি গেলেই বাবা পাইক প্যায়দা দিয়ে আমায় আটক করে দেবেন।

প্যারীমোহন সঙ্গে সঙ্গে বললো, না, না, ঠাকুরখুড়া নিজে আমায় কথা দিয়েচেন। কেউ তোকে আটকাবে না।

গৌর বললো, আমি দায়িক রইলুম, তুই আবার ইচ্ছে মতন ফিরে আসবি।

মধু বললো, তুই লিকেচিলি, কুক্ষণে ডিয়ালট্রি সাহেব এদেশে এয়েচিলেন বলেই আমি খৃষ্টান হয়েচি। তোর এ ধারণা ভুল। তোরা জানিস, আমার উপর জোর করে কিছু করিয়ে নেবার সাধ্যি কারুর নেই। পরম পিতা যীশুর পাদপদ্মে আমি নিজেকে সঁপে দিতে চেয়েছি স্বেচ্ছায়। আমি কারুর জোর-জবরদস্তি মানি না।

—বেশ মানলুম। তুই তা হলে মাকে দেখতে যাবি কি না?

—যাবো।

প্যারী তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমাদের পাল্কিওয়ালাটা চলে গ্যাচে বোধ হয়। আর একটা পাল্কি ডেকে আনি?

মধু বললো, রও, রও, প্যারীদাদা, অমন হটমট করচো কেন? যাবো বলে কি এখুনি যাবো? আজ চার্চে একটা মেমোরিয়াল সার্ভিস রয়েচে, সেটা অ্যাটেণ্ড করতেই হবে। তারপর, কাল, না, কালও হবে না। ক্যাপটেন রিচার্ডসন কাল এখানে ডিনার খেতে আসচেন। পরশু যেতে পারি। ধরো, পরশু সকাল এগারোটায়।

গৌর বললো, তুই বুঝি তোর মায়ের সঙ্গেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখা করতে যেতে চাস?

—অফ কোর্স? হোয়াই নট?

—চার্চে মেমোরিয়াল সার্ভিস তো সন্ধ্যাকালে। এখন এই সকালবেলা, তোর যেতে আপত্তি কী? তুই এখন যেতে চাস তো বল, নইলে তোর যা খুশী করিস!

মধু কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর আপন মনে বলে উঠলো, বিকজ আই লাভ, রেসপেক্ট অ্যাণ্ড অনার দী, অ্যাণ্ড থিংক ইউ আর আ ম্যান অফ অনেস্টি? ঠিক আচে, চল।

কেউ একটুও অতিরঞ্জিত করে বলেনি, জাহ্নবী দেবী তখনও নিজ কক্ষের ভূঁয়ের ওপর বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। খোলা চুল লুটোচ্ছে পাশে। তাঁর একটি হাত যেন শক্ত সিমেন্টের মেঝেকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে।

জুতো না খুলেই মধু দ্রুত এসে কাছে বসে পড়ে ডাকলো, মা!

সেই ডাকে যেন ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলো। যেন প্রবল একটি আঘাতে জাহ্নবী তড়াক করে উঠে পড়ে ভয়ার্ত গলায় বললেন, কে?

পর মুহূর্তেই ঘোর কেটে গেল। তিনি পুত্রকে জড়িয়ে ধরে উন্মাদিনীর মতন বলতে লাগলেন, মধু, মধু, মধু, মধু। মধুও সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগলো মা, মা, মা, মা।

প্রথমিক উচ্ছ্বাস কেটে যাবার পর জাহ্নবী তাঁর হৃদয়ের নিধির দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ম্লান গলায় বললেন, বাছা, তুই আমায় এমন দাগা দিলি? দিতে পারলি?

মধু বললো, মা, দ্যাখো, আমি তো তোমার সেই মধুই রয়িচি। আমার চোখ, মুখ, কান, হাত, পা কিছুই কি বদলেচে? আমি কি অন্য রকম কথা কইচি? আমার মনের বিশ্বাস শুধু অন্য রকম হয়েচে। কিন্তু তোমার ছেলে তো তোমারই রয়েচে, মা!

—ওরে, কত মানুষের ছেলেদের যমে কেড়ে নিয়ে যায়। তোকে সাহেবরা কেড়ে নিয়ে গেল আমার কোল থেকে।

—আমায় কেউ কেড়ে নেয়নি। এই দ্যাখো না, আমি নিজের ইচ্ছেতে এসিচি তোমার কাচে।

—তুই আবার চলে যাবি?

প্যারীমোহন গিয়ে খবর দিয়েছিল রাজনারায়ণ দত্তকে। প্রথমে তিনি আসতে চাননি। ছেলে এসে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তবে তিনি ছেলের সঙ্গে কথা বলবেন। প্যারী প্রায় হাতে পায়ে ধরে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে তাঁকে একবার নিয়ে এলো। কেননা, প্যারীর ভয় ছিল, মধু শুধু তার মায়ের সঙ্গে দেখা করবার কড়ারে এসেছে, হয়তো শুধু মাকে দেখেই চলে যাবে। তাতে রাজনারায়ণ দত্ত আরও অপমানিত হবেন।

দ্বারের কাছে এসে দাঁড়ালেন রাজনারায়ণ দত্ত। তাঁর ছায়া এসে পড়লো মধুর শরীরে। রাজনারায়ণের মুখ উৎকট গাম্ভীর্য মাখানো। যেন সেই গাম্ভীর্য দিয়েই তিনি তাঁর আহত অহঙ্কার ঢাকতে চান। মধুও ঘাড় শক্ত করে রইলো।

মাত্র বৎসরকাল আগেও পিতা ও পুত্র ছিল দুই বন্ধুর মতন। আর এখন যেন মুখোমুখি দুই যুযুধান।

রাজনারায়ণ জলদ স্বরে বললেন, আমি পুরুত বামুনদের সঙ্গে কথা কয়িচি। প্রায়শ্চিত্তি করবার কোনো অসুবিধে হবে না। তারা নিদেন খুঁজে বার করেচে। দু-পাঁচশো বামুনকে শাল-দোশাল দিয়ে একদিন পেট পুরে খাইয়ে দিলেই হবে। আর তোকে এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে পঞ্চগব্য খেয়ে দুটো চারটে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। শুভস্য শীঘ্রং, আমি ব্যবস্থা নিচ্চি, এ হপ্তার মধ্যেই সব হয়ে যাবে।

মধু উঠে দাঁড়িয়ে তেজের সঙ্গে বলে উঠলো. বাবা, আপনি একটা কথা শুনে রাখুন, যদি আকাশে

চন্দ্র সূর্য না ওঠে, যদি পুবের বদলে পশ্চিমে সূর্যের উদয় হয়, তা হলেও আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো না ! আমি নিজের জ্ঞান বুদ্ধি মতে খৃষ্টান হয়িচি ! আমি বর্বর হিন্দু সমাজ ছেড়ে সুসভ্য ইংরাজদের সমকক্ষ হয়িচি !

ক্রোধে রাজনারায়ণের শরীর কম্পিত হতে লাগলো । তিনি বললেন, দূর হয়ে যা ! আর কোনোদিন যেন তোর মুখ আমার দেখতে না হয় ।

লম্বা অলিন্দ ধরে হাঁটতে লাগলেন রাজনারায়ণ । বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, ও আমার ছেলে নয় ! ও আমার কেউ নয় ! বিধর্মী, ও কালসর্প । ওকে আমি মন থেকে মুচে ফেলবো । দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো ।

এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে রাজনারায়ণ আবার ভাবলেন, আমার পুত্র নেই । আমি ম'লে আমার মুখাগ্নি করার কেউ রইলো না । আমাকে পুন্নাম নরকে যেতে হবে ।

মুখমণ্ডল কঠিন করে তিনি সেইক্ষণেই শপথ নিলেন, তিনি আবার বিবাহ করবেন । আর একটি পুত্র সন্তান তাঁর চাই-ই চাই ।

মধুর বেশ সুবিধেই হয়ে গেল । পিতার এবম্বিধ কঠিন ব্যবহার গৌর প্রত্যক্ষ করেছে । সুতরাং এ রকম একজন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী থাকার ফলে অন্যান্য বন্ধু ও শুভার্থীদের কাছে মধু এর পর থেকে অনয়াসেই বলতে পারে, পিতা চান না, সে বাড়ি ফিরবে কী করে ? মাঝে মাঝে সে অবশ্য লুকিয়ে চুরিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং মুঠো মুঠো টাকা পকেট ভরে নিয়ে যায় । বিলাসিতা তার অহংকারের আশ্রয় । প্রচুর অর্থ না থাকলে তার স্বস্তি হয় না ।

প্রথম কিছুদিন তার অসুবিধে হলো পড়াশুনোর ব্যাপারে । শিক্ষা অর্জনে তার অদম্য উৎসাহ । কিন্তু হিন্দু কলেজে তার প্রবেশ অধিকার নেই । হিন্দু ছাড়া আর কোনো ছাত্র সেখানে পড়তে পারে না । বেশ কয়েক মাস মধু বিভিন্ন পাদ্রীদের গৃহে অবস্থান করে তাঁদের কাছ থেকেই পাঠ গ্রহণ করতে লাগলো । এই যুবকটির মেধা ও আগ্রহ দেখে বহু সাহেবই মুগ্ধ ও বিস্মিত । তাঁরাই পরামর্শ দিলেন মধুকে বিশপস কলেজে ভর্তি হবার জন্য ।

বিশপস কলেজে আবাসিক ছাত্র হওয়া রীতিমতন ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার । প্রতি মাসে ষাট টাকা করে লাগে । মায়ের কাছ থেকে নিয়মিত এত টাকা পাবার সম্ভাবনা নেই, তাই মায়ের মারফৎ কথাটা সে তার পিতার কানে তোলালো । রাজনারায়ণ দত্ত নিজের পুত্রকে অস্বীকার করলেও লোকে এখনো মধুকে বলে, রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে । এর পরেও মধু যদি পাদ্রীদের কাছে ভিক্ষাজীবী হয়, তাতে রাজনারায়ণেরই মান ক্ষুণ্ণ হবে । পত্নীর হাত দিয়েই তিনি পুত্রের জন্য মাসিক একশো টাকা বরাদ্দ করে দিলেন ।

বিশপস কলেজে মধু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছাত্র । সেখানে খাঁটি ইওরোপীয় যুবকেরা পড়ে, আর রয়েচে কিছু দেশীয় খৃষ্টান । নিঃসন্দেহে এদের সকলের মধ্যে মধু সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল । ক্লাসিকাল ল্যাঙ্গোয়েজ বিভাগে মধু গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু এবং সংস্কৃত শিক্ষা করতে লাগলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে । ভাষা শিক্ষায় তার দ্রুত কৃতিত্বে শিক্ষকরা মুগ্ধ । আবার এই মধুই এক একদিন ক্লাসে অসম্ভব দৌরাত্ম্য করে । কলেজের নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে প্রায়ই । সন্ধ্যাকালে সে বিলাসী পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে প্রমোদ সন্ধানে যায়, যখন ফেরে, তখন তার মস্তক ও পদদ্বয় টালমাটাল ।

কলেজে ভর্তি হবার প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই মধু একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে তুললো । সে দেখলো যে, ইওরোপীয় ছাত্র ও দেশী খৃষ্টান ছাত্রদের দু রকম পোশাক । সে ভেবেছিল, খৃষ্টান ধর্মে কোনো জাতিভেদ নেই, মানুষে মানুষে সমভ্রাতৃত্বই এই ধর্মের সার কথা । তবে দু রকমের পোশাক কেন ?

মধু ইওরোপীয় ছাত্রদের মতন কালো ক্যাসক, কোমরবন্ধ ও চতুষ্কোণ টুপী পরিধান করে ক্লাসে এলো একদিন । সব ইওরোপীয় ছাত্ররা আড়চোখে দেখতে লাগলো তাকে । শিক্ষক মহাশয় পড়ানো বন্ধ করলেন এবং অধ্যক্ষ মহাশয় ছুটে এলেন । তিনি মধুকে বললেন, প্রিয় বৎস, যদি ক্যাসক পরিধান করিতেই চাও তো সাদা রঙের পরিধান করিও ।

মধু উঠে দাঁড়িয়ে বললো, না, মহাশয় । হয় ইওরোপীয় পোশাক পরিধান করিব, নয় তো আমার পছন্দ মতন দেশীয় পোশাক ।

অধ্যক্ষ বললেন, বেশ, দেশীয় পোশাকেই আসিও ।

মধু মুচকি হেসে তখুনি মনে মনে মতলব ভেঁজে নিল । এবং পরদিন ক্লাসে সে বাধিয়ে দিল আরও এক হুলুস্থুল কাণ্ড । লেখাপড়া সব মাথায় উঠলো, সমস্ত কলেজের ছাত্ররা নিজ নিজ ক্লাস ছেড়ে

বেরিয়ে এসে দেখতে লাগলো মধুকে। সেদিন মধু পরেছে সাদা সিল্কের কাবা, গলায় বহু রঙের কাজ করা শালের কার্ফ এবং মাথায় উকিলদের মতন বিরাট রঙীন পাগড়ি। মধু যেন সেদিন কোনো 'গো অ্যাজ ইউ লাইক' প্রদর্শনীর নায়ক। আবার ছুটে এলেন অধ্যক্ষ।

এমন ছেলেকে একটি ধর্মীয় বিদ্যালয়ে রাখা নিরাপদ নয়। অধ্যক্ষ ও কলেজ কর্তৃপক্ষ মধুকে নিয়ে একটি সভায় বসলেন। সেদিনই মধুর নাম কাটা যেত, কিন্তু রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পরামর্শ দিলেন, মধুর ওপর যদি এমন কঠোর নীতি প্রয়োগ করা হয়, তা হলে এর পর আর সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেদের খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা সুদূরপরাহত হবে। অনেক বিচার বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ কৃষ্ণমোহনের পরামর্শই মেনে নিলেন। মধু ইওরোপীয় ছাত্রদের মতনই পোশাক পরবার অনুমতি পেল।

এরপর মাইকেল এম এস ডাট পাক্কা সাহেব। ক্লাস করবার সময় তার পাদ্রীদের মতন পোশাক আর তার সায়ংকালীন প্রমোদযাত্রায় ইংলিশ কোট ও মাথায় বীভার হ্যাট।

আবার একদিন অধ্যক্ষ নিজ কক্ষে ডেকে পাঠালেন মধুকে। ঈষদুষ্ণ কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন, বৎস, তুমি গতকল্য গীর্জায় উপাসনার সময় হাসিয়াছিলে কেন?

মধু বললো, আমাদের মাননীয় পাদ্রী বাংলাভাষায় উপদেশ দিতেছিলেন কিনা!

অধ্যক্ষ ভর্ৎসনা করে বললেন, তুমি নিজে বঙ্গবাসী, তবু বঙ্গভাষা শুনিলে তোমার হাস্য উদ্রেক হয়? ছিঃ!

বাংলা ভাষাকে মধু নিজের জীবন থেকে ত্যাগ করেছিল। সে এখন খৃষ্টান, ইংরেজদের স্বজাতি, সে ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করে অমর হবে। বাংলা ভাষা দিয়ে তার প্রয়োজন কী? কিন্তু গীর্জার উপাসনায় অকস্মাৎ বাংলা ভাষার ব্যবহার তার বিস্ময় উদ্রেক করে।

অধ্যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে সে বললো, মহাশয়, উপাসনার সময় আমাদের মাননীয় পাদ্রী কী ধরনের বাংলা বলিতেছিলেন, আপনি জানেন কি? তিনি বলিতেছিলেন, "আমরা তাম্বু ফেলিলাম, সন্ধ্যা হইল, বায়ু বহিল, কুকুর-বিড়াল বৃষ্টি পড়িল, কল্য উঠাইয়া লইলাম, এবং অন্য স্থানে তাম্বু গাড়িলাম!" এই কি বাংলা? বাংলা ভাষা এত যাহা তাহা নহে। এই ধরনের বিলাতি বাংলা শুনিলে হাস্যই আসে, ইহার পরিবর্তে ইংরাজি বলাই শ্রেয়।

এর পরের ঘটনাটি অবশ্য আরও অনেক গুরুতর। সেটি ঘটেছিল ডাইনিং হলে।

সন্ধ্যার সময় ছাত্রেরা ইচ্ছে মতন বাইরে ঘুরে আসে। কে কোথায় যায়, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। তবে নৈশভোজের ঘণ্টাধ্বনির সময় সব ছাত্রের ডাইনিং হলে এসে উপস্থিত হবার কথা। মধু অবশ্য দু একদিন অধিক রাত করে ফেলে, কিন্তু ইতিমধ্যেই তার সম্পর্কে নিয়ম কানুন একটু শিথিল। সে যতই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করুক, অধ্যয়নের ব্যাপারে সে যে এই কলেজের গৌরব। কোনো কোনো ছুটির দিনে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মধু শুধু দু'বেলা আহারের সময় ছাড়া আর একবারও নিজের ঘর থেকে নির্গত হয় না। অনবরত শুধু বই পড়ে যায়।

সেরকমই একটি দিনে মধু নৈশভোজের ঘণ্টাধ্বনি শুনে ডাইনিং হলে উপস্থিত হয়েছে। সারাদিনের পরিশ্রমে সে ক্লান্ত। তবু আহার সেরেই সে আবার বই নিয়ে বসবে। ইদানীং সে এতই ব্যস্ত যে গৌরদাস বসাকের চিঠির উত্তর দেবারও সময় পায় না। মূল ভাষায় সে ভার্জিল ও হোমার পড়তে শুরু করেছে।

ইউরোপীয় প্রথা অনুযায়ী আহারের পূর্বে দু' এক পেগ হাল্কা সুরা পরিবেশন করা হয়। সারাদিন মধু কিছু পান করেনি, তাই সে ঐটুকু সুরার জন্যই উন্মুখ হয়েছিল। হঠাৎ সে দেখলো, পরিচারক শুধু শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদেরই সুরা পরিবেশন করে গেল, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের গেলাস শূন্যই পড়ে রইলো।

ক্রোধে কুঞ্চিত হয়ে গেল মধুর মুখ। এই ক্রোধ সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, প্রথমে সে জিভের তলায় আঙুল দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ শিস দিল। তারপর ডান হাতের তর্জনী হেলন করে ডাকলো, স্টুয়ার্ড, কাম হিদার!

পরিচারকটি এগিয়ে আসার পর মধু নিজের শূন্য গেলাসটির দিকে ইঙ্গিত করে বললো, এটি পূর্ণ করোনি কেন?

পরিচারক বললো, আজ আমাদের ভাণ্ডারে সুরা কিছু কম আছে, তাই সকলকে দেওয়া যায়নি।

মধু বললো, তাহলে সব ইওরোপীয় ছাত্ররা পেল কী করে? একজনও দেশীয় ছাত্র পায়নি কেন? তোমার যদি অল্প সুরা থাকে, তবে প্রথম থেকে শুরু করে যে-ক'জন পাবে তো পাবে। এটাই

নিয়মসঙ্গত নয় কি?

পরিচারকটি কাঁচুমাচু হয়ে বললো, আমাদের ওপর নির্দেশ আছে, প্রথমে শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদের, তারপর অন্যদের…

মধু উঠে দাঁড়িয়ে সিংহগর্জনে বললো, ইউ বী ড্যামড্! দোজ ইনস্ট্রাকশানস বী ড্যামড্!

সঙ্গে সঙ্গে মধু নিজের শূন্য গেলাসটা ছুঁড়ে মারলো মাটিতে। শুধু নিজেরটা নয়, আশপাশের কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রের গেলাস তুলে নিয়ে সে ঝন্‌ঝন শব্দে ভাঙতে লাগলো।
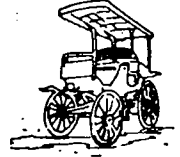
মানিকগঞ্জের জমিদার পূর্ণচন্দ্র রায় যাবেন কলকাতা দর্শনে। বাঙাল দেশের লোক, আগে কখনো পদ্মা পার হননি, রাজধানী কলকাতা সম্পর্কে মনের মধ্যে কিছুটা ভয় ভয় ভাব আছে। কিন্তু দেশ গাঁয়ে আমোদ ফুর্তির মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য নেই, একটু বিদেশ ঘুরে আসার জন্য মন ঘুর ঘুর করে। তা ছাড়া একটি মাতৃদায়ও রয়েছে। পর পর দু বৎসর উত্তম ফসল হওয়ায় আদায়-তহশিলও ভালো, সারা বাড়িতে টাকার থলিগুলি ঝমর ঝমর করে নাচে। তাই বাবু পূর্ণচন্দ্র বর্ষার পরই ঘুরে আসা মনস্থ করলেন।

পূর্ণচন্দ্রের পিতা গত হয়েছেন অনেকদিন আগেই। তাঁর মা অনঙ্গমোহিনী ছিলেন অতি জাঁদরেল নারী, নাবালক পুত্রের হয়ে তিনিই জমিদারী শাসন করতেন অতি দক্ষতার সঙ্গে। এমনকি পূর্ণচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হলেও অনঙ্গমোহিনী একটুও রাশ আলগা করেননি, পুত্র তখন নামে মাত্র জমিদার হলেও সমস্ত কর্তৃত্ব ছিল তাঁর হাতে। বৎসর দেড়েক আগে সেই অনঙ্গমোহিনীও স্বর্গারোহণ করেছেন। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তিনি পুত্রকে বলেছিলেন, বাবা পূর্ণ, মা কালীর কাছে আমার একটা মানত আছে, তুই কালীঘাটে মায়ের পূজা দিয়ে আসিস, নইলে আমার আত্মা স্বর্গে গিয়াও তৃপ্তি পাবে না।

মানতটি অবশ্য পূর্ণচন্দ্র সম্পর্কেই, মায়ের মৃত্যুকালে পূর্ণচন্দ্রের বয়স উনত্রিশ কিন্তু তখনও বংশে নতুন উত্তরাধিকারী আসেনি। নাতির মুখ দেখার জেদে অনঙ্গমোহিনী আট বৎসরের মধ্যে পাঁচবার পুত্রের বিবাহ দিয়েছেন। সেই পাঁচটি বধূই এ বাড়িতে থাকে কিন্তু তারা কেউই স্বামীকে একটিও সন্তান উপহার দিতে পারেনি। কালাশৌচ কেটে যাবার পর ইয়ার বন্ধুরা পূর্ণচন্দ্রকে আর একবার দার পরিগ্রহ করার পরামর্শ দিচ্ছিল, তার আগে পূর্ণচন্দ্র ঠিক করলেন একবার কালীঘাটটা ঘুরে আসা যাক।

পাশের পরগণার জমিদার ইব্রাহিম শেখের সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রের দোস্তি আছে। ইব্রাহিম শেখ বুঝদার লোক, ইতিমধ্যে তিনি দুবার ঘুরে এসেছেন কলকাতা থেকে। সুতরাং পূর্ণচন্দ্র গেলেন তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে।

ইব্রাহিম শেখ পথের সুলুক সন্ধান দিয়ে দিলেন এবং কলকাতার এমন একটি চিত্র আঁকলেন যাতে পূর্ণচন্দ্র একেবারে তাজ্জব। জল নাকি জমে শক্ত হয়ে যায় এবং তা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খায় কলকাতার মানুষ। আরও কতক মানুষ নাকি দিনের বেলা ঘুমোয় ও রাতের বেলা জেগে থাকে। মুসলমান মেয়েমানুষের বাড়িতে হিন্দু বাবুরা যায় এবং কসবীর আম্মাকে মা বলে ডাকে।

পূর্ণচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, ভাইডি, একটা কথা কও তো। শুনছি, কইলকাতায় গ্যালেই সাহেবরা নাকি সক্কলডিরে ধইরা ধইরা খৃষ্টান কইরা দেয়? তোমারে ধরতে আসে নাই?

ইব্রাহিম শেখ অহংকারী পুরুষ, মুসলমান জাতির পূর্ব গৌরব সম্পর্কে সদা সজাগ। তিনি বললেন, আমারে খৃষ্টান করতে আইব কুন পুঙ্গির পুত? হ্যারে তার মায় এখনো জম্মো দেয় নাই।

পূর্ণচন্দ্র বললো, ভাই তোমাগো মুসলমানগো সাহেবরা এখনো ডরায়। কিন্তু হিন্দুগুলোর উপর নাকি খুব অইত্যাচার করে?

ইব্রাহিম শেখ বললো, দোস্ত, আমি কইলকাতা থিকা অইন্য খবর শুইন্যা আইছি। তোমাগো হিন্দুগো সর্বনাশ করতে আছে হিন্দুরাই। হিন্দু ধর্ম আর বুঝি রইল না। ইংরাজি ল্যাখাপড়া শিখ্যা এক দলের মাথা বিগড়াইয়া গ্যাছে, তারা হিন্দুদের জবরদস্তি কইরা বেহ্মজ্ঞানি কইরা দিতাছে।

—কী কইরা দিতাছে ?

—বেহ্মজ্ঞানি। হেডা কী বস্তু তা তোমরাই ভালো বোঝবা। আমি দ্যাখলাম, সিঁদুরিয়াপট্টিতে একদল বাবুরে দেইখ্যা রাস্তার লোকেরা বেহ্মজ্ঞানি বেহ্মজ্ঞানি কইরা তরাসে চিল্লাইতে চিল্লাইতে আগল বাগল দৌড়াইয়া পলাইয়া গ্যালো।

ইংরাজি শিক্ষার ঢেউ পূর্ব বাংলার এতদূর অভ্যন্তরে পৌঁছোয়নি। পূর্ণচন্দ্র অতি অল্প কিছুদিন এক মুন্সীর কাছে সামান্য ফার্সী পড়েছিলেন এবং বাংলায় নাম সই করতে পারেন মাত্র। বেহ্মজ্ঞানি কথাটার অর্থ তিনি কিছুই বুঝলেন না। বেহ্মদৈত্যের নাম শুনেছেন, সেরকমই একটা কিছু বলে মনে হলো।

ভয়ে বিবর্ণ মুখে তিনি বললেন, তাহলে আর কইলকাতায় গিয়া কাম নাই। জাত খোয়াইতে পারমু না। স্বর্গ থিকা মায় আমারে অভিশাপ দিবে।

ইব্রাহিম শেখ তখন আশ্বাস দিয়ে বললেন, দুই চাইরজন পাইক লাঠিয়াল নিয়া যাও সঙ্গে। কইলকাতার মানুষ দুইডা জিনিসের বড় মাইন্য করে। পেয়াদা আর পয়সা। পেয়াদার লাঠি দ্যাখলেই ভয়ে পলায় আর পয়সা ছড়াইলেই পায়ের উপর আইস্যা পড়ে। পয়সা ছড়াও আর লাথ্থি মারো, কইলকাতায় এই একটা বড় সুখ।

শুভক্ষণ দেখে পূর্ণচন্দ্র কয়েকজন দেহরক্ষী নিয়ে বজরায় ভেসে পড়লেন। দিন সাতেক পর লালগোলার কাছে চড়ায় আটকে গেল সেই বজরা। সে আর কিছুতেই নড়ানো যায় না। এখান থেকে স্থলপথে তিনি পালকিতে যেতে পারেন বটে, কিন্তু ইব্রাহিম শেখ বারবার বলে দিয়েছেন, নিজস্ব বজরা না নিয়ে গেলে খাতির পাওয়া যায় না কলকাতা শহরে। সুতরাং পুরোনো বজরা সেখানেই ফেলে রেখে, লোক লাগিয়ে দেখে শুনে একটি বজরা কিনে ফেললেন এবং ভগবানগোলা থেকে সেই বজরায় আবার যাত্রা শুরু করলেন। যথাসময়ে বাগবাজারের ঘাটে এসে ভিড়লো তাঁর সেই নতুন বজরা।

এই সব ঘাটে মোসাহেব ও দালালরা সদাপ্রত্যহ ছোঁক ছোঁক করে। এখান থেকেই বাবু পাকড়াতে হয়। তীর্থস্থানের পাণ্ডাদের মতন দালাল মোসাহেবরা কে আগে কোন্ বাবুকে পাকড়াবে তা নিয়ে রীতিমতন প্রতিযোগিতা ও ধুন্ধুমার কাণ্ড চলে। বিশেষত বাঙাল দেশের বড়মানুষ দেখলে তাদের আমোদ আর ধরে না। বাঙাল দেশের বড়মানুষরা প্রত্যেকেই এক একটি যেন নধর পাঁঠা।

পূর্ণচন্দ্র যে দুই দালালের এক্তিয়ারে পড়লেন, তাদের নিজস্ব নাম যা-ই থাক, লোকে তাদের নন্দী ও ভৃঙ্গী বলে ডাকে। সেই নন্দী ও ভৃঙ্গী পূণচন্দ্রের বজরায় উঠে ষাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করলো।

কলকাতা যতই এগিয়ে আসছিল, ততই পূর্ণচন্দ্রের বক্ষের ধুকপুকানি বাড়ছিল। কোন্ আজব জায়গা দেখবেন কে জানে! পাইক লাঠিয়ালদের প্রস্তুত থাকতে বলে তিনি উত্তেজনা প্রশমনের জন্য সুরাপান শুরু করে দিলেন. বাগবাজারে এসে যখন পৌঁছোলেন তখন তাঁর টপভুজঙ্গ দশা। এই সময় তাঁর ভীরুতা, দুর্বলতা একেবারে উপে যায়, সুরাপান করলেই তিনি শের। মা জীবিত থাকতে তিনি কখনো ও জিনিস স্পর্শ করতেও সাহস পাননি, মাত্র এই দেড় বৎসরেই পূর্বেকার সব তৃষ্ণা মিটিয়ে নিয়েছেন।

রক্তাক্ত চক্ষে কামরার বাইরে এসে তিনি গর্জন করে বললেন, তোমরা কেডা ? আমার বজরায় আইছ কার হুকুমে ?

নন্দী ও ভৃঙ্গী হাত জোড় করে বললো, হুজুর, আমরা আপনার দাসানুদাস। আপনার সেবা করবার জন্য আমরা হাজির হইচি।

দোস্ত ইব্রাহিম শেখের পরামর্শ মনে রেখে পূর্ণচন্দ্র তাঁর রেশমী কুর্তার পকেট থেকে দু মুঠো টাকা বার করে ছুঁড়ে দিলেন ওদের দুজনের সামনে। ওরা সাগ্রহে সেই টাকা কুড়িয়ে নেবার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়তেই পূর্ণচন্দ্র দুজনের পশ্চাৎদেশে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে দুটি লাথি কষালেন।

মারের আকস্মিকতায় ঈষৎ চমকে উঠলেও নন্দী ও ভৃঙ্গী বিগলিত হাসিমুখ করে রইলো। দুধেল গোরু তো মাঝে মাঝে চাঁট মারবেই।

পূর্ণচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগলো ?

নন্দী ভৃঙ্গী একসঙ্গে বলে উঠলো, আহা কী কোমল আপনার পা, যেন পদ্মফুল দিয়ে গড়া। যেন ছিরিকেষ্টর পদাঘাত, আমরা হলুম গে রাধিকে। আর একবার মারুন।

পূর্ণচন্দ্র হৃষ্ট হয়ে বললেন, বাঃ বেশ !

তারপর নিজের লোকজনদের দিকে ফিরে বললেন, দেখলি ? কেমন সোন্দর কথা কয় ? কইলকাতা শহরের সহবৎই আলাদা।

নন্দী ভৃঙ্গী কাজে নিযুক্ত হয়ে গেল। একটি বাসা ভাড়া করা হলো রামবাগানে। তারপর মচ্ছব চলতে লাগলো কয়েকদিন ধরে। বাঙাল পূর্ণচন্দ্রকে শহুরে বাবু করে তোলার জন্য নন্দী ভৃঙ্গী উঠে পড়ে লাগলো। পূর্ণচন্দ্রের পোশাক-আসাক ও মাথার চুল দেখলেই বাঙাল বলে চেনা যায়, কথা বললে তো আর রক্ষে নেই। রাস্তা দিয়ে দশ বারোজন পারিষদ পরিবৃত হয়ে পূর্ণচন্দ্র যখন চলেন, অমনি ফচকে ছোঁড়া, কুঠীওয়ালা ও গেঁজেল গুলিখোররা চেঁচিয়ে ওঠে, বাঙাল ভিড়েচে ! বাঙালের মরণ ! মাথাখানা দ্যাখ, যেন কাতলা মাছ !

এসব কথায় পূর্ণচন্দ্রের মনে বড় ব্যথা লাগে। তাই নাপিত ডেকে তাঁর চুল ছাঁটিয়ে দেওয়া হল। নন্দী ভৃঙ্গী বোঝালো যে ঘাড়ের কাছের চুল সব ছেঁটে ফেললে ঘাড়ে বাতাস লাগে, বুদ্ধি খোলসা হয়, সেইজন্যই কলকাতার সব বড় বড় বাবুদের ঘাড় ছাঁটা। বেশী চুল রাখতে হয় মাথার সামনের দিকে, সেটা হলো গিয়ে শোভা, যেমন মোরগের মাথার ঝুঁটি। পূর্ণচন্দ্রবাবুর পোশাক ছিল ফিনফিনে আটহাতি নতকলকা ধুতি, তার ওপর নবাবী আমলের খাজাঞ্চিদের মতন রেশমী বেনিয়ান আর পায়ে শুঁড়ওয়ালা নাগরা। এসব ছাড়িয়ে তাকে পরানো হলো দো-নলা প্যান্টালুন, লালদীঘির ধারের দোকানের আলপাকার চায়না কোট আর গরানহাটার ইংলিশ জুতো। মাথায় হাকিমী পাগড়ি। কোটের বুক পকেটে ওয়াচগার্ড সংবলিত ঘড়ি, হাতে হীরের আংটি এবং সর্বদা সঙ্গে রাখেন ফুকো-শিশি ভরা আতর। এই রূপে পূর্ণচন্দ্র ভব্য হলেন।

বাবুর জন্য সকলরকম কেনাকাটার কাজেই দালালরা দু দফা দস্তুরি পায়। কিন্তু সবচেয়ে বেশী দস্তুরি মেয়েমানুষে। এই বাসা বাড়ির খুব কাছেই অবিদ্যাদের আশ্রয়স্থল। অবশ্য এ শহরের কোথাই বা তারা নেই, সর্বত্রই তাদের অধিষ্ঠান। পূর্ণচন্দ্র এক জোড়া বড় সাদা ঘোড়া সমেত একটি ফেটিং গাড়ি কিনেছেন, সেই গাড়ি এক এক রাত্রে থামতে লাগলো এক এক বারবনিতার বাড়ি। ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত সুকুমারী নাম্নী এক অল্পবয়েসী বারবনিতার প্রতি তাঁর মন মজে গেল।

সুকুমারীর বয়েস উনিশ। চিকন পাতলা গড়ন, মেম-পারা গায়ের রঙ, মাথা ভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। সুকুমারীরা তিন পুরুষের বেশ্যা, তার মা চুনীবালা (ডাক নাম পোঁটা চুন্নি) সদ্য কাজ থেকে অবসর নিয়ে বাড়িউলি মাসি হয়েছে। সুকুমারীরও খুব পছন্দ হয়ে গেল পূর্ণচন্দ্রকে। মানুষটি বেশ আলাভোলা, যখন মদ খায় না তখন মিনমিন করে আর একটু মদ পেটে পড়লেই অন্য চেহারা। সন্ধ্যে হতে না হতেই ব্র্যাণ্ডি আর শ্যাম্পেনের স্রোত বইতে থাকে সুকুমারীর ঘরে। নন্দী আর ভৃঙ্গী চোঁ-চোঁ করে মদ গিলতে পারে এবং সহজে তারা বেহেড হয় না, তারা নানারকম সরেস গল্প বলে পূর্ণচন্দ্রের মন খুশী রাখে। ওদের খেইচি, গিইচি ধরনের কথার সব অর্থ বুঝতে পারেন না পূর্ণচন্দ্র, তবু শুধু কথা শুনেই হেসে গড়াগড়ি যান। নেশা বেশ খানিকটা জমে উঠলে পূর্ণচন্দ্র অধিকতর মজার জন্য পকেট থেকে পাঁচ দশ টাকা বার করে হুংকার দেন, নন্দী !

নন্দী অমনি বুঝতে পারে, টাকাগুলো হাত পেতে নিয়ে সুবোধ বালকের মতন পশ্চাদ্দেশটি ঘুরিয়ে বসে আর পূর্ণচন্দ্র সজোরে সেখানে লাথি কষান। তারপর ভৃঙ্গীর পালা। সত্যি, কী শুলুকই দিয়েছে ইব্রাহিম শেখ, এমন মজা আর হয় না।

সুকুমারীও এতে দারুণ আমোদ পায়। সে বলে, ওগো, আমায় ট্যাকা দাও, আমায় ট্যাকা দাও, আমিও নাতি মারবো !

ইঁদুরমুখো তবলা বাজনদারটি হাঁ করে চেয়ে থাকে। একদিন সে বলেই ফেললো, হ্যাঁ মোশাই, আপনাদের দেশে বুঝি নাথি মারবার লোক নেই ! সবাই সেখানে জমিদার ?

পূর্ণচন্দ্র বলেন, থাকবে না ক্যান ? কিন্তু নিজের দ্যাশে লাথ্থি মারায় সুখ নাই। আমার প্রজাগো আমি যারে খুশী লাথ্থি মারতে পারি, বাঁশ দিয়ে ডলাইতে পারি, পোঙায় হুড়কা দিতে পারি, কিন্তু হ্যারা হইল আমার প্রজা, হ্যারা তো টু শব্দও করবে না !

তবলা বাজনদারটি বলে, বুইচি, দৈনিক দু চারটি নাথি না মেরে আপনারা জলখাবার খান না। আমরা এখেনে অনেক বাবু দেকিচি, কিন্তু এসব নাথি-মারা বাবু আগে দেকিনি !

নন্দী বললো, এমন নাথি নাথি করছো কেন গা ? এ হলো গে হুজুরের স্নেহাশীর্বাদ।

ভৃঙ্গী বললো, তোর বুঝি হিংসেয় বুক জ্বলচে ? চুম্ মেরে থাক। তবলা চাঁটানো কাজ, তবলা চাঁটা !
সুকুমারী জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ গা বাবু, তোমাদের দেশে তো শুনিচি চারদিকে শুদু জল। তোমরা এ বাড়ি ও বাড়ি কী করে যাও ? সাঁতরে ?
নন্দী বললো, বাবু কত বড় বজরা এনেচেন, জানিস ? এই অ্যাত্তবড়, দুখানা বাড়ির সমান। বাবুর দেশে কত নৌকো, কত বজরা, বাবু সাঁতরে যাবেন কোন্ দুঃখে ?
ভৃঙ্গী বললো, চাদ্দিকে জল হলে কী হবে, তার মধ্যে বাবুর রাজপ্রাসাদখানি যেন ইন্দ্রের ঐরাবত !
পূর্ণচন্দ্র বললেন, ঐরাবত না তোমার মাথা ! আমার বাড়ি থিকা সাত মাইল দূরে ম্যাঘনা নদী, তাছাড়া সব দিক শুকনা। আমি জমিদারি দ্যাখতে ঘুরায় চইড়া যাই।
সুকুমারী জিজ্ঞেস করলো, ঘুরায় ?
পূর্ণচন্দ্র বললেন, হ্যা হ্যা, ঘুরা। ছুট ছুট ঘুরা। কিন্তু ছুট হইলে কী হয়, তাগৎ খুব ! ঠিক যেন পংখীরাজ !
ছুট ছুট ঘুরা, ছুট ছুট ঘুরা, এই কথা বলতে বলতে সুকুমারী হাসতে হাসতে গড়াগড়ি দেয়।
সুকুমারীর মা পোঁটাচুন্নি বসে থাকে পাশের ঘরে : মেয়ের ঘরে যখন বাবু থাকবে, তখন সে কক্ষনো সে ঘরে ঢুকবে না, এটাই নিয়ম। মোসাহেবরা মাঝে মাঝে মদের গেলাস ভরে হাত বাড়িয়ে পোঁটাচুন্নির দিকে এগিয়ে দেয়।
পোঁটাচুন্নি পাশের ঘর থেকে ফিসফিস করে বললো, অ সুকু, বাবুকে বল্ না একদিন বাজরায় করে আমাদের ঘুরিয়ে আনতে। কতদিন বাজরায় বসে হাওয়া খাওয়া হয়নি !
পূর্ণচন্দ্র শুনতে পেয়ে বললেন, কাইলই চলেন। মা, আপনে যখন কইতে আছেন, তখন হ্যায় আর কথা কী ! কাইল ক্যান, আইজ রাইতেই চলেন !
ইব্রাহিম শেখ বলে দিয়েছিল কসবীর মাকে মা বলে ডাকতে হয় সেটাই কলকাতার প্রথা, পূর্ণচন্দ্র তা ভুলে যায়নি। কিন্তু ঐ মা ডাক শুনে পোঁটাচুন্নি পাশের ঘরে বসে আধ হাত জিভ কাটে।
বাইরে কোনো একটা গোলমাল হতেই পূর্ণচন্দ্র সন্ত্রস্ত হয়ে বলে ওঠে, কেডা আইল, কেডা আইল ? বেহ্মজ্ঞানি নাকি ? অ্যাঁ ?
কলকাতায় এ পর্যন্ত বেহ্মজ্ঞানিদের সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু মনে মনে ভয় আছে এখনো। সঙ্গের দুজন লাঠিয়ালকে দাঁড় করানো আছে সুকুমারীর বাড়ির সদরে।
এর পর তিন চারদিন গেল বজরা সফরে। আমোদ-হুল্লোড় ঠিক যেমন হয়—তেমনই হলো পুরোপুরি, শুধু ছোট একটুখানি বৈচিত্র্য ঘটেছিল।
বজরার ছাদে বসে ব্র্যাণ্ডির নেশায় চুরচুর হয়ে হঠাৎ পূর্ণচন্দ্রের আবার লাথি মারার শখ জেগে ওঠায় যথারীতি নন্দী ও ভৃঙ্গী তৈরি হয়েছিল পেছন ঘুরিয়ে। কিন্তু ভৃঙ্গীর বেলায় লাথিটা এমন জোরে হয়ে যায় যে সে ছিটকে পড়ে গেল ভরা গঙ্গায়। কলকাতার লোক অনেকেই সাঁতার জানে না, ভৃঙ্গী বেচারা প্রাণেই মারা যেত, শেষ পর্যন্ত বজরার দুজন দাঁড়ি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বাঁচায়।

দিনের মনে দিন কাটতে লাগলো। পূর্ণচন্দ্রের যে টাকাকড়ি ফুরিয়ে আসছে, তার খেয়াল নেই। বৃদ্ধ নায়েব সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু তাকে আনলে ফুর্তির বাধা হবে বলে তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছে। মূর্খ পূর্ণচন্দ্র টাকাকড়ির হিসেবেও বোঝে না। সুকুমারীর নেশায় সে উন্মত্ত, দেশ থেকে টাকাকড়ি আনতে অনেক দেরি হয়ে যাবে বলে বজরাটি বেচে দেওয়া হলো !
পোঁটাচুন্নি আবার একদিন মেয়ের মারফত অনুরোধ জানালো, তার খুব কালীঘাট দর্শন করবার ইচ্ছে। বাবু দয়া করলেই তাদের কালীঘাটে যাওয়া হয়।
পূর্ণচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বললো, বিলক্ষণ। কাইল সকালেই যামু। নন্দী, ভৃঙ্গী সব ব্যবস্থা পাক্কা কইরা ন্যাও।
সুকুমারীদের পাড়ায় একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেল : কালীঘাট ভ্রমণের সুযোগ পাওয়া যায় না। সুকুমারী পূর্ণচন্দ্রের কাছে আবদার ধরে বললো, কালীঘাটে শুধু আমরা যাবো, আমার সই, মিতিন, গঙ্গাজল, মকর, চোকের বালি, মনের কালি, নয়নতারা এরা যাবে না ?
পূর্ণচন্দ্র বললেন, ক্যান যাবে না ? হক্কলডিই যাবে !
সুকুমারী পূর্ণচন্দ্রের গাল টিপে আদর করে বললো, ওরে আমার হক্কলডিরে ! ওরে আমার ক্যান রে ! এইজন্যই তোমায় আমার এত ভালো লাগে।

দেখা গেল, সব মিলিয়ে যাবার মানুষ আটচল্লিশ জন। নন্দী বললো, হুজুর, এটা আপনার একটা যোগ্য কাজ হয়েচে! তিথ্যিস্থানে বড় দঙ্গল না নিয়ে গেলে পাণ্ডারা বড় হ্যাটা করে।

ভৃঙ্গী বললো, বাবুর মন এত বড়, তিনি ছোট দঙ্গল নিয়ে যেতে পারেন কখনো? আমাদের বাবু কোনো কিছুতেই পেচপাঁও নন।

মেছোবাজারের আড়গড়া থেকে বেছে বেছে পনেরখানি ছ্যাকরা গাড়ি ভাড়া করে আনা হলো। যার যত ভালো ভালো শাড়ি গয়না ছিল, তাতে সেজেগুজে ছুঁড়ি ও বুড়ি বেশ্যারা পিলপিল করে বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে। নিজের ফিটনখানা পূর্ণচন্দ্র আগের দিনই বেচে দিয়েছেন, সুতরাং নিজেও একটি ভাড়া গাড়িতে সুকুমারী আর তার চোখের বালি ও গঙ্গাজলকে সঙ্গে নিয়ে উঠলেন।

কালীঘাট যেতে হলে নানাবিধ সরঞ্জাম লাগে। নন্দী আগেই একলা গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেছে, সেখানে গিয়ে একটি বাড়ি ভাড়া করে সব ব্যবস্থা করে রাখবে। ভৃঙ্গী এদিককার বাজার করে নিয়ে যাবে। রাধাবাজার থেকে কিনতে হবে মদের বোতল, বড়বাজার থেকে চাল ডাল, মেছোবাজার থেকে সাজিয়ে নিতে হবে গোলাপী ও ছাঁচী পানের খিলি, মোগলের দোকানের অম্বুরি তামাক।

যথাসময়ে শহর ছাড়িয়ে ওরা কালীঘাটের গ্রামে এসে পৌঁছোলো। গাড়ি থেকে নেমেই সুকুমারী খোঁজ করলো, মা কোতা? মায়ের গাড়ি এয়েচে? পূর্ণচন্দ্রও শশব্যস্ত হয়ে বললেন, মায়ের গাড়ি ঠিকঠাক আইছে তো? মায়ের কষ্ট হয় নাই তো!

পোঁটাচুন্নি পাখা দিয়ে বাতাস খেতে খেতে সদ্য ভাড়া করা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বললো, এই তো আমি। এসো বাছা, প্রথমে বসে একটু বিচ্ছাম নাও।

অনেক দূরের পথ, গাড়িতে বসে আসায় বেশ পরিশ্রম হয়েছে। সুকুমারী বিবি রুমালে মুখ রগড়ে রগড়ে মুখ একেবারে লাল করে ফেললে। নন্দী একটা গেলাসে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে তাতে সোডা ওয়াটার মিশিয়ে ধরলে সুকুমারীর মুখের কাছে। বিবি অমনি চটে উঠে বললো, তোমরা সহবত শেকোনি গা? মিতিন, মকর, গঙ্গাজল এরা সব রয়েচে, তাদের না দিয়ে তুমি প্রথমেই আমাকে দিলে? নিজেরা আগে টেনে বসে আচো, বাবুর যে গলা শুকোচ্চে, সে খেয়াল নেই?

কালীঘাটে এসে এক দণ্ড বাইরে তিষ্ঠোবার উপায় নেই। পাল পাল কাঙালী এসে ছেঁকে ধরে। এ ছাড়া পুজুরি বামুন, রাঁধুনি বামুন, আরও হাজার রকমের উমেদার। কেউ খ্যাংরা-গুঁপো, কেউ গামছা-কাঁধে, কেউ ধামা-মাথায়। চতুর্দিকে একেবারে চিলুবিলু অবস্থা। বড়বাজারের দোকানে পাকানো পৈতে বিক্রি শুরু হবার পর শহরে বামুন খুব বেড়ে গেছে, কালীঘাটে এখন কাঙালী বেশী না বামুন বেশী, তা বোঝা ভার।

দোতলায় কার্পেট বিছানো ঘরে এসে বসে পূর্ণচন্দ্র একটু জিরোতে লাগলেন। সুকুমারীর সইয়েরা বাতাস করতে লাগলো তাঁকে। নন্দী ভৃঙ্গী এসে সুরার গ্লাস তুলে দিল হাতে। পোঁটাচুন্নি দরজার আড়াল থেকে মৃদু ভর্ৎসনা দিয়ে বললো, অ সুকু, এসেই তোরা টানতে বসে গিলি? পুজো আচ্চার ব্যবস্থা করতে হবে না!

নন্দী বললো, পুজো তো ওব্‌লা? এখন কী? এব্‌লা পাঁচটা উনুন ধরিয়েচে।

পোঁটাচুন্নি বললো, ওমা, সে কি কতা! মন্দিরের ঘণ্টা শুনতে পাচ্চি, আর ও পোড়োরমুখো বলে কি না পুজো ওব্‌লা? কালীঘাটে এসে আগে পুজো দিতে হয়, তার পর অন্য কিচু।

ভৃঙ্গী বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুজোর ব্যবস্থা করচি। আমি বামুন পাণ্ডা ধরে আনচি।

ভৃঙ্গী বাইরে থেকে কোরা থান পরা, পৈতের গোছা গলায়, মাথায় মস্ত টিকি, খড়ম পায়ে একজন বেশ বিশ্বাসযোগ্য চেহারার বামুনকে ডেকে আনলো। পোঁটাচুন্নি বললো, ওমা, কী হবে! আসবার সময় আমি যে তাড়াতাড়িতে সিন্দুক খুলেও টাকা বার করতে ভুলে গ্যাচি! আমি যে পুজো মানত করেচিলুম, কী করে পুজো দেবো?

পূর্ণচন্দ্র বললেন, একথা বলে বড় লইজ্জা দিলেন মা। আমার টাকাও যা, আপনের টাকাও তা। এই ন্যান, কত লাগবে?

পকেট থেকে কুড়ি পঁচিশ টাকা যা ওঠে তাই পূর্ণচন্দ্র দিয়ে দিলেন নন্দীর হাতে। নন্দী তার থেকে পাঁচ টাকা সরিয়ে বাকিটা দিল পোঁটাচুন্নিকে। পোঁটাচুন্নি আবার তার থেকে বেশ কিছু সরিয়ে মোট সাতটি টাকা দিল বামুনকে। তাই পেয়েই বামুনের এক গাল হাসি। দুটো ছোট গোছের পাঁঠা, দু' সরাতে আধসেরটাক চিনি, একছড়া মন্দির বেড়া জবাফুলের মালা, কুনকেটাক আলো চাল, গোটা দশেক কাঁঠালি কলা, একটু ঘি, একটু সিঁদুর—সব মিলিয়ে মোট আড়াই টাকার জিনিস কিনে মন্দিরে

গিয়ে পুজো চড়িয়ে এলো।

এদিকে ভাড়া বাড়ির একতলায় বড় বড় উনুনে খিচুড়ি তৈরি হচ্ছে, আর দোতলায় বোতলের পর বোতল উড়ছে। বোতল শুধু ওড়ে না, একসময় গড়ায়, তখন মানুষগুলোও গড়ায়। একজন গড়ালে অন্যজন তাকে টেনে তোলবার চেষ্টা করে, তারপর সেও গড়িয়ে যায়। কালীঘাটে এসে এতটা বাড়াবাড়ি পোঁটাচুন্নির পছন্দ হচ্ছে না ; তার বয়েস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মে মতি হয়েছে। সে এসে মাঝে মাঝে বকুনি দিয়ে যাচ্ছে ওদের। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সুকুমারীর সইরা সব এক একজন মোসাহেবের পাশে বসে গলা জড়াজড়ি করছে। নন্দী আর ভৃঙ্গী মাঝে মাঝে বলে উঠছে, ওফ্, এত ফুর্তি বহুত দিন হয়নি। ধন্য আমাদের পূর্ণচন্দ্রবাবু !

রান্না শেষ, নীচতলার চাতালে জল ছিটিয়ে পাত পাড়া হয়ে গেছে, কিন্তু কে খেতে যাবে ? ওপরের বাবু বিবিদের খাওয়ার কথায় হুঁশ নেই। কেউ ডাকতে এলেও তারা দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। চাকর-নফর, পাইক আর অন্যরা গাণ্ডেপিণ্ডে গিলতে লাগলো গরম খিচুড়ি, রুই মাছের কালিয়া, পাঁঠার পোলাও, আলুর দম, হাঁসের ডিম, তালদা বাঁশের চোঙায় জমিয়ে ধোঁকা। বেলা গড়িয়ে বিকেল পড়ে এলো।

মদের বোতল সব শূন্য, তবু পূর্ণচন্দ্রের তৃষ্ণা মেটেনি। এলানো অবস্থায় সে বললো, কই বাপ নন্দী, কই বাপ ভৃঙ্গী, গেলাস যে খালি। শ্যাম্পেন কার্ক খোলার ফটাফট মধুর আওয়াজও বন্ধ। কী হইলো তোমাগো ?

নন্দী বললো, হুজুর টাকা দিন !

পূর্ণচন্দ্র বললেন, টাকা চাই ? কত টাকা ?

এবার পোঁটাচুন্নি সত্যিকারের রেগে গিয়ে বললো, হ্যাঁ গা, কী আক্কেল তোমাদের ? কাঁড়ি কাঁড়ি রান্না হলো, কিছু খেলে না। গঙ্গায় নাইলে না, মায়ের দর্শন করলে না, এ কেমন ধারা ব্যাভার ? সন্ধ্যে হয়ে এলো। আগে দুটি খেয়ে নাও !

পূর্ণচন্দ্র বীরবিক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, না খামু না ! মায়ের দর্শন করতে যামু। উপাস কইরাই পূজা দিতে হয়, তয় তো পুইণ্য হবে ! আগে মায়ের দর্শন, তারপর অইন্য কথা ! চলো, সুকুমারী !

সুকুমারী দু পা চলতে গিয়েই লুটিয়ে পড়ে গেল। একেবারে জ্ঞানহারা। তাকে একটুক্ষণ টানাটানি করেও কোনো সুবিধে হলো না। পোঁটাচুন্নি বললো, থাক, ওকে ছাড়ো, ওর আর ক্ষ্যামতা নেই।

পূর্ণচন্দ্রের মনে একটা আঘাত লাগলো। এত দূর এসেও সুকুমারী তার সঙ্গে মন্দিরে যাবে না ? এত খরচাপাতি করে মেয়েমানুষ রেখে তাহলে লাভ কী হল ? পূর্ণচন্দ্রের মস্তিষ্কের নেশাগ্রস্ত যুক্তিতে মনে হলো যে সুকুমারী যেন ইচ্ছে করেই ভিরমি খেয়ে পড়ে আছে। দু-একবার সে তাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সুকুমারীর মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে।

তখন পূর্ণচন্দ্র বললেন, তয় আমি একলাই যামু।

সিঁড়ি দিয়ে দুপ দাপ করে তিনি নেমে এলেন। নন্দী, ভৃঙ্গী এলো সঙ্গে সঙ্গে। নীচতলার লোকগুলো নেশা করেনি বটে কিন্তু প্রচণ্ড রকম খিচুড়ি মিচুড়ি খেয়ে পেট মোটা করে শুয়ে আছে। লাঠিয়াল দুজন ঘুমন্ত। পূর্ণচন্দ্র ওদের আর ডাকলেন না। রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলেন ভিড় ঠেলে। পা দুটি টলমল করলেও তাঁর শরীরে যেন মত্ত মাতঙ্গের শক্তি। নন্দী, ভৃঙ্গী কাঙালীদের হঠাতে লাগলো।

পূর্ণচন্দ্র মন্দিরে এসে উঠলেন। হঠাৎ তাঁর মনটা বিষাদে ভরে গেছে। মনে পড়েছে স্বর্গগতা জননীর কথা। মায়ের মৃত্যুশয্যার অনুরোধেই কালীঘাট দর্শনের জন্য কলকাতায় আসা। অথচ এতদিনে কালীঘাট দর্শনের কথা মনেও পড়েনি। সেই কালীঘাটে আসতে হলো কিনা সুকুমারীর কথায় ! আর সে বেশ্যামাগীও এমন নিমকহারাম, শেষ পর্যন্ত সঙ্গে এলো না !

পূর্ণচন্দ্র চেঁচিয়ে উঠলেন, মা, মা, আমি তোমার কুপুত্র। আমি মহাপাতকী।

মন্দিরের পুরুতরা চেহারা ও বেশবাসের চাকচিক্যে পূর্ণচন্দ্রকে একজন বেশ বড় গোছের বাবু

ঠাউরে অন্য লোকজনদের সরিয়ে সাগ্রহে বলতে লাগলো, আসুন, আপনি সামনে আসুন। আপনার গোত্র কী?

পূর্ণচন্দ্র এগোতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন। আর অমনি মুখ দিয়ে হড়হড়িয়ে বমি বেরিয়ে এলো। তাতে অসহ্য দুর্গন্ধ। পুরোহিতরা চেঁচিয়ে উঠলো, দিলে দিলে, সব কিছু নষ্ট করে দিলে। কী আপদ! এ মাতালকে সরাও!

নন্দী, ভৃঙ্গী হাত ধরে তুলে দাঁড় করালো পূর্ণচন্দ্রকে। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বিড়বিড় করে বারবার বলছেন, আমি মহাপাতকী, মহাপাতকী! ওগো, আমার মা কী যেন মানত কইরাছিল, তোমাগো মনে আছে?

নন্দী ভৃঙ্গী বললো, হুজুর, আপনার মায়ের মানত আমরা জানবো কী করে!

পূর্ণচন্দ্রের দারুণ কষ্ট হচ্ছে, কিছুতেই একটা কথাও মনে আসছে না।

পুরুতরা বললো, দক্ষিণা যা দেবার দিয়ে একে এবার এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও না!

দক্ষিণার কথা শুনে পূর্ণচন্দ্র পকেটে হাত দিলেন। পকেট শূন্য। অসহায়ভাবে ঘোলাটে চোখে নন্দী আর ভৃঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, টাকা? আমার টাকা নাই? তোমরা আমারে টাকা দেবা? আমি মায়ের দক্ষিণা দিতে পারমু না?

নন্দী, ভৃঙ্গী বললো, হুজুর, আমরা ট্যাকা পাবো কোথায়? আমাদের কি ট্যাকা থাকে?

হাত থেকে হীরের আংটিটা খুলে প্রণামীর থালার ওপরে ছুঁড়ে দিলেন পূর্ণচন্দ্র। তারপর ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন। নন্দী, ভৃঙ্গী ওঁকে ধরাধরি করে চত্বরে নিয়ে এলো।

একটু সামলে পূর্ণচন্দ্র বললো, আমি আর এ মাগীগো কাছে যামু না। আমি বাড়ি যামু। আমার দ্যাশে যামু। আমারে গঙ্গার ধারে নিয়ে চলো, আমি গঙ্গাস্নান কইরা শুদ্ধ হমু।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এখন আর স্নানটানের ঝামেলায় নন্দী, ভৃঙ্গী যেতে চায় না। তারা অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু অতিশয় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পূর্ণচন্দ্র বোধশক্তিহীন গোঁয়ার হয়ে গেছেন। তিনি যাবেনই স্নান করতে।

অগত্যা নন্দী আর ভৃঙ্গী ওঁকে নিয়ে চললো টানতে টানতে। পূর্ণচন্দ্রের আর চলার শক্তি নেই, চেতনাও আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। গঙ্গার একেবারে কাছাকাছি এসে আর পারলেন না, একেবারে পাথর হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। আদি গঙ্গার ঢালু পাড়ে তার মাথাটা নীচের দিকে ঝুলে রইলো।

নন্দী ভৃঙ্গীকে বললো, থাক, এখানেই পড়ে থাক। এ ব্যাটা ছিবড়ে হয়ে গ্যাচে!

ভৃঙ্গী বললো, দ্যাক না, ট্যাঁকে কিছু নুকোনো আচে কিনা!

দুজনে হাঁটু গেড়ে বসে ভালো করে পূর্ণচন্দ্রের ট্যাঁক ও পকেট পরীক্ষা করে দেখলো। না, আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সুতরাং এর জন্য আর সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না ভেবে চলে যেতে গিয়েও দুজনে আবার থমকে দাঁড়ালো। দুজনের মনে একই কথা এসেছে। ব্যাটার জামাকাপড়গুলোও তো দামী, সেগুলিই বা বাদ থাকে কেন? কাছে ফিরে এসে ওরা পূর্ণচন্দ্রের সমস্ত পোশাক খুলে নিল। পায়ের জুতো জোড়া পর্যন্ত। সব কিছু নিয়ে একটা পুঁটলি বেঁধে উঠে দাঁড়ালো দুজনে।

আবার ওরা চোখাচোখি করলো। ঠিক একই কথা আবার দুজনের মনে এসেছে। দুজনে দুপাশে সরে গিয়ে পূর্ণচন্দ্রের নগ্ন নিতম্বে সপাটে লাথি কষালো কয়েকবার।

পাঁচ বৎসর বয়েসে, সরস্বতী পূজার দিনে নবীনকুমারের হাতেখড়ি হলো। এই উপলক্ষে বেশ ধুমধাম হলো সিংহ সদনে।

বিম্ববতীর পিত্রালয়ের কারুর শিক্ষার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর শ্বশুর স্বামীও বিদ্যাচর্চা না করেও প্রভূত বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু বিম্ববতীর দত্তকপুত্র গঙ্গানারায়ণ প্রধানত স্বীয়

যত্নে আজ কৃতবিদ্য এবং এই বিদ্যার গুণে সে বিনয়ী, সুশীল ও ধীরস্থির। গঙ্গানারায়ণকে প্রীতি করে না, এমন কেউ নেই। বিম্ববতী পুত্রগর্বে গর্বিত এবং গঙ্গানারায়ণের চরিত্রের ক্রম পরিণতি দেখেই তিনি বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে আকৃষ্ট হয়েছেন।

হিন্দু কলেজের পাঠ সমাপ্ত করে গঙ্গানারায়ণ এখন বিধুশেখরের নির্দেশ মতন পারিবারিক ব্যবসায় ও জমিদারির কাজে শিক্ষিত হচ্ছে। রামকমল সিংহ তো সব দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন, কমলাসুন্দরীকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন উত্তরভারত পরিভ্রমণে, গত পাঁচ মাস তাঁর কোনো সংবাদই নেই। যত দূর জানা যায়, তিনি বারানসীতে এক বিশাল প্রাসাদ ভাড়া নিয়ে নৃত্যগীতের আসরে মত্ত হয়ে আছেন।

বিম্ববতী দেখেছেন, কর্তাদের ধারা কিছুই বর্তায়নি গঙ্গানারায়ণের ওপরে। সে সুরা পান করে না। সন্ধ্যার পর জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে গৃহ থেকে নির্গত হয়ে ভোররাত্রে বাড়ি ফেরার যে রীতি, গঙ্গানারায়ণ তেমনটি করেনি একদিনও। যথা সময়ে অফিস দেখতে যায় এবং সন্ধ্যার পর বিদ্বান বন্ধুদের সঙ্গে নানাপ্রকার তর্কে মেতে থাকে। এ গৃহের মজলিশকক্ষে এখন আর নূপুরের নিক্কন কিংবা বোতল-গেলাসের ঠনৎকার শোনা যায় না, বরং গঙ্গানারায়ণের বন্ধুরা সেখানে নানা রকম কেতাব থেকে উচ্চৈকণ্ঠে পাঠ করে পরস্পরকে শোনায়।

বিধুভূষণও গঙ্গানারায়ণের ওপরে খুব সন্তুষ্ট। হিন্দু কলেজে পাঠ নিয়েও সে ফিরিঙ্গি বনে যায়নি কিংবা দেবেন্দ্র ঠাকুরের হুজুগে দলে গিয়ে ভেড়েনি। তাছাড়া ইতিমধ্যেই দুবার জমিদারি মহল পরিদর্শন করতে গিয়ে সে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে এবং সুবন্দোবস্ত করে এসেছে।

বিম্ববতী চান, নবীনকুমারও তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অনুসরণ করুক। কর্তারা যা বিষয়-বৈভব করে গেছেন, তাতে এদের সাত পুরুষ বিনা পরিশ্রমে চালিয়ে যেতে পারবে। সুতরাং বিষয় না দেখে যদি শুধু বিদ্যাচর্চা কিংবা ধর্মানুশীলনেও মেতে থাকে তাতে অন্তত সংসারের শান্তি আসবে। দুই ভ্রাতায় খুব ভাব। নবীনকুমারের জন্মের পর যে শঙ্কা বিম্ববতী ও তাঁর স্বামীর মনে জেগেছিল, তা অমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে। গঙ্গানারায়ণ তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিশয় ভালোবাসে। আর নবীনকুমারও যতই দুরন্তপনা করুক, সে গঙ্গানারায়ণের খুবই বশবর্তী এবং এক একদিন সে গঙ্গানারায়ণের বন্ধুদের তর্কসভায় গিয়ে চুপটি করে বসে থাকে।

নবীনকুমারের শিক্ষা সম্পর্কে বিম্ববতী বিধুশেখরের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। এ গৃহে বিধুশেখর নিত্য আসেন এবং পরপুরুষদের মধ্যে একমাত্র সরাসরি বিধুশেখরের সঙ্গেই কথা বলেন বিম্ববতী। যখন নবম বর্ষীয়া কন্যা, সেই সময় নববধূ হয়ে এই বাড়িতে এসেছিলেন বিম্ববতী, আজ তাঁর বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর, এই সুদীর্ঘকাল কত সুখ-দুঃখের কথা হয়েছে বিধুশেখরের সঙ্গে। গত কয়েক বৎসর তো স্বামীর সঙ্গে বিম্ববতীর প্রায় দেখাই হয় না। তা নিয়ে অবশ্য কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন না বিম্ববতী, কারণ, যেটুকু সময় রামকমল সিংহ গৃহে থাকেন, তখন তিনি যেন বিম্ববতীর দাসানুদাস। গদ্‌গদ কণ্ঠে বলেন, বিম্ব, তুমি আমার লক্ষ্মী, তুমিই আমার জগদ্ধাত্রী, তোমার জন্যই আমার এত সব হয়েচে। তুমি যদি রাগ করো তো বলো, আমি বাড়ির বাইরে এক পা যাবো না। তবে, আমায় আর বিষয় দেখতে বলো না! আর যে ক'টা দিন বেঁচে আচি··· ! সঙ্গে সঙ্গে বিম্ববতী বলেন, ওগো, না, না, তোমার যা মন চায় তাই তুমি কর্বে···।

বিধুশেখরের মত এই যে, নবীনকুমার গৃহেই বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে বিদ্যাভ্যাস করুক। সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে সে ইংরাজীও শিখবে বইকি, কিন্তু সেজন্যে তাকে সাহেব শিক্ষকদের স্কুলে পাঠাবার দরকার নেই। আজকাল ভদ্র ঘরের অনেক যুবকও ইংরাজী শিখেছে, গঙ্গানারায়ণের বন্ধুদের মধ্যেও তো দু-একজন গরীব অথচ মেধাবী ছাত্র আছে, তাদেরই কারুর ওপর ভার দেওয়া যেতে পারে। বিম্ববতীর তাতে কোনো আপত্তি নেই।

হাতেখড়ির দিন দীক্ষাচার্য হিসেবে বিধুশেখর তিনজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে আনাবার ব্যবস্থা করলেন। আজকাল অবশ্য প্রকৃত ব্রাহ্মণ খুঁজে পাওয়া ভার। পয়সার লোভে অনেক ব্রাহ্মণই বিবেক ধর্ম বিসর্জন দিয়ে ধনীদের খোসামোদ করে।

সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী বাবু রসময় দত্ত বিধুশেখরের বন্ধুস্থানীয়। বাঙালী বা ভারতীয়দের মধ্যে বোধ হয় তিনিই সর্বোচ্চ সরকারি কর্মে নিযুক্ত, তাঁর বেতন নব্বুই টাকা। সাহেবদের কাছে রসময় দত্তের খুব প্রতিপত্তি। কিন্তু রসময় দত্ত ব্রাহ্মণ নন, তাঁকে আচার্য করা যায় না। সুতরাং ঐ কলেজেরই অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী বৃদ্ধ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারকে একজন আচার্য হিসেবে মনোনয়ন করলেন

বিধুশেখর। রসময় দত্তই বললেন, আর একজনের কথা, তাঁর নাম দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মানুষটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিধুশেখর মুগ্ধ হলেন। দুর্গাচরণ সত্যিই বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ, ইংরাজী ও সংস্কৃত দুই ভাষাতেই বিশেষ দক্ষতা আছে, এক সময় হেয়ার সাহেবের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, তারপর হঠাৎ শিক্ষকতা ছেড়ে মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হলেন। চিকিৎসাবিদ্যা উত্তমরূপে শিক্ষা করার পর তিনি দুঃস্থ-আতুর মানুষদের চিকিৎসায় সাহায্য দেন। আবার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড রাইটার হিসাবেও নিযুক্ত। ইংরাজদের শিক্ষা-বিজ্ঞান আহরণ করেও এঁর চালচলন খাঁটি দেশীয়দের মতন, এই প্রকার মানুষই বিধুশেখরের পছন্দ। এই দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকেন তালতলায়, তাঁর বাড়িতেই বিধুশেখরের পরিচয় হলো আর একজনের সঙ্গে। এঁকেই তিনি তৃতীয় আচার্য হিসেবে মনোনীত করে ফেললেন। ইনি মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণ, বয়েসে যুবক এবং বিশিষ্ট পণ্ডিত হিসেবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুকাল আগে সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদ্যাসাগর পদবী পেয়েছেন, ইদানীং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের কাজ করেন। যুবকটির চেহারা কদাকার। কিন্তু মুখমণ্ডলে আত্মাভিমানের ছাপ প্রকট।

বিধুশেখরের সঙ্গে পরিচয় হতেই ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, মহাশয়কে আমি বিলক্ষণ চিনি। আপনার স্মরণ নাই, কিন্তু আপনার বাড়িতে গিয়ে একদিন এমন ভূরিভোজ খেতে হয়েছিল যে আজও সেকথা মনে এলে আতঙ্ক হয়। সে আপনার এক কন্যার বিবাহের সময়, আমাদেরই এক সতীর্থ আপনার জামাতা। বরযাত্রীদের খাওয়াইয়ে খাওয়াইয়ে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টাই বুঝি আপনাদিগের রীতি?

বিধুশেখর উচ্চহাস করে উঠেছিলেন।

কিছুক্ষণ রঙ্গালাপের পর বিধুশেখর অত্যন্ত বিনয় সহকারে বলেছিলেন, পণ্ডিতপ্রবর, এই বাগদেবীর পূজায় যদি আমার বন্ধু রামকমল সিংহের গৃহে পদধূলি দেন, তবে আমি ধন্য হই! বন্ধুর একটি পঞ্চম বর্ষীয় সুলক্ষণ পুত্র আছে, সে আমারও পুত্রবৎ, আপনারা সেইদিন তাহাকে আশীর্বাদ কল্লে সে জ্ঞানপথের পথিক হতে পারে।

দুর্গাচরণ বললেন, সেদিনও ভূরিভোজনের ব্যবস্থা থাকবে তো?

ঈশ্বরচন্দ্র বন্ধুকে বললেন, ঔদরিক! অমনি বুঝি নোলা শক শক করে উঠলো?

দুর্গাচরণ বললেন, ভাই, বামুনের ছেলে উত্তম আহারের সম্ভাবনা দেখলে চাঞ্চল্য ঘটবে না, একি একটা কথা হলো? বংশের অবমাননা হবে যে!

ঈশ্বরচন্দ্র বিধুশেখরকে বললেন, এই উপলক্ষে বামুন পণ্ডিত ডাকছেন যখন, তখন শাল দোশালা বিদায় দেবেন নিশ্চয়?

বিধুশেখর বললেন, আজ্ঞে, সে তো আমাদের প্রথাই রয়েচে!

ঈশ্বরচন্দ্র আবার বললেন, আর সোনাদানা?

দুর্গাচরণ হাসতে হাসতে বললেন, ঈশ্বর, তুমি বোধ হয় জানো না, রামকমল সিংহী কত বড় ধনী। তেনার মনটাও খুব খোলসা শুনিচি! সোনাদানা দিয়ে তোমায় ভরিয়ে দেবেন।

বিধুশেখর বললেন, আমি এইটুকু বলতে পারি, আপনাদের কোনো প্রকার অসম্মান হবে না। আমার বন্ধু আপনাদের মর্যাদার যোগ্য জিনিসই দেবেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, দত্ত মহাশয়, দুর্গাচরণবাবু অতিশয় পরিহাস-প্রবণ। তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছাড়া কথা কইতে পারেন না। সেইজন্যই আমার বিষয়টি আমি স্পষ্টাক্ষরে বলি। আপনার বন্ধুপুত্রের হাতেখড়ির সময় উপস্থিত থাকতে রাজি আছি, কিন্তু আমার কিছু শর্ত আছে। সোনা-দানা, শাল-দোশালা দূরে থাক, গুরুদক্ষিণা হিসাবেও আমাকে একটি পাইপয়সা দিতে পারবেন না। আমি পঞ্চাশ টাকা বেতন পাই, তাতেই আমার সংসার অতি উত্তমরূপে চলে যায়। কাহারো কাছ থেকে দান গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না।

বিধুশেখর অভিভূত ভাবে নির্বাক হয়ে রইলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র আবার বললেন, দুর্গাচরণবাবুকেও আমি যথেষ্ট চিনি। উনি বেতন পান আশি টাকা, উঁহারও দান গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখি না। সুতরাং আমরা কিছুই লবো না, এই শর্তে যদি রাজি থাকেন, তবে আমরা যেতে পারি। এই উপলক্ষে যদি অর্থ ব্যয় করতে চান, তবে কিছু দুঃস্থ ছাত্রকে সাহায্য করুন, সেটা কাজে দেবে।

বিধুশেখর বললেন, আপনাদের যা অভিপ্রায়, সেই মতই হবে।

দুর্গাচরণ বললেন, ঈশ্বর, তুমি 'আমরা' 'আমরা' বলে ঠিক করলে না। তুমি নিজে কিছু গ্রহণ করতে

চাও না, বুঝলাম ! আর আমার সম্পর্কেও সটান এমন বলে দিলে যে ইচ্ছে থাকলেও আমি চক্ষুলজ্জায় আর কিছু নিতে পারবো না ! কিন্তু উনি রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারকেও আচার্য করেছেন, তাঁকে কেন বঞ্চিত করো, সে বুড়োর যথেষ্ট লোভ আছে আমি জানি। তাছাড়া, বিদ্যালঙ্কারের মস্ত বড় সংসার, কতদিন আর চাকরি করতে পারবেন তার ঠিক নেই । তাঁর অর্থের প্রয়োজন আছে । আমি বলি কী, ইঁহারা আমাদের তিনজনকে যা দেবেন স্থির করেছিলেন, তার সবটাই বিদ্যালঙ্করকে দিন না কেন !

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, এটা একটা ভারী কাজের কথা বলেছেন । তবে তেমনই করুন । কিন্তু কিছু দুঃস্থ ছাত্রকে সাহায্য করার কথাও ভুলবেন না।

বিধুশেখর বুঝলেন, তিনি যোগ্য ব্যক্তিদের কাছেই এসেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র আবার বললেন, আর একটি কথা । আমি দুগ্ধ জাতীয় কোনো খাদ্য খাই না । মাছ-মাংসও পরিত্যাগ করেছি । আপনার গৃহে শুধু ফলাহার করবো । অধিক কিছু খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না । আপনাদের মতন বড় মানুষদের গৃহে একদিন আহার করলে পেটের পীড়া সারাতে এক বৎসর লেগে যায় ।

দুর্গাচরণ বিধুশেখরকে বললেন, মহাশয়, এই ব্যাপারে কিন্তু আমি ঈশ্বরের সঙ্গে একমত নই । আমি পেটুক মানুষ, লুচি মণ্ডাতে আপত্তি নেই ।

মহাসমারোহে সরস্বতী পূজা সম্পন্ন হয়ে গেল । বাহির মহলের উঠানে শামিয়ানা খাটিয়ে সেখানে সব ব্যবস্থা হয়েছে । রামকমল সিংহ উত্তর ভারত থেকে এখনো ফেরেননি, গত সপ্তাহেই তাঁর এক দূত এসে আবার এককাঁড়ি টাকা নিয়ে গেছে, সুতরাং সব দায়িত্ব বিধুশেখরের একার । অচেনা যে-কেউ ভাববে তিনিই এ বাড়ির কর্তা ।

তিন ব্রাহ্মণ পাশাপাশি বসেছেন মখমলের আসনে । বালক নবীনকুমারকে সকাল থেকে উপবাসী রেখে, স্নান করিয়ে, কোড়া পট্টবস্ত্র পরিয়ে নিয়ে আসা হলো তাঁদের সামনে । প্রথমে রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার নানা প্রকার মন্ত্রোচ্চারণ করে আশীর্বাদ করলেন তাকে । অধিকাংশ দাঁত নেই, বৃদ্ধ একেবারে ফোকলা, তাই কোনো কথাই প্রায় বোঝা যায় না ।

তারপর দুর্গাচরণও নবীনকুমারের মস্তক স্পর্শ করে কয়েকটি মন্ত্র পড়ে আশীর্বাদ করলেন । নবীনকুমারের কোনো রূপ আড়ষ্টতা নেই । সে তার অস্বাভাবিক তীব্র চোখ মেলে দেখছে ওঁদের । দুর্গাচরণ বললেন, এ বালকের মুখে প্রতিভার জ্যোতি আছে ।

আচার্যদের যে প্রণাম করতে হয়, সেটা নবীনকুমারকে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না । দু'পাশ থেকে গঙ্গানারায়ণ আর বিধুশেখর বারংবার বলছেন, প্রণাম কর । পণ্ডিতমশাইদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর ! নবীনকুমার মুখ ফিরিয়ে শুধু তাকাচ্ছে, সে যেন জানেই না প্রণাম কাকে বলে । শেষ পর্যন্ত গঙ্গানারায়ণ তার হাত ধরে আচার্যদের পায়ে ছোঁয়ালো ।

ঈশ্বরচন্দ্র কোনো সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করলেন না । তিনি বললেন, আসল হাতেখড়িই তো হলো না । খড়ি কই ? শ্লেট কই ?

শ্লেট-পেন্সিল ও কয়েকখানি পুস্তক সরস্বতী মূর্তির পায়ের কাছে রাখা ছিল, সে সব পুষ্পস্তবকের নীচে চাপা পড়ে গেছে । পুরোহিত সেগুলি হাতিয়ে বার করলেন ।

ঈশ্বরচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে টেনে নিয়ে কোলে বসিয়ে বললেন, তোমার মুক্তার মতন হস্তাক্ষর হোক । এসো দিকি, আমরা দুজনে মিলে একটু লিখি ।

বালকের হাতে পেন্সিল ধরিয়ে দিয়ে নিজেও তার হাতটি চেপে ধরলেন । তারপর বললেন, প্রথমে ওপর থেকে নীচে এই একটা সোজা দাগ । এই, এই ! তারপর বাম দিকে তেকোণা করে দুটো দাগ । এই, এই, এই ! এবার কী হলো ? ঘুড়ি দেখেছো তো ? ছেলেরা মাঠে যে ঘুড়ি ওড়ায় ? এই হলো একটা ঘুড়ির অর্ধেক, তাই না, এবার ডানদিকে একটা শুণ্ডি, এই ! এবার কী হলো ? এর নাম ক !

নবীনকুমার বললো, ক !

দুর্গাচরণ বললেন, ও কি, ঈশ্বর, আগে অ আ না লিখিয়ে প্রথমেই ব্যঞ্জনবর্ণ ধরালে ?

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, ওতেই হবে । প্রথম দিন কিছু একটা লিখলেই হয় । অ-এর চেয়ে ক লেখা বালকদের পক্ষে সহজ ।

নবীনকুমার বারবার বলতে লাগলো, ক, ক, ক, ক !

তারপর ঈশ্বরচন্দ্র তার হাত ছেড়ে দিতেই সে নিজের শ্লেটের ওপর আঁকিবুঁকি কাটতে লাগলো ।

ঈশ্বরচন্দ্র দারুণ বিস্মিত হয়ে বললেন, এ কী ? এ বালক কি আগেই লেখা অভ্যেস করেছে ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, না তো !

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, এ তো ক লিখতে জানে ! এই যে একটা লিখেছে।

অপর দুই ব্রাহ্মণও শ্লেটের ওপর উঁকি দিলেন। সত্যিই তো, ঈশ্বরচন্দ্র যে ক লিখে দিলেন, নবীনচন্দ্র তার পাশে আর একটি ক লিখে ফেলেছে। যতই আঁকাবাঁকা রেখা হোক, তবু ক বলে চেনা যায়। প্রথম দিনেই এমন লেখা কোনো বালকের পক্ষে সম্ভব নয়।

বিধুশেখরও শ্লেটখানি তুলে নিয়ে দেখলেন। চারপাশে আরও অনেকে ভিড় করে এলো। দূরে চিকের আড়ালে রয়েছেন বিম্ববতী এবং অন্য রমণীরা।

ঈশ্বরচন্দ্র শ্লেটটা ফেরৎ নিয়ে বললেন, দেখি, দেখি, আর একটা লেখো তো !

কোনো আপত্তি নেই, বালক আবার লিখে দেখালো।

ঈশ্বরচন্দ্র বাঁ হাতের চেটো দিয়ে শ্লেটটা একেবারে মুছে ফেলে বললেন, আর একবার লেখো তো ! কী সুন্দর ছেলে ! আর একবার লেখো !

এবারে সকলেরই একেবারে স্তম্ভিত অবস্থা। নবীনকুমার সেই শূন্য শ্লেটে, কিছু না দেখেই আবার ক লিখেছে।

দুর্গাচরণ প্রশ্ন করলেন, আপনারা সত্যি জানেন, এ বালক আগে লিখতে শেখেনি ?

গঙ্গানারায়ণ ও বিধুশেখর দুজনেই বললেন, আজ্ঞে, না। হাতেখড়ির আগে কেউ কি লেখাপড়া শেখায় ?

দুর্গাচরণ এবার নিজে শ্লেটটা নিয়ে ইংরেজি এ আর বি অক্ষর দুটি লিখলেন। তারপর নবীনকুমারকে বললেন, ঠিক এই রকম দুটি পাশে লিখে দেখাও তো !

নবীনকুমার যেন বেশ কৌতুক পেয়েছে। খুব মন দিয়ে পেন্সিল ঘষে সে এ এবং বি অক্ষর ফুটিয়ে তুললো। দুর্গাচরণ সব মুছে দিলেন, তারপরও নবীনকুমার লিখে দেখাতে পারলো।

আর কোনো সন্দেহ রাখার উপায় নেই। বাড়ির কারুর কাছ থেকে যদি বা বাংলা অক্ষর লিখতে শিখেও থাকে, ইংরেজি অক্ষর শেখাবার মতন লোক কোথায় পাওয়া যাবে ?

দুর্গাচরণ বললেন, ভাই, শ্রুতিধরের কথা শুনেছি। কিন্তু এই বালক কি দৃষ্টিস্মৃতিধর ?

বিধুশেখর বললেন, এ শিশু জন্মের অতি অল্পকাল পর থেকেই নানাপ্রকার বিস্ময়ের কাজ করেচে। এ হাঁটতে শিখেচে, কথা কইতে শিখেচে অন্য ছেলেপুলেদের চেয়ে অনেক আগে। হ্যাঁরে গঙ্গা, ও ক' মাসে কথা কইতে শিখেচিল রে ?

গঙ্গানারায়ণ পিছন ফিরে মায়ের দিকে চাইলো। সেখান থেকে অন্য লোক মারফৎ উত্তর এলো, আট মাসে !

দুর্গাচরণ বললেন, আমি দেখেই বুঝেছি, এ বালক ক্ষণজন্মা।

বিধুশেখর গর্বিতভাবে বললেন, ওর কুষ্ঠিতেও আছে, ও বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

দুর্গাচরণ বললেন, এর দিকে নজর রাখবেন ভালো করে। স্বাস্থ্যের যত্ন নেবেন। দেখবেন, যেন, এ শিশু দীর্ঘজীবী হয় !

গঙ্গানারায়ণ বললো, দেড় দু'বছর বয়েস থেকেই ও অনেক রকম ছড়া বলতে পারে। একলা একলা ছড়া বলে বলে দরদালানে ঘুরে বেড়ায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, কই শুনি। একটা ছড়া বলো তো ?

গঙ্গানারায়ণ বললেন, বল তো নবীন, একটা ছড়া বল তো।

নবীনকুমার অমনি চোখ বুঁজে বললো :

তুমি প্রভু সৃষ্টিধর জগতের পতি
তোমা পানে সদা মোর যেন থাকে মতি !

তিন ব্রাহ্মণ একসঙ্গে বাহবা দিয়ে উঠলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, বড় সুন্দর কণ্ঠস্বর, আর একটা বলো তো !

এবার নবীনকুমার কণ্ঠস্বর চড়িয়ে বললো :

এসো এসো চাঁদবদনি
এ রসে নিরসো কোরো না ধনি ?

দুর্গাচরণ ও ঈশ্বরচন্দ্র হেসে উঠলেও রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার নাক কুঁচকোলেন। তিনি বললেন, এ

সব আবার কোথা থেকে শিখলো !

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, আর একটু বলো তো, আর জানো না ?

নবীনচন্দ্র আবার দুলে দুলে বলতে লাগলো :

তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ
তুমি আমার তার রতনমণি

আধো আধো বালকের কথা নয় । প্রায় সঠিক উচ্চারণ । শুনতে শুনতে একটা হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল । এমনকি বিধুশেখরও হেসে ফেললেন । একমাত্র বিদ্যালঙ্কারই অসন্তুষ্ট হলেন একটু । ঠাকুর দেবতার সামনে একি অশ্লীল কথা ! তাও এক বালকের মুখে !

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, চেনা চেনা যেন মনে হয়, এ গান কার রচনা ?

দুর্গাচরণ বললেন, এ তো গোঁজলা গুঁই-এর গান, বহু পুরাতন । এদানি শোনাই যায় না ।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, এ শিশু এ গান শিখলে কেমন করে ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, ভিকিরী, বৈষ্ণব, কীর্তনীয়ারা বাড়িতে এলে আমার ভাইটি তাদের গান খুব মন দিয়ে শোনে । সে সব শুনে শুনেই শিখেচে ।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, তাহলে তো এক বালক শ্রুতিধরও বটে !

দুর্গাচরণ বললেন, এমন আশ্চর্য শিশু আমি আগে আর দেখিনি তো বটেই, কোথাও শুনিনি পর্যন্ত ! ঈশ্বর ওকে দীর্ঘজীবী করুন ।

তারপর উভয়ে মিলে নবীনকুমারকে প্রভূত আদর করতে লাগলেন । দূর থেকে দেখে বিম্ববতীর মন গর্বে ভরে গেল । পুত্রের ব্যবহার দেখে তাঁর নিজের এখনো মাঝে মাঝে খটকা লাগে, কোনো রকম অপ্রাকৃত কিছুর প্রভাব আছে কি না । কিন্তু এত বড় গুণী ব্যক্তিরা তাঁর পুত্রের এমন সুখ্যাতি করছেন যখন, তখন আর কোনো চিন্তা নেই ।

ব্রাহ্মণদের এবার জলপান করানো হবে । নবীনকুমারকেও এখন খাওয়ানো দরকার, তাই গঙ্গানারায়ণ তাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাবার জন্য ভাইকে ক্রোড়ে তুলে নিল । নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, দাদা, আমার হাতেখড়ি হয়ে গ্যাচে ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, হ্যাঁ । তোমার খুব ভালো হাতেখড়ি হয়েচে ।

তখন নবীনকুমার তীক্ষ্ণ জোরালো গলায় বললো, দাদা, দুলালের হাতেখড়ি হবে না ?

বিধুশেখর বিস্মিতভাবে বললেন, দুলাল ? দুলাল কে ?

গঙ্গানারায়ণ নবীনকুমারের পিঠ চাপড়ে বলে উঠলো, এখন খাবার খাবি । চল, চল !

নবীনকুমার কেঁদে উঠলো, না, আমি যাবো না । দুলালের হাতেখড়ি হবে । দুলালকে ডাকো । দুলালকে ডাকো ।

গঙ্গানারায়ণও জানে না দুলাল কে । খানিকটা বিব্রত অবস্থায় সে নবীনকুমারকে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল । মায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, দুলাল কে মা ? দ্যাখো, ছোটবাবু আবার কী বাতিক ধরেচে ।

বিম্ববতী বললেন, কী জানি বাবা, নীচের যে ছেলেটি ওর সঙ্গে খেলে, সেই নাকি !

নবীনকুমার দুলালের নাম করে ডুকরে কাঁদতে শুরু করেছে । তখন গঙ্গানারায়ণ ও বিম্ববতী দুজনেই তাকে অনেক কষ্টে বোঝালেন যে, হ্যা, হ্যাঁ, হবে, হবে, দুলালেরও হাতেখড়ি হবে, পরে হবে ।

ভিড়ের একেবারে পিছন দিকে থাকোমণি তার পুত্রকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল । মনিবপুত্রের মুখে দুলালের নাম উচ্চারণ সে-ও শুনতে পেয়েছে । কিন্তু সে ভয় পেয়ে গেল, তার মন বললো, এ সব ভালো নয় । বাবুদের কোনো ব্যাপারের মধ্যেই থাকা ভালো নয় । ছেলেকে নিয়ে থাকোমণি সরে গেল তাড়াতাড়ি ।

দুলালচন্দ্রকে নবীনকুমার খুঁজে পেল বিকেলবেলা । শ্লেট আর পেন্সিল সে সারাদিন আর কাছছাড়া করেনি । এগুলিকে সে নতুন খেলনা হিসেবে পেয়েছে ।

—দুলাল, তুই হাতেখড়ি দিলিনি ? তোর বিদ্যে হবে না ।

দুলালচন্দ্র হাতেখড়ি মানে জানে না । সে দূর থেকে দেখেছিল । সাদা রঙের হাঁসের ওপর বসা সরস্বতী ঠাকুরের সামনে স্তূপ করা ছিল সন্দেশের পাহাড় । তার ভাগ্যে একটিও জোটেনি ।

—আয়, আমি তোকে হাতেখড়ি শেখাবো। বোস, আমার সামনে বোস, হাঁটু গেড়ে বোস।

নিজে ঠিক ব্রাহ্মণ আচার্যদের ভঙ্গিতে পিঠ সোজা করে বসে সে অবিকল তাঁদের নকল করে বলতে লাগলো, লেখ, ক ! ঘুঁড়ির আধেক আর একটা শুণ্ডি ! তোকে আগে কেউ লিখতে শিখিয়েচে ? লেখ, এ, বি !

এবার আমায় প্রণাম কর।

রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার অকস্মাৎ পরলোকগমন করায় সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির পদটি খালি হোল। এই পদের জন্য দাবিদার অনেক। কিন্তু সাহেবরা বুঝেছে যে বৃদ্ধ পণ্ডিত বা গ্রামের টুলো বামুনদের দিয়ে শিক্ষালয় পরিচালনার কাজ ভালো চলে না। এজন্য আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন কোনো তেজস্বী ও উচ্চ শিক্ষিত যুবকের প্রয়োজন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার ঈশ্বরচন্দ্র বছর পাঁচেক ধরে বেশ যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে সুনাম অর্জন করেছে। সেইজন্য শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি ময়েট সাহেব ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ মার্সাল সাহেবকে অনুরোধ জানালেন ঈশ্বরকে ছেড়ে দেবার জন্য। মার্সাল সাহেব রাজি হলেন সানন্দে।

উভয় চাকরিরই বেতন একই, সেই পঞ্চাশ টাকা। তবুও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চেয়ে সংস্কৃত কলেজে কাজ নেওয়ায় ঈশ্বরের বেশী আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পড়াতে হয় সাহেবদের, তারা বাংলা বা সংস্কৃত শেখে চাকরি রক্ষার কারণে। আর সংস্কৃত কলেজে পড়ানো হয় দেশীয় ছাত্রদের এবং সেটিই প্রকৃত বিদ্যাচর্চার স্থল। মার্সাল সাহেব ঈশ্বর পণ্ডিতের ওপর এমনই প্রীত ছিলেন যে ঈশ্বর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পরিত্যাগ করার পর তাঁর ভাই দীনবন্ধুকেই তিনি সে জায়গায় বসালেন।

সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত। ইনি নিজে সংস্কৃত তেমন কিছু জানেন না। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় দক্ষ এবং সাহেবদের সঙ্গে উত্তমরূপে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন বলে সংস্কৃত কলেজ পরিচালনার ভার পেয়েছেন। ঈশবরচন্দ্র হলেন তাঁর সহকারী। বাবু রসময় দত্তের আরও পাঁচ রকম কর্ম আছে, তা ছাড়া তিনি ছোট আদালতের সাব জজ্, তিনি সর্বক্ষণ কলেজে থাকতে পারেন না, ঘণ্টা দু' একের জন্য এসে ব্যবস্থাদি ঠিক মতন চলছে কিনা দেখে যান। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে কলেজের পরিচালনা পদ্ধতি সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা পাঠ শেষ করবার পর বিদ্যাভূষণ, বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যারত্ন, বিদ্যাসাগর ইত্যাদি পদবী পায়। ঈশ্বরচন্দ্রের আগেও দু' একজন বিদ্যাসাগর হয়েছেন, পরেও হয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিজের নাম লেখার সময় লেখেন ঈশ্বরচন্দ্র শর্মণ, কিন্তু লোকে তাঁকে বিদ্যাসাগর বলে ডাকতে শুরু করেছে কয়েক বছর আগে থেকেই, সংস্কৃত কলেজে আসবার পর ঐ নামেই তিনি পরিচিত হয়ে উঠলেন।

নতুন চাকরি নেওয়ার পর একবার পিতামাতার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন। ঈশ্বরচন্দ্র তাই ভাইদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কলকাতার বাসা থেকে স্বগ্রাম মেদিনীপুরে পৌঁছোবার ব্যবস্থা অতি সরল, গাড়ি-ঘোড়ার কোনো বালাই নেই। বউবাজার থেকে বেরিয়ে পদব্রজে হাটখোলার গঙ্গার ধারে এসে ফেরি নৌকোয় পার হয়ে গিয়ে উঠলেন শালিখায়। তারপর বাঁধা রাস্তা ধরে হণ্টন। বৈশাখ মাস, যখন তখন ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা, সে রকম হলে গাছতলায় বিশ্রাম। মসাট গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে রাস্তা ছেড়ে ঈশ্বরচন্দ্র সদলবলে নেমে পড়লেন মাঠের মধ্যে। কোণাকুণি পশ্চিম মুখে গেলে দূরত্ব সংক্ষেপ হয়। বর্ষার সময় রাস্তা ও মাঠ প্রায় একাকার হয়ে যায়, কোথাও কোথাও হাঁটু সমান কাদা ঠেলে এগোতে হয়। এখন অবশ্য মাঠ ঘাট শুকনো। ওঁরা দিন শেষে পৌঁছোলেন রাজবলহাটে। এখানে দামোদর নদ পেরুতে হবে। সঙ্গে চিঁড়ে গুড় মুড়ি যা ছিল, তা দিয়ে আহার সেরে নেওয়া হলো।

দামোদর অতি ভয়ঙ্কর ও সুন্দর নদ। এখন গ্রীষ্মকাল, অধিকাংশ নদী নালারই তেজ মরে যায়, কিন্তু দামোদর এই সময়ও তপস্যারত যোগীর মতন কৃশকায় হলেও সমান তেজস্বী। ভরা বর্ষায় এই নদ করাল রূপ ধারণ করে, দু পার্শ্বের চার-পাঁচ ক্রোশ জলমগ্ন হয়ে যায়। প্রতি বৎসরই বন্যা।

সে রাত্রে নৌকো পাওয়া গেল না বলে ফিরে আসতে হলো রাজবলহাটে। এই গ্রামে রাত্রি যাপনের জন্য সরাইখানা আছে। ধনী ব্যক্তিরা পথিকদের জন্য মধ্যে মধ্যে এ রকম সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন, পথিকরা বিনা ব্যয়ে এখানে থেকে যান।

ভোরে উঠে দামোদর পেরিয়ে আবার পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে এসে পৌঁছোলেন পাতুল গ্রামে। এখানে ঈশ্বরচন্দ্রের কিছু আত্মীয়স্বজন থাকেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করে আবার বেরিয়ে পড়লেন নিজের গ্রামের উদ্দেশ্যে। এখান থেকে বীরসিংহা গ্রাম মাত্র সাত ক্রোশ। দুপুরে দুই ঘটিকার মধ্যেই ওঁরা পৌঁছে গেলেন বাড়িতে।

আগে থেকে খবর দেওয়া ছিল না, অকস্মাৎ পুত্রদের উপস্থিত হতে দেখে বাড়িতে আনন্দের সমারোহ পড়ে গেল।

ঠাকুরদাসে চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে এখন গ্রামেই থাকেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ঢোকার পরই ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় জোর করেই পিতাকে চাকুরি ছাড়িয়েছেন। ঠাকুরদাস তখন মাইনে পেতেন দশ টাকা। তাঁর সমবয়েসীরা অবশ্য পরামর্শ দিয়েছিলেন, কাঁচা বয়েসের ছেলের কথায় এমন হুট করে কাজ ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়, ছেলে যদি পরে দুশ্চরিত্র হয়ে যায়, বাপ মাকে আর না দেখে, তখন ঠাকুরদাসকে আবার চাকরির খোঁজে দোরে দোরে ঘুরতে হবে। কিন্তু ঠাকুরদাস ততদিনে বুঝে গেছেন, এ ছেলে ঠাকুর দেবতাদের বিশেষ ভক্তি করে না বটে, কিন্তু পিতা মাতাই এর ঠাকুর দেবতা।

সাত ভাইয়ের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র সকলের জ্যেষ্ঠ। তিনি সবচেয়ে বেশী কৃতী হয়েছেন বলেই নয়, বাল্যকাল থেকেই তিনি জননীর বেশী প্রিয়। ঈশ্বর এসেছে বলে ভগবতী অত বেলাতেই আবার রান্নাবান্না নিয়ে মেতে উঠলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পত্নী দীনময়ীও রান্নাঘরে ঢুকে বসে রইলেন শাশুড়ীর সঙ্গে। স্বামী অনেকদিন পরে বাড়ি এসেছেন বটে, কিন্তু দিনের আলোয় স্বামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হবে না। সে রকম নিয়ম নেই।

বাবা মায়ের সঙ্গে কুশল সংবাদ সেরে নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বেরুলেন পাড়া বেড়াতে। প্রথমেই গেলেন কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। ইনি ঈশ্বরচন্দ্রের আদি শিক্ষক, প্রত্যেকবার বাড়ি আসবার সময় ঈশবরচন্দ্র এঁর জন্য নতুন বস্ত্র কিনে আনেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়েছে, দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ, তবু তিনি একটি দৃশ্য দেখে চমকে উঠলেন। গৃহিণীকে ডেকে বললেন, ওগো, দেখে যাও, দেখে যাও পাগল ছেলের কাণ্ড!

অদূরের মাঠে ছেলেরা জল কাদার মধ্যে কপাটি খেলছিল, ঈশ্বরচন্দ্রও তাদের মধ্যে নেমে পড়ে লাফালাফি করছেন। গুরুমশাই ঈশ্বরকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন, ঈশ্বর দূর থেকেই উত্তর দিলেন, দাঁড়ান, খেলাটি সেরে লই!

খানিক বাদে ঈশ্বরচন্দ্র এলেন হাঁপাতে হাঁপাতে। গুরুমশাই বললেন, এ কি কাণ্ড দেখো! একেবারে বালকদের সঙ্গে মিশে বালক হয়ে গেলে!

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, কলকেতায় তো আর খেলাধূলার সুযোগ হয় না! গ্রামে এলেই আমার শরীর সুস্থ থাকে। নিয়মিত কপাটি খেললে উদরাময় হয় না।

গুরুমশাই তাঁর পত্নীকে বললেন, শোনো ছেলের কথা! এ এখন কী হয়েছে জানো! সংস্কৃত কলেজের সহকারী পরিচালক, দু বেলা সাহেবদের সঙ্গে কথা কইতে হয়, দেশের মাথা মাথা লোকেরা যেখানে ঠাঁই পায় না—

ঈশ্বরচন্দ্র হাসতে লাগলেন।

গুরু-পত্নী বললেন, আমাদের সেদিনের সেই ঈশ্বর, এই তো এইটুকুন গুটলিমতন চেহারা ছিল, কী দুষ্টামিই করতো! সে আজ এত বড়টি হয়েছে। অ ঈশ্বর, তোর বয়েস কত হলো?

ঈশ্বরচন্দ্র হিসেব কষে বললেন, এই তো ছাব্বিশে পড়লাম।

তিনি বললেন, চেহারা দেখে কিন্তু বোঝা যায় না বাপু! সেই যেন ছোটটিই রইছিস।

গুরুমশাই বললেন, হ্যাঁরে ঈশ্বর, সংস্কৃত কলেজের ছেলেরা তোকে মানে?

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, ফোর্ট উইলিয়াম কালেজে আমি সাহেব ছাত্রদের শায়েস্তা করিছি, আর এই নিরীহ ডাল-ভাত খাওয়া ছেলেরা আমায় মানবে না?

কথায় কথায় একটু বাদে কালীকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, ক্ষীরপাই যাবি নাকি? তা হলে চল আমিও তোর সাথেই যাই। পরশু আমায় সে স্থলে যেতে হবে।

ক্ষীরপাই গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের শ্বশুরালয়। তিনি কদাচিৎ সেখানে যান। এখন তাঁর স্ত্রী এখানেই রয়েছেন, সুতরাং যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, আপনার শরীর তো দেখছি ভালো না। আপনি আবার অত দূর যাবেন কী জন্য?

কালীকান্ত বললেন, কী করি বল, আবার একটি বিবাহের সম্বন্ধ এসেছে, না করলেই নয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিস্মিত হয়ে বললেন, বিবাহের সম্বন্ধ? কার? আপনার?

কালীকান্ত বললেন, আর বলিস কেন! না করলে নয়, ওরাও ছাড়ে না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে রইলেন গুরুর দিকে। গুরু-পত্নী পাশেই বসা, তাঁর মুখেও কোনো ভাবান্তর নেই। কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ভঙ্গ কুলীন, বহু বিবাহে আলস্য নেই। ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই জানেন এ কথা। বাড়িতে এই একটিই স্ত্রী। অন্যান্য গ্রামে স্ত্রীদের কাছে বৎসরে একবার করে টাকা আদায় করতে যান। সেই সব স্ত্রীদের বৎসরে একবার তিনি সহবাস দিয়ে ধন্য করেন বলে তাদের পিতামাতাকে অর্থব্যয় করতে হয় প্রত্যেকবার।

এসব জানা সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র আজ যেন গুরুকে নতুনভাবে দেখলেন, তাঁর সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হয়ে গেল ঘৃণা, গুরু হিসেবে যাঁকে শ্রদ্ধা করেছেন, মানুষ হিসেবে তিনি এত অশ্রদ্ধেয়! ইদানীং ঈশ্বর অনুভব করছেন, খাঁটি মানুষ বড় দুর্লভ। লেখাপড়া তো শিখছে অনেকেই, কিন্তু তাদের মধ্যেই বা খাঁটি মানুষ ক'জন?

এই বৃদ্ধের তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখনো বিবাহ করার শখ? জেনেশুনে আবার একটি মেয়ের সর্বনাশ করবে?

ঈশ্বরচন্দ্রকে রুদ্ধবাক্ দেখে গুরুমশাই নিজেই বললেন, কী করি বল, পাঠশালাটি এখন ভালো চলে না, আমার এ পক্ষেই ছয়টি ছেলেমেয়ে, এত বড় সংসার চালানো কি সহজ কথা! পুরানো শ্বশুরবাটিগুলান থেকেও আদায়পত্তর আজকাল আর ভালো হয় না, রোজগারের একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো!

ঈশ্বরচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, সে মেয়েটির বয়েস কত?

গুরুমশাই বললেন, নয় পার হয়ে গেছে। এত বড় বয়স্থা কন্যা, তার পিতা অতি ব্যস্ত হয়ে আমার একেবারে হাতে পায়ে ধরেছে। টাকা পয়সাও এরা দেবে ভালো।

ঈশ্বরচন্দ্র কড়া গলায় বললেন, দুদিন পর আপনি চোখ বুজলে সে মেয়েটির যে কপাল পুড়বে?

—আর তার যদি বিবাহ না হয়, সমাজে তার বাপ মা পতিত হয়ে যাবে না?

—আপনার ছেলে শ্রীনাথ···সেও তো উপযুক্ত হয়েছে, তার সঙ্গেই এই কন্যার বিবাহ দিন না কেন?

—শ্রীনাথের আমি অন্যত্র বিবাহ ঠিক করিছি। তোকে বললুম না, টাকা পয়সার বড় টান যাচ্ছে।

গুরু-পত্নী স্বহস্তে প্রস্তুত চিঁড়ের মোয়া এনে দিলেন ঈশ্বরের জন্য। কিন্তু ঈশ্বর হাত জোড় করে বললেন, মাপ করুন, এ বাড়িতে আমি জলস্পর্শ করবো না।

তারপর কালীকান্তের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন, গুরুমহাশয়, আপনার সহিত এই আমার শেষ দেখা। এ বাড়িতে আর আমি কোনোদিন আসবো না।

পিছন ফিরে হন হন করে হাঁটিতে লাগলেন ঈশ্বরচন্দ্র। গুরুমশাই তাঁর ক্রোধের কারণ বুঝতে না পেরে বিস্মিতভাবে ডাকতে লাগলেন, অ ঈশ্বর, শোন, কী হলো, অ ঈশ্বর···

ঈশ্বর আর দাঁড়ালেনও না, উত্তরও দিলেন না।

তারপর থেকে সর্বক্ষণ ঈশ্বরের মন চঞ্চল হয়ে রইলো। যাঁরা নমস্য, যাঁরা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, তাঁরাও এই প্রকার অন্যায় করে, তবে সাধারণ অশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত ব্যক্তিরা তো এ রকম করবেই। অথচ এর প্রতিবিধান করার কোনো ক্ষমতা তাঁর নেই, এ কথা চিন্তা করেই গায়ে যেন জ্বালা ধরে।

তাঁর মনে পড়লো, তাঁর ছাত্রাবস্থায় সংস্কৃত কলেজে তাঁর ব্যাকরণ শিক্ষক শম্ভুনাথ বাচস্পতি পত্নী

বিয়োগের পর সেই বৃদ্ধ বয়েসেই আবার বিবাহ করতে উদ্যত হন। ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাঁকে বলেছিলেন, এরূপ বয়সে মহাশয়ের বিবাহ করা পরামর্শ-সিদ্ধ নয়। বাচস্পতি শুনলেন না, আবার এক বালিকাকে বিয়ে করে আনলেন। সেই থেকে ঈশ্বরচন্দ্র আর যেতেন না শম্ভুনাথ বাচস্পতির গৃহে। বাপস্পতি মাঝে মাঝেই বলতেন, একটি দিনের জন্যও তোমার মাকে দেখতে গেলে না। পেড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত একদিন গেলেন তিনি, কিন্তু মেয়েটিকে দেখা মাত্রই তাঁর চোখ ফেটে জল এলো, নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারেননি। কিছুদিনের মধ্যেই মেয়েটিকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে বাচস্পতি প্রস্থান করলেন পরলোকে।

কালীকান্ত যে মেয়েটিকে বিবাহ করতে যাচ্ছেন, সে মেয়েটিকে চক্ষেও দেখেননি ঈশ্বরচন্দ্র, তবু সেই মেয়েটির কথা ভেবে তাঁর কান্না এসে গেল।

জননী ভগবতীও ঈশ্বরের ব্যবহার দেখে অবাক। এত যত্ন করে তিনি অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করলেন, ঈশ্বরচন্দ্র তার কিছুই প্রায় খেতে চান না। জাল ফেলে পুকুর থেকে মাছ ধরা হয়েছে, বাড়ির গাভির দুধে রাঁধা হয়েছে পায়েসান্ন, পুত্র এতবড় সুসংবাদ বহন করে এনেছে, তারই জন্য এত আয়োজন। কিন্তু ঈশ্বর বললেন, মা, আমি শুধু দুটি ডাল ভাত খাবো, আর কিছু আমার মুখে রুচবে না।

মা চোখ কপালে তুলে বললেন, ওমা, এ কী কথা ? তুই খাবিনি কেন ? তোর জন্য এত কল্লাম !

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, মা, এতকাল আমরা ডাল ভাত খেয়েই তো মানুষ হয়েছি, সেই ডাল ভাত খেয়েই তো কত আহ্লাদ করলাম। এখন হঠাৎ বড় মানুষী করার প্রয়োজন তো দেখি না। মা, দেশে অনেক দুঃখী, তাদের কথা চিন্তা করলে আমার মুখে ভালো খাদ্য রোচে না।

ভগবতী বললেন, তুই বড় কাজ পেয়েচিস, একদিন গরীব দুঃখীদেরও আমি পেট পুরে খাওয়াবো।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, মা, তোমাদের আশীর্বাদে আমি আর দীনবন্ধু দু' ভায়েই উপযুক্ত কাজ পেয়েছি, এখন আমাদের অবস্থা যদি কিছু ফেরে, তবে তা দিয়ে দেশ-গাঁয়ের কিছু উন্নতি ঘটাতে চাই।

—সে হবেখন। একদিন শখ করে রেঁধেছি, তুই খা তো এখন।

ঈশ্বর একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, মা, আমাদের কলকেতার বাসাবাড়ির যাওয়া-আসার পথে আমি রোজ দেখি গোয়ালাদের দুধ দুইতে। বাছুরগুলানকে তারা দূরে বেঁধে রাখে, তারা করুণভাবে ম্যা ম্যা করে ডাকে, তবু তাদের একটু মাতৃস্তন্য পান করতে দেয় না। গোরুর সব দুধ মানুষে চুরি করে নেয়, অথচ গোবৎসদের জন্যই তো দুধ, তাদের আমরা বঞ্চিত করি। এইসব দেখেশুনে দুধের প্রতি আমার অভক্তি জন্মে গেছে। মাছ মাংস খেতেও আমার রুচি হয় না।

ভগবতী রীতিমতন ভয় পেয়ে বললেন, ও মা, এমন অলক্ষুণে কথা তো কখনো শুনিনি। দুধ, মাছ, মাংস না খেলে শরীর টিঁকবে ? একেই তো তোদের কত খাটুনি।

এক টুকরো ভাজা মাছ ভগবতী নিজে পাত থেকে তুলে নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের মুখের কাছে ধরে বললেন, খা। আমি বলছি, খা !

অন্য ভাইরা কৌতুক দেখার ভঙ্গিতে চেয়ে আছে। খাদ্য বিষয়ে দাদার এই নতুন বাতিকের কথা তারা জানে। দাদা দারুণ গোঁয়ার, একবার যা বলে সে কথা আর ফেরায় না। কিন্তু জননীর সঙ্গে কি দাদা জেদে পারবে ?

ঈশ্বরচন্দ্র মায়ের হাত থেকে মাছ ভাজাটি নিয়ে বললেন, মা, তুমি এত করে বলছো বলে এই আমি এক টুকরো মাছ মুখে দিলাম। কিন্তু পায়েস সরিয়ে নাও। দুধের জিনিস আর আমি কিছুতেই খেতে পারবো না।

ঠাকুরদাস কাছেই দাঁড়িয়ে হুঁকো টানতে টানতে শুনছিলেন সব। এবার তিনি বললেন, ও ঘাড়-বেঁকাকে তুমি আর বেশী সিধে করতে পারবে না, ব্রাহ্মণী ! আর বেশী জোর করলে সব ফেলে উঠে যাবে !

কয়েকদিন গ্রামে থেকে ঈশ্বরচন্দ্র আবার ফিরলেন কলকাতার দিকে। এবারে তাঁর বড় মন খারাপ হয়ে গেছে। সেই নয় বৎসর বয়েসে তিনি কলকাতায় চলে যান। তারপর থেকে প্রায় কলকাতাতেই থেকেছেন, মধ্যে মধ্যে ছুটিতে এসেছেন গ্রামে বেড়াতে। প্রত্যেকবারই গ্রামে এসে তাঁর মন প্রফুল্ল হয়ে গেছে, বালকের মতন ফুর্তিতে গায়ে মেখেছেন দেশের ধুলো মাটি। কিন্তু এবারে তাঁর মনে হলো, গ্রামের মানুষের মধ্যে দুঃখ দারিদ্র্য কুসংস্কার যেন দিন দিনই বাড়ছে। সামান্য স্বার্থ নিয়ে সবাই ব্যাপৃত, সামান্য কারণে দলাদলি। এ-সব দূর করার উপায় কী ? একমাত্র শিক্ষা বিস্তারেই কিছু সুফল পাওয়া

যেতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষা মানুষের সামনে একটি দর্পণ তুলে ধরে। মানুষ তাতে নিজেকে চিনতে শেখে।

কলকাতায় ফিরেই তিনি সংস্কৃত কলেজটির আমূল সংস্কার করার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। সংস্কৃত কলেজটি যেন হরিঘোষের গোয়াল হয়েছে। সরকার কলেজ খুলে দিয়েছে, যার যেমন খুশী কলেজকটিকে ব্যবহার করে। ছাত্রদের কোনো বেতন লাগে না, তাই পড়াশুনোর কর্মটিকেও তারা মনে করে যেন গোপাল ঠাকুরের ব্যাগার। যার যখন ইচ্ছা আসে যায়। যদিও পাকা ইষ্টকের ভবনে কলেজ বসে, তবু শিক্ষকগণ যেন সেই আগেকার গাছতলার টোলের ধারাটাই অক্ষুণ্ণ রাখতে চান। কোনো শিক্ষক ক্লাসের মধ্যে চেয়ারে পা তুলে বসে তাঁর কোনো প্রিয় ছাত্রকে ডেকে বলেন, বাপু হে, একটু বাতাস করো তো, কিছুক্ষণ ঘুমায়ে লই!

কলেজে কোনো সাপ্তাহিক ছুটির দিন নির্দিষ্ট নেই। অষ্টমী ও প্রতিপদে সংস্কৃত অনুশীলন নিষেধ বলে ঐ দুই তিথিতে কলেজ বন্ধ থাকে। দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় কোনো নতুন পাঠ শুরু করতে নেই, এমন রীতি কে স্থির করেছে তার ঠিক নেই, তবু চলে আসছে।

ঈশ্বরচন্দ্র এ-সব প্রথা বন্ধ করে দিলেন। প্রত্যেক রবিবার কলেজ বন্ধ থাকবে, বাকি দিনগুলিতে যথানিয়মে ক্লাস চলবে। শিক্ষক বা ছাত্র সকলকেই আসতে হবে সাড়ে দশটার মধ্যে। ক্লাসে কোনো শিক্ষক ঘুমোলে তিনি নিজে গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে দেন, অতিশয় নিদ্রাতুর কোনো শিক্ষককে হেসে পরামর্শ দেন, এবার থেকে সঙ্গে নস্যর ডিপে রাখুন, ঘুম এলেই নাকে নস্য ঠুসে দেবেন!

কলেজ ভবনের পেছন দিকে মালির ঘরের পাশে শৌচাগার। ছাত্ররা সেখানে যাবার নাম করে দল বেঁধে একসঙ্গে এসে নানারকম রঙ্গ-রস করে। তাদের পাঠ্য রচনার মধ্যে আদি রসাত্মক শ্লোকের ছড়াছড়ি। সেগুলি আলোচনারও এটিই উপযুক্ত জায়গা। নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি নিয়ম করলেন, একবারে একজনের বেশী ছাত্র শৌচাগারে যেতে পারবে না এবং যাবার সময় কাষ্ঠের পাস নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে। শিক্ষক বা ছাত্র কেউই আবেদনপত্র না পাঠিয়ে দিনের পর দিন অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। মাসে একবার প্রত্যেক ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে হবে এবং শুধু সংস্কৃত নয়, ছাত্রদের প্রত্যেককেই বাধ্যতামূলকভাবে শিখতে হবে বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক।

ছাত্রদের নিয়ে বেশী সমস্যা নেই, কিন্তু কিছু সমস্যা দেখা দিল অধ্যাপকদের নিয়ে। অধিকাংশ বৃদ্ধ অধ্যাপকের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র নিজে পড়েছেন। তাঁরা তাঁর গুরুস্থানীয়। ঈশ্বরচন্দ্র এখন তাঁদের ওপরে কর্তা হয়ে বসায় তাঁরা সব নির্দেশ মানতে চান না। বিশেষত সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে কলেজে এসে পৌঁছোবার ব্যাপারটা বড়ই বাড়াবাড়ি মনে হয়।

গুরুস্থানীয় অধ্যাপকদের ঈশ্বরচন্দ্র মুখে কিছু বলতে পারেন না। ঠিক সাড়ে দশটার সময় তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন কলেজের গেটে, হাতে একটা ঘড়ি। যে-সব অধ্যাপক অনেক বিলম্ব করে পৌঁছোন, তাঁরা দেখতে পান যে, ঈশ্বরচন্দ্র একবার তাঁদের মুখের দিকে আর একবার ঘড়ির দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন। একজন পণ্ডিত একদিন বলেই ফেললেন, ঈশ্বর তুমি যে কিছু বলো না, টিপি টিপি হাসো, ওতেই বড় লজ্জা পাই। ঘাট মানছি বাপু, কাল থেকে ঠিক সময়ে আসবো।

মাঝখানে একটা ঘটনায় ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্র মহলে খুব জনপ্রিয় হয়ে গেলেন। হিন্দু কলেজ আর সংস্কৃত কলেজ সন্নিহিত ভবনে বসে। একদিন কোনো প্রয়োজনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গেলেন হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কার সাহেবের ঘরে। চরকায় মায়ের হাতে বোনা মোটা সুতোর ধুতি ও চাদর পরা, মাথার সামনের দিক কামানো, পিছনে সুবৃহৎ শিখা। এমন চেহারার মনুষ্যকে দেখে কার সাহেব বসতে বললেন না, বরং নিজের পা দুখানি টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ, পণ্ডিত, কী দরকার বলো?

অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র ফিরে এলেন সেদিন, কারুকে কিছু বললেন না। কয়েকদিন পরেই একটি সুযোগ পেয়ে গেলেন। পিঠোপিঠি দুই কলেজের পরিচালকদের প্রায়ই নানা কাজে কথাবার্তা বলতে হয়। সেদিন কার সাহেব এলেন সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে। আগে থেকে খবর পেয়েই ঈশ্বরচন্দ্র টেবিলের ওপর তাঁর চটি পরা পা দুখানি তুলে

রাখলেন, তারপর কার সাহেবকে বসবার চেয়ার না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ, বলো সাহেব, কী তোমার প্রয়োজন ?

রাগে ছটফটিয়ে ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলেন কার সাহেব।

এই ঘটনাই নানাভাবে পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। এমনকি ইংরেজ সমাজেরও কানে গেল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা এই কথা শুনিয়ে শুনিয়ে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের দুয়ো দেয়। কার সাহেব ঘটনাটিকে রসিকতা হিসেবে না নিয়ে শিক্ষা বিভাগের প্রধানের কাছে নালিশ জানালেন। তিনি বললেন, আর কোনো ইউরোপীয় হলে এই অপমান কিছুতেই সহ্য করতো না।

শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি ময়েট সাহেব এলেন তদন্তে। ঈশ্বরচন্দ্র নিরীহমুখে বললেন, আমি কিছু দোষ করেছি, তা তো জানতাম না। আমি তো ভেবেছিলাম, এটাই তোমাদের দেশের ভদ্রতা। কার সাহেবের মতন একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি যদি টেবিলে চর্ম নির্মিত জুতোশুদ্ধ পা তুলে দিয়ে বসে থাকেন, তা হলে আমার পক্ষে টেবিল থেকে পা নামিয়ে বসা কি অভব্যতা হতো না ?

ময়েট সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর রিপোর্ট লিখলেন, 'পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতন সাহসী ও তেজস্বী পুরুষ আমি বাঙালীদের মধ্যে আর একজনও দেখি নাই।

সেবার চাকরি টিকে গেলেও মাত্র এক বছর তিন মাস পরেই সংস্কৃত কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

রসময় দত্ত ঈশ্বরচন্দ্রের গতিবিধি সুনজরে দেখছিলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন, কলেজের নানাবিধ সংস্কারের কারণে সাহেবগণ ঈশ্বরচন্দ্রের প্রশংসা করছেন। রসময় দত্ত মনে করলেন, সাহেবদের কাছে তাঁর নিজের সমাদর যেন কমে যাবে এতে। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর অধস্তন কর্মচারী, সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র খাটবেন, কৃতিত্বটা পাবেন তিনি, এরকমই সাধারণত হয়। কিন্তু এ যে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় হয়ে যাচ্ছে। এবার রসময় দত্ত শক্ত হাতে হাল ধরলেন এবং ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কার প্রস্তাব বাতিল করে দিতে লাগলেন একটার পর একটা। কলেজটি আমূলভাবে ঢেলে সাজাবার একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। সেটি রসময় দত্ত কিছুতেই পাঠাতে রাজি হলেন না শিক্ষা বিভাগীয় বড় সাহেবদের কাছে।

বিরক্ত হয়ে ইস্তফাপত্র পেশ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। সে কথা শুনে কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক লিখিতভাবে রসময় দত্তকে অনুরোধ করলেন, এই কলেজের পক্ষে বিদ্যাসাগর মহা উপকারী, তাকে যেন যেতে না দেওয়া হয় কিছুতেই। রসময় দত্ত সে-সব গ্রাহ্য করলেন না। তাঁর ধারণা, একটু চাপ দিলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে নরম করা যাবে!

এক কথায় ঈশ্বরচন্দ্র চাকরি ছেড়ে চলে এলেন।

বন্ধু ডাক্তার দুর্গাচরণ বাড়িতে এসে বললেন, ওহে ঈশ্বরচন্দ্র, তোমার কাণ্ড দেখে যে সকলের তাক্ লেগে গেছে। এই বাজারে কেউ এত বড় চাকরি ছাড়ে ? রসময় দত্ত কী বলছেন জানো ? ছোকরা এক কথায় চাকরি ছাড়লো, এর পর খাবে কী ?

ঈশ্বর হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, ওঁকে জানিয়ে দিও, দরকার হলে আলু পটল বেচে খাবো, মুদির দোকান দেবো! তবু যে চাকরিতে মান থাকে না, সে চাকরি আর আমি কক্ষনো করতে যাবো না।
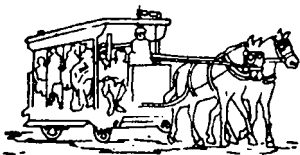
বিন্দুবাসিনী একটা স্বপ্ন দেখছিল। স্বর্গের নন্দনকাননে সে শুয়ে আছে গোলাপের পাপড়ি বিছানো তৃণশয্যায়, তার সামনে দাঁড়িয়ে এক জ্যোতিষ্মান পুরুষ, মাথায় সুবর্ণ কিরীট, মুখখানি অপরূপ হাস্যময়। বিন্দু চিনতে পারলো, ইনিই তো জনার্দনরূপী বিষ্ণু স্বয়ং, যিনি সমস্ত জগতের পতি এবং বিন্দুবাসিনীর আরাধ্য। তিনি বিন্দুবাসিনীর দিকে হাত বাড়িয়ে ভুবনমোহন স্বরে বললেন, উঠে এসো, কোন্ অভিমানে তুমি শুয়ে আছো, এই তো আমি দর্শন দিয়েছি।

শরীরে মানুষের স্পর্শ লাগতেই বিন্দুবাসিনী ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসলো। দারুণ চমকে গিয়ে বললো, এ কি, তুই ?

গঙ্গানারায়ণ বিন্দুর খুব কাছে মাটিতে হাত রেখে ঝুঁকে বসে একদৃষ্টে দেখছিল বিন্দুর ঘুমন্ত মুখখানি। যেন একটি সাদা ফোটা পদ্ম, তাতে শারদ শিশিরের মতন কয়েকটি শ্বেত কণা। বিন্দুবাসিনী এখন পূর্ণ যুবতী, তার রূপ যেন ফেটে পড়ছে। কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে নিবিড় বর্ষার মেঘের মতন কেশভার, তার বুকে যৌবন যেন আপন আগমনের কথা জানান দিচ্ছে শব্দ করে। তার উরুর রেখাভঙ্গিমা পারস্য দেশীয় খড়্গের মতন।

অকৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে বিন্দু প্রশ্ন করলো, একি গঙ্গা, তুই ঠাকুরঘরে ঢুকিচিস যে?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম বাইরে, তোর ঘুম ভাঙাতে চাইনি। কী অপরূপ লাবণ্যময়ী হয়িচিস তুই, বিন্দু! তাই আমি আর মাথার ঠিক রাখতে পারলুম না।

বিন্দু ঈষৎ হাস্যে বললো, আহা হা, ঢং! তোর বোয়ের খবর কী? বাপের বাড়ি থেকে সে এয়েচে?

অন্যমনস্কভাবে গঙ্গানারায়ণ বললো, না।

—তাকে আর কতদিন বাপের বাড়িতে ফেলে রাকবি? তাকে নিয়ে আয় এবার। আমরা একটু মনের মতন করে তাকে সাজাই!

—সে আসতে চায় না।

—ওমা সেকি কথা? বাড়ির প্রথম বউ, সে আর কতদিন বাইরে বাইরে থাকবে! নতুন বউ পায়ে মল পরে ঝমর ঝমর করে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াবে, তবেই না আনন্দ!

গঙ্গানারায়ণ বিন্দুর একখানি হাত ধরে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললো, এখন তার কথা থাক। বিন্দু, তুই একটু আমার পানে চা।

বিন্দুবাসিনী গঙ্গানারায়ণের চেয়ে বয়সে সামান্য ছোট হলেও ভাবভঙ্গিতে যেন অনেকখানি বড়। একুশ বৎসর বয়েসে গঙ্গানারায়ণ জীবনে প্রতিষ্ঠিত এবং উচ্চদায়িত্বসম্পন্ন পুরুষ হয়েও বিন্দুর সামনে সে আচরণ করছে বালকের মতন।

বিন্দুবাসিনী গঙ্গানারায়ণের আবেগ-ভাব অগ্রাহ্য করে পুনরায় খুব স্বাভাবিকভাবে বললো, বাড়ির বউকে বেশী দিন বাপের বাড়িতে রাখা মোটেই কাজের কতা নয়। এবার লোক পাটিয়ে তাকে নিয়ে আয়। তিন বচর হলো বিয়ে হয়েচে, এখন তো আর সে ছোটটি নেই।

গঙ্গানারায়ণ অপ্রসন্নভাবে বললো, আজো সে বালিকা। আমার কোনো কথাই সে বোঝে না। সে তার মায়ের আদরিণী মেয়ে, এ বাড়িতে এলেই মায়ের জন্য কাঁদাকাটি করে। এখনো সে পুতুল খেলে।

বিন্দুবাসিনী সহাস্যে বললো, তুই এবার নিয়ে আয়, আমরা তাকে সব শিকিয়ে পড়িয়ে দোবো। এখন সে তোকে নিয়েই পুতুল খেলবে। মেয়েমানুষের সবচেয়ে বড় পুতুল তো তার স্বামী।

—বিন্দু, সে কোনোদিনই আমার জীবনসঙ্গিনী হতে পারবে না। সে লেখাপড়া কিচুই শেখেনি।

—তুই শিকিয়ে পড়িয়ে দিবি। তুই এত বড় বিদ্বান হয়িচিস।

—আমি তোর সাথে বসে অনেক বই পড়বো। মনে আচে, আমাদের একসঙ্গে মেঘদূতম পাঠের কথা ছেল? আজও তা হলো না।

—আমার আর লেখাপড়া! আমার মতন মেয়েরা লেখাপড়া করলে সে বাড়ির অকল্যাণ হয়!

—তোর সেই অভিমান এখনো আচে, না বিন্দু? খুড়োমশাই তোর পড়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন...এবার থেকে আমরা গোপনে এক সাথে পড়বো আবার।

—আমার হাত ছাড়, বাইরে গিয়ে দাঁড়া। তুই ঠাকুরঘরে ঢুকিচিস, কেউ যদি দ্যাকে?

—বিন্দু, তোকে বিনে আমি বাঁচবো না।

—মরণ! মাথায় বুঝি ভূত সেঁধিয়েচে? যা, বাইরে যা বলচি!

—কেউ দেখবে না। বাড়িতে কেউ নেই। আমি কায়স্থ বলে তুই-ও আমায় ঠাকুরঘর থেকে তাড়িয়ে দিবি? কেন, কায়স্থ হয়ে জন্মিচি বলেই আমি কিসে অপবিত্র?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বিন্দু একটুক্ষণ উৎকর্ণ হলো। সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, কখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমে এসেছে সে টেরও পায়নি। ঘরের মধ্যে এখন আবছা আবছা অন্ধকার। সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ মনে হয়।

বিন্দু জিজ্ঞেস করলো, বাড়িতে কেউ নেই কেন? সবাই কোতায় গেল?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আজ শ্রীরামপুরে আমার বড় মামার বাড়িতে সকলের নেমন্তন্ন, তুই জানিস

না ? সবাই বেলাবেলি রওনা হয়ে গ্যাচে।

বিন্দুবাসিনী একটি সংক্ষিপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যদিকে মুখ ফেরালো। গঙ্গানারায়ণকে সে তার মনের ভাব বুঝতে দিতে চায় না। সে বিধবা, তাকে তো কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে না, তাই কোনদিন কবে নেমন্তন্ন থাকে সে কথা তাকে জানাবারও প্রয়োজন মনে করে না কেউ। ক্রমে ক্রমে এ বাড়ির অনেকেই তার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে। সে তিনতলার ঠাকুরঘরে নির্বাসিতা।

আবার মুখ ফিরিয়ে বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞেস করলো, সবাই গ্যাচে, তুই যাসনি কেন ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমার যে জ্বর। তুই তো আমার খবরও রাকিস না, তিনদিন ধরে আমি জ্বরে শুয়েচিলাম।

নারীদের চিরকালীন স্বভাববশত অসুখের কথা শুনেই বিন্দুবাসিনী ঈষৎ ব্যাকুল হয়ে গঙ্গার কপালে হাত ছুঁইয়ে বললো, ওমা, এখনো জ্বর রয়েচে দেকচি ! তুই এই জ্বর-গায়ে বেরিয়ে এলি ?

উদ্ভিন্নযৌবনা বিন্দুকে এত কাছে পেয়ে গঙ্গানারায়ণ আর স্থির থাকতে পারলো না। তাকে আলিঙ্গন করে বুকে টেনে নিল।

রীতিমতন ভয় পেয়ে বিন্দু বললো, এ কি গঙ্গা, তুই কি পাগল হয়ে গেলি ? জ্বরের জন্য তোর বিকার হয়েচে। ছাড়, ছাড় আমাকে।

—না, আমি আর তোকে কোনোদিন ছাড়বো না !

—তোর মাথায় পাপ ঢুকেচে। গঙ্গা, তুই ঠাকুরের সামনে···ছি, ছি, ছি, আমার মরে যেতে ইচ্ছে কচ্চে, তুই আমাকে ছাড়, নইলে আজই আমি আত্মঘাতিনী হবো।

বিন্দুবাসিনীর এই মুক্তি পাওয়ার চেষ্টার মধ্যে কোনো প্রকার ছলাকলা নেই বুঝতে পেরে গঙ্গানারায়ণ ছেড়ে দিল তাকে। আহত, কাতর কণ্ঠে বললো, বিন্দু, তুই সত্যিই আমায় চাস না ?

বিন্দুবাসিনী বললো, আমার এই জনার্দন রয়েচে, আমি কি আর অন্য কোনো মানুষকে চাইতে পারি ?

গঙ্গানারায়ণ সরোষে সে মূর্তির দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, আমি ভেঙে ফেলবো এই পাথরের ঠাকুর।

বিন্দুবাসিনী তার হাত চেপে ধরে বললো, তুই কি সত্যি পাগল হলি ? এসব কথা তো তোর মুখে কখনো শুনিনি ? তোর কী হয়েচে আমায় সব বল তো !

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমি ক'দিন জ্বরে পড়েচিলাম, আমার কিচুই ভালো লাগচিল না। আমার বন্ধুরা এসেচিল, তাদের সঙ্গও আমার ভালো লাগেনি। মা বলেচিলেন, বাগবাজার থেকে লীলাবতীকে আনবেন, আমি বলিচিলুম, থাক মা। সে পুতুল খেলা নিয়ে আচে থাক। আমি তো সেবা চাইনি, আমি চেয়িচিলুম সাহচর্য। লীলাবতী তো আমায় তা দিতে পারে না, সে এখনও অবোধ বালিকা···আমার খুব অভিমান হচ্চিল, তুই আমাকে ভুলে গেচিস।

—আমি কি তোকে কখনো ভুলতে পারি, গঙ্গা ? আমার আর কী আচে যে তোকে ভুলবো ?

—এই যে বললি, তোর জনার্দন আচে ? কিন্তু আমার আর কেউ নেই, আমি অনেক ভেবে দেখিচি, তুই দূরে থাকলে আমি কিছুতেই শান্তি পাবো না। আমার কোনো আশ্রয় নেই, অথচ তুই বারবার আমাকে ঠেলে দিস···কেন বিন্দু, কেন, আমার জন্য তোর টান হয় না ?

—চল গঙ্গা, আমরা ঠাকুরঘরের বাইরে যাই।

—তুই এখনো ভাবচিস, আমি এখানে থাকলে তোর জনার্দনের ঘর অপবিত্র হয়ে যাবে ? আমি সত্যিই একদিন ভুঁয়ে আছড়ে তোর এ ঠাকুরকে ভেঙে ফেলবো !

—তুই বুঝি বেহ্মদের দলে নাম লিকিয়িচিস ? শুনলুম তুই দেবেন ঠাকুরের বাড়িতে যাতায়াত করিস আজকাল ?

—তোকে কে বললে ?

—তুই ভাবিস আমি তোর খবর রাখি না। কিন্তু আমি সব খবরই রাখি।

—শুধু আমি কাচে এলেই তুই দূরে ঠেলে দিস ! আজ আমি তোকে ছাড়বো না। আজ আমাকে বাধা দেবার কেউ নেই।

—ছিঃ ! বাড়িতে কেউ নেই বলেই বুঝি তোকে চোরের মতন আসতে হবে ! তুই তো রাজা, তুই যেখানে যাবি, রাজার মতন যাবি ! তোর কত যাবার জায়গা আচে। আমি দূরেই থাকবো, সেই তো আমার নিয়তি।

—আমি নিয়তি মানি না।

—তুই মানিস না, কিন্তু আমায় মানতেই হবে। আমি যে স্ত্রীলোক।

এই কথা বলেই বিন্দু হাসলো। তার কণ্ঠে একটুও দুঃখের সুর নেই। ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে অন্ধকার গাঢ় হয়েছে, গবাক্ষের বাইরে আকাশে জ্যোৎস্নাধারা।

—তুই হাসলি কেন ?

—আমরা একসঙ্গে পড়াশুনো কত্তুম, তোর মনে আচে ? হঠাৎ পণ্ডিতমশাই একদিন বলেচিলেন, আমি আর বালিকা নই, আমি স্ত্রীলোক। তখন অবাক হয়িচিলুম, রাগও ধরেছিল খুব। কিন্তু এখন তো সত্যিই আমি স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের অনেক কিচুই করতে নেই, এমনকি ছেলেবয়সের খেলার সাথী যে তুই, সে তুই-ও এখন আমার কাচে পরপুরুষ, তোর কাচাকাচি আমায় বসতে নেই। তুই এটা বুঝিস না ?

—না। আমি বুঝবো না। বিন্দু, আমি তোকে চাই।

—এ জন্মে নয়।

—হ্যাঁ, এ জন্মেই !

গঙ্গানারায়ণ আবার বিন্দুবাসিনীর দু বাহু চেপে ধরে তার সুমেরু পর্বত সদৃশ স্তনের ওপর ব্যাকুল মুখখানি চেপে ধরলো।

নিশ্বাস রোধ করে শরীর শক্ত করে রইলো বিন্দু। তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললো, ছাড়, আমাকে একবার ছাড়, আগে আমার একটা কতা শোন।

—আমি আর তোর কোনো কতা শুনবো না।

—তুই একবার ছাড়, তারপর তোর সব কথা আমি শুনবো।

গঙ্গানারায়ণ ছেড়ে দিতেই বিন্দুবাসিনী ঝটিতি উঠে পড়েই ছুটলো ঘরের বাইরে গঙ্গানারায়ণও তৎক্ষণাৎ তাড়া করে গেল তাকে। নীচের তলার দাসদাসীরা কেউ ওপরে আসবে না, দ্বিতল, ত্রিতল সম্পূর্ণ ফাঁকা। বিন্দুবাসিনী কোথায় লুকোবে ? নীচে যাবার সিঁড়িতে পৌঁছোবার আগেই গঙ্গানারায়ণ তাকে ধরে ফেলবে বুঝতে পেরে সে ছুটতে লাগলো ছাদের দিকে।

যেন বাল্যকালের মতন পরস্পরকে ধরার খেলা। এককালের দুই শিশু-খেলুড়ে এইরকম ভাবেই ছাদে ছুটোছুটি করতো। তবে তখন সব খেলাই ছিল উদ্দেশ্যহীন, কিন্তু দুই যুবক-যুবতী আধো অন্ধকার ছাদে সে প্রকার অনাবিল উদ্দেশ্যহীন খেলা আর খেলতে পারে না।

গঙ্গানারায়ণ অচিরেই ধরে ফেললো বিন্দুবাসিনীকে। সবলে তাকে নিজ শরীরের সঙ্গে চেপে ধরে ক্ষ্যাপার মতন তার সারা মুখে চুম্বন বর্ষণ করতে লাগলো।

একবার ক্ষণেকের জন্য গঙ্গানারায়ণ নিবৃত্ত হতেই বিন্দু বসে পড়লো তার পায়ের কাছে। গঙ্গানারায়ণের জানু ধরে, এতক্ষণ বাদে এই প্রথম সে ব্যথিত গলায় বললো, গঙ্গা, আমি পাপ করতে পারবো না। কিছুতেই পারবো না। তুই আমার বন্ধু হয়েও এমন সর্বনাশ কর্বি ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, পাপ ? এই যদি পাপ হয়, তবে পুণ্য কী ? লোকে যাকে পুণ্য বলে, তার সব কিচু আমি পরিত্যাগ করতে রাজি আচি। আমার যথাসর্বস্বের বিনিময়েও আমি তোকে চাই, এই কি পাপের চাওয়া ?

বিন্দু বললো, তুই এসব আর আমাকে বলিসনি। এ জন্মটা আমার এইভাবেই যাবে। আশীর্বাদ কর, যেন পরের জন্মে তোকে আমার নিজের করে পেতে পারি।

গঙ্গানারায়ণ নিজেও হাঁটু গেড়ে বিন্দুর মুখোমুখি বসে পড়ে বললো, পরজন্ম আছে কিনা কে বলতে পারে ? তার জন্য এ জন্মটায় নিজেকে বঞ্চনা করা মূর্খামি নয় ? আর বিন্দু, এই দেশ কিংবা এই সমাজের বাইরেও অন্য দেশ, অন্য সমাজ আচে, চল, আমরা সেরকম কোনো স্থলে চলে যাই। সেখানে কেউ আমাদের চিনবে না।

বিন্দু বললো, কিন্তু আমরা কি নিজের কাচ থেকে পালাতে পারবো ? আমি নিজেই যে জানি, এটা পাপ !

—না, পাপ নয়।

—গঙ্গা, তুই আমাকে ছাড়, আমি পারবো না, কিছুতেই পারবো না।

—বিন্দু, তোকে আমি ছাড়তে পারি না, তোর এই অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি, এমন দেবীর মতন মুখের শোভা—আমার বুকে তুই আগুন জ্বালিয়িচিস বিন্দু।

গঙ্গানারায়ণ ফের বিন্দুকে বক্ষে টানতে যেতেই বিন্দু দু হাতে তাকে বাধা দিয়ে বললো, তুই যদি আমার ওপর জোর করিস তবে তুই শুধু আমার শরীর পাবি, মন পাবি না। আর আজ রাতেই আমি গলায় ফাঁস বেঁধে মরবো। তুই তো আমার জেদ জানিস ?

গঙ্গানারায়ণ বিন্দুকে ছেড়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ ভাবে বিন্দুর মুখখানি পরীক্ষা করতে করতে বললো, এমন ? সত্য করে বল তো, অপর কারোর ওপর তোর মন মজেচে ?

—ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই, গঙ্গা।

—বিন্দু, তুই আমাকে চাস না ?

—এমন নোংরা, কদর্যভাবে তোকে আমি চাই না। আমার কাচে তুই থাকবি শুদ্ধ, সুন্দর, জ্যোতির্ময়রূপে।

উঠে দাঁড়িয়ে গঙ্গানারায়ণ বললো, আমি চললুম। আর আমি তোর কাচে কোনোদিন আসবো না।

বিন্দুবাসিনী কোনো উত্তর দিল না।

গঙ্গানারায়ণ আবার বললো, আমার মাথার মধ্যে কেমন আগুন জ্বলচে, তুই কিচুই বুঝলি না। জানি না, এখন কিসে শান্তি পাবো। আমাকে না দেখলেই তুই খুশী হোস তো, আমি আর আসবো না তোর কাচে।

বিন্দু এবারও কোনো কথা বললো না। ছাদের আলসেতে হেলান দিয়ে বসে রইলো হাঁটুতে চিবুক ভর দিয়ে।

গঙ্গানারায়ণ পিছন ফিরে ক্রুদ্ধভাবে চলে গেল, সিঁড়িতে তার পদশব্দ হতে লাগলো, তবু কেউ তাকে ফিরে আসবার জন্য ডাকলো না। পথ দিয়ে সে পদব্রজে ধাবিত হলো নিজের বাড়ির দিকে। এ গৃহও শূন্য। কারুর সঙ্গে কথা বলে যে সে তার মস্তিষ্ক জুড়োবে, তার উপায় নেই। অথচ বন্ধু-বান্ধব কারো কাছে যেতেও তার ইচ্ছে হলো না। শান্ত, মৃদু স্বভাবের গঙ্গানারায়ণ আজ অত্যন্ত চঞ্চল ও উদ্‌ভ্রান্ত। শহরে স্ত্রীলোকের অভাব নেই। ইচ্ছা হলে গঙ্গানারায়ণ এখনই জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে কোনো রূপসী সঙ্গীতপটীয়সী বারাঙ্গনার গৃহে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে, তার এখন অর্থেরও অভাব নেই। কিন্তু বিন্দুবাসিনী ছাড়া আর কোনো রমণী তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। বিন্দু তার জীবনে শুধু নারীর প্রয়োজন মেটাবে না, বিন্দু তার চেয়েও বেশী অনেক কিছু। সেই বিন্দু তাকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দিল।

সেই সন্ধ্যাকালেই নিজের শয্যায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলো গঙ্গানারায়ণ।

গঙ্গানারায়ণের এই চাঞ্চল্য এর পরের কয়েকদিনেও কমলো না একটুও। অথচ মন শান্ত করা দরকার। অনেকটা শান্তি পাওয়া যায় দেবেন্দ্রবাবুর কাছে গিয়ে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীগুলি শুনলে।

তার কলেজ জীবনের সহপাঠী রাজনারায়ণ বসু এখন দেবেন্দ্রবাবুর তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে উপনিষদ অনুবাদকের চাকুরি করে। একসময় রাজনারায়ণ অতিরিক্ত মদ্যপান শুরু করেছিল, এখন কিছুটা শুধরেছে। রাজনারায়ণ একসময় ছিল সংশয়বাদী, সকল ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো, এখন যেন তার মন খানিকটা ফিরেছে ধর্মপথে। দেবেন্দ্রবাবু উপনিষদের শ্লোকগুলি পাঠ করে তারপর তার অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেন। সেই শুনে শুনে রাজনারায়ণ এই শ্লোকগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করে। উপনিষদের দুরূহ শ্লোকগুলি দেবেন্দ্রবাবু এমনই প্রাঞ্জল ও সুললিত ভাষায় ব্যাখ্যা করেন যে তা শুনবার জন্য অনেকেই সেখানে ভিড় করে। গঙ্গানারায়ণ একদিন তার বন্ধু রাজনারায়ণের সঙ্গে গিয়ে দেবেন্দ্রবাবুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। দেবেন্দ্রবাবুও তাকে প্রীতির চক্ষে দেখেন।

কয়েকদিন সেখানে গিয়েও গঙ্গানারায়ণের মন শান্ত হলো না। ধর্ম, দর্শন, সমাজ, সংস্কার কিছুই যেন আর তার ভালো লাগে না। মন সর্বক্ষণ বিন্দুর সান্নিধ্যে যাবার জন্য ছটফট করে। নিজেকে শান্তি দেবার জন্য সে জমিদারি পরিদর্শনে চলে গেল কুষ্টিয়ায়।

সেখানে পৌঁছেই বুঝলো, সে আরও ভুল করেছে। কলকাতায় তবু বরং এটুকু সান্ত্বনা ছিল যে, বিন্দু অদূরেই আছে, ইচ্ছা করলেই সে ছুটে গিয়ে বিন্দুকে একবার দেখে আসতে পারে। কিন্তু কুষ্টিয়া যেন তার কাছে মরুভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হলো। কাজকর্ম সব অসমাপ্ত রেখে সে আবার ফিরে এলো কলকাতায়।

আবার এক সায়াহ্নে সে বিন্দুর ঠাকুরঘরে উপস্থিত হয়ে বললো, আমি হার মানলাম বিন্দু। তোকে ছেড়ে আমি কিছুতেই দূরে রইতে পাচ্চি না!

বিন্দু রাগ করলো না, বরং সুমিষ্ট স্বরে তাকে বললো, আয়, দোরের কাচে বোস। শরীরের উপর খুব

বুঝি অযত্ন করচিস ?

কিন্তু শুধু বিন্দুর সুমিষ্ট বাক্য শুনলেই গঙ্গানারায়ণের মন ভরে না আর। দূরে থাকার সময় সে ভেবেছিল, বুঝি একবার বিন্দুর মুখখানি দেখলেই তার হৃদয় জুড়োবে। কাছে এসে বুঝলো, পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখার দিকে ধায়, তেমনি বিন্দুর রূপরাশির মধ্যে সে চায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হতে।

বিন্দু কিছুতেই তাকে প্রশ্রয় দেবে না। গঙ্গানারায়ণ যদি দূরে বসে তার সঙ্গে গল্পগাছা করতে চায় তার আপত্তি নেই, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ তার হস্ত আকর্ষণ করলেই বিন্দু বলে, তুই কি চাস আমি মরি ? পাপের পথে যাওয়ার চেয়ে মরণও ভালো।

গঙ্গানারায়ণ প্রশ্ন করে, আর কিছু নয়, আমি যদি তোর ক্রোড়ে মাথা দিয়ে শুই, তাও কি পাপ ?

বিন্দু বলে, অমন কতা উচ্চারণ করাও পাপ। এমন কি হাতে হাত ছোঁয়াও পাপ।

গঙ্গানারায়ণ উন্মত্তবৎ হয়ে উঠলো। সে জিদ ধরলো, বিন্দুর এই প্রতিরোধ সে ভাঙবেই। বিন্দুকে না পেলে তার জীবনের আর সব কিছু ব্যর্থ। তার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান রইলো না। অফিস-কাছারি থেকে সে যখন তখন চলে এসে বসে থাকে বিন্দুর কাছে। সে গৃহে তার অবারিতদ্বার। যে-কোনো সময় সে আসতে পারে, যার কাছে খুশী সে যেতে পারে, কেউ তাকে বাধা দেবে না। কিন্তু সে যে আর কারো কাছে নয়, শুধু সর্বক্ষণ বিন্দুর কাছেই নিভৃতে বসে থাকে, এটা যে দৃষ্টিকটু এ বোধ তার লুপ্ত হয়ে গেছে। বিন্দুকে ছাড়া এ জগতের আর কিছুই যেন সে এখন দেখতে পায় না।

এক নিঝুম দ্বিপ্রহরে গঙ্গানারায়ণ আবার বিন্দুর ওপর বলপ্রয়োগ করতে গেল। বিন্দু সেদিন কেঁদে ফেললো একেবারে। বিন্দু বড় অসহায়। সে চিৎকার চেঁচামেচি করতে পারে না, কারণ গঙ্গানারায়ণ যে তার বড় প্রিয়, গঙ্গানারায়ণের সম্মানহানি হোক, তাই বা সে চাইবে কী করে ! সে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, আমার মরণই ভালো। তুই কেন এমনভাবে নিজের সর্বনাশ করচিস গঙ্গা ? তুই আমায় বিষ এনে দে !

গঙ্গানারায়ণ বিন্দুকে বক্ষে আঁকড়ে ধরে বলতে লাগলো, আমি আর কিচু জানি না, আয় আজ তুই আমি দুইজনে মরণ-উৎসবে মাতি।

বিন্দু ফিসফিস করে বললো, ছেড়ে দে, ওরে আমায় ছেড়ে দে, আমায় এমনভাবে নরকের দিকে নিয়ে যাসনি—

পক্ষকাল ধরেই এ বাড়ির দাসদাসী মহলে পাঁচরকম কথা কানাকানি হচ্ছিল। কথা পৌঁছেছিল বাড়ির গৃহিণীরও কানে। দাসী সমভিব্যাহারে বিন্দুর মা নিজে সেই সময় এসে এ দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলেন। গৃহদেবতার সামনে ব্যভিচারক্রিয়া চলছে।

তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকলেন, বিন্দু !

তারপর কপাল চাপড়ে বললেন, হা অদৃষ্ট, এ কি কল্লে ? বিন্দু, পোড়ারমুখী, ঘরজ্বালানী, তুই মরলিনি কেন ? তোর মনে মনে এই ছেল ? গঙ্গা আমাদের সোনার টুকরো ছেলে, তুই তার ওপর বিষ নজর দিইচিস ! ডাইনী !

গঙ্গানারায়ণের চৈতন্য উদয় হলো। বিন্দুর কাছ থেকে সরে এসে নতমস্তকে বললো, খুড়িমা, দোষ আমার। বিন্দুর কোনো দোষ নয়।

বিন্দু পাষাণমূর্তির মতন স্থির।

বিন্দুর মা সৌদামিনী গঙ্গানারায়ণকে বললেন, গঙ্গা, তুমি সরে এসো, ও ডাইনীর কাচে থেকো না। আমার পেটে আমি এই বিষপুঁটুলি ধরিচিলাম। ওফ !

গঙ্গানারায়ণ বাইরে বেরিয়ে আসতেই তিনি দরজা টেনে শিকলি বন্ধ করে দিয়ে বললে, ও থাকুক এখানে। কত্তা এসে ওকে নিয়ে যা করার করবেন। তুমি এসো, গঙ্গা, নীচে এসো—

দাসীর দিকে ফিরে গৃহকর্ত্রী কড়া সুরে বললেন, দেখিস, খপরদার যেন এ সব কথা পাঁচ কান হয় না ! তাহলে তোর জিভ কেটে দোবো !

গঙ্গানারায়ণ আচ্ছন্নের মতন বললো, আপনি···বিন্দুকে বন্ধ করে রাখলেন···দোষ যে সব আমার···আমিই ওর ওপর জোর খাটাচ্ছিলুম···।

গঙ্গানারায়ণ কিছুতেই সেখান থেকে যাবে না। কথাবার্তা উচ্চগ্রামে উঠছে ক্রমশ। দৈবাৎ সেদিন বিধুশেখরও গৃহে ছিলেন, তিনি উঠে এলেন ওপরে।

তাঁকে দেখে সবাই চুপ করে গেল।

গঙ্গানারায়ণ কম্পিতবক্ষে বললো, খুড়ামশাই, বিন্দুকে ক্ষমা করুন। আমার মতিভ্রম হয়েছেল, আমি

বিন্দুর উপর লোভ করিচিলুম, কিন্তু বিন্দু আমায় শেষ পর্যন্ত নিবৃত্ত করেচে···যা শাস্তি দেবার আমায় দিন··· ।

বিধুশেখর দরজা খুলে দেখলেন বিন্দুকে। বিন্দু ঠিক সেই একই রকম স্থির। আলুলায়িত বসনও ঠিক করেনি। যেন সে দক্ষের যজ্ঞ সভায় সতীর মতন নিশ্বাস রোধ করে বসে আছে।

বিধুশেখর বিন্দুকে কিছুই বললেন না, গঙ্গানারায়ণকে আদেশ করলেন, এসো আমার সঙ্গে।

সে আদেশ অমান্য করার সাধ্য গঙ্গানারায়ণের নেই। সে বিধুশেখরের সঙ্গে নীচে নেমে এলো। বিধুশেখর পোশাক পরিবর্তন করলেন না পর্যন্ত। সেইভাবেই গঙ্গানারায়ণকে নিয়ে তাঁর ল্যাণ্ডো গাড়িতে উঠলেন।

গঙ্গানারায়ণ ভেবেছিল, বিধুশেখর তাকে নিয়ে তাদের বাড়িতে চলে আসবেন। পিতা রামকমল শহরে নেই। মাতা বিম্ববতীর সামনে গিয়ে কিছু একটা বোঝাপড়া করবেন বিধুশেখর। কিন্তু তিনি সহিসকে সোজা যাবার হুকুম দিলেন।

পথে একটিও কথা বললেন না বিধুশেখর। তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের সামনে গঙ্গানারায়ণ যেন কুঁকড়ে যেতে লাগলো। তবু তৎক্ষণাৎ সে মনে মনে একথাও ঠিক করে রাখলো, যদি তাকে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করাও হয়, তবু সে বিন্দুবাসিনীকে কোনো শাস্তি দেওয়া সহ্য করবে না। সে রুখে দাঁড়াবে।

অনেকক্ষণ পর বিধুশেখরের নির্দেশে গাড়ি এসে দাঁড়ালো বউবাজারের সুবিখ্যাত কালীমন্দিরের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে গঙ্গানারায়ণকে বিধুশেখর বললেন, এসো।

সন্ধ্যা হয় হয়। এস্থলে এখন ভক্তবৃন্দের খুব ভিড়। গেঁজেল ও সুরাপায়ীদের গদ্‌গদ চিৎকারে কান পাতা দায়। তবে এ মন্দিরের পাণ্ডা-পূজারীরা বিধুশেখরের পরিচিত। তিনি ভিড় ঠেলে উপস্থিত হলেন একেবারে গর্ভ গৃহে। প্রতিমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে গঙ্গানারায়ণকে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

তারপর নিম্ন স্বরে বললেন, গঙ্গা, তুমি আজ যা করেচো, তা কোনোদিন কেউ জানতে পারবে না। তোমার পিতামাতা কিচুই টের পাবেন না। তোমার সংসারে কোনো অশান্তি ঘটুক আমি চাই না। শুধু তুমি শপথ করো, আর কোনোদিন তুমি বিন্দুকে দেকতে যাবে না, আর কোনোদিন তুমি তার সঙ্গে কতা পর্যন্ত বলবে না।

গঙ্গানারায়ণ একটুক্ষণ ইতঃস্তত করে বললো, আমি এ শপথ করতে রাজি আচি। কিন্তু আপনিও বিন্দুকে কোনো শাস্তি দেবেন না বলুন! সে নিরপরাধ।

বিধুশেখর বললেন, বেশ, সেকথাও আমি দিলুম।

গঙ্গানারায়ণ তখন মূর্তির সামনে গড় করে বিড়বিড় করে ঐ শপথ বাক্য উচ্চারণ করলো।

কিন্তু এ ঘটনার তিন-চারদিন পরই গঙ্গানারায়ণ খবর পেল যে, বিন্দুবাসিনী তার নিজের বাড়িতে আর নেই। সে কোথায় গেছে কেউ জানে না।

গঙ্গানারায়ণ ছুটে গেল বিধুশেখরের কাছে। উত্তেজিতভাবে বললো, খুড়ামশাই, আপনি যে কতা দিয়েচিলেন—

বিধুশেখর বললেন, আমি ঠিকই আমার কথা রেখিচি, গঙ্গা। বিন্দুকে কোনোরূপ শাস্তি দিইনি, সে ভালো আচে। আমি বরং তোমার শপথ রক্ষার ব্যাপারটা অনেক সহজ করে দিইচি। কাশীতে পাঠিয়ে দিইচি বিন্দুকে। সে আর কোনোদিন এখানে আসবে না। সেখানেই সে ভালো থাকবে।

দ্বারকানাথ আবার বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। স্বদেশে আর তাঁর মন টিকছিল না, জ্যেষ্ঠপুত্রের ব্যবহারে তিনি ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। তাছাড়া এখানে তাঁর প্রাণের দোসর বলতে আর কেউ নেই। তাঁকে সকলে ভয় পায় বা শ্রদ্ধা করে, কেউ ভালোবাসে না। বাণিজ্যে ও জমিদারি পরিচালনায় কৃতিত্বে তিনি সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। উপার্জন করেছেন প্রভূত ধন-সম্পদ, কিন্তু এক সময় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে

ভাবলেন, কী লাভ এত পরিশ্রমে ? তাঁর উত্তরাধিকারীরা যদি এ সব রক্ষা করতে না পারে বা না চায়, তাহলে তিনিই বা আর লক্ষ্মীর পিছনে ছোটাছুটি করে আয়ুক্ষয় করবেন কেন ? বরং এবার দু হাতে ব্যয় করে যাবেন। ইওরোপে তাঁর অগাধ খাতির, রূপসী ললনারা তাঁকে ঘিরে থাকবে সেখানে। সেদেশের খাদ্য ও মদ্যও অতি উচ্চশ্রেণীর।

বিলাত যাত্রার সময় দ্বারকানাথ সঙ্গে প্রচুর ধনসম্পদ তো নিয়ে গেলেনই, তাছাড়া তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রকে কঠোর নির্দেশ দিয়ে গেলেন যেন তাঁকে হাতখরচ হিসাবে প্রতিমাসে একলক্ষ টাকা পাঠানো হয়। এবং এবার তিনি কতদিন থাকবেন, তার কোনো ঠিক নেই। একলক্ষ টাকা অর্থাৎ যা দিয়ে পাঁচ হাজার ভরি সোনা ক্রয় করা যায়।

দ্বিতীয়বার প্রবাস যাত্রার আগে দ্বারকানাথের মনে সামান্য একটু সংশয় ছিল, এবারেও তিনি পূর্বেকার মতন সমাদর পাবেন তো ? প্রথম পরিচয়ের বিস্ময় দ্বিতীয়বার অনেকটা কমে যায়। তাছাড়া, তিনি আগেরবার যখন এসেছিলেন, তখন ইওরোপের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁকেই প্রথম একজন হিন্দু বা ভারতীয় হিসেবে চাক্ষুষ দেখলেন। এক রূপকথার দেশ হিন্দুস্থান বা ভারতবর্ষ, সেখানকার মানুষকে দেখতে কেমন, এই কৌতূহলই ছিল প্রবল। এবারে ইওরোপে পৌঁছেই দ্বারকানাথ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য একেবারে বিলাসের স্রোত বইয়ে দিলেন।

দ্বারকানাথ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন ছোটখাটো একটি দল। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ, তাঁর ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র, একজন নিজস্ব ইংরেজ চিকিৎসক, একজন ইংরেজ একান্ত সচিব, কয়েকজন ভৃত্য কর্মচারী। এ ছাড়া মেডিক্যাল কলেজের দুজন ছাত্রকে তিনি উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ দেবার জন্য তাদের পথ-খরচ এবং বিলাতে তাদের আহার, বাসস্থান ও শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এসেছে সেই দুটি ছাত্র এবং সরকারী খরচে আরও দুটি ছাত্র। বিলেতে পৌঁছে তিনি প্রথমেই ঐ ছাত্রদের এবং তাঁর পুত্র ও ভাগিনেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাদের পৃথক পৃথক বাসা ভাড়া করে দিলেন। তারপর দায়িত্বমুক্ত হয়ে তিনি স্বেচ্ছামার্গী হলেন।

আগের বার এসে তিনি সাহেব জাতিরা কী কী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছে এবং শিল্পে-বাণিজ্যে কোন্ কোন্ অভিনব পন্থা অবলম্বন করে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানবার চেষ্টা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর স্বদেশেও সে-সব পন্থা প্রয়োগ করবেন। কিন্তু এবারে দ্বারকানাথ স্বদেশের উন্নতি কিংবা নিজ পরিবারের সম্পদ বৃদ্ধির ব্যাপারে উদাসীন। এখন তিনি নৃত্য, গীত, ভোজের আসর কিংবা থিয়েটার, অপেরা সম্পর্কে বেশী আগ্রহী। রানী ও রানীর স্বামীর (বিলাত এমনই দেশ, যেখানে রানীর স্বামী সব সময় রাজা হন না) জন্য তিনি স্বর্ণনির্মিত বহুমূল্য সব উপহার নিয়ে এসেছিলেন, রানী ও যুবরাজ সেগুলি পেয়ে অতিশয় উৎফুল্ল হলেন। রাজপ্রাসাদে দ্বারকানাথের ঘন ঘন ডাক পড়তে লাগলো। তাছাড়াও প্রখ্যাত সব ডিউক ও ডাচেস এবং লর্ড ও লেডিগণ পরিবৃত হয়ে তিনি থাকেন প্রায় সর্বদা। কেউ তাঁকে নিমন্ত্রণ করলে তিনিও সমান বা তার চেয়ে বেশী জাঁকজমকের সঙ্গে তাঁদের পালটা নিমন্ত্রণ করেন। মাঝে মাঝে তিনি প্রখ্যাত সব সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের ডেকে আসর জমান নিজের গৃহে। তিনি চান, ইংলণ্ডের লোক বুঝুক পরাজিত জাতির প্রতিনিধি হয়েও একজন ভারতবাসী তাদের সমকক্ষ হতে পারে সব দিক দিয়ে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধিবেশন দেখে দ্বারকানাথের মনে একটি নতুন চিন্তা এলো। ব্রিটিশ প্রজাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই পার্লামেন্টের আসন অলঙ্কৃত করেন। তাহলে ভারতীয়রাই বা কেন সেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না ? আর ভারতীয়দের মধ্যে দ্বারকানাথের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি কে হতে পারে ? পার্লামেন্টের আসন পেলে দ্বারকানাথের বিলাতে অবস্থান স্থায়ী হতে পারে।

এক নৈশভোজের নিমন্ত্রণের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী একদিন নিজে এলেন দ্বারকানাথের বাসভবনে। তখন কথা প্রসঙ্গে দ্বারকানাথ পার্লামেন্টে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেন। অস্বস্তিতে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী। এই মহামান্য অতিথির মনে আঘাত লাগবে এমন কোনো কথা তিনি বলতে পারেন না। প্রকারান্তরে তিনি জানালেন যে সেখানে কোনো অ-ব্রিটিশের নির্বাচিত হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। দ্বারকানাথ চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বললেন, তিনি যে কোনো স্থান থেকেই নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জয়ী হতে পারবেন ! প্রধানমন্ত্রীকে তখন বলতেই হলো যে, ধরা যাক যদি সেরকমই হয়, তবুও কোনো হিন্দুর পক্ষে পার্লামেন্টে শপথ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। খৃষ্টান ছাড়া আর কারুর সে অধিকার নেই।

দ্বারকানাথ প্রশ্ন করলেন, হিন্দু খৃষ্টানে তফাৎ কী ? হিন্দুও একমাত্র এক পরমেশ্বরের ভজনা করে,

খৃষ্টানেও কি তা করে না ? হিন্দু ও খৃষ্টানে তো ধর্মবিশ্বাসের কোনো সংঘর্ষ নেই, তবে তারা পাশাপাশি কেন বসতে পারবে না পার্লামেন্টে ?

প্রধানমন্ত্রী বললেন, খৃষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যীশুকে কি আপনারা ঈশ্বরের পুত্র বলে মানেন ? যারা তা মানে না, তাদের আমরা বিপথগামী বলে মনে করি।

আলোচনা অপ্রিয় দিকে মোড় নিচ্ছে বলে উভয়েই এক সময়ে থেমে গেলেন। কিন্তু দ্বারকানাথের মনে বিক্ষোভ রয়েই গেল। এই ঘটনার পর থেকে তাঁর মনে খৃষ্টীয় ধর্ম সম্পর্কে একটা বিরূপতার ভাব জমতে লাগলো ধীরে ধীরে। দেশে থাকতে তিনি ব্রাহ্মণদের ছুঁৎমার্গ ও কুসংস্কার দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। এবার তিনি পাদ্রীদের নাম দিলেন কালো কোট পরা বিলাতী ব্রাহ্মণ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে ঘেঁটে যখনই তিনি পাদ্রীদের কোনো পদস্খলন বা লজ্জাজনক ব্যবহারের কাহিনী দেখেন অমনি সেগুলি কেটে কেটে গঁদ দিয়ে সেঁটে রাখতে লাগলেন একটা খাতায়। তাঁর কোনো ইওরোপীয় বন্ধু বা অতিথি খৃষ্টধর্মের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি শুরু করলেই তিনি সেই খাতাটি খুলে দেখান।

মাঝখানে কিছুদিন দ্বারকানাথ ঘুরে এলেন ফ্রান্সে। ফরাসী দেশের সম্রাট লুই ফিলিপ প্রায় তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু হয়ে পড়েছেন। ভার্সাইয়ের রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরেও দ্বারকানাথের গতিবিধি, সম্রাটের পত্নী ও ভগিনীর সঙ্গে এর আগে আর কোনো বহিরাগত কথাবার্তা বলার সম্মান অর্জন করেননি, একমাত্র দ্বারকানাথ ছাড়া। দ্বারকানাথের অঙ্গে দেশীয় পোশাক এবং একটি বহুমূল্য কাশ্মিরী শাল, তা দেখে মহিলারা মুগ্ধ। এ রকম বাহারী জিনিস তারা আগে কখনো দেখেনি।

ফরাসী দেশে এক সান্ধ্য সম্মিলনীর আয়োজন করে দ্বারকানাথ সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী সমেত ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ অভিজাতদের নিমন্ত্রণ করলেন সেদিন। তিনি বিশেষ করে অনুরোধ করলেন সকলেই যেন তাঁদের স্ত্রী বা প্রেয়সীদের নিয়ে আসেন। একটি বিরাট হলঘরে বসেছে সেই সান্ধ্যভোজের আসর। সেই হলঘরের সব দেয়াল বহুমূল্য সব কাশ্মিরী শালে মোড়া। অতিথিরা, বিশেষত রমণীরা সেই কারুকার্যখচিত শালগুলি থেকে চোখ ফেরাতে পারছেন না। শাল অঙ্গে জড়ানো এখন ফরাসীদেশে একটি দারুণ ফ্যাসানদস্তুর ব্যাপার। কিন্তু এমন চমৎকার কাশ্মীরী শাল ফরাসিনীরাও দেখেননি। কোনো নীলনয়না সুন্দরী দেয়ালের কোনো কাশ্মিরী শালের সামনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেই দ্বারকানাথ এসে বলছেন, মহাশয়া, এই শালটি আপনাকে উপহার দিয়া আমি ধন্য হতে পারি কি ? তারপরই তিনি দেয়াল থেকে সেই শালটি খুলে নিয়ে বিস্ময়াপ্লুত সেই রমণীর শরীরে নিজের হাতে জড়িয়ে দিলেন। ক্রমে ক্রমে সব ক'টি শালই এইভাবে বিলি হয়ে গেল। এমন নিমন্ত্রণ উৎসব বহুকাল কেউ প্যারিসে দেখেননি।

প্যারিসে অবস্থানকালেই দ্বারকানাথের সঙ্গে পরিচয় হলো ম্যাক্সমুলারের। দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রর চেয়েও ম্যাক্সমুলার বছর ছয়েকের ছোট। এই যুবকটি তখন জার্মানির লাইপৎসিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ ডি করে ফ্রান্সে এসে অধ্যাপক বুর্ণুফের কাছে সংস্কৃত অধ্যয়ন করছেন। সেই বুর্ণুফই একদিন ম্যাক্সমুলারকে নিয়ে এলেন দ্বারকানাথের কাছে। দ্বারকানাথ নিজে সংস্কৃত অবশ্য ভালো জানেন না, কিন্তু অধ্যাপক বুর্ণুফ এবং ম্যাক্সমুলার সংস্কৃত শিক্ষার সূত্রে ভারতবর্ষ সম্পর্কে এমন সব কথা বলেন, যার সঙ্গে প্রকৃত ভারতবর্ষের সাদৃশ্য খুব কম—এ সব শুনে দ্বারকানাথ কৌতুক বোধ করেন। ম্যাক্সমুলার নামের যুবকটির কৌতূহলের আতিশয্য দেখে দ্বারকানাথ তাকে বললেন, যেদিন খুশী সকালবেলা সে তাঁর কাছে আসতে পারে। ম্যাক্সমুলার প্রায় নিয়মিতই আসতে লাগলেন। সংস্কৃত ভাষা ভালোভাবে না জানলেও পারিবারিক সূত্রে দ্বারকানাথ সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। তাঁর মুখ থেকে সেই সব কথা ম্যাক্সমুলার গোগ্রাসে গেলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে এই জার্মান যুবকটির আগ্রহ অসীম।

দ্বারকানাথ এই সময় গান-বাজনার চর্চায়ও মেতে উঠেছেন। ফরাসী ও ইতালীয় অপেরাগীতি তিনি অনুকরণ করতে পারেন অনবদ্যভাবে। তাঁর কণ্ঠস্বর জোরালো। মাঝে মাঝে সেই সব গান তিনি গেয়ে উঠলে ম্যাক্সমুলার শোনেন মুগ্ধভাবে। কখনো কখনো ম্যাক্সমুলার ওঁর গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজান। খুব একটা চর্চা না করলেও দ্বারকানাথের কণ্ঠে বেশ সুর আছে। একদিন ম্যাক্সমুলার দ্বারকানাথকে অনুরোধ করলেন একটি ভারতবর্ষীয় মার্গ সঙ্গীত শোনাবার জন্য। ভারতীয় প্রিন্স বললেন, ও গান

বিদেশীরা বুঝবে না। তবু ম্যাক্সমুলার বারবার পেড়াপীড়ি করায় তিনি একটি গান গাইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কী, এর মর্ম বুঝিলে কিছু ?

ম্যাক্সমুলার অকপটে স্বীকার করলেন যে, ঐ গানে তিনি কোনো রস পাননি, ওটি কোনো গান বলিয়া মনে হয় না। সুর তাল লয় কিছুই নেই।

অমনি চটে উঠলেন দ্বারকানাথ। রুক্ষ স্বরে বললেন, এই তোমাদের এক দোষ। তোমরা সহজে কোনো নতুন জিনিস গ্রহণ করিতে পারো না। কোনো জিনিস যদি প্রথমবারই তোমাদের মনোরঞ্জন করিতে না পারে, অমনি তোমরা তার প্রতি বিরূপ হও। আমি যখন প্রথম ইতালীয় গীতবাদ্য শুনি, তখন মনে হইয়াছিল উহা বিড়ালের চ্যাঁচামেচি। ধৈর্য ধারণ করিয়া আমি তাহার রস গ্রহণ করিতে শিখিয়াছি। তোমরা মনে করো আমাদের ধর্ম ধর্মই নয়, আমাদের কাব্য কাব্যই নয়, আমাদের দর্শন দর্শনই নয়, যেহেতু তোমরা তা বোঝো না।

ম্যাক্সমুলার চুপসে গেলেন একেবারে।

ইদানীং দ্বারকানাথের মেজাজ প্রায়ই ভালো থাকে না। দেশ থেকে টাকা আসতে সামান্য দেরি হলে, তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে তীব্র ভর্ৎসনা করে চিঠি লেখেন। দেবেন্দ্রকে তিনি জানিয়ে দেন, তিনি ভালোই বুঝতে পেরেছেন যে দেবেন্দ্র যে পথে চলেছে, তাতে বিষয়সম্পত্তি কিছুই রক্ষা করতে পারবে না।

এদিকে সত্যিই সেইপ্রকার ব্যাপার চলছে। পিতা বিদেশবাসী হবার পর দেবেন্দ্র বিষয়কর্ম থেকে মন একেবারেই সরিয়ে ফেলেছেন যেন। সর্বক্ষণ তিনি ধর্ম সাধনায় ও ধর্ম বিস্তারের জন্য উন্মুখ। ইতিমধ্যেই দীক্ষিত ব্রাহ্মর সংখ্যা পাঁচশত ছাড়িয়ে গেছে, এখন শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলেও এই নব ধর্ম প্রচারের আয়োজন চলছে।

একদিন সকালে দেবেন্দ্র তাঁদের বাহির বাটিতে বসে সংবাদপত্র পাঠ করছেন, এমন সময় তাঁদের হাউসের সরকার রাজেন্দ্রনাথ এসে তাঁর কাছে কেঁদে পড়লো। কাঁদতে কাঁদতে সে বললো, দেশে এত বড় অবিচার সংঘটিত হচ্ছে, অথচ তার প্রতিকার করার কেউ কি নেই ?

কাগজ মুড়ে রেখে দেবেন্দ্র বললেন, কান্না থামাও, আগে বৃত্তান্তটি কি তা খুলে বলো!

রাজেন্দ্রনাথ যে কাহিনীটি বললো, তা এই :

গত রবিবার রাজেন্দ্রনাথের স্ত্রী এবং তার ছোট ভাই উমেশচন্দ্রের স্ত্রী এক পালকিতে চেপে কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছিল এমন সময় তার ছোট ভাই উমেশচন্দ্র পালকি থামিয়ে জোর করে নিজের স্ত্রীকে নামিয়ে নিয়ে যায় এবং উভয়ে খৃষ্টান হবার নিমিত্ত পাদ্রী ডফ সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। উমেশচন্দ্রের বয়স চোদ্দ এবং তার পত্নীর বয়েস এগারো, উভয়েই নাবালক-নাবালিকা। সুতরাং স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হবার অধিকার তাদের নেই। উমেশচন্দ্রের পিতা ডফ সাহেবের কাছে গিয়ে অনুনয় বিনয় করলেন, পুত্র ও পুত্রবধূকে ফিরিয়ে দেবার জন্য। ডফ সাহেব তা শুনলেন না। তখন সুপ্রীমকোর্টে নালিশ করা হলো, সুপ্রীমকোর্ট অচিরাৎ রায় দিয়ে দিল যে ছেলে যখন বাপের কাছে ফিরে যেতে চায় না, তখন আদালত সেখানে জবরদস্তি করবে কেন ?

তখন রাজেন্দ্র এবং তার পিতা ডফ সাহেবের কাছে অনুরোধ করে বললো, তারা আবার আদালতে নালিশ আনবে, সেই বিচার সমাপ্ত হবার আগে পর্যন্ত যেন ডফ সাহেব উমেশচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রীকে খৃষ্টান না করেন। ডফ সাহেব সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। গতকল্য সন্ধ্যাবেলা ডফ সাহেব ওদের দুজনকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে ফেলেছেন।

ঘটনাটি শুনে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন দেবেন্দ্র। আদালত এমত প্রকার রায় দিয়েছে ? নাবালক-নাবালিকাকেও জোর করে ধর্মান্তরিত করা যাবে। এ তো স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব। এই কি ব্রিটিশ ন্যায়-এর উদাহরণ ?

তিনি তাঁর কর্মচারী ও বয়স্য অক্ষয় দত্তকে ডেকে বললেন, আপনি এক্ষণেই এর বিরুদ্ধে কলম ধারণ করুন। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকেরাও এইভাবে ক্রমে ক্রমে স্বধর্ম ছেড়ে পরধর্ম গ্রহণ করবে ? এই সাংঘাতিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেও কি আমাদের চৈতন্য হবে না!

দেবেন্দ্র নিজে গাড়ি নিয়ে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে লাগলেন। তাঁদের বোঝাতে লাগলেন যে, পাদ্রীরা বিনা পয়সায় লেখাপড়া শেখাবার প্রলোভন দেখিয়ে ছোট ছোট বালকদের নিজেদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করাচ্ছে এবং তারপরই প্রথম সুযোগে তাদের খৃষ্টান করে নিচ্ছে। হাজার হাজার ছেলে এইভাবে খৃষ্টান হচ্ছে। এইভাবে চললে যে এদেশের সবাই খৃষ্টান হয়ে যাবে!

পাদ্রীদের সংস্পর্শ থেকে এখনি ছেলেদের সরিয়ে আনা দরকার।

সম্ভ্রান্তদের মধ্যে অনেকেই দেবেন্দ্রকে সুনজরে দেখেন না। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে তিনি সনাতন হিন্দুধর্মকে আঘাত করার চেষ্টা করছেন বলে মনে করেন অনেকে। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের শিরোমণি রাধাকান্ত দেব ব্রহ্মসভার বিরুদ্ধে একটি ধর্মসভা স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তিনিও দেবেন্দ্রর এই ব্যাকুলতা দেখে তাঁর সঙ্গে একমত হলেন। উচ্চ ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে দু-একজন শুধু প্রশ্ন তুললেন, খৃষ্টান ধর্ম প্রসারে আপত্তি করার নৈতিক ভিত্তি কী ? খৃষ্টান ধর্মও তো একটি মহান ধর্ম। ধর্মবিশ্বাসে প্রতিটি মানুষ স্বাধীন, সুতরাং কেউ যদি হিন্দুধর্মের বদলে খৃষ্টধর্ম বরণ করতে চায়, তাহলে তাকে বাধা দেওয়া হবে কেন ?

দেবেন্দ্র বললেন, খৃষ্টধর্ম যে মহান তা আমি অবশ্য জানি। ধর্মবিশ্বাসে মানুষ স্বাধীন একথাও ঠিক। কিন্তু প্রধানত খৃষ্টান হয় কাহাদের সন্তানেরা ? খৃষ্টান হয় গ্রামের দরিদ্র মানুষ অথবা শহরের নব্য শিক্ষিত যুবকেরা। গ্রামের মানুষ খৃষ্টান হয় নানা প্রকার প্রলোভনে। আর শহরের যুবকেরা হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাহাদিগকে খৃষ্টান করা সহজ কাজ বটে, কিন্তু উচিত কাজ কিনা সেটাই প্রশ্নের বিষয়। পাদ্রীরা বেদান্তধর্ম সম্পর্কে নানা রকম গালাগালি করে এবং লোকের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করায়। সেইজন্যই আমি বলি, হিন্দুধর্ম ও খৃষ্টধর্মের মতামতগুলির সম্যক জ্ঞান দেশময় বিস্তারিত হোক। তারপর দুই ধর্মমত তৌল করে কেউ যদি একটিকে অন্যটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বেছে নেয়, তবে তো ভয়ের কোনো কারণ নেই।

দেবেন্দ্রর ব্যাকুলতা ও জোরালো যুক্তি শুনে সকলেই উপলব্ধি করলেন বিষয়টির গুরুত্ব। এইভাবে ভালো ভালো পরিবারের যুবকেরা, এমনকি নাবালক নাবালিকারাও যদি মোহে পড়ে খৃষ্টান হয়, তাহলে হিন্দুসমাজে ভাঙন রোধ করা যাবে কী প্রকারে ? ঠিক হলো, পাদ্রীদের বিদ্যালয়ে যেমন ছেলেরা পড়তে পারে, সেই রকম হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় নামে একটি পাঠশালা খোলা হবে, সেখানেও বালকরা বিনাবেতনে পড়বে। বালিকাদের জন্যও একটি পাঠশালার কথা অনেকের মনে গুঞ্জরিত হচ্ছে, এর আগে দু-একবার চেষ্টা করেও সুফল পাওয়া যায়নি, কিন্তু আশা ছাড়েননি অনেকে।

শিমুলিয়াতে এক প্রকাশ্য সভায় এই স্কুল খোলার প্রস্তাবে একদিনে চাঁদা উঠে গেল চল্লিশ হাজার টাকা। এমনকি অন্তঃপুরের মহিলারাও এর জন্য তাঁদের দান পাঠিয়ে দিলেন। দেবেন্দ্রর একটি বড় রকমের জয় হলো।

পত্রিকা পরিচালনা ও ধর্মবিস্তার নিয়ে দেবেন্দ্র বেশ কয়েক বৎসর মত্ত হয়েছিলেন। অন্য কোনো দিকে মন দেবার সময় পাননি। নিজ পরিবারের লোকজনের সঙ্গেও প্রায় যোগাযোগ শূন্য। শরীর ক্লান্ত। এইজন্য কিছুদিনের জন্য দেবেন্দ্র গেলেন নদীপথে পরিভ্রমণে। শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষায় তাঁর পত্নী সারদা দেবী এবং তিন শিশু পুত্র দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র ও হেমেন্দ্রকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। সঙ্গে আরও রইলেন রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণ সদ্য ব্রাহ্ম হয়েছে এবং দেবেন্দ্রর বিশেষ প্রিয়পাত্র। ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত এই রকম একজন সঙ্গীর প্রয়োজন খুব অনুভব করছিলেন দেবেন্দ্র। অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসু, এই দুজন যথাক্রমে বাংলা ও ইংরেজিতে দেবেন্দ্রর মতামত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারেন।

একটি প্রকাণ্ড পিনিসে পত্নী ও পুত্রদের রেখে আর একটি ছোট বোটে দেবেন্দ্র রয়েছেন রাজনারায়ণের সঙ্গে। সারাদিনে দুইজনে নানা প্রকার বিশ্রম্ভালাপ হয়, সন্ধ্যার পর রাজনারায়ণ সেই সব কথা ও সারাদিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। তারপর আহারের সময় দুজন কিঞ্চিৎ সুরা পান করতে করতে সেগুলি নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠেন আবার।

পরপর কয়েকটি দিন কাটলো। নবদ্বীপ ও পাটুলি ছাড়িয়ে চলেছে নৌকাদ্বয়। তখন সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। দেবেন্দ্র রাজনারায়ণকে বললেন, এবার তোমার দিনলিপি লিখে লও বরং। রাজনারায়ণ বললো, এখনো বেলা শেষ হয়নি, এর মধ্যে আরও কত কাণ্ড-কারখানা হতে পারে কে জানে !

বলতে বলতেই প্রায় দেখা গেল আকাশের পশ্চিম কোণ থেকে একখণ্ড জমাট কালো মেঘ ডানা মেলে হু হু করে এগিয়ে আসছে। এখনি ঝড় উঠতে পারে ভেবে দেবেন্দ্র বললেন, ঝড়ের সময় ছোট বোটে থাকা ভালো নয়, চলো আমরা পিনিসে যাই। মাঝিরা বোটটিকে পিনিসের গায়ে লাগাবার চেষ্টা করতে লাগলো, এমন সময় এক ভয়ঙ্কর দমকা হাওয়া উঠে পিনিসের মাস্তুলের এক অংশ ভেঙে তার

পাল ও দড়িদড়া সমেত জড়িয়ে বোটের ছাদের ওপর পড়লো। বাকি পালে তীরের মতন ছুটলো পিনিস এবং বোটটাকেও সঙ্গে টেনে নিয়ে দ্রুত চললো। অতবড় পিনিস অর্থাৎ বজরার টানে কাৎ হয়ে গেল ছোট বোটটি, এখুনি দড়িদড়া ছাড়াতে না পারলে ভয়ঙ্কর বিপদ। দড়িদড়া কেটে ফেলবার জন্য দা খোঁজা হতে লাগলো, কিন্তু ঐ হুড়োহুড়ির মধ্যে দা পাওয়া যায় না। একজন মাঝি লগি দিয়ে গুণ ছাড়াতে যেতেই সে লগি পড়লো দেবেন্দ্রর নাকের ওপর, দরদর ধারায় রক্ত বেরুতে লাগলো।

এই সময় বাতাস একটু থেমেই আবার প্রবলতর হলো। ভয়ার্ত মাঝিরা চিৎকার করে উঠলো, ওরে, আবার তাই রে, আবার তাই রে! বোট একদিকে সম্পূর্ণ কাৎ হয়ে গেছে, আর দু-এক মুহূর্তের মধ্যেই ডুবে যাবে। দেবেন্দ্র স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। সামনে নিশ্চিত মৃত্যুকে দেখছেন।

কোনোক্রমে একটা দা খুঁজে পেয়ে মাঝিরা কচাকচ করে কাটতে লাগলো দড়ি। শেষ দড়িটি কাটা হবার সঙ্গে সঙ্গে বোটটি পিনিসকে ছেড়ে তীরবেগে গিয়ে পাড়ের বালিয়াড়ির ওপর আছড়ে পড়লো। দেবেন্দ্র ও রাজনারায়ণ লাফিয়ে পড়লেন নীচে এবং একটুর জন্য বেঁচে গেলেন।

ইতিমধ্যে ঝড়ে ও অন্ধকারে কোনোদিকে কিছু দেখা যায় না। দেবেন্দ্রর স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে পিনিস কোন্‌দিকে ছুটে গেল বোঝার উপায় নেই। এরই মধ্যে ছোট একটি ডিঙি নৌকো এসে ভিড়লো সেখানে। নিশ্চিত বোম্বেটের নৌকো ভেবে সবাই ভয়ার্তভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, কে ও? কে ও?

সেই নৌকো থেকে এক ব্যক্তি সত্বর লাফিয়ে পড়ে ছুটে এলো দেবেন্দ্রর দিকে। তার কণ্ঠস্বর শুনেই দেবেন্দ্র চিনতে পারলেন। সে ব্যক্তি তাঁদের বাড়ির স্বরূপ খানসামা। সে একটি জরুরী বার্তাবহ পত্র নিয়ে এসেছে।

অন্ধকারে পড়বার উপায় নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই বিদ্যুতের ঝিকিমিকি আলোয় দেবেন্দ্র কোনোক্রমে খানিকটা পাঠোদ্ধার করলেন।

চিঠিতে আছে, 'ইংলণ্ড হইতে দুঃখের সংবাদ। দ্বারকানাথ আর নাই!'

দেবেন্দ্র মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলেন, রাজনারায়ণ তাঁকে জড়িয়ে ধরলো। অল্পকালের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলেন দেবেন্দ্র। পিতৃশোকের চেয়েও তিনি অন্য বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন বেশী। অবিলম্বে কলকাতায় না ফিরলে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে দারুণ গোলযোগ উপস্থিত হবে। তিনি অতি সম্প্রতি জেনেছেন যে, গত কয়েক বৎসরে দ্বারকানাথ বাজারে এক কোটি টাকা দেনা করেছেন, এবার পাওনাদারগণ তাঁদের পরিবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

পরদিনই সেই ঝড়-জলের মধ্যেই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দেবেন্দ্র রওনা হলেন কলকাতার দিকে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোনোক্রমে পলতায় পৌঁছে, সেখানে ডাঙায় নেমে পেয়ে গেলেন অশ্বশকট। সেই দুর্যোগের মধ্যেই গাড়ি হাঁকিয়ে রাত দুপুরে পৌঁছোলেন কলকাতায়। সেদিনের সেই ঝড় যেন তাঁদের পারিবারিক বিপর্যয়ের রূপক।

পাওনাদারেরা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতন শ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত আশেপাশে ঘুরতে লাগলো। দেবেন্দ্র সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে অশৌচদশায় তিনি টাকাপয়সা সংক্রান্ত কোনো আলোচনাই করবেন না।

কিন্তু এর আগেই দারুণ মতান্তর দেখা গেল শ্রাদ্ধপ্রণালী নিয়ে। দেবেন্দ্রর ছোটকাকা রমানাথ ঠাকুর বললেন, দেখো, ব্রহ্ম ব্রহ্ম করে এ সময় কোনো গোলমাল তুলো না। দাদার বড় নাম।

দেবেন্দ্র বললেন, তা কি করে হয়! আমার ধর্মব্রতের বিরুদ্ধে তো কোনো কাজ আমি করতে পারি না। আমি শ্রাদ্ধ করবো উপনিষদের মতে। শালগ্রাম শিলা আমি মানি না। পাথরের নুড়িকে আমি নারায়ণ বলে পূজা করতে পারবো না।

রাজা রাধাকান্ত দেব বললেন, সে হবে না, সে হবে না। তুমি অমন করলে শ্রাদ্ধ বিধিপূর্বক হবে না। তোমার পিতার পারলৌকিক কার্য অসম্পূর্ণ থাকবে।

দেবেন্দ্র তখন তাঁর মেজ ভাই গিরীন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর মত। গিরীন্দ্র দাদার অনুবর্তী। দাদার সঙ্গে তিনিও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখন তিনিও বললেন, আমরা যদি এমন করি, তাহলে সকলে আমাদিগকে ত্যাগ করবে, সকলে বিপক্ষে যাবে।

দেবেন্দ্র বিস্মিত, বিমূঢ় বোধ করলেন। সকলেই তাঁর মতের বিরোধী। এ দেশে ধর্ম আর সামাজিক

প্রথা যেন পৃথক ব্যাপার। যারা ব্রহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছে, তারাও সামাজিক প্রথা অমান্য করতে ভয় পায়।

দেবেন্দ্র তখন নির্জনে বসে প্রশ্ন করতে লাগলেন নিজের বিবেককে। বারবার একই উত্তর পেলেন। লোকভয়, সামাজিক শিষ্টাচারের চেয়েও নিজের ধর্মবিশ্বাস অনেক বড়। এর মধ্যে তিনি একদিন স্বপ্নে দেখলেন তাঁর পরলোকগতা জননীকে। তিনি যেন জীবন্ত হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, তোকে বড় দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল। তুই নাকি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছিস ? এর দ্বারা আমাদের কুল পবিত্র হয়েছে, তোর জননী কৃতার্থ হয়েছে। সারা শরীরে আনন্দ প্রবাহ নিয়ে জেগে উঠলেন দেবেন্দ্র।

শ্রাদ্ধের দিন বাড়ির পশ্চিম প্রাঙ্গণে মস্ত এক চালা তৈরি হয়েছে। দানসাগরের সোনা রূপার যোড়শোপচারে ভরে গেছে সেই চালা। মাঝখানে পুরোহিত, আত্মীয়-পরিজন সকলে শালগ্রাম শিলা স্থাপন করে বসে আছেন দেবেন্দ্রর অপেক্ষায়।

দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ দেবেন্দ্র পট্টবস্ত্র পরিধান করে গম্ভীরভাবে প্রবেশ করলেন সেখানে। উপনিষদের একটি শ্লোক উচ্চারণ করে সমগ্র দানসামগ্রী উৎসর্গ করে তিনি আবার পেছন ফিরলেন। আত্মীয়বন্ধুরা তাঁকে ডাকতে লাগলো যজ্ঞের আসনে এসে বসবার জন্য। দ্বারকানাথের তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র, তাঁকে বাদ দিয়ে যজ্ঞ শুরু হতে পারে না। কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না, সোজা উঠে গেলেন তিনতলায়।

একটু পরে তিনি শুনতে পেলেন তাঁর ভাই গিরীন্দ্রনাথ তাঁর হয়ে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করে চলেছেন।

দেবেন্দ্র মনে মনে বললেন, জ্ঞাতি বন্ধুরা আমায় ত্যাগ করে করুক, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে আরও গ্রহণ করলেন।

মানুষের জীবনে সমস্ত রাত্রিই ভোর হয় না। কোনো কোনো রাত্রি মধ্য পথে থমকে যায়। কালস্রোত নিমেষের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়ে মানুষকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে।

বাবু রামকমল সিংহ জানবাজারের গৃহে কমলাসুন্দরীর আলিঙ্গনে মধুর আলস্যে নিদ্রিত ছিলেন, হঠাৎ গেলুম রে, মলুম রে বলে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন। তারপরই সদ্য বলি দেওয়া মুণ্ডহীন ছাগের মতন ধড়ফড় করতে লাগলেন শয্যার ওপর।

কমলাসুন্দরী জেগে উঠে কী হলো গা, কী হলো বলে অতি ভীতভাবে ধাক্কা দিতে লাগলো তাঁকে। কিন্তু রামকমল সিংহের মুখে আর কোনো কথা নেই। চক্ষু দুটি ঘূর্ণিত হচ্ছে, গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে ঠোঁটের পাশ দিয়ে।

শব্দ শুনে ছুটে এলো দাসী-বাঁদীরা। পাশের মজলিশ ঘরে ইয়ার দোস্তরা কয়েকজন গালিচার ওপর লম্বা হয়ে আছে, তাদের নেশার ঘুম সহজে ভাঙবে না। তবলা বাজনদার ডুগিটির গলা জড়িয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে, যেন ঐ ডুগিটিই তার সোহাগিনী। এদের ডেকে তোলা গেল না। কিন্তু রামকমল সিংহের নিজস্ব ভৃত্য দুখীরাম তার বাবুর এই অবস্থা দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

রামকমল সিংহের অবস্থা দেখে ভয় পাবারই কথা। তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে গেছে, মুখখানা দারুণ যন্ত্রণায় কুঞ্চিত, মাঝে মাঝে পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকে উঠছে ধনুকের মতন। এত বড় একজন মানী লোক, যাঁর হুকুমে পঞ্চাশ-একশোটা লোক যে-কোনো সময় মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পারে, সেই মানুষের কী অসহায় দশা।

কমলাসুন্দরী দিশেহারা হয়ে পড়লো। বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে কিছু উপায় ঠিক করা তার ধাতে নেই। সাধারণত বারবিলাসিনীদের মায়েরাই হয় তাদের পরামর্শদাতৃ, কিন্তু কমলাসুন্দরীর মা নেই, স্বজন বলতে কেউ নেই, গত কয়েক বৎসর রামকমল সিংহ যেন তাকে দাস-দাসী, আমোদের উপকরণ আর আদর-যত্ন দিয়ে তুলোয় মুড়ে রেখেছিলেন। সামান্য অবস্থা থেকে আজ কমলাসুন্দরীকে কলকাতার মানুষ একডাকে চেনে।

কমলাসুন্দরীর দাসীরা সবাই যুবতী। রামকমল সিংহ যৌবনের পূজারী। লোলচর্ম ও পক্ককেশ তিনি চক্ষে সইতে পারেন না। এই সব দাসীরাও কোনো কোনো সময় তাঁর কৃপালাভে ধন্য হয়েছে। আগে তিনি দু-এক বৎসর অন্তর রক্ষিতা পরিবর্তন করতেন, কিন্তু এই কমলাসুন্দরী তাঁকে বড় মায়ার বন্ধনে বেঁধেছে। মাঝে মাঝে তিনি বলতেন, যখন সগ্যে যাবো, তখন তোকেও যে আমার সঙ্গে যেতে হবে রে, কমলা! তিনি নিশ্চিত ছিলেন তিনি স্বর্গেই যাবেন। হায়, সেই মানুষের আজ কী দশা!

কমলাসুন্দরীর এক দাসীর নাম আতরবালা। সে বেশ বুদ্ধি ধরে। দিলদরিয়া রামকমলের কাছ থেকে প্রায়ই টাকাটা সিকেটা বাগিয়ে নিয়ে সে ইতিমধ্যেই একটি মাঠকোটা বাড়ি কিনে নিজে আলাদা কারবার শুরু করার ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছে। সেই আতরবালা দুখীরামকে বললো, আরে মিনসে, এখন কী কাঁদবার সময়। মান খোয়ালি রে, মান খোয়ালি! কতায় বলে, মরণের চেয়ে মান বড়। এত বড় মানুষটার এখানে যদি কিছু হয়, তবে আর ওঁয়ার মাগ-পুতের মান থাকবে? গাড়ি যুততে বল, বাবুকে চটজলদি বাড়ি নিয়ে যা।

একথা শুনে কমলাসুন্দরী সন্ত্রস্ত হলো। রামকমল সিংহ কি সত্যিই মরতে বসেছেন নাকি? বাবু টাকা-পয়সার ব্যবস্থা তো কিছুই করে যাননি, তিনি মলে তার নিজের কী উপায় হবে? সে অসহায় স্ত্রীলোক, সবাই যদি তাকে তখন ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়? বাবু মুখে অনেকবার বলেছেন বটে যে জানবাজারের এই বাড়ি কমলাসুন্দরীর নামেই কেনা, কিন্তু তার কাগজপত্র কোথায়?

দুখীরাম গাড়ির ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিল, কমলাসুন্দরী তাকে বললো, ডাঁড়া ডাঁড়া! ওরে আমার সব্বোনাশ হচ্চে, আমায় একটু চিন্তা করতে দে। বাবুর এখন তখন অবস্থা, গাড়িতে যেতে যেতেই মলে আমি দোষের ভাগী হবো না?

আতরবালা বললো, তবে কি বাবু রাঁঢ়ের বাড়ি মরবে, সেটা ভালো হবে? দেশশুদ্ধু লোক জানবে যে...

এমন সময় তবলা-বাজনদারটি ঢুলু ঢুলু চক্ষে উঠে এসে বিরক্তভাবে বললো, কী হয়েচে, অ্যাঁ, এত গোলমাল কিসের?

তারপর রামকমল সিংহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সে সচমকে বললো, আরে, বাবুর এ কী অবস্থা? বাবু যে ধুঁকচেন। এখুনো কোবরেজ ডাকিসনি? মেয়েছেলের বুদ্ধি!

সে নিজেই কবিরাজ ডাকার উদ্যোগ করতে গিয়ে চৌকাঠে পা বেঁধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আর উঠলো না।

এ পল্লীতে বিখ্যাত ধনী রাজচন্দ্র মাড়ের সুবৃহৎ প্রাসাদ রয়েছে। রাজচন্দ্র গত হবার পর তাঁর পত্নী রাসমণিই এখন জমিদারী চালান। শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীলোক হলেও তাঁকে অনেকে ইদানীং রানী বলতে শুরু করেছে। সেই রানী রাসমণির প্রাসাদে সম্প্রতি কোনো পল্লীগ্রাম থেকে একজন কবিরাজ এসে রয়েছেন। তিনি নাকি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। দাসী-বাঁদীরাও শুনেছে তাঁর কথা।

কমলাসুন্দরী দাসীদের উদ্দেশে বললো, যা, শিগগির সেই কোবরেজ মশাইকে ডেকে নিয়ে আয়। যেমন করে পারিস নিয়ে আসবি। এত রেতে যদি তিনি না আসতে চান, তেনার পায়ে ধরবি, পায়ের বুড়ো আঙুল মুখে পুরে চুষবি।

দাসীরা গেল কবিরাজকে ডাকতে। দুখীরামও আর দেরী করলো না। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটলো। একটা জিনিস সে বুঝেছে, এখন যে-উপায়ে হোক বিধুশেখরকে সংবাদ দেওয়া দরকার। এ রকম সংকটে বিধুশেখরই সব কিছু সুষ্ঠুভাবে চালনা করতে পারেন।

রাত-বিরেতে কলকাতায় পথঘাটে একা চলা দায়। ঠ্যাঙাড়ে-বোম্বেটেদের হাতে পড়লে তো কথাই নেই, পাহারাওয়ালা সেপাইদের নজরে পড়লেও ভোগান্তি কম নয়। দুখীরাম নিশাচর প্রাণীর মতন অন্ধকার দেখে দেখে দৌড়োতে লাগলো প্রাণপণে। তার অতি বাল্যকাল থেকে সে নিযুক্ত আছে রামকমল সিংহের সেবায়, বাবুর মতন এমন ক্ষমতাশালী অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারীও যে সাধারণ মানুষের মতন হঠাৎ মরে যেতে পারে, এ কথা তার মাথাতেই ঢুকছে না।

এক সময় সে বিধুশেখরের বাড়ির সামনে পৌঁছেও গেল। এত রাত্রে বিধুশেখরের কাছে কোনো সংবাদ পৌঁছোনোও সহজ কথা নয়। কিন্তু দুখীরাম প্রবল হল্লা তুলে দিল। বিধুশেখরের নেশাভাঙ করার অভ্যেস থাকলে হয়তো এই মধ্যরাত্রে তাঁর ঘুম ভাঙানো কঠিনই হতো, কিন্তু তাঁর সে সব দোষ

নেই এবং পাতলা ঘুম, তিনি জেগে উঠলেন। নীচে নেমে এসে সব বৃত্তান্ত শুনে তিনি কয়েক পলক মাত্র স্থির হয়ে চিন্তা করলেন, একটুও বিচলিত দেখালো না তাঁকে। সুগম্ভীর কণ্ঠে দারবানদের বললেন, সহিসলোককো উঠাও! আস্তাবলকা দরওয়াজা খুলো!

অতি দ্রুত তৈরি হয়ে নিয়ে বিধুশেখর উঠে বসলেন তাঁর চার ঘোড়ার গাড়িতে। এ গাড়ি তাঁকে অত্যল্পকালের মধ্যে পৌঁছে দেবে জানবাজার। শুধু চিৎপুরের রাস্তায় গাড়ি বাঁক নেবার মুখে তিনি শুধু একবার বললেন, রোখো। অদূরের সিংহবাড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি একটুক্ষণ চিন্তা করলেন, বিম্ববতী কিংবা গঙ্গানারায়ণকে এখনই খবর দেবেন কি না। তারপরে সিদ্ধান্ত নিয়ে বললেন, না, চলো।

রাসমণির বাড়ির কবিরাজটি অতি সদাশয়। বিপদের ডাক তিনি উপেক্ষা করেন না। এত রাতেও তিনি এসেছেন। মানুষটি পৌঁছেছেন বার্ধক্যের শেষ সীমায়। তাঁকে দেখলে মনে হয় তিনি নিজেই মারা যাবেন যে-কোনো মুহূর্তে।

বিধুশেখর জানবাজারের গৃহে পৌঁছে দেখলেন সেই অতি বৃদ্ধ কবিরাজ বসে আছেন রামকমল সিংহের শয্যার পাশে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি রোগীর নাড়ি দেখতে পারছেন না, এমনই ছটফট করছে রোগী, তার হাত ধরতে গেলেও ঝট্‌কা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে। কবিরাজ মহাশয় কয়েকজন দাসদাসীকে বলেছিলেন রোগীকে ধরে থাকতে। তারাও চেষ্টা করে পারেনি। অবশ্য তারাও ধরেছে বড়ই নরমভাবে। এই অবস্থাতেও প্রভুর ওপর বলপ্রয়োগ করতে তারা সাহস পায় না। বিধুশেখর এসেই কড়া গলায় হুকুম দিলেন, দুখী, পা দুটো চেপে ধর। আমি নিজে ওর হাত ধচ্চি।

রেড়ির তেলের একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলছে ঘরে, তাতে অতি সামান্য আলো আর প্রায় ঘরজোড়া ছায়া, বিধুশেখর দাসদাসীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেউ একজন একটা মশাল জ্বালো।

কমলাসুন্দরী আড়ষ্টভাবে তাকিয়ে রইলো বিধুশেখরের দিকে এই প্রথম দেখা। এই মানুষটি সম্পর্কে এত বছর ধরে অনেক কিছু শুনেছে সে, কিন্তু আগে কখনো চাক্ষুষ দেখেনি। এই মানুষটিই সিংহ পরিবারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এর পর থেকে কমলাসুন্দরীরও ভাগ্য নির্ভর করবে এঁর হাতে? বিধুশেখর কিন্তু একবারও দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন না কমলাসুন্দরীর দিকে। এই অপবিত্র গৃহে তাঁকে আসতে হয়েছে বলে তাঁর ওষ্ঠ ভঙ্গিমায় ঘৃণা ও বিরক্তি মাখানো।

কবিরাজ কিছুক্ষণ নাড়ি ধরে রেখে মাথা নাড়তে লাগলেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, আয়ু নাই, আয়ু নাই, ইঁহার দিন ফুরোয়ে গেচে।

কমলাসুন্দরী তাঁর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো, আপনি ধন্বন্তরি। আপনি বাঁচিয়ে দিন গো! যত টাকা লাগে, আমার গয়নাগাটি যা আচে সব দোবো গো···

কবিরাজ পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, আমার সাধ্য নাই, আমি রোগের চিকিৎসা কত্তে পারি কিন্তু মৃত্যুকে ঠেকাতে পারি না।

বিধুশেখর বললেন, মহাশয়, ইহাকে কি এখন স্বগৃহে লয়ে যেতে পারি? গাড়ির ধকল কি এর সইবে?

কবিরাজ দু-দিকে মাথা নাড়লেন।

বিধুশেখর আবার প্রশ্ন করলেন, ইহার যন্ত্রণা উপশমের কি কোনো নিদান নাই?

কবিরাজ বললেন, এই রোগের নাম ধনুষ্টঙ্কার। স্বয়ং যমও এই ব্যাধিকে ভয় পায়। যমদূতরা কাছে আসতে দ্বিধা করে, সেইজন্যই এই রোগের যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ বড় দুষ্ট ব্যাধি।

তখন নিরাশ হয়ে বিধুশেখর বললেন, ইহার কি আর চেতনাও ফিরবে না? দুটো কথাও কইতে পারবে না?

এবার সবাইকে চমকিত করে কবিরাজ বললেন, হ্যাঁ, চেতনা ফিরায়ে দিতে পারি। সে এমন কিছু শক্ত নয়। সূচিকাভরণ দিলে চেতনা হবে, তারপর সব কিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

কবিরাজ যেন সত্যিই ধন্বন্তরি। কোন্ তীব্র বিষ তিনি রামকমল সিংহের ওষ্ঠে ছোঁয়ালেন কে জানে। কিয়ৎকালের মধ্যেই তাঁর হাতপায়ের খিঁচুনি কমে গেল। তিনি চোখ মেলে তাকালেন।

কবিরাজ দুর্গা শ্রীহরি দুর্গা শ্রীহরি বলে কপালে হাত ঠেকিয়ে তাঁর ইষ্ট দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, কেউ একটু আলোটা দেখা তো বাবা, আমি যাই, আমার কিছু করবার নেই এখেনে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই রামকমল সিংহের মুখে কথা ফুটলো। তিনি বললেন, কে, বিধু?

কবিরাজ বলেছিলেন, ব্যথা কমবে না। কিন্তু রামকমল সিংহের মুখে রোগযন্ত্রণার কোনো চিহ্নই

নেই। কণ্ঠস্বরও স্বাভাবিক। যেন কোনো অলৌকিক উপায়ে রামকমল সিংহ হঠাৎ বিপন্মুক্ত হয়ে গেছেন।

কমলাসুন্দরী পাশে বসে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছে, বিধুশেখর রয়েছেন বলে সে সাহস করে রামকমল সিংহের সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। রামকমল তার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বললেন, ভয় নেই কমলা। বিধু, কমলা রইলো, দেখিস যেন ও কোনো কষ্ট না পায়।

বিধুশেখর বললেন, তোকে আমি গৃহে ফিরায়ে নিয়ে যেতে এসিচি। বিম্ববতীকে, তোর পুত্রদের দেখতে ইচ্ছে করে না?

রামকমল সিংহের দু চোখের পাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। তিনি প্রশ্ন করলেন, আজ কি তিথি?

বিধুশেখর বললেন, একাদশী।

রামকমল এই অবস্থার মধ্যেই ক্ষীণ হেসে বললেন, ঠিক। কাশীর সেই জ্যোতিষী কী বলেচেন তোর মনে নাই? একাদশীতেই আমি যাবো।

বিধুশেখর বললেন, আরও অনেক একাদশী আসবে, এত ত্বরা কিসের?

রামকমল বললেন, তোর সঙ্গে দু চারিটি কথা আচে, যদি আর সময় না পাই···।

বিধুশেখর গলা চড়িয়ে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, এই, তোমরা সবাই বাইরে যাও। বাইরে যাও। দরজা বন্ধ করে দোবো।

কমলাসুন্দরী তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, বিধুশেখর পরোক্ষে বললেন, দুখী, এনাকেও একটু বাইরে যেতে বল।

কমলাসুন্দরী এবার মুখ তুলে বললো, না, আমি থাকবো। আমি কোতাও যাবো না।

সরাসরি এই প্রথম বিধুশেখর তাকালেন কমলাসুন্দরীর দিকে। রাগে তাঁর গাত্র জ্বলে গেল। কালো রঙের এই সামান্য স্ত্রীলোকটি কুহক জাল বিস্তার করে বেঁধে রেখেছে রামকমলকে। এর রূপেরই বা কী এমন চাকচিক্য? এ তো বিম্ববতীর পায়ের এক কণা নোখের যোগ্য নয়। বিম্ববতীকে ছেড়ে কোনো বুদ্ধিভাগ্যসম্পন্ন মানুষ এমন এক কুলটা মেয়েতে যে কী ভাবে মজে থাকতে পারে, তা বিধুশেখর কিছুতেই বুঝতে পারছেন না।

তীব্রভাবে কমলাসুন্দরীর চোখে চোখ রেখে বিধুশেখর আদেশ দিলেন, আমাদের কিছু গূঢ় কথা আছে, তুই এখন বাইরে যা!

সে আদেশ অগ্রাহ্য করার সাহস কমলাসুন্দরীর নেই। প্রায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে চলে গেল ঘরের বাইরে।

তখন বন্ধুর কপালে হস্ত রেখে বিধুশেখর বললেন, ভাই, চিন্তা করিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

রামকমল বললেন, জানতুম, মৃত্যু আমার কাচে যে কোনোদিন আসবে, আমার তৈরি থাকার কথা ছিল····কিন্তু পারিনি। যেতে ইচ্ছে করে না····বড় বাঁচতে ইচ্ছে করে।

—তুই এখন কেমন বোধ করচিস? বেদনা আর আচে কী? এযাত্রা ভালো হয়ে গেলি মনে হয়।

—না, বিধু, আর সময় নেই। শরীরে অসহ্য বেদনা। কিন্তু আমি হাত পা নাড়তে পারছিনি। আর সময় পাবো না····তোর সঙ্গে একটা কতা····

—বিষয়-সম্পত্তি সব উইল করা আচে, নতুন কিছু ইচ্ছে যদি তোর থাকে!

—বিষয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না····তুই রইলি····জানি····সব ঠিক থাকবে····শুধু একটা কতা····সে কতা না জানলে মলেও আমার শান্তি হবে না····এতকাল সেই কতা ভেবেই ছটফট করিচি।

—রামকমল, তোকে আমি বাড়িতে নিয়ে যাবো····এ পাপের জায়গা····বুকে সাহস আন····বাড়িতে গিয়ে বিম্ববতীর কোলে মাথা রেখে শুবি····সে সতী সাধ্বী।

—বিধু, আমার ছেলে····নবীন····সে আমার বড় আদরের, সে কি আমার? সে কার সন্তান?

বিধুশেখরের বুকে যেন বজ্রপাত হলো। মুখমণ্ডল হলো বিবর্ণ, রক্তশূন্য। মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে এ কী কথা তিনি শুনলেন? তিনি সহসা কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

রামকমল সিংহ বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে বললেন, আমার মুখে আগুন দেবে···কে···গঙ্গা না নবীন, ওরা কেউ আমার রক্তের নয়!

বিধুশেখর মুখটা ঝুঁকিয়ে এনে বললেন, কী বলচিস তুই রামকমল? নবীন তোর নিজের সন্তান····বিম্ববতী তোর সংসারের লক্ষ্মী, তোর ছেলে বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে এয়েচে।

—সে কি আমার, তোর নয় তো ? সত্যি করে বল্ ?

—আমার কেন হবে ? ছি, ছি, ছি, এমন কথা···নবীন তোর ঔরস জাত সন্তান···

—বিধু, আমার বুকে বড় জ্বালা···এতখানি বয়েসে···ভোমর যেমন ফুলে ফুলে···তেমনি আমি কত নারীতে উপগত হয়িচি, সবই নিষ্ফল ? কেউ আমায় একটিও সন্তান দেয়নি, তাই আমি ভেবেচি, আমার ও ক্ষমতা নেই, বিম্ব আমাকে···

—তোর কোনো পাপের সন্তান হয়নি, সে তো ভালোই, তাতে বিষয় সম্পত্তি ছারেখারে যেত···বিম্ববতী অনেক পুণ্য করেচে, ভগবানের কৃপায় সে তোর বংশ ধন্য করতে অমন হীরের টুকরো ছেলে দিয়েচে···

—ও ছেলে আমার ? তোর নয় ?

—রামকমল, আমি তাঁবা, তুলসী, গঙ্গাজল ছুঁয়ে শপথ করে বলতে পারি···তুই একি পাগলের মতন কথা বলচিস !

—তুই শপথ করতে পারবি ?

—হ্যাঁ···এক্ষুণি আমি আনাচ্চি সব।

—তুই আমার মাথা ছুঁয়ে বল।

—এই যে বললুম, নবীন তোর সন্তান···তোর রক্ত তার শরীরে বইচে, আমি বিম্ববতীকে কোনোদিন মন্দভাবে স্পর্শ করিনি।

—আঃ ! শান্তি, শান্তি···আমার বুকে বল এলো···বিধু, নবীনকে একবার দেকতে বড় সাধ হয়···একবার বিম্বকে···আমি কৃতঘ্ন···তার কাচ থেকে দূরে দূরে রয়িচি এতদিন···

—আমি এখুনি তোকে বাড়ি নিয়ে যাচ্চি।

কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই রামকমল সিংহের গলা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ উঠলো, হাত পায়ের খিচুনি শুরু হলো আবার। বোধহয় সূচিকাভরণের শক্তিও নিঃশেষিত হয়ে গেল। বিধুশেখর তাঁর কপাল ছুঁয়ে থেকে তারা ব্রহ্মময়ী, তারা ব্রহ্মময়ী, নাম জপ করতে লাগলেন। এই সময় বন্ধুর মুখে ফোঁটা ফোঁটা গঙ্গাজল দিতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু এই অবিদ্যার বাড়িতে গঙ্গাজলই বা পাওয়া যাবে কী করে ?

শেষবারের মতন মুখ ঘুরিয়ে বিধুশেখরের হাতের ওপর মুখ রেখেই শেষ নিশ্বাস ফেললেন রামকমল সিংহ।

বিধুশেখর চিৎকার করে বললেন, দুখীরাম দরজা খুলে দে। অমনি হুড়মুড়িয়ে ঢুকে এলো সকলে। কমলাসুন্দরী এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো মৃত রামকমল সিংহের বুকে। অন্য দাস-দাসীরাও এসে তাঁর পায়ে মাথা ঠুকতে লাগলো। ক্রন্দন চিৎকারে ভারী হয়ে গেল বাতাস।

বিধুশেখর চাইলেন, বিলম্ব না করে তখুনি রামকমল সিংহের মরদেহ সেখান থেকে সরিয়ে ফেলবেন। তাঁর বন্ধুর এই ঘৃণিত স্থানে মৃত্যু ঘটনার সংবাদ যেন কাকপক্ষীতেও না জানতে পারে। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে মৃতদেহ সরিয়ে নেওয়াই শক্ত। তাছাড়া কী করে যেন বাতাসের কানে কানে রটে যায় খবর। ভোরের আলো সবে মাত্র ফুটি ফুটি, এখনো অন্ধকার যায়নি, এরই মধ্যে বেশ একটা ভিড় জমে গেছে বাড়ির সামনে। সেই ভিড়ের মধ্যেই সকলের মাথা ছাড়িয়ে দেখা গেল রাইমোহন ঘোষালের লম্বা, সিড়িঙ্গে চেহারা। লোকজন ঠেলতে ঠেলতে সে হাউ হাউ করে কাঁদছে আর বলছে, ওরে সর সর, কত্তাবাবুকে একবার শেষ দেখা দেকেনি। মহাদেবতুল্য লোক ছিলেন আমাদের কত্তাবাবু···আহা কত বড় দরাজ দিল!

রাইমোহনকে দেখে তবু খানিকটা আশ্বস্ত হলেন বিধুশেখর। তিনি জানেন রাইমোহন অতিশয় চতুর ও চটপটে, যে-কোনো হুকুম তামিল করার শক্তি রাখে সে। তিনি বললেন, ওহে রাইমোহন, এই স্ত্রীলোকদের এখন সরে যেতে বলো, আগে রামকমলকে তার বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। সেখানে শান্তি স্বস্ত্যয়ন যা করবার···

তৎক্ষণাৎ কৃত্রিম কান্না থামিয়ে তৎপর হয়ে উঠলো রাইমোহন। শোকের বাড়ি তার খুব পছন্দ। শোকের বাড়িতে সব কিছুই অগোছালো থাকে, লোকের চক্ষু থাকে ঝাপসা। সে অমনি মেয়েদের দঙ্গলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু-হাতে ঠেলতে লাগলো তাদের। আর চিৎকার করতে লাগলো, সবাই সরো সরো, বড় কত্তামশাই রাগ কচ্চেন, সরো, জানো না এখন মড়া ছুঁতে নেই !

এই সুযোগে সে কমলাসুন্দরীর গলা থেকে একটা আলগা স্বর্ণহারও হাতিয়ে ফেললো সুকৌশলে। এবং তারপরও তীক্ষ্ণ লোভমাখা চোখ ফেরাতে লাগলো এদিক ওদিক। এতবড় একজন মানুষ মারা গেলেন সেই উপলক্ষে তার দু-দশটাকা রোজগার হবে না একী একটা কথা হলো ! রামকমল সিংহের মৃতদেহ সে একাই পাঁজাকোলা করে তুললো গাড়িতে এবং তারই মধ্যে রামকমল সিংহের দু আঙুলের দুটি মূল্যবান আংটি চলে গেল রাইমোহনের জেবের গহ্বরে।

এরপর রামকমল সিংহের মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে যাত্রা এবং পরে তার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমারোহ একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেল সব কিছুর। লোকের মুখে মুখে কথাই রটে গেল যে, হ্যাঁ, সেই পোস্তার রাজা সুখময় রায়ের বাড়িতে দুর্গোৎসব হয়েছিল আর এই রামকমল সিংগীর ছেরাদ্দ, এমনটি আর দেখা যায়নি। কাগজওয়ালারা চুটিয়ে লিখলে, ইংরেজি কাগজগুলোতেও ছাপা হলো রামকমল সিংহের গুণপণার বৃত্তান্ত। ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশান বিশেষ সভা ডেকে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করলে।

তারপর সবকিছু চুকে যাবার পর জোড়াসাঁকোর সিংহ বাড়ি উৎকটরূপে স্তব্ধ হয়ে গেল একসময়। রামকমল সিংহ যখন বেঁচে ছিলেন, তখন তাঁর উপস্থিতি বিশেষ টের পাওয়া যেত না এ বাড়িতে। ইদানীং তিনি তো প্রায় বাড়িতে থাকতেনই না। কিন্তু এখন তিনি গত হয়েছেন শুধু এই সংবাদটির জন্যই যেন বাড়িটি খাঁ খাঁ করে।

ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর মৃত্যুতে বিধুশেখর যে কতখানি আঘাত পেয়েছেন, তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কেউ তাঁর চোখে জল দেখেনি, কারুর সামনে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েননি। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে বিরাট যজ্ঞ এবং প্রায় গোটা শহরটিকেই খাওয়ানো দাওয়ানোর সব কিছু দেখাশুনো করেছেন তিনি নিজে। এতখানি ধকল অবশ্য তাঁর সহ্য হয়নি। একেবারে শেষের দিকে তিনি নিজেই খানিকটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

আবার সামলে উঠে তিনি এলেন একদিন সিংহ বাড়িতে। কারুকে তিনি ডাকলেন না, খবর পাঠালেন না, তিনি নিজেই উঠে এলেন দ্বিতলে। লম্বা টানা বারান্দা ধরে তিনি হাঁটতে লাগলেন। সেখান দিয়ে যেতে যেতে তিনি দেখতে পেলেন সিঁড়ির ওপর নবীনকুমার খেলা করছে দুলালচন্দ্রের সঙ্গে। নবীনকুমারের দিকে তিনি একবার সস্নেহ দৃষ্টিপাত করলেন শুধু, কোনো কথা বললেন না।

বারান্দাটা ডান দিকে ঘুরে গিয়ে শেষ প্রান্তে বিম্ববতীর নিজস্ব কক্ষ। সেখানে এসে দ্বারের সামনে দাঁড়ালেন বিধুশেখর। তারপর অনুচ্চ স্বরে তিনি ডাকলেন, বিম্ব, বিম্ববতী !

দ্বার খুলে গেল, ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো চিন্তামণি দাসী। বিধুশেখর কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন। বড়বাবুকে দেখে চিন্তামণি সলজ্জভাবে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে চলে গেল বাইরে। বিধুশেখর এসে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে।

পালঙ্কের ওপর বসে আছেন বিম্ববতী। নতুন বৈধব্যবেশে বিম্ববতীর রূপ এমনই বদলে গেছে যে বিধুশেখর সাঙ্ঘাতিক চমকিত হলেন। কোমর ছড়ানো বিশাল কালো চুলের গোছা ছিল বিম্ববতীর, তার চিহ্নমাত্র নেই। বিম্ববতী মস্তক মুণ্ডন করেছেন। যে দু হাত ভর্তি স্বর্ণালঙ্কার ও শাঁখা ছিল, সেই হাত দুটি এখন নিরাভরণ। যে সোনার অঙ্গ সজ্জিত থাকতো একসময় বালুচরী বা মসলিনে, এখন সেই অঙ্গ ঢেকে আছে একটি ফরাসডাঙ্গার সাদা থানে। পূর্ণযৌবনা বিম্ববতী যেন ধরেছেন যোগিনীর রূপ।

পালঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বিম্ববতী বললেন, আমি অভাগিনী, আমার নাবালক সন্তান····আমায় আর দেকবার কেউ নেই···।

বিধুশেখর এক পা অগ্রসর হয়ে বললেন, তোমার এই বেশ আমি সহ্য করতে পারবো না ভেবে আমি কয়েকটা দিন আসিনি। কিন্তু তুমি তো জানো, যতদিন আমি রয়িচি, তোমার কোনো চিন্তা নেই।

বিম্ববতী বললেন, আপনার শরীর অসুস্থ হয়েছিল ?

বিধুশেখর বললেন, সে অমন কিচু না···বিম্ব, তোমার মন শক্ত করতে হবে, তোমায় সংসারের হাল ধরতে হবে···আমি যতদিন আচি, ততদিন অবশ্য···

বিম্ববতী একটু এগিয়ে এসে বললেন, আমার ছেলে···সে যে আমার আঁধার ঘরের মানিক, সে যে আমার জীবনসব্বস্ব, যদি কেউ কোনোদিন তার নামে···

বিধুশেখর দৃঢ় স্বরে বললেন, জগতে কেউ কোনোদিন জানবে না, তোমার স্বামী শান্তিতে মরেচে, সে আমায় বিশ্বাস করে গ্যাচে, এখন তুমি শুধু শক্ত হয়ে থাকো···

বিম্ববতীর অধরোষ্ঠ কেঁপে উঠলো, শরীরে যেন লাগলো ঝড়ের বাতাস। তিনি মূর্ছিতার মতন এসে

পড়লেন বিধুশেখরের পায়ের কাছে। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমি পারবো না…আমি পারবো না…আমি দুর্বল…।

বিধুশেখর বললেন, পারবে, নিশ্চয়ই পারবে। আমি তো রয়িচিই, তোমার পাশে আমি সর্বক্ষণ আচি…তুমি যে আমার চক্ষের মণি…

বিম্ববতীকে তুলে বক্ষে জড়িয়ে ধরে বিধুশেখর তাঁর পিঠের ওপর হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

গুপী স্যাকরার বরাত ফিরেছে। রাইমোহনের দৌলতে দু-চারটি বড় বড় মানুষের বাড়ির কাজ ধরবার ফলে বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটেছে তার। আর সে আগেকার মতন সন্ধেবেলা দুগ্নাপিদিম জ্বালিয়ে একা একা হাপর চালায় না, এখন তার দোকানে পাঁচ ছ'জন কর্মচারী খাটাখাটনি করে, সে নিজে উঁচু জাজিমের ওপর বসে আরামে গড়গড়া টানে। ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে মেদ বৃদ্ধিও হয়ে চলেছে সমান তালে, মুখমণ্ডলেও দেখা দিয়েছে বেশ একটা তেল চুপচুপে ভাব। সমাজে মান বাড়াবার জন্য গুপীও এখন রামবাগানে একটি পশ্চিমা মেয়েমানুষ রেখেছে।

অনেকদিন পর রাইমোহন এলো তার দোকানে। দীর্ঘকায় রাইমোহনের এখন আর ছাতে মাথা ঠুকে যাবার ভয় নেই, কারণ গুপী তার পুরোনো দোকানঘর ভেঙে নতুন পাকা বাড়ি বানিয়েছে, দেয়ালজোড়া বেলজিয়ান আর্শি, সামনে লোহার গেট। রাইমোহন সাধারণত আসে দোকান বন্ধ হবার মুখটায় যখন আর খদ্দেরপাতি থাকে না। আজও গুপী স্যাকরা যখন তার কর্মচারীদের বিদায় করছে সেই সময় সে এসে উপস্থিত হলো।

গুপী তাকে খাতির দেখাবার জন্য দাঁড়িয়ে উঠে হৈ হৈ করে বললো, আসুন, আসুন, ঘোষালমশাই, আসতে আজ্ঞা হোক, বসতে আজ্ঞা হোক। ওরে পান নিয়ায়, গড়গড়া নিয়ায়। ঘোষালমশাইয়ের জুতো জোড়া ওপাশে রেকে দে।

রাইমোহন জাজিমের ওপর বাবু হয়ে বসে একটি বেশ বড় রকমের উদ্‌গার তুলে বললো, এক ঘটি জল খাওয়া তো বাপ। ঘি খেতে খেতে বায়ু রোগ ধরে গ্যাল!

গুপীর আদেশে এক ছোকরা কর্মচারী এক কাঁসার ঘটি ভর্তি জল নিয়ে এলো, আলগোছে রাইমোহন তার জলটুকু শেষ করে ফেলে আর একটি উদ্‌গার তুলে তৃপ্তির সঙ্গে বললো, আঃ!

গুপী জিজ্ঞেস করলো, কোতায় এত ঘি খেলেন, ঘোষালমশাই?

রাইমোহন বললো, আর বলিস কেন? এক একজন বড় মানুষ মরে, আর তাদের শ্রাদ্ধ খেতে খেতে আমাদের পেটের ব্যামো ধরে যায়।

গুপী বললো, আপনারও আহারে অরুচি? এ যে দেখছি অগ্নিরও অগ্নিমান্দ্য!

—বয়েস হলো রে গুপী, আর তেমন খাওয়ার ঢক নেই।

—তা কার ছেরাদ্দে এত খেলেন?

—কেন, রামকমল সিংগীর ছেরাদ্দে তোর নেমন্তন্ন হয়নি?

—হ্যাঁ তা তো হয়েচে। আমি ভাবলুম বুঝি আবার কেউ মারা গেল।

—রামকমল সিংগী মারা যাওয়ায় মনে বড় দাগা পেয়িচি রে। বড় দিলদার মানুষ ছেল, এমনটি আর হবে না।

—আহা হা, সে কথা আর বলতে! মহাদেব তুল্য লোক, কোনোদিন দর কষাকষি করেননি, ভালো মালের কদর বুঝতেন, যেন একটি নক্ষত্র খসে গেল!

—তা যা বলিচিস! কারুর কাচে কখনো হাত পাতেনি রামকমল সিংগী, সব সময় উপুড়হস্ত। তাতেও অগাধ সম্পত্তি রেখে গ্যাচেন।

—আর দেশের কী হালচাল বলুন, ঘোষালমশাই!

—বড় খারাপ রে, বড় খারাপ ! মানী মানী লোকেরা চলে যাচ্চে, এখন যত চ্যাংড়াদের উৎপাত, জাত ধম্মো আর কিছু রইলো না, দেশটা রসাতলে যাবে এবার।

—আমাদের মহল্লাতেও এক কালেজী ছোকরা গত পরশু কেরেস্তান হয়েচে। এভাবে যদি ভদ্রঘরের ছেলেরা কেরেস্তান হয়ে যায়—

—আরে কেরেস্তান হবে, সেটা আশ্চর্যি কিচু নয়। হাজার হোক রাজার জাত, যদি জোর করে নিজের পাতে ঝোল টানে, তাতে করার কিচু নেই। কিন্তু হিঁদুরাই যে হিঁদুদের ইয়েতে হুড়কো দিচ্চে। পিরিলি বামুনরাই দেশটার সব্বোনাশ করে দিলে। দ্বারকানাথ ঠাকুর বিদেশে বেঘোরে মলো, শুনলুম নাকি তেনার শবদাহ পর্যন্ত হয়নি, বিলেতে মাটির নীচে পুঁতে রেখেচে, তার ওপর দিয়ে ম্লেচ্ছ সাহেবরা হেঁটে চলে বেড়াচ্চে। ভাব একবার কাণ্ডটা, অত বড় মানী লোক, মরার পর ছেলের হাতে মুখে আগুনটা পর্যন্ত পেলে না। দেবেন ঠাকুর তো বাপের শ্রাদ্ধটাও করলে না।

—ছি ছি ছি ছি ছি ছি।

—তারপর দেবেন ঠাকুর এখন চ্যালাচামুণ্ডো নিয়ে চারদিকে হামলে বেড়াচ্চে, বলচে আমাদের ঠাকুর দেবতা কিচু নেই, বেদ নাকি চাঁড়ালেও শুনতে পারে !

—ছি ছি ছি ছি ছি ছি।

—বামুন-কায়েত-সুদ্দুর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পংক্তি ভোজনে বসে।

—ছি ছি ছি ছি ছি ছি।

—আজই দুকুরে কী দেকে এলুম জানিস ? পটলড্যাঙ্গার মোড়ে একটা ছোঁড়া, কালেজে পড়া ছোঁড়াই মনে হলো, সে বিস্কুট খাচ্চে !

—বিস্কুট কী ?

—বিস্কুট জানিস না ? ঐ যে একরকম আটা-ময়দা গোলা শুকিয়ে গোল গোল চাক্তি বানায়। মোছলমান আর ফিরিঙ্গিদের দোকানে বিক্‌কিরি হয়।

—দেকিনি কখনো !

—সাহেবের সিক্‌নি না মেশালে সে জিনিসের তার হয় না। মোছলমান কারিগররা রোজ দু বেলা সাহেবপাড়ায় গিয়ে মদ্দা-মাগীদের সিক্‌নি নিয়ে আসে ডালায় করে। তারপর তা আটা-ময়দা গোলার সঙ্গে মেশায়, আরও প্যাঁজ রসুন কত কী মেশায় কে জানে, তার ওপর মোছলমানরা দাঁড়িয়ে পা দিয়ে ডলে খুব করে, তারপর তৈরি হয় বিস্কুট। সেই জিনিস হিঁদু ছেলেরা খাচ্চে ! আজ দেকলুম, তিনটে ছোঁড়া এ ওকে ঠ্যালাঠেলি কচ্চে, এই তুই বিস্কুট খেতে পারবি ? এক টাকা বাজি ! অমনি একটা ছোঁড়া দৌড়ে গিয়ে বিস্কুট কিনে কচর মচর করে খেতে লাগলো, রাস্তার মধ্যে, সব্বার সামনে !

—ছি ছি ছি ছি ছি ছি।

—এসব কাদের শিক্ষা ? ঐ বেম্ম হারামজাদারাই তো শিখুচ্চে ! বেম্ম হতে গেলে শেরি আর বিস্কুট খেতে হয়। ঐ খেয়ে তারা উদ্ধার হয়ে যায়।

—বলেন কী ?

দোকানের কয়েকজন কর্মচারী এই সব বাক্যালাপ গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে শুনছিল। রাইমোহন কথা থামিয়ে তাদের তাড়া লাগিয়ে বললো, বাড়ি যাও, বাপধনেরা এবার বাড়ি যাও !

তারা বেরিয়ে যাবার পর গুপী দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিয়ে এসে বললো, ঘোষালমশাই, আজ একটা অদ্ভুত মানুষ দেকলুম। অমন আমি কক্ষনো দেকিনি। মানুষ না পুতুল তা বোঝা যায় না। মনে হয় যেন পুতুলই গুড়গুড়িয়ে হাঁটে আর ওঁয়াও মোঁয়াও করে কতা বলে। তাকে সাহেবদের মতন দেখতেও না আবার হিন্দুস্থানীর সঙ্গেও মিল নেই। গায়ের রং হলদে মতন, খুব বেশী লম্বা চওড়া নয়, মাতায় আবার মস্ত বড় বেণী, সে মেয়েছেলে না ব্যাটাছেলে তাও বোজবার জো নেই।

রাইমোহন বললো, বুজিচি, ও তো চায়নাম্যান। তুই আগে দেকিসনি কখনো ? ওরা তো অনেক দিন থেকেই আসচে। আছু নামে একটা চায়নাম্যানের নামে অছিপুর গ্রাম হয়ে গেল। ওরা একটা চিনির কল বানিয়েচে। এখুন তো চায়নাম্যান অনেক এয়েচে এ দেশে।

—আমি কিন্তু বাপের জম্মে দেকিনি। আমার দোকানে আজ এয়েছেল লণ্ঠন বেচতে। একটা কতাও বোঝার উপায় নেই।

—হিমালয় পর্বতের ওপাশে চীন দেশ, ওরা সেখান থেকে এয়েচে। সে দেশের মাগী মদ্দা সব দেকতে একরকম। সব্বাইকে দেকতে একরকম, ঠিক যেন যমজ। দেশসুদ্ধ সব লোক যমজ।

—কী সব্বোনেশে দেশ রে বাবা! তা ওরা হিমালয় পাহাড় ডিঙিয়ে এলো কী করে?

—পাহাড় ডিঙিয়ে কী আর আসতে পারে? হিমালয় পাহাড় ডিঙোনো মানুষের সাধ্যি নেই, বাবা মহাদেবের চ্যালারা সে জায়গা সর্বক্ষণ পাহারা দিচ্চে। ওরা এয়েচে জাহাজে। রুস্তমজীদের জাহাজ চলে যে চীন দেশ পর্যন্ত। আসবে আসবে, আরও কত রকমের লোক আসে দেকবি। গুড় থাকলেই পিঁপড়ে ছুটে আসে। এখন কলকেতা শহরে ছড়ানো যে অনেক গুড় আর মধু। জাহাজঘাটায় দেকগে যা কত হরেক জাতের মানুষ আর কত কিচিরমিচির ভাষা। একটা মুস্কো জোয়ান দেকলুম, তার গায়ের রং কী কালো, যেন বাদুড়ে রং মেকেচে। ওরা হলো গে কাফ্রি। তারপর দেকলুম গ্রীক, সে মোগল পাঠানদের চেয়েও দড় চেহারা, ওরা আসে সেকেন্দার শা'র দেশ থেকে। সেকেন্দার শা'র নাম শুনিচিস?

—আজ্ঞে না।

—তুই এখুনো মুখ্যুই রয়ে গেলি। আবার শুনচি নাকি রুশীরা কলকেতার ওপর হামলা করবে। একটা জিনিস দেকলুম বটে, সবাই জানতো ইংরেজ সাহেবরা কারুকে ভয় পায় না। এখুন দেকচি, ইংরেজ ব্যাটারাও রুশীদের ভয় পায়। যখন তখন রব ওঠে যে রুশীরা আসচে। কোনো আপিসে একবার রুশীদের কেউ নাম কল্লে হলো, অমনি সাহেব সুবোরা তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে। সত্যি যদি রুশীরা আক্রমণ করে, তাহলে ইংরেজরা পোঁ পোঁ করে পালাবে।

—সত্যিই আসবে নাকি রুশীরা?

—আসতেও পারে। শুনিচি তো রুশীরা মস্ত বীর। জগমোহন সরকারের বৈঠকখানায় একদিন কথা হচ্চেলো। সবচে ভালো বেরাণ্ডি তৈরি হয় যে দেশে, তার নাম ফরাসী দেশ। ফরাসী জাতের লোক দেকিচিস তো, চন্নননগরেই রয়েচে। সে দেশে নেপো নামে একটা লোক ছেল, তার মতন বীর নাকি পৃথিবীতে আর জন্মায়নি। সেই নেপোর নাম শুনলেও ইংরেজরা ভির্মি যেত, জ্যান্ত মানুষ চিবিয়ে খেয়ে ফেলতো নেপো। সেই রকম বীরও রুশীদের কাচে ঘায়েল হয়ে গ্যাচে। দু লাখ না পাঁচ লাখ কত যেন সৈন্য নিয়ে নেপো গেস্লো রুশীদের সঙ্গে লড়তে, সব সেখেনে মাটিপোঁতা হয়ে গেল। নেপো একলা পালিয়ে বেঁচে ছেল।

—বাবাঃ! সেই রুশীরা আসবে? আবার যুদ্ধ হবে?

—আমরা হলুম গে উলুখাগড়া। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবে, তাতে তোর আমার কী? বড়জোর ইংরেজ রাজার বদলে রুশী রাজা আসবে।

—তেনারা আবার কেমন কাঁচাখেগো দ্যাবতা হবেন কে জানে!

—যখন আসবে, তখন দ্যাকা যাবে। এবার কাজের কতা বলি।

—মালপত্তর কিচু এনেচেন নাকি?

ট্যাঁক থেকে একটি গেঁজে বার করলো রাইমোহন। তারপর হাস্যময় মুখে বললো, বুড়ি ঠাকুমার বাক্স প্যাঁটরা ঘাঁটতে ঘাঁটতে বেশ কিচু সোনাদানা পেয়ে গেলুম রে! তখুনি বুজলুম, তোরই বরাত খুললো। এসব তো তোরই ভোগে লাগবে।

গুপীও হেসে বললো, আপনার ঠাকুমার যে দেকচি অক্ষয় ধন। এর আগেও তেনার প্যাঁটরা ঘাঁটতে ঘাঁটতে অনেক কিচু বেরিয়েচে না?

—কত বড় বাড়ির মেয়ে ছিলেন তিনি! হাত ঘুরোলেই সোনাদানা ঝরে পড়তো। আর হাসলেই মুক্তো। সেসব ছিল তাঁর বয়েস কালে, আমি তো চক্ষে দেকিনি, শুনিচি শুধু।

রাইমোহনের গেঁজে থেকে বেরুল এক ছড়া হার আর দুটি আংটি।

গুপী বললো, চেনাচেনা লাগে যেন। এ হারছড়া মনে হচ্চে যেন আমিই বানিয়েচি!

রাইমোহন কৃত্রিম ধমক দিয়ে বলে উঠলো, চোকের মাতা খেয়িচিস নাকি? আমার ঠাকমার হার তুই কী করে বানাবি রে ব্যাটা? আজকালকার মত ফিনফিনে নয়, সেকেলে জিনিস, এ সবের চেকনাই-ই আলাদা।

—যাই বলুন ঘোষালমশাই, হাতে নিলেই যেন মনে হচ্চে এ আমার নিজের হাতের কাজ।

—এক হতে পারে, তোর ঠাকুর্দা বানিয়েছেল। আমার ঠাকুমার জিনিস তোর ঠাকুর্দা বানাবে, তাতে আশ্চয্যি কিছু নেই। সেইজন্যিই তোর চেনা চেনা লাগচে।

—সেটা একটা কতা বটে। আর এই আংটির পাতরটা, পামারস্টোন কোম্পানি বাজারে ছেড়েচে এই দু বছর।

—আরে, পামারস্টোন কোম্পানিরও তো ঠাকুর্দা-কোম্পানি ছেল, ছেল না ? সে আমলে কি লোকে আংটিতে পাতর বসাতো না ? নে, নে, তোর অত কতায় কাজ কী, ওজন কর, ওজন কর !

যথারীতি এই প্রকার কৌতুক ও দর কষাকষি চললো কিছুক্ষণ। দাম বেশ ভালোই পাওয়া গেছে, নগদ টাকা গুণে নিয়ে পুনরায় সেই গেঁজেতে ভরে ট্যাঁকে গুঁজলো রাইমোহন। তারপর দুজনে একই সঙ্গে বেরুলো দোকান থেকে।

গুপীর অনুরোধে রাইমোহন তার সঙ্গে চললো রামবাগানে। গুপীর ভাড়া করা রমণীটিকে সে একবার দেখে আসবে। রাইমোহন সাত ঘাটের জল খাওয়া মানুষ, তার মতামতের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

রাতের বেলা ডুলি পালকি সহজে পাওয়া যায় না। এক-ঘোড়ার কেরাঞ্চি গাড়িগুলোরও এই সময় বড় গুমোর বাড়ে, খদ্দের ডাকাডাকি করলেও সে গাড়ির গাড়োয়ানরা মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। অনেক চেষ্টায় সে রকম একটি গাড়ি যোগাড় করা গেল।

রামবাগান পাড়া সারাদিন ঘুমিয়ে থাকে, সন্ধের পরই এখানে আসল রমরমা। সব বাড়িতে বাড়িতে আলো, হারমোনিয়াম আর ঘুঙুরের সুমিষ্ট ধ্বনিতে বাতাস মদির। মাঝে মাঝেই শোনা যায় রমণীদের কাংস্য বিনিন্দিত স্বরের হাস্য।

গুপী স্যাকরা যে-বাড়িতে ঢুকলো, সে বাড়ির সামনেই খোলা নর্দমার পাশে একটি মাতাল অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তার ঠোঁটের কাছে ভনভন করছে মাছি। পথ দিয়ে লোকজন আসছে যাচ্ছে, কেউ ভ্রূক্ষেপও করছে না ওর দিকে। গুপী আর রাইমোহনও উঠে গেল ওপরে। তিনতলায় থাকে গুপীর সেই স্ত্রীলোকটি। কিছুকাল আগেও এই স্ত্রীলোকটির নাম ছিল ছুন্নিবিবি, এখন নাম নিয়েছে পদ্মবালা। বেশ মোটাসোটা চেহারা, গুপীর সঙ্গে মানিয়েছে ভালোই।

রাইমোহন সেখানে বসে কয়েক পাত্তর ব্র্যাণ্ডি পান করলো ও পদ্মবালার দু'খানি গান শুনলো। পদ্মবালার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কালীঘাটের হাঁড়িকাঠে মাথা দেওয়া বলির পাঁঠার শেষ আওয়াজের অনায়াসেই তুলনা দেওয়া যায়।

রাইমোহন গান শুনতে শুনতে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো। তার চলাফেরা খানদানী ঘরের বড় মানুষদের সঙ্গে, দামী দামী মেয়েমানুষ দেখা তার অভ্যেস। এই সব বুঁচি পাঁচী ধরনের বারাঙ্গনাদের সে ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। গুপী স্যাকরার হাতে অনেক কাঁচা টাকা এলেও কৃপণ স্বভাবটি তো যায়নি, সুতরাং তার নজর আর এর থেকে উঁচুতে উঠবে কী করে। তবু রাইমোহন গুপীর দিকে চোখ টিপে ইশারায় জানালো, সরেস মাল, চালিয়ে যা !

অর্ধ সমাপ্ত ব্র্যাণ্ডির বোতলটি বগলের তলায় লুকিয়ে রাইমোহন উঠে পড়লো। আর বেশীক্ষণ এখানে বসলে আরও গান শুনতে হবে, তাহলে সে মারা পড়বে। আর যাই থাক না থাক রাইমোহনের সঙ্গীত রুচি সত্যিই উঁচু।

রাইমোহন যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো, তখনও সেই মাতালটি ঠিক একইভাবে পড়ে আছে নর্দমার ধারে। মাঝে মাঝে বুঁ বুঁ শব্দ করছে মুখ দিয়ে। মালকোচা মারা ধুতি আর বেনিয়ান পরা, বছর পঁচিশেক বয়েস, দেখলে মনে হয় ভদ্রঘরের মানুষ। রাইমোহন লোকটিকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। নতুন কিছু ব্যাপার নয়, এরকম রোজই দেখা যায় দু একজনকে। এদের সকলেরই ইতিহাস এক, ইয়ার বক্সি নিয়ে ফুর্তি করতে এসেছিল, টাকা কড়ি সব ফুরিয়ে যাওয়ায় সঙ্গীরা এই অবস্থায় ফেলে পালিয়েছে। যাদের নিজেদের টাকা নেই, যারা পরের পয়সায় ফুর্তি করে, তারা কিন্তু কখনো এমনভাবে চেতনা হারিয়ে পথের পাশে পড়ে থাকে না।

রাইমোহন লোকটিকে টেনে তুলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু অজ্ঞান মানুষ যেন দ্বিগুণ ভারী হয়ে যায়। রাইমোহন তখন লোকটির গালে চাপড়া মারতে মারতে বললো, এই, এই, ওঠ্ ওঠ্ ! লোকটির তবু সাড় আসে না, বুঁ বুঁ শব্দ করে। রাইমোহনের টানাটানিতে যেন বিরক্ত হয়েই সে গড়িয়ে আরও নর্দমার দিকে যেতে চাইলো।

রাইমোহনের উদ্যম দেখে ইতিমধ্যেই একটা ছোট ভিড় জমে গেল। কেউ রাইমোহনকে সাহায্য

করার চেষ্টা করলো না, শহুরে মানুষের সেরকম স্বভাব হয়, বরং নানান চুটকি টিপ্পনি শোনা যেতে লাগলো। একজন বললো, বৃথা চেষ্টা মোয়াই! ও বদ-নসীবকে আপনি গঙ্গায় ভাস্যে দিন, তাও ও চোক মেলবে না।

রাইমোহন তখন মুখ ঝুঁকিয়ে লোকটির কানে কানে বললো, এই, আর একটু মাল খাবি?

তাতেই কাজ হলো, লোকটি এক হাত উঁচু করে আঙুলগুলো গেলাস ধরার ভঙ্গিতে রেখে বললো, দে। মাল দে।

রাইমোহন বোতলটি লোকটির হাতে না দিয়ে বললো, হাঁ কর!

বাধ্য ছেলের মতন সে অমনি হাঁ করলো, রাইমোহন গপ্ গপ্ করে বেশ খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দিল তার মুখে। দারুণ বিষম খেয়ে লোকটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলো। তারপর কোনোক্রমে সামলে নিয়ে চোখ মেলে বললো, আমি কোথায়?

রাইমোহন লোকটির কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে বললো, চলো ভায়া, আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমায় ঘরে পৌঁছে দেবোখন।

কাঁচা ব্র্যাণ্ডির তীব্র ঝাঁঝে লোকটির চৈতন্য ফিরে এসেছে, সে উঠে দাঁড়াতে পারলো এবং রাইমোহনের গায়ে ভর দিয়ে হাঁটতেও শুরু করলো।

ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে খানিকটা হাঁটবার পর রাইমোহন জিজ্ঞেস করলো, মশায়ের কোথায় থাকা হয়? এখন কোন্ দিকে যাওয়া হবে?

লোকটি জড়িত স্বরে বললো, আমি এখন আরও মাল খাবো। কিন্তু আমার তো টাকা পয়সা নেই। টাকা কে দেবে?

রাইমোহন বললো, মাল খাবে তো খাও না, আমি দিচ্চি!

লোকটি একবার বোতলটার দিকে আর একবার রাইমোহনের মুখের দিকে চাইতে লাগলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে বাওয়া, দেবদূত?

রাইমোহন বললো, দেবদূতই বটে। চেহারাখানা দেখচো না!

লোকটি বোতলটা হাতে নিয়ে রীতিমতন বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, খাবো? সত্যি খাবো?

—হ্যাঁ, খাও।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবো, না বসে বসে?

—যা তোমার ইচ্ছে।

—আমি ভদ্দরলোকের ছেলে, আমি তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাল খাই না।

—তবে বসে বসেই খাও।

কাছেই একটি গৃহের সদরের সিঁড়িতে গিয়ে বসে পড়লো লোকটি। বোতল থেকে একটি আরামের চুমুক দিয়ে রাইমোহনের উদ্দেশ্যে বললো, এসো দাদা, তোমার পায়ের ধুলো নিই।

রাইমোহনও লোকটির পাশে বসে পড়ে বোতলটা থেকে একটু চুমুক লাগালো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, নাম কী?

—হরচন্দ্র সামন্ত। ইয়োর মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। অ্যালাউ মী টু টেক দি ডাস্ট অফ ইয়োর ফিট, স্যার!

—হুঁ, পেটে বিদ্যে আচে দেখচি। তা নদ্দোমার ধারে পড়ে ছিলে কেন? অমন ভাবে থাকলে শেষ রাতের দিকে কুকুর-শেয়ালে যে গায়ের মাংস খুবলে নিতো!

হরচন্দ্র উদাসীনভাবে বললো, তা নিতো নিতো!

—বাড়ি কোতায়?

—বাড়ি? আমার বাড়ি নেই। কেউ নেই!

—হুঁ, আমারই মতন অবস্থা দেখচি প্রায়। নেকাপড়া শিকোচো, কাজকম্মো কিচু করো না?

—নাঃ! কাজ শুধু মাল খাওয়া।

—তা মাথা গোঁজবার একটা কিছু জায়গা তো আচে? কাল ছিলে কোতায়?

—রাস্তায়।

—পরশু?

—রাস্তায়।

—বুঝলুম। নাও, বোতলটা শেষ করো, তারপর চলো আমার সঙ্গে।

লোকটিকে বেশ পছন্দ হয়েছে রাইমোহনের। এই ধরনের বিবাগী, বাউণ্ডুলে ধরনের মানুষদের প্রতি তার একটা টান আছে। যারা স্বেচ্ছায় নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, যারা উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে অপরকে প্রবঞ্চনা করার নেশায় মাতে না, রাইমোহনের মতে, তারাই খাঁটি মানুষ। এই সব লোকের সঙ্গে সে সময় কাটাতে ভালোবাসে। এর আগেও সে রাস্তা থেকে এমন লোক কুড়িয়ে নিয়েছে।

এত রাতে আর গাড়ি পাবার আশা নেই, লোকটিকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো রাইমোহন। হরচন্দ্র মাঝে মাঝে টাল খেয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেই রাইমোহন তার কাঁধ ধরে ফেলচে। এইভাবে বৌবাজারে পৌঁছোতে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল।

রাইমোহন সেই যে হীরেমণির বাড়িতে আস্তানা গেড়ে ছিল, আর সে জায়গা ছাড়েনি। বেশ কিছুকাল কঠিন রোগভোগের পর হীরেমণি আস্তে আস্তে সেরে উঠেছে, ফিরে পেয়েছে আগেকার রূপ। আবার সে পূর্ব পেশায় ফিরে গেছে। হীরেমণি যখন বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যস্ত থাকে, তখন রাইমোহন হীরেমণির ছেলে চন্দ্রনাথের দেখাশুনো করে।

চন্দ্রনাথকে সে যদিও দত্তক নিয়েছে কিন্তু ও ছেলে কক্ষনো তাকে বাবা বলে ডাকে না। এ ব্যাপারে হীরেমণির কঠিন নিষেধ আছে। কেন যে হীরেমণির এই জেদ, তা রাইমোহন কিছুতেই বোঝে না। হীরেমণি চন্দ্রনাথের পিতৃপরিচয়ও জানাবে না আবার রাইমোহনকেও পিতৃত্বের অধিকার দেবে না। চন্দ্রনাথ তাকে বলে রাইদাদা।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি বেশ জমকালো চেহারার জুড়িগাড়ি, মনে হয় আজ কোনো শাঁসালো খদ্দের এসেছে। দ্বিতলের কক্ষে উজ্জ্বল আলো এবং তবলার চটাং চটাং বোল।

বাড়িতে ঢুকতে যাবার আগে থেমে গেল হরচন্দ্র। কোনো রকমে চোখ খুলে সে জিজ্ঞেস করলো, এটা কার বাড়ি ?

রাইমোহন বললো, তা জেনে তোমার দরকার কী ? মাতা গোঁজবার একটা ঠাঁই পেলেই তো হলো ? চলো—

—আমি যার তার বাড়ি যাই না ! তুমি আমায় নিয়ে যাচ্চো কেন বাওয়া ? তোমার মতলোবখানা কী ?

—ধরে নাও, এখেনে তোমার অন্ন বাঁধা আচে। তোমার নিয়তি তোমায় টেনে এনেচে !

—আগেই বলে রাকচি, আমায় চুষে ছিবড়ে করে ফেললেও আমার কাচ থেকে কোনো মালকড়ি বেরুবে না। আমার সব ফিনিস্ !

—সে তোমায় দেকেই বুঝিচি !

—তবু তুমি আমায় থাকতে দেবে ? শুতে দেবে ! খেতেও দেবে ? তুমি দেকচি স্বগ্যো থেকে নেমে এলে !

হরচন্দ্রকে টানতে টানতে ভেতরে এনে রাইমোহন তাকে একতলার সিঁড়ির নীচের ঘরটায় বসালো। এ ঘরটা খালিই পড়েছিল, রাইমোহন সাফ সুতরো করে নিয়েছে। হীরেমণির কাছে যেসব সন্ধ্যেবেলা বাবুরা আসে, সেই সময় রাইমোহন এই ঘরে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। সাধারণত বাবুরা সুন্দরী বারাঙ্গনার কাছে এসে পরপুরুষের মুখ দেখা পছন্দ করে না।

তক্তপোশের ওপর হরচন্দ্রকে বসিয়ে রাইমোহন বললো, শুয়ে পড়ো ভায়া। যদি খাবার-দাবার খেতে চাও, তাও দোবো। শুধু একটা কতা, এখানে টুঁ শব্দ করা চলবে না।

হরচন্দ্রর চৈতন্য আবার লোপ পাবার পথে। সে কোনোক্রমে বললো, আরও মদ খাবো।

রাইমোহন বললে, বেশ তো, খাবে'খন। এখন এক ঘুম ঘুমিয়ে নাও !

ওপরতলায় হীরেমণি গান ধরেছে। রাইমোহন উৎকর্ণ হলো। স্পষ্ট খুশীর ছায়া পড়লো তার মুখমণ্ডলে। রাইমোহনেরই রচিত গান গাইছে হীরেমণি, বড় সুন্দর তার কণ্ঠস্বর, নিখুঁত তার পরিবেশনা।

গানের জন্য শহরে বেশ নাম কাটছে হীরেমণির। এখন অনেকে তাকে হীরেমণির বদলে অন্য একটা নাম দিয়েছে। ভারী মানানসই নাম, হীরা বুলবুল।
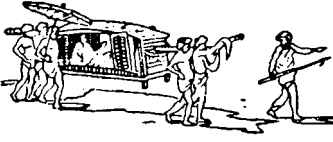
বিম্ববতীর কক্ষে একদিন বিধুশেখর গঙ্গানারায়ণ এবং নবীনকুমারকে ডেকে পরলোকগত রামকমল সিংহের উইল পাঠ করে শোনালেন। নবীনকুমারের বয়েস মাত্র ছয়, সে উইলের ভাষা কিছুই বুঝবে না, আর গঙ্গানারায়ণেরও যেন বিষয়সম্পত্তি, টাকা-পয়সা সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই।

বিধুশেখর জোর করে বিন্দুবাসিনীকে কাশীতে পাঠিয়ে দেবার পর থেকেই গঙ্গানারায়ণ একদিকে যেমন দারুণ অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্ছে অন্যদিকে সারা বিশ্ব সংসারের প্রতিও একটা বিরাগ জন্মে গেছে তার। এতকাল সে বিধুশেখরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে, সে শ্রদ্ধা এখন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, এখন সে বিধুশেখরের মুখের দিকে ভালো করে চাইতেও পারে না।

কালাশৌচ পার হয়ে গেলেও গঙ্গানারায়ণ এখনো সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করে না। গায়ে একটি তসরের চাদর জড়ানো, সে উদাসীন মুখে বসলো ঘরের মেঝেতে, হাঁটুর ওপর থুতনিটা স্থাপন করা। কিছু বুঝুক না বুঝুক, নবীনকুমার গম্ভীরভাবে বাবু হয়ে বসে আছে মায়ের পাশে, তার অত্যুজ্জ্বল চোখ দুটি বিধুশেখরের দিকে স্থির। গঙ্গানারায়ণ ও নবীনকুমার দুজনেই মস্তক মুণ্ডন করেছে, গঙ্গানারায়ণের মস্তক নগ্ন, আর নবীনকুমার পরেছে একটি লাল মলমলের টুপী।

গলা খাঁকারি দিয়ে বিধুশেখর প্রথমে গঙ্গানারায়ণের দিকে তাকিয়ে বললেন, গঙ্গা, তোমাকে একটি জরুরি কথা আজ জানানো প্রয়োজন। এতদিন এ কথা গোপন ছিল, কিন্তু এখন তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছো, যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি আয়ত্ত করেছো, এখন আর গোপন রাখার কোনো কারণ দেখি না। তুমি রামকমল সিংহের ঔরসজাত পুত্র নও, বিম্ববতী তোমার গর্ভধারিণী জননী নন। তবে, এঁরা দুজনেই তোমাকে এত স্নেহ করেচেন যে আপন পিতামাতাও অনেক সময় এতখানি করে না। রামকমল দীর্ঘকাল অপুত্রক ছিলেন, সেই অবস্থায় দত্তক নিয়েছিলেন তোমাকে। এই বংশের রক্ত বহন করচে নবীনকুমার।

বিধুশেখর চকিতে একবার তাকালেন বিম্ববতীর দিকে। বিম্ববতীর মাথায় অনেকখানি ঘোমটা, তাঁর মুখ দেখা যায় না।

গঙ্গানারায়ণ মাটির দিকে চক্ষু রেখে চুপ করে রইলো। বিধুশেখর যা বললেন, সে তথ্য তার অজানা নয়। এসব কথা গোপন থাকে না। নিজের বাবা কিংবা মা সম্পর্কে গঙ্গানারায়ণের সামান্যতম স্মৃতিও নেই, জ্ঞান-উন্মেষের পর থেকে সে রামকমল এবং বিম্ববতীকেই পিতামাতা বলে জেনে এসেছে। কিন্তু নবীনকুমার জন্মাবার পর দাস-দাসী, স্বজন-পরিজনরা আকারে ইঙ্গিতে তাকে জানিয়ে দিয়েছে তার আসল পরিচয়। তাতে কিন্তু গঙ্গানারায়ণের বড় কোনো আঘাত লাগেনি, কারণ তার তো কোনো অভাব-বোধ ছিল না। নবীনকুমার জন্মাবার পরও বিম্ববতী এবং রামকমল তার সঙ্গে আগের মতই সমান স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। বিম্ববতীকে সে নিজের মা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না।

বিধুশেখর বললেন, একথাগুলিন আজ তোমার বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন এই জন্য যে রামকমলের উইলে তোমার আর নবীনের ভাগে কিছু ব্যাসকম রয়েচে। পাচে তুমি দুঃখ পাও তাই তোমাকে আগে থেকেই প্রস্তুত করে দিলুম। বস্তুত এ পরামর্শ রামকমলকে আমিই দিয়েচি। দত্তক গ্রহণ করার পর যদি নিজের ধর্মপত্নীর গর্ভে সন্তান জন্মায়, তবে সেই সন্তান বিষয়-সম্পত্তির মুখ্যভাগের অধিকারী হবে এটাই কৌলিক প্রথা।

গঙ্গানারায়ণ এবার ধীর স্বরে বললো, আপনি সবকিছুই নবীনকুমারকে দিন, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। সে আমার ভাই, আমি আমার সবকিচু তাকেই দিতে চাই।

বিম্ববতী গঙ্গানারায়ণের বাহু ছুঁয়ে মৃদুভাবে ডাকলেন, গঙ্গা!

গঙ্গানারায়ণ বিম্ববতীর পায়ে হাত রেখে বললো, মা—

শুধু এই দুটি ডাক, এছাড়া কেউই আর কোনো কথা বললো না।

বিধুশেখর এই ধরনের হার্দিক আন্দোলনের বিশেষ গুরুত্ব দেন না। তিনি আবার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার

করে বললেন, যাক, আগে উইলটি পাঠ করে শোনাই—শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং উইল পত্রমিদং কার্যঞ্চ আপন জ্ঞানপূর্বক ও স্বেচ্ছাধীন এই উইল করিতেছি আমার পৈতৃক দৌলত শ্রীশ্রীঠাকুর ও জায়গা ও বাটী ও এলবাস পোষাক তাঁবা পিতল কাঁসার ও রূপা সোনার বাসন গহনাদি যাহা কিছু ইহার পঞ্চভাগের এক ভাগ আমার বিধবা অপুত্রক ভ্রাতৃজায়া হেমাঙ্গিনী দেব্যা পাইবেক অপর চারি অংশ আমার উত্তরাধিকারীতে বর্তাইবে আমার স্বোপার্জিত দৌলত ও সোনা রূপার বাসন ও গহনাদি ধর্মতলার বাটী বহুবাজারের বাটিদ্বয়—বিরজিতলাওয়ের জমি ৫ বিঘা শহর কলিকাতার মধ্যে খরিদা জায়গা জেলা যশোহরের মোতালক পরগণে খালিসপুর জমিদারী কটকের তালুক হুগলীর জমিদারী...

উইলটি খুব দীর্ঘ নয়। দেখা গেল রামকমল সিংহ সাতটি পরগণায় জমিদারী ও তালুক, কলকাতায় মোট সাতখানি বাড়ি ও বেশ কয়েক বিঘা জমি, তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা, বন্ধকী কারবারে নিযুক্ত সাড়ে সাত লক্ষ টাকা, একখানি জাহাজ, দুটি বৃহৎ কয়লা খনি, দশ লক্ষ টাকার সোনা জহরৎ, তিনজন সাহেবের কাছে ঋণ বাবদ প্রাপ্য সাড়ে ছ' হাজার গিনি ইত্যাদি রেখে গেছেন। এর মধ্যে থেকে দান করা হয়েছে দাস-দাসী, পাইক-গোমস্তাদের বেতনের টাকা প্রতি এক শত টাকা, অর্থাৎ যার বেতন পাঁচ টাকা সে পাবে পাঁচশত টাকা, প্রধান গোমস্তা দিবাকর পাবে বেতনের টাকা প্রতি দুই শত টাকা, আশ্রিতদের জন্য কিছু কিছু মাসোহারা, পৈতৃক গ্রামে দেব মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বার্ষিক দুই শত টাকা, সংস্কৃত কলেজের দুটি উৎকৃষ্ট ছাত্রকে প্রতি বৎসর বৃত্তির জন্য পাঁচ হাজার টাকা জমা ইত্যাদি।

এই সমুদয় সম্পত্তির মধ্যে শুধু একটি পরগণার জমিদারী ও কলকাতার বউবাজারের একটিমাত্র বাড়ি দেওয়া হয়েছে গঙ্গানারায়ণকে, বাকি সবই নবীনকুমারের। শিশু নবীনকুমার সেই মুহূর্তে অতুল বৈভবের অধিকারী হয়ে গেল।

গঙ্গানারায়ণের দৃষ্টি মাটির দিকে, তবু তার চক্ষু জ্বালা করে উঠলো, বুক ভরে গেল প্রচণ্ড অভিমানে। অতিকষ্টে অশ্রু সামলাতে সামলাতে সে অবাক হয়ে উঠলো। কেন এই অভিমান, তার তো বিষয় সম্পদে সত্যিই লোভ নেই? তার নিজের যথেষ্ট যোগ্যতা রয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের নীতির পরিবর্তন হয়েছে, তারা এখন হিন্দু কলেজের ভালো ছাত্রদের ডেকে ডেকে ডেপুটি কালেক্টরের চাকরি দিচ্ছে, গঙ্গানারায়ণের বেশ কয়েকজন বন্ধু সে রকম চাকরি পেয়ে সুখী। গঙ্গানারায়ণ যে-কোনো সময় ইচ্ছে করলেই সে রকম কাজ পেতে পারে। তবু কেন অভিমান? গঙ্গানারায়ণের শুধু মনে হচ্ছে, তাহলে কি রামকমল সিংহ তাকে আর ভালোবাসতেন না? যত স্নেহ দেখাতেন, তা সবই ভান? আশ্রিত পরিজনদের চেয়ে তাকে সামান্য বেশী কিছু দান করেই তিনি কর্তব্য সেরেছেন। এর বদলে রামকমল তাকে কিছুই না দিলে পারতেন।

অতটুকু ছেলে নবীনকুমার, তবু তার বেশ আমি তুমি জ্ঞান হয়েছে। বিধুশেখরের সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে সে তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলো, কার বেশী? দাদামণির বেশী না আমার বেশী?

বিধুশেখর বললেন, তোমার!

অমনি নবীনকুমার হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, আমার বেশী! আমার বেশী! দাদামণি হেরে গ্যাচে!

বিম্ববতী তাকে থামিয়ে দিয়ে বিধুশেখরকে প্রশ্ন করলেন, এ কোন্ উইল? এ উইলের কথা তো আমি কিছুই জানিনি। আগে তো অন্যরকম ছেল!

বিধুশেখর বললেন, মাত্র গত মাসেই রামকমল উইল বদল করেচেন। তোমাকে জানানোর কথা তার মনে আসেনি বোধহয়।

গঙ্গানারায়ণ রোষকশায়িত নেত্রে বিধুশেখরের দিকে তাকালো। সে বুঝতে পারলো, এ সমস্তই বিধুশেখরের কারসাজি। আপনভোলা রামকমলকে দিয়ে বিধুশেখর যা খুশী করিয়ে নিতে পারেন। বিধুশেখর এক সময় গঙ্গানারায়ণকে বেশ ভালোই বাসতেন, কিন্তু বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে সেই ঘটনার পর গঙ্গানারায়ণ বিধুশেখরের স্নেহ থেকে পতিত হয়েছে। বিধুশেখর কঠিন মানুষ, গঙ্গানারায়ণকে বঞ্চিত করে এইভাবে তিনি শাস্তি দিলেন।

গঙ্গানারায়ণ ক্রোধের সঙ্গে বলতে যাচ্ছিল, এই উইল আমি মানি না, কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। বিধুশেখর দক্ষ আইনজ্ঞ, তিনি কোনো কাঁচা কাজ করবেন না।

গঙ্গানারায়ণ বিম্ববতীর দিকে চেয়ে বললেন, মা আমার কিছুই চাই না। সর্বকিছুই নবীনকুমারের

হোক। আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।

বিম্ববতী কেঁদে ফেললেন। গঙ্গানারায়ণের মাথায় হাত রেখে মর্ম-নিঙড়ানো কণ্ঠে বলঙ্গেন, গঙ্গা, তুই কোথাও চলে গেলে আমি মাথা কুটে মরবো। তোরা দু জনেই আমার কাছে সমান। উইলে যা-ই লেকা থাক, সব সম্পত্তি তোদের দু জনের সমান থাকবে। তুই বড় ভাই, তুই-তো নবীনের মাথার ওপর থাকবি।

বিধুশেখর বললেন, বৌঠান, দিন কখনো সমান যায় না। বিষয় সম্পত্তি ছেলেখেলার বস্তু নয়। রামকমল বুঝেশুনেই উচিত ব্যবস্থা করে গ্যাচে। আমার মনে হয়, উইলে যেমন আছে, সেই অনুসারে গঙ্গানারায়ণের বিষয় ভাগ করে দেওয়াই কর্তব্য।

লজ্জাশীলা, মৃদুভাষিণী বিম্ববতী এই প্রথম বিধুশেখরের কথার প্রতিবাদ করে দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, না। আমি যতদিন বেঁচে রয়িচি, গঙ্গা আমার কাচেই থাকবে। নবীন নাবালক, তার বিষয় দেকাশুনো করবে কে?

বিধুশেখর বললেন, তুমি আর আমি। উইলে সেই রকমই লেখা রয়েচে।

বিম্ববতী বললেন, আমার হয়ে গঙ্গাই দেকবে সবকিচু। এটা আপনি কাগজে লেখাপড়া করে নিন। গঙ্গা, তোর কাচে আমার এই মাথার দিব্যি রইলো, তুই নবীনেতে আর তোতে কখনো পৃথগ্ দেখবিনি। তোরা দুজনে আমার দুই নয়নের মণি।

বিধুশেখর বিরক্তভাবে গম্ভীর হলেন।

ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়ে রইলো। সমগ্র সম্পত্তির ওপর গঙ্গানারায়ণের আইনত কোনো অধিকার রইলো না, কিন্তু বিম্ববতীর অছি হিসেবে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও কারবার পরিচালনার ব্যাপারে তার কর্তৃত্ব থাকবে। এজন্য বিধুশেখরের সঙ্গে তার ঠকাঠকি লাগবেই। গঙ্গানারায়ণ মনে মনে বিধুশেখরের সঙ্গে টক্কর দেবার জন্য প্রস্তুত হলো। তার জন্ম থেকে সে দেখে আসছে যে এ বাড়ির সব কিছুই বিধুশেখরের নির্দেশে চলে। এখন থেকে সে বিধুশেখরের সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ করার সবরকম চেষ্টা করবে।

বিধুশেখর গঙ্গানারায়ণকে বললেন, ভাইকে নিয়ে তুমি এখন একটু বাইরে যাও। বৌঠানের সঙ্গে আমার আরও দু' চারটি কতা আচে।

ওরা বেরিয়ে যাবার পর দুজনেই চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। বিধুশেখর কোনোরকম প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না। বিম্ববতী তাঁর ব্যবস্থা মানেননি, বিম্ববতী তাঁর মুখের ওপর কথা বলতে পারেন, এটাই যেন এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না বিধুশেখর। তিনি উগ্রভাবে বললেন, কাজটা ভালো করলে না, বিম্ব। রামকমল সিংহ যা সম্পত্তি রেখে গ্যাচে, তা অনেক রাজারাজড়ারও ভাগ্যে জোটে না। এমন সম্পত্তি নিয়ে অনেক সহোদর ভাইরাও মারামারি কাটাকাটি করে। আর গঙ্গা তো পরের ছেলে।

বিম্ববতী বললেন, ও-কতা বলবেন না। গঙ্গাকে আমি সে-চোকে কখনো দেকিনি।

—মানুষ অনেক বদলে যায়। গঙ্গা যে নবীনকে হিংসে করবে না কখনো, তা কি কেউ বলতে পারে? সেইজন্যই তার সম্পত্তি আলাদা করে দিতে চেয়েছিলুম। ওর এখন থেকে আর এ বাড়িতে না থাকাই মঙ্গল।

—গঙ্গা হীরের টুকরো ছেলে। আমার চে বেশী তো তাকে কেউ চেনে না। ওর মনের মধ্যে লোভ বলে কোনো বস্তু নেই। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ও কোনোদিন অসূহৃৎ করবে না।

বিধুশেখর ভ্রূ কুঞ্চিত করে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর নিজের কন্যা বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে গঙ্গানারায়ণ যে কাণ্ডটি করেছে, সে কথা তিনি বিম্ববতীকে বলেননি। হয়তো এখনো বলার সময় আসেনি। বিম্ববতী বলছেন গঙ্গানারায়ণ হীরের টুকরো ছেলে। কিন্তু তিনি তো জানেন, গঙ্গা দুশ্চরিত্র। সে তাঁর পরিবারে কলঙ্ক আনার চেষ্টা করেছিল। সেজন্য তাঁর কাছে ওর কোনো ক্ষমা নেই।

—আমি নবীনের ভালোর জন্যই এ ব্যবস্থা করেচিলুম। নবীন যেমন তোমার, তেমন তো সে আমারও।

—আপনি বলিচিলেন, ও কথা আর কোনোদিন উচ্চারণ করবেন না। যদি কাকপক্ষীতেও টের পায়…

—না, না, আর বলবো না, কোনোদিন বলবো না।
—এমন করে আপনাতে আমাতে নিভৃতে কতা বলাও কি ঠিক ? ছেলেরা এখন বড় হয়েচে—
—তুমি চাও না আমি আর আসি ?
—আপনি না এলে আমি চক্ষে অসহায় দেকবো। আমার আর কে আচে ? তবে এ সময় ঘরে অন্য কেউ থাকলেই শোভন।
—বিম্ব, তুমি আর আমাকে প্রীতি করো না ?
বিম্ববতী বিধুশেখরের পায়ের ওপর মাথাটা ছুঁইয়ে কাঁদতে লাগলেন। বিধুশেখর তাঁকে তুলে ধরে বললেন, তোমার এই ভুবনমোহিনী রূপ, রামকমল তার কোনো মূল্য দেয়নি। সন্তানহীনা বলে তোমার অশেষ দুঃখ ছেল, সেই দুঃখ জুড়োবার জন্য আমি তোমাকে একটি ছেলে দিইচি। সে কি পাপ ? জীবনে আমি কোনো ভ্রষ্টাচার করিনি, শুধু তোমার কাচেই হার মেনিচি আমি। দ্যাকো, মানুষের নিয়তি কী বিচিত্র ! আমার নিজের স্ত্রীর গর্ভে কোনো পুত্রসন্তান হলো না। আর তুমি একবার চাইতেই আমি তোমায় একটি পুত্র দিলুম। তুমি মুখ ফুটে চাওনি জানি, কিন্তু আমি বুঝিচিলুম তোমার দুঃখু, সেইজন্যই, লোভ বা কামের বশবর্তী হয়ে নয়, আমি তোমাতে উপগত হয়েচি কর্তব্যবোধে ! আমি ব্রাহ্মণ, কুলীনশ্রেষ্ঠ, বিবাহিতা রমণী ব্রাহ্মণ নিয়োগে সন্তান উৎপাদন দেশাচারসম্মত। তাই তোমায় বলচি, কোনো পাপ হয়নি, মনে ভয় রেকো না··· । থাক, এ কতা কোনোদিন কাকপক্ষীতেও জানবে না। আমি আর একলা আসবো না তোমার কাচে।
বিম্ববতী কাঁদতেই লাগলেন।
বিধুশেখর আবার বললেন, রামকমলকে আমি ভালোবাসতুম, তার অনেক গুণ ছেল, কিন্তু এই একটা ব্যাপারে আমি তাকে কখনো ক্ষমা করতে পারিনি। তোমার মতন এমন সোনার প্রতিমা ছেড়ে সে ছাইগাদায় পড়ে থাকতো। সেই আবাগীর বেটীর আমি এবার বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বো। উইলে জানবাজারের বাড়ি কারুকে দান করার কথা লেকা নেই। এ হপ্তার মধ্যেই আমি সে মাগীকে ও বাড়ি থেকে দূর করে তাড়াবো।
কান্না মুছে বিম্ববতী বললেন, আহা, সে থাক না !
বিধুশেখর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে থাকবে ? কার কতা বলচো ?
বিম্ববতী বললেন, ঐ যে মেয়েটি, ঐ যে কমলা না কী যেন নাম শুনিচি, সে ও বাড়িতে আচে থাক না। একটা বাড়িতে আর কী যাবে আসবে !
—কী বলচো তুমি ? সাত ঘাটের জল খাওয়া বেশ্যা মাগী, তার জন্য একখানা বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে ? কক্ষনো না !
—আহা, আমার স্বোয়ামী তাকে পচুন্দো কত্তেন, তার মনে দুঃখ দেওয়া কী ঠিক হবে ? তিনি তো ওর জন্যই বাড়িটা কিনেচিলেন। তাছাড়া শুনিচি সেটা নাকি আগে কোন্ চাঁড়াল না ডোমের বাড়ি ছেল। অমন বাড়ি দিয়ে আমাদের কী হবে !
—ডোম নয়, ডোম নয়, ডম অ্যান্টুনি, এক ফিরিঙ্গির বাড়ি। সেখানে তো আমরা বসত করতে যাচ্চিনে। ভাড়া দিলে কোন্ না বিশ পঞ্চাশ টাকা আসবে। মাগী একেবারে ডাইনী, রামকমলকে ভেড়া বানিয়ে রেকেছেল। এ হপ্তাতেই তাড়াবো ওকে।
এই বিষয়টি নিয়েই প্রথম বিধুশেখরের সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের বিরোধ বাধলো।
মামলা মোকদ্দমা করবার আগে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার জন্য কমলাসুন্দরীর বাড়িতে চারজন পাইকসহ দিবাকরকে পাঠিয়ে দিলেন বিধুশেখর। যাবার সময় দিবাকরকে তিনি বলে দিলেন, কাজ উদ্ধার করে এসো, তোমার ভালোমতন ইনাম মিলবে। কী ইনাম দেবো, তা এখন বলবো না।
বিধুশেখর ভালোরকমই জানেন যে দিবাকরের মতন আমলারা দু তরফ থেকেই টাকা খায়। সেইজন্যই দিবাকরকে আগে থেকে টোপ দিয়ে রাখা দরকার। বিধুশেখর নিজে গেলে অবশ্য এক দাবড়ানি দিয়েই স্ত্রীলোকটিকে একেবারে দেশছাড়া করে দিতে পারতেন, কিন্তু ঐ অপবিত্র স্থানে তিনি আর পদার্পণ করতে চান না। তাছাড়া ওখানে গেলেই রামকমলের স্মৃতি তাঁকে আবার বেশী করে পীড়া দেবে।
ইনামের কথা শুনেই দিবাকর আসল ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে। স্ত্রীলোকটিকে ঐ বাড়ি থেকে উৎখাত না করতে পারলে বড়বাবুর কাছ থেকে ধাতানি খেতে হবে। এই ডামাডোলের মধ্যে তার চাকরি নির্ভর করছে বড়বাবুর মর্জির ওপর।

দিবাকর জানবাজারে পৌঁছে বিরাট হম্বিতম্বি শুরু করে দিল। দাসদাসী ও দু-চারজন পরগাছা ধরনের মানুষ তখনো রয়ে গেছে সে বাড়িতে। দিবাকর সামনে যাকে দেখলে তারই ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বললো, নিকালো, আভি নিকালো। দিবাকরের পেছনে ভয়াল চেহারার পাইকদের দেখে ঐ নারী-পুরুষরা প্লাবনের সময়কার ইঁদুরের মতন দৌড়ে পালাতে লাগলো এদিক ওদিক।

দিবাকর উঠে এলো দোতলায়।

বড় মজলিশ কক্ষটির মাঝখানে কুশের আসনে নিশ্চল হয়ে বসে আছে কমলাসুন্দরী। পরনে একখানি সাদা থান, দু হাতে কিংবা কণ্ঠে কোনো অলঙ্কার নেই, খাঁটি হিন্দুর বিধবার মতন বেশ। মাথা অবশ্য মুণ্ডন করেনি কমলাসুন্দরী, দীঘল খোলা চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। কমলাসুন্দরীর মুখে এখনো শোক ও বেদনার নরম লেখা।

দিবাকরকে দেখে মুখ তুলে কমলাসুন্দরী প্রশ্ন করলো, কে?

দিবাকর কমলাসুন্দরীকে অনেকদিন থেকেই দেখছে। এই নারীকে সে এই বেশে দেখে হকচকিয়ে গেল।

বিশেষ প্রয়োজনে দিবাকরকে রামকমল সিংহের খোঁজে কয়েকবারই আসতে হয়েছে এখানে। তখন সে দেখেছে এই স্ত্রীলোকটি যেন একটি সাজানো পুতুল, রামকমল সিংহ এই মেয়েটিকে নিয়ে পুতুল খেলা খেলতেন। গত কয়েক বৎসরে নৃত্যপটিয়সী হয়ে উঠেছিল কমলাসুন্দরী, সেই কারণে তার সাজ ও অলঙ্কারের মাত্রা আরও বেড়েছিল। তার এই নিরাভরণ দেহ যেন চেনাই যায় না। তাছাড়া বাবু মারা গেলে তাঁর রক্ষিতা আবার নতুন করে বাবু ধরবে, এটাই স্বাভাবিক। কোনো বেশ্যা যে বিধবার রূপ ধরতে পারে, এমন কথা কেউ সাতজন্মে শোনেনি!

দিবাকর বললো, এই, ইয়ে···বড়বাবু আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

কমলাসুন্দরী বললো, বড়বাবু···বড়বাবু কে?

—সেই যে সেদিন এয়েচিলেন, আমাদের বাবুর বন্ধু, তিনিই এখন সবকিছুর মালিক। তা তিনি বললেন···

—আমি একজনকেই বড়বাবু জানি, যিনি আমাদের অকূল পাথারে ভাস্যে সগ্গে গেচেন। আর বড়বাবু কেউ নেই।

—যা হয়ে গ্যাচে তা তো আর ফেরাবার উপায় নেই। বাবু হঠাৎ চলে গ্যালেন, এখন বিধুশেখর মুকুজ্যেই দণ্ডমুণ্ডের কত্তা। তিনি বলে পাটালেন, এ বাড়ি তোমায় ছাড়তে হবে।

—আমি এ বাড়ি ছাড়বো? তারপ। আমি কোতায় যাবো? এই বাড়িই আমার বাড়ি—

—সে রকম নেকাপড়া তো কিচু করে যাননি। বাবু ছিলেন আপনভোলা, হঠাৎ মরে যাবেন তাও তো ভাবেননি, এখুন তো, মেয়ে, তোমার নিজের পথ নিজেকেই দেকতে হবে।

—আমি যাবো না।

—সে কতা বললে কী চলে! বাবু তোমায় আলাদা কিচু দিয়ে থুয়ে যাননি? বাবু সোনাদানা টাকাকড়ি তো কম ঢালেননি তোমার পায়ে, আলাদা বাসা ভাড়া করে নেও গে।

—আমি এখেন থেকে যাবো না!

—দেকো মেয়ে, বেশী জেদ করোনি। বিধু মুকুজ্যের কবজা থেকে এ বাড়ি তুমি ছাড়াতে পারবে না।

—আমার বাবু এখেনে মরেচেন, আমিও এখেনেই মরবো। আমি ম'লে তারপর তোমরা এ বাড়ির দখল নিও!

—বালাই ষাট, এমন কাঁচা বয়েসে তুমি মরবে কেন? তোমার তো গোটা জীবনটাই সামনে পড়ে আচে। তবে এ বাড়ির মায়া তোমায় ছাড়তেই হবে।

—খবর্দার, আমার সামনে এসো না!

দু' পা এগিয়ে এসেও দিবাকর থমকে দাঁড়ালো। হঠাৎ বন বিড়ালীর মতন ফোঁস করে উঠেছে কমলাসুন্দরী। ঈষৎ কঠিন হয়ে দিবাকর বললো, তবে কি তোমায় জোর করে তুলতে হবে? আমার ওপর যা হুকুম···কেন অবুঝপনা করচো?

কমলাসুন্দরী বললো, তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে দ্যাকো, আমি তখুনি বিষ খেয়ে আত্মঘাতিনী হবো। এই যে বিষ রেখিচি।

আসনের এক প্রান্ত তুলে দেখালো কমলাসুন্দরী, সেখানে সত্যিই একটি কাগজের পুরিয়া রয়েছে।

দিবাকর আর সাহস করলো না। স্ত্রীলোকদের ওপর জোর জবরদস্তি করা তার ঠিক পছন্দ হয় না। তাছাড়া, মাত্র তো কয়েকদিন আগেই এই রমণী ছিল তার বাবুর দুই নয়নের মণি, তখন এর মনোরঞ্জনের জন্য রামকমল সিংহের আদেশে কত কিছু জোগাড় করতে হয়েছে তাকে, আর আজ সেই রমণীকেই সামান্য কুকুর বিড়ালের মতন গলাধাক্কা দিয়ে তাড়াতে দিবাকরের মতন ঘোর বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরও চক্ষুলজ্জা হলো।

আরও একটা কথা, হঠাৎ যদি সত্যিই বিষ-টিষ খেয়ে বসে, তখন তার হ্যাঁপা সামলাবে কে ? তখন হয়তো বিধুশেখরই তাকে বলবেন, কে তোকে বলেছেল হাত ধরে টানাটানি করতে ? আমাকে আর একবার জিজ্ঞেস করে যাসনি কেন ?

মুখ রক্ষার জন্য দিবাকর বললো, আমি আরও দুদিন সময় দিয়ে যাচ্চি, এর মধ্যে একটা কিছু বন্দোবস্ত করে নাও। এ বাড়ি তোমায় ছাড়তেই হবে বলে রাকলুম।

সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দিবাকরের আবার আফসোস হলো। কার্যোদ্ধার না করে গেলে বিধুশেখরের কাছে কতখানি ধাতানি খেতে হবে কে জানে ? বারাঙ্গনাটির কাছে জব্দ হয়ে গেল সে। তার মনে হলো, ঐ সব বৈধব্যের বেশটেশ আসলে ভেক। আসনের নীচে বিষ পর্যন্ত রেখেছে। এসব তো ও মেয়ের নিজের বুদ্ধিতে কুলোবে না, নিশ্চয়ই ওর কানে মন্তর দিয়েছে অন্য কেউ। সহজে ও বাড়ি ছাড়বে না।

ফিরে এসে দিবাকর দেখলো, বৈঠকখানা ঘরে বিধুশেখর আর গঙ্গানারায়ণ অনেক দলিল দস্তাবেজ খুলে বসে হিসেবের কাজে ব্যস্ত। তাদের দুজনের কাছেই দিবাকর তার অভিযানের পরিণাম ব্যক্ত করলো।

বিধুশেখর চোয়াল শক্ত করে বললেন, তুমি গলাধাক্কা দাওনি ভালোই করোচো। আদালতের প্যায়দা পাঠিয়েই ও কাজটা সারা যাবে।

গঙ্গানারায়ণ বললো, কেন, সে বাড়ি ছাড়বে না কেন ? ও বাড়ির ওপর তার কী হক্ক আছে ? মামলা মোকদ্দমা করার দরকার কী, আমি নিজে গিয়ে তাকে তাড়িয়ে আসবো।

বিধুশেখর বললেন, না, না, ও সমস্ত জায়গায় তোমার যাবার দরকার নেই।

গঙ্গানারায়ণ বললো, কেন ? বাড়ি তো আমাদেরই, সেখানে আমি যেতে পারবো না কেন ?

বিধুশেখর বললেন, ঐ অবিদ্যা আগে দূর হোক, তারপর যেও। ওদের মুখ দর্শন করাও পাপ।

বিধুশেখর নিষেধ করলেন বলেই গঙ্গানারায়ণ সেখানে গেল সেদিনই সন্ধেবেলা। কারুকে কিছু না বলে, একা।

আবার রামকমল সিংহের নিজস্ব জুড়িগাড়ি এসে থামলো জানবাজারে কমলাসুন্দরীর গৃহের সামনে। গাড়িটি নিকষ কালো মেহগিনি কাষ্ঠে নির্মিত, এমনই চিক্কন পালিশ যেন দর্পণের মতন মুখ দেখা যায়। আর অশ্বদুটি দুগ্ধ ধবল, তাদের পৃষ্ঠে জরির কাজ করা কিংখাব। গাড়ির সম্মুখের পিত্তল দণ্ড দুটির এত চাকচিক্য যে সোনা বলে ভ্রম হয়। অবশ্য রামকমল সিংহ তাঁর জুড়িগাড়িতে স্বর্ণ দণ্ড ব্যবহার করলেও আশ্চর্যের কিছু ছিল না। গাড়ির সম্মুখে অধিষ্ঠিত বল্লাধারী কোচম্যানের পোশাক মুঘল সেনানীর মতন, তাকে দেখলেই পথচারীদের মনে সম্ভ্রম জাগে। গাড়ির পিছনেও উর্দিধারী দুজন রক্ষী দণ্ডায়মান থাকে সব সময়।

চার বৎসর আগে জানবাজারের এই গৃহটি ক্রয় করা হয়েছিল, তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই রামকমল সিংহের এই জুড়িগাড়িকে দেখা গেছে দ্বারের সামনে। কিন্তু আজকের আগমনের সঙ্গে তার কত তফাত ! আগে গাড়িখানি থামবার পরই পিছন থেকে রক্ষী দুজন ছুটে এসে দোর খুলে দাঁড়াতো। মেদবহুল শরীর নিয়ে রামকমল সিংহ রক্ষী দুজনের স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করে ধীরে ধীরে নামতেন। তাঁর মাথায় সোনালী জরির পাগড়ি, অঙ্গে মখমলের কুর্তা, হাতে গজদন্তের ছড়ি, আঙুলগুলিতে মোট

ছ'খানি আংটি, পুরুষ্টু গুম্ফ সমন্বিত মুখখানি সদা হাস্যময়, এদিক ওদিক তাকিয়ে তিনি শ্লথ পায়ে ঢুকে যেতেন গৃহের মধ্যে।

আজ সব কিছুই অন্যরূপ। জুড়িগাড়ি থামার পরই তার ভেতর থেকে দ্রুত নেমে এলো এক নবীন যুবা। চুনোট করা ধুতি ও চীনা সিল্কের বেনিয়ান পরা, শরীরে কোনো অলঙ্কার নেই। পাছে তাকে কেউ চিনতে ভুল করে তাই কোচম্যান নেমে এসে চিৎকার করতে লাগলো, এই, সব হঠ যাও, হঠ যাও, বাবুর বড় ছেলে এয়েচেন! গড় কর, বাবুর বড় ছেলে।

গঙ্গানারায়ণ অন্যদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না, সে থমকে দাঁড়িয়ে বাইরে থেকে একবার গৃহখানি নিরীক্ষণ করে নিল। গৃহটি দ্বিতল তবে প্রস্থে অনেকখানি, কক্ষের সংখ্যা অন্তত বারো চোদ্দটি হবেই। লৌহ ফটকের দুপাশে দুটি নারিকেল বৃক্ষ, গৃহের ডান পাশে ছোট একটি বাগানের মতনও রয়েছে।

গঙ্গানারায়ণ কোচম্যানের দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি আগে আগে চলো। গঙ্গানারায়ণ একুশ বৎসর বয়স্ক যুবা, এই প্রথম সে কোনো রূপোপজীবিনীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে যাচ্ছে। তার মতন বড় বংশের এবং তার বয়েসী যুবাদের এই সব প্রমোদ ভবনে গমনাগমন অতি স্বাভাবিক ঘটনা। তার বয়েসী অনেক ধনাঢ্য যুবাই নিজ গৃহে এবং নিজ পত্নীর সঙ্গে একই শয্যায় রাত্রিযাপন করা বড় অসম্মানের কাজ মনে করে। সেজন্য অনেকেরই বাঁধা রাঁঢ় থাকে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে এরকমও দেখা যায় পিতা ও পুত্রের একই পল্লীর বিভিন্ন গৃহে গতায়াত আছে। কিন্তু হিন্দু কলেজের ছাত্ররা এই প্রথা পরিত্যাগ করেছে। গঙ্গানারায়ণের বন্ধুরা প্রায় সকলেই বারাঙ্গনা-গমনকে ঘৃণার চক্ষে দেখে।

এ বিষয়ে গঙ্গানারায়ণের ঘৃণা যেন আরও প্রবল। সে এসেচে তাদের পারিবারিক সম্পত্তি উদ্ধার করতে। যে কুলটা স্ত্রীলোকের জন্য তার মা বিম্ববতী এতকাল মনঃকষ্ট পেয়েছেন, সেই স্ত্রীলোকটিকে সে আজই গৃহছাড়া করবে।

কোচম্যান ও অন্যান্য অনুচররা হঠো হঠো বলতে লাগলো, গঙ্গানারায়ণ সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো দ্বিতলে। মজলিস-কক্ষটিকে একটু আগেই যেন পরিষ্কার করা হয়েছে, ডুগি-তবলা, হারমোনিয়াম, ঘুঙুর সব অদৃশ্য। পরিচ্ছন্ন গালিচার ওপর শুধু একটি মাত্র কৌচ। উপরতলায় কোনো পুরুষ মানুষ নেই, তিনজন সুসজ্জিতা যুবতী দাসী যেন গঙ্গানারায়ণের জন্যই অপেক্ষা করে ছিল, তারা কৃতার্থ ভঙ্গিতে বললো, আজ আমাদের কত বড় সৌভাগ্য, আপনি নিজে এ বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েচেন!

তারা গঙ্গানারায়ণের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালো সেই কৌচে। একজন হাঁটু গেড়ে বসে গঙ্গানারায়ণের পা থেকে জুতো খুলতে লাগলো আর একজন দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এলো একটি শ্বেতপাথরের গেলাস ভর্তি সরবত, সেটি হাতে নিয়ে গঙ্গানারায়ণের সামনে অপ্সরার ভঙ্গিতে দাঁড়ালো।

বিস্মিত গঙ্গানারায়ণ জিজ্ঞেস করলো, এ কী?

মেয়েটি ঝলমল হাস্যে বললো, আপনি ক্লান্ত হয়ে এয়েচেন, একটু পেস্তার সরবত আপনার সেবার জন্য।

গঙ্গানারায়ণ হাত নেড়ে বললো, না, না আমার প্রয়োজন নেই।

অন্য একটি মেয়ে ততক্ষণে নিয়ে এসেছে আলবোলা। তার রূপো বাঁধানো নলটি এগিয়ে দিল প্রাক্তন প্রভুর পুত্রের দিকে।

গঙ্গানারায়ণ তাকেও বললো, না, না, আমি ধূমপান করি না।

তখন তিনটি মেয়েই সমস্বরে বললো, আমরা আপনার দাসী, আপনি হুকুম করুন আপনার জন্য কী আনবো?

গঙ্গানারায়ণ প্রথমে খানিকটা বিমূঢ় বোধ করলো। নারীদের সঙ্গে সে সব সময় সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করে। তার এ-যাবৎ জীবনে সে এমন লজ্জাহীনা রমণী দেখেনি। দু-চারজন আত্মীয়া ব্যতীত অপর নারীদের মুখ দর্শনই দুরূহ ঘটনা। পথে-ঘাটে সে নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকদের দেখেছে বটে কিন্তু গঙ্গানারায়ণ তাদের দিকে কখনো ভালো করে দৃষ্টিপাত করেনি। সে বরাবরই লাজুক স্বভাবের। কিন্তু এই স্ত্রীলোকদের এমন সাবলীল নির্লজ্জতা তাকে কাঁপিয়ে দেয়। তার দুই কর্ণমূল উষ্ণ হয়ে ওঠে। সে চক্ষু নত করলো।

দুটি মেয়ে টিপতে লাগলো গঙ্গানারায়ণের দুই পা, এবং এদের মধ্যে যে বেশী রূপসী সে গঙ্গানারায়ণের কানে তার নরম ওষ্ঠ ছুঁইয়ে ফিসফিস করে বললো, আপনার জন্য একটা শ্যাম্পেন খুলবো কী?

বেশী লজ্জা পেলে মানুষ হঠাৎ রুক্ষ হয়ে ওঠে। গঙ্গানারায়ণ অতিরিক্ত রুক্ষতার সঙ্গে বললো, এসব কী? আপনারা সরে যান। আপনাদের কর্ত্রীকে ডাকুন।

একজন রমণী বললো, আমাদের কর্ত্রী তো আসবেন না।

আরেকজন বললো, আমাদের পছন্দ হলো না? হা অদেষ্ট!

গঙ্গানারায়ণ এবার সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে বললো, কেন, তোমাদের কর্ত্রী আসবেন না কেন?

একজন রমণী বললো, আপনি এয়েচেন শুনেই তিনি ঘরে আগল দিয়েচেন।

আরেকজন বললো, তিনি আপনাকে মুখ দেকাবেন না।

অন্যজন বললো, আপনি যে তাঁর ছেলের মতন গো!

গঙ্গানারায়ণ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি তেনার সঙ্গে কাজের কথা বলতে এয়েচি। তোমরা সরে যাও!

তখন দুই রমণী গঙ্গানারায়ণের দু হাত ধরে বললো, আহা রাগ কচ্চেন কেন গো বাবু, বসো বসো! আমরা হলুম গে অবলা, আপনাদের রাগ দেকলে যে আমাদের বুক কাঁপে।

তারপর একজন তার উত্তাল বক্ষদ্বয়ের ওপর এক হাত রেখে সুমধুর হাস্যে বললো, এই দ্যাকো, কেমন বুক কাঁপচে, দেকুন, দেকুন, নিজে হাত দিয়ে দেকুন।

অন্য একজন বললো, আমরা তোমার রাগ দেকে যদি দাঁত ছিরকুট্টি হয়ে মরে যাই, তা হলে যে আপনার পাপ লাগবে।

গঙ্গানারায়ণের মনে হলো, সে যেন একটা ফাঁদে পড়েচে। কেন সে এখানে এলো! একবার ভাবলো, সে দৌড়ে এখান থেকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু তা হলে এই মেয়েরা তার পশ্চাতে খিলখিল করে বিদ্রূপ হাস্য করবে না! সে সিংহ পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান হয়ে পালিয়ে যাবেই বা কেন? এই গৃহ তাদের সম্পত্তি। এখানে সে ইচ্ছে করলে আগুন লাগিয়েও দিতে পারে।

এবার সে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললো, তোমাদের কর্ত্রীর সঙ্গে দেখ না করে আমি যাবো না। তাকে শীঘ্র খবর দাও, এই আমার হুকুম।

পরিহাসপ্রিয়া রমণীটি বললো, ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই। আমাদের যদি পছন্দ না হয় তবে আর কারুকে ডাকবো তো বলুন!

সিঁড়ির কাছে বলিষ্ঠকায় কোচম্যান চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। গঙ্গানারায়ণ তার দিকে চেয়ে বললো, করিমবক্স, ঢুঁড়কে দেখো তো মালকান কাঁহা—

তখনই মজলিস কক্ষের একদিকের দ্বার খুলে গেল। সেখানে এসে দাঁড়ালো কমলাসুন্দরী। শুভ্র থানকাপড় পরা সেই আগের মতই বৈধব্য বেশ, অঙ্গে একটিও অলঙ্কার নেই, পিঠের ওপর মেঘের মতন খোলা চুলের ঢাল।

কমলাসুন্দরীকে দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল গঙ্গানারায়ণ। অনেক দিন ধরেই সে এই নারীর কথা শুনে আসছে, মনে মনে কমলাসুন্দরীর রূপ সে কল্পনা করে রেখেছিল। তার সঙ্গে এই নারীর সামান্যতম মিলও নেই।

গঙ্গানারায়ণ ভেবেছিল ছলাকলা-নিপুণা এই রমণী হবে মধ্যবর্ষীয়া, অন্তত তার মা বিম্ববতীর সমবয়স্কা তো হবেই। এর ওষ্ঠ হবে তাম্বুলরঞ্জিত, দেহ ঈষৎ পৃথুলা, চক্ষু দুটি সুর্মা আঁকা। কিন্তু একে দেখে যেন গঙ্গানারায়ণের নিজের চেয়েও ছোট মনে হয়, যেন বিন্দুবাসিনীর সমান। বিশেষত এই বৈধব্যবেশের জন্যই বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে মিলটির কথাই গঙ্গানারায়ণের প্রথমে মনে আসে। তার বক্ষে অমনি একটি মোচড় লাগে।

কমলাসুন্দরী গঙ্গানারায়ণের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে কয়েক পা এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালো, তারপর খুব শান্তভাবে ধীরে ধীরে বললো, আপনি···তুমিই গঙ্গা? তোমার কথা কত শুনিচি···কত বড় বিদ্বান, কত গুণ, তুমি এয়োচো, এ বাড়ি ধন্য হলো।

গঙ্গানারায়ণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, কোনো কথা বলতে পারলো না।

কমলাসুন্দরী আবার বললো, আমি হতভাগিনী, জানি, নরকেও আমার স্থান হবে না, আমার জাত নেই, মান নেই, তবু আমি সর্বসমক্ষে বলবো, তোমার বাবা ছিলেন আমার স্বামী, আমি তাঁকে পতির

চক্ষে দেকিচি গো, আর কোনো চক্ষে দেকিনি, ভগবান সাক্ষী, আমি তেনাকে কোনোদিন ছলনা করিনি…

সহচরীদের দিকে ফিরে কমলাসুন্দরী সজলনয়নে বললো, তোরা বল, তোরা তো দেকিচিস সব, কোনোদিন আমি তেনাকে ছলনা করিচি ? তিনি ছিলেন দেবতুল্য মানুষ।

সহচরীরা বললো, সে কতাই তো এতক্ষুণ এনাকে বোঝাচ্চিলুম, বড়বাবু ছেলেন আমাদের দেবতা, তেনার ছেলেকে আমরা খাতির যত্ন করবো না ?

কমলাসুন্দরী বললো, আমি অসহায়, দীনহীনা, ভাগ্যহীনা, ছেঁড়াকপালী। তিনি আমায় অকূল পাথারে ভাস্যে চলে গেলেন এই যে এখেনে, ঠিক এই ঘরটায়, মিত্যুর আগে আমার পানে চেয়ে তিনি বললেন, কমল, আমি চললুম, তুমি এখানেই থেকো, আমি ওপর থেকে তোমাকে দেকবো ! সেই থেকে আমি এ বাড়ি ছেড়ে এক পা বেরোইনি…গঙ্গা, তোমায় দেকে আমার বুকের মধ্যে উথালি পাথালি কচ্চে, অবিকল যেন সেই মুখখানা বসানো, সেইরকম চাউনি…

গঙ্গানারায়ণ একটি তপ্ত নিশ্বাস ছাড়লো। বাল্যকালে অনেকেই বলতো যে তার মুখের আদলে তার পিতার মুখের খুব মিল আছে। তখন বোধহয় তারা জানতো না যে গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে তার পিতা রামকমল সিংহের কোনো রক্তসম্পর্ক নেই। এই নারীও হয়তো সে কথা জানে না।

কমলাসুন্দরী বললো, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, না, বসবার প্রয়োজন নেই।

কমলাসুন্দরী বললো, তুমি যে এয়োচো, এই আমাদের কত ভাগ্যি। তোমায় দেকে তবু চক্ষু জুড়োলো। যেন তোমার মধ্যে তেনাকে দেকলুম। তিনি এ বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ফেলেচেন, এ বাড়ি আমার কাশী-বৃন্দাবন, আমি আমার শেষ দিনটি পর্যন্ত এখেনে থেকে তেনার ইস্মৃতি পুজো করবো।

বয়সে প্রায় সমান হলেও কমলাসুন্দরী এমনভাবে কথা বলছে, যেন সে কত বড়। এই রমণীর স্মৃতি জুড়ে এখনো রয়েছেন রামকমল। গঙ্গানারায়ণ ওর দিকে চেয়ে থাকলেও তার বেশী করে মনে পড়তে লাগলো, বিন্দুবাসিনীর কথা। এই নারীও যেন বিন্দুরই মতন অসহায়। বিন্দুকে একা জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো দূর বিদেশে, অথচ বিন্দুর তো কোনো দোষ ছিল না। আর কি কোনোদিন দেখা হবে বিন্দুর সঙ্গে ?

কমলাসুন্দরী বললো, পাইক বরকন্দাজরা এসে জোর করে টানাটানি করলেও আমি যাবো না, আমি এই পুণ্যভূমিতে বিষ খেয়ে মর্বো। আদালতের প্যায়দারা এসে যদি আমার মাথায় লাঠি মেরে রক্তারক্তি করে, তবু আমায় কেউ ঠাঁই নাড়া কত্তে পারবে না…

গঙ্গানারায়ণকে তবুও নীরব দেখে কমলাসুন্দরী হঠাৎ থেমে গেল। তারপর কণ্ঠস্বর খুব সহজ করে সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি আমাকে এ বাড়ি থেকে দূর করে দেবার জন্য নিজে এয়োচো ? তুমি চুপ করে রয়োচো, লজ্জায় সে কতা বলতে পাচ্চো না ? বলো, সে কতা বলো, তুমি মুখ ফুটে একবার বললে, আমি এই দণ্ডে এক কাপড়ে এই ভিটে ছেড়ে চলে যাবো, একবারও পেচুন পানে তাকাবো না। আর কোনোদিন তোমরা আমায় দেকতে পাবে না। যদিও এ-কতা উচ্চারণ করলে আমার জিভ খসে যাওয়া উচিত, তবু আমি বলবো, গঙ্গা, তুমি আমার ছেলের মতন। তুমি বললে আমি সব শুনতে রাজি আচি, তুমি যদি আমায় আস্তাকুঁড়ে যেতে বলো—

গঙ্গানারায়ণ আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলো না। আবেগকম্পিত স্বরে বললো, মা, আপনাকে কোথাও যেতে হবে না, আপনি এ বাড়িতেই থাকবেন।

কমলাসুন্দরী প্রায় চিৎকার করে উঠলো। হাসি-কান্না মেশানো সুরে বললো, মা ? তুমি আমায় মা বললে ? ওগো, আমার মতন মহাপাতকীও যে উদ্ধার হয়ে গেল !

সহচরীদের দিকে তাকিয়ে কমলাসুন্দরী বললো, ওরে, তোরা সব শুনিচিস ? মা বলেচে, আমার প্রাণপতির ছেলে আমায় মা বলেচে, আমি ধন্য !

কমলাসুন্দরী গঙ্গানারায়ণের হাত জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো তীব্র আনন্দে।

গঙ্গানারায়ণ অনভিজ্ঞ, জীবনের কতখানিই বা সে দেখেছে, নারীগণের আকস্মিক হাসি বা কান্নার মর্ম সে বিশেষ কিছুই বোঝে না। কমলাসুন্দরীর অঝোর কান্না দেখে তারও চোখে জল এসে যাচ্ছিল, অতি কষ্টে নিজেকে সামলে রেখে সে বললো, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, কেউ আপনাকে এখেন

থেকে সরাতে পারবে না। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি।

পাশের যে ঘরটিতে রামকমল সিংহ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন কমলাসুন্দরী সেই ঘরটিতে গিয়ে কাঁধে আঁচলের খুঁট জড়িয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। তারপর মেঝেতে কপাল ছুঁইয়ে বললো, ওগো, তুমি শুনচো ? তুমি দেকচো ? তোমার ছেলে নিজের মুখে বলেচে, আমি এখেনে থাকবো, তোমার সুযোগ্য ছেলে, হীরের টুকরো ছেলে, সে আমায় মা বলেচে।

গঙ্গানারায়ণ সিঁড়ির দিকে এগোতে যেতেই তিন সহচরী তাকে বললো, আপনি মানুষ নন গো, আপনি দেবতা। কতা দিন, আপনি মাঝে মাঝে আসবেন, আমাদের একটু সেবা কত্তে দেবেন গো।

গঙ্গানারায়ণ বললো, না, সে-রকম কথা দিতে পারি না। তবে ভয় নেই, তোমাদের কেউ বিরক্ত করবে না।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় গঙ্গানারায়ণ অনুভব করলো, তার সর্ব শরীর কাঁপছে। কেন কাঁপছে, তা সে নিজেই বুঝতে পারলো না। স্বল্পবাসা, উন্মুক্ত স্বভাবের এতগুলি রমণীকে এত কাছ থেকে সে কখনো দেখেনি, এদের প্রতি তার অত্যন্ত ঘৃণা ছিল, অথচ আজ এদের মুখোমুখি এসে তো তেমন ঘৃণা জাগলো না। তার মনে হলো, এরা সবাই যেন বিন্দুবাসিনীর মতন নিয়তির প্রহারে এরকম অবস্থার মধ্যে পড়েছে।

সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গঙ্গানারায়ণ জুড়িগাড়িতে উঠে বললো, গাড়ি ঘোরাও। কোচম্যান জিজ্ঞেস করলো, হুজুর, এবার কোন্ দিকে যাবো ?

গঙ্গানারায়ণ একটুক্ষণ ইতস্তত করলো। সত্যিই তো, সে কোথায় যাবে এখন ? এখনই গৃহে ফিরে যেতে তার ইচ্ছে হলো না। তার মনে এখন তীব্র আসঙ্গ লিপ্সা। শুধু মনে পড়ছে বিন্দুবাসিনীর কথা। কিন্তু বিন্দুর সঙ্গে তার আর দেখা হবার উপায় নেই।

কোচম্যানকে সে নির্দেশ দিল কেল্লার কাছে গঙ্গার ধারে গাড়ি নিয়ে যেতে। সে মুক্তবায়ু সেবন করে শরীর জুড়োবে।

এখন প্রতিদিনই সকালে বিধুশেখর এবং গঙ্গানারায়ণ কয়েক ঘণ্টার জন্য আলোচনায় বসে। রামকমল সিংহের বিস্তীর্ণ সম্পত্তি কোন্‌টি কোথায় কী অবস্থায় আছে, তা গঙ্গানারায়ণের বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। এ সম্পর্কে গঙ্গানারায়ণ নিজেই ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছে। কিছুদিন আগেও বিষয়-আসয় সম্পর্কে তার কোনো মোহ ছিল না, কিন্তু উইলে সে নিজে বঞ্চিত হয়েছে বলেই যেন হঠাৎ তার আগ্রহ বেড়ে গেছে। সে নিজে কিছু চায় না, কিন্তু বিধুশেখরের কর্তৃত্ব সে খর্ব করবেই। ভবিষ্যতে নবীনকুমার যখন সাবালক হবে তখন গঙ্গানারায়ণ সম্পূর্ণ সম্পত্তি তার হাতে তুলে দেবে। সিংহ পরিবারকে সে বিধুশেখরের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করবেই।

কথাবার্তা হয় অতি শুষ্কভাবে, আগেকার সেই স্নেহ শ্রদ্ধার সম্পর্ক আর নেই। বিধুশেখর এখনো তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব খাটিয়ে গঙ্গানারায়ণকে জালে আবদ্ধ করতে চান, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ আর কোনদিন সে-রকমভাবে অভিভূত হবে না।

আলোচনা শেষ হবার পর বিধুশেখর বললেন, এই পর্যন্ত মোটামুটি তুমি বুঝলে। এবার তুমি ইব্রাহিমপুরের তালুকটা ঘুরে দেকে এসো। সেখানকার প্রজারা বেগড়বাঁই করচে। আমি বলি কী, ওদিককার নীল চাষের কারবারটা সাহেবদের কাছে বেচে দেওয়াই ভালো। সাহেবদের সঙ্গে নীল চাষের ব্যাপারে আমরা যুঝতে পারবো না। গঙ্গানারায়ণ বললো, দেখি, আমি নিজে একবার দেকে আসি।

তারপর গঙ্গানারায়ণ অকস্মাৎ খুব সংক্ষিপ্তভাবে বললো, জানবাজারের বাড়িটা আমরা ছেড়ে দিচ্চি।

কথাটা বলেই গঙ্গানারায়ণ উঠে দাঁড়ালো। যেন এ বিষয়ে আর কিছু আলোচনার প্রয়োজন নেই।

বিধুশেখর বিস্মিতভাবে বললেন, জানবাজারের বাড়ি ? কোন্ বাড়ি ? যে বাড়ি ডম আণ্টুনির কাচ থেকে কেনা হয়েছেল ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, হ্যাঁ। সে বাড়ি আমার পিতা আমাদের ভোগে লাগাবার জন্য কেনেননি। সে বাড়ি তিনি অন্য একজনকে দিয়ে গ্যাচেন !

—অন্য একজনকে দিয়ে গ্যাচেন ? কাকে ? কাগজপত্তরে কোথাও তার উল্লেখ রয়েচে ? আমাকে

দ্যাখাও দিকি !

—লেখা না থাক, তাঁর মুখের কথাই যথেষ্ট।

বিধুশেখর গঙ্গানারায়ণের কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে জোর দিয়ে বললেন, না, না, ওসব কোনো কাজের কতা নয়। দেব-দ্বিজে দান করলেও না হয় পরকালের কাজে লাগতো। না দেবায়, না ধর্মায়, এক বেশ্যা মাগীর ভোগে লাগবে ঐ অতবড় বাড়ি ? ছ্যাঃ ! একটা মামলা ঠুকে দিলেই মাগী বাপ বাপ বলে পালাবে।

গঙ্গানারায়ণ বিধুশেখরের মুখর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল না। অকম্পিত গলায় বললো, না, মামলা ঠোকবার দরকার নেই। আমি কথা দিইচি, ও বাড়ি আমরা দখল নিতে যাবো না।

—কথা দিয়োচো ! কাকে কথা দিয়োচো ?

—আপনি তার নাম জানেন। আমার পিতার মৃত্যুর সময় আপনি তাকে দেকেচিলেন।

—কমলা বলে সেই ছুঁড়িটা ? তাকে তুমি কতা দিয়োচো ? তাকে তুমি কোতায় দেকলে ?

—আমি গিয়েচিলুম ও বাড়িতে।

—তুমি গেসলে ? তুমি কি আজকাল ঐ সব পাড়ায় যাতায়াত শুরু করোচো নাকি ?

—হ্যাঁ। ভাবচি মাঝে মাঝেই যাবো। এ বিষয়ে তো আমি আপনার কাছে কোনো শপথ করিনি।

গঙ্গানারায়ণ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, বিধুশেখর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ডেকে বললেন, শোনো। তুমি ঐ কমলা ছুঁড়িটাকে কতা দিয়োচো কোন্ এক্তিয়ারে ? এমন যাকে তাকে কতা দেবার অধিকার তোমায় কে দিয়েচে ?

দ্বারের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে গঙ্গানারায়ণ শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বললো, আমি মায়ের অনুমতি নিইচি। মা বলেচেন, ও সম্পত্তিতে আমাদের প্রয়োজন নেই। পিঁপড়ের পেট টিপে মধু বার না করলেও আমাদের চলে যাবে।

—তোমার মাকে বলোচো যে তুমি রাতের বেলায় অবিদ্যাদের বাড়িতে যাতায়াত করচো ?

—হ্যাঁ বলিচি।

—তোমার মা তো আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কখোনো কোনো বিষয়ে মত দেননি।

—খুড়োমশাই, আপনি জানেন যে আমি মিথ্যে ভাষণ করি না। আপনার সন্দেহ হয় আপনি মাকে জিজ্ঞেস করে দেকবেন।

—দাঁড়াও। তোমার মা বলে থাকলেও তিনি ভুল বুঝে বলেচেন। আমি বলচি, এ মামলা হবেই।

—আমার মা যতদিন রয়েচেন, ততদিন আমার মতামতের একটা মূল্য থাকবে, এমনই দলিল করা হয়েচে। আমার মা যদি আমার ওপর থেকে বিশ্বাস ফিরিয়ে নেন, তবে সেদিন, সেই মুহূর্তেই আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো ! আমি বলচি, এ মামলা হবে না।

—বেয়াদব ! আমার মুখে মুখে কতা ! তোর মা আমার চেয়ে তোর কতা বেশী শুনবে ?

—তা আমি জানি না। সে কতা আপনি নিজেই জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন তাঁর কাছ থেকে।

—ঐ একটা নচ্ছার মেয়েমানুষ···বিষধর সাপ···এর মধ্যেই আবার খদ্দের জুটিয়েচে···ঐ হারামজাদা জগমোহন সরকার ওর কাছে নিয়মিত যায়, সব খবর আসে আমার কানে···সেই কালনাগিনীকে আমরা একটা বাড়ি ছেড়ে দেবো ? কক্ষনো না। এ মামলা হবেই।

গঙ্গানারায়ণ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। তার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠলো কমলাসুন্দরীর বৈধব্য বেশ, শুদ্ধা সতীর মতন মুখশ্রী। যেন কমলাসুন্দরী নয়, বিন্দুবাসিনীরই ঐ আর এক রূপ। সে আবার বললো, আমি কতা দিইচি, ও বাড়ি ওরই থাকবে।

আর কোনো মন্তব্য না করে গঙ্গানারায়ণ চলে গেল সেখান থেকে। তার বুকের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা, সরাসরি এই প্রথম সে বিধুশেখরের ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করলো। তবে এই তো সবে শুরু। একটা মোহময় সুখও অনুভব করলো সে। যেন সে আজ বিধুশেখরের কাছে বিন্দুবাসিনীর ওপর অত্যাচারেরই শোধ নিল।

বৈঠকখানা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গঙ্গানারায়ণ সহিসদের ডেকে গাড়িতে ঘোড়া যুতবার হুকুম দিল। আজ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে ব্রাহ্ম ভক্তরা মিলিত হবে, গঙ্গানারায়ণের বন্ধু রাজনারায়ণ তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে সেখানে যেতে। ব্রাহ্মদের সঙ্গ গঙ্গানারায়ণের ভালো লাগে। এক

সঙ্গে এত সুন্দর রুচিসম্পন্ন বিদগ্ধ মানুষের সমাবেশ গঙ্গানারায়ণ আর কখনো দেখেনি।

রাজনারায়ণ তাকে অনেকবার বুঝিয়েছে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করবার জন্য। মনের দিক থেকে গঙ্গানারায়ণের কোনো বাধা নেই। সে শান্তি চায়। জ্ঞানমার্গী ধর্ম আলোচনায় ও সমাজ-সংস্কারের চিন্তায় নিযুক্ত রয়েছে ব্রাহ্মরা, তাদের সংসর্গে গঙ্গানারায়ণ বিশেষ উৎসাহবোধ করে। এক একবার তার ইচ্ছে জাগে, সব ছেড়েছুড়ে ঐ কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

কিন্তু গঙ্গানারায়ণের জননী হয়তো গঙ্গানারায়ণের বারনারীগমনও মেনে নিতে পারবেন। গঙ্গানারায়ণের যদি সত্যিই বাসনা হয়, তা হলে সে অনায়াসেই একটি নিজস্ব রক্ষিতার সঙ্গে বিলাসে ডুবে থাকতে পারে, তার জন্য সে খুব সহজেই এস্টেট থেকে টাকা নিতে পারবে। অথচ গঙ্গানারায়ণ যদি ব্রাহ্ম হতে চায় তা হলে হুলুস্থুলু বেধে যাবে, বিম্ববতী হয়তো আত্মহত্যাই করে বসবেন। ব্রাহ্মরা ঠাকুর দেবতা মানে না একথা শুনে একদিন বিম্ববতী বলেছিলেন, কোনো ছেলে যদি অমন অনাছিষ্টি করে তবে তার মুখ দেখার চেয়ে তার বাপ মায়ের মরে যাওয়াই ভালো। গঙ্গানারায়ণ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, বিম্ববতী কানে আঙুল দিয়ে বলেছিলেন, না, বলিসনি, অমন কতা শোনাও পাপ। সেই দৃশ্য গঙ্গানারায়ণের মনে পড়ে। এই মাতৃদায় সে এড়াবে কী করে?

বাবু রামগোপাল ঘোষের গৃহে সন্ধ্যাকালে তাঁর বন্ধুরা এসেছেন। প্রায় প্রতি সায়াহ্নেই দু-একজন বন্ধু রামগোপাল ঘোষকে সান্নিধ্য দিতে আসেন, কিন্তু আজ অনেকদিন বাদে একসঙ্গে অনেক বন্ধুর পুনর্মিলন হলো।

এক সময় এঁরা "ইয়ং বেঙ্গল" নামে চিহ্নিত হয়ে প্রভূত অখ্যাতি ও কিছু খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন, এঁরা ছিলেন রক্ষণশীল সমাজের চক্ষুশূল, আবার কিছু কিছু যুবক এঁদের অনুকরণ করতেও শুরু করেছিল। ডিরোজিও শিষ্য এই "ইয়ং বেঙ্গল" দল প্রথম প্রথম উন্মাদনা বশে নানা রকম উৎকট কাণ্ড করতেন। রাস্তায় কোনো টিকিধারী ব্রাহ্মণ দেখলে তাকে তাড়া করতে করতে বলতেন, "আমরা গোরু খাই গো, গোরু খাই!" সেই যুবকদের ছোঁয়ায় জাত চলে যাবার ভয়ে ব্রাহ্মণরা মুক্তকচ্ছ হয়ে দৌড়োতো। এই যুবকরা কখনো নিজেদের বাড়ির ছাদে উঠে চিৎকার করে প্রতিবাসীদের জানাতো, এই দ্যাখো আমরা মুসলমানের ছোঁয়া জল খাচ্ছি। এই দ্যাখো গো-মাংস! প্রমাণস্বরূপ তারা মাংসের হাড় ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত চতুর্দিকে।

সে সব অনেকদিন আগেকার কথা। "ইয়ং বেঙ্গল" দলের কেউই আর এখন যুবক নন, তাঁরা এখন মধ্যবয়স্ক, সুস্থির দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক। সকলেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, কেউ কেউ সরকারী উচ্চকর্মে নিযুক্ত, কেউ বা ব্যবসায়ে ভাগ্য ফিরিয়েছেন। তবে প্রথম যৌবনের সেই বিদ্রোহের অগ্নি এখনো একেবারে নির্বাপিত হয়নি, তা যেন এখন অনেকটা প্রদীপের স্নিগ্ধ শিখা হয়ে এঁদের বক্ষে দেদীপ্যমান। প্রতিটি সামাজিক আন্দোলনেই এখনো এঁদের অনেককে এগিয়ে আসতে দেখা যায়।

এই গোষ্ঠীর মধ্যে বাবু রামগোপাল ঘোষ যেন মুকুটহীন রাজা হিসেবে স্বীকৃত। ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে তাঁকে প্রধান পুরুষ হিসেবে গণ্য করে লোকে মুখে মুখে তাঁর নাম দিয়েছে এজু-রাজ। সাহেবদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইংরেজি বক্তৃতার সময় তাঁর মুখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলঝুরি ছোটে। ইংরেজরাও তাঁর সম্পর্কে বলে, এক নতুন ডেমস্থেনিস।

রামগোপাল ঘোষ অতিশয় বন্ধুবৎসল মানুষ। এক সময় তিনি ছিলেন দরিদ্রের সন্তান, এখন বেসরকারী ইংরাজদের সঙ্গে যুগ্মভাবে বাণিজ্য করে তিনি প্রভূত ঐশ্বর্যশালী হয়েছেন কিন্তু বন্ধুদের আপদে কিংবা মনস্তুষ্টির জন্য তিনি অর্থব্যয় করতে কার্পণ্য করেন না। তাঁর বাড়ির সান্ধ্য আসরে শেরি ও শ্যামপেন থাকে অপর্যাপ্ত, কিন্তু এখানে কেউ নেশাগ্রস্ত হয়ে কুৎসিত আচরণ করে না, প্রত্যেকের নিজস্ব পরিমাপ আছে। সুরাপান এই আসরের মুখ্য ব্যাপার নয়, পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে আত্মোন্নতি ও জ্ঞান উপার্জনই এঁদের লক্ষ্য।

কার্য উপলক্ষে বন্ধুরা অনেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছেন, নিয়মিত দেখা হবার আর উপায় নেই, আজ অনেকদিন পর কয়েকজন প্রবাসী বন্ধুকে পাওয়া গেছে। রসিককৃষ্ণ মল্লিক এখন বর্ধমানের ডেপুটি কালেক্টর, রামতনু লাহিড়ী কৃষ্ণনগর কলেজের শিক্ষক। সবচেয়ে বেশী দূরে থাকেন রাধানাথ সিকদার, তিনি দেরাদুনে সরকারের জরিপ বিভাগে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। পিতার গুরুতর ব্যাধির খবর পেয়ে রাধানাথ চলে এসেছিলেন কলকাতায়। তাঁর পিতা এখন একটু সুস্থ তাই তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ সুহৃদ প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে এসেছেন রামগোপাল ঘোষের বাড়ির সান্ধ্য আসরে।

বহুদিন পর বন্ধুদের কাছে এসে রাধানাথ খুশী হয়েছেন যতখানি, বিস্মিত হয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী। এতখানি পরিবর্তন তিনি কল্পনাই করতে পারেননি। তিনি সবচেয়ে বেশী অবাক হয়েছেন এঁদের মুখের ভাষা শুনে। তাঁদের ছাত্রবয়েসে তাঁরা নিজেদের মধ্যে সব সময় ইংরাজিতে কথা বলতেন। বাংলা ভাষার কোনো স্থানই ছিল না প্রায়। নেহাৎ বাড়িতে বাবা মায়ের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে হতো, কিন্তু জ্ঞান, চিত্তশুদ্ধি বা রসাস্বাদনের জন্য বাংলা ছিল অপাংক্তেয়। প্রবাসে থাকার সময় রাধানাথ বাংলা ভাষাকে জীবন থেকে বাদই দিয়ে ফেলেছিলেন, এবার বাড়িতে এসে বাবার সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর মুখ দিয়ে ভাঙা হিন্দী ও ইংরেজি বেরিয়ে আসছে বারবার। চেষ্টা করে বাংলা বলতে গেলেও সব কথা মনে আসে না। প্যারীচাঁদ এই নিয়ে তাঁকে ঠাট্টা করছিলেন! প্যারী, রামগোপাল, রসিক এঁরা ইংরেজিতে বিখ্যাত কৃতবিদ্য, অথচ আজ তাঁদের মুখেই বাংলা ভাষা? হঠাৎ এ দেশটার হলো কী, আবার কী লোকে ইংরাজি ভুলে গিয়ে অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে যাবে?

একটি গোল টেবল ঘিরে বসেছে বন্ধুরা। প্রত্যেকের কেদারার পাশে রয়েছে ধূমায়িত আলবোলা। ভৃত্যেরা টেবিলের ওপর সাজিয়ে দিয়ে গেছে গেলাস ও বিভিন্ন প্রকার সুরার বোতল, যার যেমন রুচি, সে নিজে ঢেলে নেবে। শুধু রামগোপালের সামনে একটি বিচিত্র আকৃতির পোর্সিলিনের পাত্র। পাত্রটি গোল, তার একদিক দিয়ে হাতির শুঁড়ের মতন একটি ছোট্ট নল বেরিয়ে আছে। সেখান থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সকলেই কৌতূহলী হয়ে সেদিকে তাকিয়ে।

রামগোপাল মৃদু হেসে বললেন, ইউ পোর ইয়োর ড্রিঙ্কস, মাই ডিয়ার ফেলোজ, আমি আগে একটু উষ্ণ পানীয় পান করবো। ইদানীং এইটি পান করা আমার অভ্যাস হয়ে গেচে।

একটি হাতলযুক্ত গোল পোর্সিলিনের বাটিতে রামগোপাল খানিকটা কালো রঙের উষ্ণ তরল পদার্থ ঢাললেন, তারপর তার সঙ্গে তিন চামচ দুধ ও তিন চামচ চিনি মিশিয়ে গুলতে লাগলেন। মিশ্রণ কার্যটি সমাপ্ত হলে রামগোপাল বাটিটি সাবধানে ওষ্ঠের কাছে এনে সুরুৎ করে ছোট্ট একটি চুমুক দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, আহ!

রাধানাথ সিকদার আর কৌতূহল চাপতে না পেরে বলে উঠলেন, হোয়াট ইজ দ্যাট স্ট্রেঞ্জ কনককশান?

রামগোপাল পরিহাসের সঙ্গে বললেন, দিস ইজ মাই ফেভারিট পয়জন। একটু স্বাদ নিয়ে দেখবে নাকি?

রসিককৃষ্ণ বললেন, দিস ইজ টি। রাধানাথ, তুমি চায়ের কথা শোনো নাই? আগে চীন দেশ থেকে এ বস্তু আসতো, এখন আমাদের আসামেই যথেষ্ট হচ্চে!

রাধানাথ অনেকদিন দেশ ছাড়া বলে চা কথাটা জানেন না, তবে টি-এর কথা কাগজে-পত্রে পড়েছেন, কোনোদিন চর্মচক্ষে দেখেননি। তাঁদের দেরাদুনে নানা রকম মদ্যের ছড়াছড়ি, সেখানে উষ্ণ পানীয় বলতে চলে শুধু ভেড়ার দুধ।

প্যারীচাঁদ মদ্যপান করেন না, তাঁর আসক্তি ধূমপানের দিকে। তিনি বললেন, আমি একটু চেখে দেখতে রাজি আছি। ইংরেজ মহলে আজকাল চা পান খুব চলচে শুনিচি।

রামতনু বললেন, আমি হেয়ার সাহেবকেও ঐ জিনিস পান করতে দেকতুম। তবে ওতে মাদকদ্রব্য বোধহয় কিছু নেই। কারণ, হেয়ার সাহেব নেশা ভাঙ করার বিরোধী ছিলেন।

শিবচন্দ্র বললেন, নেশা না হলে আর ও জিনিস পান করা কেন?

রামগোপাল দ্বিতীয় একটি বাটিতে প্যারীচাঁদের জন্য চা ঢালতে ঢালতে বললেন, নেশা হয় বৈকি। এর এক চুমুকেই পঞ্চেন্দ্রিয়ে একটা অ্যালার্টনেস এসে যায়। লাইক কিসিং এ ড্যামজেল…অ্যাণ্ড ইউ

ওয়ান্ট টু কিস এগেইন···এই নাও প্যারী, আজ আমি তোমায় এই নতুন সুধারসে দীক্ষা দিলুম।

প্যারীচাঁদ প্রথমে খানিকটা ইতস্তত করলেন। বাটিটি হাতে নিয়ে তাকালেন একবার বন্ধুদের দিকে। ঠোঁট পুড়ে যাবার ভয়ে ফুঁ দিলেন কয়েকবার। তারপর কোনোক্রমে একটি চুমুক দিয়েই মুখ বিকৃত করে ফেললেন। পানীয়টি তাঁর পছন্দ হয়নি। রামগোপাল কোন সুখে এ জিনিস খাচ্ছেন? রামগোপাল তাঁর সঙ্গে কৌতুক করার জন্য সত্যিই বিষাক্ত কিছু দেননি তো? রামগোপালের কথাই আলাদা, তিনি বেপরোয়া ধরনের মানুষ, কোনো কিছুতেই ভয় পান না। প্রায়ই তিনি কথায় কথায় বলেন, আই বেয়ার এ চার্মড্ লাইফ।

রামগোপাল জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্রাদার, কেমন লাগলো?

প্যারীচাঁদ বললেন, একটু তিক্ত, একটু কষায়।

বন্ধুরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

রামগোপাল প্যারীচাঁদের বাটিতে আরও খানিকটা চিনি মিশিয়ে দিয়ে বললেন, এবার দ্যাখো তো:

প্যারীচাঁদ সভয়ে আবার চুমুক দিলেন। এবার তাঁর মুখ হাসিতে ভরে গেল, তিনি বললেন, বাঃ, দিব্য অপূর্ব, স্বাদটা যেন একেবারে বদলে গেল!

রামগোপাল জিজ্ঞেস করলেন, কেমন, শরীরে বেশ একটা চনমনে ভাব হয়নি?

প্যারীচাঁদ বললেন, বিলক্ষণ!

রামগোপাল আবার জিজ্ঞেস করলেন, মনে হয় না আবার চুম্বন করি, আবার, আবার?

প্যারীচাঁদ বললেন, নিশ্চয়! ভাই আমি বলি কি, এবার থেকে আমরা এই বস্তুই পান করবো। শুধু শুধু সুরা পান করে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করা কেন? সর্বনাশিনী সুরা যে এ দেশটাকে ছারখার করে দিচ্চে।

বন্ধুদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এতক্ষণ নীরব ছিলেন। সম্প্রতি বর্ধমান রাজ পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, আইন বিষয়ক পরামর্শের উপলক্ষে সেখানকার বিধবা রাণী তাঁকে ঘন ঘন ডাক পাঠাচ্ছেন। মাঝে মাঝে সেই অপরূপ সুন্দরী রাণী এমন বিহ্বলভাবে চেয়ে থাকেন তাঁর দিকে যাতে মনে হয় শুষ্ক আইনের চেয়েও আইন উপদেষ্টা মানুষটির প্রতিই তাঁর আকর্ষণ বেশী। সেই অপ্সরাতুল্য রমণীর দিকে দৃষ্টিপাত করে দক্ষিণারঞ্জনেরও মস্তক ঘূর্ণিত হয়। দূরে থাকলেও সর্বক্ষণ মনে পড়ে সেই মুখ। একথা আর কারুকে বলা যায় না।

দক্ষিণারঞ্জন ফটাস শব্দে শ্যাম্পেনের কর্ক খুলে নিজ পাত্রে খানিকটা ঢেলে বললেন, তোমরা চা পান করতে চাও করো, আমি এ জিনিসে মজেচি, আমি ছাড়চি না। সুরা পানে সর্বনাশ হয় মূর্খদের। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সুরা পান করলে তাদের চিন্তাশক্তির আরও বিকাশ হয়।

রাধানাথ বললেন, আই এগ্রি উইথ ইউ, দক্ষিণা! এই ফিলদি লুকিং লিকুইড নিয়ে তুমলোগ কিঁউ ইতনা শোর মচাতা, দ্যাট আই ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড!

শিবচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, শোর মচাতা? তার মানে কী ভাই?

প্যারীচাঁদ বললেন, আমাদের রাধানাথ বাংলা একেবারে ভুলে গ্যাচে। বাবাকে বলে পিতাজী আর জলকে বলে পানি।

রাধানাথ রাগতভাবে বললেন, অ্যাণ্ড ইউ···তোমরা···তোমরা, তোমরা যে অচানক বাংলা-লাভার হয়ে যাবে, হাউ কুড আই নো দ্যাট? ইন আওয়ার কলেজ ডেইজ ইউ অল ইউজড টু হেট দিস ল্যাঙ্গোয়েজ।

প্যারীচাঁদ বললেন, ভাই, তারপর···এই সময়ের মধ্যে যে বাংলা ভাষা অনেক বদলে গ্যাচে···আমরা তখন ভাবতুম বাংলা ভাষায় কোনো মহৎ ভাব প্রকাশ করা যায় না···কিন্তু এখন এই ভাষায় এমন অনেক ভালো ভালো লেখক এয়েচেন।

রামগোপাল বললেন, তুমি তত্ত্ববোধিনী কাগচ দেখোচো? আমি আগে কক্ষণো বাংলা পড়তুম না, আমার ঘৃণা হতো, কিন্তু একদিন একখানা তত্ত্ববোধিনী কাগচ আসবার পর আমি চমকিত হয়ে গেচি। তুমি দেখবে, দেখবে সেই কাগচ?

রসিককৃষ্ণ বললেন, দেবেন্দ্র ঠাকুর, অক্ষয় দত্ত এঁরা উচ্চ চিন্তার কথা লিকচেন বাংলা ভাষায় সে প্রোজ কার্লাইল বা মিলের চেয়ে কোনো অংশে হীন নয়।

প্যারীচাঁদ বললেন, কেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে এক বামুন পণ্ডিত একখানা বই লিকেচেন, সে তো রীতিমতন সাহিত্য হে। রামগোপাল তোমার কাচে নেই সে বইখানা? একবার রাধানাথকে দেখাও না।

রামগোপাল তখুনি উঠে গিয়ে নিয়ে এলেন সেই বই। "বেতাল পঞ্চ বিংশতি", ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। বইখানা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলেন রাধানাথ ও অন্যান্য বন্ধুরা। প্যারীচাঁদ বললেন, আমি এখানা থেকে একটু পড়ে শোনাবো ? শুনবে ?

প্যারীচাঁদ পড়তে লাগলেন, "ধর্মপুরে গোবিন্দ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহার দুই পুত্র তন্মধ্যে একজন ভোজন বিলাসী অর্থাৎ অন্নে ও ব্যঞ্জনে যদি কোনও দোষ থাকিত তাহা দুর্জ্ঞেয় হইলেও ঐ অন্নের ও ঐ ব্যঞ্জনের ভক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি হইত না দ্বিতীয় শয্যা বিলাসী অর্থাৎ শয্যায় কোনও দুর্লক্ষ্য বিঘ্ন ঘটিলেও সে তাহাতে শয়ন করিতে পারিত না এই এক এক বিষয়ে তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল ঈদৃশ বিস্ময়জনক ক্ষমতার বিষয় তত্রত্য নরপতির কর্ণগোচর হইলে তিনি তাহাদের ঐ ক্ষমতার পরীক্ষার্থে সাতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন এবং উভয়কে রাজধানীতে আনাইয়া জিজ্ঞাসিলেন তোমরা কে কোন বিষয়ে বিলাসী..."

পড়া থামিয়ে প্যারীচাঁদ জিজ্ঞেস করলেন, কেমন, এমন সুললিত অথচ সুগম্ভীর বাংলা ভাষা তোমরা আগে শুনোচো কি ? এই ভাষা কি অবজ্ঞার বস্তু ?

একমাত্র রাধানাথ ব্যতীত আর সকলেই উচ্চ প্রশংসা করলেন। দক্ষিণারঞ্জন বললেন, রচনাটি তো সুন্দর বটে কিন্তু এমন বই কিনবে কে ? বাংলা ভাষার গ্রন্থ ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা কিনতে চাইবে কি ?

প্যারীচাঁদ বললেন, আমি শুনিচি, বইটি প্রকাশ হওয়া মাত্র বেশ একটি শোরগোল পড়ে গ্যাচে। মার্সাল সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের জন্য এই বই একশো কাপি কিনে নিয়েচেন, পাঠকরাও এ বই কেনার জন্য হুড়োহুড়ি কচ্চে। লোকের মুখে মুখে রটে গ্যাচে যে এখানিই বাংলায় প্রথম সাহিত্য পদবাচ্য গ্রন্থ। এর লেখক ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কেও লোকের দারুণ কৌতূহল।

রাধানাথ বেশ বিমূঢ় বোধ করলেন। দেবেন্দ্র ঠাকুর, অক্ষয় দত্ত. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—এইসব ব্যক্তিদের তিনি নামও শোনেননি আগে। তবু দেবেন্দ্র ঠাকুর না হয় বোঝা গেল বিখ্যাত দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ সন্তান, কিন্তু অক্ষয় দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—এই সব অজ্ঞাতকুলশীলরা কারা ?

রাধানাথ প্যারীচাঁদকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি এঁদের চেনেন কি না।

প্যারীচাঁদ কলকাতার পাবলিক লাইব্রেরির ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান, নবীন লেখকদের সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ থাকবেই। তিনি বললেন, এই ঈশ্বরচন্দ্র কিছুদিন সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি ছিলেন, সেই সময় ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। রাগ করে এখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে বই লিকচেন। আমি কিন্তু ওঁকে দেখেই বুঝিছিলুম, ঐ মানুষটির ভেতরে আগুন আচে। দেবেন্দ্র, অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র এঁরা সবাই আমাদিগের চেয়ে বয়েসে ছোট, তবু আমি বলবো, এঁরা দেশের জন্য বড় কাজ কচ্চেন।

রামগোপাল বললেন, সে-কথা ঠিক। দেবেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে দেশের মহদুপকার কচ্চেন। ইয়াং ম্যানরা যে দলে দলে ক্রিশ্চান হচ্ছিল, তা অনেকটা বন্ধ হয়েচে।

রাধানাথ জিজ্ঞেস করলো, এই ব্রাহ্মধর্ম ব্যাপারটা...ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন টু মী থরোলি ? খুব শুনচি।

প্যারীচাঁদ বললেন, সে আমি তোমায় পরে বুঝিয়ে বলবো। এঁরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্মের ওপর একটা আঘাত হেনেচেন।

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, সে আঘাত আমরাই কি আগে হানিনি ? সব কৃতিত্ব এঁদের দিচ্চো কেন ? হিন্দু গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আমাদের রসিককৃষ্ণের চেয়ে বড় কথা এ পর্যন্ত কে বলেচে ?

ছাত্রাবস্থায় রসিককৃষ্ণ মল্লিক একটি কাণ্ড বাধিয়ে কলকাতা শহরে তথা হিন্দু সমাজে দারুণ আলোড়ন তুলেছিলেন। কোনো এক মামলায় সুপ্রিম কোর্টে তাঁকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়েছিল। প্রত্যেক সাক্ষীকে আগে শপথ গ্রহণ করতে হয়, একজন ওড়িশা দেশীয় ব্রাহ্মণ একখানি তাম্রকুণ্ডে তুলসী ও গঙ্গাজল নিয়ে সাক্ষীর সামনে এনে ধরে, সাক্ষী সেটা স্পর্শ করে বলে আমি সত্য বই মিথ্যা বলিব না। রসিককৃষ্ণের সামনে সে রকম তাম্রকুণ্ড এনে ধরা হলে তিনি সেটি স্পর্শ না করে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। বিচারপতি যখন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি শপথ লইতেছেন না কেন ? তখন

রসিককৃষ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, আমি গঙ্গা জলের পবিত্রতা মানি না। ইন্টারপ্রেটার অমনি চেঁচিয়ে অনুবাদ করে জানালো, সাক্ষী বলছে, "আই ডু নট বিলিভ ইন দি সেক্রেডনেস অব দি গ্যাঞ্জেস।" অমনি আদালতে উপস্থিত হিন্দুরা কানে আঙুল দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। হুলস্থুল পড়ে গেল শহরে, অনেকেই মনে করলো, এই বুঝি ঘোর কলি উপস্থিত, হিন্দুর ছেলে প্রকাশ্যে বলছে গঙ্গা মানে না! তাই নিয়ে সংবাদপত্রে কত লেখালেখি।

দক্ষিণারঞ্জনের কথা শুনে রসিককৃষ্ণ বিনীত লাজুকভাবে বললেন, সে পুরোনো কথা ছাড়ো। আমরা তো সংঘবদ্ধভাবে হিন্দু ধর্মের সংস্কারের জন্য কিছু করিনি, এনারা কচ্চেন।

অতি স্বল্পভাষী রামতনু লাহিড়ী এবার বললেন, তা ঠিক বটে, কিন্তু ব্রাহ্মদের একটা জিনিস আমার পছন্দ হচ্চে না। এঁরা খৃষ্টানদের খুব গালাগাল কচ্চেন। সেটি উচিত হয় না। আমরা সত্যের উপাসক। যে-ধর্মের মধ্যে যে-টুকু সত্য রয়েচে, তা গ্রহণ করাই ধর্মসম্মত। সত্যের অনুসন্ধানের জন্য সবার মন মুক্ত থাকা দরকার।

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, খৃষ্টানরাও আমাদের কম গাল দেয় না। ওদের মতে তো হিন্দুধর্ম ধর্মই নয়।

প্যারীচাঁদ বললেন, খৃষ্টানদের মধ্যেও কুসংস্কারগ্রস্ত অনেকে রয়েচে। তাদের জবাব দিতে গিয়ে আমরাই বা কেন কুসংস্কারের আশ্রয় লবো?

রামগোপাল বললেন, ব্রাহ্মদের অনেক কিছুই ঠিক, কিন্তু ওনারাও তো জাতির পাঁতি ছাড়েননি। সবাই এক ধর্মের উপাসক, অথচ কেউ পৈতেধারী, কেউ বেদ পাঠে অনধিকারী, এ আবার কেমন কথা?

রামতনু বললেন, ওনারা তত্ত্ববোধিনী কাগচে লিকচেন যে বেদ অভ্রান্ত ঈশ্বর বাণী, অথচ অনেকেই তা মনে মনে বিশ্বাস করেন না। এ তো কপটতা। এই জন্য আমি আর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক রবো না ঠিক করিচি।

রামগোপাল বললেন, তনু, তনু, তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন? তত্ত্ববোধিনীতে পাঠ্য বিষয় আরও অনেক কিছু থাকে।

রসিককৃষ্ণ বলেন, এসব আলোচনা থাক। এবার ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিসভায় কে কে বক্তৃতা দেবেন, তা ঠিক করে ফেলো। ১লা জুন তো এসে গেল। রাধানাথ, তুমি যখন এখানে আচো, তুমিই এবার কিছু বলো না!

রাধানাথ বললেন, স্পীচ কি বাংলায় ডেলিভার কত্তে হবে নাকি?

প্যারীচাঁদ হেসে বললেন, না, না, তুমি ইংরেজিতেই বলো। কিন্তু বাংলাটা এবার শিখে নাও। ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরা এখন আর বাংলাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে না। এ দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্য বাংলা ভাষাকেই অবলম্বন কত্তে হবে। বিশেষত যদি স্ত্রীলোকদের শিক্ষা দিতে হয়।

রাধানাথ চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি ফিমেল এডুকেশ্যানের কথা থিংক কচ্চো? এ দেশে তা পসিবল্?

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, কেন সম্ভব নয়? নারীদের আমরা কতকাল অন্ধকারে রাখবো?

এমন সময় গৃহের বাইরে পথে একটা বিষম হট্টগোল শোনা গেল। নানান কণ্ঠের উত্তেজিত আওয়াজ ছাড়িয়েও শোনা যাচ্ছে কয়েকটি কণ্ঠের কান্না। কৌতূহলী হয়ে সকলে এসে দাঁড়ালেন দ্বিতলের নিকটস্থ অলিন্দে।

ব্যাপারটা অবশ্য এমন কিছু অভিনব নয়। একটি মৃতদেহকে বহন করে নিয়ে চলেছে শ্মশানযাত্রীরা। সঙ্গে অনেক লোকজন। গ্রীষ্মের এই মাঝামাঝি সময়ে শহরে মৃত্যুর সংখ্যা খুবই বেড়ে যায়, ওলাউঠোর প্রকোপ এই সময়ই বেশী হয়। দিনরাতই পথে শোনা যায় হরিধ্বনি, তবে সন্ধ্যার পর শ্মশানযাত্রীদের কণ্ঠে এই হরিধ্বনি পরিণত হয় গর্জনে। মাতাল ও গেঁজেলরা নেশার দ্রব্য সংগ্রহের আশায় এ-গলি ও-গলিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ গা, আজ কেউ মলো? আজ কেউ মলো? আমরা শ্মশানবন্ধুরা যে বৃথা বয়ে যাচ্চি গো।

মৃতদেহের পিছনে পিছনে একটি দশ-এগারো বছরের বালিকা এক একবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, কিছু লোকজন তাকে ধরে তোলবার চেষ্টা করতেই সে মৃগীরোগীর মতন ছটফটিয়ে আবার ছিটকে পড়ছে মাটিতে। বালিকাটির মুখখানি সিঁদুরে মাখামাখি। খোলা চুল ধুলোয় ধূসর। মেয়েটি আর

একবার মাটিতে গড়াতেই দুজন বলশালী লোক তাকে দুদিক থেকে শূন্যে তুলে বহন করে নিয়ে চললো।

রামগোপাল এবং তাঁর বন্ধুদের ধারণা হলো যে ঐ লোকগুলি ঐ বালিকাটিকে বলপ্রয়োগ করে নিয়ে যাচ্ছে। শ্মশানের স্ত্রীলোকদের নিয়ে যাবার প্রথা তো ইদানীং আর নেই। অন্য কোনো আশঙ্কার কথা মনে পড়ে।

ওঁরা সকলে তরতর করে নীচে নেমে এলেন। বালিকাটিকে যদি জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়, তা হলে ওঁরা প্রতিরোধ করবেন। আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও এখনো গ্রাম থেকে মাঝে মাঝেই সতীদাহের কথা কানে আসে। কলকাতাতেও সেরকম ঘটনা বিচিত্র কিছু নয়।

রামগোপাল সেই বালিকা-বহনকারী দুই ব্যক্তির মধ্যে একজনের গতি রোধ করে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, একে আপনারা কোথায় নিয়ে যাচ্চেন?

সেই ব্যক্তি রুক্ষ স্বরে বললো, জাহান্নামে।

তখন রামগোপালের সব বন্ধুরাও তাকে ঘিরে দাঁড়ালেন এবং ক্রুদ্ধ রাধানাথ লোকটিকে মারবার জন্য উদ্যত হলেন। তখন লোকটি বললো মশায়, করেন কী, করেন কী? এ মেয়েটি পাগল হয়ে গ্যাচে।

রামগোপাল বললেন, তোমরা আগে ওকে ছেড়ে দাও, তারপর আমি দেকচি ও কেমন পাগল।

প্যারীচাঁদ বললেন, এখুনি কোতোয়ালিতে সংবাদ দেবো!

দ্বিতীয় লোকটি বললো, আরে খেলে যা! আপনারা কী ভাবচেন আমরা ওকে জোর করে নিয়ে যাচ্চি? এ পাগলি কিছুতেই বাড়িতে রইবে না। আমরা কতবার ঠেলে ঠেলে দিয়ে এলুম—ওর স্বোয়ামী মারা গ্যাচে. বাড়িতে আর মেয়েমানুষ কেউ নেই, আমরা ওকে কী করে আটকাই বলুন!

রামগোপাল বালিকাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন শ্মশানে যাচ্চো?

বালিকাটির চোখ সত্যিই উন্মাদের মতন। সে তীব্রস্বরে বললো, মর্তে যাচ্চি! মর্তে! তুমি কে গা!

রামগোপাল বললেন, তুমি কেন মরবে?

মেয়েটি বললো, বেশ করবো!

শ্মশানযাত্রীর দল থেমে গেছে, আরও কিছু পথ চলতি উটকো লোক ভিড় জমিয়েছে সেখানে। আর মেয়েটি ক্ষ্যাপাটে গলায় চিৎকার করছে, আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও, আমি মর্বো! মর্বো!

প্যারীচাঁদ বললেন, কোতোয়ালিতে খবর দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমি যাচ্চি।

শ্মশানযাত্রীরা ভয় পেয়ে গেছে। তারা বললো, ও মশাই, আমাদের কী দোষ দেকলেন! এ মেয়ে যে নিজেই যেতে চায়। এক কাজ করুন না, আপনারা ভদ্দরলোক, এ মেয়েটিকে আপনাদেরই বাড়িতে আটকে রাখুন না হয়।

রামগোপাল বললেন, সেই ভালো। এই মেয়েটিকে আমার বাড়ির মধ্যে আনো, স্ত্রীলোকদের কাছে ওকে পাঠিয়ে দিচ্চি।

মেয়েটি কিছুতেই আসবে না সুতরাং জোর করেই তাকে আনতে হলো ভেতরে। সে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলো, ওগো আমার কেউ নেই, আমায় মর্তে দাও, আমায় শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে, ওগো, আমায় ছেড়ে দাও।

অন্দরমহলে রেখে আসা হলো মেয়েটিকে। শ্মশানযাত্রীরা আবার নতুন উৎসাহে হরিধ্বনি তুলতে তুলতে চলে গেল।

রামগোপাল এবং তাঁর বন্ধুরা কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে দ্বিতলে উঠে এসে বসলেন টেবিলে। প্যারীচাঁদ ব্যতীত প্রত্যেকেই নিজের নিজের পাত্রে ঢেলে নিলেন সুরা।

প্যারীচাঁদ বললেন, রামমোহনের আনুকূল্যে সতীদাহ রদ হয়েচে বটে কিন্তু তার সুফল পাওয়া গেল কতটুকু? এই সব বালবিধবাদের ভবিষ্যৎ কী? নয় দশ বছরের বালিকারা বিধবা হয়ে সারা জীবন গলগ্রহ হয়ে থাকবে...সেইজন্যই বলচিলুম এদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করলে...

রামগোপাল মুখ তুলে গম্ভীরভাবে বললেন, শুধু শিক্ষার ব্যবস্থা করলেই হবে না, এই সব বিধবাদের বিবাহেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, ঠিক কথা।

শিবচরণ বললেন, তা হলে কি এই সব বিধবাদের ক্রিশ্চিয়ান হতে বলছো?

রসিককৃষ্ণ বললেন, ক্রিশ্চিয়ান হোক, মুসলমান হোক, এদের যে-কোনো প্রকারে বিবাহের ব্যবস্থা করা দরকার।

রামগোপাল বললেন, না, তা কেন?

শিবচরণ বললেন, হিন্দু বিধবাদের বিবাহ? সে যে অসম্ভব কথা। ব্রাহ্মরাও এমন সাহস করেছেন বলে তো শুনিনি। এমন কথা সমাজে কে উত্থাপন করবে? আমরা এ বিষয়ে অগ্রসর হতে পেরেচি কতটুকু?

রামগোপাল বললেন, তা জানি না। তোমরা আজ স্বচক্ষে দেখলে তো এই মেয়েটির অবস্থা। এই সব দুঃখিনী মেয়েদের দুঃখ দূর করার জন্য কেউ যদি এঁদের বিবাহ আইন-সিদ্ধ করতে পারে, তবে আমি সর্বতোভাবে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবো।

রাধানাথ ইংরেজিতে বললো, তোমরা এসব কী বলিতেছ হে! তা হলে তো আমাকেও শীঘ্রই কলকাতায় বদলি হইয়া আসিতে হয়।

হীরেমণির বাড়িতে এসে জগমোহন সরকার কেঁদে একেবারে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছেন। নেশাটি বেশ জমেছে, রাত্রিও গভীর, এই সময় জগমোহনের হঠাৎ দেশের মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা মনে পড়ে যায়, হৃদয়টা উথালি পাথালি করে। বিশেষত অবলা জাতির অসহায় অবস্থা দূর করার জন্য আজও কিছু করা গেল না! অবলারা এখনো অবোলাই রয়ে গেল! জগমোহন সরকার ফিমেল উদ্ধারের জন্য সেই কবে থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কিন্তু কেউ তাঁকে মদৎ দিল না। হেয়ার সাহেব মারা যাবার পর সব ধামা চাপা পড়ে গেছে আবার। জগমোহন সরকার মেয়েদের ইস্কুল খোলবার জন্য নিজে জায়গা দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু ছাত্রী পাওয়া যাবে কোথা থেকে? পাড়াপড়শীরা কেউ রাজি নয়। সবাই ওকথা শুনে হেসে উড়িয়ে দেয়, কেউ কেউ আবার দাঁত কিড়মিড় করে।

জগমোহন সরকার শুনেছেন যে বারাসতে নাকি মেয়েদের জন্য স্কুল খোলা হয়েছে একটি। উত্তরপাড়ার রাজা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও স্ত্রীশিক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন, অথচ এত বড় শহর কলকাতা, সেখানে ভদ্র হিন্দু পরিবারের মেয়েদের পড়াশুনোর কোনো ব্যবস্থা এখনো হলো না! সাহেব মেমরা এর আগে যে-কয়েকটা স্কুল খুলেছে, সে সব জায়গাতেই শুধু কচি কচি মেয়েদের ভুলিয়ে ভালিয়ে খৃষ্টান করে নেওয়া হয়েছে। যীশু-ভজনা না করলে নাকি লেখাপড়া হয় না। কলকাতায় প্রথম অ-খৃষ্টানী বিদ্যালয় স্থাপনের কৃতিত্ব জগমোহন নিতে চান।

জগমোহন সরকার বারাঙ্গনা গৃহে কখনো ইয়ার-বক্সিদের নিয়ে আসেন না। এসব জায়গায় তিনি গোপনে একা আসাই পছন্দ করেন। তাঁর ধারণা, তাঁর নিজস্ব কোচম্যান এবং এক অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য ছাড়া তাঁর এই অভিযানের কথা আর কেউ জানে না।

জগমোহন বললেন, বুজলি হীরে, এতখানি জম্মো আমার ব্রেথাই গেল, কিচুই করতে পারলুম নিকো····ওফ্····ওফ্।

লাল মখমলে মোড়া জাজিমের ওপর হীরেমণি বসে আছে জগমোহনের মুখোমুখি। জগমোহনের এমন স্বভাবের কথা সে ভালোভাবেই জানে। এই বিশালবপু বাবুটির দুটি বিচিত্র অভ্যেস আছে। প্রথমে ঘরে ঢুকেই তিনি বেশ জোরে একটি উদ্গার তুলবেন। এইটিই যেন তাঁর তৃপ্তির লক্ষণ। তারপর সুরা পান শুরু করার পরও এইরকম উদ্গার চলতেই থাকবে। সুরাপানের সময় এমন অ্যাও অ্যাও শব্দে ঢেঁকুর তুলতে আর কারুকে দেখেনি হীরেমণি। আর শেষের দিকে এই কান্না। জগমোহন সরকারের কান্না শুনলেই হীরেমণি বুঝতে পারে যে আর আধঘণ্টার বেশী ওঁর চৈতন্য থাকবে না।

হীরেমণি ছোট্ট একটি হাই গোপন করে বললো, আপনি অ্যাত কিছু করেচেন, অ্যাত বাড়ি, গাড়ি, বিষয় সম্পত্তি—

জগমোহন হীরেমণির হাত চেপে ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে বললেন, ওরে তাতে কী হয়, তাতে কী হয়···এই তো গ্যালো মাসেই আর একটা বাড়ি কিনলুম, কিন্তু বিষয় সম্পত্তি সবই তো মায়া প্রপঞ্চ···কিচুই সঙ্গে যাবে না।

হীরেমণি বললো, আপনি দানধ্যানও কম করেননি—

জগমোহন হীরেমণিকে আরও কাছে টেনে এনে বললেন, কার্পণ্য করিনি, যে যা চেয়েচে দিয়িচি···তোকে দিইনি, বল ? দিইনি ?

—তা দিয়েচেন বইকি ! সে কতা স্বীকার না করলে আমার পাপ হবে।

—গ্যালো হপ্তাতেই তোকে এক জোড়া কঙ্কণ দিলুম, আমাদের বাড়ির সুরো দাসীকে একটা আংটি দিয়িচি, কমলাকে দিয়িচি একছড়া চন্দ্রহার—

—এখন বুঝি কমলার ওপর খুব মন মজেচে ?

—ওরে সে মাগী বড় দেমাকী। বড় দেমাকী ! তোকে কী বলবো ! রামকমল সিংগী মরে ভূত হয়ে গেল কবে, আর এখনও সে মাগী বেধবা সেজে ঢং করে আচে। নাক নেই তার নথ, বেশ্যা আবার বেধবা ! হুঁ !

কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে হীরেমণি নিজেকে জগমোহনের আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বললো, কমলার ওপরেই যখন এত টান, তবে আর আমার কাচে আসা কেন ?

জগমোহন তাকে নিবিড় করে টেনে এনে বললেন, ওরে কমলি আলায়দা আর তুই আলায়দা। তোর মতন গান কমলি গাইতে পারবে ? কমলির গায়ের রং কালো আর তোর যেন দুধে আলতা। আমি তো পেয়ার করি তোকেই। তবু কমলিকে কেন চাই জানিস ? সে ছেল রামকমল সিংগীর মতন একজন বড়মানুষের বাঁধা মেয়েমানুষ, রামকমল সিংগী মারা গ্যাচে, এখন তার মেয়েমানুষকে কে নেবে এই নিয়ে যে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গ্যাচে শহরে। বুজলি নে, রামকমল সিংগীর মেয়েমানুষকে যে নিতে পারবে তার কতটা মান বাড়বে ? আমি ওর বাড়িতে প্রথমে একছড়া চন্দ্রহার পাটালুম, তা বেশ নিয়ে নিলে। ওমা, তারপর আর আসেই না, আসেই না। দুটো অন্য মাগীকে জুতে দিলে আমার সঙ্গে। সে দুটো যেন আশশ্যাওড়া গাচের পেত্নী ! আমি বললুম, কমলাকে ডাকো, তার সঙ্গে দুটো কতা কইবো, তা সে পেত্নীরা বলে কিনা উনি তো আসবেন না, আজ যে ওনার একাদশী !····শোন্ কতা ! এমন কতা শুনলে গা পিত্তি জ্বলে যায় না ?

এতক্ষণ একটু কান্নাটা থেমেছিল, আবার ফুঁপিয়ে উঠে হীরেমণির বুকে মুখ গুঁজে জগমোহন বলতে লাগলেন, তুই বল হীরে, এটা কী ওর উচিত কাজ হয়েচে ? আমার মতন একটা মানী লোককে ফিরিয়ে দিলে ? উফ্ উফ্ !

হীরেমণি আদর করে জগমোহনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, আহা গো, মনে বড় নেগেচে, দুঃখু করো না, দুঃখু করো না, ঐ গতরখাগী শতেক খোয়ারি কমলি ঠিক একদিন তোমার পায়ে এসে লুটোবে—

—ওর থোতামুখ যদি ভোঁতা করে না দিতে পারি, তাহলে আমার নাম জগমোহন সরকার নয়। আমি জানি ব্যাচা মল্লিকও ঐ কমলির কাছে ঘুরঘুর কচ্চে ! ব্যাচা মল্লিক আমার ওপর টেক্কা দেবে !

—ব্যাচা মল্লিক তোমার নখের যুগ্যি নয় !

—তুই বল হীরে, তুই বল, ব্যাচা মল্লিকের নাম ক'জনা জানে ? সাহেবদের কাচে সুদ খাটিয়ে ওর বড় টাকার গরমাই হয়েচে ! আমি কাগচে আর্টিকেল লিকি, দেশের জন্য এত কাজ কচ্চি, আর ঐ কম্‌লি ছুঁড়ি আমায় না পুঁচে ব্যাচা মল্লিককে পুঁচবে !

—কক্ষণো না।

—তুই দেকিস কম্‌লি, আহা কম্‌লি কি বললুম, হীরে, তুই তো আমার আসল হীরেমণি, আর ঐ কমলিটা ঝুটো মুক্তো ! তুই দেকিস, আমি বালিকা বিদ্যালয় খুলে দেশে অক্ষয় কীর্তি রেকে যাবো।

—কী খুলবেন ?

—ইস্কুল, মেয়েদের জন্য ইস্কুল—

—ইস্কুল ? তাহলে সেখেনে আমার ছেলেটাকে ভর্তি করে নিন গো !

জগমোহন সরকার ধড়ফড় করে উঠে বসে বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে বললেন, 'ছেলে ? তোর আবার ছেলে হলো কবে ?'

হীরেমণির মুখ থেকে কথাটা হঠাৎ বেরিয়ে গেছে। বারাঙ্গনাদের পুত্রসন্তান থাকতে নেই, থাকলেও বাবুদের সামনে তার কথা উচ্চারণ করা চলে না।

কিন্তু হীরেমণির মনের মধ্যে দিন দিন মাতৃভাবটিই যেন প্রবল হয়ে উঠছে। যখন তখন ছেলের কথা মনে পড়ে, এমনকি কোনো বাবুর অঙ্কশায়িনী অবস্থাতেও চোখে ভাসতে থাকে তার সন্তানের মুখ। আর হীরেমণির ছেলেটিও দিন দিন হয়ে উঠছে বড় সুন্দর। যেমন তার রূপ, তেমনি তার গুণ। বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ তার ছেলের, এর মধ্যেই পড়াশুনোয় তার বেশ মেধা দেখা যাচ্ছে। রাইমোহন কোথা থেকে একটি মাতালকে ধরে এনে আশ্রয় দিয়েছে বাড়িতে, পেঁচি মাতাল হলেও লোকটি গ্যাট ম্যাট করে ইংরেজি বলে মাঝে মাঝে, যাতে বোঝা যায় কিছু বিদ্যেসিধ্যে আছে তার। পেট খোরাকি আর নেশার দ্রব্য জোগাবার চুক্তিতে সে রোজ সকালবেলা হীরেমণির ছেলে চন্দ্রনাথকে পড়ায়। সুস্থ অবস্থায় সে বেশ বিনীত আর ভদ্র থাকে। সে চন্দ্রনাথকে নিয়ে ইংরেজি শব্দ ঘোষায় : পমকিন—লাউ, কুমড়ো, কুকুম্বার—শশা, ফিলজফর—বিজ্ঞ লোক, প্লৌম্যান—চাষা।

ছেলে লেখাপড়া শিখছে দেখে হীরেমণির চোখ কান যেন জুড়িয়ে যায়। একেক সময় এমন কথাও চিন্তা করে হীরেমণি যে সে এই পাপ ব্যবসা ছেড়ে শুধু ছেলেকে নিয়েই থাকবে। সে রাইমোহনকে জিজ্ঞেস করেছিল, হ্যাঁ গা, চাঁদুর যখন নেকাপড়া শেখার অত ঝোঁক, তা ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া যায় না ? রাইমোহন বলেছিল, ইস্কুলে ভর্তি হতে গেলেও ওর বাপের নাম শুধোবে। তুই তো আজও ওর বাপের নাম বললিনি !

এইসব কথাই মাথায় ঘুরছিল বলে হীরেমণি ইস্কুলের নাম শুনেই ছেলের কথা বলে ফেলেছে। এখন আর কথা ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই।

সে বললো, আমার ছেলে রয়েচে···অনেকদিন।

জগমোহন সরকার তবু যেন বিশ্বাস করতে পারেছেন না। এতদিন যাওয়া আসা করছেন তিনি এ বাড়িতে, অথচ হীরেমণির যে একটি ছেলে আছে, তাই টের পাননি !

—কত বয়েস ?

—তা প্রায় আট ন' বচরের হলো।

জগমোহন সরকার হীরেমণির আপাদমস্তক দেখলেন আরেকবার। পশ্চিমা স্ত্রীলোকদের মতন হীরেমণি কাঁচুলি ও ঘাগরা পরে আছে আজ, তার উদ্যত স্তন, মসৃণ ত্বক, ধারালো দুটি চোখ, ভরা যৌবনা যুবতী সে, তাকে জননী রূপে যেন কল্পনাই করা যায় না।

—কোথায় থাকে তোর ছেলে ?

—এ বাড়িতেই থাকে, নীচতলায় !

—দূর ! যত সব ! আয়, আমার কাচে আয়, ঘুম পেয়েচে, তোর কোলে মাতা রেকে এবার আমি ঘুমোবো।

হীরেমণি জানে, এবার জগমোহনের ঘুমেরই সময়। চোখ জুড়ে এসেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ছুটি পাবে।

জগমোহন হীরেমণির কোলে মাথা রেখে বললেন, তুই আর পাঁচ জায়গায় মুজরো খাটতে কেন যাস ? আমি যা দিই, তাতে তোর কুলোয় না ?

কথা না বাড়াবার জন্য হীরেমণি বললো, আচ্ছা, আর যাবো না !

—বোতলে আর ব্র্যাণ্ডি আচে ? দে, আমায় শেষ এক ঢোঁক খাইয়ে দে।

—আপনার ইস্কুলে আমার ছেলেটাকে ভর্তি করে নিন না !

—দূর পাগলি ? তোর ছেলে লেখাপড়া শিখে কী করবে ? সে কি গেরস্তবাবু হবে নাকি ?

—আমার ছেলে নেকাপড়া শিখ্‌লে কুঠিওয়ালাদের মতন আপিসে চাকরি করবে !

—হেঃ, যেমন তোর কতা ! বেশ্যার ছেলের মাতায় কখনো বিদ্যে ঢোকে ? বরং তুই ওকে কুস্তি শেখা, লাঠিখেলা শেখা, তাহলে বরং এ পাড়ার গুণ্ডোদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে।

—না গো, তার বেশ বুদ্ধি হয়েচে। সে নিজের নাম নিকতে পারে।

—তবে আর কি, যথেষ্ট হয়েচে ! তাকে কুস্তি শেখাতে না চাস ডুগি তবলা বাজাতে শেখা !

—কেন, আপনার ইস্কুলে তাকে একবারটি ভর্তি করে দেকুনই না—

—আরে দূর ! আমার ইস্কুলে কি ছেলেরা পড়বে নাকি ? ছেলেদের ইস্কুল তো গণ্ডাগণ্ডা নিত্যি নতুন গজাচ্চে। ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমি ইস্কুল খুলবো মেয়েদের জন্য।

—মেয়েরা নেকাপড়া শিখবে ? ভদ্রঘরের মেয়েরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে ইস্কুলে যাবে। ওমা সে কি কতা গো ! সাধ করে কে জাত খোয়াবে ?

—জাত খোয়াবে কেন ? দেকবি ঠিক আসবে⋯কচি কচি, ফুটফুটে, সুন্দর সুন্দর মেয়েরা, আহা, যেন সব তাজা তাজা ফুল !

তারপর হীরেমণির স্তনে মুখ ঘষতে ঘষতে জগমোহন সরকার বলতে লাগলেন, মেয়েদের আমি বড্ড ভালোবাসি রে, বড্ড ভালোবাসি, তাদের আমি জ্ঞানের আলো পৌঁচে দোবো, তারা হাসবে, খেলবে, ছুটোছুটি করবে, আহা হা, আমি বড্ড ভালোবাসি।

হীরেমণি ঘুম পাড়াবার জন্য জগমোহনের মাথায় ছোট ছোট চাপড় দিতে লাগলো।

জগমোহন জড়িত কণ্ঠে বললেন, একটা গান শোনা, হীরে আমার, বুলবুল আমার, তোর গান শুনলেই আমার মন জুড়োয়, চোখ জুড়োয়, তোর গান শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়বো⋯

হীরেমণি একটুখানি গুন গুন করে সুর ভেঁজে গান ধরলো :

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ, বদন ঢেকে যেও না
তোমায় ভালোবাসি তাই
চোখের দেখা দেখতে চাই
কিন্তু 'থাকো' 'থাকো' বলে ধরে রাখবো না।
আমি কোনো দুঃখের কথা তোমায় বলবো না
তুমি যাতে ভালো থাকো সেই ভালো
গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ আমারই গেলো।

জগমোহন সরকার উপুড় হয়ে শুয়ে হীরেমণির উরুতে চাপড় মেরে মেরে তাল দিতে লাগলেন। তাঁর ঘুম প্রায় এলো এলো।

পাশের ঘরের দরজায় একটা মৃদু শব্দ হতেই হীরেমণি তাকালো সেদিকে। দরজাটা ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেছে, তার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে রাইমোহন।

রাইমোহন হাত পা নেড়ে ইশারা করছে তার দিকে। হীরেমণি বুঝতে পেরেও দু-একবার মাথা নাড়লো, রাইমোহন তবু কোনো ব্যাপারে তাকে জোর করতে চায়।

তখন হীরেমণি ঐ গান মাঝপথে থামিয়ে অন্য গান ধরলো আড়ে ঠেকায় :

হেরি অবলার দুখ, ওগো গুণনিধি
বুঝি গেল তোমার বুক ফেটে
সদরে রইলো না আগল, ওগো গুণনিধি
তবু তুমি ঢুকলে সিঁধ কেটে
তুমি জগতের মোহন, বংশীধারী
তাই বুঝি, ওগো গুণনিধি, চাই
ষোড়শ গোপিনী উপচারই⋯

জগমোহন মুখ ফিরিয়ে বললেন, এ কি গান ? অ্যাঁ ? এ গান তো কখনো শুনিনি ! এ গান কে বাঁধলে ?

হীরেমণি বললো, কাল এক ভিকিরী ছোঁড়া গাইছেল, শুনতে শুনতে আমার মুখস্ত হয়ে গ্যালো। সুর লাগিয়েছে খাসা⋯এ গান আমিও আগে শুনিনি।

জগমোহন আতঙ্কিতভাবে বললেন, আবার গা তো ! আবার গা একবার।

হীরেমণি আবার ধরলো গানটা।

জগমোহন শুনে যেন আঁতকে আঁতকে উঠতে লাগলেন।

বিড়বিড় করে বললেন, তুমি জগতের মোহন ? তার মানে তো আমি ! 'হেরি অবলার দুখ, ওগো গুণনিধি, বুঝি গেল তোমার বুক ফেটে'—এ তো আমার সম্বন্ধে⋯কী সব্বোনেশে কথা, 'তবু তুমি

ঢুকলে সিঁধ কেটে', আমি কোথায় সিঁধ কেটে ঢুকিচি ? অ্যাঁ ? খবর্দার, এ গান গাইবি তো জিভ ছিঁড়ে দোবো ! কে এ গান তোকে শিখুলে সত্যি করে বল্।

হীরেমণি নিরীহ মুখ করে বললো, বললুম তো, এক ভিকিরি ছোঁড়া গাইছেল।

—সে কোথাকার ভিকিরি ?

—তা আমি কী করে জানবো। আমি তো তার ঠিকুজী ঠিকানা রাখিনি ! তবে সে আসে মাঝে মাঝে, দু-চারদিন অন্তর।

—ওরে কেউ আমার সব্বোনাশ করতে চাইচে ! কেউ আমার পেচুনে লেগেচে। আমার নামে কুচ্ছো রটাচ্ছে। তুই এ গান গাইতে গেলি কেন, বল ? সত্যি করে বল্ ?

—ও মা, আমি জানবো কী করে যে এ গানে আপনার ঘুম চটে যাবে ? আমি ভাবলুম ভক্তির গান, শুনে তাড়াতাড়ি আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন...রাত অনেক হলো।

—ভক্তির গান ? অভক্তি ! অভক্তি ! লোকের ভালো করতে গেলে এই হয়। এ গানের আরও পদ আচে নাকি ?

হীরেমণি মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, হ্যাঁ গো। অনেক আচে।

পরের লাইনগুলি শুনে জগমোহন সরকার প্রায় তিড়িং তিড়িং করতে লাগলেন। বিরাট শরীর নিয়ে তিনি একবার ঘরের এদিক আর একবার ওদিক ছুটতে লাগলেন উদ্‌ভ্রান্তের মতন। চোখ দিয়ে আবার জল গড়াচ্ছে। ধরা গলায় বলতে লাগলেন, গভীর ষড়যন্ত্র ! গভীর ষড়যন্ত্র ! কে এমন করলে ? ব্যাচা মল্লিক ? বাগাড়ম্বর মিত্তির ? ওফ্ ! হীরে, তুই আমায় বাঁচা !

হীরেমণি বললো, আমি সামান্য মেয়েমানুষ, আমি আপনাকে কী করে বাঁচাবো ?

জগমোহন সরকার হাহাকার করে বললেন, তুই এ গান ভুলে যা ! কোনোদিন ভুলেও আর গাইবিনি। তুই পাঁচ জায়গায় মুজরো গাইতে যাস, কোনোদিন যেন তোর মুখ ফস্কে এ গান না বেরোয়। কতা দে আমায়। দিব্যি কর !

বাঁ হাতের মধ্যমা থেকে একটি বড় পান্না-বসানো আংটি খুলে হীরেমণির কোলে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এই নে ! ওরে, তুই এ গান ভুলে যা !

হীরেমণি ভালোমানুষের ঝিয়ের মতন বললো, আপনি হুকুম করচেন, এরচে আর বড় কতা কী ! গাইবো না ! কোনোদিন এ গান আর মনেও আনবো না। এ গানের মধ্যে যে অ্যাত, তা আমি জানবো কী করে।

—তুই না হয় গাইবি না, কিন্তু সেই ভিকিরি ছোঁড়া ?

—তার আমি কী করে মুখ আটকাবো বলুন ?

—তুই বললি না যে সে আসে মাঝে মাঝে ?

—তা আসে।

এবার এলেই তাকে চেপে ধর। তাকে মুখ সামলে থাকতে বলবি, নইলে, তাকে ভয় দেকাবি, আমি তাকে গারদে পুরে দোবো ! বুঝলি ?

—হ্যাঁ বুজলুম।

কোটের দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে দু মুঠো টাকা বার করে জগমোহন সরকার ছুঁড়ে দিলেন হীরেমণির দিকে। বললেন, এই নে ! আরও নে ! আমার মুখ রক্ষে কর। 'তবু তুমি ঢুকলে সিঁধ কেটে' ওরে বাপরে বাপ, কী সাংঘাতিক কতা। আমার মতন একটা মানী লোক—

হীরেমণি বললো, আপনি অত ছটফটাচ্চেন কেন ? শুয়ে পড়ুন, এবার ঘুমোন।

জগমোহন সরকার হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, আর আমি শুয়িচি, ঘুম আমার মাতায় উঠে গ্যাচে। আমার সর্বাঙ্গ জ্বলচে....ভোর হতে আর দেরি নেই বোধহয়, আমি গঙ্গাচ্চান করে তবে বাড়ি ফিরবো !

আর একটুও অপেক্ষা করলেন না জগমোহন সরকার, দরজা খুলে অন্ধকারের মধ্যেই দুপদাপ করে নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। তারপর বাইরে শোনা গেল তাঁর জুড়িগাড়ির শব্দ।

দরজা ঠেলে এ ঘরে এসে রাইমোহন একেবারে হেসে আকুল। হীরেমণিও হাসতে লাগলো। একটা গানে যে এরকম প্রতিক্রিয়া হবে, তা হীরেমণি কল্পনাও করতে পারেনি।

রাইমোহন বললো, দেকলি, হীরে, দেকলি, কেমন ওষুধ ধরেচে !

হীরেমণি বললো, ইস, মনে বড্ড দাগা পেয়েচেন গো ! কাটা পাঁঠার মতন ছটফটাচ্চিলেন মানুষটা।

রাইমোহন বললো, হবে না ! ঐ সিঁধ কাটার কথাটাতেই আঁতে ঘা লেগেচে যে ! সত্যি যে সিঁধ কাটে।

—সে কি গো ! অতবড় একটা মানুষ !

—রেকে দে তোর বড়মানুষ। ও একটা পিশেচেরও অধম ! ফিমেল উদ্ধারের নাম করে ভদ্দরলোকের বাড়িতে ঢুকে জাত কুল নষ্ট করচে। এক ব্রাহ্মণের বিধবা, একটি মাত্র ছোট মেয়ে আচে তেনার, সেই মেয়েকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনবার জন্য মেয়ের মায়ের সব্বোনাশ করে দিলে গো ! আমি সব জানি। এতেই কী হয়েচে, ওকে নিয়ে আরও একটা গান বেঁধেচি, সেটাও তোকে শিকিয়ে দেবোখন।

হীরেমণি বললো, অমন গান দ্বিতীয়টি শুনলে উনি আর ইদিক পানেই আসবেন না !

রাইমোহন বললো, আসবে, আসবে, যত বেশী শুনবে, ততই বেশী জ্বলেপুড়ে আসবে। শুধু জগু সরকার কেন, ব্যাচা মল্লিককে নিয়েও একটা গান বাঁধা হয়ে গ্যাচে আমার। এবার কারুক্কে ছাড়বো না।

বিধুশেখরের ঘুম ভাঙে অতি প্রত্যূষে। তাঁর শয়নকক্ষটি খুব প্রশস্ত, পশ্চিমশিয়রী বিছানা। বেশ কয়েক বছর ধরেই তিনি পৃথক কক্ষে একলা ঘুমোন। বিধুশেখর রাত্রে ঘুমের মধ্যে কোনো বিঘ্ন পছন্দ করেন না। তাঁর স্ত্রী সৌদামিনী বাতব্যাধি ও বহুমূত্রে ভুগছেন, রাত্রে বারবার তাঁকে উঠতে হয়, তাই তিনি নিজেই অন্য ঘরে থাকেন।

পূর্বদিকের গবাক্ষ দিয়ে ভোরবেলার প্রথম সূর্যের রশ্মি এসে পড়ে বিধুশেখরের চোখে। তখনই তিনি চোখ মেলে তাকান। শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস এই অভ্যেস। পঞ্চাশের বেশী বয়েস হয়ে গেলেও এখনো তাঁর শরীরে কোনো প্রকার জড়তা আসেনি, ঘুমভাঙা মাত্র তিনি উঠে বসেন এবং হাত জোড় করে ললাটে ঠেকিয়ে প্রণাম জানান কুলদেবতার উদ্দেশে।

তারপর তিনি নাকের সামনে তাঁর বাম করতল এনে নিশ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করেন। বিধুশেখরের ধারণা, ঘুম ভাঙার পর মানুষের শুধু এক নাক দিয়ে প্রশ্বাস পড়ে। কোনোদিন বাম, কোনোদিন ডান। প্রত্যেকদিন এই সময় শয্যায় বসে বিধুশেখর এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে নেন, আজ কোন্ নাকে, বাম না ডান ? ঠিক কোনো নির্দিষ্ট কারণ না থাকলেও কেন যেন বিধুশেখর প্রথম জাগরণের পর বাম নাকের প্রশ্বাসই পছন্দ করেন।

আজ ডান নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়ছে। সুতরাং খাট থেকে নামবার জন্য বিধুশেখর প্রথমে বাঁ পা বাড়ালেন। তারপর জানলার দিকে হেঁটে যেতে তিনি পর্যায়ক্রমে একবার বাঁ দিকের নাকের ফুটো আর একবার ডান দিকের নাকের ফুটো টিপে ধরে ধরে প্রশ্বাস পাল্টাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এতে অনেক সময় সত্যিই বদল হয়ে যায়। সেই অবস্থাতেই তিনি সূর্য দেবতার উদ্দেশে ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে চললেন।

বিধুশেখর জেগে ওঠার পরও সারা বাড়ি ঘুমিয়ে থাকবে, এটা অসম্ভব কথা। দ্বিতলের বারান্দায় তাঁর খড়মের ঠকঠকানি শুনলেই নীচতলায় একটা চাঞ্চল্য পড়ে যায়। তাঁর খিদমদগারির জন্য তৈরি হয়ে থাকে ভৃত্যমহল।

দোতলায় সিঁড়ির ঠিক সামনের ঘরটায় থাকেন তাঁর স্ত্রী সৌদামিনী। ইদানীং তিনি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই শয্যাশায়ী। সে ঘরের দরজা ভেজানো, বিধুশেখর একটু ঠেলে খুললেন। ঘরের মেঝেতে শুয়ে থাকে একজন দাসী। কর্তার খড়মের শব্দ শুনে সে আগেই উঠে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইলো দেয়ালের ধারে। সৌদামিনী তখনও নিদ্রাভিভূতা, বিধুশেখর পালঙ্কের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। কয়েক বৎসর আগেও সৌদামিনী ছিলেন স্থূলাঙ্গিনী ও সুখী

চেহারার রমণী, হঠাৎ যেন শরীরে খরা লেগেছে, মেদ ঝরে গিয়ে শিথিল হয়ে গেছে চামড়া, গৌরবর্ণ এখন পাণ্ডুর হয়ে এসেছে।

বিধুশেখরের চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু জ্ঞান আছে। শরীরের বর্ণ পরিবর্তন দেখে তিনি রোগের মাত্রা নির্ণয় করতে পারেন। তিনি ঘুমন্ত পত্নীর একটি হাত তুলে নিয়ে নোখের ডগা ও তালুর রং নিরীক্ষণ করলেন, তারপর নাড়ী টিপে দেখলেন। আবার হাতটা তাঁর বুকের ওপর আস্তে নামিয়ে রেখে বিধুশেখর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সবই ললাটলিপি ! বিধুশেখর কোনোদিন তাঁর পত্নীর প্রতি অবহেলা, অযত্ন করেননি। তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁর ক্ষমতা আছে, অর্থ আছে, তিনি একাধিক বিবাহ করতে পারতেন অনায়াসেই। কিন্তু বিধুশেখর একদার। সৌদামিনী পাঁচটি কন্যাকে গর্ভে ধরেছেন। একটি পুত্রসন্তানও উপহার দিতে পারেননি স্বামীকে। বিধুশেখরের কোনো বংশধর থাকবে না, তবুও তো তিনি অন্য পত্নী গ্রহণ করলেন না। বিধুশেখরেরই সমব্যবসায়ী রাজনারায়ণ দত্ত কী কাণ্ড করছেন ! রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র পুত্র মধু খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে দেশান্তরী হয়েছে। শোনা যায় সে সুদূর মান্দ্রাজে আছে। মধুকে ত্যাজ্যপুত্র করে আর একটি পুত্রসন্তান পাবার আশায় ক্রুদ্ধ রাজনারায়ণ দত্ত একটার পর একটা বিবাহ করে চলেছেন। নিষ্ফল চেষ্টা, লোক-হাসানো হচ্ছে শুধু।

সৌদামিনী নিজেই বিধুশেখরকে আর একটি বিবাহ করার জন্য পীড়াপীড়ি করেছেন অনেকবার, বিধুশেখর কর্ণপাত করেননি। ভাগ্যে থাকলে এক পত্নীতেই পুত্রসন্তান পাওয়া যেত।

নিয়তি যে কার প্রতি কী রকম ব্যবহার করবেন, তার কোনো ঠিক নেই। স্বামী সোহাগ থেকে কখনো বঞ্চিতা হননি, শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হয়নি কোনোদিন, তবু তাঁকে এমন কাল রোগে ধরলো। সাধ আহ্লাদ সব মিটে গেল এ জীবনের মতন, এখন শুধু মৃত্যুর পানে তিল তিল করে এগোনো। ওদিকে দেখো বিম্ববতীর ভাগ্য। বিম্ববতী সারাজীবনে স্বামীসঙ্গ পেয়েছেন কমই, রামকমল সিংহ প্রায় রাত্রেই গৃহে থাকতেন না, স্বভাবতই তাঁর খুবই মনোবেদনা থাকবার কথা, তবু বিম্ববতীর কি নিটোল স্বাস্থ্য, শরীরে রোগ ভোগ নেই। এখনো তাঁর রূপ যেন ফেটে পড়ছে। বিধবা হলেন অকালে, তবু বিম্ববতী পুত্রগর্বে সৌভাগ্যবতী।

আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিধুশেখর বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। পুত্রসন্তান না থাক, বিধুশেখর দত্তকপুত্র নেবার পক্ষপাতী নন। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার স্বামীকে তিনি ঘরজামাই করে রেখেছেন। আরও কয়েক বছর বিধুশেখর তাঁর জামাই দুর্গাপ্রসাদের মতিগতি লক্ষ করবেন। ছেলেটি বড় বেশী চুপচাপ, এখনো তাকে পুরোপুরি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। যদি সে দুঃশীল হয়, তবে বিধুশেখর সমস্ত সম্পত্তি দেবত্র করে দিয়ে যাবেন। অনেকটা তাঁর অমতেই রামকমল তাড়াহুড়ো করে গঙ্গানারায়ণকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেছিল, এই তো তার পরিণতি ! গঙ্গানারায়ণ ! আজকাল এই নামটি মনে পড়লেই বিধুশেখরের গাত্রদাহ হয়।

বিধুশেখর নীচে নেমে এলেন। শীতকালে তিনি রৌদ্রে বসে দাঁতন করেন। বাড়ির পিছনের বাগানে ভৃত্যরা এরই মধ্যে তাঁর জন্য একটি আরাম কেদারা পেতে রেখেছে। একটি ছোট বেতের ঝুড়িতে কয়েকটি নিমডাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন ভৃত্য। বিধুশেখর বাছাবাছি করে একটি নিমডাল তুলে নিলেন। তারপর দাঁতন করতে করতে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন গঙ্গানারায়ণের কথা। যৌবনের দর্পে গঙ্গানারায়ণ যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছে। বিধুশেখরের প্রত্যেকটি নির্দেশ অমান্য করেই যেন সে আনন্দ পায়। গঙ্গানারায়ণকে তিনি পাঠিয়েছিলেন যশোহরের ইব্রাহিমপুরের কুঠিতে। সেখানে অনেকখানি জমি নীলচাষের জন্য পত্তন নেওয়া আছে। নীলচাষ নিয়ে সম্প্রতি কিছু কিছু হাঙ্গামা হচ্ছে। এই চাষ এখন অত্যন্ত লাভের কারবার তাই দলে দলে সাহেবরা ঝুঁকেছে এদিকে। ভাগ্যান্বেষী বে-সরকারী ইংরেজরা এদেশে এসে নানান ব্যবসা ফেঁদে বসে, এখন তারা হুড়মুড়িয়ে যাচ্ছে নীলচাষে। বিধুশেখর বুঝেছেন যে সাহেবদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারা যাবে না। মফস্বলের আদালতে ইংরেজদের বিচার হয় না বলে তারা কোনো রকম আইনের পরোয়া করে না, তারা চাষীদের ওপর যত খুশী জুলুম করতে পারে। সেইজন্যই বিধুশেখর চান নীলচাষের জন্য পত্তন দেওয়া জমি সাহেবদের কাছে ইজারা দিয়ে দিতে, নীলের বাজার তেজী থাকতে থাকতে দাম বেশ ভালো পাওয়া যাবে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি পাঠালেন গঙ্গানারায়ণকে, কিন্তু সে করে এলো সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ। সে সাহেবদের কাছে জমি হস্তান্তর করার কোনো চেষ্টাই করেনি, বরং উল্টে সে চাষীদের নীলচাষের দরুন যে দাদন দেওয়া হয়েছিল তা সব মকুব করে দিয়ে তাদের সেই জমিতে ধান চাষের অনুমতি দিয়ে এসেছে।

বিধুশেখর চিক্ করে থুতু ফেললেন মাটিতে। চাষীদের জন্য দরদ ! গঙ্গানারায়ণের দুরভিসন্ধি

বুঝতে বিধুশেখরের আর বাকি নেই। চাষীদের কাছে উদার, দেশহিতৈষী সেজে সে প্রমাণ করতে চায় যে যেন সে নিজেই জমিদার! নবীনকুমার এখনো ছোটো, তাকে কেউ চেনে না, প্রজারা এখনো গঙ্গানারায়ণকেই রামকমল সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে মানে। হুঁঃ! বিধুশেখর মনে মনে হাসলেন। তিনি ইচ্ছে করলেই এখনো গঙ্গানারায়ণকে আবর্জনায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন। গঙ্গানারায়ণ জানে না। বিধুশেখর যদি চাইতেন তাহলে তিনি নিজেই এতদিনে রামকমল সিংহের সমগ্র সম্পত্তি গ্রাস করে ফেলতে পারতেন। এমনকি রামকমল সিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জোড়াসাঁকো থেকে সমগ্র সিংহ পরিবারকে মুছে ফেলে দেওয়াও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। সে-সব তিনি করেননি শুধু বিম্ববতী আর নবীনকুমারের মুখ চেয়ে। নবীনকুমারের কথা চিন্তা করলেই তাঁর মন কোমল হয়ে যায়।

নবীনকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হোক, তাকে তিনি কলকাতার ধনী, অভিজাত সমাজের একেবারে চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করে যাবেন। তার আগে তিনি সম্পূর্ণ ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে যাবেন গঙ্গানারায়ণকে, নইলে তাঁর আত্মা কিছুতে তৃপ্ত হবে না। কুলাঙ্গার! বিধুশেখর একসময় এত প্রশ্রয় দিয়েছিলেন গঙ্গানারায়ণকে, তার প্রতিদানে সে কিনা তাঁরই কন্যার ধর্মনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল! দুধ-কলা দিয়ে এই কাল-সর্পকে পোষা হয়েছে এতদিন। এখন সে বিধুশেখরের সামনেই ফোঁস ফোঁস করতে আসে। ওকে বিধুশেখর পথের ভিখারী করে ছাড়বেন।

মৃত্যুর আগে তিনি নির্দেশ দিয়ে যাবেন, যেন নবীনকুমারই তাঁর মুখাগ্নি করে।

দাঁতন শেষ করে নিমডালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিধুশেখর ডান হাতটা বাড়িয়ে রইলেন। একজন ভৃত্য অমনি একটি তামার জিভ-ছোলা নিয়ে এলো। খানিকক্ষণ জিহ্বা পরিষ্কার করার পর তিনি সেটা ফিরিয়ে দিলেন ভৃত্যটির দিকে। সে জল নিয়ে প্রস্তুত। মুখ প্রক্ষালন করার পর বিধুশেখর গেলেন অন্য প্রাতঃকৃত্য সেরে আসতে।

সকালবেলা পুজো-আচ্চা শেষ করার আগে বিধুশেখর সাধারণত কারো সঙ্গে একটিও কথা বলেন না। তাই হুকুমের অপেক্ষা করতে হয় না ভৃত্যদের, তারা প্রত্যেকদিনই একই নিয়মমতন পরপর সব কিছু সাজিয়ে রাখে।

প্রাতঃকৃত্যের পর স্নান। বিধুশেখরের বাড়ির সংলগ্ন নিজস্ব পুষ্করিণী আছে। কিন্তু তিনি পুষ্করিণীতে স্নান করা পছন্দ করেন না। অতি ভোর থেকেই ভৃত্যরা বাগানে একটি পোর্সিলিনের বিরাট গামলায় জল ভরে রাখে। সেই জল রৌদ্রে উষ্ণ হয়। তার পাশেই পাতা থাকে একটি মাদুর। প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে বিধুশেখর বাসী কাপড় ছেড়ে একটি তেলধুতি পরে সেই মাদুরের ওপর শুয়ে পড়েন, তখন কয়েকজন ভৃত্য তাঁর শরীরে তৈল মর্দন করে। এই ব্যাপারটা চলে অনেকক্ষণ। প্রভু বা ভৃত্যেরা কেউ কোনো কথা বলে না। শুধু দলাই মলাই করার চপাস চটাং শব্দ হয়। তারপর এক সময় বিধুশেখর নেমে পড়েন জলের গামলায়। সেখানেও তিনি শুয়ে থাকেন স্থির হয়ে, ভৃত্যেরা সম্মার্জন করে তাঁর অঙ্গ।

এত কাণ্ড সত্ত্বেও তাঁর স্নানটি প্রায় কাকস্নানের পর্যায়ে পড়ে। জল সম্পর্কে তাঁর ভীতি আছে। পুষ্করিণীতে তো নয়ই, বিধুশেখর এত ধর্মপ্রাণ হয়েও কখনো গঙ্গায় স্নান করতে যান না। তাঁর গৃহে গঙ্গাজল রাখা থাকে। প্রতিদিন পুজোর আগে তিনি সেই জল একটু মাথায় ছিটিয়ে নেন। নৌকাযোগে মহাল পরিদর্শনে যেতে হয় বলে তিনি নিজে জমিদারি পর্যন্ত কেনেননি। তাঁর নিজের অধিকাংশ সম্পত্তি লগ্নী করা আছে কলকাতার বিভিন্ন হৌসে।

স্নান সেরে বিধুশেখর ভেজা কাপড় পরেই চললেন গৃহের দিকে। নাকের সামনে করতল এনে আবার তিনি পরীক্ষা করলেন তাঁর প্রশ্বাস। তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। স্নানের পর দেহ পবিত্র হয়, তখন দু নাক দিয়েই সমানভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস হয়, তখন মানুষ মুক্ত হয় ইড়া-পিঙ্গলার প্রভাব থেকে। অথচ আজও ডান নাক দিয়ে প্রশ্বাস পড়ছে কেন? একি কোনো দুর্লক্ষণ?

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডান চোখের তারা একবার কেঁপে উঠলো।

বিধুশেখর মনের দুর্বলতার প্রশ্রয় না দিয়ে ওপরে উঠে এসে বস্ত্র পরিবর্তন করলেন। একটি পট্টবস্ত্র পরে তিনি গেলেন পূজার ঘরে। কুশাসনে বসে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে করতেও তিনি অন্যমনস্কভাবে একবার নাকের কাছে নিয়ে এলেন হাত। এখনো ডান নাক দিয়েই!

এই ঠাকুরঘর এক সময় বিন্দুবাসিনীর অধিকারে ছিল। প্রতিদিন সকালে বিধুশেখর এখানে এসে

পূজায় বসলেই বিন্দু তার পিতার জন্য কোষাকুষি, গঙ্গাজল, ফুল সব এগিয়ে দিত। সারা দিন রাত্রির মধ্যে শুধু এই সময়টিতেই বিন্দুর সঙ্গে দেখা হতো বিধুশেখরের। দু একটি কথাবার্তা হতো। এখনো এই কক্ষে এসে বসলেই বিন্দুর কথা একবার মনে পড়ে বিধুশেখরের। কিন্তু সেই হতভাগিনী কন্যার কথা ভেবে বিধুশেখরের মনে কোনো দুঃখবোধ হয় না। অপরাধের তুলনায় তিনি তো বিন্দুকে অতি মৃদু শাস্তিই দিয়েছেন। মতিচ্ছন্ন হয়ে সেই মেয়ে এই ঠাকুরঘর অপবিত্র করেছিল। গঙ্গানারায়ণ তাকে পাপ মনে দেখেছিল। পাপ মনে তাকে স্পর্শ করতে এসেছিল, তার আগে বিন্দু বিষ পান করেনি কেন? বিন্দু তেমনভাবে মরলে কন্যার জন্য গর্বিত হতেন বিধুশেখর, কন্যার নামে কালীঘাটের মন্দিরে একটি পাথর বাঁধিয়ে দিতেন। সংযমই তো বিধবার অলঙ্কার। যে বিধবা এ জন্মে প্রতিটি বিধান মেনে কঠোরভাবে আত্মসংযম পালন করে, পরজন্মে তার সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় হয়। এ কথা কতবার তিনি বুঝিয়েছিলেন বিন্দুকে। তা সে শুনলো না, জীবনে তিনি তার মুখ দর্শন করবেন না।

পূজা সেরে উঠে দাঁড়ালেন বিধুশেখর। আজ পূজায় ভালো করে মন বসেনি। মনকে তিনি কিছুতেই একাগ্র করতে পারছিলেন না। তবু শুধু শুধু আর বসে থাকার কোনো মানে হয় না। সায়াহ্নে আর একবার বসবেন পূজায়।

নাকের কাছে আবার হাতটা আনলেন। এখনো ডানদিকে।

একটি কমলালেবু, একটি সন্দেশ ও এক গ্লাস ঘোলের সরবত খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করলেন বিধুশেখর। তারপর আবার এলেন পত্নী সৌদামিনীর ঘরে।

সৌদামিনীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে কিছু আগে। তবে এখনো তিনি শয্যার ওপরেই আধো-শোয়া হয়ে রয়েছেন, একজন নাপতেনী আলতা পরাচ্ছে তাঁর পায়ে। আগে এসব আলতা পরানো কিংবা অন্যান্য প্রসাধনপর্ব শুরু হতো বিকেলবেলায়, কিন্তু এখন সৌদামিনীর নানারকম বাতিক দেখা দিয়েছে। যখন তখন তাঁর নানারকম ইচ্ছে জাগে, আর যখন যেটি চাইছেন, তখন তাঁর সেটি চাই-ই। একদিন রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে তিনি হঠাৎ নতুন গুড়ের মোয়া খাবার বায়না ধরেছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে দুর্গাপুজোর বাজনা বাজছে আর তার পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাঁর মৃতদেহ। শীতকাল আসবার আগেই তিনি মরে যাবেন। স্বপ্নে এরকম ইঙ্গিত ছিল, তাহলে আর এবছরের নতুন গুড়ের মোয়া খাওয়া হবে না। সে কথা ভেবেই দুঃখে তাঁর বুক ফেটে গেল, তিনি অবোধ বালিকার মতন কান্না জুড়ে দিয়েছিলেন।

সৌদামিনী অসুস্থ হয়ে পড়ার পর থেকে তাঁর বিধবা বড় মেয়ে নারায়ণী সংসারের কর্তৃত্ব নিয়েছে। দাসীরা ডেকে এনেছিল তাকে। নতুন গুড়ের মোয়া তো দূরে থাক, বাড়িতে কোনো রকম মোয়াই নেই, এত রাত্রে তা পাওয়া যাবেই বা কোথায়। নারায়ণী মাকে অনেক করে বুঝিয়েছিল। কিন্তু সৌদামিনী কিছুতেই শুনবেন না। ওরে তোদের জন্য আমি এত করিচি, আর তোরা আমার এইটুকুনি সাধ মিটোবিনি, এই বলে কী কান্না! নারায়ণী পিতার ঘুম ভাঙায়নি। সেই রাত্রেই পোস্তাবাজারে লোক পাঠিয়ে গুড় আনিয়ে বাড়িতে মোয়া বানিয়ে মাকে খাইয়েছিল সে।

বিধুশেখর ঘরের মধ্যে এসে একটুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলেন। নাপতেনী দ্রুত কাজ সেরে বেরিয়ে গেল। তারপর বিধুশেখর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আজ কেমন বোধ কচ্চো, সদু?

স্বামীকে দেখে সৌদামিনী মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে বললেন, ভালো, কালকের চেয়ে আজ বেশী ভালো আচি।

সৌদামিনীর এই একটা গুণ, স্বামীর কাছে কখনো নিজের অসুখ বিষয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করতে চান না। তাঁর স্বামী অতিশয় ব্যস্ত কাজের মানুষ। তাঁর চিন্তা আর বাড়াতে চান না সতী-সাধ্বী পত্নী।

বিধুশেখর জিজ্ঞেস করলেন, হাঁটুর গ্যাঁটের বেদনাটা কমেচে?

সৌদামিনী বললেন, একদম নেই-ই বলতে গেলে! আপনি ও নিয়ে আর ভাববেন না। কোবরেজমশাই খুব ভালো ওষুধ দিয়েচেন।

তারপর ফ্যাকাশে ভাবে একটু হাসির চেষ্টা করে তিনি আবার বললেন, কোবরেজমশাইকে অমন ভালো ভালো ওষুধ দিতে আপনি নিষেধ করুন না। এখন সিঁথের সিঁদুর নিয়ে মত্তে পারলেই যে আমার সুখ!

বিধুশেখরও সামান্য কৌতুকের চেষ্টা করে বললেন, তা কী করে হবে ! পত্নীবিয়োগ তো আমার কোষ্ঠীতে লেকা নেই। আমার আয়ু আশি বচর, তুমি তার চে বেশী বাঁচবে।

সৌদামিনী বললেন, আশি বচর কেন, আপনি বাঁচবেন আরও ঢের বেশী। মেয়েমানুষের অতদিন বেঁচে থাকা ভালো নয়।

বিধুশেখর পত্নীর ললাটে হাত রাখলেন। ঠাণ্ডা, একটু বেশী ঠাণ্ডা। এটাই বিধুশেখরকে চিন্তায় ফেলে। অসুস্থ মানুষের শরীরে তাপ বেশী থাকারই তো কথা। অথচ সৌদামিনীর দেহের তাপ যেন দিনের পর দিন ক্রমশই কমে আসছে।

বিধুশেখর বললেন, হ্যাঁ, ভালোই তো মনে হচ্চে আজ।

—সুহাসিনীদের কোনো পত্তর এয়েচে ?

বিধুশেখরের কনিষ্ঠা কন্যা আর জামাই দুর্গাপ্রসাদ গেছে কৃষ্ণনগরে। ওখানেই বিধুশেখরের পৈতৃক বাড়ি। সে বাড়ি বহুদিন অযত্নে পড়ে আছে, সেইজন্যই বিধুশেখর জামাইকে সেখানে পাঠিয়েছেন যাতে সে বাড়িটি সারিয়ে, বাগানের আগাছা জঙ্গল পরিষ্কার করে সেটা ভদ্রস্থ করে তুলতে পারে। মস্ত বড় বাড়ি, শুধু শুধু ফেলে রাখা কোনো কাজের কথা নয়। ইংরেজ কোম্পানি রাজত্ব নেবার পর বাড়ি ভাড়ার বেশ চাহিদা বেড়েছে, সরকারী কর্মচারীরা উচ্চ দামে বাড়ি ভাড়া নেয়, সুতরাং ও বাড়িটিও ভাড়া দিলে কিছু সুসার হয়। কন্যাকেও পাঠিয়েছেন জামাতার সঙ্গে, কিছুদিন ধরে সে পেটের পীড়ায় ভুগছে, ওখানে গেলে কিছুটা স্বাস্থ্য পরিবর্তন হতে পারে। কৃষ্ণনগরের জল-হাওয়া ভালো।

বিধুশেখর বললেন, না, আসেনি। এই তো ক'দিন মাত্তর গ্যালো, এখনো পত্র আসার সময় হয়নি।

—আজ ও বাড়ি যাওনি ?

—যাইনি, যাবো।

ও বাড়ি অর্থাৎ সিংহ ভবন। প্রতিদিন সকালে সিংহ ভবনে একবার গিয়ে সব খবরাখবর নিয়ে আসা বিধুশেখরের বহুকালের অভ্যেস। ও বাড়ির সব রকম ব্যবস্থাপনা এখনো বিধুশেখরের নির্দেশেই চলে। গঙ্গানারায়ণ যতই বিদ্রোহী হবার চেষ্টা করুক, বিধুশেখর এখনো দুই পরিবারের কর্তা।

পত্নীর কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে বিধুশেখর সৌদামিনীর নাকের কাছে হাত নিয়ে বললেন, শ্বাস ফেলো তো !

আশ্চর্য, সৌদামিনীরও ডান নাক দিয়ে প্রশ্বাস পড়ছে।

ললাট কুঞ্চিত করে বিধুশেখর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নেমে এলেন নীচে। বৈঠকখানা ঘরের সামনের বারান্দায় কিছু উমেদার, দালাল ও প্রার্থীর ভিড় জমেছে। আজকাল এক নতুন উৎপাত শুরু হয়েছে, যার নাম চাঁদা। আগে ছেলের পৈতে, বাপের শ্রাদ্ধ, কন্যাদায় ইত্যাদির নাম করে কিছু দরিদ্র, কিছু ফেরেববাজ সাহায্য চাইতে আসতো। আজকাল আসে ইস্কুলের চাঁদা, সঙের চাঁদা, গাজন, চড়ক, দুর্গোৎসব সব কিছুর জন্য চাঁদা। আর এই চাঁদা-আদায়কারীরা যেন গুড়ের নাগরির ওপরকার মাছি, কিছুতেই তাড়ানো যায় না।

প্রার্থীরা বিধুশেখরকে দেখে দণ্ডবৎ হলো। এদের থেকে একটু দূরে দাঁড়ানো লম্বা রাইমোহনকেই আগে চোখে পড়ে। খগরাজের ভঙ্গিতে সে হাত জোড় করে রয়েছে।

রামকমল সিংহ মারা যাবার পর রাইমোহন মাঝে মাঝেই এ বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছে। ব্যাপারটা বোঝেন বিধুশেখর। মোসাহেবী করাই রাইমোহনের পেশা, সে নতুন বাবু ধরতে চায়। কিন্তু রাইমোহনের পক্ষে এটা ভুল জায়গা, বিধুশেখর মোসাহেবদের নিয়ে সময় কাটানোকে মোটেই উৎকৃষ্ট আমোদের পন্থা বলে মনে করেন না। তাছাড়া, মোসাহেবরা তাঁর কাছে এসে মদের স্রোতেও ভাসতে পারবে না কিংবা মাগীবাড়িতে গিয়ে ফুর্তির অংশ পাবারও আশা নেই। শহরসুদ্ধ সকলেই জানে এর কোনোটাতেই রুচি নেই বিধুশেখর মুখুজ্যের। তবু রাইমোহন আসে কেন ?

বিধুশেখর তার উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন করলেন, কী হে, কী বার্তা ?

রাইমোহন বিগলিত হাস্যের সঙ্গে বললো, আজ্ঞে, আপনার কুশল সংবাদ নিতে এয়েচিলুম।

তাকে কোনো উত্তর না দিয়ে এবং অন্যদের প্রতি দৃকপাত না করে বিধুশেখর গম্ভীরভাবে এগিয়ে গেলেন দ্বারের দিকে। দ্বারওয়ানরা ঝুঁকে সেলাম জানালো, কোচম্যান ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলো, গাড়ি যুতবে কি না, বিধুশেখর হাত তুলে নিষেধ করলেন। তারপর পদব্রজেই চললেন সিংহ ভবনের

দিকে; তাঁর মন বলছে, ও বাড়িতে হয়তো কোনো বিপদ ঘটেছে।

বিধুশেখরের দীর্ঘ ঋজু চেহারা, লম্বা লম্বা পদক্ষেপে তিনি অল্পকালের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন ও বাড়িতে। দ্বারের কাছেই দেখা হলো দিবাকরের সঙ্গে। সে শুষ্ক মুখে বিধুশেখরের অপেক্ষাতেই যেন দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে বুকটা একবার কেঁপে উঠলো বিধুশেখরের, তিনি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, ছোট খোকা কেমন আছে? নবীন?

দিবাকর বললো, ভালো। সে গুরুমশাইয়ের কাচে পাঠ নিচ্চে!

—আর তোমাদের কর্তামা, তাঁর শরীর ভালো আচে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি তো এই মাত্তর গঙ্গাচ্চানে গেলেন!

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন বিধুশেখর। তিনি অকারণ দুশ্চিন্তা করছিলেন। সবই ঠিক আছে। তিনি গঙ্গানারায়ণ সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই করলেন না।

দিবাকর তবু কাঁচুমাচু মুখ করে বললো, বড়বাবু, আপনার সঙ্গে দুটো কতা ছেল! এই বুড়ো বয়েসে কি বউ ছেলে নিয়ে না খেয়ে মরবো? এই আপনাদের বিচার হলো?

বিধুশেখর বললেন, কেন, কী হয়েচে?

—সেই শিশুকাল থেকে এ বাড়ির অন্ন খেয়িচি, কত্তাবাবুদের সেবার কোনো তুরুটি করিনি, মাতার রক্ত জল করে খেটিচি।

বিধুশেখর ঈষৎ ধমক দিয়ে বললেন, ভণিতা না করে আসল কতাটা বল্।

দিবাকর সঙ্গে সঙ্গে বললো, আজ্ঞে গঙ্গাদাদা আমায় লুটিস দিয়েচেন। তিনি আমার চাকরি রাখবেন না। তিনি বলেচেন, এস্টেটের কাজে আমার আর দরকার নেইকো!

—কেন?

—আজ্ঞে আমি নাকি নিমোখহারাম! আমি অযোগ্য।

বিধুশেখর জানেন, দিবাকর নিমকহারামও নয়, অযোগ্যও নয়। সে চোর। তবে অতি বিশ্বাসী চোর। তার ওপর কোনো কাজের ভার দিলে সে ঠিকই সেটা উসুল করে আসবে, কিছু চুরিও করবে। আজকাল সব ব্যাটাই চোর, কিন্তু কাজ উসুল করতে জানে ক'জন? সবাই শুধু চুরি করতেই জানে। দিবাকরের মতন কাজের লোক আজকাল দুর্লভ।

—গঙ্গা তোকে ছাড়িয়ে দেবে বলেচে?

—আজ্ঞে ঠিক স্পষ্ট বলেননি। তবে ভাবখানা সেই রকম। শুনে তো আমি আকাশ থেকে পড়িচি। এতকাল সব হুকুম নিয়িচি আপনার কাচ ঠেঙে···মুখের কতাটি খসাতে না খসাতেই আমি···

দিবাকর অতি ধূর্ত। পিঁপড়ে যেমন আগে থেকে ঝড় বৃষ্টির ইঙ্গিত পায়, সেই রকম সে টের পেয়েছে যে বিধুশেখরের সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের একটি চূড়ান্ত সঙ্ঘর্ষ আসন্ন। এই সময় সে নিরপেক্ষভাবে দূরে থাকতে পারে না, লাভের অংশভাগী হতে গেলে আগে থেকেই তাকে যে-কোনো এক পক্ষে যোগ দিতে হবে। সব দিক বিচার করে সে বুঝেছে, বিধুশেখরের পক্ষে থাকাই সবচেয়ে শ্রেয় ও নিরাপদ। কূটকৌশলী বিধুশেখরের তুলনায় গঙ্গানারায়ণ নিতান্ত শিশু ছাড়া তো আর কিছুই নয়।

বিধুশেখর হেসে বললেন, তুই দু-চারদিন বাইরে ঘুরে আয় বরং। তোকে আমি ইব্রাহিমপুরের কুঠিতে পাঠাবো ভাবচিলুম। সেখানকার প্রজাদের একটু শায়েস্তা করতে হবে। দরকার হলে দু-চারটে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে পারবি না?

দিবাকর বললো, আজ্ঞে, আপনি যদি হুকুম করেন তাহলে আমি যমের বাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দিয়ে আসতে পারি।

দিবাকরের সঙ্গে কথাবার্তা আর বেশী দূর এগোলো না। বিধুশেখরের নিজস্ব ভৃত্য রঘুনাথ ছুটতে ছুটতে এসে একটা দুঃসংবাদ দিল। কৃষ্ণনগর থেকে একজন লোক এসেছে। সুহাসিনী গুরুতর রকমের অসুস্থ।

খবর শুনে বিধুশেখর একটুক্ষণের জন্য অনড়, স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বিপদ যে এই দিক থেকে আসবে, তা তিনি কল্পনাও করেননি। সকাল থেকে ডান নাকের নিশ্বাস দেখেই তাঁর মনে কু-ডাক ডেকেছিল। সুহাসিনী—তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা, তাঁর সবচেয়ে আদরের সন্তান···।

আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে আবার সজাগ হলেন বিধুশেখর। একটুও সময় নষ্ট করলে চলবে না—সুহাসিনীকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা যে করতেই হবে।
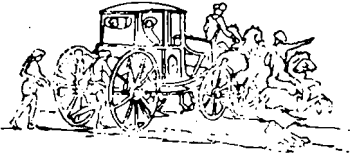
কৃষ্ণনগর কম দূরের পথ নয়। স্থলপথে যেতে অন্তত দু-দিন লেগে যাবে। তাছাড়া ঠ্যাঙাড়ে দস্যুদের উপদ্রবের আশঙ্কা আছে, রাত্রে পথ চলা দুষ্কর। নদীপথে কিছু অল্প সময় লাগতে পারে, কিন্তু বিধুশেখর নিজে নৌকোয় চড়তে ভয় পান। তাঁর কোষ্ঠিতে জলে ডোবা ফাঁড়ার উল্লেখ আছে।

বিধুশেখর তাঁর নিজের দুজন কর্মচারী এবং দিবাকরকে অগ্রিম রওনা করিয়ে দিলেন দ্রুতগামী ছিপ নৌকোয়, তারপর তিনি যাত্রা করলেন কয়েকজন পাইকবরকন্দাজসহ দুখানি জুড়িগাড়িতে। দুঃসংবাদ শুনে গঙ্গানারায়ণও তাঁর সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, বিধুশেখর বলেছেন, তার প্রয়োজন নেই, গঙ্গানারায়ণ কলকাতায় থেকে দুই পরিবারের দেখাশুনো করুক।

রুগ্ণা পত্নীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার কাজটি সহজ হয়নি। সৌদামিনী এখন একেবারে অবুঝের মতন হয়ে গেছেন, প্রতিদিন সকালে স্বামী সন্দর্শন না হলে তিনি আকুলি বিকুলি করেন। সুতরাং তাঁকে না জানিয়ে বিধুশেখর যেতে পারেন না। আবার সুহাসিনীর অসুখের কথা জানালেও সৌদামিনী এমন অস্থির হয়ে উঠবেন যে তখন তাঁকে বাঁচানোই শক্ত হবে। বিধুশেখর কলকাতা ছেড়ে যান ক্বচিৎ কদাচিৎ, মোকদ্দমার কারণে দু একবার বর্ধমান গিয়েছেন শুধু, সুতরাং হঠাৎ তাঁর বাইরে যাবার কারণটি সৌদামিনীকে বোঝাবেনই বা কী করে। সেই জন্য বিধুশেখরকে কিছু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছিল, তিনি সৌদামিনীকে বোঝালেন যে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ি থেকে তাঁর ডাক এসেছে একটি গুরুতর মামলায় তাঁর কাছ থেকে আইনের পরামর্শের জন্য। তিনি যেতে সম্মত হয়েছেন তার কারণ একযাত্রায় দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হবে। তাঁর জামাই কৃষ্ণনগরে তাঁদের বাড়িখানির ব্যবস্থা কতদূর কী করলো তাও দেখে আসা যাবে। তিনি নিজে উপস্থিত হলে কাজ ত্বরান্বিত হবে নিশ্চিত, তাহলে তিনি মেয়ে জামাইকে সঙ্গে নিয়েও ফিরতে পারেন।

সৌদামিনী এই কথায় প্রবোধ মেনে বলেছিলেন, বাড়ির কাজ শেষ হোক বা না হোক, আপনি সুহাসিনীকে সঙ্গে নিয়েই আসবেন। আমি আর কতদিন আচি কি না আচি, শেষবারের মতন তার মুখখানি যেন দেকে যেতে পারি।

বিধুশেখরের কাপড়-চোপড় গুছিয়ে দিয়েছিল তাঁর বড় মেয়ে নারায়ণী। কয়েক বছর আগে সেও কপাল পুড়িয়ে ফিরে এসেছে বাপের বাড়িতে।

নারায়ণী মৃদু স্বরে বলেছিল, বাবা, আমি কি আপনার সঙ্গে যাবো?

বিধুশেখর বলেছিলেন, না মা, তুই গেলে এ দিকে সব সামলাবে কে? তোর ওপরেই তো এখন সব ভার।

—তবু আমাদের কেউ একজন গেলে ভালো হতো। সুহাসিনী পোয়াতী।

—অ্যাঁ?

রাগে বিধুশেখরের মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে হয়েছিল। সুহাসিনী যে অন্তঃসত্ত্বা, সে কথা কেউ তাঁকে আগে বলেনি কেন? তাহলে কি তিনি সুহাসিনীকে কৃষ্ণনগরে পাঠাতেন? এ বাড়িতে কেউ তাঁকে কোনো কথা বলে না, সবাই শুধু ভয় পায়।

বিবাহ দেবার পর সুহাসিনীকে তিনি একদিনের জন্যও শ্বশুরালয়ে যেতে দেননি। এইজন্যই তিনি এবার অনেক দেখেশুনে গরীব ঘর থেকে একটি সচ্চরিত্র ছেলেকে জামাই করেছেন এবং বিবাহের আগেই শর্ত করে নিয়েছিলেন যে তাকে ঘরজামাই হতে হবে। সবই ঠিকঠাক চলছিল, তারপর মেয়ে নিজেই কৃষ্ণনগর বেড়াতে যাবার জন্য আবদার করলো। বিধুশেখর তখন ভেবেছিলেন, যাক ঘুরে আসুক, কৃষ্ণনগর স্বাস্থ্যকর জায়গা। তখন কেউ তাঁকে একবার বলতে পারেনি যে সুহাসিনী গর্ভবতী!

গাড়ি ছুটে চলেছে ঝমঝমিয়ে, বিধুশেখর ভেতরে বসে আছেন সোজা হয়ে চোখ বুজে। যেন ধ্যানমগ্ন। বিধুশেখরের অন্তরে একটিই চিন্তা, সুহাসিনীকে দেখতে পাবেন তো কৃষ্ণনগরে পৌঁছে! বাহকের হাতে যে পত্র এসেছে তাতে সুহাসিনীর কী অসুখ তা লেখা নেই। এখন শীতের সময়,

ওলাওঠার প্রকোপ এই সময় কম থাকে। ঐ রোগটিকেই ভয় সবচেয়ে বেশী, একদিনও সময় দেয় না। তবে আর কোন্ রোগ হতে পারে? রোগ নিশ্চয়ই সাঙ্ঘাতিক রকমের কিছু নইলে এমনভাবে জরুরী বার্তা আসবে কেন!

বিধুশেখরের সন্তান ভাগ্য বড় মন্দ। পুত্র তো জন্মালোই না, পাঁচটি কন্যার মধ্যে দুটি মারা গেছে, আর দুটি বিধবা। বড় মেয়ে নারায়ণীরও কোনো পুত্র সন্তান হয়নি, সে বিধবা হয়েছে তিনটি কন্যা সন্তান নিয়ে। বিধুশেখর প্রকাশ্যে স্নেহ-মমতা দেখান না, কিন্তু কনিষ্ঠা কন্যা সুহাসিনীর ওপর মনে মনে তিনি তাঁর সমস্ত স্নেহ উজাড় করে দিয়েছিলেন। কত আশা করেছিলেন সুহাসিনীর স্বামী দুর্গাপ্রসাদকে সব কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে তাঁর বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যাবেন। সুহাসিনীই যদি না বাঁচে, তাহলে আর দুর্গাপ্রসাদের কোনো মূল্য নেই তাঁর কাছে! তাহলে সব কিছু নবীনকুমারই পাবে।

দেশসুদ্ধ লোক জানে এবং চিরকাল জানবে যে নবীনকুমার রামকমল সিংহের সন্তান। সেটাই তো সত্য। অর্জুন চিরকাল নিজেকে পাণ্ডব বলেছে। সে কি কখনো ইন্দ্রপুত্র বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে? বিধুশেখর ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ মাত্রই দেবতার অংশ নিয়ে জন্মায়। কত নারী সন্তানের আশায় দেবতার কাছে বর মাগে। বিম্ববতীর একটি পুত্র সন্তানের জন্য বড় সাধ ছিল, বিধুশেখর সেই সাধটুকু পূর্ণ করে দিয়েছেন। এতে কুল রক্ষা হয়েছে, তাঁর বন্ধু রামকমল সিংহ তৃপ্তির সঙ্গে শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন, এর চেয়ে বড় পুণ্যকর্ম আর কী হতে পারে। নিছক ভোগ লালসার দৃষ্টিতে বিম্ববতীকে কখনো দেখেননি বিধুশেখর, শুধুমাত্র সন্তান জন্মের প্রয়োজনেই তিনি সহবাস করেছেন বিম্ববতীর সঙ্গে এবং নবীনকুমারের জন্মের পর আর একবারও তিনি বিম্ববতীকে শয্যাসঙ্গিনী হবার জন্য আহ্বান জানাননি। এখন বিম্ববতী বিধবা, আর তো সে প্রশ্নই ওঠে না।

কৃষ্ণনগর যাত্রার প্রাক্কালে নিজ স্ত্রী সৌদামিনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছেন বিধুশেখর, কিন্তু বিম্ববতীর সঙ্গে একবার দেখাও করে আসতে পারেননি। বিম্ববতী লোকমুখে সংবাদ পাবেন যে বিধুশেখর শহরে নেই। তাতে কী বিম্ববতীর ক্ষীণতম অভিমানও হবে না?

গাড়ি হঠাৎ থেমে যেতেই বিধুশেখর বাইরে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, থামলি কেন? ব্যাটারা শীগগির চল!

ওপর থেকে একজন পাইক বললো, হুজুর কোম্পানীর ফৌজ আসছে!

বিধুশেখর বিউগিলের শব্দ শুনতে পেলেন।

কোম্পানীর সিপাইরা মার্চ করে আসছে, এখন পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হবে। বিধুশেখরের গাড়ি নেমে গেল একটা মাঠের মধ্যে। বিধুশেখর দেখলেন প্রায় সহস্রাধিক পদাতিক ও অশ্বারোহী, এরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অনেকখানি সময় নষ্ট হলো।

সামনে মাত্র দশ বারো জন গোরা সৈন্য, বাকি সবই দেশী সেপাই। বিখ্যাত বেঙ্গল রেজিমেণ্ট। কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত সবাই এই বেঙ্গল রেজিমেণ্টের নামে ভয়ে কাঁপে। দেশে এখন যুদ্ধবিগ্রহ নেই, সর্বত্রই শান্ত অবস্থা তবু কোম্পানির সৈন্যবাহিনী মাঝে মাঝেই পথ পরিক্রমা করে। শান্তি বজায় রাখার জন্য মাঝে মাঝে শক্তি সামর্থ্যের প্রদর্শন করা বৃটিশ জাতির রণকৌশলের একটি অঙ্গ। রেজিমেণ্টে অবশ্য বাঙালী নেই, সিপাহীরা সকলেই পশ্চিমী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতীয়। বাঙালী জাতি যুদ্ধবিদ্যা ভুলে গেছে। কলকাতায় রাজধানী স্থাপন করার পর, সেই রাজধানীকে সুরক্ষিত করার জন্য ইংরেজরা বাঙালীদের হাত থেকে তলোয়ার-বন্দুক কেড়ে নিয়ে তার বদলে কলম ধরিয়ে দিয়েছে।

বিধুশেখর মুগ্ধভাবে তাকিয়ে রইলেন সৈন্যবাহিনীর দিকে। কী সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে চলেছে সিপাহীরা। ইংরেজ জাতির শিক্ষার কী গুণ, দশ-বারোজন মাত্র গোরা সৈন্যের হুকুমে সহস্র সহস্র দেশী সৈন্য নীরবে মাথা নীচু করে চলে। বিধুশেখর তাঁর ঠাকুর্দার মুখে গল্প শুনেছেন যে সেকালে নবাবী ফৌজকে আসতে দেখলেই গ্রামে-জনপদে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তো। বিনা প্ররোচনায় লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ ও হত্যা ছিল নবাবী ফৌজের ব্যসন। সে অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য কোথাও নালিশ জানাবারও উপায় ছিল না। তাই নবাবী ফৌজকে আসতে দেখলেই সবাই বনে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঈশ্বরকে ডাকতো। সেই তুলনায় ইংরেজ জাতি কত ভদ্র, সভ্য। কোম্পানির ফৌজ কখনো অকারণে লুঠপাট করে না। বরং কোম্পানির ফৌজ যে পথ দিয়ে যায়, সে অঞ্চলে আর বহুদিন চোর-তস্করের উপদ্রব থাকে না।

ফৌজী কলম ছেড়ে একজন গোরা অশ্বারোহী ছুটে এলো বিধুশেখরের গাড়ির দিকে। জুড়ি ঘোড়ার

একটির গায়ে এক ঘা চাবুক কষিয়ে সে জিজ্ঞেস করলে, সাইস, ভিতরে কে আছে ? জেনানা না মর্দানা ?

বিধুশেখর মুখ বাড়িয়ে বললেন, আই অ্যাম স্যার।

গোরা সৈনিকটি বয়েসে অতি তরুণ, দুপুরের রৌদ্রে মুখখানি টকটকে লাল। সে আবার শূন্যে চাবুকের শব্দ করে বললো, তুমি কৌন মহারাজা আছো ? কম্পানির ফৌজ যাইতেছে, নামিয়া দাঁড়াও নাই কেন ?

গোরা সৈনিকের দুর্বোধ্য ভাষণ বিধুশেখর ঠিক বুঝতে পারলেন না। তবু দ্রুত নেমে এসে একটি সেলাম ঠুকলেন।

গোরা সৈনিক জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে ?

বিধুশেখর বললেন, বিধুশেখর মুখুজ্যে স্যার, লা ইয়ার, স্যার ; প্র্যাকটিস ইন সিভিল কোর্ট স্যার !

—উষ্ণীব খোলো, কুক্কুরীর সন্তান !

বিধুশেখর পুরোপুরি আইনজীবীর বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে বেরিয়েছিলেন। চোগা চাপকান ও মাথায় পাগড়ি। তিনি দেখলেন যে অন্য গাড়ির পাইক বরকন্দাজরা আগেই গাড়ি থেকে নেমে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পায়ের কাছে রেখে হেঁট মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে। বিধুশেখর বাইরে বেরোন কম, আগে কখনো কোম্পানির ফৌজের সামনে পড়েননি, তাই এ সব নিয়ম কেতা জানেন না।

তিনি তাড়াতাড়ি পাগড়ি খুলে সাহেবটিকে আবার সেলাম জানালেন।

অশ্বারোহী সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে ধুলো উড়িয়ে আবার ছুটে গেল। কী অপূর্ব দার্ঢ্যময় তেজীয়ান তার ভঙ্গি, যেন চোখের নিমেষে সে আবার ফিরে গিয়ে মিশে গেল মূল বাহিনীর সঙ্গে।

যতক্ষণ ওদের দেখা যায় ততক্ষণ বিধুশেখর এক হাতে পাগড়ি নিয়ে অন্য হাতে সেলামের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। এ জন্য তিনি ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত বোধ করলেন না। ইংরেজ এদেশে শান্তি ও ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে। তার বিনিময়ে এইটুকু সম্ভ্রম তো তারা দাবি করতেই পারে। রাজার জাতি হিসেবে শক্তিমান ইংরেজের প্রতি বিধুশেখরের রীতিমতন শ্রদ্ধাই আছে, কিন্তু তারা যখন ম্লেচ্ছ শিক্ষা প্রবর্তন কিংবা এ দেশের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করে, সেগুলিই শুধু বিধুশেখর সহ্য করতে পারেন না।

কোম্পানির ফৌজের জন্য দেড় ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করার পর বিধুশেখর আবার যাত্রা শুরু করলেন। এরপর আর কোন বিঘ্ন ঘটলো না। পথে একস্থানে রাত্রিবাস করে কৃষ্ণনগর পৌঁছোলেন পরদিন দ্বিপ্রহরে।

নিজেদের বাড়িতে এসে বিধুশেখরের প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার মতন অবস্থা হলো। তাঁর কন্যা সুহাসিনী তখনো বেঁচে আছে বটে কিন্তু একেবারে যেন শেষ অবস্থা এবং তার স্বামী দুর্গাপ্রসাদও সমানভাবে পীড়িত। তাদের দুজনেরই কালাজ্বর হয়েছে।

দিবাকররা আগেই পৌঁছে গিয়ে চিকিৎসাপত্রের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছে বটে, কিন্তু আশা খুব কম। কালাজ্বর যেন সাক্ষাৎ কালান্তক যম, একবার ছুঁলে আর নিস্তার নেই। যশোর বা খুলনার দিকে হাজার হাজার লোক এই ব্যাধিতে মারা যাচ্ছে, এখন সেই রোগ কৃষ্ণনগরেও এসে উপস্থিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই কালাজ্বরের কালগ্রাসে পতিত হয়েছে বেশ কয়েকজন।

বিধুশেখর যেন উন্মত্তবৎ হয়ে উঠলেন। এ জীবনে তিনি মৃত্যু কম দেখেননি। মৃত্যু তো জীবের অমোঘ ভবিতব্য, যার যখন যাবার কথা যেতেই হবে। কিন্তু বিধুশেখর যেন কিছুতেই তাঁর প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যা আর তার স্বামীর বিয়োগ যন্ত্রণা সইতে পারবেন না। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিল, সেই দেওয়ানজীকে ধরে রাজবাড়ির চিকিৎসককে তিনি আনাবার ব্যবস্থা করলেন। এখানকার একজন পাদ্রীর সুচিকিৎসক হিসেবে সুনাম আছে, তাঁকেও নিয়ে এলেন কাকুতি মিনতি করে। এমনকি এক মৌলভি হেকিমী চিকিৎসককেও নিয়ে আসা হলো। পালা করে দেখতে লাগলেন তাঁরা তিনজনে। কেউই সুনির্দিষ্ট ভরসা দিতে পারছেন না। তবু যেন চলতে লাগলো যমে মানুষের লড়াই।

বিধুশেখর আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন। পাশাপাশি দুই শয্যায় শুয়ে আছে সুহাসিনী ও দুর্গাপ্রসাদ। তাদের শিয়রের কাছে আসন নিলেন বিধুশেখর। মাঝে মাঝেই তিনি একবার সুহাসিনী একবার দুর্গাপ্রসাদের মুখের কাছে মুখ ঝুঁকিয়ে এনে উদ্‌গ্রীবভাবে চেয়ে থাকেন, যদি কেউ কোনো কথা বলে। কিন্তু দুজনেরই বাক্‌রোধ হয়ে গেছে।

সেই রাত কেটে গেল, পরের দিনেও একই অবস্থা। দুজনেরই যেন মৃত্যুর রঙ মাখা পাণ্ডুর মুখ,

সামান্য নাড়ীর স্পন্দনে শুধু তাদের জীবনের স্পন্দন টের পাওয়া যায়। কবিরাজী, ইংরাজী ও হেকিমী এই তিন প্রকার ওষুধের তীব্র ঝাঁঝেই সম্ভবত তাদের প্রাণপাখি খাঁচা ছেড়ে বেরুতে পারছে না। তবে আর একটা রাত কাটবে কী না সন্দেহ।

সেই রাতে, রোগীদের ঘরে একা একা ঠায় বসে থেকে এক সময় বুঝি বিধুশেখরের তন্দ্রা এসে গেল। তিনি নিজেও সেটা বুঝতে পারলেন না। তাঁর ধারণা, তিনি তখনো জেগে আছেন।

বিধুশেখর দেখলেন, হঠাৎ সমস্ত ঘর এক দিব্য আলোয় ভরে গেল, এক স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত হলো সেই বন্ধ ঘরের বাতাস। তারপর আস্তে আস্তে ফুটে উঠলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ।

বিধুশেখর মনে করলেন, এই বুঝি যমরাজ। স্বয়ং এসেছেন তাঁর কন্যা জামাতাকে নিয়ে যেতে।

তিনি হাতজোড় করে বললেন, প্রভু, দয়া করুন, যদি সারা জীবনে কিছু সৎ কর্ম করে থাকি, তবে তার বিনিময়ে এই দুজনের প্রাণ ভিক্ষা দিন।

তখন সেই মূর্তি বললেন, বিধু, চেয়ে দ্যাখো।

বিধুশেখর ভালো করে দেখে তাঁর ভ্রম বুঝলেন। ইনি তো যমরাজ নন, ইনি তো স্বয়ং জনার্দন, চার হাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, মুখে মায়া-রহস্য-কৌতুক মেশা হাসি। ঠিক বিধুশেখরের গৃহদেবতার বেশে ইনি এসেছেন। তখন অপূর্ব এক পুলকে বিধুশেখরের শরীর রোমাঞ্চিত হলো। তাঁর জীবন আজ ধন্য। জগৎপতি জনার্দন তাঁকে দেখা দিয়েছেন, আজ এই সঙ্কটের রাত্রে, তবে তো আর ভয় নেই।

বিধুশেখর আচ্ছন্নের মতন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। পুনর্বার মাথা তুলতে তাঁর ভয় হলো। যদি সেই মূর্তি আর দেখতে না পান।

তবু, মুখ তুলে দেখলেন। সেই মূর্তি সেই রকমই স্ফুরিত হাস্যে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন।

বিধুশেখর বললেন, হে গিরিধারী, মধুকৈটভহারি, দয়াল, দীনবন্ধু, আমায় ভিক্ষা দিন!

জ্যোতির্ময় পুরুষ বললেন, আমি তো দিতেই এসেছি।

বিধুশেখর বললেন, আমার প্রাণসম কন্যা, আমার জামাতা—

যে হাতে পদ্ম ধরা, সেই হাতের একটি আঙুল দেখিয়ে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ বললেন, একজন!

বিধুশেখর বুঝতে পারলেন না। হতবুদ্ধির মতন তাকিয়ে রইলেন।

সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ আবার বললেন, যে কোনো একজন। তুমি বেছে নাও, আমি যে কোনো একজনের প্রাণভিক্ষা দেবো!

বিধুশেখরের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো। তিনি কোনো কথাই আর বলতে পারলেন না। যে কোনো একজন? তিনি কার প্রাণভিক্ষা চাইবেন? সুহাসিনীর? কিন্তু দুর্গাপ্রসাদ?

বিধুশেখর দেখলেন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের দেহটি যেন দীপশিখার মতন একটু একটু কাঁপছে। হয়তো এখুনি আবার মিলিয়ে যাবেন।

বিধুশেখর ক্রন্দন মিশ্রিত ব্যাকুল গলায় বললেন, প্রভু, আমার পুত্র নেই, এই জামাতাই আমার পুত্রের স্থান নিয়েছে, আর সুহাসিনী আমার দুই নয়নের মণি, তাকে ছেড়ে আমি...তার গর্ভধারিণীও আর বাঁচবেন না—

জ্যোতির্ময় পুরুষের মূর্তিটি আরও বেশী কাঁপছে। সত্যিই বুঝি মিলিয়ে যাবার আর দেরী নেই। জলদগম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, একজন!

মুহূর্তে মনস্থির করে ফেললেন বিধুশেখর। সুহাসিনীর মাত্র তের বৎসর বয়েস, দুর্গাপ্রসাদ মারা গেলে তার সামনে পড়ে থাকবে দীর্ঘ বৈধব্য জীবন। কন্যাদের বৈধব্য দশা দেখে দেখে আর বিধুশেখর সহ্য করতে পারছেন না, বিধবা অবস্থায় সুহাসিনী যদি ভ্রষ্টা হয়, যদি কুলে কালি দেয়, তাহলে ইহকাল পরকাল সব যাবে। দুর্গাপ্রসাদ পুরুষ মানুষ, পত্নী বিয়োগের দুঃখ সে সামলে উঠতে পারবে, সে বুদ্ধিমান, কৃতবিদ্য, এক জীবনে তার আরও অনেক কিছু পাবার থাকবে। কিন্তু সুহাসিনীর যে কিছুই থাকবে না।

বিধুশেখর বললেন, দুর্গাপ্রসাদ—

জ্যোতির্ময় পুরুষ সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেলেন। সেই দিব্য আলো ও দিব্য সৌরভও অন্তর্হিত হলো। প্রদীপের মৃদু আলোক ও ধোঁয়ায় মাখা ঘরখানি আগেকার চেহারা ফিরে পেল আবার।

বিধুশেখর যেন এই অন্তর্ধান সহ্য করতে পারলেন না। আর একবার দর্শন পাবার বাসনায় ছুটে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। প্রভু প্রভু বলে চিৎকার করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ে গেলেন হুড়মুড়িয়ে।

নীচতলায় দিবাকর ও অন্য লোকজনরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো শব্দ শুনে। তারা দেখলো, বিধুশেখর বাহ্যজ্ঞানহীন। তাঁকে ধরাধরি করে এনে শুইয়ে দেওয়া হলো একটি খাটে। একজন ছুটে গেল রাজবৈদ্যকে ডেকে আনতে। অন্যরা বিধুশেখরের মাথায় জল ঢালতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর বিধুশেখরের চৈতন্য হলো কিন্তু কোনো কথা বলতে পারলেন না। শুধু মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ বার করতে লাগলেন। সবাই মনে করলো, বিধুশেখরকে ওলায় ধরেছে। ঘুমের মধ্যে অনেক সময় এরকম হয়।

বিধুশেখরকে জোর করে তুলে বসিয়ে দুজনে দুদিকে চেপে রইলো আর দিবাকর ওঁর কানে রাম নাম শোনাতে লাগলো।

এক সময় বিধুশেখর পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পেলেন। স্বাভাবিক স্বরে বললেন, আমায় ধরে আছিস কেন ? ছেড়ে দে !

তারপরই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে দিবাকরকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ওরে, আমি কী দেকলুম ! আমি কী দেকলুম !

কঠোর ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বিধুশেখরকে এইভাবে কাঁদতে কেউ কখনো দেখেনি। সুহাসিনীর ঠিক আগের বোনটিরও তো মৃত্যু হয়েছে বিধুশেখরের সামনেই, তখনো তো এমন দুর্বল হয়ে পড়েননি তিনি।

রাজবৈদ্য যখন এলেন, তখনই বিধুশেখর আপনমনে অশ্রুপ্লুত কণ্ঠে বারবার বলে যাচ্ছেন, আমি কী দেকলুম ! আমি কী দেকলুম !

রাজবৈদ্য ওপরে এসে পরীক্ষা করে বুঝলেন, সুহাসিনী ও দুর্গাপ্রসাদের অবস্থা একই রকম আছে। দুজনেরই এখনো নাড়ীর স্পন্দন পাওয়া যায়। তাহলে বিধুশেখর হঠাৎ এত কান্নাকাটি করছেন কেন ?

দেবতাদের কী অপূর্ব লীলা ! মানুষকে যে তাঁরা কত রকম পরীক্ষায় ফেলেই দেখতে চান, তার আর কোনো ইয়ত্তা নেই।

পরদিন সকালেই দুর্গাপ্রসাদ মারা গেল এবং সুহাসিনী ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো। দু দিনের মধ্যেই সুহাসিনীর মৃত্যু আশঙ্কা কেটে গেল একেবারে। সে যে ইতিমধ্যে বিধবা হয়ে গেছে তা সে জানতেও পারেনি !

বিধুশেখর একেবারে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। এ কী হলো ? তিনি তো দুর্গাপ্রসাদেরই জীবন ভিক্ষা চেয়েছিলেন। তবে কি সেটা তাঁর মনের কথা ছিল না ? সর্বজ্ঞ ভগবান কি তাঁর মনের কথা বুঝেই বিপরীত বর দিয়ে গেলেন ? কিন্তু গর্ভবতী অবস্থায় বিধবা হয়ে সুহাসিনী দীর্ঘ বিড়ম্বিত জীবন নিয়ে কী করবে ? বালবিধবার পক্ষে মৃত্যুই যে আশীর্বাদ।

সুহাসিনী তখনও শয্যাশ্রিতা, উঠে দাঁড়াবার মতন পায়ের জোর পায়নি, সেই অবস্থাতেই তার হাতের শাঁখা ভেঙে, সিঁথের সিঁদুর মুছে দেওয়া হলো। কৃষ্ণনগরের স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি পরামর্শ দিয়েছিলেন, আর কয়েকটা দিন যাক, রুগ্‌ণা মেয়েটিকে এখনই এমন নিদারুণ শোক সংবাদ জানাবার দরকার নেই।

কিন্তু বিধুশেখর এমন অনাচার হতে দিতে পারেন না। স্বামীর শবদেহ দাহ করা হয়ে গেছে। তার পরেও কোনো হিন্দু রমণী শাঁখা সিঁদুর পরে থাকতে পারে না। সেকালের মুনি-ঋষিরা মূর্খ ছিলেন না। তাঁরা যা নির্দেশ দিয়ে গেছেন, অনেক ভেবেচিন্তেই দিয়েছেন। একজনের পাপে সমগ্র সমাজ ছারেখারে যেতে পারে। ঠাকুর যখন পরীক্ষায় ফেলেছেন, তখন সব কিছু জেনেই বিধুশেখরকে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করতে হবে। সত্যিকারের পুরুষকার যদি থাকে, তাহলে নিয়তির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, কোনো কিছুতেই ভয় পেলে চলবে না। বিধুশেখর ভয় পান না।

গলায় জোর নেই, তাই সুহাসিনী ডুকরে কাঁদতে পারলো না। ওষ্ঠ দংশন করে সে চোখের জলে বালিশ ভেজাতে লাগলো। মাত্র তের বৎসর বয়েস হলেও বৈধব্য যন্ত্রণা কী বস্তু, তা সে জানে। সে তার দিদি বিন্দুবাসিনীকে দেখেছে।

কন্যাকে নিয়ে আড়াই মাস কাল কৃষ্ণনগরেই থেকে গেলেন বিধুশেখর। চিকিৎসকের নির্দেশ মতন তখনও সুহাসিনীকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া চলে না। অনেক প্রয়োজনীয় কাজ থাকা সত্ত্বেও বিধুশেখর ফিরতে পারলেন না। কন্যাকে কার ভরসায় রেখে যাবেন ? কলকাতার সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদান চলে নিয়মিত। তাঁর পত্নী সৌদামিনী এখন একটু সুস্থই আছেন। দুর্গাপ্রসাদের মৃত্যু সংবাদ তাঁকে জানানো হয়নি।

তারপর এক রাত্রে সুহাসিনীর প্রসব বেদনা উঠলো। এবং যথা সময়ে সে জন্ম দিল একটি পুত্রসন্তানের। পুত্র! প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর বিধুশেখরের বংশে এই প্রথম পুত্র সন্তান এলো। আর এই পুত্রটি গর্ভে থাকা অবস্থায় বিধুশেখর তাঁর কন্যার মৃত্যু কামনা করেছিলেন।

সেকথা চিন্তা করেই বিধুশেখর শিহরিত হলেন।

সেই লাজুক স্বল্পভাষী কিশোরটি আর নেই। এক সময় যার উপস্থিতিই টের পাওয়া যেত না এই গৃহে। এখন গঙ্গানারায়ণ বলিষ্ঠকায় রাশভারী যুবা। তার গৌরবর্ণ মুখে শ্যামল কোমল গুম্ফ দাড়ি গজিয়েছে কিছু কিছু। তার গুম্ফটি যদিও এখনো সুবিন্যস্ত করার মতন স্বাস্থ্যবান হয়নি, তবু কারুর সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে কথা বলবার সময় সে তার নরম গুম্ফের একপ্রান্ত পাকাবার চেষ্টা করে যায়।

এখন আর সহাধ্যায়ী বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে কালক্ষেপণ করে না গঙ্গানারায়ণ। সকালে কাছারিঘরে সে নিজে উপস্থিত থেকে গোমস্তা কর্মচারিদের নানাপ্রকার কাজের নির্দেশ দেয়। তারপর আহারাদি সম্পন্ন করে সে তাদের তিনটি হৌস পরিদর্শনে যায়, তার কোটের পকেটে একটি ঘড়ি থাকে, কোনোদিন সে এক মিনিটও সময়ের ব্যত্যয় করে না। কোনো কোনো দিন সন্ধ্যাকালেও ব্যবসায় কার্যের পরামর্শের জন্য বাড়িতে লোকজন আসে, তাদের সঙ্গে গঙ্গানারায়ণ অনেক রাত পর্যন্ত নিযুক্ত থাকে। বিধুশেখরও উপস্থিত থাকেন সেখানে আর মাঝে মাঝেই তাঁর সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের তর্কদ্বন্দ্ব বেঁধে যায়।

অবশ্য তার ভিতরের রোমান্টিক, আবেগপ্রবণ মনটি এখনো রয়ে গেছে, এখনো সে বিরলে গ্রন্থপাঠ করতে করতে অশ্রু বিসর্জন করে। তার স্ত্রী লীলাবতী অধিকাংশ সময়ই থাকে পিত্রালয়ে। লীলাবতীর বালিকা স্বভাব আর ঘুচলো না, বাবা-মা ও পুতুল খেলার সঙ্গিনীদের ছেড়ে সে এখনো বেশী দিন থাকতে পারে না, নানান ছুতো দেখিয়ে তো প্রায়ই বাগবাজারে বাপের বাড়ি চলে যায়। গঙ্গানারায়ণ অবশ্য এজন্য কোনোদিনই আপত্তি জানায়নি, লীলাবতী সম্পর্কে তার মনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ জাগেনি। নিজের কক্ষে একাকী গঙ্গানারায়ণ এক একদিন দীপের আলোকে পুস্তক পাঠ করতে করতে সারারাত্রি জেগে কাটিয়ে দেয়।

ইদানীং সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে তার আগ্রহ জেগেছে, ইংরেজী কাব্যগুলির পাশাপাশি সে সংস্কৃত কাব্যগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে পড়ে। তবে, সংস্কৃত কাব্যগুলিতে শৃঙ্গার রসের বড় আধিক্য, পড়তে পড়তে তরুণ গঙ্গানারায়ণের কর্ণমূল আরক্ত হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে বই মুড়ে রেখে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকে। সেই সব গভীর নির্জন মধ্যরাত্রে বিন্দুবাসিনীর কথা তার মনে পড়ে যায়, তার অন্তরের মধ্যে সে যেন শুনতে পায় ঝড়ের গর্জন। সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে তার আর কোনোদিন দেখা হবে না!

প্রায় সকালে গঙ্গানারায়ণের ঘুম ভাঙে এক কচি সুরেলা কণ্ঠে সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ শুনে। নবীনকুমারের বয়েস এখন আট বছর, সে জেগে ওঠে অতি প্রাতে এবং দ্বিতলের বারান্দায় ঘুরে ঘুরে উচ্চকণ্ঠে স্তোত্র পাঠ করে। আশ্চর্য এই বালকের স্মৃতিশক্তি, এতটুকু বয়েসেই সে মহাভারতের কঠিন কঠিন শ্লোক কণ্ঠস্থ করে ফেলেছে। তার মেধা দেখে সকলেই চমৎকৃত। বিম্ববতী নবীনকুমারকে চোখের আড়াল করতে চান না বলে এখনও নবীনকুমারকে কোনও বিদ্যালয়ে পাঠানো হয় না, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ তার কনিষ্ঠ ভ্রাতার শিক্ষার জন্য ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি করেননি। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ থেকে বাছাই করা তিনজন ছাত্রকে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে, তাঁরা নবীনকুমারকে সংস্কৃত, ইংরেজী ও অঙ্ক শিক্ষা দেন। এ ছাড়া নবীনকুমারের সঙ্গীত প্রীতি লক্ষ্য করে এক ওস্তাদজীকেও মাসোহারার বন্দোবস্তে রাখা হয়েছে বাড়িতে, তাঁর কাছ থেকে নবীনকুমার কণ্ঠ সঙ্গীতের তালিম নেবে। ভিখারি বৈরাগীদের গান শুনলেই নবীনকুমার ঠিক ঠিক শিখে নেয়, যে-সব গানের কথার অর্থ তার একেবারেই বোঝার কথা নয়, সেগুলিও সে বেশ ভাব দিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গায়। মাঝে মাঝে সে তার মায়ের সামনে নানাপ্রকার নাট্য রঙ্গ করেও দেখায়, কোথা থেকে যে সে

এসব শেখে, কে জানে !

নবীনকুমার তার দাদা গঙ্গানারায়ণকে বড় ভালোবাসে। নবীন কিছু নতুন পাঠ শিখলেই সেটি তার দাদাকে শোনানো চাই। গঙ্গানারায়ণ ঘুম থেকে উঠেই নবীনকুমারকে নিজের ঘরে ডেকে আনে। আদর করে তাকে পাশে বসিয়ে নবীনকুমারের নবলব্ধ জ্ঞানের পরীক্ষা করে।

গঙ্গানারায়ণ জিজ্ঞেস করে, গাড মানে কী ?

নবীন বলে, ঈশ্বর !

গঙ্গানারায়ণ আবার বলে, লার্ড ?

নবীন বলে, প্রভু।

তারপর নবীন নিজেই গড় গড় করে হাততালি দিতে দিতে বলে, আমি ফিলজফর মানে জানি ! বিজ্ঞলোক। আর প্লৌম্যান মানে চাষা !

নবীনেতে আর গঙ্গানারায়ণে এই সখ্য বিধুশেখরের চক্ষুশূল। গঙ্গানারায়ণ বেয়াদপী শুরু করলেও বিধুশেখর জানেন, একদিন নবীনকুমারকে দিয়েই তিনি এ গৃহ থেকে গঙ্গানারায়ণকে উৎখাত করাবেন। এর জন্য প্রয়োজন শুধু অপেক্ষা। নবীনকুমার আর একটু বড় হোক, তখন বিধুশেখর দেখবেন গঙ্গানারায়ণের দর্প কীভাবে ভাঙতে হয়।

বিম্ববতী এক অপরাহ্ণে ডেকে পাঠালেন গঙ্গানারায়ণকে। সকালবেলা বিম্ববতী যখন তাঁর পোষা পাখিদের ছোলা খাওয়ান তখন একবার গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। গঙ্গানারায়ণ এসে জননীকে প্রণাম করে, দু-একটি কুশল বাক্য বিনিময় হয় তখন। বৈষয়িক ব্যাপারে কোনো আলোচনা থাকলে দিনের অন্য সময়ে গঙ্গানারায়ণ নিজেই খবর পাঠিয়ে বিম্ববতীর কাছে যায়। অপরাহ্ণে বিম্ববতী স্বয়ং যখন এত্তেলা পাঠিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই কিছু গুরুতর ব্যাপার আছে।

অবশ্য ব্যাপারটি তেমন কিছু গুরুতর নয়।

গঙ্গানারায়ণ এসে মায়ের পদধূলি নিয়ে নত মস্তকে দাঁড়াবার পর বিম্ববতী বললেন, বাগবাজার থেকে তত্ত্ব এয়েচে আজ, তুই শুনিচিস ?

গঙ্গানারায়ণ একটু বিমূঢ় বোধ করলো। বাগবাজারে তার শ্বশুরালয়। তত্ত্ব সেখান থেকেই এসেছে মনে হয়। কিন্তু একথা তাকে জানাবার কী আছে ? তত্ত্ববাহিকারা বড় বড় পরাতে নানাপ্রকার জিনিস সাজিয়ে অন্দরমহলেই চলে আসে এবং গৃহকর্ত্রীর কাছ থেকেই তারা দক্ষিণা পায়। এসব মেয়েমহলের ব্যাপার, গঙ্গানারায়ণ মাথা ঘামাতে চায় না।

গঙ্গানারায়ণ শুষ্ক কণ্ঠে বললো, ও !

বিম্ববতী হেসে ফেলে বললেন, ও কী ? তুই এর মর্ম বুজলিনি ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, তত্ত্বের আবার মর্ম কী মা ?

বিম্ববতী বললেন, পালা-পার্বণ কিচু নেই। জামাইষষ্ঠী নয়, তিলষষ্ঠী নয়, সংক্রান্তি নয়, দধিমুখ নয়, হঠাৎ অমনি অমনি তত্ত্ব পাঠালে ? তুই এটাও বুজিস না ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, দ্যাখো গে ও বাড়িতে বোধহয় কোনো ব্রত-ট্রত আচে—

—না রে না। বেয়ান আমায় ঠেস দিয়েচে ! ছ' মাস হয়ে গ্যালো, লীলাবতীকে আমরা ও বাড়ি ঠেঙে আনিনি, তুই একবার খোঁজ নিতেও যাসনি, তাই তত্ত্ব পাঠিয়ে বেয়ান আমাদের মনে করিয়ে দিলে।

—ও !

—আবার ও ! একটা ব্যাবোস্তা কর। ওঁরা বারো মাতা তত্ত্ব পাঠিয়েচে, আমি কালই ষোলো মাতা পাটাচ্চি, জনার্দন আর দেবীপদকে বলিচি ভালো সন্দেশ আর দশসেরি রুই মাচ জোগাড় করতে, তারপর পরশুদিন তুই গিয়ে লীলাকে নিয়ে আয় গে যা।

গঙ্গানারায়ণ উদাসীনভাবে বললো, আমি যে এখন বড়ই কাজে ব্যস্ত মা, আমি তো যেতে পারবো না, অন্য কারুকে পাঠিয়ে দাও।

—তা কি হয় ? তোকে নিজে যেতে হয়। তুই একেবারে শ্বশুরবাড়িমুখো হতে চাস না কেন ?

—আমায় যেতে গেলে অনেক দেরি হবে। এ মাসে সময় হবে না।

বিম্ববতী গঙ্গানারায়ণের পিঠে তাঁর সস্নেহ হাতটি রেখে বললেন, যা একবারটি ঘুরে আয়। এই তো বাগবাজার, কতটুকুই বা রাস্তা ! তোর শ্বশুরবাড়ি অত বড় মানী বংশ, তুই নিজে না গেলে তাঁরা মেয়ে পাঠাবেনই না। লীলাকে এত বেশী দিন বাপের বাড়ি ফেলে রাখা ভালো দেকায় না। তুই এই

একবারটি যা, আর যেতে হবে না। পুরুষমানুষের বেশী শ্বশুরবাড়ি না যাওয়াই ভালো...এই দ্যাক না, তোর বাবা...বিয়ের পর সেই যে আমি এয়িচিলুম, আর কোনোদিন বাপের বাড়ি চক্ষে দেকিনি, আমায় যেতে দিলেন না, উনিও কখনো গেলেন না।

অকস্মাৎ রামকমল সিংহের প্রসঙ্গ এসে পড়ায় বিম্ববতী চক্ষে আঁচল দিলেন।

মায়ের অনুরোধ ঠেলতে পারলো না গঙ্গানারায়ণ, বাগবাজার থেকে লীলাবতীকে নিয়ে আসতে হলো তাকে। এবার যেন সে লীলাবতীর বেশ খানিকটা পরিবর্তন দেখতে পেল। এই কয়েক মাসেই অনেকখানি লম্বা হয়ে গেছে লীলাবতী, মুখের চামড়ায় চিক্কণ ভাব এসেছে, হাত ও পায়ের গড়নে সুডৌল ভাব, বালিকাসুলভ চাপল্যের বদলে তার ব্যবহারে এখন লাজুকতাই বেশী। এর আগে লীলাবতীকে তেমনভাবে লক্ষ্য করার কোনো সুযোগই হয়নি গঙ্গানারায়ণের। লীলাবতীর সঙ্গে সারাদিন তার দেখাই প্রায় হয় না, রাত্রে যখন সে শুতে আসে ততক্ষণে লীলাবতী ঘুমে বিভোর। এবারও গঙ্গানারায়ণ তার স্ত্রী সম্পর্কে বিশেষ কোনো আগ্রহ বোধ করলো না। মায়ের আদেশে স্ত্রীকে সে এনেছে, এখন মা-ই ওর ভার নেবেন।

এক সকালে নবীনকুমার তার দাদার কাছে নালিশ জানাতে এলো। বড় বৌঠান পড়াশুনোয় বড়ই অমনোযোগী। সে এত চেষ্টা করছে, তবু বড় বৌঠান কিছুতেই পড়বে না।

গঙ্গানারায়ণ কৌতুক বোধ করলো।

মাঝে মাঝে সে দেখেছে বটে যে বালক নবীনকুমার আর একজন বালকের ওপর গুরুমশাইগিরি করছে। এই বালকটি ভৃত্য মহলেরই কারুর সন্তান, তার ওপরে আসা ব্যাপারে অনেক বারই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, কিন্তু নবীনকুমার কান্নাকাটি করে প্রতিবারই ভেঙে দিয়েছে সেই নিষেধাজ্ঞা। নবীনকুমারের কোনো খেলার সঙ্গী নেই, মায়ের সঙ্গে ছাড়া কখনো সে বাড়ির বাইরে যেতে পারে না, সেইজন্য বালকটিকে সে সঙ্গী হিসেবে চায়। শেষ পর্যন্ত সেই বালকটিকে নবীনকুমারের নিজস্ব ভৃত্য করে নেওয়া হয়েছে। সে ছেলেটি নবীনকুমারের সঙ্গে খেলে, তার হুকুম তামিল করে আবার তার ছাত্র সেজেও বসে। পড়া না পারলে নবীনকুমারের হাতে সে মারও খায়।

গঙ্গানারায়ণ জিজ্ঞেস করলো, তুই বড় বৌঠানকেও পড়াতে শুরু করিচিস ? বাঃ খুব ভালো কথা ! তাহলে তো তার জন্য গুরুদক্ষিণার ব্যবস্থা করতে হয় !

নবীনকুমার বললো, বড় বৌঠান আমার কথা শোনে না। খালি খালি হাসে। তুমি ওকে বকে দেও !

গঙ্গানারায়ণ হাসতে হাসতে বললো, কেন, হাসে কেন ? খুব অন্যায় !

নবীনকুমার বললো, বড় বৌঠানকে আমি কেতাব দিয়ে দিয়িচিলুম তা ছিঁড়ে ফেলেচে ! আমি মারতে গেলুম, অমনি মা'র কাচে গিয়ে নুকোলো !

গঙ্গানারায়ণ হাসতে লাগলো খুব।

সারাদিন নানান কাজের মধ্যেও এই কথাগুলো ঘুরতে লাগলো গঙ্গানারায়ণের মাথায়। লীলাবতীকে সত্যি সত্যি পড়াশুনো শেখালে কেমন হয় ! ধর্মপত্নীকে তো সে আর ফেলতে পারবে না, সারাজীবন এর সঙ্গেই কাটাতে হবে। যদি নিজের মতন তৈরি করে নেওয়া যায়, তবে লীলাবতী হয়তো একদিন তার যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে উঠতে পারবে। খৃষ্টান মেয়েরা আজকাল অনেকেই লেখাপড়া শেখে। লীলাবতীর জন্য একজন ইউরোপীয় মহিলাকে বাড়িতে এসে শিক্ষা দিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গঙ্গানারায়ণ জানে যে তার মা বিম্ববতী এতে আপত্তি করবেন না, আর বিধুশেখর আপত্তি করলেই বা কী যাবে আসবে ? বিধুশেখর বিন্দুবাসিনীর শিক্ষা মধ্যপথে বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তখন গঙ্গানারায়ণ কোনো প্রতিকার করতে পারেনি। কিন্তু লীলাবতীর ক্ষেত্রে সে রকম কোনো বাধাই আসতে পারবে না।

গঙ্গানারায়ণ বিন্দুবাসিনীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, বিধুশেখর গুরুমশাইয়ের কাছে পড়া বন্ধ করে দিলেও সে নিজে গোপনে বিন্দুকে নিয়মিত পড়াবে। সেকথা রাখেনি গঙ্গানারায়ণ, তখন কলেজে বন্ধুবান্ধবদের সংসর্গে উত্তেজনাকর জীবনযাত্রার মধ্যে কিছুকালের জন্য বিন্দুবাসিনীর কথা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল একেবারে। সেজন্য আজও গঙ্গানারায়ণের অনুশোচনা হয়।

সেদিন রাত্রে আপন কক্ষে এসে গঙ্গানারায়ণ দেখলো, তার পত্নী লীলাবতী তখনও জেগে আছে। একটা জমকালো সিল্কের শাড়ি পরা, জরির কারুকার্য করা একটা কালো রঙের শাল গায়ে জড়ানো। খোঁপায় ও বাহুতে ফুলের অলঙ্কার। শুধু জেগে থাকার জন্যই নয়, রাত্রে তার এই বিশেষ সাজ-সজ্জা

দেখেও বিস্মিত হলো গঙ্গানারায়ণ। এসব কী ব্যাপার ?

সংলগ্ন ছোট ঘরটিতে গিয়ে বস্ত্র পরিবর্তন করার পর এবার ফিরে এসে গঙ্গানারায়ণ দেখলো, লীলাবতীর দু চোখে জল।

গঙ্গানারায়ণ জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েচে ? মায়ের জন্য মন কেমন কচ্চে ? তা এই রাত্তিরেই তুমি সেজেগুজে বসেচো, সেখানে যাবার জন্য নাকি ?

লীলাবতী বললো, না।

—তবে ?

লীলাবতী উঠে এসে গঙ্গানারায়ণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, আপনি আমার সঙ্গে কতা বলেন না কেন ? বাপের বাড়িতে গেলেই আমার গঙ্গাজল জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ লা, তোর বর তোর সঙ্গে সারারাত জেগে বকর বকর করে ? তোর বর সোহাগ করে ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, সারারাত জেগে বকর বকর করবো, আমি কি পাগল নাকি ?

লীলাবতী ওষ্ঠ ফুলিয়ে বললো, গঙ্গাজল বলে যে ওর বর নিজেও সারারাত জাগে আর ওকেও জাগিয়ে রাকে।

গঙ্গানারায়ণ বললো, তোমার গঙ্গাজলের বর নিশ্চয়ই তাহলে সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোয়। নিষ্কর্মার ঢেঁকি ! আমায় সারাদিন অনেক কাজ করতে হয়।

—আমি বাপের বাড়ি গেলে ওরা যে হাসে আমায় নিয়ে।

—হাসুক ! শোনো, নবীন তোমায় পড়াতে চায়, তুমি পড়ো না কেন ? সে আমার কাছে নালিশ কচ্চিল।

—ঐটুকু ছেলের মুকে পাকাপাকা কতা, ও যা বলে তাই আমি শুনবো নাকি ! ও কি আমার গুরুঠাকুর !

—বেশ তো, তুমি অন্য কারুর কাছে পড়বে ?

—না।

—কেন ? মেমসাহেব এসে তোমায় পড়াবে। একবার পড়তে শিখলে দেখবে কত কী জানা যায়, কত আনন্দ পাবে।

—না, আমার দরকার নেই। পড়ালেখা করলে মেয়েমানুষের কপাল পোড়ে !

—বাজে কথা, এসব কে বলেছে তোমাকে !

—সবাই বলে। এই তো সুহাসিনীর কপাল পুড়লো !

—ছিঃ অমন কথা বলতে নেই। ওসব নির্বোধের মত কথা।

—আমার মাও বলেচে।

—এবার বাপের বাড়ি গিয়ে তোমার মা-কে বোঝাবে। তোমার কপাল পোড়া মানে তো আমার মরে যাওয়া। তাই যদি হতো, তাহলে কি আমি নিজে তোমাকে পড়াশুনোর কথা বলতুম ?

—সুহাসিনীর বরও তো তাকে লেখাপড়া শেখাতো !

—সুহাসিনীর স্বামী মারা গ্যাচে কঠিন অসুখে। যারা লেখাপড়া শেখে না, তাদেরও ঐ অসুখ হয়। তারাও মারা যায়। শোনো, তোমাকে আমি একটা বই থেকে পড়ে শোনাচ্চি। ঐ কুলুঙ্গিতে যে তিনটে বই রয়েচে, তার সবের নীচের বইটা নিয়ো এসো তো !

—আপনি আনুন।

গঙ্গানারায়ণ উচ্চহাস্য করে বললো, কেন বই ছুঁলেই তোমার কপাল পুড়ে যাবে নাকি ? আমি ছুঁলে কোনো দোষ নেই ? হাঃ হাঃ হাঃ।

বইখানি নিয়ে এসে পাতা উল্টে এক জায়গায় থেমে গঙ্গানারায়ণ বললো, এই জায়গাটা শোনো। দুজন মেয়ে এখানে কথা বলচে। মনে করো, তুমি আর তোমার গঙ্গাজল। দুজনে আলাপচারি কচ্চে ! শোনো, প্রথমে একজন প্রশ্ন কল্লো, ওলো এখন যে অনেক মেয্যা মানুষ লেখাপড়া করিতে আরম্ভ করিল, এ কেমন ধারা। কালে ২ কতই হবে ইহা তোমার মনে কেমন লাগে।

তখন অন্যজন উত্তর দিচ্চে, তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এত কালের পর আমার কপাল ফিরিয়াছে। এমন জ্ঞান হয়।

প্রশ্ন : কেন গো। সেসকল পুরুষের কাজ। তাহাতে আমাদের ভাল মন্দ কি।

উত্তর : শুন লো। ইহাতে আমাদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ হইতেছে, কেননা এদেশের স্ত্রীলোকেরা

লেখাপড়া করে না, ইহাতেই তারা প্রায় পশুর মতন অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর-দ্বারের কায-কর্ম করিয়া কাল কাটায়।

প্রশ্ন : ভাল। লেখা পড়া শিখিলে কি ঘরের কায কর্ম করিতে হয় না। স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধা বাড়া ছেলেপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে।

উত্তর : না। পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়। কিন্তু লেখাপড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কায কর্ম সারিয়া অবকাশ মতে দুই দণ্ড লেখা পড়া নিয়া থাকিলে মনস্থির থাকে, এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।

প্রশ্ন : ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝিলাম যে লেখা পড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সেকালের স্ত্রীলোকেরা কহেন যে লেখাপড়া যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয়, এ কি সত্য কথা। যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না। কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।

উত্তর : না বইন না, সে কেবল কথার কথা। কারণ আমি আমার ঠাকুরানী দিদির ঠাঁই শুনিয়াছি যে কোন শাস্ত্রে এমত লেখা নাই, যে মেয়্যা মানুষ পড়িলে রাঁড় হয়। কেবল গতর শোগা মাগিরা এ কথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে। যদি তাহা হইত তবে কত স্ত্রীলোকের বিদ্যার কথা পুরানে শুনিয়াছি, ও বড় ২ মানুষের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই লেড়াপড়া করে এমত শুনিতে পাই। সংপ্রতি সাক্ষাতে দেখনা কেন, বিবিরা তো সাহেবের মতন লেখাপড়া জানে, তাহারা কেন রাঁড় হয় না।

লীলাবতী বললো, থাক, থাক, আমি আর শুনবো না। জানি এসব কতা কোনো ফিরিঙ্গি বা ম্লেচ্ছ লিকেচে। ওরা ঐ সব বলে আমাদের জাত মাত্তে চায়।

গঙ্গানারায়ণ বললো, ম্লেচ্ছ ফিরিঙ্গি নয়, এ বই গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার নামে এক খাঁটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের লেখা। আর একটু শুনে দ্যাখো :

প্রশ্ন : ভাল। যদি দোষ নাই তবে এতদিন এ দেশের মেয়্যা মানুষে কেন শিখে নাই।

প্রশ্ন : শুন লো। যখন স্ত্রীলোক মা বাপের বাড়ী থাকে, তখন তাহারা কেবল খেলাধূলা ও নাট্যরঙ্গ দেখিয়ে বেড়ায়। বাপ মায়ও লেখাপড়ার কথা কহেন না। কেবল কহেন যে ঘরের কায কর্ম রাঁধা বাড়া না শিখিলে পরের ঘর কন্না কেমন করিয়া চালাইবি। সংসারের কর্মে দেয়া থোয়া শিখিলেই শ্বশুরবাড়ি সুখ্যাতি হবে। নতুবা অখ্যাতির সীমা নাই। কিন্তু জ্ঞানের কথা কিছুই কহেন না।

লীলাবতী বললো, আমি যখন ছোট ছিলুম, তখনো আমার বে হয়নিকো, আমার ভাই গুরুমশাইয়ের কাচে পড়তো, আমিও পাততাড়ি নিয়ে তার পাশে বসেচিলুম, অমনি আমার ন' পিসীমা এসে আমায় কান ধরে তুলে নে গেল আর বকে বকে বললো, মদ্দা ঢেঁটি ছুঁড়ি, তুই ব্যাটাছেলের সমান হতে চাস ? শেষে আমার মতন বেওয়া বিধবা মাগি হয়ে জীবন কাটাবি ? সেই কতাগুলান স্মরণে এলেই এখনো আমার বুক কাঁপে !

গঙ্গানারায়ণ গম্ভীরভাবে বললো, তোমার বাপের বাড়ির কোনো নিয়ম বা কারুর কথা এখানে খাটবে না। আমি আগামী মাস থেকেই তোমার জন্য মাস্টারনী ঠিক করবো।

লীলাবতী ভয়ার্ত গলায় বললো, আমার যে মাথায় বুদ্ধি নেই ! লেখাপড়ার শক্ত শক্ত জিনিস আমার মাথায় ঢুকবে না।

গঙ্গানারায়ণের ইচ্ছে হলো হাতের বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এত অবোধকে সে কী করে মানুষ করবে ? আর কোনো কথা না বলে বইখানি কুলুঙ্গিতে রেখে এসে সে শুয়ে পড়লো।

খানিক পরে সে টের পেল লীলাবতী তার বুকের কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। এটা গঙ্গানারায়ণের নতুন অভিজ্ঞতা। এমন আগে ঘটেনি। সে ঘুমের ভান করে নিথর হয়ে রইলো।

লীলাবতী ফিসফিস করে বললো, আপনি ঘুমুচ্চেন ? আপনি রাগ কল্লেন ?

গঙ্গানারায়ণ কোনো উত্তর দিল না।

লীলাবতী আবার বললো, আচ্ছা, আমি পড়বো। আপনি নিজে পড়াবেন ? মেমসাহেব দেখলেই আমার ভয় লাগে। আপনি পড়ালে আমার কোনো ভয় থাকবে না।

গঙ্গানারায়ণ বললো, ঠিক আচে, এখন ঘুমোও !

—আপনি আমায় একটুও সোহাগ করেন না। গঙ্গাজল বলছেল···

—তোমার গঙ্গাজল কী বলছিল, তা কাল শুনবো। আজ ঘুমোও।

—গঙ্গাজল বলছেল, তোর বর তোকে মা করে দিতে চায় না ? তোর বরকে বলবি···

—ছিঃ, ওসব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না।

—গঙ্গাজল মা হয়েছে, আমি মা হবো না ? সুহাসিনী মা হয়েচে, ক্ষেমঙ্করী মা হয়েচে, দুর্গামিয়ী মা হয়েছে, আমি হইনি···সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। সবাই বলে, তোর বর তোকে পীরিত করে না।

—ওসব কথা কাল শুনবো। আজ এখন ঘুমোও, আমার ঘুম পেয়েচে, কাল সকালে আমার অনেক কাজ।

লীলাবতী গঙ্গানারায়ণকে আঁকড়ে ধরে তার বুকে মাথা ঘষতে ঘষতে এক সময় ঘুমিয়েই পড়লো। সে রজঃস্বলা হবার পর নারীমহল তাকে নানারকম শিক্ষা দিয়েছে পতিকে বশ করবার জন্য। বয়েসের তুলনায় লীলাবতী এখনো বেশ সরল, সে অতশত বোঝে না, সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে ঘুমিয়ে পড়লো। তার সখীরা বলেছিল, রাত্রে বর যখন প্রথম ঘরে আসবে, তখন একটু সেজেগুজে কাঁদতে বসলেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে। কিন্তু তার বর তো তার কান্নাকে কোনো মূল্যই দিল না!

লীলাবতী ঘুমিয়ে পড়লেও গঙ্গানারায়ণ ঘুমোতে পারলো না অনেকক্ষণ। চোখ থেকে ঘুম সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে গেছে, সে কেবলই ছটফট করছে। কেন যে এই অস্থিরতা, তা সে নিজেই বুঝলো না। এক সময় সে উঠে বসলো।

লীলাবতীর বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে গেছে, গঙ্গানারায়ণকে ছেড়ে সে এখন চিৎ হয়ে শয়ান। তার নিদ্রাপ্লুত মুখখানিতে জানলা দিয়ে এসে পড়েছে শেষ শীতের স্বচ্ছ জ্যোৎস্না। লীলাবতীর গা থেকে সরে গেছে লেপ।

গঙ্গানারায়ণের বিস্ময় ও মুগ্ধতা হঠাৎ পাল্লা দিতে শুরু করলো। লীলাবতী যে এত সুরূপা, তা তো সে কোনোদিন জানেনি। অথবা কি এই জ্যোৎস্নার জন্যই তার মুখখানি এত অপরূপ দেখাচ্ছে!

সে বিড়বিড় করে বললো, 'ও শী ডাথ টিচ্ দা টর্চেস টু বার্ন ব্রাইট!' তারপর খুব সন্তর্পণে তার একটি হাত রাখলো লীলাবতীর কপালে। তার মনে পড়ে যাচ্ছে তার পঠিত বিভিন্ন কাব্যের নারী-বর্ণনা।

লীলাবতীর একখানা হাত সে তার মুঠিতে তুলে নিয়ে আবার বললো, ইফ আই প্রোফেন উইথ মাই আনওয়ার্দিয়েস্ট হ্যাণ্ড দিস হোলি শ্রাইন, দা জেন্টল সিন ইজ দিস্।

গঙ্গানারায়ণ যেন আর গঙ্গানারায়ণ নয়, সে এখন শেক্সপীয়ারের কোনো নাট্যকাব্যের চরিত্র। রোমিও এর পর কী করেছিল? 'ও, দেন, ডিয়ার, সেইন্ট, লেট লিপ্স ডু হোয়াট হ্যাণ্ডস ডু! দে প্রে: গ্র্যাণ্ট দাউ, লেস্ট ফেইথ টার্ন টু ডিসপেয়ার।'

গঙ্গানারায়ণ মুখ নীচু করে লীলাবতীর ওষ্ঠ চুম্বন করলো।

লীলাবতী ধড়মড় করে জেগে উঠে বললো, কে? কে? ওমা গো!

গঙ্গানারায়ণ আচ্ছন্নভাবে বলে চললো, সিন ফ্রম মাই লিপ্স? ও ট্রেসপাস সুইটলি আর্জড্! গিভ মি মাই সিন এগেইন।

নাট্যের নির্দেশ মতন গঙ্গানারায়ণ আবার গাঢ়ভাবে চুম্বন করলো লীলাবতীকে।

লীলাবতী একেবারে গলে গিয়ে বললো, কী ভালো লাগচে, আমার মাথা ঝিমঝিমিয়ে উঠলো য্যানো···আমি গঙ্গাজলকে বলবো, আমার বরও আমায় সোহাগ করে, শুধু তোর বর একলা করে না।

গঙ্গানারায়ণ বললো, এখন কথা বলো না।

তারপর সে লীলাবতীকে শুইয়ে দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো তার দিকে। ইংরেজীর বদলে এবার তার মনে পড়লো সংস্কৃত। সে আপন মনে বলতে লাগলো:

> তন্বী শ্যামা শিখরি-দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
> মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণী প্রেক্ষণা নিম্ন-নাভিঃ!
> শ্রোণীভারাদলস-গমনা স্তোক-নম্রা স্তনাভ্যাং
> যা তত্র স্যাদ যুবতি-বিষয়ে সৃষ্টি রাদ্যেব ধাতুঃ!

লীলাবতী জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি বিয়ের মন্ত্র পড়চেন? আমাদের তো কবেই বে হয়ে গ্যাচে!

গঙ্গানারায়ণ হেসে বললো, না। তুমি এসব বুঝবে না।

—একটু বুঝিয়ে বলুন না।

—সে তন্বী, সে শ্যামা, সুন্দর শিখর যুক্ত তার দাঁত, পাকা বিম্বফলের মতন তার ওষ্ঠ ও অধর, তার কোমর সরু, তার দৃষ্টি হরিণীর মতন চঞ্চলা, গভীর তার নাভি, তার গতি নিতম্বে গুরুভারে শিথিল, স্তনের ভারে সে সামান্য ঝুঁকে রয়েচে—তুমি এরকম যাকে দেখবে, তোমার মনে হবে যুবতী সৃষ্টিতে

সে-ই বিধাতার আদর্শ। কে লিখেচেন জানো ? কালিদাস ! তুমি কি এই রকম ?

লীলাবতী বললো, কী জানি ! সব কতার মানেই বুজলাম না যে !

গঙ্গানারায়ণ তখন বর্ণনা মতন লীলাবতীর দাঁত, ঠোঁট, স্তন, কোমর ও নাভিতে হাত দিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগলো এটা এই, এটা এই। তারপর লীলাবতীর ঘন ঘন নিশ্বাসে আন্দোলিত বক্ষে নিজ হস্ত স্থাপন করে আবার বললো, ঘটয়তি সুঘনে কুচ-যুগ গগনে মৃগমদ রুচি রুচিতে। মনিসরমমলং তারক-পটলং নখ-পদ-শশি-ভূষিতে··· । এই স্তনে কি সত্যিই নখরাঘাত করে রক্ত বয়ার করে দিতে হয় ? গঙ্গানারায়ণ সত্যিই লীলাবতীর বক্ষের কাঁচুলি সরিয়ে স্তনের ওপর পাঁচ অঙুল চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলো, লাগচে ? তোমার ব্যথা লাগচে ?

লীলাবতী বললো, আঃ আঃ আঃ !

এরপর কুমারসম্ভবের বর্ণনা অনুযায়ী ঠিক মিলিয়ে মিলিয়ে গঙ্গানারায়ণ লীলাবতীর সমস্ত বস্ত্র উন্মোচিত করে রতি ক্রিয়া শুরু করলো।

দু' জনেই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কিন্তু আনন্দের যেন অবধি নেই। লীলাবতীর বেশী আনন্দ এইজন্য যে সে এখন থেকে তার গঙ্গাজল এবং অন্যান্য সখীদের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে গেল। তাদের কাছে এবার সে সগর্বে এই ঘটনার বর্ণনা দিতে পারবে বারবার, যেমন ওরা দেয়। উচ্ছ্বাসে লীলাবতী এইসব কথা গঙ্গানারায়ণকে শোনাতে যাচ্ছিল, গঙ্গানারায়ণ আকুলভাবে বলতে লাগলো, চুপ করো, চুপ করো, এখন কথা কয়ো না ! এবং সেই পরম উৎসুক নারী শরীরকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করার পর সে মনে মনে ভাবতে লাগলো, এ যেন লীলাবতী নয়, সে বিন্দুবাসিনীকেই ভোগ করছে।
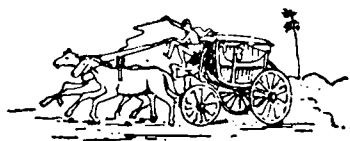
এপ্রিল মাসের এক সকালে ভারতের মাটিতে পা দিলেন জন এলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটন। সাতচল্লিশ বছর বয়েস, স্বাস্থ্যবান উন্নত দেহ, মন বিবিধ উৎসাহে ভরপুর। তিনি সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারের মানুষ, নিজেও আইন ও অঙ্ক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অক্সফোর্ডের র‍্যাংলার। কাব্য সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ। কলকাতা বন্দরে তিনি নামলেন অনেক আশা নিয়ে। বসন্তকালীন বাতাস ও রৌদ্র ধৌত এই সুন্দর শহরটি দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ অনেক দিনের। যৌবনে লণ্ডন শহরে তিনি যখন আইনজীবী হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠছেন, সেই সময় একটি অতি কৌতূহলজনক মামলায় ওকালতী করার জন্য তাঁর কাছে একটি প্রস্তাব আসে। ব্যাপারটা স্ত্রীলোকদের পুড়িয়ে মারা বিষয়ে। একদল হিন্দু আবেদন করেছিল যে স্বামীর মৃত্যুর পর সেই একই চিতায় তার জীবন্ত স্ত্রীকেও পুড়িয়ে মারার যে প্রথা ভারতে আছে, তা আইন করে বন্ধ করা হোক। আর একদল হিন্দু আবার এই রকম আইনে তাদের ধর্ম কলঙ্কিত হবে বলে এই আইন জারির বিরুদ্ধে প্রিভি কৌন্সিলে আপীল করতে চায়। সেই বিরুদ্ধ পক্ষীয় হিন্দুরাই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। বিষয়টি জেনে প্রথমে বেশ বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন বীটন। জীবন্ত নারীকে পুড়িয়ে মারা হবে কি না, তা নিয়েও মতভেদ ? 'সুট্টি'র কথা তিনি নানান পত্র-পত্রিকায় পড়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল এসব রূপকথা। ইওরোপেও ডাইনী ঘোষণা করে অনেক নারীকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, ইনকুইজিশানের বহু কদাচারের কথা তিনি জানেন, কিন্তু সে তো মধ্যযুগের কথা। এখন ঊনবিংশ শতাব্দী, মানব সভ্যতার এক নবজাগরণ হয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে দেখা দিয়েছে অসীম সম্ভাবনা, চতুর্দিকে প্রবাহিত হচ্ছে মুক্ত চিন্তার বাতাস। এর মধ্যে জ্ঞানীদের দেশ ভারতবর্ষে এতখানি কুসংস্কার আচ্ছন্ন অন্ধকার !

সেই থেকে জন বীটন ভারতবর্ষীয় সমাজ নিয়ে পড়াশুনা শুরু করলেন। তাঁর স্বদেশে তখন নারী মুক্তির আন্দোলন চলছে, চতুর্দিকে স্থাপিত হচ্ছে নানা ধরনের লেডিজ অ্যাসোসিয়েশান, নারীরা প্রকাশ্যে সভাসমিতি করে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দাবি করছে। বীটন নিজেও মনে করেন যে

ঈশ্বর পুরুষ ও নারী জাতিকে সমানভাবেই বুদ্ধি, হৃদয় ও সুখ-দুঃখের অনুভূতি দিয়েছেন। এতকাল পুরুষ যে স্ত্রী জাতিকে নিছক ভোগের সামগ্রী করে রেখেছিল এবং সমাজজীবনে নারীর কোনো ভূমিকাই স্বীকার করেনি, সেটা অন্যায়। ইওরোপে নারীরা একে একে অনেক অধিকার আদায় করছে, কিন্তু বীটন জেনে দুঃখিত হয়েছিলেন যে ভারতে রমণীরা এখনও পদাবনত। তাদের পুড়িয়ে মারা বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও তারা সারাজীবন দগ্ধ হয়।

বীটন হচ্ছেন সেই ধরনের মানুষ, যাঁরা কয়েকটি মহৎ ধারণার পরিপোষণ করেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে সুখ পান। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়েও পৃথিবীর মানুষের কিছু সুখ বৃদ্ধির চেষ্টা করেই তৃপ্তি পান এই ধরনের মানুষ। বীটন অকৃতদার এবং তাঁর কোনো গৃহ-বন্ধন নেই। বিলাতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ যখন তাঁকে ভারতে আইন সচিব করে পাঠাতে চাইলেন, তখন সে প্রস্তাবে সাগ্রহে সম্মতি দিয়েছিলেন বীটন। প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষকে জানার বাসনা তাঁর এতদিনে চরিতার্থ হবে।

বীটনের আগমনের অল্পকাল আগে লর্ড ডালহৌসি এসেছেন ভারতের বড়লাট হয়ে। ডালহৌসির আকাঙ্ক্ষা রাজ্য বিস্তারের। তা ছলে, বলে ও কৌশলে যে উপায়েই হোক। আর তাঁর আইন সচিব বীটনের বাসনা এই যে, যে নবজাগরণের জোয়ার এসেছে ইওরোপে, তারই অনুরূপ কিছু এই প্রাচীন, সুমহান সভ্যতার দেশ ভারতবর্ষেও সঞ্চারিত হোক। এই দুই রাজপুরুষেরই অবস্থিতি হলো রাজধানী কলকাতায়।

পদাধিকার বলে বীটন কাউন্সিল অব এডুকেশনেরও সভাপতি হলেন। অর্থাৎ এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনিই প্রধান। কলকাতায় উপস্থিত হয়েই তিনি জড়িয়ে পড়লেন নানান কাজে। তিনি দেখলেন, কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসা রয়েছে, পৃথকভাবে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার জন্য। আর যেটা সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠান, যেখান থেকে ছাত্ররা পায় পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোক, সেই হিন্দু কলেজে শুধু হিন্দু ছাত্র ছাড়া আর কারুর প্রবেশ অধিকার নেই। শুধু হিন্দু হলেই হবে না, কিছুটা অন্তত বংশকৌলীন্য না থাকলে যেকোনো ছাত্রই হিন্দু কলেজে পড়তে আসতে পারে না। এই অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখে তাঁর খটকা লাগলো। তাছাড়া তিনি দেখলেন, পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাই অস্বাভাবিক। সংস্কৃত কলেজে শেখানো হয় সংস্কৃত, মাদ্রাসায় আরবী ফারসী আর হিন্দু কলেজে ইংরেজী। বাংলাদেশে বাঙালী ছাত্ররা কেউ বাংলা ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শেখে না। বীটন ভাবলেন, ইংলণ্ডের ইংরাজ যুবকরা শুধু গ্রীক ল্যাটিনের মাধ্যমে পড়াশুনা করছে, ইংরেজী শিখছে না, এ কি কল্পনা করা যায়?

কিছু কিছু দেশীয় লোকদের সঙ্গে কথা বলে তিনি দেখলেন, তারা হিন্দু কলেজের ব্যাপারে খুব গর্বিত। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শহর এই কলকাতায় এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে নেটিভ বালকরা গড় গড় করে ইংরেজী বলতে শেখে, শেকসপীয়ারের কাব্য মুখস্থ রাখে এবং গৃহদেবতার উপাসনার সময়ও হোমারের কাব্য থেকে পাঠ করে। এরা বাংলা ভাষা একেবারেই শেখে না এবং ইংরেজী কৃতিত্বের জন্য গর্ববোধ করে।

বীটনের মনে হলো, হিন্দু কলেজ যেন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয়, এ তো একটি ভৃত্য বানাবার কারখানা। সাম্রাজ্য বাড়ছে, সরকারী কাজকর্মও বাড়ছে, অল্প বেতনে ইংরেজ কর্মচারী পাওয়া দুষ্কর, তাই হিন্দু কলেজের পাশ করা ছাত্রদের মধ্য থেকেই এখন সরকারের নিম্ন বিভাগীয় কর্মচারী পাওয়া যাচ্ছে যথেষ্ট। কতকগুলি ভৃত্য উৎপাদনের জন্য শেকস্‌পীয়ার, হোমার পঠন-পাঠনের প্রয়োজন কী?

এই সব ব্যাপার দেখে বীটন ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি শিক্ষা সমাজের সভাপতি, তাঁর কাজ শিক্ষা বিস্তার, ভৃত্য উৎপাদন তো নয়। শিক্ষা মানে তো আত্ম উপলব্ধি। যে ছাত্ররা মাতৃভাষা, নিজের সংস্কৃতি ও দেশীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে কিছুই জানলো না, তাদের আবার শিক্ষা হলো কী? বীটন জানেন, ইংলণ্ডে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কথাই হলো ছাত্রদের মধ্যে নিজের জাতি ও নিজের সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা অন্ধ ভালোবাসা জাগিয়ে তোলা। আর ভারতবর্ষের ব্যবস্থা ঠিক বিপরীত, এখানকার ছাত্ররা শিখছে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ঘৃণা করতে এবং অন্ধভাবে অনুকরণ করছে বিদেশী সংস্কৃতি ও ভাষার। এরকম ব্যবস্থায় এদের মধ্যে থেকে দৈবাৎ দু-একজন চিন্তাশীল মানুষ বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু বেশির ভাগই তো দাস মনোভাবসম্পন্নই থেকে যাবে।

অন্যান্য রাজকর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে বীটন বুঝতে পারলেন, এই রকম শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে প্রভুভক্ত দাস সৃষ্টি করাই ব্রিটিশ নীতি। তারা এদেশ শাসন করতে এসেছে, এ দেশের মানুষের

আত্মিক উন্নতি ঘটানোর দায়িত্ব তাদের নয়। হিন্দু কলেজে শুধু হিন্দু ছাত্র ভর্তি করাই অভিপ্রেত, মুসলমানদের এখন ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া উচিত হবে না। মুসলমানরা ঘুমন্ত সিংহ, ওদের এখন না জাগানোই ভালো।

ইংলণ্ডে থেকে বীটন এসব কিছুই বুঝতে পারেননি। ইংলণ্ডের জনসাধারণের ধারণা, অধঃপতিত ভারতীয়দের উদ্ধার কার্যেই ব্রিটিশ জাতি সেখানে নিযুক্ত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে এসেছিল বাণিজ্য করতে, তবু ভারতবর্ষ শাসন করার গুরু দায়িত্বও তাদের নিতে হয়েছে বাধ্য হয়ে, কারণ ভারতীয়রা রাজ্য শাসনের রীতিনীতি সব ভুলে গেছে, তারা শুধু পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ করে। কলকাতায় এসে বীটন বুঝলেন স্বদেশে এবং উপনিবেশে ব্রিটিশ নীতি দু'রকম। ইংলণ্ডের পণ্য ভারতে আসে বিনা শুল্কে, আর ভারতীয় পণ্য ইংলণ্ডে গেলে তার ওপর চড়া হারে শুল্ক বসে। যাতে আস্তে আস্তে ভারতীয় পণ্যের বাজার ইংলণ্ডে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শাসনভার তো নিয়েছে এই উদ্দেশ্যেই। ভারতীয়রা আস্তে আস্তে শিল্প উৎপাদন একেবারেই ভুলে যাবে, জীবন ধারণের জন্য যা কিছু দ্রব্যের জন্য তারা হয়ে উঠবে পুরোপুরি ইংলণ্ডের শিল্প উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল।

বীটন অবাক হয়ে ভাবলেন, দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত ভেবে আত্মাভিমান দেখান, তাঁরাও এই তিক্ত সত্যগুলি বুঝতে পারছেন না কেন? নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন। এঁরা বুঝতে পারছেন না, তার কারণ এঁরাও যথার্থ 'শিক্ষিত' নন, এঁদের কোনো আত্ম-উপলব্ধি হয়নি।

বীটন বুঝলেন, তাঁর একার পক্ষে এই সব কিছু পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তবু তিনি নিরুদ্যমী হয়ে বসে থাকবার মতন মানুষ নন। কয়েকটি মহান আদর্শকে অবলম্বন করেই যাঁরা জীবন কাটান, তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকেন না। আমরা যাকে বলি বাস্তবজ্ঞান, সেই জিনিস তাঁদের যথেষ্ট কম থাকে। বীটন তাঁর কার্যকলাপ শুরু করেই একসঙ্গে এ দেশীয় ব্যক্তিদের এবং তাঁর স্বদেশবাসী ইংরাজদের ক্রুদ্ধ করে দিলেন।

কৈলাশচন্দ্র বসু নামে হিন্দু কলেজের একজন শিক্ষক খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলেন। অমনি কলেজের অভিভাবক সভার হিন্দু সদস্যরা রুষ্ট হয়ে বললেন, কৈলাশচন্দ্রকে চাকরি থেকে অপসারিত করতে হবে। বীটন বিস্মিত হলেন। ধর্মান্তরিত হওয়াই কি একজন শিক্ষকের অযোগ্যতার পরিচায়ক? কলেজে তো অনেক ইওরোপীয় শিক্ষক রয়েছেন, যাঁরা ধর্মে খৃষ্টান, তাহলে একজন বাঙালী যদি খৃষ্টান হয়, তবে সে কেন শিক্ষকতা করতে পারবে না? হিন্দু সদস্যরা উত্তরে বললেন, এতে ছাত্রদের সামনে একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে। বীটন নতুন এসেছেন, সব কিছু ভালো করে বুঝে উঠবার আগেই কৈলাশচন্দ্র বসু অপসারিত হয়ে গেলেন।

কিছুদিন বাদে গুরুচরণ সিংহ নামে একটি ছাত্র খৃষ্টান হলো। দেশে খৃষ্টান হবার ধুম পড়ে গেছে, ইংরেজী শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত যুবকদের ধারণা, খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলেই তারা রাজার জাতে উন্নীত হবে।

হিন্দু কলেজের নিয়ম অনুযায়ী গুরুচরণ সিংহ আর ছাত্র থাকতে পারবে না সেখানে। হিন্দু ছাড়া কারুর পাঠের অধিকার নেই সেখানে। কয়েক বছর আগে রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র মধুসূদনও খৃষ্টান হবার পর এই কলেজ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এবার বীটন দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন।

হিন্দু কলেজ পুরোপুরি সরকারের এক্তিয়ারে নয়। কয়েক বছর ধরে ইংরেজ সরকার এই কলেজকে কিছু আর্থিক সাহায্য করছেন কিন্তু কলেজটি স্থাপিত হয়েছিল বেসরকারী উদ্যোগে এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দানে। সেই সব ব্যক্তিরা কিংবা তাঁদের পারিবারিক প্রতিনিধিরা এখনো রয়েছেন কলেজ পরিচালনা সংস্থার সদস্য। তাঁদের নেতৃত্ব দেন রাজা রাধাকান্ত দেব, রক্ষণশীলতার প্রধান ও সুদৃঢ়তম দুর্গটি তিনিই রক্ষা করে চলেছেন।

হিন্দু সদস্যরা ভাবলেন, পাদ্রীদের মতন বীটনও বুঝি এদেশে খৃষ্ট ধর্মের বন্যা বইয়ে দিতে চান। সুতরাং রাধাকান্ত দেব প্রমুখ দৃঢ় প্রতিরোধে নামলেন। যদিও বীটন ধর্ম বিষয়ে খুব উৎসাহী নন, অখৃষ্টান মাত্রই নরকে পতিত হবে, এমন বিশ্বাস তাঁর নেই, ধর্ম গ্রহণ বা বর্জনকে তিনি মানুষের ব্যক্তিগত রুচি হিসেবেই গ্রহণ করেন। শুধু হিন্দুরাই ছাত্র হবার অধিকারী, হিন্দু কলেজের এই মূল

নিয়মটিকেই তিনি বর্জন করতে চান। তিনি প্রতিপক্ষের সামনে দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন। হুগলীর কলেজ কিংবা প্রিন্স গোলাম মহম্মদ প্রতিষ্ঠিত রসাপাগলা গ্রামের ইংরেজী স্কুলে তো খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু ছাত্ররা একসঙ্গে পাঠ নেয়! সে সব স্থলে তো কোনো বৈষম্য নেই। মুসলমান-খৃষ্টানরা হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে শিক্ষাভ্যাস করতে অনাগ্রহী নয়, শুধু হিন্দুরাই কেন দূরে সরে থাকবে?

এ তর্ক মাঝপথে রইলো। গুরুচরণ সিংহ নামের ছাত্রটি নিজে থেকেই কলেজ ছেড়ে চলে যাওয়ায় তখুনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলো না। কিন্তু রাধাকান্ত দেবের দল বীট্‌নের ওপর চটে রইলেন।

বীট্‌ন এরপর চটিয়ে দিলেন ছাত্রদের। ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের অতি জনপ্রিয় অধ্যাপক ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন অন্যান্য কয়েক জায়গা ঘুরে সম্প্রতি হিন্দু কলেজেরই অধ্যক্ষ হয়েছেন। ক্যাপ্টেন সাহেব শিক্ষক হিসেবে অতি সুযোগ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর নারীঘটিত দুর্বলতার কথা নিয়ে কানাকানি চলছিল সর্বত্র। তাছাড়া যথাসময়ে কলেজে আসাও তাঁর ঠিক ধাতে পোষায় না। এক একদিন কলেজ শুরু হবার অনেক পরে তিনি ঈষৎ স্খলিতপদে কলেজে আসেন, তখনও তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিমাভ। এই অসংযমী ও সময়জ্ঞানহীন অধ্যক্ষকে বীট্‌ন সুনজরে দেখলেন না। ছাত্রদের কাছে এরকম অধ্যক্ষ আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত নয়। তিনি রিচার্ডসনের কাছে কৈফিয়ত চাইলেন, অহংকারী রিচার্ডসন তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিলেন পদত্যাগপত্র এবং বীট্‌ন তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করলেন না একটুও। এর ফলে ছাত্র মহলে শোরগোল পড়ে গেল, অভিভাবকরাও সভা ডেকে বীট্‌নের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলেন। ছাত্ররা ঠিক করলো বিশাল আকারে সম্বর্ধনা দেবে তাঁদের প্রিয় অধ্যাপককে, বীট্‌ন তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে জানালেন যে কোনো বিদায়ী সরকারী কর্মচারীকেও সম্বর্ধনা জানানো আইনবিরুদ্ধ। ছাত্ররা একযোগে সংবাদপত্রে লিখলো বীট্‌নের এই ধরনের কঠোর হস্তক্ষেপ বিষয়ে। সারা দেশে বীট্‌নের নিন্দা রটে গেল।

বীট্‌নের এর পরের উদ্যোগটিতে হাঙ্গামা হলো অনেক বেশী। শিক্ষা বিষয়ের মতন, বীট্‌ন দেখলেন, এ দেশে আইন ব্যবস্থার মধ্যেও অনেক বৈষম্য রয়েছে। ইওরোপীয়রা কতকগুলি বিশেষ সুযোগসুবিধা পায় ও তার অপব্যবহার করে। মফস্বলে ইওরোপীয়রা ভারতীয়দের উপর যত অত্যাচারই করুক তার কোনো প্রতিবিধান নেই। মফস্বলের কোনো আদালতে ইওরোপীয়দের কোনো ফৌজদারী মামলার বিচার হয় না। বহু ইংরেজ ও অন্যান্য ইওরোপীয়রা ছড়িয়ে আছে গ্রামে-গঞ্জে, কয়েক রকমের ব্যবসা তারা একচেটিয়া করে নিচ্ছে, রেশম, চিনি এবং নীল উৎপাদনের জন্য তারা কুঠী স্থাপন করে সেখানে নিজস্ব রাজত্ব চালায়। সেখানে কোনো আইনের শাসন নেই, শ্বেতঙ্গরা স্থানীয় লোকদের মারধোর করে, বাড়িতে আগুন লাগায় ও যুবতী স্ত্রীদের সবলে ধরে নিয়ে যায়। সরকারের দেশী কর্মচারীরা এদের কোনো কাজে বাধা দিতে গেলেও এদের কাছে অপমানিত হয়, অনেক সময় প্রহৃতও হয়।

আইন সচিব হিসেবে বীট্‌ন এসব সহ্য করতে রাজি নন। তিনি যে আইন শিক্ষা করেছেন, তার মূল কথাই হলো, আইনের চক্ষে সবাই সমান। আমেরিকায় স্বাধীনতার যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লবের পর সকল মানুষের সমান অধিকারের কথা ইওরোপের বিদগ্ধ মানুষের কাছে স্বীকৃত হয়েছে। বীট্‌ন সেরকমই একজন মানুষ, শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের জন্য দু রকম আইনের ব্যবস্থা তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত নন। তিনি ইওরোপীয়দের বিশেষ অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি বাতিল করে দিয়ে নতুন আইনের খসড়া প্রণয়ন করলেন।

অমনি গর্জে উঠলো বেসরকারী ইংরেজ সমাজ। এইসব ইংরেজদের হাতে বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকাও রয়েছে। সেই সব কাগজে উঠলো প্রতিবাদের ঝড়। তারা বীট্‌নের এই নতুন আইনের নাম দিল ব্ল্যাক অ্যাক্ট বা কালা কানুন। প্রায় এক যুগ আগে মেকলে সাহেবও এই রকম আইন প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলেন এবং সর্বাংশে সার্থক হতে পারেননি। বীট্‌ন একেবারে বদ্ধপরিকর। সংবাদপত্রে তাঁকে নিয়ে যতই গালাগালি কুৎসা চলুক, তিনি পশ্চাৎপদ হবেন না। তবে তিনি লক্ষ্য করলেন নেটিভদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর পক্ষ সমর্থন করতে এগিয়ে আসছেন। রামগোপাল ঘোষ নামে এক ব্যক্তি ইংরেজীতে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন তাঁর স্বপক্ষে।

তবু শেষ পর্যন্ত হেরে গেলেন বীট্‌ন। লর্ড ডালহৌসি দেশীয় রাজন্যবর্গের বিষয় সম্পত্তি কেড়ে নেবার পরিকল্পনাতেই তখন ব্যস্ত, তিনি তুচ্ছ আদর্শগত কারণে ইংরেজ সম্প্রদায়কে চটাতে চান না মোটেই। সরকার বীট্‌নের নতুন আইনের খসড়া বাতিল করে দিল। উল্লাসের কলরোল পড়ে গেল ইংরেজ সমাজে, বীট্‌ন সেদিন একা বসে রইলেন নিজের কক্ষে। হিন্দু কলেজেও তিনি সব সম্প্রদায়ের ছাত্রদের প্রবেশ অধিকার দিতে পারেননি, আইনের বিচারের ক্ষেত্রেও তিনি শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের সমান সুযোগ দিতে পারলেন না চেষ্টা করেও।

এরই মধ্যে একদিন সকালে তাঁর খানসামা এসে খবর দিল যে একজন দেশী বাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। বীট্‌ন বাবুটিকে ভিতরে নিয়ে আসার অনুমতি দিলেন।

কোট প্যান্টে সুসজ্জিত একজন সুপুরুষ বাঙালী এসে ঢুকলেন ঘরে, তাঁর হাতে একখানি বই। ইনি হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র গৌরদাস বসাক।

বিশুদ্ধ ইংরেজীতে গৌরদাস বললেন, মিঃ বেথুন, আমি যে আপনার অমূল্য সময় ব্যয় করাইতে আসিলাম, সেজন্য মার্জনা করিবেন কী?

বীট্‌ন একটু হাসলেন। তাঁর নামের বানান দেখে নেটিভরা প্রায় সকলেই তাঁকে বেথুন বলে সম্বোধন করে। তিনি প্রথম প্রথম সংশোধন করে দিতেন, এখন আর করেন না। বানানটি অন্য রকম, সকলকে বোঝানো সম্ভব নয়।

তিনি একটি কেদারা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ভদ্র মহোদয়, আসন গ্রহণ করুন, তাহার পর আপনার বক্তব্য শুনিব।

গৌরদাস বললেন, মহাশয়, আমার বক্তব্য অতি সামান্য। আমার এক বন্ধু একটি কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। আপনি স্বয়ং বিদ্বান ও সাহিত্য অনুরাগী, সেই বিবিচেনায় আপনাকে সেই পুস্তকের এক কপি উপহার দিতে আসিয়াছি, যদি অনুগ্রহ করিয়া তাহা গ্রহণ করেন।

বীট্‌ন জিজ্ঞেস করলেন, কবিতা পুস্তকটি আপনার রচনা নহে?

গৌরদাস বললেন, না মহাশয়, ইহা আমার এক আবাল্য সুহৃদের। তিনি মান্দ্রাজে থাকেন। তিনি এক্ষণে কলিকাতায় উপস্থিত থাকিলে অবশ্যই স্বয়ং আসিয়া আপনার সমীপে কেতাবটি পেশ করিতেন। তাঁহার অনুরোধেই আমি···

—বাঙলা কবিতা পুস্তক? দুঃখের বিষয়, আমি বাঙলা পড়িতে জানি না।

—না মহাশয়, ইহা ইংরেজীতে রচিত। ইহাতে অতিশয় উচ্চাঙ্গের সব কবিতা গ্রন্থিত হইয়াছে।

বীট্‌ন হাত বাড়িয়ে বইখানি নিলেন। বইখানি সুন্দর করে বাঁধানো, ভিতরে তাঁর নামের নীচে কবির স্বাক্ষর। কবির নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বইটির নাম 'ক্যাপটিভ লেডী।'

বীট্‌ন পৃষ্ঠা উল্টে উল্টে দেখতে লাগলেন রচনার নিদর্শন।

গৌরদাস বিনীতভাবে বললেন, আমার এই সুহৃদটি অতি অল্প বয়স হইতেই ইংরাজীতে কাব্য রচনা করিয়া বহুজনকে চমৎকৃত করিয়াছে। ক্রমে সে মিলটন বায়রনের সমগোত্রীয় হইয়া উঠিবে, এই আমাদের বিশ্বাস।

বীট্‌ন একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বইটি মুড়লেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বান্ধবটি বাঙালাভাষী হইয়াও বাঙালাতে কাব্য রচনা না করিয়া ইংরাজীতে কাব্য রচিলেন কেন? কোনো কবি মাতৃভাষা ছাড়িয়া অপর ভাষা অবলম্বনে কাব্য রচনা করে, এমন তো কখনো শুনি নাই।

গৌরদাস বললেন, মহাশয়, এই কবি মাইকেল এম এস ডাট ইংরেজদের মতনই ইংরাজী ভাষায় দক্ষ। বহু ইংরাজই একথা স্বীকার পাইয়াছেন।

—আমিও না হয় তাহা স্বীকার করিলাম। অনেক ইংরাজও অত্যুত্তম ফরাসীভাষা জানে, কিন্তু তাহারা ফরাসী ভাষাতে কবিতা রচনা করে না। বাঙালাবাসীদের পক্ষে বাঙালাতে কিছু রচনা করার বাধা কোথায়?

—মহাশয়, বাঙালা ভাষা সাহিত্য রচনার উপযোগী নয়। ইহা অতি কদর্য ও ইতর লোকের ব্যবহার্য। এই ভাষার দ্বারা কোনো মহৎ ভাব প্রকাশ সম্ভব না। আমার সুহৃদটিকে আমি নিজেও কয়েকবার বাঙলায় কিছু রচিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি, কিন্তু সে বাঙলা সম্পর্কে এই রূপ মত প্রকাশ করে।

বীট্‌ন ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তিনি আগেও লক্ষ করেছেন, বাঙালীরাই বেশী বাঙলা ভাষার নিন্দা করে। বাঙলা ভাষা যদি উচ্চাঙ্গের নাও হয়, তবু সেজন্য বাঙালীদের কোনো দুঃখবোধ নেই। এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়?

তাঁর মনে পড়লো কিছুদিন আগে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখেছিলেন কৃতী ছাত্ররা তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য নানান ইংরেজী কবিতা পাঠ করে শোনালো। বীট্‌ন তখন মঞ্চে উপবিষ্ট কয়েকজন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেছিলেন, ভদ্রমহোদয়গণ, ইহারা কি কেহ কোনো বাঙলা কবিতা জানে না? ইংলণ্ডের কোনো সভায় একটিও ইংরাজী পদ্য পাঠ করা হইল না, ইহা অকল্পনীয়। আপনাদের বাঙালা দেশের সভায় ইহা কী করিয়া সম্ভব হয়?

সেই ভদ্রমণ্ডলীও তখন একবাক্যে বলেছিলেন, মহাশয়, ইহারা বাঙলা শিখিবে কি? বাঙালাতে শিখিবার কোনো বস্তু নাই। বাঙালাতে যা রচিত হয়, তা সবই কুরুচিপূর্ণ।

বীট্‌ন একটু রেগে গিয়ে বলেছিলেন, পাঁচশত বৎসর আগে আমাদের ইংলণ্ডেও ইংরাজী ভাষা খুবই অমার্জিত ও বর্বর ছিল। তাহা বলিয়া কি আমরা পর ভাষা গ্রহণ করিয়াছি? আপনাদের মতন ব্যক্তিরা উদ্যোগ করিলে তবেই না বাঙালা ভাষার উন্নতি বিধান ঘটিবে। বাঙালাতে যদি মহৎ ভাবের গ্রন্থ নাই, তবে বিভিন্ন ইওরোপীয় ভাষা হইতে উত্তম উত্তম রচনাদি বাঙালায় অনুবাদিত করাইতেছেন না কেন? বাঙালা ভাষায় সেই সব অনুবাদ পড়িয়া ছাত্রদের রুচি উন্নত হইবে, তৎপরে তাহারা উচ্চমানের রচনা বাঙালাতে লিখিতে শিখিবে।

গৌরদাসের মুখের ওপর সরাসরি দৃষ্টি স্থাপন করে বীট্‌ন বললেন, মহাশয়, আমি যতটুকু বুঝি তাহাতে বলিতে পারি যে একজন উচ্চাভিলাষী প্রতিভাবান তরুণের পক্ষে এমন সুবর্ণ সুযোগ তো আর হয় না! বাঙালা ভাষা যদি এখনও অপরিণতই থাকে, তবে কাহার না লোভ হইবে সেই ভাষাকে পরিমার্জনা করিয়া দেশের মানুষের কাছে প্রথম মহৎ কোনো রচনা উপহার দেওয়ার? যে ভাষায় বহু সংখ্যক লেখক অনেক উত্তম গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সে ভাষায় খ্যাতি অর্জন করা সুকঠিন। কিন্তু যে ভূমি আজও অকর্ষিত, সেখানে তো অতি সহজেই সোনার ফসল ফলানো যাইতে পারে।

গৌরদাস বসাকের এসব কথাগুলি তেমন পছন্দ হলো না। তিনি ভেবেছিলেন, মিঃ বেথুনের মতন একজন মাননীয় ইংরাজের কাছ থেকে একটি প্রশংসাপত্র আদায় করে মধুর কাছে পাঠিয়ে দেবেন! কিন্তু এ সাহেব যে উল্টো রকমের কথা বলে!

গৌরদাস উঠে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে বললেন, মিঃ বেথুন, আপনার উপদেশ আমি নিশ্চিত আমার বন্ধুকে জানাইব।

গৌরদাস চলে যাবার পর বীট্‌ন আবার দেখতে লাগলেন বইখানি। কিছু অংশ পাঠ করলেন মনঃসংযোগ করে। তিনি হতাশ হলেন। কতখানি ইংরেজী ভাষার চর্চা করেছে এই কবি, তার প্রাণপণ প্রমাণ দেবার চেষ্টা আছে এই বইখানির মধ্যে। কিন্তু এতে কাব্যের নামগন্ধও নেই। এই ব্যক্তির পক্ষে ইংরাজী ভাষার কবিদের মধ্যে স্থান গ্রহণ করা যেন প্রায় এক মুণ্ডহীন ধড়ের দিবাস্বপ্ন। এ দেশের ধারণা অনুযায়ী এ ব্যক্তি 'শিক্ষিত', কিন্তু বীট্‌নের মতে, যতই ইংরেজী শিক্ষা করুক, তবু এই রকম ব্যক্তি শিক্ষাহীন, কারণ এদের আত্ম-উপলব্ধি হয়নি।
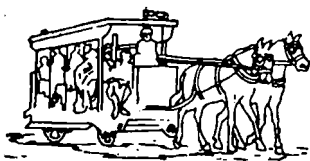
সিংহবাড়িতে গণ্ডা গণ্ডা দাস-দাসীর মধ্যে থাকোমণি এখন বেশ ভালোভাবেই মিশে গেছে এবং নিজের কাজে বেশ পাকাপোক্তও হয়ে উঠেছে। এখন সে-ও অন্যদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কলহ করে এবং নিজের ভাগটি কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত হিসেবে বুঝে নিতে জানে। ইদানীং সে বেশ একটু স্থূলকায়া

হওয়ায় তার মুখে দেখা দিয়েছে তৈলাক্ত সুখী সুখী ভাব।

খাঁচার পাখিকে নিয়ে কবিরা কত কবিতা রচে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খাঁচার পাখির মনে মুক্ত আকাশের জন্য দুঃখ কতকাল পোষা থাকে তা কে বা জানে। অভ্যাস বশে প্রথম প্রথম কিছুদিন বন্য বিহঙ্গম খাঁচার মধ্যে থেকে ছটফট করে বটে, তারপর এক সময় সে হয়তো সেই খাঁচাকেই ভালোবেসে ফেলে। অনেক সময় দেখা যায়, পিঞ্জরের দ্বার খোলা থাকলেও আকাশের পাখি আর ফিরে যেতে চায় না মুক্ত আকাশে।

গরীব কৃষকের বধূ ছিল থাকোমণি, এখন ধনী গৃহের দাসী, তার নিজস্ব ও সন্তানের জন্য পেয়েছে নিশ্চিন্ত আশ্রয় ও খাদ্য। পুরোনো দিনের কথা আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসছে তার স্মৃতিতে। সেই ভয়মাখানো গ্রাম্য সরলতা তার ভাবে প্রকারে আর খুঁজে পাওয়া যায় না একটুও। প্রথম বছরখানেক সে তার হারানো স্বামীর জন্য বিরলে অশ্রুপাত করতো, এখন ত্রিলোচন দাসের কথা তার কদাচিৎ মনে পড়ে এবং মনে পড়লেই ক্রোধ জাগে। থাকোমণির এখন নিশ্চিত ধারণা, সে হতচ্ছাড়া মিনসে তাদের ফেলে রেখে সজ্ঞানেই পলায়ন করেছে। নইলে, এ শহরে এত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, আর সেই মানুষটা কর্পূরের মতন উপে গেল? থাকোমণি নিজেও এখন প্রায়ই বাড়ির বাইরে বেরোয়, এই তো সেদিন এ-বাড়ির অন্য দাস-দাসীদের সঙ্গে দল বেঁধে বাগবাজারের কুটুম বাড়িতে তত্ত্ব দিয়ে এলো। দুটি নগদ টাকা আর একখানা নতুন শাড়ি পেয়েছিল সেজন্য। তাছাড়াও গিন্নীমার সঙ্গিনী হয়ে প্রায়ই যায় গঙ্গার ঘাটে। শহুরে হালচালও সে বুঝে গেছে অনেকটা।

স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই ইতিমধ্যে সতীত্ব বিসর্জন দিতে হয়েছে তাকে। দাসী-বাঁদীর কাজ করেও সতীত্বের গুমর দেখাবে, এ তো অসম্ভব কথা। বয়েসে যুবতী, স্বাস্থ্য ভালো, তার ওপর বেওয়া, এমন রমণী তো পুরুষের খাদ্য হবেই। প্রথম বছর দেড়েক থাকোমণি অতি কষ্টে নিজেকে সামলে ছিল, বংশানুক্রমিক সংস্কারবশতঃ তার ধারণা ছিল, যে স্ত্রীলোক পর-পুরুষের কাছে ধরা দেয়, তার স্থান হয় অনন্ত নরকে। কিন্তু শহরের এই জমিদার বাড়িতে থেকে, যে বাড়িকে অনেকে কথায় কথায় বলে রাজবাড়ি, থাকোমণি আস্তে আস্তে বুঝতে পারলো, এ রকম বাড়ির ওপরতলা আর নীচের তলাতেই আছে স্বর্গ আর নরক। আর এখানকার নরকও তেমন ভয়াবহ নয়, বরং একটু মানিয়ে নিতে পারলে বেশ আরামদায়কই হয়ে ওঠে।

এইসব গৃহের ভৃত্যতন্ত্রের মধ্যে মাঝে মাঝেই নানারকম ওঠাপড়া থাকে। কর্তা-গিন্নীদের কাছে যে যত পেয়ারের, নীচের তলায় তার তত প্রতাপ। অবশ্য এমনও দেখা যায়, কর্তা আজ যে ভৃত্যের সব কথা বিশ্বাস করছেন, দুদিন বাদে তাকেই হয়তো জুতো পেটা করে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। এই তো চিন্তামণি দাসী ছিল গিন্নীমা বিম্ববতীর একেবারে অতি নিজের লোক, গত মাসেই কোন্ অপরাধে কে জানে চিন্তামণিকে একেবারে বাড়ি ছাড়া করে দেওয়া হলো। সে নাকি আর কলকাতা শহরেই থাকতে পারবে না।

দিবাকরের স্ত্রী সোহাগবালার কর্তৃত্ব অবশ্য এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। তার প্রবল ব্যক্তিত্ব দমন করার সাধ্য কারুর নেই। এখনো সকালবেলা পানের বাটা হাতে নিয়ে বারান্দার জলচৌকিতে বসে সোহাগবালা হুকুমের পর হুকুম চালায়। রান্নাবান্নার ব্যবস্থা থেকে আর সব কিছুই হয় তার নির্দেশে। এই ক'-বছরে আরও অসম্ভব বেশী মোটা হয়ে গেছে সোহাগবালা, এখন আর সে নিজে নিজে হাঁটতে পারে না। দুজন দাসী দুদিক থেকে তাকে ধরে ধরে এনে বসিয়ে দেয় বারান্দায়। ঐটুকু পদচারণার পরিশ্রমেই তার শরীর থেকে স্বেদ নির্গত হয় গল গল করে। গরম সে সহ্য করতে পারে না একেবারেই, গ্রীষ্মকালে গায়ে কাপড় রাখতেও যেন তার কষ্ট হয়। শুধু একটা পাতলা ফিনফিনে সাদা ফরাসডাঙার শাড়ি পরে থাকে। শরীরে যত বেশী মেদ বর্ধিত হচ্ছে, তত ফর্সাও হচ্ছে তার গাত্রবর্ণ। সেই পাতলা শাড়ি ভেদ করে দেখা যায়। তার পাশ বালিশের মতন বিশাল দুটি স্তন এবং সিঁড়ির মতন পেটের ভাঁজ। আঁচলের মধ্য দিয়ে হাত গলিয়ে দিয়ে সেখানকার ঘামাচি চুলকোতে চুলকোতে সোহাগবালা হাঁক দেয়, কই রে দুজ্জোধন! মাচের মুড়ো দুটো দেকালি নি? হ্যালা গোপালী, পশ্শু তোকে ঘিয়ের টিন ভরে দিলুম আর এর মধে ফৌত হয়ে গেল? চ্যায়ারাখানা অমন খোলতাই হয়েচে, আজকাল বুজি গতরেও ঘি মাকচিস? গতরসোঁগা, নিমকহারাম, লক্ষ্মীছাড়া...।

স্বগ্রামে দিবাকর দুখানি পাকা বাড়ি বানিয়েছে, পুকুর কাটিয়েছে, মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রায়ই সে স্ত্রীকে বলে দেশে গিয়ে সেখানকার সংসারের ভার নিয়ে থাকতে। সন্তান-সন্ততি কিছু হলো না, এখন এই বয়েসে তো ধর্মকর্ম করবারই কথা। তাছাড়া সেখানে দিবাকরের দুই ভাইয়ের পরিবার সব লুটে

পুটে খাচ্ছে। কিন্তু সোহাগবালা কিছুতেই যাবে না। সেখানে কি সে এতগুলো দাসদাসীর ওপর কর্তৃত্ব করতে পারবে? তাছাড়া চুরির নেশা বড় নেশা, নিজের সংসারে গেলে সোহাগবালাকে শুধু খরচই করতে হবে, আর এখানে চাল-ডালের পাহাড়ে সে গড়াগড়ি দিতে পারে, সাঁতার দিতে পারে ঘি-তেলের সমুদ্রে। যদিও গড়াগড়ি দেওয়া কিংবা সাঁতারকাটার মতন শারীরিক শক্তি আর তার নেই, প্রায়ই বাত ব্যাধিতে তাকে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়তে হয়।

প্রথম প্রথম অন্যান্য দাসদাসীদের দেখে থাকোমণি বুঝেছিল যে সোহাগবালার সকল রকম অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে যাওয়াই এ বাড়ির নিয়ম। কারণ, সোহাগবালার নামে কারুর কাছে কখনো নালিশ চলে না। ওপর মহলের কারুর সঙ্গে কথা বলারই অধিকার নেই নীচতলার ভৃত্যদের। গুরুতর কোনো ব্যাপার ঘটলে সে খবর জানাতে হয় দিবাকরকে। রান্নাঘরের দুজন ঠাকুর নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে একজন একটি জ্বলন্ত কাঠি তুলে মেরেছিল অন্য জনের মাথায়। সে ঘটনা ওপরতলার বাবুদের কর্ণগোচরও হয়নি। যা কিছু প্রতিবিধান তা দিবাকরই করেছিল। যে পাচকটি মার খেয়েছিল, তাকেই বরখাস্ত করে দেয় দিবাকর। সুতরাং সোহাগবালার হুকুমে খুন্তি পুড়িয়ে পিঠে ছ্যাঁকা দেগে দেবার শাস্তি দেওয়া হয় যখন কোনো অবাধ্য দাস-দাসীকে, তখন সে ঘটনা দিবাকরকে জানানোও অর্থহীন।

বিশ বাইশটি দাস-দাসীর মধ্যে দু-চারজনকে অবশ্য হঠাৎ হঠাৎ দয়া-দাক্ষিণ্য দেখায় সোহাগবালা। এর কারণ সহজে বোঝা যায় না। কোনোদিন যদি সন্ধের পর সোহাগবালা কোনো দাসীকে তার পা টিপে দেবার জন্য নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে যায়, তা হলেই বুঝতে হবে যে সেই দাসীর কপাল ফিরেছে। থাকোমণি অবশ্য গোড়ার থেকেই যে সোহাগবালার বিষ নজরে পড়েছিল, তা কাটিয়ে উঠতে ঢের সময় লেগে গেছে।

দুলালকে আর দিনের বেশীর ভাগ সময়ই কাছে পায় না থাকোমণি। দুলাল থাকে ওপরতলাতেই, সে ছোটবাবুর খাস ভৃত্য হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে, এজন্য দুটি টাকা মাইনেও বরাদ্দ হয়েছে তার এবং ভালোমন্দ খেতেও পায়। সে নবীনকুমারের খেলার সঙ্গী, এই খেলার একটি অঙ্গ প্রহার সহ্য করা, দুলালচন্দ্র এই বয়েসেই শিখে নিয়েছে, যে মনিবের হাতে প্রহার খেলে প্রতিবাদ করতে নেই। রূপালী রঙ করা কাঠের তলোয়ার নিয়ে লড়াই করতে করতে দুলালচন্দ্র নিজেই এক সময় ইচ্ছে করে ধরাশায়ী হয়, নবীনকুমার তার বুকের ওপর চেপে বসে গলায় তলোয়ারের পোঁচ দেয়। ব্যথা পেয়ে দুলালচন্দ্র যত হাসে ততই নবীনকুমার মাত্রা বাড়ায় অত্যাচারের এবং শেষ পর্যন্ত দুলালচন্দ্রের চোখ দিয়ে জল বার হতে দেখে তৃপ্ত হয় সে। অবশ্য নবীনকুমার ভালোও বাসে দুলালচন্দ্রকে, সে শুধু ওকে তার সুস্বাদু খাদ্যেরই ভাগ দেয় না, তাকে সে বিদ্যাশিক্ষায়ও সাথী করে নিয়েছে। দুলালচন্দ্র এর মধ্যেই বাংলা যুক্তাক্ষর সমন্বিত "দাতাকর্ণ" বইটি পড়তে পারে।

মানুষ বেশীদিন একেলা থাকতে পারে না। পুত্র সংসর্গ বঞ্চিতা হয়েই থাকোমণি আস্তে আস্তে অন্য দাসদাসীদের সঙ্গে মিশতে শুরু করে। দাসদাসী মহলের প্রধান বিলাসিতাই হলো নানা রকম কুৎসা রটনা। কলকাতার সমস্ত বড় বড় ঘরের গুপ্ত কাহিনীই যেন তাদের নখদর্পণে। এমন কি কোন্ বড় মানুষ ওপরে ওপরে বড়মানুষী ঠাঁট বজায় রাখলেও ভেতরে ভেতরে সে ফোঁপরা হয়ে গেছে, সে সব গূঢ় কথাও তাদের অজানা নয়।

অধঃপতিত ধনী তাদের কাছে অতিশয় কৃপার বস্তু। যতদিন ঐশ্বর্যের রবরবা, ততদিন এইসব মানুষরা দেবতা স্থানীয়, স্বর্গ থেকে পতন হলেই দেখতে পাওয়া যায় তাদের খড়ের শরীর। দাসদাসীরা তাদের নিয়ে হাসাহাসি করে। দ্বারকানাথ ঠাকুরকে এরা বলে দ্বারিকা মহারাজ, দাস-দাসীদের চোখে তিনি ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য, সেইজন্যই তাঁর মহারাজ উপাধি এরাই দিয়েছে, কিন্তু তাঁর পুত্রকে এরা বলে দেবাঠাকুর। সেই দেবাঠাকুর নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করেছেন বলে তাঁর প্রতি এদের অসীম ঘৃণা। গ্রাম থেকে আসা এই সব সর্বহারা পরিবারের লোকেরা বড় মানুষদের দারিদ্র্য কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারে না। বস্তুত মল্লিক বাড়ির ছোট বধূর এক মুসলমানের সঙ্গে পলায়নের কাহিনীর চেয়েও যেন এই দেবাঠাকুরের অধঃপতনের গল্প দাস-দাসীদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় বোধ হয়।

একদিন নকুড় সন্ধেবেলা ঢুকে পড়েছিল থাকোমণির ঘরে। চরসের নেশায় নকুড়ের চোখ দুটি টকটকে লাল, তার গায়ে অসুরের শক্তি। নকুড় সম্প্রতি বাজার সরকারের পদে উন্নীত হয়েছে, ফলে

সে আর এখন ঠিক ভৃত্য শ্রেণীর মধ্যে নেই, অন্যরা তাকে নোক্‌ড়োদাদা বলে ডাকতে শুরু করেছে। ইদানীং মাছের দর বেশি চড়া, রুই-কাৎলার দর উঠেছে আট টাকা মণ, নকুড় তাও দশ টাকা মণ হিসেবে চালায়। এ বাড়িতে রোজ কিছু না হোক আট-দশ সের মাছ আসে, অর্থাৎ নকুড়ের রোজ এক অধুলি উপরি রোজগার, তার থেকে এক সিকি যদিও দিতে হয় সোহাগবালাকে, তবু নকুড়কে দেখলেই বোঝা যায় তার বেশ টাকার গরমাই হয়েছে।

ছেলে থাকে ওপরে বাবু মহলে, তাই থাকোমণি ঘরে ছিল একা, হঠাৎ নকুড়কে দেখে সে আঁতকে উঠেছিল। নকুড় অতি মিঠে গলায় বলেছিল, আর কতদিন শুকিয়ে থাকবি পেয়ারী ? আজ তোর নরম হাতের ছিলিম টানবো।

ভৃত্যমহলে গাঁজা, গুলি, চরসের নেশা প্রায় সবাই করে, স্ত্রীলোকেরাও বাদ যায় না। কর্তারা নীচতলার কোনো খবরই রাখেন না। ভৃত্যরা শুধু এক ব্যাপারে সাবধান থাকে, যাতে কোনো রকম গোলমাল ওপরে না পৌঁছোয়। সেইজন্যই সুরাপান এখানে নিষিদ্ধ। সুরাপান করলেই হল্লা করার একটা প্রবৃত্তি জাগে বলে কারুর যদি কোনোদিন ঐ তৃষ্ণা খুব পায়, তাহলে সে সেদিন বাড়ির বাইরে রাত কাটিয়ে আসে।

থাকোমণি বলেছিল, ওমা, ওকি, ওকি !

নকুড় তার পাশে বসে পড়ে আদরকাড়া কণ্ঠে বলেছিল, ছিলিম সাজতে জানিস না, পেয়ারী ? আয় আমি তোকে শিক্যে দিচ্চি !

এর পর সে ছিলিম টানার সঙ্গে সম্পূর্ণ, সম্পর্ক বিরহিত কারণে থাকোমণির আঁচল টানার চেষ্টা করেছিল।

থাকোমণি সেবার অবশ্য পালিয়ে বেঁচেছিল। কোনোরকম চিন্তা না করেই সে সহজাত বুদ্ধিতে বুঝেছিল যে বাঁচবার একমাত্র উপায় সোহাগবালার কাছে আশ্রয় নেওয়া। নকুড়ের মতন শক্তিশালী ব্যক্তিও সোহাগবালার সামনে এসে জুলুম করার সাহস দেখাবে না।

সোহাগবালা জিজ্ঞেস করেছিল, ও মা, অমন হা-ঘরে মাগীদের মতন দম ফাটাচ্চিস কেন ! কী হয়েচে লা ?

থাকোমণি এটুকুও বুঝেছিল যে নকুড়ের নামে কোনো নালিশ করা ঠিক হবে না। নীচতলার জগতে কোনো পুরুষের নামে কোন স্ত্রীলোকের নালিশ জানাবার নিয়ম নেই। যাবতীয় শাস্তি স্ত্রীলোকদেরই প্রাপ্য।

থাকোমণি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে ছিল।

—ভূত দেকিচিস নাকি ? মুখ অমন আমসি পারা হয়ে গ্যাচে কেন ?

এই ব্যাপারটা মেনে নেওয়াই সুবিধাজনক বলে থাকোমণি ঘাড় হেলিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ গো মা। ছায়ার মতন কী যেন স্যাঁৎ করে সরে গেল !

—পাইখানার দিক ঠেঙে তো ? বাসী কাপড়ে গিয়িচিলি। কদ্দিন বলিচি সন্ধের পর ওদিকে বাসী কাপড়ে যাবিনি, দেবে একদিন ঘাড় মুচড়ে—

নকুড় অবশ্য সেদিন আর কোনো ঝঞ্ঝাট করেনি। থাকোমণির ঘরেই বসে সে ঘণ্টাখানেক ধরে চরস পুড়িয়ে পুড়িয়ে টানতে লাগলো। আর হাসতে লাগলো ফিক ফিক করে।

সব কিছুই চক্রবৎ পরিবর্তিত হয়। যার আরম্ভ এক রকম, তার শেষও সেই অনুযায়ী হবে। থাকোমণির মতন যারা গা ছাঁটা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে যায়, তারা কেমন ভাবে ফিরে আসবে, তা নকুড় জানে।

এর পর থাকোমণি যেন সত্যিই একদিন বাড়ির মধ্যে ভূত দেখলো। কিছুদিন ধরে তার ওপর ভার দেওয়া হয়েছে সন্ধেবেলা বাতি জ্বালানোর। ওপরতলায় বাতি জ্বালাবার আলাদা লোক আছে, থাকোমণি শুধু রান্না ঘর, ভাঁড়ার ঘর, জলের ঘর, আনাজের ঘর আর ভিতর মহলের এক তলার বিভিন্ন কুলুঙ্গিতে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালায়। গন্ধকমাখানো একটি পাটকাঠি এক হাতে, অন্য হাতে তেলের ডিবে নিয়ে ঘোরে থাকোমণি।

মাঝ মহলের অব্যবহৃত বৈঠকখানার সামনের বারান্দার কুলুঙ্গিতে রাখা সেজ বাতি জ্বালতে গিয়ে থাকোমণি দারুণ ভাবে চমকে উঠলো। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দিবাকর। বৈঠকখানার দরজাটা ঠেলা দিয়ে খুলে দিবাকর বললো, আয় !

বড়বাবু তখনো বেঁচে, কিন্তু পর পর কয়েকদিন বাড়ি ফিরছেন না। বাবুর বড় ছেলে গঙ্গানারায়ণ গেছে মহাল পরিদর্শনে। বিধুশেখর সকালে একবার তদারক করে চলে যান, তারপর সারাদিন

দিবাকরই যেন বাড়ির কর্তা। এই সব দিনে দিবাকরও যথেষ্ট নেশাভাঙ করে। অবশ্য সোহাগবালার এমনই দাপট যে দিবাকর কোনোদিন বাড়ির বাইরে রাত কাটাবার সাহস পায়নি।

দিবাকরকে দেখে থাকোমণি ভয়ে একেবারে বাক্যরহিত হয়ে গিয়েছিল। চিৎকার পর্যন্ত করতে পারেনি। দিবাকর যে এমন ব্যবহার করবে, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। পিছন দিকের দালানে এইমাত্র সোহাগবালাকে বসে থাকতে দেখেছে সে, আর এত কাছে দিবাকর তার কাছে এমন প্রস্তাব করছে। দিবাকরের বয়েস প্রায় ষাটের কাছাকাছি, তাকে থাকোমণি প্রায় পিতার মতন মনে করে। তাছাড়া দিবাকরই তো তাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

দিবাকর আবার বললো, ভিতরে আয়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইচিস কি ? অ্যাঁ ? চেহারাখানা তো বেশ খোলতাই হয়েচে।

দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে থাকোমণি সেদিনও দৌড়োলো। আবার আশ্রয় নিল সোহাগবালার কাছে। মুখে কিছু বললো না, শুধু থরথর করে কাঁপতে লাগলো ভয়ে।

সোহাগবালা ধমকে বললো, আ মর, এ আবাগীর বেটির দেকচি বেশী বেশী ভয় ! মূচ্ছো যাবে একেবারে। বাড়ির মধ্যে ভূত আসবে ? অ্যাঁ ? এ বাড়িতে নারায়ণ প্রিতিষ্ঠে করা আছে, ভূতের বাপের সাধ্যি কি এর ত্রিসীমানায় পা বাড়ায় !

সেদিন সারারাত ঘুম আসেনি থাকোমণির। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে। সে বুঝেছে, তার যৌবনের প্রতি চিল শকুনের দৃষ্টি পড়েছে। কয়েক বছর দু-বেলা পেটপুরে খেয়ে জেল্লা ফিরেছে তার শরীরের। আরশিতে নিজেকে দেখে সে নিজেই যেন চিনতে পারে না। পুরুষ মানুষের দৃষ্টি যখন তার গায়ে বেঁধে, তখন এক ধরনের সুখানুভূতিতেও শিরশির করে তার সর্বাঙ্গ। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়ে মাতু বলে সেই মেয়েটির কথা। সে হতভাগিনী পোয়াতী হয়ে পড়েছিল, তারপর সেই ভুলের মাসুল হিসেবে তাকে প্রাণ দিতে হয়। তারপরেও ভব নামের একটি দাসী ঐ একই ভুল করে। সে অবশ্য প্রাণে মরেনি কিন্তু গর্ভ নিষ্কাষণের পর তার শরীর শালিকের বাচ্চার মতন এমনই শুকিয়ে হাড়-বের-করা হয়ে যায় যে এখন আর কেউ তার দিকে তাকিয়েও দেখে না।

সেই রাত্রেই থাকোমণির ইচ্ছে হয়েছিল ও বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবে। বিশ্বসংসারে তার ছেলে দুলালচন্দ্র ছাড়া আর কেউ নেই। ছেলের হাত ধরে পথে বেরিয়ে পড়লে সে ভিখ্ মেঙেও দিন চালাতে পারবে। এ শহরে কাঙালীরও অন্ন জুটে যায়। তবু তো থাকোমণির মান বাঁচবে !

থাকোমণি অনায়াসেই চলে যেতে পারতো। কেউ তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখেনি। এক বাড়ির দাসদাসীরা অন্য বাড়িতে কাজ পেয়ে চলে যায়। কেউ তাদের বাধা দেয় না। কিন্তু আমরা পূর্বেই খাঁচার দরজা খোলা পাখির উল্লেখ করেছি।

সম্মান রক্ষার জন্য পুত্রের হাত ধরে থাকোমণির পথে বেরিয়ে পড়ার শুভ সঙ্কল্প ক্রমশই পিছিয়ে যায়। বাবুদের উচ্ছিষ্টান্নও দুলালের কাছে রাজভোগের মতন, থাকোমণি নিজেও কোনোদিন বড় মাছের কাঁটা চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খায়নি—এসব ছেড়ে অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে যেতে তার আর পা ওঠে না।

তারপর একদিন তার ডাক পড়ে সোহাগবালার ঘরে। শীতের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সোহাগবালার বাতের ব্যামো বৃদ্ধি পায়। কয়েকদিন ধরে সে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী। থাকোমণি ইদানীং সোহাগবালার খুব ন্যাওটা হয়ে গেছে, প্রায় সর্বক্ষণ তার কাছাকাছি থেকেছে। সেই সুবাদেই বোধ হয় সোহাগবালার সেবার জন্য থাকোমণিকে পছন্দ করা হয়। সন্ধ্যাকাল, দুলাল তখনও ওপর মহলে নবীনকুমারের সঙ্গে রয়েছে, নবীনকুমার ঘুমিয়ে না পড়লে সে নীচে নামবে না, এই সময় থাকোমণি নিজের ঘরে এসে কাপড় বদলে সোহাগবালার ঘরের দিকে যায়। সোহাগবালার ছুঁৎমার্গ আছে, বাসী কাপড় পরে কেউ তার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে না।

থাকোমণির যাবার সময় অন্য দাসীরা তার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসে। এতদিনে থাকোমণির কপাল ফিরলো, আর কোনোদিন সোহাগবালা গালমন্দ করে তার বিষ ঝাড়বে না থাকোমণির ওপর। কয়েকজন দাসী কী সব মন্তব্য করে, থাকোমণি ঠিক বুঝতে পারে না।

নীচতলায় সোহাগবালার অধিকারে আছে তিনখানা কুঠরি। নীচ মহলে বেশ কয়েকটি ঘরই সারা বছর অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকে, ইচ্ছে করলে সোহাগবালা তার সব ক'টাই ব্যবহার করতে পারে।

যত মোটা হচ্ছে ততই সোহাগবালার বিছানার গদি হচ্ছে পুরু। কর্তাদের বাতিল করা বিশাল একটা পালঙ্ক তার শয়নকক্ষে রয়েছে। সোহাগবালা ব্যথায় উঃ আঃ করছিল, এক গলা ঘোমটা দিয়ে এসে থাকোমণি তার পদসেবা করতে লাগলো। ভীমের গদার মতন মোটা মোটা পা সোহাগবালার, কিন্তু মাংস যেন নরম তুলতুলে, হাত দিলে আঙুল বসে যায়।

আধ ঘণ্টাটাক সেবা নেবার পর সোহাগবালা খানিকটা আরাম বোধ করার পর ডাকলো, এই মেয়ে, ইদিকে আয়, আমার সামনে ডাঁড়া।

থাকোমণি এসে তার শিয়রের কাছে দাঁড়ালো।

সোহাগবালা বললো, মুখের কাপড় তোল।

থাকোমণির মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো সোহাগবালা। তার আজকের দৃষ্টি কণ্ঠস্বর, সবই যেন অন্য প্রকার। থাকোমণির মুখে সে কী দেখছে তা সেই জানে।

একটু পরে সে বললো, পাশের ঘরে যা। তোদের গোমস্তাবাবুর জ্বর হয়েচে। যদি মাতা টিপে দিতে বলে দিবি। যদি পা টিপে দিতে বলে পা টিপে দিবি। যা—

থাকোমণি স্থাণু হয়ে গেল। সোহাগবালা নিজে তাকে দিবাকরের কাছে যেতে বলছে! এই দিবাকর, একদিন তাকে ফাঁকা অন্ধকার বৈঠকখানা ঘরের দরজা খুলে বলেছিল, আয়। সোহাগবালা নিশ্চয়ই সে কথা জানে না। এখন কি সে কথা থাকোমণির বলে দেওয়া কর্তব্য? কিন্তু কোনো পত্নীর কাছে কি কেউ পতির নিন্দা করে? কিংবা তেমন করেও কি কিছু লাভ হবে!

থাকোমণির মনে হলো, সেই মুহূর্তে সে মরে গেলেই যেন ভালো হয়।

সোহাগবালা আবার হুকুমের সুরে বললো, যা। ভয় নেই!

থাকোমণি এবার আর পালিয়ে গেল না। অচৈতন্যের মতন সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল পার্শ্ববর্তী কক্ষের দিকে।

শয্যা শূন্য, সেখানে দিবাকর নেই। সে দাঁড়িয়েছিল দ্বারের পাশে, উৎসুক প্রতীক্ষায়। থাকোমণি ঘরে ঢোকা মাত্রই দিবাকর তাকে দু' হাতে চেপে ধরলো। জ্বরো রুগীর মতন তপ্ত তার হাত, কিন্তু এ জ্বর অন্য রকম।

দিবাকর তাকে টেনে নিয়ে গল শয্যার দিকে। থাকোমণি কোনোক্রমে একবার বললো, ওগো, আমায় দয়া করুন গো বাবু!

তার উত্তরে দিবাকর বললো, চুপ, টু শব্দটি করবিনি। গলা টিপে দোবো একেবারে।

অর্ধ প্রহর পরে সে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো থাকোমণি, তখনও সে কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

সোহাগবালা ঠিক সেই দ্বারের দিকেই চক্ষু নিবদ্ধ করে পাশ ফিরে ছিল। থাকোমণি বেরুতেই সে অঙ্গুলির ইঙ্গিত করে বললো, ডাঁড়া!

তারপর কোনোক্রমে উঠে বসবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে বললো, উফ্, নিজে পাচ্ছিনি ; শোন, ডান দিকের ঐ কুলুঙ্গিতে দ্যাখ একটা বেতের ঝাঁপি রয়েচে, সেটা নিয়ায় আমার কাচে। পেঁচোয় পাওয়ার মতন হাঁ করে ডাঁড়িয়ে রইলি কেন, যা বলচি শোন! বেতের ঝাঁপিটা আমায় দে।

থাকোমণি কান্না থামিয়ে সোহাগবালার হুকুম তামিল করতে হলো। বেতের ঝাঁপি থেকে কয়েকটি শিকড় বাকড় বার করে সেগুলো থাকোমণির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, এগুলো এখুনি বেটে খেয়ে নিগে যা। ভয় নেই। আমার কতা শুনে চলবি, ঠিক থাকবি। তেত্রিশ বছর হলো বে হয়েছে, একদিনও তোদের গোমস্তাবাবুকে বাড়ির বাইরে রাত কাটাতে দিইনি। পুরুষ মানুষকে ধরে রাকা কি যে-সে কতা! তার ওপর ভগমান আমার কপালে ছেলেপুলে দিলেন না!

বালিশের তলা থেকে একটি নতুন শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ি বার করে সেখানিও থাকোমণির হাতে তুলে দিয়ে বললো, এ কাপড়টা য্যানো আগেই পরে ফেলিসনিকো। এর পর যেদিন ডাকবো, চান-টান করে এই নতুন বস্তর পরে আসবি—! এখন যা—!

এর পরেও থাকোমণি স্বেচ্ছায় মরলো না কিংবা ছেলের হাত ধরে পথে বেরিয়ে পড়লো না। দু-তিনদিন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদলো শুধু। দুলাল তার মাকে অনেকদিন কাঁদতে দেখেনি। রাত্রে শুয়ে শুয়ে একদিন মায়ের ফোঁপানি শুনে জিজ্ঞেস করেছিল, তোর কী হয়েছে মা?

থাকোমণি উত্তর দিতে পারে না।

তারপর, পরের সপ্তাহে যখন সোহাগবালা থাকোমণির বদলে অন্য একজন দাসীকে ডেকে পাঠালো, সেদিন, বিস্ময়ের কিছু নেই, থাকোমণির খানিকটা ঈর্ষা হলো পর্যন্ত। সেদিনও তার চোখ

ঠেলে জল বেরিয়ে আসতে চাইছিল। অবশ্য পরবর্তী সপ্তাহে তার আবার ডাক পড়লো। তারপর প্রায় প্রতি মাসেই নিয়মিত দু-একবার।

এবং একদিন নকুড়ও এলো তার ঘরে। ঘোলাটে চক্ষু ও অসম্বৃত কণ্ঠে নকুড় বললো, সেই তো মল খসালি, আগে শুধু এঁটো হলি! তারপর থাকোমণিকে সবলে আঁকড়ে ধপাস করে পড়ে গেল মেঝের ওপরে। সেদিন নকুড়কে বাধা দেবার মতন শুধু শারীরিক জোর নয়, মনের জোরও অবশিষ্ট ছিল না থাকোমণির। এমন কি, এরকম ঘটনা কয়েকবার ঘটবার পর নকুড়কেই বেশী পছন্দ করে ফেললো থাকোমণি। দিবাকর বৃদ্ধ, নকুড় যুবক। দিবাকরের অনেকগুলি দাঁত নেই, আর নকুড় বন্য পশুর মতন হিংস্র।

কিছু দিনের মধ্যেই এই দুই পুরুষ মানুষের সঙ্গে পালা করে মিলন-ভোগ করতে অভ্যস্ত হয়ে গেল থাকোমণি। এবং এর ফলেই হয়তো তার চলনে, বলনে, কথাবার্তায় ব্যক্তিত্বের ছাপ এলো, এতদিন পর সে নারী হিসেবে নিজের মূল্য বুঝতে পেরেছে।

কয়েক দিন ধরে দুলালচন্দ্রের জ্বর। তার জন্য নবীনকুমার এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে স্বয়ং এসে দুলালকে দেখে গেছে। কোনো দাসীর ঘরে বাবুদের ছেলের আসা প্রায় এক অসম্ভব ঘটনা। কিন্তু নবীনকুমার বায়না ধরলে তা রোধ করার ক্ষমতা কারুর নেই। কয়েক দিন দুলালচন্দ্র একেবারে নেতিয়ে পড়েছিল, ভয়ে উৎকণ্ঠায় থাকোমণিও প্রায় মুমূর্ষুর মতন হয়ে গিয়েছিল। ঐ ছেলে ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই, ছেলের কিছু হলে সে আর বাঁচবে কী নিয়ে! কাল থেকে অবশ্য দুলালচন্দ্র আবার ভালোর দিকে, বোঝাই যায়, তার বিপদ কেটে গেছে। এই সময়ে সোহাগবালা অনেক সাহায্য করেছে তাকে, লোক পাঠিয়ে কোবরেজ মশাইদের কাছ থেকে দাওয়াই আনিয়ে দিয়েছে। সোহাগবালার কাছে থাকোমণির কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে পাশে শুয়ে ছিল থাকোমণি, এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। এ আওয়াজ থাকোমণির চেনা। এ নকুড় নয়, ডাক এসেছে দিবাকরের কাছ থেকে। না গিয়ে উপায় নেই। থাকোমণি স্নান করতে গেল।

ফিরে এসে যখন সে শাড়ি বদল করছে, এমন সময় জেগে উঠলো দুলালচন্দ্র। জিজ্ঞেস করলো, মা, কোথায় যাচ্ছিস এখন?

একটু অপ্রস্তুত হয়ে থাকোমণি বললো, কোথাও না! দেখি, একবার বুঝি গিন্নীমা কেন ডেকেচেন।

এর পর স্বাভাবিক ভাবেই ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগলো দুলালচন্দ্র। সে এখন মাকে ছেড়ে থাকতে চায় না। থাকোমণি যতই বোঝায় যে একটু শুয়ে থাক আমি আসচি, সে বুঝবে না। অসুস্থ হলে মায়ের ওপর অযৌক্তিকভাবে বেশী জোর খাটাবার একটা অধিকার সব সন্তানদেরই বর্তে যায়। সেই অনুযায়ী দুলালচন্দ্র আনুনাসিক কান্না জুড়ে দেয় এবং মায়ের আঁচল টেনে ধরে।

বেশী দেরি করলে সোহাগবালা আর দিবাকর রাগ করবে। অনেক চেষ্টা করেও যখন দুলালকে বোঝানো গেল না, তখন বিরক্ত হয়ে থাকোমণি খুব জোরে তাকে একটা থাবড়া কষিয়ে দিল। গরগরিয়ে বললো, তুই মর, মর, মরতে পারিস না! তুই মরলে আমার হাড় জুড়োয়!

বারাসতের বালিকা বিদ্যালয়ের ঘটনা নিয়ে শহরে খুব শোরগোল চলছে।

এত বড় শহরে বালিকাদের শিক্ষার জন্য আজ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা করা গেল না। এক একবার উদ্যোগ হয় ও ভেস্তে যায়। খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারিকাগণ দু-একটি স্কুল খুলেছেন অবশ্য কিন্তু সেখানে সম্ভ্রান্ত দেশীয় ব্যক্তিগণ কেউই তাঁদের কন্যাদের পাঠাতে চান না। মুসলমান সমাজে কঠোর পর্দা প্রথা, তাদের বালিকারা বাইরে পড়তে যাবে না। হিন্দু পরিবারের অবরোধ একটু একটু করে ভাঙছে, যদিও জাত নষ্ট

হবার ভয় এখনো যায়নি। এ ভয় সম্পূর্ণ অমূলকও নয়, মিশনারিরা যেন রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের মতন জোর করে ছেলেমেয়েদের ধরে ধরে খ্রীষ্টান করার জন্য ব্যগ্র। এই অবস্থার মধ্যে বারাসত নামে ক্ষুদ্র পল্লীর স্থানীয় অধিবাসীদের চেষ্টায় একটি দেশীয় বালিকা বিদ্যালয় দিব্যি চলছে। এজন্য বারাসতবাসীরা সারা দেশের প্রশংসাভাজন হয়েছিল। বিশেষত প্যারীচরণ সরকারের পরিশ্রম ও উদ্যোগেই স্কুলটি চলছিল বলে সবাই তাঁকে ধন্য ধন্য করে। হঠাৎ একটি উল্টো ব্যাপার ঘটলো।

বারাসতের ঐ বিদ্যালয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবে একজন ইংরেজ সস্ত্রীক গিয়েছিলেন সভাপতি হিসেবে। একটি অল্প বয়েসী বালিকার কবিতাপাঠ শুনে মোহিত হয়ে ইংরেজ পুরুষটি আদর করে তার গাল টিপে দেন। অমনি অভিভাবকদের মধ্যে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। একদল বললে, হিন্দু কন্যাকে ম্লেচ্ছ ছুঁয়েছে বলে মেয়েটির জাত গেছে। কেউ কেউ এমন কথাও বললে যে ইংরেজের স্পর্শে মেয়েটির শ্লীলতা হানি হয়েছে। সাহেবটি অপ্রস্তুতের একশেষ। শেষ পর্যন্ত ব্যাপার এমন দাঁড়ালো যে স্কুলটি উঠে যাবারই উপক্রম। স্কুলের শিক্ষকদের ধোপা নাপিত বন্ধ হলো, এমনকি স্থানীয় জমিদার ডাকাত লেলিয়ে তাঁদের প্রাণে মারবারও চেষ্টা করলেন।

শহরের পত্র-পত্রিকায় এই বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ চললো বেশ কয়েকদিন। পথে-ঘাটেও লোকের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা। হিন্দু সমাজের এবম্বিধ ছুঁৎমার্গের নিন্দে করলে অনেকে, আবার সাহেবদের সংস্পর্শ থেকে বালক-বালিকাদের সম্পূর্ণ দূরে রাখারও পক্ষে কম লোক নেই।

এই ঘটনায় সবচেয়ে বেশী মনে আঘাত পেলেন জন বীট্ন। এ দেশের মানুষের মন যদি এতখানি সংস্কারাচ্ছন্ন হয়, তাহলে এ দেশে বিদ্যার প্রসার হবে কিরূপে। সরকারী মহলেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এ দেশের লোকদের ইংরেজি শেখাবার জন্য সরকার ক্রমশই বেশী উদ্যোগ নিচ্ছিল বটে, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর রাজকর্মচারীদের মত হলো এই যে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে তাঁদের মাথা গলাবার দরকার নেই। এ দেশীয়দের সঙ্গে ব্যবহারে সরকার সব সময় সতর্ক থাকতে চান। মিশনারিদেরও খানিকটা নিরস্ত করা দরকার। ভারতীয়রা অর্থনৈতিক ক্ষতির ব্যাপারটা বোঝে না। শুধু ধর্মে হস্তক্ষেপ করলেই তারা ক্ষেপে ওঠে।

ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিসভায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন জন বীট্ন। ডেভিড হেয়ার মারা গেছেন ছ' বছর আগে, তবু প্রত্যেক বছর তাঁর মৃত্যুদিনে শিক্ষিত হিন্দুরা সভার আয়োজন করে তাঁকে স্মরণ করে। বক্তৃতা হয় ইংরেজি ও বাংলায়। বীট্ন বিস্মিত হয়ে দেখলেন, কোনো কোনো বক্তা হেয়ার সাহেবের কীর্তির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অশ্রুপাত করে। এ জাতি সত্যিই বড় বিচিত্র। এক সাহেবের স্পর্শে এদের জাতি নষ্ট হয় আবার আর এক সাহেবের কথা মনে করে কাঁদে।

সেই সভাতেই কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালীর সঙ্গে পরিচয় হল বীট্নের। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে তিনি খুশী হলেন, তাঁরা যথেষ্ট শিক্ষিত এবং উদার মনের মানুষ। আরও কয়েকটি সভাসমিতিতে দেখা হলো এঁদের সঙ্গে। ভারতীয়দের মধ্যে এঁরা অগ্রণী শ্রেণীর। পরে বীট্ন খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলেন যে এঁরাই এককালের 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে খ্যাত যুব সম্প্রদায়, ডিরোজিও নামে এক অকালমৃত ফিরিঙ্গি যুবক ছিলেন এঁদের শিক্ষাগুরু। এ দেশীয়দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষায় এঁরাই সবচেয়ে বেশী কৃতবিদ্য। তিনি আরও শুনলেন যে এঁদের মধ্যে যাঁর নাম রামগোপাল ঘোষ, তাঁর বাড়িতে প্রায়ই এঁরা একত্রিত হয়ে নানারকম উচ্চাঙ্গের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

বীট্ন রামগোপাল ঘোষকে আমন্ত্রণ জানালেন যেন তিনি এক সন্ধ্যাবেলা বন্ধুবান্ধবসহ তাঁর বাড়িতে চা পান করতে আসেন। রামগোপাল ঘোষ এলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে। এঁদের মধ্যে একজন ব্যতীত আর সকলেই সাহেবী পরিচ্ছদে ভূষিত। যিনি ব্যতিক্রম, তিনি পরিধান করে আছেন ধুতি ও ফতুয়া, মাথায় মস্তবড় টিকি। ইনি বিদ্যাসাগরের বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

মদনমোহনের সঙ্গে রামগোপালের পরিচয় হয়েছে কয়েক বছর আগে। এই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হওয়ায় একটি বিরাট সুফল ফলেছে। ইয়ং বেঙ্গলের দল ইংরেজি শিক্ষার ফলে গোড়ার দিকে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে শুধু ইওরোপীয় সংস্কৃতি অনুকরণ করতেন। তাঁরা মনে করতেন, এ দেশের সব কিছুই কু-সংস্কারে ভরা। মদনমোহনের মাধ্যমে তাঁদের সেই ভুল আস্তে আস্তে ভাঙলো, তাঁরা সন্ধান পেলেন সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট ঐশ্বর্যের, তাঁরা বুঝলেন মাতৃভাষা বাংলার

প্রয়োজনীয়তা। মদনমোহনের বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ হবার পর তাঁরা টের পেলেন, সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে এমন মুক্ত মনের মানুষ থাকতে পারে। এর ফলে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের সঙ্গে মিলন হলো ভারতীয় সংস্কৃতির, মানবপ্রেমের সঙ্গে যুক্ত হলো দেশপ্রেম।

বীট্‌ন খাতির করে বসালেন রামগোপাল ও তাঁর বন্ধুদের। দু-একবার শুধু তিনি ঈষৎ সংশয়পূর্ণ নয়নে তাকালেন মদনমোহনের দিকে। তিনি শুনেছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা অপরের ছোঁয়া কিছু খায় না। তাহলে এই ব্রাহ্মণকে কি কিছু জলখাবার খাওয়ার অনুরোধ জানানো সঙ্গত হবে ? ইনি অপমান বোধ করবেন না তো ?

চতুর মদনমোহন বীট্‌নের সংশয় বুঝতে পেরে নিজেই সহাস্যে বলে উঠলেন, মহাশয়, আমি গো-মাংস ভক্ষণ করি না, কিন্তু চায়ের স্বাদে খুব তৃপ্তি পাই। এবং ইহাও জানি, গো-মাংস ভক্ষণকারীরাই অতি উত্তম চা প্রস্তুত করেন।

বীট্‌ন বাংলা জানেন না, সুতরাং কথাবার্তা চলতে লাগল ইংরেজিতেই। মদনমোহনও বেশ ইংরেজি জানেন, মাঝে মাঝে দু-একটি শব্দে আটকে যান, তখন বাংলায়, ইংরেজি প্রতিশব্দটি জেনে নেন রামগোপালের কাছ থেকে।

মদনমোহন সুরসিক, হাস্যরঙ্গ ছাড়া কথা বলতে জানেন না, সেজন্য অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আড়ষ্টতা কেটে গেল। বীট্‌ন অতি উচ্চ রাজকর্মচারী হলেও তাঁর ব্যবহারে সেরকম কোনো ভাব নেই।

প্রথমে কথা চলছিল আবহাওয়া নিয়ে। বাতাসে এখন অতি উৎকট তাপ, দুজন পাঙ্খাপুলার ঘরে ঝোলানো বিশাল পাখাটি টানছে, তবু গরম কমে না। রামগোপাল বললেন, ইংলণ্ডে এখন বসন্তকাল। বাতাস অতি স্নিগ্ধ। আমাদের এদেশে গ্রীষ্ম ও শীতের মধ্যে আর কোনো ঋতু নাই। মহাশয়ের এ দেশের আবহাওয়ায় কষ্ট হইতেছে না ?

বীট্‌ন বললেন, তেমন কষ্ট কই ? আপনাদের দেশে ঘন ঘন বৃষ্টি নামে। আমি বৃষ্টি বড় ভালোবাসি। বৃষ্টিপাত শুরু হইলেই গবাক্ষে দাঁড়াইয়া বাহিরে দেখি। এত তীব্র ধারাবর্ষণ ইংলণ্ডে নাই।

মদনমোহন বললেন, শুধু বৃষ্টি দেখার সুফল নাই। বৃষ্টির সময় নগ্ন গাত্রে বাহিরে দাঁড়াইবেন। তাহাতে ঘামাচি মরিবে!

বীট্‌ন হেসে উঠে বললেন, হাঁ, ঘামাচিতে কিছু কষ্ট পাইতেছি বটে, ঘামাচির এই প্রকার ঔষধের কথা তো আমার জানা ছিল না। মহাশয়কে ধন্যবাদ!

দক্ষিণারঞ্জন জিজ্ঞেস করলেন, যতদূর জানি, মহাশয় আগে সরকারী কর্ম করিতেন না। এখন এই পরিণত বয়েসে হঠাৎ সরকারী কর্ম লইলেন কেন ?

বীট্‌ন বললেন, কারণ ভারতবর্ষে আসিবার আগ্রহ ছিল আমার।

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, সেইরকমই অনুমান করিয়াছিলাম। এই আগ্রহের বিশেষ কোনো কারণ আছে কি ?

তখন বীট্‌ন জানালেন যে, সতীদাহের এক মামলার ব্যাপারে তাঁর প্রথম ভারত সম্পর্কে আগ্রহ জাগবার কথা। তারপর থেকেই তিনি এ দেশ সম্পর্কে অনেক পড়াশুনো করেছেন। কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সতীদাহ প্রথা এ দেশ থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে কি না।

রামগোপাল জানালেন যে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে. তা জোর দিয়ে বলা যায় না। দূর গ্রামাঞ্চলে এখনো এরকম কিছু কিছু ঘটতে পারে। এমন কি এই শহরেও— । তারপর তিনি কিছুদিন আগে তাঁর বাড়ির সামনের সেই ঘটনাটি সবিস্তারে জানালেন। খুব সম্ভবত মেয়েটি সেদিন তার স্বামীর চিতায় পুড়ে মরতেই যাচ্ছিল। মেয়েটি এখনো রামগোপাল ঘোষের বাড়িতেই আছে। এখনও সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি, মাঝে মাঝেই আত্মঘাতিনী হবার চেষ্টা করে।

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, ইহাই আশ্চর্যের কথা, অনেক বালিকা স্বেচ্ছায় মরিতে চায়। কেহ তাহাদের উপর জোর করে না।

মদনমোহন বললেন, জোর নিশ্চয়ই করে। জোর করে এই সমাজ। অসহায় বিধবা বালিকা কোন্ ভরসায়, কাহার ভরসায় বাঁচিবে ?

রামগোপাল বললেন, অশিক্ষাই ইহার জন্য দায়ী। বালিকারা যদি কিছু শিক্ষা পাইত, তাহা হইলে নিজের জীবনের মর্ম বুঝিত। মহাশয়কে একটি প্রশ্ন করিতে পারি কি ? আপনি সরকারের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা, এ দেশে বালিকাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে না ?

বীট্‌ন হেসে উঠে বললেন, বালিকাদের জন্য শিক্ষা ? এ দেশের মানুষ তাহা চায় না। আপনি

বারাসতের ঘটনা শ্রবণ করেন নাই ?

রামগোপাল বললেন, ওরকম দু-একটি ঘটনাতেই পশ্চাদপদ হইলে চলিবে কেন ? আপনার গৃহে আসিবার পূর্বেই আমি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম আপনার নিকট এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব। স্ত্রী শিক্ষার জন্য আমরা কিছু করিতে পারি না ?

বীট্‌ন বললেন, এ দেশে আসিবার আগে হইতেই আমি স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে চিন্তা করিতেছি। বালিকা স্কুল খোলা আমারও উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখন দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতেছি, এ দেশে তাহা সম্ভব নহে।

মদনমোহন বললেন, মহাশয়, এত অল্প সময়েই নিরাশ হইলেন কী প্রকারে ?

বীট্‌ন বললেন, বুঝাইয়া বলিতেছি। আমি সরকারের শিক্ষা বিভাগের প্রধান। কিন্তু আমি ইচ্ছা করিলেই যাহা খুশি করিতে পারি না। অর্থ বরাদ্দের জন্য আমাকেও অন্যদের অনুমতি লইতে হয়। আমি দেখিলাম যে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার কোনো আগ্রহ সরকারের নাই। বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট হবহাউস আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তখনও আমি জেদ ধরিয়াছিলাম ; প্রয়োজন হইলে নিজ জেব হইতে অর্থ ব্যয় করিয়া স্কুল খুলিব। আমি দার পরিগ্রহ করি নাই, আমার নিজের সংসার নাই, যদি নারীজাতির সেবার জন্য কিছু করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবন ধন্য হইবে। কিন্তু বারাসতের ঘটনায় বুঝিলাম, এ দেশের মানুষই স্ত্রী-শিক্ষা চায় না।

দক্ষিণারঞ্জন লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আপনি যদি রাজী থাকেন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আমরা আপনাকে সর্বাঙ্গীণ সাহায্য করিব।

রামগোপাল দক্ষিণারঞ্জনের মতন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়েন না। তিনি ধীর স্বরে বললেন, আমরা এ ব্যাপারে আপনার মতন সমান আগ্রহী। অবশ্য আপনি ভাবিতে পারেন,আমরা নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া স্কুল খুলিতেছি না কেন ? আমরা জানি, বহু লোক আমাদের প্রতিবন্ধকতা করিবে। বলপ্রয়োগেরও চেষ্টা করিতে পারে। বালিকাদের কোনো প্রকার বিপদে জড়াইবার ঝুঁকি নিতে আমরা পারি না। তবে এ দেশের মানুষ রাজশক্তিকে খুব ভয় পায়। সরকার সাহায্য করুক বা না করুক, আপনি ব্যক্তিগতভাবে যদি অগ্রণী হইয়া কোনো স্কুল খুলেন, তাহা হইলেও লোকে আপনাকে সরকারের প্রতিনিধি মনে করিয়া ডরাইবে। আপনার পশ্চাতে থাকিয়া আমরা আপনাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিব।

মদনমোহন বললেন, স্কুল খুলিলে তাহাতে ছাত্রী সংগ্রহের ভার আমার উপর ছাড়িয়া দিতে পারেন। ভুবনমালা ও কুন্দমালা নামে আমার দুইটি কন্যাসন্তান আছে, তাহারাই প্রথম দুই ছাত্রী হইবে। আপনি কোনো সচ্চরিত্র বিবিকে শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিবেন।

বীট্‌ন সবিস্ময়ে বললেন, আপনি ব্রাহ্মণ...আপনার কন্যারা বাড়ির বাহিরে আসিয়া পাঠশালায় যাইবে ? সমাজে আপনি পতিত হইবেন না ?

মদনমোহন বললেন, কেন পতিত হইব ? ব্রাহ্মণ কন্যাদের বিদ্যার্জন তো নতুন কিছু না। চিরকালই করিতেছে। দুই চারিটি উল্লুক না হয় নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিবে, তা করুক।

বীট্‌ন জিজ্ঞেস করলেন, স্ত্রী-শিক্ষার চল আপনাদের মধ্যে আগেও ছিল বলিতেছেন ? আমি কখনো শুনি নাই।

মদনমোহন বললেন, আপনাকে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। পুরাকালে নারীরা পুরুষের সমান শিক্ষিতা ছিল, কয়েকজন বেদের সূক্তও রচনা করিয়াছে। মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্যা আত্রেয়ী অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে পাঠ গ্রহণ করিতে যাইতেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গী ও মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিদর্ভ রাজার কন্যা রুক্মিনী নিজে পত্র লিখিয়া কৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, এ কথা মহাভারতে আছে। উদয়নাচার্যের কন্যা লীলাবতী কতখানি জ্ঞানবতী ছিলেন দেখুন যে তিনি শঙ্করাচার্য ও মণ্ডন মিশ্রের তর্ক-বিচারে মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন। কর্ণাটের রাজমহিষী এবং কবি কালিদাসের পত্নী ছিলেন পণ্ডিতা। বিশ্বদেবী নামে এক নারী গঙ্গাবাক্যাবলী নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। খনা নাম্নী এক নারী জ্যোতিষশাস্ত্র এমন উত্তম জানিতেন যে, এখনও লোকে খনার বচন মান্য করে। আর কত উদাহরণ দিব ? এত প্রাচীনকালেই বা যাইবার প্রয়োজন কী ? হটী বিদ্যালঙ্কার নামে এক প্রসিদ্ধা রমণী বারাণসীতে টোল খুলিয়া বসিয়া এক্ষণে রীতিমতন ছাত্রদের শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার কথা কে না জানে ?

বীট্‌ন বললেন, এ সব কথা আপনারা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতেছেন না কেন ?

মদনমোহন বললেন, করিব, নিশ্চয়ই করিব। বালিকাদের শিক্ষার উপযুক্ত বহি আমি নিজে রচনা করিব।

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, যদি শীঘ্র কার্য শুরু করিতে চান, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের ভবন আমি নিজে দিতে প্রস্তুত আছি। মীর্জাপুরে আমার একটি বৈঠকখানা বাটী খালি রহিয়াছে, সেখানেই স্কুল বসিতে পারে।

বীট্‌ন বললেন, আজই চলুন না। শুভস্য শীঘ্রম্।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বীট্‌ন এবং দক্ষিণারঞ্জনের জুড়িগাড়ি ছুটে চললো মীর্জাপুর—বাহির সিমুলিয়ার দিকে।

দক্ষিণারঞ্জনের বৈঠকখানা বাটীটি সত্যিই দেখবার মতন। বড় বড় খিলান ও দালান সমন্বিত প্রাচীন ঠাটের একটি সুরম্য গৃহ, তার বাইরে চতুর্দিকে বাগান। বাগানে নানাবিধ ফলবান মূল্যবান বৃক্ষ। সেই উদ্যানটি আবার উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। একটি মাত্র প্রবেশদ্বার। বাগানটি আরও প্রশস্ত করবার মানসে দক্ষিণারঞ্জন সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী সাড়ে পাঁচ বিঘা ভূমি নয় সহস্র টাকা মূল্যে ক্রয় করেছেন।

বাড়িটি দেখে সকলেরই পছন্দ হলো। সে রকম একটি বাড়ি ভাড়া দিলে কিছু না হোক মাসে একশত টাকা পাওয়া যায়, তবু দক্ষিণারঞ্জন শুধু ফেলে রেখেছিলেন। মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে এখানে অবসর যাপনের জন্য আসতেন, এখন এক কথায় বাড়ি ও সংলগ্ন জমি দান করে দিতে চাইলেন। মদনমোহন সন্তোষ প্রকাশ করে দক্ষিণারঞ্জনকে বললেন, দ্বারের কাছে যষ্টিধারী দুটি দ্বারবান বসিয়ে দিলেই আর কুমতলবীরা কেউ ভিতরে ঢুকতে পারবে না। আর ইস্কুল পরিচালনার জন্য আমার বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্রকে দলে টানতে চাই, ও-রকম একজন কড়া-ধাতুর মানুষ দরকার।

সিদ্ধান্ত হলো, এই প্রশস্ত সুন্দর ভবনটিতেই স্কুল বসবে। অনেক কথা ঠিক হয়ে গেল সেখানেই। প্রশ্ন উঠলো, স্কুলের নাম কী হবে? রামগোপাল বললেন, ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল বা কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয়ই তো খুব সহজ ও সঙ্গত নাম।

বীট্‌ন বললেন, যদি ইংলণ্ডের রানীর নামে স্কুলের নাম রাখা যায়, তাহা হইলে হয়তো ভবিষ্যতে সরকারী সাহায্য মিলিতে পারে।

মদনমোহন বললেন, "বিকটরিয়া বালিকা বিদ্যালয়", ইহা তো অতি উত্তম নাম। স্ত্রী বিদ্যালয়ের সহিত এ জগতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালিনী রমণীর নাম যুক্ত রহিল।

বীট্‌ন বললেন, আমার ভগিনীর সহিত কুইন ভিকটোরিয়ার পরিচয় আছে। তাহাকে আমি লিখিতে পারি, বোধ করি সে রানীর সম্মতি আদায় করিতে সক্ষম হইবে।

নামের প্রশ্নটি তখনকার মত অমীমাংসিত থাকলেও স্কুল খোলা বিষয়ে কোনো দ্বিমত রইলো না।

অল্পকালের মধ্যেই এক সোমবারে স্কুল শুরু হয়ে গেল। মদনমোহন তাঁর দুই কন্যাকে স্কুল ভবনের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দ্বারের পাশে। হাওয়ায় ফরফর করে উড়তে লাগলো তাঁর দীর্ঘ শিখাগুচ্ছ, মুখে অনাবিল হাসি। স্কুল ভবনের সামনের উদ্যানে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী রিডসডেল নামে এক উচ্চশিক্ষিতা মেম সাদরে ডেকে নিতে লাগলেন বালিকাদের।

প্রথম দিন স্কুলে এলো একুশটি বালিকা, কিন্তু ক্রমশই ছাত্রী সংখ্যা কমতে লাগলো। বালিকাদের কোনো বেতন লাগে না, পুস্তক ও কাগজপত্রও দেওয়া হয় স্কুল থেকে। এমনকি যে সব বালিকার বাড়ি থেকে যাতায়াতের অসুবিধা আছে, স্কুল থেকে তাদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। তবু কয়েক মাসের মধ্যেই ছাত্রীসংখ্যা কমতে কমতে দাঁড়ালো সাতে।

ইতিমধ্যে শহরের কিছু মানুষ ও কয়েকটি পত্র-পত্রিকা এই উদ্যমকে স্বাগত জানালেও বহু লোক আর বহু পত্রিকা নিন্দা-মন্দ ও কুৎসা রটনায় উঠে পড়ে লাগলো। এই বিদ্যালয়ে যায় নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য বালিকারা, তবু তাদের নিয়েই আদিরসের রসিকতা চললো অঢেল। এক পত্রিকার বৃদ্ধ সম্পাদক লিখলেন, বাঘ ও ছাগলের মধ্যে যেমন শুধু খাদ্য ও খাদকের সম্বন্ধ, পুরুষ ও নারীর মধ্যেও তাই।

বীট্‌ন, দক্ষিণারঞ্জন প্রমুখ কিন্তু এতেও দমলেন না। স্কুল তাঁরা চালাবেনই। সাতজন ছাত্রী, তার জন্য মাসে প্রায় আটশো টাকা খরচ। বীট্‌ন মনে মনে কল্পনা করে রেখেছেন একদিন এই স্কুল বিশাল

হবে, শত শত বালিকা এখানে পড়তে আসবে, তখন আরও বড় ভবনের প্রয়োজন হবে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি ইতিমধ্যে কাছাকাছি আরও অনেক জমি কিনে ফেলেছেন। কিন্তু ছাত্রীসংখ্যা প্রতিনিয়ত কমতে থাকায় তাঁর কল্পনা বুঝি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। শুভার্থীরা বললেন, অপপ্রচারের ফলাফল যাই হোক, ছাত্রীসংখ্যা হ্রাসের আর একটি কারণ আছে, মীর্জাপুর হলো শহরের এক প্রান্তে, অত দূরে অভিভাবকরা তাঁদের কন্যাদের পাঠাতে ভয় পান। স্কুলটি হওয়া উচিত শহরের মধ্যস্থলে।

বীট্‌ন এ পরামর্শের যুক্তি স্বীকার করে বললেন যে, তবে তাই হোক, শহরের কেন্দ্রেই গড়ে উঠবে নতুন বিদ্যালয় গৃহ। হেদুয়ার পশ্চিম পার্শ্বে অনেকখানি জমি খালি পড়ে আছে, বর্তমানে তা আগাছায় পূর্ণ। কিন্তু সে জমির মালিক সরকার। বীট্‌ন সরকারের কাছে প্রস্তাব দিলেন যে মীর্জাপুরের সমুদয় জমি ও অট্টালিকাটির বিনিময়ে সরকার তাঁদের ঐ হেদুয়ার জমি হস্তান্তর করুন। সরকার এতে আপত্তি করলেন না। বীট্‌ন নিজে যেন সরকারের লোক নন, তিনি এক্ষেত্রে দেশীয় সমাজের প্রতিনিধি।

বৎসর দেড়েকের মধ্যেই একদিন তিনি মহা সমারোহে নতুন বিদ্যালয় ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করালেন। ফ্রি মেশনরা এলো সমারোহ করে। ডেপুটি গভর্নরের পত্নী লেডি লিটলারের হস্ত দিয়ে রোপণ করানো হলো একটি অশোক বৃক্ষের চারা। বীট্‌ন তাঁর ভাষণে বললেন যে, এই বৃক্ষ হোক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির মিলনের প্রতীক। আমি শুনেছি, বাংলায় অশোক কথাটির অর্থ আনন্দ-বনস্পতি। এই বৃক্ষটি শুধু দেখতে সুন্দর নয়, এর সঙ্গে অনেক শুভ ইচ্ছা মিশ্রিত হয়ে আছে। আমি এ কথাও শুনেছি যে প্রাচীন কালে ভারতীয় রমণীরা এই বৃক্ষের কোমল কোরক চিবিয়ে খেতেন তাঁদের সন্তানদের কল্যাণ কামনায়। আরও সুখের কথা এই যে, ইওরোপীয় প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা এই অশোক বৃক্ষের নাম রেখেছেন জোনেসিয়া অশোকা, এই নামের মধ্য দিয়ে তাঁরা স্যার উইলিয়াম জোনসের স্মৃতিকে অমর করেছেন। সেই মহাত্মা উইলিয়াম জোনস এ দেশে তাঁর জীবন ব্যয় করেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতের জ্ঞানের সম্মিলনের জন্য। এই বৃক্ষকে কেন্দ্র করে দূর-দূরান্তে সেই জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ুক।

নতুন ভবন নির্মাণ করতে ব্যয় হবে প্রায় চুরাশি হাজার টাকা, এর মধ্যে পূর্বের বাড়ি ও জমি ছাড়াও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় দান করলেন আরও কয়েক হাজার টাকা। উত্তরপাড়ার বিদ্যোৎসাহী রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এগিয়ে এলেন সাহায্যের জন্য, বর্ধমানের মহারাজা এক সহস্র মুদ্রা দিয়ে নিয়মরক্ষা করলেন। একা বীট্‌নই নিজের সঞ্চয় থেকে ব্যয় করলেন চল্লিশ সহস্র মুদ্রার বেশী। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য, ভবনটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাপ্ত করা। তিনি স্বয়ং এসে প্রায়ই দেখে যান, কাজ কতখানি অগ্রসর হলো। আবার অল্পসংখ্যক ছাত্রী নিয়ে মীর্জাপুরে যে স্কুলটি টিমটিম করে চলছে, সেখানেও তিনি নিয়মিত যান তাদের উৎসাহ দিতে।

একদিন তিনি মীর্জাপুরের বিদ্যালয়ে এলেন ঈষৎ বিষণ্ণ বদনে। তিনি নেটিভদের ব্যাপারে এতখানি উৎসাহী হয়ে পড়েছেন, সর্বক্ষণ নেটিভদের সঙ্গে মেলামেশা করেন বলে তাঁর সহযোগী কোনো কোনো রাজপুরুষ তাঁকে বিদ্রূপ করতে শুরু করেছেন। শুধু এই একটি স্কুল স্থাপন করেই ক্ষান্ত হননি বীট্‌ন। তিনি আরও স্কুল খুলতে উদ্যোগী হয়েছেন। বাংলাভাষার উন্নতির জন্যও তিনি চিন্তা করছেন অনেকখানি। মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া সুচারুভাবে শিক্ষা হতে পারে না। অথচ বাংলাভাষায় উত্তম গ্রন্থ নেই, সেজন্য তিনি স্থাপন করেছেন বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ইংরেজি থেকে বই অনুবাদ করবেন বাংলাভাষায়। যার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়, তাকেই তিনি বলেন, বাংলায় বই লিখুন, বাংলাভাষাকে উন্নত করুন। নারীগণের শিক্ষার জন্য আপনারাও কিছু করুন। বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রের জন্য তিনি একটি সোনার মেডেলও ঘোষণা করেছেন।

স্কুলের জন্য মহারানী ভিকটোরিয়ার নামটি পাওয়া যায়নি। শুধু বিদ্রূপ নয়, সেদিন তাঁর প্রতিযোগী এক রাজপুরুষ তাঁকে ভর্ৎসনাও করেছেন খানিকটা। এ দেশের সরকারকে কিছু না জানিয়ে তিনি সরাসরি ভিকটোরিয়ার এক পার্শ্বচরীর মারফত মহারানীকে এই স্কুলের কথা যে জানাবার চেষ্টা করেছিলেন, তা সঙ্গত হয়নি। সুতরাং স্কুলের নাম ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলই থাকবে। ক্ষুব্ধ হয়ে বীট্‌ন এই স্কুল ও অন্যান্য মফঃস্বল স্কুলের সব বৃত্তান্ত জানিয়ে বড়লাট লর্ড ডালহৌসির কাছে এক দীর্ঘ পত্র পাঠিয়েছেন। তবু তাঁর মনের বিষণ্ণতা কাটেনি।

স্কুলের উদ্যানে তিনি দেখলেন একটি বালিকা বাড়ি যাবার নাম করে কাঁদছে। বীট্‌ন কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেন, মা?

বালিকাটি তাঁর কথা বুঝতে পারলো না, কিন্তু চুপ করে গেল। বীট্‌নের সৌম্য মুখমণ্ডল দেখে

তাঁকে ছাত্রীরা কেউ ভয় পায় না। তিনি মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে মিঠাই বিতরণ করেন। বালিকারা কাড়াকাড়ি করে খায়।

বীটন কাছে এসে বালিকাটির চিবুক স্পর্শ করে বললেন, মা, তুমি রানী হইবে?

মেয়েটি তখনো বুঝলো না। প্যান্ট-কোটধারী বীটন অমনি ধুলোর মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ে বললেন, এই দ্যাখো আমি ঘোড়া হইয়াছি। তুমি আমার পৃষ্ঠে চড়িয়া রানীর মতন আমাকে হাঁকাও।

স্নেহের একটা বিশ্বজনীন ভাষা আছে, যা সব শিশুরাই বোঝে। মেয়েটি ফিক করে হেসে ফেলে বীটনের পিঠে চড়ে বসে বললো, বেথুন ঘোড়া, হ্যাট হ্যাট।

দুই কন্যাকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিলেন মদনমোহন। দ্বারের কাছ থেকে এই দৃশ্য দেখে তাঁর চোখে জল এসে গেল। একটু পরে বীটন খেলা সমাপ্ত করার পর তিনি বললেন, মহাশয়, আপনার তুলনায় আমরা অতি নগণ্য মানুষ!

বীটন লজ্জা পেয়ে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি ছাত্রী সংগ্রহ করিবেন বলিয়াছিলেন, সে কাজ যথেষ্ট করিতেছেন কই? আমার আরও ছাত্রী চাই।

হেদুয়ায় স্কুল ভবনটি প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে, আর এক মাসের মধ্যেই এর দ্বারোদ্ঘাটন করা যাবে। বীটন ভেতরে ভেতরে যেন উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠছেন। সেই শুভ দিনটিতে তিনি কী প্রকার বিশাল উৎসবের আয়োজন করবেন, মনে মনে সেই পরিকল্পনার অন্ত নেই।

ইতিমধ্যে তিনি একদিন গেলেন জনাইতে একটি স্কুল পরিদর্শন করতে। ফেরার পথে সাংঘাতিক বৃষ্টি শুরু হলো। সে বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চলাই দুষ্কর। কিন্তু বীটনের মন পড়ে আছে কলকাতায়, তিনি বৃষ্টিতে ভিজে, সেই জলকাদা ভেঙেই ফিরলেন।

এবং ফিরেই জ্বরে পড়লেন। তিনদিনের মধ্যেই বোঝা গেল তাঁর এই রোগ কালব্যাধি।

পুরো একদিন অচেতন থাকার পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তিনি দেখলেন, তাঁর শিয়রের কাছে দেশী ও ইওরোপীয় শুভানুধ্যায়ীরা সার বেঁধে দণ্ডায়মান রয়েছেন। বীটন প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, স্কুল ভবনে রঙের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে তো?

কয়েকজনের চক্ষে জল এসে গেল। একজন অতিকষ্টে বললেন, রঙ অতি মনোহর হইয়াছে। মহাশয়, আপনি সারিয়া উঠিয়া সব স্বচক্ষে দেখিবেন।

বীটন একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর শান্ত স্বরে তাঁর ভারতীয় বন্ধুদের উদ্দেশে বললেন, আমরা ইংরেজরা মৃত্যুকে ভয় পাই না। আপনাদের মতন আমাদের পরলোকেও বিশ্বাস নাই। জানি, শেষ নিশ্বাসের সাথে সাথেই সব কিছুর শেষ। শুধু দুই একটি বাসনা অপূর্ণ রহিয়া গেল এই যা দুঃখ। আপনাদের নিকট অনুরোধ, দেখিবেন, আমার অবর্তমানে যেন স্কুলটি না মরে।

তারপর তিনি একজন আইনজীবীকে মুখে মুখে তাঁর উইল বলে গেলেন। তাঁর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সবই তিনি রেখে গেলেন স্কুলটির জন্য। যে জুড়িগাড়িটিতে তিনি নিজে চড়িতেন, সেটি প্রত্যহ দাঁড়িয়ে থাকবে বিদ্যালয়ের সামনে। বালিকারা এটিতে করে যাতায়াত করবে।

বীটনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হেদুয়ার পার্শ্বে নবনির্মিত বালিকা বিদ্যালয়টির নামকরণের সমস্যা আর রইলো না। 'বেথুন সাহেবের স্কুল' সকলের মুখে মুখে রটে গেল এই নাম।

কথায় বলে "রাতের রোশনাই, দিনের ছাইগাদা।" দিনের বেলার দৃশ্য দেখে সত্যিই কিছু বোঝার উপায় নেই। এই সব বাড়ি অনেক বেলা পর্যন্ত নিদ্রিত থাকে, গবাক্ষগুলি সব বন্ধ। গোয়ালা গরু নিয়ে দুধ দুইতে এসে হল্লা লাগায়, সহজে দাস-দাসীরাও দুধের পাত্র নিয়ে আসে না। এখানে দাস-দাসীদের মর্জিও অন্যরকম। হীরেমণির গৃহে প্রাতে দশ ঘটিকা পর্যন্ত শুধু এক বালকের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পাঠাভ্যাস করে। সে বালক হীরেমণির পুত্র চন্দ্রনাথ।

রাতে এ গৃহের দ্বিতলের বড় প্রকোষ্ঠে ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে, সেখান থেকে ভেসে আসে হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলার আওয়াজ ও নূপুর নিক্কন। দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে জমকালো ধরনের জুড়িগাড়ি। সঙ্গীত লহরী ছাপিয়েও এক এক সময় মদ্যপায়ীদের স্খলিত কণ্ঠ রাত্রির মসৃণতাকে বিদীর্ণ করে। দিনের বেলায় সব শান্ত, অন্যান্য বাড়িগুলির তুলনায় হীরেমণিদের মতন বারাঙ্গনাদের গৃহ যেন বেশী স্তব্ধ।

হীরেমণির এখন অবস্থা ফিরেছে, শহরের বাবু মহলে তার খুব নামডাক, টাকা-পয়সাও আসছে যথেষ্ট। এখন এ শহরে বারাঙ্গনাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নামডাক কমলাসুন্দরী আর হীরেমণির। এরা শুধু তো দেহপশারিণীই নয়, কমলাসুন্দরী নৃত্যকলা পটিয়সী আর হীরেমণির কণ্ঠের গান যে একবার শুনেছে, সে আর ভুলতে পারে না। হীরেমণির আসল নাম ভুলে গিয়ে লোকে তাকে এখন বুলবুল বলে ডাকে। বুনিয়াদী পরিবারের দোল-দুর্গোৎসবের মজলিশে যখন সাহেব মেমদেরও নেমন্তন্ন হয়, তখন সেখানে কমলাসুন্দরী হীরেমণিদেরও ডাক পড়ে। সাধারণ ছা-পোষা লোকেরা ভাবে হীরেমণির মতন তয়ফাওয়ালি রেণ্ডিরা বুঝি বাড়িতে হীরে মুক্তো চিবিয়ে খায় আর সোনার বিছানায় শুয়ে রূপোর পাশবালিশ জড়ায়। এরা কেউ কোনোদিন দ্বিপ্রহরে গৃহে এলে বিস্ময়ে বাক্‌রহিত হয়ে যেত। কুচোচিংড়ি দিয়ে পুঁইশাকের ডাঁটাচচ্চড়ি হীরেমণির অতি প্রিয় খাদ্য। এক বাটি খেসারির ডাল সে চুমুক দিয়ে খায়। মাংস দেখলে সে নাক সিঁটকোয়, এমনকি বড় জাতের মাছও তার না-পছন্দ, ঐসব মাছে নাকি কাদা কাদা গন্ধ। সে ভালোবাসে পুঁটি, মৌরলা, চাঁদা। দ্বিপ্রহরে সাধারণ কস্তা পাড়ের ডুরে শাড়ি পরে সে যখন রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে পুঁইডাঁটা চিবোয়, তখন তাকে কোনো সাধারণ বাড়ির বউ-ঝি ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। অবশ্য এই সব খেয়েও হীরেমণির রূপ এখনো যেন ফেটে পড়ছে।

সকাল দশটার সময় ঘুম ভাঙার পরেই রাইমোহনের ওপর একটা কাজ বর্তেছে। অবস্থা ফেরার পর হীরেমণির এখন দাসদাসীর অভাব নেই, তবু কোনো প্রয়োজন হলেই সে রাইমোহনের ওপরেই হুকুম চালায়। আজ সকালে হীরেমণি কুয়োতলায় স্নান করতে গিয়েই দেখে যে জল তোলার দড়ি ছেঁড়া, কলসীটিও উধাও। ছিঁচকে চোরেরা প্রায়ই কুয়োতলার কলসী চুরি করে পালায়, সেইজন্য ব্যবহার করার পরই কলসী ভেতরে তুলে রাখতে হয়। কাল সন্ধ্যায় হয়তো কোনো অমনোযোগী দাসী ভুল করে কলসী ফেলে রেখে গিয়েছিল।

হীরেমণি গতকাল মুজরো গাইতে গিয়েছিল শোভাবাজারে, ফিরেছে শেষ রাতে। ঘুম থেকে উঠেই স্নান করা তার অভ্যাস। কলসী নেই আর দড়ি ছেঁড়া দেখেই তার মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল। দাস-দাসীদের সকলকে ডেকে হীরেমণি তার কুৎসিত গালিগালাজের ভাণ্ডার একেবারে উজাড় করে দিল। অবশ্য দাসদাসীরাও এমন বে-আক্কেলে, কেউ দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে চায় না, দোষারোপ করতে লাগলো পরস্পরের ওপর। তারা বলতে চায় যে কলসী চুরি যায়নি। দড়ি ছিঁড়ে কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছে।

তখন হীরেমণির জেদ চাপলো, কুয়ো থেকে সেই কলসী তোলাতে হবে, নইলে সে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যে চুরি যায়নি। একটার জায়গায় দশটা কলসী তখনই হীরেমণি কিনতে পারে, কিন্তু জেদ হচ্ছে জেদ।

হীরেমণি চেঁচিয়ে বললো, সেই হতচ্ছাড়া বে-আক্কেলে মিনসেটা কী করচে? এখনো পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্চে! ওফ্, ভগমান আমার কপালে কত দুঃখই দিয়েচেন! আমায় দেকবার কেউ নেই গা!

হরচন্দ্র বলে যে মাতালটিকে রাইমোহন আশ্রয় দিয়েছিল, সে আজও রয়ে গেছে। এছাড়া আরও দু'জন বৃদ্ধ এখানে আশ্রিত। ভাগ্যহীন বাউণ্ডুলেদের সম্পর্কে রাইমোহনের বেশ দুর্বলতা আছে, সে রকম কারুকে চোখে দেখলে সে ডেকে আনে এ বাড়িতে। হীরেমণি অবশ্য এদের দু' চক্ষে সহ্য করতে পারে না, তবু তার মুখঝোপা সহ্য করে টিঁকে আছে এই তিনজন।

হীরেমণির চ্যাঁচামেচিতে তাদেরও ঘুম ভেঙে গেছে। উঠোনে কুয়োতলায় গামছা পরে দাঁড়িয়ে সে সমানে চালাচ্ছে হাত, পা, মুখ। গামছায় তার সোনার অঙ্গ ঢাকা পড়েছে খুবই সামান্য। আরও বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে লাফালাফি করলে হঠাৎ তার বিবস্ত্রা হয়ে পড়ারও সম্ভাবনা আছে। হীরেমণির সেদিকে হুঁশ নেই। অমন রূপসী একটি নারী এবং গানের জন্য যে কোকিলকণ্ঠী নামে পরিচিতা, তার কণ্ঠ থেকেও যে এত কদর্য কুবাক্যের স্রোত বেরিয়ে আসতে পারে, তা কল্পনা করাই শক্ত।

হরচন্দ্র ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, অ দিদি, আমি দৌড়ে গে একটা কলসী নিয়ে আসবো?

হীরেমণি তার দিকে ফিরে ক্রোধ ঘূর্ণিত নয়নে বললো, দিদি? আমি তোর কোন্ সাতজন্মের দিদি

রে, অলপ্পেয়ে ? দুনিয়ার কোথাও ঠাঁই নেই। তাই এখেনে মাটি কামড়ে পড়ে আচিস, আবার দিদি বলে সোহাগ ! গা জ্বলে যায় !

হরচন্দ্র বললো, চান না করলে যে গা আরও বেশী জ্বলবে ! কলসী এনে দি ?

হীরেমণি বললো, চুপ্ মার ! কেন্, সে কোতায় ? সেই খাল ভরা, ড্যাকরা, খগরাজের মতন চ্যায়রা হতভাগাটা পড়ে পড়ে ঘুমুবে ? তাকে দিয়ে এক তিল উবগার হয় না, তাকে কেউ ডাকতে পাচ্চিসনি ?

রাইমোহনের ঘুম গাঢ়, তাছাড়া নেশার ঘুম, সহজে ভাঙে না। একজন ভৃত্য গিয়ে তাকে ঠেলাঠেলি করতে লাগলো।

চক্ষু রগড়াতে রগড়াতে নেমে এসে রাইমোহন বললো, কী হলো ? আজ আবার কী বৃত্তান্ত ?

হীরেমণি বললো, আমার সব্বোনাশ হলেও তো তুমি চোখ বুজে থাকবে। আদুড় গায়ে সেই কখন থেকে ডাঁড়িয়ে আচি, কেউ একবার ভাবে না আমার কতা !

রাইমোহন অন্যদের কাছ থেকে ঘটনাটি জেনে নিয়ে হীরেমণিকে বললো, এই জন্যই তো তোমায় পই পই করে বলচি, কলসী আর রেকোনি। পেতল কাঁসার জিনিস, তাই চোর ছ্যাঁচোড়ে নিয়ে যায়। আজকাল বালটি বলে একরকম জিনিস বেরিয়েচে, বেশ মজবুত, লোহার তৈরি, তা কেউ নেবে না।

হীরেমণি প্রায় আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, আমি নোয়ার জিনিসের জলে চ্চান করবো ? ওরে আমার পেয়ারের নাঙ রে ! অতি বড় শত্তুর ছাড়া কেউ এমন ধারা কতা বলে ! আমার যদি কেউ হিতকারী হতো তাহলে আমার চ্চানের জন্যে সোনার কলসী থেকে গোলাপ জল ঢেলে দিত ! বলে কিনা নোয়ার জিনিসে জল তুলবে ! সেই জলে চ্চান করে আমার গতরটা পচে যাক, তাতেই তোমাদের সুক হবে ! ওঃ, এত বড় শত্তুরকে ঘরে রেকিচি !

রাইমোহন এক গাল হেসে বললো, আমার তো শত্রু রূপেই ভজনা, তা তুমি জানো না ? তুমি যতই আমায় গালি-গালাজ দাও, ততই আমার কানে সুধা বর্ষণ হয় !

এতে হীরেমণি আরও বেশী ক্রুদ্ধ হয়ে আরও তপ্ত বাক্যস্রোত বইয়ে দিতে লাগলো। রাইমোহন অনবরত কৌতুক চালিয়ে গেল তার সঙ্গে। তারপর সত্যিই একবার হীরেমণির অঙ্গ থেকে গামছা খসে যেতেই রাইমোহন দাস-দাসী ও আশ্রিতদের তাড়া দিয়ে বললো, যা, যা, এখেনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেকচিস ? যা না, মসজিদের পাশের তালাও থেকে জল তুলে নিয়ে আয় !

কিন্তু হীরেমণি তাতেও শান্ত হবার পাত্রী নয়। সে পুকুরের জলে স্নান করবে না, এমনকি অন্য কোনো পাত্রে তোলা জল হলেও চলবে না। আগে তার হারানো কলসীর ব্যাপারটির মীমাংসা করা দরকার। এবং তা রাইমোহনকেই করতে হবে।

সেইজন্য রাইমোহন বউবাজারের মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালো কূয়োর-জিনিস-তোলাবে-গো'র খোঁজে। কিন্তু যখন যে জিনিসটি খুব বেশী প্রয়োজন, তখনই সেটি পাওয়া দুর্ঘট হয়ে ওঠে। যখন প্রয়োজন কোনো পরামাণিকের, তখন দেখা যায় গণ্ডায় গণ্ডায় মুচি। যখন চাই মুড়িওলীকে, তখন চোখের সামনে দিয়ে অনবরত যাবে দইওয়ালা। কূয়োর-জিনিস-তোলাবে-গো'রা অন্যদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে চেঁচিয়ে কান ঝালাপালা করে, আর এখন এই সঙ্কটের সময় তাদের পাত্তা নেই। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর রাইমোহন আরও শঙ্কিত হয়ে উঠলো, এতক্ষণে বাড়িতে কী কাণ্ড ঘটছে কে জানে ! হীরেমণির অঙ্গ থেকে হয়তো আরও কয়েকবার গামছা খসে গেছে। রাত্তিরবেলা বড় বড় রহিস বাবুরা হীরেমণির রূপসুধা সন্দর্শনের জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করেন, সে হীরেমণিই দিনের বেলা যেন কারুকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না।

রাইমোহন একটি নতুন কলসী ও এক গাছি মোটা দড়ি কিনে বাড়ি ফিরলো। হীরেমণি তখন প্রায়োপবেশনের ভঙ্গিতে কূয়োর পাশের পাথরের পৈঠায় বসে আছে গালে হাত দিয়ে। নতুন কলসী দেখে সে আবার রাগে জ্বলে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই রাইমোহন হাত তুলে বললো, রসো, রসো। সে মুখপোড়াদের একটারও দেকা পেলুমনিকো, তাই আমি নিজেই নাবচি। আমি নিজে এই কূয়োর মধ্যে ডুববো। তোমার জন্য আমি কী না পারি।

তারপর সে কূয়োর ধাপের ওপরে উঠে বসে বললো, এক পাড়াগেঁয়ে বাঙালের মুখে একবার একটি গান শুনিচিলুম, বড় সরেস কথাগুলিন। তার দুটো একটা পংক্তি মনে আচে, 'কোথায় পাইমু কলসী কইন্যে, কোথায় পাইমু দড়ি, তুমি হইও গহীন গাঙ, আমি ডুইব্যে মরি !' আমি ভেবেচিলুম, আমিও তোর ঐ চোখের গহীন গাঙে ডুবে মরবো, কিন্তু তা তো আর হতে দিলিনি, তাই দড়ি কলসী কিনে আনতে হলো।

হীরেমণি বললো, আর রঙ্গ কণ্ডে হবে না তোমায়। অত যদি মরার ইচ্ছে তবে অ্যাতোদিন মরোনি কেন, কে তোমায় বারণ করেছেল ?

রাইমোহন বললো, মরিচি তো ! তবে এক্কবার মরলে সুখ হয় না, বারবার মর্তে ইচ্ছে করে !

কূয়োর ওপরের লোহার দণ্ডটির সঙ্গে দড়িটিকে মজবুত করে বেঁধে তার অন্য প্রান্ত নিজের কোমরে জড়িয়ে রাইমোহন বললো, এই আমি ঝুললুম !

তারপর কূয়োর মধ্যে এক পা গলিয়ে আবার সে বললো, যদি না ফিরি, তবে পরজন্মে দেকা হবে।

অমনি সব কিছু বদলে গেল। হীরেমণি ছুটে এসে হাউ মাউ করে কেঁদে বললো, ওগো, না, যেওনি, যেওনি ! আমার ঘাট হয়েচে !

রাইমোহন বিয়োগান্ত নাট্যের শেষ দৃশ্যের নায়কের ভঙ্গিতে বললো, বুলবুল, তুই চাইলে আমি গোখরো সাপের মাথার মণিও আনতে যেতে পারি, এ তো সামান্য একটা কল্‌সী !

হীরেমণি বললো, না, না, আমার কলসী চাই না, আমার কিচু চাই না, তুমি চলে গেলে আমায় চিল শকুনে ছিঁড়ে খাবে !

রাইমোহন আরও এক ধাপ নেমে বললো, বন্দুকধারী দ্বারোয়ান রেকো, চিল শকুন আলসের ধার ঘেঁষতে সাহস পাবে না !

দাস-দাসী, আশ্রিতরা বারান্দায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্য থেকে হরচন্দ্র উৎসাহ দিয়ে বলে উঠলো, নেমে পড়ো, দাদা ! ডু অর ডাই !

হীরেমণি রাইমোহনের চুল খামচে ধরে বললো, এই আমি এখেনে কপাল কুটবো ! তুমি মরে গেলে আমিও মরবো, আর একটি দিনও বাঁচবো না।

আরও কিছুক্ষণ এইরূপ মস্করা চলার পর রাইমোহন উঠে আসে। বলাই বাহুল্য কূয়োর মধ্যে নেমে প্রাণ হারাবার ঝুঁকি নেবার বিন্দুমাত্র বাসনা তার ছিল না, সে হীরেমণিকে অতি উত্তমভাবেই চেনে। এরপর হীরেমণি খানিকক্ষণ কাঁদে এবং রাইমোহন নিজে জল তুলে হীরেমণির মাথায় ঢেলে স্নান করায়। খানিকবাদে শুদ্ধ বস্ত্র পরে, এস্রাজ বাজিয়ে হীরেমণি যখন রেওয়াজ করতে বসে, তখন আবার তাকে মনে হয় সম্পূর্ণ অন্য মানুষ।

এটি একদিনের ঘটনা। তবে প্রতিদিনই এ গৃহে এরকম কিছু না কিছু হয়ই। দিনের বেলা রাইমোহনের রঙ্গে হীরেমণির সম্পর্ক পুরোনো দাম্পত্যের মতন মধুর। রাইমোহনের ওপর হীরেমণি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আর হীরেমণির সংসারই এখন রাইমোহনের সংসার। শহরের দু-চারজন বড় মানুষের গৃহে এখনো যাতায়াত থাকলেও মোসাহেবী পেশা রাইমোহন পরিত্যাগ করেছে, সারাদিন সে হীরেমণির সঙ্গে নানারকম ফষ্টি করে, আর রাতেরবেলা বাবুরা এলে সে অদৃশ্য হয়ে থাকে। হীরেমণি কোথাও মুজরো গাইতে গেলে রাইমোহন নিজে পৌঁছে দিয়ে আসে তাকে।

গায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠাপন্ন হবার পর থেকে হীরেমণিরও খানিকটা পরিবর্তন এসেছে। নিছক দেহলোলুপ ধনীদের সে আর নিজ গৃহে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে চায় না। নিতান্ত দু-চারজন পুরোনো বাবুদের সে এখনও ফেরাতে পারে না শুধু। তাদের মধ্যেও যারা বেশী বাড়াবাড়ি করে, হীরেমণির শরীর-মনের ওপর অত্যাচার করবার ব্যাপারে যাদের কোনো মায়া দয়া নেই, তাদের তাড়াবার মোক্ষম কৌশল বার করে দিয়েছে রাইমোহন। সেই সব ধনীদের গুপ্ত পাপ কাহিনী নিয়ে গান বাঁধে রাইমোহন, হীরেমণিকে সেগুলো শিখিয়ে দেয়।

রাইমোহন বলে, দ্যাখ না হীরে, শিগগির এমন দিন আসবে, যখন তোকে আর গাইতেও হবে না। শুধু শহরময় রটিয়ে দেবো যে তুই অমুক অমুক বড় মানুষ সম্পর্কে গান শোনাবি ! অমনি দেকবি তারা ছুটে এসে সেই গান বন্ধ করার জন্য তোর পায়ে টাকা ঢেলে দেবে। বাগাড়ম্বর মিত্তির, গাধাকান্ত দেব, একে একে সব্বাইকে ধচ্চি !

হীরেমণির পুত্র চন্দ্রনাথ এখন বেশ ডাগরটি হয়েছে। তার বয়েস এখন চতুর্দশ বৎসর, পিতৃপরিচয়হীন এই কিশোরটির মুখশ্রীর মতন ব্যবহারও অতি মধুর। এই বয়েসেই সে অতি কম কথা বলে, যেটুকু বলে, তাও অতি নম্রভাবে। সে একা একা ক্রীড়া করে, একা একা পড়ে। বাড়িতে এত রকমের গোলমাল, সে ভ্রূক্ষেপও করে না। অতি শৈশবে তাকে দুধের সঙ্গে ঈষৎ আফিং-এর জল মিশিয়ে খাওয়ানো হতো বলে সে সন্ধ্যা থেকে নিদ্রা যেত। রাইমোহন সে কথা জানতে পেরে এখন তা

বন্ধ করে দিয়েছে। কিশোরটি অতিশয় বুদ্ধিমান, মায়ের পেশার কথা সে জানতে পারবেই, বা ইতিমধ্যেই বুঝে গেছে হয়তো, সুতরাং কৃত্রিমভাবে তাকে ঘুম পাড়াবার কোনো প্রয়োজন নেই। বুঝুক বা না বুঝুক, চন্দ্রনাথ এ বাড়ির রাতের অতিথিদের সম্পর্কে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করে না। হীরেমণির মনে হয়, তার পুত্রের বুঝি স্নেহ ভালোবাসা ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলিই কম। হীরেমণি যতটা ভালোবাসে তার সন্তানকে, সে তুলনায় চন্দ্রনাথের যেন মায়ের প্রতি তেমন টান নেই, এমনকি সে মায়ের কাছে কোনো আবদার পর্যন্ত করে না।

লেখাপড়ায় তার অসম্ভব আগ্রহ। রাইমোহন নিজে তাকে বাংলা পড়িয়েছে। হরচন্দ্র নামের মাতালটি ইংরেজি জানে বেশ, তার কাছেও ইংরিজি শিক্ষা করেছে চন্দ্রনাথ, এখন হরচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছে যে তার যতখানি বিদ্যে ছিল, তা চন্দ্রনাথের শিখতে বাকি নেই আর, এখন তার উন্নততর শিক্ষক আবশ্যক। কিন্তু চন্দ্রনাথকে কোনো ইস্কুলে ভর্তি করার উপায় নেই। যে-কোনো বিদ্যালয়ে পড়তে গেলেই ছাত্রের পিতৃপরিচয় জানাবার প্রয়োজন হয়। রাইমোহন বারংবার বলেছে যে চন্দ্রনাথকে সে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে চায়। বারাঙ্গনার গৃহের আবাসিক হলেও তার শরীরে এখনো খাঁটি ব্রাহ্মণের রক্ত বইছে। তার পদবী ঘোষাল, সমাজে এই পদবীর যথেষ্ট কদর আছে। এই ব্যাপারে হীরেমণি বিষম জেদী, সে কিছুতেই রাইমোহনের কথা শোনে না, সে এখনো বলে, ঈশ্বর তাকে এই পুত্রটি দান করেছেন, ঈশ্বরই তার পিতা।

হায়, সব মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, তবু বিশেষ কোনো একজন মানুষকে শুধু ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে পরিচয় দিলে, সমাজ তা কিছুতেই মানবে না, উপহাস, ধিক্কার দেবে।

ফিরিঙ্গিদের পাঠশালায় অবশ্য ভর্তি করে দেওয়া যায়। ফিরিঙ্গিরা অতশত মানে না। কিন্তু সেখানে পাঠাতেও হীরেমণির নিতান্ত আপত্তি। ইদানীং শহরে যেন জুজুর ভয় রটেছে। ওলাউঠার হেঙ্গামার চেয়েও খৃষ্টানী হেঙ্গামা অতি প্রবল। একটু আধটু লেখাপড়া শিখলেই ছেলেরা খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে, এ ব্যাপারে মিশনারিদের উৎসাহ উদ্দীপনাও যেন হঠাৎ চতুর্গুণ হয়ে উঠেছে। বর্গীর ভয়ের মতন মা বাপেরা ছেলে-মেয়েদের ঘরে আটকে রাখে, কী জানি কখন পাদ্রীরা তাদের কানে ফুসমন্তর দিয়ে টেনে নিয়ে যায়।

চন্দ্রনাথের লেখাপড়া বিষয়ে হীরেমণির মনে একটা অশান্তি চলছিল। সে নিজে বিদ্যাশিক্ষার অত কিছু মর্ম বোঝে না, কিন্তু তার ছেলেকে যারাই দেখে তারাই বলে যে, এ ছেলে বড় হলে হীরের টুকরো হবে। হীরেমণি দিশেহারা হয়ে যায়।

একদিন দুপুরবেলা খেতে বসে রাইমোহন বললো, বুজলি হীরে, ইচ্ছে করলে চাঁদুকে এ দেশের সবচে বড়, সবচে ভালো বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া যায়। হিন্দু কালেজের বহুৎ নাম ডাক, সেখানে তোর ছেলে পড়বে, যদি তুই নিজে দু-একটা কাজ করতে রাজি থাকিস।

হীরেমণি অবাক হয়ে বললো, আমি আবার কী করবো? আমার ক' অক্ষর গো-মাংস, ইস্কুলের ব্যাপার আমি কী জানি!

রাইমোহন বললো, সে আমি তোকে শিখোয়ে পড়িয়ে দোবো।

রাইমোহনের পাশেই বসেছিল হরচন্দ্র। সন্ধের পর থেকেই সে মাতাল হয়ে থাকলেও দুনিয়া সম্পর্কে কিছু খোঁজ খবর রাখে। সে বললো, দাদা, এ কথাটি আমিও ভাবছিলুম ক'দিন ধরে। লোকমুখে শুনতে পাচ্ছি, বেথুন নামে নাকি একজন সাহেব এয়েচে, সরকারি ইস্কুল বিভাগের বড় কত্তা হয়ে। তিনি নাকি অনেক নিয়ম উল্টে দিয়েচেন আর মেয়েছেলেদেরও পড়ালেখা শিকোচ্চেন। সে সাহেবটি খানিকটা দিলদরিয়া, মাতা পাগলা গোচের। অনেকটা সেই যে ডেভিড হেয়ার ছেলেন, তেনার মতন আর কি!

রাইমোহন বললো, তুই ডেভিড হেয়ারের কতাও জানিস নাকি?

হরচন্দ্র কানে হাত দিয়ে বললো, সে মহাত্মার কথা কে না জানে! আমি নিজেই তো হেয়ার সাহেবের পটলডাঙার ইস্কুলে পড়িচি।

—তা নেকাপড়া শিকেও তোর এই অবস্থা হলো কেন? এমন নিষ্কম্মার ঢেঁকি হয়ে রইলি!

—সে দাদা, আমার নিয়তি।

—তুই কতদিন বাড়ি-ছাড়া হয়ে আচিস?

—তা বছর পাঁচেক হবে।

—তুই তার পর থেকে আর কিছুই জানিসনি বোধ করি? সে হেয়ার সাহেব তো কবে পটল তুলে

হেভেনে চলে গ্যাচেন রে ! ভালো সাহেবরা এ দেশে বেশী বাঁচে না। যে গুলোন রক্তখেকো, সে গুলোন বাঁচে।

হীরেমণি বললো, আবার কী সব হ্যান ত্যান কতা শুরু করলে। চাঁদুর ইস্কুলে ভত্তির কতা কী বলছেলে যে !

হরচন্দ্র বললো, দিদি, আমি নিজে গিয়ে চাঁদুকে হিঁদু কালেজে ভর্ত্তি করে দিয়ে আসবো। দরকার হলে সাহেবদের পায়ে ধরে বলবো, টেস্ট নাও ! ছেলেকে যাচিয়ে দেকো।

রাইমোহন তাকে ধমক দিয়ে বললো, তুই থাম ! ওতে কিচু হবে না। সাহেবরা পারবে না। আমাদের জাতের বড় বড় মাতা মাতা লোকেরা এখনো কামিটি মেম্বর রয়েচেন, তাঁদের অমতে কিচু হবেনি কো। তাঁদের ধরতে হবে।

তারপর সে হীরেমণির দিকে ফিরে বললো, পশুপ দত্ত বাড়িতে তো গান গাইবার মুজরো আছে। আমি খবর নিইচি, সেখানে লাট-বেলাট ইংরেজরা তো আসবেই, শহর ছেঁকে বড় মানুষরা আসবে, তার মধ্যে হিন্দু কালেজের অভিভাবক সভার অধ্যক্ষও থাকবেন পাঁচজন। তুই তাঁদের পানে চেয়ে গাইবি। গান গেয়ে তাঁদের মাৎ করে দিতে পারবিনি ?

হীরেমণি বললো, কী জানি বাবা ! অত বড় আসরে কে মাৎ হলো কি না হলো, তা কি আমি ঠাহর কত্তে পারি ?

রাইমোহন বললো, ভাবের গান গাইবি, ভক্তির গান গাইবি। মদের আসরে ভক্তির গান বেশী জমে, বাবুদের চোকে জল এসে যায়। তোকে সেইটি কত্তে হবে। যে পাঁচজন বাবুর নাম বলে দেবো, তাদের পানে চেয়ে কুর্নিশ করবি। তেনারা নিশ্চয়ই কেউ তোকে মালা কিংবা মোহর ছুঁড়ে দেবেন। দেন তো সেরকম !

হীরেমণি ওষ্ঠ উল্টে বললো, কতো ! যেগুলো ফোতো, তারা মালাই বেশী দেয়।

রাইমোহন বললো, শোন, যখন ঐ পাঁচজনার মধ্যে কেউ কিচু দেবে, না হয় শুধু মালাই দিল, তখন তুই উঠে তেনার একেবারে সামনে গিয়ে চোখ ছলোছলো করে বলবি, আমি সামান্য স্ত্রীলোক, আমার আর শিরোপা দরকার নেই, যদি আপনাদের মনোরঞ্জন কত্তে পেরে থাকি, তবে আমার ছেলেটার একটা গতি করে দিন। তারপর সব খুলে বলবি, দরকার হয় পায়ে পড়বি প্রথমেই। পারবি না ?

রাইমোহনের এই পরামর্শ একেবারেই কার্যকর হলো না। সে রাত্রে ফিরে এসে হীরেমণি তাকে এই মারে কি সেই মারে ! তাকে অপমানের একশেষ হতে হয়েছে। হিন্দু কলেজ কমিটির মেম্বারদের যে পাঁচজনের নাম সে করেছিল, তাদের একজনের কণ্ঠে অতিরিক্ত বাহবা শুনে এবং বারবার মালা ছোঁড়ার বহর দেখে হীরেমণি এগিয়ে গিয়ে তার বক্তব্যটি শোনাবার আগেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। ব্যস, আর যায় কোথায়। সেই মহাপুরুষ অমনি অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, কী, এতবড় সাহস ! একজন পতিতা তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করে ? এরা মানীর মান রাখতে জানে না। বাঁদর যেমন লাই দিলে মাথায় ওঠে...

সব শুনে ক্রোধে রাইমোহনের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। অনেককাল সে ধনীদের মোসাহেবী করেছে, ইদানীং যেন সব ধনীদের ওপরেই তার জাতক্রোধ জন্মে গেছে। সে নিষ্ঠুর হাস্যমিশ্রিত কণ্ঠে বললো, তাই ! কাঁদিসনি, বুলবুল। তোর ছেলেকে আমি ঐ হিন্দু কালেজে ভর্ত্তি করাবোই। এ নিয়ে আমি ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধাবো, তুই দেকে নিস। পিশেচের দল ! পতিতা অঙ্গ স্পর্শ করলে রাগ দেখানো ! লোকসমক্ষে ভণ্ডামি। আর একলা একলা ঘরের মধ্যে ঐসব বাবুরাই যে তোর মতন মেয়েমানুষের পায়ে ধরে...একে একে আমি সব হাটে হাঁড়ি ভাঙবো...

এরপর দিনক্ষণ দেখে এক সকালে রাইমোহন চন্দ্রনাথ আর হীরেমণিকে নিয়ে যাত্রা করলো। সেদিন সে চন্দ্রনাথকে নিজের হাতে সাজিয়েছে, ধুতির ওপর মলমলের কুর্তা, কাঁধে মুগার উড়ুনি, পায়ে ইংলিশবাড়ির জুতো। চন্দ্রনাথকে দেখাচ্ছে যেন এক বিয়ের আসরের খুদে বরের মতন। হীরেমণিকেও সে দারুণ জমকালোভাবে সাজতে বাধ্য করেছে। দিনের বেলা হীরেমণির এমন সাজ কেউ কখনো দেখেনি। পায়ে জরির নাগরা, সিল্কের শালোয়ার কামিজ, তার ওপরে কাশ্মিরী মলিদা। তার দশ আঙুলে সাতটি অঙ্গুরীয় এবং ওষ্ঠ তাম্বুলরঞ্জিত। এই সাজে সে রাত্রিকালে প্রমোদভবনে যায়, অথচ আজ দিনেরবেলা রাইমোহন এমন সাজেই তাকে নিয়ে যেতে চায় বিদ্যালয়ে।

একটা ভাড়া করা জুড়িগাড়ি এসে থামলো পটলডাঙ্গার মোড়ে হিন্দু কলেজ ভবনের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে রাইমোহন হীরেমণিকে বললো, যা, ছেলের হাত ধরে সটান ভেতরে ঢুকে যা। চিবুক উঁচু

রাখবি, চোক মাটির দিকে নামাবিনি একবারও। যা শিখ্যে দিইচি, ঠিক তেমনটি তেমনটি বলবি। যা।

হীরেমণি বললো, তুমিও সঙ্গে চলো না। আমার যে ভয় কচ্চে!

হীরেমণিকে দেখে ইতিমধ্যেই পথে ভীড় জমে গেছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রাইমোহন বললো, কোনো ভয় নেই, চলে যা। আমি খপর নিইচি, আজ মেম্বারদের মিটিন্ আছে। দেখচিসনি, তেনাদের গাড়িগুলি দাঁড়িয়ে আচে সার বেঁধে। একেবারে সক্কলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবি!

রাইমোহন নিজে তাদের ধরে কয়েক কদম এগিয়ে দিয়ে আবার ফিসফিস করে হীরেমণির কানে কানে বললো, সব ঠিক ঠিক মনে আচে তো? চিবুক উঁচিয়ে একেবারে সক্কলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবি। বলবি, আমার ছেলেকে ভত্তি করাতে এনিচি। আমার নাম হীরা বুলবুল, আমাকে আপনারা চেনেন না? তারপর ওনারা যখন শুধোবেন, ছেলের বাপের নাম কী, তুই একে একে সকলের মুখের দিকে তাকাবি। তারপর কচাং করে একবার চোখ মেরে, আলতো করে হেসে বলবি, বলবো? ওর বাবার নাম এখেনে বলাটা কি ভালো হবে? তার চেয়ে বরং লিখে নিন, ওর বাবার নাম ভগবান।

সংস্কৃত কলেজের দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন বিদ্যাসাগর। প্রায়ই ছাত্রদের মধ্যে মারামারি লাগে। বিশেষত, পিঠোপিঠি ভাই-বোনের মতন, পাশাপাশি সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের ছাত্ররা তুচ্ছ কারণে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। বয়েসসুলভ চাপল্যে ছাত্ররা এরকম পারস্পরিক লড়াই মাঝে মাঝে করবেই, অধিকাংশ সময়েই বিদ্যাসাগর ওপর থেকে সে দৃশ্য উপভোগ করেন, কখনো চেঁচিয়ে বলেন, দেখি, কে জেতে! মারামারি গুরুতর আকার ধারণ করলে অবশ্য তিনি নিজে নেমে যান তাদের থামাতে, দু-একবার পুলিসও ডাকতে হয়েছে।

রসময় দত্ত ইস্তফা দেবার পর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি হয়েছিলেন, এখন সেক্রেটারির পদ উঠে গেছে, বর্তমানে বিদ্যাসাগর এই কলেজের অধ্যক্ষ। এবং দেশে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে ভারতের ইংরেজ সরকার বিদ্যাসাগরের ওপরে অনেকখানি নির্ভরশীল।

আজ অবশ্য মারামারি বাধেনি, বিদ্যাসাগর দেখলেন হিন্দু কলেজের প্রবেশদ্বারের কাছে একটি জুড়িগাড়ি থেমেছে এবং সেখানে কিসের যেন গোলমাল হচ্ছে। ওপর থেকে তিনি সব ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না। তবে এটা তাঁর প্রতিষ্ঠানের ব্যাপার নয় বলে তিনি একটু পরে চলে গেলেন নিজের দপ্তরে।

হিন্দু কলেজের প্রবেশদ্বারের কাছে গোলমাল ক্রমশই বাড়ছিল। এক বালকের হাত ধরে ঝলমলে পোশাকে ভূষিতা এক উগ্রযৌবনা রমণী কলেজের মধ্যে ঢুকতে চাইছে। এমনটি আর কখনো ঘটেনি, দেশগৌরব এই বিদ্যালয়ে এর আগে আর কোনো নারী প্রবেশ করেনি।

আরে একি একি—বলে শোরগোল তুলেছে একদল বালক। সম্ভ্রান্ত বংশীয় বালকেরা চুপ করে দেখছে এক পাশে দাঁড়িয়ে। এদের মধ্যে রয়েছে রামকমল সেনের পৌত্র কেশবচন্দ্র, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রলাল সরকার, দীনবন্ধু মিত্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইত্যাদি। কেশব অত্যন্ত ধীর স্থির ও গম্ভীর স্বভাবের বালক, সে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো স্থির দৃষ্টিতে. অন্যরা সবিস্ময়ে ফিসফিস করতে লাগলো। স্ত্রীলোকটির সঙ্গের বালকটি তাদেরই বয়েসী, লজ্জায় তার মুখ আরক্ত, সে কোনোদিকে তাকাচ্ছে না।

হীরে বুলবুল কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পুত্রকে নিয়ে সোজা ঢুকে এলো ভেতরে। সিঁড়ির পাশের বাঁ দিকের প্রশস্ত ঘরটিতে কমিটি মেম্বাররা প্রয়োজনে মিলিত হন। রাইমোহনের সংবাদ সঠিকই ছিল, আজ ইংরেজ ও ভারতীয় সদস্যরা অনেকেই এসেছেন কোনো একটি জরুরি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। পুত্র সমেত হীরাকে প্রবেশ করতে দেখে মাননীয় দেশী সদস্যরা সবাই যেন আঁতকে উঠলেন।

রাইমোহন যা শিখিয়েছিল, তোতাপাখির মতন গড় গড় করে বলে গেল সে কথা। সে চক্ষু নত করেনি এবং চিবুক উঁচিয়ে রেখেছে। হীরেমণি যে একজন বারাঙ্গনা, সে কথা কারুর বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না, তাকে দেখা মাত্র বোঝা যায়।

হীরেমণির কথার মধ্যপথেই একজন দেশী সদস্য চেঁচিয়ে উঠলো, আরে মলো যা, কী উৎপাত! দ্বারবান বেটারা কই? রামটহল! ব্রজবাসী!

হীরেমণি বললো, আমার নাম হীরা বুলবুল। দারোয়ান বেটারা আমার গায়ে হাত দেবে? অ্যাতগুলোন ভদ্দরলোক এখানে বসে থাকতে?

ইংরেজ সদস্যরা বাধা দিয়ে বললো, আগে ব্যাপারটা শোনা যাউক। হে মহোদয়া, আপনি আসন পরিগ্রহণ করুন!

অমনি ভারতীয় সদস্যদের মধ্যেকার একজন সমাজ শিরোমণি বলে উঠলেন, সে কি মহাশয়, এক কুলটা রমণী আমাদের সম্মুখে বসিবে কি? তাহার সংস্পর্শে এই পূতঃ বিদ্যালয় অপবিত্র হইয়া যাইতেছে!

হীরেমণি কয়েকজন দেশীয় সম্ভ্রান্ত সদস্যের মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি ন্যস্ত করে রইলো, যেন এখনি সে বলে উঠবে, কী গো বাবু, আমায় চিনতে পাচ্চো না? কতদিন আমার গা ঘেঁষাঘেঁষি করোচো, তা মনে করিয়ে দিতে হবে?

মুখে অবশ্য সে কথা বললো না হীরেমণি, যেন তার দৃষ্টিই যথেষ্ট।

ইংরেজ সদস্যরা কৌতুক পেয়ে গেল। মুসলমান ও খৃষ্টান ছাত্রদের এ কলেজে প্রবেশ অধিকার এখনো নেই। এমনকি, কোনো হিন্দু ছাত্র বা শিক্ষক ধর্মান্তরিত হলেই হিন্দু সদস্যরা তাদের তাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লাগে। এবার ইংরেজ সদস্যরা সুযোগ পেয়েছে। তারা একযোগে বললো, আপনাদের আপত্তির কারণ তো কিছু বুঝিতে পারিতেছি না? এই রমণী কি হিন্দু নয়? হিন্দুর সন্তান অবশ্যই হিন্দু হইবে!

এক ভারতীয় সক্রোধে বলে উঠলেন, বেশ্যার ছেলের আবার জাত কী? ওর কি কোনো বাপের ঠিক আছে?

হীরেমণি চোখ ঘুরিয়ে মুচকি হাসলো। তারপর বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী ব্যক্তিদের প্রত্যেকের মুখের দিকে একে একে দৃষ্টি ফেলে সে বললো, বলবো? এখেনে সকলের সামনে ওর বাপের নাম বলবো? সেটা কি ঠিক হবে? ভেবে দেকুন একবার!

অমনি সব উজ্জ্বল মুখগুলি ম্লান হয়ে গেল। মনে মনে সবাই প্রমাদ গুণলেন। এ পাপীয়সীর মনে কী আছে কে জানে। যদি মিথ্যেমিথ্যে যে-কোনো একজনের নাম বলে দেয়? একবার কলঙ্ক রটে গেলে তা আর সহজে ফেরানো যায় না। বেশ্যার মুখের কথা সারা শহর রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করবে। দুরাচার, সংবাদপত্রের মসিজীবীরা তাই নিয়ে বানাবে সাত কাহন।

হীরেমণি বললো, বলচি তো, লিকে নিন, ওর বাপের নাম ভগবান!

ভারতীয় সদস্যরা সদলে একযোগে প্রতিবাদ স্বরূপ সভাস্থল পরিত্যাগ করে চলে গেলেন।

ইংরেজ সদস্যরা পরীক্ষা করে দেখলো হীরেমণির সন্তানের শিক্ষাগত যোগ্যতা। চন্দ্রনাথের মেধা সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবার কথা নয়। ইংরেজরা একতরফাভাবে চন্দ্রনাথকে হিন্দু কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে নেবার সিদ্ধান্ত নিল। তক্ষণেই কলেজের অধ্যক্ষ চন্দ্রনাথের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়ে এলেন ক্লাসে।

বিজয়িনীর ভঙ্গিতে বেরিয়ে এলো হীরেমণি। কিছু দূরে অপেক্ষা করছিল জুড়িগাড়িটি, তার মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে রাইমোহন। হীরেমণি একা এসে গাড়িতে উঠতেই রাইমোহন সেই বসা অবস্থাতেই নৃত্য শুরু করে দিল যেন। দন্তপাটি বিকশিত করে সে বলতে লাগলো, কেমন, ফললো কি না! ফললো কি না! দিয়িচি সব ব্যাটার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে। কেমুন ল্যাজ গুটিয়ে ভেগে পড়লো সব!

গাড়ি ঘরঘরিয়ে চললো, আর তার মধ্যে উল্লাসে লাফাতে লাগলো রাইমোহন।

সেদিন হিন্দু কলেজের তৃতীয় শ্রেণীর বাকি সব ছাত্রদের বাড়িতে এসে স্নান করে মাথায় গঙ্গাজল স্পর্শ করতে হলো। তাদের সেদিনকার পরিধেয় বস্ত্র ফেলে দেওয়া হলো পথে। অভিভাবকদের মধ্যে সৃষ্টি হলো সাংঘাতিক উত্তেজনার। দেশ বুঝি রসাতলে যেতে বসেছে। একি অনাচার! একি অনাচার! শোভাবাজারে রাধাকান্ত দেবের প্রাসাদে, জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অট্টালিকায় এবং তালতলায় রাজেন্দ্রনাথ দত্তের ভবনে পৃথক পৃথক ভাবে বড় মানুষদের সভা বসলো। এর প্রতিবিধান না করতে পারলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেশের বড় বড় হিন্দুরাই, আজ সে প্রতিষ্ঠান ইংরেজদের কুক্ষিগত।

পরদিন হিন্দু কলেজে বহু ছাত্রই অনুপস্থিত হলো। তৃতীয় শ্রেণীতে চন্দ্রনাথ ছাড়া আর একজনও আসেনি। বই ও খাতা নিয়ে চন্দ্রনাথ একা চুপ করে বসে রইলো ক্লাস ঘরে। হিন্দু অধ্যাপকরা অনেকেই তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়ে চন্দ্রনাথকে পড়াতে রাজি নয়। কিন্তু ইংরেজ অধ্যক্ষ অনড়। যে-সব অধ্যাপক পড়াতে রাজি নন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চন্দ্রনাথকে ভর্তি করানো হয়েছে যখন, তখন সে পড়বেই। একজন ইংরেজ অধ্যাপক তৃতীয় শ্রেণীতে একা চন্দ্রনাথকে পড়াবার উদ্দেশে এসে বললেন, কাম অন, মাই বয়, উই শ্যাল রীড পোয়েট্রি টুডে। তুমি বায়রনের নাম শুনিয়াছ ?

চন্দ্রনাথ নম্রভাবে উঠে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করলো, 'ও টক নট টু মী অফ এ নেম গ্রেট ইন স্টোরি ; দি ডেইজ অফ আওয়ার ইউথ আর দি ডেইজ অফ আওয়ার গ্লোরি···।'

সাহেব শুনে চমৎকৃত হয়ে গেলেন।

দেশীয় সমাজের প্রবল প্রতিবাদের উত্তরে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হলো এই যে, বারবনিতারা নিজে থেকে জন্মায় না। এই সমাজই বারবনিতা তৈরি করে। যে সমাজ বারবনিতাদের পোষণ করতে পারে, সে সমাজ তাদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ দেবে না কেন ? ইংলণ্ডেও বারবনিতা আছে, সেখানে তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার কোনো বাধা নেই।

দ্বিতলে বসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যথাসময়ে শুনলেন হিন্দু কলেজের ঘটনা। তিনি কোনো মন্তব্য করলেন না। হিন্দু কলেজের সঙ্গে তাঁর কোনো সংস্রব নেই, শুধু সেখানকার দু-একজন ইংরেজী ভাষার শিক্ষকের কাছে তিনি ছুটির পর নিয়মিতভাবে ইংরেজী সাহিত্যের পাঠ নিতে যান। সুতরাং সেখানকার সব কথাই তাঁর কানে আসে।

সেদিন কাজ সেরে বেরুতে তাঁর অনেক দেরি হয়েছে। কলেজ থেকে বেরিয়ে তিনি গেলেন সুকিয়া স্ট্রিটে তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। এখানে তিনি প্রায়ই আসেন। সর্ব ব্যাপারে রাজকৃষ্ণ তাঁর সহচর। রাত্রের আহার সেখানেই সেরে বিদ্যাসাগর আবার বাড়ির দিকে রওনা হলেন। রাজকৃষ্ণ একটি গাড়ির ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিদ্যাসাগর রাজি হননি। তাঁর পায়ের তলায় শর্ষে, তিনি হেঁটে হেঁটেই দুনিয়া ঘুরতে পারেন। সুকিয়া স্ট্রিট থেকে বউবাজার আর কতখানিই বা দূরত্ব। একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে, তবু তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

পথে এক স্ত্রীলোক তাঁর পিছু নিল। সে হতভাগিনী মানুষ চিনতে পারেনি। কিংবা বেশী রাতে একা পথচারী দেখে সে উপযুক্ত খরিদ্দারই মনে করেছে। প্রথমে কিছুক্ষণ সে কানের কাছে প্যান প্যান করলো, তারপর একবার মরিয়া হয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের হাত চেপে ধরলো।

ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিদ্যাসাগর হেঁটে গেলেন হন হন করে। একটু দূরে গিয়ে থামলেন। তারপর আবার ফিরে আসতে লাগলেন মেয়েটির কাছে। হঠাৎ তাঁর চোখে জল এসে গেল। এই এক তাঁর রোগ, যখন তখন কান্না এসে যায়। যুক্তি দিয়ে তিনি মস্তিষ্কে সব বোঝেন, তবু হৃদয়দৌর্বল্য কিছুতেই কমে না।

স্ত্রীলোকটি অল্পবয়েসী, রোগা ছিপছিপে চেহারা, মুখখানি শুকনো। ঈশ্বরচন্দ্র তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এত রাত্রে বৃষ্টির মধ্যে আর পথে পথে ঘুরছো কেন ? বাড়ি যাও !

ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখে মেয়েটি একটি হতাশ নিশ্বাস ফেললো। চেহারা দেখলেই মনে হয় কোনো বাড়ির রসুই বামুন, কিংবা পুজুরী। পয়সাকড়ির মুরোদ নেই। মেয়েটির ভাগ্যে এত রাতে একটি ভুল লোকই জুটেছিল।

মেয়েটি বললো, কী করবো ঠাকুর ! আজ একটা খদ্দেরও জোটেনি। বাড়িতে একটা আধলাও নেই, খাবো কী ?

ঈশ্বরচন্দ্র চোখ নীচু করলেন। কোন্ মুখে তিনি এই ভাগ্যহীনা রমণীকে তিরস্কার করবেন ? আবার তিনি একা এই সমস্যা দূর করবেনই বা কী করে ? এই সমাজ স্ত্রীলোকদের লেখাপড়া শেখাতে দেয় না। এই সমাজ স্ত্রীলোকদের অতি শৈশব অবস্থায় বিবাহ করতে বাধ্য করে। তারপর দৈবাৎ কোনো স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে, সে বিধবার সমস্ত সাধ আহ্লাদ ঘুচে যায় সারা জীবনের মতন। মৃত স্বামীর বিষয়-সম্পত্তি লুটে পুটে নেয় পাঁচ ভূতে। তারপর সেই স্ত্রীলোক যদি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পথে নামতে বাধ্য হয়, অমনি সেই সমাজ তাকে পতিতা বলে ঘোষণা করে দেয়। হীরা বুলবুল তার সন্তানকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করে সমাজের নীচের তলার অনেক ক্লেদ প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। হীরা বুলবুলের সন্তানের জনক কে, সমাজেরই কোনো বড় মানুষ নিশ্চয়ই।

ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে যা পয়সাকড়ি ছিল মেয়েটির হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আজ আর বৃষ্টিতে ভিজো না। আজ বাড়ি যাও।

মেয়েটি বললো, তুমি আমায় এমনি এমনি পয়সা দিচ্চো কেন? তুমি কে গা?

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, আমি কেউ না।

তারপর তিনি হন্‌হন করে হাঁটতে শুরু করলেন। মেয়েটি চিৎকার করতে লাগলো, ও ঠাকুর, চলে যাচ্চো কেন, লজ্জা কী? আমি তোমায় ভালো করে সুখ দোবো! ও ঠাকুর···

ঈশ্বরচন্দ্র দু' হাতে কান চাপা দিয়ে ছুটতে লাগলেন প্রায়।

হিন্দু কলেজে ছাত্রসংখ্যা প্রতিদিনই কমতে লাগলো। অনেক ছাত্র বই খাতা নিয়ে এসে বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে থাকে, চন্দ্রনাথকে ঢুকতে দেখলে তারা বিদ্রূপ ধ্বনি দেয়। চন্দ্রনাথ গ্রাহ্য করে না।

সাতদিন পরে একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে তিন-চারজন লাঠিধারী জোয়ান পিছন থেকে অকস্মাৎ মারতে লাগলো চন্দ্রনাথকে। চন্দ্রনাথ দৌড়ে পালাবারও সময় পেল না, রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে গেল মাটিতে। দুর্বৃত্তরা চম্পট দিল অবিলম্বে। চন্দ্রনাথ পড়েই রইলো সেখানে, একটা কুকুর এসে গন্ধ শুঁকে গেল কিন্তু কোনো মানুষ তাকে স্পর্শ করলো না।

সেদিন আবার সন্ধের আগেই রাইমোহন মাতাল হয়ে বসে আছে। হরচন্দ্র কোথা থেকে কিছু টাকা জোগাড় করেছে, সে-ই ক্রয় করে এনেছে বোতল, তারপর দুজনে মিলে উচ্চণ্ড মাতলামি শুরু করেছে। এদিকে বেলা পার হয়ে আঁধার হয়ে আসার পর হীরেমণি উতলা হয়ে উঠলো ছেলের জন্য। সে রাইমোহনের কাছে এসে কিছু বলতে এলে রাইমোহন হেসে উড়িয়ে দেয়। চন্দ্রনাথ তো আর তেমন ছেলেমানুষটি নয় যে পথ হারিয়ে ফেলবে। সাহেবরা তাকে একলা একলা পড়ায়, সেইজন্য বোধহয় সময়ের হুঁশবোধ নেই।

শেষ পর্যন্ত এক গাছা মুড়ো ঝাঁটা এনে হীরেমণি সপাসপ করে পেটাতে লাগলো ওদের দুজনকে। তখন ওরা দৌড়ে বেরিয়ে পড়লো পথে। গলা ধরাধরি করে দুই মাতাল চলতে লাগলো, আর মাঝে মাঝে পথের মানুষদের ডেকে ডেকে জড়িত কণ্ঠে শুধোয়, ওগো, তোমরা কেউ চাঁদুকে দেখেছো? লোকেরা কোনো উত্তর না দিয়ে ভয়ে পালিয়ে যায়। একবার পটলডাঙ্গায় হিন্দু কলেজ পর্যন্ত গিয়েও তারা ফিরে এলো, কলেজের দ্বার বন্ধ, সেখানে কেউ নেই। গোলদীঘিতে বসে আরও সুরাপান ও সামনের দোকান থেকে কাবাব এনে ভক্ষণের প্রস্তাব দিল হরচন্দ্র, কিন্তু রাইমোহন বললো, না, চল, বাড়ি যাই। গিয়ে দেকবো, চাঁদু পৌঁচে গ্যাচে, আর হীরেকে বলবো, নে, এখন সব ঝ্যাঁটার বাড়ি ফেরৎ নে।

ফেরার পথে তারা দৈবাৎ আবিষ্কার করলো চন্দ্রনাথকে। রক্তমাখা নিস্পন্দ চন্দ্রনাথকে দেখেই তারা কেঁদে উঠলো ডুকরে। পথের ওপর বসে পড়ে ওরা প্রকৃতপক্ষেই শোকে আকুল হয়ে উঠলো, ওরা দুজনেই চাঁদুকে খুব ভালোবাসে। এই সংবাদ এখন হীরেমণিকে জানাবেই বা কী করে? রাইমোহনের শোক রূপান্তরিত হলো ক্রোধে, সে শহরের সব বড় মানুষের নাম উচ্চারণ করে করে বাপান্ত করতে লাগলো।

তার সেই গালিগালাজেই আকৃষ্ট হলেন দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এখন শহরের নামকরা চিকিৎসক, রুগী দেখে ফিরছিলেন নিজের পালকিতে, মুখ বাড়িয়ে দেখলেন এক কিশোরের শায়িত দেহের পাশে বসে চিল্লাচ্ছে দু'জন মাতাল। তিনি র্ভৎসনা করে বললেন, এই! চুপ করবি, না পুলিসে এত্তেলা পাঠাবো!

দুর্গাচরণ পালকি থেকে নেমে কিশোরটির উপুড় হওয়া দেহটি উল্টে দেখলেন। চন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়নি, মস্তিষ্কে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে সে অচৈতন্য হয়ে আছে।

দুর্গাচরণ প্রশ্ন করলেন, একে এমনভাবে কে মেরেছে? তোরাই মারিসনি তো?

রাইমোহন উন্মাদের মতন বললো, একে মেরেচেন আপনি! আর এই চারদিকের বাড়িগুলানে, এ শহরে যত ভদ্দরলোক আচে, তারা সবাই মিলে মেরেচে।

দুর্গাচরণ বললেন, তোরা এখেনে জুটলি কোন্ চুলো থেকে? শেয়ালকুকুরের মতন অলুক্ষণে কান্না জুড়েচে। এ ছেলেটার চিকিৎসা করালে তো এখনো বেঁচে যাবে। নে, একে পালকিতে তোল!

রাইমোহন তবু তেড়িয়া গলায় বললো, দেখুন মশায়, আগে থেকেই একটা কতা বলে দি। এ কিন্তু

বেশ্যার ছেলে। একে ছুঁলে আপনার আবার জাত যাবে না তো?

হরচন্দ্র বললো, হি ইজ এ পিউপল অব দি হিন্দু কলেজ। হিজ মাদারস নেম ইজ হীরা বুলবুল!

দুর্গাচরণও শহরের এই চাঞ্চল্যকর বৃত্তান্তটি শুনেছেন। এক নিমেষেই তিনি সব বুঝে গেলেন। তিনি বললেন, আমি ডাক্তার, আমি জাত-বিজেত বুঝি না। নে, নে, আর দেরি করিসনি। শিগগির তোল।

দু-দিনের মধ্যেই চন্দ্রনাথ সুস্থ হয়ে উঠলো। তার মাথায় বাঁধা রইল মস্ত বড় ফেট্টি। সেই অবস্থাতেই চন্দ্রনাথ বললো যে সে কলেজে যাবে।

এমন অসম্ভব কথা শুনে হীরেমণি প্রবল আপত্তি তুললেও রাইমোহন বললো, এই তো বাঘের বাচ্চার মতন কতা! কেন যাবে না। নিশ্চয় যাবে। মাতায় অমনি ফেট্টি বেঁধেই যাবে। সকলকে বলবে, দ্যাক, আমি পরোয়া করি না। আমি নিজে দু-বেলা ওকে দিয়ে আসবো, নিয়ে আসবো। দরকার হলে আমরাও লাঠিয়াল রাকবো। তুই একটা জুড়িগাড়ি কেন তো হীরে। আমি নিজে সেই গাড়ির কোচোয়ানের পাশে বসে থাকবো।

তারপর হরচন্দ্রর দিকে ফিরে বললো, ফের যদি কোনোদিন সন্ধ্যের আগে আমায় মদ ধরাবি তো আমি তোরই মাতা ভাঙবো, হারামজাদা!

রাইমোহনেরই জয় হলো শেষ পর্যন্ত। চন্দ্রনাথের কলেজে যাওয়া আটকাতে পারলো না। এতদিনের হিন্দু কলেজ ভেঙে পড়বার উপক্রম হলো এই এক ধাক্কায়। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেরা সবাই ছেড়ে গেল হিন্দু কলেজ। তালতলার রাজেন্দ্র দত্ত রাতারাতি আর একটি কলেজ খোলার প্রস্তাব তুললেন, তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন অনেকেই। রানী রাসমণি দিলেন দশ হাজার টাকা, আরও অনেকের দানে স্থাপিত হলো হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ, হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনকে আনা হলো এই কলেজের অধ্যক্ষ করে। কেশব সেনের মতন ছাত্ররা সবাই যোগ দিল এই নতুন কলেজে।

রাইমোহন সেদিন হীরেমণিকে বললো, আজ শুধু আমার জন্য একটা আলাদা মাইফেল বসাবি, হীরে? আর কেউ আসবে না, শুধু আমার জন্য তুই সাজবি, চোখে সুর্মা লাগাবি, আমার জন্য জ্বলবে ঝাড় লণ্ঠন। ঘরে ম ম করবে আতরের গন্ধ। আমি তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসে আলবোলা টানবো চোখ বুঁজে, তুই আমার হাতে সুরার পাত্তর তুলে দিবি, আর গান গাইবি! হোক না, আজই!

হীরেমণি বললো, মরে যাই, মরে যাই, বাবুর শক কত!

রাইমোহন বললো, দ্যাক আমি শহরের এতগুলান বাবুর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিলুম, আজ আমার একটু বাবু হতে শক যাবে না? আমার প্রাণ চাইচে।

—অত যদি প্রাণ চায় তো রামবাগানে যাও না! মেয়েমানুষের কি অভাব রয়েচে কলকাতায়! ভারী আমার দু পয়সার ফুলবাবু এলেন রে!

—তুই আমায় টাকার খোঁটা দিলি? আমি টাকা রোজগার করি না? তোকে অনেক টাকা দিতে পারি না! দেকবি, আজই টাকা রোজগার করে আনবো?

—থাক, আবার কোতাও চুরি-চামারি করতে যেতে হবে না! কোন্ দিন রামঠ্যাঙানি খাবে!

—আমি চুরি করি না, আমি বুদ্ধি খাটাই! লোকে আমার বুদ্ধির দাম দেয়।

—হয়েচে! আমি ঢের জানি।

—তুই আমায় অন্য মেয়ের কাচে যেতে বললি? সেই কবে থেকে তোর এখেনে এসে হত্যে দিয়িচি, তারপর আর কোনোদিন আর কোনো মেয়েমানুষের দিকে তাকিয়েচি? তোর মন পাবার জন্যিই তো আমার এত সাধনা। তুই আমার দিকে থাক, তারপর দ্যাক না আমরা দুজনায় মিলে কত কী করি!

হীরেমণি হাই তুলে বললো, সারেঙ্গীওয়ালা এখুনি এসে যাবে, আমার রেওয়াজ করতে হবে, তুমি এখন বিদেয় হও!

রাইমোহন একটুও আহত না হয়ে বললো, লাথি ঝ্যাঁটা খেয়ে তোর এখেনে পড়ে রয়েচি, তবু এই আমার পরম সুখ। আজ আমি কিছুতেই যাচ্চিনি।

হীরেমণি তাকে আরও কিছু বাক্যবাণে বিঁধলো, তার হাত ধরে টানাটানি করলো, তবু রাইমোহন কোনোক্রমেই নড়লো না। হীরেমণির গান সে অহরহ শোনে, হীরেমণি অধিকাংশ রাতেই তার শয্যাসঙ্গিনী, তবু আজ রাতে সে হীরেমণির বাবু সাজতে চায়।

তার ঝুলোঝুলিতে হীরেমণিকে ধড়াচুড়ো পরতেই হলো। বাজার থেকে ফুলের মালা এনে রাইমোহন সাজালো হীরেমণিকে। সি নিজেও লপেটা ধুতি ও ফিনফিনে কাপড়ের বেনিয়ান পরে, গোঁফে লাগালো আতরের ছোঁয়া। মাথার চুল তেল চপচপে করে চিরুনির দিয়ে সামনে টেনে সাজিয়ে দিল কপালের ওপর। তিরিশটা মোমবাতির নতুন ঝাড় লণ্ঠন বসানো হয়েছে ঘরে, তার উজ্জ্বল আলোয় বোঝা যায়, রাইমোহনের মুখে এতদিন পরে বয়েসের ছাপ পড়েছে। চুল পাতলা হয়ে এসেছে, মুখের চামড়ায় সেই মসৃণতা নেই, চোখের দু পাশে কাকের পায়ের চিহ্ন।

সারেঙ্গীওয়ালাকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। চন্দ্রনাথ ঘুমিয়ে পড়বার পর শুরু হলো ওদের একা মজলিস। শ্যাম্পেনের বোতল খোলা হয়েছে একটা, দুটি পাত্রে তরল সুরা ঢেলে ঠুকলো একবার, তারপর দুজনে চুমুক দিল।

তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আলবোলার নলটি মুখে দেবার পর সত্যিই যেন আরামে রাইমোহনের চোখ বুজে আসছে। কত রাত্রে এই কক্ষে, এই গালিচার ওপর ঠিক এই ভঙ্গিতে বসেছে শহরের কেষ্ট বিষ্টুরা। রাইমোহনকে চোরের মতন লুকিয়ে থাকতে হয়েচে।

রাইমোহন আবেশজড়িত কণ্ঠে বললো, এবার গান গা। সেই যে প্রথম যে গানটা শিখ্যেচিলুম, অনেকদিন আগে, সেই যে রে, 'তুষিতে তোমারে এ যমুনারই পারে'—

গান চললো একটার পর একটা। গানে হীরেমণির ক্লান্তি নেই। আর যত শ্যাম্পেনের মাত্রা বাড়ে, তত রাইমোহনের তারিফও বেশী বেশী হয়। কখনো সে গানের দু-একটা বাণী সংশোধন করে দেয়। রাইমোহনকে দেখে মনে হয় সে আজ সত্যিকারের পরিতৃপ্ত।

রাত্রে এ পল্লী রীতিমতন সরব। গাড়ি ঘোড়া যাতায়াতের বিরাম নেই। এক এক সময় মনে হয় বুঝি কোনো গাড়ি এ বাড়ির দোরগোড়াতেই থামছে। তখন হীরেমণি উৎকর্ণ হয়ে ওঠে, গান থেকে মন চলে যায়। আর অন্যমনস্ক গানের সুরের অসঙ্গতি ঠিক ধরা পড়ে রাইমোহনের কানে।

সে ধড়ফড় করে উঠে বসে জিজ্ঞেস করে বলে, কেউ এলো?

তারপরই সে চোখ ঘূর্ণিত করে বলে, আজ যদি কেউ আসে, সে যত বড়ই বাবু হোক, আমি তাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদেয় করবো।

তারপর সে হীরেমণিকে কাছে টেনে নিয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ করে বলে, ওসব কিচু তুই শুনিসনি হীরে। মনে কর, আজ পৃথিবীতে আর কোনো শব্দ নেই, কোনো বাবু নেই, শুধু তুই আচিস আর আমি আচি। আজ শুধু তোর জন্য আমি আর আমার জন্য তুই। আমি গান বাঁধবো, তুই গাইবি। একদিন এসব ছেড়ে ছুড়ে তোতে আমাতে বেরিয়ে পড়বো, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে গান গাইবো। তারপর বুঝলি হীরে, ওরকমভাবে গান গাইতে গাইতে দুজনে হাত ধরাধরি করে একদিন স্বর্গে চলে যাবো। কেমন? কী, বিশ্বেস হচ্চে না? দেকিস, তুই দেকে নিস, তোর জন্যে আমি স্বর্গেও একটা জায়গা করে দেবো।

একজন খাঁটি ইংরেজতনয়কে নিযুক্ত করা হয়েছে নবীনকুমারের গৃহ-শিক্ষক হিসেবে। একজন পণ্ডিত সংস্কৃত ও বাংলা পড়ান। নবীনকুমারের গানের প্রতি অত্যধিক ঝোঁক দেখে একজন গায়কও আসেন তাকে গলা সাধানো রেওয়াজ করাতে। গায়কটি বেশ পালোয়ান গোছের, তিনি তাঁর ছাত্রকে কুস্তি ও গান, দুটোই শেখান। তবে নবীনকুমারের কোনো শিক্ষকই বেশী দিন টেঁকেন না। ইংরেজ শিক্ষক কার্ক প্যাট্রিকও গঙ্গানারায়ণের কাছে তাঁর ছাত্র বিষয়ে নালিশ জানিয়েছেন।

নবীনকুমার সংস্কৃত ও বাংলা বেশ ভালোই শিক্ষা করছে, যদিও পণ্ডিতকে সে নাস্তানাবুদ ক'রে ছাড়ে। নবীনকুমারের বাল্যের দুরন্তপনা এখন কৈশোরে অবাধ্যপনায় এসে দাঁড়িয়েছে, সে কারুর কোনো কথা শোনে না। বিম্ববতীর অতিরিক্ত প্রশ্রয়ের ফলে তাকে শাসন করার সাহস কারুর নেই। একমাত্র সে গঙ্গানারায়ণের কথা কিছুটা মানে, তার মুখে মুখে কথা বলে না, কিন্তু গঙ্গানারায়ণকে ইদানীং প্রায়ই মহাল পরিদর্শনের ব্যাপারে মফস্বলে থাকতে হয়।

দ্বাদশ বৎসর বয়েসে নবীনকুমার এখন এক অনিন্দ্যকান্তি বালক। তার মুখমণ্ডলে প্রতিভার জ্যোতি, চক্ষু দুটি অত্যুজ্জ্বল, এ বালক যে অসাধারণ তা তার মুখের পানে একবার তাকালেই বোঝা যায়।

কিন্তু এই বালকেরই মনের মধ্যে যে কতখানি নিষ্ঠুরতা আছে, তা কল্পনা করাও দুষ্কর। গৃহের দাস-দাসীদের সে মানুষ বলেই গণ্য করে না, সামান্য কর্তব্যচ্যুতি হলেই সে তাদের অসম্ভব কটু ভাষায় গালিগালাজ করে। তার আহার-বিহার-শয্যার পারিপাট্যের জন্য বিম্ববতী এখন সাতজন দাস-দাসী নিযুক্ত করেছেন। নবীনকুমার এক জায়গায় বসে খেতে পারে না বলে একজন ভৃত্য খাদ্যের ভাণ্ড নিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে। নবীনকুমার কখনো ছাদে, কখনো বাগানে এক এক চামচ করে খাদ্য মুখে দেবে, এবং সে ইঙ্গিত করা মাত্রই ভৃত্যটি যদি খাদ্যের ভাণ্ড এগিয়ে দিতে মুহূর্তমাত্র দেরি করে, অমনি নবীনকুমার লাথি মেরে সেই ভাণ্ড ফেলে দেবে। সারা বছর ধরে তাকে স্নান করানো হয় ঈষদুষ্ণ জলে, যদি কোনো একদিনও সেই জলের উত্তাপ সামান্য কম বা বেশী হয়, তখনি নবীনকুমার সংশ্লিষ্ট ভৃত্যটিকে গরু গরু বলে গালি দিয়ে ওঠে। কখনো বা অতি ক্রোধবশে সে বয়স্ক কোনো ভৃত্যকে চড় মারতেও দ্বিধা করে না। বাড়ির বাইরে যেতে হলে সে সেকালের নবাবপুত্রদের মতন আরাম কেদারায় পা ছড়িয়ে বসে কোনো ভৃত্যের নাম ধরে ডাকে। তৎক্ষণাৎ সে ভৃত্যটি এসে তার পায়ে জুতো পরিয়ে দেয়।

এই রকম দৃশ্য গঙ্গানারায়ণের চোখে পড়েছে। গঙ্গানারায়ণ হিন্দু কলেজের আলোকপ্রাপ্ত ছাত্র, সে এ সব পছন্দ করে না। মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচ জাতের সংস্কার সে মানে না। ফরাসী বিপ্লবের পর সকল মানুষের সমান অধিকারের যে বারতা পৃথিবীতে ছড়িয়েছিল, তার ঢেউ কিছুটা গঙ্গানারায়ণের মত যুবকদের মনেও এসে লেগেছে। তাছাড়া, সে দার্শনিক রুশোর কিছু কিছু রচনাও পাঠ করেছে। অর্থনৈতিক নিবন্ধনে পৃথিবীতে অনেককেই এখনো দাসত্ব বরণ করতে হয়, কিন্তু তাদের প্রতি মানবোচিত ব্যবহারেরই পক্ষপাতী গঙ্গানারায়ণ।

সে একদিন নবীনকুমারকে বলেছিল এই কথা। নবীনকুমারকে সে আদর করে ছোটকু বলে ডাকে। সে বলেছিল, এ কি ছোটকু, তুই জুতোর ফিতাটুকুও বাঁধতে জানিস না?

নবীনকুমার সগর্বে উত্তর দিয়েছিল, না।

গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, এ তো সবাই পারে। বহারু পর্যন্ত পারে, আর তুই পারিস না?

নবীনকুমার বলেছিল, দাদা, বহারু কি সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে পারে? আমি পারি। বহারুর কাজ জুতোর ফিতে বাঁধা, আমার তো তা কাজ নয়।

গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, মানুষকে নিজের সব কাজই শিখতে হয়। আয়, আমি তোকে জুতো পরা শিখিয়ে দি।

নবীনকুমার বলেছিল, জুতোয় হাত দিলে হাত নোংরা হয়। মা নিষেধ করেচে।

এর পর আর গঙ্গানারায়ণ কিছু বলতে পারেনি। বিম্ববতীর নিষেধের ওপর আর কোনো কথা চলে না। বিম্ববতী পুত্রস্নেহে অন্ধ। এমনিতে বিম্ববতী নিজে খুবই দয়াবতী, কোমলপ্রাণা নারী, তিনি নিজে কখনো দাসদাসীদের কষ্ট দেন না। কিন্তু নবীনকুমার যদি এমনকি কোনো ভৃত্যের মুণ্ড কাটার হুকুমও দেয়, বিম্ববতী বোধ হয় তা-ও মেনে নেবেন। গঙ্গানারায়ণ মায়ের সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে বহুবার নিরস্ত হয়েছে। নবীনকুমারের ব্যাপারে বিম্ববতী বধির।

ছোট ভাইয়ের তত্ত্বাবধান বিষয়ে গঙ্গানারায়ণ ইদানীং প্রায়ই চিন্তা করে। বয়সে বালক হলেও নবীনকুমারের ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তার ধরন অনেকটা বয়স্কদের মতন, এটা গঙ্গানারায়ণের মোটেই পছন্দ নয়। এত অল্প বয়েসে এত বেশী প্রশ্রয়ের ফল কখনো শুভ হতে পারে না। এতে উৎসন্নে যাবার পথ যখন-তখন খুলে যেতে পারে। গঙ্গানারায়ণের মনে পড়ে তার বন্ধু মধুর কথা। পিতা-মাতার অতিরিক্ত আদরে মধু ধরাকে সরা জ্ঞান করত। শেষ পর্যন্ত সেই মধুই পিতা-মাতার মনে চরম আঘাত দিয়ে গেল। কোথায় যে হারিয়ে গেছে মধু, তার সংবাদও এখন কেউ রাখে না। তার দুঃখিনী জননী কেঁদে কেঁদেই শেষ নিশ্বাস ফেললেন, আর তার ক্রোধোন্মত্ত পিতা আর একটি পুত্র সন্তানের আশায় পর পর আবার বিবাহ করে চললেন, শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে তিনিও ধরাধাম ত্যাগ করেছেন।

গঙ্গানারায়ণ যেন মধুর সঙ্গে তার ভাই নবীনকুমারে কিছু কিছু মিল খুঁজে পায়। নবীন যেন মধুরই মতন উদ্ধত আর জেদী, সেও যখন তখন কবিতা বা ছড়া আবৃত্তি করে। অবশ্য মধু ছিল বাল্যকাল থেকেই ফিরিঙ্গিঘেঁষা, ইংরেজী ছাড়া আর কোনো ভাষা তার মুখে আসত না সহজে, কিন্তু নবীন বেশী ভালোবাসে বাংলা ও সংস্কৃত। মাঝে মাঝে দু-একটি দৃশ্য দেখে গঙ্গানারায়ণ বিস্মিত হয়েছে।

দ্বিতলের একটি ছোট ছাদ নবীনকুমারের খেলার জন্য অতি প্রিয় স্থান। গঙ্গানারায়ণ দেখেছে, প্রায়ই নবীনকুমার সেখানে তার সর্বক্ষণের খেলার সঙ্গী দুলাল নামের ছেলেটিকে নিয়ে বসে থাকে। নবীনের সামনে এক থালা ভর্তি সন্দেশ। সে মুখে মুখে এক একটি ছড়া বা সংস্কৃত শ্লোক বলে দুলালকে জিজ্ঞেস করে, তুই পারবি বলতে? আমি দুবার বলচি, তিনবার বলচি, তুই যদি শুনে শুনে মুখস্থ বলতে পারিস, তোকে সন্দেশ দেব।

দুলাল চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। তখন নবীন এক একটা করে সন্দেহ ছুঁড়ে ছুঁড়ে কাকদের খাওয়ায়। সন্দেশের লোভে ছাদের অলসেতে অনেক কাক, চিল, পায়রা, শালিক এসে ভিড় জমায়। এমনকি বাড়ির পোষা বেড়াল মঞ্জুরীও গুটিসুটি মেরে বসে থাকে এক পাশে। এক একবার দুলাল খানিকটা বলার চেষ্টা করে, তখন নবীনকুমার একটি সন্দেশ তুলে তার মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বলে, আর একটু বল, আর একটু, তা হলেই সন্দেশ পাবি, এই যে দ্যাক, দেকে দেকে বল্... ! দুলাল এর পর একটা শব্দ ভুল করে ফেলে আর নবীন সন্দেশটা দিয়ে দেয় বেড়ালটাকে। এমনি করে সব সন্দেশ ফুরিয়ে যায়।

সংস্কৃত শেখার এত আগ্রহ, তবু নবীনকুমারের জন্য সংস্কৃত পণ্ডিত প্রায়ই বদল করতে হয়। শিক্ষককে নবীনকুমার একেবারেই গুরু হিসেবে মান্য করে না, প্রায়ই দুষ্টুমি করে পণ্ডিতের শিখা ধরে টানাটানি করে পর্যন্ত। এত বড় ধনী পরিবারে উত্তম দক্ষিণায় শিক্ষকতা করার জন্য কোনো কোনো গুরু প্রাণপণে টিকে থাকে কিছুদিন, তারপর অতি কষ্টে একদিন সম্মান রক্ষার্থে পলায়ন করে।

একবার মহাল থেকে ফিরে এসে গঙ্গানারায়ণ শুনলো যে, নবীনকুমার নাকি একজন পণ্ডিতের টিকি কেটে নিয়েছে। বাড়ি ফেরা মাত্রই তার পত্নী ফিসফিস করে তাকে সম্পূর্ণ ঘটনাটা জানিয়ে দিল।

প্রতি বৎসরই পৌষ সংক্রান্তিতে বিম্ববতী সাড়ম্বরে এক ব্রত করেন, তাতে প্রচুর ধুমধাম হয়। সে সময় বিম্ববতী ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ, বস্ত্র এবং তণ্ডুল দান করেন এবং প্রতি বৎসর একজন ব্রাহ্মণকে একটি গরুও দান করা হয়। এ বৎসর যে ব্রাহ্মণকে একটি নধর গো-বৎস দান করা হয়েছিল, সে ব্রাহ্মণটি জোড়াসাঁকোর সিংহবাড়ি থেকে বেরিয়েই কিছু দূরে কলুটোলায় এক কসাইয়ের কাছে গো-বৎসটি বিক্রয় করে দেয়। দৈবাৎ সিংহবাড়ির দুজন ভৃত্য সেই ঘটনা দেখে ফেলে এবং দৌড়ে বাড়ি ফিরে এসে সবিস্তারে সেই কাহিনী বিম্ববতীর কাছে বর্ণনা করে। বিম্ববতীর কাছেই বসে ছিল নবীনকুমার, সে অমনি ভৃত্যদের হুকুম দেয় সেই ব্রাহ্মণকে ধরে আনতে।

ভৃত্যরা চিরকালই ধরে আনতে বললে বেঁধে আনতে চায়। সে ব্রাহ্মণ পালাবার পথ পেল না, ষণ্ডামার্কা দাসদের হাতে ধরা পড়ে তার অবস্থা সঙ্গিন হলো। সে এসে প্রথমে নানাপ্রকার মিথ্যা বলে মন ভেজাবার চেষ্টা করল বিম্ববতীর, কিন্তু ভৃত্যরা তুমুল কলরবে প্রতিবাদ জানালো তার কথার। তারা নিজের চক্ষে দেখে এসেছে যে কলুটোলার কসাই ইতিমধ্যেই সে গো-বৎসটিকে কোরবানি করে ফেলেছে।

তবু বিম্ববতী দয়া পরবশ হয়ে ব্রাহ্মণকে নিষ্কৃতি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন নবীনকুমার পরিষ্কার কণ্ঠে দাবি জানায় যে ঐ ব্রাহ্মণকে টিকি কেটে দিতে হবে। ঐ টিকি তার চাই। সে কাচ দিয়ে বাঁধিয়ে রাখবে। বিম্ববতী ক্ষীণ আপত্তি করলেন, ব্রাহ্মণের শিখা কর্তন করলে পাপ হয়, সে কথা জানালেন, কিন্তু নবীনকুমার তা কিছুতেই মানবে না। ব্রাহ্মণের কাছে গরু হচ্ছে গো-মাতা, যে ব্রাহ্মণ গো-মাতাকে কসাইয়ের কাছে বিক্রি করে দিতে পারে, তার কোনো ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন রাখবার অধিকার নেই। দ্বাদশ বর্ষীয় বালক গম্ভীর কণ্ঠে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পরই কাঁদুনে গলায় মায়ের প্রতি আবদার করে বলে, মা, ওর টিকি আমি কাটবোই! আমি কাটবোই!

বিম্ববতী সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, আহা-হা, কাঁদিস না, কাঁদিস না!

প্রয়োজনে বিম্ববতী ছেলের জন্য আকাশের চাঁদও পেড়ে দিতে পারেন, আর এক ব্রাহ্মণের শিখা তো অতি সামান্য বস্তু। তিনি আর আপত্তি করলেন না। কয়েকজন মিলে সেই ব্রাহ্মণকে জোর করে

চেপে ধরে রইলো, নবীনকুমার নিজে কাঁচি দিয়ে কচাৎ করে সেই ব্রাহ্মণের শিখা সমূলে নিপাত করে খলখল শব্দে হেসে উঠলো।

এই বৃত্তান্ত শুনে গঙ্গানারায়ণ রীতিমতন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। অশিক্ষিত, বাগাড়ম্বরপ্রিয় ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে তার নিজেরও খুব একটা শ্রদ্ধা নেই, তবে ইদানীং সংস্কৃত সাহিত্যের রস গ্রহণ করতে শুরু করার পর সে যথার্থ সংস্কৃত পণ্ডিতদের ভক্তি করে। একজন গরীব ব্রাহ্মণকে গো-বৎস দানের উপযোগিতাই বা কী ? গাভী কেউ দান করে না, সকলেই দেয় মদ্দা বাছুর। সে বাছুর একদিন বলীবর্দ হয়ে উঠবে, তখন গরীব ব্রাহ্মণ তাকে নিয়ে কী করবে ? ব্রাহ্মণ তো আর হালচাষে নামবে না, শুধু শুধু এক বলীবর্দের আহার জোগাড় করবেই বা কোন্ উপায়ে ?

গঙ্গানারায়ণ শুনেছিল, কুড়ি বাইশ বৎসর আগে ডিরোজিও শিষ্য ইয়ং বেঙ্গলের দল পথেঘাটে ব্রাহ্মণদের শিখা কেটে নেবার জন্য তাড়া করতো। কিন্তু তখন কেউই শেষ পর্যন্ত কোনো ব্রাহ্মণের শিখা কাটেনি, আর নবীনকুমার এত অল্প বয়েসেই এমন দুঃসাহস দেখালো ? তাহলে যুবা অবস্থায় বা পূর্ণ বয়সে সে আরও কত কী করবে ? সে কোন্ পথে যাচ্ছে ?

গঙ্গানারায়ণ আরও অবাক হলো এই ভেবে যে, বিধুশেখর এমন একটা কাণ্ড ঘটতে দিলেন ? তাঁর অজ্ঞাতে তো এ বাড়িতে কোনো কিছুই ঘটা সম্ভব নয়। দেব-দ্বিজে বিধুশেখরের অসীম ভক্তি, তাঁর চোখে তো এ কাজ বিরাট অন্যায়।

সেদিনই অপরাহ্নে নবীনকুমারের দেখা পেয়ে গঙ্গানারায়ণ প্রশ্ন করলো, ছোটকু, তুই নাকি এক বামুনের টিকি কেটিচিস ?

নবীনকুমার হাস্য ঝলমল মুখে বললো, গঙ্গাদাদা, তুমি তো এখুনো দেকোনি। আমি সকলকে ডেকে ডেকে দেকাই ! এসো, আমার ঘরে এসো !

নবীনকুমার গঙ্গানারায়ণের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল নিজের কক্ষে। সত্যিই দেওয়ালে একটি কাচের ফ্রেমে বাঁধানো অবস্থায় সেই একগুচ্ছ শিখা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

গঙ্গানারায়ণ বললো, কী দস্যি ছেলে রে তুই ? বামুনের টিকি কাটলি ! তোর ভয় করলো না ?

নবীনকুমার বললো, গঙ্গাদাদা, তুমি থাকলে আরও মজা হত। টিকি কাটার পর সে বামুনটা মাথায় হাত দিয়ে তিড়িং তিড়িং করে লাপাতে লাগলো। আর আমাদের এক ব্যাটা হিন্দুস্থানী দারোয়ান চেঁচিয়ে বললো, হায় রাম, চৈতন চুটকি খো গ্যয়া। হায় রাম।

কথা বলতে বলতে নবীনকুমার একেবারে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলো। গঙ্গনারায়ণেরও ঠোঁটে স্মিত হাস্য এসে গেল, যদিও অন্তরে সে মৃদু অস্বস্তি বোধ করছে। তার ধারণা, এই ধরনের কাজের ফলাফল সুদূরপ্রসারী হয়।

সে বললো, তুই যে এমন পাগলামি করলি ছোটকু, এর পর যদি কোনো বামুন পণ্ডিত তোকে শিক্ষা দিতে না চায় ? এবার তোর জন্য খুব নামকরা একজন পণ্ডিত ঠিক করা হয়েচে।

নবীনকুমার বললো, আমি সেই পণ্ডিতমশাইকে বলিচি, আপনি যদি না আসেন, তাহলে পাইক পাঠিয়ে আপনাকেও ধরে এনে আপনারও টিকি কুচ্ করে দোবো !

গঙ্গানারায়ণ বললেন, কী সাঙ্ঘাতিক কথা ! অত বড় পণ্ডিতকে তুই এমন করে বললি ? তিনি কী উত্তর করলেন ?

পণ্ডিতমশাই বললেন, তুমি উত্তম কাজই করেচো বাপু। আজকাল হাজারে হাজারে নকল বামুন গজিয়েচে। তাদের এমনতর শাস্তিরই দরকার।

—দেকবি, নিউজ পেপারে এবারে আমাদের বাড়ি সম্পর্কে নানা কথা বেরুবে।

—বেরুক গে ! কোন্ নিউজ পেপার লিকবে ? তুমি সেই নিউজ পেপারটা কিনে নিও !

—ওরে বাস রে !

—তুমি বসো গঙ্গাদাদা, তুমি তো ছিলে নাকো, তাই তোমার জন্য আমি সব কথাগুলোন লিকে রেকিচি।

—কোন্ কথাগুলোন ?

—সেদিন টিকি কাটার সময় যা হলো। তুমি বসো, আমি পড়ে শোনাই।

নবীনকুমার তার বইপত্রের মধ্য থেকে কয়েকটি আলগা কাগজ বের করলো। তাতে সুন্দর

হস্তাক্ষরে বাংলায় অনেক কিছু লেখা। গঙ্গানারায়ণ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। এমন মুক্তার মতন হস্তাক্ষর কদাচিৎ দেখা যায়। সে আরও চমৎকৃত হয়ে গেল, যখন নবীনকুমার সেই রচনাটি পড়ে শোনালো। রচনার নাম, 'ব্রাহ্মণ হইল চাঁড়াল'। অতি জটিল শব্দসমন্বিত বিশুদ্ধ বাংলা।

গঙ্গানারায়ণ জিজ্ঞেস করলো, এ সব তুই নিজে লিকিচিস ? না পণ্ডিতমশাই তোকে বলে দিয়েচেন ?

নবীনকুমার বললো, আমি লিকিচি। আমি আরও কত লিকিচি। পণ্ডিতমশাই তো জানেই না। শুদু দুলালকে শুনিয়িচি, আর এই তোমায় শোনালুম।

—এমন তো আমি লিকতে পারি না রে ছোটকু ! বাংলা লিকতে গেলে আমার কলম ভেঙে যায়। তুই তো অতি সুন্দর লিকিচিস, এ লেকা তো বিদ্যেসাগর মশাইকে দেখানো দরকার। তোর পণ্ডিতমশাইকে বলিস।

—গঙ্গাদাদা, আমি গানও বাঁধতে পারি। দুটো বাংলা গান বেঁধেচি, শুনবে ?

গঙ্গানারায়ণের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। নবীনকুমার সত্যিই দুটি বাংলা গানও লিখেছে, যাতে ছন্দ ও মিল আছে রীতিমতন। গঙ্গানারায়ণের মনে হলো, তাহলে কি তার ভাইও মধুর মতন একজন কবি হবে ? পোয়েট অ্যাণ্ড অথর। কবিরা বাল্য থেকেই এমন জেদী, খামখেয়ালি আর স্বতন্ত্রতাপরায়ণ হয় ?

নবীনকুমারের বাংলা রচনা-শক্তি ও জ্ঞান দেখে গঙ্গানারায়ণ মুগ্ধ হলেও সে নিজে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, তার মনে হয় যে ইংরেজী শিক্ষা না পেলে নবীনকুমারের মনের প্রসারতা বাড়বে না। ইওরোপের সাহিত্য ও দর্শনের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় না হলে আধুনিক পৃথিবীর অনেক কিছুই তার অজানা থাকবে।

সেইজন্য গঙ্গানারায়ণ একজন ইংরেজ শিক্ষককে নিযুক্ত করলো তার ছোট ভাইয়ের জন্য। এ ব্যাপারে বিধুশেখর প্রথমে একবার আপত্তি তুলেছিলেন। তাঁর আপত্তি সরাসরি ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে নয়, এখন সকলেই, এমনকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও ইংরেজী শিখছে, রাজভাষা শিক্ষা না করলে সমাজে স্থান পাওয়া যায় না, কিন্তু বিধুশেখর বললেন, বাড়িতে ম্লেচ্ছ ঢোকানো চলবে না। ইংরেজরা শুয়োর গরু খায়, বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেও জুতো খোলে না, কোনো হিন্দু গৃহে তারা প্রবেশ করলে সে বাড়ির পবিত্রতা নষ্ট হয়। এদিকে বিম্ববতী তাঁর পুত্রকে বাড়ির বাইরে পাঠাবেন না পড়াশুনোর জন্য। নবীনকুমারকে যদি ইংরেজী শেখাতেই হয়, তবে কোনো হিন্দু ভদ্রলোককে নিযুক্ত করা হোক না।

গঙ্গানারায়ণ রাতারাতি সিংহবাড়ির সংলগ্ন উদ্যানে একটি পাঠকক্ষ নির্মাণ করিয়ে ফেললো। গঙ্গানারায়ণের পিতা বেঁচে থাকতে এ বাড়িতে বিবাহাদি উৎসবে অনেক সময় ইংরেজরা নিমন্ত্রিত হয়েছে, তখন তাদের বসানো হয়েছে ঐ উদ্যানে শামিয়ানা খাটিয়ে। সুতরাং উদ্যানের পাঠকক্ষে ইংরেজ শিক্ষক এসে অনায়াসে নবীনকুমারকে পড়াতে পারবে।

মিঃ কার্ক প্যাট্রিক একজন মৃদু স্বভাবের মানুষ। অনেক ভাগ্যান্বেষী বেসরকারী ইংরেজের মতন সেও এ দেশে এসেছিল ব্যবসা বাণিজ্য করে লক্ষ্মীলাভ করতে। কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। সব কাজ সকলের জন্য নয়। কার্ক প্যাট্রিক অধিকাংশ সময়ই বই পড়ে কাটায়। তার সঙ্গে কথা বলে গঙ্গানারায়ণ বুঝেছিল যে লোকটির জ্ঞানের কৌতূহল অসীম, এমন একজনই নবীনকুমারের উপযুক্ত শিক্ষক হতে পারবে। যদি সে তার দুরন্তপনাকে কিছুটা বশ করতে পারে।

কিন্তু কার্ক প্যাট্রিক প্রায়ই অভিযোগ জানাতে লাগলো, গঙ্গানারায়ণের কাছে। একবার সে উড়িষ্যা সফরে গিয়েছিল, ফিরে এসে শুনলো যে কার্ক প্যাট্রিক কাজ ছেড়ে চলে গেছে। নবীনুকমারকে প্রশ্ন করে কোনো সদুত্তর পাওয়া গেল না। সে বললো, ও সাহেব তো পাগল। বিড়বিড় করে আপন মনে বকে। ও আবার পড়াবে কী !

শহরে ইংরেজ শিক্ষকের অভাব নেই। একজনের বদলে আরও দশ গণ্ডা পাওয়া যায়। কিন্তু কার্ক প্যাট্রিককে গঙ্গানারায়ণের পছন্দ হয়েছিল, সে কেন কাজ ছেড়ে গেল সেটা জানা দরকার। সে ডেকে পাঠালো কার্ক প্যাট্রিককে।

কার্ক প্যাট্রিক এলো এবং ঘণ্টাখানেক আলোচনা হলো তার সঙ্গে। সে মোটেই নবীনকুমারের ওপর রাগ করে কাজ ছেড়ে চলে যায়নি, বরং নবীনকুমার সম্পর্কে তার মনে অনেকখানি স্নেহ জন্মেছে। তার

মতে, নবীনকুমারের মতন এমন মেধাবী ছাত্র বিরল, অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এই বালকের, এমন ছাত্রকে পড়িয়েও আনন্দ। কিন্তু এমন অদ্ভুত বালকও সে দেখেনি কখনো। এত অল্প বয়েস হলেও এই বালকের মধ্যে যেন স্পষ্ট দুটি সত্তা আছে। এক একদিন সে পড়াশুনোয় অত্যন্ত আগ্রহী, প্রায় শ্রুতিধরের মতন সে শিক্ষকের মুখ থেকে যা শোনে, পরক্ষণেই তা নিজে বলে দেয়। শিক্ষককে সে নানান প্রশ্ন করে বহু বিষয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয়। আবার অন্য এক একদিন সে পড়াশুনো সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বোধ করে না, শিক্ষকের সামনে ডিগবাজি খেয়ে নানা প্রকার কসরত দেখায় এবং ইচ্ছে করেই সে সব দিনে সে একটিও ইংরেজী শব্দ উচ্চারণ ন করে বাংলায় নানান কথা বলে আর হাসে। সে সব দিনে বালকটিকে উন্মাদ বলে ভ্রম হয় কার্ক প্যাট্রিকের। এই জন্যই দিশেহারা হয়ে সে এ বাড়িতে আসা বন্ধ করেছে।

গঙ্গানারায়ণ অবিশ্বাস করলো না। অতি শৈশব থেকেই নবীনকুমারের আচরণে নানা রকম অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখা গেছে, সে জানে। কিন্তু হয়তো বা এই সব অস্বাভাবিকতাই প্রতিভার লক্ষণ। গঙ্গানারায়ণ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলো, এর প্রতিবিধান কী? অন্য শিক্ষকদের সঙ্গেও নবীনকুমার এরকম ব্যবহার করে, কোন্ উপায়ে এর সুচারু শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়।

সাহেবের মতে, নবীনকুমারকে কোনো স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া উচিত। অন্যান্য অনেক বালকের সঙ্গে মিশলে, খানিকটা বাধ্যতামূলক শৃঙ্খলার মধ্যে পড়লে এর স্বভাব শুধরে যেতে পারে।

গঙ্গানারায়ণ তা জানে। কিন্তু তার মা কিছুতেই নবীনকে স্কুলে পাঠাতে চান না। নইলে তার কত সাধ ছিল, তার মতন নবীনও হিন্দু কলেজে পড়বে।

কয়েকদিন বাদে অপ্রত্যাশিতভাবে সেই সুযোগ এসে গেল। নবীনকুমার নিজেই এসে বললো, গঙ্গাদাদা, আমি কালেজে পড়বো। আমার আর বাড়ির মাস্টারদের ভালো লাগে না। পথ দিয়ে দেকি ছেলেরা বই খাতা নিয়ে কালেজে যায় আমিও ওরকম যাবো। তুমি মাকে বলো।

নবীনকুমার নিজে আবদার ধরলে তো আর কোনো কথাই নেই। বিম্ববতীর এতকালের আপত্তি একদিনে মুছে গেল। তিনি প্রথমে ক্ষীণভাবে একবার না বলতেই নবীনকুমার সকালের খাওয়া বন্ধ করেছিল। অমনি বিম্ববতী গঙ্গানারায়ণকে ডেকে বললো, ও গঙ্গা, তুই ব্যবস্থা কর বাপু, ও যখন গোঁ ধরেচে একবার—। পুরুতমশাইকে বল একটা শুভ দিন দেখতে—

হিন্দু কলেজের বহু পুরোনো শিক্ষক এখনো গঙ্গানারায়ণকে চেনে। তার কয়েকজন বন্ধুও এখন ওখানে শিক্ষকতা করছে, সুতরাং ভাইকে ভর্তি করার জন্য তাকে কোনো বেগই পেতে হবে না। মফস্বল থেকে ফিরে গঙ্গানারায়ণ শুনেছে যে, হিন্দু কলেজ নিয়ে কিছু গোলমাল চলছে শহরে। কিছু গোঁড়া লোক হিন্দু কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে একটা পাল্টা নতুন কলেজ খুলেছে। তা হোক। গঙ্গানারায়ণ তার নিজের পুরোনো কলেজেই ভর্তি করবে ভাইকে। সারা দেশে হিন্দু কলেজের মতন এমন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান আর আছে নাকি?

ওস্তাগর ডেকে নবীনকুমারের জন্য ইংরেজী ফ্যাসানের পোশাক তৈরি করানো হয়েছে। একটা পৃথক জুড়িগাড়ি এবং দুজন ভৃত্যকে ঠিক করা হয়েছে, তারা প্রতিদিন নবীনকুমারকে কলেজে নিয়ে যাবে ও নিয়ে আসবে।

ভর্তি হবার আগের দিন বিকেলে এলেন বিধুশেখর। সিঁড়ির মুখে গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে দেখা। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, তোমরা নাকি নবীনকে হিন্দু কলেজে ভর্তি কচ্চো? আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজনীয়তাও মনে করোনি?

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে তিনি ধীর পদে উঠে গেলেন দ্বিতলে। বিম্ববতীর কক্ষের সামনে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনি ঐ একই বাক্য দুটি উচ্চারণ করলেন। তারপর ভিতরে ঢুকে দু' পা এগিয়ে তিনি আবার বললেন, ওসব হবে না। নবীন কালেজে যাবে না। বাড়িতে যেমন পড়চে পড়ুক।

বিম্ববতী বললেন, খোকা যে কাঁদাকাটা করবে। খুব বায়না ধরেচে।

বিধুশেখর রুক্ষ স্বরে বললেন, কাঁদুক। দু' দিনে আবার থেমে যাবে। হিঁদু কালেজ এখন নষ্টামির কালেজ। সেখানে বেশ্যার ছেলে পড়ে। সেখানে এ বাড়ির ছেলেকে পড়াতে পাঠাবে? এসব গঙ্গার বুদ্ধি? বংশমর্যাদা বোঝার ক্ষমতা তার নেই। বেশ্যার ছেলে পাশে বসবে সিংহী বাড়ির ছেলে!

একটু থেমে, বিম্ববতীর মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিধুশেখর আবার বললেন, খোকাকে মানুষ করার ভার কি শুধু একা তোমার? আমার মতামতের বুঝি কোনো মূল্য নেই?

বিম্ববতী সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠে দারুণ ভয়ার্তভাবে বললেন, না, না, আপনি যা বলবেন, তাই হবে।

একটু পরে, বিম্ববতীর ঘর থেকে ফেরার পথে বিধুশেখর আবার নিজেই গঙ্গানারায়ণকে ডেকে বললেন, নবীন কালেজে যাবে না। সে তেরো বচরে পড়লো, আমি ঠিক করিচি, এ বচরেই তার বিয়ে দেবো। পাত্রী আমার পছন্দ করা হয়ে গ্যাচে।

এবারও গঙ্গানারায়ণের কোনো উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা না করে বিধুশেখর চলে গেলেন বাইরে।

নবীনকুমারের বিবাহে যেমন জাঁক হলো, তার তুল্য কিছু সাম্প্রতিক কালের কলকাতায় আর ঘটেনি। এ শহরে রাজা মহারাজাদের অন্ত নেই, তা ছাড়া নতুন কালের শ্রেষ্ঠী যারা, তাদেরও অতুল ধনসম্পদ। দত্ত, মল্লিক, দেব, শীল, সরকার, ঘোষাল—এই সব এক একটি পরিবারে শ্রাদ্ধ, বিবাহে প্রচুর ধুমধাম আর টাকার ছড়াছড়ি হয় বটে, কিন্তু পরলোকগত রামকমল সিংহের বিধবা পত্নী বিম্ববতী একেবারে সকলকে টেক্কা মেরে গেলেন। লোকে বলাবলি করতে লাগলো, রামকমল সিংগী বেঁচে নেই, তাতেও এত জোস, আর তিনি বেঁচে থাকলে না জানি আরও কী হতো! লোকে আরও বললো, হ্যাঁ, একেই বলে সোদরোপম বন্ধু! নাবালকের সম্পত্তি চিরকাল বার ভূতে লুটে খায়, আর বিধু মুখুজ্যে তাঁর বন্ধুর নাবালক পুত্রের সম্পত্তি যেন চার গুণ বাড়িয়ে দিয়েচেন।

নবীনকুমারের বিবাহ হলো বাগবাজারে। বর যখন শোভাযাত্রা করে যায়, তখন তাকে দেখবার জন্য শহর সুদ্ধ লোক যেন ভেঙে পড়েছিল। জুড়িগাড়ির বদলে বর গিয়েছিল অশ্বারোহণে, তার জন্য একটা বিশেষ পোশাক তৈরি করানো হয়েছিল, যাতে সাচ্চা হীরা-মোতি-চুনী-পান্নার ঝালর, মাথায় উষ্ণীব, আর কোমরবন্ধের তলোয়ারের খাপে সোনার কাজ করা। ত্রয়োদশ বর্ষের কিশোর নবীনকুমারের সে কি রূপ, যেন তাকে স্বপ্নের দেশের রাজকুমার বলে বোধ হয়।

বিবাহ উপলক্ষে বাই নাচ হয়েছিল সাত দিন ধরে। ইদানীংকালের কেতা অনুযায়ী সাহেব-বিবি এবং দেশীয় ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিনে। নিমন্ত্রিতদের প্রত্যেকের কাছে পত্রের সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল পিত্তলের ঘড়া বা থালা, অথবা কাশ্মীরী শাল বা কাশীর বস্ত্র অথবা রৌপ্য বাঁধানো শঙ্খ ও লোহা। সকল সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হলো নবীনকুমারের বিবাহের উৎসবের বর্ণনা।

এত বড় অনুষ্ঠানে গঙ্গানারায়ণের কোনো ভূমিকাই ছিল না, ব্যবস্থাপনার সমস্ত দায়িত্ব বিধুশেখর নিজের হাতে রেখেছিলেন। তিনি কোনো বিষয়েই গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে একবারও পরামর্শ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি, প্রকাশ্যেই তিনি গঙ্গানারায়ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন।

গঙ্গানারায়ণ বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী, সে নিজে এরকম বিবাহে বাধ্য হয়েছিল বটে, কিন্তু সে চেয়েছিল, তার আদরের ছোট ভাইটি লেখাপড়া শিখে উপযুক্ত হয়ে উঠে যখন ভালো মন্দ বিচারে পারঙ্গম হবে, তখনই তার বিবাহ দেওয়া ঠিক হবে। বাল্যবিবাহরূপ কুপ্রথা এ দেশের অনেক দুর্দশার হেতু।

এ ব্যাপারে গঙ্গানারায়ণ প্রথমে জননী বিম্ববতীকে বোঝাতে গিয়েছিল। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। গঙ্গানারায়ণের সমস্ত কথার উত্তরে উনি শুধু বিধুশেখরের ওপর বরাত দিয়ে বলেছিলেন, উনি যা ভালো বোঝেন তাই করবেন, তুই আর অমত করিসনি, গঙ্গা। উনি তো নবীনের অহিত চাইবেন না!

গঙ্গানারায়ণ কিছুতেই বুঝতে পারেনি, বিধুশেখরের এতখানি জোরের কারণ কী। কলেজে পড়া বন্ধ হওয়ায় নবীনকুমার উন্মাদের মতন কান্নাকাটি করেছে, দুদিন কিছুই খায়নি, তবু বিধুশেখরের মত অগ্রাহ্য করে পুত্রকে কলেজে পাঠাতে রাজি হননি বিম্ববতী। পুত্র-অন্ত প্রাণ যে বিম্ববতীর, তিনিও বিধুশেখরের ভয়ে পুত্রের ক্রন্দন সহ্য করেছেন।

সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বিধুশেখর রূঢ় ভাষায় গঙ্গানারায়ণকে যে কথাগুলি বলে গিয়েছিলেন, তা স্মরণ করলে এখনো ক্রোধে গঙ্গানারায়ণের শরীর কম্পিত হয়। কথাগুলি যেন গলিত লাভার মতন তার কর্ণে প্রবেশ করেছিল। সেইক্ষণেই সে শপথ নিয়েছিল, এবার সে ঐ বৃদ্ধের দর্প ভাঙবেই।

বিম্ববতী যতই বিধুশেখরের পক্ষ সমর্থন করুন, নবীনকুমারকে সে তার নিজের দিকে পাবে। তার ছোট ভাই তার কথা মান্য করে। নবীনকুমার জেদ ধরলে তার অন্যথা করার সাধ্য বিধুশেখরেরও নেই। নবীনকুমার বিধুশেখরকে ভয় পায় না একটুও।

কিন্তু অতীব আশ্চর্যের বিষয়, নবনীকুমার কলেজে যেতে না পারার জন্য কাঁদা-কাটা করলেও বিবাহের প্রস্তাবে এক কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল। ঐটুকু বালকের বিবাহের জন্য কী আগ্রহ! বস্তুত বিবাহ প্রসঙ্গ এসে পড়াতেই সে কলেজে না-যাবার দুঃখ ভুলে গেল। গঙ্গানারায়ণ জিজ্ঞেস করেছিল, ছোটকু, তুই এরই মধ্যে বে করবি? তুই বে'র কি বুঝিস?

নবীনকুমার বিজ্ঞ ভঙ্গিতে বলেছিল, হ্যাঁ দাদা, আমি রাধাকে বে কর্বো।

গঙ্গানারায়ণ বিস্মিত হয়ে বলেছিল, রাধা? রাধা কে?

নবীনকুমার বলেছিল, আমি তো কেষ্টঠাকুর। তাই রাধা আমার বউ হবে। বেশ মজা হবে, আমি রাধার সঙ্গে বাগানে নুকোচুরি খেলবো। গঙ্গাদাদা, জানো, আমি বাঁশি বাজাতে পারি!

বাগবাজারের যে পাত্রীটি বিধুশেখর পছন্দ করে রেখেছিল, তার নাম রাধা নয় অবশ্য, বরং তার থেকে এক কাঠি ওপরে, সে মেয়েটির নাম কৃষ্ণভামিনী। এ নামের অর্থ নবীনকুমারকে বোঝাতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি, সে একেবারে আহ্লাদে ডগমগ।

ঐ বিবাহের কিয়ৎদিবস পরে গঙ্গানারায়ণ আবার মহাল পরিদর্শনে যাওয়া মনস্থ করলো। নীলচাষীদের অসন্তোষ নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। অবিলম্বে এর কিছু বিহিত না করলে অবিলম্বে একটা গুরুতর হাঙ্গামা শুরু হয়ে যেতে পারে। নীলচাষীরা তাদের অসহায় অবস্থা দূর করার জন্য জমিদারদের সাহায্য প্রার্থনা করছে, কিন্তু জমিদাররাও কুঠিয়াল সাহেবদের কাছে পর্যুদস্ত। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মফস্বল আদালতে কুঠিয়াল সাহেবদের অপরাধের বিচার করার কোন ব্যবস্থা সরকার মেনে নিলেন না। ফলে মফস্বলে কুঠিয়াল সাহেবগণ অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, এমনকি মানুষ খুন করেও নিষ্কৃতি পেয়ে যায়। আর চাবুক মারার ঘটনা তো অহরহই ঘটছে। হাতে চাবুক নেই এমন কোনো নীলকর সাহেবের চেহারা কল্পনাও করা যায় না।

গঙ্গানারায়ণ অকুস্থলে গিয়ে যে কিছু ব্যবস্থা করতে পারবে, তার কোনো ভরসা নেই, আবার না গেলেও মহালগুলি চিরতরে হাতছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা। বিধুশেখর নিজে কখনো বাইরে যান না, তাই এই দায়িত্ব তার ওপরে দেওয়া ছিল। গঙ্গানারায়ণেরও কলকাতার বাড়িতে মন টিকছে না। নবীনকুমারের বিবাহের পর বাড়িতে এখনো বহু আত্মীয়স্বজনের ভিড়, সকলেই নতুন বর-বধূকে নিয়ে মত্ত। গঙ্গানারায়ণ সেই মত্ততায় যোগ দিতে পারেনি বলে তার প্রতিও কেউ মনোযোগ দেয় না। সে যেন নিজগৃহে পরবাসী। যথারীতি নবীনকুমারের পত্নী কৃষ্ণভামিনীও এক অষ্টমবর্ষীয়া অক্ষরজ্ঞানহীনা বালিকা। দেশে ও সমাজে যে একটা নতুন পরিবর্তনের প্রবাহ এসেছে, সে সম্পর্কে বাড়ির সকলেই অচেতন। এটা যেন গঙ্গানায়ণের কিছুতে সহ্য হয় না।

তার স্ত্রী লীলাবতীকেও সে আপন মনের মতন করে গড়ে নেবার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। লীলাবতীকে সে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করেছিল, হলো না। লীলাবতী কোনো মেমবিবির কাছে পড়বে না। বাইরের কোনো পুরুষ মানুষ, তা তিনি যত বৃদ্ধই হোন, তাঁর সামনেও মুখ খুলবে না লীলাবতী। তখন গঙ্গানারায়ণ ধৈর্য ধরে নিজে সময় ব্যয় করে লীলাবতীকে পড়াতে চেয়েছে, লীলাবতী তাতেও কান্নাকাটি করে বলেছে, ওগো, আমার মাতা নেই, তুমি রাগ করোনিকো, আমার ওসব হবে না। ছাগল দিয়ে কি হাল চাষ হয়!

যে-স্ত্রীলোক নিজেই নিজেকে ছাগলের সঙ্গে তুলনা দেয়, তার সঙ্গে মানুষ হয়ে গঙ্গানারায়ণ আর কতকাল একসঙ্গে বাস করতে পারবে।

এমনকি নবীনকুমারকেও গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, ছোটকু, তোর বউঠানকে মাঝে মধ্যে একটু পড়াবি তো। পড়ায় মন না বসলে বকবি! নবীনকুমার মহোৎসাহে কয়েকদিন পড়াতে বসেছিল লীলাবতীকে : তার ফল শুভ হয়নি। নবীনকুমার আর লীলাবতীর বয়সের ব্যবধান বেশী নয়, লীলাবতী মাত্র দু বৎসরের বড়। প্রায়ই দেখা গেল, তারা হাতাহাতি, চুলোচুলি করছে। শেষে বিম্ববতীই আদেশ দিয়েছেন, দুজনের আর একসঙ্গে পড়তে বসার প্রয়োজন নেই।

বিদ্যার্জনে না হয় আগ্রহ নাই-ই থাকলো, স্বামীর মন বোঝার কিংবা স্বামীকে সঙ্গ দেবার ব্যাপারেও

তার কোনো আগ্রহ নেই। লীলাবতী ভাবে, শুধু রাত্রে স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হওয়াতেই নারীজন্মের সার্থকতা। তাতেই সে তৃপ্ত। তার বয়সী অনেক মেয়েই এমন সুযোগও পায় না। লীলাবতী তার মা-দিদিমা-মাসী-পিসীদের জীবন থেকে এই ধারণাই গড়ে নিয়েছে যে বাড়ির কর্তাদের সঙ্গে বাড়ির বউদের দেখাশুনা হবে খুবই কম, নানান কাজে কম্মে কর্তারা প্রায়ই বাড়ির বাইরে রাত কাটাবেন। মাসের পর মাস দেখা না হওয়াটাও আশ্চর্য কিছু নয়। দূরত্ব ও দুর্লভতার কারণেই পতিকে দেবতার মতন সম্মান করতে হয়। গঙ্গানারায়ণ যে লীলাবতীকে প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরে কাছে পেতে চেয়েছে, তার বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের অনেক কথা উজাড় করে দিতে চেয়েছে, তাতে যেন কিছুতেই লীলাবতী স্বস্তি বোধ করেনি, কথার মাঝখানে তার চক্ষে ফুটে উঠেছে চাঞ্চল্য। স্বামীর এরকম ব্যবহার তার কাছে স্বাভাবিক মনে হয় না। সে যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

এমনকি গঙ্গানারায়ণ যখন মহাল পরিদর্শনে যায়, তখনও লীলাবতী তার সঙ্গিনী হতে চায় না। গঙ্গানারায়ণ তার বোটে লীলাবতীকে নিয়ে গেছে দু একবার, সে উপভোগ করেনি। বাইরের পৃথিবীকে সে একটা ভয়ের স্থান বলে বিবেচনা করে। সন্ধের পর সে একটি সামান্য ছিপ নৌকোকেও মনে করে ডাকাতের নৌকো, খালি-গায়ে যে-কোনো অচেনা মনুষ্যকেই সে মনে করে দুর্বৃত্ত। আর পথে-ঘাটে খালি গায়ে মানুষই বেশী। বর্ষার নদী কিংবা দুপুরের বৃক্ষরাজি কিংবা আকাশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের গায়ে উড়ন্ত বলাকার দৃশ্যও তাকে মুগ্ধ করে না। গঙ্গানারায়ণ লীলাবতীকে দেখে বুঝেছে যে প্রকৃতির রূপ অবলোকন ও তারিফ করার জন্যও মানসিক শিক্ষার প্রয়োজন। বহু শতাব্দী ধরে যারা মুক্তির স্বাদ পায়নি, তারা তো মুক্তির মর্মই ভুলে গেছে। গঙ্গানারায়ণ অবশ্য এমন নির্লিপ্তভাবে বিষয়টি সব সময় দেখতে পারে না, প্রায়ই তার অভিমান হয়।

এবারও গঙ্গানারায়ণ একাই বেরিয়ে পড়লো। ইব্রাহিমপুর পরগনায় বিশেষ গোলযোগের সংবাদ এসেছে, তার গন্তব্য সেই দিকে। এবার তার হৃদয় খুব ভারাক্রান্ত। অথচ বিশেষ চিন্তা বা উদ্বেগ যে রয়েছে তা নয়, বরং কোনো চিন্তাই যেন দানা বাঁধছে না। চিন্তাহীনতাও যে মনের ভার বৃদ্ধি করে, তা এই সব সময়ে বোঝা যায়। সে যেন তার জীবনের উদ্দেশ্যই হারিয়ে ফেলেছে। সংসারের প্রতি কোনো বন্ধন তার নেই, অথচ সংসারের বাইরে বৃহৎ কোনো কর্মকাণ্ডেও সে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারছে না। শিক্ষা, ধর্মসংস্কার, সাহিত্য-সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে দেশে নিত্য নতুন নতুন আন্দোলন দেখা দিচ্ছে। এবং এই সব মিলিয়ে আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে এক রকমের জাতীয়তাবোধ। গঙ্গানারায়ণ এসব টের পায়, কিন্তু সে যেন শুধু দর্শক, সে অংশগ্রহণকারী নয়। এজন্য সে নিজেকে এক এক সময় তিরস্কার করে, তবু কিছুতেই সে নিজের অন্তর্মুখী স্বভাবটা বদলাতে পারে না।

বিধুশেখরের কাছে সে পরাজিত হয়ে গেছে। বিম্ববতী তাঁকে জমিদারী পরিচালনার ব্যাপারে নিজের প্রতিনিধি করে রেখেছেন। কিন্তু জমিদারী বা ব্যবসায়ের ব্যাপারে সে কোনো পরিবর্তন আনতে গেলে বিধুশেখর মাঝে মাঝে হস্তক্ষেপ করেন। গঙ্গনারায়ণ দশটি প্রস্তাব আনলে চার পাঁচটিতে বিধুশেখর সম্মতি জানিয়ে বাকিগুলি সম্পর্কে গম্ভীরভাবে মস্তক নেড়ে বলেন, না, এটা কল্যাণকর হবে না, কিংবা, না, এটা বাপু এ বংশের মর্যাদার উপযুক্ত হবে না। ব্যাপারটার মধ্যে এমন সূক্ষ্ম চতুরতা আছে যে, তা শুধু গঙ্গানারায়ণের চক্ষেই ধরা পড়ে। অকিঞ্চিৎকর বা অতি সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্মতি জানিয়ে বিধুশেখর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলিতে নিজের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখেন। এতে বিম্ববতী মনে করেন যে গঙ্গানারায়ণের অর্ধেক প্রস্তাব তো বিধুশেখর গ্রহণ করেছেনই, বাকিগুলি সম্পর্কে পরামর্শ দেবার মতন অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও পারিবারিক অধিকার বিধুশেখরের অবশ্যই আছে।

গঙ্গানারায়ণ জানে যে এই বিশাল সম্পত্তির সে মালিক নয়, সে তার ভ্রাতা ও জননীর স্বার্থরক্ষার কারণেই নিজেকে এর সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু সে যদি তার অধিকার প্রয়োগ করতে না পারে, প্রয়োজন অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিতে বাধা পায়, তাহলে তো তার ভূমিকা একজন সাধারণ কর্মচারীর মতন। তবু গঙ্গানারায়ণ এই কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছিল যে, কোনো না কোনো উপায়ে সে এক সময় বিধুশেখরের মৌরুসীপাট্টা ভাঙবেই। কিন্তু কয়েকমাস আগে বিধুশেখর সিঁড়ির পাশে তাকে বললেন, আমি বলচি, নবীনকুমার কালেজে যাবে না, আমি শীঘ্রই বিবাহ দেব তার—এবং কথাগুলি ঠিক অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হলো, এর ফলেই গঙ্গানারায়ণের মন যেন একেবারে ভেঙে গেছে। বিধুশেখর তাকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং বিম্ববতীর কাছে বিধুশেখরের আদেশই ধ্রুব।

প্রজারা গঙ্গানারায়ণকে জমিদার জ্ঞানে সম্ভ্রম করে, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ প্রকৃতপক্ষে তো জমিদার নয়, সে সিংহবাড়ির সন্তানও নয়। গঙ্গানারায়ণ এ পৃথিবীর কেউ নয়।

ইব্রাহিমপুর পরগনার ব্যাপার বিশেষ জটিল। রামকমল সিংহের আমলেই এখানে তাদের নিজস্ব একটি নীলকুঠি ছিল। নীল চাষে লাভ যথেষ্ট। তবে কয়েক বছর ধরে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। অদূরেই সাহেবরা আর একটি কুঠি স্থাপন করেছে এবং জমি ইজারা নিয়ে রায়তদের দিয়ে জোর জুলুম করে নীল চাষ করাচ্ছে। চাষীরা আজকাল তাদের উৎপাদিত নীলের ন্যায্য দাম পায় না, সাহেব কুঠিয়ালের কাছেই তাদের সব ফসল বিক্রি করতে হয়। মূল্যের ব্যাপারেও সাহেবদের কথাই চূড়ান্ত। এখন আবার মূল্যের প্রশ্নও নেই। সাহেবগণ বিঘা প্রতি দু টাকা করে দাদন দিচ্ছে চাষীদের, তারপর উৎপন্ন সব ফসলই তাদের। যে রায়ত দাদন নিতে অস্বীকার করে তাকে ধরে এনে প্রহারে প্রহারে আধমরা করার পর কাগজে আঙুলের ছাপ দেওয়ানো হয়। সেই দু টাকার দাদন তার আর ইহজীবনে শোধ হবে না।

চাষীদের দুর্দশা দেখে কয়েক বৎসর আগে গঙ্গানারায়ণ ঠিক করেছিল যে নীল চাষের বদলে সে চাষীদের আবার ধান চাষে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

কিন্তু বিধুশেখর তাতে বাধা দিয়েছেন। বিধুশেখরের বক্তব্য ছিল এই যে, জলে বাস করে যেমন কুমীরের সঙ্গে লড়াই করা যায় না, সেরকমই কোনো রাজার রাজত্বে বাস করে রাজবংশীয় লোকেদের সঙ্গে বিবাদ করে প্রাণ বাঁচানো যায় না। সাহেবরা যখন নীলকুঠি স্থাপন করেছে, তখন সন্নিহিত জমিতে সোনার ধান ফলতে দেখলে তাদের চক্ষু জুড়োবে না। বরং চীনা ড্রাগনের মতন তাদের মুখ দিয়ে আগুন নির্গত হবে এবং সেই আগুনে ধান ক্ষেত ছারখার হয়ে যাবে।

বিধুশেখরের নির্দেশে ইব্রাহিমপুর পরগনার জমিদারীর অর্ধেক নীলকর সাহেবদের ইজারা দিয়ে দেওয়া হলো। সমগ্র জমিই ছাড়া হয়নি, তার কারণ এখানকার কিছু জমিতে খুব ভালো ইক্ষু চাষ হয়, কয়েকজন চায়নাম্যান একটি চিনিকলও স্থাপন করেছে, আর চিনি বিক্রি হয় প্রায় সোনার দামে। কিন্তু সাহেবদের কাছে অর্ধেক জমি ইজারা দিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি। ম্যাকগ্রেগর নামে এক কুঠিয়ালের অত্যাচারে প্রজাদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ম্যাকগ্রেগরের চাবুকের নাম শ্যামচাঁদ, সেই শ্যামচাঁদ একবার যার পিঠে পড়ে জন্মের মতন তার শিরদাঁড়া বেঁকে যায়। এ বছর খরার কারণে ফসল ভালো হয়নি বলে ম্যাকগ্রেগর ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। এসব রায়তদেরই কারসাজি মনে করে সে গ্রামের ভেতর ঢুকে প্রতিদিন বাড়িঘর তছনছ করে। প্রাণভয়ে ভীত প্রজারা দলে দলে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে সাহেবের এলাকার বাইরে, তবু সেখানেও নিস্তার নেই। ম্যাকগ্রেগর এলাকা মানে না, তার ঘোড়া যতদূর ছুটতে পারে, ততদূরই সে যেতে রাজি। বড় রকমের ঝঞ্ঝাটের আশঙ্কায় চায়নাম্যানরা চিনিকল বন্ধ রেখে চলে গেছে এখান থেকে।

গঙ্গানারায়ণের পিনিস বজরা নদীর ঘাটে এসে ভেড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক দুই করে প্রজারা এসে হাজির হতে লাগলো। বজরার আগমন বার্তা অনেক আগে থেকেই রটে যায়। ইজারা দেওয়া তালুকের প্রজারা এসে কেঁদে পড়লো গঙ্গানারায়ণের পায়ে। বংশানুক্রমিকভাবে তারা জমিদারকেই রক্ষাকর্তা বলে জেনে এসেছে। দেশের রাজা কে, সে খবর তারা রাখে না। খাজনা বাকি পড়লে জমিদারের প্যায়দা গোমস্তারা মারধোর করে, সেটাও জমিদারের অধিকারের মধ্যে পড়ে। আবার আপদে বিপদে জমিদারের চরণেই আশ্রয় নিতে হয়।

গঙ্গানারায়ণ উদাসীনভাবে সব কথা শুনে যেতে লাগলো। বিভিন্ন জনের কথায় কুঠিয়াল ম্যাকগ্রেগরের যে চরিত্র ফুটে উঠছে, তাতে তাকে দানব বলেই প্রতীয়মান হয়। অনেকেরই পিঠে, বুকে, মুখে ম্যাকগ্রেগরের হাতের শ্যামচাঁদের ক্ষতচিহ্ন। অনেকে গৃহহীন।

গঙ্গানারায়ণের মনে হলো, ইজারা দেওয়া তালুকের প্রজাদের সম্পর্কে তার করণীয় কিছু নেই। জমির সঙ্গে সঙ্গে সেই জমি-নির্ভর মানুষদেরও ইজারা দেওয়া হয়ে গেছে। ইজারাদারই সেই জমি ও মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা; যদিও সেইসব প্রজারা এখনো জমিদারকেই তাদের প্রভু মনে করছে। কিন্তু আইন একথা মানবে না। আর তাদের খাস তালুকের প্রজাদের ওপরেও যে অত্যাচার চলছে, তার প্রতিবিধান করতে গেলেও কোনো না কোনোভাবে আইনেরই আশ্রয় নিতে হবে। সাহেব জাতির বিরুদ্ধে তো আর পাইক লাঠিয়াল নিয়ে যুদ্ধ করতে যাওয়া যায় না। মামলা মোকদ্দমার বিষয়

বিধুশেখরই ভালো বুঝবেন।

গঙ্গানারায়ণের মন বিবশ হয়েছিল, প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে তার জড়তা কাটতে লাগলো। সবচেয়ে সে বিচলিত হলো জামালুদ্দীন শেখের ঘটনা শুনে। জামালুদ্দীনের বিবি হানিফাকে কয়েকদিন ধরে পাওয়া যাচ্ছে না, সকলের ধারণা নীলকুঠিতেই তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ম্যাকগ্রেগরের কয়েকজন দেশী কর্মচারী আছে, তাদের মধ্যে গোলক দাস নামে একজন একেবারে সাক্ষাৎ শয়তান, সে ঐ সাহেবের সকল অপকর্মের দোসর। ঐ গোলক দাসের চোখ পড়েছিল হানিফা বিবির ওপর, সে-ই তাকে নিশ্চয়ই তুলে দিয়েছে সাহেবের হাতে। হানিফা বিবি দুদিন ধরে বেপাত্তা বলে জামালুদ্দীন শেখ নিজে গিয়েছিল নীলকুঠিতে খবর নিতে, তারপর থেকে জামালুদ্দীনও আর ফেরেনি। নীলকুঠিতে মাটির নীচে একটা ঘর আছে, সেখানে নিশ্চয়ই আটক করে রেখেছে জামালুদ্দীনকে। কিংবা তাকে এতক্ষণে খুন করে ফেলাও বিচিত্র নয়। ঐ নীলকুঠিতে যাবার সাহস আর কারুর নেই, একমাত্র গঙ্গানারায়ণ যদি কোনো ব্যবস্থা করতে পারে। হাজার হোক গঙ্গানারায়ণ জমিদার, নীলকুঠির সাহেব তার মান রেখে কথা বলবে অন্তত।

জামালুদ্দীন শেখকে চেনে গঙ্গানারায়ণ। অত্যন্ত বলিষ্ঠকায় পুরুষ, তার চেহারা ভিড়ের মধ্যেও চোখে পড়ে, সে এখানে একজন মোড়ল গোছের, কথাবার্তার ভঙ্গি গোঁয়ারের মতন, যদিও গঙ্গানারায়ণ বুঝেছিল, যে জামালুদ্দীন মানুষটা অতি সরল। সেই জলজ্যান্ত মানুষটা অদৃশ্য!

জামালুদ্দীনের বৃদ্ধ পিতার দু' চোখে ছানি, সামনাসামনি খোলা চোখে চেয়ে থাকে কিন্তু হাত নাড়ে অন্ধের মতন। সে বললো, মুই তোমার গোলাম হইত গো রাজাবাবু, তুমি মোর ছাওয়ালডারে ছামিল কইরা দিতা না?

গঙ্গানারায়ণ বললে, তোমরা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে খবর দাওনি? এর বিহিত তো তিনিই করতে পারেন। তোমরা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে দরবার করো গে যাও!

এর উত্তরে সবাই সমস্বরে গোলমাল করে যা বললো, তার মর্মার্থ এই যে, তারা 'ম্যাজিস্টর' সাহেবের ওপর কোনোই ভরসা রাখে না। তাকে তারা জুজুর মতন ভয় পায়। তিনি এই নীলকুঠির 'ম্যাক গরগর' সাহেবের কুটুম্ব, 'ম্যাজিস্টর' যখন এ তল্লাটে আসেন, তখন তিনি আস্তানা নেন ঐ নীলকুঠিতেই এবং কুঠিয়ালদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে হাত ঝাঁকাঝাঁকি করেন। ম্যাক গরগর সাহেবের হাতি আছে, বাঘের মতন বড় বড় পোষা কুকুর আছে, সেই হাতির পিঠে চড়ে কুকুরগুলো সঙ্গে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট বাঘ শিকারে গিয়েছিলেন এই তো কয়েক মাস আগে। সুতরাং সেই ম্যাজিস্ট্রেট কি এই ম্যাকগ্রেগর সাহেবের বিরুদ্ধে কোনো নালিশ শুনবেন?

গঙ্গানারায়ণ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলো, আমি যাচ্ছি।

গঙ্গানারায়ণ তখুনি পিনিস থেকে নামতে উদ্যত হতেই তার স্থানীয় সরকার বললো, সেকি, আপনি কোথায় চললেন, হুজুর? ম্যাকগ্রেগর একেবারে কাঁচাখেগো দেবতা, ও বর্বর মানীর মান রাখতে জানে না। আপনি জানেন না।

গঙ্গানারায়ণ কোনো উত্তর না দিয়ে নেমে যাচ্ছিল, তখন তার নিজস্ব খাজাঞ্চি বৃদ্ধ অক্ষয় সেন বললেন, বাবু, যাবার আগে আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে, এক দণ্ড অপিক্ষে করে যান।

দিবাকরকে পছন্দ করে না গঙ্গানারায়ণ, তাকে সে কর্মচ্যুত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বিধুশেখরের জন্য পারেনি। তবে দিবাকরকে সে আর মফস্বলে আসবার সময় সঙ্গে নেয় না, তার বদলে এই অক্ষয় সেন মানুষটি অনেক ধীর স্থির, এঁর পরামর্শের মূল্য আছে।

ভিতরের একটি কক্ষে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাজাঞ্চি নিভৃতে বললেন, হুজুর, আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা কত্তে যেতে চান তো যাবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি জমিদার, আর সাহেবরা হাজার হোক আপনার ইজারাদার, দেখা কত্তে হলে সাহেবেরই আপনার নিকটে আসা উচিত। আপনি সাহেবের কাছে এত্তেলা পাঠান।

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমি এত্তেলা পাঠালে সে আসবে? যদি না আসে? যতদূর মনে হলো, সে আমার এত্তেলার পরোয়া করবে না!

খাজাঞ্চি বললেন, তা হলে আপনি তার সঙ্গে দেখা করবেন না। আপনি জমিদার হয়ে তো বেচালে চলতে পারেন না? প্রজারা নেচে উঠলেই কি আপনার কেতা নষ্ট করা উচিত হয়? আপনার বংশের

একটা মান মর্যাদা আছে না !

গঙ্গানারায়ণ বললো, সেন মশাই, যদি এক্ষুনি এই কামরার মধ্যে একটা বিষাক্ত সাপ দেখি, তা হলে অমনি তিড়িং করে লাফিয়ে উঠবো। এমনভাবে লাফিয়ে ওঠা জমিদারের পক্ষে বড়ই অনুচিত কাজ, কিন্তু কখনো কদাচিৎ তাও করতে হয়। আমি চললাম !

তখন খাজাঞ্চি বললেন, তবে অন্তত এক কাজ করুন। আগে থেকে একটা খবর অন্তত পাঠানো হোক। আপনি যাবেন, আপনার আপ্যায়নের জন্য তাদের তৈরি হবার একটু সময় তো দিতে হবে অন্তত। আপনি উট্‌কো হঠাৎ যাবেন। গিয়ে দেখলেন হয়তো সাহেব কুঠিতে নেই। তাছাড়া আপনার এখনো স্নানাহারও হয়নি।

এতে গঙ্গানারায়ণকে রাজি হতেই হলো। নীলকুঠিতে তার দূত গিয়ে খবর দিয়ে এলো যে অপরাহ্নে সে যাবে দেখা করতে, সাহেব যেন অনুগ্রহ করে তখন উপস্থিত থাকেন।

এই খবর পাঠানোই হলো একটা বড় ভুল। তার অভ্যর্থনার ব্যবস্থাটি বেশ ভালোই হলো। নীলকুঠির বিশাল চত্বরে একটি ক্যাম্প চেয়ারে পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে ম্যাকগ্রেগর, রোদ আড়াল করার জন্য মুখের ওপর টুপি চাপা দেওয়া। মাটিতে গড়াচ্ছে কয়েকটা সুরার বোতল, সেখানে ভন ভন করছে এক ঝাঁক মাছি। সাহেবের জামায় ঝোলের দাগ, বোঝা যায়, দুপুর থেকে খানাপিনা বেশ জবর হয়েছে।

কয়েকজন কর্মচারী সন্ত্রস্ত মুখে একটু দূরে সারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, দুজন সঙ্গীকে নিয়ে গঙ্গানারায়ণকে প্রবেশ করতে দেখে তারা সসম্ভ্রমে তাকে ভেতরে নিয়ে এলো এবং একজন সাহেবের কানে কানে কিছু বললো।

সাহেব টুপিটা সরিয়ে রক্তাক্ত চক্ষে গঙ্গানারায়ণের দিকে তাকিয়ে জড়িত স্বরে বললো, হ্যালো, জমিণ্ডার ! নাইস সিয়িং ইউ ! কাম অন, সীট ডাউন !

একজন দৌড়ে একটি কেদারা এনে দিল গঙ্গানারায়ণের জন্য। গঙ্গানারায়ণ সেটিতে বসে সাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখলো, সে ততক্ষণে আবার মাথা হেলিয়ে দিয়ে মুখের ওপর টুপি চাপা দিয়েছে।

গঙ্গানারায়ণ গলা খাঁকারি দিয়ে বললো, মিস্টার ম্যাকগ্রেগর, শুভ অপরাহ্ন, আশা করি আপনার শরীর স্বাস্থ্য মঙ্গল। আশা করি এতদঞ্চলের জলবায়ু আপনার সহ্য ও পছন্দ হইয়াছে। আমি আপনার সহিত কয়েকটি বিষয় লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে আসিয়াছি।

ম্যাকগ্রেগর এর উত্তরে নাক ডাকাতে শুরু করলো।

বিস্মিত হয়ে গেল গঙ্গানারায়ণ। অনেক ইংরাজের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, এ রকম বর্বর তো সে কখনো দেখেনি।

একজন খর্বকায় গোলাকৃতি বাঙালী হাত জোর করে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে আছে কাছে। তার দিকে ফিরে গঙ্গানারায়ণ বললো, সোনামুড়া পর্যন্ত পত্তনী ইজারা দেওয়া হয়েছিল, তার বাইরে আমার খাস তালুক, সেখানেও নীলকুঠির লোকেরা প্রবেশ করে জোর করে আমার প্রজাদের ধরে আনে। আমার প্রজারা নীলকুঠির রায়ত নয়।

সেই লোকটি বললো, হুজুর, আপনার প্রজাগো হয়রানি করার কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবি না। আপনারা হইলেন এ দিগের তিন পুরুষের জমিদার। তবে কি না আমাগো রায়তরা আপনের তালুকে গিয়া লুকাইয়া ঘাপটি মাইরা থাকে, তাগো ধইরা আনতে হয়। এলাকা-চাষীরা বে-এলাকায় যাবে ক্যান, হেডা আগে ক'ন ? ব্যাটারা দুই আনা পয়সা মজুরি আর পাঁচ পো চাউল খুরাকি পায়, আমাগো সাহেব পয়সা খরচ করতে কক্ষনো নারাজ নন, তবু ব্যাটারা—

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমার এলাকায় কয়েকটি পাকা আখের ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েচে, হুমকি দিয়ে চিনি কল বন্ধ করা হয়েচে।

সেই লোকটি বললো, হুজুর, কার ক্ষেতে কে আগুন দেয়, তার কি ঠিক আছে ? এ ব্যাটারা কথায় কথায় নিজেগো মইধ্যে কাজিয়া করে, পিতিবেশীর ঘরে আগুন লাগায়, অ্যাগো কথা মোটেই বিশ্বাস লবেন না হুজুর।

গঙ্গানারায়ণ কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। সাধারণ একজন কর্মচারীর সঙ্গে এসব আলোচনা করতে তার ঘৃণা বোধ হচ্ছে। লোকটির মুখ দেখলেই বোঝা যায়, লোকটি অতি খল। কে জানে, এই

সেই গোলক দাস কিনা।

গঙ্গানারায়ণ জিজ্ঞেস করলো, কুঠিতে আর কোনো সাহেব নেই ? আমার ক'টা জরুরি কতা বলবার ছেল।

লোকটি বললো, আইজ্ঞা না হুজুর, সাহেবরা সবাই চরমহালে শূয়র মারতে গেছেন গিয়া। বেলাবেলিই রওয়ানা হইছেন, আপনে আসবেন কইয়া গ্রেগর সাহেব শুধু রইছেন।

গঙ্গানারায়ণ সেই লোকটিকে বললো, জামালুদ্দীন বলে একজন চাষী এই কুঠিতে এসেছেল, আর ফিরে যায়নি।

লোকটি বললো, কোন্ জামালুদ্দীন হুজুর ? কত মানুষই তো এখেনে আসে যায়।

এবার ম্যাকগ্রেগর জড়িত গলায় বললো, দোজ বেগারস্ ! দে অল লুক অ্যালাইক…

অপমানে কর্ণমূল ও নাসিকাগ্র রক্তিমবর্ণ হয়ে গেল গঙ্গানারায়ণের। সাহেবটি জেগেই আছে, সব শুনছে, শুধু ইচ্ছে করে ঘুমের ভান করে রয়েছেন। এই কথাটি বলেই সে নাক ডাকতে শুরু করেছে আবার।

কর্মচারীটি বললেন, সাহেব কইলেন যে ঐ চাষাভূষা সকলডিরই চ্যাহারা একই লাহান। শুধু নাম শুইন্যা চেনা যায় না।

—তোমার সাহেবকে ডাকো। আমি ওর সঙ্গে কথা বলবো।

লোকটি জিভ কেটে বললো, সে সাইধ্য আমার নাই। এহানে কারুরই নাই, হুজুর ! কাচা ঘুম ভাঙাইলে গ্রেগর সাহেব চইট্যা আগুনের মতন লকলক করেন, তহন হাতের সামনে যারে পান…

গঙ্গানারায়ণ উঠে দাঁড়ালো। অভদ্র ব্যবহারের উত্তর কী হতে পারে, শারীরিক শক্তির প্রয়োগ কিংবা পাল্টা অভদ্র ব্যবহার, এর কোনোটিতেই গঙ্গানারায়ণ অভ্যস্ত নয়। সাহেবটি তাকে ইচ্ছে করে অপমান করছে ! এটা যেন তার অবিশ্বাস্য মনে হলো। একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষ এমন ব্যবহারও করতে পারে ? এই ব্রিটিশ জাতিরই কবি শেকস্পীয়র, মিল্টন ?

হঠাৎ যেন গঙ্গানারায়ণের মস্তিষ্কটা শূন্য হয়ে গেল। সে দাঁড়িয়ে রইলো স্থির হয়ে, কিন্তু সে ভুলে গেল যে কোথায় আছে। সে চোখে কিছু দেখতে পেল না, সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেল তার কানে, সে যেন একটি পাথরের মূর্তি। অপমান ও অত্যন্ত ক্রোধের পর সে যেন অপমান ক্রোধ ছাড়িয়ে চলে গেল অন্য কোনো স্তরে।

কর্মচারীটি বললো, ঐ যে দূরে কদম গাছটা দ্যাখতে আছেন হুজুর, প্রজারা কেউ অর বেশী দূর আসে না। ঐ হানে খাড়াইয়া কথা কয়। কোন্ প্রজার ঘাড়ে কয়টা মাথা যে সাহেবগো কাছারির মইধ্যে পা দিবে ! আপনে আইছেন, আপনে মাইন্য লোক, আপনার কথা হইল গিয়া ভেন্ন। কিন্তু সুজাউদ্দীন না গজাউদ্দীন কার কথা কইলেন, সে এ হানে আসফে ক্যান ?

গঙ্গানারায়ণ কিছুই শুনতে পেল না এসব। তার চোখের সামনে যে সমস্ত জগৎ চলমান। তার মাথা টলছে একটু একটু।

লোকটি বললো, হুজুর কি সাহেববাড়িতে জল খান ? তাইলে একটু মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা করি ?

একথাও শুনতে পেল না গঙ্গানারায়ণ। সে যেন অচেতন অথচ দণ্ডায়মান। তার সমস্ত মুখে বিষাদের কালিমা মাখা।

তাকে সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সকলেই বিস্মিত। তার সঙ্গীদের মধ্যে একজন ডাকলো, হুজুর !

গঙ্গানারায়ণ এক পা বাড়াতে গিয়ে টলে পড়ে যাচ্ছিল, তার সঙ্গীরা ধরে ফেললো তাকে। তখন যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সে আচ্ছন্ন গলায় বললো, কী হয়েচে ? তোরা আমায় ধরে রইচিস কেন ?

—হুজুরের কি শরীর খারাপ হলো ?

গঙ্গানারায়ণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, না, চল !

ধীর পায়ে সে বেরিয়ে এলো নীলকুঠি থেকে।
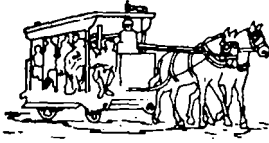
সাহেবের কুঠি থেকে বেরিয়ে পালকি পর্যন্ত সঠিকভাবে হেঁটে এলো গঙ্গানারায়ণ। তারপরই সে সংজ্ঞা হারালো. পালকির মধ্যে এক পা বাড়িয়েই পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। তার সঙ্গীরা উৎকণ্ঠিত হয়ে ডাকাডাকি করতে লাগলো তাকে. কিন্তু কোনো উত্তর পেল না। তখন বেহারারা পালকি তুলে নিয়ে ছুটলো জোর কদমে।

এ স্থল থেকে নদীর ঘাট প্রায় অর্ধ ক্রোশ দূর, এই পথটুকু অচৈতন্য হয়েই রইলো গঙ্গানারায়ণ। বজরার সন্নিকটে নদীতীরে বহু প্রজা তখনো বসেছিল জামালুদ্দিন শেখের সংবাদ জানার প্রত্যাশায়, গঙ্গানারায়ণকে পালকি থেকে ধরাধরি করে নামাতে দেখে সকলে উঠে দাঁড়িয়ে হৈহৈ রৈরৈ শুরু করলো। তাদের সকলেরই ধারণা হলো যে সাহেব কুঠিতে গিয়ে গঙ্গানারায়ণ প্রহৃত হয়েছে। দুশমন সাহেবরা কারুকেই রেয়াৎ করে না। বহুকালাবধি সংস্কারের জন্য সাধারণ প্রজারা জমিদারকে পিতৃতুল্য মনে করে, কিংবা তার চেয়েও অনেকখানি বেশী, সেই জমিদারের সম্মানহানি তাদের কাছে অকল্পনীয়। তাদের রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠলো, চিৎকার উঠতে লাগলো উচ্চগ্রামে, কয়েকজন মাটিতে লাঠি ঠুকতে লাগলো সক্রোধে।

গঙ্গানারায়ণকে এনে শোওয়ানো হলো বজরার মধ্যে তার খাস কামরায়। অতি ব্যস্ত হয়ে তার সঙ্গী কর্মচারীরা তাৎক্ষণিক কর্তব্য বিষয়ে শুরু করে দিল বিতণ্ডা। কেউ বললো, গঙ্গানারায়ণকে এখনই বজরা থেকে সরিয়ে ওপরের জমিদারি কুঠিতে নিয়ে যাওয়া হোক। সেখানে একজন কবিরাজ থাকেন, যিনি এক সময় গঙ্গানারায়ণের পিতার চিকিৎসা করেছেন। কেউ বললো, গঙ্গানারায়ণকে সরাবার দরকার নেই, কুঠিতে যেতে অনেক সময় লেগে যাবে। সেই কবিরাজকেই আনানো হোক। আবার কেউ বললো, এই বিদেশ বিভুঁয়ে উত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্ভব হবে না। সুতরাং কালবিলম্ব না করে এখনই বজরার মুখ ঘুরিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেওয়া উচিত।

খাজাঞ্চি অক্ষয় সেন বৈদ্যবংশ সম্ভূত বলে কিছু কিছু চিকিৎসা বিদ্যা জানেন, তিনি গঙ্গানারায়ণের নাড়ি ধরে বসে রইলেন। তাঁরও মত, এখানে অপেক্ষা না করে বরং কলকাতার উদ্দেশেই যাত্রা করা ভালো, অন্তত কৃষ্ণনগর পর্যন্ত পৌঁছালেও সেখানে অ্যালোপাথিক ডাক্তার পাওয়া যাবে।

একটু পরেই গঙ্গানারায়ণ চোখ মেললো এবং উঠে বসলো। তাকে ঘিরে রয়েছে কর্মচারীদের ভীত চকিত মুখ, আর বাইরে প্রজাদের তুমুল কলরব। সে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো, কী ব্যাপার, আমি কী করে এখানে এলুম ? অত চ্যাঁচামেচি কিসের ?

বৃদ্ধ খাজাঞ্চি বললেন, হুজুর, আপনি কতা বলবেন না। বিশ্রাম নিন।

গঙ্গানারায়ণ পালঙ্ক থেকে নেমে শরীরের আড়মোড়া ভেঙে বললো, কই, আমি তো অসুস্থ বোধ কচ্চি নাকো ? আমি নীলকুঠিতে গেসলুম, তারপর কী হলো ?

একজন কর্মচারী বললো, হুজুর, আপনি সাহেবের সঙ্গে কতা কইতে গেসলেন।

গঙ্গানারায়ণ বললো, হ্যাঁ। কিন্তু সে সাহেব আমার সঙ্গে কতা কইলে না, একেবারে বর্বর, নেশাখোর···কিন্তু তারপর···তারপর তো আর কিচু মনে পড়ে না।

—আপনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন···এখুন শুয়ে থাকুন বরং···একটু পরে জোয়ার এলেই আমরা নৌকো ছেড়ে দোবো।

—জ্ঞান হারিয়ে ফেলিচিলুম ? কেন ! আমার তো কখনো এমন হয় না।

—হুজুর, সাহেব আপনার মান রাখেননি।

—হ্যাঁ, সে কতা মনে আচে, আমার খুব রাগ হয়েছেল, তা বলে জ্ঞান হারাবো ? এ যে বড় আশ্চর্যের কতা!

দুদ্দাড় করে কয়েকজন লাঠিয়াল প্রজা বজরার ওপর উঠে এসে কামরার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে বলে উঠলো, হুজুরের জইন্যে আমরা জান দিমু। পাঁচখানা গাঁয়ে লাইঠ্যালরা হুজুরের থনে

আইস্যা খাড়াবে···হুজুর, একবার ক'ন, আমরা সাহেবগুলার ঘেটি ভাইঙ্গা দিমু।

খাজাঞ্চিবাবু ওদের দেখে খিচিয়ে উঠে বললেন, আ মোলো, এই হারামজাদাগুলো একেবারে ওপরে উঠে এয়েচে ! যা, যা, নীচে যা। আস্পর্ধা দেকো, ছোটলোকগুলো আজকাল যেন একেবারে মাতায় উঠতে চায়।

সে তিরস্কার অগ্রাহ্য করেও প্রজারা বলতে লাগলো, আমাগো হুজুরের শরীলে হাত দিছে, হ্যার বদলা আমরা নিমু। হুজুরের লাইগ্যা আমরা হকলডি এককাট্টা হইয়া নীলকুঠি লাল কইরা দিতাম পারি।

গঙ্গানারায়ণ হাত তুলে বললো, তোমরা শান্ত হও। আমায় মেরেচে ? কে বললে আমায় মেরেচে ? আমার মনে নেই তো ? হ্যাঁরে ভুজঙ্গ, তুই তো গেসলি আমার সঙ্গে। আমায় সত্যিই কেউ মেরেচে ?

ভুজঙ্গ বললো, আজ্ঞে না হুজুর, আমি সব সময় আপনার পাশে দাঁড়িয়ে চিলুম।

খাজাঞ্চি বললেন, হুজুরের গায়ে হাত দেবে, এমন সাধ্য কার আচে ! এই ছোটলোকগুলোর ঘটে এক রত্তি বুদ্ধি নেই—

গঙ্গানারায়ণ বললো, তবে, জামালুদ্দীন শেখের কোনো খবর আমি পাইনি···ওরা স্বীকার পেলে না···বললে জামালুদ্দীন শেখকে ওরা চেনে না।

প্রজারা আবার বললো যে, জামালুদ্দীন শেখ নিজে তার বিবি হানিফার খোঁজ নেবার জন্য নীলকুঠিতে গিয়েছিল, সেখান থেকে সে ফেরেনি ! হানিফা বিবিকে রাতের বেলা জোর করে ধরে নিয়ে গেছে গোলক দাস—এদের দুজনকেই ওরা কেউ বেরুতে দেখেনি কুঠি থেকে। নদীর পানিতে ওদের লাশও ভেসে ওঠেনি। সুতরাং কুঠির মধ্যেই মাটির নীচের গারদে নিশ্চয়ই আটক করে রাখা হয়েছে ওদের। জামালুদ্দীন আর হানিফা বিবিকে ওরা জোর করে ছাড়িয়ে আনবেই এবং সেই সঙ্গে হুজুরের প্রতি অপমানের প্রতিশোধ নেবে। তাদের কথা শুনে দয়া হয়েছিল বলেই তো হুজুর ঐ বাঘের গুহায় গিয়ে পা দিয়েছিলেন।

প্রজারা সমস্বরে আরও সব উত্তেজক কথা বলতে যাচ্ছিল, খাজাঞ্চি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে তাদের থামিয়ে দিলেন। মুখ্যু আর গোঁয়ার লোকগুলো কোমল, উদারহৃদয় জমিদার গঙ্গানারায়ণকে বিপদে ফেলতে চায়। সাহেবদের সঙ্গে লড়বে ! হুঃ ! পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরণের তরে। কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি মফস্বলে একটি ইংরেজের গায়ে হাত দিলে অমনি কলকেতা থেকে কামান বন্দুক নিয়ে রাশি রাশি ইংরেজ সৈন্য ছুটে আসবে, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে। জমিদারের বজরায় বসে সাহেবদের বিরুদ্ধে কোনো কথা উচ্চারণ করাও অতি গর্হিত। হুজুর, কানে আঙুল দিন, এসব কিছু শুনবেন না।

খাজাঞ্চি সেই প্রজার দলকে কুকুর-ছাগলের মতন তাড়াবার ভঙ্গি করে বললো, দূর হ ! বেরো ! আভি নিকাল ! হুজুর অসুস্থ, তেনার সামনে এসে হল্লা করিস, তোদের এত সাহস ! নাম আগে, নাম বজরা থেকে, তারপর তোরা যা খুশী করগে যা। হুজুর তোদের হয়ে কতা কইতে গেসলেন, এই তোদের সাত পুরুষের ভাগ্যি ! আজ রাতেই বজরা ঘোরাবো।

গঙ্গানারায়ণ এবার খাজাঞ্চিকে বাধা দিয়ে বললো, সেনমশাই, ওরা আমার প্রজা, বিপদে পড়ে আমার কাচে এয়েচে, এখন ওদের তাড়িয়ে দেওয়া কি উচিত কর্ম হয় ? আশ্রিতকে রক্ষণ করাই তো আমাদের ধর্ম !

খাজাঞ্চি বললেন, হুজুর, ওরা আপনার প্রজার যোগ্য কী ব্যবহার করেচে ? জমিদারের কাচে এয়েচে, কোনো এক ব্যাটাও কি নজরানা এনেচে ? জমিদারের সামনে নজরানা না রেখে মুখ খোলার সাহস দেখায় ! ছোটলোকগুলোর আজকাল বড় বেশী বাড় বেড়েচে।

তখন প্রজারা লজ্জিতভাবে বলে উঠলো যে, এখন তাদের পেটে অন্ন নেই, অনেকের বাড়ি ঘর পুড়ে গেছে, তাই কোনো নজরানা আনতে পারেনি। আবার, সুদিন যদি আসে, তখন তারা নিশ্চয়ই জমিদারকে নজরানা দিয়ে সম্মান দেখাবে।

একজন একটু বেশী ভাব দিয়ে বললো যে, হুজুর, এ বছর আমাদের চোখের পানিই আপনার নজরানা। আমাদের ফেলে যাবেন না।

খাজাঞ্চি বললেন, হুজুর, এখেনে বসে থেকেই বা আপনার লাভ কী ? আপনি তো একবার চেষ্টা করে দেকলেন। নীলকুঠির সাহেব যদি আপনার কতায় কান না দেয়, তাহলেও সে সাহেবকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। নীলচাষের আইন তো আপনাকে বুঝিয়ে বলিচি : নীলকররা পত্তনী জমি নিয়ে যে চাষ করে, তার নাম 'এলাকা চাষ', সেখানে জমিদারের কোনোরকম কতা কওয়ার এক্তিয়ার নেই। এখেনকের প্রজারা এখন নীলকরদের ভূমিদাস, নীলকরদের ইচ্ছে অনুযায়ী ওদের মরণ বাঁচন ! আপনি এর মধ্যে থেকে কী করবেন ?

গঙ্গানারায়ণ উষ্ণ হয়ে বললো, সেনমশাই, আপনি বলতে চান যে এর কোনোরকম প্রতিকার নেই ? এই নিরীহ মানুষগুলান শুধু শুধু মরবে ?

খাজাঞ্চি এতক্ষণে একটু হাসলেন। এই বৃদ্ধ তাঁর জীবনে দেখেছেন অনেক উত্থান পতন। জমিদারের ছেলে প্রজার দুঃখ দেখে বিচলিত হয়, এটা তাঁর কাছেও একটা নতুন অভিজ্ঞতা। গঙ্গানারায়ণের রক্ত এখনো চঞ্চল, তাই নিজের ভালোমন্দ বোঝার সময় এখনো আসেনি।

খাজাঞ্চি বললেন, হুজুর, যুদ্ধে যে জেতে সে কি অমনি অমনি কিছু ছাড়ে ? আমরা পরাধীন জাতি, আমরা কি আর বড়মুখ করে অন্যায়ের প্রতিকার চাইতে পারি ? সাহেবদের দয়ার ছিটে ফোঁটা পেয়েই আমাদের বাঁচতে হবে। আপনি শুনেচেন নিশ্চয় যে বাংলার জন্য একজন ছোটলাট নিযুক্ত হয়েচেন এ বচর। বড়লাট তো সিমলেতেই বসে থাকেন, রাজধানী কলকাতায় ক'দিনই বা আর আসেন। এখন ছোটলাট হলদি সাহেব যদি দয়া করেন।

গঙ্গানারায়ণ বললো, লেফটেনান্ট গভর্নর হ্যালিডে। তিনি কী করবেন ?

খাজাঞ্চি বললেন, শুনিচি ছোটলাট দেশের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্য সফরে বেরিয়েচেন। একদিন না একদিন এদিকপানেও আসবেন। প্রজারা তখন দল বেঁধে গিয়ে তেনার পায়ে গিয়ে আছড়ে পড়ুক। তিনি যদি কিছু সুরাহা করেন তবেই এদের বাঁচোয়া। আপনি কী করবেন ? দেশের দণ্ডমুণ্ডের মালিক তো জমিদাররা নয় এখন, সাহেবরা হলো গে মালিক। আমার পরামর্শ যদি শোনেন হুজুর, ইদিকে আপনার যে বাকি জমি এখুনো পত্তনি দেওয়া হয়নি, তাও নীলকরদের হাতে তুলে দিন। তাহলে শান্তিতে থাকবেন। আখের চাষ এখুন মাতায় থাকুক।

গঙ্গানারায়ণ বললো, হ্যালিডে সাহেব ইদিকে কখন আসবেন, তার ঠিক কী ! জামালুদ্দীন শেখ আর হানিফা বিবিকে যে গুম করে রেকেচে, তার একটা ব্যবস্থা কত্তে হবে না ? তাদের যদি এর মধ্যে মেরে ফেলে ?

—মেরে ফেললে আর আপনি কী উপায়ে আটকাবেন ? কতায় বলে, মুখ্যুর মরণ গাছের আগায়। ঐ জামালুদ্দীন শেখটাকে আমি চিনি তো, ব্যাটা কাঠগোঁয়ার, ওর মরণ তো এমন আঘাটাতেই বাঁধা ছেল ! বিবিকে ধরে নিয়ে গ্যাচে, সেজন্য ওর এত টনক নড়াবার কী দরকার ছেলে ? সাধ করে কেউ বাঘের গুহায় পা দেয় ? জোয়ান মদ্দ, বেঁচে থাকলে একটার বদলে ও অমন আরও দশটা বিবি শাদী কত্তে পাত্তো না ? বলুন ?

—আপনি বলেন কী, সেনমশাই ? ওর বউকে ধরে নিয়ে গেলে ও তার সন্ধান করতে যাবে না ? চুপ করে ঘরে বসে থাকবে জোয়ান মদ্দ হয়ে ?

—তাই যদি কত্তো তো ও হতভাগা বেঁচে যেতে পাত্তো। বরং উচিত ছেল আর একটা খাপসুরৎ মেয়েকে শাদী করে কিছুদিন পর তাকেও নীলকুঠিতে পাটিয়ে দেওয়া।

—ঘরের বউকে জোর করে টেনে নিয়ে যায়—এত বড় অন্যায় নিয়ে আপনার মস্করা আমার ভালো লাগচে না, সেনমশাই !

—যদি আমার কতাকে মস্করা বলে মনে হয়, তবে ক্ষমা করবেন হুজুর। কিন্তু এর মধ্যে অন্যায়টা আপনি দেকলেন কোতায় ? আমাদের এই এতবড় দেশটাকে পছন্দ হয়েচে বলেই তো সাহেবরা কেড়ে নিয়েচে। আর একটা সুন্দরী মাগীকে পছন্দ হলে তাকে ওরা কেড়ে নিতে পারবে না ? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা আর স্ত্রীলোকরা হলোগে বীর্যশুল্কা। আমাদের শাস্ত্রকাররা এই কতা বলে গ্যাচেন। খুঁজে দেখুন, ওদের মুসলমানী শাস্ত্রেও নিশ্চয় এমন কতা আচে, খৃষ্টানী শাস্ত্রেও আচে।

—শাস্ত্র আলোচনা এখন থাক। প্রজাদের বলুন, কালই আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে ওদের বিষয় নিয়ে দরবার কত্তে যাবো।

প্রজারা জয়ধ্বনি করে উঠলো।

খাজাঞ্চি বিরস মুখে বললেন, আপনি আজ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এরপর যদি আপনাকে কঠিন ব্যামোয় ধরে তবে কলকাতায় গিয়ে কত্তামা'র কাচে আমরা কী করে মুখ দ্যাকাবো ? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাচে গিয়ে আপনি কী করবেন ? প্রজাদের মুখেই তো শুনেচেন যে এই নীলকুঠির কুঠিয়াল সাহেব আর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একেবারে প্রাণের দোসর। সেই সাহেব এ সাহেবের কুঠিতে এসে নিত্য খানা খান। তিনি কি এনার নামে কোনো নালিশ শুনবেন ? শুধু শুধু আপনার মুখ নষ্ট হবে।

গঙ্গানারায়ণ গম্ভীরভাবে বললো, নীলকররা রায়তদের দিয়ে জোর করে নীলচাষে বাধ্য করাতে পারে বটে, আইনের সে রকম ফাঁক রয়ে গ্যাচে, কিন্তু প্রজাদের ঘর থেকে বউ কেড়ে নিয়ে যাওয়া কিংবা গুম খুন করার কোনো অধিকার তাদের নেই। ইংরেজ সরকারের যত দোষই থাকুক, তারা যেসব আইন করে, তার সুযোগ নিতে পারে সকলেই। গরীব নিরীহ লোকগুলো সেইসব আইনের খবর রাকে না বলে কি যে যা খুশী পার পেয়ে যাবে ? এই ম্যাকগ্রেগরকে আমি শাস্তি দেওয়াবোই।

—আইনের কতাই যখন তুললেন, হুজুর, তখুন আমি বলি যে আপনি সব দিক ভেবে দ্যাকেননি। আপনি ভালোমতনই জানেন যে, গুম, আটক, খুন বা ঘর বাড়ি পোড়ানো—এসব হোলো গে ফৌজদারি মামলা—মফস্বলে কোনো সাদা চামড়ার মানুষের নামেই ফৌজদারি মামলা আনা যায় না। কোনো আদালতে সে মামলা নেয় না। ম্যাজিস্ট্রেটও আপনার কতা শুনে হাঁকিয়ে দেবে। এর সুরাহা কত্তে হলে আপনাকে মামলা দায়ের কত্তে হবে কলকেতার সুপ্রিম কোর্টে। ঐ জামালুদ্দীনের বুড়ো বাপকে আপনি সঙ্গে নিয়ে চলুন, তারপর কলকেতায় ওকে দিয়ে মামলা ঠোকাবেন। আপনার যদি ইচ্ছে হয়, খরচ পত্তর আপনি দেবেন।

—আর ততদিনে যদি জামালুদ্দীন শেখ আর হানিফা বিবি বেঁচে না থাকে ? প্রমাণ লোপ করার জন্য যদি ওরা ওদের দুজনকে খুন করে জলে ভাসিয়ে দ্যায় ?

—তা হলে আর কী হবে ? এমন হাজার হাজার মচ্চে, তার সঙ্গে আরও দুটি প্রাণী যোগ হবে।

একটু থেমে, একটু কেশে এবার বৃদ্ধ সেনমশাই কুণ্ঠিতভাবে বললেন, আমার কতা আপনার কাছে তিক্ত বোধ হতে পারে হুজুর, কিন্তু আমি বলচি আপনাকে যুক্তির কতা। মিচিমিচি দুটো ভাবের কতা আপনাকে শুনিয়ে তো কোনো লাভ নেই। ঐ হানিফা বিবিকে সাহেব ছুঁয়েচে, এরপর তাকে ঐ মোছলমানরা কেউ কি আর ঘরে ঠাঁই দেবে ? ওদের জিজ্ঞেস করে দেকুন না ? এমন কি ঐ জামালুদ্দীন শেখও দিত না। হানিফা বিবিকে ছাড়িয়ে আনা হলো গে ভাবের কতা। ঐ একটি মেয়েমানুষের জন্য হাজার হাজার মানুষের ওপর আবার অত্যাচার হবে।

গঙ্গানারায়ণ বললো, আপনার যুক্তি এখন আপনার কাচেই থাক। কাল সকালে ম্যাজিস্ট্রেটের কাচে আমায় যেতেই হবে। এটা আমার দায়।

—আপনার কিসের দায় ?

—কিসের তা জানি না। তবু আমার বুকে একটা ভার চেপে আচে।

—আপনার শরীর···

—শরীর এখন ভালো আচে আমার। কেন তখন অমন মাতা ঘুরে গেল বুঝচি না।

—হুজুর, আপনি শুনেচেন বোধহয়, নদীয়ার কমিশনার সাহেব সুখচরের জমিদার নীলকণ্ঠ রায়কে আটক করে রেখেছেল এই চোতমাসে। লোকে বলে, নীলকণ্ঠ রায়কে জোর করে ঘোড়ার দানা খাওয়ানো হয়েছেল সাহেবের হুকুমে !

—ও সব কথা আর থাক। আপনাকে বললাম যে, এটা আমার দায়।

প্রজাদের উদ্দেশ্য করে গঙ্গানারায়ণ বললো, তোমরা সব এখন যাও। রাত হয়েচে। এইসব কথা আর এখুন পাঁচ কান করো না। এইসব কতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঘোঁট পাকিয়েও এখুন কোনো সুফল হবে না। কাল সকালে আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাচে যাবো, যদি আমার সঙ্গে তোমার কেউ কেউ যেতে চাও, তা হলে যাবে।

প্রজারা আবার আনন্দে সরব হয়ে উঠলো। এত দুঃখের মধ্যেও তাদের এইটুকুই সান্ত্বনা যে তাদের জমিদার তাদের সমব্যথী হয়েছেন। নায়েব-গোমস্তা-খাজাঞ্চীর কথায় কান না দিয়ে তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্রজারা তখনও যেতে চায় না, গঙ্গানারায়ণ বারবার বুঝিয়ে বললো তাদের। তারপর এক সময় সে খাবার ঘরে চলে এলো।

মেঝেতে মখমলের আসন পাতা, সামনে রূপোর থালায় যুঁই ফুল রঙের আতপ চালের ভাত ও দশ

বারো রকমের ব্যঞ্জন সাজানো। জননী বিম্ববতীর নির্দেশে সফরে বেরুবার সময় পাচক ভৃত্যের একটি ছোটখাটো দল গঙ্গানারায়ণকে সঙ্গে আনতে হয়। গঙ্গানারায়ণ স্বল্পাহারী, তবু প্রধান রসুইকর দুর্যোধন প্রতিদিন দু'বেলা নানা প্রকারের ব্যঞ্জন পাক করবেই। হস্ত মুখ প্রক্ষালনের সময় গঙ্গানারায়ণ তার ডান হাতের তিনটি অঙ্গুরীয় খুলে বাম হাতের আঙুলে পরলো। ডান হাতে অঙ্গুরীয় পরে থাকা অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ করা গঙ্গানারায়ণদের পরিবারে নিষিদ্ধ। কয়েক পুরুষ আগে এই পরিবারের একজন কর্তা নাকি অন্ন গ্রহণের সময় হঠাৎ একটি আলগা অঙ্গুরীও উদরসাৎ করে ফেলেছিলেন এবং আসনে বসে থাকা অবস্থাতেই তিনি মারা যান।

প্রথম গ্রাস অন্ন মুখে তুলেই গঙ্গানারায়ণ বুঝতে পারলো যে আজ তার আহারে একেবারেই রুচি নেই। অথচ একটু আগেই প্রজাদের সঙ্গে কথা বলবার সময় সে বেশ ক্ষুধা বোধ করছিল। এখনো তার ক্ষুধা আছে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই এ সময়ে তার ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া উচিত, তবু কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না কেন? বিভিন্ন ব্যঞ্জন সে চেখে দেখলো, সবগুলিই যেন বিস্বাদ। নদী থেকে ধরা টাটকা কাল্‌বোস মাছের সূপ, বৃহদাকার গলদা চিংড়ি ভাজা, এঁচোড়ের তরকারি যা দুর্যোধনের রন্ধনগুণে পাঁঠার মাংসের মতন মনে হয়, এর কিছুই একটুকরোর বেশী মুখে দিতে পারলো না গঙ্গানারায়ণ। এমনকি এক পাথরবাটি ভরা উষ্ণ দুধ, যা প্রতিদিন খাদ্যের শেষে পান করে সে, তাতেও ওষ্ঠ ছোঁয়ানো মাত্র সে যেন পুরোনো ঘৃতের গন্ধ পেল, তার প্রায় বমি এসে গেল। গঙ্গানারায়ণ বুঝলো, রন্ধনের কোনো দোষ নয়, তার জিহ্বাই কোনো খাদ্য গ্রহণ করতে চাইছে না, এরকম ব্যাপার গঙ্গানারায়ণের অভিজ্ঞতায় আগে কখনো হয়নি। সে বিমূঢ় বোধ করলো।

গঙ্গানারায়ণকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে দেখে খাজাঞ্চিমশাই বললেন, কিচুই খেলেন না তো হুজুর। আমি তখুনি দেকেই বুঝিচি, আপনার শরীর গতিক ভালো নয়। আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। আজই কলকাতার দিকে রওনা দিলে ভালো হয়।

গঙ্গানারায়ণ মুখ তুলে বললো, আমার শরীরে আর কোনো রকম অসুবিধা বোধ কচ্চি না খাজাঞ্চিমশাই, শুধু খেতেই যেন ইচ্ছে কচ্চে না।

খাজাঞ্চি বললেন, পিত্ত, কফ, বায়ু কুপিত হলে অনেক সময় বুজতে পারা যায় না। আমার কাচে মকরধ্বজ রয়েচে, একটু তুলসীপাতার রস আর মধুর সহিত মেড়ে যদি খেয়ে নেন—

পাত্র ত্যাগ করে উঠে পড়লো গঙ্গানারায়ণ। খাজাঞ্চির দেওয়া ওষুধ খেয়ে নিল বিনা আপত্তিতে। তারপর নিজের কক্ষে গিয়ে গবাক্ষের পাশে বসে চেয়ে রইলো নদীর দিকে। আজ কোন্ তিথি কে জানে, সন্ধ্যার দিকে আকাশ অন্ধকার ছিল, এখন বেশ জ্যোৎস্না ফুটেছে। নদীর তরঙ্গে লুটোপুটি খেয়ে খেলা করছে শিশু চাঁদ। গঙ্গানারায়ণ অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো সেদিকে, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শয্যায় আশ্রয় নিল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার নিদ্রা এলো না। অপরাহ্নে ম্যাকগ্রেগরের রূঢ় ব্যবহার আর অসহায় প্রজাদের দুঃখের কথা অনবরত ঘুরতে লাগলো তার মাথায়। সকলের কথা শুনে যা বোধ হচ্ছে, এ জেলার ম্যাজিস্ট্রেটও এক অমার্জিত ইংরেজ। সে কী রকম ব্যবহার করবে তার ঠিক নেই, তবু প্রজাদের কাছে কথা দিয়েছে, গঙ্গানারায়ণকে একবার যেতেই হবে তার কাছে। ইরেজের হাত থেকে জামালুদ্দীন শেখ আর হানিফা বিবিকে ছাড়িয়ে আনার সাধ্য তার নেই, কিন্তু সর্বপ্রকার চেষ্টা তাকে করতেই হবে। চেষ্টার নামই পুরুষকার।

একসময় গঙ্গানারায়ণ টের পেল যে তার সর্বশরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, মস্তিষ্কের মধ্যে যেন বয়ে যাচ্ছে একটা প্রবল ঝঞ্ঝা। অথচ এ ঠিক জ্বর আসার অনুভূতি নয়, শরীরে কোনো অবশ ভাব নেই, শরীর যেন আর শয্যায় থাকতে চাইছে না।

এ অবস্থায় নিদ্রা আসা অসম্ভব, গঙ্গানারায়ণ উঠে বসলো। এ কী হলো তার? নীলকুঠিতেও কিছুক্ষণের জন্য তার বোধশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল, সে দাঁড়িয়েই ছিল, অথচ সেই সময়টুকুর কথা তার কিছুই মনে নেই। তারপর পালকিতে ওঠার সময় সে সম্পূর্ণই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লো, এ রকম তো তার কখনো হয়নি আগে!

ঘাড়ে মাথায় জল ছেটালে উপকার হতে পারে ভেবে সে তাই করলো, তারপর মুক্ত বায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে সে উঠে এলো বজরার ছাদে।

রাত্রি কত প্রহর এখন কে জানে। বজরার সকলেই এখন ঘুমন্ত। বজরার সঙ্গে বাঁধা ছোট পিনিসটির ছাদে জ্বলছে একটা মশাল, তার কাছেই দুজন লোক পরস্পরের কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে বসে আছে। পাশে রাখা দুটি ধারালো বর্শা। কোনো সন্দেহ নেই যে প্রহরী দুজনও নিদ্রাপ্লুত।

নরম, শীতল বাতাসে বেশ খানিকটা আরাম পেয়ে ছাদের ওপর পায়চারি করতে লাগলো গঙ্গানারায়ণ। একটু পরেই সে স্থান কাল সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলো।

যেন এখানে কোনো নদী নেই, বজরা নেই, কোনো মানুষ নেই। গঙ্গানারায়ণ সম্পূর্ণ একা, সে কোনো সীমাহীন স্থলে ঘুরছে। হঠাৎ হঠাৎ তার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎচমকের মতো এসে যাচ্ছে এক একটি স্মৃতির টুকরো, সেগুলিও তার অচেনা। সে যেন শিশু হয়ে শুয়ে আছে কোনো জননীর কোলে, কিন্তু সেই জননীকে সে চেনে না···সে ফুলের মালা টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলছে···তার অঙ্গে রাজবেশ···সে ডুবে যাচ্ছে কোন কাল সমুদ্রে, শুধু হাত দুটি উচ্চে তোলা···পরমুহূর্তেই যেন সে আবার শুয়ে আছে নগ্নগাত্রে কোনো মন্দিরের চাতালে।

সে মুখ তুলে তাকালো আকাশের দিকে। লঘু মেঘ ও কিছুটা নীল রং মেশা জ্যোৎস্নাভরা অনন্ত গগনের দিকে চেয়ে সে যেন সত্যিই সন্ধান পেয়ে গেল অসীমের, তার নিশ্বাস পড়তে লাগলো ঘন ঘন, তার মুখের চেহারা এখন অন্যরকম।

একটা শব্দ পেয়ে গঙ্গানারায়ণ তাকালো নদীর ঘাটের দিকে। সেখানে কয়েকটি মানুষ জলে নেমে মুখ প্রক্ষালন করছে আর নিজেদের মধ্যে কথা বলছে গুন গুন করে। গঙ্গানারায়ণ ওদের দিকে তাকালো বটে কিন্তু কিছু যেন দেখলো না, কিছু গ্রাহ্য করলো না, সে আবার মুখ ফেরালো আকাশের দিকে তৃষ্ণার্তের মতন।

একটু পরেই আবার ঠিক স্বপ্নচালিতের মতন গঙ্গানারায়ণ নেমে এলো ছাদ থেকে, কিন্তু নিজের কক্ষের দিকে গেল না। বজরার সিঁড়ি তুলে রাখা হয়েছে, তীরের বেশ সন্নিকটেই নোঙর করা বজরা, গঙ্গানারায়ণ গলুইয়ের কাছে এসে এক লম্ফে চলে এলো তীরে। নদীর ঘাটের কাছে যেখানে লোকগুলি ছিল, সে সেদিকে এগিয়ে গেল দ্রুত পদে।

লোকগুলি তখন গোল হয়ে বসেছে। একজন বয়স্ক ব্যক্তি একটা বড় পাত্র ভর্তি ভেজানো চিঁড়ে ও আখের গুড় মাখছে, তার থেকে এক একটা মণ্ড তুলে তুলে দিচ্ছে অন্যদের হাতে। গঙ্গানারায়ণ সেখানে বসে পড়ে হাত বাড়ালো। বয়স্ক লোকটি কোনো প্রশ্ন না করে গঙ্গানারায়ণের হাতেও তুলে দিল একটা মণ্ড। গঙ্গানারায়ণ সাগ্রহে সেটা সবখানি এক সঙ্গে ভরে দিল মুখের মধ্যে। ঠিক যেন অমৃতের স্বাদ পেল। লোভীর মতন সে হাত বাড়িয়ে দিল আবার।

বয়স্ক লোকটি এবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে বাপু?

গঙ্গানারায়ণ কোনো উত্তর দিল না, সে হাত বাড়িয়েই রইলো। সেই লোকটি বললো, অতিথি নারায়ণ, তুমি যদি তৃপ্ত হও তো যত খুশী লও। আমরা অতি দরিদ্র, আমাদের কাছে লুণ্ঠনযোগ্য ধনসম্পদ কিছুই নেই।

দলটিতে বয়স্ক নারী পুরুষই বেশী, তিনজন যুবক ও একটি শিশুও রয়েছে, এরা তীর্থযাত্রী। আহার শেষ করার পর ওরা যখন আবার যাত্রা শুরু করলো, তখন গঙ্গানারায়ণ নিঃশব্দে অনুসরণ করতে লাগলো ওদের। সাধারণত রাত্রে পথ চলার রীতি নেই। কিন্তু বিদেশী তীর্থযাত্রীরা এ অঞ্চলে এসে শুনেছে যে নীলকরদের অত্যাচারে এখানে ত্রাসের রাজত্ব চলছে। অধিকাংশ প্রজাই গৃহছাড়া। সেইজন্য তীর্থযাত্রীরাও যত দ্রুত সম্ভব এ এলাকা পার হয়ে যেতে চায়।

গঙ্গানারায়ণ মিশে গেল ওদের দলে। ক্রমশ সে চলে যেতে লাগলো তার বজরা থেকে অনেক দূরে। তীর্থযাত্রীরা প্রথমে তাকে কোনো দস্যুদলের প্রতিনিধি মনে করেছিল, তার সঙ্গে কোনো অস্ত্র না থাকলেও তাকে ওরা ঘাঁটাতে সাহস করেনি। ভোরের আলোয় গঙ্গানারায়ণকে দেখে ওরা আরও অবাক হলো। গঙ্গানারায়ণের সর্বাঙ্গে তার পারিবারিক আভিজাত্যের ছাপ পরিস্ফুট। তার পরিধানে চিক্কন সিল্কের ঢিলে কুর্তা ও শেরওয়ানি, কণ্ঠে স্বর্ণের মফচেন, বাঁ হাতের আঙুলে পাঁচটি বিভিন্ন মূল্যবান রত্ন সমন্বিত অঙ্গুরীয়। তার মুখে অদ্ভুত বিষাদ ও ঔদাসীন্য মাখানো। তীর্থযাত্রীদের নেতা সকালবেলা তাকে জিজ্ঞেস করলো, মহাশয় আপনি কোথায় চলেছেন? কোথায় আপনার নিবাস? আমরা অতি সাধারণ মানুষ, আপনি আমাদের সঙ্গী হলেন কেন?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমাকে আপনাদের দলে স্থান দিন। আমি পথ চিনি না।

গঙ্গানারায়ণ কি কাপুরুষ? সে কি পলাতক হতে চাইছে? প্রজাদের মুখপাত্র হয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের

কাছে যাবার কথা ছিল তার, সে কি ভীরুর মতন রাত্রির অন্ধকারে দেশান্তরে চলে যাচ্ছে ? এসব কিছুই মনে নেই গঙ্গানারায়ণের। তার সমস্ত বন্ধন টুটে গেছে, কোনো কিছু সম্বন্ধেই সে আর কোনো দায় বোধ করে না।

একটানা বহুদিন বহু রাত ঐ তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে কাটিয়ে বহু পথ পরিক্রমা করে সে এসে পৌঁছোলো প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে। যাত্রীদলের গন্তব্য এই প্রয়াগই, এখানে তারা পুণ্য স্নান করতে এসেছে। অতি প্রত্যূষে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী এই তিন নদীর পবিত্র সঙ্গমে অনেকবার ডুব দেবার পর গঙ্গানারায়ণ যেন পুনর্জীবন প্রাপ্ত হলো। তার মস্তিষ্কের শূন্যতাবোধ কেটে গেছে। তার সারা শরীর কাঁপছে, এ কম্পন শীত বোধের জন্য নয়, অন্য এক উপলব্ধির উত্তেজনায়। সিক্ত বসনে পাড়ে উঠে এসে ভোরের আকাশের দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়লো, প্রয়াগের থেকে কাশী খুব বেশী দূর নয়, এবার তাকে যেতে হবে সেখানে। তার নিয়তিই তাকে এখানে টেনে এনেছে।

তীর্থযাত্রী দলের সংশ্রব ত্যাগ করে সে একাই রওনা দিল বারানসীর দিকে।

বৈশাখ মাস, সংস্কৃত কলেজে এখন গ্রীষ্মের ছুটি। কিন্তু এই কলেজের অধ্যক্ষের ছুটি নেই, খর্বকায় ব্রাহ্মণ ঠেঙো ধুতি ও উড়ানি গায়ে দিয়ে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পায়ে হেঁটে চরকির মতন ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ভারতে সে অকালমৃত বেথুন সাহেব স্বল্প সময়ের মধ্যেই অনেক উদ্দীপনার সঞ্চার করে গেছেন। যে স্ত্রীশিক্ষার জন্য তিনি প্রাণপাত করলেন, অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তার প্রসার হতে লাগলো ক্রমে ক্রমে। তাছাড়া, বেথুন সাহেব বার বার আর একটি বিষয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা না দিলে সে শিক্ষায় প্রকৃত মানুষ গড়া যায় না। যতই ইংরেজি বা সংস্কৃত শেখাবার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হোক না কেন, বাংলাদেশে বাংলা পড়াবার সুবন্দোবস্ত না হলে শিক্ষা বিস্তার প্রকৃত পক্ষে অসম্ভব। এবং শুধু শহরে নয়, শিক্ষা ব্যবস্থা ছড়িয়ে দিতে হবে গ্রামে গ্রামে। বেথুন সাহেব আরও বলে গেছেন যে, তিনি এ দেশের ছাত্রদের পরীক্ষা করে দেখেছেন, তাদের মেধায় কোনো ঘাটতি নেই, উপযুক্ত শিক্ষা পেলে তারা জগতের যে-কোনো জাতির সমকক্ষ হতে পারে।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও এ ব্যাপারে বেথুনের জীবদ্দশায় তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়েছিলেন। যারা পণ্ডিত হতে চায়, তারা সংস্কৃত শিখতে চায় শিখুক, কিন্তু দেশের আপামর জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হবে মাতৃভাষায়। এজন্য হাজার হাজার বিদ্যালয় খোলা দরকার। এবং সরকারের সাহায্য না পেলে এতবড় একটা ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া সম্ভব নয়। কোম্পানির গভর্নমেণ্ট এ দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা মুনাফা নিয়ে যাচ্ছে, তার থেকে ছিটেফোঁটা পেলেও এ দেশের বালক বালিকাদের জন্য অনেক কিছু করা যাবে।

বিদ্যাসাগর গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশদ পরিকল্পনা পেশ করলেন সরকারের কাছে। তা নিয়ে টালবাহানা চললো অনেকদিন, প্রচুর চিঠিপত্র ও মেমোরেণ্ডাম চালাচালি হলো। এর মধ্যে কাউন্সিল অব এডুকেশানের একজন সদস্য ফ্রেডারিক হ্যালিডে নিযুক্ত হলেন বাংলার ছোট লাট। হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত পরিকল্পনার কথা জানতেন। ছোটলাট তখন সেইসব পরিকল্পনা পেশ করলেন বড়লাটের কাছে, বড়লাট নীতিগতভাবে তা মঞ্জুর করে দিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন উঠলো, এইসব স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য স্থান নির্বাচন, স্কুল স্থাপন এবং পরে সেগুলির পরিচালনার ব্যাপার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তি দরকার। কে করবেন সে কাজ ? বিদ্যাসাগর নিজেই সে দায়িত্ব নিতে চান। বিদ্যাসাগরের যোগ্যতা বিষয়ে সরকারের কোনো সন্দেহ নেই ; কিন্তু সংস্কৃত কলেজের মতন এত বড় একটি প্রতিষ্ঠানের গুরুপূর্ণ দায়িত্ব যাঁর স্কন্ধে, তিনি কি

আবার গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় খোলার জন্য এত পরিশ্রম করতে পারবেন ? বিদ্যাসাগর এক বাক্যে রাজি, শুধু তাই নয়, এ কাজের জন্য তিনি আলাদা কোনো পারিশ্রমিকও চান না।

পায়ে হেঁটে ঘোরায় কোনো ক্লান্তি নেই বিদ্যাসাগরের। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হবার পরও কতবার নিজের মোট নিজেই মাথায় বহন করে নিয়ে দেশের বাড়িতে যাতায়াত করেছেন পদব্রজে। একটিই শুধু অসুবিধে, নতুন কোনো গ্রামে গিয়ে সেখানকার মুরুব্বিদের বিশ্বাস করাতেই অনেক সময় লেগে যায় যে পাল্কি বেহারাদের মতন চেহারার এই কদাকার পুরুষটিই বিদ্যাসাগর।

শিয়াখোলা, রাধানগর, কৃষ্ণনগর পর পর গ্রামগুলিতে ঘুরে বেশ ভালো সাড়া পাওয়া গেল। এক একটি গ্রামে উপস্থিত হয়ে তিনি সেখানকার চণ্ডীমণ্ডপে কিংবা বটতলায় গ্রামের গণ্যমান্যদের নিয়ে একটা বৈঠকে বসেন। লোক পাঠাবার বদলে তিনি নিজে তাঁদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ডেকে আনেন। তারপর তাঁদের কাছে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলেন, তাঁর উদ্দেশ্যের কথা। গ্রামের মানুষ যদি এক খণ্ড জমি দেয় এবং নিজেরাই চাঁদা তুলে একটি বাড়ি তুলে দেয়, তা হলে সে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হবে আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়। শিক্ষকদের বেতন দেবেন সরকার।

সব জায়গাতেই তিনি সার্থক হতে লাগলেন। পরপর চললেন ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোনা, শ্রীপুর, কামারপুকুর, রামজীবনপুর, মায়াপুর, মলয়পুর, কেশবপুর, পাতিহাল। তাঁর খাওয়া-দাওয়ার কোনো ঝামেলা নেই, তিনি অতিশয় স্বল্পাহারী, গ্রামের যে-কোনো বাড়িতে দুটি চাল-ডাল ফুটিয়ে নিলেই চলে, নইলে শুধু ফলাহারেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়ে যায়। রাত্রিবাসের জন্যও চিন্তা করতে হয় না। যেকোনো গৃহস্থের বাড়িতেই মাথা গোঁজার ব্যবস্থা হতে পারে, কিংবা গাছতলায় শয়ন করলেও চলে। প্রখর রৌদ্র কিংবা প্রবল বৃষ্টিতেও এ ব্রাহ্মণ নিরস্ত হয় না।

রামজীবনপুরে একদিন বিশ্রাম নিচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র। এখানকার বিদ্যালয়টি চালু হয়ে গেছে। বৃক্ষতলে ছায়ায় উপবেশন করে তিনি শুনছেন উচ্চকণ্ঠে ছাত্রদের পাঠাভ্যাস। পণ্ডিতমশাই নামতা ঘোষাচ্ছেন, আর ছাত্ররা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে গলা ফাটাচ্ছে একেবারে। ঈশ্বরচন্দ্রের ইচ্ছে হলো ছাত্রদের বিদ্যার উন্নতি পরীক্ষা করা।

তিনি চলে এলেন ক্লাস ঘরে। মেঝেতে পাটি বিছিয়ে বসে আছে ছেলের দল, অনেকেরই ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনো বস্ত্র নেই, কেউ কেউ পরে আছে শুধু একটি গামছা। পণ্ডিতমশাইয়ের ধুতিখানি শতচ্ছিন্ন, সম্ভবত সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করার বিষয়ে তাঁর সংস্কার আছে বলে তিনি ছেঁড়া ধুতিখানিও সেলাই না করে জায়গায় জায়গায় গিঁট বেঁধে রেখেছেন। তবে তাঁর লোমশ বুকে ধপধপে সাদা পৈতাখানিই শুধু অটুট। পণ্ডিতমশাই তাঁর বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে আসবার সময় প্রতিদিন একটি বালিশ ও একটি হাতপাখা নিয়ে আসেন। বালিশে মাথা রেখে তিনি লম্বা হয়ে শুয়ে থাকেন দ্বারের কাছে, যাতে কোনো দুষ্ট ছাত্র হঠাৎ পলায়ন করতে না পারে। ছাত্ররা পালা করে করে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করে তাঁকে। যে ছাত্র একবারও তাঁর মাথায় পাখা না ঠুকে বাতাস করতে পারে, তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাকে একটু আগে ছুটি দেন।

বিদ্যাসাগরকে দেখে পণ্ডিতমশাই ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে বসলেন। ইতিমধ্যেই এসব অঞ্চলে রটে গেছে যে, যে-ব্যক্তিকে দেখলে একেবারেই বিদ্যাসাগর বলে মনে হয় না, অথচ মুখচোখে একটা তেজী ভাব, সেই ব্যক্তিই বিদ্যাসাগর।

ঈশ্বরচন্দ্র পণ্ডিতমশায়ের পাশে বসে পড়ে বললেন, আপনার ছাত্রদের একটু দেখতে এলাম। কেমন চলছে, এদের পড়াশুনোর আগ্রহ আছে তো ?

পণ্ডিত বললেন, বিলক্ষণ ! এগুলানের পড়াশুনো না হলে আমার চাকরিটি যে যায়। তাই তেড়েফুঁড়ে পড়াই। এদের শুধিয়ে দেখুন না।

ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রদের কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। খুব নৈরাশ্যব্যঞ্জক কিছু না। ছাত্ররা বাংলা ও সরল গণিত কিছু কিছু শিখেছে। কিন্তু এটুকুই তো যথেষ্ট নয়। তিনি একটি ছেলেকে প্রশ্ন করলেন, ওরে, দিন আর রাত কেমন করে হয়, তা বলতে পারিস ?

এমন অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে ছেলেটি অবাক। এর উত্তর তো তাদের মা-ঠাকুমারাও জানে, এজন্য কি আর বিদ্যালয়ে আসতে হয় ? সূর্য উঠলে দিন আর সূর্য অস্ত গিয়ে চাঁদ উঠলে রাত।

ঈশ্বরচন্দ্র আবার প্রশ্ন করলেন, সূর্য কী করে ওঠে আর কী করেই বা অস্ত যায় ?

এর উত্তর পাছে ছাত্ররা না দিতে পারে, তাই পণ্ডিতমশাই নিজেই আগ বাড়িয়ে বললেন, কেন, সাত ঘোড়ার রথে চেপে সূর্যদেব পুবের আকাশে উঠলে দিন হয় আর সারাদিন পর সূর্যদেব পশ্চিম দিগন্তের

পরপারে চলে যান।

ঈশ্বরচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন, সে তো পুরাণের কথা। আপনি আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতির কথা কিছু শোনেননি ?

পণ্ডিত ঘাড় নাড়লেন দু-দিকে।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, সূর্য ঘোরে না। পৃথিবী ঘোরে। সূর্য আকাশে স্থির। পৃথিবী চব্বিশ ঘন্টায় একবার ঘোরে।

পণ্ডিতমশাই বললেন, পৃথিবী ঘোরে ? আপনি বলেন কি মশাই ? মস্করা করছেন, না সত্যি কথা বলছেন ?

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, মস্করা নয়, সত্যি। ছাত্রদের ভুল শেখাবেন না। পৃথিবী দু'রকমভাবে ঘোরে।

পণ্ডিত বললেন, সে মশাই আপনি বলছেন যখন, তখন ঘোরে। তবে সে বোধহয় আপনাদের শহরের দিকের পৃথিবী ঘোরে। আমাদের এই পাড়াগাঁ দেশে পৃথিবী ঘোরে টোরে না। একেবারে স্থির হয়ে থাকে সব সময়। দেকছি তো !

অট্টহাস করে উঠলেন বিদ্যাসাগর। পণ্ডিত বলেছে ভালো !

তারপর তিনি ছাত্রদের সবিস্তারে আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, ঋতুবদল ও দিন রাত্রি ছোট বড় হওয়ার কারণ বোঝাতে লাগলেন। অপ্রসন্ন মুখে শুনতে লাগলেন পণ্ডিত। বিদ্যাসাগরের কথা শেষ হবার পর পণ্ডিত বিড় বিড় করে বলে উঠলেন, আপনি বলছেন যখন, ঘুরুক তাহলে পৃথিবী। চিরকাল ঘুরুক। পৃথিবীর ঘোরাঘুরি নিয়ে কে মাথা ঘামায় ?

সেদিন ঈশ্বরচন্দ্র উপলব্ধি করলেন, শুধু পরপর বিদ্যালয় স্থাপিত করে গেলেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না, উপযুক্ত শিক্ষকও দরকার। অশিক্ষার চেয়ে কুশিক্ষা আরও ভয়াবহ। ছাত্রদের মতন শিক্ষকদেরও আগে গড়ে পিটে নেওয়া দরকার, শিক্ষক তৈরির জন্যও একটা নর্মাল স্কুল খুলতে হবে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে এ সম্পর্কে তাঁর আগে কিছু আলোচনা হয়েছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত যেমন একজন কড়া ধাতের মানুষ, তেমনি সর্বপ্রকার সংস্কারমুক্ত, ওঁর ওপর নর্মাল স্কুলের ভার দেওয়া যায়, যদি উনি রাজি হন।

ছুটি ফুরিয়ে এসেছে, আবার কলকাতায় ফিরতে হবে, তার আগে পিতামাতাকে একবার দেখে যাবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র এলেন স্বগ্রামে।

বীরসিংহ গ্রামে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির রূপ এখন ফিরে গেছে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র সরকারের কাছ থেকে দেড় শত টাকা বেতন পায়। দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে অঙ্গুলিগণ্য কয়েকজনই মাত্র এত অধিক বেতনের চাকরি করে ; তা ছাড়াও গ্রন্থ রচনা করে ঈশ্বরচন্দ্রের এখন যথেষ্ট ধনোপার্জন হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের পরের ভাইও চাকুরিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। ঠাকুরদাস-ভগবতী এক সময় কত কষ্টে দিনাতিপাত করেছেন, আজ তাঁদের সুখের দিন এসেছে। গৃহের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চণ্ডীমণ্ডপ, নতুন চালাঘর উঠেছে কয়েকখানা। এখন গোয়ালে বাঁধা গরু, মড়াইয়ে ভরা ধান, পুকুরে দাপায় বড় মাছ। শুধু নিজেদের সাচ্ছল্য নয়, এ গ্রামের প্রত্যেকেই সাহায্য পায় ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামাতার কাছ থেকে।

ঈশ্বরচন্দ্রের পাড়া বেড়ানো অভ্যেস, গ্রামে এলেই তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ান, কোথাও কেউ অভুক্ত আছে কি না সে সন্ধান তিনি ঠিক সংগ্রহ করেন। যে-বাড়িতে গিয়ে দেখেন যে উনুনে হাঁড়ি চড়েনি, সে বাড়ির সকলকে জোর করে টেনে আনেন নিজের বাড়িতে। খুব গোপনে তিনি কয়েকটি পরিবারকে মাসোহারা দিতেও শুরু করেছেন।

তবু কয়েকজন অভুক্ত থেকেই যায়। ঈশ্বরচন্দ্রের সাধ্য নেই তাদের মুখে অন্ন তুলে দেবার। তিনি সাধারণত নক্ষত্রের হিসেব রাখেন না, কিন্তু প্রতিবার গ্রামে এসেই তিনি মনঃস্থির করেন, এর পরের বার তিথি গণনা না করে তিনি আর গ্রামের মাটিতে পা দেবেন না।

এবারও ঈশ্বরচন্দ্র যে সায়াহ্নে পৌঁছোলেন, তার পরদিনই একাদশী। এদিন সমস্ত বিধবাদের নির্জলা উপবাস। সেই ছাত্র বয়েসেই ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামে এসে এরকম এক একাদশীর দিনে কেঁদে ভাসিয়েছিলেন : ক্ষেত্রমণি নামে একটি বালিকা ছিল তার বাল্যের ক্রীড়া সঙ্গিনী। তখন তাঁর তের চোদ্দ বছর বয়েস, বাড়িতে পা দিয়েই শুনলেন মাত্র তিন মাস আগে ক্ষেত্রমণির বিবাহ হয়েছিল আবার ইতিমধ্যে সে

বিধবাও হয়ে গেছে। নিজের ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র, ক্ষেত্রমণি সারাদিন এক ফোঁটা জলও পান করবে না, আর তিনি পেট ভরে আহার করবেন ? কেন, ক্ষেত্রমণি কী দোষ করেছে ?

সেই ক্ষেত্রমণি অবশ্য মরে গিয়ে বেঁচেছে, তবু প্রতি বৎসরই একজন দুজন বিধবা হয়। এবারেও কুক্ষণে এসে পৌঁছোলেন বিদ্যাসাগর। পরপর দুটি হৃদয়বিদারক ঘটনা শুনতে হলো। যে-গুরুর কাছে তিনি প্রথম বর্ণমালা শিক্ষা করেছিলেন, সেই কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি সর্বাগ্রেই দেখা করতে যেতেন। ইদানীং অভিমানবশতঃ আর যেতেন না। এবার শুনলেন, কালীকান্ত মারা গেছেন এবং বিধবা করে দিয়ে গিয়েছেন ছ'টি রমণীকে, তার মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠাটির বয়েস নয়। তাছাড়া তাঁদের এক প্রতিবেশিনীর কন্যা, এগারো বৎসর বয়স্কা বালিকা সত্যভামাও মাত্র দেড় মাস আগে বিধবা হয়েছে।

সংবাদ দুটি শুনে ঈশ্বরচন্দ্রের মন বিষিয়ে গেল। এই সব কথা শুনলে তাঁর দুঃখ যতখানি হয়, রাগও ততটাই হয়। চোখে জল আসে, বুকটা জ্বলে। বিচারবুদ্ধিহীন অন্ধ সংস্কারে দুধের বাচ্চাদের বিবাহ দেওয়া হয় বৃদ্ধদের সঙ্গে, বিবাহ জিনিসটা কি তা বুঝবার আগেই তাদের কপাল পুড়ে যায়।

অপরাহ্নে চণ্ডীমণ্ডপে বসে পিতার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন ঈশ্বরচন্দ্র, এমন সময় ভগবতী দেবী এলেন সেখানে। আঁচলে চক্ষু চাপা দিয়ে বললেন, ওরে, মেয়েটার দিকে যে আর চোখ ফেলা যায় না। ওকে জন্মাতে দেখিছি, কোলে পিঠে নিয়েছি কতবার, সেই মেয়ে রাঁঢ়ী হলো ! মেয়েটা ভুঁয়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে গড়াচ্ছে।

ঈশ্বরচন্দ্র ক্রোধে নির্বাক হয়ে ঘাড় হেঁট করে রইলেন।

ঠাকুরদাস জিজ্ঞেস করলেন, কার কথা বলতেছ ? সত্যভামা ? আহা, বেটী আমারও বড় আদরের...আমিও ওর দিকে আর চাইতে পারি না।

ভগবতী বললেন, আগেই আমি বলিছিলুম, ঐ তেজবরের সঙ্গে বিয়ে দিয়োনি—

ঠাকুরদাস পুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে ঈশ্বর, তুই তো অনেক শাস্ত্র পড়িছিস, তা সব শাস্ত্রে কি বিধবাদের এমন যাতনা দেবারই নির্দেশ রয়েছে ? ওদের আর কোনো গত্যন্তর নাই ?

ঈশ্বরচন্দ্র মুখ তুলে রাগত স্বরে বললেন, কেন থাকবে না ? বিধবাদের পুনর্বিবাহ দেবারও ব্যবস্থা রয়েছে।

—পুনর্বিবাহ ? তুই বলিস কি ?

—বাবা, আমি নানা শাস্ত্র ঘেঁটে দেখেচি, মোট তিন প্রকার নির্দেশ আছে বিধবাদের জন্য। ব্রহ্মচর্য অভাবে সহমরণ বা বিবাহ।

—রাজ আজ্ঞায় সহমরণ প্রথা নিবারিত। কলিযুগে ব্রহ্মচর্যই বা কতখানি সম্ভব ? সুতরাং বিবাহই একমাত্র উপায়। তুই শাস্ত্রবচন উদ্ধার করে বিধবার পুনর্বিবাহ যে সিদ্ধ, তা প্রমাণ কত্তে পারবি ?

ঈশ্বরচন্দ্রের চোখ জ্বলে উঠলো। তিনি পিতাকে বললেন, আপনি জানেন, কোনো কিছু যদি আমি একবার ধরি, তা হলে আর কিছুতে ছাড়ি না। প্রয়োজন হলে আমি সর্বশাস্ত্র মন্থন করে এর স্বপক্ষে যত নির্দেশ আছে সব তুলে আনবো। কিছুদিন ধরেই আমি একথা ভাবছি। যদি আপনি অনুমতি দেন এবং আশীর্বাদ করেন—

ঠাকুরদাস গাঢ় স্বরে বললেন, তুই যদি এ কাজ ভালো বুঝিস তা হলে আমরা নিষেধ কর্বো কেন ? এমনকি আমরা নিবারণ করলেও তোর ক্ষান্ত হওয়া কর্তব্য হয় না। লোকের নিন্দাবাদে বা অপর কোনো কারণেও পশ্চাৎপদ হবি না তুই।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, আচ্ছা বেশ, আমি আগামী কল্য থেকেই এ কর্মে সর্বশক্তি নিয়োগ করবো।

সেদিন রাত্রে ঈশ্বরচন্দ্র জননীকে নিভৃতে আবার জিজ্ঞেস করলেন, মা, তখন পিতাঠাকুরের সঙ্গে আমার যেসব কথাবার্তা হলো, তুই তো সব শুনিছিলি, কিন্তু কোনো কথা বললি না কেন ? তোর কি এ বিষয়ে মত নেই, মা ?

ভগবতী বললেন, আমি ভেবিছিলুম উনি এসব কথা শুনে রাগ করবেন। উনি যখন মত দিলেন, তা হলে আর চিন্তা কি ?

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, মা, তবু তোর মতটাও আমি শুনতে চাই।

ভগবতী বললেন, তুই ঠিক বুঝিছিস যে বেধবাদের বিয়ে দেওয়ায় শাস্তরে কোনো বাধা নেই ?

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, হ্যাঁ মা, আমি ঠিক বুঝেছি। এ নিয়ে আমি বই রচনা করবো, আমি চেষ্টা করবো সরকারকে দিয়ে আইন পাশ করাবার। অনেক লোক বাধা দেবে আমি জানি, সে সব আমি গ্রাহ্য করি না, কিন্তু আমি তোর মতটা নিতে ইচ্ছা করি।

ভগবতী বললেন, তোকে আমি বারণ করি না, তুই এ কাজ করগে যা—যে যা বলে বলুক। যদি শেষ পর্যন্ত পারিস, আমি তোকে আশীর্বাদ কর্বো, লাখো লাখো দুখিনী মেয়ে তোকে দু-হাত তুলে আশীর্বাদ কর্বে।

কলকাতায় ফিরেই ঈশ্বরচন্দ্র এবার নিমগ্ন হলেন শাস্ত্র সমুদ্রে। তিনি জানেন, নৈতিকভাবে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে কোনো যুক্তিই থাকতে পারে না। যারা বালিকা নয়, না-বালিকা, যারা বিবাহের মর্মই কিচ্ছু বোঝেনি, তাদের সারা জীবন বঞ্চিত রাখার বিধান যদি শাস্ত্র দিয়েও থাকে, তবে সে শাস্ত্রই ভ্রান্ত। সে শাস্ত্র পরিত্যাজ্য, সেই লোকাচার, দেশাচারও পরিবর্তনীয়। কিন্তু এই সব কথা এ দেশের সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের বোঝানো মুশকিল। শাস্ত্র উদ্ধার করেই তাদের মুখ বন্ধ করতে হবে। ইংরেজ সরকারও এ দেশের ধর্মবিশ্বাসে সহজে হাত দিতে চায় না। এবং সরকার আইন প্রণয়ন না করলে কেউই এ মীমাংসা মানবে না। সুতরাং শাস্ত্র বচন তুলে প্রমাণাদি দেখিয়ে সরকারের সম্মতি আদায় করতে হবে।

আহার নিদ্রা এক রকম পরিত্যাগ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। সারাদিন সংস্কৃত কলেজের কাজের পর আর বাড়ি ফেরেন না, সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারেই সারারাত কাটিয়ে দেন। সারা রাত্রিই সেখানে বাতি জ্বলে। তিনি স্তূপাকার পুঁথিপত্রের মধ্যে ঠায় জেগে বসে থাকেন।

এক একদিন তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় জোর করে তাঁকে টেনে নিয়ে যান নিজের গৃহে। সস্নেহ তিরস্কারে বলেন, তুমি এ কি করছো, ঈশ্বর ? এমন ভাবে চললে যে অচিরেই ব্যারামে পড়বে !

ঈশ্বরচন্দ্র হেসে বলেন, আমার কিছু হবে না। তুমি তো জানো, যখন জেদ ধরেছি, তখন এর শেষ না দেখতে পেলেই আমার ব্যারাম হবে। দেও বাপু, কী খাবার দেবে, দেও !

রাজকৃষ্ণ বললেন, সে তুমি যাই বলো, দু' বেলা এখানে রোজ দুটি খেয়ে যেতেই হবে। সে কথা দেও ! আর দিনের পর দিন না ঘুমালে কি মানুষ বাঁচে !

ঈশ্বরচন্দ্রের এসব কথার উত্তর দেবার সময় নেই। কোনো রকমে নাকে মুখে কিছু খাদ্য গুঁজেই তিনি আবার দৌড়োন সংস্কৃত কলেজের দিকে।

একদিন রাজকৃষ্ণ বললেন, তুমি এ পরিশ্রম যে কচ্চো, কিন্তু এতে লাভ হবে কি ? বিধবার বিয়ে দেবার উদ্যোগ তো আগেও কেউ কেউ করেছিলেন। তেনারাও নানান শাস্ত্র বচন ঘেঁটেছিলেন শুনতে পাই। কিন্তু তাতে তো কোনো সুরাহা হয়নি !

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, জানি, আমি খুব ভালো রকমই জানি। ঢাকার রাজা রাজবল্লভ সেন থেকে আরম্ভ করে ডিরোজিও সাহেবের শিষ্যরা পর্যন্ত অনেকেই বিধবার বিয়ে দেবার স্বপক্ষে মত প্রচার করেছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কেউই তা কার্যে পরিণত করতে এগিয়ে আসেননি। কিন্তু আমাকে তো তুমি চেনো, আমি এক গোঁয়ার গোবিন্দ, আমার শুধু মুখের কথা নয় কিংবা নিউজ পেপারে প্রবন্ধ ফাঁদাই নয়, ধরেছি যখন তখন একে কার্যে পরিণত আমি করবোই। তার আগে আমার শান্তি নেই।

সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে সারা রাত পড়াশুনো করতে করতে এক এক সময় মাথা গরম হয়ে যায়। মস্তিষ্কের শুশ্রূষার জন্য এক সময় তিনি ভোরের দিকে পথে বেরিয়ে পড়েন। ভোরের শীতল বাতাস যেন স্নিগ্ধ প্রলেপের মতন কাজ করে।

একদিন তিনি সেইরকম অতি প্রত্যূষে পথে ভ্রমণ করতে করতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর আপন মনে বললেন, পেয়েছি !

শূন্য রাজপথে তিনি বিড়বিড় করে আবৃত্তি করে চললেন, কয়েকটি শ্লোকের পর শ্লোক। তারপর, সামনেই যেন তার প্রতিপক্ষরা সব সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের উদ্দেশ্য করে আঙুল উঁচিয়ে বললেন, এইগুলি দিয়েই আমি শুরু করবো আমার প্রস্তাব ! দেখি, তোমাদের মধ্যে কোন্ পণ্ডিতের ক'টা মাথা আছে যার দ্বারা আমার এসকল যুক্তি ভঞ্জন করতে পারো !
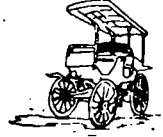
এতকালের সুনামসম্পন্ন হিন্দু কলেজ বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। ছাত্র সংখ্যা কমতে কমতে এমন হলো যে কোনো কোনো শ্রেণীতে তিন-চারজনের বেশী ছাত্র থাকে না। তৃতীয় শ্রেণীতে শুধু চন্দ্রনাথ একা। সে প্রতিদিন বই খাতা নিয়ে যথাসময়ে এসে ক্লাস ঘরে চুপ করে বসে থাকে, হিন্দু শিক্ষকরা কেউ তাকে পড়াতে রাজি নন, ইংরেজ শিক্ষকরা এসে তার মেধাশক্তি দেখে চমৎকৃত হয়ে যান। এরকম সুদর্শন, সুশীল ও মেধাবী ছাত্র এ কলেজে খুব কমই এসেছে।

কিন্তু এভাবে আর কলেজ চালানো সম্ভব নয়। সরকারের শিক্ষাবিভাগ এ কলেজের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন কিন্তু একজন বারবনিতার পুত্রকে কলেজে গ্রহণ করার পর থেকে শহরের উচ্চবংশীয় এবং ধনী হিন্দু সমাজ এ কলেজকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে চাইছে। ওদিকে প্রতিযোগী মেট্রোপলিটান কলেজ কয়েক মাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল, ছাত্র সংখ্যা হলো এক হাজারের বেশী। হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন প্রতিশোধ স্পৃহায় নবপ্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজের জন্য খাটতে লাগলেন প্রাণপণে, শহরের মাথা মাথা ব্যক্তিরা সাহায্য করতে লাগলেন এই নতুন কলেজটিকে, দানশীলা রানী রাসমণি একাই দিলেন দশ হাজার টাকা।

হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ ছাত্র-বেতন কমিয়ে দিলেন, তবু ছাত্রদের আকৃষ্ট করা গেল না। কোনো ভদ্র বংশের ছেলেই আর ঐ বেশ্যাপুত্র চন্দ্রনাথের ছায়াও মাড়াবে না।

এ অবস্থায় আর বেশী দিন আদর্শ বজায় রাখা যায় না। চন্দ্রনাথকে কলেজে গ্রহণ করার দিনটিতে যে বিপুল হুলস্থূল হয়েছিল, সে তুলনায় চন্দ্রনাথের বিতাড়ন পর্বটি হলো খুবই সংক্ষিপ্ত এবং আড়ম্বরহীন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ একদিন হঠাৎ তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষের দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। তারপর চন্দ্রনাথকে ডেকে বললেন, বালক, এদিকে আইস।

একজন তরুণ ইংরেজ শিক্ষক তখন পড়াচ্ছিলেন চন্দ্রনাথকে। শিক্ষক ও ছাত্র দুজনেই অধ্যক্ষের কণ্ঠস্বর শুনে বিস্মিত। চন্দ্রনাথ ভয়ে ভয়ে উঠে এলো।

অধ্যক্ষ তর্জনী উঁচিয়ে চন্দ্রনাথকে বললেন, তুমি দূর হইয়া যাও! আর কোনোদিন এ বিদ্যালয়ে আসিবে না। কোনোদিন ইহার দ্বার দিয়া প্রবেশের চেষ্টা করিবে না।

চন্দ্রনাথ বিমূঢ়ভাবে বললো, মহাশয়, আমি আর আসিব না?

—নাঃ!

চন্দ্রনাথ নির্বোধ নয়। সে বুঝেছিল যে তার জন্যই হিন্দু কলেজের ছাত্র সংখ্যা এত কমে যাচ্ছে। এর প্রতিকারের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ একটা কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করবেনই। তার নিজের পাঠতৃষ্ণা এত প্রবল যে সে কলেজ ছাড়ার কথা চিন্তাই করেনি। সে আশা করেছিল, তার জন্য পৃথক কোনো বন্দোবস্ত হবে। অধ্যক্ষ হঠাৎ এমন ক্রুদ্ধভাবে তাকে চলে যেতে বলবেন, এমন সে আশঙ্কা করেনি একবারও। আর এক সপ্তাহ পরেই তার পরীক্ষা শুরু হবার কথা।

সে কাতরভাবে জিজ্ঞেস করলো, মহাশয়, তাহা হইলে ইহার পর আমি কোথায় পাঠ লইতে যাইব?

অধ্যক্ষ হুঙ্কার দিয়ে বললেন, তোমার ইচ্ছা হয় তুমি জাহান্নামে যাইতে পারো। এ কলেজের সহিত তোমার আর কোনো সংশ্রব নাই!

তরুণ শিক্ষকটি উঠে এসে মৃদু প্রতিবাদ করতে গেলে অধ্যক্ষ তাকে থামিয়ে দিলেন। এবং চন্দ্রনাথ তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে অধ্যক্ষ দ্বারবানদের ডাকলেন।

বেশ্যা-পুত্রকে দ্বারবানরাও ঘৃণা করে। ইতিমধ্যে একদিন চন্দ্রনাথ জল খাবার ঘরের কলসী থেকে জল গড়িয়ে খেতে যাওয়ায় দ্বারবানরা তাকে 'আরে আরে জাত মারলে রে, ঘড়া মাৎ ছোঁও' বলে ধমকে উঠেছিল। এখন দ্বারবানরা খুব উপভোগ্য ভঙ্গিতে চন্দ্রনাথের ঘাড় ধরে কলেজ দ্বারের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

প্রথম প্রথম কিছুদিন রাইমোহন নিজে রোজ কলেজ ছুটির পর চন্দ্রনাথকে নিয়ে যাবার জন্য

কলেজের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে থাকতো। ইদানীং আর নিয়মিত আসে না। তা ছাড়া এখন কলেজ ছুটির সময়ও নয়। বেলা দ্বিপ্রহর। চন্দ্রনাথের ভয় হলো, পথে হয়তো আজও ভাড়াটে গুণ্ডারা তাকে মারবে। সে একা একা বাড়ি ফিরবে কী করে? তারপর সে ভাবলো, মারে মারুক।

সে ধীর পায়ে হেঁটে প্রবেশ করলো গোলদীঘিতে, বসলো গিয়ে জলের ধারে। একটু পরেই সে আর নিজেকে সামলাতে পারলো না, দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে সে কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তার সর্বাঙ্গ মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। ঠিক কার বিরুদ্ধে যে তার রাগ বা দুঃখ তা সে ঠিক জানে না, কিন্তু তার কিশোর-হৃদয় যেন ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যাচ্ছে!

গোলদীঘিতে নিষ্কর্মা লোক ও বয়াটে ছোকরাদের কখনো অভাব হয় না। বিপরীত দিকের বাজার ফেরত ফড়ে আর ব্যাপারীরাও এখানে গাছতলায় ঘুমোতে আসে। কিন্তু দুপুর রৌদ্রে জলের ধারে বসে থাকা এক কিশোরের কান্নার দৃশ্য কারুকে আকৃষ্ট করে না। কেউ তার পাশে এসে প্রশ্ন করে না, তোমার কী হয়েছে ভাই?

চন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলো। কান্নারও ক্লান্তি আছে। এক সময় থামতেই হয়। এক সময় চন্দ্রনাথ মুখ তুলে জলের দিকে চেয়ে রইলো। জলে তার মুখের প্রতিবিম্ব। অনেকেই তাকে রূপবান বলে, কিন্তু চন্দ্রনাথের মনে হলো তার মুখখানি যেন কোনো বীভৎস প্রেতের মতন। মানুষের সমাজে তার স্থান নেই। সে রামায়ণ, মহাভারত পড়েছে, মিলটন, বায়রন, শেক্সপীয়ারও পড়েছে কিছু কিছু, এসব কাব্যের জগতের সঙ্গে সে একাত্মতা বোধ করে, কাব্যের নারী-পুরুষদের সে মনে করে অতি আপনজন, কিন্তু তাকে কেউ আপনজন মনে করবে না। এই পৃথিবীতে সে কেন জন্মালো? সে তো স্বেচ্ছায় এ পৃথিবীতে আসেনি। এ পৃথিবীতে কেউই নিজের ইচ্ছেয় আসে না, তবু সে কেন একা অস্পৃশ্য!

প্রথমে সে একটা বই থেকে একটা একটা করে পাতা ছিঁড়ে ভাসাতে লাগলো জলে। তারপর এক সময় সমস্ত বই খাতাপত্র কুটি কুটি করে ছিঁড়ে নিক্ষেপ করলো দীঘিতে। এরপর তার কলেজে আসবার জন্য যে বিশেষ পিরানটি প্রস্তুত করানো হয়েছিল, সেটিও সে খুলে ফেললো গা থেকে। সেটিকেও ছেঁড়ার চেষ্টা করলো। শক্ত বনাতের কাপড়, সহজে ছেঁড়া যায় না, তবু ক্রোধের চোটে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে সে দু-হাতে টানতে লাগলো প্রাণপণে, শেষ পর্যন্ত কুর্তাটিকে ফালাফালা করে ফেলে সে তাতে এক তাল মাটি জড়িয়ে ডুবিয়ে দিল জলের মধ্যে। তারপর সে উঠে দাঁড়ালো। ধুতির কোচা খুলে কোমর বেড়া দিয়ে বাঁধলো শক্ত করে।

বাড়ির দিকে না গিয়ে চন্দ্রনাথ আচ্ছন্নের মতন ঘুরতে লাগলো পথে পথে। কোনোদিন সে একা এমনভাবে হাঁটেনি, সে এ শহরের রাস্তাঘাটও সব চেনে না। তবু যেদিকে দু'চোখ যায় সে যাবে।

এক জায়গায় দেখলো, একজন সাহেবের তদারকিতে এক দঙ্গল মজুর গাছপালা কেটে সাফ করছে আর আরেক দঙ্গল মজুর একটা পুকুর ভরাট করছে। এ শহরের পথের দু পাশে দু পা অন্তর একটা করে পুকুর বা ডোবা। তার পাশে ঝোপঝাড়। সম্প্রতি সরকার বাহাদুর উদ্যোগ নিয়েছে ডোবাগুলি ভরাট করবে আর ঝোপঝাড় আগাছার নিকেশ করবে। সন্ধে হতে না হতেই মশার উৎপাতে টেঁকা যায় না, ওলাউঠোয় প্রতি বছরই বাড়িকে বাড়ি ছারখার করে দিচ্ছে। এইসব আগাছার জঙ্গল আর পচা জলের জন্যই নাকি রোগ ছড়ায়।

চন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো সেই কর্মকাণ্ড। কিন্তু একটু পরেই সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, আবার তার চোখে জল আসে। ধুতির খুঁট তুলে চোখ মুছে সে আবার হাঁটতে শুরু করে।

একটু পরে একটি বিরাট ধুমধামের শোভাযাত্রার মধ্যে পড়ে গেল সে। কিসের শোভাযাত্রা তা প্রথমটায় বোঝাই যায় না। একদল লোক খোল-করতাল বাজিয়ে ধেই ধেই করে নাচছে আর চিল্লাচিল্লি করে একটা গান গাইছে। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে একটা রথের মতন জিনিস বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিছু লোক, দূর থেকে সেটিকে ভালো করে দেখতে পেল না চন্দ্রনাথ। লোকগুলি সকলেই যেন একেবারে ভাবে বিভোর। চন্দ্রনাথের একবার মনে হলো এ বুঝি কোনো খানদানি মানী লোকের মড়া নিয়ে শ্মশানযাত্রা হচ্ছে।

একটু মনোযোগ দিয়ে সে গানটা শুনলো।

> যিনি গুরু তিনি কৃষ্ণ না ভাবিও আন্
> গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট জানিবা প্রমাণ।

প্রেমারাধ্যা রাধাসমা তুমি লো যুবতী
রাখ লো গুরুর মান যা হয় যুকতি।

শ্মশানযাত্রায় কি এ গান হয় ? তাছাড়া খোল করতালধারীরা গাইতে গাইতে এমন লাফাচ্ছে যে দেখলে হাসি পায়। এদের দেখবার জন্য ভিড় জমে গেছে পথের দু পাশে। বারান্দা থেকে উঁকি মারছে স্ত্রীলোকেরা। চৌমাথার বেনের দোকানের সামনে ভর্তি লোক, তাদের নানারকম বেশ, কারুর কফ্ ও কলারওয়ালা কামিজ, রূপোর বগলস্ আঁটা শাইনিং লেদার বা ইণ্ডিয়া রাবারের জুতো, কেউ পরেছে চায়না কোট, কাঁধে ক্রেপের চাদর, হাতে স্টিক। কেউবা খ্যাংরাগুঁপো, গামছা-কাঁধে। কেউ ছোট আদালতের উকিল। কেউ সেকশন রাইটার, টাকাওয়ালা গন্ধবেনে, কেউ তেলী বা কেউ কামার অথবা ফলারে যজমেনে বামুন, কোথাও বা চার-পাঁচজনের দল বাঁধা নারী, তাদের কোলে কাঁখে বাচ্চা।

যে-কোনো হুজুগেই শহরের পথে এমন ভিড় জমে যায়। কেউ ভক্তিভরে কীর্তনিয়াদের উদ্দেশে প্রণাম করলো, কেউ বা নানান টিটকিরির মন্তব্য ছুঁড়তে লাগলো;কেউ বললে, চোখে তেমন জল নেই ক্যান, বাপ ? বেক্ষরা আরও বেশী কেঁদে ভাসায়। কেউ বললে, আহা-হা, জয় গুরু গুরু, এবার হলো কলির শুরু ! কেউ বললো, হরি হে মাধব, চান করবো না গা ধোবো ! কেউ আরও উচ্চস্বরে বৈষ্ণবদের চেয়ে শাক্তদের গলার জোর বেশী প্রমাণ করবার জন্য বললো, ব্যোম কালী কোলকেতাওয়ালি !

কীর্তনিয়ারা তাতে একটুও দমে না। একজন খোলধারী মিছিল থেকে বেরিয়ে এসে দর্শকদের উদ্দেশ্য করে চট চটাং চট চটাং করে খোল বাজিয়ে নাচতে নাচতে ঝুঁকে পড়ে গান ধরলো : "তাথইয়া তাথইয়া নাচত ফিরত গোপাল ননী চুরি করি খাঞীছে,/আরে আরে ননী চুরি করি খাঞীছে তাথইয়া তাথইয়া..."। অমনি দর্শকরা হরিবোল হরিবোল দিয়ে উঠলো।

চন্দ্রনাথ ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। রথটি দেখবার জন্য তার কৌতূহল।

রথটি নানারকম ফুল ও রাংতার ঝালর দিয়ে সাজানো। তার ওপর কোনো বিগ্রহ নেই, বসে আছেন এক জ্যান্ত গোঁসাই। আজ পর্যন্ত এ শহরে কেউ রোগা চেহারার গোঁসাই দেখেনি, ইনি আবার একাই তিনজনের সমান। জনা ছ'য়েক লোক রথটি ঠেলতে ঠেলতে একেবারে গলদঘর্ম। গোঁসাইজীর শরীরটা প্রকাণ্ড, মুণ্ডিত মস্তক, মধ্যে তরমুজের বোঁটার মতন চৈতন ফক্কা। সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ। নাকে তিলক ও অদৃষ্টে (কপালে) এক ধ্যাবড়া চন্দন, ঠিক যেন মনে হয় কাকের অপকর্ম। পাছে পাপীতাপী এবং অবিদ্যাদের ওপর চোখ পড়ে সেইজন্য গোঁসাইজী চক্ষু বুজে নাম জপ করছেন।

ইনি মল্লিকবাড়ির কুলগুরু নদেরচাঁদ গোস্বামী জিউ বাবা। যত বড় ধনীর বাড়ির গুরু, তত বেশী জাঁকজমক, নইলে যজমানের ইজ্জৎ থাকে না। ভক্ত শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে সারা শহর কাঁপিয়ে আগমন ঘটালে লোকে বলে, হ্যাঁ, অমুক বাড়ির গুরুদেব এলেন বটে !

এত হই-চইয়ের মধ্যে মিশে গিয়ে খানিকক্ষণ হাঁটতে চন্দ্রনাথের মন্দ লাগলো না। কিন্তু কিছুতেই তার মনের ভার কাটে না। ঢেউয়ের মতন হঠাৎ হঠাৎ অভিমান এসে আছড়ে পড়ে বুকে। এত লোক আনন্দ ফুর্তি করে নাচতে নাচতে যাচ্ছে, ওরা তো কেউ জানে না ওদের মধ্যে বুক ভরা দুঃখ নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এক কিশোর। নিজের অজ্ঞাতসারেই চন্দ্রনাথ আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

চন্দ্রনাথকে কাঁদতে দেখে এক ভক্ত তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বসিয়ে দিল রথের ওপরে, তারপর গদগদ স্বরে বলতে লাগলো, অহো, অহো, অহো ! গুরো, তুমিই সত্য ! ধন্য তোমার মহিমা ! বালককেও তুমি তরালে। বল বাবা, বল, জয় গুরু, জয় গুরু !

চন্দ্রনাথ হাত পা মুচড়ে নেমে পড়লো। সে কুষ্ঠরোগীর মতন অস্পৃশ্য, যদি এরা সে কথা জেনে যায় ? সে মিছিল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, সেই ভক্তপ্রবর তার হাত ধরে বললো, যাস কই, ওরে যাস কই ? চল, আমাদের সঙ্গে চল, গুরুর প্রসাদ পাবি, তেমন জিনিস তোর বাপের জন্মে খাসনি।

হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে পালালো চন্দ্রনাথ। তার এখন বুক হালকা করা দরকার। সে একটি মসজিদের সিঁড়িতে বসে আবার কাঁদলো অনেকক্ষণ। তারপর সেখানেই কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

তার যখন ঘুম ভাঙলো, তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে, সন্ধ্যা সমাগত। সে দেখলো তার পাশে কয়েকটা পাই পয়সা ও আধলা পড়ে আছে। রমজানের মাস, ভক্ত মুসলমানরা নামাজ সেরে বেরুবার সময় ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে দেখে মনে করেছে কোনো অনাথ আতুর, তাই কেউ কেউ কিছু দান করে গেছে।

চন্দ্রনাথ সে পয়সা ছুঁলো না। ঘুম ভাঙার পর প্রথমে সে দিশাই করতে পারলো না, এখন ভোর না

সন্ধ্যা। তারপর একটু ধাতস্থ হবার পর সে আবার এক বিড়ম্বনায় পড়লো। এটা কোন্ জায়গা? সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোয় সব কিছুই অচেনা মনে হয়। সে এখান থেকে বাড়ি ফিরবে কী উপায়ে? একবার তার মায়ের কথা মনে পড়লো। এই সময় তার মা বেশভূষা পরিবর্তন করে চোখে সুর্মা আঁকে, সারা অঙ্গে আতর ছিটিয়ে রাত্রের বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্য তৈরি হয়। মায়ের প্রতি চন্দ্রনাথের কোনো রাগ হলো না, কিন্তু সে আর বাড়ি ফিরে যাবে না।

মসজিদের কাছে একটা কাবাবের দোকান। সেখানে কিছু লোক দাঁড়িয়ে জটলা করছে। কোনো একটা ব্যাপারে তাদের বেশ উত্তেজিত মনে হয়। চন্দ্রনাথ সেদিকে এগিয়ে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলো, এ জাগাটার নাম কী?

লোকগুলো নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, কেউ উত্তর দিল না। দোকানটিতে মস্ত বড় চুল্লিতে ঝলসানো হচ্ছে মাংস, সেই গন্ধে চনচনিয়ে উঠলো ক্ষিদে। কলেজ থেকে ফিরে এই সময় চন্দ্রনাথ রোজ তার খাবার খায়। আর কোনোদিন সে কলেজে যাবে না। সে বাড়ি ফিরে গিয়ে সব কথা বললেই রাইমোহনদাদা আবার তাকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগবে। রাইমোহনদাদা অতি ধুরন্ধর, হয়তো নাম ভাঁড়িয়ে চন্দ্রনাথকে আবার অন্য কোনো জায়গায় ভর্তির ব্যবস্থা করবে। সেখানেও কিছুদিন পর চন্দ্রনাথ ধরা পড়ে যাবে নিশ্চিত, আবার সেখান থেকে তাকে বিতাড়িত করা হবে। না, চন্দ্রনাথ আর এই অপমান সহ্য করতে রাজি নয়। সে আর জীবনে কোনো বই ছোঁবে না।

সে এবার দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলো এই জায়গাটির নাম। এবং জানলো যে এটা গরানহাটা। আর ঠিক তখনই দূর থেকে তিন চারজন লোক ছুটে এলো এদিকে।

তাদের মধ্যে একজন ভয়ংকর চেহারার লোক হুংকার দিয়ে বললো, আরে কাল্লু! তারপরই তার হাতে ঝলসে উঠলো একটা ছুরি, সে ঝাঁপিয়ে পড়লো আগের জটলাটার মধ্যে।

চন্দ্রনাথ এমনই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল যে কী করবে তা বুঝতে পারার আগেই কিছু লোক তাকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে দিল। আচমকা পড়ে গিয়ে তার মাথায় বেশ চোট লাগলেও সে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেখলো, এরই মধ্যে জায়গাটা একদম ফাঁকা হয়ে গেছে। সবাই পালিয়েছে, দোকানদারও ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে, শুধু রাস্তার ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে একটা লোক, তার বুকে একটা আমূল ছুরি বেঁধা। লোকটার বুক ভেসে যাচ্ছে রক্তে, তখনও সদ্য মুণ্ডকাটা ছাগলের মতন কেঁপে কেঁপে উঠছে তার দেহ। একটুবাদেই একেবারে নিথর হয়ে গেল।

এরকম ভয়ংকর দৃশ্য চন্দ্রনাথ কখনো দেখেনি। তার চক্ষু দুটি যেন স্থানচ্যুত হতে চাইছে, তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। লোকটি কি সত্যিই মরে গেল? একটু আগে এই লোকটিই চাঁচাচ্ছিল তারস্বরে, এর মধ্যেই সব শেষ? একবার সে ভাবলো, কাছে গিয়ে দেখবে লোকটির নাক দিয়ে এখনো নিশ্বাস পড়ছে কি না। কিন্তু পর মুহূর্তেই তার ভেতরকার সহজাত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি তাকে বলে দিল পলায়ন করতে। সে পিছন ফিরে অন্ধের মতন দৌড় লাগালো।

দৌড়োতে দৌড়োতে কত পথঘাট পেরিয়ে গেল চন্দ্রনাথ, তার কোনো হিসেব নেই। অনেক অন্ধকার পথ পেরিয়ে সে চলে এলো একটি আলো-উজ্জ্বল পল্লীতে। এলাকার অনেক বাড়ির দরজায় জাহাজীল্যাম্প হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাজগোজ করা স্ত্রীলোকেরা। পথে মাতালের হল্লা ও জুড়িগাড়ির ভিড়। এইসব স্ত্রীলোকরা কোন্ উদ্দেশ্যে রাত্রিবেলা এত বেশী প্রসাধন করেছে, তা বুঝতে চন্দ্রনাথের কোনো ভুল হলো না। এ পল্লীর নাম যদিও সোনাগাছী কিন্তু চন্দ্রনাথের ভ্রম হলো সে বুঝি নিজের বাড়ির কাছে এসে পড়েছে। সে আবার প্রাণপণে ছুটলো।

বেশ কিছুক্ষণ পর একটা অন্ধকার অঞ্চল দেখে চন্দ্রনাথ একটা অশ্বত্থ গাছের নীচে বসে জিরোতে লাগলো। চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই ছুরি বেঁধা লোকটির শরীর। লোকটার শরীর যেমনভাবে ছটফট করছিল, ঠিক সেইভাবেই যেন চন্দ্রনাথের শরীরও কাঁপছে। মৃত্যু এত সহজ? লোকটার নাম কাল্লু, ওর বাড়ির লোক নিশ্চয়ই এখনো কিছু জানে না। ওর মা হয়তো ওর জন্য রাত্তিরবেলা ভাত বেড়ে অপেক্ষা করে থাকবে। ওরা ভাত খায় না, রুটি খায়। রুটি আর কাবাব। কাল্লু আর কোনোদিন রুটি আর কাবাব খাবে না।

আজ চন্দ্রনাথ বাড়িতে না ফিরলেও তার মা হীরেমণি কোনো বাবুর বাড়িতে মুজরো গাইতে যাবে? রাইমোহনদাদা আজও একতলার সিঁড়ির নীচের ঘরে মদের আসর বসাবে? হীরেমণি নিজে হাতে

রোজ বিকেলে ছেলেকে খাবার দেয়। আজ তো বিকেল কখন পেরিয়ে গেছে, মা এখন কী করছে ? মা কি এতক্ষণে জড়ির চুমকি বসানো ঘাঘরাটা খুলে আবার আটপৌরে শাড়ি পরে এখন কাঁদতে বসেছে ? কিংবা 'কত্তা দেওয়া আচে, যেতেই হবে গা, চাঁদু ফিরলে একটা খপর পাঠিয়ো' বলে মা উঠে বসেছে কোনো বাবুর জুড়িগাড়িতে ? রাইমোহনদাদা খুঁজতে বেরিয়েছে তাকে ?

চন্দ্রনাথ ভাবলো, সে যদি আজই মরে যায়, তা হলে তারপরও কি তার মা বাবুদের কাছে যাবে ? চন্দ্রনাথের ধারণা হলো, সে মরে গেলে তার মা খুব কাঁদবে, শুধু কাঁদবে, আর কোনোদিন ঐ পাপের জীবনে যাবে না। তা হলে তো তার মরে যাওয়াই ভালো। কত সহজে মরে যাওয়া, কেউ তার বুকে একটা ছুরি বসিয়ে দিলেই হলো। কিংবা, সে নিজেই নিজের বুকে একটা ছুরি বসিয়ে দিতে পারে।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে চন্দ্রনাথের পেছনে কেউ একটা লাথি কষিয়ে বলে উঠলো, এই শাল্লো ! ভাগ !

চন্দ্রনাথ ধড়ফড় করে উঠে দেখলো মুখ ভর্তি দাড়িওয়ালা একজন লোক, খালি গা, পরনে একটা শতচ্ছিন্ন ধুতি, হাতে একটা বাঁশের লাঠি। মনে হয় কোনো পাগল !

লোকটি বললো, আমার জ্যায়গায় শুইচিস শাল্লো ! কাঁচা খেয়ে ফেলবো ! আমার সাত পুরুষের ভিটে, এখেনে যো আয়গা, ও মরে গা !

চন্দ্রনাথ এবার তাকিয়ে দেখলো, গাছের গোড়ায় একটা মাটির হাঁড়ি আর একটা পুঁটলি পাকানো কম্বল রয়েছে। এই লোকটি এখানে শোয়, চন্দ্রনাথ ভুল করে সে জায়গা দখল করেছিল।

লোকটা চন্দ্রনাথকে মারবার জন্য লাঠিটা তুলেছে, অমনি চন্দ্রনাথ হাতজোড় করে অনুনয় করে বললো, মেরো না মেরো না, আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।

লোকটা বললো, যাবি না তো, তোর খাল খিচে দেবো, শাল্লো !

চন্দ্রনাথ সুরুত করে পালিয়ে গেল সেখান থেকে। ভয়ে তার বুকের মধ্যে দুমদাম শব্দ হচ্ছে। কাল্লুকে ছুরি-বেঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে চন্দ্রনাথ ভয় পেয়েছিল, কিন্তু এই লোকটি লাঠি তুলে দাঁড়ানোতে চন্দ্রনাথ যে ভয় পেল, তা একেবারে অন্যরকম। এ তার নিজের মৃত্যুভয়। অথচ একটু আগেই তো চন্দ্রনাথ মরে যেতে চাইছিল।

না। এভাবে মরা চলবে না। চন্দ্রনাথ মরবেই, তবে, অন্যের হাতে নয়, নিজের ইচ্ছায়। সবচেয়ে ভালো জলে ডুবে মরা। তাদের পাশের বাড়ির চপলা নামে এক বালিকা গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে ডুবে মরেছিল। চন্দ্রনাথও গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে। সে সাঁতার জানে না। গঙ্গায় মরলে সব পাপী-তাপীই উদ্ধার পেয়ে যায়। মা গঙ্গা সবাইকে বুকে আশ্রয় দেন। তিনি সকলের মা, তিনি জাতি বিচার করেন না, দীন দুঃখীদেরও তিনি বুকে টেনে নেন। এখন চন্দ্রনাথকে খুঁজে বার করতে হবে, কোথায় গঙ্গা।

কিছুটা দৌড়ে, কিছুটা হেঁটে চন্দ্রনাথ আবার পৌঁছে গেল লোকালয়ে। এ পল্লীটির নাম বাগবাজার। এখানে অনেক ধনী মানুষদের অট্টালিকা রয়েছে। একটি বাড়ির সামনে অনেক মানুষের ভিড়। এই সব ধনীদের বাড়িতে বারো মাসে তের পার্বণ লেগেই থাকে। এই বাড়ির অন্দরে খুব খাওয়াদাওয়া চলছে বোঝা যায়। বড় বড় ঝুড়িতে করে এঁটো কলাপাতা আর মাটির গেলাস ফেলা হচ্ছে রাস্তায়। সিংহদ্বারের কাছে ভিড় জমিয়েছে কাঙালীর দল। চন্দ্রনাথও তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তার পাকস্থলী যেন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে খিধের আগুনে, গলা একেবারে ফেটে যাচ্ছে তৃষ্ণায়। মৃত্যু চিন্তার চেয়েও তার খাদ্য চিন্তা অনেক বেশি প্রবল হয়ে উঠলো।

সে দেখলো একজন লোক বাড়ির ভেতর থেকে এক বৃহৎ চাঙ্গারি ভর্তি লুচি এনে কাঙালীদের উদ্দেশে হেঁকে বললো, সব সার দিয়ে বসে যা, গোলমাল করবিনি, সবাই পাবি, অনেক খাবার রয়েচে, মাংস মেঠাই সব পাবি, বসে যা—

কাঙালীরা হুড়মুড় করে বসে গেল রাস্তার ওপর সার বেঁধে। একজন পাণ্ডা গোছের কাঙালী হেঁকে বললো, জয় হোক, বোসবাবুদের খাওয়া যেন অমের্ত ! আর কোনো বাবুদের এমন দরাজ দিল নেই !

চন্দ্রনাথও বসে পড়েছে তাদের মধ্যে। তার গৌর বর্ণ, সুঠাম শরীর। কাঙালীদের মধ্যে তাকে একেবারেই বেমানান লাগে। তার কখনো খাবার কষ্ট হয়নি, সে যখন যা ইচ্ছে হয়েছে পেয়েছে, কিন্তু আজ কাঙালীদের সঙ্গে বসতে তার একটু দ্বিধা হলো না। তার দু-পাশে যারা বসেছে, তারা একটু অবাক হয়ে দেখলো তাকে।

চারখানা লুচি ও কুমড়োর ছক্কা খাওয়া হয়ে গেছে, এর পরেই আসছে মাংস। এইটুকু খেয়ে

চন্দ্রনাথের ক্ষিধে যেন আরও বেড়ে গেছে, সে অধীর প্রতীক্ষায় আঙুল চাটছে। এমন সময় নিয়তি দেবী তার সঙ্গে আর একবার পরিহাস করলেন।

পরিবেশনকারী ব্যক্তিটি চন্দ্রনাথের সামনে এসে থমকে গেল। কালো কালো নোংরা চেহারার কাঙালীদের মধ্যে চন্দ্রনাথকে মনে হয় যেন কোনো দেবদূত। পরিবেশনকারীটি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, তুমি কে গা ? এখেনে বসোচো ? তুমি কাদের বাড়ির ছেলে ?

আর তখনই চন্দ্রনাথেরই বয়েসী এক কিশোর, ঐ বাবুদের বাড়িরই ছেলে, এগিয়ে এসে চন্দ্রনাথকে দেখে ভূত দেখার মতন চমকে উঠলো। সে বললো, ওমা, এই তো সেই ছোঁড়া ! ও ছোটকাকা, দেকবে এসো, দেকবে এসো !

পরিবেশন বন্ধ হয়ে গেছে। দেউড়ির ওপাশে এক প্রবীণ ব্যক্তি বিশিষ্ট অভ্যাগতদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি এগিয়ে এসে বললো, কী হয়েচে ? গোলমাল কিসের ?

কিশোরটি বললো, ছোটকাকা, এই দ্যাকো, এই সেই ছোঁড়া ! এর জন্যিই তো আমার হিন্দু কলেজে যাওয়া তোমরা বন্ধ করে দিয়েচো ! এই সেই বেশ্যার ছেলেটা।

বেশ্যার ছেলে যেন একটা দারুণ দর্শনীয় বস্তু। এই হিসেবে অনেকেই ভিড় করে দেখতে এলো চন্দ্রনাথকে। এমন কি কাঙালীরাও এমন একজনের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসাটা অসম্মানজনক মনে করে হই হই করে উঠলো। যেন তাদেরও জাত চলে যাবে।

বাবুদের বাড়ির কিশোরটি বললো, এ ছোঁড়া এসে আমাদের কেলাসে ভর্তি হলো, ওর মা-মাগীটা নিজে নিয়ে এয়েছেল ওকে, সবাই দেকেচে— !

তারপরই সে, হারামীর বাচ্চা, আমাদের সব্বোনাশ করে আবার আমাদের বাড়িতেই খেতে এয়েচে ! এই বলে এক লাথিতে উলটে দিল চন্দ্রনাথের খাবারের পাতা। তার ছোটকাকা চন্দ্রনাথের কান ধরে বললো, দূর হ ! বেজন্মা কাঁহিকা*!

চন্দ্রনাথ একটা কথাও বললো না। দু-তিনজন মিলে তাকে তুলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল খানিকটা। তারপর দ্বিপ্রহরে কলেজের দ্বারবানরা মিলে যেভাবে তাকে ছুঁড়ে দিয়েছিল এখন এরাও যেন তার চেয়েও বেশী প্রতিহিংসায় আরও জোরে ছুঁড়ে দিল তাকে।

তবু এবার শরীরে কোনো রকম ব্যথা বোধ করলো না চন্দ্রনাথ। পড়ে গিয়েই সে তাকালো এদিক ওদিক। কাছেই একটা পাথরের চাঙ্গার দেখতে পেয়ে সেটা হাতে নিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। যারা তাকে ছুঁড়ে দিয়েছিল, তাদের মধ্যে পরিবেশনকারী ব্যক্তিটিকে দেখে সে উন্মাদের মতন ছুটে এসে সেই পাথরের চাঙড় দিয়ে মারলো তার মাথায়। লোকটি বাপ রে, মলাম রে, বলে পড়ে গেল ধপাস করে। চন্দ্রনাথ পাথরটি জোরে ছুঁড়ে মারলো অন্যদের দিকে, তারপর প্রাণপণে ছুটলো।

পাইক বরকন্দাজ সমেত অনেকেই অনেক দূর পর্যন্ত তাড়া করে এসেছিল, কিন্তু কিছুতেই তার নাগাল পেল না।

চন্দ্রনাথ ক্রমে এক সময় পৌঁছোলো গঙ্গার ধারে। কিন্তু জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যার কথা তখন আর তার মনে এলো না। তার হাত চটচট করছিল। প্রথমে সে ভেবেছিল এঁটো লেগে আছে, কিন্তু নদীতীরে জ্যোৎস্নায় সে ডান হাতের পাঞ্জাবি তুলে দেখলো, সেখানে লেগে আছে রক্ত। মানুষের রক্ত।

জলের কাছে নেমে গিয়ে সযত্নে হাত ধুতে লাগলো চন্দ্রনাথ। এক হিসেবে আজ তার আর একবার হাতেখড়ি হলো।

ভূকৈলাশের রাজবাড়িতে এক মহাপুরুষ এসেছেন। শহরের সকলের মুখে মুখে এখন শুধু সেই মহাপুরুষের কথা। কেউ বললো, ইনি সত্যযুগের মানুষ, সেই যে শ্রীরামচন্দ্রের আমলে ধ্যানে বসেছিলেন, তারপর আর খেয়ালই করেননি যে কত হাজার বছর কেটে গেছে। কেউ বললেন, ইনি

বাল্মীকি মুনির ছোট ভাই, এনারও সারা গায়ে উইয়ের ঢিপি। কেউ বললো, শুধু উইয়ের ঢিপি নয়, তার ওপর আবার বড় বড় বট ও অশ্বত্থ গাছও গজিয়ে গেছে।

নবীনকুমার ঠিক করলো, সেই মহাপুরুষকে দেখতে যাবে।

বিবাহের পর নবীনকুমার অকস্মাৎ অনেকখানি বদলে গেছে। আর সে তার মায়ের নয়নের মণি, আদরের দুলালটি নেই। সে সদ্য ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রম করলেও এখন একজন বিবাহিত পুরুষ এবং সিংহ বাড়ির কর্তা। বিধুশেখর বহুমূত্র রোগে কাবু হয়ে পড়েছেন, আগেকার মতন আর প্রতিদিন তিনি এ গৃহে আসতে পারেন না, সম্প্রতি কিছুদিন তিনি একেবারেই শয্যাশায়ী। এদিকে গঙ্গানারায়ণও যে সেই মহাল পরিদর্শনে গেছে, তারপর সাড়ে পাঁচ মাস হয়ে গেল তার আর কোনো সংবাদ নেই।

বিম্ববতী গঙ্গানারায়ণের জন্য খুবই উৎকণ্ঠিত। গঙ্গানারায়ণ তো কখনো এমন করে না। অন্তত লোক পাঠিয়ে সে তো একটা খবর দিতে পারতো। বিম্ববতী বিধুশেখরকে বলেছিলেন গঙ্গানারায়ণের একটা খোঁজ নিতে, কিন্তু বিধুশেখর গা করেননি। তিনি বলেছিলেন, বজরা তো এখনো ফেরেনি, তাহলে দ্যাকো গে তোমার বড় পুত্তুর কোতায় না কোতায় হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্চে!

বিম্ববতী এরপর দিবাকরকে ডেকে স্বয়ং হুকুম দিয়েছিলেন গঙ্গানারায়ণের সংবাদ আনবার জন্য দ্রুতগামী ছিপে কোনো কর্মচারীকে প্রেরণ করতে। দিবাকর তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল। কিন্তু গঙ্গানারায়ণের খবর জানতে তো তার ভারী গরজ! গঙ্গানারায়ণ যতদিন দূরে দূরে থাকে, ততদিনই তার পোয়া বারো। তাছাড়া সে একটি বাংলা সংবাদপত্রে পাঠ করেছে যে ইব্রাহিমপুর পরগনায় নীলকর সাহেব ও স্থানীয় রায়তদের মধ্যে নাকি একটা হাঙ্গামা হয়ে গেছে। গঙ্গানারায়ণ সেই হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়লে তো আরোই মঙ্গল। সুতরাং, গঙ্গানারায়ণ গেছে নদীয়ায়, আর তার সংবাদ আনাবার জন্য দিবাকর একজন পাইককে সত্বর পাঠিয়ে দিলে খুলনার দিকে। বিম্ববতী মাঝে মাঝে ডেকে প্রশ্ন করেন। দিবাকর নানাপ্রকার ভুজুং ভাজুং দেয়।

বিয়ে দিলে ছেলে পর হয়ে যায়। নবীনকুমারের বিবাহের ছ' মাসের মধ্যেই বিম্ববতী অনুভব করলেন, তাঁর বুকের ধন ছোটকু আর তাঁর বাধ্য নেই। নবীনকুমারের পত্নী কৃষ্ণভামিনীর বয়েস মাত্র আট বৎসর, ঐ বয়েসী বধূরা সাধারণত পিত্রালয়ে থাকে। কিন্তু কৃষ্ণভামিনী তার খেলার পুতুল, তাকে সর্বক্ষণ নবীনকুমারের কাছে চাই। শুধু তাই নয়, এতকাল সে মায়ের পাশে শুয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়েছে। এখন নবীনকুমার বিবাহিত পুরুষ, সে অবিকল কোনো বয়স্ক ব্যক্তির মতন নিজেই ব্যবস্থা করে পৃথক কক্ষে তার খেলার সঙ্গিনীকে নিয়ে রাত্রিযাপন করে।

এখন প্রতি রাত্রে বিম্ববতীর বুক নিদারুণভাবে খালি খালি লাগে, তাঁর ঘুম আসে না।

নবীনকুমার অন্যান্য ব্যাপারেও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। সে মায়ের অনুমতি না নিয়েই এখন বাড়ির বাইরে যায়। বিম্ববতী তাকে নিষেধ করতে গিয়ে বার বার হার মেনেছেন। নবীনকুমার মুখের ওপর জানিয়ে দেয়, আমি তো আর দুধের বাছাটি নেই মা, যে কাবুলি মেওয়াওয়ালারা ঝোলায় পুরে নিয়ে যাবে আর গরম কড়ার ওপর উল্টো করে ঝুলিয়ে রেকে নাক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বার কর্বে!

নবীনকুমারকে এখন সর্ব ব্যাপারে তাল দিচ্ছে দিবাকর। মনে মনে সে মতলব এঁটে রেখেছে যে এই ছোটবাবুটিকে একবার খরচের হাত ধরিয়ে দিতে পারলেই হয়। অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক এই বালক, একবার এ খরচ শুরু করলে পারিষদরাই তো তার মোটা ভাগ পাবে। বাবু রামকমল সিংহ ছিলেন দিলদরিয়া মানুষ, তাঁর আমলে দিবাকরের বিলক্ষণ দশ টাকা উপরি রোজগার হতো। তিনি অকালে গত হওয়ায় দিবাকর বেশ অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। বিধুশেখরের তীক্ষ্ণ নজর হিসাবপত্রের দিকে। আর গঙ্গানারায়ণ তো কলেজে-পড়া ম্লেচ্ছভাবাপন্ন ছোঁড়া। তার সেরকম বুনিয়াদি উঁচু নজরই নেই যে পাঁচ টাকার জায়গায় পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করবে। আরে, কলকাতা শহরে বাবু সমাজে দু'হাতে টাকা না ওড়ালে যে মান থাকে না, লোকে আড়ালে ছ্যা ছ্যা করে, সে জ্ঞানই হলো না গঙ্গানারায়ণের। দিবাকরের খুব আশা নবীনকুমারের মতি এদিকে ফেরানো যাবে।

গত মাসে নবীনকুমার নিজে গিয়ে হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়ে এসেছে। বিম্ববতীর আপত্তিতে সে কর্ণপাত করেনি, এবং বিধুশেখরেরও আপত্তি জানাবার মতন আর কোনো যুক্তি নেই। হিন্দু কলেজে হীরা-বুলবুল পর্ব সমাপ্ত হয়েছে, বিতাড়িত হয়েছে চন্দ্রনাথ, এখন আর বেশ্যাপুত্রের সংসর্গে থাকার কোনো প্রশ্ন নেই। হিন্দু কলেজে আবার আস্তে আস্তে ফিরে আসছে প্রাক্তন ছাত্ররা, আসছে বড়ঘরের

ছেলেরাও। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন সাহেবের নতুন কলেজের যতই রবরবা হোক, তবু হিন্দু কলেজ কতদিনের ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বাপ-কাকারা যেখানে পড়েছে, অনেক ছাত্র সেখানেই পড়তে চায়।

কলেজ থেকেই নবীনকুমার শুনে এসেছে মহাপুরুষের কাহিনী। ছাত্ররা সবাই বলাবলি করছিল ঐ কথা। ক্লাসে তো এই সব গল্পই হয়।

পুনর্গঠিত হিন্দু কলেজে আগেকার সেই শৃঙ্খলা আর নেই। কোনো কিছু একবার ভাঙলে ঠিক মতন জোড়া লাগানো শক্ত। আগে হিন্দু কলেজে ভর্তি হওয়াই ছিল একটি কঠিন ব্যাপার। বংশ পরিচয়, বিত্ত এবং মেধার পরিচয় না নিয়ে কোনো ছাত্রকে গ্রহণ করা হতো না। হীরা-বুলবুল পর্ব চুকে যাবার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তোষামোদ করে ছাত্রদের ডেকে এনেছেন। এই সুযোগে অনেক অগা বগা দুঃশীল বালকও ঢুকে পড়েছে ছাত্র সেজে। পড়াশুনোর বদলে ক্লাসের মধ্যে এখন হই হট্টগোলই হয় বেশী।

এই পরিবেশটি নবীনকুমারের বেশ পছন্দ। অতি অল্প দিনেই সে সর্দার গোছের হয়ে উঠেছে ক্লাসের মধ্যে। নানাপ্রকার দুষ্ট আমোদে সে উস্কানি দেয়। শিক্ষক যখন ক্লাসে থাকেন না তখন কক্ষটি হয়ে ওঠে একটি হট্টমেলা। ছেলেরা কেউ শ্যামা পাখির মতন শিস দেয়, কেউ পায়রার মতন বকম বকম করে, কেউ ঘোড়া সেজে চার পায়ে ছোটে, কেউ বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে শিক্ষকদের অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করে দেখায়, আর নবীনকুমার এইসব উপভোগ করে তীক্ষ্ণ স্বরে হাসে।

এক একদিন এক একরকম হুজুগের গল্প শোনা যায়।

যেমন একদিন জলখাবার ছুটির সময় কাশীপুর অঞ্চল নিবাসী এক ছোকরা বললো, জানিস, কাল বৈকালে পাকপাড়ার লালাবাবুদের বাড়িতে কী হয়েচে ? একদল মাতাল গোরা লালারাজাদের বাড়িতে এসে হামলে পড়ে চার পাঁচজন দারোয়ানকে বর্শায় বিদে গিয়েচে !

অমনি অন্য ছাত্ররা রই রই করে উঠলো। একজন কিছু বললে অন্য কেউ তার প্রতিবাদ করবেই। একজন বললো, পাকপাড়ায় কী হয়েচে, তা তুই জানলি কী করে রে ? কাশীপুরের ছাত্র বললো, আমি সন্ধেবেলা ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, নিজের চোকে দেকিচি !

আর একজন বললো, পাকপাড়ায় মাতাল গোরা আসবে কোতা থেকে ? কাল সন্ধেবেলা চরস খেয়েচিলি নিশ্চয় ?

অন্য একজন কাশীপুরীর সমর্থনে বললে, কেন, দমদমা থেকে ময়দানের কেল্লায় তো গোরারা হরদমই যাতায়াত কর্চে। আব তারা তো সর্বক্ষণই মাতাল হয়ে থাকে।

অন্য কয়েকজন একসঙ্গে কিছু বলতে যাচ্ছিল, নবীনকুমার তাদের থামিয়ে দিযে বললো, আঃ, দাঁড়া না, তারপর কী হলো শুনি। রাজারা কী কল্লেন ?

কাশীপুরী বললো, রাজারা ভয় পেয়ে হাসন হোসেন বলতে বলতে বুক চাপড়ে দৌড়ে পুরোনো এক পাতকো'র মধ্যে সেঁদিয়ে প্রাণরক্ষা কল্লেন।

নবীনকুমার বললো, রাজারা পাতকো'র মধ্যে সেঁধুলো কী করে, গিরগিটি নাকি ?

অমনি হাসির গররা পড়ে গেল।

আর একটি ছাত্র বললো, আরে তা নয়, তা নয়। আসল কতাটা আমি জানি, আমার বড়দাদার কাচে শুনিচি ! রাজাদের বাড়ির সামনের গাচে একটা কাগ বসেছেল, এক সাহেব শিকারী বন্দুকের তাক ঠিক আছে কিনা দেকবার জন্য সেই কাগটাকে যেই মারলো অমনি রাজাদের দারোয়ান তেড়ে তাকে মাত্তে গেল···

তাকে থামিয়ে দিয়ে আর একজন বললো, ধেৎ, যতসব বাজে কতা ! আমাদের পাশের বাড়ির কতা, আমি জানি না, তোরা জানিস !

নবীনকুমার সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো, তুই লালারাজাদের পাশের বাড়ি থাকিস ? আগে তো কখনো শুনিনিকো !

সে ছেলেটি বললো, আলবত আমাদের পাশের বাড়ি। রাজাদের বাড়ির পেছুনে যে বড় পগারটা রয়েচে জানো ? তারই পাশে যে পচা পুকুর, সেখানেই আমাদের বাড়ির খিড়কি ! তাহলে ?

নবীনকুমার বললো, তাহলে তো পাশাপাশি বটেই। তুই তা হলে বল—

সে বললো, রাজাদের এক আমলার মুখখানা ঠিক বানরের মতন। দেখলেই ভেংচি কাটতে ইচ্ছে করে। আমরা কতবার তাকে দেকে ভেংচি কেটে পালিয়িচি, কালকে হয়েচে কী, একজন সাহেব ঐ আমলার ভাইকে দেখে ভেংচেছিল, তাতে আমলার ভাইও ভেংচোয় আর চেঁচিয়ে বলে, তুইও তো একটা লালমুখো বানর রে! ব্যস, অমনি সাহেব গেল ক্ষেপে, আরও সাহেবরা দলবল মিলে এসে রাজবাড়ির ওপর গুলি চালালে!

ছেলেরা হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে। ফুর্তির চোটে কেউ একজন গল্পকারকে চ্যাংদোলা করে তুলে ফেললো।

আরও কেউ কেউ এই ঘটনার অন্য ভাষ্য দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় ঢং ঢং করে দুটোর ঘন্টা বেজে গেল আর মাস্টারমশাইও তামাক খাবার ঘর থেকে চলে এলেন ক্লাস রুমে। তখনকার মতন গোলমাল চাপা পড়লো।

পরদিন কিন্তু দেখা গেল ঘটনাটা একেবারে অমূলক নয়। একটা কিছু ঘটেছে পাকপাড়ার রাজবাড়িতে। একটি বাংলা সংবাদপত্রে লিখলে, "একদল গোরা বাজনা বাজিয়ে যাইতেছিল, দলের মধ্যে একজনের জলের তৃষ্ণা পাইল, রাজাদের বাড়িতে যেমন জল খাইতে যাইবে জমাদার গলাধাক্কা মারিয়া বাহির করিয়া দেয়, তাহাতে সঙ্গের কর্নেল গুলি করিতে হুকুম দ্যান।"

কিন্তু ক্লাসের ছেলেরা কেউ খবরের কাগজের বিবরণ সত্য বলে মানতে রাজি নয়। পরদিন তারা আরো অনেকে একটা করে গল্প বানিয়ে এনেছে। কেউ বললে, লোক মারা গেছে দশ জন, কেউ বললে পঞ্চাশ। কেউ বললে, দৌড়ে পালাতে গিয়ে বড় রাজার ঠ্যাং ভেঙে গেছে। কেউ বললে, ছোট রাজা মুক্তকচ্ছ হয়ে এমন দৌড়েছিলেন যে গঙ্গার ধারে পৌঁছেও থামতে ভুলে গিয়ে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন জলে। এদিকে তিনি আবার সাঁতার জানেন না।

সেদিন জল খাবার ছুটির সময় নবীনকুমার পালিয়েছিল কলেজ থেকে। তার কৌতূহল অপরিসীম, সে আসল ঘটনাটা জানতে চায়। কলেজের গেটের কাছে তার জুড়িগাড়ি সর্বক্ষণ অপেক্ষা করে, তাতে বসে থাকে দুলাল। নবীনকুমার গাড়ি হাঁকাতে বললো পাকপাড়ার দিকে।

এই বয়েসেই নবীনকুমার বংশমর্যাদা সম্পর্কে অতিশয় সচেতন। অনিমন্ত্রিত অবস্থায় কোনো বড় মানুষের গৃহে যাওয়া তার মানায় না। সে পাকপাড়ার রাজাদের বাড়ির সামনে এসে গাড়িতে বসেই তাকিয়ে দেখলো দেউড়ির দিকে। সেখানে অস্বাভাবিকতার কোনো চিহ্নই নেই। উর্দিপরা দারোয়ানরা দাঁড়িয়ে আছে বর্শা হাতে, লোকজন যাতায়াত করছে, এমনকি রাজাদের একজনকেও যেন দেখা গেল বার বাড়িতে বসে গড়গড়া টানছেন।

নবীনকুমার দুলালকে পাঠিয়ে বললো, যা, গিয়ে জেনে আয় তো সঠিক কী হয়েচে।

দুলাল দেউড়ির কাছে গিয়ে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ফিরে এলো। একটা কিছু ঘটেছে ঠিকই। তবে অতি সামান্য ব্যাপার। একজন নতুন গোছের ফিরিঙ্গি শিকারী এদিকে এসে ঘোরাঘুরি করছিল দু'দিন আগে। পাকপাড়ার দিকে প্রচুর শেয়াল, এমনকি দিনের বেলার দিকেও দেখা যায় শেয়ালদের ঘোরাঘুরি করতে। ফিরিঙ্গিরা অযথা শেয়াল মারতে ভালোবাসে, এক শেয়ালকে তাড়া করছিল সেই শিকারী, তারপর সে শেয়ালটি নাকি রাজবাড়ির বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ে। শিকারীটিও যেই বাগানে ঢুকতে যাবে, তখন তাকে বাধা দেয় এক দ্বারবান। কিন্তু শিকারের ঝোঁক একবার মাথায় চাপলে তখন আর শাদা চামড়াদের কোনো জ্ঞান থাকে না। তর্কাতর্কির সুযোগে শেয়ালটা পালিয়ে যাচ্ছে ভেবে শিকারীটি তখন একজন দারোয়ানকেই গুলি করে মেরে দেয়।

তারপর রাজারা বেরিয়ে এসে শিকারীর কাছে ক্ষমা চান এবং শিকারীটিও মাথা ঠাণ্ডা হলে বলে যে লোকটিকে মেরে ফেলবার ইচ্ছে তার ছিল না, হঠাৎ হাত ফসকে গুলি বেরিয়ে যায়। সাহেবের হাত ফসকে গুলি বেরিয়েছে, তবে তো কোনো কথাই নেই। আসলে দ্বারবানটির আয়ু ফুরিয়ে গিয়েছিল বলেই না সে পঞ্চত্ব লাভ করেছে! ব্যস, সেখানেই চুকে গেছে সব কিছু। রাজারা নিহত দারোয়ানের পরিবারকে দুশো টাকা দান করেছেন।

দুলালের মুখে সব বিবরণ শুনে নবীনকুমার বক্রভাবে হাসলো।

ভূকৈলাশের রাজবাড়িতে মহাপুরুষের আগমন ব্যাপারটাও নবীনকুমার নিজের চোখে যাচাই করতে

চায়। সেদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে খাবারদাবার খেয়ে নবীনকুমার দুলালকে ডেকে বললো, আবার গাড়ি যুততে বল, চল ভূকৈলাশ থেকে ঘুরে আসি।

এখানেও প্রথমে নবীনকুমার গাড়ি থেকে না নেমে প্রথমে দুলালকে পাঠালো। দুলাল ঘুরে দেখে এসে বললো, হ্যাঁ, সত্যিই একজন জটাজূটধারী লোক রাজবাড়ির ঠাকুর দালানে বসে আছেন বটে, তাঁকে ঘিরে দারুণ ভিড়।

নবীনকুমার বললো, তেনাকে দেকতে কেমন ?

দুলাল প্রথমে বললো, দেকলে ভয় করে।

তারপরই আবার বললো, ভক্তিও হয়। আমি পেন্নাম করিচি, দূর থেকে।

নবীনকুমার ধমকে বললো, তোর ভয় করে না ভক্তি হয়, সে কতা কে জানতে চাইচে ? বলচি যে লোকটার চেহারা কেমন ?

দুলাল বললো, ইয়া মোটা। সারা গায় মাটি ল্যাপা, তার ওপর ঘাস ঘাস মতন দেকলুম বটে, কিন্তু বট অশ্বত্থ গাছ দেকিনি। মাতায় দুটো অজগর সাপের মতন জটা, বুকের ওপর পড়ে আচে। চোক বোঁজা।

এমন মানুষকে স্বচক্ষে না দেখলে চলে না। এত লোকের ভিড় যখন, তখন এর মধ্যে মিশে গেলে কেউ তাকে চিনবে না। কৌতূহল সামলাতে না পেরে নবীনকুমার নেমে পড়লো গাড়ি থেকে।

বয়সের তুলনায়ও নবীনকুমারের শরীরটি ছোটখাটো, রোগা পাতলা। কিন্তু কুচোনো ধুতি, হলুদ রঙের রেশমী বেনিয়ান ও কাঁধে চীনা সিল্কের চাদর ও পায়ে চকচকে পালিশ করা কালো পাম্প শু—এবং তার মুখের গাম্ভীর্য ও ধীর পদক্ষেপ দেখে কোনো রাশভারী ব্যক্তি বলে ভ্রম হয়। এবং তার দৃষ্টি অত্যুজ্জ্বল।

দর্শনার্থীদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যাই বেশী। অবিদ্যা, ঘুসকি ও গেরস্ত মেয়েদের ভিড় ঠেলে নবীনকুমার গিয়ে দাঁড়ালো একেবারে সামনে। মহাপুরুষের মূর্তি দেখলে সত্যিই প্রথমটায় বুক কেঁপে ওঠে। মনে হয় মানুষ না যেন ছোটখাটো একটি পাহাড়। চার পাশের লোক গুঞ্জন করে নানা কথা বলছে। দশদিন ধরে উনি এখানে আছেন, এর মধ্যে একবারও ওঠেননি, মলমূত্র ত্যাগ করেননি, কিছু খাননি, এমনকি চোখও খোলেননি। রাজবাড়ির লোকেরা ওঁকে পরীক্ষা করবার জন্য প্রথমে দু-একদিন কানের কাছে ঢাকঢোল বাজিয়েছেন, তবু কোনো সাড় দেখা যায়নি ওঁর শরীরে। এখন আর সে চেষ্টা কেউ করে না। উনি নাকি চোখ খুললেই সবাই ভস্ম হয়ে যাবে। সবাই ওঁর পায়ের কাছে টিপ টিপ করে প্রণাম করছে আর ছুঁড়ে দিচ্ছে পয়সা।

বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না ভিড়ের চাপে। নবীনকুমার আর দুলালচন্দ্র আস্তে আস্তে সরে এলো সেখান থেকে। এর মধ্যে আরও অনেক খবর শোনা গেল। মহাপুরুষের গায়ের যে মাটির প্রলেপ, তা কেমন ভেজা ভেজা। দশদিন ধরে মাটি ওরকম ভেজা ভেজাই রয়েছে। গঙ্গার ধারে উনি মাটি ফুঁড়ে উঠেছেন, সেইজন্যই ওঁর গায়ে ভিজে গঙ্গামাটি।

ফেরার পথে নবীনকুমারের ওষ্ঠে মৃদু হাস্য লেগে রইলো। মহাপুরুষকে দেখে সে বেশ মজা পেয়েছে। বাড়ি ফিরেই সে কৃষ্ণভামিনীকে মহাপুরুষ দর্শনের অভিজ্ঞতা শোনাবার জন্য তাকে খুঁজতে গিয়ে দেখলো, কৃষ্ণভামিনী বসে আছে তার মায়ের কক্ষে। সেখানে তার জ্যেঠাইমা হেমাঙ্গিনী ও আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক বসে গল্প করছিলেন। সবাই, নবীনকুমারকে দেখে নিজেদের কথা থামিয়ে বললো, আয় এখেনে বোস, কী দেকলি ? কেমন দেকলি ?

নবীনকুমার মহাপুরুষের চেহারার বর্ণনা দিয়ে বললো, এমন কতা কখনো শুনোচো যে দশদিন ধরে চোক খোলে না, পেচ্ছাপ বাহ্যি যায় না ?

মহিলারা চোখ কপালে তুলে বললো, ওমা তাই নাকি ? ইনি তো তা হলে খুব বড় মহাপুরুষ রে ! দশদিন চোক খোলে না !

হেমাঙ্গিনী বললেন, দশদিন কি গো ! শহরের লোকে তো দেকচে মোটে দশ দিন, মাটির নীচে কতদিন চোক বুঁজে আছেন তা কে জানে ! ওনারা সব পারেন।

নবীনকুমার বললো, দিনের পর দিন না খেলে মানুষ বাঁচে ?

বিম্ববতী বললেন, পুণ্যাত্মাদের খাওয়া লাগে না। ওঁয়ারা তো আর সাধারণ মানুষ নন।

নবীনকুমার বললো, আমার কী ইচ্ছে হচ্ছিল, জানো মা ? ওঁর কানের পাশে তো অনেক ঢাক-ঢোল বাজানো হয়েছেল, একবার ওনার নাকের কাচে একটু নস্যি দিয়ে দেকলে কেমন হতো ?

মহিলারা সমস্বরে বলে উঠলো, ছি ছি ছি, ও কতা বলতে নেই, ছোটকু ! অমন কতা শুনলেও পাপ ! মহাপুরুষদের কক্ষনো পরীক্ষা করেও দেকতে নেই।

হেমাঙ্গিনী বললেন, আমার বাপের বাড়িতে আমার সম্পর্কে এক পিসেমশাই একবার অমনি একজন মহাপুরুষ দেকেচিলেন। আমার পিসেমশাই নৌকোয় কাশী যাচ্ছিলেন, গঙ্গার ধারে জঙ্গলের মধ্যে দেকলেন একজন ওরম মহাপুরুষ ধ্যানে অচৈতন্য হয়ে বসে আচেন। মাঝিরা তা দেখে বললো, বাবু, এ জঙ্গলে বড় বাঘ, এ সাধুরে তো আজই বাঘে খেয়ে ফেলবে। মাঝিরা ধরাধরি করে মহাপুরুষকে নৌকোয় তুলে আনলো। তিনি নৌকোয় বসে রইলেন পাতরের মূর্তির মতন। তখনকার দিনে ছাপঘাটির মোহনায় জল থাকতো না বলে কাশীর যাত্রীরা বাদা বনের ভিতর দিয়ে যাওয়া আসা কত্তেন, একদিন আমাদের সেই পিসেমশাইয়ের নৌকো বাদাবনের মধ্যি দিয়ে মাঝিরা গুণ টেনে নিয়ে আসচে, মাঝি আর অন্য লোকেরা হঠাৎ দেকলো কি, জলের ধারে ঠিক ঐরকম একজন মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে আচেন। দু'জনার চেহারা ঠিক এক রকম। এদিকে এ মহাপুরুষ তো নৌকোর গলুইয়ে তেমনি একই ভাবে ধ্যানে বসিচিলেন, ড্যাঙ্গার মহাপুরুষকে যেই মাঝিরা দেকলো, অমনি উনি চোক মেলে চাইলেন। এরই মধ্যে ড্যাঙ্গার মহাপুরুষ হাসতে হাসতে নৌকোর ওপরে এসে নৌকোর মহাপুরুষকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করালেন, তারপর দু'জনায় তেমনি হাসতে হাসতে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন, আর তেনাদের দেকতে পাওয়া গেল না।

অন্য নারীরা বললো, বলো কি গো, দিদি ! এ যে মহা আশ্চর্যি কথা !

হেমাঙ্গিনী বললেন, এই দ্যাকো না, তোমাদের বললুম তো, অমনি আমার লোমাঞ্চ হচ্ছে, গা কাঁপচে। এনারা সব সে-কালের মুনি ঋষি, কেউ দশ হাজার, কেউ বিশ হাজার বছর ধরে তপিস্যে কচ্চেন, এঁরা মনে কল্লে সব কত্তে পারেন !

অন্য আর একজন স্ত্রীলোক বললেন, আমিও এরকম একজনের কথা শুনিচিলুম। একবার ঝিলিপুরের দত্তরা সোঁদরবন আবাদ কত্তে কত্তে ত্রিশ হাত মাটির ভিতরে এক মহাপুরুষকে দেকেছেলেন। তাঁর শরীর শুকিয়ে চ্যালাকাট হয়ে গ্যাচে আর গা থেকে বেরিয়েছে বড় বড় শেকড়। দত্তরা অনেক করে সেই মহাপুরুষকে নিয়ে এলেন ঝিলিপুরে, সেখানে তিনি এক মাস থাকলেন, তারপর হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হয়ে গ্যালেন।

বিম্ববতী বললেন, এঁরা যখন ইচ্ছে করেন দ্যাকা দ্যান আবার যখন ইচ্ছে করেন সংসার ছেড়ে চলে যান।

হেমাঙ্গিনী বললেন, ভূকৈলেশের রাজাদের কত ভাগ্য, তাদের বাড়িতে ইনি দেকা দিয়েচেন, কবে আবার চলে যাবেন ঠিক কি ! হ্যা লা, আমরা একবার দেকতে যাই না !

নবীনকুমার বললো, জ্যাঠাইমা, তোমরা সেখানে যেতে পারবে না, বড্ড পাঁচপেঁচি ধরনের লোকের ভিড় সেখানে।

পরদিন বিম্ববতী বাড়ির একজন ভৃত্যকে পাঠিয়ে মহাপুরুষের পায়ের ধুলো আনালেন খানিকটা। তা দুটো মাদুলিতে ভরে একটা বেঁধে দিলেন নবীনকুমারের বাহুতে, আর একটা রেখে দিলেন গঙ্গানারায়ণের জন্য। মহাপুরুষদের পূত রজঃ অঙ্গে রাখলে সন্তানদের সব বিপদ কেটে যাবে।

মায়ের অনুরোধ একেবারে ফেলতে পারলো না নবীনকুমার। তবে সেই জয়ঢাকের মতন মাদুলিটা প্রায়ই সে খুলে নিয়ে লোফালুফি খেলা করে। মায়ের সামনে আবার ঠিকঠাক করে নেয়।

মহাপুরুষের নানা রকম অলৌকিক গুণাবলীর কথা কয়েকদিন ধরে খুব বাজার সরগরম করে রেখে আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে এলো। তারপর একদিন স্কুলের টিফিনে নবীনকুমার গোলদিঘিতে তার বন্ধুদের সঙ্গে ফড়িং ধরে খেলা করছে, এমন সময় ওদের ক্লাসের পণ্ডিতমশাই এলেন মাঠের মধ্যে। এই পণ্ডিতমশাই এক সময় এক বড়মানুষের বাড়িতে রাঁধুনী বামুন ছিলেন, এখন এডুকেশান কাউনসিলে সুপারিশের জোরে পণ্ডিত হয়েছেন। ইনি পান খেতে খুব ভালোবাসেন, তাই এঁর হাতে

যাতে কানমলা খেতে না হয় তাই ছেলেরা এঁকে দেখামাত্র পান কিনে দেয়। সবাই হুড়মুড়িয়ে দৌড়ে গিয়ে পান কিনে আনলো।

খুসী হয়ে পণ্ডিত বললেন, ওরে নবীন, ভূকৈলেশের সেই মহাপুরুষের কথা শুনিচিস ? সে এক কাণ্ড হয়েচে !

কী হয়েচে, কী হয়েচে বলে সবাই পণ্ডিতকে ছেঁকে ধরলো।

তিনি বললেন, মহাপুরুষের নানা রকম কেরামতির কথা শুনে এক সাহেব গিয়েছিলেন তেনাকে পরীক্ষে করতে। বাবা, সাহেবদের কাচে অত জারিজুরি খাটে না। ভূকৈলেশের রাজারা নাকি মহাপুরুষের গায়ে গুল পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়েছিলেন, জলে ডুবিয়ে রেখেছিলেন, তাতেও কিছু হয়নি; কিন্তু সাহেব সেই মহাপুরুষের নাকের কাছে কী একটা আরক যেই একটু ধরলেন, অমনি মহাপুরুষ সাতবার হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করে উঠলো আর চোখ মেলেই সাহেব দেখে কেঁদে বললো, ওরে বাপা, গারোদে দিওনি ! গারোদে দিওনি !

নবীনকুমার আনন্দে ফেটে পড়ে লাফাতে লাফাতে বললো, নস্যি ! নস্যি ! আমি আগেই জানতুম !

পণ্ডিতমশাই বললেন, ভূকৈলেশের রাজারা তো ক্ষেপে আগুন ! এতদিন কত মানী গুণী লোক ঐ বুজরুগটার পায়ের ধুলো নিয়েচে। তাই রাজারা এখন ঐ ব্যাটাকে দিয়ে নিজেদের পা টেপাচ্ছেন।

নবীনকুমার হেসে গড়াগড়ি দিল মাটিতে। তারপর হাতের মাদুলিটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিল জলে।

কৌতুক ও কৌতূহলের জন্য নবীনকুমার প্রায়ই এরকম নানা রকম অভিযানে বেরোয়। ইতিমধ্যেই তার একটা নিজস্ব মতামত তৈরী হয়েছে, সে আর অন্য কারুর কথা যাচাই না করে মেনে নেয় না।

ক্লাসের মধ্যে নবীনকুমারের দুরন্তপনা দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। পড়াশুনোয় একেবারেই মন নেই। প্রত্যেকটি শিক্ষক তাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। অথচ সবাই জানেন, এ ছেলে একটু মন দিয়ে পড়লে সবার সেরা হতে পারতো, এমন স্মৃতিশক্তি খুব কম ছাত্রেরই দেখা যায়। কিন্তু সে পড়বে না।

একদিন একজন শিক্ষক মন দিয়ে পড়াচ্ছেন, সারা ক্লাস স্তব্ধ, এমন সময় হঠাৎ নবীনকুমার দুম করে তার এক সহপাঠীর পিঠে এক কিল বসিয়ে দিল সম্পূর্ণ বিনা কারণে। ছেলেটি আর্তনাদ করে তখুনি উঠে দাঁড়িয়ে নালিশ জানালো শিক্ষকের কাছে। শিক্ষক মহাশয় আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না, দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, স্ট্যাণ্ড আপ অন দা বেঞ্চ ! ইউ ! স্ট্যাণ্ড আপ অন দা বেঞ্চ !

নবীনকুমার হাসতে হাসতে বেঞ্চের ওপরে উঠে দাঁড়ালো।

শিক্ষক বললেন, কান ধরো। সর্বক্ষণ কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কার কান ধরবো স্যার ?

সারা ক্লাস ফেটে পড়লো হাসিতে।

শিক্ষকমশাই ডায়াস থেকে নেমে এগিয়ে এলেন নবীনকুমারের কাছে। ব্যথাময় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এমন করো বলো তো ? কেন ওকে মারলে ?

নবীনকুমার সগর্বে উত্তর দিল, মহাশয়, আমি সিংহ সন্তান। জাত-স্বভাব তো ছাড়তে পারি না !

একদিন কলেজ থেকে ফিরে নবীনকুমার দেখলো তার শয়নকক্ষে তার পত্নী কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে আর একটি বালিকা বসে খেলা করছে। দুজনেই সমবয়সিনী, দুজনেই রেশমী শাড়ি ও হাত ভর্তি সোনার চুড়ি পরিহিতা দুটি পুত্তলিকার মতন। ওরা খেলাও করছে কাচকড়ার বিলাতি পুতুল নিয়ে।

নবীনকুমার ঘরে ঢুকতেই মেয়েটি মাথায় ঘোমটা টেনে পিছন ফিরে বসলো।

নবীনকুমার কৃষ্ণভামিনীকে জিজ্ঞেস করলো, এ মেয়েটি কে গা ?

কৃষ্ণভামিনী বললো, ও তো আমার মিতেনী, আমাদের বে'র সময় ওকে দ্যাকেননি ? সব সময়ই তো আমার পাশে ঠায় বসেছেল !

বাসরঘরে এক সঙ্গে অনেক মেয়েই উপস্থিত থাকে বলে কারুকেই ঠিক মত দেখা যায় না। এই

মেয়েটিকেও নবীনকুমারের মনে নেই।

সে আবার জিজ্ঞেস করলো, তোমার মিতেনী ? আমাদের এ পাড়ায় আবার তোমার মিতেনী কী করে হলো ?

কৃষ্ণভামিনী বললো, এ পাড়ার কে বললো ? ওর বে হয়েচে হাটখোলায়, আমার ঠিক এক মাস পরে। ওদের বাড়ির পালকিতে আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে এয়েচে।

তারপর সে তার সখীকে বললো, আমার বরকে দেকে অত লজ্জা কিসের লা ? তোর বরকে দেকে কি আমি ঘোমটা দিই ?

মেয়েটি তবু যেন লজ্জায় একেবারে নুয়ে পড়েছে। কৃষ্ণভামিনী জোর করে তার ঘোমটা খুলে দিলো। মেয়েটির মুখখানি ফুটফুটে, অপরূপ সুন্দরী যাকে বলে। কৃষ্ণভামিনীও খুব ফর্সা, কিন্তু এ মেয়েটির রং যেন গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতন, চোখের মণি দুটিতে নীলবর্ণ আভা।

কাঁধের উড়ুনিটা শয্যার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে নবীনকুমারও বসে পড়লো ওদের পাশে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, এই মিতেনীটির নাম কি গো ?

কৃষ্ণভামিনী তার সখীর গায়ে খোঁচা মেরে বললো, এই, নাম বল না !

মেয়েটি এখনো লজ্জা-কুণ্ঠিতা, মুখ খুলবে না। দু-তিনবার সাধাসাধিতেও সে নাম বললো না। কৃষ্ণভামিনী বললো, কী জানি ছাই, আমি ওর নাম ভুলেই গেচি ! মিতেনী বলেই তো ডাকি ! ও, মনে পড়েচে, মনে পড়েচে ! কুসোম ! তোর নাম কুসোম না রে ?

মেয়েটি এবার অস্ফুট গলায় বললো, আমার নাম কুসুমকুমারী !

নবীনকুমার বললো, এঃ ! কুসুমকুমারী ! পচা নাম ! একদম মানায়নিকো !

বলেই সে হেসে উঠলো হা-হা করে।

কৃষ্ণভামিনীর মনে হলো, তার সখীকে বুঝি যথোচিত সম্মান জানানো হচ্ছে না। সে রেগে গিয়ে বললো, পচা নাম ! কে বলেচে আপনাকে ? সবাই বলে আমার মিতেনীর নাম আমার চেয়েও সোন্দর !

নবীনকুমার বললো, এ তো কেষ্টযাত্রার সখীদের এরকম নাম হয়। কুসুমকুমারী, অবলাবালা, বিধুমুখী !

কৃষ্ণভামিনী চক্ষু কপালে তুলে বললো, ও মা ! আমার পিসীমার নাম বিধুমুখী ! সেটা বুঝি খারাপ নাম ?

কুসুমকুমারী শাড়ির আঁচল গুছিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দু'দিকে ঘাড় নেড়ে বললো, আমি ভাই এবার যাই ? বেলা পড়ে এলো, মা এবার পুজোয় বসবেন।

নবীনকুমার তার হাত ধরে টেনে আবার বসিয়ে দিয়ে বললো, অমনি বুঝি রাগ হলো মিতেনীর। আমি তোমায় একটা সুন্দর নাম দিয়ে দিচ্চি !

কৃষ্ণভামিনী বললো, আপনি আপনার মায়ের সঙ্গে দেকা করে আসুন না। আমরা এখন এ ঘরে খেলচি, আমার ছেলের সঙ্গে ওর মেয়ের এখুনি বে হবে !

নবীনকুমার বললো, আমিও খেলবো ! আমায় তোমরা খেলায় নেবে না কেন ?

নবীনকুমার বাল্যকাল থেকেই দুলালের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রের লড়াই, তেপান্তরের মাঠ, ভূত আমার পুত, নৃসিংহ অবতার—এই সব খেলা খেলতো। বিবাহের পর কৃষ্ণভামিনী পিত্রালয় থেকে তার সমস্ত মেয়েলি খেলনা সঙ্গে নিয়ে এসেছে, সে একা একাই সেগুলি নিয়ে খেলতে বসতো, তা দেখে নবীনকুমারও যোগ দিয়েছে সে খেলায়। পুতুলের সংসার নিয়ে খেলা করতে সে আমোদ পেতে শুরু করেছে ইদানীং।

কুসুমকুমারী বললো, ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে আমাদের খেলতে নেই। তা হলে আমার মা রাগ করবেন।

নবীনকুমার অমনি বললো, বেশ তো, আমি মেয়েমানুষ হয়ে যাচ্চি। দেকবে, দেকবে, আমি কেমন মেয়েমানুষ হতে পারি !

পালঙ্কের মাথায় কৃষ্ণভামিনীর একটা শাড়ি ঝুলছিল, সেটা ফস করে টেনে নিয়ে নবীনকুমার শরীরে জড়িয়ে ফেললো, তারপর বাম হাতের কড়ে আঙুলটি মুখে পুরে, ঘাড় বেঁকিয়ে হেলে দুলে হেঁটে, কণ্ঠস্বর বদলে ফেলে বললো, হ্যাঁ গা মিতেনী, তুমি রাগ করেচো আমার ওপর !

বাল্যকাল থেকেই নবীনকুমার অনুকরণপটু, তার ভাবভঙ্গি অবিকল কোনো স্ত্রীলোকের মতনই দেখায়।

কৃষ্ণভামিনী বললো, ঢং! কত ঢংই যে আপনি কত্তে পারেন!

কুসুমকুমারী কিন্তু ফিক করে হেসে ফেললো।

নবীনকুমার সেই স্ত্রী সাজেই ওদের পাশে বসে পড়ে বললো, এই তো মুখে হাসি ফুটেচে। এবার থেকে ভাই আমরা তিনজনে মিলে খেলবো বেশ! তার আগে মিতেনীর একটা নাম দিয়ে দিই? তোমার নাম বনজ্যোৎস্না!

কৃষ্ণভামিনী বললো, ওমা, ও আবার কী নামের ছিরি! বনজোচ্ছনা! মেয়েমানুষের এমন নাম হয় সাতজম্মে শুনিনিকো।

নবীনকুমার বললো, তোমার সাত সাততে উনপঞ্চাশ জন্ম আগে এমন নাম হতো। কি গো, মিতেনী, তোমার পছন্দ হয়নি!

কুসুমকুমারী বললো, এ তো একটা লতানে ফুল গাচের নাম! মেয়েমানুষের নাম কেন হবে!

নবীনকুমার এবার সত্যিকারের বিস্ময়ে ভুরু উত্তোলিত করে বললো, ওমা, তুমি জানো? কী করে জানলে?

কুসুমকুমারী বললো, সেই যে শকুন্তলা বলে একটা গল্প আছে না? সেই গল্পের মধ্যে শুনিচি!

—সে গল্প তুমি কোতায় শুনলে?

—পোনমশাই আমার দাদাদের পড়াতেন, তখন আমি পাশে বসে থাকতাম। গল্পটা খুব দুঃখের।

নবীনকুমার তার স্ত্রী কৃষ্ণভামিনীর দিকে তাকিয়ে বললো, দেকোচো, তোমার মিতেনী তোমার চে কত বেশী জানে!

কৃষ্ণভামিনী বললো, আমার কি একটাও দাদা আচে নাকি যে পণ্ডিতমশাই এসে বাড়িতে পড়াবে?

নবীনকুমার কুসুমকুমারীকে বললো, শোনো ভাই, মিতেনী, তোমাকে তো একটা লতানে ফুল গাচের মতনই দেকতে, তাই তোমার বাপ মা তোমার নাম দিয়েছিলেন কুসুমকুমারী। আমি নাম দিলাম বনজ্যোৎস্না। একই তো!

কৃষ্ণভামিনী বললো, শুধু কতাই হবে, খেলা হবে না বুঝি?

নবীনকুমার বললো, হ্যাঁ, এবার খেলা হোক। তোমাদের ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবে তো! তা ছেলেমেয়ের কী নাম রেকোচো?

দুই সখী মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। নামের কথা তাদের মনে আসেনি।

নবীনকুমার বললো, তা হলে মেয়েটার নাম শকুন্তলা, আর ছেলের নাম দুশমন!

কুসুমকুমারী বললো, না ভাই, আমি খেলবো না! তোর বর বড্ড খারাপ খারাপ কতা বলচে! দুশমন নাকি, রাজার নাম তো ছিল দুষ্মন্ত।

নবীনকুমার হাসতে হাসতে বললো, তোমার তাও মনে আচে? আচ্ছা বেশ, দুষ্মন্তই হলো।

কুসুমকুমারী বললো, না। ও নাম আমি দেবো না। ওটা বড্ড দুঃখের গল্প, আমি জানি।

নবীনকুমার বললো, শেষকালে সুখ আচে।

কৃষ্ণভামিনী আর একটি পুতুল বার করে বললো, উনি বড় বিরক্ত কচ্চেন রে, তাড়াতাড়ি বে দিয়ে দে, এই হলো গে পুরুতমশাই।

নবীনকুমার বললো, এ বিয়েতে পুরুত লাগবে না। এ তো বনের মধ্যে বিয়ে, ওরা নিজেরা নিজেরাই বিয়ে করবে।

কৃষ্ণভামিনী বললো, অমন বিচ্ছিরি বে আমি দেবো না!

নবীনকুমার এরপর সেই খেলায় এমন মত্ত হয়ে গেল যে এখন কে বলবে এই সেই হিন্দু কলেজের অতি দুরন্ত ছাত্র। সে কখনো পুরুষ, কখনো নারীর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর মুখে সংলাপ বসাতে লাগলো। কৃষ্ণভামিনী সন্দেশ এনে রেখেছিল, বিয়ের শেষে পরিবেশন করা হবে বলে, নবীনকুমার আগেই সেই সন্দেশ কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি দিতে লাগলো মাটিতে।

খেলা শেষ হয়ে গেছে, এবার যেতে হবে কুসুমকুমারীকে। তার সঙ্গে এসেছে দুটি দাসী ও চার বেহারার পাল্কী। গোধূলিতে আকাশ ম্লান হয়ে এসেছে, এখুনি অন্ধকার হয়ে যাবে বলে নবীনকুমার সে পালকির সঙ্গে দুজন পাইক পাঠিয়ে দিল। বিদায় দেবার আগে কৃষ্ণভামিনী তার সখীর কাঁধ জড়িয়ে

ধরে বললো, আবার কবে আসবি বল ? কাল ? পশ্যু ?

কুসুমকুমারী বললো, আহা—হা, আমিই বার বার আসতে গেলুম রে ! তুই বুঝি যেতে পারিস না ?

কৃষ্ণভামিনী তার স্বামীর দিকে তাকালো।

নবীনকুমার বললো, যাবে না কেন, নিশ্চয়ই যাবে। তা মিতেনী, আমায় যেতে বললে না যে ? আমি বুঝি তোমার মিতে নয় ?

কুসুমকুমারী তার সারল্যমাখা নীলবর্ণ চোখ দুটি তুলে নবীনকুমারকে একবার অপাঙ্গে দেখলো শুধু। কোনো উত্তর দিল না। তার কোলে দুটি পুতুল, মেয়ে-জামাইকে সে নিজের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। কোনোক্রমে পুতুল দুটিকে সামলে সে উঠে পড়লো পালকিতে।

কুসুমকুমারী তার সখী কৃষ্ণভামিনীর চেয়ে বয়েসে একটু বড়, তার বয়েস এখন সাড়ে দশ, আর কৃষ্ণভামিনীর নয় ছুঁই ছুঁই। তাদের দুজনেরই পিত্রালয় বাগবাজারে পাশাপাশি গৃহে। দুজনে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে। এ দুই বালিকা পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে এখনো অভ্যস্ত হয়নি। কৃষ্ণভামিনী বাপের বাড়িতে যাওয়ার বেশী সুযোগ পায়, তবু পালা-পার্বণে যখন দু-একদিনের জন্য যাওয়া হয়, তখন খবর পেয়ে কুসুমকুমারীও চলে আসে বাগবাজারে, দুজনে প্রায় সর্বক্ষণ একসঙ্গে কাটায়।

কুসুমকুমারীর স্বামী অঘোরনাথ, নবীনকুমারের চেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠ। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর সে নাকি ব্রাহ্ম হতে গিয়েছিল, ঠিক সময়ে সে খবর পেয়ে তার মা গলার সামনে একটি বড় আঁশ বটি ধরে বলেছিলেন, আমার কথা শুনবিনি, তুই জোর করে যাবি ? তো যা, ফিরে এসে আমার মরা মুখ দেকবি !

মাতৃহন্তা হতে হবে বলেই অঘোরনাথ শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্ম হয়নি কিন্তু সেই সময় থেকেই নাকি সর্বক্ষণ সে বিষণ্ণ উদাসীন হয়ে দিন কাটায়। সে তাদের পৈতৃক জমিদারি কার্য দেখে না, কলকাতায় তাদের নিজস্ব হৌসেও যায় না। দ্বিতীয় বিবাহের পরও তার মানসিক ক্লৈব্য কাটেনি।

পত্নীর কাছ থেকে এই সব তথ্য জানলো নবীনকুমার। ব্রাহ্মদের সম্পর্কে তার সঠিক কোনো ধারণা এখনো গড়ে ওঠেনি। ব্রাহ্ম শুনলেই তার মনে পড়ে কিছু দাড়িওয়ালা গম্ভীর গম্ভীর মানুষ, যারা কদাচ হাসে না, এবং অনেকেই রূপোর ফ্রেমের চশমা চোখে দেয়। কুসুমকুমারীর স্বামী সে রকম মানুষ ?

কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে ওপরে উঠে এসে নবীনকুমার বললো, তোমার যদি ছেলে হয় আর তোমার মিতেনীর যদি মেয়ে হয়, তা হলে তোমাদের ছেলেমেয়ের সত্যিকারের বিয়ে হলে বেশ হয়, তাই না ?

কৃষ্ণভামিনী একটুও লজ্জিত না হয়ে বললো, আমি তো তাই ঠিক করে রেখিচি !

নবীনকুমার আড়চোখে তার বালিকা বধূর মুখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণভাবে নজর করে দেখলো। একটি বিষয়ে নবীনকুমারের মনে খটকা আছে। সে জানে যে বিবাহিত নারী পুরুষদেরই শুধু সন্তানাদি হয়। যাদের বিবাহ হয়নি কিংবা যে স্ত্রীলোকেরা বিধবা এবং যে পুরুষরা একা থাকে, তাদের কখনো পুত্র কন্যা হয় না। কিন্তু বিবাহের পর ঠিক কখন, কীভাবে এবং কেন পুত্র কন্যা জন্মায়, সে সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা নেই। প্রায়ই সে এই কৌতূহলে ছটফট করে কিন্তু কারুকেই জিজ্ঞেস করতে পারে না। সে যে-সব কেতাব পড়েছে, তার মধ্যেও এর কোনো উত্তর নেই। কলেজে ভর্তি হবার পর নবীনকুমারের মধ্যে একটা সবজান্তা ভাব এসেছে, কিন্তু এই একটি বিষয়ে অজ্ঞতা তাকে পীড়া দেয়। কৃষ্ণভামিনী তার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট হলেও এ ব্যাপারটা জানে নাকি ?

লজ্জাবশত এ কথাটি সে নিজের স্ত্রীকেও জিজ্ঞেস করতে পারলো না।

কৃষ্ণভামিনী শয়ন কক্ষে ঢুকে মন দিয়ে তার পুতুলের সংসার গুছোতে লাগলো। এর মধ্যে একটি পুতুল পাওয়া যাচ্ছে না, সেটি কুসুমকুমারীরও নিয়ে যাওয়ার কথা নয়। এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজির পরও সেটি না পেয়ে সে নবীনকুমাকে চেপে ধরে বললো, আপনি নিশ্চয়ই নুকিয়েচেন ! আমার পুতুল কোতায় ?

নবীনকুমার নিরীহ মুখ করে বললো, কই, আমি তো দেকিনি।

কৃষ্ণভামিনী বললো, তা হলে কোতায় গেল ? ওটা আমার মা কালীঘাট থেকে কিনে এনেছেলেন, ঐ পুতুলটা সবচে ভালো।

নবীনকুমার বললো, তা হলে বোধ হয় তোমার মিতেনীর খুব পছন্দ হয়েচে, সেই সেটা চুরি করে নিয়ে গ্যাচে !

কী, আপনি আমার মিতেনীকে চোর বললেন ? এ কথা বলেই কৃষ্ণভামিনী সপাটে এক চড় কষিয়ে দিল নবীনকুমারের গালে।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থেকেই নবীনকুমার লাফিয়ে গিয়ে কৃষ্ণভামিনীর চুলের মুঠি চেপে ধরলো এবং কণ্ঠস্বর বিকট করে বললো, রে রে, হতভাগিনী তোর এ দুর্মতি ! আজ তোরে নরকে পাঠাইব ! পরনিন্দা, অতি লোভ, স্বামী প্রহরণ, যেই নারী করে তার নরকে গমন !

খানিকক্ষণ ঝটাপটি করার পর কৃষ্ণভামিনী নবীনকুমারের পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলো। হঠাৎ রাগ হলে তার মাথার ঠিক থাকে না। কিন্তু স্বামীর গায়ে হাত তোলা যে মহা পাপ, তা সে জানে। নবীনকুমারের কাছে অবশ্য এ সবই কৌতুক। সারা দিনের প্রতিটি ঘটনা থেকেই সে মজার উপাদান খোঁজে। কৃষ্ণভামিনী ক্ষমা চাইবার পর সে জাজিমের তলা থেকে বার করে দিল লুকোনো পুতুলটি।

এই দুই কিশোর-বালিকার খুনসুটি, বিবাদ ও রাগ ছাড়া এই অট্টালিকার দ্বিতল সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। আর কোনো কক্ষে প্রাণের সাড়া নেই। বিম্ববতী পুত্রশোকে শয্যা নিয়েছেন।

ইব্রাহিমপুর থেকে বেশ কিছুদিন আগে ফিরে এসেছে বজরা। বৃদ্ধ খাজাঞ্চি সেনমশাই অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে সব কথা জানিয়েছেন বিম্ববতীকে। গঙ্গানারায়ণের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। সেনমশাই তার তল্লাশে লোক পাঠিয়েছিলেন নানা দিকে, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ যেন কর্পূরের মত মিলিয়ে গেছে শূন্যে। গঙ্গানারায়ণকে বজরা থেকে বলপ্রয়োগ করে কেড়ে নিয়ে যাওয়া কারুর পক্ষে সম্ভব ছিল না, প্রহরীরা সে রকম একটি শব্দও শোনেনি। স্বেচ্ছায় সে রাত্রিবেলা বজরা ছেড়ে চলে যাবে, এও যে বড় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সে বজরার মালিক, তার হুকুমেই বজরা যেখানে খুশী যেতে পারে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে যদি তার সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা না থাকতো, তবে সে রাত্রেই তো নোঙর তুলে কলকাতার অভিমুখে রওনা হওয়া যেত। এমনকি একথা সেনমশাই অনেকবার বলেও ছিলেন গঙ্গানারায়ণকে। গঙ্গানারায়ণ এক বস্ত্রে চলে গেছে। এ বড় বিচিত্র ঘটনা, এমনটি আর কখনো শোনা যায়নি। গঙ্গানারায়ণ নিরুদ্দিষ্ট বা মৃত। মৃত বলেই বেশী সন্দেহ হয়।

নবীনকুমারের জন্মের পর থেকে গঙ্গানারায়ণের প্রতি বিম্ববতীর মনোযোগ অনেক কমে গিয়েছিল। কিন্তু এক সময় গঙ্গানারায়ণও তো ছিল তাঁর অতি আদরের। এখন নবীনকুমারও তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। গঙ্গানারায়ণের সংবাদ শুনে বিম্ববতীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হয়েছিল, প্রথম পুত্রের প্রতি তাঁর সমস্ত স্নেহ ভালোবাসা ফিরে এলো শোক ও পরিতাপ হয়ে। গঙ্গানারায়ণ তাঁর আপন গর্ভের সন্তান নয়, তবু তার প্রতি বিম্ববতীর নাড়ির টান আছে যে সে কথা বিম্ববতী আবার অনুভব করলেন।

বিম্ববতী কয়েকদিন কেঁদে ভাসালেন। জনে জনে অনুরোধ করলেন, যত টাকাই লাগুক, গঙ্গানারায়ণের সন্ধানে আবার সারা দেশ তোলপাড় করে খুঁজে দেখা হোক। কিন্তু কারুরই গরজ নেই সে ব্যাপারে। বিধুশেখর তাঁর মন থেকে গঙ্গানারায়ণকে মুছে ফেলতে চান। কর্মচারীরা শুধু টাকা খায়, কাজের কাজ কিছুই করে না।

অগ্রজের নিরুদ্দেশের সংবাদে নবীনকুমার খানিকটা বিস্মিত হয়েছিল বটে, কিন্তু খুব বেশী তাপ উত্তাপ বোধ করেনি। দাদা বজরা ছেড়ে কোথাও চলে গেছে, আবার নিশ্চয়ই একদিন ফিরে আসবে।

গঙ্গানারায়ণের পত্নী লীলাবতী প্রথমে সংবাদ শুনে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। তারপর সে আর একদিনও এ বাড়িতে থাকতে চায়নি। তাকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক মাসের মধ্যেই যেন গঙ্গানারায়ণকে সবাই বিস্মৃত হয়ে গেল। তার কক্ষটি তালাবন্ধ, সারা বাড়িতে আর কোথাও তার কোনো চিহ্ন নেই। সাতাশ বছর যে এ গৃহে কাটিয়েছে, এক বৎসরের মধ্যে সে মুছে গেল। শুধু বিম্ববতী একা একা অশ্রুপাত করে বালিশ ভিজিয়ে দেন।

নবীনকুমারের যখন যে ঝোঁক চাপে, তখন সেটি নিয়ে মেতে ওঠে। একবার যেমন নীচতলা থেকে একটা ফুটফুটে সাদা বেড়াল একদিন উঠে এসেছিল ওপরে। বেড়ালটি দেখে তার এমন পছন্দ হলো যে তাকে সে সেদিন থেকে পুষতে লাগলো। বেড়ালটির নাম রেখেছিল মুঞ্জুরী। পোষা মানে কি, সর্বক্ষণ বেড়ালটিকে তার সঙ্গে রাখা চাই। তার খিদমদগার দুলাল পাহারা দিত, যেন মুঞ্জুরী আর কোনোক্রমেই নীচতলায় যেতে না পারে। মুঞ্জুরী দু-তিন বার অকারণে ম্যাও ম্যাও করলেই নবীনকুমারের সন্দেহ হতো ওর খিদে পেয়েছে আর দুলাল নিশ্চয়ই ওর বরাদ্দ দুধ চুরি করে খেয়েছে। সেই উপলক্ষে এক ডজন কানমলা পাওনা হতো দুলালের। রাত্রেও মুঞ্জুরীকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে থাকতো নবীনকুমার।

মুঞ্জুরী বেড়াল ছিল না, বেড়ালী। অত সংরক্ষণ সত্ত্বেও সে কোন্ ফাঁকে অভিসারে চলে যেত, তা জানা যায় না, একদিন দেখা গেল সে গর্ভবতী। তখন নবীনকুমার বিম্ববতীর সঙ্গে এক শয্যায় শুতো। বিম্ববতী বেড়াল পছন্দ করেন না, কিন্তু পুত্রের আবদারের জন্য তাঁকে মেনে নিতে হতো সবই। মুঞ্জুরীর

সন্তান-সম্ভাবনা দেখে তিনি বলেছিলেন, ওরে এ সময় বেড়ালকে আঁকড়ে রাখতে নেই, ওরা এ সময়টা একা একা থাকতে চায়। ওকে এখন ছেড়ে দে, ছোটকু। নবীনকুমার তা শুনবে না। মুঞ্জুরীর বাচ্চা হবে শুনে তার মহা আনন্দ, সারা বাড়ি এরপর বেড়ালে ভরে যাবে।

একদিন ভোরে জেগে উঠে নবীনকুমার দেখলো তার আলিঙ্গনের মধ্যে মুঞ্জুরী মরে কাঠ হয়ে আছে। তারপর নবীনকুমারের সে কি কান্না! পরমাত্মীয় বিয়োগেও মানুষ বুঝি অমন মর্মবিদারী কান্না কাঁদতে পারে না। তিনদিন নবীনকুমার মুখে অন্ন তুলতে পারে নি। এর পর থেকে অবশ্য সে আর অন্য কোনো বেড়াল দু'চক্ষে দেখতে পারে না, এ অট্টালিকার দ্বিতলে কোনো বেড়াল দৈবাৎ এসে পড়লে সে নিজে লাঠি নিয়ে তেড়ে যায়।

কৃষ্ণভামিনীর মিতেনীর সঙ্গে পুতুল খেলাতেও নবীনকুমারের সে রকম ঝোঁক চাপলো। পরদিনই সে জিজ্ঞেস করলো, কই, তোমার মিতেনী আর এলো না? তোমার ছেলেকে কতদিন শ্বশুর বাড়ি ফেলে রাকবে? এ বাড়ির পুরুষরা কক্ষনো শ্বশুর বাড়িতে থাকে না। সিংহ কি সিংহীর কাছে যায়, না সিংহীই আসে সিংহের গুহায়?

দু' তিন দিন পর নবীনকুমার অস্থির হয়ে উঠলো একেবারে। সে কৃষ্ণভামিনীকে বললো, পত্তর পাঠাও! তোমার মিতেনীকে লেকো তোমার ছেলে আর তার বউকে সে যেন কালই নিয়ে আসে!

নবীনকুমার নিজেই মুসাবিদা করে তার মুক্তোর মতন হস্তাক্ষরে লিখলো কৃষ্ণভামিনীর ব-কলমে চিঠি। এক পরাত সন্দেশ ও একটি বড় রোহিত মৎস্য সমেত একজন বাহক মারফত পাঠিয়ে দেওয়া হলো সেই পত্র। পরদিন কুসুমকুমারী নিজে এলো না, দ্বিগুণ তত্ত্বসমেত পাঠিয়ে দিলে পুতুল দুটিকে। সঙ্গে একটি ছোট চিঠি, বেশ গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, কার্যাঞ্চে নিবেদন এই যে, আমি যাইতে পারিলাম না, কবে পারিব ঠিক নাই, পরমেশ্বরের কৃপায় ইহারা সুখে থাকুক। ভবদীয়া কুসুমকুমারী বনজ্যোৎস্না মিতেনী।

চিঠিখানা দেখে ভুরু কুঁচকে নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, এ চিঠি কে লিকে দিয়েচে? ওর বর?

কৃষ্ণভামিনী বললো, আমার মিতেনী নিজেই লিকতে পারে। সব জানে।

নবীনকুমার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, যেমন বিচ্ছিরি হাতের লেকা, তেমন বদ স্বভাব মেয়েটার। আবার দেমাক করে লিকেচে, কবে পারিব ঠিক নাই!

কুসুমকুমারীর ব্রাহ্ম স্বামীকে দেখার খুবই কৌতূহল নবীনকুমারের। সে কৃষ্ণভামিনীকে বললো, তোমার মিতেনীর গোমড়ামুখো বর নিশ্চয়ই তার বউকে আর একলা পাঠাতে চায় না। একদিন ওদের এ বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়াও না!

এবার নবীনকুমার নিজেই অঘোরনাথকে সম্বোধন করে এক লৌকিকতাপূর্ণ নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করলো। কিন্তু তার উত্তর অঘোরনাথের কাছ থেকে না এসে এলো কুসুমকুমারীর হস্তাক্ষরে। সে দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছে যে নানা কারণে এখন তাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। তার বদলে একদিন কৃষ্ণভামিনীরা কি আসতে পারে না?

বাড়ির কর্তার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ না এলে সেখানে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নবীনকুমার একদিন বাড়ির ঘেরাটোপ পালকিতে কৃষ্ণভামিনীকে পাঠিয়ে দিতে পারে বটে, তার নিজের যাওয়া শোভা পায় না। কিন্তু কুসুমকুমারীর সঙ্গে তার পুতুল খেলা অসমাপ্ত রয়ে গেছে বলে সে খুবই অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। সামাজিক নিয়ম উপেক্ষা করে সে একদিন কৃষ্ণভামিনীকে বললো, চলো আজ হাটখোলায়, তোমার মিতেনীর বাড়িটা দেকে আসি। পুতুলগুলোন সঙ্গে করে নাও—।

সে বাড়িতে গিয়ে বড় অপমানিত হতে হলো নবীনকুমারকে।

হাটখোলায় কৃষ্ণভামিনীর মিতেনীর শ্বশুরালয়টি তেমন বুনিয়াদী নয়। মাত্র দু' পুরুষে ধনী। অনেকেই এখনও বলে যে জগাই মল্লিক নাকি চিত্তেশ্বরীর মন্দিরের সামনে বসে ফুটকড়াই বেচতো। জগাই মল্লিকের আদি নিবাস ছিল পেনেটিতে। বৃদ্ধ বয়সে দেবী চিত্তেশ্বরী তাঁকে স্বপ্নে গুপ্তধনের সন্ধান দেন এবং তিনি এক পানা পুকুরের মাঝখানে ডুব দিয়ে এক সোনার ঘড়া ভর্তি মোহর পেয়ে যান। অবশ্য কেউ কেউ অন্য কাহিনীও বলে। এক ডাকাইত নাকি সেপাইদের তাড়া খেয়ে জগাই মল্লিকের বসতবাটিতে এসে রাত্রে আশ্রয় নেয়। পরদিন সকালেই সে ডাকাইতকে সেপাইয়ের বদলে ধরে ফেলে মারাত্মক বিসূচিকা রোগে এবং সন্ধের আগেই সে মারা যায়। রাতারাতি সেই শবদেহ দাহ করে জগাই মল্লিক সে দস্যুর ধনরত্ন নিয়ে পেনেটি ছেড়ে পাকাপাকিভাবে আশ্রয় নেন কলকাতায়। প্রথম পক্ষের স্ত্রী-পুত্রদেরও পরিত্যাগ করে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন এখানে। এই দ্বিতীয় কাহিনীর সত্যাসত্য ঠিক নির্ধারণ করা যায় না। তবে কলকাতার অধিকাংশ ধনীরই ভাগ্য পরিবর্তনের ব্যাপারে দু রকম কাহিনী প্রচলিত থাকে। সে যাই হোক, জগাই মল্লিকের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ চিত্তপ্রসাদ বাণিজ্য ব্যাপারে নিদারুণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে অগাধ ধনসম্পদ উপার্জন করেন এবং তিনিই হাটখোলায় এই প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করেছেন।

চিত্তপ্রসাদ দীর্ঘজীবী হননি এবং আকস্মিক মৃত্যুর ফলে বিষয়াদির সুচারু ব্যবস্থা করে যেতে পারেননি। ভ্রাতৃবৎসল চিত্তপ্রসাদ সমুদয় সম্পত্তি তিনি ভাইয়ের নামেই রেখেছিলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা চণ্ডিকাপ্রসাদ তখন না-লায়েক বিধায় মধ্যম ভ্রাতা কালীপ্রসাদই অগ্রজের মৃত্যুর পর ট্রাস্টের অছি হয়। অতি বৃদ্ধ জগাই মল্লিক এখনো জীবিত, তাঁর সঠিক বয়সের হিসাব কেউ জানে না, তবে তিনি নিজে এক সময় বলতেন যে, যে সময় নবাব সিরাজদৌল্লার ফৌজের সঙ্গে ক্লাইভ সাহেব লড়াই দিয়েছিলেন পলাশীর মাঠে, সেই বৎসর তাঁর জন্ম। সেই হিসাব সঠিক ধরলে জগাই মল্লিকের বয়স এখন ছিয়ানব্বই তো বটেই। গত দশ বৎসর ধরে তিনি সম্পূর্ণ বধির এবং সম্পূর্ণ দন্তহীন হওয়ায় কথা যা বলেন তার কিছুই বোঝা যায় না। তাঁর হাঁটা চলার ক্ষমতা অবশ্য এখনো নষ্ট হয়নি। কয়েক বৎসর আগেও তিনি প্রত্যহ অপরাহ্ণে পদব্রজে একবার চিত্তেশ্বরীর মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করে আসতেন, এখন তাঁকে পালকিতে করে ঘুরিয়ে আনা হয়।

সম্পত্তি পরিচালনার ভার হাতে পেয়ে কালীপ্রসাদের মতিগতি সম্পূর্ণ পালটে যায়। দাদার অধীনে তিনি স্বল্পভাষী ও কর্মঠ মানুষ ছিলেন, তাঁর কোনো পৃথক ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়নি, স্বাধীন হবার পর তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্যের চেয়েও নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে বেশী মন দিলেন। কালীপ্রসাদ সমাজে ঘোরাফেরা করে বুঝেছিলেন, অর্থোপার্জন বা বড় বড় অট্টালিকা হাঁকড়ানোই বড় কথা নয়, তার চেয়েও বড় কথা কৌলিন্য! লোকে কথায় কথায় এখনো বলে, ফুটকড়াই বেচা জগা মল্লিকের ছেলেরা এখন দুটো পয়সার মুখ দেখেচে! কেউ কেউ একথা কালীপ্রসাদের মুখের সামনে বলতেও দ্বিধা করে না!

কালীপ্রসাদ কলকাতার পথেঘাটে টাকা ছড়াতে লাগলেন। আমোদ আহ্লাদ কাকে বলে তিনি দেখিয়ে দিতে চান। পয়সা প্রচুর রোজগার করা গেছে। দু-তিন পুরুষ ধরে খোলামকুচির মতন ছিটোলেও ফুরোবে না, কিন্তু সুনাম অর্জন করতে হবে এই এক পুরুষেই। লোকে যাতে জগাই মল্লিকের কথা একেবারেই ভুলে গিয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, হ্যাঁ, বাবু তো বাবু, হাটখোলার কালী মল্লিক! দান-ধ্যানে কালীপ্রসাদ মল্লিক দরাজ দিল, কোথাও ইস্কুল কলেজ খোলা হোক, কালীপ্রসাদ মল্লিকের কাছে সাহায্য চাইতে এসে তারা কখনো বিমুখ হয় না। কালীপ্রসাদ আগে জিজ্ঞেস করেন, অমুক কত দিয়েছে, আর অমুক, আর তমুক? তারপর সর্বোচ্চ দাতার চেয়ে অন্তত এক টাকা বেশী ধরে তিনি সগর্বে বলেন, লিখে নাও! খাজাঞ্চির কাচে যাও, এখুনি টাকা মিলবে, আমার সব নগদানগদি কারবার, যতোবাবুদের মতন আমি শুধু প্রমিজ করি না। কারুর কন্যাদায়, কারুর বাপের

শ্রাদ্ধ, একবার কালীপ্রসাদ মল্লিকের কাছে এলেই হলো। আবার চড়কের সময় ছাতুবাবুদের মাঠে ম্যারাপ বেঁধে এক সঙ্গে একশো মেয়েমানুষ দিয়ে খ্যামটা নাচানো, এমনটি আগে কেউ পেরেছে ! কী গান জমেছিল সেবার, "ফণীর মাথার মণি চুরি কল্লি, বুঝি বিদেশে বিঘোরে পরাণ হারালি"—এখনো লোকের কানে লেগে আছে।

কালীপ্রসাদের ছোট ভাই চণ্ডিকাপ্রসাদও মধ্যমাগ্রজের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করছে সম্পূর্ণ মনপ্রাণ দিয়ে। এঁর আবার ইংরেজী কেতা ভাল লাগে না, নবাবী কায়দার দিকে বেশী ঝোঁক। সর্বদা এক বিচিত্র পোশাক পরে থাকেন। লক্ষ্ণৌ ফ্যাসানের চুড়িদার পায়জামা, রামজামা, কোমরে দোপাট্টা আর পায়ে জড়ির চপ্পল। মাথার টুপিটি একদিকে এমনই হেলিয়ে পরা থাকে যে বাবুর ডান কান আছে কিনা তাতে হঠাৎ সন্দেহ জাগে। এ ছাড়া তাঁর হাতে থাকে সব সময়ই একটি টকটকে লাল রঙের রুমাল। এবং প্যাঁজ-রসুনের গন্ধ এঁর পছন্দ বলে যবনী তয়ফাওয়ালীর বাড়িতেই এঁর বেশী যাতায়াত।

চণ্ডিকাপ্রসাদ গোড়া থেকেই বিষয়কর্ম কিছু শেখেননি, তাঁর মেজদাদা তাঁকে সেদিকে ভিড়তেও দেননি। চণ্ডিকাপ্রসাদ মাসে হাতখরচ বাবদ যা পান, তাতে একটি তালুক কেনা যায়। কালীপ্রসাদ ছোট ভাইয়ের কোনো সাধেই বাদ সাধেন না, তাঁর মনোগত অভিপ্রায়টি যেন এই, দু'ভাই মিলে বাপের নামটি মুছে ফেলা হোক, কেউ যেন তাঁদের আর জগাই মল্লিকের ব্যাটা বলে সম্বোধন না করে। স্বনামে যার পরিচয় হয় না, সে আবার একটা মানুষ ? ঠেঙো ধুতি, নিমে পরা সাতকেলে বুড়ো জগাই মল্লিককে বাপ বলে পরিচয় দিতে দু' ভাইয়েরই লজ্জা হয়। জগাই মল্লিক লোকসমক্ষে বেরোক এটাও ওঁরা কেউ চান না, কিন্তু বৃদ্ধ একবার করে চিত্তেশ্বরীকে প্রণাম করতে যাবেনই।

অঘোরনাথ এ গৃহে সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের মানুষ। তার পিতা কিংবা পিতামহ কেউই রূপবান নন, জগাই মল্লিকের দোকানদারের মতন চেহারা তাঁর পুত্ররাও পেয়েছে। কিন্তু অঘোরনাথ মাতৃমুখী সন্তান। সে দীর্ঘকায়, সুঠাম, গৌরবর্ণ, মুখশ্রী সুন্দর। অঘোরনাথের মা চিত্তপ্রসাদের তৃতীয়পক্ষ। প্রথম দু'পক্ষের কোনো পুত্রসন্তান না হওয়ায় গরীব ঘরের এই রূপসী কন্যাটিকে বিবাহ করে এনেছিলেন চিত্তপ্রসাদ। অঘোরনাথ তার মায়ের একমাত্র সন্তান, আবাল্য মাতৃছায়ায় লালিত। তাই খুড়ামশাইদের বিলাসী জীবনের প্রভাব পড়েনি তার ওপর। পড়াশুনোয় আগ্রহ খুব, হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসেবেও সুনাম কিনেছিল। যথারীতি ছাত্রাবস্থাতেই তার বিবাহ হয়, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরই তার মনে প্রবল ধর্মভাব দেখা দেয়। সে নিয়মিত জোড়াসাঁকোর দেবেন ঠাকুরের বাড়ি যাতায়াত শুরু করে। তারপর সে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণের জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়েও তার জননীর প্রতিবন্ধকে সংকল্প সিদ্ধ করতে পারলো না। মা তার দ্বিতীয় বিবাহ দিলেন হুড়োহুড়ি করে এবং পিতৃ-সম্পত্তি বুঝে নেবার জন্য এস্টেটের কাজে লাগিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু কোনোটিরই সুফল ফললো না। অঘোরনাথ মনোরোগী হয়ে গেল।

নবীনকুমার কৃষ্ণভামিনীকে নিয়ে হাটখোলার মল্লিক বাড়িতে আসার কিছুক্ষণ পরেই বুঝলো, তার না আসাই উচিত ছিল এখানে। কুসুমকুমারীর সঙ্গে তার পুতুলখেলা অসমাপ্ত রয়ে গেছে। সে এসেছে সেই টানে। তার বাবার আমলের সবচেয়ে সুদৃশ্য জুড়িগাড়িটি নিয়ে সে এসেছে, সে আশা করেছিল দেউড়ির সামনেই এ বাড়ির কর্তারা সার বেঁধে অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে। নবীনকুমার বংশ-মর্যাদা সম্পর্কে অতি সচেতন, সে রামকমল সিংহের সন্তান, যে রামকমল সিংহ ছিলেন কলকাতার আট-দশজন প্রধান ধনীদের অন্যতম। জোড়াসাঁকোর সিংহবাড়ির নাম সবাই এক ডাকে চেনে। সেই সিংহদের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এখন একমাত্র নবীনকুমার। তার স্ত্রী কৃষ্ণভামিনীও সামান্যা নয়, বাগবাজারের সুবিখ্যাত বসু পরিবারের কন্যা।

দেউড়ির সামনে অভ্যর্থনার জন্য কেউ নেই। জুড়িগাড়ির পিছনে যে দুজন ভৃত্য দাঁড়িয়ে আসে, তারাই তড়াক করে নেমে দরজা খুলে দিল। পুতুল খেলার সরঞ্জাম ভরা একটি কাশ্মীরী বাক্স বগলে নিয়ে নবীনকুমার নেমে দাঁড়িয়ে এদিকে ওদিকে তাকালো। একজন দ্বারবান শুধু অলসভাবে চেয়ে আছে এদিকে। নবীনকুমারের সন্দেহ হলো, তা হলে কি তারিখ ভুল হলো ? না, আজই তো শনিবার, কুসুমকুমারী জানে না তাদের আসবার কথা ?

একগলা ঘোমটা দেওয়া একজন দাসী স্থানীয়া স্ত্রীলোক শুধু এগিয়ে এসে বললো, ভিতরে আসুন, নতুন বৌঠান আপনকারদের জন্য অপিক্ষে করে আচেন।

কৃষ্ণভামিনীও নেমে পড়েছে ততক্ষণে। তারও মুখে ঘোমটা, এমন একটা জমকালো ভারী শাড়ি পরে এসেছে সে যে ঠিক মতন সামলাতে না পারলে যখন তখন হোঁচট খেয়ে পড়তে পারে। দাসীটি তাকে ধরে ধরে নিয়ে চললো।

দেউড়ি থেকে মোরাম বিছানো খানিকটা পথ গম্ভীরভাবে হেঁটে নবীনকুমার উঠে এলো বারান্দায়। সেখানে দু'জন ভৃত্য দাঁড়িয়ে, কিন্তু তাদের ব্যবহারে কোনো ব্যস্ততা নেই, তাদের উভয়েরই দৃষ্টি অতি ধূর্ত ধরনের। যেন সেই মুহূর্তে তারা কিছু একটা ষড়যন্ত্র করছিল, নবীনকুমারকে দেখে থেমে গেল। একটি ঘরের খুব ভারী কাঠের দরজা ঠেলে খুলে তাদের একজন বললো, এখানে বসুন।

নবীনকুমার ও কৃষ্ণভামিনী দু'জনেই সে ঘরে ঢুকলো। তার অন্য দিকে আর একটি দরজা আছে, সেটি খোলা। দাসীটি কিছু না বলে কৃষ্ণভামিনীর হাত ধরে সেই দরজা দিয়ে ভিতর দিকে চলে গেল।

ঘরটিতে এলোমেলোভাবে অনেকগুলি গদি মোড়া চেয়ার ছড়ানো, একপাশে একটি বড় চৌকির ওপর ফরাস পাতা। চারটি দেয়ালে ঝুলছে চারখানি কোনো শীতের দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। খুব সম্ভবত ছবিগুলি কোনো নিলাম থেকে এক লটে কেনা।

নবীনকুমার তার ধুতির ফুলকোঁচাটি সাবধানে একটু তুলে একটি চেয়ারে বসলো। তারপর কামিজের জেব থেকে সোনার গার্ড চেন দেওয়া মেকাবি ঘড়িটি বার করে সময় দেখলো। ঠিক ছ'টা বাজে এখন এবং নবীনকুমারের ঘড়ির সমর্থনেই যেন গুপুস গুপুস করে ছ'বার শব্দ পাওয়া গেল কেল্লার তোপের। ঠিক ছ'টার সময়েই তো নবীনকুমারের সস্ত্রীক আসার কথা ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে সে ঘরে কেউ এলো না আর। স্বভাব-চঞ্চল নবীনকুমার বেশীক্ষণ এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকতে পারে না। সে হাঁটু দোলাতে লাগলো ঘন ঘন, বিরক্তিতে তার ভুরু কুঞ্চিত হয়ে গেছে। সে ভাবতে লাগলো, এ বাড়ির কেউ কি কোনো সহবৎ জানে না নাকি ? সামান্য উমেদারের মতন তাকে বার-বাড়ির একটা ঠেঙো ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। অনাত্মীয় বা কাজ-সম্বন্ধী লোকদের তবু লোকে বৈঠকখানায় বসাতে পারে কিন্তু নবীনকুমাররা হলো এ বাড়ির বধূর বাপের বাড়ির সম্পর্কের, অর্থাৎ কুটুম, এমন কুটুমদের দ্বিতলের মজলিস কক্ষে বসানোই প্রথা। নবীনকুমার বাল্যকাল থেকে এমনই দেখে এসেছে। সে আশা করেছিল, কুসুমকুমারী এবং তার স্বামীর নিশ্চয়ই একটা আলাদা মহল আছে এ বাড়িতে, সেখানেই নিয়ে যাওয়া হবে তাকে।

একটুক্ষণের মধ্যেই অস্থির হয়ে উঠলো নবীনকুমার। ভৃত্য দুটিকে ডাকবার জন্য সে দু-একবার গলা খাঁকারি দিল, তবু তাদের আসবার নাম নেই। তখন সে উঠে গিয়ে বাইরের দিকের দরজাটি দিয়ে মুখ বাড়ালো। ভৃত্য দুটি কাছেই বসে আছে, এ ওর গা ঠেলাঠেলি করে কী নিয়ে যেন হাসাহাসি করছে।

নবীনকুমার একহাতে কোঁচাটি, কাঠের বাক্সটি সামলে ধরে অন্য হাত কোমরে রেখে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলো, এই, তোদের বাবু কোথায় ?

একজন ভৃত্য মুখ তুলে বললো, কোন্ বাবু ? আপনি কার কতা জিগ্যেস কচ্চেন ?

আর একজন বললো, মেজোবাবু কখোন ফিরবেন জানি না। আর ছোটব্যবু আজও ফিত্তে পারেন, কালও ফিত্তে পারেন, আবার ফিত্তে নাও পারেন।

নবীনকুমারদের বাড়ির কোনো ভৃত্য এমনভাবে বসে বসে কথা বলে না বাবুদের সঙ্গে।

নবীনকুমার বললো, অঘোরনাথবাবুর কথা জিজ্ঞেস কচ্চি।

এবার ভৃত্যদ্বয় পরস্পরের মুখ তাকাতাকি করলো। তারপর একজন মুচকি হেসে বললো, তিনি তো ওপরেই আচেন

নবীনকুমার বললো, তেনাকে একবার খপর দাও। বলোগে, নবীনকুমার সিংহ এশ্চেন।

সেই ভৃত্যটি বললো, আজ্ঞে তেনাকে খপর দেবার এক্তিয়ার আমাদের নেই।

বলেই সে চিক করে থুতু ত্যাগ করলো বারান্দার নীচে।

নবীনকুমারদের বাড়ির কোনো ভৃত্য এমন অবাধ্য বেয়াড়াপনা করলে দিবাকরকে দিয়ে চাবকে তার পিঠের ছাল তুলে দেওয়া হতো। এ নেহাত অন্যের বাড়ি।

রাগে গসগস করে নবীনকুমার ফিরে এলো ঘরের মধ্যে। পরক্ষণেই তার একটি কথা মনে পড়লো। তারা আজকে তাদের পুতুল-ছেলে ও ছেলের বউকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছে, খালি হাতে তো কুটুমবাড়িতে আসা যায় না, তাই দু' পরাত তত্ত্ব আনা হয়েছে। সেগুলি রয়ে গেছে জুড়ি গাড়ির মধ্যেই।

আবার সে ফিরে এসে ভৃত্য দুটিকে উদ্দেশ্য করে বললো, গাড়িতে তত্ত্ব রয়েচে, কারুকে বলো নামাবার ব্যবস্থা কত্তে।

ভৃত্য দুটি অমনি তড়াক করে ছুটে গেল এবং নিজেরাই পরাত দুটি নামিয়ে হুই হুই করে চলে গেল বাড়ির মধ্যে, যেন জন্মে তারা তত্ত্ব দেখেনি।

নবীনকুমার ঘরটির মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো মুখ নীচু করে। এখুনি তার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কৃষ্ণভামিনীকে খবর পাঠানো যাবে কী করে? মিতেনীর স্বামী অঘোরনাথ বাড়িতে থেকেও যে একবারও তার সঙ্গে দেখা করতে এলো না, এই চিন্তাই তাকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দিচ্ছে।

নবীনকুমার একবার গিয়ে অন্দর মহলের দরজায় উঁকি দিল। ভেতরে মস্ত বড় একটা উঠোন, সেখানে নানা রকম কাপড়চোপড় ছড়ানো, মনে হয় যেন ওপর থেকে উড়ে উড়ে পড়ছে। এ বাড়ির মতন একটা অপরিচ্ছন্ন বাড়ি নবীনকুমার আগে কখনো দেখেনি। বাইরে থেকে মনে হয় অট্টালিকাটি রীতিমতন বিশাল এবং তেমন পুরোনোও নয়, কিন্তু সদর থেকেই অযত্নের চিহ্ন, যেখানে সেখানে আবর্জনা জমে আছে; ঘরের আসবাবগুলি যে মূল্যবান তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় নিয়মিত ঝাড়াই সাফাই হয় না। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, অথচ নীচতলায় আলো জ্বালবার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।

এবার অন্য দুজন ভৃত্য একটি বড় পাথরের থালা ভর্তি নানাবিধ ফল ও মিষ্টদ্রব্য এবং এক গেলাস সরবত এনে একটি টিপয়ের ওপর রাখলো।

খাবার দেখেই গা জ্বলে উঠলো নবীনকুমারের। সে একা একা খাবে? আজ পর্যন্ত কখনো কেউ সাধাসাধি না করলে সে কোনো খাদ্য মুখেই তোলেনি।

সে ক্রোধ চাপা কণ্ঠে বললো, এ সবের প্রয়োজন নেই, নিয়ে যা।

একজন ভৃত্য বললো, নতুন বৌঠান আপনায় একটু মিষ্টি মুখ কত্তে বল্লেন।

নবীনকুমার বললো, ওপরে খপর দে, আমি এবার যাবো!

ভৃত্য দুটি বিনা বাক্যব্যয়ে ভেতরে চলে গেল। আবার বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে কারুর কোনো সাড়া শব্দ নেই।

এবার নবীনকুমার বেরিয়ে এলো বারান্দায়। এই একা ঘরে অসহ্য অবস্থায় বসে থাকার বদলে সে নিজের গাড়ির মধ্যে বসে অপেক্ষা করবে বরং। কিংবা তার একজন ভৃত্যকে পাঠাবে কৃষ্ণভামিনীকে খবর দেবার জন্য।

নবীনকুমার বাইরে বেরিয়ে আসতেই গেটের সামনে প্রথমে একটি পালকি, তারপর একটি ফেটিং গাড়ি এসে থামলো।

পালকি-বেহারারা পালকি নামিয়ে রেখে ভেতর থেকে ধরে ধরে বার করলো জগাই মল্লিককে। চোখ দুটি ঘোলাটে রঙের, শত কুঞ্চিত চামড়ায় মোড়া কয়েকখানি হাড়, দু' পাশের দুই বেহারার কাঁধে হাত রেখে জগাই মল্লিক ঠিক শিশুর মতন দুলে দুলে হাঁটতে লাগলো। নবীনকুমার এ রকম চলন্ত মনুষ্যকঙ্কাল আগে দেখেনি। জগাই মল্লিকের গাল দুটি অনবরত নড়ছে, যেন অতি ব্যস্ত হয়ে তিনি কিছু চিবুচ্ছেন।

ফেটিং গাড়িটি থামা মাত্র সেই প্রথম দেখা ভৃত্য দুটি ভোজবাজির মতন তৎক্ষণাৎ এসে উদয় হলো দেউড়ির কাছে। গাড়ির ভেতর থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো, মেদো! যেদো!

ভৃত্য দুটি বললো, এই যে হুজুর!

গাড়ি থেকে নামলেন এ বাড়ির ছোটবাবু চণ্ডিকাপ্রসাদ মল্লিক। মদের নেশায় একেবারে টপভুজঙ্গ হয়ে আছেন, পোশাকের নানা স্থানে পানের পিকের দাগ। তিনি দু-পা হেঁটেই বোঁ করে ঘুরে গেলেন একবার। তারপর পপাত ধরণীতল হবার আগে ভৃত্য দুটি ঝটিতি ধরে ফেললো তাঁকে।

চণ্ডিকাপ্রসাদ এ রকম অসময়ে কখনো বাড়ি ফেরেন না। তিনি দ্বিপ্রহর থেকে শ্যাম্পেন টানা শুরু করেন, এখন সবে তো কলির সন্ধে। নিশ্চিত কোনো জরুরী কারণে তাঁর নগদ টাকার প্রয়োজন হয়েছে—একমাত্র এই টানেই তাঁকে দু-একদিন অন্তর বাড়ি আসতে হয়।

চণ্ডিকাপ্রসাদ সব কথাই বলেন জোরে জোরে। ভৃত্যদের হুকুম করলেন, ব্যাটারা ভালো করে ধর না আমাকে, পায় জোর পাচ্ছিনি! তারপরই তারস্বরে জুড়ে দিলেন একটা গান।

মাত্র হাত পাঁচেক তফাতে বিভিন্ন ভৃত্যেরা পিতা ও পুত্রকে ধরে ধরে এগিয়ে নিয়ে চললো। এর মধ্যে, চণ্ডিকাপ্রসাদ বার বার টলে পড়ে যাব'র উপক্রম হলেও তাঁর গতিই খানিকটা দ্রুত, কারণ তাঁর ফেরার তাড়া আছে। সুতরাং তিনি ধরে ফেললেন জগাই মল্লিককে।

পিতা পুত্র তাকালেন পরস্পরের দিকে। কেউ কারুকে প্রথমে চিনতে পারলেন না সম্ভবত।

চণ্ডিকাপ্রসাদ ভুরু কুঁচকে দৃষ্টিতে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করে বললেন, তুমি কে বাওয়া? অ্যাঁ?

জগাই মল্লিকের থুতনিটা ধরে উঁচু করে দেখে অট্টহাস্য করে উঠলেন চণ্ডিকাপ্রসাদ। হাসির চোটে যেন তাঁর দম ফেটে যাবে।

সেই রকম হাসতে হাসতেই বললেন, অ, তুমি আমার বাওয়া? আমার নিজের বাওয়া! তুমি এখনো বেঁচে আচো বাওয়া? যেদিনই আসি দেখি তুমি বেঁচে রয়েচো, এ কেমন ধারা ব্যাভার তোমার মাইরি। দু-একদিন তো মরে গ্যালেও পারো!

জগাই মল্লিকের গাল আরও জোরে জোরে নড়তে লাগলো, আর ঠোঁট দিয়ে শব্দ হতে লাগলো, ম-ম-ম-ম-ম!

চণ্ডিকাপ্রসাদ পিতার কেশহীন মাথায় একটি ছোট চাঁটি মেরে আবার বললো, তা বাঁচো বাওয়া, বাঁচো! আমরা সব্বাই মরে ফৌত হয়ে যাই, তারপরেও তুমি বেঁচে থাকো'! কত ধুমধাম করে তোমার ছেরাদ্দ করবো ভেবে রেকেচিলুম, তা তোমার প্রাণে সইলো না। হারামজাদা, আমাদের একটু হাত খুলে ছেরাদ্দ কত্তেও দেবে না; তবে কি নিজের ছেরাদ্দ তুমি কিপ্যনের মতন নিজেই করবে? অ্যাঁ?

পালকি-বেহারারা জগাই মল্লিককে আগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই চণ্ডিকাপ্রসাদ তাদের একজনের কাঁধ খামচে ধরে বললেন, অ্যাই ও, চোপ। আমি আমার বাওয়ার সঙ্গে কথা বলচি, তাতে তোর বাওয়ার কী? চলে যাচ্চিস যে! জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দোবো।

সত্যি সত্যি নীচু হয়ে পা থেকে জুতো খুলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন চণ্ডিকাপ্রসাদ। সেই অবস্থাতেই গড়িয়ে গিয়ে পিতার পা জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি তোমার অধম সন্তান, বাওয়া, তোমার ছেরাদ্দটিও করতে পাল্লুমনি গো! ওফ!

এবার কান্না। যাই হোক এর মধ্যেই ভৃত্যদের তৎপরতায় পিতা-পুত্রকে বিযুক্ত করা হলো, পালকি-বেহারারা জগাই মল্লিককে নিয়ে গেল ভেতরে। চণ্ডিকাপ্রসাদকে তুলে দাঁড় করানো হলো, তিনিও অবিলম্বেই বাবার কথা ভুলে গিয়ে গান ধরলেন, 'পরেরো মনেরো ভাবো বুঝিতে কি পারে প—রে!'

হাত-পা ছুঁড়ে গান গাইতে গাইতে তিনি উঠতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। নবীনকুমার তাড়াতাড়ি একটি থামের আড়ালে সরে গেল।

চণ্ডিকাপ্রসাদ তাকে এক নজর দেখে ফিক করে হেসে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আবার কে গা? ধিনি কার্ত্তিকের মতন চায়রা!

নবীনকুমার এমন প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে রইলো। চণ্ডিকাপ্রসাদ তাকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে আবার জড়ানো গলায় গান গাইতে গাইতে বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন।

পাশ দিয়ে যাবার সময় চণ্ডিকাপ্রসাদের গা থেকে যে বিকট গন্ধ ভেসে এলো তাতেই নবীনকুমারের নাড়িভুঁড়ি উলটে আসার উপক্রম। এ রকম দৃশ্য নবীনকুমারের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। নবীনকুমার তার পিতাকে অতি অল্প বয়েসে দেখেছে। রামকমল সিংহ বাড়িতে কোনো দিন এমন বেলেল্লা করেননি, শেষের দিকে তিনি প্রায় গৃহেই থাকতেন না বলতে গেলে। গঙ্গানারায়ণের আমলে সিংহ বাড়িতে কোনোদিন মদ্যপান করেনি কেউ। নবীনকুমারের কলেজের সহপাঠীরা কেউ কেউ এই বয়েসেই সুরাপান করে, ও সম্পর্কে নবীনকুমারেরও সামান্য একটু কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল সবে মাত্র। কিন্তু মাতাল চণ্ডিকাপ্রসাদকে দেখে মদের ওপর তার একটা দারুণ ঘৃণা জন্মে গেল, এবং সেইখানে দাঁড়িয়ে সেই মুহূর্তে সে মনে মনে শপথ নিলো যে, জীবনে সে কখনো সুরাপান করবে না।

নবীনকুমার গাড়ির মধ্যে বসে অপেক্ষা করার আরও প্রায় আধঘণ্টা পরে এলো কৃষ্ণভামিনী। তৎক্ষণাৎ গাড়ি ছাড়তে হুকুম দেওয়া হলো। পথের মধ্যে কোন রকম গোল করা ঠিক হবে না, নবীনকুমার বাড়ি ফিরেই কৃষ্ণভামিনীকে আচ্ছাসে মার লাগাবে, এই মনে করে গুম্ হয়ে রইলো।

কৃষ্ণভামিনীই ফিসফিস করে বললো, ওগো, আমার মিতেনীর দুঃখ দেকলে পাতরেরও বুক ফেটে যাবে! ওর বাপ মা কী দেকে বে দিলে, ওর সোয়ামী যে পাগল!

নবীনকুমার বললো, পাগল না শেয়ানা। একবার নীচে নামতে পারলেন না, অসভ্য, ইতর।

কৃষ্ণভামিনী বললো, হ্যাঁগো, সত্যি পাগল! কোথ্থাও বেরোয় না, শুধু একটা ঠাকুরের পটের সামনে বসে থাকে আর বিলকিচ ছিলকিচ কতা বলে, নয়তো একদম চুম্ মেরে থাকে। এই যে আমি এতক্ষণ রইলুম, একটা কতা বলেনি। মাঝে মাঝে অজ্ঞেন হয়ে যায়! এই এক মাস হলো বেশী বাড়াবাড়ি হয়েচে! আমার মিতেনী কেঁদে ভাসাচ্চে গো, কেঁদে ভাসাচ্চে!

নবীনকুমার বললো, আমাদের ছেলে-বউ এনেচো?

কৃষ্ণভামিনী বললো, না। সে কতা আর পাড়তে পারলুম কই! ওপরে গিয়ে দেকি, এই তো অবস্তা। মিতেনীর শাশুড়িও কাঁদচে, মিতেনীও কাঁদচে!

নবীনকুমার বললো, যত ইচ্ছে কাঁদুক, ওদের সঙ্গে আমাদের আর কোনো সম্পর্ক নেই। ছেলে-বউয়ের আর আশা করো না! ওটা উনপাঁজুরেদের বাড়ি, আমাদের মতন লোকের এখেনে আসা যাওয়া চলে না!

কৃষ্ণভামিনী বললো, কিন্তু মিতেনী যে অনেক করে বললে, আমার হাত ধরে কতা আদায় করে নিলে। ওর শাশুড়ি এখুন ওকে কোতাও যেতে দেবে না, তাই আমি যদি আসি।

নবীনকুমার কঠোর স্বরে বললো, না!

কৃষ্ণভামিনীকে অবশ্য আর কোনোদিন আসতে হলো না হটখোলায়। এর দশদিনের মধ্যেই শুরু হলো তার ভেদ বমি, বড় বড় ডাক্তার বদ্যিরাও তাকে দেড়দিনের বেশী ধরে রাখতে পারলো না, পুতুল খেলা ও স্বামী সোহাগের মায়া কাটিয়ে টুপ করে মরে গেল কৃষ্ণভামিনী।

চাকুরি উপলক্ষে রাধানাথ সুদীর্ঘকাল পশ্চিমাঞ্চলে কাটিয়ে কিছুদিন হলো কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছেন। গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অফিসে তিনি বত্রিশ টাকা মাহিনায় চাকুরিতে ঢুকেছিলেন, তারপর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অঙ্কশাস্ত্রে তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় দিয়ে তিনি অনেক উন্নতি করেছেন! ডিরোজিও শিষ্য রাধানাথ শিকদারের ন্যায়-নীতি বোধ অতি প্রবল। উৎকোচ গ্রহণ এবং চাটুকারিতা, এই দুটিকেই তিনি প্রবলভাবে ঘৃণা করেন। তাঁর অফিসের বিভাগীয় দু'একজন কর্তা এইসব গুণের জন্য তাঁকে বিশেষ পছন্দ করেন। তাছাড়া উচ্চগণিতে রাধানাথের মতন জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ বিলাতেও বিশেষ নেই।

কলকাতা অফিসে রাধানাথ বদলি হয়ে এসেছেন চীফ কমপিউটার হিসেবে, বেতন ছয়শত টাকা। বহুকাল তিনি ঘুরেছেন পাহাড়ে পর্বতে, জরীপের লোকজন ও যন্ত্রপাতি নিয়ে গেছেন অনেক দুর্গম স্থানে। ছয় ফুটের বেশী লম্বা, দৈত্যের মতন স্বাস্থ্য, স্থানীয় ইংরেজরা তাঁকে আড়ালে লেভিয়াথান বলে ডাকতো। কলকাতায় তাঁর কাজ হলো খাতাপত্রে দুরূহ অঙ্কের হিসেব কষা।

হিন্দুস্থানে এখন তেমন যুদ্ধ বিগ্রহ নেই কোথাও, মোটামুটি শান্তিপূর্ণ অবস্থা, তাই ইংরেজ কর্মচারীরা এখন অন্য নানাবিধ কর্মে ব্যাপৃত। পাহাড় পর্বতের প্রতি সাহেব জাতির বরাবরেরই টান আছে, তাছাড়া গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে স্নিগ্ধ শীতল জলবায়ু অন্বেষণে তারা বারবার পাহাড়ে যেতে ভালোবাসে। হিমালয় পর্বতের নাম বহু প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীতে পরিচিত, কিন্তু ইংরেজরা দেরাদুনের দিক থেকে হিমালয়ের দিকে অগ্রসর হতে হতে প্রতিনিয়তই অগাধ বিস্ময়ের সম্মুখীন হতে লাগলো। এই নগাধিরাজ কী বিশাল, কী গহন, কী মহান! সমুদ্রের অন্তহীন ঢেউয়ের মতন দিগন্ত জুড়ে রয়েছে

সংখ্যাহীন শৃঙ্গ। এখানে রয়েছে চক্ষুর সীম না ছাড়ানো অরণ্য, যেখানে কত বিচিত্র মনোহারী অচেনা বৃক্ষ, অ-দৃশ্যপূর্ব কত পশু-প্রাণী-পতঙ্গ। গিরিকন্দরে অকস্মাৎ চোখে পড়ে কোনো সিদ্ধ পুরুষ বা তপস্যানিরত যোগী চক্ষু মুদে বসে আছেন। কতকাল তিনি সেই অবস্থায় আছেন কেউ জানে না। এখানে এলে হৃদয়ে অদ্ভুত প্রশান্তি আসে, আবার প্রতি পদক্ষেপে বিপদ। শান্ত ও ভয়ংকর রসের এমন আশ্চর্য সমাহার আর কোথাও দেখা যায় না।

সানুদেশের নিবিড় অরণ্য ক্রমশ উপরের দিকে বৃক্ষ-বিরল হতে থাকে। শিখরগুলিতে শুভ্র চিরতুষারের বিহার। কত যে শিখর, তার ইয়ত্তা নেই। সেসব স্থলে মানুষ তো দূরের কথা পৃথিবীর কোনো প্রাণীই কখনো পদার্পণ করেনি। হিন্দুগণের বিশ্বাস ঐ তুষারক্ষেত্র দেবতা ও অপ্সরাদের লীলাস্থল।

অসীমকে সীমা দিয়ে ঘেরার একটা চেষ্টা মনুষ্যজাতির মধ্যে সব সময়েই রয়েছে। এইরূপ চেষ্টাই সভ্যতার লক্ষণ হিসেবে গণ্য। যা অসীম, যা অনন্ত রহস্যময় তা মানুষের সহ্য হয় না, সেইজন্যই তো এই দেয়ালঘেরা সঙ্কুচিত নগর সভ্যতা।

জরীপ বিভাগের কর্মীরা অত্যুৎসাহে হিমালয়ের শৃঙ্গগুলিকে পরিমাপের সংখ্যাতত্ত্বে বেঁধে ফেলার জন্য নিয়মিত অভিযানে যায়। অবশ্য এজন্য চূড়ায় আরোহণ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, চূড়ার সঙ্গে সরলরেখায় কোনো একটি স্থান নির্দিষ্ট করতে হয়, তারপর থিওডোলাইট যন্ত্রের সাহায্যে চলে জ্যামিতিক হিসাব। তারপর সেইসব পরিসংখ্যান তারা প্রেরণ করে জরীপ বিভাগের সদর দফতর কলকাতায়।

যুগ যুগ ধরে ভারতীয়রা দূর থেকে হিমালয়কে প্রণাম জানিয়েছে। কিন্তু ইংরাজ জাতি জড় পদার্থকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করায় বিশ্বাস করে না। তারা চায় জীব ও জড়জগতকে পদানত করতে। ভারতীয়রা হিমালয়কে উদ্দেশ্য করে কাব্য রচেছে, কিন্তু হিমালয় যে একটি মাত্র পর্বত নয়, কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পর্বতমালার সমষ্টি, এ সম্পর্কে কোনো কৌতূহল দেখায়নি। ইংরেজরা আরও আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায় এই জন্য যে ভারতীয়রা হিমালয়ের শৃঙ্গগুলির নাম পর্যন্ত দেয়নি। স্থানীয় লোকেরা কাছাকাছি পরিদৃশ্যমান চূড়াগুলিকে কিছু একটা মনগড়া নামে ডাকে, দূরের দুঃসাধ্য-গমন শিখরগুলি নামহীন, গোত্রহীন, চির উদাসীন।

জরীপ বিভাগ এ পর্যন্ত বেছে বেছে প্রধান প্রধান উনআশীটি শিখরের উচ্চতা পর্যবেক্ষণ করেছেন কিন্তু তাদের পৃথক পৃথক নাম না থাকায় কাগজপত্রে হিসাব রাখার খুবই অসুবিধা হয়। তবু একত্রিশটির স্থানীয় নাম পাওয়া গেছে, বাকিগুলি পীক নাম্বার ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর এইভাবে চিহ্নিত।

জরীপ বিভাগের কাজে অর্থের কোনো অনটন নেই। এ ব্যাপারে সরকার কোনো কার্পণ্য করেন না। অবশ্য ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণই ইংরেজ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। এছাড়া আরও গূঢ় কারণ আছে। হিমালয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান সঞ্চয়ও বিশেষ প্রয়োজন। কারণ এই হিমালয়ের ওপারেই রুশ দেশ এবং রুশরাই এখন ইংরাজদের শত্রু। প্রায়ই শোনা যায় রুশরা ইংরাজদের কাছ থেকে ভারতবর্ষটা ছিনিয়ে নেবার জন্য আসছে। কোন্ কোন্ পথ ধরে রুশীয় বাহিনী আসতে পারে, তা কোম্পানির প্রতিরক্ষা দফতরের অবশ্যই জেনে রাখা দরকার। জরীপ বিভাগকে তাই প্রবল উদ্যমে হিমালয় অভিযানে নিযুক্ত করা হয়েছে।

মাঝখানে দু'একবার অল্পদিনের জন্য কলকাতা ঘুরে গেলেও রাধানাথ প্রায় বিশ বৎসর দেশছাড়া। তাঁর অবর্তমানে বাংলার সামাজিক জীবনে কত পরিবর্তন ঘটে গেছে, রাধানাথের সঙ্গে সেসব কিছুর যোগ ছিল না। এমন কি বাংলা ভাষাও তিনি ভালো করে বলতে পারেন না। রাধানাথের বন্ধু প্যারীচাঁদ প্রায়ই বলেন, রাধু, বাংলাটা শেখো। দেশের ভাষা না জানলে তুমি দেশের মানুষদের চিনবে কী করে? পাহাড় পর্বত নিয়েই কি তোমার সারা জীবন কাটবে? কথাটা রাধানাথের মনে লেগেছে। অফিস থেকে ফিরে প্রতি সন্ধেবেলাই তিনি প্যারীচাঁদের কাছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ নিতে যান। প্যারীচাঁদের ভাই কিশোরীচাঁদও অতিশয় বুদ্ধিমান ও কৃতবিদ্য পুরুষ, এই দু'জনের কাছ থেকে রাধানাথ অনেক বিষয়ে জানতে পারেন। পাহাড় ছেড়ে আস্তে আস্তে তাঁর মন মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সদ্য পরলোকগত বেথুন সাহেবের নামে একটি বেথুন সোসাইটি স্থাপিত হয়েছে, সেখানে দেশের শিক্ষিত সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তিরা সমবেত হয়ে দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন। রাধানাথকে সেই সোসাইটির সদস্য করে দিয়েছেন প্যারীচাঁদ। প্রথম প্রথম রাধানাথ সেখানে গিয়ে চুপ করে বসে থাকেন, তাঁর ইচ্ছে কোনো না কোনোদিন তিনিও সেখানে একটি প্রবন্ধ পাঠ

করবেন। বাংলায়।

ইতিমধ্যেই রাধানাথ এক অত্যাশ্চর্য কাণ্ড করে ফেললেন।

অফিসে বসে তিনি কাজ করছেন। তাঁর সহকারীরা জরীপ বিভাগের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত পরিসংখ্যান তাঁর কাছে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। চীফ কমপিউটার এবং প্রধান অঙ্কবিদ হিসেবে তিনি সেগুলি যাচাই করবেন। জটিল অঙ্কের মধ্যে তিনি গভীরভাবে ডুবে ছিলেন, হঠাৎ তাঁর মাথার মধ্যে যেন এক বিদ্যুচ্চমক হলো। তিনি অস্ফুটভাবে বলে উঠলেন, আরেঃ!

প্রথমটায় তিনি নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাঁর চোখের সামনে টেবিলের ওপর ছড়ানো নানান কাগজপত্রে শুধু অঙ্কের সংখ্যা, কিন্তু তারই মধ্যে থেকে যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগলো এক পর্বতশৃঙ্গ। সেই শৃঙ্গটি উঁচু হতে হতে যেন একেবারে স্পর্শ করলো আকাশ। রাধানাথ বিস্ময়ে বিমোহিত হয়ে মানসনেত্রে দেখতে লাগলেন ধবল মুকুট পরা সেই সুমহান দিগন্ত বিস্তারী মূর্তিমান বিশালত্বকে।

একটু পরেই তাঁর ঘোর ভাঙলো, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে এক ঝটকায় কাগজপত্রগুলি জড়ো করে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন নিজের কামরা থেকে। অদূরেই আর একটি কামরায় বসেন কর্নেল অ্যান্ড্রু ওয়া। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের জরীপ বিভাগের প্রধান। আগে থেকে এত্তেলা না পাঠিয়ে বড় সাহেবের কামরায় প্রবেশ করা যায় না, কিন্তু রাধানাথের সে কথা মনে রইলো না। তিনি ঝড়ের বেগে দরজা ঠেলে ঢুকে এসে টেবিলের ওপর কাগজগুলি আছড়ে অতি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, স্যার, দেখুন! দেখুন!

কর্নেল ওয়া তখন অন্য দু'একটি সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি হতচকিত হয়ে বললেন, কী হইয়াছে, শিকদার? ব্যাপার কি? তুমি কাঁপিতেছ কেন?

রাধানাথ বললেন, স্যার, অদ্য একটি লাল অক্ষরের দিন: আমরা আজ এই বিশ্বের মধ্যে যাহা সর্ববৃহৎ তাহার সন্ধান পাইয়াছি।

কর্নেল ওয়া তবু বুঝতে না পেরে বললেন, শিকদার, অত উত্তেজিত হইয়ো না। আসন গ্রহণ করো। কী হইয়াছে, আমায় বিস্তারিত করিয়া বলো।

রাধানাথ বসলেন না। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, স্যার দেখুন, এই পীক নাম্বার ফিফটিনের সর্বশেষ হিসাব।

কর্নেল ওয়া বললেন, তাহাতে কী হইল? পীক নাম্বার ফিফটিন তোমাকে এমত পাগল করিল কেন?

রাধানাথ বললেন, ছয়টি বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে এই পীক নাম্বার ফিফটিনকে পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে। এই দেখুন নিকলসনের প্রতিবেদন। নিকলসন কিছুই বোঝে নাই সে কি দেখিতেছে। তিন বৎসর ধরিয়া এই কাগজগুলি পড়িয়া আছে।

কর্নেল ওয়া একটু অধৈর্য হয়ে বললেন, আসল কথাটি কি তাহা তো আমি এখনো বুঝিলাম না।

রাধানাথ সগর্বে বললেন, আমি গণনা করিয়া দেখিয়াছি, ইহার উচ্চতা উনত্রিশ সহস্র দুই ফিট; এই বিশ্বে ইহা অপেক্ষা বড় আর কিছুই নাই। আমরা আবিষ্কার করিয়াছি পৃথিবীর চূড়া।

এবার কর্নেল ওয়া লাফিয়ে উঠে বললেন, বলো কী?

কর্নেল ওয়া রাধানাথের প্রতিভা বিষয়ে জানেন। তাঁর পূর্বতন সার্ভেয়ার জেনারেল রাধানাথের নামে অনেক প্রশস্তিবাণী লিখে রেখে গেছেন। সুতরাং তিনি রাধানাথের কথা সহসা অবিশ্বাস করতে পারেন না। তবু রাধানাথের সঙ্গে বসে অঙ্কগুলি মিলিয়ে দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর তিনিও এক সময় বলে উঠলেন, হুররে।

এটা একটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার মতন সংবাদ। ততক্ষণে জরীপ বিভাগের সকল কর্মী এসে জমায়েত হয়েছে সেখানে। এত বড় আবিষ্কারের কৃতিত্ব কলকাতা অফিসের। সকলের মধ্যে আনন্দ কোলাহল।

কর্নেল ওয়া সোল্লাসে রাধানাথের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, ধন্যবাদ, শিকদার, তুমি একটি বিস্ময়কর কার্য করিয়াছ।

তারপর কর্নেল ওয়া স্বগতভাবে বললেন, পুয়োর নিকলসন, হি ডিড্ নট সাসপেক্ট দ্যাট হি ওয়াজ ভিউয়িং থ্রু দা টেলিস্কোপ দা হাইয়েস্ট পয়েন্ট অফ দা আর্থ।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা কর্নেল ওয়ার গৃহে শ্যাম্পেনের বোতল খুলে এই মহান উপলক্ষটি উদ্‌যাপিত

করা হলো। গভর্নর জেনারেল এখন কলকাতায় নেই, এই সংবাদ-লেফাফা নিয়ে তাঁর কাছে চলে গেছে দূত। আজ স্থানীয় ইংরেজদের কাছে বড় আনন্দের দিন। নতুন কিছু আবিষ্কারের মর্ম ভারতীয়রা ঠিক বোঝে না, কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের সময় শ্বেতাঙ্গরা যখন নিত্য নতুন আবিষ্কারে মত্ত, তখন পৃথিবীর চূড়া আবিষ্কারের মতন ঘটনাও বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ। সারা বিশ্ব এজন্য কলকাতার জরীপ বিভাগের কৃতিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য।

কথায় কথায় প্রশ্ন উঠলো, পীক নাম্বার ফিফটিনের নতুন নাম কী হবে? দুনিয়ার সমস্ত পাহাড়ের যিনি রাজা, তিনি তো নামহীন থাকতে পারেন না। স্থানীয় লোকেরা এর কোনো নাম দিয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে কি আর অনুসন্ধান করতে পাঠাতে হবে? এ দেশের পাহাড়ের যদি কোনো এ দেশীয় নাম থাকে তবে তা পরিবর্তন করার দরকার নেই।

রাধানাথ বললেন, স্যার, আমি নিজেও কয়েকবার নামহীন শিখরগুলির পর্যবেক্ষণ অভিযানে বাহির হইয়াছি। আমি খুব ভালো করিয়াই জানি যে স্থানীয় লোকেরা এই উচ্চতম শৃঙ্গটির অস্তিত্ব সম্পর্কেই অবহিত নয়।

কর্নেল ওয়া বললেন, তাহা হইলে তো একটি নাম আমাদেরই দেওয়া কর্তব্য। বিশ্বের সকল দেশে এই আবিষ্কারের কাহিনী প্রচারিত হইবে, বিলাতে আগামী কল্যই ডেসপ্যাচ প্রেরণ করিবার কথা, সুতরাং একটি নাম তো আশু প্রয়োজন।

রাধানাথ দ্রুত চিন্তা করলেন। রাজভক্ত ইংরেজরা নিশ্চয়ই তাদের মহারানী ভিক্টোরিয়ার নাম প্রস্তাব করবে। রাধানাথ নিজ অভিজ্ঞতায় দেখেছেন যে হিমালয় যেমন পুরুষ, তেমনই হিমালয়ের পরিচিত বড় বড় শৃঙ্গগুলিকে পুরুষ হিসেবেই কল্পনা করে ভারতীয়রা। বেশ কয়েকটি নাম কোনো দেবতার নামে। সাহেবরা কোনো হিন্দু দেবতার নাম পছন্দ করবেন না। রাধানাথ নিজেও একেশ্বরবাদী, হিন্দু দেব-দেবীদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ নেই। তিনি অন্য একটি নাম আগেই চিন্তা করে রেখেছেন।

অন্য কেউ কিছু বলবার আগেই রাধানাথ বললেন, ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, আমার একটি প্রস্তাব পেশ করিতে পারি কি?

কর্নেল ওয়া উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই, শিকদার, বলো, তোমার কী অভিপ্রায়?

রাধানাথ বললেন, স্যার, জরীপ বিভাগের পূর্ববর্তী প্রধান পরিচালক জর্জ এভারেস্ট আমার গণিত শিক্ষার গুরু। ভারতীয় জরীপ বিভাগটি তিনি এমনভাবে ঢালিয়া সাজাইয়া ছিলেন যে বলিতে পারেন এই বিভাগ প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই সৃষ্টি। তিনি যে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন সেই অনুযায়ীই আজিও পর্যবেক্ষণ ও গণনা চলিতেছে। তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া এক্ষণে বিলাতে অবস্থান করিতেছেন। হিমালয়ের এই রাজশিখরটিকে তাঁহার নামে অভিষিক্ত করিলে তিনি এক পুলক-চমক পাইবেন। ভাবিয়া দেখুন, ইহাই হইবে সেই কর্মবীরের প্রতি আমাদের সমবেত উপহার। পীক নাম্বার ফিফটিনের নাম হউক জর্জ এভারেস্ট।

উপস্থিত সাহেববৃন্দ এই আলোচনার পক্ষে বিপক্ষে নানা প্রকার আলোচনা শুরু করে দিল। রাধানাথের মনে হলো নামের ব্যাপারটির দ্রুত নিষ্পত্তি করা দরকার। একবার কেউ মহারানীর নাম উত্থাপন করলেই বিপদ, কারণ, তাহলে আর তা প্রত্যাহার করা যাবে না। মহারানীর নামের বিপক্ষে কে যাবে?

কর্নেল অ্যান্ড্রু ওয়া বেশ কিছুদিন জর্জ এভারেস্টের অধীনে কাজ করেছেন, তাঁর সম্পর্কে ওয়ার শ্রদ্ধা আছে।

তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, উত্তম, শিকদার, তোমার প্রস্তাবই গ্রহণযোগ্য মনে হয়। এই নামে আমাদের দফতরটিই সম্মানিত হইবে। তবে আমি একটু সংশোধন করিতেছি, জর্জ এভারেস্ট নহে, শুদ্ধ এভারেস্ট। এই এভারেস্ট শব্দটির মধ্যেই এমন একটি ব্যঞ্জনা রহিয়াছে যাহা এই চিরকালের সর্ববৃহতের পক্ষে বেমানান হইবে না।

এরপর কয়েকদিন ধরেই বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই কাহিনী নানাভাবে প্রচারিত হওয়ায় দেশের লোক প্রথম রাধানাথ শিকদারের নাম জানলেন। ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই এখন নানাপ্রকার কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত বলে দেশবাসী তাদের চেনে। কিন্তু রাধানাথ সেই সময়কার হিন্দু কলেজের উজ্জ্বল ছাত্র হয়েও জনসাধারণের অগোচরে ছিলেন, এবার প্রকাশ্যে এলেন।

অবশ্য ইংরাজী সংবাদপত্রগুলি একজন দেশীয় লোকের কৃতিত্বের কথা প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ

করলো যথারীতি। প্রায় কোনো ইংরাজী সংবাদপত্রেই রাধানাথের নাম উল্লেখ করা হলো না, কোথাও বলা হলো 'বেঙ্গলি চীফ কমপিউটার', কোথাও বা 'ক্লার্ক' আর কোথাও বা শুধু 'এ বাবু'।

রাধানাথের বন্ধুরা একদিন রামগোপাল ঘোষের আবাসে মিলিত হলেন রাধানাথকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য। এসেছেন বর্ধমানের ডেপুটি কালেকক্টর রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এখন কলকাতার অ্যাসেসমেন্ট কালেক্টর। সুযোগ্য শিক্ষক রামতনু লাহিড়ী, কলকাতার প্রধান সরকারি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক প্যারিচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী বর্ধমান রাজের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে সদ্য চলে এসেছেন কলকাতায়, বাগ্মী ও সাংবাদিক হিসেবে তিনি সুপরিচিত, এছাড়া এসেছেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ আরও অনেকে।

ইয়ং বেঙ্গলের দল প্রবীণ হয়ে অনেকেই সুরাপান ত্যাগ করেছেন এখন। কিন্তু রামগোপাল করেননি, বরং তাঁর যেন কিঞ্চিৎ মাত্রা বেড়েছে। রামগোপালের মুখে অস্থিরতার ছাপ, তাঁর ভেতরে ভেতরে কিছু একটা জ্বালা রয়ে গেছে মনে হয়। রামগোপাল ব্র্যাণ্ডি ও শ্যাম্পেনের বোতল খুলে দিলেন, সুগন্ধ চা-ও প্রস্তুত হলো, যার যে-রকম অভিরুচি গ্রহণ করবেন।

রাধানাথ অতিশয় গো-মাংস ও সুরার ভক্ত, তাঁর বিশাল বলবান শরীরটি রক্ষার জন্যও এইসব জিনিসের প্রয়োজন। বন্ধুদের মধ্যে রাধানাথ প্রায়ই মত ব্যক্ত করেন যে, হিন্দুদের মধ্যে গো-মাংস আহারের প্রচলন করাতে না পারলে হিন্দু সমাজের কোনোদিন উন্নতি হবে না। গোখাদকরা কক্ষনো অন্য কারুর চোখ রাঙানী সহ্য করে না। এবার কলকাতায় ফিরে এসে রাধানাথ অবশ্য বিস্মিত হয়ে দেখেছেন যে তাঁর বন্ধুরা অনেকেই এখন আর গো-মাংস ভক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহী নয়। যারা একসময় প্রকাশ্যে গোরুর মাংস খেয়ে হ'ড় ছুঁড়ে দিত প্রতিবেশীদের বাড়ির ছাদে, তারা কেউ কেউ এখন আর গো-মাংসের নামও উচ্চারণ করে না। এমনকি প্যারীচাঁদ তাঁকে দু'একবার বলেছেন, না হে রাধু, ও নিয়ে আর বেশী বাড়াবাড়ি করো না, হিন্দুরা গো-মাংসের সংস্কার কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারবে না।

সেদিন অবশ্য রাধানাথের জন্য প্রচুর গো-মাংসের কাবাবও রাখা হয়েছে। ভোজনরসিক রাধানাথ তাতেই সন্তুষ্ট, ভণ্ড হিন্দুরা যত খুশী পাঁঠার মাংস খেয়ে ব্যা ব্যা করুক, তাঁর নিজের পছন্দ মতন খাদ্য পেলেই হলো।

আলাপচারি যখন বেশ জমে উঠেছে, তখন রামগোপাল একবার ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, কিন্তু আমাদের রাধা যে এতবড় একটা কাজ করলে, সরকার তার স্বীকৃতি দিলেন কোথায় ? তাকে কি একদিন পাবলিক রিসেপশন দেওয়া উচিত কর্ম হতো না ? যে কীর্তি ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে তার জন্য কোম্পানির ডিরেক্টারগণ তাকে কোনো পুরস্কার দিতে পারলে না ? অন্য দেশ হলে ওকে মাথায় তুলে নাচতো।

রাধানাথের চেহারাটি বিশাল হলেও স্বভাবে বড় লাজুক। বিশেষত নিজের বিষয়ে কোনো আলোচনা শুনতে তিনি লজ্জা পান।

তিনি বললেন, না, না, তেমন কিছু নয়। তোমরা বেশী বাড়াচ্চো।

প্যারীচাঁদ বললেন, তেমন কিছু নয় কেন ? তুমি সেদিনকে যে আমায় বোঝালে, ট্রিগোনোমেট্রির এমন জটিল গণনা করার ক্ষমতা ক'জন সাহেবের আছে ? এদেশে কারুর নেই। তোমায় নিশ্চয়ই কোম্পানির তরফ থেকে শিরোপা দেওয়া ন্যায্য ছিল।

রাধানাথ বললেন, ঐ তো কোম্পানি আমায় আলিপুরের আবহাওয়া অফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর পদ দিয়েছে।

রামগোপাল বললেন, তাতে কী হলো, তাতে শুধু তোমার অতিরিক্ত কাজ বাড়লো। তাতে কী তোমার পদোন্নতি হলো ?

এবার রসিককৃষ্ণ মল্লিক বললেন, ভায়া, ওর থেকে আর বেশী আশা করো না। কালো চামড়া কালো চামড়াই। সাহেবরা যে পদে কাজ করে, সে পদে কোনোদিন কালো চামড়াদের বসাবে না। দ্যাকো না, আমি সেই যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটিতে ঢুকেছিলাম, এখনো সেখানেই ঘষচি। আর নতুন চাকরে সাহেবরা টকাটক করে আমার মাথা টপকে যাচ্চে।

রামগোপাল বললেন, এ অবিচারের প্রতিবাদ হওয়া দরকার। এ বিষয়ে একটি সভা ডেকে

রেজোলিউশান নিলে কেমন হয় ?

রসিককৃষ্ণ বললেন, তাতে কোনো সুরাহা হবে বলে আমি মনে করি না। আমাদের চাকরি-বাকরির উন্নতিকল্পে মিটিং না ডেকে আমরা বরং দেশের উন্নতিকল্পে আরও কিছু কাজ করলে পারি। সবচে আগে প্রয়োজন দেশের মানুষের মধ্যে অবিচারবোধ জাগ্রত করা।

রাধানাথ বললেন, তুমি এই কথাটা বহোৎ বিলকুল সাচ্চা বলছো হে রসিক। এবার ফিরে এসে যেন দেকচি, জাত, ধম্মো, হিঁদুয়ানি নিয়ে ফিন হামেশা বাড়াবাড়ি শুরু হয়েচে। লোকের মন আবার যেন পিছাড়ি হটচে !

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, হীরা বুলবুল নামের বারাঙ্গনার ছেলেটিকে হিন্দু কালেজে ভর্তি করা উপলক্ষে রক্ষণশীলরা আবার নতুন করে ঘোঁট পাকাতে শুরু করেচে।

প্যারীচাঁদ বললেন, সে ছেলেটিকে তো আবার তাড়িয়েও ছেড়েচে এর মধ্যে শুনচি।

রামগোপাল রাধানাথের বাহু চাপড়ে বললেন, রাধা, তুমি নেচারের মধ্যে ম্যাগনিফিসেন্টকে আবিষ্কার করেচো, আমাদের উচিত হবে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে কত বৃহৎ, কত মহৎ রয়েচে, তা খুঁজে বার করা।

রাধানাথ বললো, ঠিক। আমায় তোমরা রাস্তা বাতাও, আমি সেদিকে কাজ করতে জরুর রাজি আছি।

প্যারীচাঁদ বললেন, অনেকে মাথা তোলার সুযোগই পাচ্ছে নাকো, সেইজন্যেই বোঝা যাচ্ছে না, তাদের আসল দৈর্ঘ্য কতখানি।

রামগোপাল বললেন, আমাদের এখন রাজনৈতিক অধিকারের জন্য আন্দোলন করা দরকার।

রসিককৃষ্ণ বললেন, ওপথে এখনো যাবার সময় হয়নি, এখনও সামাজিক আন্দোলনেই বেশী কাজ হবে। কী বলো হে, রামতনু ?

স্বল্পভাষী রামতনু বললেন, তোমার কথাই ঠিক।

রাধানাথ রামগোপালকে বললেন, তুমি তো এ যুগের ডিমস্থিনিস, তুমি চেষ্টা করলে বোহুৎ কুছ করতে পারবে।

রামগোপাল বললেন, ডিমস্থিনিস এর সঙ্গে যদি লেভিয়াথান যোগ দেয়, তাহলে ধুন্ধুমার হয়ে যাবে। কী বলো ?

রাধানাথ বললেন, বোহুৎ খুব। ম্যায় তৈয়ার।

প্যারীচাঁদ বললেন, এই রাধুটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। বোহুৎ কিছু আর বোহুৎ খুব ওর মুখ থেকে আর ছাড়ানো গেল না কিছুতেই।

হাসির রোলে হাওয়া একটু হালকা হয়ে গেল।

এক সময় রাধানাথ রামগোপালকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্রাদার, আগেরবার যখন আসি, তখন তোমার বাড়ির সামনে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছেল। সেই যে এক ছোট লেড়কিকে সেইভ করা হলো, তা সেই লেড়কিটির এখন কী অবস্থা ?

রামগোপাল বললেন, সে রয়ে গ্যাচে আমারই বাড়িতে। তার আত্মীয়-স্বজনরা কেউ তাকে ফেরৎ নিতে আসেনি। কে জানে, সবাই তো ভাবে আমি ম্লেচ্ছ, আমার বাড়িতে রাখায় তার বুঝি জাত গ্যাচে। আমার পত্নী মেয়েটার নাম দিয়েছিলেন কুড়ানী, আমি নাম রেখিচি নীপবালা। খানিকটা লেখাপড়া শিকিয়েওচি, কিন্তু কী হবে, সারা জীবন কষ্টই পাবে। আমার সাধ্য থাকলে আমি মেয়েটির বিয়ে দিতুম।

রাধানাথ উৎসাহের সঙ্গে বললেন, দেও না। আমরা সবাই থোড়া কুচ সাবক্রিপশান দিয়ে মেয়েটাকে উদ্ধার করে দিই।

রামগোপাল বললেন, টাকার জন্য কী আটকে আছে নাকি ? টাকা থাকলেই বিয়ে দেওয়া যায় ?

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, কেষ্ট বলেচে, যদি মেয়েটিকে খৃষ্টান করতে রাজি হও, তবে ওর একটা হিল্লে হয়ে যেতে পারে।

রাধানাথ বললেন, বিয়ে-শাদীর জন্য আমাদের অবলাদের কেরেস্তান হতে হবে, ইয়ে বহুৎ তাজ্জব কী বাৎ !

রামগোপাল বললেন, হিন্দু বিধবার বিয়ে দেওয়া যায় না, সে অক্ষতযোনি হলেও একবার বিধবার বিধবা থাকাই নিয়তি। তোমাদের পশ্চিমে কী হয় জানি না, এই বঙ্গে আর কিছু সম্ভব নয়।

প্যারীচাঁদ বললেন, শুনতে পাই যে সংস্কৃত কলেজের ঈশ্বর বিদ্যেসাগর নাকি বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেচেন।

রামগোপাল বললেন, সে ব্রাহ্মণ আর একলা কী করবেন ? কতটুকু পারবেন দেশ সুদ্ধ মূঢ়ের দলের মন ফেরাতে ?

মদনমোহন বললেন, সে বাম্‌নার জেদ তোমরা জানো না। একেবারে কচ্ছপের কামড়ের মতন, একবার কিছুতে লাগলে আর ছাড়ে না। শিকদের মশায়, এ ব্রাহ্মণও একখানা পাহাড়ের চূড়া, এখনো কেউ মেপে দেখেনি।

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, আমার ভয় হয়, বিদ্যেসাগর মশাইয়ের ওপর কেউ হামলা না করে। অকাল কুষ্মাণ্ডের দল যদি ওনার কোনো শারীরিক ক্ষতি করে বসে ?

প্যারীচাঁদ বললেন, সতীদাহ বিলের সময় রামমোহনকেও অনেকে মারবে বলে শাসিয়েছিল।

রামগোপাল খানিকটা আচ্ছন্নভাবে বললেন, সে সময় কিন্তু আমরাও রামমোহনের পাশে গিয়ে অনেকে দাঁড়াইনি। বাল্যের চাপল্যে আমরা রামমোহনের সুদূর প্রসারী আদর্শের মর্ম বুঝিনিকো, অনেক তুচ্ছ ব্যাপারে মত্ত ছিলুম।...

তারাচাঁদ বললেন, দেওয়ানজীর পর এই বিদ্যাসাগরই একা ভ্রম নিরসনের জন্য উঠে পড়ে লেগেচেন !

রাধানাথ বললেন, এই ঈশ্বর পণ্ডিতের কথা আমি আগেরবার এসেও শুনিচি। তাহলে ভাই আমরা এতজন রয়িচি, আমরাও ওনাকে মদৎ দিই না কেন ?

তারাচাঁদ বললেন, রাধানাথ এটি বেশ কথা বলেচে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় আমাদেরও পূর্ণ সমর্থন জানানো দরকার।

রাধানাথ বললেন, তাহলে এসো না ভাই, এইক্ষণেই আমরা একটি শপথ লই, এই ঈশ্বর পণ্ডিত বিধবা বিবাহ দেবার চেষ্টা করলে আমরা ইয়াং বেঙ্গলের দল সকলে তেনার পাশে গিয়ে খাড়া হয়ে যাবো।

সকলেই হৈ হৈ করে যার যার হাতের সুরার পাত্র কিংবা চায়ের কাপ তুলে নিয়ে একসঙ্গে সেই মর্মে শপথ বাক্য উচ্চারণ করলেন।

মোগলসরাই নামক স্থান পার হয়ে এক অপরাহ্নে গঙ্গানারায়ণ বারাণসীর সমীপে এসে উপস্থিত হলো। গঙ্গার বাম কূলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি নগরীটি তখন সদ্য দীপাবলীর আলোকমালায় ঝলমল করে উঠেছে। গঙ্গানারায়ণের হৃদয় কম্পিত হতে লাগলো। আর বেশী দেরি নেই। এবার বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

গঙ্গানারায়ণ তখনই অবশ্য নগরে প্রবেশ করলো না। তার মনের মধ্যে একটি বাধা আছে। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে যে কয়েক মাস সে পরিভ্রমণে রত ছিল, ততদিন তার স্মৃতি যেন হয়েছিল অবশ। সে আহার করেছে, নিদ্রা গেছে এবং অন্যদের সঙ্গে পথ হেঁটেছে, অর্থাৎ তার শরীর ছিল সক্রিয়, কিন্তু মনের কোনো কার্যকলাপ ছিল না। যে জীবন সে ছেড়ে চলে এসেছে, একবারও সে জীবনের ছায়াপাত ঘটেনি মনে। তার দুঃখ ছিল না, পরিতাপ ছিল না, ভয় কিংবা সুখের আকাঙ্ক্ষা ছিল না।

প্রয়াগ সঙ্গমে স্নান করার পর তার সেই মোহনিদ্রা ভেঙে গেছে। এখন সকলই তার কাছে স্পষ্ট। সে জানে, সে গঙ্গানারায়ণ সিংহ, সে ইব্রাহিমপুরের জমিদারি পরিদর্শনে এসেছিল, সে প্রজাদের পক্ষ নিয়ে অত্যাচারী নীলকরদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমেও মধ্যপথে অকস্মাৎ সব ছেড়ে চলে এসেছে। কলকাতায় রয়েছে তার জননী, তার ভাই ও বিবাহিতা পত্নী, এ সব কথা গঙ্গানারায়ণের মনে পড়লেও এখন এ সমস্ত কিছুও তার কাছে তুচ্ছ। সে আর পিছন দিকে ফিরে যাবে না। বিন্দুবাসিনীকে নিয়ে সে পরিচিত জগৎ থেকে হারিয়ে গিয়ে মানুষের অগম্য কোনো স্থানে নীড় বাঁধবে। বিস্ময়ে বিমোহিতা

বিন্দুবাসিনীর সামনে সে অকস্মাৎ উপস্থিত হয়ে বলবে, দ্যাখ বিন্দু, তোকে আমি ভুলিনি। আমি এসেছি, অনেক দূরের পথ পার হয়ে। আমরা দু'জনে আমাদের পরিচিত পৃথিবীকে পশ্চাতে ফেলে অজানা দেশে চলে যাবো।

কিন্তু গঙ্গানারায়ণের বাধাটি অন্য।

বিধুশেখরের নির্দেশে বউবাজারের কালীমন্দিরে গিয়ে দেবীমূর্তির পা ছুঁয়ে গঙ্গানারায়ণ শপথ করেছিল যে, সে আর কখনো বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করবে না। সেই শপথের কথা বিন্দুবাসিনীও জানে। সেই শপথের জন্যই যদি বিন্দুবাসিনী তাকে ফিরিয়ে দেয়? শপথভঙ্গকারীকে কেউ শ্রদ্ধা করে না, গঙ্গানারায়ণ নিজেও করে না। সে সময় গঙ্গানারায়ণের বয়স অল্প ছিল, বিধুশেখরের প্রতাপ অগ্রাহ্য করার মতন শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি, তা ছাড়া, বিন্দুবাসিনীর ওপর যাতে কোনো অত্যাচার না হয়, সেইজন্যই সে বাধ্য হয়ে নিয়েছিল শপথ। এখন সেই শপথের বাধা অতিক্রম করবে কী করে?

পথশ্রমে গঙ্গানারায়ণ ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, অবসন্ন। এখন তার শরীর চাইছে বিশ্রাম। সে অনায়াসেই রাত্রির জন্য কোনো সরাইখানায় আশ্রয় নিতে পারে। আসার পথে গঙ্গানারায়ণ তার দুটি অঙ্গুরীয় বিক্রয় করেছে, তার কাছে যথেষ্ট অর্থ আছে। তবু গঙ্গানারায়ণ ইতস্তত করতে লাগলো। বারাণসীতে সে যে বিন্দুবাসিনীর সন্ধানেই এসেছে, এ ব্যাপারে সে তার মনের সঙ্গেও কারচুপি করতে পারবে না।

বারাণসী শহরের প্রবেশ পথে মস্ত বড় একটি লোহার ফটক। কাছেই একটি কোতোয়ালি। ফটকটির দু'পাশে দাউ দাউ করে জ্বলছে দুটি মশাল। অনেকগুলি গো-যান, অশ্ব শকট ও মানুষজনের ভিড় সেখানে।

সেখান থেকে একটু পিছিয়ে এসে একটি বৃক্ষতলে বসে গঙ্গানারায়ণ শ্রান্তিতে চোখ মুদলো। অমনি সে মানস নয়নে দেখতে পেল এক করাল কালীমূর্তি, এঁর জিহ্বাটি সোনার, চক্ষুদুটিতেও স্বর্ণ ফলক বসানো, অন্ধকারে সেই জিভ ও চোখ ঝকঝক করছে। এই সেই বউবাজারের কালীমূর্তি, যাঁর সামনে শপথ নিয়েছিল গঙ্গানারায়ণ। গঙ্গানারায়ণের সর্বাঙ্গে শিহরন হলো। সে যে ঠিক ভয় পেল তাও নয়, কলেজ জীবন থেকেই সে অলৌকিক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে আস্তে আস্তে। কিন্তু এ এক অন্যরকম অনুভূতি। সে চোখ বুজে এখন বিন্দুবাসিনীর মুখখানি মনে করতে চাইছে কিন্তু তার বদলে দেখা দিচ্ছে এই ধাতু-প্রস্তরের মূর্তির মুখ। অনেক চেষ্টা করেও গঙ্গানারায়ণ বিন্দুবাসিনীর মুখখানি মনে আনতে পারলো না।

গঙ্গানারায়ণ চোখ খোলা রেখে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগলো। এই শপথের নিগড় তাকে ভাঙতেই হবে। এত দূর এসে সে তো আর ফিরে যেতে পারে না। প্রয়াগ থেকে আসার পথে সে বারবার এই কথাই ভেবেছে। অতীত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হতে পারলে বিন্দুবাসিনীকে পাবার কোনো উপায় নেই তার।

এক সময় গঙ্গানারায়ণ আপন মনেই বলে উঠলো, আমি মানি না!

মাটির ওপর হাঁটু দুটি স্থাপন করে বসে হাত দুটি অঞ্জলিবদ্ধ করে গঙ্গানারায়ণ বললো, আজ থেকে আমি তোমাদের নিকট হতে বিযুক্ত হলুম। আমি নতুন শপথ গ্রহণ করচি, আজ থেকে আমরণ আমি আর কোনো দেব-দেবীকে প্রণাম জানাবো না। এই সব দেব-দেবীরা ভ্রান্ত বিশ্বাসে গড়া কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের পুত্তলি মাত্র, যারা ওদের নিয়ে পুতুল খেলতে চায় খেলুক, আমার কাছে ওরা সব মূল্যহীন।

গঙ্গানারায়ণ তার বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে যাতায়াত করেছে অনেকবার। রাজনারায়ণ যেদিন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে, সেদিন গঙ্গানারায়ণ উপস্থিত ছিল সেখানে। সংস্কারমুক্ত ব্রাহ্মধর্মের প্রতি সেও শ্রদ্ধাশীল হয়েছিল, সে বুঝেছিল যে, রাজার জাতি খৃষ্টানদের চাপে পড়ে দেশের মানুষের মধ্যে যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণের জোয়ার এনেছে তা রোধ করার জন্য এই নতুন মত প্রচারই শ্রেষ্ঠ পন্থা এবং এর ফলে হিন্দুধর্মও একটা পরিচ্ছন্ন রূপ পাবে।

এই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও গঙ্গানারায়ণ নিজে তা গ্রহণ করতে পারেনি, তাদের গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারে এ এক দারুণ বিদ্রোহ, তার মা কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না। অনেক ধর্মপ্রাণা হিন্দু মহিলার ধারণা দেব-দেবীদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করলে অকাল মৃত্যু হয়। ধর্ম হিন্দুদের মধ্যে এনে দিয়েছে ভীরুতা। ধর্ম পালনের কারণ যেন নানাপ্রকার ভয়।

এখন গঙ্গানারায়ণ একা, তার কোনো পশ্চাৎটান নেই, সে বিশ্বাসের ব্যাপারে স্বাধীন।

গঙ্গানারায়ণ তখন সেইখানে নিজের বিবেককে সাক্ষী রেখে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করলো। সে উচ্চারণ

করলো, ওঁ তৎ সৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা সেই সত্য ।...একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম—একমাত্র অদ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী নিত্য ব্রহ্ম, আমি তাঁহার বন্দনা করিব ।...তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তরূপ স্বরূপ ব্রহ্ম...যাঁহা হইতে সকল ভূত জন্ম লাভ করে, যাঁহাতে জীবিত থাকে এবং যাঁহাতেই সব লয়প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম...আমি প্রতিদিন শুদ্ধ চিত্তে তাঁহারই বন্দনা করিব, তাঁহা বৈ আর কাহারও নয় ।...

গঙ্গানারায়ণ এখন নতুন মানুষ, পুরাতন বিশ্বাস, শপথের আর কোনো মূল্যই নেই তার কাছে । সে যদি খৃষ্টান বা মুসলমান হতো, তার পরও কি সে হিন্দু দেব-দেবীর কাছে গ্রহণ করা শপথ মান্য করতো ? বেশী কথা কি, বিন্দুবাসিনীর জন্য খৃষ্টান বা মুসলমান হতেও তার আপত্তি ছিল না, সকল ধর্মের ঈশ্বরই তো এক ।

গঙ্গানারায়ণ আবার চোখ বুজলো । এবারেও অবশ্য সে বিন্দুবাসিনীর মুখ দেখতে পেল না, এবারও অন্ধকারে ভেসে উঠলো সেই স্বর্ণজিহ্বা ও স্বর্ণনয়না কালীমূর্তির মুখ । তবু গঙ্গানারায়ণের আর কোনো দায় নেই । সে ঠিক জানে, তার দৃষ্টি একদিন স্বচ্ছ হয়ে যাবে ।

এবার গঙ্গানারায়ণ উঠে হাঁটতে হাঁটতে ফটক পেরিয়ে চলে এলো বারাণসী শহরের মধ্যে । পথে পথে মশাল জ্বলছে, দোকানপাটে চলছে কেনাবেচা । সে এক দোকান থেকে কিনলো এক প্রস্থ নতুন পোশাক, তীর্থযাত্রীর ধূলি-মলিন বেশ সে এবারে ছাড়বে । অপর এক দোকান থেকে সে কচৌড়ি ও মালাই কিনে উদর পূর্তি করলো, তারপর আশ্রয় নিল কাছাকাছি এক সরাইখানায় । এই রাত্রে বিন্দুবাসিনীর খোঁজ করে কোনো লাভ নেই ।

বারাণসী শহরটি সম্পর্কে গঙ্গানারায়ণের সম্যক কোনো ধারণা ছিল না । কলকাতার চেয়েও এর লোকসংখ্যা বেশী । কত রকমের মানুষ ! সকাল বেলা পথে বেরিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেল সে ।

কতকালের প্রাচীন এই শহর, হিন্দুদের পরম পবিত্র তীর্থ । স্বয়ং শিব এখানে এসে ভিক্ষা নিয়েছিলেন অন্নপূর্ণার কাছ থেকে । আবার এই শহর মুসলমানদের অধীনেও থেকেছে, মন্দিরের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে মসজিদ । এক হিন্দু জমিদারের হাতে কাশীর জমিদারির স্বত্ব দিয়েছিলেন অযোধ্যার নবাব । আবার এই জমিদারি শাসনের অধিকার অযোধ্যার নবাব দিয়ে দিয়েছেন ইংরেজদের । ফলে এখানে হিন্দু, মুসলমান এবং ইংরাজ নারী-পুরুষ যত্রতত্র দেখা যায় । ভীরু তীর্থযাত্রীদের দলের পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায় সাহেব রাজপুরুষ । অথবা ঝমঝম করে তাঞ্জাম হাঁকিয়ে যেতে দেখা যায় কোনো অভিজাত মুসলমানকে । আবার এক সঙ্গে এক দঙ্গল সাধুর শোভাযাত্রায় রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় । বিভিন্ন জায়গার রাজা মহারাজারাও জাঁকজমকের সঙ্গে আসেন পুণ্য অর্জনের জন্য । নানা বয়েসের বিধবা ও বৃদ্ধ ধর্মভীরু বাঙালীর সংখ্যাও ভিড়ের মধ্যে কম নয় ।

গঙ্গানারায়ণ জানে, তার পিতা রামকমল সিংহ এক সময় বারাণসীতে একটি বাড়ি কিনেছিলেন । বিধুশেখরের নিজস্ব কোনো সম্পত্তি নেই এখানে। বিধুশেখর দূর দেশে ঘোরাঘুরি পছন্দ করেন না বলে তাঁর ভূসম্পত্তি তিনি কলকাতাতেই বাড়িয়ে চলেছেন । সুতরাং, বিন্দুবাসিনীকে কাশীতে রামকমল সিংহের বাড়িতেই রাখা হবে, এটাই গঙ্গানারায়ণ স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছিল । দলিলপত্র দেখে সে বাড়িটির ঠিকানাও জানা ছিল তার ।

পথঘাট সে চেনে না, লোককে জিজ্ঞেস করতে করতে এগোলো গঙ্গানারায়ণ । তাকে যেতে হবে দশাশ্বমেধের ঘাটের কাছে । এখানে নাকি ঘাট আছে প্রায় আশিটি, তার মধ্যে যে পাঁচটি ঘাটকে বলে পঞ্চতীর্থ, তার মধ্যে দশাশ্বমেধ একটি, সুতরাং সবাই চেনে । পথের লোককে কিছু জিজ্ঞেস করলে তারা স্বেচ্ছায় অনেক কথা জানিয়ে দেয় । কাশীর মানুষ অচেনা লোকদের সঙ্গেও কথা বলতে ভালোবাসে, এরা কলকাতার লোকদের মতন নয় ।

বেশ কিছু দূর যাবার পর গঙ্গানারায়ণের চোখে পড়লো একটি উচ্চ মন্দিরের চূড়া । রৌদ্রকিরণে মন্দিরের উপরিভাগ ঠিক সোনার মতন ঝকঝক করছে । এমন মন্দির সে আগে কখনো দেখেনি । পথের লোককে সেই মন্দিরের কথা জিজ্ঞেস করতে তারা সাঙ্ঘাতিক অবাক হয়ে গেল । কাশীতে এসেও বাবা বিশ্বনাথের মন্দির চেনে না, এ কোন্ পাপী ?

গঙ্গানারায়ণ লোকের কথায় জানতে পারলো যে, মন্দিরের চূড়াটি সত্যিই সোনার । এ মন্দির কতকালের কেউ জানে না । তবে ঔরঙ্গজেবের আমলে এই মন্দির একবার ধ্বংস করা হয়েছিল । রানী অহল্যাবাঈ মন্দিরটি আবার গড়ে দিয়েছেন আর মহারাজা রণজিৎ সিংহ শিখরটি মুড়ে দিয়েছেন

সোনায়। একজন পথের সাথী গঙ্গানারায়ণের হাত চেপে ধরে বললো, চলো, আমিও মন্দিরে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে গিয়ে বিশ্বনাথ দর্শন করে আসবে। কাশীতে এসে আগে বিশ্বনাথকে প্রণাম করে তারপর অন্য কাজ শুরু করতে হয়।

গঙ্গানারায়ণ হাত ছাড়িয়ে নিল। দূর থেকে মন্দির দর্শন করাই তার পক্ষে যথেষ্ট। আর কোনোদিন সে পাথরের মূর্তিকে প্রণাম করবে না।

দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে সেই বাড়িটির সন্ধান পাওয়া গেল। সে বাড়ির চত্বরে কয়েকজন বলশালী হিন্দুস্থানী সারা গায়ে তেল মেখে কুস্তি লড়ছে। ঊরুতে চপাস চপাস করে চড় মেরে তারা পরস্পরের প্রতি হুংকার ছেড়ে বলছে, চলে আও, চলে আও পাঠ্যে! সে বড় মজাব কুস্তি খেলা, একজন আর একজনের ওপর লাফিয়ে পড়ছে বটে, কিন্তু কেউ কারুকে ধরে রাখতে পারছে না, অত্যধিক তৈল মর্দনের জন্য তাদের শরীর দারুণ পিচ্ছিল, ধপাস ধপাস করে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে এবং হাসছে।

তাদের খেলা দেখবার জন্য কিছু দর্শকও জমেছে। গঙ্গানারায়ণও দাঁড়িয়ে গেল। সেই যুযুধানদের ভেদ করে বাড়ির সদরে যাওয়া যাবে না। বাড়িটি আগাগোড়া কঠিন পাথরের তৈরি, ত্রিতল, ভিতর দিকে কয়েকটি মহল আছে বলে মনে হয়। গঙ্গানারায়ণ যখন কলেজের ছাত্র, সেই সময় তার পিতা রামকমল সিংহ এখানে কিছু দিন ছিলেন কমলাসুন্দরীকে নিয়ে।

কুস্তি শেষ হবার পর ঐ পালোয়ানদেরই একজনকে গঙ্গানারায়ণ প্রশ্ন করলো যে, ঐ বাড়ির মধ্যে কে আছে? সে কলকাতা থেকে এসেছে, ঐ বাড়ির অন্দরমহলে একবার যেতে চায়।

পালোয়ানটি বিস্মিত হয়ে বললো যে, কুঠিটির অন্দরমহলে বাঙালীবাবুটি গিয়ে কী করবে? এই কুঠির মালিক তো রাজা চৈত সিং, তিনি কয়েকদিনের মধ্যে কাশী দর্শনে আসবেন বলে তাঁর কয়েকজন দেহরক্ষী অগ্রিম এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, তা ছাড়া আর বাড়িতে কেউ নেই।

তবে কি ঠিকানা ভুল হলো? তাইবা কী করে হবে? গঙ্গানারায়ণ আর একবার বাড়িটির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল যে, সদর দ্বারের পাশে দেওয়ালে একটি চৌকো শ্বেতপাথরে দেবনাগরী হরফে লেখা আছে, 'সিংহ মঞ্জিল'। গঙ্গানারায়ণ সেদিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললো, এ বাড়ি তো কলকাতার সিংহবাবুদের। এ বাড়ি আমাদের।

পালোয়ানরা এ বিষয়ে কিছু জানে না। তারা প্রত্যেক বছর একবার করে রাজা চৈত সিং-এর সঙ্গে কাশীধামে আসে আর এই বাড়িতেই ওঠে। চৈত সিং-এর কুঠির নাম যে সিংহ মঞ্জিল হবে, এই সাধারণ কথাটাও এই বাঙালীবাবুটি বোঝে না? তারা সরল লোক, তারা বললো, বাড়ির মালিকানা নিয়ে তো তাদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই, আর এক সপ্তাহের মধ্যে রাজা সাহেব নিজে এসে যাবেন, তখন তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য যেন বাঙালীবাবটি অপেক্ষা করেন।

গঙ্গানারায়ণের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সত্যিই তো, রাজা চৈত সিং-এর বাড়ির নামও তো সিংহ মঞ্জিল হতে পারে। তা হলে কী এ তল্লাটে আর কোনো সিংহ মঞ্জিল আছে? দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে সিংহ মঞ্জিল নামে বাড়ির কথাই তো সে জানে।

যে-কয়েকজন দর্শক উপস্থিত ছিল, তারা বললো যে না, এদিকে সিংহ মঞ্জিল নামে আর কোনো বাড়ির কথা তাদের জানা নেই। তবে বাঙালীবাবুটি এক কাজ করতে পারে। দশাশ্বমেধ ঘাটে মনসারাম নামে একজন ছড়িওয়ালা থাকে, যার পেশা সকলের কপালে চন্দনের ফোঁটা লাগানো, সেই মনসারাম ছড়িওয়ালা এ তল্লাটের সব কুঠির খবর রাখে। তার কাছে জিজ্ঞেস করলে সব জানা যাবে।

ঘাটে এসে মনসারামকে খুঁজে পেতে দেরি হলো না। দু'একজন উৎসাহী লোক গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে সঙ্গেই এলো। দর্মা দিয়ে তৈরি একটা বিরাট ছাতার নিচে বসে আছে মনসারাম। লম্বা, সিড়িঙ্গে চেহারা, দেখে মনে হয় বয়সের গাছ পাথর নেই।

মনসারাম সব বৃত্তান্ত শুনে বললো, হাঁ, কলকাত্তার বাবু রামকমল সিংজীর কথা তার খুব মনে আছে। বহুৎ রহিস আদমি ছিলেন, প্রতি রাতে এখানে বজরার ওপর বাঈজী নিয়ে খুব নাচা-গানা ফুর্তি করতেন। শুধু তাই নয়, বাবুর দিল ছিল খুব বড়, প্রতি মাসে একবার তিনি বারাণসীর সব পাণ্ডা আর ব্রাহ্মণদের পেট চুক্তি খাওয়াতেন। ওঃ সে কি জবর খাওয়া, মনসারাম ছড়িওয়ালার এখনো মনে আছে। হাঁ, ঐ যে কাছেই সিং মঞ্জিল, ঐটাই ছিল রামকমল সিং বাবুর কোঠি।

তাহলে ঐ বাড়ি এখন চৈত সিং-এর হলো কী করে? এ প্রশ্নের উত্তরে সে জানালো যে, পাঁচ ছ' বছর আগে ঐ কোঠি বিক্রি হয়ে গেছে, কলকাত্তা থেকে রামকমল সিংহ বাবুর দেওয়ান এসেছিল, তার কাছ থেকে রাজা চৈত সিং খুব মুফ্‌তে বাড়ি কিনে নিয়েছেন, মাত্র সাড়ে বারো শ' রূপেয়াতে। অথচ

রামকমল সিং-বাবুজী নিজে কিনেছিলেন পঁচিশ শো টাকা দিয়ে, সে সব জানে। এই তো নসীব, বড় মানুষ মারা গেলে তার সম্পত্তি ছারখার হয়ে যায়, মনসারাম এরকম কত দেখেছে।

উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় গঙ্গানারায়ণ ঘাটের এক প্রান্তে এসে জলের দিকে মুখ করে বসলো। এবার সে কোথায় বিন্দুবাসিনীর সন্ধান করবে ? বারাণসী যে এত বৃহৎ জায়গা, সে আগে কল্পনাও করেনি। এর মধ্যে একটি অন্দরবাসিনী নারীকে সে খুঁজে পাবে কী ভাবে ? নিজস্ব কোনো আশ্রয় নেই, তাহলে বিধুশেখর কোথায় পাঠালেন বিন্দুবাসিনীকে ! বিধুশেখর নিজে আসেননি, কোনো কর্মচারী মারফৎ মেয়েকে বিদায় দিয়েছেন, সেই লোক কি বিড়াল পার করার মতন বিন্দুবাসিনীকে যে-কোনো জায়গায় অসহায়ভাবে ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছে ?

অথবা এমনও হতে পারে, বিধুশেখর বিন্দুবাসিনীকে আদৌ পাঠাননি কাশীতে। সে চতুর ব্রাহ্মণকে কিছু বিশ্বাস নেই। ভবিষ্যতেও যাতে কোনোদিন গঙ্গানারায়ণ তার সন্ধান না পায় সেইজন্য বিধুশেখর বিন্দুবাসিনীকে হয়তো অন্য কোথাও প্রেরণ করে রটিয়ে দিয়েছেন কাশীর কথা। কৃষ্ণনগরে বিধুশেখরের পৈতৃক বাড়ি আছে, সেখানে রেখে আসেননি তো ! না, কৃষ্ণনগর বেশী দূর নয়, তাহলে জানাজানি হয়ে যেতই।

রাগে হতাশায় গঙ্গানারায়ণ অত্যন্ত অবসন্ন বোধ করলো। কিন্তু সে বুঝতে পারলো, তাকে ভেঙে পড়লে চলবে না। বিন্দুকে খুঁজে বার করতেই হবে। বিন্দুর জন্য সে সব কিছু ছেড়ে এসেছে। আর তার ফেরার পথ নেই। বিন্দুকে সে যদি খুঁজে নাও পায় তাহলেও সে চিরজীবনের মতন এই কাশীতেই থেকে যাবে।

এরপর বেশ কয়েকদিন সে কাশীর অলি গলিতে ঘুরে বেড়ালো সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা। ভোরে কিংবা অপরাহ্নে স্নানের সময়ও সে ঘাটগুলি তন্ন তন্ন করে খোঁজে। কখনো দূর থেকে কোনো যুবতীকে দেখে বিন্দুবাসিনী বলে ভ্রম হয়। সে কাছে ছুটে যায়, সেই সব মুহূর্তে তাকে মনে হয় উন্মাদের মতন। কিন্তু বিন্দুবাসিনীর কোনো চিহ্ন নেই।

সারা বারাণসী ঘুরে গঙ্গানারায়ণের অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। যত বড় তীর্থ ক্ষেত্র, সেখানে ততবেশী পাপের আড্ডা। ইংরেজরা কাশীতে পুলিস চৌকি বসিয়েছে বটে, কিন্তু এখানে আইন শৃঙ্খলার প্রায় কোনো অস্তিত্ব নেই। একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট আছে, আদালত-গারদ আছে। কিন্তু কেউ তা মান্য করে না। সাধুপুণ্যার্থীদের মতনই প্রায় সমান সংখ্যক গুণ্ডা বদমাস গিসগিস করছে এখানে। গলিতে গলিতে অসংখ্য বাঈজী ও দেহ পসারিণী। একদিন সন্ধ্যার পর একটি গলিতে ঢুকে পড়ে সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। প্রতি গৃহের দরজায় দরজায় রূপসী স্ত্রীলোকদের জেল্লা। তাকে দেখে খলখলিয়ে হেসে উঠেছিল তারা। দু' তিনজন এসে চেপে ধরেছিল তার হাত, অতি কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে মান নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছে গঙ্গানারায়ণ।

আর একদিন গঙ্গানারায়ণের প্রায় চোখের সামনেই কয়েকজন দুর্বৃত্ত এক শেঠজীর মাথায় ডাণ্ডা মেরে তার সর্বস্ব অপহরণ করে নেয়। অল্প দূরত্বে গঙ্গানারায়ণ এক প্রাচীরের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল, নইলে সেও বিপদে পড়তো। শেঠজীর সঙ্গের এক ভৃত্য ভয় পেয়ে তারস্বরে চিৎকার করে যাচ্ছিল, সে-ও বেশী দূর যেতে পারলো না, গুণ্ডারা তাড়া করে গিয়ে চুরমার করে দিল তার মাথা। আরও একদিন সে দেখেছিল, মধ্য গঙ্গার ওপরে একটি বজরায় হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠেছিল দাউদাউ করে। তীরের লোকেরা বলাবলি করেছিল, দস্যুরাই নাকি বজরা লুণ্ঠন করে এমনভাবে আগুন লাগিয়ে দেয়। সন্ধ্যার পর বারাণসী অতি ভয়ংকর স্থান। গঙ্গানারায়ণ ধনী পরিবারের সন্তান, চিরকাল যত্নে লালিত, বাহির পৃথিবীতে একা একা ঘুরে তার নিত্যনতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হতে লাগলো। মাঝে মাঝেই সে ভাবে, কতখানি হৃদয়হীন মানুষ বিধুশেখর, কাশীর মতন এমন বিপদসঙ্কুল জায়গায় কন্যাকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি সুস্থির থাকতে পারেন !

মনিকর্ণিকার ঘাটে গঙ্গানারায়ণ প্রতি অপরাহ্নেই একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখে। এক বিশাল চেহারার সাধু ভেসে থাকেন গঙ্গার স্রোতে। এক ঘণ্টা, দু' ঘণ্টা, কখনো বা তিনি সারাদিনই থাকেন জলে এবং এমন নিস্পন্দভাবে ভেসে থাকেন যে মনে হয় যেন তিনি শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এই সাধুকে পথ দিয়ে হাঁটতেও দেখেছে গঙ্গানারায়ণ, ইনি সব সময়েই সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে থাকেন এবং বপুটি যেন একটি পাহাড়ের মতন, থপথপ করে হাঁটার সময় একাই সমস্ত পথটা জুড়ে রাখেন।

এই সাধু সম্পর্কে কারুকে কিছু প্রশ্ন করলেই অমনি বহুরকম কাহিনী শোনা যায়। এই সাধুর আসল নাম কেউ জানে না, কেউ বলে ওঁর নাম আগে ছিল শিবরাম, কেউ বলে গণপতি সরস্বতী, কিন্তু তেলঙ্গ

দেশ থেকে এসেছেন বলে সবাই তৈলঙ্গ স্বামী বলে ডাকে। এঁর বয়েস যে কত শো বছর তার কোনো হিসেব নেই, কাশীতেই নাকি উনি আছেন প্রায় দেড় শো বৎসর। ইনি ইচ্ছা মতন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন। উলঙ্গ হয়ে ফেরেন বলে একবার এক ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট ওঁকে কারাদণ্ড দিয়েছিলেন, উনি সশরীরে বদ্ধ কারাগার থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে সেই ম্যাজিস্ট্রেটের পাশে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন। আর একবার এক সাহেব তাঁকে জোর করে ম্লেচ্ছ খাবার খাওয়াতে চেয়েছিলেন। সাধুজীর চন্দন ও বিষ্ঠায় সমজ্ঞান, তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে বলেছিলেন, "তুম্‌কো খানা ম্যায় খা সকতা, লেকিন ইসকে পহ্‌লে মেরে খানা তুম্‌কো খানা হোগা।" তারপর তিনি নিজ পশ্চাৎদেশে হাত দিয়ে খানিকটা পুরীষ এনে বলেছিলেন, সাহেব, এই আমার আজকের খানা। তিনি অম্লান বদনে খেয়েও নিয়েছিলেন সেটি। তারপর থেকে সাহেবরা হুকুম জারি করে দিয়েছে যে তৈলঙ্গস্বামী উলঙ্গ হয়েই যত্রতত্র ঘুরতে পারবেন, কেউ তাঁকে কোনপ্রকারে বাধা দিতে পারবে না।

আর একবার উজ্জয়িনীর রাজা মধ্য গঙ্গায় নৌকাবিলাস করছিলেন, তৈলঙ্গ স্বামী সেই নৌকায় উঠে রাজার কোমর থেকে একটি অতি মূল্যবান তরবারি হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ জলে ফেলে দিলেন। তরবারিটি নানাপ্রকার রত্নখচিত এবং মহারাজার মর্যাদাস্বরূপ ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া, তাই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে এই উন্মাদ সাধুকে মারতে উঠলেন। তৈলঙ্গস্বামী নির্বিকার ভাবে গঙ্গার জলে হাত ডুবিয়ে তুলে আনলেন হুবহু একই রকম দুটি তরবারি, তারপর রাজাকে বললেন, এর মধ্যে কোনটি তোমার বেছে নাও। হতবুদ্ধি রাজা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না ঐ দুটির মধ্যে কোনটি তাঁর। তখন সাধু রাজাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, মূর্খ, নিজস্ব জিনিস ঠিক মতন চেনো না, অথচ এটা আমার, ওটা আমার বলে চেঁচিয়ে মরো।

তৈলঙ্গস্বামী ইদানীং মৌনী। গঙ্গানারায়ণ দেখে যে জল থেকে তিনি উঠে আসবার পর তাঁর এক মারাঠী ভক্ত তাঁর শরীর মুছিয়ে দেয়। আর দলেদলে নারী পুরুষ তখন ছুটে গিয়ে তৈলঙ্গস্বামীকে ঘিরে ধরে বিলাপ করতে করতে তাদের রোগ-ভোগ আপদ-বিপদের কথা জানিয়ে প্রতিকারের প্রার্থনা জানায়। সাধু যেন কিছুই শুনতে পান না। তিনি পাহাড়ের মতন বধির, অবিচল। একটু পরে তিনি ঘাট ছেড়ে চলে যান, সকলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম জানায় তাঁর উদ্দেশ্যে, কেউ কেউ চিৎকার করে বলে, চলন্ত শিব, চলন্ত শিব!

গঙ্গানারায়ণ দূরে বসে দেখে। বারাণসীতে পা দেবার পর থেকে সে কোনো দেবদেবীর মূর্তি কিংবা কোনো সাধু সন্ন্যাসীকে প্রণাম জানায়নি। ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করার সময় সে এক অঞ্জলি জল নিয়ে পরম ব্রহ্মের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সে এখন ব্রাহ্ম, পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মের সঙ্গে তার আর কোনো সংশ্রব নেই। তৈলঙ্গস্বামী ছাড়া আরও কত সাধু আছেন কাশীতে, তাঁদের ঘিরে ভক্ত দল, অনেক সাধু অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখান, নিরুদ্দিষ্ট লোকের সন্ধানও এঁরা বলে দিতে পারেন এমনও শোনা যায়, তবু গঙ্গানারায়ণের প্রবৃত্তি হয় না তাঁদের কাছে যাওয়ার।

একটি তরুণী বিধবার সঙ্গে বিন্দুবাসিনীর খুব সাদৃশ্য আছে, সেই যুবতীটি আর কয়েকজন বিধবার সঙ্গে স্নান করতে আসে মনিকর্ণিকার ঘাটে। এক এক সময় তাকে অবিকল বিন্দুবাসিনী বলেই মনে হয়, গঙ্গানারায়ণ 'বিন্দু' বলে ডেকে উঠতে যায়: আবার অন্য সময় মনে হয়, না, এ বিন্দুবাসিনী হতে পারে না। যুবতীটির সঙ্গিনীরা কেউ বাঙালী নয়, যুবতীটি তাদের সঙ্গে পরিষ্কার হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বলে। অবশ্য এই কয় বৎসরে বিন্দুবাসিনী তো বারাণসীর ভাষা শিখে নিতেই পারে। মেয়েটি যেন বিন্দুবাসিনীর তুলনায় একটু বেশী লম্বা। যুবতীটির সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের চোখাচোখিও হয়েছে, তাতে পরিচয়ের সামান্য চিহ্নও নেই। বিন্দু হঠাৎ গঙ্গানারায়ণকে দেখলে নিজে থেকেই ছুটে আসবে না?

পর পর কয়েকদিন দেখার পর গঙ্গানারায়ণ সেই যুবতীটির সঙ্গে বিন্দুর আরও দু' একটি বৈষম্য খুঁজে পেল। না, এই মেয়েটি বিন্দু নয়। তবু, গঙ্গানারায়ণ ঠিক সময়ে এসে মণিকর্ণিকার ঘাটে বসে আছে। একদিন সে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলো। বিন্দু নয় জেনেও সে প্রতিদিন এই যুবতীকে দেখতে আসে কেন? বিন্দুবাসিনীর সন্ধান স্থগিত রেখে সে এখানে এসে ঐ যুবতীটির জন্য প্রতীক্ষা করে। গঙ্গানারায়ণ মণিকর্ণিকা ঘাটে আসাই বন্ধ করে দিল।

মাসাধিক কাল কেটে গেছে, বিন্দুর অস্তিত্বের কোনো চিহ্নই সে পায়নি। একদিন গঙ্গানারায়ণ দশাশ্বমেধ ঘাটের পৈঠায় বসে সূর্যাস্ত দেখছে, এমন সময় ছড়িওয়ালা মনসারাম তার পাশে এসে

দাঁড়ালো। অনেক বাঙালীর সঙ্গে সংসর্গের দরুণ মনসারাম কিছু কিছু বাংলা জানে। সে জিজ্ঞেস করলো, আপনি বাবু রামকমল সিং-এর কোঠির খোঁজ করছিলেন, আপনি তার কে হন ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, পরলোকগত রামকমল সিংহ আমার পিতা।

মনসারাম বললো, আপনি কাশীতে একা একা কী করছেন ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমি একটি রমণীকে খুঁজছি, আমার আত্মীয়া বলতে পারেন। আপনি তো অনেক কিছুর সন্ধান রাখেন, আপনি বলতে পারেন কি, একটি বিধবা মেয়ে, বাঙালী, তার নাম বিন্দুবাসিনী—

মনসারাম গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, হাঁ, তার কথা আমি জানি, বাবু রামকমলের দোস্ত বিদ্ধুবাবুর লেড়কি, সে এখানে থাকতো ঠিকই, কিন্তু আপনি তাকে খুঁজে পাবেন না, সে মারা গেছে, আপনি ফিরে যান। লালা হরদয়ালের কাছে ঐ লেড়কির নামে টাকা আসতো বিদ্ধুবাবুর কাছ থেকে। গত বৎসর লালা হরদয়াল সে টাকা ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

গঙ্গানারায়ণ তীব্র চোখে মনসারামের দিকে তাকিয়ে বললো, সে মারা গেছে ? হতেই পারে না ! কবে মারা গেছে, কী করে মারা গেছে ?

মনসারাম সস্নেহে গঙ্গানারায়ণের বাহু ছুঁয়ে বললো, সে সব কথা আর জেনে লাভ কী, তাতে আপনার কষ্ট বাড়বে, তাকে তো আর আপনি ফিরে পাবেন না। আপনার মতন জোয়ান ছোকরার পক্ষে কাশী জায়গা ভালো না। আপনি আপনার মুলুকে ফিরে যান। আমি বলছি, তাতেই আপনার ভালো হবে। এই বয়সে কি কেউ একা একা দুঃখী দুঃখী মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় !

গঙ্গানারায়ণের দৃঢ় বিশ্বাস হলো, ছড়িওয়ালা বিন্দুর মৃত্যুর ব্যাপারটি সত্য বলেনি। মনসারাম অনেক কিছু জানে, তার কাছে গোপন করে যাচ্ছে। মনসারামকে আর সে ছাড়বে না।

অনেকদিন পর বিধুশেখর একটু সামলে উঠেছেন। ইতিমধ্যে কঠিন পীড়ায় তাঁর প্রাণাশঙ্কা হয়েছিল, কয়েকদিনের জন্য তাঁর কথা বলার শক্তিও চলে গিয়েছিল. তিনি শুধু তীব্র চোখ মেলে চেয়ে থাকতেন। বহুমূত্র বড় দুষ্ট ব্যাধি, কখন কাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, তার কোনো ঠিক নেই। অসীম মানসিক বলেই আবার উঠে বসেছেন বিধুশেখর। কণ্ঠস্বরও ফিরে পেয়েছেন, কিন্তু সব ক'টি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ফিরে পাননি, তাঁর বাঁ পা ও বাঁ হাত প্রায় অসাড় হয়ে গেছে, বাঁ চোখের দৃষ্টিশক্তি একেবারেই নেই, তাঁর নিশ্বাসও এখন নাসিকার ডান ফুটো দিয়েই নিতে হয়। যে-কোনো কারণেই হোক, শরীরের বাম দিকটাই তাঁর অধিকতর প্রিয় ছিল।

প্রথম কিছুদিন অপরের স্কন্ধে ভর দিয়ে চলাফেরা করতে হতো। ক্রমে ক্রমে তিনি আবার নিজেই নিজের ভার বইতে সক্ষম হলেন। ডান হাতে একটি মোটা লাঠি থাকে, বাঁ পা-টি সামান্য হেঁচড়ে হাঁটতে হয়, কিছু দূরে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে বিশ্রাম নেন। এই ক্ষুদ্র অসুবিধেগুলি অগ্রাহ্য করা অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর অভ্যেস হয়ে গেল, এখনো তিনি তাঁর নিজস্ব পরিমণ্ডলে পূর্ণ আধিপত্য বজায় রাখতে চান।

ইতিমধ্যে স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে বিধুশেখরের। আদালতে যাওয়াও তিনি বন্ধ করেছেন। এখন গৃহই তাঁর বিশ্ব। একটি গৃহ নয়, দুটি।

তাঁর নিজগৃহে বর্তমানে কিছু অশান্তি চলছে। জ্যেষ্ঠা কন্যা নারায়ণীই এখন সংসারের কর্ত্রী। বিধবা হয়ে নারায়ণী তিনটি সন্তান সমেত চলে এসেছিল পিত্রালয়ে, তিনটিই মেয়ে। তাদের মধ্যে দুটির বিবাহ হয়ে গেছে, একটির এখনো বাকি। বিধুশেখরের কনিষ্ঠা কন্যা সুহাসিনীর মৃতপিতৃক পুত্রসন্তানটির বয়েস এখন পাঁচ বৎসর। এই নাতিটি বিধুশেখরের প্রাণাধিক প্রিয়, এর নামও তিনি রেখেছেন প্রাণগোপাল। অসুস্থ অবস্থায় এই প্রাণগোপালকে দেখেই তিনি শান্তি পেয়েছেন, এর জন্যই তিনি চেয়েছেন বেঁচে থাকতে। যেন তাঁদের গৃহদেবতাই মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছেন এই বংশে, ওকে

'গোপাল' 'গোপাল' বলে ডাকলেই বিধুশেখরের হৃদয় জুড়িয়ে যায়, মৃত্যুকালেও তিনি এই নাম উচ্চারণ করতে করতেই শেষ নিশ্বাস ফেলবেন।

প্রাণগোপালকে তার পিতৃকুল নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে চায়। অসুস্থ অবস্থাতেই এ সংবাদ শুনে বিধুশেখর ক্রোধে জ্বলে উঠেছিলেন। পূজারী ব্রাহ্মণদের এত দূর স্পর্ধা! অকৃতজ্ঞতা আর কাকে বলে! ঘরজামাই করবেন বলেই তিনি গরিব বংশ থেকে একটি সচ্চরিত্র মেধাবী যুবককে বেছে নিয়ে সুহাসিনীর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। সে সময় তিনি পার্বতীচরণের সংসারে অর্থসাহায্যও করেছিলেন প্রচুর। আজ সেই পার্বতীচরণের বাপের এত সাহস যে প্রাণগোপালকে বিধুশেখরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায়! পার্বতীচরণের ভাগ্যে নেই, তাই সে বেঁচে থেকে এ সংসারের সুখ ভোগ করে যেতে পারলো না। কিন্তু সে ছিল এই পরিবারের প্রতিশ্রুত ঘরজামাই, সুতরাং তার পুত্রসন্তানের ওপর তো বিধুশেখরেরই সম্পূর্ণ অধিকার।

এদিকে পার্বতীচরণের বাপ শিবলোচন বারবার এসে বলাবলি করছেন, নাতি তো তাঁরও, নাতিকে না দেখে তাঁরও প্রাণ পোড়ে। শিবলোচনের গৃহিণী এখনও পুত্রশোক ভুলতে পারেননি, এখনও প্রতিদিন কান্নাকাটি করেন, পার্বতীচরণের ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে তিনি তবু কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন।

বিধুশেখর খুব ভালোভাবেই জানেন যে, এই প্রাণ পোড়া কিংবা কান্নাকাটির কথা সব মিথ্যে, এসবই স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভণ্ডামি। ঐ শিবলোচনটা একদিনের তরেও ছেলে-ছেলের বউকে ঘরে নেয়নি, পার্বতীচরণ মারা যাবার পর সুহাসিনীকে সান্ত্বনা জানাবার জন্য একবারও আসেনি, হঠাৎ এতদিন পর শুধু নাতির জন্য দরদ উথলে উঠেছে! কুলীনের ঘরে পুত্রসন্তানের দাম অনেক। প্রাণগোপাল আর একটু বড় হলেই শিবলোচন ওর পাঁচটা দশটা বিয়ে দিয়ে অর্থ উপার্জন করবে। নাতি যাতে পর না হয়ে যায়, তাই নিজের কাছে রাখতে চায়।

এমন কি বিধুশেখরের রাখা প্রাণগোপাল নামও শিবলোচনদের পছন্দ হয়নি।ওরা নাম রেখেছে কালিকাপ্রসাদ। শিবলোচন যখন এ বাড়িতে এসে ডাকেন, কই, দাদুভাই, কালিকাপ্রসাদ—তখন বিধুশেখরের আপাদমস্তক জ্বলে যায়। এ যেন ইচ্ছে করেই তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য তাঁর দেওয়া নামে ওরা কক্ষনো ডাকে না।

এক মাস আগে শিবলোচন এসে বলেছিলেন, অন্তত কিছুদিনের জন্য প্রাণগোপালকে তিনি নিজের কাছে রাখতে চান। বিধুশেখর তখন সদ্য রোগমুক্ত হয়ে সবেমাত্র শয্যায় উঠে বসতে পারছেন, বাইরে আসতে পারেন না। তিনি শিবলোচনের সঙ্গে দেখাও করলেন না, সোজা বলে পাঠালেন যে বিধুশেখর মুখুজ্যের নাতি একদিনের জন্যও এ বাড়ি ছেড়ে যাবে না। শিবলোচনের যতবার ইচ্ছে হয়, এ বাড়িতে এসে নাতির মুখ দেখে যেতে পারে।

শিবলোচন অপমানিত হয়ে শাসিয়ে গেছেন যে আদালতে গিয়ে তিনি মকদ্দমা রুজু করবেন। নাতির ওপরে ন্যায্য অধিকার তাঁর। বিধুশেখর ওষ্ঠ উল্টে হেসেছেন। যজমানী বামুন তাঁকে মকদ্দমার ভয় দেখায়! করুক একবার মকদ্দমা, শিবলোচনের ভিটেমাটি চাটি করে দেবেন তিনি!

অনেকদিন পর বারবাড়িতে এসে বৈঠকখানায় বসে বিধুশেখর গড়গড়ায় মৃদুমন্দ টান দিতে দিতে ইংরেজী কাগজ পড়ছিলেন। এমন সময় এক ভৃত্য এসে খবর দিল যে মুনশী আমীর আলী তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এসেছেন! বিধুশেখর একটু বিস্মিত হলেন। মুনশী আমীর আলী দেওয়ানী আদালতে তাঁর সমসাময়িক প্রসিদ্ধ উকিল, হঠাৎ তিনি কোন্ প্রয়োজনে আসবেন তাঁর কাছে? মুনশী সাহেব খানদানী বংশের গণ্যমান্য লোক, তিনি তো বিনা কারণে আসবেন না।

বিধুশেখর খাতির করে মুনশী সাহেবকে ডেকে আনলেন। দীর্ঘকায় সুদর্শন মুনশী সাহেবের চুলে সদ্য রূপালী রঙের পাক ধরেছে, অঙ্গে জরিবসানো কালো রঙের কুর্তা, মাথায় ফেজ টুপি, দরজা থেকেই আদাব জানাতে জানাতে ঢুকলেন তিনি। বিধুশেখর সসম্মানে তাঁকে বসালেন কৌচে, ভৃত্যকে হুকুম দিলেন পৃথক আলবোলা এনে দেবার জন্য।

বিধুশেখর যৌবনে ফার্সী শিক্ষা করেছিলেন, তাই অনেক সময় তিনি মুনশী আমীর আলীর সঙ্গে ফার্সীতে বাক্যালাপ করতেন। মুনশী সাহেব অবশ্য বাংলাও খুব ভালো জানেন।

কৌচে বসে মুনশী সাহেব হাফেজের একটি পঙ্‌ক্তি বললেন, যার অর্থ হলো, প্রিয়তম কঠিন অসুখে পড়েছেন, তিনি কখন চলে যাবেন এই আশঙ্কায় আমার চিত্ত বেতবৃক্ষের মতন কম্পিত হচ্ছে।

বিধুশেখরও পাল্টা এক বয়েৎ বললেন, যার অর্থ হলো, এই পৃথিবীতে আকর্ষণীয় বস্তু তো তেমন কিছুই নেই, শুধু বন্ধুদের ভালোবাসা। একমাত্র তার টানেই মানুষ বেশীদিন বেঁচে থাকতে চায়!

মুনশী সাহেব এর পর বিধুশেখরের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিলেন এবং তাঁর অভাবে দেওয়ানী আদালত যে এখন সিংহহীন অরণ্যের মতন নিস্তেজ হয়ে আছে, সে কথাও জানালেন।

বিধুশেখর বললেন, কোকিলের সুস্বরে যখন বাতাস আমোদিত হয় তখন গত বসন্তের জন্য আর কারু খেদ থাকে না। আমীর আলীর মতন পিকরাজ যখন রয়েছেন, তখন আর দেওয়ানী আদালতের অভাব কিসের!

এসবই কথার খেলা। বিধুশেখর জানেন যে মুনশী সাহেব শুধু নিছক ছড়া কাটার জন্য এখানে আসেননি।

সেই আসল বিষয়টা এলো একটু পরে। মুনশী সাহেব বললেন, খোদাতাল্লার এবং আপনার মতন দোস্তদের শুভেচ্ছায় আমি জানবাজারে একটি অতি সামান্য কুটির এবং এক টুকরো বাগান খরিদ করেছি, বড় সাধ ছিল আমার এই গরিবখানায় আপনার মতন একজন বিশিষ্ট অতিথিকে একদিন নিয়ে যাবো, কিন্তু আপনার শরীরগতিকের যা অবস্থা দেখছি⋯।

বিধুশেখর বললেন, আমার আর যাওয়া হয়েচে! এবার পরপারের ডাক আসার সময় হয়ে এলো!

বিধুশেখর কথার ফাঁকে ফাঁকে মুনশীর মুখখানি প্রখরভাবে লক্ষ করতে লাগলেন। মুনশী আমীর আলী প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক, বোঝাই যাচ্ছে তিনি আর একটি বড় বাগানবাড়ি ক্রয় করেছেন, কিন্তু সেখানে বিধুশেখরকে নিয়ে যাওয়া তো তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হতে পারে না। আরও কিছু গূঢ় ব্যাপার আছে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সম্পত্তিটা খরিদ করলেন কার কাছ থেকে?

মুনশী সাহেব জানালেন যে, বাগান ও বাড়িটি তিনি কিনেছেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের কাছ থেকে।

বিধুশেখর জানেন যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের অবস্থা খুবই পড়তির দিকে। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর বিশাল ঋণের বোঝা চেপেছিল তাঁর পুত্রদের ঘাড়ে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্র জমি, বাড়ি, তালুক বিক্রয় করে করে সেই ঋণের অংশ শুধছেন।

মুনশী বললেন যে, জানবাজারের এই বাড়ির সংলগ্ন বাগানটি ক্ষুদ্র হলেও অপরূপ, বহুরকম ফলফুলের গাছ রয়েছে। কিন্তু এক জেনানার জন্য তা ঠিকমতন ভোগ করার উপায় নেই। ঠাকুরদের সম্পত্তিটি অনেকদিন অযত্নে অবহেলায় পড়েছিল, ঐ জেনানা থাকে পাশের কুঠিতে, সে আর তার লোকজনই এতদিন সব লুটেপুটে খাচ্ছিল। এখনো তারা এই বাগানে এসে উৎপাত করে, তাদের গরু চলে আসে এই বাগানে, সে জেনানার নিজস্ব লোকজনও অতি বদ, তারা রাতবিরেতে এই বাগানে এসে হল্লা করে।

বিধুশেখর উকিলী ভাষায় তৎক্ষণাৎ মুনশী সাহেবের বক্তব্যটি অনুবাদ করে নিলেন। এর প্রাঞ্জল অর্থ হলো, মুনশী আমীর আলী তাঁর জানবাজারের সম্পত্তির পাশের বাড়ির জেনানার বাগানটিও গ্রাস করতে চান। কিন্তু এজন্য তাঁর কাছে আসা কেন?

মুনশী সাহেব বললেন, সে জেনানা এক কসবী!

বিধুশেখর শুকনোভাবে বললেন, অ!

মুনশী সাহেব বললেন, ঐ কসবীর নামে আমি মামলা দায়ের করতে যাচ্ছি, তাই সে বিষয়ে আপনার কাছে কিঞ্চিৎ পরামর্শ চাই।

বিধুশেখর আমোদহীন হাস্য করে বললেন, পরামর্শ, আমার কাছে? আপনি নিজে বিচক্ষণ ধুরন্ধর উকিল, আপনাকে পরামর্শ দেবো আমি?

মুনশী সাহেব বললেন, তোবা, তোবা, আপনার তুলনায় আমি? আপনার বুদ্ধির সামান্য এক কণা খরচ করলেই বড় বড় মামলার ফয়সালা হয়ে যায়। তা ছাড়া আর একটু কথা আছে। সে জেনানার হাল হকিকত আমি তল্লাশ করে দেখেছি। ঐ কসবীটা ঐ কুঠি আর বাগান জবরদখল করে আছে। ঐ সম্পত্তি মরহুম রামকমল সিংহের, বর্তমানে যাঁর এস্টেটের অন্যতম অছি আপনি!

বিধুশেখরের তৎক্ষণাৎ চকিতে সব মনে পড়লো। জানবাজারের সেই মাগীটা, সেই কমলি, যার বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ফেলেছিল রামকমল সিংহ। হ্যাঁ, ঠিক, সে বাড়িতে ঐ মাগী জোর করে চেপে বসে আছে। বিধুশেখর তাকে উচ্ছেদের চেষ্টাও করেছিলেন এক সময়।

এবার উৎসাহিত হয়ে তিনি মুনশী সাহেবের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। অসুস্থ হয়ে শয্যায় পড়ে থাকা অবস্থায় বিধুশেখর অনেক দিন ও-বাড়ির কোনো খোঁজ পাননি। জানবাজারের সম্পত্তিটি

উদ্ধারের এই তো সুবর্ণসুযোগ। বাগান সমেত বাড়িটি মুনশী সাহেবকে বিক্রি করে দিলে তারপর মুনশী সাহেব ঠিকই উচ্ছেদ করতে পারবেন ঐ মাগীকে।

কিছুক্ষণ এই বিষয়ে শলা-পরামর্শ হলো। তারপর বিধুশেখর মুনশী সাহেবকে বললেন যে, রামকমল সিংহের বিধবা পত্নীর সঙ্গে আলোচনা করে তিনি তাঁকে পাকা সংবাদ জানাবেন।

মুনশী আমী আলী চলে যাবার পর বিধুশেখর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি আদালত ছাড়তে চাইলেও মামলা-মোকদ্দমা তাঁকে ছাড়তে চাইছে না।

সেদিন অপরাহ্নে বিধুশেখর বাড়ি থেকে বার হলেন। এতদিন পর্যন্ত তিনি নিজগৃহ থেকে সিংহসদনে পদব্রজেই যাওয়া-আসা করতেন, সামান্যই তো পথ। কিন্তু পায়ে সেরকম আর জোর নেই, তিনি আজ জুড়িগাড়ি নিয়েই বেরুলেন, ইচ্ছে এই যে, ও-বাড়িতে একবার দেখা দিয়ে তিনি গড়ের মাঠ থেকে একটু হাওয়া খেয়ে আসবেন।

বিধুশেখরকে দেখে সিংহবাড়ির দ্বারবান-ভৃত্যরা ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বেশ কয়েক মাস পরে বিধুশেখরের এখানে আগমন, তিনি তো এখানকার দ্বিতীয় প্রভু। ইতিমধ্যে চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে তাঁর, শীর্ণ হয়েছেন, মুখে সেই তেজের আভা নেই, একটি চক্ষু ঘষা কাচের মতন। দিবাকর খবর পেয়ে ছুটে এসে সন্ত্রস্ত হয়ে বলতে লাগলো, আসুন বড়বাবু, আসুন, আপনাকে না পেয়ে আমরা এতকাল একেবারে অনাথ হয়ে রইচি! আহা, কত জমজমাট ছেল এই বাড়ি, এখুন একেবারে সব ফাঁকা।

কিছুক্ষণ একতলায় দাঁড়িয়ে বিধুশেখর কর্মচারীদের কাছ থেকে নানা বিষয়ে খবরাখবর নিতে লাগলেন। গঙ্গানারায়ণ অনেক কাল নিরুদ্দিষ্ট তিনি জানেন। তিনি নিজেও শয্যাশায়ী থাকায় এ-বাড়ির বিষয়সম্পত্তিতে যে নানাবিধ অনাচার হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ কী! নবীনকুমার বালক আর বিম্ববতী স্ত্রীলোক, বিষয় পরিচালনার কোনো জ্ঞানই তাদের কিছুমাত্র নেই। আবার শক্ত হাতে বিধুশেখরকেই হাল ধরতে হবে। তিনি যতদিন জীবিত আছেন, রামকমল সিংহের সম্পত্তির কোনো অনিষ্ট হতে দেবেন না। তিনি হাতের লাঠিগাছা উঁচু করে দিবাকরের উদ্দেশে দাবড়ানি দিয়ে বললেন, সব হিসেবপত্তর কাল সকালে আমায় দেখাবি!

বিম্ববতীর কক্ষে খবর পাঠানো হয়েছে। এবার বিধুশেখর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বিধুশেখরের কষ্ট হয়, তবু বিধুশেখর লাঠি ভর দিয়ে উঠতে লাগলেন পা হেঁচড়ে হেঁচড়ে। কয়েক ধাপ উঠেই দাঁড়িয়ে পড়ে দম নেন।

বিধুশেখর সিঁড়ির মধ্যপথ পর্যন্ত উঠেছেন, এমন সময় ওপর থেকে দুপদাপ করে নেমে এলো নবীনকুমার। তার যেন কিসের দারুণ ব্যস্ততা, সে বিধুশেখরকে দেখেও দেখলো না, পাশ কাটিয়ে নেমে গেল হুড়মুড়িয়ে।

অসীম বিস্ময়ে নবীনকুমারের দিকে তাকিয়ে থেকে বিধুশেখর ডাকলেন, ছোটকু!

নবীনকুমার ততক্ষণে নীচে পৌঁছে গেছে। সেখান থেকে বললো, কে, ও জ্যাঠাবাবু?

—ছোটকু, এদিকে শোন!

—জ্যাঠাবাবু, আপনি ওপরে বসুন। আমি একটু পরেই আসচি।

তারপরই সে দৌড়ে চলে গেল।

বিধুশেখর স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই কয়েক মাসেই ছোটকু এতখানি বড় হয়ে গেছে! এতদিন পরেও তাঁকে দেখে ছোটকু প্রণাম করলো না। কোনো কথা জিজ্ঞেস করলো না! তাঁর অসুখের সময় বিম্ববতী দু-তিনবার গিয়েছিলেন তাঁদের বাড়িতে। দূর থেকে একগলা ঘোমটা দিয়ে তাঁকে দেখেছেন। কোনো কথা বলেননি। অপরের সমক্ষে বিম্ববতী বিধুশেখরের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না। কিন্তু নবীনকুমার একদিনও দেখতে যায়নি তাঁকে।

বিধুশেখর তাঁর হৃদয়ে একটা সূক্ষ্ম কাঁটার ব্যথা বোধ করলেন। ছোটকু তাঁর এত আদরের, সেই ছোটকু তাঁর কাছে আসে না। তাঁর মৃত্যু হলে ছোটকুরই তো মুখাগ্নি করার কথা!

দম নিতে নিতে বিধুশেখর উঠে এলেন ওপরে। বাঁ পা, বাঁ হাতের শক্তি কি আর ফিরে আসবে না? আর কি কখনো তিনি দু'পায়ে জুতো মশমশিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করবেন না সহজভাবে? সব

হবে। কবিরাজ মশায় বলেছে, আবার তিনি পুরোপুরি সুস্থ জীবন ফিরে পাবেন।

সিঁড়ির সামনেই মজলিস-কক্ষ, সেটির দরজা খোলা। বিধুশেখর দেখলেন সেখানে পাতা হয়েছে নতুন গালিচা, ঝোলানো হয়েছে অনেকগুলি নতুন ঝাড়লণ্ঠন। বিধুশেখরের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। এ কক্ষ অনেকদিন খোলা হয়নি। এখানে কে এখন আসর বসায়।

ধীরে পায়ে হেঁটে তিনি গেলেন ভিতরমহলের দিকে।

বিম্ববতীর ঘরের সামনের টানা বারান্দায় আগে এলেই শোনা যেত নানারকম পাখির কলকাকলি। আজ এ গৃহ যেন বড় বেশী নিস্তব্ধ। খাঁচাগুলি সার বেঁধে এখনো ঝুলছে, কিন্তু অধিকাংশই শূন্য। পাখিগুলি হয় উড়ে গেছে কিংবা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। পাখি পোষার শখ আর বুঝি নেই বিম্ববতীর। একটি কথাবলা ময়নাকে এখনো একটি খাঁচার মধ্যে দেখতে পেলেন বিধুশেখর, আগে সে মানুষজন দেখলেই বলে উঠতো, ময়না, বলো, জয় রাধে! জয় কৃষ্ণ! সে পাখিটি তার লাল চক্ষু মেলে বিধুশেখরকে একবার দেখে আবার চক্ষু মুদলো। বৃদ্ধ হয়ে এ পক্ষীও বুঝি ভুলে গেছে কথা বলতে।

নির্দিষ্ট ঘরটির দরজার সামনে এসে বিধুশেখর ডাকলেন, বিম্ব!

একটি নতুন দাসী বেরিয়ে এসে বললো, কত্তামা আপনার জন্যে ভেতরে বসে আচেন।

বিধুশেখরের সঙ্গে সঙ্গে দাসীটিও প্রবেশ করলো ঘরে। আগেকার দাসীবাঁদীরা সব জানতো, বিধুশেখর এখানে এলে কেউ আর কাছাকাছি থাকতো না।

দক্ষিণ দেয়ালে রামকমল সিংহের বৃহৎ তৈলচিত্রের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিম্ববতী। অবগুণ্ঠন কপাল পর্যন্ত তোলা, পরনে ধপধপে শুভ্র বসন। কতই বা বয়েস বিম্ববতীর। বড় জোড় চল্লিশ-বেয়াল্লিশ, কিন্তু যৌবন যেন এখনো মধ্য গগনে, সেই দেবী ভগবতীর মতন রূপ এখনো ম্লান হয়নি।

পা টেনে টেনে ভেতরে গিয়ে বিধুশেখর পালঙ্কের বাজু ধরে দাঁড়ালেন তারপর দাসীটিকে উদ্দেশ করে বললেন, পান নিয়ে আয়। পান রেখে চলে যাবি, তোকে এখেনে থাকতে হবে না।

বিম্ববতী এগিয়ে এসে নীচু হয়ে বিধুশেখরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। বিধুশেখর তাঁর দু কাঁধ ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো, বিম্ব?

উত্তর না দিয়ে বিম্ববতী নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন।

বিধুশেখর বললেন, এক সময় মনে হয়েছেল, আর বুঝি কোনোদিন এখেনে আসতে পারবো না। আর বুঝি তোমাতে আমাতে এমন দেকা হবে না।

বিম্ববতীর ক্রন্দন এবার শব্দময় হলো।

—আর কেঁদো না, বিম্ব! এই তো আমি এসিচি।

পালঙ্কের ওপর বসে বিধুশেখর বিম্ববতীর চিবুকটি দু আঙুলে তুলে প্রশ্ন করলেন, বলো, কী তোমার দুঃখ?

বিম্ববতী হাতের তালুতে অশ্রু মার্জনা করে বললেন, আমি ভগবানের কাছে দিনরাত প্রার্থনা করিচি…আপনি সুস্থ না হলে আমিও মত্তুম।

বিধুশেখর নরমভাবে বললেন, সব আবার ঠিক হয়ে যাবে। আমি আরও দীর্ঘকাল বাঁচবো, তুমি দেকে নিও।

—আমার সব এমন ছারেখারে গেল।

—কেন, কিসের অভাব তোমার?

—এ-বাড়ি পূর্ণ ছিল, শূন্য হয়ে গেল…সব সময় মানুষজনে গমগম করতো, এখন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

দাসী পান নিয়ে এসেচে, বিম্ববতী একটু সরে গিয়ে একটি মোড়া টেনে নিয়ে বিধুশেখরের পায়ের কাছে বসলেন।

পান মুখে দিয়ে বিধুশেখর জিজ্ঞেস করলেন, ছোটকু অমন দৌড়ে দৌড়ে কোথায় গেল? আমায় দেকেও কাচে এলো না!

বিম্ববতী বললেন, কী জানি! বন্ধুরা এসেচে বুঝি! ওর কালেজের বন্ধুরা আসে, ও তাদের বাড়ি

যায়। বউমা মারা যাবার পর ছোটকু যেন কেমন হয়ে গেসলো, কারুর সঙ্গে কতা বলে না, কাঁদে না পর্যন্ত, শুধু গুম হয়ে থাকে, আমি কাঁদি, আমি ওকে আদর করে কাচে টানতে চাই, ও আসে না কো, ক'দিন ধরে আবার দেকচি ও বারমুখো হয়েচে, আমি কিছু বলি না আর।

বিধুশেখর বললেন, ওর আবার একটা বিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে!

বিম্ববতী বললেন, আর গঙ্গা, তার কোনো খবরও কেউ নিলে না···

বিধুশেখর জানতেন এই প্রসঙ্গটা উঠবেই। এ প্রসঙ্গ তাঁর মনঃপূত নয়। গঙ্গানারায়ণকে তিনি মন থেকে মুছে ফেলেছেন।

ঈষৎ ঝাঁঝের সঙ্গে তিনি বললেন, সে জোয়ানমদ্দ মানুষ, সে যদি নিজে থেকে কোতাও চলে যায়, কে তার সন্ধান পাবে বলো? দিবাকর তো চতুদ্দিকে লোক পাঠিয়েছেল। অনেক চেষ্টা হয়েচে।

বিম্ববতী বললো,আপনি সুস্থ হয়েচেন, আপনি এবার সব ব্যবস্থা করতে পারেন। একটা কতা বলবো?

—বলো!

—গঙ্গা কাশীতে যায়নি তো? আমার যেন মন বলচে।

—কাশী? কেন, সেখেনে যাবে কেন হঠাৎ?

—আপনি তখন আমায় সব খুলে বলেননি, কিন্তু আমি সব জেনেচি। কাশীতে আমার বিন্দুমা রয়েচে, গঙ্গা যদি তার জন্য কাশী যায়?

—যায় সে যেতে পারে। তার আবার মতিভ্রম হলে যা খুশি কত্তে পারে। কিন্তু ঈশ্বর আমায় কলঙ্ক থেকে রক্ষা করেছেন। কাশীতে বিন্দুবাসিনী নেই।

—নেই? কাশীতে নেই?

—কাল বড় করাল, বিম্ব। কে তার গতি রুক্‌তে পারে?

—তার মানে?

—কাশীতে ছেল, কিন্তু বিন্দু আর বেঁচে নেই!

—বেঁচে নেই? বিন্দু? ও মা!

—কাশীতে এক শেঠের কাচে প্রতি ছ' মাস অন্তর আমি বিন্দুর নাম করে টাকা পাঠাতুম। গত বছর সেই শেঠ জানিয়েচে যে বিন্দু মারা গ্যাচে।

—বিন্দু মারা গ্যাচে? আমরা অ্যাতদিন কেউ জানলাম না, শুনলাম না। কেউ তাকে দেকতে গেল না, তাকে দাহ করলো কে? বিন্দু, হতভাগিনী বিন্দু···

—কে যাবে বলো? আমি কি কখনো দূর দেশে গেচি? আমার বাড়িতে আর পুরুষ কোতায়? অন্য কোনো লোকজনকে বিশ্বাস নেই। কাশীর সেই শেঠ আমার মক্কেল ছেল, মানী লোক, সেই সব ব্যবস্থা করেচে।

বিম্ববতী চোখে আঁচল দিয়ে হু হু করে কাঁদতে লাগলেন। বিধুশেখরের চক্ষু শুষ্ক, তিনি কিছুক্ষণ সময় দিলেন বিম্ববতীর শোক ও অশ্রু মোচনের জন্য।

তারপর বিধুশেখর তাঁর এক চোখের দৃষ্টি বিম্ববতীর দুই চোখের ওপর পর্যায়ক্রমে ফেলে উদাত্ত স্বরে বললেন, নিয়তি! বৈধব্যই ছিল বিন্দুর নিয়তি, অল্প আয়ুই ছিল তার ভবিতব্য, স্বয়ং বিধাতাপুরুষ তার ললাটে লিকে দিয়েচেন, তুমি আমি খণ্ডাবার কে? গুরুবল এই যে, তোমার সুপুত্তুর তার ধর্ম নষ্ট কত্তে পারেনি।

বিম্ববতীর চক্ষু দিয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়লো। বিধুশেখর জিজ্ঞেস করলেন, মজলিস-ঘরটি দেকলুম আবার গোচগাচ করা হয়েচে। রামকমলের এই ছবিখানাও তো সেখেনে ছিল, এটা এ ঘরে কে আনালে!

উদাসীনভাবে বিম্ববতী বললেন, ছোটকু। মজলিস-ঘরে সে ক'দিন হলো থ্যাটারের আসর বসিয়েচে।

—থ্যাটার!

বিধুভূষণ আঁতকে উঠলেন। প্রথমে ব্যাপারটা তাঁর বোধগম্যই হলো না। তারপর আরও কিছু কথাবার্তা বলে জিনিসটা বুঝে তিনি বললেন, কী? ইতর লোকদের মতন সে যাত্রা করবে? সঙ সাজবে? ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যা। বিম্ব, রাশ টানো, এ বয়েস থেকেই এমন করলে ও ছেলে যে উৎসন্নে যাবে! কক্ষনো হবে না, আমি বেঁচে থাকতে ওসব কক্ষনো হবে না! ঠিক আচে, কাল থেকে আমিই

ওর শিক্ষার ভার নেবো। কাল থেকে আমি এ-বাড়িতে আবার রোজ আসবো। নিয়মিত আসবো, আমার ব্যবস্থা অনুযায়ী সব চলবে।ছোটকুর আবার বিয়ে দিতে হবে, ওকে ঘরে বেঁধে রাখতে হবে, এ যেন রামকমলের ধারা না পায়। তুমি কিচ্ছু ভেবো না, আমি সব ঠিক করে দোবো!
বিধুশেখর তাঁর সক্ষম পা-টি তুলে দিলেন বিম্ববতীর কোলে।
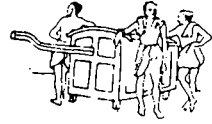
জানবাজারের বিখ্যাত ধনী প্রীতিরাম মাড়ের পুত্রবধূ রাসমণি বিধবা হবার পর নিজেই তাঁদের বিপুল সম্পত্তি ও বৃহৎ সংসারের হাল ধরেন। মাহিষ্য বংশীয়া এই রমণীটি বিদ্যাশিক্ষা করেননি বটে, কিন্তু তাঁর জাগতিক জ্ঞান অতি প্রখর। তাঁর স্বামী রাজা ছিলেন না, কিন্তু স্বামীর নাম ছিল রাজচন্দ্র, সেই সুবাদে রাজচন্দ্রের পত্নীকে অনেকে রানী বলে অভিহিত করেন। এবং তিনি রানী নামের যোগ্যও বটে। শ্রীমতী রাসমণি যেমন রূপবতী, তেমন তেজস্বিনী।

রূপের জন্যই সামান্য দরিদ্র পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি এত সম্পদশালী পরিবারের বধূ ও কর্ত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিতা হন। জন্মস্থান হালিশহরের কাছে গঙ্গাতীরে কিশোরী রাসমণি একদিন স্নান করতে এবং জল তুলতে এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়েস এগারো। সেই সময় যুবক রাজচন্দ্র গঙ্গাবক্ষে বজরায় বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে যাচ্ছিলেন কোনো তীর্থে। রাজচন্দ্রের তখন হৃদয় ভগ্ন, জীবনে শান্তি নেই। পর পর দুটি স্ত্রী পরলোকগমন করায় রাজচন্দ্রের আর বিবাহে মতি নেই। কিন্তু নদীকূলে ঐ রূপলাবণ্যবতী কিশোরীটিকে তাঁর চোখে লেগে গেল। রাজচন্দ্রের বন্ধুবান্ধবরাও বললো, সত্যি, এমনটি আর হয় না। তারা অনুসন্ধান করে জানলো যে, জাতের অমিল নেই, কন্যাটি পালটি ঘরের। পুত্রের বন্ধুদের মুখে সব কথা জানতে পেরে প্রীতিরাম ঐ মেয়েটিকে পুত্রবধূ করে নিয়ে এলেন। বধূ সুলক্ষণা, তিনি আসবার পর এই পরিবারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগলো।

রাজচন্দ্রের মৃত্যুর আগে রানী রাসমণির নাম সর্বসাধারণের মধ্যে বিশেষ পরিচিত ছিল না। স্বামীর শ্রাদ্ধের সময়ই তাঁর খানিকটা পরিচয় পাওয়া গেল। এমন দানশীলা রমণী কেউ আর আগে দেখেনি। দানসাগর শ্রাদ্ধে পর পর দুদিন ধরে তিনি মুঠো মুঠো ধন দান করতে লাগলেন। তাঁর নির্দেশ, কোনো প্রার্থীই যেন ফিরে না যায়। তৃতীয় দিনে তিনি করলেন তুলট। শুদ্ধ বস্ত্র পরে রানী রাসমণি বসলেন দাঁড়িপাল্লার একদিকে, অন্যদিকে চাপানো হলো শুধু রূপোর টাকা। তাঁর দেহের ওজন হলো ছ' হাজার সতেরোটি রৌপ্যমুদ্রা, সেগুলি সেই দণ্ডেই বিতরণ করা হলো পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে। তারপর থেকে যে কোনো মহৎ কর্মের উদ্দেশ্যে কেউ প্রার্থী হয়ে এলে রানীর কাছ থেকে আশাতীত দান পেয়ে যায়।

রানী রাসমণি যেমন একদিকে অকাতরে দান করেন তেমনি অন্যদিকে বিষয় সম্পত্তিও বাড়িয়ে চলেছেন। কী জমিদারি পরিচালনায়, কী ব্যবসায় কার্যে, তিনি পরিচয় দেন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার। অর্থ উপার্জনে তাঁর যেমন আনন্দ, তেমনি ব্যয়ে। কলকাতার অন্য ধনীদের প্রায় সবার সঙ্গে রাসমণির একটি পরিষ্কার পার্থক্য চোখে পড়ে। অন্যরাও অনেক সময় দান ধ্যান করেন বটে, কিন্তু বিলাসে প্রমোদেও তাঁরা কম অর্থ ব্যয় করেন না। কিন্তু রানী রাসমণি শুদ্ধাচারিণী, বিশেষ বিশেষ তিথিতে তিনি ভূমিশয্যায় নিদ্রা যান।

কলকাতার ধনীদের মধ্যে একমাত্র ঠাকুর বাড়ির দেবেন্দ্রবাবু সমস্ত বিলাসিতা পরিত্যাগ করে ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন। এক হিসেবে দেবেন্দ্রবাবুও রানী রাসমণির প্রতিপক্ষ। দেবেন্দ্রবাবু প্রচার করছেন, দেশবাসী পুতুল পূজা পরিত্যাগ করে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করুক। আর রানী রাসমণি পূজা করেন সাকার ঈশ্বরের। সমস্ত দেব-দেবীর প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি। হিন্দু ধর্মের মহিমা বিস্তারের জন্য তাঁর ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত। প্রিন্স দ্বারকানাথ তাঁর স্বামীর কাছ থেকে এক সময় দু লক্ষ টাকা কর্জ নিয়েছিলেন, যথাসময়ে তা শোধ করতে পারেননি বলে ঠাকুরদের জমিদারির একটি পরগণা এখন রানী রাসমণির অধীনে। সুতরাং, প্রকারান্তরে দ্বারকানাথেরই জমিদারির টাকায় দেবেন্দ্রবাবু ও রানী রাসমণি পরস্পরবিরোধী দুই ধর্মকর্মে ব্যাপৃত।

আতুরালয় স্থাপন, গঙ্গায় ঘাট নির্মাণ, বিভিন্ন তীর্থের দেবদেবীর অলঙ্কার সজ্জা, এ সব তো আছেই, তা ছাড়া এই নগরের উন্নতিকল্পেও তাঁর যত্নের অন্ত নেই। জানবাজারে রানী রাসমণির প্রকাণ্ড অট্টালিকায় দোল-দুর্গোৎসবের জাঁকজমকও কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রবাদ-প্রসিদ্ধি পেয়ে গেল। দুর্গোৎসব করতেন বটে পোস্তার রাজা সুখময় রায়, তারপর এই রানী রাসমণি। এই সব উৎসবে সারা শহরের লোক ভেঙে পড়ে তাঁর বাড়িতে। রথের দিন পথে বেরোয় প্রাসাদতুল্য সম্পূর্ণ রূপোয় নির্মিত রথ, তার পিছনে প্রায় আধ ক্রোশব্যাপী শোভাযাত্রা, তাতে অবিরাম শোনা যায় গীত, বাদ্য আর 'হরি বোল' ধ্বনি।

দুর্গোৎসব উপলক্ষেই রানী রাসমণির অন্য একটি রূপ প্রকাশিত হলো একবার।

মহালয়ার দিনের বোধন থেকে শুরু হয় উৎসব। সপ্তমীর দিনে খুব ভোরে ব্রাহ্মণরা নব পত্রিকা নিয়ে গঙ্গায় স্নান করাতে যায়, তাদের পেছনে পেছনে বাজনদাররা ঢাক, ঢোল, সানাই, করতাল বাজাতে বাজাতে চলে।

সেই তুমুল বাদ্যরবে এক সাহেবের নিদ্রার খুব ব্যাঘাত হলো।

তিনি গবাক্ষ খুলে দেখলেন একদল অর্ধ উলঙ্গ নেটিভ বিকট শব্দ করে লাফাতে লাফাতে চলেছে। নেটিভদের অনেক প্রকার উদ্ভট মূর্খামির পরিচয় এর আগে পাওয়া গেছে, কিন্তু সূর্যোদয়ের আগে সকলকার ঘুম ভাঙিয়ে একি উৎকট আনন্দ !

মুখ রক্তবর্ণ করে সাহেব দারুণ চেঁচামেচি করতে লাগলেন এবং তখনই হুকুম দিলেন বাজনা বন্ধ করার। কিন্তু রানী রাসমণির লোকেরা শুনবে কেন ? তারা কর্ণপাত না করে তেমনভাবেই ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল।

ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে সাহেব খবর দিলেন কোতোয়ালিতে। পুলিসের সাহায্য চাইলেন, যাতে ফেরার পথে ঐ নেটিভরা তাঁর শান্তি ভঙ্গ করতে না পারে।

দু'-একজন অনুচর এ সংবাদ জানালো রানী রাসমণিকে। তিনিও দপ্ করে জ্বলে উঠলেন রাগে। তিনি বললেন, আমরা হিন্দু, আমাদের ধর্মকর্মে বাধা দেবার কী অধিকার আছে সাহেবের ? সাহেবরা যে খৃষ্টীয় পরবে সারারাত্রব্যাপী হল্লা করে, তখন কি আমরা বাধা দিতে যাই ? যা, আরও বেশী করে ঢাক ঢোল বাজা গে যা তোরা ! শুধু তাই নয়, আজ সারাদিন ধরে এই পথ দিয়ে বাজাতে বাজাতে যাবি আর আসবি।

তিনি কয়েকজন পাইকও পাঠিয়ে দিলেন ওদের সঙ্গে।

দু'চারজন পুলিস সেই শোভাযাত্রাকে বাধা দিতে পারলো না। রাসমণির কর্মচারীরা বললো, আমাদের মা বলে দিয়েছেন, এ রাস্তা আমাদের, এখানে আমরা যা খুশী করবো। সাহেব হাত পা কামড়াতে লাগলেন, সারাদিন ধরে অসহ্য ঢাকের বাজনা তাঁর কান ঝালাপালা করে দিল।

সাহেব একটি মামলা ঠুকলেন রাসমণির নামে। ইংরেজের আদালতে ইংরেজ আনীত মামলার ফলাফল যা হবার তাই হলো, পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হলো রাসমণির। কিন্তু এ রমণী বড় জেদী, কিছুতেই হার স্বীকার করার পাত্রী নন। জরিমানার টাকা জমা দিয়ে রাসমণি বললেন, বেশ, এর পর থেকে যে রাস্তা আমি বানিয়েছি, সে রাস্তা দিয়ে অন্য কারুর হাঁটা চলার এক্তিয়ার থাকবে না। বড় বড় গরাণ কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তিনি জানবাজার থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত রাস্তার দুদিকে শক্ত বেড়া দিয়ে দিলেন। সব যানবাহন বন্ধ হয়ে গেল, নগর পরিচালকরা পড়লেন মহা অসুবিধেয়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা আপোস করলেন রাসমণির সঙ্গে, ক্ষমা চেয়ে তাঁরা জরিমানার টাকা ফেরত দিলেন। রাসমণিও তুলে নিলেন পথের বেড়া। এক স্ত্রীলোকের এই জয় কাহিনীতে খুব আমোদ পেল নগরবাসীরা।

রানী রাসমণি আর একবার কোম্পানী বাহাদুরকে জব্দ করেছিলেন।

সরকার থেকে হঠাৎ আদেশ জারি করা হলো, গঙ্গায় আর জেলেরা ইচ্ছে মতন মাছ ধরতে পারবে না। মাঘে সরস্বতী পূজার পর থেকে সেই আশ্বিন মাস পর্যন্ত গঙ্গা থাকে ইলিশ মাছে ভরা, তখন গঙ্গাবক্ষ জেলে ডিঙিতে ছেয়ে যায়। এর ফলে জাহাজ চলাচলে অসুবিধা হয় বলে ঠিক হলো যে যার খুশী সে আর এখানে মাছ ধরতে পারবে না। এজন্য কর দিতে হবে। কর দিতে গেলেই জেলে ডিঙির সংখ্যা যাবে অনেক কমে।

মৎস্যজীবীরা গিয়ে কেঁদে পড়লো রানী রাসমণির পায়ে। অনেকের জীবিকা নষ্ট হবার উপক্রম। এখন রানী না বাঁচালে তাদের কে বাঁচাবে ? তিনি ছাড়া তাদের জাতের দুঃখে আর কে সমব্যথী হবে ?

রাসমণি তখন আবার এক চমকপ্রদ বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। সরকার মাছ ধরার জন্য কর চেয়েছেন,

ঠিক আছে, সেই কর তিনি একাই দেবেন। দশ হাজার টাকা দিয়ে তিনি ঘুষুড়ি থেকে মেটেবুরুজ পর্যন্ত গঙ্গা ইজারা নিয়ে নিলেন সরকারের কাছ থেকে। তারপর জাহাজ লঙ্গর করার মোটা দড়ি দিয়ে ঘিরে ফেললেন গঙ্গার সেই এলাকা, জেলেদের বলে দিলেন, এবার তোরা মাছ ধর, যত খুশী মাছ ধর।

দড়ি দিয়ে ঘেরার ফলে সব জাহাজ আটকে গেল। কলকাতার বন্দরে আর কোনো জাহাজ ভিড়তে পারে না, কলকাতার জীবন অচল হয়ে যাবার উপক্রম। কলকাতার লোক সবাই সেদিন গঙ্গার কূলে গিয়েছিল রানী রাসমণির কীর্তি দেখতে। দুলালচন্দ্রকে নিয়ে নবীনকুমারও গিয়েছিল। সে বড় অদ্ভুত দৃশ্য। মোটা দড়ির ওধারে সার বেঁধে থমকে আছে ইংরেজের জাহাজ, তার নাবিকরা সব হতভম্ব, আর এদিকে পতঙ্গের মতন অজস্র জেলে ডিঙি ভাসছে, জেলেরা উল্লাসে হো হো হা হা করছে। এই দৃশ্যে বড় মজা পেয়েছিল নবীনকুমার। সে তখন খুবই বালক, তবু ইঁচোড়ে পাকার ভঙ্গিতে সে দুলালকে বলেছিল, দ্যাক দ্যাক, জানবাজারের জমিদারণী ইংরেজের মুখে চুনকালি দিয়েচে।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে সরকার রাসমণির কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করলেন। রাসমণির উত্তর অতি সরল। মাছ ধরার জন্য তিনি গঙ্গার অংশ ইজারা নিয়েছেন, এখন সেই অংশ তিনি জেলেদের মধ্যে বিলি করতে পারেন, সে অধিকার তাঁর আছে। এখান দিয়ে জাহাজ চলাচল করলে মাছ ধরায় বিঘ্ন হবে। সরকার তাঁকে ইজারা দিয়েছেন। এখন তাঁর সুবিধে অসুবিধে দেখার দায়িত্ব তো সরকারের। পুকুর জমা নিয়ে যখন বেড়া জাল ফেলে মাছ ধরা হয়, তখন কি পাড়া-প্রতিবেশীরা সেই পুকুরে আর নাইতে আসে?

শেষ পর্যন্ত সরকারকে রফা করতে হলো। গঙ্গাবক্ষে জেলেদের আবার বিনা করে মাছ ধরার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হলো, রানীও দড়ি কাছি গুটিয়ে নিলেন।

রানীর বয়েস এখন ষাট, কিন্তু স্বাস্থ্য অটুট, আর তেজও এক বিন্দু কমেনি। পরিণত বয়সে তাঁর রূপ আরও মহিমান্বিত হয়েছে, এখনো তিনি স্বয়ং জমিদারি পরিচালনা করেন, প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার কথা শোনেন। তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত দুটি। প্রজাদের প্রতি অবিচার রোধ এবং সনাতন হিন্দু ধর্মের সংস্থাপন। খৃষ্টানী এবং নিরাকার ব্রহ্মের পূজা, তাঁর দুই নয়নের বিষ। হিন্দু ধর্মের গৌরব তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে যাবেনই।

সম্প্রতি তিনি একটি অতি বৃহৎ কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং সেই ব্যাপারেই প্রবল আঘাত পেলেন দেশবাসীর কাছ থেকে।

রানী স্বাবলম্বিনী। বিধবা হবার পর তিনি প্রায়ই এক সঙ্গে অনেক বজরা সাজিয়ে, পাইক বরকন্দাজ সঙ্গে নিয়ে নানান তীর্থ ভ্রমণে গেছেন। একবার তিনি কাশীধামে গিয়ে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শন করে আসবেন মনস্থ করেছিলেন। কাশী অনেক দূরের পথ, দস্যু-তস্করের উপদ্রবের ভয় আছে, কিন্তু একবার কোনো কথা মনে এলে রানী আর নিরস্ত হন না। তিনি এক সঙ্গে পঁচিশখানা বজরা সাজালেন, তাতে নিলেন ছ' মাসের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য আর প্রচুর লোকলস্কর ও অস্ত্রধারী প্রহরী।

মধ্য রাত্রে জোয়ারের পর বজরার বহর ছাড়বে। আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে রানী আগেই নিজস্ব বজরায় উঠে শুয়ে পড়েছেন। ঘুমের মধ্যে কখন বজরা ছেড়েচে, তিনি খেয়াল করেননি। এমন সময় রানী একটি স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্ন নয়, রানীর মনে হলো দৈব দর্শন। স্বয়ং জগজ্জননী মা কালী তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ভর্ৎসনার সুরে বলছেন, তোর সন্তানতুল্য ছেলেরা খেতে পরতে পাচ্ছে না, তাদের ছেড়ে তুই কোথায় চললি? কাশী? এদের সেবা কর, তাতেই আমাকে পূজা করা হবে। এখানে এই গঙ্গাতীরেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেবার ব্যবস্থা কর, সেখানেই আমি তোর হাতের পূজা গ্রহণ করবো।

স্বপ্ন ভেঙে যেতেই রানী রাসমণি ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ ঘামে সিক্ত। স্বপ্ন নয়, যেন একেবারে সত্য। মা তাঁকে আদেশ দিয়ে গেছেন। একটুক্ষণ আচ্ছন্ন ভাবে বসে রইলেন তিনি। তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বললেন, ওরে, বজরা থামা, বজরা থামা!

পরদিন প্রভাতে সবগুলি বজরার অন্ন বস্ত্র স্থানীয় দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে রানী ফিরে এলেন জানবাজারে। তাঁর যাত্রা ভঙ্গের কারণ আর কারুর কাছে ব্যক্ত না করে তিনি ডেকে পাঠালেন মথুরকে।

রানীর পুত্র সন্তান নেই। চারটি কন্যা। এর মধ্যে তৃতীয়া কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন এই মথুরের সঙ্গে। সেই কন্যাটি অকালে মারা যায়। তারপর চতুর্থ কন্যাটির সঙ্গেও মথুরেরই বিবাহ দিয়ে তাঁকে তিনি ঘরজামাই করে রেখেছেন। এই মথুর বেশ বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, রানীর বিষয়কর্মের ডান হাত।

মথুরকে ডেকে তিনি বললেন, তুমি গঙ্গার কূলে জমি দেখো, আমি মন্দির প্রতিষ্ঠা করবো।

'গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারানসী সমতুল', সুতরাং পশ্চিম পারে জমি পেলেই ভালো হয়। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেদিকে পছন্দমতন এক লপ্তে অনেকখানি জমি পাওয়া গেল না, বরং পূর্বপারে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে জমি বিক্রয় আছে। সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নী হেস্টি সাহেবের কুঠি, মুসলমানদের একটি পরিত্যক্ত কবরখানা ও এক গাজী সাহেবের পীরের আস্তানা, সব মিলিয়ে সাড়ে চুয়ান্ন বিঘা জমি, মূল্য সাড়ে বেয়াল্লিশ হাজার টাকা। সেখানে শুরু হলো একালের বৃহত্তম মন্দিরের নির্মাণের কাজ। গঙ্গার কূলে পোস্তা বেঁধে আগাগোড়া বাঁধিয়ে দেওয়া হলো, তৈরি হলো বৃহৎ স্নান ঘাট, তারপর দ্বাদশ শিব মন্দির, বিষ্ণু মন্দির, নবরত্ন চূড়াযুক্ত কালী মন্দির ও নাট মন্দির। যত লক্ষ টাকা লাগে লাগুক, তবু সব কিছু রানীর মনোমতন হওয়া চাই।

মন্দির গঠনের কাজে যাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে সেইজন্য রানী কঠোর কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করলেন। ত্রি-সন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন গ্রহণ, ভূমিতে শয়ন এবং নিশিদিন ইষ্টদেবতার কাছে প্রার্থনা। কয়েক বছর ধরে চললো মন্দির নির্মাণের কাজ, প্রতিদিন তিনি মথুরের কাছ থেকে খবরাখবর নেন এবং মাঝে মাঝে নিজে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে গিয়ে কাজের প্রগতি দেখে আসেন। আর বেশি বাকি নেই, বৎসরকালের মধ্যেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে, রানী এর মধ্যেই দিনক্ষণ দেখতে শুরু করেছেন।

তবু বাধা এলো অন্য দিক থেকে।

একদিন মথুর এসে বিষণ্ণ মুখে জানালেন সেই দুঃসংবাদ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ফতোয়া দিয়েছেন, জানবাজারের জমিদার-পত্নী রাসমণি দাসী দক্ষিণেশ্বর গ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করলে, সে কাজ হবে অশাস্ত্রীয়।

রানী একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। অশাস্ত্রীয় ? তিনি শুদ্ধচিত্তে, ফলের প্রত্যাশী না হয়ে, তাঁর সমস্ত সম্পদ উজাড় করে মন্দির স্থাপন করতে চান, সে কাজ অশাস্ত্রীয় কেন হবে ?

মথুর জানালেন যে, ব্রাহ্মণরা বলেছেন, শূদ্রের কোনো অধিকার নেই দেবদেউল প্রতিষ্ঠার। শূদ্রের হাতের পূজা কোনো দেব-দেবী নেন না। টাকার গরম থাকলেই কি শাস্ত্র উল্টে যাবে ! এই বলে পণ্ডিতরা ঘোঁট পাকাচ্ছে।

রানী হাহাকার করে বললেন, কিন্তু মা যে স্বয়ং আমায় দেকা দিয়ে বলেচেন যে তিনি আমার হাতের পূজা নেবেন !

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সে স্বপ্নের কথা বিশ্বাস করবে না। স্বপ্নের কথা বলে শাস্ত্র পাল্টানো যায় না।

রানী রাসমণি গুম হয়ে বসে রইলেন। তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি, ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা, এ সবই তুচ্ছ ? তিনি শূদ্র বংশীয়া, এটাই বড় কথা ? তা ছাড়া, কে বলেছে শূদ্র ? মাহিষ্যরা মোটেই শূদ্র নয়। ব্রাহ্মণরা যে-কোনো একটা ফতোয়া দিয়ে দিলেই হলো ! জমিদারির কাগজপত্রে তাঁর নামের শিলমোহরে লেখা থাকে, কালীপদ অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী। পণ্ডিতেরা তাঁর মায়ের পদ বন্দনা করতে দেবে না। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির বিগ্রহহীন শূন্য পড়ে থাকবে ? ব্রাহ্মণরা অশাস্ত্রীয় বলে ঘোষণা করলে পাপের ভয়ে কেউ তো সে মন্দিরে যাবে না।

একটু পরে রানী চোখের জল মুছে বললেন, তা বলে তো ভেঙে পড়লে চলবে না, মথুর। হেরে যেতে আমি শিখিনি। কলকাতার পণ্ডিতরা বলেচে বলে সেটাই তো শেষ কতা নয়। তুমি লোক পাঠাও, কাশীতে, মারহাট্টাদের দেশে, দক্ষিণ ভারতে। সেখানেও বড় বড় পণ্ডিত থাকে, তেনাদের মত আনাও।

কিন্তু দূর দূর দেশ থেকেও নৈরাশ্যজনক সংবাদ আসতে লাগলো। শূদ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠার অধিকার ভারতের ব্রাহ্মণ সমাজ মেনে নেবে না কিছুতেই। কলকাতার পণ্ডিতরা প্রকাশ্যে আন্দোলন শুরু করলো। তারা প্রচার করলো, রাসমণি দাসীর এই স্পর্ধা কিছুতেই সহ্য করা হবে না। এই ঘোর অনাচার মেনে নিলে হিন্দু সমাজে প্রবল বিকার দেখা দেবে। টাকা দিয়ে আর সব কেনা যায়, ধর্ম কেনা যায় না। রাসমণি দাসী আবার সেখানে অন্নভোগ দিতে চায় ! শূদ্রের অন্ন দেওয়া হবে দেবতাকে ! এর মধ্যেই কি কলির পাঁচ পা বেরুলো !

ধর্মপ্রাণা রানী রাসমণি ইংরেজের বিরুদ্ধে কূট কৌশলে লড়েছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁর চোখে দেবতুল্য, সেই ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে তিনি লড়বেন কী ভাবে ! তাঁর মন ভেঙে গেল। তিনি ভূমিশয্যায় শুয়ে অনবরত রোদন করেন আর মাঝে মাঝে কাতর ভাবে বলে ওঠেন, মা, মা, আমি শূদ্র বংশে জন্মে কী অপরাধ করেছি মা, যে তোমার সেবা করতে পারবো না ? তুমি কি শূদ্রেরও মা নও ?

রানীর এক এক সময় মনে পড়ে যায় নবদ্বীপের কথা। কয়েক বছর আগে তিনি নবদ্বীপে

গিয়েছিলেন তীর্থ দর্শনে। চন্দ্রগ্রহণের রাতে নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে তিনি কল্পতরু হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের তিনি রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র ও রৌপ্যমুদ্রা দান করেছেন। বিশিষ্ট সব শিরোমণি, তর্কসিদ্ধান্ত, ন্যায়রত্ন ও বিদ্যারত্নদের নিমন্ত্রণ করে তাঁদের প্রত্যেককে দিয়েছেন পঞ্চাশটি করে টাকা ও লাল রঙের বনাত। পণ্ডিতরা দু' হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

সেই কথা মনে পড়ায় রানী দীর্ঘশ্বাস ফেলেন : ব্রাহ্মণরা তাঁর দান গ্রহণ করতে পারেন, সেজন্য খুশী হয়ে আশীর্বাদ করতে পারেন, অথচ তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেই ব্রাহ্মণদের আপত্তি! এ কেমন কথা? এ যে স্বার্থপর, লোভীদের মতন মনোবৃত্তি! পর মুহূর্তেই রানী আবার তিরস্কার করেন নিজেকে। না, ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে এমন চিন্তা করাও যে পাপ!

রানীর মুশকিল এই যে, তিনি ব্রাহ্মণদের শত্রু বলে মনে করতে পারছেন না। নইলে তো লাঠি কিংবা বুদ্ধির জোরেই তিনি কলকাতার ব্রাহ্মণ সমাজকে শায়েস্তা করতে পারতেন। টাকা দিয়ে কিছু ব্রাহ্মণকে কিনেও ফেলা যায়! কিন্তু পণ্ডিতসমাজ পুরো ব্যাপারটিকেই অশাস্ত্রীয় বলে ঘোষণা করলে জনসাধারণ তাঁর দিকে আসবে না। তাঁর চাই শাস্ত্রের সমর্থন। ব্রাহ্মণ ছাড়া পূজা হয় না। দেবেন্দ্র ঠাকুরের দল পূজা আচ্চা তুলে দিয়ে বেদ পাঠ করাচ্ছে। সে সবের বিরুদ্ধেই তো রানী রাসমণি পূজার মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চান। অথচ ব্রাহ্মণরাই তাঁকে প্রতিহত করছেন!

মথুর মাঝে মাঝে সান্ত্বনা দিতে আসেন, কিন্তু রানী কিছুতেই প্রবোধ মানেন না। তিনি কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। মা কালী নিজে এসে তাঁকে অন্নভোগ দিতে বলেছিলেন, আদেশ দিয়েছিলেন মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করতে, তা আর ইহজীবনে সম্পন্ন হবে না!

একদিন মথুর হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, মা, মা, একটি সুসংবাদ আছে! এবার বুঝি একটা উপায় হয়েচে।

রানী বিশেষ গরজ করলেন না, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, কী বলো?

মথুর বললেন, মা, আপনি উঠে বসুন। অনেক কথা আচে।

রাসমণি উঠে মথুরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ঠাণ্ডাভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী উপায় হয়েচে, আগে শুনি!

মথুর বললেন, এক চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত জানালেন যে, আপনি যদি মন্দিরের যাবতীয় সম্পত্তি কোনো ব্রাহ্মণকে আগে দান করেন আর সেই ব্রাহ্মণ যদি মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন, তা হলে আর শাস্ত্রের কোনো বাধা থাকে না।

রাসমণি বললেন, এ আর এমন কি কথা। আমার গুরুদেবের নামে ঐ সব সম্পত্তি ব্রহ্মোত্তর করে দেবো, আমি হবো তাঁর কর্মচারী। আমি তো নাম চাই না, মায়ের সেবার অধিকার পেলেই হলো।

মথুর বললেন, বেশ, এই তো উত্তম বন্দোবস্ত।

রানী জিজ্ঞেস করলেন, এই পণ্ডিতের বিধান সবাই মানবে? ইনি কে? কোথায় থাকেন?

মথুরবাবু বললেন, কেন মানবে না? ইনিও যে-সে পণ্ডিত নন। আমি নিজে এই মাত্র তেনার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে আসচি। তিনি আমায় শাস্ত্রের বচন উদ্ধার করে শোনালেন।

রাসমণি আবার প্রশ্ন করলেন, পণ্ডিতটি কে?

পণ্ডিতের নাম রামকুমার ভট্টাচার্য। হুগলীর কামারপুকুরে বাড়ি। কলকাতায় এসে ঝামাপুকুরে টোল খুলেছেন। তাঁর সঙ্গে থাকে তাঁর সতেরো বছর বয়সী এক ভাই, তার নাম গদাধর। ছেলেটি বেশ ভালো গান গায়।

রাইমোহন ও তার দলবল চন্দ্রনাথকে উদ্ধার করলো নিমতলার শ্মশানঘাট থেকে। তিনদিন ধরে ওরা সারা কলকাতা শহর চষে ফেলেছিল। হীরা বুলবুলের প্রায় অর্ধোন্মাদিনীর দশা। হিন্দু কলেজ থেকে চন্দ্রনাথ বিতাড়নের সংবাদ ছাপা হয়েছিল সংবাদপত্রে, এমনকি বাগবাজারের বোসেদের বাড়িতে

চন্দ্রনাথই যে বাবুদের এক শ্যালককে পাথরের চাঙ্গাড় ছুঁড়ে মেরে মাথা ফাটিয়েছে, সে খবরও গোপন থাকেনি।

রাইমোহন বুঝেছিল, বাবুদের পাইক বরকন্দাজরা চন্দ্রনাথকে একবার ধরতে পারলে হাতে নাতে মেরেই ফেলবে। কোতোয়ালির সাহায্য নিয়েও তারা ওকে ধরবার চেষ্টা করবে। তার আগেই চন্দ্রনাথকে কোথাও সরিয়ে ফেলা দরকার।

চন্দ্রনাথকে প্রথমে চিনতেই পারেনি রাইমোহন। শ্মশানে ডোমেদের পাশে সেও ডোম সেজে ছিল। পরনে শুধু মালকোচা মারা ধুতি, সারা গায়ে কালি-ঝুলি মাখা, মুখখানাতেও ছাই মেখেছে, চুলগুলো আঠার মতন। নিজের চেহারার চেয়েও বড় একটা বাঁশ নিয়ে সে চুল্লি খোঁচায়, আর শ্মশানযাত্রীরা যে ভিজে আতপ চাল ও কলা বাতাসা ফেলে যায়, সেইগুলি খেয়ে সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে।

রাইমোহন চেনার আগেই চন্দ্রনাথ তাদের চিনতে পেরে হাতের বাঁশটি ফেলে মেরেছিল এক দৌড়। তখন হারাণচন্দ্র চেঁচিয়ে উঠেছিল, ঐ তো চাঁদু।

রাইমোহনের বয়েস হয়েছে, এক তাজা বয়েসী কিশোরের সঙ্গে সে দৌড়ে পারবে কী করে। তার সঙ্গীরাও মাতাল দাঁতাল মানুষ, দৌড় ঝাঁপে বিশেষ দড় নয়। তবু সবাই মিলে ধর্ ধর্, ছোঁড়াটাকে ধর, বলে ছুটেছিল। কলকাতার মানুষ বড় হুজুগে, একটা কোনো উপলক্ষ পেলেই হলো। শ্মশান-মশানে অনেক পরগাছা ধরনের মানুষ থাকে, মড়াদের ওপর নির্ভর করেই তারা জীবন কাটায়। তারা অধিকাংশ সময়ই শুয়ে থাকে অথবা ইটের টুকরো দিয়ে বাঘবন্দী খেলে, হরিধ্বনি দিয়ে কোনো মড়া দাহের দল এলে তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এখন একটি জ্যান্ত ছেলেকে তাড়া করার দৃশ্য দেখে তারাও মজা পেল এবং অনুসরণকারীদের দলে যোগ দিল। নিশ্চয়ই কোনো চোর ধরার ব্যাপার, আর চোর ধরতে সকলেরই, এমনকি অন্য চোরেদেরও বিশেষ উৎসাহ থাকে।

এক সঙ্গে অনেকের তাড়া খেয়ে চন্দ্রনাথ প্রথমে কিছুক্ষণ ভীত ইঁদুরের মতন এদিক ওদিক করলো, তারপর দিশাহারা হয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো গঙ্গায়।

সে সাঁতার জানে না, কিন্তু ডুবে যাবার সুযোগ ঘটার আগেই শ্মশানের পরগাছারা কয়েকজন একসঙ্গে নেমে জল দাপিয়ে তুলে আনলো তাকে। এরা গঙ্গার জলের তলা থেকে শ্মশানবন্ধুদের ছুঁড়ে দেওয়া তামার পয়সা পর্যন্ত তুলে আনে, আর একজন মানুষকে তোলা তো এদের কাছে বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের যোগ্য কাজ।

ভিড় ঠেলে কাছে এগিয়ে এলো রাইমোহন, সে দারুণ ভাবে হাঁপাচ্ছে। চন্দ্রনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে আকুলভাবে বললো, চাঁদু চাঁদু, বাপ আমার, একি কল্লি তুই! তোর মা যে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাচ্চে রে!

নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য ছটফট করছে চন্দ্রনাথ। তার চোখ বোঁজা, মুখখানা কুঁকড়ে আছে।

রাইমোহন বললো, ডোম চাঁড়ালদের সঙ্গে ছিলি তুই, ওরে তোর কি একটু ঘেন্নাও নেই! সোনার বন্ন একেবারে কালি হয়ে গেচে! বাপ আমার চল, ঘরে চল।

এক ঝটকা মেরে রুক্ষ কণ্ঠে চন্দ্রনাথ বললো, ছাড়ো আমাকে। আমি যাবো না, বাড়ি যাবো না! আমি তোমাদের চিনি না!

তখন তিন চারজনে মিলে জোর করে চ্যাংদোলা করে তুলে ওকে চাপানো হলো একটি কেরাঞ্চি গাড়িতে। গাড়োয়ানকে রাইমোহন বললো, একটু শিগগির শিগগির চল বাবা! বখশিস পাবি! গাড়ির মধ্যে তারা চন্দ্রনাথকে চেপে ধরে রইলো। রাইমোহন পেছন ফিরে আড়াল করে রাখলো গাড়ির দরজাটি, যাতে পথের লোক কেউ দেখতে না পায়।

একখানা সাদা থান পরে দোতলার ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল হীরা বুলবুল। এই তিনদিন সে এক কণা অন্ন মুখে তোলেনি। কেঁদে কেঁদে তার সুন্দর ডিমছাঁদের মুখটি এখন ফুলে যেন বাতাপি লেবুর মতন হয়ে গেছে।

রাইমোহন ঘরে ঢুকে বললো, ও হীরে, ওঠ্, চোখ মেলে দ্যাক কাকে এনিচি!

হীরা বুলবুল মুখ ফিরিয়েই চন্দ্রনাথকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পক্ষিমাতার মতন ঝাঁপিয়ে পড়লো চন্দ্রনাথের ওপর।

কিন্তু চন্দ্রনাথের কাছে মাতৃস্নেহের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সে মায়ের আলিঙ্গনে ধরা দিল না, তার

আগেই এমন এক ধাক্কা দিল যে হীরা বুলবুল ঘুরে গিয়ে পড়লো দেয়ালে, ঠক্ করে তার মাথা ঠুকে গেল।

তারপর চন্দ্রনাথ তীব্র গলায় বললো, তুই আমার মা না রাক্ষুসী ? আমায় কেন গর্ভে ধারণ করিছিলি ? আর যদি ধারণ করেইছিলি, আঁতুর ঘরে আমার গলা টিপে মেরে ফেলিসনি কেন ?

মাত্র এই তিনদিনেই চন্দ্রনাথের শুধু যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে তাই-ই নয়, তার কণ্ঠস্বর পর্যন্ত বদলে গেছে। সে এখন বয়স্কদের ভঙ্গিতে বয়স্কদের ভাষায় কথা বলে।

হীরেমণি ভেউ ভেউ করে কান্না জুড়ে দিল।

রাইমোহন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, কাঁদিসনি হীরে, এই কি কাঁদবার সময় ! ছেলে ফিরে পেয়েচিস, ভগবানকে পেন্নাম জানা। মায়ে-ছেলেতে এমন আথান্তর হয়ই, ছেলের কতা গায়ে মাকতে নেই।

তারপর সে চন্দ্রনাথের দিকে ফিরে বললো, চাঁদু সোনা, বাপ আমার, অমন কটু কতা বলিসনি ! তোর অপমানে কি আমাদেরও কম অপমান হয়েচে ? তোর মা একেবারে মরমে মরে আচে। কাটা ঘায়ে এখুন আর নুনের ছিটে দিসনি !

চন্দ্রনাথ বললো, তুমি আমায় বাপ বলবে না ! তুমি কে ? তুমি আমার কিসের বাপ ? ক'দিনের বাপ ? তুমি আমায় কেন জোর করে ধরে এনোচো ?

রাইমোহন বললো, সব কতার উত্তর দেবো। এখুন একটু ঠাণ্ডা হ ! হাত মুক ধুয়ে কিছু পেটে দে।

চন্দ্রনাথ বললো, না !

হীরা বুলবুল বললো, ওরে চাঁদু রে, আমায় তোর যত ইচ্ছে বকিস। আমি আর পাপ কর্বো না কক্ষণো। আমি প্রাচিত্তির কর্বো। তোকে নিয়ে আমি তীথে যাবো ! পুরীর জগন্নাথের সোনার মুকুট গড়িয়ে দেবো। ব্রেন্দাবনে কৃষ্ণের হাতে সোনার বাঁশী তুলে দোবো। তাতেও আমার পাপ ধুয়ে যাবে না ?

চন্দ্রনাথ বললো, তুই মর। তুই যা খুশী কর। আমি তোদের কেউ না।

চন্দ্রনাথকে জোরজার করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো তার ঘরে। সেখানেও চন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ সজারুর মতন রইলো রোঁয়া ফুলিয়ে। ঘরে তার বইপত্র যা ছিল সব ছিঁড়ে একেবারে ধ্বংস করে ফেললো। খাবারের থালা সে ছুঁড়ে মারলো দেয়ালে। তার উগ্র উন্মাদের মতন মূর্তি দেখে কেউ ঘরে ঢুকতে সাহস পেল না।

সেই ভোর রাতেই চন্দ্রনাথ আবার পলায়ন করলো বাড়ি থেকে।

অনুসন্ধান পার্টি নিয়ে রাইমোহন আবার ঘুরতে লাগলো কলকাতার পথে পথে। সবক'টি শ্মশান ঘুরে দেখা হলো, চন্দ্রনাথ এবার ওসব দিকে যায়নি। কালীঘাটের মন্দিরের কাছে শয়ে শয়ে কাঙালী ঘুরে বেড়ায়। চন্দ্রনাথ সেখানে ওদের মধ্যে মিশে থাকতে পারে ভেবে রাইমোহন সারাদিন ওঁৎ পেতে রইলো, কিন্তু চন্দ্রনাথের সন্ধান মিললো না। বার সিমলেতে অষ্টপ্রহর হরি সংকীর্তন উপলক্ষে ভিখারীদের ফুটকড়াই ও আধলা বিলোনো হচ্ছে কিংবা পাথুরেঘাটার ঠাকুরদের বাড়িতে এক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী দরিদ্রনারায়ণ সেবা হচ্ছে, সেসব জায়গাতেও খোঁজ করে দেখলো রাইমোহন। চন্দ্রনাথ নেই।

পাঁচ দিনের মাথায় তাকে পাওয়া গেল মেটেবুরুজে। সেখানে পর পর কয়েকটি পুকুর ভরাট করে রাস্তা তৈরি হবে, জনা পঞ্চাশেক মজুর খাটছে, তাদের মধ্যে চন্দ্রনাথ একজন।

এবার রাইমোহনকে দেখে চন্দ্রনাথ পালাবার চেষ্টা করলো না ; একখানা লোহার শাবল তুলে সে তাকে মারতে তেড়ে এলো। আঘাতটা ঠিক মতন লাগলে রাইমোহনের মাথাটা চৌচির হয়ে যেত। ঠিক সময় রাইমোহন শরীরটা বাঁকিয়ে নিয়েছিল। শাবলের ঘা লাগলো তার কাঁধে, তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে সে দু'হাতে চন্দ্রনাথকে জড়িয়ে ধরে বললো, আর তোকে ছাড়চিনি, বাপ আমার ! এবার সর্বক্ষণ তোকে বুকে আগলে রাকবো।

এক ফিরিঙ্গি ঠিকাদার সেখানকার কুলিদের কাজ দেখাশোনা করছিল, সে এই বিচিত্র ঘটনায় আকৃষ্ট হয়ে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, এসব কী হইতেছে ?

রাইমোহন বললো, মাই চাইল্ড, স্যার ! ভেরি ম্যাড, স্যার। পাগলা কুকুরে বাইট করেছেল স্যার।

সেই থেকে মাথা ট্রাবলসাম, স্যার।

ফিরিঙ্গিটি আর কোনো বাক্য ব্যয় না করে ডান হাতের পাঞ্জাটি দুবার এমনভাবে নাড়ালো, যার অর্থ, নিয়ে যাও। শীঘ্র বিদায় হও।

আবার জোর করে চন্দ্রনাথকে তোলা হলো গাড়িতে। এবার বাড়িতে এনে তাকে একটি ঘরে বন্ধ করে শিকলি তুলে দেওয়া হলো।

হীরা বুলবুলকে রাইমোহন বললো, আমি বলি কী হীরে, এ পাড়া থেকে এবার বাস তুলে দে। তুই তো বাবু-বসানো ছেড়েই দিতে চাইচিস, তবে আর এ পাড়ায় থেকে লাভ কী। শহর ছেড়ে চল খিদিরপুরের দিকে চলে যাই। কিংবা রসাপাগলায় বন কেটে অনেক বসত বাড়ি হচ্চে, সেখেনে একটা বাড়ি কিনে তোতে আমাতে স্বোয়ামী স্ত্রী সেজে থাকবো। ছেলের মাতা গরম হয়েচে, ওকে নিয়মিত ক'দিন মকরধ্বজের সঙ্গে মধু-তুলসীপাতা মেড়ে খাওয়ালেই আবার ঠিক হয়ে যাবে।

হীরা বুলবুল বললো, আমার ওতে কাজ নেই। তুমি ব্যবস্থা দ্যাকো, আমি তিথ্যি যাত্রায় বেরুবো। আমার পাপের প্রাচিত্তির করতে হবে।

রাইমোহন বললো, পাপ আবার কী? তুই কোন পাপ করিচিস? মেয়ে মানুষে কখুনো একলা একলা পাপ করতে পারে না। তোর সঙ্গে যে-সব বড় মানুষরা পাপ করেচে, তারা কী তীর্থযাত্রা করে পাপ ধুতে যাচ্চে? প্রতিশোধ নিতে হবে, বুঝলি? যে বড়মানুষগুলোনের জন্য চাঁদুকে হিঁদু কালেজ থেকে তাড়ানো হয়েচে, সেই সব ব্যাটাদের দেকে নোবো। এর শোধ যদি না তুলি তাহলে আমার নাম রাইমোহন ঘোষাল নয়। না পারলে রূপী বাঁদরটার নামে আমার নাম রাকিস।

হীরা বুলবুল বললো, অত বড় বড় কতায় আমার কাজ নেই। ঐ ছেলে বৈ আমার আর কেউ নেই এ সংসারে।

রাইমোহন বললো, আর কেউ নেই? আমি তোর কেউ নই? এতদিন লাথি ঝ্যাঁটা খেয়ে তোর পায়ের কাচে রইলুম, এখুন বলচিস, আমি তোর কেউ নই!

—ওমা, সে কতা কখুন বল্লুম! আমি তিথ্যি কত্তে গেলে তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে। তবে আর এখেনে কখুনো ফিরচিনি। সে কতা আমি আগেই বলে দিলুম। ঘেন্না ধরে গ্যাচে এই কলকেতা শহরের ওপর।

—সে যে পালানো হবে রে। আমরা ভয় পেয়ে পালাবো কেন?

—তা হলে তুমি থাকো। আমরা মায়ে পোয়ে বেরিয়ে পড়বো।

—কোতায় যাবি?

—যেদিকে দু'চোক যায়।

—এই জন্যেই না বলে মেয়েমানুষের বুদ্ধি। বেরিয়ে পড়বো বললেই হলো। বেরুতে গ্যালে অনেক বন্দোবস্ত লাগে।

—আমার কিচু লাগবে না। ছেলের হাত ধরে আমি চলে যাবো, কে আমার কী কর্বে!

—অমনি বললেই হলো। ওরে তোর এখুনো গতর আচে, চাঁদপানা মুখ আচে, ঢলো ঢলো যৌবন আচে, তোকে কেউ নির্ঝঞ্ঝাটে যেতে দেবে? পথের বাঁকে বাঁকে বাঘ নেকড়েরা ওঁৎ পেতে রয়েচে, তোকে ছিঁড়ে খাবে।

—সেইজন্যিই তো বলচি, তুমি চলো। তুমি আমাদের চোকে চোকে রাকবে। তোমায় ছেড়ে কি কোতাও যেতে পারি।

রাইমোহন নিজের প্রৌঢ় শরীরখানির দিকে তাকিয়ে ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমার কি আর সে তাগদ আচে রে। কোনোদিন লাঠি বন্দুকও ধরতে শিকিনি!

তারপর নিজের ললাটে দুটি টোকা দিয়ে বললো, আমার জোর এখেনে। এই বুদ্ধির জোরে কলকেতার বাবুদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারি, কিন্তু ঠ্যাঙাড়ে-বোম্বেটেদের কাচে সুবিধে করতে পারবো না। তাই তো বলচি, পালাবি কেন? আমরা এইখেনে থেকেই লড়বো।

এই সময় বাড়ির সম্মুখস্থ পথে কয়েকটি ভারি পায়ের লোহা বাঁধানো জুতোর শব্দ হল। জানলার খড়খড়ি সামান্য ফাঁক করে উঁকি মেরে রাইমোহন দেখলো, কয়েকজন সেপাই এদিকেই আসছে। রাইমোহনের মুখ শুকিয়ে গেল।

সেপাইরা অবশ্য এ গৃহে প্রবেশ করলো না, তারা এগিয়ে গেল সামনের দিকে। খড়খড়ি বন্ধ করে হাঁপ ছেড়ে ফিরে এসে রাইমোহন বললো, বাপরে বাপ! পিলে চমকে গিয়েছেল একেবারে! আমি ভাবলুম বুঝি সেপাইরা চাঁদুকেই ধরতে আসচে!

হীরা বুলবুল বললো, ওমা, চাঁদুকে ধরবে কেন? চাঁদু তো কারুর পাকা ধানে মই দেয়নি!

—বাগবাজারের বোসবাবুদের এক শালার মাতা ফাটিয়ে দিয়েচে না চাঁদু? তারা সহজে ছাড়বে ভাবিস। পুলিশ ঠিক এ বাড়ি খুঁজে বার করবে একদিন না একদিন।

হীরা বুলবুল অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে বললো, ওগো আর এ বাড়িতে থেকে তবে কাজ নেই। তুমি আজই তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা করো। ওগো বজরায় গেলে হয় না? যদি কয়েকজন পাইক ভাড়া করা যায়?

—তারপর রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়? পাইকরাই যদি মাঝপথে মেরেকুটে সব কিছু নিয়ে চম্পট দেয়? ডাঁড়া, একটু চিন্তা করতে দে!

—তুমি যাই বলো, আমি তীথে যাবোই।

—কালীঘাটও তো তীর্থ, সেখেনে গিয়ে থাক তবে। একটা বাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে, দু'একদিনে হবে না।

—না, কালীঘাটে না, এমন জায়গায় যাবো, যেখেনে কেউ আমাদের চেনে না।

—আঃ ডাঁড়া না, একটু ভাবতে দে। ও, এক কাজ করলে হয়! আজই এ বাড়ি থেকে সরে পড়া দরকার। এই তো কাচেই কমলা থাকে, ওর সঙ্গে আমার বেশ চেনা আচে। আমি বললে সে কয়েক রাত খুব আহ্লাদের সঙ্গে তোদের থাকতে দেবে। তারপর ক'টা দিন কাটলে অন্য একটা ব্যবস্থা!

—কার বাড়ি?

—জানবাজারের কমলার।

আহত দলিতা ফণিনীর মতন ফোঁস করে উঠলো হীরা বুলবুল। সে এবং কমলাসুন্দরী দুজনেই এই শহরের দুই ডাকসাঁইটে বারাঙ্গনা। হীরা বুলবুলের খ্যাতি যেমন সঙ্গীতে কমলাসুন্দরীর তেমনি নৃত্যে। এরা পরস্পরের প্রতিপক্ষ। তার বাড়িতে আশ্রয়ের প্রস্তাব এনে রাইমোহন হীরা বুলবুলের আঁতে ঘা দিয়েছে।

হীরা বুলবুল বললো, কী, আমি কমলির বাড়িতে গিয়ে নুকোবো? তার আগে তুই আমায় থুতু ফেলে ডুবে মত্তে বললি না কেন? ড্যাকরা, খালভরা! এই তোর মনে ছেল! হাতি পাঁকে পড়লে ব্যাঙেও নাতি মারে! আজ আমার এমন বিপদ বলেই তুই এমনধারা কতা বলতে পারলি। কমলি যদি তোর এত পেয়ারের নাঙী হয় তবে তুই যা না সেখেনে। এখুনি যা। বিদেয় হ। দূর হ। ডরপুক্ কাঁহিকা। এইজন্যই আমার সঙ্গে তিথ্যি কত্তে যেতে তোর এত ভয়। কমলি মাগীটা পাঁচজনের সামনে উলঙ্গ হয়, ছোট জাতের মেয়ে, তাকেই তোর মনে ধরেচে। নিমকহারাম, এতকাল আমি দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষচি···

হীরা বুলবুল একবার গালাগালির স্রোত বহাতে শুরু করলে তাকে থামায় কার সাধ্যি। রাইমোহন দু'হাত তুলে অসহায়ের মতন তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলো, তারপর হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলো, শেষ পর্যন্ত তার পায়ে পড়লো। তবু হীরা বুলবুল থামে না।

রাইমোহন সবলে হীরা বুলবুলের মুখ চেপে ধরে বললো, ওরে কমলি তোর অত শত্তুর বলেই তো তার কথাটা মনে এলো। সেখেনে তুই বা চাঁদু লুকোলে পুলিশ কেন, পুলিশের বাপের সাধ্যি নেই সন্দেহ করে। সবাই জানে, হীরে বুলবুল আর যে-জায়গাতেই লুকোক, মরে গেলেও সে কমলির কাচে আশ্রয় চাইবে নাকো। আমি বলি কি, ডাঁড়া, বলতে দে আগে আমাকে, তোর যাবার দরকার নেই, তুই কেন যাবি, পুলিশ তো তোকে ধরতে আসবে না। চাঁদু বরং দু'চারদিন ওখেনে থাক। পুলিশও ওর খোঁজ পাবে না। চাঁদুও ওখেন থেকে সহজে পালাতে পারবে না।

মুখখানা একটু ছাড়া পেতেই হীরা বুলবুল বললো, সে মাগী আমার ছেলেকে নুকিয়ে রাকবে? তোর মাতায় কি শোঁয়া পোকা ঢুকেচে! সে রাক্কুসী আরও সেপাই ডেকে চাঁদুকে ধরিয়ে দেবে।

রাইমোহন বললো, কক্ষণো না। তুই নিজের কতাই একবার ভেবে দ্যাক। কমলির যদি কোনো ছেলে থাকতো, আর সে যদি তোর কাচে আশ্রয় চাইতো, তুই থাকতে দিতিসনি? বিপদের দিনে নিজের জাতের লোকদের কি কেউ পায়ে ঠেলে দেয়?

—নিজের জাত? সে মাগীর জাতের কোনো ঠিক আচে? দ্যাগ গিয়ে, সে কোন্ মুদ্দোফরাসের ···

মেয়ে। রঙের কী চেকনাই, কাঠ কয়লা বলে মরি মরি।

—আহা-হা, তোর থেকে তো সে নীচু জাতের বটেই। তবু বলচি, সেও তোর মতন পাঁচজন বড় মানুষের সঙ্গে ওঠা বসা করেচে, মনটা একটু খোলামেলা হয়েচে।

অনেক বোঝাবার পর এবং চন্দ্রনাথের আশু বিপদের সম্ভাবনায় শেষ পর্যন্ত রাজি হলো হীরা বুলবুল।

কিন্তু চন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়া সহজ কাজ নয়। সে কারুকে কাছেই ঘেঁষতে দেয় না। কেউ তাকে ধরতে গেলেই ক্ষিপ্ত পশুর মতন দু'হাত চালায়। শেষ পর্যন্ত তিন চারজনে মিলে চন্দ্রনাথের হাত, পা ও মুখ বেঁধে মধ্যরাত্রে একটি গাড়িতে তোলা হলো।

নিশুতি রাত, পথে লোক নেই, যাবার পথে গাড়িতে চন্দ্রনাথকে অনবরত বোঝাতে লাগলো রাইমোহন। চন্দ্রনাথ যদি বাড়ির সঙ্গে কোনো সংশ্রব না রাখতে চায়, বেশ তো, কয়েকদিন পর তার যেখানে খুশী চলে যাবে। আগে হাঙ্গামাটা মিটুক। সবাই এসব কথা ভুলে যাক। এখন বোসবাবুদের লোকদের হাতে ধরা পড়লে চন্দ্রনাথ যে আরও বিপদে পড়বে। তাছাড়া, হিন্দু কলেজ ছাড়া কি পড়াশুনো করা যায় না? রাইমোহন তার জন্য সাহেব শিক্ষক রেখে দেবে বাড়িতে। কিংবা এমনিতেই চন্দ্রনাথ ঢের লেখাপড়া শিখেছে, এখনি সে কোনো হৌসে চাকরি জুটিয়ে বাবু শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারে। চন্দ্রনাথ যদি রাইমোহনকে পিতা বলে মেনে নেয় তাহলে সে ঘোষাল পদবী নিতে পারে, তারপর এই সমাজে তাকে অবজ্ঞা করে কার সাধ্যি?

সেই রাত্রেও কমলাসুন্দরীর বাড়িতে একটি মজলিস বসেছিল। সুরার নেশায় কমলার নয়ন দুটি ঢুলুঢুলু। ঘাঘড় ও কাঁচুলি পরা। বয়েসের ফলে কমলাসুন্দরী এখন অনেকটা পৃথুলা হয়েছে, কোমরে মেদের স্তর, তবু সে এখনো নাচের ঠমকে শহরের অনেক বাবুরই হৃদয় আন্দোলিত করতে পারে।

রাইমোহন মজলিস ঘর থেকে বাইরে ডেকে কমলাসুন্দরীকে সব বৃত্তান্তটি জানালো। কমলাসুন্দরী প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতেই পারে না। নেশায় মগজ আচ্ছন্ন, সে বারবার বলতে লাগলো, কার ছেলে? বাপের নাম কী? শুধু হীরের ছেলে, হি-হি-হি-হি! হি-হি-হি-হি! হীরের ছেলে! কী করেচে সে, ডাকাতি? ফেরেববাজি? তা থাকো না বাবা, থাকো! যতদিন ইচ্ছে থাকো! তুমি যখন বলচো, তাতে আর আপত্যি কি! তা এতদিন কেন আসোনি, নাগর? কতদিন তোমার চাঁদ মুখ দেকিনি।

এ বাড়ির ছাদে একটি চিলে-কোঠা আছে, অনেকদিন ব্যবহৃত হয়নি। কোনোরকমে সেটিই সাফ সুতরো করে সেখানে এনে শোয়ানো হলো চন্দ্রনাথকে। তার মুখ ও হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে রাইমোহন বললো, তুই আমায় মারতে চাস, মার, যত খুশী। এই আমি দোরগোড়ায় বসে রইলুম। আমাকে একেবারে মেরে না ফেলে তুই যেতে পারবিনি।

কোণঠাসা বিড়ালের মতন দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলো, তুমি কতক্ষণ, কতদিন আমায় পাহারা দেবে?

হাই তুলে রাইমোহন বললো, এই ধর, আট দিন, কি দশ দিন, তারপর সবাই তোর কথা ভুলে যাবে। তখন তুই যা খুশী করিস!

চন্দ্রনাথ বললো, আমি আর এক দণ্ডও তোমাদের কাচে থাকতে চাই না! তোমাদের দেকলেই আমার গা জ্বালা করে!

—আমি পিঠ ফিরিয়ে বসি, আমায় দেকিসনি!

—তুমি দূর হয়ে যাও।

—কেন মিছে এত রাগ করচিস, চাঁদু? মহাভারত পড়িসনি? কর্ণ কি বলেছেল? দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং হি পৌরুষম্! মানুষ কোন কুলে, কোতায় জন্মায়, সেটা দৈব ঘটনা, তার ওপর তো কারুর নিজের হাত নেই। দ্যাক, সমাজের পাঁচজনের মধ্যে তুই যাতে মাতা তুলে দাঁড়াতে পারিস, তার জন্য আমরা কম চেষ্টা করিনি। একবার হারবি, পাঁচবার হারবি, তা বলে তো ভেঙে পড়লে চলবে না! আত্মোন্নতির চেষ্টা কক্ষণো ছাড়তে নেই।

—আঃ, চুপ করো, আমার বকবকানি ভালো লাগে না।

—শোন্ চাঁদু, তুই আমার ওপর রাগ করতে পারিস, তোর মায়ের ওপর রাগ করতে পারিস, কিন্তু আমরা কখনো তোর গায়ে কোনো ময়লা লাগতে দিইনিকো।

চন্দ্রনাথ একদলা থুতু থুঃ করে ছিটিয়ে দিল রাইমোহনের দিকে। সেই থুতু রাইমোহনের গালে লেগে গড়িয়ে পড়লো ঘাড়ে, রাইমোহন মুছলো না, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো চন্দ্রনাথের দিকে। সে দৃষ্টিতে রাগ নেই, বরং একটু পরে তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো অশ্রু। কতদিন পর, বোধহয় পঁচিশ, তিরিশ, চল্লিশ বছরের মধ্যেও রাইমোহন কখনো কাঁদেনি। এ বোধহয় বার্ধক্যের ফল!

চন্দ্রনাথ খর চোখে চেয়ে রইলো, কারুর কান্না দেখে তার মন আর দুর্বল হবার নয়।

দোতলায় নাচ-গানের জড়িত হল্লা তখনো চলেছে, ওপরে দু'জন সম্পূর্ণ নীরব। এরকমভাবে আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়। এক সময় চন্দ্রনাথ ঘুমে হেলে পড়লো। তারও পর অনেকক্ষণ জেগে বসে থেকে ভোর রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়লো রাইমোহন। দরজার চৌকাঠের কাছে আড়াআড়িভাবে শুয়ে।

রাইমোহনের ঘুম ভাঙলো বেশ বেলায়। ধড়ফড় করে উঠে বসেই সে দেখলো ঘর শূন্য। রাইমোহন একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। চন্দ্রনাথকে আর খুঁজে লাভ নেই। তাকে আটকে রাখতে গেলে হাত পা বেঁধে রাখাই উচিত ছিল। মানুষকে মানুষ ডিঙ্গিয়ে যায় না, চন্দ্রনাথ সেই সৌজন্যটুকুও মানেনি, সে নিশ্চয়ই রাইমোহনকে ডিঙ্গিয়ে লাফিয়ে চলে গেছে। চন্দ্রনাথ সাবালক হয়েছে, বুদ্ধিবৃত্তি আছে, তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কী ভাবে আর আটকে রাখা যায়। চন্দ্রনাথের মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসার চিহ্ন কখনোই তেমন দেখা যায়নি, এখন সে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করেছে। হীরেমণিকে এই বাস্তব সত্য মেনে নিতেই হবে। এখন ছেলেটা বেঘোরে মারা না যায়! রাইমোহন নিজে অনেক গলাধাক্কা, অপমান সহ্য করেছে, কিন্তু চন্দ্রনাথের মনের কোন্ তন্ত্রীতে ধাক্কা লাগায় সে এমন বিগড়ে গেল, তা সে বুঝতে পারলো না।

সারা বাড়ি এখনো প্রায় ঘুমন্ত। হীরা বুলবুল এবং কমলাসুন্দরী দু'জনেরই প্রতিপত্তি এখন পড়ন্ত। এর মধ্যে কমলাসুন্দরী আরও কয়েকটি যুবতীকে নিজের কাছে রেখে তালিম দিচ্ছে, যাতে তার পসার বজায় থাকে। সেই দু'-তিনটি মেয়ে স্নান সেরে ঘোরাঘুরি করছে অলিন্দে। রাইমোহন এদের চেনে না, এরাও চেনে না রাইমোহনকে। সে একবার ভাবলো ওদের কাছে চাঁদুর কথা জিজ্ঞেস করবে কি না। পরক্ষণেই মনে হলো, কোনো লাভ নেই; দ্বারবানদের প্রশ্ন করেও কোনো সুসার হবে না।

ভারাক্রান্ত মনে সে চলে এলো গৃহের পশ্চাদ্বর্তী বাগানে। এখন একটি কঠিন কাজ বাকি আছে, হীরা বুলবুলের কাছে সংবাদটি প্রকাশ করতে হবে। অবুঝ হীরা বুলবুলকে সামলানো যে কী প্রাণান্তকর ব্যাপার হবে, তা ভেবেই শিউড়ে উঠলো রাইমোহন। এক্ষুনি সে হীরার সম্মুখীন হতে চায় না। কোনো সন্দেহ নেই যে হীরা রাইমোহনকেই সম্পূর্ণ দায়ী করবে। এখানে চন্দ্রনাথকে নিয়ে এসে কি ভুল করলো সে? জীবনে এতবড় ভুল আর তার হয়নি। ঘরে শিকলি তুলে দিয়েই বা একটি সোমত্থ ছেলেকে ক'দিন আটকে রাখা যায়। তা ছাড়া পুলিশের হাতে পড়ার ভয়টি তো মিথ্যে নয়।

রাইমোহন আপনমনে বাগানে ঘুরছিল, এমন সময় কেউ একজন তাকে ডাকলো, ওহে এদিকে একবার শোনো তো!

রাইমোহন চমকিত হয়ে তাকিয়ে দেখলো, পার্শ্ববর্তী উদ্যানে ফেজ পরা খানদানী চেহারার একজন মুসলমানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ধুতি চাদর পরা এক বৃদ্ধ। সেই বৃদ্ধকে চিনতে পেরে রাইমোহন দ্বিতীয়বার চমকিত হলো। বিধুশেখর মুখুজ্যের এই চেহারা হয়েছে! বাঁ চোখের ওপরে একটা কালো ঢাকনা দেওয়া, শরীরটা শুকিয়ে গেছে, হাতের ছড়ির ওপর ভর দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে।

রাইমোহন কাছে আসতেই বিধুশেখর বললেন, তুমি রাইমোহন না?

রাইমোহন বিনয়ে গলে গিয়ে বিগলিত হাস্যে বললো, প্রণাম মুখুজ্যে মশাই। এতদিন পরেও ঠিক চিনেচেন। তা আপনি সর্বজ্ঞ ব্যক্তি, আপনার কখনো ভুল হতে পারে! আপনি এখেনে?

বিধুশেখর বললেন, তার আগে বলো, তুমি এখেনে কী করচো?

রাইমোহন শ্রদ্ধায় ভক্তিতে একেবারে নুয়ে গিয়ে বললো, আজ্ঞে, আমরা শখের পায়রা, যখন যেখানে দানা ছড়ানো থাকে সেখানে খুঁটে খেতে যাই।

—তা আপাতত কার দানা খাচ্চো?

—দানা পাচ্চি, খাচ্চি, মালিকের খোঁজ রাখি না। আর সেরকম মালিকই বা কোতায় ? রামকমল সিংগী মশাই মারা গিয়ে আমাদের একেবারে অনাথ করে দিয়ে গ্যালেন। বড় বৃক্ষের ছায়ায় থাকা আমাদের অভ্যেস।

—শোনো, ঝড় উঠবার উপক্রম হলে পিপড়েরা নড়বড়ে বাড়ি ছেড়ে সার বেঁধে চলে যায়, দেকোচো ? তুমিও ও বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও সটকাও। ও বাড়ির মাগীটার ভিটে মাটি চাঁটি করবো এবার। মামলা দায়ের হয়েচে !

মুনসী আমীর আলী বিধুশেখরকে ফার্সীতে প্রশ্ন করলেন, এই চিড়িয়াটি কে ?

বিধুশেখর বললেন, আপনি ঠিক চিনতে পারবেন না। আমাদের শাস্ত্রে এই পাখির উল্লেখ আছে, তার নাম গরুড়। দেখছেন না সব সময় হাত জোড় করে আছে।

রাইমোহন সেই মুহূর্তে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। হীরা বুলবুল তার পেশা ছেড়ে দিতে চাইছে, কিন্তু রাইমোহন তার পুরোনো পেশাটিকে আবার চালু করবে। তবে, এই বুড়োকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না, এ একেবারে ছিবড়ে হয়ে গেছে, নওজোয়ান ছোকরা চাই। চন্দ্রনাথের ওপর অবিচারের শোধ নিতে হবে তো !

বেড়া টপকে এদিকে এসে সে বললো, হুজুর, আপনি কমলিকে তাড়াবেন, সে তো বেশ ভালো কতা। আপনি ইচ্ছে করলে কী না প্যারেন ! আমরা একটু আশ্রয় পেলেই হলো।

তারপর হেঁট হয়ে বিধুশেখরের পায়ের ধুলো নিয়ে সে আবার বললো, হুজুর, আশীর্বাদ করুন, কোনোরকমে যেন বেঁচে বর্তে থাকি। এই অধম আপনার সেবক, যখন যা হুকুম করবেন তা তামিল করবার জন্য আমি সব সময় তৈরি। যদি বলেন তো ঐ কমলী মাগীটার পেছুনে বিছুটে লাগিয়ে একেবারে দেশছাড়া করে দিই !

আশীর্বাদের ভঙ্গিতে ডান হাত তুলে বিধুশেখর বললেন, বেশ, বেশ !
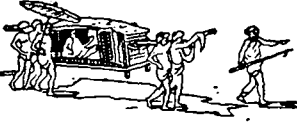
কাশী শহরে হুলুস্থুলু পড়ে গেছে। সকাল থেকেই লোকের মুখে মুখে একটি কাহিনী নানানভাবে পল্লবিত হতে লাগলো। ত্রৈলঙ্গ স্বামী আর একটি কাণ্ড করেছেন। ভোরবেলা তিনি মণিকর্ণিকার ঘাটে নেমে ভুস্ করে এক ডুব দিয়ে বেশ খানিক পরে উঠেছেন আর এক ঘাটে, তারপর কী খেয়াল হয়েছে, জল থেকে উঠে এসে সামনের এক কালী মন্দিরে ঢুকে মূর্তির গায়ে প্রস্রাব করে দিয়েছেন।

কেউ বলে মন্দিরে তখন আর কেউ ছিল না, কেউ বলে পুরোহিত ছিল, আবার কেউ বলে সেখানে ছিল এক বাঙালী সাধক। সে যাই হোক, পুরোহিত বা বাঙালী সাধকটি এই কাণ্ড দেখে আঁতকে উঠে বলেছিল, আরে রাম রাম ! স্বামীজী, ইয়ে আপ কেয়া কবতা !

কয়েক বৎসর ধরে ত্রৈলঙ্গ স্বামী সম্পূর্ণ মৌনী, কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি সেই কার্যটি সমাপ্ত করলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর মন্দিরের মেঝেতে গড়ানো প্রস্রাবের ধারার ওপরেই আঙুল দিয়ে লিখলেন, 'গঙ্গোদকং'।

বারাণসীর জনসাধারণ এই ঘটনায় দুটি দলে বিভক্ত হয়ে তর্ক বিতর্কে মেতে উঠলো। তবে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর পক্ষপাতীরাই দলে ভারী। তাদের মতে ত্রৈলঙ্গস্বামী স্বয়ং চলন্ত শিব, তিনি যা করবেন, সেটাই তাঁর পূজা। তিনি লোকাচারের অতীত, সর্বসমক্ষে উলঙ্গ থাকতেও তাঁর কোনো দ্বিধা নেই। তাঁর কাছে চন্দন আর বিষ্ঠা সমান, সুতরাং গঙ্গাজল ও স্বমূত্রতেই বা প্রভেদ থাকবে কেন ? গঙ্গা তাঁর শরীরের মধ্যে প্রবাহিত।

অন্য দল এতটা মানতে রাজি নয়। যোগীরাজ বা অবতারদেরও তো লোকশিক্ষার জন্য কিছু করতে হয়। এ কেমনধারা লোকাচার বহির্ভূত উৎকট ব্যবহার !

দলে দলে লোক ছুটে চলেছে সেই কালী মন্দিরের দিকে।

গঙ্গানারায়ণ বসে ছিল দশাশ্বমেধ ঘাটের পৈঠায়, যথাসময়ে সেও সংবাদটি শুনলো। কালী মূর্তির

গায়ে প্রস্রাব ছিটানোর কাহিনী শুনে সে কৌতুক বোধ করলো খুব। এখন আর সে চক্ষু মুদলে সেই স্বর্ণজিহ্ব স্বর্ণনয়না মূর্তিটি দেখতে পায় না! শপথ ভঙ্গের কোনো গ্লানি তার নেই। এখন দেব-দেবীর মূর্তি তার কাছে নিছকই প্রস্তর-দারু মূর্তি!

অবশ্য শপথ ভেঙেই বা কী লাভ হলো। বিন্দুবাসিনীর কোনো সন্ধান সে পায়নি। বোধ করি পাওয়ার আর কোনো আশাও নেই। ছড়িদার মনসারামের পিছন পিছন সে অনেক ঘুরেছে। যে লালাজীর কাছে বিধুশেখর টাকা পাঠাতেন, তাকেও সে খুঁজে বার করেছে. এরা দু'জনেই বলতে চায় যে, বিন্দুবাসিনী আর বেঁচে নেই। কিন্তু সে কথা গঙ্গানারায়ণ বিশ্বাস করতে পারেনি পুরোপুরি। বিন্দুবাসিনী কোন্ রোগে মরলো, কোথায় তাকে দাহ করা হলো, সে বিষয়ে ঐ দু'জনেই অস্পষ্ট উত্তর দেয়। কেমন যেন এড়িয়ে যেতে চায়। উদাসীনভাবে বলে, আর সে সব কথা শুনে কী হবে, বাবুজী! যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আপনি ঘরে ফিরে যান। কাশীতে একা একা এমন দেওয়ানা হয়ে ঘুরবেন কেন?

কিন্তু গঙ্গানারায়ণের ফিরে যাওয়ার কথা একবারও মনে আসে না। কাশীর জীবন-যাত্রায় সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

কোনোই কাজ নেই, তাই গঙ্গানারায়ণ ভিড়ের স্রোতের সঙ্গে মিশে দেখতে গেল ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে।

সেই কালী মন্দিরের চাতালে গঙ্গামুখী হয়ে স্থির ভাবে বসে আছেন সেই মানুষ-পাহাড়টি। শত শত লোক তাঁর কাছে গিয়ে গড় করছে, বহু লোক আকুল চিৎকার করে তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে, কিন্তু স্বামীজীর কোনো হুঁশ বোধই নেই। তিনি যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি ভক্তি চটে গেছে গঙ্গানারায়ণের, কিন্তু ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো, এই মানুষটি কিছুটা অসাধারণ নিশ্চিত। এত লোকের ব্যাকুলতার মধ্যে এমন অনড় অটল হয়ে বসে থাকা যে-সে লোকের কর্ম নয়। কিন্তু এই যে ভক্তের দলবল, এরা কি মানুষ, না পোকামাকড়? এদের কি নিজস্ব চিন্তাশক্তি বলে কিছু নেই? ওরই মধ্যে অনেক লোক আবার সেই প্রস্রাব হাতে মেখে সেই হাত জিভে ছোঁয়াচ্ছে। ঘৃণায় গঙ্গানারায়ণের মুখ কুঞ্চিত হলো।

গতকাল সন্ধ্যাতেই কাশীতে একটি ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে গেছে। 'শিশমহল' নামে একটি বাড়িতে একদল দুর্বৃত্ত তলোয়ার বন্দুক নিয়ে হানা দিয়েছিল। সে বাড়ি ভর্তি অনেক লোক, এমনকি বাড়ির কর্তার একটি বন্দুকও ছিল, কিন্তু কেউ বাধা দিতে পারেনি. দুর্বৃত্তরা দু'জনকে হত্যা করেছে, সব অর্থ-স্বর্ণালঙ্কার লুণ্ঠন করেছে এবং একজন সুন্দরী রমণীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এতবড় একটা নৃশংস ঘটনা সম্পর্কেও কাশীর লোকদের তেমন মাথাব্যথা নেই। অথচ একজন সাধু কালীমূর্তির গায়ে অপকর্ম করেছে, তা নিয়েই সবাই উন্মত্ত।

সেদিন অপরাহ্নে গঙ্গানারায়ণ নৌকাযোগে গঙ্গা পার হয়ে ওপারের রামনগরে গেল বেড়াতে। কাশী ও রামনগরের মধ্যে খেয়া আছে, কিন্তু সে আগে এদিকে আসেনি। রামনগরের দিকে ঠিক শহর গড়ে ওঠেনি, কাশীর রাজার প্রাসাদ এবং তাঁর লোকলস্করের বাসস্থান, আর খানিক দূরে দূরে এক একটি ধনী ব্যক্তির অট্টালিকা। এদিকে তেমন লোক চলাচল করে না। গঙ্গাতীরের বিস্তীর্ণ ফাঁকা জমিতে সে একা একা পরিভ্রমণ করতে লাগলো।

গঙ্গানারায়ণের এখন প্রায়ই কলকাতার কথা মনে পড়ে। একমাত্র জননী বিম্ববতীর জন্যই তার বক্ষে মোচড় লাগে। আর কারুর প্রতি তার টান নেই। নিজের স্ত্রীর কথা স্মরণে এলে তার একটুও মমতা জাগে না। তার স্ত্রীকে সে নিজের মনোমত গড়ে নেবার অনেক চেষ্টা করেছিল, পারেনি। লীলাবতী শুধু তার শয্যাসহচরী হতে পারে, তার জীবনসঙ্গিনী হবার ক্ষমতা তার নেই। অথচ গঙ্গানারায়ণের তো আর কেউ নেই, তার বুক ভরা নিঃসীম একাকিত্ব, সে একজন সঙ্গিনীকেই চেয়েছিল। লীলাবতী বিন্দুবাসিনীর স্থান নিতে পারলো না! এখন লীলাবতীর যা ঘটে ঘটুক, সেজন্য গঙ্গানারায়ণ দায়ী নয়।

আর মনে পড়ে কলেজ জীবনের বন্ধুদের কথা। কলেজ পরিত্যাগ করার পর থেকে আস্তে আস্তে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মধু, রাজনারায়ণ, ভূদেব, বঙ্কু, গৌর—সবাই এক একদিকে ছড়িয়ে গেছে। গঙ্গানারায়ণের মনে হয়, ঐসব বন্ধুরা সকলেই স্বেচ্ছামত নিজের জীবন গড়ে নিয়েছে, শুধু গঙ্গানারায়ণই কিছু পারলো না। তার জীবনের কোনো স্থির লক্ষ্য ছিল না। বৃথাই সে ঘোরাঘুরি করলো এদিক-ওদিক। বিধুশেখরের স্বৈরাচার দমন করতে গিয়েও ব্যর্থ হলো সে। এখন সে কোন্ মুখে আর ফিরে যাবে দেশে? ব্যর্থ, পরাজিত ভাবে তার প্রত্যাগমনে সবাই উপহাস করবে না? ইব্রাহিমপুর

পরগণা পরিদর্শন করতে গিয়ে অকস্মাৎ বজরা থেকে তার উধাও হয়ে যাওয়ার কোন্ কারণ সে দর্শাবে ? কারণটি তো সে নিজেই এখনো জানে না। বিন্দুবাসিনী নেই, তবু এই বারাণসীতেই সে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে।

ফেরার জন্য গঙ্গানারায়ণ তীর ধরে ধরে খেয়াঘাটের দিকে আসছে, পথে অন্য একটি ঘাট পড়লো। তখন প্রায়ান্ধকার হয়ে এসেছে, আকাশে ফিকে জ্যোৎস্নার আভা, বাতাস বইছে মন্দ মন্দ। গঙ্গানারায়ণ দেখলো, নদী থেকে উঠে আসছে এক রমণী। সিক্ত বসন শরীরের সঙ্গে সাঁটা, পিঠের ওপর গুচ্ছ গুচ্ছ কেশভার, চক্ষু দুটি নিমীল।

তৎক্ষণাৎ গঙ্গানারায়ণের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, তার হৃদয়ে সংশয়ের অবকাশ মাত্র হলো না। এক পলক দেখেই সে অস্ফুট কণ্ঠে বললো, বিন্দু !

ঘাটের কাছে দু'জন স্ত্রীলোক একটি লাল বনাত মেলে ধরে আছে, যাতে সম্মুখ থেকে অন্য কেউ স্নানরতাকে দেখতে না পায়। কিন্তু গঙ্গানারায়ণ আসছিল নদীর ধার ঘেঁষে, তার চোখ চলে গিয়েছিল হঠাৎ সেদিকে।

দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করেই গঙ্গানারায়ণ আবার জোর করে ডেকে উঠলো, বিন্দু ! তারপরই দৌড়োলো সেদিকে।

গঙ্গানারায়ণ ঘাটের কাছে গিয়ে পৌঁছোতেই সেই বনাত ধরে থাকা স্ত্রীলোক দুটি চিৎকার করে উঠলো দুর্বোধ্য ভাষায়। অমনি কোথা থেকে দু'জন ভীমকায় প্রহরী এসে গঙ্গানারায়ণের হাত চেপে ধরে কর্কশ স্বরে বললো, বেওকুফ, বেহুদা কাঁহিকা—

গঙ্গানারায়ণ নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সেই যমদূত সদৃশ প্রহরীদের সঙ্গে শারীরিক শক্তিতে সে পারবে কেন ? তারা তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল খানিক দূরে। গঙ্গানারায়ণ প্রবলভাবে ছটফটিয়ে বিন্দু বিন্দু বলে চিৎকার করলে তারা তার ঘাড়ে ও উদরে দুটি কোঁৎকা কষালো সজোরে, তাতে তার যেন দম বন্ধ হয়ে এলো।

গঙ্গানারায়ণ দেখলো, পথের ওপরে নামানো রয়েছে একটি তাঞ্জাম, সেখানে আরও সাত আটটি প্রহরী মাটিতে উবু হয়ে বসে আছে। গোলমাল শুনে তারা কয়েকজন কাছে এগিয়ে এলো, তাদের হাতে বর্শা।

অনেকদিন চুল কাটেনি, দাড়ি মুণ্ডিত করেনি, তাই গঙ্গানারায়ণকে তারা পথের বেওয়ারিশ উন্মাদ বলেই ধরে নিল। নইলে হয়তো সেখানেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হতো। প্রহরীরা তাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ দিয়ে ও মারতে মারতে টেনে হিঁচড়ে খানিক দূর নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল কাঁটা ঝোপ ভরা মাঠের মধ্যে।

গঙ্গানারায়ণ সংজ্ঞা হারায়নি। শারীরিক ব্যথা বেদনার চেয়েও অসম্ভব এক বিস্ময়বোধ তাকে বিমূঢ় করে দিল। তার চিনতে কিছুতেই ভুল হয়নি। কিন্তু বিন্দুর সঙ্গে এত সব প্রহরী কেন ? বিন্দু কি তার ডাক শুনতে পায়নি ? অথবা সত্যিই কি তার এতখানি দৃষ্টিবিভ্রম হলো ? ঐ রমণী বিন্দু ছাড়া আর কে !

একটু পরেই হুম হাম শব্দে সে আবার সচকিত হলো। তাঞ্জামটি চলতে শুরু করেছে। গঙ্গানারায়ণও টলতে টলতে উঠে এলো পথের ওপর। তাঞ্জামের দু'পাশে পর্দা ফেলা, ভিতরের আরোহিণীকে দেখা যায় না। দু'জন মশালধারী ছুটছে তাঞ্জামের সঙ্গে সঙ্গে।

মরীয়া হয়ে ছুটে এসে গঙ্গানারায়ণ তাঞ্জামের পর্দা সরিয়ে ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে অসম্ভব আর্তকণ্ঠে বললো, বিন্দু ! আমি গঙ্গা, চিনতে পারিস না ? তুই কোথায় চলেছিস ?

কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তার মধ্যেই একজন মশালধারী ধাক্কা মেরে ফেলে দিল তাকে। এবং পরপর কয়েকজন প্রহরী মাড়িয়ে চলে গেল তার দেহ। ভলকে ভলকে রক্ত বেরুতে লাগলো তার মুখ দিয়ে। তাঞ্জামটি মিলিয়ে গেল পথের বাঁকে।

সেই অবস্থায় সেখানেই বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে রইলো গঙ্গানারায়ণ। তার মস্তিষ্ক তখনো একেবারে স্বচ্ছ। প্রহরীরা নেহাৎ অবজ্ঞাবশেই তাকে হত্যা করেনি। কয়েকজন পদদলিত করে গেছে তাকে, মনে হয় যেন তার হাড়-পাঁজরাগুলি আর অটুট নেই। তখুনি উঠে দাঁড়াতে পারলো না গঙ্গানারায়ণ, তবু সেই অবস্থায় থেকেও তার মনে হলো, তার ভুল হয়নি। সে বিন্দুবাসিনীকেই দেখেছে। চক্ষু মুদে সে শুধু দেখতে লাগলো তাঞ্জামের মধ্যে দেখা কয়েক মুহূর্তের সেই দৃশ্যটি।

রাজরাজেন্দ্রাণীর ভঙ্গিতে বসে ছিল বিন্দুবাসিনী। তার সর্বাঙ্গে কত রকমের বহুমূল্য অলঙ্কার। তার

রূপ যেন আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়েছিল বিন্দুবাসিনী, মুখের একটি রেখা কাঁপেনি, চোখের পলক পড়েনি। সকালে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর যেমন দৃষ্টি দেখেছিল গঙ্গানারায়ণ, বিন্দুবাসিনীর দৃষ্টিও যেন ঠিক সেই রকম। কোনো আর্ত রবেই ভ্রূক্ষেপ হয় না। ঠিক যেন প্রাচীন পাথরের মূর্তির জীবন্ত চক্ষু, কী কঠিন, কী অস্বাভাবিক!

প্রহরীদের প্রহারের জন্য নয়, বিন্দুবাসিনীর সেই দৃষ্টির জন্যই গঙ্গানারায়ণের ভয় করতে লাগলো। এ কোন্ বিন্দুকে দেখলো সে?

ছড়িদার মনসারাম পরিত্যক্ত ফুল বেলপাতা তৈজসপত্র ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করে সবেমাত্র বাড়ি ফেরার উপক্রম করছে, এমন সময় সেখানে ধূলি ধূসরিত, রক্তাক্ত, ছিন্ন-বসন গঙ্গানারায়ণ এসে উপস্থিত হলো তার সামনে। মনসারামের কাঁধ খামচে ধরে সে হিংস্র কণ্ঠে বললো, তুমি কেন আমায় মিথ্যে কথা বলেছিলে?

মনসারাম সচকিতে এদিকে ওদিকে তাকালো তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, বাবুজী, আমার ডেরায় চলুন।

গঙ্গানারায়ণ আবার চিৎকার করে বললো, না আগে বলো, কেন মিথ্যে কথা বলে আমায় ধোঁকা দিয়েছিলে?

মনসারাম হাত জোড় করে কাতর গলায় বললো, বাবুজী, আমি সব বলবো। তবে এখানে বলা যাবে না, হাওয়া বহুৎ খারাপ, আপনি আমার ডেরায় চলুন আগে।

মনসারাম প্রায় টানতে টানতে গঙ্গানারায়ণকে নিয়ে চললো। কাছেই তার বাড়ি। বারাণসীর বড় বড় পাথরের বাড়ির একতলায় সাধারণত মানুষ থাকে না, সেইরকমই একতলার দুটি ঘরে মনসারামের সংসার। তার দুই পত্নী ও তিনটি সন্তান। নিছক ফুল-বাতাসা বিক্রয় করে ও পুণ্যার্থীদের চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সে তার সংসারের অনটন ঘোচাতে পারেনি। মাঝে মাঝে দালালি করে কিছু উপরি জুটে যায়।

অতিশয় যত্নে সে গঙ্গানারায়ণের ক্ষতস্থান মুছে দিল। একটা নতুন কোড়া ধুতি এনে বললো, বাবুজী, আপনার পোষাক ছেড়ে এটা পরে নিন।

ঘরে জ্বলছে রেড়ির তেলের সেজবাতি। তার দুই পত্নী দ্বারের কাছে এসে কৌতূহলী হয়ে দেখছে আগন্তুককে। মনসারাম তাদের তাড়া দিয়ে বললো, এই যা, যা, উধার যা! বাবুজীর জন্য পানি লিয়ে আয়। আর এক বর্তন দহি আর নিমক আন—

তারপর সে কোমলকণ্ঠে বললো, বাবুজী, একটু দহি খেয়ে নিন, শরীর ঠাণ্ডা হবে। আজ শুয়ে যান আমার এই গরীবখানায়।

গঙ্গানারায়ণের কোটরগত চক্ষু দুটি জ্বলছে। সে যেন মনসারামকে দগ্ধ করে ফেলতে চায়।

মনসারাম ধীর স্বরে বললো, বাবুজী, আমি গরিবলোক, সিংহ কিংবা শেরের সঙ্গে কি আমি বিবাদ করতে পারি! দেবী সিং-এর নামে এ তল্লাটে সবাই ডরে কাঁপে। তার যেমন ধনদৌলত, তেমন লাঠির জোর। তার সঙ্গে টক্কর দেওয়া, আমি তো দূরের কথা, আপনারও সাধ্য নয়। সেইজন্যই বলেছিলাম, আপনি মুলুকে ফিরে যান।

গঙ্গানারায়ণ বললো, তুমি কেন বলেছিলে যে মেয়েটি মরে গেছে? আমি আজ নিজে তাকে দেখলাম।

—ঠিকই তো বলেছিলাম, বাবুজী। হিন্দু ঘরের মেয়েকে যদি পরপুরুষে একবার নিয়ে যায়, তাহলে তাকে তো মরাই বলে। যমের হাত থেকে যেমন কারুকে ছিনিয়ে আনা যায় না, তেমনি হিন্দু রমণীকেও পরপুরুষের ঘর থেকে ফিরিয়ে আনা যায় না।

—উঃ, কী পাষণ্ড তোমরা! সে বেঁচে আছে জেনেও তার মৃত্যুর খবর রটিয়ে দিলে? তার বাড়িতেও সেই খবর পাঠিয়েছো, ঐ লালাজীও তোমার মতন চশমখোর!

—আরে সীয়া রাম, সীয়া রাম! লালাজী বড় ধরম প্রাণ মানুষ। কখনো অন্যায় করেন না। উনিই আপনাদের বাঁচাবার জন্য ঐ খবর ইচ্ছে করে রটিয়েছেন। নইলে, ভালো করে ভেবে দেখুন, আপনারা জাতে পতিত হয়ে যেতেন না? যে-বংশের মেয়েকে, তাও কিনা বিধবা, ভিন জাতের লোক লুঠ করে নিয়ে যায়, সে বংশই পতিত হয়ে যায় না? বিদ্ধুবাবু ব্রামভন, তাঁর বংশে কলঙ্ক লেগে যেত না এই

কথা জানাজানি হলে ? আমি জানি, বাবুজী, বঙ্গালদেশে মগ্-সংসর্গে কত ব্রাম্ভন বংশ পতিত হয়ে গেছে।

—কী হয়েছিল আমায় খুলে বলো।

—নতুন তো কিছু না। এখানে এমন হামেশা হয়। খাপসুরত জেনানা দেখলেই তার পেছনে লোক লেগে যায়। প্রথমে লোভ দেখিয়ে ভোলাতে চায়। সোজা পথে কাম হলে তো ভালোই, নইলে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। দিনের বেলা, সকলের সামনে দুশমনরা এসে তুলে নিয়ে যায় সুন্দর মেয়েদের। আপনাদের ঐ মেয়েটিকে যেদিন নিয়ে যায়, সেদিন আমি নিজে ঘাটে ছিলাম। সবাই হায় হায় করলো, ব্যস, আর কি, দশ পনেরো জন দুশমনকে কে আটকাবে ?

—এ দেশে কি কোতোয়ালী নেই ? পুলিশ নেই ? আমি কালই পুলিশ নিয়ে গিয়ে ওকে উদ্ধার করে আনবো।

—বাবুজী, এখন রাবণের রাজত্ব, রামজীর দেখা নেই। আপনাদের কলকাতার মতন এখানে কথায় কথায় পুলিশ দৌড়য় না। পুলিশের সাধ্য কি, দেবী সিং-এর মহাল থেকে কোনো আওরৎকে বার করে আনে! আপনি কি ভাবছেন দেবী সিং নিজে ধরে নিয়ে গেছে! না, না, সে এমন নেংরা কাজে নিজে হাত লাগায় না। এখানে মেয়ে বিক্রির ব্যবসার ধুম চলছে। আপনারা বাঙালীরা বিধবাদের এই কাশীধামে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন, ব্যস। তার মধ্যে কতজন যে রেণ্ডি পাড়ায় যায় আর কতজন বিক্রি হয়ে চালান হয়ে যায় তার খবর কে রাখে। সুরাট বন্দর দিয়ে আরব দেশেও কত লেড়কি চালান যায়।

—বিন্দুকে গুণ্ডারা বিক্রি করেছে ?

—বিলকুল ঠিক ধরেছেন।

—তা বলে আমরা মেনে নেবো ?

—তাছাড়া আর কী করবেন ?

—আমি নিজের চোখে তাঁকে দেখেছি···দেবী সিং যদি তাকে আটকে রেখে থাকে, আমরা সেখান থেকে উদ্ধার করবোই। দেশ এখন অরাজক নয়, কোম্পানির আমলে আইন আছে, আইনের জোরে দেবী সিং-এর মতন গুণ্ডাদের শাস্তি দেওয়া যায়।

—বাবুজী, আজ রাতটায় ভালো করে নিদ যান, কাল মাথা ঠাণ্ডা হবে, তখন সব বুঝবেন। লেখনী পুস্তিকা ভার্যা পর হস্তং গতা গতাঃ—কলম কেতাব আর কামিনী একবার পরের হাতে গেলে আর ফিরে আসে না। সেইজন্যই তো বলছিলাম, মনে করে নিন, ও জেনানা পরলোকে চলে গেছে। ওকে ফিরিয়ে এনে আপনি কী করবেন ?

—কী করবো মানে ? কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।

—আপনার মাথা গরম হয়ে গেছে, তাই বুঝছেন না। লুঠ করার পর ক'টা জানোয়ার ঐ মাঈজীর ধরম নাশ করেছে কে জানে। তারপর পড়েছে দেবী সিং-এর খপ্পরে, শুনেছি, তার মহালে এমন বিশ ত্রিশটা জেনানা আছে। আপনি যদি ঐ মাঈজীকে বার করে আনতেও পারেন, তারপর কে তাকে স্থান দেবে ? ওনার পিতাজী দেবেন ? আপনি দেবেন ? আপনি চাইলেও সমাজ দেবে না। কোনো উপায় নেই। ঐসব জেনানাদের শেষ পর্যন্ত স্থান হয় রেণ্ডি পাড়ায়। আপনি ওর কথা ভুলে যান। কেন শুধু শুধু এক ধরম ভ্রষ্টা, জাতি ভ্রষ্টা আওরতের জন্য নিজের বিপদ ডেকে আনবেন।

গঙ্গানারায়ণের মনে পড়লো ইব্রাহিমপুর পরগনায় মুসলমান চাষীটির বিবিকে নীলকর সাহেবরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তার সম্পর্কেও তার খাজাঞ্চি সেন মশাই ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। এরা একই কথা বলে। অন্য পুরুষ একবার ছুঁলে সেইসব মেয়েদের আর ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করাও অর্থহীন। তাদের আর কেউ ঘরে স্থান দেবে না।

গঙ্গানারায়ণের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগলো। বিন্দু তাকে কোনোদিন তার শরীর স্পর্শ করার অধিকার দেয়নি। সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ তার মন, ধর্মনীতি, শাস্ত্রনীতির ওপর অভিমান করে সে ভয়ঙ্কর কঠোর ব্রতচারিণী হয়েছিল, সেই বিন্দুকে কয়েকটা নরপশু মিলে।··· গঙ্গানারায়ণ আর ভাবতেও পারে না। বিন্দু কেন একটা কথাও বললো না তার সঙ্গে। কেন অমন হিমশীতল, নিস্পন্দ চোখে চেয়েছিল ?

মনসারাম বললো, লুঠ করা লেড়কিদের ফিরিয়ে এনে আরও বেশী ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয় বলে আংরেজ পুলিশও আর এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। কোথায় রাখবে সেই লেড়কিদের ? একবার

বে-ইজ্জত হলে হিন্দু ঘরের জেনানার মরণই ভালো।

কথা বলতে বলতে সে দেখলো, গঙ্গানারায়ণ অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ছে। মেঝেতে মাথা ঠুকে যাবার আগেই সে ধরে ফেললো, তারপর শুইয়ে দিল যত্ন করে। মনসারাম অনেক কিছু দেখেছে, জীবন কত কঠোর, কত বিচিত্র, সে জানে। কিন্তু এই ছোকরাবাবুটি বড় ঘরের ছেলে. মন নরম, হয়তো জীবনে এই প্রথম আঘাত পেল, তাই সহ্য করতে পারছে না।

এরপর কয়েকদিন গঙ্গানারায়ণ থেকে গেল মনসারামের বাড়িতে। মনসারামের দুই স্ত্রী পালা করে সেবা শুশ্রূষায় সুস্থ করে তুললো তাকে। মনসারামের স্ত্রী দুজন এক হিসেবে বড় অদ্ভুত। এরা পাশাপাশি দুটি ঘরে থাকে, এখন গঙ্গানারায়ণ একটা ঘর জুড়ে থাকায় ওরা দু'জনেই একঘরেই এক সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু ওদের কক্ষনো ঝগড়া বিবাদ করতে শোনা যায় না। পরস্পরের মধ্যে খুব ভাব, যেন দুই ভগিনী কিংবা দুই সখী।

একদিন ওদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিল গঙ্গানারায়ণ। মনসারাম বারবার বলে দিল, গঙ্গানারায়ণ যেন কাশী ছেড়ে চলে যায়। এখানে থাকা তার পক্ষে বিপজ্জনক। দেবীসিং-এর অনুচররা চতুর্দিকে ঘোরাঘুরি করে, তারা যদি জানতে পারে যে, এই ছোকরাটি দেবী সিং-এর কেনা আওরতের দিকে নজর দিয়েছে, তাহলে তারা সেদিনই গঙ্গানারায়ণকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে।

গঙ্গানারায়ণ মনসারামের কথায় মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। কিন্তু বারাণসী ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে তার একটুও নেই। সে সাধুদের এক আখড়ায় গিয়ে আশ্রয় নিল, মিশে রইলো চ্যালাদের মধ্যে। খঞ্জনী বাজিয়ে যখন গান হয়, সেও গান ধরে, অন্যরা তার দিকে গঞ্জিকার কল্কে এগিয়ে দিলে সেও দু-এক টান মারে। আর প্রায়ই সন্ধের দিকে একটা ছোট নৌকো ভাড়া নিয়ে সে রামনগরে যাতায়াত করে।

তারপর এলো বৈশাখী পূর্ণিমার রাত। এ রাতে গঙ্গাতীরবর্তী বারাণসী আর তীর্থক্ষেত্র থাকে না, হয়ে ওঠে একটি প্রমোদ নগরী। এ শহরে মন্দির, সাধুদের আখড়া যত আছে, সে তুলনায় সঙ্গীত, নৃত্যের মজলিসও কিছু কম নেই। এই রাতে রেণ্ডিপাড়া খালি করে তারা সবাই চলে আসে গঙ্গার ধারে। লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ থেকেও বাঈজীরা আসে এখানে।

কথায় বলে, যদি ভোর দেখতে চাও তো যাও বারাণসীতে, সন্ধ্যা দেখতে চাও তো যাও লক্ষ্ণৌতে, আর যদি রাতের সুস্নিগ্ধ বাতাস উপভোগ করতে চাও তো চলে যাও মালবে। কিন্তু বৈশাখী আর কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় বারাণসী লক্ষ্ণৌকেও টেক্কা দেয়। গঙ্গাবক্ষে ভাসে শত শত বজরা, দূর থেকে মনে হয় যেন শত রাজহংসী, আলোকমালায় সজ্জিত। বজরার ছাদ থেকে ভেসে আসে সারেঙ্গি, তবলা বাদ্যের ধ্বনি আর নূপুরের নিক্কণ অথবা ঠুংরির সুমিষ্ট সুর। এই উপলক্ষে বড় বড় রইস ব্যক্তিদের মধ্যে চলে প্রতিযোগিতা। বিশাল বিশাল পাত্রে গোলা হয় সিদ্ধি, সুরার বোতলও কম থাকে না, যার যেমন রুচি।

উৎসব শুরু হয় সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই, উদ্দেশ্য থাকে একইভাবে নিশিভোর করে দেবার। কিন্তু বেশীর ভাগ বজরাতেই দেখা যায়, মধ্যরাত্রির পর নর্তকী নেচে চলেছে, বাঈজী গেয়ে চলেছে কিন্তু দর্শক বা শ্রোতারা নিঃশব্দ। বাবু তাঁর ইয়ারবক্সী নিয়ে সংজ্ঞাহীন। দাঁড়ি, মাঝি, প্রহরীরাও সিদ্ধির নেশায় বিভোর হয়ে পড়ে।

দেবী সিং-এর বজরা চারখানি একসঙ্গে বাঁধা। সন্ধে থেকেই দাপটে ফূর্তি শুরু করে দেবী সিং চালালো অনেকক্ষণ। পঞ্চাশোর্ধ বয়েস দেবী সিং-এর, টকটকে ফর্সা রং, গোলমরিচের রঙের মস্তবড় গোঁফ, মুখখানি ঠিক যেন বাঘের মতন। এখনো সে নর্তকীদের সঙ্গে নিজে উঠে নাচতে পারে, তবে নেশার ঝোঁকে যখন তার চোখ দুটি ঘোলাটে হয়ে আসে, তখন তার পরিহিত বস্ত্রও খসে পড়ে।

শেষ রাতের দিকে যখন সব নিঃসাড় হয়ে এলো, তখন একটি ছোট ডিঙ্গি এসে লাগলো দেবী সিং-এর একটি বজরার গায়ে। সেই ডিঙ্গি থেকে গঙ্গানারায়ণ সঠিক গবাক্ষটিতে উঁকি দিল।

ধবল জ্যোৎস্নায় কামরার ভিতরটি দেখতে অসুবিধে হয় না। শয্যায় পাশ ফিরে, পা দুটি গুটিয়ে ঘুমিয়ে আছে বিন্দুবাসিনী। জড়ির চুমকি বসানো রক্তবর্ণের রেশমী শাড়ি পরে আছে সে, গলায় একটি গোড়ের মালা, সুগন্ধে ঘরটি আমোদিত।

গঙ্গানারায়ণ ফিসফিস করে দু-বার ডাকলো, বিন্দু, বিন্দু!

বিন্দুবাসিনী চোখ মেলে তাকালো। সিদ্ধির নেশায় তার চোখ দুটি টকটকে লাল। সে চমকে উঠলো না। মাথাটি সামান্য তুলে, একটুখানি বাঁকিয়ে কৌতূহলী ভাবে চেয়ে রইলো। গঙ্গানারায়ণের মাথায় সন্ন্যাসীদের মতন বড় বড় চুল, মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, তাকে সহজে চিনতে পারার কথা নয়।

বিন্দুবাসিনী শাড়ি-গয়নার শব্দ করে উঠে বসলো। তারপর হাত দুটি সামনের দিকে বাড়িয়ে খুব নরম গলায় বললো, কে, গঙ্গা? আয়—

যেন মাঝখানে বহু উত্তাল সময় বয়ে যায়নি, যেন নিয়তি তাদের নিয়ে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের খেলা খেলেনি, যেন কিছুই হয়নি, ঠিক যেন আগের দিনই দেখা হয়েছিল, এমনভাবে ডাকলো বিন্দু। রামনগরের ঘাটে বিন্দুর ভাবলেশহীন মুখ দেখে গঙ্গানারায়ণ যতখানি অবাক হয়েছিল, আজ রাতে তার অতি-স্বাভাবিক ব্যবহার দেখেও গঙ্গানারায়ণ প্রথমে হতচকিত হয়ে গেল।

বিন্দু আবার বললো, আয়, গঙ্গা ভেতরে আয়!

গঙ্গানারায়ণ এক লম্ফে কামরার মধ্যে প্রবেশ করে ছুটে গিয়ে বিন্দুবাসিনীকে আলিঙ্গন করলো।

তারপর যেন কত যুগ যুগান্ত কেটে গেল। কেউ আর একটিও কথা বললো না। শুধু বাইরে জলের ছলছল মধুর শব্দ। দুটি তপ্ত প্রাণ অনেকদিন পর এক সঙ্গে জুড়োচ্ছে। গঙ্গানারায়ণের পিঠে বিন্দুবাসিনীর দুই হাত, শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে সে, যেন আর কিছুতেই ছাড়বে না।

গঙ্গানারায়ণই এক সময় ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। ব্যস্ত হয়ে বললো, আর একটুও দেরি নয়, আমি নৌকো এনিচি, তুই এক্ষুনি চল আমার সঙ্গে!

বিন্দু সারা মুখে চন্দ্রকিরণের মতন হাসি ফুটিয়ে বললো, কোতায়!

—চল, আমরা চলে যাবো, অনেক দূরে, বহু দূরে, যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না—

বিন্দু আদুরে গলায় জিজ্ঞেস করলো, আগে বল, সেই জায়গা কোতায়?

গঙ্গানারায়ণ বললো, সে জায়গা আমরা খুঁজে নেবো, যেখানে আর কেউ নেই, কোনো বনের মধ্যে নদীর ধারে, একটা কুঁড়েঘর বেঁধে, শুধু তুই আর আমি।

বিন্দুবাসিনী হঠাৎ যেন খুব উৎসাহিত হয়ে বললো, সে রকম জায়গা আচে? চল, এক্ষুনি চলে যাই।

—চল, আমার হাত ধর।

—ওমা, আমার গয়নার বাক্স যে আনিনি!

—কী?

—গয়নার বাক্স আমার···একবার রামনগর ঘুরে যেতে হবে।

—গয়নার বাক্স দিয়ে কী হবে? ওসবের কিচ্ছু দরকার নেই।

—সে কি, আমার অত গয়না, সেগুলো ফেলে যাওয়া যায় নাকি।

গঙ্গানারায়ণ আহতভাবে বললো, বিন্দু, তুই গয়নার কথা ভাবচিস? গয়না দিয়ে আমাদের কী হবে?

বিন্দুবাসিনী যে নেশার ঝোঁকে কথা বলছে, তা বুঝতে পারলো না গঙ্গানারায়ণ। বিন্দুবাসিনী তার ঢুলঢুলে চক্ষু দুটি গঙ্গানারায়ণের মুখের দিকে স্থাপন করে ফিক করে হেসে বললো, তুই সত্যি গঙ্গা? আমার সেই ছেলেবেলার খেলুড়ি? যাঃ, আমি স্বপ্ন দেখচি! আমার স্বপ্ন দেখতে ভাল্লাগে না! একদম ভাল্লাগে না!

গঙ্গানারায়ণ ব্যাকুল হয়ে বললো, বিন্দু আর একটুও দেরি করার সময় নেই। এক্ষুনি যদি কেউ জেগে ওঠে···

বিন্দুবাসিনী সঙ্গে সঙ্গে বললো, ওমা, তাই তো! তুই এলি কী করে? দেবী সিং-এর লোকরা যে তোকে দেখলে একেবারে কেটে ফেলবে! তুই শিগগির চলে যা—

—তুই আমার সঙ্গে যাবি না?

—আমি? আমি কোতায় যাবো?

—বিন্দু দেরি করিসনি, এই পাপের জায়গায় আর এক মুহূর্ত থাকা নয়, আয় আমার সঙ্গে।

—কিন্তু আমার ছেলে?

—ছেলে!

দু'জনে দু'জনের দিকে নির্বাকভাবে চেয়ে রইলো। কেউ যেন একটা মুগুড় দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত

করেছে গঙ্গানারায়ণের মাথায়। বিন্দু আগে বললো গয়নার বাক্সের কথা, তারপর···তারপর··· ।

বিন্দুবাসিনী এবার গঙ্গানারায়ণের বুকে মাথা রেখে হু হু করে কেঁদে ফেললো। বিমূঢ় হয়ে বসে রইলো গঙ্গানারায়ণ। এ কী শুনলো সে বিন্দুবাসিনীর মুখে ?

আবার মুখ তুলে বিন্দুবাসিনী একটু সামলে নিল নিজেকে। আঁচলে চোখ মুছে সে শান্ত গলায় বললো, তুই জিজ্ঞেস করলি না, আমি কেন এতদিনে মরিনি ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আগে এখেন থেকে চলে যাই, তারপর সব কথা শুনবো।

—তুই আমার ছেলেকে এনে দিতে পারবি ?

—তুই কি বলচিস, আমি বুঝতে পাচ্চি না, বিন্দু !

—ইস, আমায় বড্ড বেশী খাইয়ে দিয়েচে, আমি তোকে ভালো করে দেকতে পাচ্চি না। ইস্, এ কী চেহারা হয়েচে তোর, এত রোগা হয়ে গেচিস !

—বিন্দু, তুই আমার সঙ্গে যাবি না ? আর দেরি করলে দুজনেই বিপদে পড়বো।

—শোন, মরা তো সহজ, আমি কি মরতে পারতুম না ? ওরা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল, মা মা বলে কত চ্যাঁচালুম, কেউ বাঁচাতে এল না···তার আগে কখনো পাপ করিনি, তবু দেবতারাও বাঁচালো না আমায়, দেবী সিং-এর বাড়িতে হাত পা বেঁধে রেকেচিল, খাবার খেতে চাইনি, জোর করে মুখে দুধ ঢেলে দিয়েচে···আমার ওপর কত অত্যেচার করেচে, তবু ঠাকুরকে ডেকেচি, ঠাকুর আমায় মরণ দাও ! আমার ডাক শুনে ঠাকুর কী দিল জানিস ? আমার পেটে বাচ্চা এলো। পেটে বাচ্চা নিয়ে কি কেউ মরতে পারে বল, তুই বল ?

আবার ফিক করে হেসে ফেলে বিন্দুবাসিনী বললো, তুই আমায় চিনলি কি করে, গঙ্গা ? বিধবা ছিলুম, এখন দ্যাখ আমার কেমন ঝলমলে রঙীন শাড়ি, গায়ে গয়না, দাসীরা দুধের সর হলুদ বাটা দিয়ে আমার গা মেজে দেয়।

গঙ্গানারায়ণ নিরসভাবে জিজ্ঞেস করলো, তোর ছেলে হয়েচিল ?

বিন্দুবাসিনী বললো, হ্যাঁ রে, ফুটফুটে ছেলে, ঠিক যেন রাজপুত্তুর !··· ঠাকুরের কী খেলা ভেবে দ্যাখ, বিধবার পেটে ছেলে ! চাইলুম মরণ, দিল ছেলে ! তরপর আবার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে গেল !

—কে ?

—ওরা ! তিন মাসের বাচ্চা, তাকে কেড়ে নিয়ে গেল, আমার কোল থেকে। কোতায় রেখেচে জানি না ! ওদের কাচে ভিক্ষে চাই, ওগো, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও ! সেইজন্যই তো ওদের সব কথা শুনি, ওরা নাচতে বললে নাচি, হ্যাঁ রে, আমি নাচতে শিখিচি, ওরা সিদ্ধি খেতে বললে সিদ্ধি খাই, যদি ছেলেকে ফিরিয়ে দেয় ! আগে তো কখনো ভাবিনি যে আমি মা হবো। ওরে, মা হওয়া যে কী কষ্টের, কী সুখের !

গঙ্গানারায়ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। জীবনে কোনো একটা ব্যাপারেও সার্থক হওয়া তার নিয়তিতে নেই। এত সাবধানতার সঙ্গে, এত পরিকল্পনা করে সে এসেছে বিন্দুবাসিনীর কাছে, তারপর যে এমন ঘটবে, তা সে দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি।

—তুই ফিরে যা গঙ্গা।

—তুই যাবি না ?

—না রে, আমি কি যেতে পারি ? আমি নষ্ট। আমার শরীর অপবিত্র। তুই যে বিন্দুবাসিনীকে চিনতিস, সে তো আমি নয় ! আমি তো একটা কাশীর রেণ্ডি।

—ছিঃ, বিন্দু ! তুই এখনো যদি আমার সঙ্গে যেতে চাস, আমরা দুজনে কোনো দূর দেশে চলে যেতে পারি।

—আমি বিচ্ছিরি, পোকায় খাওয়া, আমায় নিয়ে তুই কী করবি, গঙ্গা ! উঃ, বড্ড মাথার যন্ত্রণা, একটু মাথা টিপে দিবি !

—আয়।

—না, না, আমি কী পাগলের মতন কথা বলচি। আমি কি তেমন ভাগ্য করে জন্মিচি ? তুই চলে যা, ওরা এখুনি এসে পড়বে !

—আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে চাই, বিন্দু।

—ওরে, সে আর আমার ভাগ্যে নেই। তুই যা, আমার মাথার দিব্যি, তুই চলে যা, চলে যা, চলে যা।

বিন্দুবাসিনী এমন এক স্বরে চলে যাওয়ার কথা বলতে লাগলো যে গঙ্গানারায়ণ আর স্থির থাকতে পারলো না। সে চলে যাওয়াই ঠিক করলো। বিন্দু যাবে না, সে বুঝতে পেরেছে। ছেলেকে ছেড়ে কোন্ মা যায়? হোক না পাপের সন্তান তবু তো নিজের গর্ভের ফল।

কোনো রকম বিদায় না নিয়ে গঙ্গানারায়ণ আবার গবাক্ষ দিয়ে বেরিয়ে এসে ডিঙ্গি নৌকোয় উঠলো। অন্য মাঝি আনেনি, সে নিজেই দাঁড় বাইবে। এত বড় একটা দুঃসাহসী কাজ সে জীবনে কখনো করেনি, তবু সব বৃথা গেল। দাঁড়টা তুলে নিয়ে সে দেখলো বিন্দু গবাক্ষ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ব্যাকুল ভাবে চেয়ে আছে। পরিপূর্ণ আলোয় এবার গঙ্গানারায়ণ বুঝতে পারলো, বিন্দুর মুখখানি অস্বাভাবিক নেশাগ্রস্ত।

বিন্দু প্রায় কেঁদে উঠে বললো, তুই চলে যাচ্ছিস গঙ্গা? আমায় নিয়ে যাবি না?

গঙ্গানারায়ণ এক হাত বাড়িয়ে বললো, আয়।

বিন্দু সঙ্গে সঙ্গে নৌকোয় নেমে এলো!

গঙ্গানারায়ণ রুদ্ধশ্বাসে বললো, মাথা নীচু করে বসে পড়, কেউ যেন দেখতে না পায়।

বজরা থেকে খানিকটা দূরে নৌকোটা সরে আসার পর বিন্দুবাসিনী খানিকটা জল মাথায় চাপড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার চুল খোলা, জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে শীরের অলঙ্কার। দু'দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে সে যেন আপন মনে বললো, আঃ, বড় সুন্দর, বড় সুন্দর এই পৃথিবী।

গঙ্গানারায়ণ বললো, বিন্দু, বসে পড়, কেউ দেখতে পাবে!

বিন্দুবাসিনী সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে হঠাৎ নিজের গলা চেপে ধরে অসম্ভব তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠলো, ওহ্ হো হো হো, আমায় দিলে না, আমায় কেউ দিলে না—

হঠাৎ আবার পরিষ্কার কণ্ঠে বললো, নীচে মা গঙ্গা, মাথার ওপরে আকাশে রয়েচেন দেবতারা, সবাইকে বলে গেলুম, যদি পরজন্ম থাকে, তবে পরজন্মে যেন তোকে আমি পাই। এ জন্মে আমার সব নষ্ট হয়ে গেল রে! সব নষ্ট হয়ে গেল! আমায় কেউ কিচু দিলে না...।

গঙ্গানারায়ণকে প্রস্তুত হবার কোনো সুযোগ না দিয়ে বিন্দুবাসিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। ডিঙ্গি নৌকোটা প্রচণ্ডভাবে দুলে ওঠায় গঙ্গানারায়ণ একটুক্ষণের জন্য দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। তারপর সেও ঝাঁপ দিল।

জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে সব দিক। গঙ্গানদীকে সেই জ্যোৎস্নায় মনে হয় যেন এক প্রশস্ত পথ। সেই পথ চলে গেছে কোন্ নিরুদ্দেশের দিকে।

একটু পরেই শুরু হলো ঝড়। সব বজরাগুলো একসঙ্গে দুলে উঠলো। তারপর ঝড় ও বৃষ্টি মাখামাখি হয়ে মুছে দিল বিশ্ব চরাচর।

॥ প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় পর্ব

কালীপ্রসন্ন সিংহ স্মরণে
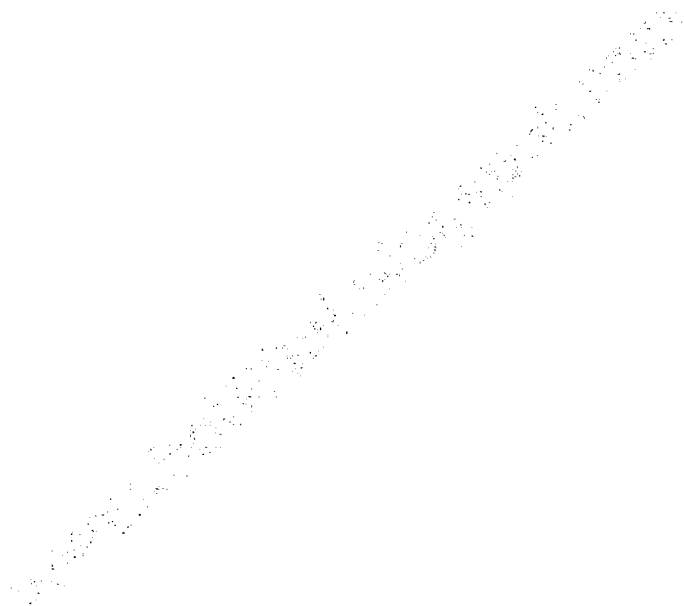
শীতের শেষ কিন্তু গ্রীষ্ম এখনো তেমনভাবে আসরে নামেনি। বাতাস মোলায়েম আর রোদ্দুর যেন রেশমী ওড়না। বাজারে এখনো তরিতরকারি টাটকা সতেজ। দিনের বেলা জাগরণের সময় সহসা ক্লান্তি আসে না, রাত্রির নিদ্রা সুখকর। সময়টি প্রকৃতই মধুর।

বাংলায় বসন্ত শুধু কবি-কল্পনায় আর মা-শীতলার দয়ার প্রকাশে। শীত যেতে না যেতেই গা-পোড়ানো গ্রীষ্ম হুড়মুড় করে এসে পড়ে। কিন্তু এ বৎসরটি যে নিতান্তই ব্যতিক্রম। শীত ও গ্রীষ্ম এই দুই ঋতু যেন কিছু ব্যবধান রেখে দুই ধারে দণ্ডায়মান আর মধ্যখানে এসে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বহুকালের অজ্ঞাতবাসের পর ঋতুরাজ বসন্ত। সুন্দর, সুস্নিগ্ধ, পিকরব মুখরিত, মন-উচাটন বসন্তকাল।

ছাতুবাবুর মাঠে সার সার তাঁবু পড়েছে। সকাল থেকে সেখানে শুধু কালো কালো মানুষের মাথা। আর মাঝে মাঝেই তার মধ্য থেকে চিৎকার উঠছে, ধ্যো মারা, ধ্যো মারা।

লাল বুলবুলি, শা বুলবুলি আর সেপাই বুলবুলি। লাল বুলবুলির সর্বাঙ্গই প্রায় কুচকুচে কালো, শুধু পেটের তলা আর লেজ লালবর্ণ। আর শা বুলবুলি শাবক অবস্থায় থাকে পুরো খয়েরি, ক্রমশ শরীরের নানা অংশের রঙ সাদা হতে থাকে, মাথায় ঝুঁটি, ডাগর চোখে চঞ্চলভাবে তাকায় আর গলা ফুলিয়ে ডাকে।

তবে আসল লড়াকু হল সেপাই বুলবুলি। এদের ডানা খয়েরি, কিন্তু মাথার দু পাশে লাল রঙের রেখা। ঝুঁটিটি কালো। যেন সেপাইদের মতন লাল-কালো উষ্ণীষ পরে আছে মাথায়।

এক একজন বড় মানুষের তাঁবুতে বিশাল বিশাল খাঁচায় রাখা আছে এই সব শিক্ষিত, যোদ্ধা পাখিদের। খালিফারা তাদের সর্বক্ষণ তোষামোদ করে চলেছে শিস দিয়ে। আজকের দিনটিতে বাবুদের চেয়ে বাবুদের বুলবুলিরাই নায়ক। সালিশী মশাই হাঁক দিলে এক একজন বাবু একজোড়া করে পক্ষী নিয়ে আসছেন লড়াইয়ের আঙিনায়। এই বুলবুলিগুলিকে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে উপবাসী রাখা হয়েছে, সালিশী মশাই মাঝখানে এক খাবলা কাবলি ছোলা ছড়িয়ে দেবার পর দু পক্ষের দু জোড়া বুলবুলি ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। এদের এমনই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে বিপক্ষীয় পক্ষীদের আগে হটিয়ে না দিয়ে দানায় মুখ দেয় না। পক্ষীতে পক্ষীতে ঝটাপটি বেঁধে যাবার পর দর্শকরা তুমুল হাততালি ও গালবাদ্য দিয়ে ওদের আরও উত্তেজিত করে তোলে। তারপর এক পক্ষের আহত বুলবুলি ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলেই দর্শকরা দুয়ো দেয়, ধ্যো মারা।

এই খেলার উদ্যোগের জন্য প্রতি বৎসর ব্যয়িত হয় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা। তবে যারা বহু বৎসর বুলবুলির লড়াইয়ের প্রত্যক্ষদর্শী, যারা আসল সোয়াকীন, তাদের মতে, এ বৎসর খেলার মধ্যে যেন তেমন ধার নেই। কোথায় সেই আড়ম্বর, সেই গীত বাদ্য, সেই পয়সার ঝনঝনি। বাবুদের যেন তেমন আর মুরোদ নেই। এই মাঠেই মল্লিকবাড়ির বাবু হরনাথের সঙ্গে লড়েছিলেন ছাতুবাবু স্বয়ং। পক্ষীর খেলা তো নয়, যেন এক ধুন্দুমার কাণ্ড। সে দৃশ্য এখনো অনেকের মনে আছে। রাজা সুখময় রায়ের পুত্রেরাও এ খেলায় ঢেলে দিতেন অঢেল টাকা। আর সে রকম উঁচু নজর ক'জনের আছে।

দু বৎসর আগেই যেন হয়ে গেছে শেষ জমজমাট বুলবুলাখ্য পক্ষিগণের যুদ্ধ। সেবার এসেছিলেন রাজা সুখময় রায়ের বংশেরই রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ তাঁর বিশাল পক্ষিবাহিনী নিয়ে। আগে থেকেই ডংকা বাজিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর বুলবুলিদের রুখতে পারে এমন বুলবুলিওয়ালা ভূ-ভারতে কেউ নেই। তাঁর বুলবুলিদের যদি সত্যিই কেউ হারাতে পারে তাহলে তিনি নিজের মাথার মুকুট খুলে রাখবেন প্রতিপক্ষের পায়ের কাছে। সে খেলা দেখতে ছুটে এসেছিল লাখে লাখে মানুষ, এমনকি সাহেব রাজপুরুষরাও আসর ঘেঁষে সার বেঁধে দণ্ডায়মান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অভূতপূর্ব অঘটন ঘটে গিয়েছিল সেবারেই। অতবড় মানী লোক রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ, তাঁকে কিনা টক্কর দিতে এলো কোথাকার এক দয়াল মিস্তির।

বেলা দশটা থেকে খেলা শুরু, প্রথম খেলাতেই রাজার পক্ষী ঘায়েল। তার পরের বারও। এবং

তার পরের বার। মোট পঞ্চাশ জোড়া পক্ষীর খেলার ফলাফল নিয়ে জয় পরাজয় হবার কথা, কিন্তু সাঁইতিরিশ বার খেলার মধ্যে সাতাশবারই হারলেন রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ। তাঁর প্রথম দিকের বিস্ময় ক্রমশ পরিণত হলো গভীর শোকে। তাঁর অনুচরেরা নিয়মিত খবর রেখেছে যে কলকাতায় কোন কোন বাড়িতে পক্ষীদের কেমন তালিম দেওয়া হয়। একবারও দয়াল মিত্তিরের নামও কেউ উচ্চারণ করেনি। খেলার শেষ পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারলেন না রাজেন্দ্রনারায়ণ, দারুণ বিমর্ষ মুখে কুরুক্ষেত্রের দুর্যোধনের মতন রণে ভঙ্গ দিলেন।

লোকে বলে, সেই বুলবুলির লড়াইতে হেরে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ মনের দুঃখে লালাবাবুর মতন বিবাগী হয়ে গেছেন।

এ বৎসরের রণাঙ্গনে সেই দয়াল মিত্তিরই জাঁকিয়ে বসে আছেন মাঝখানে, কিন্তু প্রতিপক্ষ বিশেষ কেউ নেই। কিছু কিছু নতুন উঠতি বাবু তাঁবু ফেলেছেন বটে, কেউ পাঁচ গণ্ডা, কেউ দশ গণ্ডা পক্ষীও এনেছেন। কিন্তু তাদের না আছে তেমন সহবৎ, না আছে রোশনাই ' এই সব ফতোবাবুদের নামই আগে শোনা যায়নি। সেইজন্য ঝানু দর্শকেরা নাসিকা কুঞ্চিত করে মন্তব্য করছে, এ যে দেকচি বাওয়া সড়ুঞ্চে পোয়াতীর বুড়ো বয়েসের ছেলে গো! ড্যানাক ড্যানাক ড্যাডাং ড্যাং চিংড়ি মাছের দুটো ঠ্যাঙ!

সাধারণ দর্শকদের থেকে খানিকটা দূরে আলাদা দাঁড়িয়ে আছে যুগলসেতুর সুবিখ্যাত সিংহ পরিবারের সন্তান নবীনকুমার। এখন পঞ্চদশ বর্ষীয় যুবা। সে পরিধান করে আছে হলুদ রঙের চায়না কোট ও সাদা পাণ্টুলুন, কালো ইংলিশ লেদারের জুতো কিন্তু মাথায় টুপি পরেনি। বুকপকেটে একটি স্বর্ণময় ঘড়ি, তার গার্ড চেইনও সোনার। বাঁ হাতের তর্জনীতে একটি বৃহদাকার হীরকসমন্বিত অঙ্গুরীয়। তার কোমল লাবণ্যমণ্ডিত মুখমণ্ডলে চক্ষু দুটি অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল।

নবীনকুমারের পাশে দণ্ডায়মান তার সর্বক্ষণের সঙ্গী দুলালচন্দ্র। এই দুলালচন্দ্রের চেহারায় হঠাৎ পরিবর্তন এসেছে। তার মনিবের চেয়ে সে কয়েক বৎসরের বড়, মাত্র গত বৎসরই সে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, তাকে মনে হয় পালোয়ানের মতন। চওড়া স্কন্ধ, চওড়া কব্জি, ঘাড় স্থূল। বড় বড় চুল রেখেছে সে। নবীনকুমারের এখনো কণ্ঠ ভাঙেনি, তার স্বর কোমল, সুরেলা, অনেকটা নারীদের মতন। সেই তুলনায় দুলালচন্দ্রের কণ্ঠস্বর বয়স্ক পুরুষদের মতন। সে মালকোঁচা মেরে ধুতি পরে এবং গায়ের একটি তুলোর বেনিয়ান। ইদানীং সে বিম্ববতীর নির্দেশে নবীনকুমারকে আপনি আজ্ঞে বলে কথা বলে।

নবীনকুমার দুলালচন্দেরর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, তুই আরও দেক্‌তে চাস?

দুলালচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বললো, আজ্ঞে, আপনি যা বলবেন।

নবীনকুমার বললো, তুই দেক্‌তে চাস তো দ্যাক্, আমি গাড়িতে গিয়ে বসি।

দুলালচন্দ্র বললো, আজ্ঞে না। আমিও যাবো।

বস্তুত দুলালচন্দ্র এই খেলা খুবই উপভোগ করছিল। বুলবুলির মতন নরম, সুশ্রী চেহারার পক্ষীও যে ঠোঁট দিয়ে একে অপরের উদর ফুটো করে দিতে পারে, সে আগে কখনো কল্পনাও করেনি। যুদ্ধে পরাজিত কোনো বুলবুলি যখন ওড়ার চেষ্টা করেও বার বার মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল, তখন অন্য দর্শকদের সঙ্গে সেও উত্তেজনায় গলা মিলিয়েছে।

নবীনকুমার আগাগোড়া নীরব ছিল। দুলালচন্দ্রের অত্যুৎসাহ তার নজর এড়ায়নি। ফেরার জন্য পা বাড়িয়ে সে বললো, তোর মতন পাঁচপেঁচী লোকদের এই বুলবুলির লড়াইয়ে মন চুলবুলোবে তাতে আশ্চর্যির কিচু নেই—

দুলালচন্দ্র জিজ্ঞেস করলো, আজ্ঞে, আপনার ভালো লাগেনি?

নবীনকুমার বললো, বড় বড় বংশের মানী মানী লোকেরা যে এমন ছেলেখেলায় মজে, সেটাই বড় তাজ্জবের কতা। পঞ্চগব্যের আসল গব্যটি এদের মাতায় পোরা নিশ্চয়। কোর্তা উল্টে দ্যাখ, এদের সবার পেছুনে একটা করে ন্যাজ আচে!

দুলালচন্দ্র সবটা বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলো।

গম্ভীর ভারিক্কী চালে অগ্রসর হতে হতে নবীনকুমার আবার বললো, দেশটা ধনী বংশের মর্কটে ছেয়ে গ্যাচে, আর সেই সুযোগে বুদ্ধিমান, শক্তিশালী ইংরেজ লুটেপুটে নিয়ে যাচ্চে সব। ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা। বুলবুলি লড়াইয়ের এত নামডাক শুনিচি, তা কিনা এই! এর চেয়ে মেয়েমানুষের পুতুল খেলাও ভালো।

ভিড় ছাড়িয়ে বাইরে এসে নবীনকুমারের মুখের ভাবের পরিবর্তন হলো। হাসি ফুটলো এই প্রথম। সে বললো, তবে একটা ব্যাপারে আমি খুশী হয়েচি। হাটখোলার কালীপ্রসাদ দত্তর সব ক'টা পাখির ঠ্যাং খোঁড়া হয়েচে, ওকে হারিয়ে একেবারে ভুষ্টিনাশ করে দিয়েচে। বেশ হয়েচে, খুব হয়েচে, ভালো হয়েচে।

দুলালচন্দ্র কালীপ্রসাদ দত্তকে চেনে না, সে বুঝতে পারলো না সেই বিশেষ ব্যক্তিটির হার হওয়ায় তার মনিব এত খুশী কেন।

নবীনকুমার আপন মনে একটুক্ষণ হাসলো, তারপর একদিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করে বললো, ওদিকে চ।

দুলালচন্দ্র বললো, আজ্ঞে, গাড়ি এদিকে।

নবীনকুমার এক ধমক দিয়ে বললো, জানি! ওদিকে চ!

ছাতুবাবুর মাঠে এই বুলবুলির লড়াই উপলক্ষে বেশ বড় একটা মেলা বসে যায়। পর পর মোয়া, মুড়কি, পাঁপড় আর তেলেভাজার দোকান। কিছুদিনের মধ্যেই গাজনের উৎসব আসছে, সেইজন্য রকমারি মাটির পুতুল, গামছা, হাঁড়িকুড়ির ব্যাপারীরা আসে কাছেই রামবাগান, সেখানকার অবিদ্যা-স্ত্রীলোকেরা খাতায় খাতায় আসে কেনাকাটি করতে।

আর আসে পক্ষী বিক্রেতারা। নানা জাতের গৃহপোষ্য, রঙ-বেরঙের ছোট বড় পাখি তো থাকেই, সবচেয়ে বেশী থাকে বুলবুলি। নতুন বাবুরা আগামী বৎসরের লড়াইয়ের জন্য এখান থেকেই বুলবুলি কিনে নিয়ে যায়। কোন কোন বিশিষ্ট খালিফার তালিম দেওয়া বুলবুলি, দোকানদাররা সেইসব নাম হাঁকাহাঁকি করছে।

একটি পাখির দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো নবীনকুমার। দুলালচন্দ্রকে বললো, কত দাম জিজ্ঞেস কর।

দুলালচন্দ্র বিস্মিত হলো। এইমাত্র তার মনিব নিন্দে করলো এই পাখির লড়াইয়ের, এবার সে নিজেই পাখি কিনবে নাকি? আগামী বছর এখানে তাঁবু খাটিয়ে খেলতে আসবে? তার খামখেয়ালী মনিবের মনের গতিবিধি বোঝা ভার।

একজোড়া বুলবুলির দাম চার টাকা।

তা শুনে দুলালচন্দ্রের চোখ প্রায় কপালে ওঠার অবস্থা। এ লোকগুলো বলে কী? এরা ঠ্যাঙাড়ে না গলা কাটা? সাত আট টাকায় একটি দুধেল গাই পাওয়া যায়, আর এই টুকুন টুকুন এক একটা পাখনার দাম দু'টাকা। তার কম বয়স্ক মনিবকে দেখেই এরা বুঝতে পেরেছে সে খুব বড় মানুষের সন্তান, তাই এরা দাঁও মারতে চাইছে।

দুলালচন্দ্র বললে, দিনে ডাকাতি পেইচিস ব্যাটারা?

তখন পাশাপাশি দোকানদাররা বলতে লাগলো, বাবু ছায়েব, জমির শেখ খালিফার নাম শোনেননি? খিদিরপুরের জমির শেখ! তেনার নিজের হাতের শিকুনো…বাবু ছায়েব, মিঞা হোসেন সা, তিনি আরও বড় খালিফা, এই দ্যাখেন।

নবীনকুমার বললো, দরদাম কর। আমি কিনবো!

অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করে দু'টাকা জোড়ায় নামানো গেল। এর থেকে আর কমানো যাবে না।

নবীনকুমার কোটের লম্বা পাশ পকেটে হাত ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এই সবচেয়ে বড় খাঁচাটায় কটা বুলবুলি আচে গুণে দেকতে বল্।

হিসেব করাই ছিল, আবার গণনা করা হলো। ছ্যাঁচা বাঁশের লম্বা খাঁচাটিতে রয়েছে পঞ্চাশ জোড়া সেপাই বুলবুলি।

নবীনকুমার ঝনঝন করে একশোটি টাকা ছুঁড়ে দিল দোকানীর সামনে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে খাঁচার দরজাটা সে নিজেই খুলে ফেললো।

কোনো বড় খালিফার কাছেই এসব পাখিরা তালিম পায়নি। যারা ধরে, তারাই কিছুদিন পরে সুতো বেঁধে রেখে একটু একটু পোষ মানায়। খাঁচার দরজা খোলা পেলেও এরা উড়ে যায় না সহসা।

নবীনকুমার তাদের ডাকতে লাগলো, আয়, আয়। একটা পাখিকে সে খপ করে ধরে ফেলে বাইরে আনলো। তারপর শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, যাঃ।

বুলবুলিটা ডানা ঝটপটিয়ে একটুক্ষণ ঘুরপাক খেল, বিস্মিত চোখে বুঝি একবার দেখে নিল মুক্তিদাতাকে, তারপর উড়ে চলে গেল।

দোকানদার আঁতকে উঠে বললো, আরে করেন কী, করেন কী ছায়েব ?

খাঁচার ওপর দু হাতের চাপড় মারতে মারতে নবীনকুমার বলতে লাগলো, আয় ! আয় ! বাইরে আয় সব।

ফুরুৎ ফারাৎ করে উড়ে বেরুতে লাগলো একটি দুটি বুলবুলি। নবীনকুমার নিজেও হাত ঢুকিয়ে একটা করে ধরে এনে ওপরের দিকে উড়িয়ে দিয়ে বলতে লাগলো, যাঃ। যেখেন ঠেঙে এসিচিস, সেখেনে যা। মাঠের ধান খা গিয়ে। হিমালয় পাহাড়ে উড়ে যা।

একশো বুলবুলি কয়েক মিনিটেই শেষ। নবীনকুমার পাশের খাঁচাটির কাছে সরে গিয়ে বললো, এটার মধ্যে কত আচে, হিসেব করো।

দেখতে দেখতে ভিড় ভেঙে লোকজন ধেয়ে এলো সেদিকে। মূল খেলা ছেড়েও দর্শকেরা চলে এলো নবীনকুমারকে দেখতে। দাবানলের মতন খবর রটে গেল যে সিংগীবাড়ির ছোটকুমার দু হাতে টাকা ওড়াচ্ছেন। টাকা ওড়ানো নয় তো কী ! এক একটা পাখি এক টাকা। অনেকে আবার সেই পাখিগুলিকে ধরার জন্য লম্ফঝম্ফ করতে লাগলো, কিন্তু একজনও একটাও ধরতে পারলো না।

তিনটি খাঁচা খালি করার পর নবীনকুমার একটু থামলো। কয়েকটি বুলবুলি কাছেই একটা বকুলগাছে বসে বিস্মিতভাবে ডাকাডাকি করছে। একঝাঁক চক্রাকারে ঘুরছে মাথার ওপর আকাশে। নবীনকুমার সেদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো, সে এখন সত্যিকারের আনন্দ উপভোগ করছে। সামান্য কয়েকটি টাকার বিনিময়ে যে এমন আনন্দ পাওয়া যায়, সে জানতো না।

তার কাছে আর টাকা নেই। সে হাতের হীরক অঙ্গুরীয়টি খুলে দুলালচন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, ইদিকে কোতায় স্যাকরার বাড়ি আচে দ্যাক। এটা বেচে যত টাকা পাস নিয়ায়।

দুলালচন্দ্র কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, ছোটবাবু, এবার উঠুন। আর দরকার নেই।

—তোকে যা বলচি কর।

—আজ্ঞে ও আংটি আমি বেচতে পারবো না, কত্তামা তা হলে আমায় রক্ষে রাখবেন না। ও আপনার বাবার আংটি।

—তবে যা, বাড়ি থেকে টাকা নিয়ায়।

—আর থাক না। এবার উঠুন বরং—।

নবীনকুমার ওর সঙ্গে আর কোনো বাক্যব্যয় না করে আর একটি খাঁচার দরজা খুলতে গেল। সে খাঁচার মালিক হা হা করে উঠতেই সে ধমক দিয়ে বললো, কাল সিংহ বাড়িতে গিয়ে ডবল দাম নিয়ে আসবি। আমার কতার দাম লাখ টাকা।

বুলবুলির লড়াইয়ের প্রাঙ্গণ একেবারে দর্শকশূন্য। সমস্ত মানুষ এখন এদিকে। নবীনকুমার এক একটি খাঁচা খুলছে আর তুমুল আনন্দের শোরগোল উঠছে। ছাতুবাবুর বাগানে এমন অভিনব দৃশ্য কেউ কোনোদিন দেখেনি। দয়াল মিত্তির, কালীপ্রসাদ দত্ত পর্যন্ত নিজেদের তাঁবু ছেড়ে চলে এসেছেন এই নতুন খেলা দেখতে।

নবীনকুমার সব কটি খাঁচা শেষ করলো যখন, তখন ওদিকে বুলবুলির লড়াই অসমাপ্ত অবস্থায় বন্ধ হয়ে গেছে। যিনি সালিশী করতে এসেছিলেন, তিনি বিরক্ত হয়ে হাঁটা দিয়েছেন বাড়ির দিকে।

নবীনকুমার যখন উঠে দাঁড়ালো, তখন ঘন ঘন জয়ধ্বনি দেওয়া হতে লাগলো তার নামে। তার যাওয়ার পথ করে দেবার জন্য জনতা বীরের সম্মান দিয়ে ফাঁক হয়ে গেল। নবীনকুমারের জুড়িগাড়ি পর্যন্ত বহু লোক এলো তার পেছনে পেছনে।

জুড়িগাড়িটির ঠিক সামনে রাস্তার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল এক উন্মাদ। তার বয়েস হবে বছর পঞ্চাশেক, কাঁচা-পাকা চুল ও দাড়িগোঁফ বহুকালের ধুলোয় জট পাকানো।

এত মানুষের শোরগোলে সে ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালো। সামনেই নবীনকুমারকে দেখে সে হাত দুটি অঞ্জলিবদ্ধ করে বললো, বাবু, এট্টু জল দেবে, চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবো !

নবীনকুমার পাগল, মাতাল ও পুলিশদের অত্যন্ত অপছন্দ করে। একেবারে মুখোমুখি এক বলশালী উন্মাদকে দেখে সে বলে উঠল, দুলাল !

দুলালচন্দ্র অমনি এক কঠিন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল উন্মাদটিকে।

নবীনকুমার গাড়িতে উঠে বসে দরজা বন্ধ করে দিল।

দুলালচন্দ্র পাশের পাদানিতে দাঁড়িয়ে বললো, সহিস, হাঁকো। জুড়িগাড়ি চলে গেল কপকপিয়ে।

সেই উন্মাদ তখন অন্যদের বলতে লাগলো, বাবু, এট্টু জল দেবে, চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবো।

শহরের মানুষ বড় বিচিত্র রকমের আমোদখোর। অনেকে তখন সেই পাগলটিকে নিয়ে পড়লো। এ ব্যাটা চিঁড়ে চায় না, জল চায়। আগে চিঁড়ের খোঁজ কর, জল তো কত রয়েছে, পাঁচ পা অন্তর একটা করে পুকুর।

—বাবু, এট্টু জল দেবেন, চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবো।

সবাই সামনে থেকে সরে যায়, আর একটু দূর থেকে বলে, আরে ব্যাটা, চিঁড়ে খাবি কেন, ভাত খা ভেজাতে হবে না। আর একজন বললো, ভাত কেন, পোলাউ খা না, মনে মনে খাবি যখন, তখন পোলাউতে আপত্তি কী!

লোকটি যেন কারুর কথাই শুনতে বা বুঝতে পারে না। একঘেয়ে কাকুতিমাখা গলায় ও শুধু বলে চলে, বাবু, এট্টু জল দেবেন, চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবো।

এক সময় অপরাহ্ন শেষ হয়ে সন্ধ্যা এলো, মেলা সাঙ্গ হলো। ছাতুবাবুর বাগান জনশূন্য হয়ে গেল। পশ্চিম দিগন্তে আকাশ অরুণ বর্ণ, রাত্রির মজলিসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে নগরী। গাছের ডালে ডালে এখনও কল-কূজনে মত্ত হয়ে আছে অনেক পক্ষী। তাদের মধ্যে অনেকগুলিই স্বাধীন বুলবুলি।

কাছাকাছি আর কোনো মানুষ নেই, তবু সেই উন্মাদটি বলে যেতে লাগলো, বাবু, এট্টু জল দেবেন, চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবো।

উন্মাদটি অসম্ভব ক্ষুধার্ত। কিন্তু সে কেড়ে খেতে জানে না। মস্তিষ্কের গোলযোগ হেতু সে ভিক্ষার সঠিক ভাষাটিও বলতে পারে না। সে যদি বলতো, বাবু, একটু চিঁড়ে দিন, জলে ভিজিয়ে খাবো, কেউ হয়তো দয়াপরবশতঃ তাকে কিছু খাদ্য দিত। কিন্তু ভাষার ভুলের জন্য তার ক্ষুধার কথা কেউ বুঝলো না। সে সবার উপহাসের পাত্র হলো।

কিন্তু সে কী করবে। বহুকাল আগে সে শুকনো চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবার জন্য জলের সন্ধানেই বেরিয়েছিল। সে কথাই তার মনে গেঁথে আছে।

পথ দিয়ে চলতে চলতে সেই মূর্খ উন্মাদটি এক একবার রক্তবর্ণ আকাশের দিকে চায়, তারপর নিকটবর্তী কোনো পথচারীকে দেখলে আবার সেই ভুল ভাষাতেই বলে, বাবু, এট্টু জল দেবেন, চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবো!

পথচরীরা ভয় পেয়ে বলে, আ মলো যা, এ ব্যাটা কে রে, দূর হ! দূর হ!

কিছুদিন আগে বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের বাড়িতে বড় রকম একটা ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতরা কারুকে প্রাণে মারতে পারেনি কিন্তু জিনিসপত্র নিয়ে গেছে সবই। এমনই অবস্থা যে পরদিন থালা-বাটি, হাঁড়িকুঁড়ি কিনে না আনলে ভাত খাওয়ারও উপায় নেই।

ঈশ্বরচন্দ্র সে সময় গ্রামের বাড়িতেই ছিলেন। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন দস্যু মধ্যরাত্রে অকস্মাৎ মশাল ও বর্শা হাতে নিয়ে আক্রমণ করায় ঈশ্বরচন্দ্র বৃদ্ধ পিতামাতাকে ও বাড়ির অন্য লোকজনদের সরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজে প্রস্তুত রইলেন ডাকাতদের মোকাবিলা করার জন্য। কিন্তু হট্টগোল শুনেও গ্রামবাসীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ডাকাতদের প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে আসেনি, একা ঈশ্বরচন্দ্র কী করবেন। বাড়ির লোকেরা সবাই ঈশ্বরচন্দ্রকে পলায়ন করবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো, কিন্তু এ গোঁয়ার ব্রাহ্মণ একবার জেদ ধরলে সহজে ছাড়বে না। তখন ঈশ্বরচন্দ্রের পত্নী দীনময়ী দেবী তিন বৎসরের পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে কোলে নিয়ে সদরের কাছে বসে পড়ে বললেন, তবে আমিও থাকবো। ডাকাতরা এসে আগে আমাকে আর ছেলেকে মারুক, কাটুক, তারপর তারা আপনার গায়ে হাত দেবে। পরিবারের নির্বন্ধে তখন ঈশ্বরচন্দ্রকেও খিড়কির দোর দিয়ে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল।

পরে কলকাতায় ফেরার পর হ্যালিডে সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, কি হে, পণ্ডিত,

তোমার গৃহে ডাকাত পড়িয়াছিল শুনিলাম ? আর তুমি কাপুরুষের মতন পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে পলায়ন করিলে ?

ঈশ্বরচন্দ্র উত্তর দিলেন, আর যদি আমি একা চল্লিশজন দস্যুর সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রাণ দিতাম, তখন আপনি কী বলতেন ? বলতেন, লোকটি অতি আহাম্মক ! তাই না ? না মহাশয়, আমি এত সহজে প্রাণ দিতে চাই না, আমার এখন অনেক কাজ বাকি আছে।

যাই হোক, সেই ঘটনার পর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস বীরসিংহ গ্রামের বাড়িতে একজন লাঠিয়াল নিযুক্ত করেছিলেন। ডাকাতরা যাবার সময় গৃহ-প্রাঙ্গণে জ্বলন্ত মশাল পুঁতে রেখে গিয়েছিল, তার অর্থ তারা আবার আসবে। ঠাকুরদাসের পুত্র কলকাতায় সরকার বাহাদুরের অধীনে পাঁচশো টাকা বেতনের চাকরি করে, অর্থাৎ রীতিমতন বড় মানুষ, সুতরাং তাঁর গৃহের প্রতি তো দস্যু-তস্করের দৃষ্টি পড়বেই।

কিন্তু নবনিযুক্ত লাঠিয়ালটি যেমন প্রভুভক্ত, তেমনই শক্তিশালী। তার নাম শ্রীমন্ত। চারপাশের আট-দশখানা গাঁয়ের লোক এই শ্রীমন্তের লাঠির জোরের কথা জানে। তা ছাড়া নিকটস্থ থানার দারোগা একবার ঠাকুরদাসের কাছে ঘুষ চেয়ে বড় নাকাল হয়েছিল। ঠাকুরদাসের পুত্রকে যে লাট-বেলাটেরাও খাতির করে, সে খবর দারোগাপ্রবর তখন জানতো না। ডাকাতির পরদিন দারোগাটি ঠাকুরদাসের সেই পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখেছিল প্রতিবেশী বালকদের সঙ্গে মহানন্দে হা-ডু-ডু খেলতে। ছোটখাটো, হেঁজিপেঁজী ধরনের এই বামুনের এক কথায় যে দারোগার চাকরি চলে যেতে পারে, সে কথা জানার পর দারোগাটি প্রভূতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল এবং সে গৃহের নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বারবার। তারপর থেকে আর ডাকাত আসেনি।

সেই লাঠিয়াল শ্রীমন্তকে ঠাকুরদাস কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন ছেলের কাছে। এখন থেকে সে কলকাতাতেই থাকবে। ঈশ্বরচন্দ্র তাকে দেখে বিস্মিত। কলকাতায় লাঠিয়ালের কী প্রয়োজন ? কলকাতায় পুলিশ-কোতোয়ালি রয়েছে, তা ছাড়া কলকাতায় বাঘা বাঘা ধনী অজস্র, তাঁদের ছেড়ে দস্যু-তস্কররা তাঁর মতন এক শিক্ষকের দিকে নজর দেবে কেন ? কিন্তু শ্রীমন্ত কিছুতেই গ্রামে ফিরে যেতে রাজি নয়। সে ছায়ার মতন লেগে রইলো ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে, দিনে রাত্রে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র যখন যেখানে যান, শ্রীমন্ত ঠিক পশ্চাতে পশ্চাতে থাকে।

ঠাকুরদাস গ্রামে বসে ঠিকই সংবাদ পেয়েছিলেন। কলকাতায় তাঁর পুত্রের প্রাণের আশঙ্কা আছে, লুণ্ঠন-অপহরণের জন্য নয়, অন্য কারণে। ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা-বিবাহকে শাস্ত্রসিদ্ধ এবং আইনসিদ্ধ করবার পথে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন। এইজন্য তাঁর এখন প্রচুর শত্রু।

'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামে ঈশ্বরচন্দ্র রচিত পুস্তিকাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঝড় তুলেছিল। এই রচনার বিপক্ষে কলম ধরলেন দলে দলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। কিন্তু যুক্তিতর্কে ঈশ্বরচন্দ্রকে পরাস্ত করার ক্ষমতা কারুর নেই। লেখনীকে তরবারিতে পরিণত করে ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিপক্ষের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করতে লাগলেন শাস্ত্র উদ্ধার করে। কিন্তু শাস্ত্রের সমর্থনের চেয়েও বড় কথা বিবেকের সমর্থন। প্রতিপক্ষকে বরাবর তিনি প্রশ্ন করতে লাগলেন, ব্যভিচার, গর্ভপাত, ভ্রূণহত্যার চেয়ে কি বিধবার বিবাহ দেওয়া সমাজের পক্ষে বেশী উপকারী নয় ? বৈধব্যের ফলে সহস্র সহস্র নারীদের পদস্খলন, অকালমৃত্যু, অপহরণ ঘটছে না ? বিধবাকে ব্রহ্মচারিণী করার নামে তিথি বিশেষে তাকে কোনো খাদ্য দেওয়া হবে না, এমনকি তৃষ্ণায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হয়ে গেলেও দেওয়া হবে না এক বিন্দু জল, এই কি বিবেকসম্মত কাজ ! যে-বালিকা জ্ঞানোন্মেষের আগেই বিবাহিতা এবং বিধবা হলো, তাকে বাকি জীবন থাকতে হবে দণ্ডিতা হয়ে ?

যুক্তিতে হেরে গেলেই মানুষ বেশী ক্রুদ্ধ হয়। প্রতিপক্ষরা এই ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের কাছে যুক্তিতর্কে পরাজিত হয়ে যে কোনো উপায়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে নিবৃত্ত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। তিনি পথে বেরুলেই এক দল লোক তাঁকে বিদ্রূপ করে, দূর থেকে গোপনে ইঁট-পাটকেলও ছোঁড়ে। হঠাৎ হঠাৎ তিনি দেখতে পান তাঁকে ঘিরে ধরেছে একদল লোক। তিনি সোজা তাকান তাদের চোখের দিকে। এখনো সামনাসামনি কেউ গায়ে হাত তুলতে সাহস পায় না। তবে অনেক বড় মানুষের বাড়িতেই মোসাহেবেরা পরামর্শ দিতে আরম্ভ করেছে, হুজুর, অত তর্কাতর্কিতে কাজ কী ? রেতেরবেলায় ঐ বিটলে বামুনটাকে এক কোপে সাবাড় করে দিলেই তো হয়। জাত-ধম্মো সব রসাতলে দিলে, ছ্যা ছ্যা !

আমাদের পূর্ব পরিচিত সিমুলিয়ার বাবু জগমোহন সরকার এখন ঘোর সনাতনপন্থী হয়েছেন।

এককালে তিনি স্ত্রী-শিক্ষা নিয়ে খেপেছিলেন। কিন্তু তাঁর দমদমার বাগানবাটিতে তাঁর ইয়ারবকশীরা একবার দুটি দশ-এগারো বৎসর বয়স্কা বালিকাকে এনে খুব আমোদ-ফূর্তিতে মাতে, আমোদ কিঞ্চিৎ মাত্রাতিরিক্তই হয়েছিল নিশ্চয়ই, কারণ পল্লীস্থ ভদ্রব্যক্তিরা তিতিবিরক্ত হয়ে এক সময় সদলবলে এসে সেই গৃহ চড়াও করে। ইয়ারবকশীরা দুর্ভিক্ষ সময়কালীন ইঁদুরের মতন এদিক ওদিক ছুটে পালায়। আর বে-এক্তিয়ার জগমোহন সরকার মুক্তকচ্ছ হয়ে বলে ফেলেন, আপনারা নিজেই হল্লা করচেন, এখানে কোনো আনফেয়ার মিন্স নেওয়া হচ্চে না। আমরা মেয়ে দুটিকে নেকাপড়া শেকাচ্চিলুম, আমরা অফ টাইমে ফিমেল এডুকেশনের চর্চা করি।

পল্লীর ভদ্রব্যক্তিরা সে কথায় কর্ণপাত না করে জগমোহন সরকার ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের উত্তম মধ্যম দেয় এবং ব্যাপারটি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। সেই সময় বেথুন সাহেব মীর্জাপুরে সবেমাত্র বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছেন। কিছু পত্র-পত্রিকায় স্ত্রী-শিক্ষার ঘোর বিরোধিতা করে নানা প্রকার চটুল, অশ্লীল মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছিল, সেই সংবাদপত্রের মসীজীবীরা জগমোহন সরকারের মুখরোচক মামলাটি উপজীব্য করে বিদ্রূপের বন্যা বইয়ে দেয়। "বঙ্গবাসিগণ, স্ত্রী-শিক্ষার কী সুচারু পরিণতি তোমরা দ্যাখো। আজিকালি রিফর্মড বাবুগণ অবসর বিনোদনের নামে বৃথা সময় ব্যয় না করিয়া প্রমোদভবনে কচি দুই বালিকাদের উলঙ্গ করিয়া তাহাদের সঙ্গে নৃত্য করিতে ২ এ বি সি ডি শিক্ষা দিতেছেন। এক হস্তে সুরার পাত্র অন্য হস্তে কেতাব। ভাবাবেগে চক্ষু মুদিয়া নাম সঙ্কীর্তনের মতন তাঁহারা গাহিতেছেন বি এ টি ব্যাট, সি এ টি ক্যাট। নিশিকালে পুরবাসীরা পাঁচী-বুঁচি, বিমি-ক্ষেমীদের কণ্ঠে কলতান শুনিতেছে বি এ টি ব্যাট, সি এ টি ক্যাট। এতদ্দেশীয় নারীগণের ইমানসিপেশনের আর বাকি রহিল কি! যে কালিতে কলম ডুবাইয়া এই বাক্য সকল লিখিতেছি, ইচ্ছা করে সেই কালিতেই ডুবিয়া মরি!"

এই ঘটনার পর জগমোহন সরকার কিছুদিন জনসমক্ষে মুখ লুকিয়ে ছিলেন। এখন আবার নব পরিচয়ে উদিত হয়েছেন। লিভারে ব্যথা উঠে কিছুদিন কষ্ট পাবার ফলে তিনি এখন মদ্যপান সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে 'সুরাপান না বিষপান' নামে একটি গ্রন্থ ছাপিয়ে ফেলেছেন। তাঁর বাড়িতে সুরাপান নিবারণী সমিতি স্থাপিত হয়েছে। তা ছাড়া সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই।

প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর বৈঠকখানার আসরে এখন বিদ্যাসাগরের মুণ্ডপাত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে দু-একবার এসেছেন এ বাড়িতে। তিনি কলকাতার বহু ব্যক্তির কাছে স্বয়ং গিয়ে বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছেন এখন। সামনাসামনি বোঝালে অনেক সময় কাজ হয়। জগমোহন সরকারকে বিদ্যাসাগর চিনতেন না, তবে বিশিষ্ট ধনী হিসেবে এই ব্যক্তিটির নাম আছে এবং মন্দির-বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি ব্যাপারে কিছু দানধ্যানও করেছেন। তাই বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র এসেছিলেন এই জগমোহন সরকারের কাছে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেই বুঝেছিলেন যে এখানে সুবিধে হবে না, নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছিল তাঁকে।

মোসাহেব পরিবৃত হয়ে জগমোহন সরকার সগৌরবে বলেন, কেমন দিলুম ঐ সাহেবের পা-চাটা বামুনটার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে। আমার কাচে শাস্ত্র কপচাতে এয়েচেন। বিলেতে বেধবাব বে হয় বলে এদেশেও হবে? সাহেবদের খুশি করবার জন্য আমরা আমাদের মাসী-পিসীদের আবার বে দেবো!

এক মোসাহেব বললো, হুজুর, এই বিদ্যেসাগর লোকটার জন্য মাগীগুলোর কেমন আস্পর্ধা বেড়ে গ্যাচে একবার শুনুন। যত বুড়ি ধুড়ি রাঁড়েরাও এখন বে'র জন্য ক্ষেপেচে।

অপর এক মোসাহেব বললো, আরে বুড়ি বলচিস কি! আমার আপন পিসী, পঁচাশি বচর বয়েস, বেধবা হয়েছেল সে ছ' না সাত বচরে, এতদিন মন দিয়ে পুজোআচ্চা করেচে, আহা নিরামিষ্যি রান্না আমার পিসী বড় ভালো রাঁদে, একবার কাঁচকলা আর বড়ির সুক্তো যা খেইচিলুম, আমার বাবার দাঁত নেই, মাছ-মাংস ছেড়ে দিয়েচেন, পিসীর হাতের নিরিমিষ্যি রান্না ছাড়া মুখে কিচু রোচে না, মেথি ফোঁড়ন দিয়ে লাউঘণ্ট।

জগমোহন ধমক দিয়ে বললেন, আরে গেল যা, নিরিমিষ্যির সাত কাহন শুরু করে দিলে। পিসীর কতা কী বলচিলি?

মোসাহেব বললো, হ্যাঁ, আমার সেই পঁচাশি বচরের বুড়ি পিসী হঠাৎ বলে কিনা, আর আমি তোদের হেঁসেল ঠেলতে পারবো না, তোদের জন্যে তো এতকাল হাড় পচালুম, এবার ক্ষ্যামা দে। ও-বাড়ির রাইমণি আর নীরোবালা বলছেল যে বিদ্যেসাগর না কে যেন এক মহাপণ্ডিত বিধেন দিয়েচে যে বিধবা

মাগীদের আবার বে হবে। তোরা পাত্তর দ্যাক, আমি আবার বে কর্বো।
জগমোহন বললেন, বলিস কি রে? পঁচাশি বচরের বুড়ি?
মোসাহেব বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর, সে একেবারে ক্ষেপে উঠেচে। বলে কি না আর রান্না কর্বো না, আজই আমার বে দে। মরার আগে একটু সুক করে নিই।
—বুড়ি মাগীর সুক করার শক হয়েচে? হে-হে-হে-হে।
—আরও বলে কিনা, আমার নুকোনো সোনার গয়না আচে, আমার বে'র খর্চা আমিই দেবো।
হাসির হুল্লোড় পড়ে যায়, জগমোহন সরকার মোসাহেবটির পিঠ থাবড়ে সাবাস জানান।
অপর এক মোসাহেব বললো, ঈশ্বর গুপ্ত বেড়ে লিকেচেন কিন্তু। আপনি পড়েচেন হুজুর?
জগমোহন বললেন, কী লিকেচে, শুনি, শুনি?
মোসাহেবটি মুখস্থ বলতে লাগলো :

> বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল
> বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল।
> কোথা বা করিছে লোক শুধু হেউ হেউ
> কোথা বা বাঘের পিছে লাগিয়াছে ফেউ।
> অনেকেই এত মত লতেছে বিধান
> "অক্ষত যোনির" বটে বিবাহ-বিধান।
> কেহ বলে ক্ষতাক্ষত কেবা আর বাছে?
> একেবারে তরে যায় যত রাঁড়ী আছে।...

সে আরও বলতে যাচ্ছিল, জগমোহন তাকে মধ্য পথে বাধা দিয়ে বললো, কী বললি, কী বললি, ক্ষতাক্ষত কে বা আর বাছে?
মোসাহেবটি বললো, হ্যাঁ হুজুর, কেউ কেউ বলচে কিনা বেধবার বে হতে পারে বটে তবে শুধু অক্ষত যোনির বেধবাদের।
জগমোহন সোল্লাসে উরু চাপড়ে বললেন, ওরে ঈশ্বর গুপ্ত মশাই তো ঠিকই বলেচেন রে! ক্ষতাক্ষত কে বা আর বাচে? মেয়ে ধরে ধরে কি আগে পরীক্ষে করে দেখতে হবে নাকি যে কার অক্ষত যোনি আর কার ছিঁড়েচে? হে-হে-হে-হে।
এক রসিক মোসাহেব আবার আর একটু যোগ করলো, মেয়েছেলের যোনি পরীক্ষার জন্য তা হলে ইন্সপেকটর রাখতে হবে বলুন, হুজুর! সে ইন্সপেকটারি কাজের জন্য যে হাজারে হাজারে লোক লাইন লাগাবে!
কানু বিনা গীত নাই আর স্ত্রীলোকের উল্লেখ ছাড়া রসের গল্প হয় না। সে স্ত্রী-শিক্ষাই হোক আর বিধবা-বিবাহই হোক, যে কোনো একটা প্রসঙ্গ পেলেই হলো। স্ত্রীলোকেরা যখন জড়িত তখন আদিরসের স্রোত অমনি বয়ে যায়। এই প্রকার বাক্যালাপ শুধু জগমোহন সরকারের বৈঠকখানায় নয়, কলকাতার বহু বড় মানুষের বাড়িতেই এ রকম চলছে।
ঈশ্বরচন্দ্র জোরালো সমর্থন পেয়েছেন ইয়ং-বেঙ্গলের দলের কাছ থেকে। এই শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত। ব্রাহ্মরাও তাঁকে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে। অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাও তাঁর সমর্থক। কিন্তু দেশের ধনী সম্প্রদায় তাঁর প্রতিকূলতা করে চলেছে। এবং এই ধনীদের বেতনভোগী ব্রাহ্মণরাই তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারক। নব্য ধনীরা আগেকার দিনের রাজসভার কায়দায় বাড়িতে একটি সভা বসিয়েছে এবং উচ্ছিষ্টলোভী ব্রাহ্মণেরা সেজে বসেছে সেই সব সভার সভাপণ্ডিত। এবং এই সব রক্ষণশীল ধনীরা তাদের মুরুব্বি হিসেবে ধরেছে রাজা রাধাকান্ত দেবকে।
রাজা রাধাকান্ত দেব রক্ষণশীলতার শিরোমণি হিসেবে পরিচিত হলেও স্বয়ং কৃতবিদ্য পুরুষ এবং অনেক বিষয়ে উদার মতাবলম্বী। এ দেশে রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রভাব খুব। তিনি প্রতিবন্ধকতা করলে সামাজিকভাবে বিধবা-বিবাহ চালু করা খুবই কঠিন কাজ হবে। সেইজন্য ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা করেছিলেন রাধাকান্ত দেবকে বিধবা-বিবাহের পক্ষে আনার।
রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র আনন্দচন্দ্র বসুর সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের সৌহার্দ্য আছে। এঁর কাছে তিনি শেক্সপীয়ার পাঠ করেছেন এক সময়। তিনি আনন্দচন্দ্রকে বললেন, তোমার দাদামশাইয়ের সমাজে ও রাজদরবারে খুব সম্মান। তিনি ইচ্ছে করলে এ দেশের বিধবাদের দুঃখ দূর করতে পারেন। তুমি তাঁকে

একটু বুঝিয়ে বলো না ! আনন্দচন্দ্র রাজি হতে দ্বিধা করলেন। তাঁর দাদামশাই অতি রাশভারি মানুষ, তাঁর কাছে অন্য ব্যাপারের আবদার করা যায় যদিও, কিন্তু এই সব সামাজিক প্রসঙ্গ তুলতে গেলে তিনি যদি প্রগল্‌ভতা মনে করেন ! আনন্দচন্দ্র বন্ধুকে বললেন, তুমি বরং তোমার বই একখানি দাদামশাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর মতামত চাও।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রেরিত বই পাঠ করে রাধাকান্ত দেব সুকৌশলে মতামত এড়িয়ে গেলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের লিপিচাতুর্যের প্রশংসা করে বললেন, দ্যাখো, আমরা বিষয়ী লোক, আমরা আর এ সম্পর্কে কী বিচার করতে পারি। বরং, তুমি যদি রাজি থাকো, তবে আমার সভায় পণ্ডিতদের একদিন ডাকি, তাঁদের সঙ্গে তোমার শাস্ত্র বিচার হোক।

ঈশ্বরচন্দ্র রাজি হলেন। কিছুদিনের ব্যবধানে দু-বার পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধে নামলেন ঈশ্বরচন্দ্র। রাজা রাধাকান্ত দেব একদিন একটি শাল উপহার দিলেন ঈশ্বরচন্দ্রকে, আর একদিন দিলেন নবদ্বীপের স্মার্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে। যেন তিনি দুজনের শাস্ত্রজ্ঞানেই মুগ্ধ হয়েছেন। রাধাকান্ত দেবের মনোভব অনেকটা যেন এই যে, বিধবা-বিবাহের পক্ষে বিপক্ষে তাত্ত্বিক আলোচনা চলছে চলুক না, ভালোই তো, এতে দু পক্ষের কাছ থেকেই অনেক শাস্ত্রবচন জানা যাচ্ছে।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র শুধু বিদ্যা জাহির করবার জন্য বিধবা-বিবাহের পক্ষে কলম ধরেননি। একে কার্যে না পরিণত করে ছাড়বেন না। এক সময় তিনি ঠিক করলেন, ধনীরা যতই বাধা দেবার চেষ্টা করুক, বিধবা-বিবাহের প্রচলনের জন্য আইন পাস করাতে হবে। ইয়ং বেঙ্গল এবং ব্রাহ্মরাও চায় সরকারের কাছে এই মর্মে আবেদন করা হোক। আবেদনপত্র রচনা করে ঈশ্বরচন্দ্র এবার ঘুরে ঘুরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে লাগলেন।

এবার দপ করে জ্বলে উঠলেন রাধাকান্ত দেব। তর্কাতর্কি করা এক ব্যাপার, আর বিদেশী রাজশক্তির সাহায্য নিয়ে দেশের ওপর একটি আইন চাপিয়ে দেওয়া অন্য ব্যাপার। সতীদাহ বন্ধ করার সময় রাধাকান্ত দেব যে কারণে বিরোধিতা করেছিলেন, বিধবা-বিবাহের ব্যাপারেও তিনি সেই কারণেই উগ্র হয়ে উঠলেন। সমাজের পরিবর্তন যদি আসে, তবে তা আসবে জনমানসের ক্রম-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, এতে রাজশক্তির হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ রাজশক্তি একবার নাসিকা গলাতে শুরু করলে তার আর কোনো শেষ থাকবে না।

বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতীদের মত এই যে দেশের আইন-কানুন রক্ষার দায়িত্ব রাজশক্তির। বিধবা-বিবাহ যদি আইনসম্মত না হয়, তবে সাধারণ মানুষ এই বিবাহে সম্মত হবে না। কিংবা হলেও, বিধবার পুনর্বিবাহের পর তার সন্তান সম্পত্তির অধিকার পাবে না। সন্তান যদি পিতামহের সম্পত্তির বৈধ অধিকারী না হতে পারে, তাহলে সেই বিবাহ যে অসিদ্ধ হিসেবে গণ্য এই সরল কথাটি রাজা রাধাকান্ত দেবের দল বুঝেও বুঝলেন না। তাঁরাও দ্বিগুণ উৎসাহে প্রতিবাদী স্বাক্ষর জোগাড় করতে শুরু করলেন।

বিধবা-বিবাহের সমর্থনে আবেদনটিই আগে পেশ করার ব্যবস্থা হলো সরকার সমীপে। এতে স্বাক্ষর করলেন নয়শো বত্রিশ জন ব্যক্তি, একেবারে শেষ স্বাক্ষরকারীর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

আবেদনপত্র জমা দেবার আগের দিন ঈশ্বরচন্দ্র সারাদিন ঘোরাঘুরি করেছেন, তিনি গাড়ি-পাল্কির তোয়াক্কা করেন না, তাঁর দুই পা দুই অশ্বশক্তি, হাঁটাহাঁটি করতে তাঁর কোনো ক্লান্তি নেই।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। পথঘাট নির্জন, ঈশ্বরচন্দ্র ঠনঠনের কাছাকাছি এসেছেন, দেখলেন কিয়ৎদূরে কয়কজন লোক দাঁড়িয়ে আছে পথজুড়ে। তাদের ভাবভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়, তারা অপেক্ষা করছে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য।

ঈশ্বরচন্দ্র একবার পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, কি রে, ছিরে আছিস তো ?

লাঠিয়াল শ্রীমন্ত বললো, হ্যাঁ, তুমি থেমো না, এগিয়ে যাও। তোমার চাকর তৈরি আছে, সম্বুদ্ধির ভাইদের সে দেখবে।

শ্রীমন্তের তাড়া খেয়ে লোকগুলো ভয়ে দৌড় লাগাল। ওদের মধ্যে একটি লোককে যেন ঈশ্বরচন্দ্র চিনতে পারলেন। কিছুদিন আগেই তিনি ঐ লোকটিকে কোনো এক বাবুর পার্শ্বচর হিসেবে দেখেছেন।

তিনি হনহন করে এগিয়ে গেলেন সিমুলিয়ার দিকে। জগমোহন সরকারের গৃহের সামনে গিয়ে তিনি শ্রীমন্তকে বললেন, ছিরে, তুই বাইরে দাঁড়া !

তিনি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে সোজা উপস্থিত হলেন জগমোহন সরকারের সামনে, জগমোহন সরকার আঁতকে উঠলেন একেবারে।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, আপনি আমাকে মারতে লোক পাঠিয়েছিলেন না ? অত কষ্ট করার দরকার কী ? এই তো আমি এসেছি, মারতে হয় মারুন দেখি ?

শীতের এক সকালে বেণ্টিঙ্ক নামক একটি জাহাজ এসে ভিড়লো কলকাতার পোতাশ্রয়ে। জাহাজটি এসেছে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে। অন্যান্য অনেকের সঙ্গে সেই জাহাজ থেকে নামলেন এক কালো রঙের পাক্কা সাহেব। হ্যাট, কোট, প্যাণ্ট, বুট জুতো পরিহিত। এঁর ওষ্ঠে সাদা লম্বা একটি পদার্থ, যার এক প্রান্ত থেকে ধূম উদ্গীরিত হচ্ছে। কাগজের মধ্যে তামাক পাকানো এই জিনিসটির নাম সিগারেট, কলকাতাবাসীর চক্ষে এ বস্তুটি নতুন।

এই কৃষ্ণকায় সাহেবটিই স্বর্গত উকিল রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র পুত্র মধুসূদন। তবে মধু নামে যে উচ্ছৃঙ্খল, প্রতিভাবান, কোমল, হঠকারী, উদ্ধত যুবকটি এক সময় কলকাতা শহর মাতিয়ে তুলেছিল, সে আর নেই, তার বদলে ইনি একজন স্থূলকায়, মধ্যবয়সী, ক্লান্ত চেহারার পুরুষ। মধুসূদনের বয়েস এখন বত্রিশ, কিন্তু তাঁর চেহারায় যৌবনের দীপ্তি নেই, বরং এরই মধ্যে যেন প্রৌঢ়ত্বের ছাপ পড়েছে।

সুদীর্ঘ আট বৎসরকাল মধুসূদন মান্দ্রাজে প্রবাসী ছিলেন। একদা বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়পরিজন কারুকে কোনো সংবাদ না দিয়ে গোপনে তিনি কলকাতা পরিত্যাগ করেছিলেন, তখন বুকে কত আশা ছিল, ভবিষ্যতের কত পরিকল্পনা ছিল। তার কিছুই ফলেনি। আজ কলকাতার অনেকের চোখেই তিনি মৃত, জাহাজঘাটায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য একজনও দাঁড়িয়ে নেই। তবু মধুসূদন এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন, যদি একটিও চেনা মুখ চোখে পড়ে। কেউ নেই। ইতোমধ্যে কলকাতার অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। মধুসূদন এখন কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন, তারও ঠিক নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মধুসূদন মালপত্র একটি ছ্যাকরা গাড়িতে তুলে বললেন, চলো ফেরীঘাট, বিশপস কালেজ মে যায়ে গা !

মান্দ্রাজে মধুসূদনের ভাগ্যে জুটেছে ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা। খৃষ্টান হয়েছিলেন বিলাত যাবার লোভে, কিন্তু অদ্যাপি সে সুযোগ ঘটেনি। মান্দ্রাজে গিয়ে ভেবেছিলেন, ইওরোপীয় সমাজের সঙ্গে মিশে গিয়ে উচ্চ কোনো পদে নিযুক্ত হবেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর নেটিভ আখ্যা ঘোচেনি, জীবিকার্জনের জন্য তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল সামান্য স্কুল মাস্টারি। কবি খ্যাতির মোহে রচনা করেছিলেন মিল্টনের অনুকরণে গাথা-কাব্য, তাঁর সেই ইংরেজি কাব্যের সমাদর হয়নি। কেউ কেউ পিঠ চাপড়ানি দিয়েছে মাত্র, কলকাতার সংবাদপত্র তাঁর রচনারীতি নিয়ে পরিহাস করেছে। মধুসূদন মনে করতেন বাঙালী মেয়েদের তুলনায় ইওরোপীয় রমণীরা শতগুণে শ্রেষ্ঠা, সেই মোহে মান্দ্রাজে যাবার অত্যল্পকালের মধ্যেই তাঁর ছাত্রীস্থানীয়া এক নীলকর সাহেবের কন্যা রেবেকাকে বিবাহ করেছিলেন। চারটি পুত্র-কন্যার জন্ম দিয়েও সে বিবাহ সুখের হলো না, স্থায়ী হলো না। পুত্র-কন্যা সমেত রেবেকাকে পরিত্যাগ করে আবার এক ফরাসী যুবতীর সঙ্গে পত্নীভাবে বসবাস করছিলেন।

কবি হতে গেলে পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে নেই, এই আহরিত বদ্ধমূল বিশ্বাসে মধুসূদন মান্দ্রাজে গিয়ে পিতামাতার সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগই রাখেননি। প্রথম প্রথম বন্ধুবান্ধবদের চিঠি লিখতেন। যে প্রাণপ্রতিম সুহৃদ গৌরদাসকে একদিন না দেখলে থাকতে পারতেন না, প্রবাসে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই গৌরদাসকে প্রথম দিকে নিয়মিত উচ্ছ্বাসপূর্ণ চিঠি লিখতেন, তারপর এক সময় তাতেও ভাঁটা পড়লো। চোখের বার হলেই মনের বার হয়ে যায়। কলেজ জীবনের বন্ধুরা সকলেই সংসারী হয়ে নানা কর্মে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে, আর সেই প্রাণের টান থাকে না। পর পর কয়েক বৎসরের নীরবতার পর কলকাতার অনেকের মনেই সন্দেহ দেখা দিল যে, মধু আর বেঁচে আছে কি নেই। সে যেমন যথেচ্ছাচারী, তার পক্ষে আকস্মিক মৃত্যু অসম্ভব কিছু নয়।

একমাত্র গৌরদাসের ভালোবাসাই অকৃত্রিম এবং একনিষ্ঠ। তিনি একদিনের তরেও তাঁর প্রিয় বন্ধু মধুকে ভোলেননি। এই আট বৎসর ধরেও মধুর জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে আছেন। পত্র লিখেও মধুর কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে তিনি হাল ছাড়েননি। মান্দ্রাজের ইংরেজি পত্রপত্রিকা আনিয়ে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে দেখেন, তাতে মধুর কোনো লেখা আছে কি না। অনেক লেখাতেই মধু নিজের নাম দেয় না, কিন্তু রচনারীতি গৌরদাসের এতই পরিচিত যে গৌরদাস একটি লাইন দেখলেও চিনতে পারবেন।

খৃষ্টান হবার পর মধুসূদন প্রায় পাঁচ বৎসর কাটিয়েছেন বিশপস কলেজের ছাত্রাবাসে। তারপর আট বৎসর মান্দ্রাজে। এই এক যুগের অধিককাল কলকাতার জীবনের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। এই সময়ের মধ্যে এ দেশে ও সমাজে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে, মধু তার কোনো সন্ধানই রাখেন না।

পুত্র-বিরহে জাহ্নবী দেবী ধরাধাম পরিত্যাগ করে চলে গেছেন অকালে। ক্রুদ্ধ উন্মত্ত রাজনারায়ণ জাহ্নবী দেবী জীবিত থাকতেই পর পর শিবসুন্দরী, প্রসন্নময়ী এবং হরকামিনী নামে তিনটি সদ্বংশীয়া রূপলাবণ্যবতী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। আর একটি পুত্র তাঁর চাই-ই, বিধর্মী মধুকে তিনি ত্যাজ্য করেছেন, তার হাতের জল তিনি নেবেন না। এবং অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর পুন্নাম নরকে তিনি কিছুতেই যেতে রাজি নন। কিন্তু পুত্র-বিরহের ওপর সপত্নী-জ্বালায় পীড়িত হয়ে জাহ্নবী দেবী অভিশাপ দিয়েছিলেন স্বামীকে, আমি যদি সতী হই, তবে আর কোনো পত্নী দ্বারা তোমার সন্তান উৎপন্ন হবে না। শেষ পর্যন্ত হলোও তাই, দ্বিতীয় পুত্রের মুখ দেখা ভাগ্যে ঘটলো না, নিদারুণ মনস্তাপ নিয়ে রাজনারায়ণ এক সময় মৃত্যুবরণ করলেন।

পিতার মৃত্যুসংবাদ মধুসূদনের কানেও পৌঁছোয়নি এক বৎসরের মধ্যে। আত্মীয়-জ্ঞাতিরা রাজনারায়ণের বিষয় সম্পত্তি গ্রাস করে নেওয়ার জন্য চুলোচুলি শুরু করেছিল। তারা রটিয়ে দিয়েছিল যে মধুসূদন মৃত, সুতরাং নিকট জ্ঞাতিরাই সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করে নেবে। তাছাড়া, সে জীবিত থাকলেই বা কী, হিন্দু আইনে বিধর্মী সন্তান পিতৃ সম্পত্তির অধিকার হারায়। সেই কারণেই নিম্নবর্ণের, দরিদ্র শ্রেণীর হিন্দুরাই সাধারণত মুসলমান বা খৃষ্টান হয়েছে, অবস্থাপন্ন, ধনী হিন্দুরা সহসা ধর্মান্তরিত হয় না। তবে সম্প্রতি খৃষ্টান মিশনারীদের প্ররোচনায় সরকার 'লেক্সলোসি' নামে এক আইন প্রণয়ন করেছেন, এই আইন বলে ধর্মান্তরিত পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির দাবীদার হতে পারে। তবে এ পর্যন্ত অবশ্য কেউ এই নতুন আইনের প্রয়োগ পরীক্ষা করেনি।

রাজনারায়ণের নিজস্ব বাসগৃহটিও অন্যেরা দখল করে নিচ্ছে শুনে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন গৌরদাস বসাক। এ বাড়ি মধুর প্রাপ্য। অথচ কোথায় মধু? সে সময় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো কার্য উপলক্ষে মান্দ্রাজে যাচ্ছিলেন, তাঁর হাতে মধুর নামে একটি চিঠি দিয়ে গৌরদাস তাঁকে অনুরোধ করলেন যে প্রকারে হোক মধুকে খুঁজে বার করতে। কৃষ্ণমোহনের মাধ্যমেই আবার কলকাতার সঙ্গে মধুসূদনের যোগসূত্র স্থাপিত হলো।

মধুসূদন কলকাতায় এসেছেন অর্থ সংগ্রহের আশায়। মান্দ্রাজে দারিদ্র্য তাঁকে পীড়া দিয়েছে। পিতার কতখানি এবং কী প্রকার সম্পত্তি আছে, সে সম্পর্কে মধুসূদনের কোনো ধারণা নেই। পুত্রের মতন রাজনারায়ণও ছিলেন বিলাসী, ভোগী পুরুষ। যদৃচ্ছা দু হাতে অর্থ উড়িয়েছেন। মান্দ্রাজে দ্বিতীয়া পত্নীকে রেখে মধুসূদন একা জাহাজ ভাড়ার ঝুঁকি নিয়ে কলকাতায় এসেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, পৈতৃক সম্পত্তি যদি কিছু পাওয়া যায়, তবে তা বিক্রয় করে সংগৃহীত অর্থ নিয়ে আবার ফিরে যাবেন মান্দ্রাজে।

কলকাতায় তাঁর থাকার কোনো জায়গা নেই। তাঁর মতন খৃষ্টানকে কোনো হিন্দু বন্ধু স্বগৃহে আশ্রয় দেবে কিনা, সে সম্পর্কে ঘোর সন্দেহ আছে। সেই জন্যই মধুসূদন সোজা গিয়ে উঠলেন বিশপস কলেজে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোয়ার্টারে। পৌঁছেই দ্রুত চিঠি পাঠালেন গৌরদাস বসাকের কাছে।

গৌরদাস পত্রপাঠ হাজির। বহুকাল পর দুই বন্ধুতে দেখা।

মধুসূদন আগের মতন আর ছুটে গিয়ে গৌরদাসকে আলিঙ্গন করে তাঁর গণ্ড চুম্বনে সিক্ত করলেন না। শুধু উঠে দাঁড়িয়ে গৌরদাসের প্রসারিত দক্ষিণ হস্ত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললেন, অ্যাডসুম! আই অ্যাম হিয়ার!

বিস্ময়ে বেদনায় গৌরদাস বললেন, এ কী চেহারা তোর হয়েছে, মধু!

গৌরদাসের চোখে ভাসে সেই ছিপছিপে কৃষ্ণবর্ণ যুবকটির শরীর। তার বদলে মধু যে এখন শুধু স্থূলাকার হয়েছে তাই-ই নয়, মুখখানি ফোলাফোলা, চোখের নীচে গভীর কালো দাগ, সর্বাঙ্গে অমিতাচারের ছাপ। কণ্ঠস্বর ভাঙাভাঙা।

মধুসূদন হেসে বললেন, বাট্ গাউর, ইউ আর অ্যাজ হ্যান্ডসাম অ্যাজ এভার।

গৌরদাসেরও পরিবর্তন হয়েছে অনেক, কালপ্রবাহ কারুকেই স্পর্শ দিতে ভোলে না। গৌরদাস এখন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ, উচ্চপদস্থ চাকুরে, হিন্দু কলেজের অন্যান্য মেধাবী ছাত্রের মতন তিনিও এখন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এরই মধ্যে তাঁর দুবার পত্নী বিয়োগ হয়েছে, সেই শোকের ছাপ আছে তাঁর চোখে। তবে তাঁর মুখশ্রী প্রায় আগের মতনই সুন্দর বটে।

মধুসূদন সমস্ত কথাবার্তাই বলছেন ইংরেজিতে। বাংলা তিনি প্রায় ভুলেই গেছেন। গৌরদাসকে চিঠি পাঠিয়ে তিনি ছটফট করছিলেন। কৃষ্ণমোহনের বাড়িতে মদ্যপানের সুবিধে নেই, পাদ্রী কৃষ্ণমোহন ও ব্যাপারের ঘোর বিরোধী।

মধুসূদন বললেন, চল্ গাউর, আমরা কোথাও যাই। আর কিছু না হোক, শহরটা একবার ঘুরিয়া দেখিয়া আসি।

গৌর বললেন, আমি গাড়ি এনিচি। আগে খিদিরপুরে যাবো। তোর নিজের বাড়ি দেকবার সাধ হয় না?

—আমায় সে বাড়িতে ঢুকিতে দিবে?

—কেন দেবে না? দু-একদিন আগে গিয়ে আমি হম্বিতম্বি করে এসিচি। প-বাবু আর ব-বাবুকে বলে দিইচি, খবরদার, মধু শিগগিরই এসে পড়বে, তার আগে আপনারা কিচ্ছুটি করবেন নাকো!

—সে কি, তুই আমার আগমন বার্তা চতুর্দিকে রটাইয়া দিয়াছিস নাকি? আমি কিছুকাল সংগোপনে থাকিতে চাই।

—না, আর কারুকে বলিনি। তবে, এত গোপনতাই বা কেন? বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেকা করবিনি?

—আমার লজ্জা হয়, গাউর। পূর্বে সগৌরবে উন্নত মস্তকে হেথায় পরিভ্রমণ করিতাম। এখন আসিয়াছি ভিখারির মতন।

—কে বলে তুই ভিকিরি! তুই আমাদের সকলের প্রিয় সেই মধু!

—তোদের সকলের প্রিয় হইবার মতন আমার আর কী আছে বল, গাউর।

—তুই আমায় গাউর গাউর করিসনি তো। গৌর বল্! সব বিষয়ে ইংরেজি কেতা ধরিচিস বলে কি আমাদের নামগুলোও ইংরেজি করে ফেলবি!

—সরি, আই অ্যাম প্রফিউজলি সরি, মাই ডিয়ারেস্ট গৌর! বাঙ্গালা আমার মুখে একেবারেই আইসে না।

—তোকে আমি চিঠিতে অনেকবার লিকিচিলুম যে, তুই বাংলা শেখ্। বাংলা ছাড়া আমাদের আর গতি নেই। তোর কবিত্বশক্তি তুই বাংলায় প্রয়োগ কর।

—সে আর এ জীবনে হইবে না! বন্ধুদের সংবাদ কী বল্: ভূদেব, বঙ্কু, ভোলানাথ, রাজনারায়ণ, লতিফ ইহারা সব কে কেমন রহিয়াছে। উহারা আমাকে মনে রাখিয়াছে কি?

—কেন মনে রাকবে না? দেকা হবে, আস্তে আস্তে সবার সঙ্গেই দেকা সাক্ষাৎ হবে। তবে রাজনারায়ণ এখুন থাকে মেদিনীপুরে।

—আর গঙ্গানারায়ণ? দ্যাট শাই, ইনট্রোভার্ট ফেলো? আমি উহাকে খুব পছন্দ করিতাম।

—গঙ্গানারায়ণ তোরই মতন বহুদিন নিরুদ্দেশ। কেউ তার খবর জানে না।

গৌরদাসের জুড়ি গাড়ি অপেক্ষা করছিল গঙ্গার এ পারে। দুই বন্ধুতে নৌকোয় নদী পেরিয়ে এসে সেই গাড়িতে উঠলো। খিদিরপুরের কাছাকাছি আসবার পর মধুসূদন হঠাৎ গৌরদাসের হাত চেপে ধরে বললেন, না, গৌর, আমি যাইব না! ঐ গৃহে আমার মাতা প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন, সেই শূন্য ভবনে আমি কোন্ প্রাণে প্রবেশ করিব?

গৌরদাস ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে বললেন, এতদিন বুঝি মায়ের কতা মনে ছেল না? মৃত্যুশয্যায় একবার তো দেকা দিতেও আসিসনি!

মধুসূদন ভগ্নকণ্ঠে বললেন, সত্যই আমি অপরাধী। আমি কৃতঘ্ন! তুই আমাকে যা বলিবি বল্।

মধুসূদনের দু চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়াতে লাগলো। সাহেব মানুষদের যে যেখানে সেখানে চক্ষের জল ফেলতে নেই, সে কথা খেয়াল রইলো না তাঁর।

এক সময় মধু এ বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামলেই তিন চারজন ভৃত্য ছুটে আসতো তার হুকুম শোনবার জন্য। আজ সেখানে দ্বারবান, ভৃত্য একজনও নেই। বাড়ির ভিতরটা যেন খাঁ খাঁ করছে! মনে হয় জনশূন্য।

সিঁড়িতে পা দিয়ে মধুসূদন আবার কাতর হয়ে পড়লেন। এককালে তিনি সুহৃদদের নিয়ে কত প্রমোদ রঙ্গ করেছেন এ বাড়িতে, এখানে কত প্রিয় স্মৃতি লেগে আছে। আজ সব কিছুই যেন ভগ্নদশা। নড়বড় করছে সিঁড়ির রেইলিং। এক সময় চতুর্দিকে ঝাড়বাতি জ্বলতো, এখন ছিন্ন ছিন্ন অন্ধকার ঝুলছে মাথার ওপরে।

গৌরদাস হাঁক দিলেন, কই, কে আছো? কেউ এখানে আছো?

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। যেন পরিত্যক্ত, হানা বাড়ি।

গৌরদাস বললেন, আর তা হলে ওপরে গিয়ে কাজ নেই। বরং দিনের বেলায় আর একদিন আসা যাবেখন।

মধুসূদন বললেন, একবার আমার শয়ন কক্ষটি দেখিব।

গৌরদাস বললেন, এই অন্ধকারের মধ্যে আর সেখানে কী দেকবি!

মধুসূদন বললেন, একবার স্বহস্তে দেওয়ালগুলি স্পর্শ করিব। দেখিতে চাই, উহারা আমাকে চিনিতে পারে কি না!

উভয়ে উঠে এলেন দ্বিতলে। অলিন্দটি পুরোপুরি অন্ধকার নয়, সম্মুখস্থ অপর একটি অট্টালিকার আলোকচ্ছটা কিছুটা এসে পড়েছে সেখানে। কিছুকাল আগেও এ অঞ্চল জনবিরল ছিল, এখন অনেক বাড়ি উঠছে।

মধুর ঘরের দ্বারটি ভেজানো, একটু ঠেলা দিতেই খুলে গেল। ভিতরে আসবাবপত্র কিছুই নেই, কারা যেন নিয়ে গেছে সে সব। শুধু চারটি শূন্য দেওয়াল। এক সময় এখানে স্তূপীকৃত হয়ে থাকতো মধুর বইপত্র, যেখানে সেখানে ছড়ানো থাকতো তার রকমারি পোশাকআশাক।

গৌরদাসের কাঁধে ভর দিয়ে মধুসূদন আবার ক্রন্দন করতে লাগলেন। ভগ্নকণ্ঠে বারবার বলতে লাগলেন, গৌর, কী ছিল, আর কী হইল! সেইসব দিন কোথায় গেল? মনে পড়ে, এই কক্ষে, এক পালঙ্কে তুই আর আমি একত্র শয়ন করিয়াছি! কী উন্মাদের মতন ভালোবাসিয়াছি তোকে, কোনো নারীর প্রতিও এত আকর্ষণ বোধ করি নাই...

গৌরদাস চমকিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, কে?

দ্বারের সামনে এক শ্বেতবসনা মূর্তি। গৌরদাসের প্রশ্নেও সেই মূর্তি নিথর নীরব।

কান্না থামিয়ে মধুসূদনও ভয় পেয়ে গেলেন: অন্ধকারের মধ্যে ঐ মূর্তিটি হঠাৎ এলো কী করে? যেন অপার্থিব কোনো কিছু—

গৌরদাস আবার জিজ্ঞেস করলেন, কে?

কোনো উত্তর নেই।

তখন গৌরদাস সাহস করে এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখে বললেন, ও আপনি? সারা বাড়ি অন্ধকার কেন?

মধুসূদনের তখনো ভয় কাটেনি। তিনি বারবার প্রশ্ন করতে লাগলেন, কে? গৌর, কে?

মধু কলকাতা ত্যাগ করার পরও গৌরদাস কয়েকবার এসেছেন এ বাড়িতে। জাহ্নবী দেবীর মৃত্যুশয্যায় গৌরদাস এসে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মধুর চেয়ে এ বাড়ির সংবাদ তিনি অনেক বেশী রাখেন।

গৌরদাস বললেন, ইনি হরকামিনী দেবী। মধু, ইনি তোমার একজন জননী।

মধুসূদন ঈষৎ বিরক্তভাবে বললেন, অন্ধকারে প্রেতাত্মার মতন উনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কেন? কথা কহেন না কেন?

গৌরদাস বললেন, শোকে দুঃখে উনি অমন স্তব্ধ হয়ে গ্যাচেন।

মধুসূদন বললেন, আমার আবার কয়টি জননী? ইঁহাকে আমি কক্ষনো চক্ষে দেখি নাই!

গৌরদাস বললেন, ইনি তোমার বাপের চতুর্থ পত্নী। আমি এনাকে আগে দেকিচি।

গৌরদাস সেই রমণীকে জিজ্ঞেস করলেন, মা, আপনার এখানে বাতি নেই? আপনি এখেনে একা একা রয়েচেন কেন? বাড়িতে আর কোনো লোকজন নেই?

এবার মহিলা বললেন, একজন চাকর থাকে, তাকে বাজারে পাঠাইছি। আপনেরা খাড়ান, আমি বাতি নিয়া আসি।

অনতিবিলম্বেই মহিলা একটি সেজবাতি নিয়ে এলেন হাতে ঢেকে। সেই আলোয় দেখা গেল রমণী অতি অল্প বয়সিনী, ষোড়শী বা সপ্তদশী বড় জোর, বৈধব্যের কারণে মাথার চুল অতি ছোট করে ছাঁটা।

মুখখানি দেখলে মনে হয়, যেন বিষাদ প্রতিমা।

হরকামিনী ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কে ? কোথা থনে আসছেন ?

গৌরদাস মধুসূদনের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ইনি আপনার পুত্র, এর নাম মধু, বোধ করি আপনি এর কতা শুনে থাকবেন।

হরকামিনী ঠিক উন্মাদিনীর মতন এক পা এক পা করে এগিয়ে এসে হাতের বাতিটি মধুসূদনের মুখের সামনে তুলে অদ্ভুত করুণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মধু ? এতদিন পরে এলে ? সব যে শেষ বাবা !

তারপরই তিনি ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠে বললেন, ওগো আমার আর কেউ নাই ! আমি কোথায় যাবো ?

মধুসূদন বিব্রত হয়ে এক পা পিছিয়ে গেলেন। অপরের কান্না তিনি সহ্য করতে পারেন না। তিনি গৌরদাসকে বললেন, গৌর, তুই এই রমণীকে অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া বলিয়া দে যে, আমি উহাকে বলিতেছি, মাতা, আপনি এই গৃহে যতদিন খুশী অবস্থান করুন।

গৌরদাস বললেন, তুই কি বাংলায় মা অবধি বলতে ভুলে গিচিস ? তুই নিজের মুখে বল, মা, আপনি থাকুন !

নিজের প্রায় অর্ধেক বয়েসী এক যুবতীকে মাতৃ সম্বোধন করে মধুসূদন সেই কথাই জানালেন।

হরকামিনীর সত্যিই পাগল-পাগল দশা। মধুসূদনের মুখের বিকৃত বাংলা তিনি বুঝতে পারছেন না। ক্রন্দন করতে করতে তিনি মধুসূদনকে আলিঙ্গন করতে এলেন। মধুসূদন অতিকষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, গৌর, ইহাকে বুঝাও, এ গৃহ হইতে কেহ ইহাকে সরাইবে না !

তারপর আর বিলম্ব না করে বেরিয়ে এলেন সে ঘর থেকে।

এর কয়েকদিন পর গৌরদাস একদিন নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন কয়েকজন বন্ধু ও কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। এই উপলক্ষে তিনি মধুসূদনকে কলকাতার বিদ্বজ্জন সমাজে পরিচয় করিয়ে দিতে চান।

মধুসূদনের বিষয় সম্পত্তির নিস্পত্তি করতে অনেক সময় লাগবে। এদিকে তিনি একেবারে কপর্দকশূন্য। কিছু একটা রোজগারের সুরাহা না হলে তাঁর পক্ষে কলকাতায় থাকা অসম্ভব। দুরাত্মা আত্মীয়রা কোথা থেকে একটি জাল উইল দাখিল করেছে, সুতরাং সম্পত্তি এখন গভীর জলে। তাছাড়া, গৌরদাসের আন্তরিক বাসনা, মধু আর মান্দ্রাজে না ফিরে কলকাতাতেই থেকে যাক।

সেই আসরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন প্যারীচাঁদ মিত্রের ছোট ভাই কিশোরীচাঁদ মিত্র। তিনি পুলিশ কোর্টের জুনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর স্ত্রী খিদিরপুরের মেয়ে, এক সময় মধুসূদনের বাড়িতে যাতায়াত করতেন এবং তাঁকে মধুদাদা বলে সম্বোধন করতেন। খিদিরপুরের বাড়ি নিয়ে মামলা বেধেছে বলে মধুসূদনের এখন কলকাতায় অবস্থানের কোনো স্থিরতা নেই। কিশোরীচাঁদের সহধর্মিণী স্বামী মারফত বলে পাঠিয়েছেন যে, মধুসূদন তাঁদের দমদমের বাগান বাড়িতে এসে থাকতে পারেন। সেখানে অতি সুন্দর উদ্যান রয়েচে এবং অনেকগুলি কক্ষসমন্বিত একটি বাড়ি। কিশোরীচাঁদ সাগ্রহে মধুসূদনকে তাঁর বাড়িতে অতিথি হবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

শুধু তাই নয়, কিশোরীচাঁদ বললেন, পুলিশ কোর্টে তাঁর অধীনে একটি কেরানীর পদ খালি আছে। মধুসূদন ইচ্ছে করলে সেই চাকুরিটি নিতে পারেন।

গৌরদাস প্রমুখ অনেকেই এ প্রস্তাবকে সোল্লাসে স্বাগত জানালেন। এই তো মধুর চমৎকার হিল্লে হয়ে যাবে।

মধুসূদনের মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেল। কেরানীর চাকরি ! এদের এতদূর স্পর্ধা যে তাঁকে এমন প্রস্তাব দিতে পারে ! যে ব্যক্তি বাইরন বা স্কটের মতন লেখক হতে চায়, সে করবে পুলিশ কোর্টে কেরানীর চাকরি ?

কিশোরীচাঁদ বললেন, বেতন নেহাত মন্দ না, আপাতত একশত কুড়ি টাকা দেবে, ভবিষ্যতে পদোন্নতির আশা আছে।

গৌরদাস বললেন, তুই চুপ করে আছিস যে মধু ? কিশোরীচাঁদবাবু অতিশয় সহৃদয় মানুষ।

কিশোরীচাঁদ বললেন, আপনি আমার গাড়িতে আমার সঙ্গেই যাতায়াত করতে পারবেন, মিঃ ডাট্।

মধুসূদন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এরা ধরেই নিয়েছে যে, এই চাকরি তাঁর মতন একজন বেকারের পক্ষে লোভনীয়। যাতায়াত ও বাসগৃহেরও অসুবিধে নেই। পকেট শূন্য। এর মধ্যেই মধুসূদনকে পর-মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে। ঋণ করতে হয়েছে কয়েকজনের কাছে। আর উপায় কী ! মধুসূদন

বললেন, ইহা তো আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা !

মধুসূদন চলে গেলেন দমদমের বাগান বাড়িতে। কিশোরীচাঁদের সঙ্গে রোজ অফিসে যাতায়াত করেন। কিশোরীচাঁদ অবশ্য মোটেই তাঁর সঙ্গে কর্মচারীর মতন ব্যবহার করেন না, তিনি ঠিক বন্ধুর মতন।

দমদমের এই বাগান বাড়িতে প্রায়ই অনেকে আলাপচারির জন্য আসেন। প্রচুর পানাহার, তর্কবিতর্ক, সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চা হয়। মধু এমনিতে বেশ মজলিশী স্বভাবের, নানাপ্রকার গল্পগুজবে তাঁর জুড়ি নেই, মুখে মুখে এখনো তিনি ইংরেজি কবিতা বানাতে পারেন, কিন্তু এক এক সময় তাঁর খুব অসুবিধে হয়। অহংকারী মধুর তখন নিজেকে মনে হয়, বকের দলের মধ্যে এক হংস। সেই সময় তিনি চুপ করে শুধু সুরার গেলাসের দিকে মনঃসংযোগ করেন।

কিশোরীচাঁদের এই বাড়িতে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি আসেন। এঁরা ইংরেজি সাহিত্যে ডাকসাঁইটে পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও আজকাল প্রায়ই কথা বলেন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে। রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখকে মধুসূদন ছাত্র বয়েস থেকেই চেনেন, এঁরা হিন্দু কলেজের গোড়ার যুগের ছাত্র, ডিরোজিও'র প্রত্যক্ষ শিষ্য, এ দেশে পশ্চিমী ধ্যানধারণা তো ছড়িয়েছেন এঁরাই। আর ইদানীং এঁরা মেতেছেন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে। কেউ কেউ আবার প্যান্ট কোট ছেড়ে ধুতি-মেরজাই-চাদর পরে দিশিবাবু সেজে আসেন। কে এক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নাকি বিধবাদের বিয়ে দেবে বলে মেতেছে, সে সম্পর্কেও এঁদের দারুণ উৎসাহ। প্রায়ই সে প্রসঙ্গ আসে, আর এঁরা তখন রৈ-রৈ করে ওঠেন এবং প্রখ্যাত রাজা রাধাকান্ত দেবের মুণ্ডপাত করেন। মধুসূদনের এ সময়ে কথা বলার কিছুই থাকে না। হিন্দুরা বিধবাদের পুনর্বিবাহ দিতে পারবে, এ তাঁর বিশ্বাস হয় না। এই যে সেদিন তাঁর তরুণী বিমাতা হরকামিনীকে দেখে এলেন, তাঁর তো সারা জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল। হিন্দুরা পারবে ঐ অসহায় বিধবাকে কোনো সুপথ দেখাতে ?

একদিন হঠাৎ কিশোরীচাঁদের দাদা প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে মধুসূদনের বাক্‌দ্বন্দ্ব বেধে গেল। সন্ধ্যায় বাগানবাড়ির এক প্রান্তে সরোবরের বাঁধানো ঘাটে আসর বসেছে। আজও কথা চলছে বাংলা ভাষার বইপত্র বিষয়ে। প্যারীচাঁদের বন্ধু, মাউন্ট এভারেস্টের সূত্রে প্রখ্যাত রাধানাথ সিকদার এখন আপন যত্নে বাংলা শিক্ষা করে নিয়েছেন এবং নিজে লিখছেনও কিছু কিছু। রাধানাথ ও প্যারীচাঁদ যুগ্মভাবে প্রকাশ করছেন একটি পত্রিকা, স্ত্রীলোক এবং অল্পশিক্ষিতরাও যাতে পড়ে বুঝতে পারে এমন সরল বাংলায় সেখানে সব কিছু লেখা হয়, পত্রিকাটির নামটিও অতি সরল, "মাসিক পত্রিকা"। মধুসূদন কিশোরীচাঁদের কাছ থেকে নিয়ে দু-একবার উল্টে দেখেছেন সে পত্রিকাটি। তাঁর বিবমিষা হয়েছে। সে পত্রিকায় প্যারীচাঁদ ধারাবাহিকভাবে লিখছেন একটি উপন্যাস, নাম 'আলালের ঘরের দুলাল', ছোটলোক চাঁড়ালদের মতন ভাষায় লেখা। অথচ সেই লেখাটির জন্যই নাকি তুমুল সোরগোল পড়ে গেছে সারা দেশে।

মধুসূদন বিরক্তি সহকারে শুনছিলেন ওঁদের কথাবার্তা, খানিক বাদে নেশার মাত্রা কিছুটা চড়লে তিনি ইংরেজিতে বলে উঠলেন, হোয়াট ট্র্যাস ইউ আর রাইটিং, প্যারীচাঁদবাবু ? ইহা কি ভদ্রলোকের ভাষা ? গৃহ মধ্যে লোকে দাস-দাসীদের সহিত যে ভাষায় কথা বলে, তাহাও কি আপনি সভ্যসমাজে আনিতে চান ! গৃহ মধ্যে আপনি যেমন তেমন পোশাকে থাকিতে পারেন, গামছা জড়াইয়াও ঘুরিতে পারেন, কিন্তু ভদ্রমণ্ডলীতেও কি সেই পোশাক পরিধান করিয়া আসিবেন ?

প্যারীচাঁদ চমকিত হয়ে তাকালেন মধুসূদনের দিকে। তারপর একটু কৃপার হাস্য দিয়ে বললেন, আমরা কথা বলছি বাংলা সাহিত্য নিয়ে, আপনি সে বিষয়ে কিছু বুঝবেন না, মিঃ ডাট্‌।

মধুসূদন তবুও বললেন, আমি আপনার ঐ পত্রিকার রচনা পাঠ করিয়াছি। উহা কি সাহিত্য ? এইরূপ ভাষায় সাহিত্য হয় ? বাংলা তো জেলে-জোলা-তাঁতীদের ল্যাঙ্গোয়েজ ! সংস্কৃত হইতে প্রচুর শব্দ আমদানি করিয়া তবু এই ভাষাকে কিছুটা ভদ্রস্থ করা যাইতে পারে।

প্যারীচাঁদ বললেন, মিঃ ডাট্‌, আমি বলচি, শুনে রাখুন। সংস্কৃতের দিন গ্যাচে। এই যে খাঁটি চলতি মুখের ভাষা আমি ব্যবহার করচি, দেকবেন একদিন সবাই আমার এই ভাষাতেই লিকবে, আমার প্রবর্তিত এই ভাষা বঙ্গে চিরস্থায়ী হবে !

মধুসূদনও তৎক্ষণাৎ সগর্বে বললেন, মোটেই তাহা নহে। ছি ছি, সাহিত্য একটি পবিত্র জিনিস, তাহা লইয়া আপনারা বাল-ক্রীড়া করিতেছেন ! এই কুৎসিত বাংলা ভাষায় যদি কিছু রচনা করিতেই হয়

তবে অগ্রে ইহার উন্নতি করিতে হইবে। দেখিবেন, আমি যে ভাষার সৃষ্টি করিব, তাহাই হইবে চিরস্থায়ী।

—আপনি ভাষা সৃষ্টি করবেন? কোন্ ভাষা? ল্যাটিন, গ্রীক, তামিল?

—না, বাংলা।

সকলে সমস্বরে হো-হো করে হেসে উঠলো। হাসির কথাই বটে, যে ব্যক্তি ইংরেজি ছাড়া বাংলাতে কথাই বলে না, দু-চারটি বাংলা শব্দ উচ্চারণ করতে গেলেও ভুল করে, সে কিনা বড়াই করে বাংলা ভাষা সৃষ্টি করার!

প্যারীচাঁদ বিদ্রূপ করে বললেন, আপনি বাংলা লিকবেন? কোন্ কালে? এই কলিকালে, না সত্যযুগে?

মধুসূদন গুম হয়ে রইলেন।
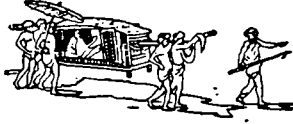
এক শনিবারের দ্বিপ্রহরে নবীনকুমারের ঘুম ভেঙ্গে গেল কিছু নারীকণ্ঠের কল-কোলাহলে। প্রতি শনিবার বিকেলের দিকে তাকে গুরুতর কর্মে ব্যাপৃত থাকতে হয়, তাই আহারাদির পর সে খানিকটা নিদ্রা-সাধনা করে নেয়।

হিন্দু কলেজের পাঠ সাঙ্গ করার আগেই কলেজ ছেড়ে দিয়েছে নবীনকুমার। ক্লাসে শান্ত হয়ে বসে থাকা কিংবা শিক্ষকদের শাসন মান্য করা তার ধাতে সয় না। সে অতি মেধাবী এবং তার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর। অন্য ছাত্ররা যা সাতদিনে শেখে তা নবীনকুমার একদিনেই রপ্ত করে নেয়, সুতরাং বাকি দিনগুলি যে সে ক্লাসের মধ্যে দুষ্টামী করবে, তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে।

কলেজ ছেড়ে দিয়ে সে বাড়িতে একটি ক্লাব স্থাপন করেছে, তার নাম বিদ্যোৎসাহিনী সভা। বিশিষ্ট জ্ঞানী, গুণী ও চিন্তাবিদরা এখানে এসে দেশ, কাল, সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। কলেজী শিক্ষকদের বাঁধা-ধরা লেকচারের চেয়ে তা অনেক বেশী ভাবগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ। নবীনকুমার নিজেও দু-এক শনিবার কয়েকটি স্বলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করে শ্রোতাদের বিষম চমকে দিয়েছে। চতুর্দশ বর্ষীয় এক কিশোরের মুখ থেকে এমন সুচিন্তিত কথাবার্তা কেউ আগে কখনো শোনেনি। সকলে নবীনকুমারকে ধন্য ধন্য করে, তাতে তার আত্মাভিমানে সুড়সুড়ি লাগে, তার ললাটে গর্বিত আলো ঝলসায়। বিদ্যোৎসাহিনী সভা এখন নবীনকুমারের ধ্যান-জ্ঞান। বৎসরাধিক কাল ধরে সভা নিয়মিত চলছে।

নারীকণ্ঠের সুরেলা গোলমাল শুনে নবীনকুমার বেরিয়ে এলো নিজ কক্ষ থেকে। দুই বৎসর আগে নিরুদ্দিষ্ট গঙ্গানারায়ণকে মৃত বলে ধরে নেওয়ায় তার শয়ন ঘরটিও এখন নবীনকুমার ব্যবহার করে, শব্দ আসছে সেখান থেকে। সেখানে উঁকি দিয়ে নবীনকুমার এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলো।

কৃষ্ণভামিনীর মৃত্যুর দেড় বৎসর পর নবীনকুমার দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেছে। এ সময়ে তার বিবাহে মতি ছিল না, বিদ্যাৎসাহিনী সভা নিয়েই সে মত্ত হয়ে ছিল। কিন্তু বিধুশেখরের প্ররোচনায় জননী বিম্ববতী তাকে নিয়মিত পীড়াপীড়ি করছিলেন, তাই শেষ পর্যন্ত নবীনকুমার বিবাহে সম্মতি দিয়েছে এক সময়। কৃষ্ণভামিণীরই এক সম্পর্কীয়া ভগিনী অপর এক বসু পরিবারের কন্যা সরোজিনী এ বাড়িতে এসেছে নববধূ হয়ে।

প্রথম বিবাহের পর, বালকদশা থেকে সদ্য কৈশোরে উত্তীর্ণ নবীনকুমার যেমন স্ত্রীকে নিয়ে মেতে উঠেছিল, দ্বিতীয় বিবাহের পর সে রকম কিছুই হয়নি। তখন বাড়ির বাইরের জগতের সঙ্গে নবীনকুমারের বিশেষ পরিচয় ছিল না, তাই এক নতুন বালিকাকে সে খেলার সঙ্গিনী পেয়ে খুশী হয়েছিল।

এখন শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গেই নবীনকুমারের পরিচয় হয়েছে, তার বয়স এত কম হলেও আচরণের ভারিক্কীপনায় সে নিজেও একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য। বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিশেষ

সুনাম হয়েছে, দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এ সভার বিবরণ প্রকাশিত হয়।

এখন বাড়ির চেয়ে বাইরের টানই বেশী, তাই দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে নবীনকুমারের ভালো করে পরিচয়ই হয়নি। মাতৃ-সনির্বন্ধে বিবাহ করতে হয়েছে, করেছে, আর যেন তার কোনো দায় নেই। স্ত্রী থাকে অন্দরমহলে। তার মায়ের কাছে। দুপুরে নবীনকুমার যখন খেতে বসে তখন বিম্ববতীর আজ্ঞায় বালিকা সরোজিনী একটি ঝালর বসানো পাখা দিয়ে স্বামীকে হাওয়া দেয়। সেই সময়টিতেই যা নবীনকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তার দ্বিতীয় পত্নীর। কৃষ্ণভামিনীকে নবীনকুমার জোর করে রাত্রে নিজ শয্যাতে নিয়ে শুত, যদিও কোনো প্রকার যৌন চেতনা তার তখন জাগেনি, খেলার সঙ্গিনীকে সে যেন নিদ্রার মধ্যেও ছাড়তে চাইতো না। সরোজিনী সম্পর্কে তার সে আগ্রহ নেই, বিম্ববতীও অল্পবয়েসী বধূকে রাত্রে ছেলের কাছে পাঠান না।

নবীনকুমার দেখলো, পাঁচ-ছটি বালিকাকে নিয়ে সরোজিনী সেই দুপুরে পুতুল খেলায় মেতেছে। সরোজিনী সমেত আর সব কটি বালিকারই বয়েস নয়-দশ বৎসরের মধ্যে, শুধু একজন একটু বড়, সে বোধ হয় দ্বাদশ বর্ষীয়া হবে।

প্রথমেই নবীনকুমারের বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো। তার মনে পড়ে গেল কৃষ্ণভামিনীর কথা। কৃষ্ণভামিনীর মৃত্যুর পর প্রথম কয়েক দিন নবীনকুমার খুব কান্নাকাটি করেছিল, তারপর আর অনেক দিন তার কথা মনেই পড়েনি।

ঠিক যেন একই দৃশ্য। এই বাড়িতে কৃষ্ণভামিনী তার সখীদের সঙ্গে দুপুরবেলা পুতুল খেলতে বসতো। কয়েকবার নবীনকুমারও যোগ দিয়েছে সেই খেলায়। এখনও বালিকারা সেই রকম পুতুল নিয়ে বিয়ে বিয়ে খেলছে। শুধু এর মধ্যে কৃষ্ণভামিনী নামে সেই চঞ্চলা, মুখরা বালিকাটি নেই, সে হারিয়ে গেছে কোন মহাশূন্যে।

নবীনকুমার সে ঘরে প্রবেশ করতেই সব মেয়েরা আড়ষ্ট হয়ে গেল। খেলা বন্ধ করে সবাই এমনভাবে মাটির দিকে মুখ নীচু করে রইলো যেন নবীনকুমার এক মহামান্য গুরুজন, তার সামনে তারা কোনো গুরুতর দোষের কাজ করে ফেলেছে।

পৃথিবীটা সম্পূর্ণভাবে পুরুষের দখলে হলেও সংসারে, অন্দরমহলে নারীদের একটা সাবলীল অধিকারবোধ থাকে।

সরোজিনী তার সখীদের ভয় ভাঙাবার জন্য বলে উঠলো, আমরা পুতুল খেলচিলুম, দরোজা বন্ধ করে দিচ্চি, তাহলে আর গোলমাল হবে না।

নবীনকুমার তাদের অভয় দান করে বললো, না, তোমরা খ্যালো না! আমি দেকতে এলুম।

নবীনকুমারের হঠাৎ ইচ্ছে হলো দু বৎসর আগেকার দিনগুলিতে ফিরে যেতে। ওদের সঙ্গে বসে সেও কি পুতুল খেলতে পারে না? সন্ধ্যাকালে জ্ঞানীগুণীর আসরে যাকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দিতে হবে, তার পক্ষে দুপুরবেলা বালিকাদের সঙ্গে পুতুল খেলা কি দোষের?

যে বালিকাটির বয়েস কিছু বেশী, সে বসে ছিল খানিকটা দূরে একটি মোড়ার ওপর। অন্যরা সবাই গালিচার ওপর অনেকগুলি পুতুল ছড়িয়ে বসেছে। সুন্দর সুন্দর সব কাচকড়ার পুতুল, তাতে আবার উত্তম সিল্কের পোশাক পরানো।

মোড়ার ওপর বসা বালিকাটি সব দিক থেকেই অন্যদের চেয়ে পৃথক, তার গায়ের রঙ গোলাপ বর্ণ, তার চোখের মণি দুটি নীল।

তার দিকে দু-এক পলক তাকিয়ে নবীনকুমারের কেমন যেন চেনা চেনা মনে হলো। কিন্তু আগে কোথায় কখন দেখেছে, ঠিক স্মরণে এলো না। সে মেয়েটি অন্যদের মতন ভয় পায়নি, সরাসরি চোখ ফেলেছে নবীনকুমারের দিকে।

নবীনকুমার সরোজিনীর পাশে বসে পড়ে বললো, আমাকে তোমার খেলায় নেবে? ছেলেমেয়ের বে হয়ে গ্যাচে? আমি ভালো ঘটকালি কত্তে পারি!

সরোজিনী বললো, ওমা, ব্যাটাছেলেরা আবার এ খেলা খেলে নাকি? এ তো আমাদের খেলা। ছেলেমেয়ের বে নয়, আমরা সাবিত্তিরি-সত্যবান খেলচি!

মোড়ার ওপর বসা হলুদ-রেশমী শাড়ি পরা মেয়েটি এবার বললো, ওলো সরোজিনী, তোর বর মেয়েও সাজতে পারে! বল না, এক্ষুনি শাড়ি পরে সাজবে!

নবীনকুমার চমকিত হয়ে মেয়েটির দিকে তাকালো, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল। এই মেয়েটি ছিল কৃষ্ণভামিনীর মিতেনী। এ প্রায়ই কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে পুতুল খেলতে আসতো। একদিন

সত্যিই নবীনকুমার শাড়ি জড়িয়ে নারী সেজে কৌতুক করে ওদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিয়েছিল। কী যেন নাম মেয়েটির!

স্মৃতি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে নবীনকুমারের মনে খানিকটা ক্রোধেরও উদ্রেক হলো। এই মেয়েটির শ্বশুরালয়ে গিয়ে একদিন অপমানিত হতে হয়েছিল নবীনকুমারকে। সে এক হতচ্ছাড়াদের বাড়ি। কেউ কোনো সহবৎ জানে না, এমন কি ভৃত্যগুলো পর্যন্ত অতি বদ। এই মেয়েটি আবার এ বাড়িতে এসেছে কোন্ সুবাদে?

নবীনকুমার তাকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলো, তোমায় তো আগে দেকিচি, তোমার নাম কী য্যানো?

মেয়েটি তার ওষ্ঠে অস্পষ্ট হাসির রেখা এঁকে সামান্য কৌতুক সামান্য বিদ্রূপ মিশিয়ে উত্তর দিল, মনে নেই? এরই মধ্যে ভুলে গ্যাচেন! আমার নাম বনজ্যোৎস্না

অন্য মেয়েরা সকলেই বিস্মিতভাবে তাকালো ঐ মেয়েটির দিকে একজন বললো, ওমা, কুসোমদিদি, তোমার আবার ঐ নাম হলো কবে থেকে?

কৃষ্ণভামিনীর সখী কুসুমকুমারী স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে নবীনকুমারের দিকে। নবীনকুমারের একথাও মনে পড়লো যে কুসুমকুমারীর নাম বনজ্যোৎস্না সে-ই রেখেছিল। এর মধ্যে মেয়েটি বেশ বড় হয়ে গেছে। তবু এই বালিকার প্রতি তার মন প্রসন্ন হলো না।

সরোজিনী ফিক করে হেসে ফেলে বললো, কুসুমদিদি, তুমি কী করে জানলে আমার বর মেয়ে সাজতে পারেন? সত্যি পারেন কিন্তু, আমি নুকিয়ে নুকিয়ে দেকিচি

কুসুমকুমারী বললো, ওমা, সে কী কথা! তোর বর মেয়ে সাজেন, আর তুই নুকিয়ে দেকিস? এমন তো কখুনো শুনিনি।

অন্য বালিকারা একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়লো।

সরোজিনী বললো, হ্যাঁগো, উনি বেনারসী শাড়ি পরেন। মায়ের কাছ থেকে সোনার জরি বসানো একটা লাল বেনারসী চেয়ে নিয়েচেন।

অন্য বালিকারা তেমনি হাসতেই লাগলো, আর কুসুমকুমারী হাসি চেপে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ গো মিতেনীর বড় বর, এ সব কী শুনচি? আপনি রোজ লাল বেনারসী পরেন?

কয়েকটি নারী, হোক তারা বালিকা, যদি একজন পুরুষকে ঘিরে ধরে কৌতুক করতে শুরু করে তখন সেই পুরুষের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়। বহু যুদ্ধে জয়ী বীর পুরুষরাও এ রকম অবস্থায় কাবু হয়ে পড়েন।

নবীনকুমার আফসোস করতে লাগলো, কেন সে এ ঘরে এই সময় এলো। যদি বা এলো, কেনই বা এদের সঙ্গে পুতুল খেলায় যোগ দিতে চাইলো। তার একবার ইচ্ছে হলো, লাথি মেরে সব পুতুলগুলে তছনছ করে দেয়। কিন্তু এই দুষ্ট মেয়েগুলো বুঝি তাতেও হাসবে।

সে রোষকশায়িত নেত্রে নিজের স্ত্রী সরোজিনীর দিকে চাইলো। কিন্তু সরোজিনীর এদিকে দৃষ্টিই নেই। ঐ ছোট্ট লাজুক মেয়েটি যে এত কথা বলতে পারে, তাও তো নবীনকুমারের জানা ছিল না।

সরোজিনী বললো, আমাদের বাড়িতে যে থ্যাটার হবে গো। রোজ মওলা হয়। আমি অমনি চুপটি করে দরজার ফাঁক দিয়ে দেকিচি। মা বারণ করিচিলেন, তবু আমি নুকিয়ে নুকিয়ে দেক্‌তে আসি।

একটি মেয়ে সরলভাবে জিজ্ঞেস করলে, থ্যাটার কী ভাই?

সরোজিনী বললো, ঐ যে রামলীলে, কেষ্টযাত্রা হয়, সেই রকম। তবে পান্তির মাঠ কিংবা ধোপার মাঠে হবে না, আমাদের ঠাকুর দালানে হবে। ম্যারোপ বাঁধা হবে!

কুসুমকুমারী বললে, সাহেবদের যাত্রাকে বলে থিয়েটার! আপনারা বুঝি ইংরিজি যাত্রাপালা করবেন?

নবীনকুমার এবার এই সব অবোধ, অশিক্ষিতা বালিকাদের জ্ঞান দান করার জন্য কণ্ঠস্বর গাঢ় করে বললো, শুধু সাহেবরা কেন, আগেকার কালে আমাদের রাজা-মহারাজাদের আমলেও নাটকের অভিনয় হতো। সংস্কৃত নাটক। আমরা সেই রকম নাটকের অভিনয় কচ্চি, তবে বাংলায়। সাহেব-সুবোরাও দেকতে আসবে।

—পালার নাম কী?

—বেণী সংহার।

—আপনি সে পালায় কী সাজবেন?

এবার নবীনকুমারের বদলে সরোজিনীই বলে দিল, উনি সাজবেন রাজকুমারী ভানুমতী। তাই তো অমন দামী বেনারসী পরে···

কুসুমকুমারী বললো, সরোজ, তোর বরকে রাজকুমারী সাজলে বেশ ভালোই মানাবে! তা সে নাটক দেকা তো আমাদের কপালে জুটবে না। পুরুষ মানুষরাই দেকবে!

সরোজিনী বললো, না গো দিদি, চিকের আড়ালে বসবে মেয়েরা। মা বলেচেন, আমরা সবাই দেকবো। তোমায় গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে আসবো।

সে কথায় খুব একটা মূল্য না দিয়ে কুসুমকুমারী বললো, দূর, আমার ভাগ্যে ও হবে না।

নবীনকুমার উঠে ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্য উদ্যত হলে কুসুমকুমারী তাকে ডেকে বললো, ও মিতেনীর বর, শুনুন। আপনি ভাবলেন তো, আমি আবার কী করে এলুম? কেউ ডাকেনি। হ্যাংলার মতন এয়েচি! আপনি আমার মিতেনীর খুড়তুতো বোন সরোজকে বিবাহ করেচেন। আমার বোনেরা আবার এই সরোজের মিতেনী। ওরা আসতে চাইলো, তাই আমি নিয়ে এলাম সঙ্গে করে। আপনি তো আমাদের খোঁজ খবর ন্যাননি।

নবীনকুমারের মুখে উত্তর এসে গিয়েছিল যে তোমার লক্ষ্মীছাড়া শ্বশুবাড়িতে কে তোমার খোঁজ নেবে? মাতাল লম্পটদের আখড়া একটা। কৃষ্ণভামিনী বেঁচে থাকলেও নবীনকুমার আর কক্ষনো তাকে ও বাড়িতে যেতে দিত না।

কিন্তু নবীনকুমার চুপ করে রইলো।

কুসুমকুমারী বললো, আমার মেয়ের সঙ্গে আপনাদের ছেলের বে হয়েছিল, মনে আচে? তা মেয়ে-জামাইকে তো আমার বাড়িতেই ফেলে রাকলেন, আনবার আর নামটিও করেন না, আমার মিতেনীও চলে গেল।

নবীনকুমার শুষ্কভাবে বললো, আর কী হবে!

কুসুমকুমারী বললো, কেন, এখুন সরোজ এয়েচে, ওর কাচেই পাঠিয়ে দেবো মেয়ে-জামাইকে। আমার মেয়ে এখেনেই সুখে থাকবে। আমিও আর পুতুল খেলি না।

নবীনকুমার কিছু বললো না।

কুসুমকুমারী বললো, আর একটা কতা বলবো? আপনি নাটুকে পালায় রাজকুমারী সাজবেন, আপনাকে মানাবে ভালো কিন্তু দেকবেন, হাঁটার সময় যেন খেয়াল থাকে।

নবীনকুমার ঠিক বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে গেল। হাঁটার সময় কী খেয়াল থাকবে?

তার বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে কুসুমকুমারী বললো, আমাদের বাড়ির পাশে প্রায়ই কেষ্টযাত্রা হয়। একবার বিদ্যেসুন্দর পালাও হয়েছেল। একটা পানওয়ালা ছোঁড়া রাধা সাজে, আবার বিদ্যেসুন্দরে সে-ই বিদ্যে, কী সুন্দর মানায় তাকে, মাতায় ঘোমটা দিয়ে নাকের নোলক নেড়ে সে যখন গান গায়, তখন কে বলবে যে সে মেয়ে নয়কো, ছেলে। কিন্তু যেই হাঁটে, অমনি কেমন যেন বুক ফুলিয়ে গ্যাট ম্যাট করে, হি-হি-হি, তাই আপনাকেও বলে দিচ্চি···।

নবনীকুমার গম্ভীর।

—আপনি রাগ করলেন? আপনি আমার মিতেনীর বর, আপনার সঙ্গে একটু রঙ্গ করেও কতা বলতে পারবো না?

—মেয়েরা কেমন করে হাঁটে, একটু দেকিয়ে দাও তো!

—সরোজিনীর কাছ থেকে জেনে নেবেন।

—ও তো ছোট, তুমি দেকিয়ে দাও।

—এই মরেচে, বলে বিপদ হলো দেকচি। না, না, আমি পারবো না।

নবীনকুমার খপ করে তার হাতটা চেপে ধরে বললো, পারবে না মানে? পারতেই হবে।

কুসুমকুমারী বললো, ওমা, এ কি লোক গো: আমায় নিয়ে জোর করে হাঁটাবেন আপনি! রক্ষে করো।

নবীনকুমার বললো, আর ছাড়চি না। মেয়েরা কেমন আলাদা হাঁটে দেকি!

—জোর করে হাঁটালে বুজি কোনো লাভ হবে? রাজকুমারী ভানুমতীকে কি কেউ জোর করে হাঁটাবে?

সরোজিনী উঠে এসে স্বামীকে বললো, আপনি কুসুমদিদিকে ধরে রেকেচেন কেন? ছেড়ে দিন।

নবীনকুমার বললো, এই মেয়েটিকে আগে দেকিচি, মুখ দিয়ে কথাই ফুটতো না। এখুন দিব্যি

টরটরিয়ে কতা বলে। কেষ্টযাত্রায় কোন্ পানওলা রাধা সাজে, তার সঙ্গে আমার তুলনা!

কুসুমকুমারী অমনি বললো, যদি কিছু অপরাধ করে থাকি, যদি আকতা-কুকতা বলে থাকি, মাপ করবেন। আর কখুনো বলবো না, আর কোনোদিন আসবো না।

নবীনকুমার ধমক দিয়ে বললো, হ্যাঁ, আসতে হবে। আমি নেমন্তন্নর কার্ড পাঠাবো, তোমার স্বামীকে নিয়ে আমাদের প্লে দেকতে আসবে।

—না, নেমুন্তন্ন পাঠাবার দরকার নেই। আমাদের আসা হবে না। আমার বর কোথাও যান না।

—কেন, কোথাও যান না কেন? তিনি কী এমন নবাবপুত্তুর? তোমাদের বাড়ি আমি যেদিন গেস্লাম, সেদিনও তিনি আমার সঙ্গে দেকা করেননি।

—তিনি কারুর সঙ্গে দেকা করেন না। তাঁর সঙ্গেই অন্যদের দেকা করতে হয়।

—ও, তাই? তোমার পতি দেবতাটি দেকচি সত্যিই দেবতা।

গভীর সমুদ্রের নির্মল নীল জলের মতন দুটি চক্ষুতারকা নবীনকুমারের দু চোখের ওপর ন্যস্ত করে কুসুমকুমারী বললো, ফের একদিন আসুন না আমাদের বাড়িতে, তাঁকে দেকে যাবেন। তাঁকে লোহার শিকলি দিয়ে বেঁধে রাকতে হয় তো, সেইজন্য তিনি কোতাও যেতে পারেন না।

একটু থেমে নিষ্কম্প অম্লান কণ্ঠে কুসুমকুমারী আবার বললো, তিনি এখন বদ্ধ উন্মাদ, কেউ কাচে গেলে মারেন।

নবীনকুমার থমকে গেল। এমন কিছু শুনতে হবে সে আশা করেনি। এই রকম একটা ফুটফুটে বালিকার স্বামী উন্মাদ! সে রোগের যে চিকিৎসা নেই। হ্যাঁ, এরকম একটা কথা নবীনকুমার আগেও শুনেছিল বটে।

কিছু তো একটা বলতে হবে, তাই অন্য কিছু আর খুঁজে না পেয়ে নবীনকুমার বললো, আহা, তোমার তো খুব দুঃখ!

—বলতে পারেন, জগতে সুখী কে?

সেদিন বিদ্যোৎসাহিনী সভায় নবীনকুমার বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগলো। এই সভায় তার অনেক দায়িত্ব। সে সম্পাদক, উদ্বোধনী ভাষণ তাকেই দিতে হয়, সেদিনকার বক্তার পরিচয় এবং বক্তৃতার বিষয়ের সারমর্ম ঘোষণা করাও তার দায়িত্ব। প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ সিকদার প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিরা যেমন এই সভায় আসেন তেমনি আসে কৃষ্ণকমল ভটচায, হরীশ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল ইত্যাদি প্রকৃত উৎসাহী নব্য যুবকেরা। ইংরেজ পণ্ডিত ও শিক্ষকরাও আসেন। সভায় উপস্থিত অভ্যাগতবৃন্দের জন্য ভূরিভোজেরও ব্যবস্থা থাকে, সে দায়িত্ব দুলালের ওপর, নবীনকুমারকেও সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হয়।

তবু আজ নবীনকুমারের মন ক্ষণে ক্ষণে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। চোখের সামনে ভেসে উঠছে কুসুমকুমারীর মুখ। এক সময় নবীনকুমার কিছু না ভেবেই মেয়েটির একটি নাম দিয়েছিল বনজ্যোৎস্না। তখন নবীনকুমার ধারাবাহিকভাবে কালিদাসের নাটক ও কাব্যগুলি পাঠ করছিল, শকুন্তলা নাট্যের ঐ নামটি তার বড় পছন্দ হয়েছিল। কুসুমকুমারীর নীল রঙের চোখের দৃষ্টিতে সত্যিই যেন অরণ্য-জ্যোৎস্নার আভা আছে।

ঐটুকু মেয়ে কেমন শান্ত নিরুত্তাপভাবে বললো, বলতে পারেন, জগতে সুখী কে? এই বয়সেই কুসুমকুমারী দুঃখকে চিনেছে। তার স্বামী বদ্ধ উন্মাদ, তার সামনে পড়ে আছে অনন্ত দুঃখময় জীবন।

সেদিন সভায় কার্ক প্যাট্রিক সাহেব সমাজনীতি ও বিবেকের যুক্তি এই শিরোনামায় একটি ইংরেজি সন্দর্ভ পাঠ করলেন। সেটি নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনার পর প্রিয়মাধব বসু নামে আর একজন ঈশ্বরচন্দ্র বিধবাদের বিবাহ প্রচলনের উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন করছেন, তার সমর্থনে বাংলায় বক্তৃতা করতে লাগলেন। নবীনকুমার আজ কথাবার্তাও বিশেষ বলছে না। শেষোক্ত আলোচনা শুনতে শুনতে তার মনে হলো, বিধবাদের পুনর্বিবাহ তো চালু হওয়া উচিত বটেই, কিন্তু কুসুমকুমারীর কী হবে? বদ্ধ উন্মাদরা আর সুস্থ হয় না কোনো ব্যক্তির স্ত্রী যদি বদ্ধ উন্মাদিনী হয়, সে ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে আর একটি বিবাহ করতে পারে। তাহলে কুসুমকুমারী পারবে না কেন!

নবীনকুমার নিজে এক সময় সচেতন হলো। এ সব কী উৎকট চিন্তা তার মাথায় ঢুকছে।

বিদ্যাসাগর পণ্ডিত বিধবাদের মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করতে চাইছেন বলে কি দেশটা একেবারে বিলাত হয়ে যাবে নাকি! উন্মাদ হোক আর কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হোক, হিন্দু নারীর স্বামীই একমাত্র অবলম্বন। পরাশরের নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ইত্যাদি শ্লোকের মধ্যে উন্মাদ বিষয়ে কিছু নেই। কুসুমকুমারীকে সারাজীবন ঐ উন্মাদ স্বামীর সঙ্গেই থাকতে হবে। তবু তার ঐ কথাটা কানে বাজে, বলতে পারেন, জগতে সুখী কে?

সভা যখন শেষ হয়ে এসেছে, সেই সময় নবীনকুমার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মান্যবরগণ, আমি একটি নিবেদন রাখিতে চাই।

সকলে উৎকর্ণ হলো। নবীনকুমারের প্রস্তাবটি এই যে, বাংলাভাষার উন্নতিকল্পে বিদ্যাৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে জনসাধারণের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? কোন একটি বিষয় ঘোষণা করে দেওয়া হবে। সেই বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে পুরস্কার দেওয়া হবে কিছু টাকা। এর ফলে শিক্ষিত লোকে বাংলাভাষায় লিখতে আগ্রহী হবে।

সকলেই এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

নবীনকুমার জানালো যে তবে আজই একটি প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হোক। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে সে নিজে দুই শত টাকা পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয়টি কী হবে?

এক মুহূর্তও চিন্তা না করে নবীনকুমার বললো, বিষয়টি হোক, এ জগতে সুখী কে?

সভার শেষ প্রান্ত থেকে দীর্ঘকায়, খড়্গনাশা এক প্রৌঢ় উঠে দাঁড়িয়ে বললো, সাধু! সাধু! এ অতি উত্তম প্রস্তাব। আর বিষয়টিও বড় উপযুক্ত। এ জগতে সুখী কে? এ বড় গূঢ় কতা।

এই ব্যক্তিটি রাইমোহন। তার চেহারা ও বেশবাসের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন আর সে কুঁচোনো ধুতির কোঁচার ডগার মুখটি হাতে ধরে থাকে না, গায়ে দেয় না এণ্ডির বেনিয়ান, চোখে নেই সুর্মা, হাতে নেই গোড়ের মালা। তাকে দেখলে আর সেই আগেকার বেশ্যাবাড়ির নিশাচর বলে চেনা যায় না। তার চেহারা ও পোশাক এখন বিদ্বজ্জন সমাগমে যোগ দেবার উপযুক্ত, মাথার বাবরি চুল ছেঁটে তেল চুকচুক করে আঁচড়ানো, কাঁধে চাদর।

গুরুগম্ভীর বক্তৃতা শোনার জন্য রাইমোহন এখন নিয়মিত এসে বসে থাকে। তাছাড়া সে এখানে তার উপস্থিতির কিছুটা গুরুত্বও আদায় করে নিয়েছে। বিদ্যোৎসাহী সমিতি থেকে যে নাটক অভিনয়ের মহলা চলছে, সেই বেণীসংহার নাটকে কয়েকটি গীত সংযোজন করার কথা উঠেছিল। রাইমোহনই সেজন্য তিনটি গান রচনা করে সুরও দিয়েছে। সে গান প্রশংসা পেয়েছে সকলের।

রাইমোহন এগিয়ে এসে নবীনকুমারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, বড় উত্তম প্রস্তাব দিয়েছেন আপনি! আপনার দ্বারা এ দেশের মহদোপকার হবে। দুশো টাকা পুরস্কার! এ আপনার স্বর্গত পিতার উপযুক্ত পুত্রের মতনই হয়েচে বটে! সাধু সাধু!

সোহাগবালার ব্যাধিটি বড় বিচিত্র। মানুষের স্থূলত্বেরও তো একটা সীমা আছে, কিন্তু সোহাগবালার ক্ষেত্রে সব কিছুই সীমা ছাড়িয়ে গেল। প্রত্যেকদিনই সে বেশী মোটা হচ্ছে। যৌবনে সোহাগবালা অসুন্দরী ছিল না, বরং ফর্সা, চোখ, নাক, ঠোঁট সবই গোল গোল, কিন্তু তার স্বামীর প্রতিপত্তি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন তার শরীর স্থূল হতে লাগলো। একটা বয়েসের পর মানুষ আর দৈর্ঘ্যে বাড়ে না, কিন্তু সোহাগবালার প্রস্থ বাড়তে লাগলো অস্বাভাবিকভাবে। তার এক একখানি হাতই যেন একজন মানুষের শরীরের সমান, বক্ষের ওপর দুটি দোদুল্যমান অলাবু। তার পা দেখে এক সময় মনে হতো ভীমের গদা, এখন মনে হয়, ভীমও বুঝি এত বড় গদা তুলতে পারতেন না। মোটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশী ফর্সাও হচ্ছে সে, রং একেবারে ফেটে পড়ছে।

দু'খানি শাড়ি একসঙ্গে জোড়া দিয়েও তার শরীরের ঘের পায় না। তার নিতম্ব এতই বড় যে হস্তিনী

বললেও কম বলা হয়। শরীরে বস্ত্রও সে রাখতে পারে না, সব সময় তার অসম্ভব গরম বোধ হয়, এক এক সময় জ্বলে গেল, অঙ্গ জ্বলে গেল গো, বলে চেঁচায়। দিবাকর তার স্ত্রীর চিকিৎসার কম চেষ্টা করেনি, কিন্তু ডাক্তার বদ্যি কেউ তার রোগ ধরতে পারলে না। নিরাময় করা তো দূরস্থান।

কিছুদিন আগেও সোহাগবালাকে দুজন দাসী দু'দিক থেকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে দরদালানে একটি জলচৌকির ওপর বসিয়ে দিত। সেখানে বসে বসে সোহাগবালা চালাতো তার রাজ্যপাট, এ গৃহের সব দাস-দাসীই তার অধীনে। ঘি-তেল, চাল-ডাল থেকে শুরু করে মাছের মুড়োর হিসেব পর্যন্ত তার নখদর্পণে।

তারপর এক সময় সোহাগবালার চলৎশক্তিও নষ্ট হয়ে গেল। তার উরুদ্বয়ের মধ্যে আর ব্যবধান রইলো না, হাঁটতে গেলেই উরুতে উরুতে ঘর্ষণ হয়, চামড়া ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে যায় পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত সোহাগবালাকে স্থায়ীভাবে শয্যা নিতে হলো। পালঙ্কের ওপর শুয়ে থাকে যেন একটি জীবন্ত মাংসের পাহাড়

সব দাস-দাসীরাই পালা করে সোহাগবালার সেবা করে, তাদের মধ্যে থাকোমণির স্থান একটু বিশেষ ধরনের। থাকোমণি আসে রাত্রে এবং তাকে সেবা করতে হয় সোহাগবালা আর দিবাকর, দু'জনকেই।

দিবাকরের বয়েস এখন ষাট পেরিয়ে গেছে তবু তার শরীরের ক্ষুধা একটুও মরেনি। চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়ে সোহাগবালা এখন যেন শিশুর মতন অবুঝ হয়ে গেছে। দিবাকরকে সে সব সময় চোখে চোখে রাখতে চায়। তাই এখন আর চক্ষুলজ্জার বালাই নেই, ঐ এক পালঙ্কেই দিবাকর আর সোহাগবালার মাঝখানে থাকোমণিকে মাঝে মাঝে শুতে হয়। দিবাকর যখন থাকোমণিকে সবলে আঁকড়ে ধরে তখন সোহাগবালা তার বিরাট চক্ষু দুটি মেলে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকে। থাকোমণি যথোচিতভাবে দিবাকরের সেবা করার পর উঠে যাবার সময় সোহাগবালা তাকে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ লা, ঠিক মতোন যত্ন করিচিস তো ? আগে চান করে এয়েচিস ? গায়ে পা-টা ঠেকে গ্যাচে, নে, বাবুর পায়ের ধুলো নে, তারপর যা, আবার চান করে আয়।

তারপর সে ব্যাকুলভাবে স্বামীকে প্রশ্ন করে, হ্যাঁগা, তোমার শরীল গতিক ভালো আচে ? মাতার ধাতু ঠাণ্ডা হয়েচে ? তোমার সুক হয়েচে, বলো না ? তোমার সুকের জন্য তুমি যা চাও···আহা, সিঁথের সিঁদুর নিয়ে যেন আমি যেতে পারি, তোমার মতন পতি পেয়িচি, আমার কতবড় ভাগ্যি···

বলতে বলতেই সোহাগবালা কাঁদতে শুরু করে।

সোহাগবালার মৃত্যুর পর চারজনে তার খাট বয়ে নিয়ে যেতে পারলো না, বড় খাট বানিয়ে তার তলার দিকে বাঁশ বেঁধে দশজন শববাহককে কাঁধ দিতে হলো। বড় সুখের ভাগ্য নিয়েই মরলো সোহাগবালা, তার মুমূর্ষুদশার খবর পেয়ে এ বাড়ির কর্ত্রী স্বয়ং বিম্ববতী এসেছিলেন তাকে দেখতে। গত আট-দশ বছরের মধ্যে ওপরতলার বাবুদের কেউ ভৃত্য মহলে আসেননি। বিম্ববতী তার ঠোঁটে কয়েক ফোঁটা গঙ্গাজল দিয়ে বলেছিলেন, আহা সতী লক্ষ্মী, ও ঠিক স্বগ্যে যাবে !

তিনি নিজের একটি বহুমূল্য গরদের শাড়ি দিলেন মৃতদেহ ঢেকে নিয়ে যাবার জন্য।

সোহাগবালার মৃত্যুর পর দরদালানের শূন্য চৌকিতে থাকোমণি বসতে লাগলো। এ ব্যাপারে কেউ কোনো প্রশ্ন পর্যন্ত তুললো না। সোহাগবালার স্থান যে থাকোমণি গ্রহণ করবে, এ যেন স্বতঃসিদ্ধ। থাকোমণি শুধু যে দিবাকরের নেকনজরে আছে, তাই তো নয়, তার ছেলে দুলালচন্দ্র এ বাড়ির ছোটবাবুর পেয়ারের ভৃত্য। না, ভৃত্য বলা ভুল হলো, দুলালচন্দ্রের স্থান ভৃত্যের চেয়ে কিছুটা উঁচুতে, সে ছোটবাবুর সর্বক্ষণের সঙ্গী। সে কিছুটা লেখাপড়াও জানে এবং সে ভৃত্য মহলে থাকে না।

থাকোমণির যৌবনও এখন পশ্চিমগগনে হেলতে শুরু করেছে, শরীর কিছুটা ভার-ভাত্তিক হয়েছে। কোন্ শেকর-বাকড় বেটে খেলে গর্ভনাশ হয় কিংবা কোনো মূর্খ দাসী পাঁচ মাসের পোয়াতী হয়ে গেলে কোন্ দেয়াসিনীর কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য ওষুধ আনাতে হয়, তাও সে সব জানে। কোনো অল্প বয়সিনী সোমত্থ দাসী কাজে ভর্তি হলে তাকেও সে দু-একবার দিবাকরের কাছে পাঠায়। সেবার জন্য।

তিন বৎসর আগে থাকোমণি দুলালচন্দ্রের বিবাহ দিয়েছে। কিন্তু ছেলে-বউ নিয়ে ঘর করার সুখ তার কপালে নেই। ইদানীং দুলালচন্দ্র তার মাকে আর গ্রাহ্য করে না। মায়ের দিকে সে ঘৃণার চক্ষে তাকায় এবং তার মা যে একজন সামান্য দাসী, এই পরিচয় দিতে সে লজ্জা পায়। নবীনকুমারকে যখন একজন সাহেব শিক্ষক পড়াতো, তখন সাহেবকে যাতে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে না হয় সেইজন্য বাগানে একটি পাকা, সুদৃশ্য পড়ার ঘর নির্মিত হয়েছিল। সেই ঘরটি এখন দুলালচন্দ্রকে দেওয়া হয়েছে, সেখানে সে সস্ত্রীক থাকে। আর দুলালচন্দ্রের বউটিও বড় আদুরী, শাশুড়ির যত্ন করার কথা সে

একবার মনেও ভাবে না, সব সময় সেজেগুজে পটের বিবিটি হয়ে বাগানে নেচে বেড়ায়। সম্প্রতি তার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে।

থাকোমণি ছেলের ব্যবহারে আঘাত পায়, কখনো একলা থাকলে সে আপন মনে গজগজ করে। অবজ্ঞায় ওষ্ঠ উল্টে সে বাতাসকে শুনিয়ে বলে, ছেলে আমায় না দেকলে তো বয়েই গেল ! ও ছেলে আমায় খাওয়াবে, না পরাবে ? ভারী আমি তার তোয়াক্কা করি ! আমার নিজের পায়ে ডাঁড়াবার ক্ষ্যামতা আছে, আমি কারুর হাত তোলা নই ! কতায় বলে, 'কড়ি ফট্‌কা চিঁড়ে দই, বন্ধু নহি কড়ি বই, কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মেলে।'

তা হাতে এখন বেশ কিছু টাকা কড়ি জমেছে থাকোমণির। মাস মাইনে তিন টাকা থেকে ছ' টাকায় উঠেছে, সে টাকার তো এক পাইও খরচা হয় না। তাছাড়া, সোহাগবালার স্থান গ্রহণ করায় এখন উপ্‌রি রোজগারও যথেষ্ট। না চাইলেও অনেকে তাকে দস্তুরি দেয়। যে-রাখালটা দুধ দেয়, সে কিছুটা দুধ গোপনে বাইরে বিক্রি করে, তার কিছুটা হিস্যা সে থাকোমণিকে দিয়ে যায়। নকুড় বাজার সরকার, সে প্রতিদিন থাকোমণিকে দেয় এক সিকি। এমনকি দুটি জুড়ি গাড়ির চারটি ঘোড়ার ছোলা-দানাও যায় এখানকার ভাঁড়ার থেকে। সহিসরা সেই ছোলা-দানাও কিছুটা বাইরে বিক্রি করে এবং তারও কিছুটা ভাগ স্বেচ্ছায় তারা দেয় থাকোমণিকে। ঘি, তেল, মশলা সবই ফেরিওয়ালারা দিয়ে যায় বাড়িতে, আগে ওদের কাছ থেকে বখরা আদায় করতো দিবাকর। আজকাল আর সে এই সব ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে না, ওসবও এখন থাকোমণির ভাগে।

নকুড় ছিল বেশ কিছুদিন থাকোমণির আরেক নাগর। কিন্তু সে লোকটি এমনই অলপ্পেয়ে যে মিছে কথা বলায় তার জুড়ি নেই। নকুড়ের দেশ-ঘরে বিয়ে করা বউ ও ছেলে-মেয়ে আছে। মাঝে মাঝে সে ছুটি নিয়ে সেখানে যায়। এবার সে ঘুরে এসে বলেছিল, তার বউয়ের ক্ষয়কাশ হয়েছে, আর বেশীদিন আয়ু নেই। সেই বউটা মরলে নকুড় থাকোমণিকেই বউ সাজিয়ে তার দেশের বাড়িতে রেখে আসবে। সেখানে নকুড়ের বড় সংসার, দেখাশুনোর জন্য থাকোমণির মতন একজন মানুষ চাই, নকুড় তো আর এখানকার এত রোজগার ছেড়ে সারা বছর দেশে পড়ে থাকতে পারবে না।

তা সে বউটাও মরলো, নকুড়ও সব কিছু ভুলে গিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলো। এখন সে দিবাকরের আরেক উচ্ছিষ্ট কচি বয়েসের দাসীকে নিয়ে মেতে আছে। তা থাক, তাতে থাকোমণির এখন আর কিছু যায় আসে না। তার যৌবন চলে যেতে বসেছে, এখন পুরুষ মানুষরা তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেবেই, এটা সে জেনে গেছে। তবে নকুড় যদি তাকে দু-একদিন সিকি দিতে ভুলে যায়, অমনি সে ক্যাঁক করে চেপে ধরে।

গলা খরখরিয়ে সে বলে, অ্যাই নোকড়ো, আজ কত মাছ এনিচিস দেকি ? এই তোর দশ সের ? কাকে বুজোচ্চিস, আমি কানা ? দেকি, পাল্লায় চাপা, পাল্লায় চাপা হারামজাদা মিন্সে। কতায় বলে, অতি বাড় বেড়োনাকো ঝড়ে পড়ে যাবে, অতি ঝাড় হয়ো নাকো ছাগলে মুড়োবে ! বেশী নোলা হয়েচে, তাই না ?

সোহাগবালার কাছ থেকে অবিকল এই সব কথাগুলি মুখস্থ করে রেখেছে থাকোমণি, যথাস্থানে ব্যবহার করে।

এই সব কথাতেও কাজ না হলে থাকোমণি চোখ রাঙিয়ে বলে, দ্যাক্ নোকড়ো, ফের যদি আমার সঙ্গে ফেরেববাজি কত্তে আসবি তো ছোটবাবুর কানে কতা তুলে দোবো !

চোখ রাঙিয়ে পীরিত আদায় করা যায় না, কিন্তু চুরির ভাগ আদায় করা যায়।

তাছাড়া, থাকোমণির হাতে আছে এই তুরুপের তাশ। সকলে জানে যে থাকোমণি ইচ্ছে করলেই দিবাকরকে এড়িয়ে তার পুত্র মারফত এ বাড়ির ছোট কর্তার কাছে নালিশ জানাতে পারে। আর ছোট কর্তা তো দুলালের কথায় ওঠেন বসেন। আর কিছুদিনের মধ্যে দুলালই যে দিবাকরের জায়গা দখল করে নেবে, তাতে কারুর কোনো সন্দেহ নেই। থাকোমণির ছেলে তার মাকে ভক্তি ছেদ্দা করে কি না, সে খবর তো সবাই রাখে না।

স্বগ্রামে দিবাকরের বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে। এতকাল সিংহবাড়িতে গোমস্তাগিরি করে সেই টাকায় সে নিজে বাড়ি বানিয়েছে, জমি কিনেছে, পুকুর কাটিয়েছে, মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে। এখন চাকরি গেলেও তার কিছু যায় আসে না, কলকাতা ছেড়ে নিজের বাড়িতে গিয়ে বুড়ো বয়েসটায় বহাল তবিয়তে পায়ের ওপর পা তুলে থাকবে। দিবাকর চাঁছাছোলা ধরনের মানুষ। থাকোমণিকে সে কখনো কোনো মিথ্যে আশ্বাস দেয়নি, এমন কি শয্যাসঙ্গিনীকে সে কখনো কোনো নরম আদরের বাক্যও বলে

না। থাকোমণি তার সেবাদাসী, ব্যস, সেইটুকুই তার পরিচয়। যখন দিবাকরের কোনো প্রয়োজন থাকবে না, তখন থাকোমণির আর কোনো স্থান নেই তার জীবনে। থাকোমণি একদিন মাত্র ভীরু কণ্ঠে দাবি জানিয়েছিল যে দিবাকর যখন দেশের বাড়িতে যায়, তখন একবার কি সে থাকোমণিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে না? এর উত্তরে সে প্রচণ্ড দাবড়ি খেয়েছিল দিবাকরের কাছ থেকে।

থাকোমণির টাকা-কড়ি সব তার বিছানার নীচে। মাঝে মাঝে সে রাত্তিরবেলা পিদিম জ্বেলে গুনতে বসে। বারবার গুনেও আশ মেটে না। এক সময় সে গুনতেই জানতো না, স্বামী ও পুত্র-কন্যার হাত ধরে যখন সে এই শহরে আসে তখন দুই আর দুইয়ে কত হয়, সে ধারণাও ছিল না তার। সে সব কতকাল আগেকার কথা। সে সব দিনের কথা আর থাকোমণির মনেই পড়ে না প্রায়, কেমন যেন আবছা স্বপ্নের মতন। দু'পাশে দুটি তাল গাছের মাঝখানে ছিল তাদের মাটি লেপা, খড়ের চালে ছাওয়া বাড়ি, একদিন জমিদারের নায়েব এসে সে বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। স্বপ্নের মধ্যে সেই আগুনও এখন নিবে গেছে।

এখন থাকোমণি গোনাগুনতিতে চৌকোশ। গোনে আর ভাবে, এত টাকা! এই টাকা তাকে যক্ষের মতন আগলাতে হবে।

টাকার ওপর শুয়ে শুয়ে থাকোমণি আজকাল একটি নতুন স্বপ্ন দেখে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় দিবাকর যেখানে বাড়ি বানিয়েছে, পুকুর কেটেছে, ঠিক সেই গ্রামে কিংবা তার পাশের গ্রামে থাকোমণিও একটা বাড়ি বানাতে পারে না? বাড়ি, পুকুর, চাষের জমি··· ! যদিও এখনো পুরোপুরি দেয়নি, কিন্তু থাকোমণি জানে, আর কিছুদিন পর দিবাকর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। সে নিজে থেকে গায়ে-পড়া হতে গেলেও সে তাকে ছুঁতে চাইবে না। এ বাড়ির বয়স্কা দাসীদের কী অবস্থা হয় তা তো এই ক'বছরে থাকোমণি কম দেখেনি। গতরের জোর কমে গেলেই যেন একটা যাই যাই রব উঠে যায়। আর সকলে নানা ছুতোয় গলাধাক্কা দিতে শুরু করে, অন্যে জিনিস ভাঙলেও দোষ হয় তার। অন্য কেউ চুরি করলেও তাকেই চোর অপবাদ নিতে হয়। তারপর একদিন কাঁদতে কাঁদতে বিদায় গ্রহণ। বাড়ির কর্তাদের কাছে করুণা ভিক্ষা করেও কোনো লাভ নেই, তাদের কাছে পৌঁছোনোই যায় না, তা ছাড়া দাস-দাসীদের নিয়োগ বা বিতাড়নের ভার সম্পূর্ণত দিবাকরের ওপর। কর্তারা এ নিয়ে মাথা ঘামান না, কেউ কখনো কিছু বলতে গেলে বিরক্ত হন। ঠিক মতন কাজ না পেলে কর্তারা দিবাকরের কাছেই জবাবদিহি চাইবেন।

অনেক বৃদ্ধা দাসীকে ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি নিয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় চলে যেতে দেখেছে থাকোমণি। কোথায় যায় তারা? গো-ভাগাড়ের মতন কোথাও কি মানুষ-ভাগাড় আছে!

থাকোমণি নিঃসম্বল নয়, তার যথেষ্ট টাকা আছে, কিন্তু একলা মেয়েমানুষ হয়ে সে এই টাকা নিয়েই বা কী করবে? একটু হাত-আলগা দিলেই লুটেপুটে খাবে পাঁচ ভূতে। কিছুদিন আগেও তার সব সাধ-আহ্লাদ ছিল ছেলেকে ঘিরে। সেই ছেলে এখন পর হয়ে গেছে, সে এখন কত ব্যস্ত। তবু তন্দ্রার মধ্যে থকোমণি মনশ্চক্ষে সেই অদেখা জায়গার অনির্মিত নতুন বাড়িটির ছবি তৈরি করে নেয়। নিকোনো অঙ্গন ছোট বাড়ি, বাতাবি লেবুর গাছ, সেখানে ছোট বয়েসী দুলাল ধুলো মেখে খেলা করছে···

গঙ্গানারায়ণ নিরুদ্দিষ্ট হবার পর বেশ কিছুদিন এ গৃহ নিঝুম হয়ে ছিল। এখন আবার সরগরম। নবীনকুমারের দ্বিতীয় বিবাহের পর তার পত্নীর পিত্রালয়ের লোকজন সর্বক্ষণ আসে। তা ছাড়া প্রতি শনিবার অপরাহ্নে বিদ্বজ্জন সমাগম হয়। সিংহ সদনের সামনে সার বেঁধে দাঁড়ায় জুড়িগাড়ি, হুম হাম করে পালকি বেহারারা অনবরত এসে পালকি নামায়। মজলিশ কক্ষ গমগম করে। দেশোন্নতি ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে কত ভাবগর্ভ বক্তৃতা হয়। তার সামান্যতম ঢেউও এসে পৌঁছোয় না ভৃত্য মহলে। তারা শুধু জানে, প্রতি শনিবার ছোটবাবুর কাছে তাঁর ইয়ারবক্সীরা আসেন, তাঁদের জন্য প্রচুর খাবার পাঠাতে হবে। বাড়িতে বেশী জনসমাগম হলে দাস-দাসীরা খুশী হয়। বেশী মানুষ মানেই বেশী খাবার। আর তার থেকে রাই কুড়োতে কুড়োতে বেল হয়ে যায়।

দুপুরের দিকে যখন হাতে বিশেষ কাজ থাকে না, তখন থাকোমণি এক পা এক পা করে বাগানের মধ্যে তার ছেলের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ দিনই দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকে।

থাকোমণি তখন ডাকে, অ বউমা, আমার বাপধন ঘুমিয়ে আছে নাকি ? অ বউমা ! একবার দুয়োরটা খোলো, অ বউমা !

দুলালচন্দ্রের পত্নী সুবালা অনিচ্ছার সঙ্গে দরজা খোলে। দুপুরের নিদ্রাটি তার বড় প্রিয়। রাতে তাকে বারবার জাগতে হয়, ছেলে কখন কেঁদে ওঠে কিংবা বিছানা নোংরা করে, তার ঠিক নেই, আবার দুপুরের ঘুমটাও যদি শাশুড়ি এসে ভেঙে দেয়, তাহলে কি মেজাজ ঠিক থাকে। বউ যদি জেনে যায় যে তার স্বামীই তার মাকে তাচ্ছিল্য করে, তবে সে তো আরও বেশী করে করবেই।

শাশুড়িকে ভেতরে আহ্বান না জানিয়ে দরজার দুপাশে হাত রেখে সে বলে, কী ? খোকা তো এখুন ঘুমুচ্চে ! এই অনেক কষ্টে ঘুম পাড়ালুম।

—তবু একবার চোকে দেকে যাই। বাপধনকে একবার না দেকলে শান্তি হয় না।

—আপনি অন্য সময় আসতে পারেন না ? খোকা এতক্ষণ খেলছেল।

—সকাল থেকে কি আমার চোকের পাতা ফেলার সময় থাকে। এই তো বিকেল পড়তে না পড়তেই মশলা বাটা শুরু হবে আবার, বাতিগুনোয় তেল ঢালতে হবে, লুচির ময়দা মেপে দিতে হবে।

দুলালচন্দ্র এই সময় প্রায় কোনোদিন থাকে না জেনেও থাকোমণি জিজ্ঞেস করে, দুলাল কোথায় ?

—ছোটবাবুর সঙ্গে বেরিয়েচে।

এমনও হয়, পর পর তিন চার দিন দুলালকে এক পলকও দেখতে পায় না থাকোমণি, তবু এখানে এসে একবার ছেলের খোঁজ নিয়ে যাওয়া চাই।

থাকোমণি সুবালার মুখের দিকেও আজকাল অবাক হয়ে তাকায়। সুবালার বয়েস চোদ্দ, তার বাপ একজন ছুতোর মিস্তিরি। বিয়ের সময় নাকে নোলক পরা ভীতু ভীতু মুখ বউটি হয়ে সে এসেছিল। এখন তার নোলক নেই। সে নিয়মিত শরীর মাজা-ঘষা করে আর এমনভাবে ফেরতা দিয়ে শাড়ি পরে যে তাকে ঠিক বাবুদের ঘরের মেয়েমানুষদের মতন দেখায়। এই থাকোমণির পুত্রবধূ, একে যে তারই সমীহ করতে ইচ্ছে করে।

সুবালা দরজার পাল্লা থেকে একটা হাত সরালে থাকোমণি ভেতরে ঢুকে পড়ে। ঘুমন্ত নাতির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তখন যেন মুগ্ধতা ঝরে পড়ে তার চোখ মুখ দিয়ে। সে বলে, আহা হা, আমার বাপধন, কী সোন্দর, ঠিক চাঁদের পারা মুখখানি, চোখ দুটো দেকেচো বউমা, ঠিক দুলালের মতন···।

মনের ভুলে নাতিকে সেই সময় কোলে তুলে নিতে গেলে সুবালা হা-হ করে ওঠে। ও মা, ও কী কচ্চেন ! এক্ষুনি জেগে যাবে, আর অমনি চ্যাঁচাবে ! কাঁচা ঘুম ভাঙলেই এমন চ্যাঁচায় !

অপরাধীর মতন মুখ করে হাত সরিয়ে নেয় থাকোমণি। ঘুম ভেঙে গেলে সে বুঝি আবার ঘুম পাড়াতে জানে না ? সে বুঝি ছেলেমেয়ে মানুষ করেনি ? যত আদিখ্যেতা !

একটু গম্ভীরভাবে সে বলে, বুকের ওপর হাত দিয়ে আচে, হাত দুটো পাশে নামিয়ে দাও, বউমা। ব্যাটাছেলেমানুষের বুকে হাত দিয়ে ঘুমুতে নেই, তাতে ইছলি বিছলি স্বপ্ন দেকার অভ্যেস হয়।

পুত্রবধূর সন্তান হবার সময় থাকোমণি বড় আশা করে ছিল রাত্রে সে তার নাতিকে কোলের কাছে নিয়ে ঘুমোবে। সে আশা তার বৃথা গেছে। সুবালা এক মুহূর্তের জন্য ছেলেকে কাছছাড়া করতে চায় না।

দৈবাৎ দু-একটা দুপুরে দুলালচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় থাকোমণির। মায়ের সঙ্গে দেখা হলেই দুলাল মুখখানায় রাগ রাগ ভাব ফুটিয়ে থাকে, ভালো করে কথাই বলতে চায় না। থাকোমণির যেন বুক ফেটে যায়। তার খুব ইচ্ছে করে, দুলালের সারা গায়ে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করে, তুই কেমন আচিস, দুলে ? ওরে, তোর জন্যে যে আমার মন পোড়ে, তুই বুঝিস না ?

কিন্তু এসব বলা হয় না। মাকে দেখলেই দুলাল সটান গিয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বোজে। মনে হয় যেন ইচ্ছে করে নাক ডাকে।

থাকোমণি মনে মনে কাতরভাবে বলে, ওরে, আমার ওপর তোর এত রাগ কেন ? আমি কী দোষ করিচি তোর কাচে ? যদি কিছু পাপ করে থাকি, সে তো তোরই জন্যে। তুই যখন ছোটটি ছিলিস, তখন তুই যাতে ভালো থাকিস, তুই যাতে ভালো করে খেতে পরতে পাস, সেই জন্যিই তো আমি···।

একদিন থাকোমণি দুপুরে দুলালকে সদ্য বাড়ি ঢুকতে দেখে তার মুখোমুখি গিয়ে বললো, অ দুলে, তোর সঙ্গে আমার ক'টা কতা আচে !

দুলাল অন্যদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে গম্ভীরভাবে বললো, কী ?

—বলচি কী, ভালো করে বোস না, অ বউমা, তুমিও এসো, তুমিও শোনো।

দুলাল মুখ ঝামটা দিয়ে বললো, কী বলবে, জলদি বলো। আমায় একটু বাদেই আবার ছোটবাবুর সঙ্গে বেরুতে হবে।

থাকোমণি খুশীর সংবাদ দেবার মতন উদ্ভাসিত মুখে বললো, বলচি কী, আমার হাতে বেশ কিছু ট্যাকা জমেচে। সেই ট্যাকা দিয়ে কোনো গাঁয়ে গিয়ে একটা ছোটখাটো বাড়ি কিনলে হয় না?

দুলাল বললো, গাঁয়ে বাড়ি কিনবে? কেন, কী হবে?

—বাঃ, আমাদের একটা নিজের বাড়ি থাকবে না? সারা জেবন পরের বাড়ি কাটাবো?

—গাঁয়ের বাড়ি কিনবে, সেখানে থাকবে কে?

—কেন, আমরাই সবাই মিলে থাকবো!

—গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে থাকবো? আর খাবোটা কী? লবডংকা?

—বলচি, বলচি, একটু মন দিয়ে শোন! আমার যা ট্যাকা আচে, তা দিয়ে একটা ছোট বাড়ি আর কয়েক বিঘে ধান জমিও কেনা যায়। আর একটা পুকুর। জমিতে চাষবাস করলেই তো আমাদের খাওয়া পরা চলে যাবে। সেই ভালো না? কতকাল আর পরের বাড়িতে খেটে খেটে মরবো। আমাদের কেনা নিজের বাড়ি হবে, আমি আর বউমা বাড়ির কাজ দেকবো সব, আর তুই জমিতে···।

দু চোখে দারুণ বিরক্তি ফুটিয়ে এবং ধমক দিয়ে দুলাল বললো, আমি মাঠে গিয়ে হাল ঠেলবো? তোমার মাতা একদম খারাপ হয়ে গ্যাচে নাকি? এখেনে আমরা কী কষ্টে আচি যে গাঁয়ে গিয়ে চাষাভূষো সাজতে হবে? আমায় ছাড়া ছোটবাবুর এক পা চলে না···। হেঃ! পাগলের মতন কতা। কলকাতা শহর ছেড়ে গাঁয়ে যাবো হেদিয়ে মণ্ডে! তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি যাও!

বিদ্যোৎসাহিনী সভা থেকে বেরুবার মুখে একদিন রাইমোহনকে ধরলেন বিধুশেখর। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে তিনি এসে সিংহবাড়ির বৈঠকখানায় বসে থাকেন। নজর রাখেন কারা আসা-যাওয়া করছে মজলিস কক্ষে।

সভা চলাকালীন বিধুশেখর সেখানে কক্ষনো যান না। ছেলেছোকরাদের ব্যাপার, তাঁর মতন একজন প্রবীণ ব্যক্তির সামনে ওরা কখন কী অসমীচীন বাক্য বলে ফেলবে তার ঠিক নেই, তাঁর নিজের মান রক্ষা করাই দায় হতে পারে। ছোটকু অর্থাৎ নবীনকুমার এখন এই সভা নিয়ে মেতেছে, বিধুশেখর এতে কোনো বাধার সৃষ্টি করেননি, কিন্তু ব্যাপারটিকে তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখেন। কতকগুলি অল্প বয়েসী যুবক সন্ধ্যাবেলা এক স্থলে মিলিত হয়ে গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং দেশোন্নতির চিন্তায় ললাটে ঘর্ম ছোটায়, এ যেন তাঁর কাছে ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় না। এ আবার কোন্ নতুন ধরনের হুজুগ?

সারা দেশেই যুবক দলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অনাচার ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। অতি অল্প বয়েসেই তারা সুরাপান ধরছে, এবং ধরা মানে কী, সে যেন চূড়ান্তভাবে আঁকড়ে ধরা। আগে তবু গুরুজনদের সামনে যেটুকু চক্ষুলজ্জা ছিল এখন তারও বালাই নেই। শহর ছেয়ে গেছে বারাঙ্গনায়। পূর্বে এদের পৃষ্ঠপোষক ছিল মধ্যবয়েসী ধনীরা, এখন যুবকরাই সে সব কুস্থানে প্রকাশ্যে গতায়াত করে। কিছুটা ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে যুবকদের মধ্যে সরকারী চাকুরি পাবার সুযোগ এসেছে, তৈরি হয়ে উঠেছে একদল চাকুরিজীবী যুব-সম্প্রদায়। অনেকে আসছে মফঃস্বল থেকে, দেশের বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ফেলে রেখে শহরে মেস-বাড়িতে দল মিলে থাকে এবং ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করার জন্য সন্ধ্যার পর কুলটা নারীদের সংসর্গে মত্ত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার পর এই অসংযমী মদ্যপ কামপরায়ণদের দৌরাত্ম্যে পথ চলা দায়!

আবার এক শ্রেণীর যুবক মেতেছে ধর্ম নিয়ে। সেও এক ধরনের অনাচার। কিছুদিন আগে পর্যন্ত খুব খৃষ্টান হবার হিড়িক উঠেছিল, এখন তা খানিকটা প্রশমিত হলেও একদল আবার নিরাকার ব্রহ্ম ভজনার নামে এক উৎকট ধর্ম নিয়ে পাগলামি শুরু করেছে। সে ধর্মের কোনো মাথামুণ্ড নেই, সনাতন

হিন্দু ধর্মকে হেয় করাই যেন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

বিধুশেখর ভেবেই পান না যে, ধর্ম কিংবা সুরা কিংবা পরনারী নিয়েই যদি দেশের যুবকরা সকলে মেতে থাকে, তাহলে পরিবারের শুচিতা ও সমৃদ্ধি রক্ষা হবে কী প্রকারে ? যারা ব্যভিচারী এবং নেশাখোর তারাও যেমন নিজ নিজ সংসারের সর্বনাশ করছে, তেমনি যারা ধর্ম-পাগল, তাদেরও জাগতিক উন্নতির দিকে কোনো মন নেই। বিষয়সম্পত্তির কথা চিন্তা করাও তাদের চক্ষে যেন পাপ। এই সুযোগে ইংরেজ লুটেপুটে নিচ্ছে দেশের যাবতীয় সম্পদ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দেবেন্দ্র ধর্মের নামে নাচাচ্ছেন এই সব যুবকদের। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের অকালকুষ্মাণ্ড পুত্র এই দেবেন্দ্র, ওঁর পিতা পরম সাহসের সঙ্গে ইংরেজদের সঙ্গে পর্যন্ত বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। আর দেবেন্দ্র সে সব গোল্লায় দিয়ে সঞ্চিত বিষয়সম্পত্তির অংশ বেচে বেচে ধার শুধছেন এবং ধর্ম করছেন।

এ সব কথা চিন্তা করলেই বিরক্তিতে বিধুশেখরের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে যায়। ধর্ম হিন্দুদের কাছে একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। গৃহী হিন্দু নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী ধর্মচর্চা করবে এবং নিজের জীবনে সুনীতিগুলি যথাসম্ভব মেনে চলার চেষ্টা করবে। কিন্তু ধর্মের নামে একদল লোক এক স্থানে মিলিত হয়ে বক্তৃতা করবে কিংবা গান গাইতে গাইতে নৃত্য বা ক্রন্দন শুরু করবে অথবা পথ দিয়ে মিছিল করে যাবে, এ আবার কী অদ্ভুত কথা ! এ যেন বোষ্টম ন্যাড়া-নেড়ীদের ব্যাপার। তা হলে সংসার ছেড়ে ওরা আশ্রম খুললেই পারে, কিংবা বনেজঙ্গলে চলে যাক না ! দেবেন্দ্র তো আবার প্রতি বৎসরই একটি করে পুত্র বা কন্যার জন্ম দিয়ে চলেছেন !

নবনীকুমার অতি দুরন্ত, অতি খেয়ালী। বিধুশেখর জানেন, এ ছেলের ওপর খুব কড়া নজর রাখা দরকার, একটু রাশ আলগা দিলেই এ সম্পূর্ণ উৎসন্নে চলে যেতে পারে। নবীনকুমারের স্বভাব এমনই অস্থির যে, কোনো দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় যে-কোনো কু-কাজ করা তার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। তাছাড়া, এখন থেকেই তার যেমন খরচের হাত দেখা যাচ্ছে, তাতে রামকমল সিংহের অতুল বৈভবও সে উড়িয়ে দিতে পারে ইচ্ছে করলে। আইন মোতাবেক এখনও নবীনকুমার সাবালক নয়, সম্পত্তি ও জমিদারি পরিচালনার অধিকার তার এখনো জন্মায়নি, সে অধিকার এখনো বিম্ববতী ও বিধুশেখরের। পুত্রস্নেহে অন্ধ বিম্ববতী পুত্র যখন যা টাকা পয়সা চায়, তাই তিনি দিয়ে দেন, বিধুশেখর অনেক চেষ্টা করেও এর নিবারণ করতে পারছেন না।

নবীনকুমার জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার জন্য এমনভাবে মেতে উঠেছে, এটাকে বিধুশেখর এখনো সুলক্ষণ বলে গণ্য করেননি। তাঁর ধারণা, এ উচ্ছ্বাস অতি সাময়িক, এ যেন ঠিক বয়সোচিত নয়, হঠাৎ সে এর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলে যেতে পারে বলে বিধুশেখরের সন্দেহ হয়।

তিনি নিজে বিদ্যোৎসাহী সভার অধিবেশনে যোগদান করেন না, কিন্তু দিবাকরকে তিনি চর হিসেবে লাগিয়েছেন। দিবাকর আশেপাশে ঘুর ঘুর করে। দিবাকরের মারফৎ তিনি জেনেছেন যে, ঐ সভায় শ্যাম্পেন-ব্র্যাণ্ডি চলে না। এমনকি গোপনেও না। স্ত্রীলোক বিষয়ে রসালাপও হয় না ওখানে। আবার ধর্ম নিয়েও কোনো প্রসঙ্গ ওঠে না ঐ সভায়। শুধু নিরস সমাজ সংস্কার ও সাহিত্য আলোচনা ? বিধুশেখরের খটকা লাগে।

এই সভার উদ্যোগে থিয়েটার করার কথা শুনে বিধুশেখর প্রথমে প্রবল বাধা দিতে চেয়েছিলেন। যাত্রা, পালাগান এসব নিছক ভাঁড়ামো ও নিকৃষ্ট রসের ব্যাপার, ইতর শ্রেণীর জনসাধারণই সে সব উপভোগ করে, ক্বচিৎ কখনো ভদ্র ব্যক্তিরা তা দর্শন করে স্বাদ বদলায় মাত্র। তা বলে সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা নিজেরা ঐ সব করবে ?

কিন্তু নবীনকুমারের জেদের কাছে বিধুশেখরকে বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছে। যাত্রা, পালাগান আর ইংরেজদের অনুকরণে এই থিয়েটার নাকি এক নয়। উচ্চপদস্থ সাহেবরা এই প্রকার থিয়েটারের উৎসাহদাতা। কিছু কিছু হিন্দু ধনী গৃহে ইদানীং এর প্রচলন শুরু হয়েছে।

নবীনকুমার বিধুশেখরকে এড়িয়ে চলে, পারতপক্ষে সামনে আসতে চায় না। কখনো মুখোমুখি পড়ে গেলে সে কোনো একটা ছুতো দেখিয়ে পালায়। সে প্রকাশ্যে বিধুশেখরকে অগ্রাহ্য করে না, বিধুশেখরের প্রতি মনে মনে তার এখনো কিছুটা ভয় ভাব আছে। কিন্তু বিধুশেখর কোনো মতামত জোর করে তার ওপর চাপিয়ে দিলে সে মায়ের কাছে প্রবল আবদার জানিয়ে সেটাকে খারিজ করিয়ে আনে। এইভাবে সে থিয়েটারের অনুমতি আদায় করেছে।

বিধুশেখর বুঝেছেন, জোর জবরদস্তি করে এ ছেলেকে ঠাণ্ডা রাখা যাবে না। একে বশে রাখতে হবে নানাপ্রকার গোপন সুকৌশলে।

বৈঠকখানা ঘরে তিনি আরাম কেদারায় বসে আলবোলার নল মুখে দিয়ে টানছিলেন, পায়ের কাছে দিবাকর তাঁর পদসেবায় ব্যাপৃত। বিদ্যোৎসাহী সভার কার্যক্রম শেষ হয়েছে, বক্তা ও সদস্যরা একে একে বিদায় নিচ্ছেন, বিধুশেখরের চোখ সেই দিকে। একেবারে শেষের দিকে রাইমোহনকে বেরুতে দেখে বিধুশেখর চকিতে উঠে বসে দিবাকরকে বললেন, ঐ লোকটাকে ডেকে নিয়ায় তো! ঐ যে সিড়িঙ্গেটা—।

দিবাকর ডেকে নিয়ে এলো রাইমোহনকে।

বিধুশেখরের এক চোখের ওপর আজকাল একটি কালো ঢাকনা দেওয়া থাকে। ঐ নষ্ট চক্ষুটিতে তাঁব একেবারেই আলো সহ্য হয় না। বৈঠকখানা ঘরে মাথার ওপর জ্বলে একশো মোমের বিরাট ঝাড়বাতি।

সুস্থ চোখটিতে রাইমোহনের আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই যে, তোমার কী নাম যেন?

হাত দুটি যুক্ত করে বিনয়ে খানিকটা কুব্জ হয়ে গিয়ে বিগলিত হাস্যে রাইমোহন বললো, হুজুর, আমাকে বারবার দ্যাকেন আর বারবার ভুলে যান। অবশ্য আমি অতি সামান্য প্রাণী, হুজুরের মতন ব্যস্ত মানুষ আমাকে মনে রাকবেনই বা কী করে! অধমের নাম রাইমোহন ঘোষাল।

বিধুশেখর বললেন, হুঁ, মনে পড়েচে। তা তুমি আবার এখেনে এসে ভিড়লে কী করে? তোমাকে তো আমি দেকিচি সেই কমলী মাগীটার বাড়িতে!

—হুজুর আমাকে আরও অনেক জায়গায় দেকেচেন। স্বর্গীয় বাবু রামকমল সিংগী আমায় বিশেষ স্নেহ কত্তেন। তেনার অভাবে আমাদের মতন দশ-পাঁচজন একেবারে অনাথ হয়ে পড়িচি!

—বুজলুম! তুমি নিজেই একদিন বলেছিলে, তুমি হলে গে সুখের পায়রা! তা তোমার আবার বিদ্যেচর্চার মতিগতি হলো কবে থেকে? সুখের পায়রাদের তো এমন সুখ্যাতি নেই!

—হুজুর, মানুষের ভাগ্যে কখুন কী আচে, স্বয়ং কালপুরুষও বোধ হয় তা বলতে পারেন না। বয়েস হলে বেড়ালও নিরামিষাশী হয়। বয়েসে ভোগীও যোগী হয়। যে পাপী সেও ভেক নিয়ে অন্য পাপীদের তরায়। তা আমারও আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে বয়েস কম হলো না! তাই আমি একদিন নিজেকে শুধোলুম, ওরে অবোধ মন, বেলা তো যেতে বসলো, এতদিন জগতে থেকে কী সঞ্চয় কল্লি? জ্ঞান-বুদ্ধি তো কিচুই হলো না। সোনা বাইরে পড়ে রইলো, আমি শুদু আঁচলে গিরে বেঁধিচি! এখন শেষ বেলায় দুটো ভালো কতা, দেশের উন্নতির কতা অন্তত কিচু শুনে যাই, নইলে যমরাজের কাচে কী জবাবদিহি দেবো! তাই দেকলুম, বাবু রামকমল সিংগীর সুযোগ্য পুত্র নবীনকুমার বিদ্যোৎসাহী সভা খুলেচেন, তাই আমিও সেখেনে এক কোণায় ঠাঁই নিলুম।

—ওরা তোমাকে ঠাঁই দিল?

—অযোগ্যকেও তো মানুষ কখুনো কখুনো দয়া করে! কানে পাঁচটা ভালো কতা গেলেও আত্মার উন্নতি হয়। আহা ছেলে আপনার হীরের টুকরো! ধন্য রামকমল সিংগী, এমন পুত্রের জন্ম দিয়ে গ্যাচেন। প্রতিভার জ্যোতিতে এ ছেলে যেন চন্দ্র-সূয্যি এক করেচেন!

—তা তো বুঝলুম। কিন্তু এখানে যারা আসে তারা তো সবাই কলেজে-পড়া, ইংরেজি-জানা কেষ্ট-বিষ্টু ধরনের লোক। তাদের মধ্যে তুমি ঠাঁই পেলে কী করে? পোশাকে-আসাকে তো দিব্যি ভেক ধরেচো দেকচি, কিন্তু হাঁ করলেই যে তোমার বিদ্যে বেরিয়ে যাবে!

—আজ্ঞে আমি ইংরেজিটে জানিনি বটে, কিন্তু অল্প বয়েসে দু-চার পাতা শাস্তর পড়িচিলুম। আমি মন্দ হতে পারি, আমার বংশটা তো মন্দ নয়। বংশের ধারায় আমার রক্তের মধ্যে কিচু নেকাপড়ার বিদ্যে আচে। মাঝে মাঝে সেই রক্তই কথা কয়ে ওঠে।

—বাঃ, বলতে কইতে তো দিব্যি শিকে গ্যাচো দেকচি। কাজ চালিয়ে যেতে পারবে।

—তা হুজুর আর একটি সত্যি কতাও বলি। আমাদের এ সভায় নেছক ট্যাঁস-ফিরিঙ্গিদের মতন সর্বক্ষণ ইংরেজিতে কতা হয় না। বাংলাতেও কতা হয়। বাবু নবীনকুমার বাংলার বড় পৃষ্ঠপোষক, কাজে কাজেই বাংলায় যখন দেশের কতা হয়, জ্ঞানের কতা হয়, তখন মাঝেমদ্যে আমিও একটুআধটু ফোঁড়ন দিই, দু-চারটে শাস্তরের বচন উগরে দিই।

—বেশ, বেশ, তোমার যোগ্যতা বুঝলুম। কিন্তু ঠিক কোন্ উদ্দেশ্যে এখানে যাতায়াত করছো, সেটি বুঝলুম না এখনো। টাকা পয়সা কিছু পাবার আশা আচে নাকি?

রাইমোহন দারুণ চমকিত হয়ে জিভ কেটে বললো, আজ্ঞে না, হুজুর! পয়সার ধান্দায় তো অনেক

ঘুরিচি, এখন একটু নিষ্কাম জ্ঞানচর্চার সাধ জেগেচে। আমাদের সভায় সভ্যদের চাঁদা ধার্য করার কতা উঠেচে, আমিও চাঁদা দোবো। আর তাছাড়া—

বিধুশেখর ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তাছাড়া ?

—সভ্যরা যে থ্যাটার কচ্চেন, তার জন্য আমি তিনখানা গান বেঁধে দিইচি। সুরও আমার দেওয়া। বাবু নবীনকুমারকে আমি গান শিকোচ্চি। এখেনে অনেক ইংরেজি জানা, জ্ঞানীবাবুরা এলেও আমার মতন বাংলা গান বাঁধার এলেম তো আর কারুর নেই। কাজে কাজেই, আমিও যাকে বলে, প্রয়োজনীয়।

—এবার অনেকখানি খোলসা হয়েচে। তোমার মতন বুদ্ধিমানের যোগ্য কাজই বটে, নিজেকে আগে প্রয়োজনীয় করে ফেলা দরকার। তারপর যত ইচ্ছে ঐ কচি ছেলেটার মাতায় হাত বুলোবে, এই তো ? সবাই ওর মাতাটি চিবিয়ে চুষে খেয়ে ফেলার জন্য একেবারে মুখিয়ে আচে, তাই না রে, দিবাকর ? কিন্তু এ কতা জানো কি, যতদিন আমি জীবিত আচি, ততদিন সেটি হচ্চে না ? সে রকম চেষ্টা যে করবে, তাকে আমি এখুনো ঝাড়ে-বংশে একেবারে নির্বংশ করে দিতে পারি ?

বিধুশেখরের এই হুমকিতেও রাইমোহনের মুখমণ্ডলে কোনো ভয়ের রেখাপাত হলো না। ওষ্ঠে একই রকম হাস্য লেগে রইলো।

বিধুশেখর তার দিকে তীব্র দৃষ্টি স্থাপন করে একটুক্ষণ চুপ করে রইলে সে আবার বললো, হুজুর, আমার আর এখন দাঁত নেই যে কারুর মুণ্ড চিবিয়ে খাবো। বাহুতে সে শক্তি নেই, নোখে সে ধার নেই যে, কারুর ঘাড় মটকাবো। এখুন পরকালের ডাক এসে গ্যাচে, এখুন যতটা পারি চিত্তের বিকার সাফ করে যেতে চাই। আমার ধর্মে তেমন মতি নেই, তাই জ্ঞান চর্চার দিকে ঝুঁকিচি। আপনাকে তো বল্লুম, এ আমার নিষ্কাম সাধনা !

—এ অতি উত্তম কতা ! এবার আমি তোমার গান শুনবো। দিবাকর, তুই বাইরে যা। দরোজাটা বন্ধ করে দিবি আর আমি ফের না ডাকা পর্যন্ত এখেনে আসবিনি।

দরজা বন্ধ হবার পর বিধুশেখর বললেন, বসো, সামনের ঐ কেদারাটায় বসে শোনাও, থিয়েটারের জন্য কেমন গান বেঁধেচো !

একটু গলা খাঁকারি দিয়ে রাইমোহন গুণগুণ করে গান ধরলো।

নিশি যায় হায় হায় করি কী উপায়
নাথ বিহনে সখি বুঝি প্রাণ যায়
হ্যার হ্যার শশধর অস্তাচলগত সখি
প্রফুল্লিত কমলিনী, কুমুদ মলিনমুখী
আর কি আসিবে কান্ত তুষিবে আমায়—।

শিবনেত্র হয়ে গাম্ভীর্য মাখা মুখে বিধুশেখর শুনতে লাগলেন গান। তাঁর কোনো রকম সংগীতপ্রীতি আছে বলে আগে কখনো শোনা যায়নি। এ রকম হালকা আমোদে তিনি কখনো সময় ব্যয় করেন না। আজ রাইমোহনের মুখ থেকে গানগুলি শুনবার অন্য গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

একটি শেষ হবার পর তিনি বললেন, আর একটি শুনি।

রাইমোহন আবার ধরলো :

হৃৎপিঞ্জরের পোষা পাখি উড়ে এলো কার
ত্বরা করে ধর গো সখি দিয়ে হৃদয়ের আধার।
কোন্ কামিনীর পোষা পাখি, কাহারে দিয়েচে ফাঁকি
উড়ে এলো দাঁড় ছেড়ে শিকলিকাটা ধরা ভার।

বিধুশেখরের মুখে আরও গাম্ভীর্যের মেঘ জমাট হলো। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, শুধু এই সব ছ্যাবলামো গান তুমি শিখোচ্চো ওকে ?

বিধুশেখরের গান শোনার উদ্দেশ্য রাইমোহনের বুঝতে বাকি ছিল না। সেইজন্যই সে দ্বিতীয় গানে 'প্রণয়ের আধার' গাইবার সময় বদলে দিয়ে গেয়েছে, 'হৃদয়ের আধার'।

সে নিরীহ মুখ করে বললো, হুজুর, নাটকে য্যামন য্যামন কতা, সেই অনুযায়ী তো গান বাঁধতে হবে। সবারই খুব পছন্দ হয়েচে !

—তা হবে না কেন ? এ সব চটুল জিনিস আর ভালো লাগবে না ছোকরাদের ? এ তো মেয়েছেলের গান, এই সব গান তুমি নবীনের মুখে গাওয়াচ্চো ?

—আজ্ঞে, আমাদের নাটকে যে উনি রাজকুমারীর ভূমিকায় অ্যাক্টো কচ্চেন ! সেই জন্যিই এমন গান !

—রাজকুমারী হলেই সে সর্ব সময় প্রেম লীলের জন্য হ্যাংলামি করবে ? কেন, রাজকুমারীরা বুঝি কখুনো ভক্তির গান গায় না ? তুমি ভক্তির গান শিখোও ওকে, ভালো হয় যদি শ্যামাসংগীত—

রাইমোহন তৎক্ষণাৎ বললো, তাও আচে হুজুর, এই যে তৃতীয় গানটি শুনুন :

অনুগত আশ্রিত তোমার
রেখো মা, মিনতি আমার···

এই গানেও রাইমোহন 'নাথ' বদলে মা করে দিল এবং তার প্রণয় গীতিটি দিব্যি শ্যামাসংগীত হিসেবে চলে গেল।

বিধুশেখর এবার কিছুটা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমায় দিয়ে আমার দু-চারটি কাজ আচে।

দিবাকরের উদ্দেশ্যে তিনি হাঁক দিতেই দিবাকর দরজা ঠেলে উঁকি দিল। বিধুশেখর তাকে হুকুম দিলেন, খাজাঞ্চির কাচ থেকে কুড়িটে টাকা নিয়ে আয়, আমার নাম করে।

দিবাকর চলে যেতেই তিনি রাইমোহনকে জিজ্ঞেস করলেন, থাকা হয় কোতায় ? জানবাজারে সেই ঠেঁটি মেয়েছেলেটার কাচে ?

রাইমোহন বললো, না না, হুজুর, সেখেনে আমি কালেভদ্রে দু-চারবার গেচি মাত্তর। যবে থেকে শুনিচি আপনি ওকে ও বাড়ি থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় কত্তে চান, তারপর আর আমি ও ধারও মাড়াইনি ! ও বিদেয় হয়নি এখুনো ?

—মামলা চলচে এখুনো ! অমন দাগাবাজ মাগী আর দুটি দেকা যায় না ! সমানে লড়ে যাচ্চে। আমার মনে হয় তলে তলে কেউ ওকে বুদ্ধি জোগান দেয়, ওর একলার এমন ক্ষ্যামতা নেই।

—তা হতে পারে, হুজুর, ওর কাচে অনেক মাতা মাতা লোকেরা আসে।

দিবাকর কুড়িটি সিক্কা টাকা এনে দিল। টাকাগুলি নিয়ে বিধুশেখর আবার দিবাকরকে ইঙ্গিত করলেন বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতে।

তারপর টাকাগুলি রাইমোহনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও।

রাইমোহন বিরাট বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলো, টাকা ? টাকা কিসের জন্য, হুজুর ?

—কেন, তুমি টাকা ছোঁও না নাকি ? টাকা অপবিত্তর জিনিস ?

—আজ্ঞে না, টাকা হলো বক্ষের হৃৎপিণ্ড, নয়নের মণি, বাপ-মায়ের স্তেঁহ আর সন্তানের ভালোবাসা। টাকাই ইহলোকের মোক্ষ। টাকার বাণ্ডিলে বসতে পারলে কত পাপী-তাপীও মহাত্মন বনে যায়। খালি জিজ্ঞেস কচ্চি, হঠাৎ আমার ওপরে আপনার এই দয়া কেন ?

—ধরে নাও, তুমি গান শোনালে তার ইনাম। বাড়ির দোরগোড়ায় ভিকিরি এসে গান শোনালেও তাকে কিছু দিতে হয়।

রাইমোহন টাকার তোড়াটি দু হাতে ধরে বারবার কপালে ঠেকাতে লাগলো।

নিবন্ত আলবোলায় কয়েকবার বড় বড় টান দিয়ে আবার চাঙ্গা করে নিয়ে বিধুশেখর বললেন, মাসে মাসে তুমি আমার কাচ থেকে কুড়ি টাকা পাবে। তবে তার বদলে শুদু গান শোনালে চলবে না। তোমাদের ঐ সভায় কী কী কতাবার্তা হয় তা সব আমায় জানাবে। পাই পয়সা পর্যন্ত, কিচু বাদ না যায় !

এবার একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রাইমোহন বললো, নিশ্চয় হুজুর, এ সব কতা আপনার জানা তো দরকার বটেই !

—নবীন যাতে ভুল পথে না যায়, সেদিকে তোমায় নজর রাকতে হবে।

—অবশ্যই রাকবো !

—এর মধ্যে বেসুরো কিচু তোমার নজরে এয়েচে ? ঐ থিয়েটারের হুজুগটা আমার পছন্দ নয়, তাও কতা শুনলে না।

—ওটা নির্দোষ আমোদ, ওর মধ্যে দোষের কিচু নেই। তবে ঐ নাস্তিক বিদ্যেসাগরকে নিয়ে যে এত মাতামাতি করা হচ্চে, সেটা ঠিক ভালো কতা নয়।

—বিদ্যেসাগর নাস্তিক ? তাঁকে তো আমি অনেকদিন ধরে চিনি। বয়েস কম, একটু মাতা-গরম ধাঁচের, কিন্তু মানুষটি নির্লোভ। ছোটকুর হাতে-খড়ির সময় দক্ষিণা, বিদেয় কিচুই নিতে চায়নি, বড় অবাক হয়েছিলুম হে ! বামুন পণ্ডিত অথোচো অর্থলোভ নেই, কলিকালে এমন হয় ?

—কিন্তু হুজুর, কলিকালেই এমন হয় যে বামুন পণ্ডিত, অথচ নাস্তিক ! ঐ বিদ্যেসাগর নাস্তিক ছাড়া কী ? বেধবাদের বে দিতে চায় !

—কী বললে ?

—আপনি শোনেননি ? এই নিয়ে শহরে কত সোর উঠেচে ! আপনার নবীনকমার কিন্তু বেধবা বে নিয়ে খুব নেচেচে।

বিধুশেখর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। হঠাৎ তাঁর কণ্ঠ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে গেল। নিজের এই বৈকল্যে অবাক হলেন তিনি। একটু পরে মুখ তুলে অসহায় স্বরে বললেন, আমার পাঁচ মেয়ে, তাদের কারুরই ভাগ্যে সধবা হয়ে থাকা ঘটলো না। আমার প্রাণাধিকা কন্যা বিন্দু কাশীতে গিয়ে আত্মঘাতিনী হয়েচে। আমি সব সয়িচি। সমাজ ও দেশাচারের মুখ চেয়ে আমি কখনো দুর্বল হইনি। কোনো ভ্রষ্টাচারের প্রশ্রয় দিইনি। কিন্তু এখুন বয়েস হয়েচে, এখুন আর পারি না। ঘোষাল, তুমি বিধবাদের কথা আমার সামনে কক্ষনো উচ্চারণ করো না ! ওরা যা কচ্চে করুক।

রাইমোহন চুপ করে গেল।

বিধুশেখর আবার বললেন, আমিই ঐ বিদ্যেসাগরকে এনে নবীনের হাতেখড়ি দিইয়েচি, বিদ্যেসাগর ওর গুরুস্থানীয়। এখন যদি নবীন তার গুরুর কথা মান্য করে চলে তা হলে আমি কোন্ মুখে নিষেধ করবো ?

—তা অবশ্য ঠিক কতা।

—তুমি একটু নজর রেকো, নবীন যেন কুসঙ্গে না পড়ে, কুপথে না যায়। আমাদের দুই বংশে এই একটি মাত্র পুরুষ সন্তান !

—ছেলে আপনাদের একেবারে হীরের টুকরো। এতটুকুনি বয়েস অথচ কী মেধা, কত বুঝদার, এমনটি আর কেউ কখুনো দেকেনি !

বিধুশেখরের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে রাইমোহন পথে বেরিয়ে পড়লো। শরীরটা বেশ উষ্ণ আর চনমনে লাগছে। লাগবেই তো, ফতুয়ার পকেটে নগদানগদি কুড়িটা টাকা। খুব ইচ্ছে করছে সোডা ওয়াটার দিয়ে দু-চার গেলাস নাম্বার ওয়ান এক্সাক্যাস্টেলিয়ন ব্রাণ্ডী খেতে। অনেক দিন ওসব খাওয়া হয় না। আগের সে জীবন এখন নেই। নবীনকুমারের সভায় তাল রাখবার জন্য আজকাল রাইমোহনকে বইপত্র পড়তে হয়।

রাইমোহন উসখুস করতে লাগলো। আবগারির কড়াকড়ির জন্য ইদানীং সন্ধে হতে না হতেই সুরার দোকান বন্ধ হয়ে যায়। তবু দু পয়সা বেশী দাম দিলে এ সময়ও কোথায় ওসব পাওয়া যায়, রাইমোহন তা জানে, কিন্তু সেখানে গেলে পুরোনো ইয়ার-বক্সীদের পাল্লায় পড়তে হবে।

পথে আজ গোরা-পুলিশের বড় গিসগিস। রাইমোহন প্রথমে ভাবলো, এ বোধ হয় সেই হিসির হুজুগ। শহরে তো হুজুগের অভাব নেই। কিছুদিন ধরে নগরপালকরা শহর পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য খুব ক্ষেপে উঠেছে, ঝোপ-ঝাড় সাফ হচ্ছে, পুকুর-ডোবা ভরাট করার কাজ চলেছে পুরোদমে, তার ওপর এক হুকুম জারি হয়েছে যে পথে কেউ প্রস্রাব করতে পারবে না। এমন অদ্ভুত আইনের কথা আগে কেউ শোনেনি, অনেক পথচারী মন্তব্য করেছিল, রাস্তায় না মুতে তবে কি লোকে শোবার ঘরে মুততে যাবে ? কিন্তু মসকরার বিষয় নয়, বয়স্ক থেকে বালক নির্বিশেষে বেশ কয়েক জনকে পাহারাওয়ালারা ঐ নির্দেশ ভঙ্গ করার অপরাধে কোতোয়ালিতে ধরে নিয়ে গেছে এবং তাদের জরিমানা করা হয়েছে।

খানিক দূর এগিয়ে রাইমোহন বুঝলো, আজ সে ব্যাপার নয়। পথে মানুষ জন বেশী নেই। পুলিশের সংখ্যাই যেন বেশী। একদল দিশি সিপাহীর সঙ্গে কয়েকজন গোরা-সৈন্যকে কুচকাওয়াজ করে আসতে দেখে রাইমোহন দেয়াল সেঁটে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর আবার একটু এগুতে যেতেই আবার আর একটি ঐ রকম দল।

এক ভোজপুরী বিশালদেহী পাহারাওয়ালা লম্বা লাঠিটিকে বাম বগলে রেখে দু হাতে খৈনী টিপছিল, রাইমোহন তার সামনে গিয়ে মস্ত সেলাম বাজিয়ে জিজ্ঞেস করলো, সিপাহীজী, আজ ব্যাপার কী, এত সেনা-পুলিশের যাতায়াত ?

পাহারাওয়ালাটি তার দিকে কৃপার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, জানো না, আজ অমুক নবাব আসবে ?

সিপাহী যে নবাবের নামটি কী বললো, তা রাইমোহন ঠিক বুঝতে পারলো না। কেমন যেন অচেনা নাম। সে ভাবলো, মরুক গে, নবাব বাদশাদের খোঁজ রেখে তার দরকার কী ? অমন কত রাজা-মহারাজা, নবাব-বাদশা এই শহরে আসে যায় !

একটু রাত হলে কেরাঞ্চি গাড়িগুলো আর পাওয়া যায় না। পাল্কীওয়ালারাও উধাও। রাইমোহনকে হেঁটেই যেতে হবে বৌবাজার পর্যন্ত। সে সন্তর্পণে চতুর্দিকে চেয়ে চলতে লাগলো।

হীরেমণির ছেলে চন্দ্রনাথ সেই যে পলায়ন করেছে, আর সে ফেরেনি। রাইমোহন দু-চারবার দেখেছে তাকে। কখনো সে জাহাজঘাটায় কুলিগিরি করে, কখনো মাটি কাটার কাজ নেয়। রাইমোহনকে দেখলেই সে রক্তচক্ষে তাকায়। রাইমোহন বুঝে গেছে যে ওকে আর ঘরে আনা যাবে না। তার মা এবং রাইমোহনের প্রতি এক সময় যে তীব্র অভিমান ছিল, তা এখন জাতক্রোধ। রাইমোহন চন্দ্রনাথকে দেখতে পাওয়ার কথা হীরেমণিকে আর বলে না।

হীরেমণি তার পেশা একেবারে পরিত্যাগ করেছে। সে আর গানও গায় না। রাইমোহন অনেক করে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, গানটা অন্তত না ছাড়তে, সে হীরা বুলবুল, শহরে তার গানের কত কদর! কিন্তু হীরেমণি কিছুতেই তা শুনবে না! যে বড়মানুষরা তার ছেলের সর্বনাশ করেছে, তাদেরই আবার গান শুনিয়ে সে মনোরঞ্জন করবে? তার ঘৃণা হয়!

রাইমোহন হালকা পায়ে বাড়িতে ঢুকলো। আজ তার মনে বেশ ফূর্তি। সারা বাড়ি অন্ধকার। হীরেমণি আজকাল যখন তখন বাতি নিবিয়ে শুয়ে থাকে। গন্ধক-কাঠি নিয়ে রাইমোহন কয়েকটা বাতি জ্বেলে দিল। নিজের ঘরের পালঙ্কের ওপর হীরেমণি শুয়েছিল উপুড় হয়ে, রাইমোহন তার পিঠে আস্তে হাত রেখে ডাকলো, হীরে, ওঠ্! আজ তোকে একটা গান শোনাবো!

হীরেমণি বললো, না।

রাইমোহন বললো, ওঠ না। এ গান বাবুদের জন্য নয়কো। এ গান শুধু তোতে আমাতে দুজনে শুনবো। ওঠ্, দ্যাক, মন ভালো হয়ে যাবে!

—না।

—হীরে আমার, মানিক আমার, সোনা আমার, আমার দিনের কমলিনী, রাতের কুমুদিনী, ওঠ্!

—না। তুমি খেয়ে নাও গে। খাবার ঢাকা আচে।

রাইমোহন এবার জোর করে হীরেমণির মুখটা ফিরিয়ে বললো, লক্ষ্মীটি, ওঠ্। দুজনে একসঙ্গে বসে খাবো। শোন, হীরে, এই আমার কতা শুনে রাক্। যারা তোর ছেলে চাঁদুর ওপর অবিচের করেচে, তাদের ওপর আমি শোধ নেবোই নেবো, নেবোই নেবো! তুই দেকিস একদিন।

হাটখোলার মল্লিক বাড়িতে জগাই মল্লিকের কনিষ্ঠ সন্তান চণ্ডিকাপ্রসাদের মনে একটাই শুধু খেদ, সে আর তার মধ্যমাগ্রজ মিলে তাদের পিতার শ্রাদ্ধ উৎসব করতে পারলো না এখনো। এ বাড়িতে বিবাহযোগ্য এমন কোনো পুত্র বা কন্যা নেই যে তার বিবাহ উপলক্ষে খুব ধুমধাম করা যায়। বধূরা কোনো নতুন সন্তানও প্রসব করেনি যে তার অন্নপ্রাশনে জাঁকজমক করা যাবে। একটা কোনো সামাজিক উপলক্ষ তো চাই। খ্যামটা নাচ কিংবা বাঈ-নাচ বসত বাড়িতে ঠিক জমে না। আর দোল-দুর্গোৎসবে পোস্তার রাজবাড়ি কিংবা রানী রাসমণিকে কিছুতেই হার মানানো যাবে না। যতই ধুমধাম করো, লোকে তবু ঐ দুই বাড়িতেই ছুটবে।

লোকে কথায় কথায় বলে, শোভাবাজার রাজবাড়িতে ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন পেয়েছিলুম বটে! তেমনটি আর কেউ দেখাতে পারলে না! কিংবা হাটখোলার দত্ত বাড়িতে সেই যে মুখে-ভাত হয়েছেল, তাকেই না বলে মুখে ভাত, ধন্যি ধন্যি, হাজার হাজার লোকের মুখে পোলাও কালিয়া উঠেছিল সেদিনকে। কিংবা ছেরাদ্দ হয়েছেল সেই জোড়াসাঁকোর রামকমল সিংগীর, সে একেবারে রঙের গোলাম তুরুপ, তার ওপর আর কেউ দেখাতে পারলে না।

এই মল্লিক বাড়িতে এখন শুধু একটি শ্রাদ্ধেরই অবকাশ আছে। তখন দেখানো যায় রামকমল সিংহের ছেলেরাই বা কতখানি আর চণ্ডিকাপ্রসাদও কত বড় বাপের ব্যাটা। কিন্তু চণ্ডিকাপ্রসাদের এই অভিলাষ মেটাবার জন্য তার পিতার কোনোই তৎপরতা নেই। জগাই মল্লিক যেন অজর, অমর। তাঁর বয়েস বর্তমানে প্রায় একশো ছুঁই-ছুঁই, তবু এখনো তিনি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে রয়েছেন। কানে শুনতে পান না, তাঁর দন্তহীন মুখের বাক্য একটিও কেউ বুঝতে পারে না, তবু তিনি চলাফেরায় সক্ষম।

চণ্ডিকাপ্রসাদ তার বাপকে দেখে কখনো দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং কখনো কখনো ক্রোধে দাঁত কড়মড় করে। অবশ্য যতক্ষণ চণ্ডিকাপ্রসাদ সুস্থ অবস্থায় বাড়িতে থাকে। ইদানীং এই চিন্তাটি যেন তার মস্তিষ্কে গেঁথে গেছে, এক এক সময় সে ক্ষিপ্ত হয়ে পিতাকে মারতে যায় আর চিৎকার করে বলে, হারামজাদা বুড়ো, বলচি যে তোর ছেরাদ্দে দেশসুদ্ধ কাঁপিয়ে দেবো। তাও মরবিনি ! আয়, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

ভৃত্যরা তৈরিই থাকে, তারা যথাসময়ে চণ্ডিকাপ্রসাদকে ধরে ফেলে।

বাইরে থেকে নেশায় টপ ভুজঙ্গ অবস্থায় বাড়িতে ফেরার সময় সে জড়িত গলায় হাঁক পাড়তে থাকে, মরেচে ? বুড়োটা মরেচে ? অ্যাঁ ? যে আমায় আগে সু-সু-সু-সু-সুসংবাদ দিবি, তাকে পাঁচ মোহর বকশিস কবলাবো। মরেচে, অ্যাঁ ?

সেই সময় জগাই মল্লিক দ্বিতলের বারান্দার লোহার রেলিং ধরে ঠিক দশমেসে শিশুর মতন পা বেঁকিয়ে নাচে আর মুখ দিয়ে ম-ম-ম-ম শব্দ করে।

একদিন জুড়ি গাড়ি থেকে চণ্ডিকাপ্রসাদকে কয়েকজন ভৃত্য মিলে ধরাধরি করে নামালো। তার বাহ্যজ্ঞান নেই কিন্তু সমস্ত শরীরটা তড়কা রোগীর মতন কাঁপছে, আর গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে।

এক যবনী বেশ্যার বাড়িতে নাচের পাল্লা দিতে গিয়ে চণ্ডিকাপ্রসাদ চেতন হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায়, সেই থেকে আর জ্ঞান ফেরেনি।

এ গৃহে এমনই অব্যবস্থা যে কে কার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে, তারও ঠিক নেই। জগাই মল্লিকের মধ্যম পুত্র কালীপ্রসাদই গৃহকর্তা, কিন্তু বিলাসিতা ও রঙ্গ-তামাশায় তিনিও কম যান না। তবে কালীপ্রসাদের একটি অদ্ভুত গুণ আছে, তিনি মত্ত অবস্থায় কখনো গৃহে আসেন না। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর একাধিক রক্ষিতালয় আছে, মাঝে মাঝে সে-সব জায়গায় তিনি কিছুদিনের জন্য ডুব দিয়ে থাকেন। আবার স্বগৃহে, পরিবারের মধ্যে কয়েকদিন সুস্থ অবস্থায় কাটিয়ে যান। হয়তো সেই কারণেই বিষয়সম্পত্তি সব এর মধ্যে গোল্লায় যায়নি। কিংবা, জগাই মল্লিকের জ্যেষ্ঠপুত্র কর্মবীর চিত্তপ্রসাদ এমন শক্ত বাঁধনে তাঁদের বিষয়সম্পত্তি বেঁধে দিয়ে গেছেন যে তার কিছু নষ্ট হবার বদলে দিন দিন যেন শ্রীবৃদ্ধিই হচ্ছে।

চণ্ডিকাপ্রসাদকে যেদিন অচৈতন্য অবস্থায় বয়ে আনা হয় দৈবাৎ সেদিন কালীপ্রসাদ গৃহেই ছিলেন। তিনি ব্যস্ত হয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতার চিকিৎসার জন্য বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ আনালেন। তাঁরা একে একে সকলেই ফিরে গেলেন মুখ গোমড়া করে। ভাবগতিক দেখে মনে হয় পিতৃশ্রাদ্ধ করার সৌভাগ্য বুঝি চণ্ডিকাপ্রসাদের হলো না, বরং চণ্ডিকাপ্রসাদেরই শ্রাদ্ধ বুঝি তার পিতাকে দেখতে হবে।

একদিন দুপুরে নিজের মহল ছেড়ে কুসুমকুমারী এলো মাঝ মহলে পীড়িত খুড়শ্বশুরের অবস্থা জানতে। চণ্ডিকাপ্রসাদের পত্নী দুর্গামণির সঙ্গ তার ভালো লাগে। এ বাড়িতে একমাত্র দুর্গামণির কাছেই কুসুমকুমারী দুটো মনের কথা কইতে পারে।

দুর্গামণি চণ্ডিকাপ্রসাদের তৃতীয়পক্ষ। কলকাতার ধনী পরিবারের একটি নিয়ম এই যে বাবুদের বাইরে যে-কটি রক্ষিতাই থাকুক না কেন, বাড়িতে একটি স্ত্রী রাখতেই হবে। এক স্ত্রী মরলে আবার আর একটি। কায়স্থ বা বৈশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু-বিবাহের বিশেষ চল নেই, কিন্তু এক পত্নী বিয়োগের পর আর একটি পত্নী আনতে কোনো দোষ নেই। বাবু হয়তো মাসের মধ্যে একদিনও রাত্রে নিজ শয্যায় শয়ন গ্রহণ করেন না। কিন্তু অন্তঃপুর শূন্য রাখা চলবে না। বাড়িতে একজন কষ্ট পেয়ে কান্নাকাটি না করলে রক্ষিতালয়ে আমোদ যেন ঠিক জমে না।

ভাগ্যবানের বউ মরে। প্রতিটি নতুন বিবাহ মানেই নতুন করে অর্থ এবং অলঙ্কার প্রাপ্তি। চণ্ডিকাপ্রসাদের ভাগ্য সেই হিসেবে ভালো, তার প্রথমা পত্নী মারা গেছে বিবাহের দু বৎসরের মধ্যে, দ্বিতীয়া পত্নী এ গৃহে এক বৎসর অবস্থান করেই আত্মঘাতিনী হয়েছিল।

দুর্গামণি কান্নাকাটি কিংবা আত্মঘাতিনী হবার মতন পাত্রীই নয়। সে অতিশয় তেজস্বিনী ও আত্মসম্মানসম্পন্না যুবতী। তার পিত্রালয় ফরাসডাঙ্গায়, সেখানে সে কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও শিখেছিল।

তার নরাধম স্বামীকে সে প্রথম দিকে সুপথে আনবার অনেক চেষ্টা করেছিল, পারেনি। এখন সে নিজেই পারতপক্ষে তার স্বামীর মুখ দেখতে চায় না।

দুর্গামণি একটি পশমী আসনে নকশা বুনছিল, কুসুমকুমারীকে দেখে বললো, আয়, বোস।

কুসুমকুমারী জিজ্ঞেস করলো, খুড়ী, উনি কেমন আচেন গো?

দুর্গামণি বললো, ঐ একই রকম।

—জ্ঞান ফেরেনি?

—না।

—ডাক্তাররা কী বলে গ্যালেন আজ?

—ডাক্তাররা কী বলে গ্যাচেন তা আমিও বুঝিনি, তুইও বুঝবিনি। যদি ওঁর নিয়তিতে থাকে, তবে বাঁচবেন!

—ওঁর নিয়তি, না তোমার নিয়তি?

—আমার নিয়তি নিয়ে আমি মাতা ঘামাইনাকো। তুই তো জানিস, আমি মাচ, মাংস খেতে ভালোবাসি না। উনি গেলেন কি রইলেন তাতে আমার ভারি এলো গেল।

কুসুমকুমারী চোখ কপালে তুলে বললো, ওমা, এ কি অলুক্ষণে কতা! ছি ছি, খুড়ী, এমন কক্ষনো বলতে নেই। অন্য কেউ শুনলে কী ভাববে!

দুর্গামণি ফিক করে হেসে ফেলে বললো, আমি বুঝি অন্যের কাচে বলতে গ্যাচি! শুধু তোকেই তো বলি এ সব কতা।

—সত্যি খুড়ী, তোমার বড্ড সাহস।

দুর্গামণি মোটেই অবলা অন্তঃপুরিকাদের মতন নয়। সে বেশ লম্বা, শরীরের গড়নটিও ভালো। চণ্ডিকাপ্রসাদ প্রায়ই তাকে প্রহার করে। চণ্ডিকাপ্রসাদের তো গুণের ঘাট নেই, স্ত্রীকে প্রহার করাও তার বাসনা চরিতার্থ করার একটি অঙ্গ। দুর্গামণি একবার মাত্র একজন দাসীকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে তার পিত্রালয় ফরাসডাঙ্গায় চলে গিয়েছিল। চণ্ডিকাপ্রসাদ লোক পাঠিয়ে তার পত্নীকে আবার জোর করে ফিরিয়ে আনে। দুর্গামণির পিতার অবস্থা হঠাৎ পড়ে গেছে, তাই ধনী জামাইকে প্রতিহত করার ক্ষমতা তার নেই। সেবার চণ্ডিকাপ্রসাদ দুর্গামণিকে খুব প্রহার করায় দুর্গামণিও উলটে দু-এক ঘা দিয়েছিল। কুসুমকুমারী নিজের চক্ষে দেখেছে যে দুর্গামণি নেশায় সংজ্ঞাহীন তার স্বামীর গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারছে।

দুর্গামণির আর একটি কাণ্ড দেখেও অভিভূত হয়ে গিয়েছিল কুসুমকুমারী। দুর্গামণি নিজের হাতে একটি পত্র লিখেছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। সেই পণ্ডিত বিধবাদের বিবাহ দেবার জন্য সপ্তরথী ঘেরা অভিমন্যুর মতন লড়াই করছেন এবং এখন রাজদরবারে একটি আবেদন পাঠিয়েছেন। দুর্গামণি লিখেছিল, আপনার উদ্দেশ্যে শতকোটি প্রণাম। আপনি সার্থক হইলে লক্ষ লক্ষ দুর্ভাগিনী আপনার পায়ে পূজা দিবে। আপনি এ অধীনার প্রণাম লউন। আপনি চিরায়ু হউন।

নিজের হাতের একটি স্বর্ণবলয় খুলে সেই চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিল দুর্গামণি।

কুসুমকুমারী জিজ্ঞেস করেছিল, বিধবাদের বে'র জন্য তুমি এত আকুল হলে কেন গো, খুড়ী?

দুর্গামণি বলেছিল, 'জীয়ন্তে মরা' কতাটা শুনিচিস? আমি হলুম গে স্বামী জীয়ন্তে বিধবা। তোর দশাও তো একই।

কুসুমকুমারী দুর্গামণির পাশে বসলো। দুর্গামণির বেশ আঁকার হাত আছে। কোনো ছবি না দেখেই সে আসনের ওপর ফুল, লতাপাতা সেলাইতে ফুটিয়ে তুলতে পারে। অনেকগুলি এমন সুন্দর সুন্দর আসন সে বানিয়েছে। তবে, এই আসন সে কার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করে? কোন্ হৃদয়েশ্বরকে সে এই আসনে বসাবে? তার কেউ নেই।

দুর্গামণি জিজ্ঞেস করলো, তোরটি আজ কেমন আচে? আজ তেমন চাঁচানি শুনিনি যেন!

স্বামীর প্রসঙ্গ উঠলেই কুসুমকুমারীর মুখখানি ম্লান হয়ে যায়। দুর্গামণির মতন তার অবস্থা নয়। কুসুমকুমারী ইচ্ছে করলেই তার পিত্রালয়ে চলে যেতে পারে। সেখানে সে আদরের কন্যা। তার বাবা তাকে নিয়ে যেতেও চান। এবং তার স্বামী তাকে ফিরিয়ে আনবে না, সে জ্ঞানই তার নেই। কিন্তু কুসুমকুমারীর মা বলেন, ওরে কুসোম, নারীর জীবনে পতিই সব। দ্যাক, তুই এখনো সেবা যত্ন করে তাকে বাঁচাতে পারিস কি না। তাকে ছেড়ে তুই এখেনে থাকলে তোকে যে সারা জীবন দগ্ধাতে হবে!

কুসুমকুমারী বললো, তিনি আজ সকাল থেকেই ঘুমুচ্চেন!

দুর্গামণি বললো, ভালো। ঘুমুনোই ভালো। আমার এক এক সময় মনে হয়, ঐ পাগলের কাছে কাছে থেকে তুইও না এক সময় পাগল হয়ে যাস!

—ও কথা বলো না, খুড়ী। আমার ভয় করে।

—তোকে তো আমি ভয়ই দেখাচ্ছি।

পাশের ঘরে হুড়মুড় করে একটা শব্দ হতেই চমকে উঠলো দুজনে। তারপর ছুটে গেল সেদিকে।

ঘোরের মধ্যে পাশ ফিরতে গিয়ে পালঙ্ক থেকে নীচে পড়ে গেছে চণ্ডিকাপ্রসাদ। যদিও মেঝেতে পুরু গালিচা পাতা, কিন্তু পালঙ্কটিও বেশ উঁচু। নিশ্চয়ই খুব লেগেছে। চণ্ডিকাপ্রসাদ অবশ্য মুখ দিয়ে কোনো শব্দ উচ্চারণ করেনি, চোখও মেলেনি।

কুসুমকুমারী ব্যাকুলভাবে বলে উঠলো, খুড়োঠাকুর পড়ে গ্যাচেন! ও খুড়ী, ধরো ধরো, তোমাতে আমাতে তুলে দিই।

দুর্গামণি কড়া গলায় বললো, দাঁড়া! এই, ছুঁবি না। কত পাঁচ জাতের মেয়েমানুষে ওকে ছোঁয়, সাতজন্মে চান করে না, ওকে ছুঁতে আমার ঘেন্না করে।

কুসুমকুমারী বিস্ময়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল।

তারপর সে বাইরে বেরিয়ে গলা চড়িয়ে ডাকলো, চন্নবিলাসী! চন্নবিলাসী!

দুর্গামণির নিজস্ব দাসীটি ডাক শুনে উপস্থিত হতেই সে বললো, যেদো আর মেধোকে ডেকে নিয়ায়। বাবু পড়ে গ্যাচেন, তুলতে হবে।

যেদো আর মেধো এই বাবুর পেয়ারের চাকর। তাদের কাছাকাছি থাকার কথা সব সময়। কিন্তু তখুনি খোঁজাখুঁজি করে তাদের পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত দেউড়ির বাইরে থেকে ধরে আনতে হলো তাদের, তারা সেখানে বসে গাঁজা টানছিল।

ততক্ষণ মেঝেতেই পড়ে রইলো চণ্ডিকাপ্রসাদ, দুর্গামণি তাঁর পাশে এসে একবার নাড়ি দেখলো না পর্যন্ত।

তবু শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে চণ্ডিকাপ্রসাদ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো।

চণ্ডিকাপ্রসাদের বয়েস এখন চল্লিশ। তার জীবনের এখনো অনেক কিছু বাকি আছে। অতি অল্প বয়েস থেকেই সে কুসঙ্গে পড়েছে ও সুরা ও নারীতে মজেছে বলে জীবনের অন্য কোনো ভালো দিকের কথা সে জানেই না। সে জানে না স্নেহ-মমতার মূল্য সামান্য বিদ্যাশিক্ষাও করেনি বলে সে নিজের ঘেরাটোপের বাইরের জগতের কথাও কিছু জানে না। সে শুধু জানে, টাকা ছড়াতে পারলে কিছু লোক সব সময় ঘিরে থাকে ও নানাভাবে খাতির করে। যত টাকা ছড়াও, তত বেশী খাতির।

যতদিন তার চলাফেরার ক্ষমতা ঠিক মতন হলো না, ততদিন সে দুর্গামণিকে ননাভাবে জ্বালাতন করলো। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হাজার গণ্ডা হুকুম। কোনো মানুষকে সুস্থির হয়ে বসে থাকতে দেখা তার পছন্দ হয় না। বেশ কয়েক বছরের মধ্যে সে দুর্গামণির সঙ্গে এতদিন একটানা থাকেনি। দুর্গামণি তার কাছ ঘেঁষতে চায় না বলে সে প্রথমে বিস্ময়, তারপর ক্রোধ প্রকাশ করতে শুরু করে। এবং হুমকি দেয়, দেখিস মাগী, তোর তেজ ভাঙবো। আমি আর একটা বিয়ে করবো!

একদিন মদ্যপান না করে যে থাকতে পারে না, সেই ব্যক্তি পুরো এগারো দিন গলায় একবিন্দু ঢালেনি। চিকিৎসকদের কড়া নির্দেশ, তার কাছে যেন কোনোক্রমেই সুরা না পৌঁছোয়। অবশেষে যেদো ও মেধোর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে দ্বাদশ দিনের মাথায় সে একটি সুরার বোতল হস্তগত করলো এবং তা থেকে কাঁচা চুমুক দিয়ে অনেকখানি টেনে নিল একসঙ্গে। সুরা নয়, যেন জাদু! তাতেই সে আবার জেগে উঠলো শেরের মতন। রীতিমতন একটি হুংকার দিল পর্যন্ত।

তখনই সে বেরুবে। তার প্রিয় পোশাক পরে নিল সে। পাজামা, রামজামা, কোমরবন্ধ, মাথায় বাঁ-কান-ঢাকা টুপী। হাতে একটি লাল রুমাল। সেই রুমাল ঘোরাতে ঘোরাতে সে 'পরেরো মনেরো ভাবো বুঝিতে কি পারে পরে' গাইতে গাইতে নামতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। যাবার সময় দুর্গামণির সঙ্গে একটি বাক্য বিনিময় পর্যন্ত করলো না।

সদরে সিংহদ্বারের সামনে তার পিতার সঙ্গে দেখা হলো। জগাই মল্লিক তখন দুজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে বৈকালিক ভ্রমণ সেরে ফিরছেন। তাকে দেখে মাথায় একটি চাঁটি মারার লোভ অতিকষ্টে দমন করলো চণ্ডিকাপ্রসাদ। শুধু রোষকশায়িত নেত্রে তাকিয়ে বললো, ভেবেছিলে আমিই আগে পটোল তুলবো! বড় মজা, না?

তারপর থেকে চণ্ডিকাপ্রসাদের নিয়মিত জীবনযাত্রা শুরু হলো। সেই দু-তিনদিন অন্তর একবার

করে চূড়ান্ত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরা টাকার খোঁজে। এর মধ্যে বৈচিত্র্য কিছু নেই।

কয়েকদিন পর আর একটি বৈচিত্র্য ঘটালো কুসুমকুমারীর স্বামী অঘোরনাথ।

বড় পরিতাপের বিষয় এই যে, এ পরিবারের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানটিই উন্মাদ। অঘোরনাথ জ্ঞানপিপাসু মেধাবী যুবক ছিল। কাকাদের ভ্রষ্টাচার তাকে একটুও স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু ধর্ম-উন্মাদনায় বিঘ্ন ঘটায় সে মস্তিষ্ক ঠিক রাখতে পারলো না।

অঘোরনাথ গোড়ার দিকে থাকতো চুপচাপ, কোনো কথা না বলা কিংবা আপন মনে অর্থহীন শব্দ উচ্চারণই ছিল তার রোগের লক্ষণ। কিছুদিন হলো সে হিংস্র হয়ে উঠেছে। দীর্ঘকায় সুপুরুষ সে। শরীরে দারুণ শক্তি, একটি ভৃত্যের গলা টিপে তাকে প্রায় হত্যাই করেছিল একদিন। তার থেকেও ভয়াবহ কথা, সে একদিন তার ঘুমন্ত জননীকে পাঁজাকোলা করে তুলে তিনতলা থেকে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েছিল নীচে। সেদিন একটা কেলেঙ্কারিই হয়ে যেত আর একটু হলে।

অঘোরনাথকে এখন লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। বাড়ির একটি অতি বৃদ্ধা দাসী ছাড়া সে আর কারুকে চিনতে পারে না। সেই দাসীটিই তাকে প্রত্যহ দু বেলা খাইয়ে দেয়। আর কেউ ধারে কাছে ঘেঁষলেই সে চোখ ঘূর্ণিত করে গর্জন শুরু করে দেয়।

হঠাৎ একদিন কোন উপায়ে যেন অঘোরনাথ শিকল খুলে বেরিয়ে এলো। প্রথমেই সে একটি বৃহৎ অতি সুদৃশ্য চীনে মাটির পাত্র ভাঙলো আছাড় দিয়ে। তারপর অদূরে তার জননীকে দেখে তাড়া করে গেল।

সারা বাড়িতে একটা দারুণ ত্রাসের সৃষ্টি হলো। ভূমিকম্পের সময় দিশাহারা মানুষের মতন সকলে ছুটলো এদিকে ওদিকে। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মুখভর্তি গুম্ফ-দাড়ি, কোমরে শুধু একটু ফালি জড়ানো, অঘোরনাথকে দেখায় যেন ভয়ংকর রুদ্রের মতন। আজ বুঝি কারুর রক্ত না নিয়ে ছাড়বে না।

ভৃত্যকুল ও দ্বারবানরা ছুটে এলো তাকে সামলাবার জন্য। কিন্তু কেউ কাছে আসতে সাহস করে না। অঘোরনাথ যার দিকে তাকায়, সে-ই প্রাণভয়ে দৌড়োয়। চিৎকার চ্যাঁচামেচিতেও কান পাতা দায়। কেউ ভগবানের নাম জপছে। কেউ বলছে কেল্লায় খবর পাঠাতে।

কালীপ্রসাদের দুই পুত্র শিবপ্রসাদ ও অম্বিকাপ্রসাদ দ্বিতলের বারান্দা থেকে নানাপ্রকার নির্দেশ দিতে লাগলো ঐ উন্মাদকে ধরবার জন্য। তাদের নিজেদের এগোবার সাহস নেই। অঘোরনাথ তখন নীচতলার উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার জননী ওপর থেকে হাপুস নয়নে কেঁদে বলছেন, ওরে, ওকে তোরা বাইরে যেতে দিসনি। তাহলে আর ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে না; ওরে, যেমন করে পারিস ধর! আমি একছড়া সোনার হার দেবো, যে ধরবে—

শিবপ্রসাদ ও অম্বিকাপ্রসাদের নির্দেশে দ্বারবানেরা শেষ পর্যন্ত বড় বড় লাঠি এনে পেটাতে লাগলো অঘোরনাথকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে মার খেতে লাগলো এবং গজরাতে লাগলো। একটা সুবিধে এই যে, মনুষ্যেতর প্রাণীদের মতন অঘোরনাথ কোনো অস্ত্র ধারণ করতে ভুলে গেছে। কোনো এক ভোজপুরীর হাতের লাঠি যদি কেড়ে নিয়ে সে রুখে দাঁড়াতো, তাহলে অনেকেই ঘায়েল হতো। তার বদলে, মার খেতে খেতে সে এক সময় পড়ে গেল মাটিতে; তখন দশ-বারোজনে মিলে তাকে চেপে ধরে আবার শিকল নিয়ে এসে বাঁধলো।

অঘোরনাথকে শিকল বাঁধা অবস্থায় টানতে টানতে ফিরিয়ে আনা হলো তার কক্ষে। যেন বিরাট একটা যুদ্ধ জয় করা গেছে, এইভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো সকলে।

শুধু বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগলেন অঘোরনাথের জননী। তিনি কপাল চাপড়ে চাপড়ে বলতে লাগলেন, কী কুক্ষণেই তোকে আমি নিষেধ করিছিলুম, বাপ আমার! আমার কী কুগ্রহ! তুই বেহ্ম হ, কেরেস্তান হ, তোর যা খুশী, শুধু একবার সাদা চোখ মেলে চা, আমায় একবার মা বলে ডাক। অঘোর, বাপ আমার, একবার চেয়ে দ্যাখ।

তাঁর পাশে পুত্তলির মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে কুসুমকুমারী। তার যেন কথা বলারও শক্তি নেই। অঘোরনাথ যদি তাকে তাড়া করে যেত, তবে সে বুঝি পলায়ন করতেও পারতো না। তার স্বামীকে সকলে মিলে যখন বাঁশ পেটা করে মারছিল, তখন সেও শিউরে শিউরে উঠছিল। কুসুমকুমারী যেন আর সহ্য করতে পারছে না।

শাশুড়ির কান্না শুনতে শুনতে কুসুমকুমারীরও যেন এক সময় মতিভ্রম হলো। সে হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার স্বামীর শিকল বাঁধা পায়ের ওপর। সেখানে মাথা কুটতে কুটতে সে বলতে

লাগলো, আপনি ভালো হয়ে উঠুন, আপনি ভালো হয়ে উঠুন। হে ঠাকুর, ওনাকে ভালো করে দাও !

অঘোরনাথ চোখ মেলে দেখলো একবার : সেই চোখে বিস্ময়। ভাবখানা যেন, এ আবার কে ? বেশ কিছুক্ষণ সে কুসুমকুমারীকে দেখলো। তারপর, পায়ের ওপর যেন কোনো পোকামাকড় পড়েছে এই ভঙ্গিতে সে দু পায়ে সজোরে ঝাঁকুনি দিল একবার। তাতেই কুসুমকুমারী ছিটকে গিয়ে দেয়ালের কাছে পড়লো এবং দেয়ালে ঠুকে তার মাথা ফেটে গেল।

তখন ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হলো কুসুমকুমারীকে।

অনেক পরে কুসুমকুমারী সুস্থ হয়ে যখন ভালোভাবে চোখ মেললো, তখন দেখলো, তার শিয়রের কাছে বসে আছে দুর্গামণি। সে কুসুমকুমারীর সারা গায়ে নরম হাত বুলোচ্ছে।

কুসুমকুমারীকে চোখ মেলতে দেখে দুর্গামণি উঠে গিয়ে ঘরের অর্গল বন্ধ করলো। তারপর ফিরে এসে শয্যার ওপর আবার বসে সে উষ্ণ স্বরে বললো, তুই ওর পায়ে পড়তে গেলি কেন ?

কুসুমকুমারী কোনো উত্তর দিতে পারলো না।

দুর্গামণি আবার বললো, বল্, চুপ মেরে আছিস কেন ? বল্ ?

কুসুমকুমারী ধীরে ধীরে বললো, কী জানি, খুড়ী, মাতাটা কেমন যেন গুলিয়ে গেল !

—বলেছিলুম না, ঐ পাগলের সঙ্গে থাকতে থাকতে তুইও একদিন পাগল হবি ! শোন, আমি একটা কথা বলবো, তুই করতে পারবি ?

কুসুমকুমারী তার নীল, কোমল ছলছল চক্ষু দুটি স্থাপন করলো দুর্গামণির মুখে।

—একদিন ওকে বিষ খাইয়ে দে ! সব জ্বালা জুড়োক। আমার কাচে বিষ আচে, তুই খাওয়াতে পারবি ?

—তুমি কী বলচো, খুড়ী ?

—ঠিকই বলচি ! ও পাগল আর কোনোদিন ভালো হবে না। তুই বিধবা হ, তোর আমি আবার বিয়ে দেবো। তোর জন্যই তো আমি সাগরকে চিঠি দিয়েচি ! আমি তো কুড়িতে বুড়ি, আমার জীবন শেষ, কিন্তু তোর অল্প বয়েস।

—খুড়ী !

—বুকে সাহস আন, কুসোম ! ভালো করে বাঁচতে শেক্ ! মাতাল, পাগল—এদের সঙ্গে কেন আমরা ঘর করবো ? আমাদের সাদ-আহ্লাদ নেই ! আমি সব সময় বিষ কাচে রাকি, কারুকে আমি ভয় পাই না ! তোকে যা বললুম, পারবি ?

পাশ ফিরে দুর্গামণির কোলে মাথা গুঁজে কুসুমকুমারী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগলো, অমন কতা বলো না খুড়ী, ও সব কতা শুনলেও যে পাপ !

রানী রাসমণির জেদ শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয়েছে। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন মহা সমারোহে।

সমারোহ মানে কী, তেমনটি আর কেউ কখনো দেখেনি। বাংলায় ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদর তো কম নেই, কিন্তু আর কেউ এত বৃহৎ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাও করেননি, এ রকম বিপুল উৎসবের আয়োজনও কেউ করতে পারেননি। শুধু অর্থ থাকলেই হয় না, সেই অর্থ ব্যয় করার মতন অন্তঃকরণও থাকা দরকার।

রানী রাসমণি দাপটের সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর এই মন্দির সমষ্টি প্রতিষ্ঠিত করলেন এমন একটি সময়ে, যখন হিন্দুধর্ম নানাদিক থেকে বহু রকম আক্রমণে পর্যুদস্ত। অনেক হিন্দু শাস্ত্র এবং সংস্কৃত গ্রন্থ অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল প্রায়, ইংরেজ পণ্ডিতগণই তা উদ্ধার করেন। আবার এক শ্রেণীর ইংরেজ সেই সব শাস্ত্র ঘেঁটেই প্রমাণ করতে চান যে, হিন্দু ধর্মের মধ্যে কত রকম বর্বর প্রথা ও বিশ্বাস রয়েছে। খৃষ্টান

মিশনারিরা হিন্দু ধর্মের অকাট্য সব দোষ তুলে ধরেছেন ভারতবাসীর সামনে এবং সেই সুবাদে তাদের আকৃষ্ট করছেন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে। অন্যদিকে ব্রাহ্মরাও হিন্দু ধর্মের নানান ত্রুটির কথা প্রচার করছেন, দেব-দেবীরা তাঁদের চক্ষে পুতুল মাত্র, এবং এই পুতুল পূজা তাঁদের কাছে দু-চক্ষের বিষ। শুধু কি তাই, সম্প্রতি তাঁরা এমনও ঘোষণা করেছেন যে, বেদ অপৌরুষেয় নয় এবং বেদ বাক্য মাত্রই অভ্রান্ত নয়। হিন্দু ধর্মের পরম পবিত্র গ্রন্থের প্রতি এই আঘাত হেনে ব্রাহ্মরা আরও দূরে সরে গেলেন।

শিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার এবং অনৈতিক প্রথাগুলি সম্পর্কে ঘৃণা বোধ করেন। এই কি সেই মহান ধর্ম যা স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার বিধান দেয়। এই ধর্মে পুরুষের বহুবিবাহ প্রশস্ত কিন্তু নারী যদি ছ-সাত বছরেও বিধবা হয়, তাহলেও তাকে সারা জীবন বঞ্চিত, অসহ দিনাতিপাত করতে হবে। এই সেই ধর্ম যেখানে একজন মানুষ বিদ্যায় বুদ্ধিতে অন্যের চেয়ে উচ্চ হলেও শুধু সে জন্ম কারণে শূদ্র বলেই ব্রাহ্মণ ইত্যাদি জাতির সঙ্গে একাসনে বসতে পারবে না! এই সেই ধর্ম, যে ধর্মের মানুষ মুসলমান চাষীর শ্রমে ফলানো ধান অম্লান বদনে আহার করবে কিন্তু মুসলমানের হাতে ছোঁয়া জল পান করবে না।

অনেক মুক্তমনা হিন্দু, যাঁদের মনের মধ্যে ধর্মের জন্য আকুতি আছে, কিন্তু বিজাতীয় খৃষ্ট ধর্মও গ্রহণ করতে চান না, ব্রাহ্মদের সম্পর্কেও পুরোপুরি আস্থা নেই, তাঁরাও নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন এই ধর্মের নানা দোষের কারণে।

এই রকম সময়ই কালীপদ অভিলাষী রাসমণি দাসী পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মেই নতুন প্রাণ সঞ্চারের জন্য দক্ষিণেশ্বরে শুরু করলেন এই মহাযজ্ঞ। জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসী তিথিযোগে জগন্নাথের স্নানযাত্রার দিনটি শুভযোগ, সেইদিন হলো প্রতিষ্ঠা-উৎসব। বরাহনগর থেকে নাটমন্দির পর্যন্ত পথের দু-পাশে টানানো হলো ঝাড়ি লণ্ঠন। মধ্যে মধ্যে এক একটি বাঁধা মঞ্চে বাজনদাররা বাজনা বাজাচ্ছে। সমনের তোরণটি যেন আকাশচুম্বী এবং বহু বর্ণ সব কুসুমে সজ্জিত।

শুধু নিমন্ত্রিতের সংখ্যাই প্রায় এক লক্ষ, এছাড়া অনাহুত, রবাহুত যে কত, তার ইয়ত্তা নেই। রানী রাসমণির নির্দেশ যে কেউই অভুক্ত অবস্থায় কিংবা দান না নিয়ে ফিরে যাবে না। বারাণসী, পুরী, পুণা, মান্দ্রাজ থেকেও তিনি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আনিয়েছেন; নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, কোটালিপাড়ার কোনো ব্রাহ্মণই বাকি নেই। দেশের সম্ভ্রান্ত নাগরিকদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সকলকে। গঙ্গার বুকে পিনিস, বজরা বোট, ভাউলিয়া প্রভৃতি জলযান গিসগিস করছে, আবার রাজপথে গাড়িও অসংখ্য।

মন্দির প্রাঙ্গণের এক পাশে অনেকগুলি হৃষ্টপুষ্ট গোরু বাঁধা, এক পাশে স্তূপাকার পট্টবস্ত্র। এছাড়াও কয়েকটি পাহাড় সাজিয়েছেন, রৌপ্য মুদ্রার পাহাড়, সন্দেশের পাহাড়, পাকা কলার পাহাড়, অন্নের পাহাড়। কলকাতার বাজার তো বটেই, পানিহাটি, বৈদ্যবাটি, ত্রিবেণী ইত্যাদি সন্নিহিত সব এলাকার বাজার সাফ করে আনা হয়েছে সন্দেশ, সব মিলিয়ে পাঁচশত মণ। আর অন্নের পাহাড়টি তো অন্নমেরু পর্বত! রানী রাসমণি সম্মান অনুসারে ব্রাহ্মণদের গোধন, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এবং বস্ত্র দান করবেন। এবং অন্ন ও মিষ্টদ্রব্য ইত্যাদি উৎসর্গ করবেন দেবতাকে।

উৎসবের কয়েকদিন আগে একটি বাধা দেখা দিয়েছিল। মাহিষ্য সম্প্রদায়কে গোঁড়া ব্রাহ্মণের দল শূদ্র বলে মনে করে, সেই শূদ্র প্রতিষ্ঠিত মন্দিরকে ব্রাহ্মণরা অশাস্ত্রীয় বলে ঘোষণা করেছিল। তারপর ঝামাপুকুর টোলের রামকুমার পণ্ডিতের বিধান মতন দেবালয়টি রানী রাসমণি তাঁর গুরুদেবের নামে আগে উৎসর্গ করায় সে সংকট থেকে উত্তীর্ণ হওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ঐ মন্দিরের প্রতিদিনের পূজারী হবেন কে? কোনো শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতই শূদ্রের বেতনভুক্ পূজারী হতে সম্মত হলেন না, সামাজিক অপবাদের ভয়ে। শেষ পর্যন্ত রানী রাসমণির নির্দেশে তাঁর জামাতা মথুর ঐ রামকুমার চট্টোপাধ্যায়কেই সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন মন্দিরের পূজার ভার গ্রহণ করার জন্য।

সব ব্রাহ্মণই পূজারী নয়। বঙ্গে ভট্টাচার্যরাই বংশানুক্রমিক পূজারী। চট্টোপাধ্যায় বংশীয় রামকুমার রানীর প্রস্তাবে কিছু দ্বিধা করেছিলেন প্রথমে। জীবিকার জন্য তিনি কামারপুকুর থেকে এসে কলকাতার ঝামাপুকুরে টোল খুলেছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর রামকুমারের ওপরেই সংসারের ভার বর্তেছে। অধ্যাপনা ছেড়ে তিনি বেতনভুক পূজারী হবেন? এদিকে রানী রাসমণি মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন পর্যন্ত ঘোষণা করে ফেলেছেন, পুরোহিতের অভাবে যে সব পণ্ড হয়ে যায়! রামকুমার শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলেন।

নিয়তি নির্বন্ধে রামকুমারই হলেন মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনের হোতা। সঙ্গে তাঁর ছোট ভাই গদাধর, তাঁর বয়েস এখন উনিশ। গদাধর বড় লাজুক প্রকৃতির। গ্রাম থেকে এসে এখনো সে এখানকার

লোকজনদের সঙ্গে ঠিক মতন মিশতে পারে না।

বারাণসীর পট্টবস্ত্র পরে রামকুমার পূজায় নিরত, এক পাশে হাত জোড় করে চক্ষু মুদে বসে আছেন রানী রাসমণি, তাঁর মুখখানি ভক্তি ও তৃপ্তির ভাবে বিভোর। অন্যদিকে বসে আছে যুবক গদাধর, মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাবার ভয়ে সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাশ ছাড়েনি একবারও। তার দুই চোখ বিস্ময়াবিষ্ট, এত মানুষ, এত দ্রব্য, আর নবরত্নের মন্দিরটি যেন একটি পর্বত। গদাধরের এক ভাগিনেয় হৃদয়ও এসেছে সঙ্গে। সে বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও গদাধরের চেয়ে অনেক চটপটে, সে ঘোরা রি করছে চতুর্দিকে।

জানবাজারের মাড় পরিবারের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবারের সম্পর্ক অনেক দিনের। তাই সিংহ পরিবারকে রাসমণি বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দক্ষিণেশ্বরের উৎসবে যোগদান করার জন্য। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে নবীনকুমারকেই। তবে সে একা আসেনি, জননী বিম্ববতীকেও সঙ্গে এনেছে।

বিম্ববতী গৃহ থেকে নির্গত হতেই চান না। পূর্ণিমা অমাবস্যায় শুধু একবার করে যান গঙ্গাস্নানে। তাও ঘেরাটোপ পাল্কিতে, এবং সেই পাল্কি সমেতই তাঁকে জল ডুবিয়ে আনা হয়। নবীনকুমার অনেকবার বলেছে তাঁকে কোনো তীর্থ দর্শন করে আসতে কিন্তু বিম্ববতী তাতে সম্মত নন, পুত্রমুখ দর্শন না করে তিনি একদিনও থাকতে পারবেন না।

নবীনকুমার বলে, মা, আমি যখুন মহাল পরিদর্শন করতে যাবো, তখুন তুমি কী করবে ? তুমিও কি আমার সঙ্গে সঙ্গে বজরায় ঘুরবে ?

বিম্ববতী উত্তর দেন, তোর বাবা মহাল দেকতে গিয়ে কাজ নেই; সেজন্যে অনেক লোক আচে !

নবীনকুমার বলে, আমার ঠিক বয়েসটা হোক না, তখন দেকো চর্কির মতন ঘুরবো। বিষয় সম্পত্তি নিজে না দেকলে চলে ?

মহাল পরিদর্শনে গিয়েই গঙ্গানারায়ণ নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে, সে কথা ভেবে বিম্ববতীর এখনো বুক কাঁপে। তিনি ঐ সব কথা শুনে নবীনকুমারের হাত চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে বলেন, না, না, তুই কক্ষুনো মহালে যাবি না! বিষয় যা আচে, ঢের আচে, দূর থেকে চালালেই যথেষ্ট চলবে।

নবীনকুমার মায়ের কথা শুনে হাসে।

নিমতলা ঘাট থেকে বজরায় চেপে অনুকূল জোয়ারে এক ঘণ্টার মধ্যেই নবীনকুমারেরা পৌঁছে গেল দক্ষিণেশ্বরে। সদ্য দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হয়েছে, উৎসব তখন তুঙ্গে। জননীকে নিজের হাতে ধরে নবীনকুমার তীরে নামালো বিম্ববতীর মুখ ঘোমটায় ঢাকা, কোনোদিন তিনি সূর্যালোকে অচেনা মানুষের সামনে বেরোননি, এই মধ্যবয়েসেও তিনি নববধূর মতন ব্রীড়াকুণ্ঠিতা।

লোকের ভিড়ে পথ চলা দায়। দুলাল এবং আরও কয়েকজন কর্মচারী মিলে সামনে থেকে পথ সাফ করে দিতে লাগলো। নবীনকুমার তার মাকে ধরে ধরে নিয়ে এলো পূজামণ্ডপে।

গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্য আলাদা ঘেরা জায়গায় বসবার স্থান নির্দিষ্ট আছে। একদিকে পুরুষ, অন্যদিকে রমণী। নবীনকুমার বিম্ববতীকে একটি গালিচা-মোড়া কেদারায় বসিয়ে দিল। সে নিজে বসলো না, এক জায়গায় বেশীক্ষণ বসে থাকার মানুষ সে নয়। সে পরে আছে কোঁচানো ধুতি এবং লম্বাহাতার জামা, এবং পরিবার-প্রধানের চিহ্ন হিসেবে সে হাতে নিয়েছে একটি ছড়ি। আর কোনো পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক যুবককে ছড়ি-লাঠি হাতে দেখা যাবে না।

নবীনকুমার ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো সব ব্যবস্থা। রাজা-মহারাজা থেকে শুরু করে দেশের নাম করা ব্যক্তিরা প্রায় সবাই এসেছেন। নবীনকুমার খুঁজতে লাগলো একজনকে। তিনি আসেননি। তিনি নবনীকুমারের গুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতরা প্রায় সকলেই উপস্থিত, তাঁরা রানী রাসমণির অর্থ বস্ত্র দান গ্রহণ করেছেন, শুধু অনুপস্থিত তাঁদের অধ্যক্ষ।

নবীনকুমার ভাবলো, তিনি আসেননি কেন ? তিনি কোনো জায়গা থেকে দান গ্রহণ করেন না বলে ? কিংবা ঈশ্বরচন্দ্রকে বোধ হয় অনেকে আজকাল ব্রাহ্মণ বলেই মনে করে না। তিনি নাকি সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন না, কোনো ঠাকুর-দেবতার পূজা করতেও কেউ কখনো দেখেনি তাঁকে। এ কী ধরনের ব্রাহ্মণ ? তা ছাড়া তিনি এখন বিধবা বিবাহের ব্যাপারে মহা ব্যস্ত।

এত বড় নবরত্ন মন্দির, নাটমহল ও সার সার শিবমন্দির এবং এত জাঁকজমক দেখে নবীনকুমার প্রথমটায় বেশ অভিভূত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আসেননি দেখে নবীনকুমারেরও খানিকটা ভক্তি কমে গেল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও দেখতে পেল না নবীনকুমার। ব্রাহ্মরা সদলবলে এই অনুষ্ঠান বর্জন করেছে। ইয়ংবেঙ্গলের দলও যে আসবে না, তা যেন জানাই ছিল, তবু তাদের দু-একজনকে সেখানে দেখে নবীনকুমার চমৎকৃত হলো। সাহেবীভাবাপন্ন ইয়ংবেঙ্গল দলেরও কয়েকজনের মধ্যে ভক্তিভাব দেখা দিচ্ছে তা হলে!

সন্ধ্যা হতে না হতেই জ্বলে উঠলো রোশনাই। উৎসব এখনো অনেক রাত পর্যন্ত চলবে। নবীনকুমারের আরও কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছে ছিল। গঙ্গাতীরের এই স্থানটি বড় মনোরম। লোকের ভিড় থেকে সরে গিয়ে যেখানে গাছপালার ঝোপজঙ্গল, সেখানে বসে থাকতে বেশ ভালো লাগছিল তার। কিন্তু বিম্ববতী উতলা হয়ে পড়েছেন, তিনি বারবার দাসী মারফৎ খবর পাঠাচ্ছেন নবনীকুমারের কাছে।

বিম্ববতীর হাত ধরে নবীনকুমার নিয়ে এলো ঘাটের কাছে। বজরায় উঠতে গিয়ে হঠাৎ তার একটা কথা মনে পড়লো। এতগুলি মন্দিরের কোনো বিগ্রহকেই সে প্রণাম জানায়নি। একবার তার ইচ্ছে হলো, ছুটে গিয়ে প্রণাম করে আসে। তারপর আবার ভাবলো, থাক। দূর থেকে প্রণাম জানালেও তো হয়।

সে তখনও তার জননীর হাত ধরে থমকে আছে। বিম্ববতী জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো?

নবীনকুমার বললো, কিছু না।

তারপর সে বজরায় উঠে পড়লো। এবং দূর থেকেও প্রণাম জানালো না।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রানী রাসমণির দাক্ষিণ্য, মহানুভবতা এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে ধন্য ধন্য করা হলো দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে। শুধু ব্রাহ্মরা নীরব রইলো। পৌত্তলিকতা নিয়ে নতুন ভাবে এই আড়ম্বর তারা সুনজরে দেখলো না।

ব্রাহ্মদের নিজেদের মধ্যেও খানিকটা অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। এই ধর্ম প্রতিষ্ঠার পর দ্বাদশ বৎসরের একটি যুগ পার হয়েছে। এবার দেখা দিয়েছে একটি সংকট। দেবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন নিষ্কলুষ ধর্ম সাধনা এবং পরম ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে। এবং পৌত্তলিকতা ও নানারকম কুসংস্কার বর্জন করে হিন্দু ধর্মেরই একটি পরিশুদ্ধ রূপ দিতে। কিন্তু ইদানীং তাঁর সন্দেহ হচ্ছে যে কতকগুলান নাস্তিক তাঁর এই সভার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকদের অশ্রদ্ধা করেন, খৃষ্টানদের অপছন্দ করেন এবং নাস্তিকদের মনে করেন অমানুষ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করেন দেবেন্দ্রনাথ, কিন্তু সেই পত্রিকায় বর্তমানে অধ্যাত্মতত্ত্বের বদলে শুষ্ক জ্ঞানচর্চারই বেশী পরিচয় দেখা যাচ্ছে। সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের ঝোঁক যেন ঐ দিকেই। আর একজন রচনা-পরীক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তিনি তো কোনো ধর্ম-আলোচনার মধ্যেই থাকেন না। অক্ষয়কুমার আবার একটা রচনা লিখেছেন, "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার"। রচনাটি দেখে বিরক্ত হয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ। তিনি খুঁজছেন ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, আর এরা মাথা ঘামাচ্ছে বাহ্যবস্তু নিয়ে? এরা কি মানুষের মনের মধ্যে ঢুকতে জানে না? ঐ অক্ষয়কুমারের শুধু বিচারের দিকে ঝোঁক। ওঁরই প্ররোচনায় দেবেন্দ্রনাথ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে বেদের সব কিছুই অভ্রান্ত নয়।

অক্ষয়কুমার আরও একটি কাণ্ড করে দেবেন্দ্রনাথকে আরও চটিয়ে দিলেন। রামমোহনের অনুসরণে অক্ষয়কুমারও একটি আত্মীয় সভা স্থাপন করেছেন। ব্রাহ্মসমাজে শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা আসেন, সেই সুযোগ নিয়ে অক্ষয়কুমার তাঁদের মধ্যে নিজের মতাদর্শ প্রবিষ্ট করিয়ে দিতে চান। ঐ আত্মীয় সভায় অক্ষয়কুমার একদিন বললেন, আচ্ছা, ঈশ্বর যে অনন্ত তার কী প্রমাণ আছে? আপনারা সকলেই বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ? আচ্ছা, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ কি না তার বিচার করা যাক। কে কে বিশ্বাস করেন ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, হাত তুলুন তো?

এ সংবাদ শুনে দেবেন্দ্রনাথের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। হাত-তোলা ভোটাভুটিতে ঈশ্বরের স্বরূপ বিচার? এতদূর স্পর্ধা! তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা একেবারে বন্ধ করে দেবার অভিপ্রায় জানালেন, শুধু

তাই নয়, গোটা ব্রাহ্মসমাজের ওপরেই অভিমান করে ভাবলেন এর সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক ছেদ করবেন। এমনকি সংসারও পরিত্যাগ করে চিরকালের জন্য চলে যাবেন হিমালয়ে। সেখানে গিয়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ঈশ্বরচিন্তা করবেন। এবং সত্যিই সেরকম উদ্যোগ আয়োজন করতে লাগলেন।

নবীনকুমার ষোড়শ বর্ষে পা দিয়ে দু-একদিন ব্রাহ্মসভার অধিবেশনে যোগ দিতে এলো। তার গৃহে বিদ্যোৎসাহী সভা এখন জমজমাট। প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন সদস্য আসছে এবং নানাপ্রকার চিত্তাকর্ষক বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। কিন্তু নবীনকুমারের জ্ঞানস্পৃহা তাতেও মেটে না। শহরের যেখানে যেখানে বিদ্বজ্জন সমাগম হয়, সেখানেই সে যেতে চায়।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে নবীনকুমার নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারলো না। প্রথম বাধা বয়সের। ব্রাহ্মসমাজের সকল সভ্যেরই বয়েস নবীনকুমারের দ্বিগুণেরও বেশী। সে প্রায় বালক বয়েসী বলে সভাচলাকালীন অবস্থায়ও সকলে তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চায়। তছাড়া, ব্রাহ্মদের মুখের ভাষা অতি সুগম্ভীর, এক একজন বক্তৃতা শুরু করে আর থামতেই চান না। পরম ব্রহ্মের প্রসঙ্গে অনেকের চক্ষু থেকে অশ্রু গড়ায়। এই সব দেখে শুনে তার হাসি পেয়ে যায়। স্বভাব-চঞ্চল নবীনকুমার এ রকম সভায় আর কতক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে থাকবে!

তাছাড়া একজন দলত্যাগী ব্রাহ্মও খানিকটা প্রভাবিত করলো তাকে। লোকটির নাম যদুপতি গাঙ্গুলী। নবীনকুমারের চেয়ে সে বয়সে কিছু বড়, সে রীতিমতন দীক্ষা নিয়ে ব্রাহ্ম হয়েছিল, তারপর আবার ব্রাহ্মদের সংস্পর্শ ত্যাগ করে এক পাদ্রীর কাছে গিয়ে ইউনিটারিয়ান মতবাদে বিশ্বাসী হয়েছে। সে মাঝে মাঝে বিদ্যোৎসাহী সমিতিতেও আসে। নবীনকুমারের সঙ্গে তার বেশ সৌহার্দ্য হয়েছে।

সেই যদুপতি গাঙ্গুলী একদিন বললো, ভাই নবীন, তুমি আজকাল ব্রাহ্মদের সভায় যাতায়াত করচো, শুনচি।

নবীনকুমার বললো, ওঁদের ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কোচ্চি।

যদুপতি বললো, আমার ভাই বড়ই আশাভঙ্গ হয়েচে। বড় আশা নিয়ে আমি ওঁদের কাচে গেসলুম। কিন্তু দেকলুম, ওঁদের কতায় আর কাজে মেলে না।

—কী রকম!

ব্রাহ্মরা বলেন, ওঁরা পুতুল পুজোয় বিশ্বাস করেন না। অথচ দ্যাকো, সব ব্রাহ্মদের বাড়িতেই এখনো পাথরের নুড়ি কিংবা মাটি কিংবা কাঠের দেবতা রয়েচে। ওঁরা নিজেরা হয়তো পুজো করেন না, কিন্তু তাঁরা নিজের বাড়িতেই এখনো ঐসব পুজো বন্ধ করতে পারেননি, তাহলে সারা দেশে বন্ধ হবে কী করে! এমনকি, ঐসব পুজোর খরচাও ওঁরা দিচ্চেন। দেবেন্দ্রবাবুর বাড়িতে যে দোল-দুর্গোৎসব হয়, তার খরচা তো ওঁর এস্টেট থেকেই জোগাতে হয়।

নবীনকুমার চুপ করে রইলো।

—তারপর দ্যাকো, ব্রাহ্মদের মধ্যে তো জাতিভেদ নেই। সবাই এক ঈশ্বরের পূজারী। এঁদের মধ্যে আবার ভেদাভেদ কী? কিন্তু বলো, বামুন-কায়েতরা ব্রাহ্ম হতে পারে কিন্তু কোনো শূদ্রও কি ব্রাহ্ম হবে? কোনো বামুন-ব্রাহ্মের ছেলেমেয়ের সঙ্গে কোনো কায়েত-ব্রাহ্মের ছেলেমেয়ের বিবাহ হয়েছে এ পর্যন্ত? আমি কিন্তু দিকিনি।

নবীনকুমার তর্কে যেতে চায় না। সে ফস করে বললো, যাই বলো, দুর্গাপুজো কিংবা দোল বা রথযাত্রার উৎসব আমার বেশ ভালো লাগে।

—তাহলে তুমি ব্রাহ্মদের কাচে যাও কেন?

—দুটো জ্ঞানের কতা শুনতে। হরেক রকম মানুষজন দেক্‌তে!

নবীনকুমার একদিন শুনতে পেল শহরের আর একটি বাড়িতে যুবকরা বিদ্যাচর্চার জন্য মিলিত হয়। প্রখ্যাত দেওয়ান রামকমল সেনের পৌত্র কেশবকে ঘিরে বসে এই আসর।

হিন্দু কলেজে পড়বার সময় কেশবকে কয়েকবার দেখেছে নবীনকুমার। তার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। গম্ভীর, স্বল্পভাষী যুবক, সহজে অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। এমন কি কেউ কোনো প্রশ্ন করলেও উত্তর দেয় না সহসা। নবীনকুমারের খুব একটা পছন্দ হয়নি কেশবকে। এত কিসের অহংকার!

কিছুদিন আগে কেশব সম্পর্কে একটা গুজব শুনে নবীনকুমার একটু খুশীই হয়েছিল মনে মনে। কেশব নাকি কলেজের পরীক্ষায় টোকাটুকি করতে গিয়ে ধরা পড়ে ভর্ৎসিত হয়েছে। এই ছেলের আবার অহংকার, হেঃ!

যদুপতিই নবীনকুমারকে বোঝালো একদিন যে, না, কেশব ছেলেটিও মোটেই সাধারণ নয়। সে ভাবুক প্রকৃতির মানুষ, বাল্যকাল থেকেই তার মধ্যে একটা শুদ্ধতার প্রকাশ পেয়েছে। সে পড়াশুনোও করে অগাধ। বন্ধু ও পরিচিত মণ্ডলীতে সে যখন কোনো বিষয়ে কথা বলে তখন সকলে নিঃশব্দে চিত্রার্পিত হয়ে শোনে। সম্প্রতি কেশব তার বন্ধুদের নিয়ে একটি থিয়েটার করারও ব্যাপার নিয়ে মেতেছে।

নবীনকুমার একদিন যদুপতির সঙ্গে গেল কলুটোলায় কেশবদের বাড়ির আসরে। এখানকার যুবকরা সকলেই প্রায় তার কাছাকাছি বয়েসী, এদের সঙ্গে সখ্য স্থাপনে তার কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়।

তবু এখানেও কারুর সঙ্গে মনের মিল হলো না নবীনকুমারের।

কেশব বক্তৃতা দেয় ইংরেজি ভাষায়, এমন কি বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলে ইংরেজিতে। যে নাটকের তারা মহলা দিচ্ছে, তার নাম হ্যামলেট।

ইংরেজ গৃহশিক্ষকের কাছে পাঠ নিয়ে নবীনকুমারও ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছে। কিন্তু এমন নির্লজ্জ পরানুকরণ তার পছন্দ হয় না। বাঙালীরা ধর্ম-বিষয়ক আলোচনাও করচে ইংরেজিতে, হায়!

নবীনকুমার সেখানেও যাওয়া বন্ধ করে দিল।

হীরা বুলবুলের পুত্র চন্দ্রনাথকে ভরতি করা উপলক্ষে হিন্দু কলেজ ভেঙে যায়। বারবনিতার সন্তানকে গ্রহণ করার জন্য শহরের গণ্যমান্য অভিভাবকরা নিজেদের সন্তানদের এ কলেজ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পৃথক কলেজ স্থাপন করেছিলেন। গৌরবোজ্জ্বল, ঐতিহ্যবাহী হিন্দু কলেজের হীন দশা দেখে কর্তৃপক্ষ অচিরেই তাঁদের ভ্রম বুঝতে পারেন এবং তা শুধরে নেবার জন্য বিনা আড়ম্বরে, এক কথায়,অবাঞ্ছিত কুকুরের মতন চন্দ্রনাথকে দূর করে তাড়িয়ে দেন। নানাপ্রকার প্রলোভন দেখিয়ে প্রাক্তন ছাত্রদের ফিরিয়ে আনারও চেষ্টা চলতে থাকে। ছাত্ররা ফিরে আসতেও শুরু করে এবং নব প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজটি ভেঙে যায়।

কিন্তু হিন্দু কলেজ তার আগেকার রূপ আর ফিরে গেল না। হীরা বুলবুল আর তার পুত্রের ঘটনার প্রভাব মুছে ফেলা সহজ নয়। হিন্দু কলেজের নিয়মকানুনের আমূল সংস্কার করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন অনেকেই। এবং তারই পরিণতিতে হিন্দু কলেজ রূপান্তরিত হলো প্রেসিডেন্সি কলেজে। এই প্রেসিডেন্সি কলেজ চলে এলো পুরোপুরি সরকারী ব্যবস্থাপনায়, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল ছাত্রেরাই এখানে প্রবেশের সুযোগ পেল। এর স্কুল শাখাটির নাম অবশ্য রইলো হিন্দু স্কুল। অন্যান্য স্থানে আরও কলেজ স্থাপিত হয়েছে এবং ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে বলে প্রেসিডেন্সি কলেজকে কেন্দ্র করে কলকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেরও উদ্যোগ চলতে লাগলো।

হিন্দু কলেজের অনেক প্রাক্তন ছাত্রই পড়াশুনা করতে লাগলো প্রেসিডেন্সি কলেজে, কিন্তু চন্দ্রনাথের পক্ষে আর ফিরে আসা সম্ভব হলো না। এই রকম জীবন থেকে সে চলে গেছে অনেক দূরে। এর মধ্যে তার এমনই পরিবর্তন হয়েছে যে তাকে দেখে আর সহজে চেনার উপায় নেই। ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে সে মাতৃ-সান্নিধ্য ছেড়ে অনেক আগেই পথ-নিবাসী হয়েছে। রাত্রিকালে যাদের মাথার ওপর ছাদ থাকে না, যাদের দু-বেলা নিশ্চিন্ত অন্ন নেই, তাদের সব সময় একটা লড়াইয়ের মনোভাব রাখতে হয়। প্রায় অধিকাংশই এই লড়াই চালিয়ে যায় নিয়তির সঙ্গে। মাত্র দু-একজনই বাস্তব যুদ্ধে জয়ী হয়।

মায়ের কাছে চন্দ্রনাথ ছিল অতি আদরের সন্তান, ননী-মাখন খাওয়া শরীর, কখনো কোনো কষ্টভোগ করেনি। জেদের বশে পথে নেমে আসায় সে সব রকম দুঃখ-কষ্টকে অগ্রাহ্য করতে শিখেছে, পরিবেশ অনুযায়ী রূপান্তরিত হয়েছে তার শরীর। কৈশোর ছাড়িয়ে সে এখন যৌবনে উত্তীর্ণ, হঠাৎ অনেক লম্বা হয়ে গেছে, কণ্ঠস্বর বদলেছে, মাথায় বড় বড় চুল, চিবুকে দাড়ির রেখা। তার নামও এখন আর চন্দ্রনাথ নয়, শুধু চাঁদু, বা উচ্চারণ বৈগুণ্যে চেঁদো।

প্রথম কিছুদিন সে শারীরিক পরিশ্রমের বিনিময়ে আহার সংগ্রহ করতো, এখন তার থেকে সহজতর উপায় পেয়েছে। এখন তার ডেরা নিমতলা শ্মশানঘাটে।

মানুষের জীবিকার এমনই বৈচিত্র্য যে কিছু মানুষ শ্মশানে মৃতদেহগুলি'কে অবলম্বন করেই চমৎকারভাবে নিজেদের বেঁচে থাকার উপাদান সংগ্রহ করে নেয়। শুধু চণ্ডাল নয়, আরও কিছু কিছু লোক থাকে যাদের ওপর নির্ভর করতেই হয় মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের। কাঠ সংগ্রহ করা, পুরুত ডেকে আনা থেকে শুরু করে আরও বহুবিধ কাজ থাকে।

চাঁদু এখন ছোটখাটো একটি দলের নেতা। এই নেতৃত্ব তাকে অর্জন করতে হয়েছে। বনের মহিষের পালের মধ্যে একটি করে নেতা-মহিষ থাকে। কোনো আগন্তুক মহিষ দেখলেই সেই নেতা-মহিষটি লড়াই করে তাকে তাড়িয়ে দেয়। কখনো বা আগন্তুক মহিষটিই জেতে এবং তার পরই সে-ই পালটির নেতা হয়ে যায়। দুনিয়ার সর্বত্র এই নিয়মই চলছে।

নিমতলার শ্মশানঘাটে পরগাছাদের দলে চাঁদু সহজে স্থান পায়নি। বেশ কয়েকবার মার খেয়ে তাকে পালাতে হয়েছে সেখান থেকে। তারপর একদিন সে ঐ দলের নেতা ফকিরের সঙ্গে মারামারি করতে করতে দুজনে একসঙ্গে গড়িয়ে পড়ে যায় জলে, সেই জলের মধ্যে ফকিরের ঘাড়টা চাঁদু ঠুসে ধরে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। ফকির সেবার মারা যায়নি বটে কিন্তু দেখা গেল যে তার ডান হাতটি ঠুঁটো হয়ে গেছে। চাঁদু তার হাতটি এত জোরে পিছমোড়া করে ধরেছিল যে মটমট করে তার হাড় ভেঙে যায়।

এ সব বৎসর খানেক আগেকার ঘটনা। এখন চাঁদুর কোমরে একটা ছুরি গোঁজা থাকে। মাথায় লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা, হাতে একটি ডাণ্ডা। ইচ্ছে করেই সে তার চেহারাটি ভয়ংকর করে রেখেছে। মৃতদেহ নিয়ে কোনো একটি দল এসে পৌঁছোলেই চাঁদু তার দলটি নিয়ে ঘিরে দাঁড়ায়। তার অনুমতি ছাড়া কোনো ডোমও কাছে এগোয় না। কেমন ধারার দাহ হবে, চন্দন কাঠ না জারুল কাঠ, কতখানি ঘি আর কর্পূর। চার ঘণ্টার চিতা না ছ' ঘণ্টার চিতা—এইসব বিষয় আগে ঠিক করে নিতে হবে চাঁদুর সঙ্গে। মৃতের গায়ের জামা-কাপড়, খাট-পালঙ্ক এসবও প্রাপ্য চাঁদুর দলের। পোস্তার বাজারে এগুলো ভালো দামে বিক্রি হয়। অবশ্য বিক্রির জন্য এসব নিয়ে চাঁদুদের পোস্তার বাজার পর্যন্ত যেতে হয় না, সেখান থেকেই নিয়মিত ফড়েরা আসে।

তেমন শাঁসালো মড়া তো আর রোজ আসে না, মাসে দু মাসে দুটি একটি। হেঁজিপেঁজি ধরনের লোকই বেশী মরে, তারা অল্প কাঠে কোনো রকমে মুখাগ্নি করে আধপোড়া শব জলে ভাসিয়ে দেয়। সে সব ক্ষেত্রে ঐ অর্ধদগ্ধ দেহ বহন করে জলে ফেলার মজুরি আদায় করে চাঁদুর দল। যার কাছ থেকে যেমন পাওয়া যায়।

চাঁদুর একটা বিশেষ শখ আছে। চিতায় কিছুক্ষণ জ্বলবার পর একটা সময় শবের মাথাটা জোরে জোরে লাঠির বাড়ি মেরে ফাটাতে হয়, নইলে ও জিনিসটি সহজে পোড়ে না। এই কাজটি চণ্ডালদের বদলে চাঁদু নিজে নেয়। গাঁজার নেশায় চক্ষু লাল, কপালে লাল কাপড়ের ফেট্টি, হাতের প্রকাণ্ড লাঠিটা ঘুরিয়ে চাঁদু লাফিয়ে লাফিয়ে দমাস দমাস করে মারে। খুলিটা চৌচির হয়ে যখন ছিটকে বেরোয় ঘিলু, তখন তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তখন তাকে দেখায় কালভৈরবের মতন। তখন তাকে দেখলে কে বুঝবে যে একদিন এই লোকটির মাথাতেই শেক্সপীয়ার, বাইরন, কালিদাসের কবিতার লাইন গজগজ করতো।

এই তো পাথুরেঘাটার মল্লিকবাড়ির ছোটবাবুর শব এসেছিল গত মাসে, আর পরশু এসেছিল, বাগবাজারের বোসেদের অকালমৃত সেজো ছেলেটি, চাঁদুই তাদের মস্তক চূর্ণ করেছে।

যখন চিতা জ্বলে না, শ্মশান জনশূন্য, তখন চাঁদু তার দলবল নিয়ে বসে থাকে জলের ধারে। হাতে হাতে ফেরে গাঁজার কল্কে। তখনও তাদের একটা কাজ থাকে। যতই গল্পে মেতে থাকুক, তাদের চোখ থাকে স্রোতের দিকে।

হীরা বুলবুলের কাছ থেকে একটি গুণ পেয়েছে চাঁদু, তার গানের গলাটি খাসা। নানান উৎসবে বাবুরা গঙ্গায় প্রমোদতরণী নিয়ে বাঈজীদের গান শুনতে শুনতে যায়। রথযাত্রা, লক্ষ্মী পুজোর সময়

গঙ্গাবক্ষ এই সব নৌকোতে একেবারে ছয়লাপ। শুনে শুনে কয়েকটা গান চাঁদুর মুখস্থ হয়ে গেছে। তার মধ্যে এই গানটি তার সবচেয়ে প্রিয়।

যাবি যাবি যমুনাপারে ও রঙ্গিনী
কত দেখবি মজা রিষড়ের ঘাটে শামা বামা দোকানী
কিনে দেবো মাতা ঘষা, বারুইপুরের খুন্‌সী খাসা
উভয়ের পুরাবি আশা, ও সোনামনি।

হঠাৎ এক সময় গান থামিয়ে চাঁদু চেঁচিয়ে ওঠে, ঐ দ্যাক, দ্যাক! অমনি তার দলের ছেলেরা চেঁচিয়ে ওঠে, কোতা? কোতা?

গঙ্গার স্রোতে প্রায়ই একটি দুটি মৃতদেহ ভেসে যায়। অনেক দূর দূরান্ত থেকেও এমন শব আসে। কিন্তু চাঁদুর দলের ছাড়পত্র না পেয়ে কোনো শব নিমতলা ঘাট পার হতে পারে না।

চাঁদুর নির্দেশ মতন তার দল ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে এবং প্রায় শুশুকের মতন ডুব সাঁতার দিয়ে ঠিক সেই মৃতদেহটিকে ধরে পারে টেনে আনে। তারপর সেটি তন্নতন্ন ভাবে পরীক্ষা করা হয়। অনেক সময় শবের আঙুলে থাকে সোনার আংটি অথবা পায়ে রূপোর চুটকি। তামা বা রূপোর তাগা-মাদুলি মৃতদেহ থেকে আত্মীয়রা খুলে নেয় না, সেগুলি সবই চাঁদুদের প্রাপ্য। পাঁচটা শবের মধ্যে অন্তত একটা থেকে কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই।

শবদেহ পাড়ের কাছে আসলেই শকুনি আর হাড়গিলের পাল ধেয়ে আসে। তখন চাঁদুর দল লাঠিসোঁটা নিয়ে তাদের তাড়া করে যায়। শকুনিগুলো উড়ে পালালেও হাড়গিলেরা সহজে যেতে চায় না, তারা রীতিমতন লড়াই করে। কিন্তু হাড়গিলেরা মৃতদেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, এটা চাঁদুর দল পছন্দ করে না। জলের জিনিস তারা আবার জলকে ফেরত দেয়।

এই শ্মশানে দুটি চণ্ডাল। একজনের নাম ঝিনিয়া, আর একজনের নাম তাড়ু। তাড়ু আবার তার বউকে নিয়ে থাকে একটি গোলপাতার ঘরে। ঝিনিয়াটা যেমন গাঁজাখোর, তেমনি মাতাল, অধিকাংশ সময়েই তার চলৎশক্তি থাকে না। ঝিনিয়া যে কোথা থেকে এখানে এসেছে তা জানে না কেউ, অদ্ভুত হিন্দী-বাংলা মেশানো তার ভাষা, বয়েসও হয়েছে যথেষ্ট। চাঁদুর দল ঝিনিয়াকে নিয়ে নানারকম মস্করা করে, তার গাঁজার কল্কে কিংবা মদের ভাঁড় কেড়ে নিয়ে পালায়। তারপর ঝিনিয়া যখন নতুন নতুন স্বরচিত বীভৎস গালাগালির ঝড় বইয়ে দিতে থাকে, সেই সময় ওদের একজন কেউ পেছন দিক থেকে চুপি চুপি গিয়ে তার কোমরের কষি টেনে কাপড়টা খুলে দেয়। অমনি ঝিনিয়া শুরু করে দেয় তাণ্ডব নাচ। এই নিয়ে বেশ সময় কাটে।

তাড়ু সেই তুলনায় বেশ শান্ত ও গম্ভীর, বয়েসে চল্লিশের বেশী না, কালো কুচকুচে শরীর, মাথার চুল তেল চুকচুকে। তাকে দেখে কেউ চণ্ডাল বলে মনেই করবে না, কিন্তু ঝিনিয়ার চেয়ে তাড়ু কাজে অনেক বেশী দক্ষ। তার বৌয়ের নাম মতিয়া, কিছুদিন আগেও সে ইংরেজ পাড়ায় মেথরানী ছিল। কোন্ মন্ত্রবলে যে সে মতিয়াকে বিয়ে করে এই শ্মশানে রাখতে পেরেছে, তা তাড়ুই জানে। মতিয়ার সঙ্গে চাঁদুর দলের সকলের বেশ ভাব আছে।

হয়তো তাড়ু স্নানটান করে খেতে বসেছে, এমন সময় কোনো একটা বড় দল এসে উপস্থিত হলো। ঝিনিয়া অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে, তাড়ুকেই আসতে হবে। অভুক্ত অবস্থাতেই তাড়ু চলে আসে, মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের কান্নাকাটি পর্বে সে ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে থাকে এক পাশে, নিজের লাঠিটিতে ভর দিয়ে। তারপর মুখাগ্নি হয়ে গেলে সে সাজানো চিতার তলায় ভালো করে আগুন জ্বেলে দিয়ে আবার খেতে চলে যায়। খাওয়া সেরে আঁচিয়ে ভেজা মুখেই সে ফিরে এসে শবের পা মুড়ে দেয়।

মতিয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঝগড়া বেঁধে যায় ঝিনিয়ার। তাড়ুর বউ আছে, আর তার নেই, এটা মাঝে মাঝে ঝিনিয়া সহ্য করতে পারে না। এক এক রাত্রে সে তাড়ুর গোলপাতার ঘরে জোর করে ঢুকে পড়ে। তাড়ু কিছু বলে না, মতিয়াই সব ব্যবস্থার ভার নেয়। ঠেলতে ঠেলতে সে ঝিনিয়াকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসে, তারপর তার বাপান্ত করতে করতে একটা পোড়া কাঠ তুলে নিয়ে তাকে পেটায়।

চাঁদুরা কিছুক্ষণ মজা দেখে। এক সময় অবস্থা চরমে পৌঁছোলে তারা এগিয়ে গিয়ে বলে, আরে আর পেটাসনি, বুড়োটা তো মরে যাবে।

মতিয়া বলে, মরুক, মরুক গিধ্ধরটা!

চাঁদু ওর কাছ থেকে পোড়া কাঠটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে মতিয়া চোখ পাকিয়ে বলে, তবে তোর মু ভেঙে দিব ! তোহার ঘিলু ছটকাবো !

চাঁদু হাসতে হাসতে পিঠ ফিরে বলে, মার ! মার দেখিনি আমায় !

সবাই মিলে ধরাধরি করে ঝিনিয়াকে গঙ্গায় ফেলে দেয় ঝপাং করে।

সবাই জানে, ঝিনিয়া ওতেও মরবে না। বড্ড কড়া জান তার, ঠিক আবার বেঁচে উঠবে।

এইভাবে চাঁদুর দিন বেশ কেটে যাচ্ছে।

মাঝখানে একটা ঘটনা ঘটেছিল। হঠাৎ দেখা গেল প্রতিদিন বিকেলবেলা একজন ভদ্রবেশী সুশ্রী চেহারার যুবক এখানে এসে জলের ধারে বসে থাকে। এখানে ঘাট বলতে কিছু নেই, কয়েকটি গাছের গুঁড়ি ফেলা আছে, জোয়ারের সময় সেগুলোও ডুবে যায়। যুবকটি এসে সেখানে বসে। অপরাহ্নে নদীর জলে সূর্যাস্তের শোভা দেখতে দেখতে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং মাঝে মাঝে পকেট থেকে একটি নোট বই বার করে তাতে কী সব লেখে।

লোকটিকে দেখে খটকা লাগে চাঁদুর দলের। এ আবার কী চায় ? শ্মশানে তো কেউ বিনা কারণে আসে না। পাশের আনন্দময়ীতলায় অনেকে স্নান করতে আসে। এদিকে স্নানার্থীরাও আসে না। এ লোকটা যেন তাদের জায়গা জুড়ে বসেছে।

চাঁদুরা লোকটির পাশে বসে খিস্তি-খাস্তা হই-হল্লা করলেও লোকটি ভ্রূক্ষেপ করে না। সে যেন ধ্যানস্থ, আপনভাবে বিভোর। লোকটির নাকে সোনালী ফ্রেমের রিমলেশ চশমা। গায়ে পাতলা ফিনফিনে জামা, কাঁধে একটি গোলাপী রঙের চাদর।

কখনো জ্বলন্ত চিতার পাশে এসেও দাঁড়িয়ে থাকে লোকটি। তখন তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে। এ যে এক তাজ্জব ব্যাপার। কার না কার মড়া তার ঠিক নেই, সেজন্যও এ লোকটি কাঁদে !

লোকটিকে চাঁদুর সহ্য হয় না। একে জব্দ করার জন্য সে তার সঙ্গীদের নিয়ে একটি মতলব এঁটে ফেলে।

ঘাটের গুঁড়িগুলো অনেক দিন থাকার জন্য কাদার মধ্যে গেঁথে আটকে আছে। একদিন চাঁদুর দল সেই গুঁড়িগুলো তুলে তুলে আলগা করে রাখে। তারপর সেদিন বিকেলে যুবকটি এসে একটা গুঁড়ির ওপর বসেছে, একটু পরে চাঁদু তার হাতের লাঠিখানা দিয় পেছনে দিক থেকে সেই গুঁড়িটায় একটি চাড় দেয়। অমনি লোকটি সমেত গুঁড়িটি গড়িয়ে চলে জলের দিকে ! ধ্যান ভেঙে যুবকটি দু হাত তুলে উচ্চকণ্ঠে বাবা রে, মা রে, গেলুম রে বলে চেঁচিয়ে ওঠে। এবং সটান গিয়ে পড়ে জলের মধ্যে।

বোঝাই যায় যুবকটি সাঁতার জানে না। জলে পড়ে সে দু-একবার মাত্র বাঁচাও, বাঁচাও বলতে পারে, তারপর হাবুডুবু খায়। যথেষ্ট নাকানি-চোবানির পর যুবকটি যখন স্রোতের টানে পড়তে যাচ্ছে, সেই সময় চাঁদুর দল লম্ফ দিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

সুদৃশ্য বস্ত্র পরিহিত যুবকটিকে এখন দেখায় ভিজে বেড়ালের মতন চোপসানো। দম নিতে তার খানিকক্ষণ সময় লাগে।

তারপর সে অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, তোমরা এমন কেন কল্লে, ভাই ?

চন্দ্রনাথের দল হো হো করে হেসে ওঠে।

লোকটি হাতজোড় করে আবার সেই রকম একই কণ্ঠে বললো, ভাই, তোমরা কেন এমন কল্লে ? আমি কী দোষ করিচি ?

চাঁদুর এক স্যাঙাৎ ন্যাড়া তার কাছা টেনে খুলে দেবার চেষ্টা করলো।

লোকটি তখন মুক্তকচ্ছ অবস্থায় কোনো রকমে মান বাঁচাবার জন্য চোঁ-চাঁ দৌড় মারলো।

চাঁদুর দলের কাছে এটা নির্মল আনন্দের ব্যাপার। ন্যাড়া হাসতে হাসতে বললো, ও বোক্‌চৈতন আর কোনোদিন ইদিকে আসবে না।

চাঁদু বলে, আসবে, আসবে। সব ব্যাটাকেই আসতে হবে। এমন ঘাঁটি আগলে আচি যে সব ব্যাটাকেই আসতে হবে একদিন না একদিন। সব ব্যাটার মাতা ফাটাবো !

এর চেয়ে অনেক বেশী রোমহর্ষক ঘটনাও ঘটে মধ্যে মধ্যে।

এক রাতে ফিনিক দিয়ে জ্যোৎস্না ফুটেছে আর বাতাস বইছে এলোমেলো। এমন রাতে গাঁজার নেশা বড় ভালো জমে আর তার সঙ্গে চেল্লামেল্লি গান। অশথ গাছটার গায়ে একটা গোলপাতার মাচা বেঁধে চাঁদু তার দলবল নিয়ে বসে থাকে। কিন্তু গান গাইবার উপায় কী, তার মধ্যে ঝিনিয়া এসে দারুণ

হল্লা লাগিয়ে দেয়, ছেলেদের চড়-চাপাটি খেয়েও সে থামতে চায় না।

সেই সময় চারজন লোক একটা শবের খাট বয়ে নিয়ে এসে শ্মশানতলায় সেটি নামিয়ে রেখেই দৌড় লাগায়।

চাঁদু ঠিক দেখে ফেলে তার সাগরেদদের বলে, আরে, আরে, লোকগুলো কোতায় গেল দ্যাক তো!

ন্যাড়া খানিকটা এগিয়ে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে জানায়, ব্যাটারা ভেগে যাচ্ছে, ওস্তাদ!

সবাই হই হই করে তাড়া করে যায় সেই শবযাত্রীদের। কিন্তু তারা দিকবিদিক শূন্য হয়ে ছুটে পালাচ্ছে, তাদের ধরা যায় না। অনেকের ধারণা, এই নিমতলা শ্মশানে দুটো ভূত আছে, সেইজন্য রাত-বিরেতে ভাড়া করা শ্মশানযাত্রীরাও সহজে এদিকে আসতে চায় না। ওরা কি ভূতের ভয়েই পালালো! অথবা ওদের কাছে ঘাট-খরচা নেই!

চাঁদু তার দলবল নিয়ে ফিরে আসে মড়ার খাটের কাছে।

পরিষ্কার চাঁদের আলোয় দেখা যায় চাদর দিয়ে ঢাকা এক আলুলায়িতকুন্তলা, গৌরবর্ণা যুবতীর মুখ। মনে হয় যেন জীবন্ত, চোখ দুটি সম্পূর্ণ খোলা। চাঁদুর মনে হলো সেই চোখ দুটি যেন তার দিকেই চেয়ে আছে।

চাদরখানি একটুখানি সরাতেই এক দৃশ্য দেখে চাঁদু এবং তার সঙ্গীরা শব্দ করে আঁতকে ওঠে। যুবতীটির নগ্ন বুকের ঠিক মাঝখানে একটি ছুরি বেঁধা। তখনও সেখানে থকথকে রক্ত জমে আছে।

প্রতিদিন নানারকম মৃতদেহ দেখলেও চাঁদুর সঙ্গীরা ভয় পেয়ে যায়। সবাই সরে যায় দূরে।

একজন বলে, কোনো বড় ঘরের মেয়ে, খুন করেছে!

অপর একজন বলে, রেণ্ডি, রেণ্ডি!

আর একজন বলে, বেঁচে আচে, এখুনো বেঁচে আচে!

চাঁদু কাছে গিয়ে ঝুঁকে মেয়েটির গাল ধরে এপাশ ওপাশ নাড়িয়ে দেয়। জীবনের কোনো লক্ষণ তাতে প্রকাশ পায় না।

ন্যাড়া একটানে সরিয়ে দেয় চাদরটা। এবার আরও বিস্ময়ের পালা। যুবতীটির অঙ্গে এক টুকরো বস্ত্রও নেই।

কয়েক মুহূর্ত ওরা চুপ করে থেকে পরস্পরের দিকে চায়। এমন সুন্দর নারীদেহ ওরা কখনো চক্ষে দেখেনি। চাঁদের আলোয় সেই শরীর যেন আরও অপার্থিব দেখায়।

হঠাৎ ন্যাড়া একটা উৎকট চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই যুবতীর শরীরের ওপর। পাগলের মতন সেখানে মুখ ঘষতে থাকে।

কী করচিস, কী করচিস বলে চাঁদু তার চুলের মুঠি ধরে তাকে তোলবার চেষ্টা করে। কিন্তু ন্যাড়া কিছুতেই উঠবে না। শেষ পর্যন্ত চাঁদু এক লাথিতে তাকে ছিটকে ফেলে দেয়।

তখন আরও দুজন ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই মৃতদেহের ওপর। চাঁদু তাদেরও সরাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সবাই যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। কেউ আর তার কথা শুনতে চায় না। ন্যাড়া উঠে এসে বলে, তুমি সরে যাও, ওস্তাদ!

বাকি সবাই একেবারে পথের ছেলে, কিন্তু চাঁদুর এক সময় বাড়ি ছিল। সেইজন্য এ বীভৎসতা সে ঠিক সহ্য করতে পারে না। সে একাই চেষ্টা করে সবাইকে সরিয়ে দেবার, কিন্তু এই উপলক্ষে যেন তার দলে একটা বিদ্রোহ দেখা দিল। কেউ তাকে আর মানছে না।

অবিলম্বেই বিদ্রোহ দমন করবার জন্য চাঁদু বিশেষ একজনকে টেনে নেয় এবং নিজে ছুরিটা তার গলায় চেপে ধরে বলে, একদম শেষ করে দোবো। সব কটাকে আজ খতম করবো।

ন্যাড়া সেই যুবতীটির বুক থেকে ছুরিটা টেনে খুলে নিয়ে চাঁদুকে রুখতে আসে। কিন্তু হাতে একটা ছুরি থাকলেই ন্যাড়া যদি জিততে পারতো, তা হলে তো সে-ই নেতা হতো। ন্যাড়া মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পর চাঁদু যুবতীর শরীর আড়াল করে দাঁড়ায়। চিৎকার করে বলে, আয়, কে আসবি!

বিদ্রোহ প্রশমিত হলে চাঁদু বলে, ধর, সবাই হাত লাগা, একে মা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হবে।

একজন তখনও দুর্বল গলায় বলে, যদি বেঁচে থাকে এখনো!

—যদি বেঁচে থাকে, মা গঙ্গা ওকে বাঁচাবেন।

ধরাধরি করে শেষ পর্যন্ত ওরা যুবতীর দেহটিকে নিয়ে ভাসিয়ে দেয় জলে। ন্যাড়া ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে। এ পর্যন্ত ন্যাড়াকে কেউ কখনো কাঁদতে দেখেনি। ভাগ্যহীনা যুবতীটি কোন্ বেঘোরে, কার হাতে মারা গেছে কে জানে! কেউ তার জন্য শোক করেছে কিনা তারও ঠিক নেই। তবু তো

শ্মশানঘাটে একজন তার জন্য কাঁদলো।

সম্প্রতি এখানে আরও একটি কাণ্ড ঘটেছে।

বর্ষার রাত্রে চাঁদুরা সবাই ঘুমিয়ে ছিল। সেদিন একটাও মড়া আসেনি। এক সময় শোনা গেল তাড়ুর ঘর থেকে একটা ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজ। মতিয়াও যেন ভয় পাওয়া গলায় গোঙাচ্ছে। ন্যাড়া প্রথমে সেই আওয়াজে জেগে উঠে ডেকে তুললো চাঁদুকে।

নিশ্চয়ই ও ঘরে হাড়গিলে ঢুকেছে। হাড়গিলেরা মারামারি করবার সময় ঐ রকম আওয়াজ করে।

সবাই মিলে দৌড়ে গেল তাড়ুর ঘরের দিকে।

ন্যাড়া প্রথম ঢুকেই বেরিয়ে গেল জিভ কেটে। তারপর মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করে বললো, আরিঃ সাবাশ! মতিয়ার একটা বাচ্চা হয়েছে!

এখনো যেন পুরোপুরি নির্ধারিত হয়নি, ভারতবর্ষ দেশটা ঠিক কাদের। হিন্দুরা অবশ্য মনে করে এ দেশটি পুরোপুরি হিন্দুদেরই, তাদের শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে আর্য রক্ত, সুপ্রাচীন কাল থেকে তাঁরা এই সমুদ্র-মেখলা, পর্বত-মুকুট ভূমির উত্তরাধিকারী। তাদের ধর্ম, তাদের কৃষ্টি, তাদের জীবনযাপন প্রণালী এই দেশের মাটিকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। যদিও ছশো সাড়ে ছশো বছর ধরে এ দেশ শাসনের অধিকার নেই তাদের হাতে, তবু তারা মুসলমানদের মনে করে বহিরাগত। মুসলমানদের ধর্মে প্রবল আরবী গন্ধ, তারা মক্কা-মদিনার দিকে ফিরে নামাজ পড়ে, তাদের আচার ব্যবহার সবই হিন্দুদের বিপরীত। যদিও কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলমানরা হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রেখেছিল, তবু হিন্দুরা উচ্চনাসা, আত্মাভিমানী, তারা মুসলমানদের সঙ্গে সামাজিকভাবে মেশে না। গোপনে তারা মুসলমানদের অসভ্য মনে করে।

এ দেশের অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত। হিন্দুরা শৌর্য বীর্য হারিয়েছে বহু আগেই এবং যত তারা শক্তিহীন হয়েছে, ততই তাদের মধ্যে হাজার রকমের জাতপাতের সংস্কার বেড়েছে, হিন্দুরাই হিন্দুদের নিপীড়ন করেছে সবচেয়ে বেশী। নিপীড়িত হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্মের মধ্যে সাম্যের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে সেই ধর্ম বরণ করেছে। পাঠান-মোগল যারা এদেশে বসতি স্থাপন করেছে, তারাও কয়েক শতাব্দী পর এ দেশকেই নিজ ভূমি মনে করে। মুসলমানরা যদি বহিরাগত হয়, তাহলে আর্যরাও বহিরাগত। এদেশের মূল অধিবাসীরা আদিবাসী নামে অভিহিত, এবং এই আদিবাসীদের হিন্দু মুসলমান উভয়েই বর্বর হিসেবে অবজ্ঞা করে। আবার উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের চোখেও হিন্দুরা আধা-আদিবাসী, তারা বহু দেব-দেবী পূজক, একতাহীন, কিছুটা বর্বর।

কয়েক শতাব্দী ধরে এ দেশ শাসনের ভার মুসলমানদের ওপর ছিল বলে তারা মনে করে এ দেশের মালিকানা শুধু তাদেরই। হিন্দুরা সংখ্যা বৃদ্ধিকারী প্রজা মাত্র। ইংরেজরা মুসলমানদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে রাজশক্তি কেড়ে নিয়েছে। সেজন্য মর্যাদাসম্পন্ন সমস্ত মুসলমানই আহত বোধ করে। তারা অন্দর মহলে বসে অহংকারের সেই ক্ষত চাটে এবং ক্রোধের বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে ইংরেজদের প্রতি।

অন্যান্য ইওরোপীয় দস্যু ও ব্যবসায়ীদের দমন করে ইংরেজ এতদিনে প্রায় গোটা ভারতবর্ষটাই দখল করে ফেলেছে। ইংরেজ মানেও ইংলণ্ডের রাজশক্তি নয়, সামান্য একটি বণিক প্রতিষ্ঠান। এত সহজে এত বিশাল একটি দেশ জয় করা গেছে বলেই এ দেশের মানুষের প্রতি ইংরেজের এত অবজ্ঞা। বিপুল জনসংখ্যা, এমনকি বৃহৎ সেনাবাহিনী নিয়েও যারা দেশ রক্ষা করতে পারে না, তারা মানুষ নামের অযোগ্য। নবাবী বা বাদশাহী সেনাবাহিনীর লড়াই পদ্ধতি নিয়ে ইংরেজ ব্যারাকে এখনো প্রবল হাসাহাসি হয়। সুরার ঝোঁকে ফুর্তি-পাওয়া গোরা সিপাহী মুঘল সেনাপতির অঙ্গভঙ্গী অনুকরণ করে দেখায় এবং অন্যরা অনেকে টেবিল চাপড়ায়।

ইংরেজ মনে করে, এ দেশটা তাদের কাছে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। তারা এ দেশ নিয়ে যা খুশী করতে পারে, একে কামড়ে, চিবিয়ে, শুষে একেবারে ছিবড়ে করে ফেলার যাবতীয় অধিকার তাদের আছে।

সরাসরি মুসলমানদের হাত থেকে রাজ-ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে বলে ইংরেজ এখন মুসলমানদের এড়িয়ে চলে। মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের প্রতি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা বেশী, তারা হিন্দু ধনীদের বাড়ি বেশী যাতায়াত করে, আমোদ-আহ্লাদে অংশ নেয়। আহত-অহংকার নিয়ে মুসলমানরাও গুটিয়ে আছে নিজেদের মধ্যে, ইংরেজ-প্রচলিত শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা হুড়মুড় করে এগিয়ে এলো না হিন্দুদের মতন।

দুই দশক আগেও আদালত বা সরকারি ভাষা ছিল ফারসী, তখন হিন্দুরাও মৌলবীদের কাছ থেকে ঐ ভাষা শিখতো। শিক্ষিত হিন্দু গড় গড় করে বলতো ফারসী ও উর্দু ভাষা। এখন তার বদলে পুরোপুরি এসেছে ইংরেজী। শুধু রাজ্য হারায়নি মুসলমানরা, ভাষার অধিকার হারিয়ে আরো হীনবল হয়েছে।

তার ফলে, কেরানী, চিকিৎসক, শিক্ষক, উকিল এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকারের বিভিন্ন চাকরিতে (অবশ্য সব চাকরিরই দৌড় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত, তার ওপরে আর নয়) যে এক নতুন বৃত্তিধারী শ্রেণী তৈরি হলো, তাদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য।

এদেশে প্রতিবেশীদের মধ্যেই বৈরিতা বেশী। হিন্দু ও মুসলমান এ সময় দীর্ঘকালের জাত-বৈরী না ভুলে যেন পরস্পরের থেকে আরও দূরে সরে যেতে লাগলো। ইংরেজেরও তাতেই সুবিধে। মুসলমানরা দূরে সরে রইলো অভিমান ও ক্ষোভ নিয়ে, আর হিন্দুরা মনে করলো, ইংরেজ তাদের পরিত্রাতা। বাঙালী হিন্দুদের চক্ষে তো বটেই। তাদের মতে ইংরেজরা তাদের রক্ষা করেছে নবাবী আমলের অত্যাচার থেকে। মুসলমানও ছিল শাসকের জাতি, ইংরেজও শাসক, তবু এদের মধ্যে হিন্দুদের চক্ষে ইংরেজই শতগুণ শ্রেয়, কারণ ইংরেজ শাসনে তবু রুল অব ল'র আবরণ অন্তত আছে। তাছাড়া ইংরেজ ধর্মে হাত দেয় না। দু-চারজন পাদ্রী এদিক ওদিক মাতামাতি করলেও অধিকাংশ ইংরেজ এবং রাজশক্তি মাথা ঘামায় না ধর্ম নিয়ে।

হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন কলকাতা তথা বঙ্গে একটা নব-জাগরণের জোয়ার এসেছে। এবং সে নব-জাগরণ শুধু হিন্দুদের মধ্যেই। হিন্দুরা কেউ ধর্মসংস্কার নিয়ে ব্যস্ত, কেউ সামাজিক রীতি ও লোকাচারে পরিবর্তন আনতে চাইছে, কেউ মেতেছে ব্যবসা বাণিজ্যে, সাহিত্য রচনা ও শিক্ষা বিস্তারের দিকেও দারুণ ঝোঁক এসেছে। অবশ্য এ সবই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে। মুসলমানরা, অপরের চক্ষে, যেন সম্পূর্ণ নীরব। পত্রপত্রিকায় শুধু হিন্দুদেরই কথা, মুসলমানদের অস্তিত্বেরই প্রমাণ পাওয়া যায় কদাচিৎ।

কলকাতা শহরের এমন একটাও ইঁটের বাড়ি নেই, যা মুসলমানদের তৈরি নয়। কারণ হিন্দুরা রাজমিস্তিরির কাজ জানে না। ভদ্র ও ধনী শ্রেণীর অঙ্গে যে-সব উত্তম বস্ত্র, তাও সেলাই করে মুসলমান ওস্তাগরেরা। হিন্দুরা এক সময় সীবন শিল্প শিখে থাকলেও এখন তা ভুলে গেছে। কলকাতায় মুসলমানের সংখ্যা প্রচুর, তাদের মধ্যে অধিকাংশই অতি দরিদ্র। আর কিছু অতিশয় ধনী।

জনাব আবদুল লতীফ খাঁর বাড়িটি একটি দুর্গের মতন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, ও গৃহে যেন কোনো মনুষ্য বসতি নেই, দরজা-জানলা সব সময় বন্ধ থাকে। যেন বাইরের বাতাসও ওখানে ঢোকে না।

দু মহলা অট্টালিকা, লতীফ সাহেব থাকেন বাইরের দিকটিতে। এ বাড়িতে পর্দাপ্রথা অতি কঠিন, এখানকার রমণীরা অচেনা লোকচক্ষুর অগোচরে তো থাকেনই এমনকি দিনেরবেলা বাড়ির পুরুষদের সঙ্গেও তাঁদের দেখা হবার নিয়ম নেই।

লতীফ সাহেবের শরীরে পাঠান রক্ত আছে, কিন্তু গত দু পুরুষ ধরে তাঁরা প্রায় বাংলাভাষী। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী হিন্দু। মুর্শিদাবাদের বেশ বড় একখণ্ড জমিদারির তিনি মালিক, এ ছাড়া সম্প্রতি তিনি চিনির ব্যবসাতেও কিছু অর্থ নিয়োগ করেছেন। চিনি প্রায় সোনার মতন, শতকরা একশো ভাগ লাভ।

খিদিরপুরে জাহাজঘাটা থেকে কিছু দূরে এই অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন তাঁর পিতা। সেই আমল থেকেই বড় বড় জমিদারদের কলকাতায় একটি বাড়ি থাকা আভিজাত্যের চিহ্ন হিসেবে স্বীকৃত হতে শুরু করেছে। কলকাতায় এসে ধনগর্ব না দেখাতে পারলে আর ধনী হওয়া কিসের জন্য! তাছাড়া গ্রামদেশে সুখের দ্রব্য সংগ্রহ করাই কঠিন। কলকাতায় টাকা ফেললে সব কিছু পাওয়া যায়, এমনকি

বাঘের দুগ্ধ পর্যন্ত। অবশ্য বাঘের দুগ্ধ কারুর কোনো কাজে লাগে না, কিন্তু বরফের মতন এক আশ্চর্য বস্তু কলকাতা ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যাবে ? তাঁর পিতা বছরে একবার করে কলকাতায় আসতেন, লতীফ সাহেব পুরোপুরি কলকাতাতেই থাকেন। জমিদারি চালনার জন্য নিজ জমিদারি থেকে ইদানীং দূরে থাকাই প্রশস্ত। কর্মচারীরা খাজনা আদায়ের জন্য দায়ী থাকে, তারা যে কোনো প্রকারেই হোক প্রজাদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করে। জমিদার স্বয়ং উপস্থিত থাকলে প্রজারা অনেক সময় তাঁর পায়ে এসে কেঁদে পড়ে। সে বড় উপদ্রব!

বাড়িটি এক সময় ছিল বেশ ফাঁকা জায়গায়। এখন ধীরে ধীরে চারপাশে একটি বস্তি গড়ে উঠেছে। এত ঢাকাঢুকি দিয়ে থাকা সত্ত্বেও লতীফ সাহেব মাঝে মাঝে সেই বস্তি থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। একঘেয়ে শিশু কণ্ঠের কান্না।

লতীফ সাহেব হাঁক দিলেন, মীর্জা! মীর্জা!

লতীফ খাঁর নিজস্ব হুকুমবরদার মীর্জা খুশবখ্ত সব সময় দ্বারের কাছে অবস্থান করে। এর অঙ্গে পুরোদস্তুর সৈনিকের পোশাক তো বটেই, এমনকি কোমরবন্ধে একটি তলোয়ার পর্যন্ত ঝোলানো।

লম্বা সেলাম দিয়ে দাঁড়িয়ে সে বললো, হুজৌর!

লতীফ খাঁ বললেন, কে কাঁদে ? কারুর কান্না শুনতে পাচ্ছি না ? নাকি আমি খোয়াব দেখছি ?

মীর্জা বললো, না হুজৌর, আপনি ঠিকই শুনেছেন। পাশের বস্তির বে-তমিজরা এমন গোলমাল করে!

—যা ওদের দু চার ঘা দিয়ে আয়! কান্না থামাতে বল্।

—মার খেলে মানুষ আরও বেশী কাঁদে। মানুষের এই এক দোষ।

—ওরা এখন কাঁদছে কেন ? এখন তো ওদের কেউ মারছে কি ?

—হুজৌর ওরা কাঁদছে ভুখে। ভুখার মার বড় মার। কথায় বলে, ভাত এমন চীজ, খোদার চেয়ে উনিশ বিশ।

—মীর্জা খুশবখ্ত, ওরা ভাত খায় না কেন ? ভাত তো গরিবেরই খাদ্য!

—কেয়া জানে সরকার! এই বস্তির গরিব মুসলমানরা সারাদিন ঘোরে কাজের ধান্দায়। ওদের বাল্‌বাচ্চারা ঘরে থাকে। হররোজ তো কাম মেলে না, যেদিন ওদের বাপ্‌জানেরা খাবার পয়সা না নিয়ে ফেরে, সেদিন তারা বাল্‌বাচ্চাগুলোনকে রাগ করে পিটায় আর তারা ডুকরে ডুকরে কাঁদে।

লতীফ খাঁ কাতর গলায় বললেন, অত কথা আমায় বলিসনি। খেতে পায় না তো ওরা শহরে আসে কেন ? গ্রামে থাকলেই পারে। আমি কান্না একেবারে সহ্য করতে পারি না। তুই যেমন করে হোক, ওদের থামতে বল!

মীর্জা খুশবখ্ত সেলাম বাজিয়ে চলে যায়। যে কোনো উপায়েই হোক কান্না একটু বাদে থামে। এবং তারপরই মীর্জা হাসি মুখে সঙ্গে নিয়ে আসে এক অতিথিকে। মীর্জা জানে যে এই মানুষটিকে দেখলে তার প্রভু খুশী হয়ে উঠবেন।

ইনি মুন্সী আমীর আলী, দিওয়ানী আদালতের উকিল। কলকাতার মুসলমান সমাজে ইনিই একমাত্র উকিল এবং যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী। মানুষটি অতিশয় বিনয়ী এবং ধুরন্ধর হলেও রসিকও বটে। কথায় কথায় শের ও বয়েৎ বলেন। লতীফ খাঁর চেয়ে মুন্সী আমীর আলীর বয়েস যথেষ্ট বেশী, বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন, তবু আদি রসের দিকে এঁর খুব ঝোঁক আছে।

মুন্সী আমীর আলীকে দেখলে একটি প্রসিদ্ধ উক্তি মনে পড়ে : বুঢ়াপে মেঁ ইনসান কী কুওঅতে শাহ্‌ওয়ানী যবান মেঁ আ জায়া করতী হ্যায়। অর্থাৎ বার্ধক্যে মানুষের কামনা বাসনা সব জিভের ডগায় এসে ভর করে।

আজ কিন্তু মুন্সী সাহেবের সেই মজলিশী রঙ্গীন ভাবটি নেই। শুকনোভাবে সেলাম আলায়কম বলে ঘরে ঢুকে তিনি লতীফ খাঁর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে রইলেন। লতীফ খাঁ তাঁকে নানারকম ভাবে খাতির করে বসতে বললেন, কিন্তু তিনি যেন তা শুনতেই পেলেন না। তাঁর মুখে ক্রোধ এবং শোক একসঙ্গে মাখানো।

লতীফ খাঁ বিহ্বল হয়ে বললেন, এমন মলিন মুখ কেন জনাব, কিছু গুস্তাকি হয়েছে কি ?

মুন্সী আমীর আলী চড়া মেজাজে বললেন, আজ হিন্দুস্তানে মুসলমানের চরম দুর্দিন, আর আজ তুমি ঘরে বসে নিশ্চিন্তে আলবোলা টানছো ? ছিঃ!

—আজ ? কেন, আজ কী হয়েছে ?

—তুমি জানো না ? আজ নবাব ওয়াজিদ আলী খাঁ কলকাতায় আসছেন, আমাদের সব মান সম্ভ্রম ধুলোয় লুটিয়ে গেল !

লতীফ খাঁ বিস্মিতভাবে বললেন, কোন্ নবাব ওয়াজিদ আলী খাঁ ? আওধ-এর বাদশা ? তিনি লক্ষ্ণৌ ছেড়ে কলকাতায় আসবেন, এই ইংরেজের রাজত্বে ? সে কি কথা ?

মুন্সী আমীর আলী ব্যঙ্গের সুরে একটি 'রেখতী' বললেন :

চলী ওঅহাঁ সে দামন উঠাতী হুঈ
কড়ে সে কড়ে কো বজাতী হুঈ

এবার এখান থেকে আঁচল উড়িয়ে উড়িয়ে, কাঁকন বাজিয়ে বাজিয়ে ফিরে চলো !

লতীফ খাঁ তাও কিছু বুঝতে পারলেন না। তিনি ব্যাকুলভাবে বললেন, জনাব তশরীফ রাখুন। কী হয়েছে, সব খুলে বলুন তো ? আওধের বাদশা কলকাতায় আসবে কেন ? তিনি আমাদের শেষ ভরসা !

লতীফ খাঁর তুলনায় মুন্সী আমীর আলী অনেক বেশী খবর রাখেন। তিনি ফারসী, উর্দুতে দক্ষ, বাংলা এবং ইংরেজিও মোটামুটি বলতে কইতে পারেন।

হতাশ ভাবে একটি কেদারায় বসে পড়ে তিনি আলবোলার নলে কয়েকটি টান দিলেন। তারপর বললেন, এ বছরের গোড়ায় নবাবের কাছ থেকে লক্ষ্ণৌ কেড়ে নিয়েছে ইংরেজরা। সে খবরও তুমি রাখো না ? ইবলিশের দোসর ইংরেজ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে নবাবের সঙ্গে। লক্ষ্ণৌতে একটা কামানও গর্জায়নি। একজন সিপাহীও দেশরক্ষার জন্য রাজী হয়নি, বিনা যুদ্ধে নবাবের মুকুট ছিনিয়ে নিয়েছে। হিন্দুস্তানে মুসলমানের শেষ গৌরব যে আওধ, তাও চলে গেল ইংরেজের হাতে। আর আমাদের রইলো কী ?

ঘটনার গুরুত্ব বুঝে লতীফ খাঁ হতবাক হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর মস্তক ঘূর্ণিত হচ্ছে। যেন তাঁর নিজেরই জমিদারি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এই রকম নিঃস্ব বোধ করলেন তিনি।

খানিক বাদে তিনি আস্তে আস্তে বললেন, কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ের বাদশা কলকাতায় আসছেন কেন এত দূরে ?

আমীর আলী প্রায় ধমকের সুরে বললেন, শখসে কি আসছেন তিনি ? আসছেন বন্দী হয়ে। জিঞ্জিরে হাত পা বেঁধে আনা হচ্ছে তাঁকে। হিন্দুস্তানের বাদশা দিল্লিতে কাচকড়ার পুতুল হয়ে আছেন, আর লক্ষ্ণৌয়ের নবাব বন্দী থাকবেন কলকাতায়।

লতীফ খাঁ কপাল চাপড়ে বললেন, কিছুই বুঝলাম না ! আপনার কাছেই তো শুনেছি যে নবাব ওয়াজিদ আলী সাহেব-এর মস্ত বড় পল্টন আর রিসালা ছিল। এমন কি তিনি একটি জেনানা ফৌজও গড়েছিলেন। সেই তুলনায় ফিরিঙ্গিদের ফৌজ আর কত বেশী ? তবে কেন লড়াই হলো না ? কমজোর, ডরপুক হিন্দুদের মতন মুসলমানও কি লড়াই দিতে ভুলে গেছে ? আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন।

আমীর আলী আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটি বয়েৎ বললেন :

পরীন হুফতা রূখাঁ-ও-দেব দরকারিশ্‌মা-ও-ন ফ
বস্যাখ্‌ত্ অকলখ হয়রত কি ঈচে বুল অজবীস্ত

পরীরা লুকিয়ে ফেলেছে নিজেদের রূপ, এখন রাক্ষসরা দেখাচ্ছে তাদের কাণ্ড-কারখানা। কী করে যে এমন হলো, তা বুদ্ধিতে কূল কিনারা পাই না !

দোস্ত, লক্ষ্ণৌয়ের সিপাহীরা যুদ্ধ ভোলেনি, কিন্তু নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ মেতে ছিলেন নাচ-গান আর কবিতা রচনায়। সবই আমাদের নসীব ! লর্ড ডালহাউসী একে একে সব খাবে, হিন্দুস্তানের সবটুকু না খেলে ওর ভুখা মিটবে না।

—নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ কি আজই আসবেন কলকাতায় ?

—হ্যাঁ। সেইজন্যই তো এসেছি তোমার কাছে। আমাদের নবাবের হাতে পায়ে জিঞ্জির বেঁধে ধুলোর মধ্যে দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। তা দেখে দৃষ্টি সার্থক করবে না ?

লতীফ খাঁর চক্ষু সজল হয়ে এলো। তিনি হায় আল্লা বলতে বলতে বারংবার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

একটু পরে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, নবাব কলকাতায় এসে থাকবেন কোথায় ?

—শুনেছি, মেটিয়াবুরুজে ইংরেজ সরকার দয়া করে তাঁকে জমি আর বাড়ি দিয়েছেন।

—হায়, হায়, হায় ! বাদশাহ মঞ্জিল আর কায়সর বাগ ছেড়ে নবাব এসে থাকবেন কলকাতার এই জলাডাঙ্গায় ! এখানে কোথায় সেই মহলসরা আর কোথায় সেই বাগিচা ?

খানিক আলাপ আলোচনার পর নবাব-দর্শনে যাওয়াই ঠিক হলো। ভাগ্যহত, অধঃপতিত হলেও নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ হিন্দুস্তানের শেষ গৌরবমণি, তাঁকে একবার স্বচক্ষে দেখার লোভ সংবরণ করা যায় না।

তখনই লতীফ খাঁর চৌধুড়ী গাড়ি প্রস্তুত করা হলো। সঙ্গে চারজন দেহরক্ষী নিয়ে তিনি মুন্সী আমীর আলীর সঙ্গে গৃহ থেকে নির্গত হলেন।

খিদিরপুর ছেড়ে কলকাতার উপান্তে এসেই তাঁরা দেখলেন যে পথে পথে অজস্র মানুষের ভিড়। সেপাই-শাস্ত্রী ও গোরা পুলিশ—ফৌজও টহল দিচ্ছে এবং মাঝে মাঝে লাঠি উঠিয়ে অবাধ্য জনতাকে তাড়া করছে।

শোনা গেল এই পথেই একটু বাদে নবাবের কাফিলা আসবে ! গাড়িতে বসে নবাব-দর্শন অনুচিত বলে লতীফ খাঁ এবং আমীর আলী গাড়ি থেকে নেমে পথের মোড়ে এসে দাঁড়ালেন। দেহরক্ষীরা তাঁদের ঘিরে রইলো।

জনতার মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুই-ই রয়েছে। সমস্ত মুসলমানদের মুখ ম্লান। আর হিন্দুদের মুখে খানিকটা বিস্ময়, খানিকটা কৌতুক। শহরের অন্যান্য হুজুগের মতন নবাবের আগমনও যেন আর একটি বড় হুজুগ তাদের কাছে।

নবাবের কাফিলাটা বিশাল। সামনে আসছে বাদ্যকররা। তারপর পরপর অনেকগুলি গাড়ির ওপর বড় বড় খাঁচায় নানারকম পশুপাখি। পাখিদের মধ্যে ময়ূর, পায়রা, সারস, হাঁস, বগলা করকর, চকোর ইত্যাদি। এক খাঁচা ভর্তি কচ্ছপ। তারপর হরিণ, তারপর চিতাবাঘ। তিনটি খাঁচা ভর্তি নানা জাতের বানর, উল্লুক। তারপর পায়ে হাঁটানো জিরাফ, উট, হাতি। এর পর নবাবের স্বর্ণখচিত তাঞ্জাম বয়ে আনছে চারজন কাফ্রি বাহক। তার পেছনে সার দিয়ে ঘেরাটোপ জেনানাদের পাল্কি, তার পরে দাস-দাসীরা।

মুন্সী আমীর আলীর ধারণা ভুল। রাজ্যহীন নবাব ওয়াজিদ আলী শাহকে হাতে পায়ে শিকল-বেঁধে কলকাতায় আনা হয়নি। তিনি এসেছেন তাঁর সমস্ত বিলাসের উপকরণ সঙ্গে নিয়ে। রাজ্য কেড়ে নেবার পর ইংরেজরা তাঁকে লক্ষ্ণৌতে থাকারও অনুমতি দিয়েছিল, সেখানে নবাব আগেকার মতন যত খুশী রঙ তামাশায় মেতে থাকুন, তাতে ইংরেজের আপত্তি নেই, শুধু রাজ্য নিয়ে মাথা না ঘামালেই হলো। কিন্তু নবাব নিজের মাথার মুকুটটি ইংরেজের হাতে তুলে দিয়ে এখন কলকাতায় আসছেন মামলা করতে। ইংরেজ নাকি আইনের নিয়ম মানে। কলকাতার সুপ্রিম কোর্টেও সুবিধে না হলে নবাব খোদ লণ্ডনে গিয়ে প্রিভি কৌন্সিলে মামলা লড়বেন। স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়াকে প্রশ্ন করবেন, কোম্পানির ফৌজ তাঁর রাজ্য দখল করলো কোন্ আইনে ?

পাতলা মশলিনের পর্দায় ঘেরা নবাবের তাঞ্জাম। রাস্তার দু'পাশের মশালের আলোয় তাঞ্জামের মধ্যে নবাবের মূর্তি অস্পষ্ট দেখা যায়। তিনি সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে বসে আছেন, দেখলে মনে হয় নেশাগ্রস্ত। শহরের জনতা সেই রকমই মনে করলো। কারণ তারা সন্ধের পর বড় মানুষদের নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেই দেখতে অভ্যস্ত। আর ইনি তো নামকরা বিলাসী নবাব। কিন্তু নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ সুরা, আফিম, ভাং প্রভৃতি কোনো নেশার দ্রব্যই স্পর্শ করেন না। তাঁর প্রধান নেশা তিনটি, সুর, ছন্দ ও রমণী। এই তিন নেশাতেই তিনি আকণ্ঠ মজ্জিত।

পথশ্রমে ক্লান্ত হলেও নবাব ঘুমিয়ে পড়েননি। এই নতুন নগর দেখার আগ্রহও তাঁর নেই। তিনি গুণগুণ করে আওড়াচ্ছেন একটি গানের কলি। এই নগরে প্রবেশ করার মুখেই কলিটি তাঁর মাথায় এসেছে। রাজ্যপাটের কথা, দুর্দশার কথা সমস্ত বিস্মৃত হয়ে তিনি সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে কলিটিতে সুর বসাচ্ছেন। নবাবের তাঞ্জাম দেখে নানাপ্রকার চিৎকার করছে জনতা, সেদিকে গ্রাহ্য নেই ওয়াজিদ আলী শাহের। তিনি গুণ গুণ করছেন, বাবুল মেরা নৈহার ছুটহি যায়·····।

নবাবের তাঞ্জাম দেখে লতীফ খাঁর চক্ষু আবার অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে গেল। তাঁর মতন উচ্চবংশীয় লোকের এমন পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করা শোভা পায় না। কিন্তু তিনি নিজেকে সামলাতে পারছেন না। জনাব আমীর আলী ঠিকই বলেছেন, আজ মুসলমানের চরম দুর্দিন।

নবাবের তাঞ্জাম যখন কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছে, তিনি ভগ্ন কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, খুদা নবাব সাহেবকো সালামত আর বেগম সাহেবাকি কায়েম রাখো ! তারপর তিনি ছুটে যেতে চাইলেন নবাবের

তাঞ্জামটি একবার স্পর্শ করবার জন্য।

মুন্সী আমীর আলী এতটা আবেগপ্রবণ নন। তিনি চেপে ধরলেন লতীফ খাঁর হাত। তারপর টেনে নিয়ে এলেন ভিড়ের বাইরে।

লতীফ খাঁ ভেঙে পড়েছেন, এখন তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। গোরা পুলিশরা মানীর মান বোঝে না। লতীফ খাঁ ঐভাবে ছুটে যাচ্ছিলেন, আর একটু হলেই মস্তকে লাঠির বাড়ি খেতেন।

দুজনে এসে আবার বসলেন চৌঘুড়ী গাড়িতে। কিছুদূরে এক স্থানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, আর পুলিশের হাতের লগুড় ধপাধপ পড়ছে লোকের মাথায়। এরকম স্থানে আর একটুও থাকা উচিত নয়।

তিনি দেহরক্ষীদের উদ্দেশ্যে বললেন, জোরসে হাঁকাতে বলো! ঘর চলো!

গাড়ির মধ্যে বসে লতীফ খাঁ সশব্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। মুন্সী আমীর আলী মুখে কিছু না বলে শুধু চাপড় মারছেন তাঁর এক হাতে। তাঁর মনও ভারাক্রান্ত। আওধ-এর নবাব এসেছেন কলকাতায় অথচ তাঁর সম্মানে একটা তোপও দাগা হলো না!

একটু পরে তিনি উত্তেজিত ভাবে বললেন, লতীফ, মুখ উঠাও! কান্না থামাও, হিন্দুস্তানের মুসলমান এ অপমান কিছুতেই সহ্য করবে না। লাখ লাখ সিপাহী এখনো আছে এ দেশে, তারা লড়াই ছাড়া আর কিছু জানে না। তারা ইংরেজদের এ দুশমনীর বদলা নেবেই। আমি বলে রাখছি, শিগগিরই একটা গদর হবে, তখন আমাদের সকলকেই সামিল হতে হবে, মনে রেখো।

ঈশ্বরচন্দ্রের আবেদনের প্রতিবাদ করে রাজা রাধাকান্ত দেব সরকার সমীপে পাঠালেন এক পাল্টা আবেদনপত্র। ঈশ্বরচন্দ্রের আবেদনে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ছিল এক হাজারেরও কম। আর বিধবা-বিবাহ আইনের প্রতিবাদ করে রাজা রাধাকান্ত দেবের আবেদনে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা তেত্রিশ হাজার! শোভাবাজারের রাজা বাহাদুর নিজের বেতনভুক কর্মচারীদের গ্রাম-গ্রামান্তরে পাঠিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে এনেছেন।

এর পর এই প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে বোম্বাই, পুণা, ত্রিপুরা, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আরও বহু স্বাক্ষরসম্বলিত আবেদনপত্র জমা পড়তে লাগলো। গণনা করলে দেখা যাবে যে, বিধবা বিবাহের সমর্থকদের চেয়ে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদকারীর সংখ্যা বহুগুণ বেশী। বিপক্ষীয়রা যে ঈশ্বরচন্দ্রের যুক্তি খণ্ডন করতে পেরেছে তা নয়, তাদের মূল বক্তব্য এই যে, বিধবা বিবাহ হবে কি হবে না, সেটা হিন্দুসমাজের ব্যাপার, এ ব্যাপারে বৈদেশিক রাজশক্তির হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন নেই।

রাজশক্তি অবশ্য এই ব্যাপারে নির্লিপ্ত রইলো না। তিন তিনবার বিবেচনার পর হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ আইন পাশ হয়ে গেল। হিন্দু বিধবার বিবাহে কোনো নিষেধ রইলো না তো বটেই, দ্বিতীয়বার বিবাহিত নারীর সন্তান তার পিতার সম্পত্তির বৈধ অধিকারী হবে।

বিধবা বিবাহের পক্ষে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা কম হলেও সরকার মনে করলেন যে এই ধরনের সমাজ সংস্কারের কাজে শুধু সাহসী লোকেরাই এগিয়ে আসে এবং সব দেশেই তাদের সংখ্যা কম হয়।

আইনটি পাশ হবার পর কয়েকদিন খুব উল্লাসের মাতামাতি হলো বটে, কিন্তু অল্পকাল পরেই বোঝা গেল, এটি একটি পর্বতের মূষিক প্রসব। এবার বিপক্ষীয়দের উল্লাসের পালা।

অনেকেই ভেবেছিল যে, আইনটি পাশ হওয়া মাত্রই দেশে বিধবা বিবাহের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। অল্পবয়সী বিধবা বালিকার সংখ্যা অজস্র, তাদের দুঃখে অনেকেই সংবাদপত্রে কেঁদে ভাসিয়েছে। কিন্তু আইন পাশ হবার পর কয়েক মাসের মধ্যেও একজনও কেউ বিধবা বিবাহ করার জন্য এগিয়ে এলো না।

জগমোহন সরকারের বৈঠকখানায় এই নিয়ে আমোদ আহ্লাদ হতে লাগলো খুব। ভুটুর ভুটুর শব্দে আলবোলা টানতে টানতে পরিতৃপ্তভাবে তিনি তাঁর প্রধান মোসাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হে

ফটিকচাঁদ, তোমাদের বিদ্যেসাগর কী কল্লে গো ? এ যে শুদুমুদু মল খসিয়ে লোক হাসালে ?
ফটিকচাঁদ বললো, আজ্ঞে হুজুর, কবি ধীরাজ কী গান বেঁধেচে, শুনবেন ?
—কই শুনি শুনি, গাও তো !
ফটিকচাঁদ গান ধরলো

বিদ্যেসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েচে
পরাশরের ইয়ে মেরে দিয়েচে !

উপস্থিত পঞ্চজন বিরাট হাসির হুল্লোড় তুলে দিল !
জগমোহন বললো, আরে ছ্যা ছ্যা ছ্যা । বিদ্যেসাগরের সাগরেদরা এত করে তোল্লা দিয়ে, শেষমেষ সব ন্যাজ তুলে পালালো ! কেউ একটা বিধবা বে করলে তবু আমরা খানিকটা তামাশা দেকতুম !
আর একজন বললো, হুজুর, সেই যে কতায় আচে না, "বড় বড় বানরের বড় পেট, লঙ্কায় যাইতে করে মাথা হেঁট", এ হলো গে সেই ব্যাপার !
—তা বিদ্যেসাগর নিজেই একখানা বিধবাকে বে করে তো দেকাতে পারে সব্বাইকে !
—তিনি তো বুদ্ধি করে আগেভাগেই নিজের বে'টি সেরে রেকেচেন । ওঁর সাগরেদরাও সবাই নিজেরা ঠিকঠাক জাত-কুল মিলিয়ে বিবাহ-টিবাহ সেরে এখুন বড় বড় বুলি কপচাচ্ছে ! বুইলেন না, নিজের বেলা আঁটি শাটি, পরের বেলা দাঁত কপাটি !
—তা থাকলোই বা বিদ্যেসাগরের আগে একটি বিয়ে । আর একটিতে দোষ কী ? বেধবা মানেই তো দু নম্বুরী ! সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মেয়েছেলে যাকে বলে !
—হে-হে-হে-হে ! এ কতাটি বড় ভালো বলেচেন, হুজুর ! সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মেয়েছেলে ! দোকানে গিয়ে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জিনিস কেনার মত লোকে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বিয়ে করবে !
—ভাড়া করা মাগ্ আর রাকতে হবে না কারুকে । সরকার অতি উত্তম ব্যবস্থা করেচেন । বাড়িতে যার যার বউ রইলো, আর বাইরে বেধবা রাঁড়ের সঙ্গে একটু ফুসমন্তর পড়ে নিলেই সস্তায় কেল্লা ফতে ! নেড়ানেড়িদের কণ্ঠি বদলের মতন !
—হুজুর, আর এক কেচ্ছা শুনেচেন ? বিদ্যেসাগরের এক চ্যালা কী কাণ্ড করেচে !
—কী, কী, শুনি ?
—সে বেটার নাম শ্রীশচন্দ্র । এখন সকলে বলচে ছিছিচন্দ্র !
—আরে বাপু, সবটা খুলে বলো না ! কে শ্রীশচন্দ্র !
—সে যে-সে লোক নয় কো ! শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মুর্শিদাবাদের জজকোর্টের পণ্ডিত ! মুকে তার কত বারফট্টাই ! আইন পাশ হবার আগে থেকেই সে চিগরেচে, বিধবা বে কর্বো, বিধবা বে কর্বো ! য্যানো বেটা এক মস্ত বড় রিফর্মার !
—তারও আগে একটা ঠিকঠাক বউ রয়েচে বুঝি ?
—তা জানি না, শুনিচি তো ব্যাচিলার ! কেমনধারা ব্যাচিলার তা মা ভগাই জানেন !
—এখুন সেও পিচিয়ে গ্যাচে, এই তো ? এতে আর কেচ্ছা কী আচে ?
—আরও আচে, হুজুর ! শুদু বে কর্বো বলে চ্যাঁচায়নি । আগে থেকেই সে শান্তিপুর থেকে এক বেধবা মাগীকে ভাগিয়ে এনেচে !
—অ্যাঁ ? ভাগিয়ে এনেচে ? ভদ্দরলোকের বাড়ির মেয়ে ? কোতায় এনেচে ?
—এই কল্কেতাতেই কোতাও রেকেচে, কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গাতে রেকেচে, তা জানি না ।
—আ মোলো যা ! তোদের নিয়ে আর পারি নে ! তোদের এত খাওয়াই দাওয়াই, ফুর্তির খর্চা দি, আর তোরা একটু ভালো করে খপরও আনতে পারিসনি ! লোক লাগা, লোক লাগা, ভালো করে খপর নে, সে মাগী কোতায় আচে ! খোলাখুলি রাঁঢ় রাকবার মুরোদ নেই, বে করার নাম করে ভদ্রবংশের বাড়ি থেকে মেয়ে ভাগিয়ে আনা ! সমাজ কি একেবারে রসাতলে গেল ? আমরা বেঁচে নেই ! এর একটা বিহিত কর্তেই হবে । বিদ্যেসাগর সব বাড়ি থেকে কচি কচি বেধবাদের টেনে রাস্তায় বার করে বাজারের মাগী করচে ! মামলা দায়ের করবো । মেয়েটা কোতায় আচে খুঁজে বার কর আগে । আর সেই শ্রীশচন্দ্র কোতায় গেল ?
—সেই ছিছিচন্দ্র এখন কোতায় ঘাপটি মেরে লুকিয়েচে । কেউ তার পাত্তাই পাচ্চে না !
—তাকেও খুঁজে বার কর । জেলের ঘানি ঘোরাবো তো বেটাকে দিয়ে ! ভদ্রপরিবারের মেয়েদের নিয়ে এই কাণ্ড !

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে জগমোহন সরকার বলতে লাগলেন, কালই আমি এ বৃত্তান্ত রাজা রাধাকান্ত দেবের কানে তুলবো, এর একটা বিহিত করতেই হবে। মামলায় ফাঁসাবো ওদের সকলকে!

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রোগে পড়লেন।

মানুষের কর্ম-ক্ষমতার একটা সীমা আছে। একদিকে তিনি বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে স্কুল প্রতিষ্ঠা করছেন, অন্যদিকে রাত্রি জেগে রাশি রাশি শাস্ত্রগ্রন্থ মন্থন করে সমাজ সংস্কারের পক্ষে যুক্তির তীক্ষ্ণ শর প্রস্তুত করছেন। বিধবা বিবাহের সমর্থন আদায়ের জন্য ঘুরেছেন লোকের বাড়ি বাড়ি।

তিনি পাঁচশত টাকা বেতন পান, পাঠ্যপুস্তক রচনা করে তার থেকেও যথেষ্ট উপার্জন করেন, তাঁকে একজন ধনী ব্যক্তি হিসেবেই গণ্য করা উচিত। কিন্তু নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য অর্থ ব্যয় করছেন অকাতরে। এত ঘোরাঘুরির সময় সব জায়গায় পালকি ভাড়া করারও সামর্থ্য থাকে না, পা দু'খানিই সম্বল। হাঁটতে তাঁর ক্লান্তি নেই।

এবার আর পারলেন না। অসুখের কারণ তাঁর শরীর নয়, মন। এতদিন পর এই অনমনীয় গোঁয়ার পুরুষটিও ভেঙে পড়লেন।

শান্তিপুরের তাঁতীরা শাড়ির পাড়ে তাঁর প্রশস্তিতে একটা গান ছেপে ছিল : সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে/সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।

সেই গান-ছাপা শাড়ি এক সময় লোকে কিনেছে বেশী দাম দিয়ে। খোল কর্তাল বাজিয়ে অনেকে তাঁর বাড়ি বয়ে এসে সেই গান শুনিয়ে গেছে। এখন আবার একটি প্যারডি হয়েছে সেই গানের।

তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে বিদ্যাসাগর রোগশয্যায় শায়িত। তাঁর শয্যাকণ্টকি হয়েছে, ছটফট করছেন সারা পালঙ্ক জুড়ে, কিছুতেই স্থির থাকতে পারছেন না। শত দুঃখে কষ্টেও যে মানুষ কখনো টুঁ শব্দটি করেননি, এখন তাঁর বুকের একেবারে ভেতর থেকে একটা মোচড়ানো কাতর আওয়াজ ভেসে আসছে, আঃ! আঃ!

রাজকৃষ্ণ সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে নীরব হয়ে বসে থাকেন শিয়রের কাছে। ডাক্তার বৈদ্য দেখানো হয়েছে, সব ওষুধই বুঝি ব্যর্থ।

বাইরে থেকে একটা গানের আওয়াজ আসছে, রাজকৃষ্ণ সচকিত হয়ে জানালা বন্ধ করতে গেলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, থাক, থাক, বন্ধ করো না! ওরা গাইছে গাক। ওদের মনোবাসনাই পূর্ণ হবে!

বাইরে একদল ইয়ার গোছের লোক নেচেকুঁদে গাইছে সেই প্যারডি গান

শুয়ে থাক বিদ্যেসাগর চিররোগী হয়ে!
শুয়ে থাক বিদ্যেসাগর চিররোগী হয়ে!

ঈশ্বরচন্দ্র সেই গান শুনতে শুনতে বললেন, ওরে আমি চিররোগী হয়ে শুয়ে থাকতে চাই না। এখন মরলেই আমার জ্বালা জুড়োয়। আমি শীঘ্র শীঘ্র মরে ওদের খুশী করবো!

রাজকৃষ্ণ জানালা বন্ধ করে নিজে সেটা চেপে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সবচেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছেন শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্নের ব্যবহারে। তিনি তাঁকে একজন তেজী আদর্শবাদী যুবক হিসেবে জানতেন। মুর্শিদাবাদে জজ কোর্টে তার চাকরি পাওয়ার ব্যাপারেও ঈশ্বরচন্দ্র সুপারিশ করেছিলেন। সেই লোক এমন ব্যবহার করলো?

ইয়ং বেঙ্গল দল ঈশ্বরচন্দ্রকে বুঝিয়ে ছিলেন যে, তাঁরা সব সময় ঈশ্বরচন্দ্রের পাশে থাকবেন। রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ, কিশোরীচাঁদ বলেছিলেন, আইন পাশ হলেই তাঁরা দেশ জুড়ে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করবেন। দেশ জুড়ে দূরে থাক, একটি বিবাহও হলো না। ইয়ং বেঙ্গলের দলই বলেছিল, প্রথম বিবাহ করবে শ্রীশচন্দ্র।

শান্তিপুরের একটি মেয়েকে পছন্দও করে রেখেছিল শ্রীশচন্দ্র। মেয়েটির নাম কালীমতী, বয়েস এগারো বৎসর। মেয়েটির বাড়ির কেউই বিধবা বিবাহে সম্মত নয়, তবু ইয়ং বেঙ্গলের দল বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনোক্রমে কন্যার মাতা লক্ষ্মীমণি দেবীকে রাজি করালেন। মাতা সমেত কন্যাকে নিয়েও আসা হলো কলকাতায়।

বিবাহের তারিখ ঠিক। এই সময় বেঁকে বসলো শ্রীশচন্দ্র।

শ্রীশচন্দ্রের জননী নাকি বুকের সামনে একটি ছুরি ধরে বসে আছেন, তাঁর পুত্র বিধবা বিবাহ করলেই তিনি আত্মঘাতিনী হবেন। তাতেই মাতৃবাধ্য, সুপুত্র সেজে গেল শ্রীশচন্দ্র।

প্রথমে এ খবর শুনে রাগে জ্বলে উঠেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। কোন্ মা কবে পুত্রকে ইহ সংসারে রেখে

আত্মঘাতী হয় ? এ সমস্তই তো ভয়-দেখানো কথার কথা ! উপযুক্ত শিক্ষিত ছেলে যদি কোনো কাজকে ন্যায় বলে জানে, এবং তার মা যদি বিপরীত কথা বলে, তা হলে সেই ছেলে তার মায়ের ভুল বোঝাতে পারবে না ? তা হলে কিসের সুপুত্র সে ? কিসের জন্য তবে বিদ্যাশিক্ষা ? শিক্ষিত হয়েও যে পিতা-মাতার কুসংস্কার মেনে নেয়, সে আসলে মূর্খ !

কিন্তু শ্রীশচন্দ্র যখন সমস্ত রকম কথার খেলাপ করে একেবারে গা-ঢাকা দিল, তখন একেবারে নিরাশ হয়ে পড়লেন ঈশ্বরচন্দ্র। রোগশয্যায় শুয়ে এখন আর তিনি বিধবা বিবাহের নাম-উচ্চারণও সহ্য করতে পারেন না। চুলোয় যাক বিধবারা ! যার যা খুশী করুক। তাঁর আর কোনো দায় নেই। তিনি আর বাইরে বেরুবেন না, লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না।

এই সুযোগে রাজা রাধাকান্ত দেব বহু গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আর একটি আবেদনপত্র পাঠালেন সরকারের কাছে। তাঁর বক্তব্য হলো, বিধবা বিবাহ আইন পাশ হলেও সে আইন রদ করে দেওয়া হোক। সরকারের আইন যদি কার্যে পরিণত না হয়, তা হলে সরকার হাস্যাস্পদ হবেন। এ দেশে বড় জোর দুটি একটি বিধবা মেয়ে যদি বা পুনর্বিবাহের জন্য এগিয়ে আসতে চায়, কিন্তু তাদের বিবাহ করবার জন্য একটিও পুরুষ এগিয়ে আসবে না। এতদিনে তাই তো দেখা গেল। সুতরাং, এমন আইন রাখার মানে কী হয় !

কালীমতীর মা লক্ষ্মীমণিকেও একদল লোক বশ করে ফেললো। তারা বোঝালো যে, বিবাহের নামে যে মেয়ে একবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, সে কোনোদিন আর ঘরে ফিরতে পারবে ? সমাজে আর তার স্থান হবে না, সে কলঙ্কিনী হিসেবে গণ্য হবে।

তাদেরই প্ররোচনায় ও সাহায্যে লক্ষ্মীমণি এক মামলা দায়ের করলো আদালতে। শ্রীশচন্দ্র মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে কালীমতীকে শান্তিপুর থেকে কলকাতায় এনে কলঙ্কের ভাগী করেছে, এখন সে হয় কালীমতীকে বিবাহ করুক, অথবা চল্লিশ হাজার টাকা খোরপোষ দিক।

দেশের বহু সংবাদপত্র এই সময় তার ব্যঙ্গবিদ্রূপে মেতে উঠলো। সাহেবরা লিখলো, এই তো দেখা যাচ্ছে ইয়ং বেঙ্গলের সমাজ সংস্কারের দৌড়। কেউ লিখলো, কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না যে শ্রীশচন্দ্র, সে আবার জজ কোর্টের পণ্ডিত ? এর কাছ থেকে কে সুবিচারের আশা করবে ? এর চাকরি যাওয়া উচিত এবং কালীমতীর কাছে কান মূলে ক্ষমা চেয়ে চল্লিশ হাজার টাকা দণ্ড দেওয়া উচিত !

রোগশয্যায় শুয়ে যথাসময়ে এই মামলার কথাও ঈশ্বরচন্দ্রের কানে এলো। তিনি বললেন, বেশ হয়েছে !

রাজকৃষ্ণের সঙ্গে দু-চারজন বন্ধু সেদিন এসেছেন ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে। ঈশ্বরচন্দ্র দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছেন।

রাজকৃষ্ণ বললেন, তুমি অ্যাত ভেঙে পড়চো কেন, ঈশ্বর। এক জায়গায় ব্যর্থ হয়েচি, আমরা অন্য বিধবা মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করবো।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, ছাই করবে ! আর আমার কাছে ওসব কথা বলতে এসো না।

উপস্থিতদের মধ্যে একজন একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক। তিনি বললেন, আমরা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করচি। সার্থক হবো নিশ্চয় !

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, সে আপনাদের যা খুশী করুন গে ! আমাকে আর এর মধ্যে জড়াবেন না। অনেক পণ্ডশ্রম করেছি। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে !

সম্পাদকটি বললেন, এ কথা বললে চলবে কী করে ! আপনি আমাদের সেনাপতি !

ঈশ্বরচন্দ্র মুখ ফিরিয়ে বললেন, আপনাদের এই সেনাপতি অসুস্থ, মুমূর্ষু, একে দিয়ে আর আপনাদের কাজ হবে না। আপনারা অন্য সেনাপতি ধরুন।

—না, না, আপনি এমন কিছু অসুস্থ নন। আপনার কী-ই বা বয়েস ?

—দেখছেন না, চলৎশক্তি পর্যন্ত নেই ! কানা খোঁড়া সেনাপতি দিয়ে কি কোনো কাজ হয় ? বয়েস ছত্রিশ হলো, এমন কিছু কম কী ?

—সেনাপতি অসুস্থ হলেও যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারেন। সব সময় কি আর সেনাপতিকে সমরক্ষেত্রে যেতে হয় ! তাঁবুতে বসেই নির্দেশ দেন। এই দেখুন না, মুলতানের যুদ্ধের সময় জেনারেল হুইকের দারুণ জ্বর বিকার হয়েছিল, তবু শুধু শিবিরে শুয়ে শুয়েই কেমনভাবে পরামর্শ দিয়ে যুদ্ধ জয় করলেন। আপনি শুয়ে থাকুন, শুধু কলকাতা ছেড়ে যাবেন না, তাতেই আমাদের জয় হবে।

—শুধু কলকাতা কেন, আমার এখন ইহলোক ছাড়বার সময় হয়েছে !

এর দু'দিন পর একদিন দ্বিপ্রহরে ঈশ্বরচন্দ্র নিদ্রিত রয়েছেন, ঘরে আর কেউ নেই, এমন সময় একজন ব্যক্তি চুপি চুপি সে ঘরে প্রবেশ করে ঈশ্বরচন্দ্রের পা চেপে ধরলো।

চোখ মেলে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, কে রে?

লোকটি বললো, আজ্ঞে আমি শ্রীশচন্দ্র।

ঈশ্বরচন্দ্র এবার ভালো করে তাকিয়ে দেখতে পেলেন যুবক শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্নকে! সঙ্গে সঙ্গে তিনি পা সরিয়ে নিয়ে গাঢ় স্বরে বললেন, আমার মরতে যেটুকু বাকি আছে, তুই বুঝি সেটুকুও শেষ করে দিতে এসেছিস?

—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

—আমি তোকে ক্ষমা করবার কে! যা করবার করবে আদালত।

—আজ্ঞে, আদালতে সব মিটে গেছে। কিন্তু আপনার কাছেই আমি সবচেয়ে বেশী অপরাধী। আপনি ক্ষমা না করলে আমি সারা জীবনে শান্তি পাবো না!

—দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে!

—বিয়ের সব ঠিকঠাক। আপনি প্রসন্ন না হলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে!

ঈশ্বরচন্দ্র এবার শ্লেষের সঙ্গে বললেন, ও, বিয়ের সব ঠিকঠাক! হঠাৎ রাজি হবার কারণটা কী? চাকরি যাবার ভয়, না চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা দেবার ভয়?

শ্রীশচন্দ্র আবার ঈশ্বরচন্দ্রের পা চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে বললো, আপনি যদি আমায় অবিশ্বাস করেন, তা হলে আমি বিবাগী হয়ে চলে যাবো। আপনি এতকাল আমায় দেখেছেন, সত্যভঙ্গ করা কি আমার স্বভাব? আমার মা অবুঝ হয়েছিলেন. সন্তান হয়ে মায়ের ওপর জোর করা যায় না, তাই দিবারাত্র তাঁর পাশে বসে থেকে বুঝিয়েছি, সেইজন্যই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। মা আজ সকালে সম্মতি দিয়েছেন, তারপরেই ছুটে এসেছি আপনার কাছে।

—শুধু আমার কাছে এলে কী হবে? আগে পাত্রীর মায়ের কাছে ক্ষমা চা গে যা!

—আজ্ঞে সেখানেও গেসলুম। তাঁরা সব বুঝেছেন। লক্ষ্মীমণি দেবীকে আমি বারবার বলে পাঠিয়েছি যে, এ বিবাহ হবেই, শুধু কিছু বিলম্ব হচ্ছে এই যা। কিছু কু-লোকের মন্ত্রণায় তিনি মামলা দায়ের করেছিলেন। আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আমি কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রণপত্রের মুসাবিদা পর্যন্ত সঙ্গে করে এনেছি।

শ্রীশচন্দ্র ফতুয়ার পকেট থেকে একটি কাগজ বার করলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, বালিশটা আমার মাথার কাছে তুলে দে!

খানিকটা উঠে তিনি বালিশে মাথা হেলান দিয়ে বসলেন। তারপর চিঠিখানি মেলে ধরলেন চোখের সামনে।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেব্যাঃ বিনয়ং নিবেদনম্

২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার আমার কন্যার শুভ বিবাহ হইবেক, মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্বক কলিকাতার অন্তঃপাতী সিমুলিয়ার সুকেস্ স্ট্রিটের ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকর্ম সম্পন্ন করিবেন, পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ইতি। তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ, শকাব্দ ১৭৭৮।

চিঠিখানি দুবার পড়লেন ঈশ্বরচন্দ্র। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, "কন্যার শুভবিবাহ" শুধু লিখেছে কেন? লিখতে বল্ 'বিধবা কন্যার শুভবিবাহ'। আমি কোনো লুকোচাপা পছন্দ করি না। যারা আসবে, তারা যেন বিধবা বিবাহের কথা জেনেই আসে।

—আজ্ঞে তাই হবে।

—এ বাড়িতেই বিবাহ হবার কথা লিখেছিস, সে বিষয়ে আগে রাজকৃষ্ণের মত নেওয়া প্রয়োজন নয়? রাজকৃষ্ণকে ডাক্।

—আজ্ঞে রাজকৃষ্ণবাবুকেও আগেই বলা হয়েছে। তিনি সাগ্রহে রাজি হয়েছেন।

অর্থাৎ সকল কাজ পাকা করে তারপরই শ্রীশচন্দ্র এসেছে বিদ্যাসাগরের কাছে।

পক্ষকালের মধ্যেই সঙ্ঘটিত হলো কলকাতায় প্রথম হিন্দু সমাজে, ব্রাহ্মণের মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহ। ঈশ্বরচন্দ্র তখনও পুরোপুরি সুস্থ নন, কিন্তু তবু তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন তদারকির জন্য। যেন কোনো অনুষ্ঠানের ত্রুটি না হয়।

প্রায় দু' হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। অসুস্থ শরীর নিয়ে বিদ্যাসাগর নিজে গেছেন কয়েকটি বাড়িতে। এ যেন তাঁরই কন্যাদায়। সুকিয়া স্ট্রিটে তিনি যে বাড়িতে থাকেন, সে বাড়িতেই

বিবাহ হবে, সুতরাং তিনি কন্যাকর্তা তো বটেই।

নিমন্ত্রণ করতে গিয়েও এক জায়গায় দারুণ আঘাত পেলেন ঈশ্বরচন্দ্র। যেখান থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়ার আশা করেছিলেন, আঘাত এলো সেখান থেকেই। তিনি গিয়েছিলেন রামমোহন রায়ের গৃহে, রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়কে বিয়ের সময় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করবার জন্য। সমাজের শীর্ষ ব্যক্তিগণ যত বেশী উপস্থিত থাকবেন, তত বেশী এরূপ বিবাহ সম্পর্কে লোকের বিরূপতা দূর হবে।

রমাপ্রসাদ রায় একটু যেন আমতা আমতা করতে লাগলেন। বিধবা বিবাহ প্রস্তাবের আবেদনে তিনি স্বাক্ষরও দিয়েছিলেন, মুখে সমর্থনও জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকার কথায় তিনি বললেন, আমাকে আর এর মধ্যে টানা কেন ? আমি না হয় না-ই গেলাম।

মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল ঈশ্বরচন্দ্রের। তাঁর চোখ গেল দেয়ালের দিকে। সেখানে রামমোহনের একটি আবক্ষ ছবি ঝুলছে।

সতীদাহ নিবারণের জন্য যে পুরুষসিংহ সমাজের বিরুদ্ধে এত লড়েছেন, আজ বিধবা বিবাহ উপলক্ষে তাঁর পুত্রের মুখে এ রকম কথা ! উঠে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, তবে আর ঐ ছবিটা ঝুলিয়ে রেখেছেন কেন ? টান মেরে মাটিতে ফেলে দিন ! আপনি না গেলেও এ অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি হবে না !

কালীমতীকে আগে থেকেই এনে রাখা হয়েছে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। বর আসবে রামগোপাল ঘোষের বাড়ি থেকে।

বিবাহের লগ্ন রাত্রি দ্বিপ্রহরে। কিন্তু যদি কোনো গোলযোগ হয়, সেইজন্য সন্ধ্যাকালেই আনা হবে বরকে। রামগোপাল ঘোষের গৃহ থেকে বিবাহের মণ্ডপ পর্যন্ত পথের দু'পাশে দু'হাত অন্তর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে পুলিশ। পথ একেবারে লোকে লোকারণ্য। এর মধ্যে কত লোক হুজুকখোর, কত লোক স্বপক্ষের আর কত যে বিপক্ষীয় তা বোঝা দুষ্কর।

রামগোপাল ঘোষের সুসজ্জিত জুড়ি গাড়ির মধ্যে বসে আছে বরবেশে শ্রীশচন্দ্র, তার সঙ্গে রয়েছেন রামগোপাল ঘোষ নিজে, তাঁর বন্ধু হরচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও দ্বারকানাথ মিত্র।

এক সময় মনুষ্যের ভিড়ে অশ্ববাহিত গাড়ি আর অগ্রসর হতে পারে না। কারা যেন তুমুলভাবে চিৎকার করছে। তা স্বপক্ষের জয়ধ্বনি না বিপক্ষের বিদ্রূপ, তা বোঝা গেল না। হঠাৎ বিকট শব্দে একটা পটকা ফাটলো। শ্রীশচন্দ্র রামগোপালের হাত চেপে ধরলো।

শোনা গিয়েছিল যে, বিপক্ষীয় লোকেরা লাঠিয়াল এনে বরের শোভাযাত্রার জন্য হামলা করবে। সেইজন্যই এত পুলিশের ব্যবস্থা।

রামগোপাল শ্রীশচন্দ্রকে বললেন, ভয় নেই।

তারপর বন্ধুদের নিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়লেন পথে। তাঁরা জুড়ি গাড়ির দু'পাশে হাঁটতে লাগলেন। কেউ অবশ্য গোলযোগ অথবা বাধা দিতে এলো না। পৌঁছে গেলেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে।

পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানেই বিবাহ হলো। দুপক্ষের দুজন বিশিষ্ট পুরোহিত উপস্থিত। এ ছাড়া এসেছেন বিদ্যাসাগরের পক্ষপাতী সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতরা। ইয়ং বেঙ্গলের দল রয়েছেন, রাজা দিগম্বর মিত্র থেকে শুরু করে বাবু নবীনকুমার সিংহ পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ধনীরাও প্রথম থেকে সর্বক্ষণ বসে আছেন। রমাপ্রসাদ রায়ও শেষ পর্যন্ত চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে না এসে পারেননি। এবং এসেছেন অনেক মহিলা।

সমস্ত মন্ত্র পাঠ, কন্যা সম্প্রদান, নানাবিধ অলঙ্কার ও দান সামগ্রী, উলুধ্বনি, দ্বারষষ্ঠী ঝাঁটাকে প্রণাম, স্ত্রী-আচার, নাক-মলা, কান-মলা, কড়ি দে কিনলেম দড়ি দে বাঁধলেম, হাতে দিলাম মাকু, একবার ভ্যাঁ করো তো বাপু ইত্যাদি কিছুই বাদ রইলো না। তারপর ভুরিভোজ।

পরম আনন্দে এবং বিনা বাধায় অনুষ্ঠান সাঙ্গ হলো। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত, উৎকণ্ঠার শেষে অবসন্ন কিন্তু পরিতৃপ্ত মুখে দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন ঈশ্বরচন্দ্র। বিদায় নেবার জন্য তাঁর কাছে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলো নবীনকুমার।

তারপর সে বললো, আপনাকে একটি কথা নিবেদন করবো ?

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, কী কথা বলো তো, বাপু ?

নবীনকুমার বললো, এখন থেকে আমি আপনার সকল কার্যে সহায়ক হতে চাই। আমি জানি, এ

বিবাহের জন্য আপনার প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েচে ! এর পর থেকে প্রত্যেক বিধবার বিবাহে আমি এক হাজার টাকা দিতে চাই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিস্মিতভাবে এই সদ্য যুবকটির দিকে চেয়ে রইলেন।

কালপ্রবাহে কমলাসুন্দরীর জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে কিন্তু রূপের বিশেষ হেরফের হয়নি। তার বর্ণ কালো, কিন্তু সেই বর্ণই তার বৈশিষ্ট্য। এ দেশে সৌন্দর্যের প্রথম লক্ষণই হলো গাত্রবর্ণ কতখানি গৌর, তবু সকলে এক কথায় স্বীকার করে যে কমলাসুন্দরীর মতন রূপসী ক্বচিৎ দেখা যায়। তার চিক্কণ কালো মুখখানি যেন পাথরে খোদা, এবং এমনই মসৃণ যেন মনে হয় মাছি বসলে পিছলে যাবে।

কৈশোরোদ্গমের পর রামকমল সিংহের নজরে পড়ায় তার ভাগ্য ফেরে। সামান্য অবস্থা থেকে তুলে এনে রামকমল সিংহ তাকে বারবণিতা সমাজের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রামকমল সিংহ তাকে এত বড় বাড়ি দিয়েছেন, দেশের নানাস্থানে ঘুরিয়ে এনেছেন এবং পশ্চিমাঞ্চল থেকে শিক্ষক আনিয়ে তাকে নৃত্যে পটিয়সী করিয়েছেন।

কমলাসুন্দরী সত্যিই তার দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করেছিল রামকমল সিংহকে। সেই আমোদপ্রিয়, বিলাসী পুরুষটির হৃদয় ছিল বড় নরম, কখনো কারুর মনে আঘাত দিয়ে কথা কননি। রামকমল সিংহের মৃত্যুর পর দশদিক শূন্য দেখেছিল কমলাসুন্দরী এবং প্রকৃত বৈধব্য যাপন করেছিল কিছুদিন। এমনটি আর কেউ কখনো দেখেনি কিংবা শোনেনি। কিন্তু সব কিছুতেই একটা মাত্রা আছে। এক সুন্দরী, নর্তকী, বারাঙ্গনা কতদিন আর লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবে ? সে নিজে চাইলেও লোকে তাকে থাকতে দেবে কেন ?

কমলাসুন্দরী এখন শহরের সবচেয়ে নামকরা অবিদ্যা।

তার বয়েস হয়েছে, কিন্তু নর্তকী বলেই বোধ হয় তার শরীরের চমৎকার গড়ন এখনো অটুট আছে। মাঝখানে কিছুদিনের জন্য সে খানিকটা স্ফীতোদরা হয়েছিল, আবার সচেতন হয়ে, পরিশ্রম করে মেদ ঝরিয়ে ফেলেছে। এখনও সে এক একদিন নাচের আসরে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।

হীরা বুলবুলের নাম রসিক ব্যক্তিরা এরই মধ্যে ভুলে যেতে বসেছে। হীরার নাম আর শোনা যায় না। বরং কিছু নতুন নাম এখন সদ্য হাওয়ায় ভাসছে। যেমন, রওশানকুমারী, শারদা মনজিলওয়ালী, রেশমা ঘুংঘটওয়ালী। লক্ষ্ণৌয়ের রাজ্যচ্যুত নবাব কলকাতায় এসে বসতি নেবার পর লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বারাণসী থেকে কিছু কিছু ভাগ্যসন্ধানী নর্তকী-গায়িকা-গণিকারাও কলকাতায় আসছে। নবাবের সঙ্গে দলটিও কম বড় নয়।

এই লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের প্রসঙ্গেই একটা বেশ কৌতুক হয়েছিল।

রামকমল সিংহের সেই গৃহ কমলাসুন্দরী কিছুতেই ছাড়েনি। তার এখন পয়সা হয়েছে। এ রকম দু-তিনখানা বাড়ি সে অনায়াসেই কলকাতায় হাঁকাতে পারে। কিন্তু এই গৃহ থেকেই তার সৌভাগ্যের উদয়, এখানেই রামকমল সিংহ তার কোলে মাথা রেখে দেহরক্ষা করেছেন, এ গৃহ সে কোনোক্রমেই পরিত্যাগ করবে না।

বিধুশেখর মুখুজ্যে এবং মুনশী আমীর আলীর মতন দুই ধুরন্ধর উকিল মিলেও হটাতে পারেনি তাকে। মোকদ্দমা চলেছিল টানা চার বৎসর, তারপর ওঁরাই হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কমলাসুন্দরী নিজে যথেষ্ট বুদ্ধিশালিনী, তা ছাড়া তাকে মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্যও আছে তার দুজন অনুরাগী। একজনের নাম ফটিকচাঁদ মল্লিক, লোকে তার নাম দিয়েছে ফুটে মল্লিক। অন্যজন নুটুবিহারী সরকার, লোকের মুখে মুখে তার নাম ছোট নুটু, যদিও বড় নুটুটি যে কে, তা ঠিক জানা যায় না। ফুটে মল্লিক আর ছোট নুটু পালা করে নিয়মিত আসে কমলাসুন্দরীর কাছে। চপলা, তরঙ্গিনী আর চন্দনবিলাসী নামে তিনটি মেয়েও থাকে এখানে, কমলাসুন্দরী তাদের নাচ-গান শিখিয়ে তৈরি করে নিয়েছে।

একদিন নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের কাছ থেকে এক দূত এলো তার কাছে। নবাব এত্তেলা পাঠিয়েছেন ! এর মধ্যেই কমালসুন্দরীর নৃত্যকলার খ্যাতি তাঁর কানেপৌঁছেচে। হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এই শহর, জন্ম থেকেই যার কোনো রাজাবাদশা নেই, আছে বিদেশী সরকার। সেই শহরের লোকজনও যে খানদানী নৃত্য বা সঙ্গীত বোঝে, এ সম্পর্কে নবাবের কোনো ধারণাই ছিল না। তাই নবাব দেখতে চান কলকাত্তাওয়ালীর নাচ।

নবাবের দূতের চেহারা, পোশাক, কথাবার্তা সবই অন্য প্রকারের। কমলাসুন্দরী প্রথম বুঝতেই পারেনি প্রস্তাবটা। যখন বুঝলো, তার বুক কেঁপে উঠলো। এ যে বিরাট সম্মান ! অতবড় একজন নবাব তাকে দেখতে চেয়েছেন !

এ কোনো উটকা নবাব কিংবা বাদশা নয়, কত বড় বংশের মানুষ ইনি। হিন্দুস্তানের বুকের মণি যে আওয়ধ, সেখানকার শেষ স্বাধীন নবাব।

কমলাসুন্দরী শুধু তো দেহপসারিণী নয়, সে শিল্পীও বটে। শিল্পী সব সময় খোঁজে শিল্পরসিককে। টাকা পয়সা ছড়িয়ে অনেকেই এসে কমলাসুন্দরীর নাচ দেখে যায়। তার মধ্যে প্রকৃত সমঝদার কজন ? সকলেই জানে, সারা হিন্দুস্তানে নৃত্য-গীতের শ্রেষ্ঠ সমঝদার ঐ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ। তিনি ডেকেছেন কমলাসুন্দরীকে।

বিকেলে ফুটে মল্লিক আসতেই কমলাসুন্দরী চোখ মুখ উদ্ভাসিত করে বললো, আজ কী হয়েচে, জানো ? বলো দিকিনি আজ কে এয়েচেন ?

ফুটে মল্লিকের মুখ শুকিয়ে গেল। আবার কে উৎপাত করতে এসেছিল কে জানে ! কোনো নামকরা লোক, সমাজের মাথা ? নাকি তার চেয়েও আট দশ গুণ বড় কোনো নির্বোধ ধনী ? বাঙাল দেশ থেকে অনেক উটকো জমিদার আসে, তারা আঁটকুড়ে ব্রতর বাতাসার মতন মুঠো মুঠো টাকা ছড়ায়, সেগুলোর সঙ্গে পারা যায় না।

ফুটে মল্লিক বললো, সক্কালে এয়েছেল সে আবার কেমন ধারা মানুষ ? নিশ্চয়ই কেতা জানে না। রাতের চিড়িয়ার কাচে সক্কালে কেউ আসে ? আর তুই অমনি দেকা দিলি ? তখুন তোর চুলে কিলিপ ছেল ? চোকে সুর্মা দিইচিলি ?

কমলা বললো, ওগো, যে এয়েচেল,সে আসল নয় গো,আসল নয়। সে দূত। আমায় শনিবার যেতে বলেচে। কার দূত বলো দিকিনি ?

চপলা, তরঙ্গিণী, চন্দনবিলাসীরাও কমলাসুন্দরীকে ঘিরে বসে আছে মজলিশ ঘরে। এখনো তাদের সাজ-পোশাক, প্রসাধন হয়নি। আসর বসবে রাত আটটার আগে নয়।

ফুটে মল্লিক প্রায়ই আগে আগে আসে গল্প-গুজব করতে। ফুটে মল্লিক মধ্য বয়সী, বেঁটেখাটো গোলগাল ধরনের মানুষ, মাথায় সুবৃহৎ টাক, গায়ের রঙ টুকটুকে ফর্সা এবং তার টাকটিকে আরও বেশী ফর্সা দেখায়। সে সব সময় সাদা রঙের পোশাক পরিধান করে বলে একটু দূর থেকে তাকে মনে হয় একটি রসগোল্লার মতন। মানুষটি গল্প-গুজব এবং হাস্য পরিহাস ভালোবাসে এবং তাই নিয়েই সময় কাটায়। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে সেও একজন নিষ্কর্মা ধনী। তার পিতামহ উত্তরবঙ্গে একটি জমিদারি ক্রয় করেছিলেন, উত্তরাধিকারসূত্রে সে ঐ জমিদারির দুই-তৃতীয়াংশের মালিক। নিজের দেখাশুনো করারও প্রয়োজন হয় না। গত দশ বৎসরের মধ্যে সে নিজের জমিদারিতে একবারও স্বশরীরে উপস্থিত হয়নি। নায়ের-গোমস্তা মারফৎ নিয়মিত তার কাছে টাকা আসে।

ফুটে মল্লিক বললো, কার দূত রে বাবা ? আমি, আমি তো কিছুই বুঝচিনি !

অনেক রঙ্গ-রহস্যের পর কমলাসুন্দরী নবাবের কথা জানালো।

সে কথা শুনে ফুটে মল্লিকের চোখ এমনই বিস্ফারিত হয়ে গেল যে মনে হলো যেন ভিতরের গোলক দুটি ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসবে !

আর্তনাদ করে সে বলে উঠলো, তোর কি মরবার সাধ হয়েচে নাকি রে, কমলা ? অ্যাঁ ? তুই সাধ করে ঐ নবাবের গভ্ভরে পা দিবি !

কমলাসুন্দরী কিছুই বুঝতে পারলো না। সে সরল বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলো, কেন, কী হয়েচে ?

—তুই শুনিসনি কিছুই। নবাবের কীর্ত্তি-কাহিনীর খবরে যে শহর একেবারে ম ম কচ্ছে ! নবাবটি যে একেবারে কাঁচাখেগো দেবতা, মেয়েমানুষ পেলেই একেবারে চিবিয়ে খেয়ে ফ্যালে !

—যাঃ, অতবড় একটা মানী লোক।

—মানী লোকেরা কি মেয়েমানুষের মাতা খায় না ? মেটেবুরুজের চত্বরেও এদানি কোনো মেয়েমানুষ যায় না !

—কী যে বলো আশ কতা পাশ কতা। আমার তবলা বাজনদার বললে যে নবাব খুব নাচ গান ভালোবাসেন। ভালো নাচ দেখলে ভাবের ঘোরে উনি নিজেও উঠে নাচতে শুরু করেন।

—নাচ ভালোবাসেন তো বটেই। নাচ দেকে একেবারে মোহিত হয়ে যান, তোর নাচও একবার দেকবেন, তারপর তোকে খেয়ে একেবারে হজম করে ফেলবেন।

—এমন অদ্ভুত কতা কখনো শুনিনিকো। নবাব পাগল, না তুমি পাগল ?

—এসব কতা আমি স্বকর্ণে শুনিচি !

ফুটে মল্লিক আরও নানারকম ভয়াবহ গল্প শুনিয়ে কমলাসুন্দরীকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলো। কিন্তু কমলাসুন্দরীর ঠিক বিশ্বাস হলো না। ফুটে মল্লিক হিংসাতেও একথা বলতে পারে।

পরদিন সে নুটুবিহারীকে খবর পাঠালো।

নুটুবিহারী কমলাসুন্দরীর চেয়ে বয়েসে কিছু ছোটো। সম্প্রতি তার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় হাতে অঢেল পয়সা এসেছে। ফুটে মল্লিকের মতন সে একেবারে নিষ্কর্মা নয়, সে আইন শিক্ষা করে কিছুদিন ওকালতি শুরু করেছিল, তা ছাড়া সে দুটি কয়লাখনিও দেখাশুনো করে। তার পিতা অতি কড়া ধাতুর লোক ছিলেন, সেইজন্য পিতা ধরাধাম ত্যাগ করার পর স্বাধীন হয়ে সে কিছুদিন শরীরের আড়-মোড়া ভেঙে নিচ্ছে।

নুটুবিহারী বেশ লম্বা ও সুদেহী। মাথা ভর্তি বাবরি চুল, অনেকটা সেনাপতি সেনাপতি ধরনের চেহারা। কিন্তু শরীরের তুলনায় তার কণ্ঠস্বরটি অস্বাভাবিক রকমের মিনমিনে। পিতার ধমক খেয়েই বোধহয় সে তার কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলতে পারেনি।

ফুটে মল্লিকের তুলনায় ইদানীং নুটুবিহারীই কমলাসুন্দরীর বেশী ঘনিষ্ঠ। নাগর হলেও ছোট নুটুকে সে যেন খানিকটা স্নেহের চক্ষেও দেখে।

ছোট নুটু ফুটে মল্লিকের ঠিক বিপরীত। নবাবের কাছ থেকে আহ্বান এসেছে শুনে সে উল্লসিত হয়ে উঠলো। কমলাসুন্দরীর সম্মান যেন তার নিজেরই সম্মান। সে স্বয়ং কমলাসুন্দরীকে মেটেবুরুজে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

তখন কমলাসুন্দরী বললো, নবাব কেমন ধারা মানুষ গো ? ফটিকচাঁদ কেমন সব উলটো কথা বলছিল !

ফটিক চাঁদের নাম শুনেই জ্বলে উঠলো নুটুবিহারী।

—ঐ ফুটে মল্লিকটা কী জানে ? ওটা একটা ছাঁচি কুমড়ো ! ও ব্যাটা নবাবীর কী মর্ম বোঝে ? লক্ষ্ণৌয়ের নবাব, নাম শুনলেই মাতা হেঁট হয়ে যায় ! হাতি দয়ে পড়লেও হাতি। নবাব দয়ে পড়েচেন বটে কিন্তু নবাবী মেজাজ একটুও নষ্ট হয়নিকো ! রহিসী কায়দা পুরোপুরি বজায় রেকেচেন।

—তবু বাপু তুমি একটু খপর নেও না ! শুনলে কেমন ভয় ভয় করে। নবাব ডেকেচেন, সে ডাক উপিক্ষেও কত্তে পারি না, আবার চাল-চলন-সহবতে যদি কিচু ভুল হয়, নবাব যদি হাতে মাতা কাটার হুকুম দেন—

—যেতে হবে তো শনিবার ? এখনো চারদিন রয়েচে। আমি সব খোঁজ এনে দিচ্চি তোমায়। লক্ষ্ণৌয়ের নবাব কলকাতায় এসে আর কারুকে ডাকেনি, শুধু তোমায় এত্তেলা দিয়েচেন, তার মানে বুঝলে, কমলা, এক ডাকে তোমায় সবাই চেনে ! ঐ ফুটে মল্লিকটার হিংসেয় বুক ফাটচে !

দুদিন বাদে ছোট নুটু সব খোঁজখবর নিয়ে এলো। কথা বলার বদলে সে ক্রন্দন করতে শুরু করলো কমলাসুন্দরীর হাত চেপে ধরে।

কমলাসুন্দরী হতভম্ব হয়ে বললো, ও মা, এ কী ? এ কী ?

ছোট নুটু হাপুস নয়নে থেমে থেমে বললো, কমলা, কতা দাও, তুমি কিচুতেই মেটেবুরুজে যাবে না ! নবাব তোমায় যতই হীরে-মোতির মালার লোভ দেখাক্ !

—কেন গো ? সত্যিই কি নবাব বাহাদুর মেয়েমানুষদের ধরে ধরে মেরে ফেলেন নাকি ?

—না গো, তা নয় ! ব্যাপার আরও ভয়ংকর। নবাবী প্রাসাদে কেউ ঢুকলে আর বেরুতে পারে না।

নবাব সবাইকে শাদী করে ফেলেন !

—অ্যাঁ ?

—হ্যাঁ গো, আমি সব খপর এনিচি !

—এসব কতা কে শোনালে তোমায় !

—মেটেবুরুজে সব্বাই বলাবলি কচ্চে যে ! সেখেনে কত মানুষের ভিড়, যত সব ফড়ে আর দালাল, গুড়ের লোভে লোভে যেমন পিপড়ে আসে। আর জুটেচে যত রাজ্যের পাখিওলা। নবাবের খুব পাখি কেনার শক, আর ঐ শক বিয়ে করার।

—কী বললে গো তুমি ? কতা নেই, বার্ত্রা নেই, যাকে দেকবে, তাকেই ধরে ধরে বে করবে ? এ কি অলুক্ষুণে লখনৌয়ের আইন ?

—নবাব ধম্মে হলেন গে শিয়া ! ওরা যত খুশী মুত্-আ কত্তে পারে।

—মুত্-আ কী গো ?

—ঐ যে বললুম, বিয়ে বল, শাদী বল, নিকে বল, সবই ঐ মুত্-আ। নবাবের যাকে পছন্দ হয়, অমনি তাকে মুত্-আ করে ফেলেন। একজন কী বললে জানো ? এক কম বয়েসী ভিশতিনী মাগী অন্দর মহলে জল দিতে যেত, তাকে হঠাৎ নবাবের চোখে লেগে গেল। আর অমনি তাকে মুত্-আ করে ফেললেন নবাব। সে ভিশতিনী এখন বেগম !

ছোট নুটুর গলা কাঁদো কাঁদো, কিন্তু কমলাসুন্দরী হেসে গড়িয়ে পড়লো একেবারে। এ যেন রূপকথা, নবাবের নেক নজরে পড়ে এক ভিশতিনী রাতারাতি হয়ে গেল বেগম সাহেবা !

ছোট নুটু বললো, শুধু কি ভিশতিনী নাকি, এক ঝাড়ুদারনীকেও অমনি মুত্-আ করে বেগম বানিয়েচেন নবাব। তার নাম আবার মুসফ্ফা বেগম।

—তার মানে কী ?

—কে জানে ? শুনচি নবাব রোজই একটা করে শাদী কচ্চেন, অ্যাদ্দিনে প্রায় শ'খানেক বেগম হয়ে গ্যাচে। আগে আরও কত ছেল কে জানে ! তোমার মতন আগুনের খাপ্‌রাকে দেকলে নবাব কী আর ছাড়বেন ! জোরজার করে অমনি মুত্-আ করে নেবেন !

কমলাসুন্দরী ঠোঁট টিপে হেসে বললো, তা একবার নবাবের বেগম হয়ে দেকলে মন্দ হয় না !

ছোট নুটু হাত জোড় করে বললো, কমলা, তুমি এমন কতা বললে ? জাত ধম্মো বিসজ্জন দেবে ?

—আমাদের আবার জাত কী ?

—ওঃ, এই তোমার মনে ছেল ? তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে চাও ? আমরা কি তোমার পায়ে পড়ে থাকিনি ? এখুন তোমার পায়ে মাতা কুটবো, কমল।

—আরে, আরে, করে কী, করে কী, মিন্‌সেটা ! সত্যি সত্যি কি আমি ধেই ধেই করে নবাবের বেগম হতে যাচ্চি নাকি ? আর গেলেই বা কি। অমনি জোর করে মুত্-আ করবে ? এ কি মগের মুলুক নাকি রে বাবা !

—হ্যাঁ, সেই কতাই তো সবাই বলচে। নিজের রাজ্য রক্ষা কত্তে পাল্লেন না, নবাব এখন মেয়েমানুষ জয় কচ্চেন ! সুন্দরপানা কোনো মাগ্ নবাবের প্রাসাদে একবার ঢুকলে আর বেরুতে পারে না। মুত্-আ করার পর বেগম বানাবে। সে ঐ নামেই বেগম, সে আর কোনোদিন দেকতে পাবে না বাইরের আলো-বাতাস, বুঝলে ?

কমলাসুন্দরী ডাকলো চপলা, তরঙ্গিনী আর চন্দনবিলাসীকে। সব বৃত্তান্ত শুনিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী লো, তোরা কেউ নবাবের বেগম হতে চাস নাকি ? এমন সুযোগ আর কখুনো পাবিনি !

তিনজনেই সমস্বরে বলে উঠলো, ও মা গো, রক্ষে করো !

ছোট নুটু বললো, ঠিক বলিচিস। কেন নবাব মহলে গিয়ে বন্দিনী হবি ? আমরা কি তোদের কম খাতির করি ?

কমলাসুন্দরী বললো, তা হলেও বেগম বলে কতা !

চপলা বললো, ওফ্, ভাবতেও বুক কাঁপে ! প্যাঁজ রসুনের গন্ধ, আর নবাবের নাকি হুমদো হুমদো কাফ্রি খোজা রয়েচে।

নবাব সম্পর্কে এই সব চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর গল্প চলতে লাগলো দু-তিনদিন ধরে। আমন্ত্রণ পেয়েও কমলাসুন্দরী যাবে না বলে নবাব যদি রাগ করেন এবং জোর করে ধরে নিয়ে যান, সেই ভয়ে

ছোট নুটু একটা বজরা ভাড়া করে ওদের সকলকে নিয়ে কয়েকদিনের জন্য গঙ্গাবক্ষে বিহারের প্রস্তাব দিল।

অতি উত্তম কথা, কমলাসুন্দরী সানন্দে রাজি।

কিন্তু যাত্রার আগের দিন সন্ধে থেকে তরঙ্গিনীকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। পরদিনও সন্ধান মিললো না তার। কমলাসুন্দরীর বজরা ভ্রমণে বেরিয়ে গেল। এবং ফিরে আসার পর শুনতে পেল, তরঙ্গিনী ঝাড়ুদারনীর ছদ্মবেশে নবাবের মহলে ঢুকেছিল এবং নবাবও তাকে মুত্-আ করে বেগম বানিয়ে ফেলেছেন।

অবশ্য এটা ঘটনা না রটনা, তার সত্য মিথ্যে জানার কোনো উপায় নেই।
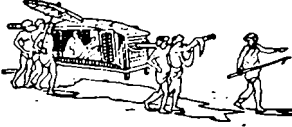
বিধুশেখরের নাতি প্রাণগোপালের উপনয়ন উপলক্ষে নবীনকুমার অনেকদিন পর এলো এ বাড়িতে। অতি শৈশবে সে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গানারায়ণের হাত ধরে এখানে অনেকবার এসেছে। তখন তাকে আদর করার জন্য নারীগণের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত।

পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে নবীনকুমার এখন বাইরের পৃথিবীকে চিনতে শুরু করেছে, মাসী-পিসী, দিদি-খুড়ো-জ্যাঠাদের সঙ্গে অহেতুক বিশ্রম্ভালাপ আর সে পছন্দ করে না। নিমন্ত্রণাদি ছাড়া আর আসা হয় না এখানে।

একমাত্র দৌহিত্রের উপনয়নে বিধুশেখর ধুমধামের আয়োজন করেছেন বিস্তর। প্রাণগগোপালকে নিয়ে তাঁকে বিস্তর ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছে। প্রাণগোপালের পিতামহ শিবলোচন কিছুতেই দাবি ছাড়েতে চান না, তিনি তাঁর পৌত্রের ওপর অধিকার বজায় রাখতে চান। প্রাণগোপাল যেমন বিধুশেখরের একমাত্র নাতি, তেমনি শিবলোচনেরও ঐ একটিই নাতি বৈ আর নেই।

গরীব ব্রাহ্মণের এই স্পর্ধা বিধুশেখরের কিছুতেই সহ্য হয় না! শিবলোচনের পুত্রকে বিধুশেখর ঘরজামাই করেছিলেন, তাঁর কন্যার সঙ্গে বিবাহই হয়েছিল ঐ শর্তে। ঘর-জামাইয়ের মৃত্যু হলে তার সন্তান তো মাতুলালয়েই থাকবে স্বাভাবিকভাবে! ঐ পূজারী ব্রাহ্মণ শিবলোচনের কতখানি সামর্থ্য আছে প্রাণগোপালকে মানুষ করার? বিধুশেখর এরই মধ্যে ঐ অষ্টমবর্ষীয় বালকের জন্য তিনজন শিক্ষক রেখেছেন।

শিবলোচন মামলা করার আস্ফালন করেছিলেন, তাতে অবশ্য হেসেছিলেন বিধুশেখর। ঐ মূর্খটা জানে না যে, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের ওপরেই শুধু হারজিত নির্ভর করে না। ধনীর সঙ্গে মামলা করে কখনো জয়ী হতে পারে না কোনো দরিদ্র। আর কিছু না, শুধু মামলাটিকে চার-পাঁচ-ছয় বৎসর ধরে চালিয়েই বিধুশেখর ওঁকে সর্বস্বান্ত করে দিতে পারেন।

শেষ পর্যন্ত মামলা-মোকদ্দমার দিকে যাননি শিবলোচন। কিন্তু হালও ছাড়েননি। প্রতি মাসে একবার দুবার করে এসে আর্জি জানিয়ে দেন। অন্তত একবার সামান্য কয়েকদিনের জন্যও তিনি প্রাণগোপালকে নিয়ে যেতে চান স্বগৃহে। ও ছেলে কি তার পিতার ভিটেয় একবারও পা দেবে না? এর পিতামহী যে একবারও ওকে চক্ষেও দেখলেন না। পুত্রের শ্বশুরালয়ে কখনো জননীকে আসতে নেই, নইলে তিনি নিজেই এসে দেখে যেতে পারতেন।

কিন্তু বিধুশেখর এ ব্যাপারেও অত্যন্ত কঠোর। তাঁর মুখের বাক্য অনড়। একবারের জন্যও তিনি প্রাণগোপালকে প্রেরণ করতে রাজি নন। তাঁর মতে, দরিদ্র মাত্রেই কুটিল ও লোভী। অভাব মানুষকে নীচে নামায়। নিজের পুত্রকে ঘরজামাই হতে দিতে রাজি হয়েছিলেন কেন শিবলোচন, অর্থলোভেই তো! নাতিকে নিয়ে যাবার আবেদনের পশ্চাতেও নিশ্চয়ই কোনো কু-মতলব আছে!

শিবলোচনকে ইদানীং আর এ গৃহে প্রবেশ করতেই দেওয়া হয় না। তবু তিনি আসেন এবং দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকেন। যদি একবার দূর থেকেও নাতির মুখ দেখা যায়।

প্রাণগোপালের উপনয়নের দিনেও তার পিতৃকুলের কারুর নিমন্ত্রণ হয়নি। শিবলোচন সম্পর্কটা এমনই তিক্ত করে ফেলেছেন যে, ওঁদের কারুর মুখদর্শন করতেও আর ইচ্ছে হয় না বিধুশেখরের। এব্যাপারে তিনি তাঁর কন্যা সুহাসিনীর মতামত জিজ্ঞেস করেছিলেন।

—ওদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না, মা ! প্যাঁচালো বামুন পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে বসে কোন্ কতা বলবে, তার ঠিক কী ! হয়তো নাকে কান্না শুরু করবে ! তারচে ওদের না ডাকাই ভালো ! তুই কী বলিস ?

সুহাসিনী আর পিতার কথার ওপর কোন্ কথা বলবে ! তা ছাড়া, শ্বশুরকুলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই স্থাপিত হয়নি। বিবাহের পর মাত্র সাতদিন সে শ্বশুরালয়ে ছিল একবার, তাঁদের কারুর মুখই তার ঠিক মতন স্মরণ হয় না।

—সে আপনি যা ভালো বুজবেন, বাবা !

নির্লজ্জ শিবলোচন তবু কোথা থেকে খবর পেয়ে আজও দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন দিনে তিনি নাতিকে একবার আশীর্বাদ করতে চান। বিধুশেখরের তুলনায় শিবলোচন আরও বেশী বৃদ্ধ। সত্তরের কাছাকাছি বয়েস, শরীরটা ভাঙা-চোরা। একটি বহু ব্যবহৃত কাষায় বস্ত্র ও উত্তমাঙ্গে নামাবলী, এ ছাড়া অন্য কোনো পোশাক তিনি কখনো ব্যবহার করেন না।

সুহাসিনীর বিবাহের সময় অতিথি আপ্যায়নের ভার ছিল গঙ্গানারায়ণের ওপর। সুহাসিনীর পুত্রের অন্নপ্রাশনের সময় সেই ভার নবীনকুমারের ওপর বর্তেছে। নবীনকুমারকে দেখে সুহাসিনীর বার বার মনে পড়ছে তার গঙ্গাদাদার কথা। নবীনকুমারের এখন যা বয়েস, তার বিবাহের সময় গঙ্গানারায়ণেরও প্রায় এই বয়েসই ছিল। অথচ দুই ভ্রাতার মধ্যে কত প্রভেদ। গঙ্গানারায়ণ ছিল লাজুক, নম্র স্বভাবের। বেশী লোকজনের মধ্যে সে অস্বস্তি অনুভব করতো, অন্দরমহলে এসে সে নারীদের চোখের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারতো না। সেই তুলনায় নবীনকুমার একেবারে বিপরীত। এত সপ্রতিভ, চঞ্চল এবং সামান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সে হুকুমের সুরে কথা বলে। ধুতির ফুল-কোঁচাটি এক হাতে ধরে সে দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে পূর্ণবয়স্কদের মতন ব্যবহার করছে মাননীয় অভ্যাগতদের সঙ্গে। তার উজ্জ্বল চক্ষু দুটি সে সোজা অপরের মুখের দিকে তুলে ধরে।

বিন্দুবাসিনীর কথাও এদিনে কয়েকবার চকিতে মনে পড়ে সুহাসিনীর। কিন্তু দিদির মুখচ্ছবিখানি সে মন থেকে মুছে দিতে চায়। দিদি বড় মন্দভাগিনী ছিল, সুহাসিনীর মতন একটি সন্তানও সে পায়নি। বৈধব্যজীবনের নিষ্ঠাও রক্ষা করতে পারলো না সে, সবাই জানে দিদি গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে কলঙ্কিনী হয়েছিল। সে মরে বেঁচেছে। এ গৃহে তার স্মৃতিরও কোনো স্থান নেই, বিশেষত আজকের মতন শুভদিনে।

অতিথিদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এই সময় নবীনকুমার একবার অন্দরমহলে এলো জল পান করবার জন্য। লোকজনের সঙ্গে অনবরত কথা বলতে বলতে কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে যায়।

সুহাসিনী তাকে দেখে বললো, এই ছোট্‌কু, শোন্।

সুহাসিনী এখন বাইশ বছরের যুবতী। তার শরীর একটু ভারির দিকে, একখানা নতুন গরদের শাড়ি পরিহিত অবস্থায় তাকে বেশ মা-মা দেখায়।

নবীনকুমার কাছে এগিয়ে যেতেই সুহাসিনী তার কপালে একটি চুম্বন দিয়ে শুধু বললো, ছোট্‌কু—। তারপরই তার দুই চক্ষু দিয়ে দরদর ধারে অশ্রু বর্ষিত হতে লাগলো।

নবীনকুমার বিস্মিত হয়ে বললো, এ কি, সুহাসিনীদিদি !

সুহাসিনী বললো, ছোট্‌কু, আজ বড় গঙ্গাদাদার কতা মনে পড়চে রে ! আমায় কত ভালোবাসতেন। আমি গঙ্গাদাদার গলা জড়িয়ে ধরে পিঠে কিল মাত্তুম ! গঙ্গাদাদা আমাদের ছেড়ে কোতায় চলে গেল রে !

নবীনকুমার নির্বাক হয়ে রইলো। গঙ্গাদাদাকে সেও খুব ভালোবাসতো। কারুর কারুর উপস্থিতিতেই ভালোবাসার ঘ্রাণ পাওয়া যায়। গঙ্গাদাদা কাছে এলেই সে রকম লাগতো। একটি দিনের কথা তার এখনো মনে আছে। পিতার মৃত্যুর পর তাদের সম্পত্তি ভাগাভাগি হচ্ছিল, প্রায় সবই নবীনকুমারের ভাগে,গঙ্গানারায়ণকে বিশেষ কিছুই দেওয়া হয়নি। তাই নিয়ে বিম্ববতী আপত্তি তোলায় গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, মা, ছোট্‌কুর পাওয়া আর আমার পাওয়া তো একই কথা, তুমি অমন কেন বলচো? তখন নবীনকুমারের অনেক কম বয়েস, অতশত বোঝার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু আজও স্মরণে এলে সে বুঝতে পারে, গঙ্গানারায়ণের ঐ কথার মধ্যে ঈর্ষার লেশমাত্র ছিল না। তবে, গঙ্গানারায়ণের নিরুদ্দিষ্ট বা মৃত বলে ঘোষিত হবার পর আর বেশী দিন নবীনকুমার তার দাদার স্মৃতি ধরে রাখতে পারেনি।

আজ সুহাসিনীর কান্না তার কাছে এমনই আকস্মিক মনে হলো যে সে কোনো উত্তরই দিতে পারলো না।

সেখানে অন্য একজন স্ত্রীলোক এসে পড়ে বললো, ওমা, সুহাসিনী, তুই কাঁদচিস? কী হলো গা?

সুহাসিনী তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছে বললো, না, না, কিচু না!

তারপর সে নবীনকুমারের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বললো, আমাদের সেই ছোট্‌কু, কত বড়টি হয়েচে, কেমন সুন্দর, কেমন বুদ্ধিমান, দেকে এত ভালো লাগলো—

সেই স্ত্রীলোকটি সুহাসিনীর প্রতি সহানুভূতি জানাবার জন্যই যেন চক্ষে আঁচল দিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, আহা, আজ যদি গোপালের বাবা বেঁচে থাকতেন···ওগো তিনি থাকলে যে সব্বাঙ্গসোন্দর হতো—

এই সময় নবীনকুমার বার-বাড়ির দিকে সরে পড়লো। স্ত্রীলোকের কান্নার সামনে দাঁড়াতে তার বিষম অস্বস্তি লাগে।

বিধুশেখর আর আগেকার মতন উৎসব গৃহের সমস্ত স্থল ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করতে পারেন না। বহুমূত্র ব্যাধিটি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, ইদানীং দ্বিতীয় চক্ষুটির দৃষ্টিও যেন কিছুটা ম্লান লাগে। তিনি বাইরে একটি আরাম কেদারায় বসে সব রকম খবরাখবর নিচ্ছেন। তাঁর বাড়িতে ভৃত্যপরিচারক এবং আশ্রিত আত্মীয়স্বজনের অভাব নেই, তাদের প্রত্যেকের ওপরেই নির্দিষ্ট কাজের ভার দেওয়া আছে। তবু তিনি মাঝে মাঝেই নবীনকুমারকে ডেকে জানতে চান সব কিছু।

ব্রাহ্মণদের দান ও নিমন্ত্রিতদের ভোজনাদি শুরু হয়েছিল দ্বিপ্রহর থেকে, শেষ হলো প্রায় রাত দশটার তোপ দাগার সময়। বিধুশেখরের জ্যেষ্ঠা কন্যা নারায়ণী এ বাড়ির কর্ত্রী, তিনি বলে রেখেছিলেন যে নবীনকুমারকে তিনি তাঁর সামনে বসিয়ে খাওয়াবেন। বৃহৎ একটি রূপোর থালায় ষোড়শ ব্যঞ্জন সাজিয়ে তিনি ডেকে পাঠালেন নবীনকুমারকে।

সারাদিন ধরে লোকজনের সঙ্গে কথা বলে ও অনেকবার ছাদে-নিচে ওঠা-নামা করে নবীনকুমার ক্লান্ত, তার আর আহারে রুচি নেই। নারায়ণী তবু জোর করে তাকে খেতে বসালেন। অনেক আত্মীয়া-অনাত্মীয়া নারী উপস্থিত সেখানে। বিম্ববতীও রয়েছেন। যারা নবীনকুমারের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠা এবং অনেকদিন পর তাকে দেখছে, তারা সকলেই নবীনকুমারের হঠাৎ যৌবনে উপনীত হওয়ায় মুগ্ধ ও বিস্মিত। সবাই বলছে, ওমা, এই তো ক'দিন আগেও একেবারে ছেলেমানুষটি ছেল, এখুন দিব্যি বাবু হয়ে উঠেচে যে গো! আর কত্ত কাজের ছেলে, সব দিকে নজর!

আর যারা বয়সে ছোট, তারাও বিস্ফারিত নেত্রে দেখছে নবীনকুমারকে, কেউ অন্য একজনের কানে কানে বলছে, ওমা দ্যাক্, দ্যাক্, গোঁপ আচে! গোঁপ আচে!

কিছুদিন আগে স্বগৃহে মঞ্চ বেঁধে নবীনকুমার নাটকের অভিনয় করেছিল এবং তাতে সে রাজকুমারীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল বলে সে অনেকের কাছে বিশেষ দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে। চিকের আড়ালে বসে অনেক নারী ও বালিকা দেখেছিল সেই নাটক। নবীনকুমারের অভিনয়-কলা নৈপুণ্যের সুখ্যাতিও বেরিয়েছিল সংবাদপত্রে। সেই সময় নবীনকুমারের সবে সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা উঠেছিল মাত্র, কিন্তু রাজকুমারীর গোঁফ থাকা কোনোক্রমেই উচিত নয় বলে পরামাণিক দিয়ে চেঁছে ফেলা হয়েছিল ওষ্ঠ। তার ফলে এখন তার বেশ কালচে রঙের গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে।

সামান্য একটু খেয়েই নবীনকুমার উঠে পড়তে যাচ্ছিল, নারায়ণী বললেন, ওমা, উঠচিস কী! খা খা, আর একটু খা, একটু পায়েস মুখে দে অন্তত—

নবীনকুমার ততক্ষণে জলের গেলাসে হাত ডুবিয়েছে। বিম্ববতী বললেন, ঐ ওর স্বভাব, এই

এইটুকুনি পাখির আহার যেন !

নবীনকুমার বললো, সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শিরদাঁড়া ব্যথা হয়ে গ্যাচে। এবার গিয়ে ঘুমুবো ! একবার গোপালের সঙ্গে দেকা করে যাই।

এই কথা শুনে নারায়ণী তাকালেন সুহাসিনীর মুখের দিকে। ওরা কিছু বলবার আগেই বিম্ববতী বললেন, আজ আর গোপালের সঙ্গে দেখা করতে হবে না। যা শুয়ে পড়গে !

নবীনকুমার কৌতুকের সঙ্গে বললো, একবার দেকে আসি, নেড়ু মাতায় গোপ্লাটাকে কেমন দেকাচ্চে !

নারায়ণী বললেন, গোপাল এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েচে !

—এই তো একটু আগে তার গলা পেলুম। বসে বসে টাকা গুণছেল ! খুব টাকা চিনেচে ছেলেটা !

নারীরা চুপ করে রইলো।

যজ্ঞ সমাপ্ত হলে উপবীত গলায় দেবার পর প্রাণগোপালকে দ্বিতলের একটি কক্ষে পৃথক করে রাখা হয়েছে। এখন সে তিনদিন ব্রহ্মচারী হয়ে থাকবে, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন জাতের মানুষের মুখ দর্শন করবে না।

নবীনকুমার উঠোনে এসে দাঁড়াতেই এক ভৃত্য এলো তার হাতে জল ঢেলে দিতে। হাত মুখ প্রক্ষালন করে নবীনকুমার বললো, গোপালকে একবার দেকেই আমি চলে যাবো।

বিম্ববতী বললেন, থাক না, এখুন আর যাস্‌নি !

—কেন ?

—এখুন ওর কাচে যেতে নেই !

ঠিক তখনই এ বাড়ির এক আশ্রিত যুবক এসে নারায়ণীকে জিজ্ঞেস করলো, ও বড়দিদি, গোপাল দুধ খেতে চাইচে। এখুন কি কিচু দেওয়া যায় ?

নবীনকুমারের এবারে খট্‌কা লাগলো। সে তাকালো সবার মুখের দিকে। তারপর ঝাঁঝালো গলায় জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার ? তোমরা আমায় নিষেধ কচ্চো কেন ? এই তো এ গেস্‌লো গোপালের ঘরে। আমি একবার গেলে কী দোষ !

নারায়ণী বললেন, ও তো বামুন।

বিম্ববতী তার সঙ্গে যোগ করলেন, বামুন ছাড়া আর কারুর যেতে নেই।

নবীনকুমারের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সে এই প্রথার কথা বিন্দুবিসর্গ জানতো না। সে ব্রাহ্মণ নয় বলে প্রাণগোপালের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না ? আজ সারাদিন সে প্রাণগোপালের পৈতের জন্য খাটলো, আজ সকালেও প্রাণগোপাল তাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেছিল, ছোট্‌কুমামা, তুমি আমায় ইস্‌প্রিং-এর হাতি দিচ্চো তো, তোমায় বলেচিলুম···সেই প্রাণগোপালের মুখ দেখা তার এখন নিষেধ ? এতদিন সবাই বলেছে, সে এ বাড়িরও ছেলেরই মতন, কিন্তু আসলে তা নয়, সে অব্রাহ্মণ, সে এদের চেয়ে ছোট !

আর একটিও কথা না বলে নবীনকুমার হনহন করে এগিয়ে গেল দ্বারের দিকে। সমস্ত ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি তার ক্রোধ উদ্দীপিত হলো। সে যখন আরও অনেক ছোট ছিল, একবার কৌতুক ও গোঁয়াতুর্মি করে টিকি কেটে নিয়েছিল এক ব্রাহ্মণের। সেই কথা মনে পড়ে গেল তার।

দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় সে দেখলো, নামাবলী গায়ে জড়ানো এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বারবানদের কাছে কী বলে যেন কাকুতি-মিনতি করছে। নবীনকুমার প্রাণগোপালের ঠাকুর্দাদা শিবলোচনকে চেনে না, তার বৃত্তান্তও জানে না। শিবলোচনকে সে মনে করলো কোনো ভিখারী।

তাকে দেখে নবীনকুমারের আরও রাগ জাগ্রত হলো। সে মনে মনে বললো, এই তো ব্রাহ্মণের দশা ! অনাহূত হয়েও এখানে সুখাদ্যের লোভে ছোঁক ছোঁক করচে। অথচ, এর মাতায় একটা বৃহৎ টিকি আর গলায় কালীঘাটের পাণ্ডাদের মতন একটা মোটা পৈতে আচে বলে এরও অধিকার রয়েচে প্রাণগোপালের মুখ দেকার !

সে দ্বারবানদের এক ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এই বুড়োটা এখেনে কী চায় ? বলে দিস্‌নি যে বামুনবিদায় দুপুরে হয়ে গ্যাচে !

শিবলোচন নবীনকুমারের দিকে এগিয়ে এসে বলতে গেল, বাবা আমি শুধু একটিবার—

নবীনকুমার সে কথায় কর্ণপাত না করে দ্বারবানদেরই আবার হুকুম দিল। লুচি মণ্ডা দু-চারখানা এনে একে দিয়ে বিদেয় কর !

তারপর সে দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলো নিজের গৃহের উদ্দেশ্যে।

এদিকে সুহাসিনী কেঁদে ফেললো আবার।

নারায়ণীকে জড়িয়ে ধরে বললো, দিদি, কী অলুক্ষণে ব্যাপার হলো, ছোট্কু রাগ করে চলে গ্যালো।

নারায়ণী বললেন, আমি কী করি বল! ছোট্কু হঠাৎ না জেনে এ রকম বললো—

বিম্ববতী সুহাসিনীর পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুই এমন উতলা হচ্ছিস কেন মা? অলক্ষণ কেন হবে? ছোট্কু ওরকম অবুঝের মতন হঠাৎ ক্ষেপে যায়। আবার কাল দেকিস, একেবারে ঠাণ্ডা জল হয়ে গ্যাচে।

সুহাসিনী মুখ ফিরিয়ে বললো, ছোটমা, ছোট্কু একবার দেখতে গেলেই বা কী দোষ হতো?

বিম্ববতী বললেন, ওমা, তা আবার হয় নাকি! শাস্তরের নিয়ম···তিনদিন পরেই তো ও আবার গোপালকে দেকতে পাবে।

—শাস্তরের এমন নিয়ম কেন?

—সে কতা কী আমরা জানি?

—ছোট্কু আমার ছোট ভাই, আমাদের আর কোনো ভাই নেই, ছোট্কুই আমাদের একমাত্র ভাই, সে আবার বামুন-অবামুন কি, ছোট মা?

—তা বললে কী চলে?

নারায়ণী বললেন, আর ও নিয়ে মাতা ঘামাসনি। ছোট্কুকে পরে আমি ডেকে সব বুঝিয়ে বলবো'খন। এখুন, চল, ভাঁড়ার বন্ধ কত্তে হবে, ছিষ্টির কাজ বাকি রয়েচে!

এই সামান্য ঘটনাতেও কিন্তু নবীনকুমারের মনে খুব তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো। পরের দিন সে আর ও বাড়িতে গেলই না।

বিম্ববতী তাকে বোঝাতে এলে সে বললো, আমি আর কোনোদিন জ্যাঠাবাবুদের বাড়ি যাবো না। তুমি আমায় অনুরোধ করো না, মা। যে-বাড়িতে গেলে আমায় পদে পদে ভেবে চলতে হবে যে কোথায় আমার যাওয়া উচিত, আর কোথায় আমার যাওয়া উচিত নয়, সেখানে আমার যাবার দরকারটা কী! এখুন মনে পড়েচে, ছেলেবেলা খেলতে খেলতে একদিন আমি ওঁদের ঠাকুরঘরে ঢুকে পড়িচিলুম, তখুন জ্যাঠাইমা আমায় বকুনি দিয়েচিলেন!

—তা বলে কি তুই জাত-ধম্মো মানবি না নাকি ছোট্কু? বামুনরা হলো সবচে ওপরে, ওনারা যা পারেন, সব কি আমরা পারি?

—তোমার সঙ্গে আমি তক্কো করবো না, মা! তুমি শুধু আমায় ও বাড়িতে আর যেতে বলো না।

—অদ্ভুত কতা বলিস তুই ছোট্কু। ওরা আমাদের কত আপন। গোপালের পৈতে হয়ে গেল, ঐ পৈতের সময়েই যা একটু···অন্য সময় তুই ও বাড়ির যেখেনে খুশী সেখেনে যেতে পারিস!

—ঠাকুর ঘরে ছাড়া!

যথাসময়ে এ কথা বিধুশেখরেরও কানে উঠলো। তাঁর চলৎ-শক্তি কমে গেছে বটে তবু সেকালের রাজাদের মতন তিনি চক্ষু দিয়ে শোনেন এবং কান দিয়ে দেখেন।

সংবাদটি শুনে বিধুশেখর দোদুল্যমান হলেন। লোকাচার অনুযায়ী সদ্য উপবীতধারী ব্রহ্মচারীর মুখ দর্শন করার অধিকার নেই নবীনকুমারের। সেই হিসেবে তাঁর কন্যারা নবীনকুমারকে বাধা দিয়ে ঠিক কাজই করেছে। কিন্তু নবীনকুমার তো আসলে ব্রাহ্মণই। মহাভারতে সূতপুত্র নামে পরিচিত কর্ণ যেমন আসলে ক্ষত্রিয়।

বিধুশেখর কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। ছোট্কু বলেছে, সে আর কখনো এ বাড়িতে আসবে না। বয়েস কম, মস্তিষ্ক উষ্ণ, হয়তো এই মনোভাব তার বেশী দিন থাকবে না। ছোট্কু এ বাড়িতে আর কখনো আসবে না, এ কখনো হয়? তাঁর সব কিছুই তো ছোট্কুর। আজ যদি তিনি হঠাৎ মারা যান, তা হলে ছোট্কুই হবে প্রাণগোপালের অভিভাবক। এক সময় ছোট্কুকে সব সত্য কথা বলতে হবে, অন্তত মৃত্যুর আগে···অথচ বিম্ববতীর কাছে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

কিছুদিন কেরানীর চাকুরির পর মধুসূদনের একটু পদোন্নতি হয়েছে। তিনি নিযুক্ত হয়েছেন পুলিশ আদালতের দ্বিভাষিকের পদে। বেতনও কিঞ্চিৎ বেশী। কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাগান বাটীতেও আর অধিক দিন আশ্রিত হয়ে থাকা ভালো দেখায় না। কিশোরীচাঁদ এবং তাঁর পত্নী যতই খাতির যত্ন করুন, তবু পরের গৃহে কখনো পূর্ণ স্বস্তি পাওয়া যায় না, একটু আড়ষ্ট ভাব থাকেই। হাত থেকে পড়ে হঠাৎ একটি কাচের গেলাস ভগ্ন হলেই মনে হয়, বুঝি কোনো বৃহৎ অপরাধ হলো। গৃহস্বামী তখন যতবার বলেন, কিচ্ছু হয়নি, ততই লজ্জা বাড়ে।

কিশোরীচাঁদের জুড়ি গাড়িতেই মধুসূদন অফিস যাতায়াত করেন বটে, কিন্তু দমদম থেকে সেই লালবাজারে পৌঁছোবার জন্য বাটী থেকে বার হতে হয় অনেক আগে। কিশোরীচাঁদ নিয়মনিষ্ঠ মানুষ, ঘড়ি ধরে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটায় তিনি দফ্তরে পৌঁছোতে চান। মধুসূদনের জন্য দেরি হয়ে যায় মাঝে মধ্যেই। পূর্বরাত্রে অত্যধিক সুরা পান করলে পরদিন সকালে আর মধুসূদনের চক্ষু খুলতেই ইচ্ছে করে না। স্নানটান না করেই শেষ মুহূর্তে নাকে মুখে কিছু খাদ্য গুঁজে, কোনোক্রমে ধরা চূড়া চাপিয়ে মধুসূদন নিজ কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। গৃহদ্বারের বাইরে কিশোরীচাঁদ তখন গাড়ির কৌচের মধ্যে অপেক্ষমান। তিনি অতিশয় ভদ্র, বিরক্তির চিহ্নমাত্র প্রকাশ করেন না, শুধু ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে গার্ড চেন লাগানো ঘড়ি বার করে বারবার দেখেন, তার ভুরুদ্বয়ে উতলা ভাবটি লুকোনো থাকে না। গাড়িতে উঠে মধুসূদন বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর কিশোরীচাঁদ শীতল সভ্যতার সঙ্গে বলেন, না, না, ঠিক আছে, ঠিক আছে, মিঃ ডাট্।

এ ছাড়া, প্রায়ই যে সান্ধ্য-আসরটি বসে কিশোরীচাঁদের উদ্যানে, সেখানেও মধুসূদন নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারলেন না। তাঁর স্বভাবটি প্রায় দুরন্ত শিশুর মতন, যে-কোনো সমাবেশেই তিনি চান সকলের দৃষ্টি শুধু তাঁর দিকেই থাকুক, সকলে তাঁর সঙ্গে কথা বলুক কিন্তু কিশোরীচাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্যারীচাঁদ এবং তাঁর বন্ধুবর্গ প্রায়শই গুরুতর বিষয় নিয়ে বাক্যালাপে ব্যাপৃত থাকেন। দেশোদ্ধার, সমাজোদ্ধার ইত্যাদি ব্যাপার মধুসূদনের পছন্দ হয় না। এঁরা বড় নীরস, এঁরা কাব্য বোঝেন না। এঁরা শব্দঝংকারের মাধুর্য আস্বাদন করতে জানেন না। মধুসূদন কখনো কখনো এঁদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে গেলে, এঁরা বিদ্রূপ করেন, তাঁর মতামতের কোনো মূল্য দেন না। হয়তো খৃষ্টান বলেই মধুসূদনকে এঁরা সম্পূর্ণ আপনজন বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন। এঁদের সঙ্গ আর ভালো লাগে না মধুসূদনের। এঁরা সকলেই তাঁর চেয়ে বয়েসে বড়, সেইজন্য খানিকটা ভারিক্কী ভাব দেখান, কিন্তু মধুসূদন কখনো বয়স্কদের ভারিক্কীপনা গ্রাহ্য করেননি। এঁরা জানেন না যে এখনকার এই পরাশ্রিত, সামান্য চাকুরিজীবী মধুসূদন এককালে এই কলকাতা শহরের বুকেই অহংকারের পদপাতে কাঁপিয়ে তুলতেন।

একদিন মধুসূদন কিশোরীচাঁদকে প্রস্তাব দিলেন যে তিনি এখন পৃথক ভাবে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে চান। এ কথা শুনে কিশোরীচাঁদ বিস্মিত, তাঁর পত্নী দুঃখিত হলেন। তাঁরা বারংবার প্রশ্ন করতে লাগলেন, মধুসূদনের কী অসুবিধে হচ্ছে, ব্যবস্থাপনায় কোন্ ত্রুটি হয়েছে? অপরের বাড়িতে অতিরিক্ত আপ্যায়নও যে অনেক সময় অশান্তির কারণ ঘটায়, একথা বোঝানো ভারি শক্ত। মধুসূদন শুধু বললেন যে, অপর কোনো কারণে নয়, প্রায়ই বিলম্বে আদালতে যাওয়ায় তিনি কিশোরীচাঁদের বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন তো বটেই, তাঁর নিজের চাকুরিও এভাবে রাখা দায়। চাকুরি বাঁচাতে হলে তাঁর কর্মস্থলের খুব কাছাকাছি থাকা দরকার।

সেই রকমই ব্যবস্থা হলো। মধুসূদন লালবাজার পুলিশ আদালতের অতি নিকটবর্তী লোয়ার চিৎপুর রোডের ছ' নম্বর দ্বিতল গৃহটি ভাড়া নিলেন। এখান থেকে চাকুরি রক্ষা করার কোনো বাধা নেই। তিনি ঘুমিয়ে থাকলেও আদালত চালু হলেই পেয়াদারা এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে যায়।

মাদ্রাজে মধুসূদনের দ্বিতীয়া পত্নী আঁরিয়েত্তা স্বামীসঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ছিলেন। তাঁর স্বামী এখন স্বাধীনভাবে পৃথক গৃহে অবস্থান করছেন এই খবর পেয়েই তিনি চলে এলেন কলকাতায়। মাদ্রাজের সঙ্গে পুরোপুরি সংশ্রব ত্যাগ করে এখানে মধুসূদনের সংসার নতুন ভাবে পাতা হলো।

পিতৃ-সম্পত্তির অধিকার এখনো পাননি মধুসূদন। পিতার কলকাতার বাড়ি, সুন্দরবনের লাট এবং সাগরদাঁড়ির বংশানুক্রমিক গৃহ, সবই এখন আত্মীয়-জ্ঞাতিদের দখলে। তারা মধুসূদনকে বিরাটভাবে মামলায় জড়িয়েছে, মামলা চালাতে গেলে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং সেজন্য মধুসূদনকে ঋণ করে যেতে হচ্ছে দু' হাতে। শেষ পর্যন্ত পিতৃ-সম্পত্তি যদি উদ্ধার করা না যায়, তাহলে মধুসূদনকে অগাধ সলিলে ডুবে যেতে হবে!

পুলিশ আদালতে সামান্য দ্বিভাষিকের কাজ করে যে জীবন কাটানো যাবে না তা বুঝেছেন মধুসূদন। তিনি আইন শিক্ষা করতে শুরু করলেন। তিনি দেখেছেন, ইংরেজি জানা আইনজীবীদের প্রচুর উপার্জন। আইন শিক্ষা করলে তিনিও চাকুরি ছেড়ে অনায়াসে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন। অর্থ চাই, প্রচুর অর্থ, দু' হাতে অর্থ ছড়াতে না পারলে কলকাতার সমাজে স্থান পাওয়া যায় না। যথেচ্ছ অর্থ ব্যয় করতে না পারলে মধুসূদনের মনেরও স্ফূর্তি হয় না। অভাবে অনটনে তাঁর মন যেন সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। নতুন বাড়িতে এসে মধুসূদন কিছুদিনের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করে, জীবনে শৃঙ্খলা এনে, মন দিয়ে চাকুরি এবং আইন শিক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। অবসর সময়ে এক পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত চর্চাও শুরু করলেন তিনি।

গৌরদাস কার্যোপলক্ষে, কলকাতার বাইরে ছিলেন। ফিরেই পরদিন তিনি এলেন মধুসূদনের চিৎপুরের বাড়িতে।

সে বাড়ির অবস্থা দেখে তিনি স্তম্ভিত!

দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে আদালতের এক পেয়াদা। দ্বিতলের এক কক্ষে আঁরিয়েত্তা ক্রন্দন করছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, অন্য এক কক্ষে একটি আরাম কেদারায় অদ্ভুত ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন মধুসূদন, কোমরের নিম্নের অংশ কেদারার বাইরে ঝুলছে, ঊর্ধ্বাঙ্গ মোচড়ানো। তবে মধুসূদন যে জেগে আছেন, তার প্রমাণ তাঁর হাতের জ্বলন্ত সিগারেট। কক্ষের মেঝেতে গড়াচ্ছে অনেকগুলি বীয়ারের বোতল, একটি ঝোল মাখা দূষিত তোয়ালে মধুসূদনের কণ্ঠে সংলগ্ন রয়েছে।

গৌরদাস ব্যাকুল ভাবে ডাকলেন, মধু, মধু!

মধুসূদন মুখ ফিরিয়ে গৌরদাসকে দেখলেন। একটুও উত্তেজিত হলেন না। নিরুত্তাপ গলায় বললেন, গৌর! হ্যালো, মাই বয়!

বেলা মাত্র এগারোটা, এই সময় মধুসূদনকে এমন নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখবেন, গৌরদাস আশাই করেননি। কাছে এগিয়ে এসে তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় সুহৃদের বাহু স্পর্শ করে বললেন, এ কী কচ্ছিস, মধু!

মধুসূদন বললেন, একটা ফেবার কত্তে পারবি, গৌর? আস্ক দ্যাট উওম্যান টু স্টপ ক্রাইং! প্লীজ!

গৌরদাস বললেন, কী হয়েছে? আমায় সব খুলে বল! আজ মঙ্গলবার, তুই আদালতে যাবিনি? আমি তো ভেবেছিলুম, তোকে বাড়িতে পাবো না। কোর্টে গিয়েই দ্যাকা কর্বো!

মধুসূদন হুংকার দিয়ে বললেন, তোরা আমায় ভেবেচিস কী? না, যাবো না! আই ওয়াজ নট বর্ণ টু বী দা ড্যামনড্ ইনটারপ্রেটার অব দ্যাট ড্যামনড্ পুলিশ কোর্ট!

অন্য ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনে আঁরিয়েত্তা এই কক্ষের দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার বরতনুটি পাতলা, ক্ষীণ, অনেকটা যেন আইভি লতার মতন। মুখখানি কান্নায় কান্নায় রক্তিম।

আঁরিয়েত্তাকে দেখেই মধুসূদন এক লম্ফে কেদারা ছেড়ে উঠে পত্নীর সামনে জানু পেতে বসে কাতর কণ্ঠে ইংরেজিতে বললেন, আঁরিয়েৎ, আমার প্রিয়তমে, তুমি অশ্রু বর্ষণ করিও না! তোমায় কাঁদিতে দেখিলে আমার হৃদয় ভাঙিয়া যায়!

গৌরদাস বললেন, মধু, তোর ওয়াইফের সঙ্গে আমায় ইনট্রোডিউস করিয়ে দিবিনি?

মধুসূদন বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়! আঁরিয়েৎ, এই গৌর, ইহার কথা তোমাকে বহুবার বলিয়াছি! তুমি ইহাকে চক্ষে না দেখিলেও মনে মনে অবশ্যই চিনিতে পারিবে। এই গৌর, ইহার হাতেই আমার জীবন-মরণ নির্ভর!

এই বলেই মধুসূদন একটী বীয়ারের বোতল তুলে অতিশয় তৃষ্ণার্তের মতন দীর্ঘ চুমুক দিতে লাগলেন।

গৌরদাস বিনীতভাবে আঁরিয়েত্তাকে অভিবাদন করে বললেন, মহাশয়া, মধু মিথ্যা বলিতেছে। সে সম্প্রতি আমাদের কথার বাধ্য নহে। আপনি ক্রন্দন করিতেছেন কেন ? আপনি শক্ত হউন। আপনি আসিয়াছেন, আর চিন্তা নাই। আপনি এবার শক্ত হাতে এই দুরন্ত মানুষটির রাশ ধরিবেন।

আঁরিয়েত্তা ধরা ধরা গলায় বললেন, প্রিয় বন্ধু, আমি এই নগরীতে কাহাকেও চিনি না আমি অসহায়। ইনি কাহারো কথা শ্রবণ করিবেন না। নিজ শরীরের প্রতি অসম্ভব অত্যাচার করিতেছেন। কিছুতেই সংসারের অর্থ সঙ্কুলান হয় না। কী করিয়া কী করিব, জানি না !

গৌরদাস শুষ্ক মুখে বললেন, নিচে একজন পেয়াদা দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখিলাম। পাওনাদার নাকি ?

আঁরিয়েত্তা বললেন, না, আদালত হইতে ডাকিতে আসিয়াছে। উনি যাইবেন না কহিতেছেন !

মধুসূদন ওষ্ঠ থেকে বোতলটি সরিয়ে বললেন, ঐ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রাই ইজ এ ড্যামনড স্লো কোচ, উহার সম্মুখে আমি বকবক করিতে আর কোনোদিন যাইব না।

গৌরদাস বললেন, তুই কোর্টের কাজ ছেড়ে দিবি, মধু ? এখন এই অবস্থায় তবে তোর চলবে কী করে ? বউকে এনিচিস !

মধুসূদন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বীয়ারের বোতলটি সক্রোধে ছুঁড়ে মারলেন ঘরের এক কোণে। তারপর বললেন, ও, আমি ঐ কেরানীর কর্ম করিলেই তোরা সুখী হইবি ? তোরা দুইজনে তাহাই চাস ? ঠিক আছে, তবে চাপরাসিকে দাঁড়াইতে বল, আমি এখনি যাইব।

সামনের দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে ঈষৎ টলে গিয়েও মধুসূদন আবার বললেন, হ্যাঁ, যাইব, তোমাদের খুশী করিবার জন্য আমি দাসত্ব করিব !

গৌরদাস বন্ধুকে ধরে ফেলে বললেন, থাক, থাক, আজ থাক। তোর চক্ষু দুটি লাল, মধু, মুখে গন্ধ ভুরভুর কচ্ছে, এই অবস্থায় কোর্টে কেউ যায় ? তুই বরং আজ ছুটি নে। একটা চিঠি পাঠিয়ে দে পেয়াদার হাত দিয়ে !

—চিঠি ? কে চিঠি লিখিবে ? আমি সব কিছু লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমি মৃত, আমি চলন্ত প্রেতাত্মা !

—দূর পাগল ! আচ্ছা, আমি না হয় চিঠি লিকে দিচ্চি, তুই দস্তখৎ করে দে।

নেশার ঘোরে মধুসূদন গৌরদাসকে জড়িয়ে ধরে তাঁর গণ্ডে এক প্রবল চুম্বন দিয়ে পত্নীর উদ্দেশ্যে বললেন, এই দ্যাখো, আঁরিয়েৎ, আমাদের পরিত্রাতা আসিয়াছে, আর কোনো চিন্তা নাই। সঙ্গে কিছু অর্থ আছে কি গৌর ? আর কয়েক বোতল বীয়ার আনয়ন করিলে বেশ হয় ! কাঁদিও না, আঁরিয়েৎ, বীয়ার পান করো, সব সমস্যা দূরীভূত হইবে।

আদালতে চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা করে গৌরদাস জোর করে মধুসূদনকে ঠেলে দিলেন স্নানের ঘরে। তারপর দাস-দাসীদের ডেকে ঘর পরিষ্কার করালেন। আঁরিয়েত্তা সংসার সম্পর্কে অনভিজ্ঞা এবং স্থানীয় ভাষা না জানায় দাস-দাসীদেরও পরিচালনা করতে পারেন না। গৌরদাস তাদেরও নির্দেশ দিলেন সব রকম।

মধুসূদন ও আঁরিয়েত্তাকে খাদ্য পরিবেশন করা হলো অবিলম্বে। মধুসূদন ছাড়বেন না, গৌরদাসকেও সঙ্গে খেতে হবে। অগত্যা তিনিও খেয়ে নিলেন ওদের সঙ্গে। এরপর দুজনকে ঘুমোতে দেবার জন্য তিনি বিদায় নিতে চান, কিন্তু মধুসূদন গৌরদাসের হাত টেনে ধরে রাখলেন। অনেকদিন পর গৌরদাসের সঙ্গে পাশাপাশি এক শয্যায় শুয়ে থাকার বাসনা হয়েছে তাঁর।

দুই বন্ধুতে শুয়ে শুয়ে অনেক সুখ-দুঃখের কথা হলো। নেশা অনেকখানি কেটে গেছে, তবু মধুসূদনের মনখানি নৈরাশ্যে ভরা।

মাদ্রাজ থেকে ফেরবার পর মধুসূদন বাংলা কথা একেবারেই বলতেন না। যেন বাংলা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। ইদানীং ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে কিছু কিছু বাংলা বলেন। আদালতে তাঁকে আসামীদের বাংলা কথা শুনেই ইংরেজি অনুবাদ করতে হয়, এমনকি হাকিমের নির্দেশে সাক্ষীদের বাংলায় জেরাও করেন তিনি। তবু বাংলার প্রতি তাঁর অবজ্ঞার ভাব এখনো রয়ে গেছে।

আজ আঁরিয়েত্তাকে দেখে গৌরদাস প্রথমে একটু চমকে উঠেছিলেন। মধুসূদন মাদ্রাজে গিয়ে

রেবেকাকে বিবাহ করেছিলেন, তখন গৌরদাসকে অনেক উচ্ছাসপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা দিয়েছিলেন নিজের স্ত্রীর—রেবেকাকে উদ্দেশ করে কবিতাও লিখেছেন মধুসূদন, সুতরাং বন্ধুর স্ত্রীর সেই ছবিই অঙ্কিত আছে গৌরদাসের মনে।

কথায় কথায় গৌরদাস একবার জিজ্ঞেস করলেন, মধু, সেই রেবেকার কী হলো ? আর তাঁর ছেলেমেয়ে ?

মধুসূদন বললেন, সেই নীলকর সাহেবের বেটীর কতা তুই ফের আমায় রিমাইণ্ড করিয়ে দিসনি ! আমায় সে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েচে !

—কিন্তু মধু, আমি তো শুনিচি ম্যাড্রাসের খৃষ্টানরা অধিকাংশই ক্যাথলিক, ওদের মধ্যে কি ডাইভোর্স হয় ?

মধুসূদন গৌরদাসের হাত চেপে ধরে বললেন, গৌর, আই ফরবিড ইউ, রেবেকার প্রসঙ্গ আমার কাচে আর কোনোদিন রেইজ করবিনি ! নেভার ! দ্যাট চ্যাপটার ইজ ক্লোজড !

—কিন্তু তোর ছেলেমেয়ে ? শুনিচি, চারটি ছেলেমেয়ে হয়েছেল ?

—গৌর, গৌর ! প্লীজ ! ও কথা থাক্ ! কেন তুই আমার মনে দুঃখ দিতে চাস ? ওদের কতা…আই ওয়ন্ট টু ফরগেট কমপ্লিটলি, আই ওয়ন্ট টু ইরেইজ ফ্রম মাই মেমারি…আঁরিয়েৎ-কে তোর পছন্দ হয়নি ? শী ইজ এ ডিয়ার…তুই যতই…দ্য মোর ইউ গেট টু নো হার…

—হেনরিয়েটা সত্যই বড় কোমল ও কমনীয়া।

—হেনরিয়াটা নয়, আঁরিয়েত্তা ! শী ইজ এ ফ্রেঞ্চ উওম্যান…রিয়েল ফ্রেঞ্চ, ইউরেশিয়ান নয়।

—তুই একটা কাণ্ড দেকালি বটে মধু ! একেবারে ফ্রেঞ্চ ! এ দেশে অনেকের অনেক রকম কাণ্ডের কথা শুনিচি, কিন্তু আর কোনো নেটিভ কোনো ইউরোপিয়ান লেডিকে বিয়ে করেচে বলে শুনিনি ! তুই-ই বোধহয় এদেশে প্রথম।

—গৌর, আরও অনেক বিষয়ে আমার এ দেশে প্রথম হবার কতা ছিল। কিন্তু তার বদলে আমি নেটিভ কোর্টে মুহুরিগিরি করচি ! আই উইল ডাই, অ্যাজ এ কমন ম্যান !

—অমন কতা কেন বলচিস ! তোর অনেক কিচু এখনো বাকি। তোর প্রতি আমাদের কত আশা। তুই নাকি প্যারীচাঁদ মিত্তিরকে বলিচিলি, তুই বাংলায় লিখে ওনাদেরকে টক্কর দিবি ?

—আরে দূর দূর !

—বলিসনি অমন কতা ?

—আমি মচ্চি টাকার চিন্তায়, ওসব কতা এখন রেকে দে !

—তুই তো এখুন কিচুই লিকিস না, মধু ! ইংরেজিও লিকিস না ! বাংলায় একবার চেষ্টা করে দ্যাক না—আজকাল কত ভালো ভালো লোক বাংলায় লিকচেন !

—গৌর, আই ওয়ন্ট মানি। দেয়ার মাস্ট বী মোর মানি ! দেয়ার মাস্ট বী মোর মানি ! আমার বাপের সম্পত্তি আমায় পেতেই হবে !

—সে তো পাবিই একদিন না একদিন ! কিশোরীচাঁদবাবু অনেক চেষ্টা কচ্চেন। কিন্তু তা বলে অন্য কাজকম্ম তুই কিচু করবিনি ? দ্যাক, রাধানাথ সিকদারও বাংলা ভুলে গেসলেন, কিন্তু তিনি তো এখন দিব্যি বাংলা লিকচেন ! তুই-ও ওঁদের মাসিক পত্রিকায় কিচু লেক না !

—গদ্য ! হরিবল ! ওঁরা ভয়ানক প্রোজেইক মানুষ। কাব্যের ধার কাচ ঘেঁষেন না। আর কী ডিসগাস্টিং বাংলা প্রোজ ওঁরা লেকেন ! দু-পাঁচ বাক্য দেকলেই গা জ্বলে যায়। তোরা ঐ গদ্য পড়িস কী করে ?

—তুই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেকা পড়ে দ্যাক ! সে বড় ঝংকারময়, তেমনই সরস !

—সেও তো গদ্য ! আমি গদ্যই পছন্দ করি না, তাও আবার বাংলা ? ছোঃ।

—মধু, তুই বাংলাকে এমন হেলাছেদ্দা করিসনি ! উচ্চশিক্ষিত, প্রতিভাবান ব্যক্তিরা বাংলা রচনায় আত্মনিয়োগ করেচেন !

মধুসূদন অসহিষ্ণুভাবে বালিশে চাপড় মারতে মারতে বললেন, রাইট মী অফ ! আমাকে দিয়ে কিচ্ছুটি হবে না ! আমি অপদার্থ ! আই অ্যাম এ ফেইলিওর ! আমার কতা তোরা ভুলে যা !

—কী হচ্চে, মধু ? তুই কি পাগল হয়ে গেলি ?

—সরি, আই অ্যাম সরি, গৌর—

—মধু, তোকে একটা কতা বলবো ? তুই অ্যাতদিন পর কলকাতায় এলি, আমি ভেবেছিলুম, সারা

শহর তোকে মাতায় করে রাকবে ! তুই ছিলি আমাদের গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে জুপিটার। কিন্তু তুই নিজেকে এমন ভাবে গুটিয়ে রেকিচিস কেন ? কোনো রকমে কোর্টের কাজ চালিয়ে যাচ্চিস, আর সারাক্ষণ বীয়ার খাস !

—আর কী কত্তে হবে ?

—সোসাইটিতে তোর একটা স্থান করে নেওয়া দরকার !

—সোসাইটি মানে বড় বড় টাকাওয়ালা লোক। তাদের মধ্যে আমার মতন একটা কোর্টের ক্লার্ক ! এ র‍্যাভেন অ্যামংগ দা পীককস ? হাঃ-হাঃ-হাঃ।

—তুই র‍্যাভেন কেন হবি, মধু ? তুই কবি !

—আমার গায়ের রংটা দেকচিস না ? দাঁড়কাককেও হার মানায় !

মধুসূদন ফস করে আর একটি সিগারেট ধরিয়ে বললেন, তুই একটা ট্রাই কর্বি নাকি ? দ্যাক না !

গৌরদাস হাত নেড়ে বললেন, না, না, ও জিনিসে আমার ভয় করে ! আমার বাবা গড়গড়াই ভালো। সে পাট তো তোর বাড়িতে রাকিসনি ?

—ওসব ঝঞ্ঝাট কে রাখে ! তুই একটা সিগারেট ট্রাই করে দ্যাক না, ভালো লাগবে।

—না রে, মধু, ঐ কাগজ পুরিয়ে তামাক টানা আমার সহ্য হবে না !

বাহুতে ভর দিয়ে খানিকটা উঠে বসে গৌরদাস আবার বললেন, শোন মধু, আজকাল শুধু টাকাওলা লোকেরাই সমাজের মাতা নয়। আরও কত রকম সামাজিক কাজ হচ্চে। কত লোক দিকে দিকে স্কুল খুলচেন। কত সাহস করে বিদ্যেসাগরমশাই বিধবাদের বিয়ে দিচ্চেন। ঠাকুরদের বাড়িতে, সিংহদের বাড়িতে বাংলা থিয়েটার হচ্চে, বিদ্যাচর্চা হচ্চে, আমরা তাতেও তো যোগ দিতে পারি। দ্যাক, ইয়ং বেঙ্গলের দল এই সব কাজে এগিয়ে এসে যোগ দিচ্চেন, কিন্তু আমাদের হিন্দু স্কুলের ব্যাচ, তাদের কারুর কোনো আগ্রহ নেই। আমাদের কিচু কি করা উচিত নয় কো ? এক কাজ করবি, মধু ?

—কী ?

—চল, আজ আমার সঙ্গে যাবি ? আজ সন্ধ্যেবেলা বিদ্যেসাগরমশাই এক কায়স্থ বংশের বিধবা মেয়ের বিয়ে দিচ্চেন। চল, আমরা সেখানে যাই। বেশীর ভাগ লোকই এখুনো বিধবার বিয়ে মানতে চাইচে না, টিটকিরি কাটে, এই সময় বিদ্যেসাগর মশাইয়ের পাশে আমাদের দাঁড়ানো উচিত নয় ?

মধুসূদন পুরো প্রস্তাবটিকেই একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, আরে দূর, দূর ! ও সব হুজুগে ব্যাপারে আমি নেই। বিধবার বিয়ে একটা ব্যাপার তাই নিয়ে আমায় আবার মাতা ঘামাতে হবে ? ছোঃ ! গৌর, তুই আমায় এত অর্ডিনারি মনে করিস ?
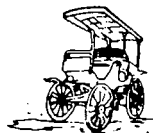
এখনো আইনত সাবালক হয়নি নবীনকুমার, তবু সে বিপুল অর্থ তছনছ করার সুযোগ পেয়ে গেছে। সে এখনও অর্থের মূল্য বোঝে না। অর্থসম্পদ যে মানুষকে উপার্জন করতে হয়, এ জ্ঞানই যেন তার নেই। তার ধারণা, ও জিনিসটি চাইলেই পাওয়া যায়, এবং বরাবরই সে পেয়ে এসেছে।

বিধুশেখরের বিচক্ষণতায় নবীনকুমারের পিতৃ-সম্পত্তি ক্রমশই বর্ধিত হয়েছে এবং অর্থনীতির এক বিচিত্র নিয়মে তা বিনা আয়াসেই এখন এ রকম বর্ধিত হতেই থাকবে। এক হিসেবে অর্থ জিনিসটা নবীনকুমারের কাছে মূল্যহীন, কারণ জল বা বাতাসের মতন চাওয়া মাত্র পাওয়া যায়।

নবীনকুমার এখন প্রায় প্রতিদিনই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গী। এ বয়সেই সে অনেক জায়গায় ঘুরে, অনেক ব্যক্তিকে দেখে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রকেই সে তার সবচেয়ে বেশী আদর্শস্থানীয় মনে করেছে এবং মনে মনে তাঁকে বরণ করেছে গুরুর পদে। অন্যান্য ষোড়শ বৎসর বয়স্ক সদ্য যুবকদের মতন সেও দুঃসাহসের অনুরাগী, ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে বেশী দুঃসাহসী মানুষ সে আর কারুকে দেখেনি। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে থেকে সে বুঝেছে যে, এ দেশে বিধবা বালিকার পুনর্বিবাহ দেওয়া কত কঠিন

কাজ। সরকারী আইন পাশ হলেও দেশের অধিকাংশ মানুষই এর ভয়ংকর বিরোধী, এমনকি মুখে যারা সমর্থন জানায়, তারাও অনেকেই কার্যকালে পশ্চাদপদ হয়। ইতিমধ্যে কয়েকটি বিধবার বিবাহ হয়ে গেলেও এখনো নানারকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এরই মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র জেদ ধরে আছেন, যদি কোনো বিধবা বালিকা পুনর্বিবাহ চায় এবং তার জন্য উপযুক্ত কোনো পাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে সে বিবাহ দেবেনই। নবীনকুমারেরও সেই একই জেদ। ঈশ্বরচন্দ্র যেমন নিজের অর্থ ব্যয় করেন, সেই রকম নবীনকুমারও প্রত্যেক বিবাহে এক সহস্র মুদ্রা দিয়ে চলেছেন।

নিজের স্বাক্ষর করার অধিকার জন্মায়নি, তাই নবীনকুমার অর্থের জন্য যখন তখন দাবি জানায় তার জননী বিম্ববতীর কাছে। বিম্ববতী একবারও প্রত্যাখ্যান করেন না। যদিও পরলোকগত রামকমল সিংহের এস্টেটের আয়-ব্যয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখেন বিধুশেখর, তবু তিনিও নবীনকুমারের এই খেয়ালী-খরচের প্রতিবাদ করেন না।

নবীনকুমারের বদান্যতার সংবাদ রটে গেছে সারা দেশে। প্রায় প্রতিদিন সকালেই নবীনকুমারের কাছে একাধিক প্রার্থী আসে। প্রথম প্রথম নবীনকুমার প্রত্যেককেই টাকা দিয়ে দিত বিনা বাক্যব্যয়ে। একদিন ঈশ্বরচন্দ্র তাকে ডেকে সাবধান করে দিলেন। গুড়ের সন্ধান পেলেই যেমন পিঁপড়ে ছুটে আসে, তেমনি টাকার লোভে অনেক দুষ্ট প্রবঞ্চক কিংবা হা-ঘরে হা-ভাতে বিধবা বিবাহের হুজুগে মেতেছে। অনেক সময় তারা কোনো বিধবা বালিকার সঙ্গে কোনোক্রমে নমো নমো করে বিবাহ সাঙ্গ করার পর দু-দশদিন বাদেই পত্নীকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালায়। টাকাটি আত্মসাৎ করাই তাদের উদ্দেশ্য। কেউ কেউ আবার টাকা নেয় কিন্তু বিবাহও করে না। সুতরাং, ঠিকঠাক অনুসন্ধান না করেই অর্থ দান করা কোনো কাজের কথা নয়। অপাত্রে ব্যয় করলে মূল উদ্দেশ্যটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

এক সকালে রাইমোহন এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলো নবীনকুমারের কাছে।

লম্বা শরীরটিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়ে প্রণাম করে রাইমোহন বললো, হুজুর, পঞ্চাশ পূর্ণ কত্তে এলুম!

নবীনকুমার বুঝতে পারলো না। সে সকৌতুক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো।

রাইমোহনের সঙ্গীটির বয়েস তিরিশের কাছাকাছি, পরনে মলিন ধুতি ও সাদা মেরজাই, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। মুখখানি চতুষ্কোণ ধরনের। সে একেবারে টিপ করে নবীনকুমারের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেললো। ধরা গলায় বললো, হুজুর অতি মহান, অতি বিপদে পড়ে আপনার কাচে এয়িচি, আপনি না তরালে আর কোনো ভরসা নেই।

নিজের চেয়ে দ্বিগুণ বয়েসী একজন লোক পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেও নবীনকুমার বিচলিত হলো না। এই বয়েসেই সে বুঝে গেছে যে, চতুষ্পার্শ্বের অধিকাংশ মানুষের কাছ থেকে আনুগত্য ও সম্মান পাবার জন্যই সে জন্মেছে।

রাইমোহন তার সঙ্গীকে ধমক দিয়ে বললো, ইংলিশে বল্, ইংলিশে বল্।

তারপর নবীনকুমারের দিকে চেয়ে বিগলিতভাবে হেসে সে বললো, হুজুর, এ অতি রিফর্মড লোক। ইংলিশ জানে।

লোকটি বললো, মোস্ট নোব্‌ল সার, মী এ ভেরী আম্‌বল্ ম্যান, আই প্রে টু ইয়োর বেনাভোলেন্স।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপারটা কী?

রাইমোহন বললো, হুজুর, বেধবাদের জন্য এর মনে বড় দুঃখু! ধনুকভাঙা পণ করেছেল যে, বেধবা ছাড়া বে করবে না। ওর বাপ দাদারা ওর ওপর খড়্গহস্ত, তাই আমি বললুম, চ, হুজুরের কাচে চ একটিবার।

নবীনকুমার বললো, বিধবা বিয়ে করবে? বেশ ভালো কতা। পাত্রী কোথায়? ঠিক হয়েচে?

লোকটি বললো, পাত্রী রেডি সার। আমাদের নেবারের ডটার, সার। অ্যাট জয়নগর-মজিলপুর, মাই বার্থ প্লেস, সার!

রাইমোহন বললো, সব কথা শুনলে দুঃখে আপনার বুক ফেটে যাবে, হুজুর। সে মেয়েটির বে হয়েছেল মাত্র তিন বচর বয়েসে, আর মাত্র ছ' মাস যেতে না যেতেই তার কপাল পোড়ে, সে হতভাগী নিজের সোয়ামীকে চিনলোই না!

নবীনকুমার অস্ফুটভাবে বললো, বিধবার বিয়ের চেয়েও বেশী প্রয়োজন বাল্য বিবাহ বন্ধ করা।

তারপর আবার বললো, বেশ তো, বিদ্যেসাগর মশাইকে বলবো অখন। আজ বিকেলে তোমরাও

এসো সেখেনে।

নবীনকুমারের পাশে দাঁড়ানো দুলাল বললো, তিনি মেদিনীপুর গ্যাচেন। কলকেতায় নেই এখুন।

নবীনকুমার বললো, তা হলে একটু র'সো, তিনি ফিরে আসুন।

রাইমোহন পকেট থেকে একটি কাগজ বার করে বললো, অপিক্ষে করার আর উপায় নেই, হুজুর। পত্তর ছাপানো হয়ে গ্যাচে। জানাজানি হয়ে গ্যাচে তো, আর অপিক্ষে করলে মেয়ের বাপ ও বৌঁকে কাশী পাটিয়ে দেবে!

—কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাই নেই, এখুন বিয়ে হবে কী করে?

—সেইজন্যই তো বললুম, হুজুর, আপনি নিজেই পঞ্চাশ পূর্ণ করুন।

—তার মানে?

—গুণে দেকিচি, এ যাবৎ মোট উনপঞ্চাশটি বেধবার বে হয়েচে এ দেশে। এই বেটি হলে পঞ্চাশ হবে। কাগজে কাগজে ফলাও করে আপনাদের জয়জয়কার বেরুবে। সাগর এখেনে নেই, আপনি নিজেই উদযুগ করে বে'টা দিলে তিনি ফিরে এসে কত খুশী হবেন!

—পঞ্চাশ পূর্ণ হবে? তুমি হিসেব করে দেকেচো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, খপরের কাগচেই তো হিসেব বেরিয়েছেল ক'দিন আগে!

নবীনকুমারের তরুণ হৃদয় এই পঞ্চাশ পূর্ণ হবার সংবাদে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ইদানীং ইংরেজি ফ্যাসানে সিলভার জুবিলি, গোল্ডেন জুবিলির কথা প্রায়ই শোনা যায়, এও তো সেই রকমই একটা কিছু ব্যাপার। সে আগ্রহের সঙ্গে পড়ে দেখতে লাগলো নিমন্ত্রণ পত্রটি।

বিবাহ হবে বরাহনগর গ্রামে। বর্ষাকাল, পথঘাটের অবস্থা অতি শোচনীয়, নবীনকুমার নিজে বিবাহবাসরে যেতে পারবে কিনা ঠিক নেই, কিন্তু অনুষ্ঠানের যাতে কোনো ত্রুটি না হয়, সে জন্য সব বন্দোবস্তের ভার সে অর্পণ করলো রাইমোহনের ওপর। টাকা পয়সার ব্যাপারে কোনো কার্পণ্য হবে না।

এর কয়েকদিন পর রাইমোহনকে ডেকে পাঠালেন বিধুশেখর। সিংহ বাড়িতে নয়, নিজের ভবনে। চলাফেরার শক্তি আবার আজকাল অনেকখানি কমে গেছে তাঁর, সহজে গৃহ থেকে নির্গত হন না।

বাহির-বাড়ির বসবার কক্ষে আরাম কেদারায় শুয়ে আছেন বিধুশেখর, হাতে আলবোলার নল। রাইমোহন এসে বসলো তাঁর সামনে, মাটিতে।

কোনো রকম ভূমিকা না করে বিধুশেখর বললেন, তোর হাত-পা বেঁধে, চাবকে পিঠের ছাল-মাংস তুলে দেবো!

রাইমোহন একটুও চমকিত না হয়ে, বরং ঈষৎ হেসে বললো, ছাল-মাংস আর কোতায় হুজুর, আমার শরীরে তো শুধু কয়েকখানা হাড়। মেরে সুক হবে না!

—তোকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো! ডালকুত্তারা শুকনো হাড় পচুন্দ করে!

—হুজুর ডালকুত্তা পুষেচেন বুঝি? শুনিনি তো! তা সে কুত্তাগুলোর তো শুনিচি বকরাক্ষসের মতন খিদে, এই ক'খানা হাড়ে কি তাদের খিদে মিটবে?

—নিমকহারাম! আমার ঠেঙে মাস মাস বিশটা করে টাকা পাচ্চিস, আবার আমার সঙ্গেই ফেরেব্‌বাজি?

—হুজুর, আর যাই করি, ঐ নেমকহারামি কখুনো আমার কাচে পাবেন না। নুন খাই যার, গুণ গাই তার!

—তোকে বলিচি ছোট্‌কুর ওপর চোক রাখতে, আর তুই উল্টে তার মাতায় ক্যাঁঠাল ভাঙচিস?

—আপনি নিজেই বলেছেলেন, হুজুর, বেধবার বে'তে আপনার আপত্তি নেই, ও ব্যাপারে আপনার মন নরম।

—তা বলে তুই গণ্ডায় গণ্ডায় লোক এনে টাকা-পয়সা একেবারে নয়ছয় করবি! ছোট্‌কু ছেলেমানুষ, তাকে যা বোঝাবি সে তাই বুঝবে! কিন্তু আমি কি মরে গেচি! তুই কত করে ভাগ পাচ্চিস এক-একটা কেসে?

—একটা পয়সাও নয়। মা কালীর দিব্যি গেলে বলচি! আমার তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে,

এখুন আর আমার টাকা-পয়সার প্রয়োজন কী ?

—ঐ যে বরানগরের বিয়েটা।

—সে জন্য কম ঝক্কি পোহাতে হয়েচে আমায় ? ও বাড়ির ছোট হুজুরকে তুষ্ট করার জন্যেই তো···বেধবা বে'র গোল্ডেন জুবিলি পূর্ণ হলো, কত হৈ-চৈ, বিদ্যেসাগরও খুশী হয়ে নবীনকুমারকে আশীর্বাদ করেচেন।

—তুই বিদ্যেসাগরকে পর্যন্ত ঠকিয়েচিস ! অ্যাতখানি স্পর্ধা তোর ! সে বামুন কলকেতায় ছেল না, তাই ফেরেব্বাজি ধত্তে পারেনি। বরানগরের ওটাকে কি বিয়ে বলে ?

—রাইমোহন জিহ্বা কেটে, চোখ বিস্ফারিত করে বললো, বিয়ে নয় ? আপনি কী বলচেন, হুজুর ? কত লোক দেকেচে ! দুশো আড়াইশো লোক—নবীনকুমার নিজে যেতে পারেননি কো, কিন্তু দুলাল গেস্‌লো, সে দেকেচে···খাটতে খাটতে আমার জান কালি !

—চোপ !

—আপনি বিশ্বেস কচ্চেন না, হুজুর। সত্যিই ধুমধাম করে বে হয়েচে, কিসের কিরে কেটে বলবো, বলুন ?

—হ্যাঁ, বিয়ে হয়েচে ! পাত্রী এক বেশ্যার মেয়ে, তার এই নিয়ে কতবার বিয়ে হলো তার ঠিক নেই। আর পাত্র এক নামকরা মাতাল। তোরই বাড়িতে আশ্রিত ! এর নাম বিয়ে, না ফূর্তির খর্চা বাগানো ? অ্যাঁ ?

রাইমোহন স্তম্ভিত হয়ে গেল। গুণীর প্রতি সম্মান দেখানো উচিত। বিধুশেখরের মতন এত বড় গুণী সে দেখেনি আর। এ বৃদ্ধের এক চক্ষের দৃষ্টিশক্তি নেই, অন্য চক্ষুটিও নিষ্প্রভ, পা অশক্ত, তবু ঘরে বসে বসে এই বৃদ্ধ অতখানি সংবাদ রাখে ? এ যে বিস্ময়কর ক্ষমতা !

সে বিধুশেখরের পা চেপে ধরে বললো, হুজুর, আমার জাত-কুল-মান-জ্ঞান কবেই ঘুচে গ্যাচে ! বেশ্যার মেয়ে কিংবা চাঁড়ালের ছেলে আমার কাচে সব সমান। দুঃখী মানুষের জাত নেই। আপনি যা বললেন, ওরা তাই, ওরা জাত ভাঁড়িয়েচে, নাম ভাঁড়িয়েচে, কিন্তু ওরা সত্যি বে করতে চেয়েছেল, তাই আমি ওদের বে দিয়িচি !

—পা ছাড়, হারামজাদা ! বেশ্যার মেয়ের আবার বিয়ে কী রে ? অমন কত বেশ্যা আর তাদের দালালরাই তো স্বামী-স্ত্রী সেজে থাকে। তার জন্য তুই পুরুত ডাকিয়ে ধর্ম রসাতলে দিলি ? ওফ্ !

—হুজুর, ওদেরও তো একটু সাধ হয় ভদ্দরলোকেদের মতন ধুমধাম করে, পাঁচজনকে ডেকে, মন্তর পড়ে বে করার !

—আর বলিসনি, শুনে আমার গা জ্বলে যাচ্চে। তোকে আমি পুলিশে ধরিয়ে দিচ্চিনি, কেন জানিস ? এই বিয়ের কতা বেশী জানাজানি হলে বিদ্যেসাগরের মান যাবে। তাকে লোকে আরও বেশী করে টিটকিরি দেবে, তাতে আমাদের ছোট্‌কুও দুঃখ পাবে ! সেইজন্যে ! নাকে খৎ দে ! নাকে খৎ দে।

—দিচ্চি হুজুর।

—ঐ দরজার চৌকাঠ থেকে এই আমার পা পর্যন্ত। পাঁচবার।

বিনা প্রতিবাদে রাইমোহন শুয়ে পড়ে নাক খৎ দিতে লাগলো। বিধুশেখর দেখতে লাগলেন স্থির দৃষ্টিতে। পাঁচবার হবার পর তিনি কঠোরভাবে বললেন, ফের যদি কখুনো তোকে আমার ওপর চালাকি কত্তে দেকি, তা হলে তোর ভবলীলে তখুনি সাঙ্গ হবে ! আর একটা কতা ! বিধবার বে নিয়ে ঢলাঢলি যথেষ্ট হয়েচে, আর দরকার নেই ! তুই ছাড়াও আরও অনেকে ঠকাচ্চে আর ঠকাবে ছোট্‌কুকে। তুই এবার ওর মন অন্য দিকে ফেরাবার চেষ্টা কর।

—বেধবা বে'র হুজুগ একেবারে বন্ধ করে দেবো, হুজুর ?

—তুই তা পারবিনি ! অতশত দরকার নেই, চলচে চলুক, তুই সুধু ছোট্‌কুর মন অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা কর !

—দেখুন না আমি কত কী পারি আর না পারি !

কয়েকদিনের মধ্যেই এক দারুণ গুজবে সারা শহর ম ম করতে লাগলো সকলের মুখে ঐ এক কথা, অচিরেই. এর নাম হলো, মড়া ফেরার হুজুক।

নদীয়ার রাম শর্মা নামে কে এক পণ্ডিত নাকি গুণে বলেছেন যে, আগামী পনেরোই কার্তিক মড়া

ফেরার দিন। অর্থাৎ দশ বছরের মধ্যে যে সব মানুষের মৃত্যু হয়েছে তারা সকলেই সশরীরে ফিরে আসবে।

বড় বড় উৎসব উপলক্ষে রাজা-মহারাজারা যেমন কিছু কয়েদীকে খালাস করে দেন, সেই রকমই স্বর্গের এক দেবতার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে যমালয় থেকে কিছু অতৃপ্ত আত্মাকে ফেরত পাঠানো হবে পৃথিবীতে।

তুষার মণ্ডের মতন, এই সব গুজব যত গড়াতে থাকে তত বড় হয়। সকলের মুখে মুখে ঐ এক কথা! ১৫ই কার্তিক রবিবার মড়া ফিরে আসবে। নদীয়ার পণ্ডিত যখন বলেছেন, তখন তো আর মিথ্যে হতে পারে না। অনেক শোকসন্তপ্ত পরিবার সত্যি সত্যি আশায় আশায় রইলো। যে জননীর সন্তান অকালমৃত, কিংবা যে নারীর স্বামী গেছে, এই সংবাদ শোনার পর তাদের আর রাত্রে ঘুম আসে না! তবে কোনো এক রহস্যময় কারণে, পুরুষ মড়ারাই শুধু ফিরে আসবে বলে শোনা যাচ্ছে, মেয়েদের কথা কেউ বলে না। মৃত নারীরা ফিরে আসুক, তা বোধ হয় কেউ চায়ও না।

নবীনকুমার এই গুজবের কথা নিয়ে হাস্য পরিহাস করছিল, এমন সময় রাইমোহন সে ঘরে প্রবিষ্ট হয়ে বললো, আপনি হাসচেন হুজুর, কিন্তু এদিকে যে লোকে আপনার গুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গুষ্টির তুষ্টি নাশ কচ্চে!

নবীনকুমার দারুণ অবাক হয়ে বললো, সে কি! এর সঙ্গে বিদ্যেসাগর মশাইয়ের সম্পর্ক কি?

—আপনি বুজলেন না? বিদ্যেসাগরের কতায় মেতে যে অ্যাত লোক বেধবা বে কল্লে, এখন মড়া ফিরলে কী হবে?

—তার মানে?

—এক নারীর দুই স্বামী হবে? বেধবা ফের একজনকে বে কল্লে, তারপর আগের স্বামীও ফিরে এলো, তখুন ধুন্দুমার কাণ্ড হবে না? ধর্মই বা কোতায় থাকবে? সব নারী অসতী হয়ে যাবে না!

—দূর, অদ্ভুত কতা যত সব! মড়া কখনো ফেরে? শ্মশানে যাকে দাহ করা হয়েচে, সে আবার ফিরতে পারে!

—আপনি বিশ্বেস না কল্লে কী হবে হুজুর, পথেঘাটে লোকে এই কতাই বলচে! ধরুন, যদি মড়া ফিরেই আসে—

—ধরো যদি কখুনো মাসীর গোঁপ গজায়, তা হলে মেসোর কী হবে? এ যে সেই ধারার কতা!

—হুজুর, আপনি পথেঘাটে একটু সাবধানে বেরুবেন। লোকে আপনাকেও বেধবা বে'র একজন মুরুব্বি বলে জানে! কী জানি যদি কেউ রাগের বশে আপনাকে হুট করে ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারে!

বিকেলবেলা নবীনকুমার সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখলো, ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত বিরক্ত, বিরস মুখে বসে আছেন। পথে কিছু লোক সেদিনই তাঁকে টিটকিরি দিয়েছে। এমন সব গালিগালাজ করেছে যে, তা কানে একেবারে আগুনের মত লাগে। মড়া ফেরার মতন একটা হাস্যকর, ছেলেমানুষী গুজবও যে এত সংখ্যক বয়স্ক মানুষ সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতে পারে, তা কিছুতেই যেন বিশ্বাস করা যায় না।

আগামী সপ্তাহেই আর একটি বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠানের কথা ছিল, লোকজনকে নিমন্ত্রণও করা হয়ে গেছে, কিন্তু হাঙ্গামার ভয়ে তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। দল বেঁধে লোকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে আর মুণ্ডপাত করছে বিদ্যাসাগরের।

ঈশ্বরচন্দ্র নিরাশভাবে বললেন, হবে না, এ দেশের কিছু হবে না! এমনিতে সবাই নিষ্কর্মার ঢেঁকি, কিন্তু তুমি কোনো সৎ কর্ম করতে যাও, অমনি বাধা দিতে ছুটে আসবে! অনেকে বলছেন, বিধবা বিবাহের ব্যাপার থেকে আমার নাকি এবার সরে দাঁড়ানো উচিত। লোকে নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করে তো করবে!

রাজকৃষ্ণবাবু বললেন, আগে দরকার শিক্ষা বিস্তারের। যতদিন সাধারণ মানুষ নিজের ভালো না বুঝবে····

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, সেইজন্যই তো আমি ইস্কুল খোলার জন্য গ্রামে গ্রামে দৌড়ে মরছি। কিন্তু তাও

বা ক'টি ? সমুদ্রের তুলনায় এক গণ্ডূষ জল মাত্র !

উপস্থিত অন্য একজন বললো, এই যে বিধবা বিবাহের একটা উল্টো হাওয়া বইলো, আর লোকে সহজে বিধবা বিবাহ করতে চাইবে না।

আর একজন লোক বললো, কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায় নিজে গিয়ে গিয়ে বিবাহ দেবেন, তবে লোকে বিধবা বিবাহ করবে, এটাই বা কেমন রকম কথা ? এমনভাবে উনি ক'টি বিয়েই বা দিতে পারবেন !

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, আমি সারা দেশ ঘুরে ঘুরে বিবাহ দিতে পারবো না তা জানি ! আমি বেশী দিন বেঁচেও থাকবো না। কিন্তু আমাদের কয়েকজনের উদ্যোগে পরপর অনেকগুলি বিবাহ সংঘটিত হওয়ালে তারপর লোকের ভয় ভেঙে যাবে, স্বাভাবিকভাবেই বিধবা বিবাহের প্রচলন হবে—এটাই আমি চেয়েছিলাম।

নবীনকুমার বললো, ১৫ই কার্তিকের আর তো বেশী দিন দেরি নেইকো ! সে দিনটি কেটে গেলেই লোকে বুজবে যে, ও কতা কত ভুয়ো ! একটাও মড়া ফিরবে না !

রাজকৃষ্ণবাবু হাসতে হাসতে বললেন, তা বলা যায় না। দু-চারটি মড়া ফিরতেও পারে !

নবীনকুমার বললো, অ্যাঁ ?

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, তা ঠিক বলেছো, রাজকৃষ্ণ ভায়া। গোছালো গোছালো জায়গায় কিছু ফন্দিবাজ, বুজরুগ প্রাক্তন মড়া সেজে যাবে, দেখো, তাই নিয়ে অনেক শোরগোল হবে। আর সস্তার কাগজওয়ালারা এই সব ঘটনা নিয়ে নাচবে !

নবীনকুমার তখনই মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো।

১৫ই কার্তিক দিনটি এক রবিবার। সেদিন সকাল থেকেই নবীনকুমারের নেতৃত্বে বিদ্যোৎসাহিনী সভার তরুণ সদস্যরা ঘুরতে লাগলো কলকাতার পথে। শহরের বহু লোক সেদিন পথে নেমে এসেছে, উৎসুক চোখ মুখ, মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছে সমবেত চিৎকার ও হাস্যরোল। কোনো কোনো বাড়ির সামনে 'মড়া ফিরেচে', 'মড়া ফিরেচে' বলেও ধ্বনি উঠলো।

নবীনকুমার তার দলবল নিয়ে অমনি ঢুকে পড়ে সেই বাড়িতে। সঙ্গে আরও চার-ছ'জন পেয়াদা এবং একজন উকিল। সিমুলিয়ার এক বাড়িতে এক মুস্কো জোয়ান এক বিধবা নারীর মৃত পতি সেজে ফিরে এসেছে, নবীনকুমারের উকিল তাকে জেরা করতে শুরু করলো। বেশীক্ষণ লাগলো না, আধ ঘণ্টার জেরার মুখে পড়েই জাল মড়া হঠাৎ এক সময় মুক্তকচ্ছ হয়ে পলায়ন করলো।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে এরকম ন'টি জাল মড়াকে সনাক্ত করা হলো। তাদের মধ্যে তিনজনকে সমর্পণ করা হলো পুলিশের হাতে। তখন দেখা গেল, হুজুগে কলকাতার নাগরিকগণ অনেকে আবার নবীনকুমারকেই সমর্থন করছে। তারা নবীনকুমারের দলটির পিছু পিছু যায়, আর ভুয়ো মড়া দেখলেই দুয়ো দেয়।

১৫ই কার্তিকের রাত নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেল, কোনো পুনর্বিবাহিতা নারীরই মৃত প্রথম স্বামী ফিরে এলো না।

এর কয়েকদিন পর নবীনকুমার অসুখে পড়লো।

শীতে শহরের স্বাস্থ্য ভালো থাকে, কিন্তু এ বৎসর শীত বিলম্বিত। অঘ্রাণ মাস এসে গেল, তবু রোদ্দুরের দাহ কমে না যেন। সেই কারণেই বোধ হয় এক উৎকট উদরাময় ছড়াতে লাগলো পল্লীতে পল্লীতে। এবং টপাটপ মানুষ মরতে লাগলো সেই রোগে।

নবীনকুমারও আক্রান্ত হলো ঐ উদরাময়ে। যা কিছু আহার করে, সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যায়। আর বমির পরই উদরে অসহ্য যন্ত্রণা। তিনদিনের মধ্যেই যেন নবীনকুমারের দেহ একেবারে মিশে গেল শয্যার সঙ্গে।

কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের আনা হয়েছে নবীনকুমারের চিকিৎসার জন্য। সারাদিনের মধ্যে সর্বক্ষণই পালা করে একজন না একজন চিকিৎসক থাকলেন গৃহে। তবু দুশ্চিন্তার শেষ নেই। চিকিৎসা ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে পরিচালনা করবার জন্য বিধুশেখর এসে রইলেন বিম্ববতীর পাশের কক্ষে। বিম্ববতীকে সান্ত্বনা দেওয়াও তাঁর প্রধান কাজ। তিনি ছাড়া আর কেউ সান্ত্বনা দিতে পারবে না।

মধ্য রাত্রে ঘুম ভেঙে নবীনকুমার দেখলো, তার শিয়রের পাশে তার বালিকা পত্নী সরোজিনী স্থির

হয়ে বসে আছে। দ্বারের কাছে বসে ঢুলছে দুজন দাসী। বাইরে চেয়ারের ওপর উপবিষ্ট মেডিক্যাল কলেজের একজন ছাত্র।

তৃষ্ণায় কণ্ঠ এমনই শুষ্ক যে, নবীনকুমার কোনো কথা বলতে পারছে না। হাতের ইঙ্গিতে সে জল চাইলো। সরোজিনী অমনি কাচের জার থেকে মিছরি ভেজানো জল ছোট পাথরের গেলাসে ঢেলে এনে দিল স্বামীকে।

সেই জল পান করে নবীনকুমার সভয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। এখুনি বুঝি বমি হবে। জল পেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যথা শুরু হয়ে গেছে।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও বমি হলো না, পেটের মধ্যে ব্যথাটা অবশ্য চলতেই লাগলো। আরও একটু জল পান করলো নবীনকুমার। বমি হয় হোক, তবু এই তৃষ্ণা সহ্য করা যায় না।

তারপর মাথাটা একটু উঁচু করে বললো, সরোজ, তুমি শুয়ে পড়ো। আর কত রাত জাগবে?

সরোজিনী বললো, না, না, আমি ঠিক আচি। আপনি ঘুমোন!

—তুমি কতক্ষণ ঠায় বসে থাকবে? তুমি আমার পাশে শুয়ে পড়ো।

—না, না, আমি ঘুমোবো না। আপনার কষ্ট হচ্চে?

—খুব! পেটে অসহ্য ব্যথা।

—পেটে হাত বুলিয়ে দিই?

সরোজিনী এগিয়ে এসে তার কচি, নরম হাত নবীনকুমারের বুকে-পেটে বুলিয়ে দিতে লাগলো। কিন্তু এ এমনই ব্যথা যে, ওপর থেকে সেবা-যত্ন করলেও তার কোনো হেরফের হয় না। জাগরণের বদলে নিদ্রাই নবীনকুমারের ভালো ছিল। জেগে উঠলেই তৃষ্ণা, তারপর তৃষ্ণা-নিবৃত্তির জন্য জল পান করলেই এই ব্যথা। এই জন্য নবীনকুমারের আর জাগতেই ইচ্ছে করে না।

এক সময় সে সরোজিনীর হাতটা চেপে ধরে বললো, সরোজ, তোমায় একটা কতা বলবো?

—কী?

—তুমি শুনবে?

—ওমা, আপনার কতা শুনবো না?

—শুধু শোনা নয়। আমি একটা অনুরোধ কর্বো, তুমি রাকবে?

—নিশ্চয়ই।

—তুমি আমার গা ছুঁয়ে শপথ করো।

—এই তো, আপনার হাত ছুঁয়েই তো রয়িচি। আপনার সব কতা রাকবো—

ব্যথার মধ্যে ঈষৎ হাঁপাতে হাঁপাতে নবীনকুমার বললো, সরোজ, আমি যদি হঠাৎ মরে যাই তুমি সারা জীবন বিধবা হয়ে থেকো না। তুমি আবার বে করো। এই আমার দিব্যি রইলো। আমি যদি মরেই যাই, তা হলে আবার বে কল্লে আমার আত্মা তৃপ্তি পাবে!

কলুটোলার কেশবদের বাড়ির সভা থেকে বেরিয়ে যদুপতি গাঙ্গুলী এবং তার বন্ধু অম্বিকাচরণ সান্যাল পদব্রজে বাড়ি ফিরতে লাগলো। উভয়েই থাকে নিকটস্থ এক পল্লীতে। অম্বিকাচরণ সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতার কাজ পেয়েছে, যদুপতি শিক্ষকতা করে অরিয়েন্টাল সেমিনারিতে।

বৃষ্টি পড়ছে অল্প অল্প, পৌষ মাসের অকাল বৃষ্টি, বেশীক্ষণ থাকার সম্ভাবনা কম। এ বৎসর শীত কিছুতেই জাঁকিয়ে পড়লো না, বৃষ্টির মধ্যে ফিনফিনে বাতাসে তবু কিছুটা শীতের ধার আছে, সেই বাতাস ও বৃষ্টিকে উপভোগ করতে করতে দুই বন্ধুতে হাঁটতে লাগলো। দুজনেরই গায়ে র‍্যাপার, অম্বিকাচরণ এক সময় তার র‍্যাপার দিয়ে মাথায় মুড়ি দিয়ে নিল। রাত্রি বেশী নয়, তবু পথ প্রায় জনশূন্য।

দুই বন্ধুরই জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল, কিন্তু নিছক গ্রন্থপাঠে যেন ঠিক তৃপ্তি হয় না, বুকের মধ্যে একটা আকূতি থেকে যায়। সে আকূতি যে কিসের জন্য, তাও স্পষ্ট নয়। আসলে ভিত টলে গেছে। এতকাল ধরে বোঝানো হয়েছিল যে মানুষের জীবনকে যা ধারণ করে থাকে, তার নামই ধর্ম। যারা ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে মত্ত, যারা যারা সাকার কিংবা নিরাকার ঈশ্বরকে অভিভাবক মনে করে, তাঁর উদ্দেশ্যে কাঁদে কিংবা প্রার্থনা জানায়, তারা শুধু বিশ্বাস করে, এবং বিশ্বাসের মধ্যেই শান্তি। যদুপতি আর অম্বিকাচরণ নতুন কালের শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে বিনা প্রশ্নে কোনো কিছুই বিশ্বাস করতে বা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তাদের ধর্মের নাম যুক্তি। এবং যুক্তির আক্রমণে প্রচলিত কোনো ধর্মই তাদের কাছে টেঁকে না। কিন্তু যুক্তির যত বড় ক্ষমতাই থাক, তা কখনো মানুষের বন্ধু কিংবা সর্বক্ষণের হৃদয়-সঙ্গী হতে পারে না, যুক্তি মানুষকে বড় নিরালা করে দেয়।

শহরের যেখানে যেখানে জ্ঞান, বুদ্ধির চর্চা হয় এই দুই বন্ধু সেখানে নিয়মিত যায়। এক সময় তারা দুজনেই ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করতো। কিন্তু কিছুদিন হলো ব্রাহ্মদের সম্পর্কে এই বন্ধুদ্বয়ের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। হিন্দু ধর্মের আড়ম্বর পরিত্যাগ করার নামে ব্রাহ্মরাও যেন এক নতুন ধরনের আড়ম্বরের প্রচলন করতে চলেছে, যুক্তির বদলে ভক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে তাঁদের মধ্যে। ইদানীং ব্রাহ্মদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে মতবিরোধ, বিশৃঙ্খলা, তাঁদের মূল আচার্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাগে ও অভিমানে কলকাতা ছেড়ে চলে গেছেন হিমালয় পাহাড়ে।

যদুপতি ও অম্বিকাচরণ নবীন সিংহের বাড়ির বিদ্যোৎসাহিনী সভায় যায়, আবার তরুণ বাগ্মী কেশবের বাড়ির আলোচনা সভাতেও আসে। তবু যেন ঠিক মন ভরে না।

অম্বিকাচরণের স্ত্রী থাকে তাদের দেশের বাড়িতে। ইদানীং শহরে সব দ্রব্যই অগ্নিমূল্য, বেতনের টাকায় সংসার চালনা করা রীতিমতন কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। কলকাতার জনসংখ্যা হু-হু করে বাড়ছে, জীবিকার সন্ধানে দেশের নানান অঞ্চল থেকে মানুষ ধেয়ে আসছে এখানে। জলা জমি ভরাট করে ব্যাঙের ছত্রাকের মতন নিত্য নতুন গজিয়ে উঠছে ঘর-বাড়ি। এই অবস্থায় স্ত্রীকে এনে কলকাতায় সংসার পাতবার ভরসা পাচ্ছে না। সে থাকে একটি মেস বাড়িতে।

যদুপতি বিপত্নীক। দু বৎসর আগে তার স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে, আত্মীয়, বন্ধুদের অনেক পীড়াপীড়িতেও সে আর দার পরিগ্রহ করেনি। বিগতা স্ত্রীর স্মৃতি তার মনে প্রবলভাবে জাগরূক। যদুপতির মূল বাড়ি কুষ্ঠিয়ায়, কলকাতাতেও তার পিতা একটি ছোট বসত বাড়ি বানিয়েছিলেন, সেখানে সে এখন একা থাকে

ভদ্র গৃহস্থেরা এই শীতের বৃষ্টির রাতে সবাই এর মধ্যে পথ ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে ঘরে। যে দু-চারজনকে দেখা যায়, তারা প্রায় সবাই ফুর্তিখোর মাতাল। যদিও বেশী মাতাল হয়ে পথের ওপর দৌরাত্ম্য করলে তাদের গ্রেফতার করে কোতোয়ালিতে আটক করার হুকুম জারি হয়েছে। তবু তাতে মদ্যপদের হুটোপাটি কমেনি কিছুমাত্র। পুলিশের উৎকোচ পাবার আর একটি উপায় হয়েছে শুধু। বারবনিতাদের সঙ্গে বেলেল্লা করতে করতে লম্পটরা সন্ধ্যা-রাত্রি থেকেই রাজপথের ওপর ঘুরে বেড়ায়। আজ অবশ্য তাদের সংখ্যাও কম।

দুজনে কিছুক্ষণ হাঁটলো নিঃশব্দে। আজ একটা গাড়ি নিতে পারলেই ভালো হতো। কিন্তু এমন রাত্রে গাড়ি পাওয়াও দুষ্কর। কেরাঞ্চি গাড়িগুলি সন্ধ্যার পরই উধাও হয়ে যায়। পাল্কি-বেহারা এমন বৃষ্টি-বাদল দেখে নিশ্চয়ই কোথাও গাঁজা টানতে বসে গেছে। পথে গাড়ি-ঘোড়াও দেখা যাচ্ছে না বড় একটা। বৃষ্টি বেশ জোরে আসছে।

যদুপতি হঠাৎ বললো, আমার আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না।

অম্বিকাচরণ চমকে উঠে বললো, সে কি কথা? কেন ভাই?

যদুপতি বললো, কেন বেঁচে থাকবো তার একটি, বেশী নয়, একটি মাত্র সুসংগত যুক্তি দেখাতে পারো?

—বাঃ, একটি কেন, অসংখ্য যুক্তি রয়েচে। সবচে বড় যুক্তি তো এই যে বেঁচে থাকবে বেঁচে থাকারই জন্য!

—তোমার কথাটি একটু ব্যাখ্যা করে বলো ভাই অম্বিকাচরণ!

—এ কী উপনিষদের শ্লোক যে ব্যাখ্যা করতে হবে? এ তো অতি সাধারণ কথা।

—এমন সাধারণ কথার উপর নির্ভর করে, এমন সাধারণ ভাবে আমি বাঁচার ইচ্ছা করি না। এ কি পশুর জীবন যে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই প্রাণ ধারণ করবো?

—তোমার এমন শ্মশান বৈরাগ্য হঠাৎ জাগলো কেন ভাই ! একবার তো শ্মশানে গিয়ে নাকাল হয়েছেলে। কয়েকটা ডোম ছোঁড়া তোমায় আচমকা ধাক্কিয়ে জলে ফেলে দিসলো না ?

—এর নাম কী শ্মশান বৈরাগ্য ? বিনা উদ্দেশ্যে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকা মানে কি নিছক বসুমতীর ভার বৃদ্ধি করা নয় ?

—তুমি তোমার স্বর্গতা পত্নীকে নিয়ে আর কোনো নতুন কবিতা রচেছো ?

—আমি আর কবিতা লিখি না। কবিতা রচনা করাও অর্থহীন। কবিতা জিনিসটা সম্পূর্ণ একটা যুক্তিহীন ব্যাপার নয় ?

—হা-হা-হা—

—তুমি হাসচো, অম্বিকা ?

—যদু, তোমার রোগটি বেশ কঠিন মনে হচ্চে। কোনো কবি যদি কখনো কবিতাকে যুক্তিহীন, অর্থহীন বলে, তখন বুঝতে হবে, হি হ্যাজ ক্রসড় দি বাউণ্ডারি লাইন।

—তুমি আমার প্রশ্ন কিন্তু এড়িয়ে যাচ্চো, ভাই অম্বিকা !

—ঐ দ্যাখো।

—কী ?

—ওকে দ্যাখো। ও কেন বেঁচে রয়েচে বা বেঁচে থাকতে চাইছে তা বলতে পারো ?

বহুবাজারে পথের মোড়ে এক ইঁটের পাঁজায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক লাল শাড়ী পরা যুবতী। বয়স সতেরো-আঠারোর বেশী মনে হয় না। হাতের একটি লাল রুমাল সে ঘুরিয়ে চলেছে, বৃষ্টিতে যে ভিজে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ সে খেয়াল নেই। এই রাত্রে সে পথের ওপর কী জন্য দাঁড়িয়ে আছে, তা এক নিমেষ তাকালেই বোঝা যায়।

অম্বিকাচরণ সেদিকে একবার চেয়েই বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিল।

যদুপতি বললো, দ্যাখো, নারীকে সবাই বলে অবলা। অথচ ওর কোনো ভয় নেই, এমন দুর্যোগের মধ্যে পথের ওপর একলা দাঁড়িয়ে রয়েচে। একেই বলে শুধু বাঁচার জন্য বাঁচা। বাঁচতে তো হবেই, কেন না, মৃত্যুর পর যে আর কিচু নেই। তুমি যুক্তির কথা বলছেলে, মৃত্যুর পর সবই যুক্তিহীন।

মেয়েটি ওদের দেখে একটু এগিয়ে এসে বললো, এই !

দুই বন্ধু কর্ণপাত করলো না। তারা যুক্তি বিষয়ে আলোচনা করতে করতে এগোতে লাগলো।

মেয়েটি আবার বললো, এই, আমায় নেবে ? নাও না, তোমাদের যেখানে খুশী, যতক্ষণ খুশী, আমায় নাও না।

যদুপতি ধমক দিয়ে বললো, যাঃ ! বিরক্ত করিসনি !

মেয়েটি পিছু পিছু আসতে আসতে বললো, দুজনে মিলে নাও ! দুটো ট্যাকা দিও !

যদুপতি বললো, যা, যাঃ ! বলচি, এখেনে সুবিধে হবে না।

—একটা ট্যাকা দিও, আর জলে ভিজতে পাচ্চিনি ! দুজনে আট আনা, আট আনা।

অম্বিকাচরণ একটা আধলা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, এই নে, আমাদের পিছু ছাড় !

মেয়েটি এবার রেগে গিয়ে গালাগাল শুরু করলো। আ মর মিনসে, আমায় ভিকিরি পেইচিস ? ড্যাকরা, ছুঁচো, আট আনা পয়সা দেবার মুরোদ নেই, আবার কোঁচার পত্তন ? আমি কি ঘাটের মড়া ? দ্যাক না আমার রাঙ দুখ্যানা, দু ট্যাকার কমে যাই না—

যদুপতি অম্বিকাচরণের হাত ধরে টেনে দ্রুত এগিয়ে গেল।

প্রথমে অম্বিকাচরণের বাসস্থান পড়ে। সে দ্বারের সামনে এসে বললো, এবার তোমায় শুভনিশি জানাই ভাই, যদু। বেঁচে থাকার যুক্তি বিষয়ে চিন্তাটা আজ রাতের জন্য মুলতুবী রেখো। আমাদের স্বর্গগতা বৌঠানের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়েই বলচি, এবার তোমার আর একটি বিবাহ করার সময় হয়েচে। বিবাহ করলে পুত্র কলত্রে ঘর ভরে গেলে বুঝবে, বেঁচে থাকার আর একটি যুক্তিও রয়েচে !

যদুপতি গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করলো, অর্থাৎ ?

অম্বিকাচরণ বললো, অর্থাৎ, তখন বুঝবে, অপরের জন্য বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। পত্নীর প্রতি প্রেম, সন্তানের জন্য স্নেহ, এগুলিও তো বেঁচে থাকার উপকরণ।

যদুপতির আর তর্ক করার দিকে মন নেই। সে হাত তুলে বিদায় জানিয়ে হাঁটতে শুরু করলো।

কিছুদূর গিয়ে থমকে দাঁড়ালো সে। কী ভেবে আবার পিছনে ফিরলো। অম্বিকাচরণের গৃহের সামনে এসে দেখলো, দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে। সে আর ডাকলো না, চলতে লাগলো উল্টো দিকে।

বহুবাজারের মোড়ে সেই যুবতীটি আবার ইঁটের পাঁজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রুমাল ঘোরাচ্ছে। যদুপতি একেবারে তার মুখোমুখি এসে থেমে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো তার দিকে।

যুবতীটির মুখে ছড়িয়ে গেল খুশীর হাস্য। সে বললো, এসচো ? নক্‌খীসোনা আমার, মানিক আমার, এসচো ? ভালো করে দ্যাকো, আমি ফ্যালনা নই, রোগা শালিক পক্‌খীটি নই।

যদুপতি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, তুমি কত রাত এখেনে দাঁড়িয়ে থাকবে ?

যুবতীটি বললো, আর ডাঁড়াবো না ! তুমি এসচো, আর আমার চিন্তা নেই। তুমি আমায় নেবে। আজ কেউ আমায় নেয়নি গো !

—এসো আমার সঙ্গে।

—আমায় একটা ট্যাকা দিও অন্তত !

—এসো।

যুবতীটিকে নিয়ে যদুপতি কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এলো নিজের গৃহে। দ্বার খুলে দেবার পর বাড়ির ভৃত্যটির প্রায় বাক্‌রহিত হবার মতন অবস্থা। তার বাবুটি অতি বিশুদ্ধ চরিত্রের, কখনো বাড়িতে ভিখারিণী এলেও তার সঙ্গে কথা বলে না। রাত্রিবেলা এরকম একজন স্ত্রীলোককে নিয়ে তার বাবু ফিরবে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। স্ত্রীলোকটি কী জাতীয়, তা ভৃত্যটিও বোঝে।

যদুপতি কিছুই গ্রাহ্য করলো না। ভৃত্যকে সংক্ষিপ্ত আদেশ দিল, তুই দোর লাগিয়ে শুয়ে পড়। তারপর যুবতীকে নিয়ে উঠে এলো দ্বিতলে।

দ্বিতলের এক কক্ষের চৌকাঠে পা দিয়ে যুবতীটি অনুনয়ের সুরে বললো, ওগো, একটা ট্যাকা ঠিক দেবে তো ? যদি দুটো ট্যাকা দিতে পারো, তা হলে বড্ড ভালো হয়।

যদুপতি বললো, আমি তোমায় স্বর্ণালঙ্কার দেবো !

সত্যিই সে দেরাজ খুলে দুটি সোনার অঙ্গুরীয় বার করে মেয়েটির হাতে দিয়ে বললো, এই নাও, আরও দেবো।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে যদুপতি একটা গামছা নিয়ে এলো। যুবতীটিকে বললো, অনেক ভিজেচো, মাথা মুচে নাও। তোমার নাম কী ?

—আমার একটা নাম বসন্তকুমারী আর একটা নাম ক্ষেমী।

—তোমার খিদে পেয়েচে ?

—খুব। তাতে কিচ্চু হবে নাকো। আমি বাড়ি গিয়ে খাবো। আংটি দিলে, একটা ট্যাকা দেবে না ?

যদুপতি আবার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার রাত্রির আহার ঢাকা দেওয়া থাকে। তার নিজের একটুও আহারের বাসনা নেই। সে এক বাটি ক্ষীর নিয়ে ফিরে এসে বললো, বসন্তকুমারী, তুমি এটা খাও, আমি দেখি।

ক্ষেমী বললো, ওমা, এখুন খাবো কী ? না, না, এখুন না, আগে তুমি আমায় নাও।

যদুপতি জোর করে ক্ষীরের বাটিটা তুলে দিল তার হাতে। তারপর একটা জলচৌকি দেখিয়ে বললো, তুমি বসো ওটার ওপর।

মেয়েটি হতভম্বের মতন বসলো সেখানে। যদুপতি বসলো তার সামনে মেঝের ওপর। তারপর হাত দুটি জোড় করে বললো, তুমি আমার মা !

ক্ষেমীর চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হয়ে গেল। তার এই ক্ষুদ্র জীবনেই অনেক রকম উন্মাদ দেখেছে, কিন্তু এটি আবার কী রকম ?

যদুপতি বললো, শুধু দুটি খেতে পাওয়ার জন্য তুমি বেঁচে রয়েচো, তোমার খাওয়া আমি দেখি। হে জননী, দুটি আহারের জন্য তোমায় পথে দাঁড়াতে হয় ?

ক্ষেমী বললো, কী কর্বো, বাড়িতে যে নোক আসে না রোজ সাধে কি আর রাস্তায় ডাঁড়াই। রাস্তায় ডাঁড়িয়েচিলুম বলেই তো তোমায় পেলুম। হ্যাঁ গা, তুমি মা মা কচ্চো কেন ? আমি তোমার মা হতে

যাবো কেন, তুমি ভদ্দরনোক!

—তুমি যে মাতৃজাতি! লাজ-লজ্জা-ধর্ম সব বিসর্জন দেবে শুধু দুটি আহারের জন্য? এর চে কি মরণ ভালো নয়? এসো মা, তোমাতে আমাতে দুজনে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরি। আমরা সন্তান হয়ে যদি মায়ের দুঃখ ঘোচাতে না পারি—

এসব কী বলচো গো! আমার ভয় কচ্চে! আমি মত্তে যাবো কোন্ আহ্লাদে? বাড়িতে যে এক গাদা মুখ হাঁ করে রয়েচে, তাদের গুষ্টির পিণ্ডি কে জোগাবে?

—তোমার রোজগারে আরও লোক খায়?

—তবে তাদের কে খাওয়াবে? ভগবান? এঃ!

—তুমি ওদের জন্যই বেঁচে রয়েচো?

—কে জানে বাবা অত কতা? তুমি আমায় নেবে তো নাও, নইলে আমি বাড়ি যাই। মরণের কতা! তুমি আমায় মেরে ফেলবে নাকি?

—না, মা, আমি তোমায় পুজো করবো।

—শোনো কতা! কেন, আমায় পুজো কর্বে কেন? আমি কি ওলাইচণ্ডী ঠাকুর? অ্যাই যাঃ। কী বলে ফেললুম! নমো, নমো।

—তুমি সব ঠাকুরের চেয়ে বড়। তুমি মা। তোমার পুজো করবো। সন্তানের কাচ থেকে পুজো পেয়েও কি তুমি আর কোনোদিন মান খুইয়ে পথে দাঁড়াবে? এর চে যে ভিক্ষে করাও ভালো।

—কে অমনি অমনি আমায় ভিক্‌কে দেবে? ক'টা আধলাই বা পাবো?

—তুমি মা, তোমার পাপে সন্তানের পাপ, তোমরা যদি এত নীচে নামো, তবে সন্তানরা যে মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতেই পারবে না।

—আমি তোমার কতা কিচুই বুঝচিনি! আমায় তবে বাড়ি যেতে দাও।

যদুপতি ক্ষেমীর পায়ের পাতা দু'হাতে চেপে ধরলো।

ক্ষেমী আঁতকে উঠে বললো, ওমা, ওমা, ভদ্দরনোকের ছেলে, আমার পা ধরলে, আমার একেই এত পাপ...ছাড়ো, ছাড়ো।

যদুপতি ব্যাকুলভাবে বললো, আমি শুধু মুখের কথা বলিনি। আমি সত্যিই তোমার পুজো করবো। ফুল-দুর্বো দিয়ে। এতদিন লোকে তোমায় যত অপমান করেচে, সব ধুয়ে যাবে, তুমি আবার মঙ্গলময়ী মা হবে।

ক্ষেমী কেঁদে ফেলে বললো, ওগো, আমরা বড় দুক্‌খী, কেন আরও দাগা দিচ্চো আমায়? সাধ করে কেউ পাপের পথে নামে!

—আবার পুণ্যের পথে উঠে যাও!

—ওগো ছাড়ো, পা ছাড়ো। বেশ, কাল থেকে ভিক্‌কে কর্বো, পা ছাড়ো, আর পাপ বাড়িও না।

যদুপতি কেঁদে ফেলে বললো, তোমার যখন যা দরকার আমার কাচ থেকে চেয়ে নিও, কিন্তু আজ থেকে তুমি মহিয়সী হও! তুমি সন্তানের নিকট আদর্শ হও!

যদুপতির আবেগের স্পর্শে ক্ষেমীও আপ্লুত হয়ে গেল। এবং একসঙ্গে কাঁদতে লাগলো দুজনে।

বেশ কয়েকদিন আত্মীয় বন্ধুদের নিদারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখে নবীনকুমার এক সময় আবার ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো। তার আর বিপদাশঙ্কা রইলো না বটে, কিন্তু শরীর একেবারে বিছানার সঙ্গে লীন। জন্মের পর থেকে নবীনকুমারের কখনো কোনো গুরুতর পীড়া হয়নি। এই এক অসুখেই সে একেবারে কাহিল।

কয়েকদিন প্রবল জ্বরে সে পুরোপুরি চৈতন্যহীন হয়ে ছিল. জ্ঞান ফেরার পর থেকে সে কানে ঠিক

মতন শুনতে পায় না। যারা কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের কণ্ঠস্বরও যেন ভেসে আসে বহু দূর থেকে। নবীনকুমার ভাবে, সে কি তবে বধির হয়ে যাচ্ছে ? তার হাত পা সরু কাঠি কাঠি, উঠে বসার শক্তি নেই, সে কি অথর্ব হয়ে থাকবে বাকি জীবন ! তার চক্ষে জল আসে। সারাদিন ধরে বারবার ওষুধ পথ্য সেবনে তার মুখ বিস্বাদ, কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

এই রকম ভাবে আরও সপ্তাহাধিক কাল কাটার পর সে কিছুটা শারীরিক শক্তি ফিরে পেল। কিন্তু তার শ্রবণক্ষমতা সেই রকম দুর্বল হয়েই রইল। সারাদিন নানা জন তাকে দেখতে আসে, অনেক রকম প্রশ্ন করে, কিন্তু নবীনকুমার তার কিছুই প্রায় বুঝতে পারে না। বারবার অ্যাঁ ? অ্যাঁ ? করতে করতে সে নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং শয্যার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে গম্ভীর হয়ে থাকে।

এই ব্যাধিতে তার একটি মাত্র লাভ হলো, সে তার দ্বিতীয়া পত্নী সরোজিনীর সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হলো। সরোজিনী সর্বক্ষণ ছায়ার মতন থাকে তার শিয়রের কাছে। এই বালিকাটির প্রতি নবীনকুমার এতদিন বিশেষ মনোযোগ দেয়নি। এখন সে দেখলো, সরোজিনী আর বালিকাটি নেই, কবে যেন হঠাৎ সে কিশোরী হয়ে গেছে। তার শরীরে এসেছে লজ্জা, তার বক্ষে উঠেছে ঢেউ। নবীনকুমারের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সরোজিনী নিজের চক্ষু নত করে। অথচ অন্য সময় নবীনকুমার অনুভব করতে পারে যে, সরোজিনী নির্নিমেষে তার দিকেই চেয়ে আছে।

সরোজিনীর কথা একেবারেই শুনতে পায় না নবীনকুমার। সরোজিনী এমনিতে বেশী কথা বলেও না, যা বলে তাও অতি মৃদুস্বরে। একদিন সকালে পিঠে বালিশের ভর দিয়ে আধো-বসা হয়ে নবীনকুমার একটি গ্রন্থ পাঠ করার চেষ্টা করছে, সরোজিনী তাকে কী যেন বললো। নবীনকুমার কিছুই বুঝতে না পেরে ক্ষুব্ধ হয়ে বললো, তোমরা এমন নিচু গলায় কতা কও কেন ? আমি এক বর্ণ বুঝতে পারি না। একটু জোরে বলো !

সরোজিনী বললো, মা কালীঘাটে চলে গ্যাচেন, আপনি তখন ঘুমুচ্চিলেন, তাই আপনার সঙ্গে দ্যাকা করে যেতে পারেননি কো।

নবীনকুমার সরোজিনীর ওষ্ঠ নাড়া দেখলো, কিন্তু কোনো কথাই তার কর্ণে প্রবিষ্ট হলো না। সে বললো, আরও কাচে এসো, আরও জোরে বলো ! আমি কিচু শুনতে পাচ্চিনি যে !

সরোজিনী কাছে এগিয়ে কথাগুলি পুনর্বার উচ্চারণ করলো। নবীনকুমার এবার কিছু শব্দ শুনতে পেল মাত্র, কিন্তু সে সব শব্দের কোনো মর্ম তার বোধগম্য হলো না।

সে বললো, আরও কাচে এসো। আমার কানে মুক লাগিয়ে বলো !

সরোজিনী চকিতে একবার পিছনের দিকে তাকালো। ঘরে অন্য কেউ নেই, ঘরের বাইরে একজন ভৃত্য বসে আছে, কিন্তু সে শিয়রের এ দিকটা দেখতে পাবে না।

সরোজিনী তার স্বামীর এক কানে ওষ্ঠ স্থাপন করে বেশ জোরে বললো কথাগুলো। এবার নবীনকুমার শুনতে পেল স্পষ্ট। সে খুশী ও বিস্মিত হলো।

সে জিজ্ঞেস করলো, কালীঘাটে, কেন, মা হঠাৎ কালীঘাটে গ্যালেন কেন ?

সরোজিনী বললো, বাঃ, কাল রাতে মা আপনাকে সব বললেন না ? আপনার অসুকের সময় মা আপনার নামে কালীঘাটে জোড়া পাঁটা মানোত করেচিলেন।

সরোজিনী একটু সরে গিয়েছিল, নবীনকুমার বললো, আবার দূর থেকে বলচো ! কানে কানে না বললে আমি শুনতে পাই না। কানে কানে বলো !

কাল রাতে মায়ের সঙ্গে কি কথাবার্তা হয়েছিল তা নবীনকুমার একটুও বুঝতে পারেনি। সে অবশ্য কালীঘাটে পুজো দেবার ব্যাপার নিয়ে আর কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলো না। সে বললো, আজ আমায় ভাত খেতে দেবে তো ? বড্ড খিদে পেয়েচে ! গরম গরম ভাত, এক পলা গাওয়া ঘি, নুন, আর আলু সেদ্ধ খাবো। আর মাগুর মাছের ঝোল খাবো !

সরোজিনী বললো, আপনাকে ভাত দেওয়া হবে পরশুদিনকে ! সেদিন ভালো তিথি আচে। আজ আপনি ওবেলা কালীঘাটের প্রসাদ খাবেন !

নবনীকুমার তার দুর্বল দক্ষিণ হস্ত দিয়ে সরোজিনীর কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে বললো, বারবার দূরে সরে যাচ্চো কেন ? সব কতা আমার কানে কানে বলো।

ভাত দেওয়া হবে না শুনে সে রেগে গিয়ে বললো, দুত্তুরি ছাই তিথির নিকুচি করেচে ! আমি ভালো হয়ে গ্যাচি, আমার খিদে পেয়েচে, আমি আজই ভাত খাবো।

সরোজিনী মিনতি করে বললো, লক্ষ্মীটি, অমন কত্তে নেই, কোবরেজ মশাই বলেচেন, পর্শুদিনকে

সকালেই আপনাকে ভাত দেওয়া হবে।

—না, আমি আজই ভাত খাবো!

—আজ মায়ের প্রসাদ খাবেন। আপনার নামে মানোত। আজ তো এমনিতেই ভাত খেতে নেই।

—না, আমি ভাত খাবো, আমি ভাত খাবো, আমি গরম ভাত খাবো!

সরোজিনী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে বললো, আপনি কাঁদবেন না, আপনার শরীর খারাপ হবে!

—আমি ভাত খাবো, কোনো কতা শুনতে চাই না, আমায় ভাত এনে দাও!

—কোবরেজ মশাইকে ডাকি?

—আঁমি ভাঁত খাঁবো! আঁমি ভাঁত খাঁবো!

সাহেব চিকিৎসকরা তো নিয়মিত দেখছেনই, তাছাড়াও মেডিক্যাল কলেজের একজন ছাত্র এবং বিশিষ্ট কবিরাজকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য স্থায়ীভাবে এ বাড়িতে রেখে দেওয়া হয়েছিল। সংকট উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রটি দুদিন আগে চলে গেছেন, কবিরাজমশাই এখনো রয়েছেন। লোক পাঠিয়ে সরোজিনী কবিরাজ মশাইকে ডেকে আনলো।

কবিরাজমশাই মধ্যবয়স্ক, রীতিমত বলবান চেহারার সুপুরুষ। জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর। দেখলে বেশ সমীহ হয়। তিনি নবীনকুমারের নাড়ি দেখে বললেন, অতি সুলক্ষণ, ভাত খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে, অতি সুলক্ষণ! নাড়ির গতিও স্বাভাবিক প্রায়! তবে কিনা কালিকার দিনটিতে অমাবস্যা, আর অমাবস্যায় শরীর এমনিই রসস্থ হয়, কালিকার দিনটি বাদ দিয়ে পরশ্ব ভাত দেওয়া যাউক!

নবীনকুমার বললো, আঁমি ভাঁত খাঁবো! আঁমি ভাঁত খাঁবো!

কবিরাজ সস্নেহে বললেন, আর তো দুটি মাত্র দিন! আজ সিদ্ধ সাবু, কাগজি লেবুর রস দুই ফোঁটা, লবণ একেবারে বাদ।

নবীনকুমার বললো, আঁমি ভাঁত খাঁবো! আঁমি ভাঁত খাঁবো!

কবিরাজের একপাশে দিবাকর, আর শয্যার শিয়রের কাছে মাথায় ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে সরোজিনী। দিবাকর বললো, কবরেজ মশাই, আজ অন্তত চাট্টিখানি ভাত দেওয়া যায় না? ছোটবাবু অ্যাত্ত করে চাইচেন।

কবিরাজ তাকে ধমক দিয়ে বললেন, বাপু, আবার জ্বরজারি এলে তুমি দায়িক হবে?

তারপর নবীনকুমারের দিকে ফিরে কোমল গলায় বললেন, আর তো মোটে দুটি মাত্র দিন। আজ সিদ্ধ সাবু, কালিকার দিনটি ফলমূল।

নবীনকুমার একঘেয়ে গলায় বলে যেতে লাগলো, আঁমি ভাঁত খাঁবো। আঁমি ভাঁত খাঁবো।

সরোজিনী মৃদুস্বরে বললো, উনি কানে শুনতে পাচ্চেন না!

কবিরাজ বললেন, তা তো হবেই, এ ব্যাধিতে পঞ্চেন্দ্রিয় দুর্বল হয়—স্বর্ণ মকরধ্বজ ঠিক মতো সেবন করলে, মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

নবীনকুমার প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচিয়ে বললো, আঁমায় ভাঁত দাঁও! আঁমি ভাঁত খাঁবো, আঁমি ভাঁত খাঁবো!

কেউ আর ভ্রূক্ষেপ করলো না তার আবেদনে। কবিরাজের সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও নিষ্ক্রান্ত হলো সে কক্ষ থেকে।

মহাধনী পরিবারের পরম আদরের দুলাল, ষোড়শ বৎসর বয়স্ক নবীনকুমার সামান্য ভাতের জন্য সানুনাসিক সুরে আর্তনাদ করতে লাগলো, কেউ তাকে ভাত এনে দিল না।

দুর্বল শরীরে কান্না বেশীক্ষণ সহ্য হয় না। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো সে। দ্বিপ্রহরে দুজন দাসীকে সঙ্গে নিয়ে সরোজিনী যখন এসে তার ঘুম ভাঙিয়ে তাকে সাবু খাওয়াতে গেল, সাবু সমেত শ্বেতপাথরের বাটিটি মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল নবীনকুমার। কিছুতেই সে সাবু খাবে না। একটু পরে তুলসীপাতা ও মধু দিয়ে মাড়াই করা মকরধ্বজ খাওয়াতে এলেও সে ওষুধের খলটি ছুঁড়ে ভেঙে ফেললো। বাল্যকাল থেকেই সে দেখে এসেছে যে, তার মুখের কথাটি খসা মাত্র প্রতিপালিত হয়, দাস-দাসীরা তার প্রত্যেক হুকুম তামিল করার জন্য সদা উন্মুখ, অথচ আজ সে ভাত খেতে চাইলেও কেউ তাকে দেয় না। অন্যের কথা সে শুনতে পায় না, তার নিজের কণ্ঠের জোর নেই, সে অসহায়। ক্ষোভে, বেদনায়, অভিমানে তার হৃদয় উদ্বেল হয়ে রইলো।

বিম্ববতী কালীঘাটের মন্দিরে পূজা দিয়ে ফিরলেন প্রায় সন্ধ্যার সময়।

ফিরেই যেই তিনি শুনলেন যে তাঁর পুত্র সারাদিনে কিছুই আহার করেনি, তিনি অমনি ছুটে এলেন ব্যাকুল ভাবে।

কিন্তু নবীনকুমার তার জননীর সঙ্গেও একটিও বাক্য বিনিময় করলে না। সে সর্বক্ষণ শুয়ে রইলো উপুড় হয়ে, মাকে সে দেখবেও না। সরোজিনী তার কানের কাছে মুখ নিয়ে কাকুতি মিনতি করতে লাগলো, একটিবার পাশ ফেরার জন্য, কোনো সাড়া মিললো না তাতে। বিম্ববতী পুত্রের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে হাজারভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। ছেলে তাঁর বড় জেদী তিনি জানেন। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় এমন জেদ যে অতি মারাত্মক! কিছুতেই কালীঘাটের প্রসাদও খাওয়ানো গেল না নবীনকুমারকে। তার মুখে জোর করে শুঁজে দিলেও সে থু থু করে ফেলে দেয়। মা কালীর প্রসাদের এমন অবমাননায় বিম্ববতীর বুক কাঁপতে থাকে অমঙ্গল আশঙ্কায়।

কবিরাজের আবার ডাক পড়ে। কাবরাজও নিজ সিদ্ধান্তে অনড়। কুপথ্য খাওয়াবার চেয়ে বিনা পথ্যে রাখাও অনেক ভালো। ভাত দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

বিম্ববতী সারাদিন উপবাস করে ছিলেন, রাত্রেও তিনি কিছুই মুখে দিলেন না। নিজ শয্যায় শুয়ে তিনিও চক্ষের জল ফেলতে লাগলেন অনবরত। নবীনকুমারকে জোর করে ধমক দিয়ে খাওয়াতে পারতেন বোধহয় শুধু একজন। বিধুশেখর। কিন্তু বিধুশেখরের নিজেরই শরীরের এমন অবস্থা যে তাঁকে যখন তখন ডেকে আনানো আর যায় না। কিংবা, কে জানে, নবীনকুমারের জেদ যে-রকম বাড়ছে, তাতে সে আজ বিধুশেখরের কথাও শুনতো কিনা! বিম্ববতীর ভয় হয়, কোনোদিন যদি নবীনকুমার মুখের ওপর বিধুশেখরের কোনো আদেশ অগ্রাহ্য করে? বিধুশেখর কি তা সহ্য করতে পারবেন? সহ্য না করতে পারলে কী রকম হবে তাঁর প্রতিক্রিয়া!

মধ্যরাতে জেগে উঠলো নবীনকুমার। ঘর একেবারে অন্ধকার নয়, এক কোণে একটি সেজবাতি মিটমিট করে জ্বলছে। প্রথমে তার মনে হলো, সে যেন গভীর সমুদ্রে এক ভেলার ওপর ভাসমান। সে চলেছে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। দুনিয়ায় তার কেউ নেই। তারপর তার চোখ পড়লো কক্ষের চেনা আসবাবগুলির প্রতি। সে আশ্বস্ত হলো।

ঘরের মেঝেতে পালঙ্কের খুব কাছে শয্যা পেতে শুয়ে আছে সরোজিনী। ঘুমের মধ্যে তার কোমল মুখখানি বড় করুণ দেখায়। নবীনকুমার তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল না। বস্তুত পৃথিবীর কোনো শব্দই তার কানে আসে না। এই নিস্তব্ধতা তার কাছে দারুণ একটা বোঝার মতন মনে হয়।

নবীনকুমার ডাকলো, সরোজ! সরোজ!

সেই ডাকেই সরোজিনী ধড়মড় করে উঠে বসে বললো, কী হয়েচে? আপনার কষ্ট হচ্চে? মাকে ডাকবো?

নবীনকুমার বললো, সরোজ—আমি যে ক্ষিদের জ্বালায় মরে যাচ্চি। আর তুমি পড়ে পড়ে ঘুমুচ্চো?

সরোজিনী চক্ষু মুছতে মুছতে বললো, ওমা, আপনাকে খাওয়াবার জন্য অত সাধাসাধি, মা আপনাকে কত করে বললেন।

—সরোজ, তুমি ভাত রাঁধতে জানো না?

—ওমা, এত রাত্তিরে? এখুন বুঝি কেউ ভাত রাঁধে?

—কী বলচো, শুনতে পাচ্চিনি। কাচে এসে কানে কানে বলো। সরোজ, এখুন তো সবাই ঘুমিয়ে পড়েচে, কেউ টের পাবে নাকো। তুমি চুপি চুপি আমার জন্য চাট্টি ভাত ফুটিয়ে এনে দেবে? ভাত আর আলু সেদ্ধ, আর কিচু চাই না।

সরোজিনী স্বামীর কানের কাছে মুখ এনে কাতর গলায় বললো, আপনার পায়ে পড়ি, আজ নয়। আর তো মোটে মাঝে কালকের দিনটা। তারপর আমি নিজে আপনাকে ভাত রেঁধে দোবো।

—সরোজ, সবাই নিষেধ কচ্চে বলে তুমিও আমার কতা শুনবে না? ভাত খাওয়ার জন্য যে আমার মনটা আকুলি বিকুলি কচ্চে। দুটি ভাত দাও না আমায়।

—মা গো মা, অমন করে কেউ ভাত চায়? এত রাতে আমি ভাত কোতায় পাবো?

—যাও, রেঁধে নিয়ে এসো। যাও। নইলে আর কোনোদিন আমি তোমার সঙ্গে কতা কবো না।

সরোজিনী সেজবাতিটা তুল নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দ্বারের বাইরে ঘুমিয়ে আছে একজন দাসী, তাকে ডিঙ্গিয়ে গেল সাবধানে। স্বামীর আদেশ সব সময় পালন করতে হয়। কিন্তু

সে যে এক্ষেত্রে একেবারে অসহায়। এ বাড়ির সব রান্না হয় পিছন মহলে নিচের তলায়, সেখানে সরোজিনী গেছে মাত্র দু-তিনবার। সেখানকার ব্যবস্থাপত্র সে কিছুই জানে না। দ্বিতলে ঠাকুরের ভোগ রান্নার জন্য একটি ছোট রান্নাঘর আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ দিনই সেটা তালাবন্ধ থাকে। তা ছাড়া, কোথায় ভাঁড়ার ঘর, কোথায় চাল-ডাল পাওয়া যায়, উনুন কীভাবে ধরাতে হয়, সেসব সম্পর্কেও তার কোনো জ্ঞান নেই।

খানিকবাদে সে ম্লান মুখে ফিরে এলো।

নবীনকুমার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো, চাপিয়েচো! ভাত চাপিয়েচো?

সরোজিনী কাছে এসে বললো, ভোগ রাঁধার ঘরে তালাবন্ধ। নিচ তলায় একলা যেতে আমার ভয় করে।

—সরোজ, তুমি আমায় না খাইয়ে মারতে চাও?

—আপনি সন্দেশ খাবেন?

—নাঃ।

—তা হলে···তা হলে আপনি খিচুড়ি খাবেন?

এবার নবীনকুমার চমকে উঠে বললো, খিচুড়ি? কোতায়? হ্যাঁ, খিচুড়ি খাবো। কোতায় খিচুড়ি পাবে?

—সে আচে। আমি খিচুড়ি আনচি। কেউ যেন জানতে না পারে।

সরোজিনী দেখেছিল জাল দিয়ে ঢাকা আলমারিতে কালীঘাটের প্রসাদ খিচুড়ি আর সন্দেশ আর ফলমূল রাখা আছে। খিচুড়ি আনা হয়েছিল বাড়ির অন্য লোকজনদের জন্য। অনেকেই খায়নি। মায়ের প্রসাদ যেখানে সেখানে ফেলে দিতে নেই বলে রেখে দেওয়া হয়েছে, কাল গঙ্গায় দিয়ে আসা হবে। বাসি হয়ে গেছে, এই খিচুড়ি এখন আর খাওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে আর চিন্তা করলো না সরোজিনী। তার জেদী পতি দেবতাটি এরকম কিছু না পেলে কিছুতেই শান্ত হবে না যে!

অতি সাবধানে জালের আলমারি খুলে সে এক বাটি খিচুড়ি বার করলো, তারপর আঁচলের তলায় লুকিয়ে নিয়ে চলে এলো।

নবীনকুমার বিছানার ওপর বসে আছে। সরোজিনী ফিরে আসতেই সে ব্যস্ত ভাবে হাত বাড়িয়ে বললো, দাও। তারপর অতিশয় লোভীর মতন, পথের ক্ষুধার্ত কাঙালীদের মতন সে সেই খিচুড়ি খেতে লাগলো।

সরোজিনী একবার ভাবলো, বিছানার ওপর বসে বসে এই সকড়ি জিনিস খেলে পাপ হবে না তো? তারপরই সে ভাবলো, মায়ের প্রসাদ কক্ষনো এঁটো হয় না। আর মায়ের প্রসাদ খেলে কখনো শরীরের ক্ষতি হতে পারে না।

তৃপ্তির সঙ্গে সবটুকু খিচুড়ি আহার করে নবীনকুমার বললো, আঃ, তুমি আমায় বাঁচালে সরোজ। এবার বলো তো, এর বিনিময়ে তোমাকে আমি কী দিতে পারি?

সরোজিনী বললো, কিচু না। এবার আপনি ঘুমোন, আমি আপনার মাতায় হাত বুইল্যে দিই।

রাত্রির এই ঘটনাটি বাড়ির অন্যান্যদের কাছে গোপন রয়ে গেল এবং পরদিন নবীনকুমার ফল ও মিষ্টি দ্রব্যাদি খেয়ে থাকতে রাজি হওয়ায় বিম্ববতী আবার দ্বিগুণ বিস্মিত হলেন। সত্যিই এ ছেলের মতিগতি বোঝা ভার।

অমাবস্যার পরদিন নবীনকুমার অন্ন গ্রহণ করবে, কঠিন রোগের পর প্রায় দেড় মাস বাদে সে আবার ভাত মুখে দিচ্ছে। সেই উপলক্ষে কয়েক শত কাঙালী ভোজনেরও আয়োজন করা হলো। বিম্ববতী কাঙালীদের একটি করে মুদ্রাও দান করলেন।

নবীনকুমারের জন্য ভাত রন্ধন করা হলো দ্বিতলের ঠাকুরের ভোগ রান্নার ঘরে। সরোজিনী নিজে উপস্থিত রইলো সেখানে এবং শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে নিজে সে ভাতের হাঁড়ি নামালো। তারপর নিজের হাতে রূপোর থালায় ভাত বেড়ে এনে দিল নবীনকুমারকে। সেই সঙ্গে গব্য ঘৃত, সিদ্ধ আলু আর মাগুর মাছের ঝোল।

অত ভাত খাবার সাধ নবীনকুমারের, কিন্তু দু-তিন গরাসের পর আর ভাত মুখে রুচলো না। বাড়ির অনেক লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। যেন একটা উৎসব। কিন্তু একটুখানি খাওয়ার পর সে থালা ঠেলে উঠে দাঁড়ালো। বিম্ববতী হা হা করে উঠলেন। কবিরাজমশাই বললেন, থাক থাক, যথেষ্ট হয়েচে, প্রথম দিন আর বেশী না খাওয়াই ভালো। তবে দেখবেন, আজ যেন দ্বিপ্রহরে নিদ্রা না যায়। জ্বরের পর

ভাত-ঘুম অতি ক্ষতিকারক।

এর দু-তিন দিনের মধ্যে নবীনকুমার অনেক সুস্থ হয়ে উঠলো, আহারেও রুচি এলো। তবু তার মুখখানি সব সময় বিরস হয়ে থাকে। সে নিজেই হাঁটা চলা করতে পারে। কিন্তু তার মস্তিষ্ক দুর্বল, শ্রবণশক্তি অতি ক্ষীণ। এই পৃথিবীর সঙ্গে যেন তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। শুধু খাওয়া, শুয়ে থাকা বা মাঝে মাঝে ছাদে গিয়ে বসা, এ ছাড়া যেন তার জীবনের কোন উদ্দেশ্য বা কর্ম নেই।

সরোজিনী সর্বক্ষণ তার কাছাকাছি থাকে এবং যাবতীয় খবরাখবর সরোজিনী মারফৎই নবীনকুমার পায়। আর কেউ তার কানের কাছে চেঁচিয়ে কথা বললে তার ভালো লাগে না। বাবার আমলের বৃদ্ধ খাজাঞ্চি সেনমশাই বদ্ধ কালা, তাঁকে কিছু বলতে গেলে ঐ রকম ভাবে চ্যাঁচাতে হয়। ষোড়শ বর্ষীয় নবীনকুমার নিজেকে ঐ বৃদ্ধের মতন ভাবতে পারে না।

সে সরোজিনীকে একদিন ছাদে বসে বললো, তুমি সব সময় কাজের কতা বলো কেন? অন্য কোনো কতা বলতে পারো না?

সরোজিনী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, অন্য কতা? কী কতা?

নবীনকুমার বললো, অন্য কিছু ভালো কতা? তুমি গান জানো না?

সরোজিনী লজ্জায় মুখ নিচু করে। দুদিকে মস্তক আন্দোলিত করে বলে, না।

নবীনকুমার বললো, আমি তোমায় গান শিকিয়ে দিচ্চি। তুমি আমার কানে কানে গান শোনাবে। আমি কোনো কিচুই শুনতে পাই না, গানও শুনতে পাই না, এর চে আমার মরণ ভালো। তারপর সে গুন গুন করে গান ধরে।

সুধাই তোমায় সুধামুখী, ভুলেছ কি আছে মনে
মনে ভেবে দেখ দেখি কী কথা ছিল দু'জনে
আমায় মন দিবে বলে আগে আমার মন নিলে
অবশেষে এই করিলে, তুই জানিস আর তোর ধর্ম জানে।

সরোজিনী খুব মন দিয়ে শোনে। তারপর হঠাৎ সে স্বামীর কানে ওষ্ঠ চেপে ধরে গান গাইতে শুরু করে। এই গান নয়, অন্য গান, "ভালোবাসিব বলে ভালোবাসিনে⋯"।

অনেক দিন পর নবীনকুমারের মুখে হাস্য ফুটে ওঠে। সরোজিনীর সান্নিধ্যের তাপ, তার উষ্ণ ওষ্ঠ তাকে এক ধরনের অনাস্বাদিতপূর্ব মাদকতা এনে দেয়। সে সরোজিনীকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বলে, সরোজ, তুমি এত ভালো গান জানো? তুমি এত সুন্দর?

রোগীকে দেখতে আসা এবং প্রবল অসুস্থ কিংবা আচ্ছন্ন অবস্থার রোগীর সঙ্গে কথা বলে আত্মপরিচয়দানের চেষ্টা, বঙ্গবাসীরা একটি বিশেষ কর্তব্য বলে মনে করে। নবীনকুমারের ব্যাধির সংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় দলে দলে লোক আসার বিরাম নেই। ইতিমধ্যে এ কথাও ছড়িয়ে গেছে যে নবীনকুমার কানে প্রায় শুনতেই পায় না; সুতরাং দর্শনপ্রার্থীরা তার একেবারে নিকটস্থ হয়ে সগর্জনে কথা বলে। নবীনকুমার কারুর কোনো উত্তর দেয় না, বিরক্তিতে মুখ কুঞ্চিত হয়ে থাকে তার। তবু দর্শনার্থীরা নিবৃত্ত হয় না, তারা পরস্পর আলোচনা করে, কোথায় কখন আর কার কার এই প্রকার অসুখ দেখেছে। কবে কোন্ বাড়িতে এই অসুখে মৃত্যু হয়েছে কার; নবীনকুমার বড় বাঁচা বেঁচে গেছে। তবে এই কাল ব্যাধির নিয়মই এই, একটা কোনো অঙ্গ নিয়ে যায়। তবে হৃৎপিণ্ডের বদলে যে শুধু কান নিয়ে ছেড়েছে, এই তো নবীনকুমারের বড় ভাগ্য।

গণ্যমান্য ব্যক্তি বা বিশিষ্ট আত্মীয়স্বজনদের নিষেধও করা যায় না। নবীনকুমারের অপছন্দ হলেও তারা আসবেই। অপরাহ্ণেই তাদের আসবার সময়। সেইজন্য এখন সেই সময়টা নবীনকুমার ঘুমের ভান করে দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকে। দুলালচন্দ্র থাকে পাহারায়। তাকে শিখিয়ে রাখা

হয়েছে, ঘরে কেউ এলেই সে ওষ্ঠে তর্জনী ঠেকিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, চুপ, কতা কইবেন না। ছোটবাবু ঘুমুচ্চেন। কোবরেজমশাই বলেচেন, হঠাৎ ঘুম ভাঙলে খুব ক্ষতি হবে।

এর ফলে ক্রমে ক্রমে দর্শনার্থীর সংখ্যা কমতে লাগলো। রোগী দেখা নয়, রোগীর কাছে নিজেকে দেখা দেওয়াটাই বড় কথা, সেই রোগীই যদি দেখতে না পেল তা হলে আর শুধু শুধু এসে লাভ কী! এখন আর অপরাহ্নে নবীনকুমারকে মটকা মেরে শুয়ে থাকতে হয় না। অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে এখন সে কিছুটা হাঁটিতে পারে। এক একদিন ছাদেও যায়।

একদিন শেষবেলায় দিবাকর এসে নবীনকুমারের কানের কাছে মুখ এনে চিৎকার করে বললো, ছোটবাবু, নিচে সভার বাবুরা সব এয়েচেন। একবার আপনার সঙ্গে দ্যাকা কত্তে চাচ্চেন, নিয়ে আসবো ওপরে?

নবীনকুমার বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করলো, সভার বাবুরা? কোন্ সভার বাবুরা?

দিবাকর বললো, আজ্ঞে আপনার সভা?

নবীনকুমার ভুরু কুঁচকে বললো, আমার সভা? কিসের সভা?

এবার দিবাকরের বিস্মিত হবার পালা। সে বললো, আজ্ঞে, আপনি যে সভা খুলেছেলেন! ফি হপ্তায় শনিবার শনিবার বাবুরা আসেন। অনেক ভাবের কতা হয়।

নবীনকুমার দুলালচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলো, কিসের সভা বলচে রে দুলাল?

দুলালচন্দ্র বললো, আজ্ঞে ঐ আপনার বিদ্যোৎসাহিনী সভা।

দিবাকর বললো, আপনি একদিন জ্বর বিকারের ঘোরে বলেছেলেন যে আপনি না যেতে পাল্লেও সভার কাজ যেন বন্ধ না থাকে। আপনি মলেও সভার কাজ চলবে। তাই আমি সব বাবুদের খপর দিয়ে আনিয়েচি। আজ শনিবার তো। এয়েচেন আজ দশ-বারো জনা।

দেখা গেল, বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পর্কে যেন নবীনকুমারের আর কোনো আগ্রহই নেই। অথচ তার অসুখের আগের দিন পর্যন্তও এই সভাই ছিল তার ধ্যান জ্ঞান। সভার বিবরণী লেখা, আগামী সভার জন্য কার্যসূচী নিরূপণ করা, সভার পক্ষ থেকে ইদানীং যে পত্রিকা বেরুচ্চে তার জন্য রচনা এবং গ্রাহকদের পত্রের উত্তর দেওয়া। এই নিয়েই সময় অতিবাহিত করতো সে।

নবীনকুমার নীরস কণ্ঠে বললো, অত চেঁচিয়ে কতা বলো না, দিবাকর। তোমরা কি আমার কানের পর্দাটাও ফাটিয়ে দিতে চাও?

দিবাকর জিজ্ঞেস করলো, বাবুদের ওপরে আনবো না?

—না!

দিবাকর আর দুলালচন্দ্র পরস্পর বিহ্বল দৃষ্টি বদল করলো। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পর্কে তাদের ছোটবাবুর হঠাৎ এই নিরাসক্তি যেন তারা বিশ্বাসই করতে পারছে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিবাকর নিষ্ক্রান্ত হলো ঘর থেকে।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আর একটি ঘটনা ঘটলো।

আহারাদি সমাপ্ত করে নবীনকুমার নিজের পালঙ্কে শুয়ে আছে। দিবানিদ্রা দূর করার জন্য এই সময় সে গ্রন্থ পাঠ করে। সংস্কৃত কাব্য মুখে মুখে অনুবাদ করে সে সরোজিনীকে শোনায়। সরোজিনী এখনো অন্দরমহল থেকে আসেনি। নবীনকুমার ঘন ঘন দ্বারের দিকে তাকাচ্ছে।

এক সময় সরোজিনী এসে পাঠমগ্ন নবীনকুমারের কানে কানে বললো, দেকুন, দেকুন, কে এয়েচে!

নবনীকুমার মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কে?

সে দেখতে পেল, দ্বারের কাছে মাথায় ঘোমটা দেওয়া এক কিশোরী দণ্ডায়মান। এক গলা ঘোমটা, মুখ দেখা যায় না।

নবীনকুমার আবার জিজ্ঞেস করলো, কে?

সরোজিনী বললো, অ কুসোমদিদি, কাচে এসো না। আহা হা, তোমার আবার এত লজ্জা কিসের? চেনো না ম্যানো!

কিশোরীটি সে রকম ব্রীড়াবনতামুখী হয়েই দাঁড়িয়ে রইলো।

সরোজিনী নবীনকুমারকে ছেড়ে সেখানে গিয়ে নিজেই কিশোরীটির মুখ থেকে অবগুণ্ঠন সরিয়ে দিয়ে বললো, এই দেকুন, আমার দিদির মিতেনী, আমাদের কুসোমদিদি। মনে নেই, সেই যে আপনাকে একদিন শাড়ী পরা নিয়ে ক্ষেপিয়েছেল?

কুসুমকুমারী তার নীল চক্ষুমণি দুটি নবীনকুমারের মুখের দিকে স্থির রেখে ঝরনা-লহরীর মতন

সুমিষ্ট স্বরে বললো, কেমন আচেন মিতেনীর বর ? আপনার অসুখ শুনে আপনাকে দেকতে এলুম।

সরোজিনী তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, অ কুসোমদিদি, উনি কানে ভালো শুনতে পাচ্চেন না, কাচে গিয়ে জোরে চেঁচিয়ে বলতে হবে। ডাক্তার-কোবরেজরা বলেচেন অবশ্য আর কটা দিন পেরুলেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে, আবার আগেকার চেয়ে বেশী কানে শুনতে পাবেন···তোমার কতাগুলোন আমি বরং ওঁর কানে কানে বলে দিচ্চি !

হাত ধরে ধরে সে কুসুমকুমারীকে নিয়ে এলো পালঙ্কের কাছে।

নবীনকুমার ধীর স্বরে বললো, এ মেয়েটি কে, চিনতে পারলুম না তো !

সরোজিনী বললো, আহা-হা, মস্করা হচ্চে, কুসোমদিদিকে চিনতে পারচেন না ? সেই যে, আপনাদের থ্যাটারের আগের দিন এয়েছেল। আপনি ওর কাচ ঠেঙে শাড়ী পরে হাঁটার ধরন শিকতে চাইলেন···

নবীনকুমার কুসুমকুমারীর নীল চক্ষু দুটি দেখতে লাগলো। তারপর আপনমনেই বললো, কই, এ মুখ আগে দেকেচি বলে মনে তো পড়ে না।

কুসুমকুমারীও নবীনকুমারকে দেখছে একদৃষ্টে। নবীনকুমারকে চিনতে তারও যেন কষ্ট হচ্ছে খুব। তার সখী কৃষ্ণভামিনীর স্বামী নবীনকুমারকে সে প্রায় দেখেছিল অতিশয় প্রাণবন্ত, অতিশয় চঞ্চল এক কিশোর, চক্ষু দুটি অত্যুজ্জ্বল। পরে সরোজিনীর স্বামী হিসেবেও তাকে প্রায় একই রকম দেখেছিল। কিন্তু এ কোন্ নবীনকুমারকে এখন দেখছে সে ! শরীরই শুধু কৃশ নয়, চক্ষু দুটি নিষ্প্রভ। মুখে পাণ্ডুর ছায়া, কণ্ঠস্বর নিষ্প্রাণ।

কুসুমকুমারী বললো, আমার নাম বনজ্যোৎস্না, মনে পড়ে না ?

সরোজিনী স্বামীর কানে সেই বার্তা প্রেরণ করবার জন্য ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে বললো, কুসোমদিদি বলচে, ওর আর একটা নাম বনজ্যোছ্‌ছনা ! এবার চিনতে পেরেচেন ?

নবীনকুমার দুদিকে মস্তক আন্দোলিত করলো।

জলে ভরে গেল কুসুমকুমারীর চক্ষু, নীল মণিদুটি আর দেখা গেল না। একবার বুঝি তার ওষ্ঠাধর সামান্য একটু কাঁপলো, তারপরই সে পিছন ফিরে দৌড় লাগালো, মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তার শাড়ীর আঁচল।

সরোজিনীও চলে গেল কুসুমকুমারীর পিছু পিছু। নবীনকুমার আবার পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করলো।

সরোজিনী ফিরে এলো বেশ খানিকক্ষণ পর। আফসোসের সুরে বললো, এহ্, ছি, ছি, আপনি এমনধারা ব্যাভার করলেন কুসোমদিদির সঙ্গে ? কত কাঁদলো ! নিজে থেকে এয়েছেল আপনাকে দেকতে।

নবীনকুমার কথাগুলি ভালো শুনতেও পেল না, ভ্রূক্ষেপও করলো না।

সরোজিনী স্বামীর কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে কর্ণকুহরে বললো, আপনি সত্যি করে বলুন তো, কুসোমদিদিকে সত্যি চিনতে পারেননি ?

নবীনকুমার বললো, না। মেয়েটি কে ? কাদের বাড়ির যেন বউ মনে হলো। মেয়েটি একলা এয়েচে ? ওর স্বামী আসেনি ?

—ওর স্বামী যে ঘোর পাগল ! আপনি একবার গেস্‌লেন ওদের বাড়িতে।

—আমি গেস্‌লাম কবে ?

—আপনার সত্যি মনে নেই !

নবীনকুমারের মুখমণ্ডলে এবার একটু ব্যথার ছাপ পড়লো। সে অস্থিরভাবে বললো, আমার মনে পড়চে না তো আমি কী করবো বলতে পারো ? আমি কী মিচে কতা বলচি ?

সরোজিনী ভয় পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ।

আরও কয়েকটি ঘটনার পর সকলেই বুঝতে পারলো যে এই কঠিন ব্যাধিতে নবীনকুমারের শ্রবণশক্তিই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, তার স্মৃতিশক্তিও অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে। অনেক কিছুই তার মনে পড়ে না, অনেক মানুষকেই সে আর চিনতে পারে না। বিদ্যোৎসাহিনী সভার কথা তার মনে নেই। যে বিধবা বিবাহের ব্যাপার নিয়ে সে এত মত্ত হয়েছিল, এখন সে ঐ প্রসঙ্গ একবারও উচ্চারণ করে না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামও বোধহয় তার স্মরণে নেই।

আবার অনেক চিকিৎসক বদ্যি ডেকে আনা হলো। যথারীতি, সকলেরই ভিন্নমত। তবে, সবচেয়ে

বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য মতামত মনে হলো এই যে, কোনো ঔষধ প্রয়োগে স্মৃতিশক্তি বা শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে আনা যাবে না। কিছু সময় দিলে স্বাভাবিকভাবেই ওগুলি আবার ফিরে আসতে পারে। নবীনকুমারের বয়েস কম, তার জীবনীশক্তিতেই সে পুনরায় পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠবে। এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বাস্থ্যোদ্ধার। এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের শ্রেষ্ঠ উপায় বায়ু পরিবর্তন।

বিম্ববতী তাঁর পুত্রকে কিছুতেই চোখের আড়াল করতে চান না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিধুশেখরও উপদেশ দিলেন, কিছুদিনের জন্য নবীনকুমারকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

কোথায় পাঠানো হবে, তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা করা হলো কয়েকদিন। কেউ বললো, বর্ধমান, ওদিককার জল হাওয়া ভালো, ওদিকে সচরাচর ওলাওঠা হয় না। কেউ বললো, কৃষ্ণনগর, অনেকেই সেখানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য যায়। বারানসীর নামও উঠলো। মহাদেবের ত্রিশূলাগ্রে অবস্থিত ঐ বারানসী ধাম, সেখানকার তো তুলনাই হয় না। কিন্তু বারানসী বড় দূরের পথ, অতখানি ঝুঁকি নেওয়া যায় না।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, কোনো বিশেষ স্থলে নয়, নবীনকুমারকে ভ্রমণ করানো হবে নদীপথে। শীতকাল সমাসন্ন, এসময় নদীর বাতাস অতিশয় তেজ-বর্ধক। নদীর সজীব মৎস্য আর দু'তীরের গ্রামাঞ্চলের টাট্‌কা তরিতরকারি পরিপাকের পক্ষে অতি উত্তম।

এলাহী বন্দোবস্ত হলো নবীনকুমারের নদী ভ্রমণের। তিনখানি বজরা ও চারখানি পানসী নিয়ে একটি বহর। দাস-দাসী-পাচক-লাঠিয়াল এবং বন্দুকধারী সেপাই-এর দলবল ছাড়াও সঙ্গে নেওয়া হলো একজন কবিরাজ ও একজন অ্যালোপাথ। দিবাকর দুলালচন্দ্রের মতন বিশ্বস্ত কর্মচারীরাও রইলো। আর নেওয়া হলো সরোজিনীকে। এখন সরোজিনী শুধু নবীনকুমারের স্ত্রী এবং সঙ্গিনীই নয়, বার্তাবাহকও বটে।

নদীপথে পথেই পরিভ্রমণ করা হবে, তবে যদি কখনো জলযাত্রায় ক্লান্তি বোধ হয় তাহলে একটি বিশ্রামের স্থলও নির্দিষ্ট রইলো। কুষ্টিয়ার দিকে সিংহ পরিবারের একটি জমিদারি আছে, সেখানে আছে একটি অতি মনোহর কুঠিবাড়ি। আগে থেকেই স্থলপথে লোক পাঠিয়ে দেওয়া হলো সেখানে, কুঠিবাড়িটি সাজিয়ে গুছিয়ে প্রস্তুত করে রাখবে।

শুভদিন দেখে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে নিমতলার ঘাট থেকে গঙ্গাবক্ষে শুরু হলো যাত্রা। তখন কেল্লা থেকে মধ্যাহ্নের তোপ দাগা হচ্ছে। যেন নবীনকুমারের সম্মানেই শোনানো হলো সেই তোপধ্বনি।

দু-তিনদিন নবীনকুমার বেশ উৎফুল্ল হয়ে রইলো। শহর ছেড়ে এই প্রথম তার অন্য কোথাও যাত্রা। কাব্য-সাহিত্যের মধ্য থেকে সে বহু স্থানের বর্ণনা পাঠ করেছে। তার দেখতে ইচ্ছে করে সেই সব দেশ। সে সমুদ্র দর্শন করেনি, পাহাড় দেখেনি, অথচ মনশ্চক্ষে সে সমুদ্র ও পাহাড় দেখতে পায়। এবার সে স্বচক্ষে সব দেখবে।

কিন্তু দু-তিনদিন পরই আবার তার সব উৎসাহ চলে গেল। সে মলিন, বিষণ্ণ মুখে বোটের জানলা দিয়ে নদীর সৈকতের দিকে চেয়ে থাকে। সরোজিনী এসে ডাকলেও সে সাড়া দেয় না। সরোজিনী জোর করে কথা বলবার জন্য তার হাত ধরে টানাটানি করে, তবু সে নির্বাক।

গৃহের বাইরে এসে, বিশাল প্রকৃতির মধ্যে আশ্রয় নিয়ে নবীনকুমারের আরও মন খারাপ হয়ে গেছে। প্রকৃতির সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে না। সে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু শুনতে পায় না জল-কল্লোল। আকাশ দিয়ে কত রকম পাখি উড়ে যায়, বজরার কাছে অনেক পাখি এসে বসে। কিন্তু সে কোনো পাখির ডাক শুনতে পায় না। সে দেখতে পায় মাঝি-মাল্লারা দাঁড়-বৈঠা চালাবার সময় মুখ ঠোঁট নাড়ছে, নিশ্চয়ই ওরা গাইছে কোনো গান কিংবা সমবেত স্বরে দিচ্ছে জোকার। কিন্তু নবীনকুমার শুধু দেখে, শুনতে পায় না কিছু। কোনো গঞ্জের সামনে এসে যখন বজরা থামে, তখন ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে ফেরিওয়ালারা আসে, তারা নবীনকুমারের গবাক্ষের কাছে ডিঙ্গি ভিড়িয়ে হাতমুখ নেড়ে অনেক কিছু বলে, নবীনকুমারের কিছুই বোধগম্য হয় না। সে বিরক্ত হয়ে শয্যায় শুয়ে পড়ে চিৎপাত হয়ে।

স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে বলে নবীনকুমারের কৌতূহলও কমে গেছে। বরং সরোজিনীই মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, ওটা কোন গাছ, এটা কী পাখি, এখানে জলের রঙ দু রকম কেন ? নবীনকুমার সংক্ষেপে উত্তর দেয়, জানি না।

স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য সরোজিনী প্রায়ই তার কানে ওষ্ঠ ঠেকিয়ে গান শোনায়। তার গলাটি বেশ সুরেলা। উড়িষ্যাবাসী গোপালের যাত্রাগান তার বাপের বাড়িতে প্রায়ই হতো। তাই শুনে শুনে সে

কয়েকটি গান তুলেছে। কিন্তু নবীনকুমারের এখন আর গানও ভালো লাগে না। এমনকি সরোজিনীর স্পর্শেও রোমাঞ্চ বোধ করে না সে। সে শব্দবঞ্চিত বলে যেন সব কিছু থেকেই বঞ্চিত।

এইভাবে মাসাধিককাল কেটে যাবার পর অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলো। এই পৃথিবী যেন আবার শব্দময় হয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠলো তার সামনে। খুবই আস্তে আস্তে অবশ্য। নবীনকুমার অনুভব করলো, সমস্ত রকম শব্দ মিলিয়ে এই বিশ্ব-ভুবনে একটি ব্যঞ্জনা আছে। আগে যখন তার স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি ছিল তখন এ সব চিন্তা তার মস্তিষ্কেই আসেনি। এখন সে টের পেল সব রকম ধ্বনির সমন্বয়ে একটি বিশেষ ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তার মধ্যেই যেন ফুটে ওঠে পরিপূর্ণ জীবনের স্পন্দন।

কোনো অলৌকিক উপায়ে নবীনকুমার একদিনেই শ্রবণ-ক্ষমতা ফিরে পায়নি। একদিন সে চকিতে বুঝলো, মাঝি-মাল্লাদের মুখ নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার শব্দও বেরুচ্ছে, সে শব্দের মর্ম সে বুঝতে পারছে না। কিন্তু শব্দগুলি যেন দুলতে দুলতে ভেসে আসছে তার কানে। আর একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে সে যেন শুনতে পেল এক অনৈসর্গিক সঙ্গীত। এ সঙ্গীত নদীর নিজস্ব। ছলাৎ ছল কল কল তার তান। এতদিন সে এ সঙ্গীত শোনেনি। সে এতই মুগ্ধ হয়ে গেল যে সে তৎক্ষণাৎ উঠে বসলো। সারারাত না ঘুমিয়ে সে শুনলো সেই জলস্বর।

নানান নদীপথ ঘুরে এখন তাদের বজরার বহর চলেছে পদ্মার ওপর দিয়ে। নবীনকুমারের কাছাকাছি এসে কেউ একটু উচ্চ কণ্ঠে কথা বললেই সে সব বুঝতে পারে। সে তৃষ্ণার্তের মতন বোটের ছাদে দাঁড়িয়ে থাকে সব রকম শব্দ শুনবে বলে।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মাথায় পৌষ মাসের হিম পড়ছে বলে নবীনকুমার এক সময় বোটের ছাদ থেকে নেমে এলো নিজের কামরায়। সে দেখলো, একটি গবাক্ষের কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে সরোজিনী গুনগুনিয়ে গাইছে, "আমি যে লাজে মরি, মনের কতা কইতে পারি নে, কত লোকে কত কতা বলে, আমি যে সইতে পারি নে।"

নবীনকুমারের সর্বাঙ্গ অকস্মাৎ শিহরিত হলো। সাদা রেশমী শাড়ি পড়েছে সরোজিনী। পিঠের ওপর চুল ছড়ানো। সে অন্য দিকে চেয়ে আছে, তবু তার গানের মর্ম বুঝতে পারছে নবীনকুমার। সে যেন এই প্রথম সরোজিনীর গান শুনলো। কানে কানে গান একদিন দুদিনই ভলো লাগে, তারপর বিরক্তি বোধ হয়। এই তো প্রকৃত গান, যা আনমনা, এ যেন সরোজিনীরই মনের ভাবোচ্ছ্বাস সুর হয়ে বেরিয়ে আসছে।

নবীনকুমার এগিয়ে গিয়ে সরোজিনীর পিঠে হাত দিয়ে বললো, সরোজ, তুমি বড় সুন্দর, মনে হলো যেন তোমায় আমি আগে কখনো দেকিনি।

সরোজিনী মুখ ফিরিয়ে তাকালো। তার দুই চক্ষু জলে ভরে উঠলো।

নবীনকুমার বললো, এ কি সরোজ, তুমি কাঁদছো?

সরোজিনী বললো, আমার ভয় করে।

—তোমার কিসের ভয়?

—এই যে আপনি মাঝে মাঝে অমন কতা বলেন। আমার ভয় করবে না? আপনি অনেক কতা ভুলে যান। আপনি অনেককে চিনতে পারেন না। আমার মনে হয়, আপনি একদিন আমাকেও চিনতে পারবেন না।

—দূর পাগল! তা হয় নাকি? তোমায় চিনতে পারবো না? যাঃ!

—তবে যে আপনি ঐ কতাটা বললেন?

—কী বললাম?

—আমায় আগে কখুনো দ্যাকেননি?

—আরে ও তো অন্যভাবে বলিচি, আগে দেকিনি মানে এমনভাবে দেকিনি। আজ যেন তোমায় নতুন করে এত সুন্দর দেকচি!

সরোজিনী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বললো, সত্যি সত্যি সত্যি তিন সত্যি করুন যে আমায় কখুনো ভুলে যাবেন না?

নবীনকুমার হাসতে হাসতে সরোজিনীকে বক্ষে টেনে নিল।

সেই রাত্রে ষোড়শ-উত্তীর্ণ সম্প্রতি সপ্তদশবর্ষীয় নবনীকুমার তার দ্বাদশবর্ষীয়া সদ্য ঋতুমতী পত্নীকে সর্বাংশে গ্রহণ করলো।

পরদিন প্রভাতে নবীনকুমার বললো, সরোজ, শেষ রাতে আমি একটা ভারি আশ্চর্য মিঠে স্বপ্ন দেকিচি। সেই স্বপ্নের রেশ এখুনো মনে লেগে আচে। সরোজ, জীবন কত সুন্দর!

নবীনকুমার যেন এই পৃথিবীকে আবার নতুন ভাবে ফিরে পেয়েছে। বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত এখন তার কাছে রোমাঞ্চকর মনে হয়। শীত শেষ হয়ে গেছে, বাতাস এখন বড় মনোরম।

বজরার ছাদে দাঁড়িয়ে সে সকালের রেশমী রৌদ্রের স্পর্শে যেন শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে সুখানুভব করে। একটি টিট্টিভ পক্ষী মাথার ওপর দিয়ে টি-টি-টি-টি করে ডেকে চলে যায়, অনেকক্ষণ ধরে বাজতে থাকে সেই শব্দের রেশ। আকাশে শুভ্রবর্ণ থোকা থোকা মেঘ, মাঝে মাঝে সেই মেঘের নিচ দিয়ে দলবদ্ধ হাঁসের ঝাঁক শান্তভাবে কোনাকুনি উড়ে যায় দিগন্তের দিকে। পদ্মার চরে মধ্যে মধ্যেই দেখা যায় নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছে একটি দুটি কুমীর, প্রাণের কোনো চিহ্ন আছে বলেই মনে হয় না, কিন্তু বজরা নিকটবর্তী হলেই তারা সড়াৎ করে নেমে পড়ে জলে।

কুমীর দেখলেই নবীনকুমার তারস্বরে ডাকে, সরোজ, দেকে যাও, দেকে যাও। ছুটে এসো—

সরোজিনী আসবার আগেই কুমীরগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। সরোজিনী অবিশ্বাস করে। সে জীবনে কখনো কুমীর দেখেনি। কুমীর যে ডাঙ্গায় উঠে বসে থাকে, একথা সে কিছুতেই সত্য বলে মানতে চায় না। নবীনকুমার বলে, তুমি তাকিয়ে থাকো, আবার দেকতে পাবে! কিন্তু সরোজিনীর ভাগ্যে কুম্ভীর-দর্শন ঘটে না। সে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়। তারপর হঠাৎ এক সময়ে সে সবিস্ময়ে বলে ওঠে, ওমা, ওটা কী গো, ওটা কী?

ভয়ে সে নবীনকুমারের হাত চেপে ধরে।

বস্তুটি নবীনকুমারও দেখেছে কিন্তু সেটি যে কী, তা সে জানে না।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার জলের ওপর ভুস্ করে জেগে উঠেই একটি বেশ বড়সড় প্রাণী আবার ডুবে গেল। সেটা যে কোনো মৎস্য নয়, তা অবশ্যই বোঝা যায়।

নবীনকুমার মাল্লাদের ডেকে জিজ্ঞেস করে। তারা জানায় ঐ প্রাণীটির নাম শুশুক। নবীনকুমার তাও প্রথমে বুঝতে পারে না। তারপর মনে পড়ে। তখন সে বালকের মতন আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, জানি জানি, শুশুক, শিশুমার। বইতে পড়িচি, সরোজ, তুমি পড়োনি তো, তাই জানো না। শুশুক আর শিশুমার একই!

সরোজিনী বললো, বাবাঃ, যেমুন বিদঘুটে দেকতে, তেমুন বিতিকিচ্ছিরি নাম! শিশুমার···ছোট ছেলেপুলে ধরে ধরে বুঝি খেয়ে ফ্যালে?

নবীনকুমার তার বিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এবার গম্ভীরভাবে বললো, না গো, নামই ঐ রকম, বইতে ওদের নামে ছড়া আচে!

ঐ দ্যাকো জলকপি শান্ত শিশুমার
হাঙ্গর কুম্ভীরসম নাই দন্তে ধার!

নবীনকুমারকে খুশী করবার জন্যই যেন পরপর আরও কয়েকটি শুশুক নদীর জলে ডিগবাজির কসরৎ দেখায়।

ক্রমে পদ্মা নদী ছেড়ে বজরা একটি ছোট নদীতে প্রবেশ করলো। সামনের কোনো গঞ্জ থেকে তরিতরকারি ও ডাল ক্রয় করতে হবে।

এ নদীর পরিসর ছোট হওয়ায় দু পারের গাছপালা স্পষ্ট দেখা যায়। বসন্ত ঋতুর আগমনে অনেক বৃক্ষে নতুন পাতা গজাচ্ছে। নবীনকুমার মুগ্ধ ভাবে তাকিয়ে দেখে যে বিভিন্ন গাছের পাতার সবুজ

রঙও কত ভিন্ন ভিন্ন ' কলাগাছের নতুন পাতা লাঠির মতন সোজা হয়ে গোটানো থাকে। এই সব কিছুই নবীনকুমারের কাছে অভিনব। জলের পাশে একপদী বক দেখে তার মনে পড়ে মহাভারতের ধর্ম বকের কথা. যে যুধিষ্ঠিরকে নানা প্রকার কূট প্রশ্ন করেছিল। গ্রন্থের পৃষ্ঠায় বর্ণিত দৃশ্য যেন অকস্মাৎ উঠে আসছে তার চোখের সামনে।

মাঝে মাঝে দেখা যায়, গোবর দিয়ে নিকোনো ঝকঝকে মাটির কুটীর। ছোট ছোট ছেলেরা বজরা দেখে দৌড়ে এসে হাত তুলে চিৎকার করে। দূর থেকে কে যেন ডেকে ওঠে, আমিনা, অ আমিনা, ইদিকে আয় পোড়ারমুহী··· । নবীনকুমারের মনে হয়, এ কণ্ঠস্বর যেন তার কত চেনা। বহু যুগ আগে, ঠিক এইখানে নদীতীরে এইরকম ভাবে সে আমিনা ডাক শুনেছিল। পরমুহূর্তেই তার শরীর একটি চিন্তায় কেঁপে ওঠে। যদি তার শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়েই থাকতো, তা হলে বঞ্চিত হতো এই সব আনন্দ থেকে। না, সেরকম ভাবে বেঁচে থাকা অনর্থক, তা হলে সে নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হতো।

আবার এক সময় সে ভাবে, তার এই মারাত্মক ব্যাধিটি এক হিসেবে তার মঙ্গলসাধনই করেছে। ব্যাধি হয়েছিল বলেই তো তার জননী তাকে নদীপথে ভ্রমণে পাঠিয়েছেন। নইলে তো এসব কিছুই এখন দেখা হতো না। এবার থেকে সে প্রতি বৎসর একবার নদী ভ্রমণে আসবে।

একটা রঙীন পাখি ঝুপ করে জলে পড়ে যেতেই নবীনকুমারই চেঁচিয়ে উঠলো, ওমা, সরোজ দ্যাকো, দ্যাকো, একটা পাখি জলে ডুবে গেল। মরে গেল আপনা আপনি !

মাঝি মাল্লারা হেসে ওঠে তার কথা শুনে। একজন বলে, আজ্ঞে না, কত্তাবাবু। ও পাখি বড় শেয়ানা, ওগুলোনরে কয় মাছরাঙা পাখি, জল থেকে কুচো মাছ ধইরে খায়।

নবীনকুমারের আবার বিস্ময় লাগে। আকাশের পাখি জলেও ডুব দিতে পারে ! সত্যিই তো পাখিটা একটা ছোট চাঁদা মাছ ঠোঁটে নিয়ে আবার উড়ে যায়। সে নির্নিমেষে প্যাখিটার দিকে চেয়ে থেকে বলে, সরোজ, কী সুন্দর না ?

সরোজিনী বলে, হ্যাঁ। আপনি ওপরে থাকবেন ? আমি এখন নাইতে চল্লুম।

—সরোজ, একদিন নদীতে নাইবে ? তোমাতে আমাতে।

—মাগো মা, নদীতে নাইবো কি ! এত জল দেকলেই আমার ভয় করে।

—জল দেকলে তোমার ভয় হয় ? কই এতদিন বলোনি তো ?

—বজরার ওপরে ভয় নেই। কিন্তু জলে নামতে পারবো না।

—আমি নদীতে নামবো। আমি সাঁতার শিকবো।

পরমুহূর্তেই সে হাঁক দেয়, দুলাল, দুলাল।

বজরা কিনারে ভিড়ছে, দুলাল আর দিবাকর গঞ্জের হাটে নামবার জন্য গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে। ডাক শুনে দুলাল ওপরে উঠে এলো।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, দুলাল, তুই সাঁতার জানিস ?

দুলাল তো বাল্যকাল থেকেই নবীনকুমারের সঙ্গে সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকে, সে আর সাঁতার শিক্ষার সুযোগ পেল কোথায়। সে উত্তর দিল, আজ্ঞে না।

নবীনকুমার বিরক্ত হয়ে বললো, কেন শিকিসনি ? তুই একটা উল্লুক।

—আজ্ঞে।

—আমি নদীতে নাইবো, তুই আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবি। সাঁতার জানিস না, আমি যদি ভেসে যাই, তুই আমায় বাঁচাবি কী করে ?

—আপনি নদীতে নামবেন ? সে হবে না। কত্তামা পই পই করে নিষেধ করে দিয়েচেন, আপনাকে যেন কিছুতেই জলে নামতে না দেওয়া হয়।

—সে কতা পরে। তুই সাঁতার শিকিসনি কেন ? আজ থেকেই সাঁতার শিকতে লেগে যা—

—আজ্ঞে দিবাকরদাদাও জলে নামতে বারণ করেচেন।

—তুই কার হুকুমে চলিস, আমার না দিবাকরের ? কী বলিচি, মাতায় ঢুকেচে ? আজ থেকে সাঁতার শিকতে লেগে যাবি।

—আজ্ঞে।

কিয়ৎকাল পরে নবীনকুমার বোটের ছাদ থেকে নেমে আসে নিজের কামরায়। এখন তার গ্রন্থপাঠের সময়। নানাপ্রকার চাপল্য দেখালেও নবীনকুমার তার সমবয়সী যুবকদের তুলনায় অনেক বেশী পড়াশুনা করেছে। পাঠ তার নেশা। সে বই পড়ে পালঙ্কে শুয়ে, উপুড় হয়ে।

স্নান সেরে ধৌত বস্ত্র পরে সরোজিনী এলো সে কামরায়। শুষ্ক গামছা দিয়ে সে মাথার ভিজে চুল ঝাপড় দিতে লাগলো, তাতেও নবীনকুমরের পাঠের মনোযোগ ভঙ্গ হলো না। তারপর সরোজিনী আরশির সামনে দাঁড়িয়ে সিঁথিতে সিন্দুর লাগাতে লাগাতে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কাল কী স্বপ্ন দেকেচেন, আমায় বললেন না ?

গ্রন্থ সরিয়ে রেখে নবীনকুমার সরোজিনীর সদ্য সিক্ত প্রফুল্ল মুখখানি দেখে মুগ্ধ হলো। বাইরের প্রকৃতির মতন সে এই কিশোরীটিকেও যেন নতুনভাবে আবিষ্কার করছে।

উঠে বসে সে বললো, সরোজ, কাল স্বপ্নে দেকলুম, আমি যেন স্বর্গে চলে গেচি !

সরোজিনী তৎক্ষণাৎ রাগত ভ্রূভঙ্গী করে বললো, ছিঃ, আবার ঐ কতা ?

নবীনকুমার বিস্মিত হয়ে বললো, কেন, কী হলো ? স্বর্গে যাওয়া দোষের ?

—আপনি বলেচিলেন না, আর কক্ষুনো মরার কতা উচ্চারণ করবেন না !

—ওঃ হো। সেই কতা। না, না, মরার কতা বলিনি। এ হলো গে সশরীরে স্বর্গে যাওয়া। যেমন যুধিষ্ঠির গিস্‌লেন, না, না, যুধিষ্ঠিরের মতন বুড়ো বয়েসে নয়, পুরুরবার মতন, তুমি মহারাজ পুরুরবার উপাখ্যান জানো ? মহাভারতে আচে !

—না, জানি না।

—আমি তোমায় পড়ে শোনাবো। স্বপ্নে দেকলুম, মহারাজ পুরুরবার মতন আমিও স্বর্গে গেচি, দেবসভায় আমার বসবার জায়গা দেওয়া হয়েচে খাতির করে আর সেখেনে উর্বশী নাচচেন, তারপর হঠাৎ বুকের মধ্যে ধড়াস্ করে উঠলো। দেকলুম কী জানো, উর্বশীর মুখখানা এক্কেবারে অবিকল তোমার মতন।

—যাঃ ! সব মিচে কতা।

—মোটেই মিচে কতা নয়। মা কালীর দিব্যি। সত্যি দেকলুম। তুমি আমার পানে চেয়ে হাসলে।

—বুঝিচি, আপনি আমায় নিয়ে রঙ্গ কচ্চেন।

—তুমি বিশ্বাস করলে না, সরোজ ? একদম হুবহু মিলে গেল···কালিদাসের নাটক আচে, বিক্রমোর্বশী, ঠিক এই রকম। তুমি এসো, আমার পাশে বসো, আমি তোমায় নাটকটা পড়ে শোনাচ্চি।

—এখুন শুনতে পারবো না। ও-বেলা। এখুন আমার কাজ রয়েচে না ?

—এখন আবার কী কাজ ?

—নেয়ে এলুম, এখুন পুজোয় বসবো।

—পুজো-টুজো রাকো। শুনেই দ্যাকো না, কী সুন্দর গল্প, কেমন দিব্য কবিতার ভাষা।

—পুজো ছেড়ে আমি গল্প শুনতে বসবো ? শোনো কতা ! আমার মা বলে দিয়েচেন, প্রত্যেকদিন যেন মন দিয়ে শিব পুজো করি। আমাদের বংশের ধারা।

—কায়েতের মেয়ের আবার অত পুজো বাতিক কেন ? শিবের মতন বরই তো পেয়েচো, আবার শিব পুজো করার কী দরকার।

—ঠাকুর দেবতা নিয়ে অমন ধারা কতা বলবেন নাকো !

নবীনকুমার দ্রুত পালঙ্ক থেকে নেমে এসে সরোজিনীকে আলিঙ্গন করে বললো, চেয়ে দ্যাকো, আমি তোমার জ্যান্ত শিব নয় ?

সরোজিনী আর্তকণ্ঠে বললো, ওমা, এ কী করলেন, ছুঁয়ে দিলেন ! আমায় আবার নাইতে হবে। পুজো করার আগে কাক্কেও ছুঁতে নেই।

নবীনকুমার পত্নীর গণ্ডে ওষ্ঠ স্থাপন করে ফিসফিস করে বললো, আবার নেয়ো বরং। এখন একটুখানি আমার পাশে বসো। সরোজ, মানুষ পুজো করে কেন ? ভগবানকে পাওয়ার জন্য তো। কাব্য পাঠ করলেও ভগবানকে পাওয়া যায়।

সরোজিনী ছটফটিয়ে বললো, আমায় ছেড়ে দিন।

নবীনকুমার বললো, তুমি বিশ্বাস করলে না ! আমাদের শাস্তরেই বলেচে, কাব্যের স্বাদ হলো ব্রহ্ম স্বাদ সহোদর। অর্থাৎ ব্রহ্মের সমান সমান। এসো, আমার পাশে একটু বসবে এসো।

সরোজিনী প্রায় ক্রন্দনের উপক্রম করে বললো, পুজোর নাম করে পুজোয় না বসলে পাপ হয়। আপনার মঙ্গলের জন্যই তো পুজো করি। আবার নেয়ে পুজো সেরে আসি, তারপর আপনার কতা শুনবো।

নবীনকুমার তাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, বেশ, যাও। কিন্তু ছেড়ে দিচ্চি এক শর্তে। এর পর থেকে

আর আমায় আপনি বলবে না, তুমি বলবে।

সরোজিনী চক্ষু প্রায় কপালে তুলে বললো, ও মা, সে কি অসম্ভব কতা! মেয়েমানুষ কখুনো স্বামীকে তুমি বলে? স্বামী গুরুজন না?

—ছাই গুরুজন। চাকর-বাকররা সব আপনি বলে, আর তুমিও আপনি বলবে! আজ থেকে হুকুম দিলুম, লোকজনের সামনে না বলো, আমার কাচে যখন একলা থাকবে, তখন শুধু তুমি করে বলবে।

—আমার পাপ হবে না?

—সব পাপ আমার। আমি তোমার শিবের মতন স্বামী, সব পাপ আমি খেয়ে ফেলতে পারি!

সরোজিনী স্নান করতে চলে যাবার পর নবীনকুমার একলাই কালিদাসের নাটকটি খুলে বসলো। কিছুক্ষণ পড়ার পর তার আবার কী খেয়াল হলো, বইটি সমেতই সে উঠে চলে গেল পাশের কামরায়।

সেখানে একটি টেবিলের ওপর দোয়াতদানি ও শকুনির পালকের কলম রাখা আছে। এবং একটি লাল রঙের খেরোর খাতা। দিবাকররা সেই খেরোর খাতায় হিসেবপত্র লেখে। নবীনকুমার একটি টুল টেনে নিয়ে বসে খাতাটি খুলে সাদা পৃষ্ঠা বার করলো। তারপর কালিতে কলম ডুবিয়ে মুক্তাক্ষরে লিখলো: বিক্রমোর্বশী। মহাকবি কালিদাস বিরচিত। শ্রীনবীনকুমার সিংহ কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।

তারপর সে লিখতে লাগলো চরিত্রলিপি। মনে মনে তখনই সঙ্কল্প করে নিল যে ফিরে গিয়ে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে এই নাটকের অভিনয় করাবে সে। সে স্বয়ং নেবে পুরুরবার ভূমিকা।

এর পর থেকে চার দিন নবীনকুমারের আর অন্য কোনো বিষয়ে হুঁশ রইলো না। সে একটানা লিখে যেতে লাগলো নাটক। এদিকে দুলালচন্দ্র প্রতিদিন নদীতে নেমে জল দাপিয়ে প্রাণান্তকর পরিশ্রমে শিখতে লাগলো সাঁতার, কিন্তু নবীনকুমারের আর সেদিকে একটুও মন নেই। সরোজিনী মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে দেখে, তখনও তার স্বামী জাহাজী লণ্ঠন জ্বেলে লিখে চলেছে। রাত্রে নোঙর-করা বজরা ঢেউতে দুলছে সামান্য। শোনা যায় জোয়ারের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, এ ছাড়া সবদিক নিস্তব্ধ সরোজিনী জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ গা, আপনি ঘুমুবেন না? শরীর আবার খারাপ হবে যে! নবীনকুমার মুখ তুলে শুধু একবার তাকায়, একটিও কথা বলে না, আবার রচনায় মনোনিবেশ করে। কখনো কখনো বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয় তার ললাট। বজরার বহরে অনেক রকম মানুষই আনা হয়েছে, কিন্তু কোনো সংস্কৃত পণ্ডিত আনা হয়নি। নবীনকুমারের সংস্কৃত জ্ঞান ততটা প্রখর নয়, মাঝে মাঝে দু-একটি সমাসবদ্ধ পদের জটিলতায় সে দিশাহারা হয়ে যায়। তখন সে আন্দাজ মতন কোনো একটা অর্থ বসিয়ে দেয়। ফিরে গিয়ে কোনো পণ্ডিতকে দিয়ে শুধরে নিলেই হবে।

মাঝে মাঝে কোনো নগরে-বন্দরে যখন বজরা থামে, তখন লোক মারফত সমস্ত কুশল সংবাদাদি দিয়ে পত্র পাঠানো হয় বিম্ববতীর কাছে। নির্দিষ্ট কোনো বন্দরে বিম্ববতীর কাছ থেকেও পত্র নিয়ে এসে লোক অপেক্ষা করে থাকে। নবীনকুমারের স্বাস্থ্য ফিরেছে এবং শ্রবণ ও স্মৃতিশক্তিরও পুনরুদ্ধার হয়েছে জেনে বিম্ববতী আনন্দ সাগরে ভাসছেন। গতকালই তিনি সংবাদ পাঠিয়েছেন যে তা হলে আর বিলম্ব করা কেন, এবার তো ফিরলেই হয়। জীবনে এই প্রথম তিনি পুত্রমুখ অদর্শন করে এত দীর্ঘদিন রইলেন। এখন তিনি অধীর হয়ে উঠেছেন। তা ছাড়া চৈত্র মাস পড়ে গেছে, যে-কোনো সময় কালবৈশাখী ওঠার সম্ভাবনা। এ সময় নদীপথ নিরাপদ নয়।

বজরার বহর এখন ফেরার মুখ ধরেছে। কিন্তু ফিরতে ফিরতে আরও পক্ষকাল তো লাগবেই।

নাটকের অনুবাদটি সম্পূর্ণ করতে নবীনকুমারের মোট এগারো দিন লাগলো। শরীরে একটুও ক্লান্তিবোধ নেই, বরং মনে অদ্ভুত আনন্দ। একটা কাজ শেষ করার তৃপ্তিই অন্যরকম। এর আগে নবীনকুমার ছোটখাটো দু-চার পাতার রচনা লিখেছে, কিন্তু এক সঙ্গে এতখানি লেখেনি। তার আত্মবিশ্বাস হলো, তা হলে সে গ্রন্থকার হতে পারবে।

এতগুলি দিন অনবরত শুয়ে বসে থাকার ফলে তার হাত-পায়ে খানিকটা যেন জড়তা এসেছে। তার ইচ্ছে করলো খানিকটা লাফ ঝাঁপ করতে, তীরে নেমে কিছুক্ষণ দৌড়োতে।

সেদিন অপরাহ্ণে সে উঠে এলো বজরার ছাদে। আকাশময় কোদালে মেঘ। হাওয়া দিচ্ছে শন্ শন্ করে, ঝড় উঠতে পারে। দিবাকর চিন্তিতভাবে কথাবার্তা বলছে মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে।

নবীনকুমার চেয়ে দেখলো নদীর দক্ষিণ পাশে এক স্থলে একটি সুন্দর বাঁধানো ঘাট। তার কিছু দূরে একটি ছোট টিলার ওপরে একটি বেশ বড় সাদা রঙের অট্টালিকা, তার চারদিকে নিবিড় গাছপালা।

সে জিজ্ঞেস করলো, এ স্থানটির নাম কী ?

দিবাকর বললো, আজ্ঞে, ইব্রাহিমপুর। সামনেই আর কিছুদূরে ময়নাডাঙ্গা, সেখেনে আমরা বজরা ভিড়োবো।

টিলার ওপরে বড় বাড়িটির এক কোণে একটি লোহার চোঙ, সেখান থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। জায়গাটি নবীনকুমারের বেশ পছন্দ হলো।

সে বললো, মেঘ উঠেচে, আর সামনে যাবার প্রয়োজন কী ? এখানেই বজরা ভেড়ানো হোক না। আমি একটু হাত পা ছড়াবো।

দিবাকর বললো, আর একটুখন অপিক্ষে করুন। ময়নাডাঙ্গার আর দেরি নেই। এ জায়গাটি ভালো নয়কো।

—কেন, এ জায়গাটি মন্দ কিসের ?

—এখেনে বড় নীলকর সাহেবদের হেঙ্গামা। ঐ যে টিলার ওপর বাড়িটে দেকচেন, ঐটে নীলকুঠি।

—নীলকুঠি রয়েচে বলে কি এ তল্লাটে মানুষজন যেতে পারবে না ? এ আবার কেমন ধারা কতা ?

—আজ্ঞে, নীলকররা বড় অত্যেচার করে। মানীর মান রাকতে জানে না। এখেনকার লোকজন অনেকে ভয়ে পালিয়েচে।

—কী নাম বললে জায়গাটার ? ইব্রাহিমপুর ! এখেনে আমাদের জমিদারি আচে না ?

—ছিল, সে সব জমি আমরা নীলকরদের ইজারা দিয়ে দিইচি। ওনাদের অত্যেচারে আর রক্ষে করা গেল না; ভালো আখের খেত ছেল, বড়বাবুর আমলে ইব্রাহিমপুর থেকে বিলক্ষণ মোটা টাকা উশুল হতো, সে সব গ্যাচে, রয়েচে শুধু কুঠিবাড়িটি।

—সেখেনে কে থাকে ?

—জনাচারেক কর্মচারী রাকা হয়েচে, দেকাশুনো করে।

—বজরা ভেড়াও, আমি সেই কুঠিতে একবার যাবো।

—আজ্ঞে হুজুর, ও কতা উচ্চারণ করবেন না। সাধ করে কেউ নীলকরদের কাচ ঘ্যাঁষে ? কতায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠেরো ঘা আর নীলকরে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।

- দিবাকর, আমি কখনো নীলকর সাহেব দেকিনি। তারা কি বাঘ-সিংহীর চেয়েও হিংস্র ? ইংরেজ এ দেশ শাসন কচ্চে, তা বলে কি লোককে দেশ-ছাড়া করবে ? নীলকরদের ভয়ে সবাই পালালে ওদেরই বা কাজ চলবে কী করে ? তুমি মিচিমিচি ভয় দেকাচ্চো ! বজরা ভেড়াতে বলো, আমি একবার নেমে দেকবো।

দিবাকর হাত জোড় করে কাচুমাচু মুখে বললো, ছোটবাবু, দয়া করে এ হুকুমটে দেবেন না। দয়া করে আমার কতাটা শুনুন। কত্তামা অনেক করে বলে দিয়েচেন, যেখেনে সেখেনে যেন না নামি। মেঘের যা চেহারা, ঝড় উঠতে দেরি আচে, এর মধ্যেই বেলাবেলি আমরা ময়নাডাঙ্গা পৌঁচে যাবো। তখন আপনি ড্যাঙ্গায় নেমে হাত পা ছড়াবেন।

—তুমি এত ভয় পাচ্চো কেন বলো তো, দিবাকর ?

—হুজুর, জায়গাটা অপয়া !

—অপয়া ? কিসের অপয়া ?

—আপনার বড় দাদা গঙ্গানারায়ণ সিংহ এই জায়গা থেকেই নিরুদ্দেশ হয়েছেলেন।

নবীনকুমার কয়েক পলক একদৃষ্টে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলো দিবাকরের মুখের দিকে।

তারপর অত্যন্ত কঠোর কর্কশ কণ্ঠে বললো, দিবাকর, আমি বলচি না বজরা ভেড়াতে ? তুমি আমার সঙ্গে ছলিবলি কচ্চো ?

ধমক খেয়ে ঘাড় হেঁট করলো দিবাকর। বিড়বিড় করে বললো, কত্তামা আমার ওপর ভার দিয়েছেলেন...আমাকে তিনি যা নয় তাই বলবেন।

—ফের দেরি কচ্চো ?

সেই ঘাটেই লাগলো বজরা। একদা মধ্যরাতে এখান থেকেই অদৃশ্য হয়েছিল গঙ্গানারায়ণ। পুরোনো আমলের মাঝিমাল্লা কয়েকজন এখনো রয়েছে এই বজরায়, তারা সেদিনের কথা স্মরণে এনে পরস্পরের প্রতি চেয়ে নীরব হয়ে রইলো।

দুলালকে সঙ্গে নিয়ে ঘাটে নামলো নবীনকুমার। গঙ্গাদাদার কথা আর তেমনভাবে মনে পড়ে না। কিন্তু তার মনে পড়লো সম্প্রতি কালের একটি ঘটনা। বিধুশেখরের কন্যা সুহাসিনীর পুত্রের

অন্নপ্রাশনের দিনে সুহাসিনী অকস্মাৎ গঙ্গানারায়ণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ক্রন্দন করেছিল। সুহাসিনীও তো অনেক বালিকাবস্থাতেই দেখেছে গঙ্গানারায়ণকে। মানুষ চলে যায়, তবু কোথাও কোথাও এমন গভীর ছাপ রেখে যায়।

সুহাসিনী সেদিন গঙ্গানারায়ণের জন্য কেঁদেছিল, সেই কথা মনে পড়ায় নবীনকুমারেরও চক্ষু জ্বালা করে উঠলো। কোনো কথা না বলে সে বসলো পাথর বাঁধানো ঘাটটিতে। তার মনে হলো, যেন তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গানারায়ণের আত্মা অদৃশ্য থেকে তার দিকে চেয়ে আছে। স্থানটি অদ্ভুত রকমের স্তব্ধ। নীলকরদের কুঠি থেকেও কোনো আওয়াজ আসছে না।

একটু পরে হঠাৎ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামলো। দুলাল ব্যস্ত হয়ে বললো, ছোটবাবু, শিগগির বোটে চলুন, একদম ভিজে যাবেন।

নবীনকুমার কোনো উত্তর দিল না। সে বসে ভিজতে লাগলো বৃষ্টিতে। অনেকক্ষণ ধরে। কর্মচারীদের শত ডাকাডাকিতেও সে কর্ণপাত করলো না।
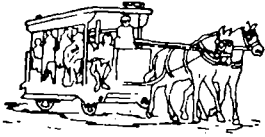
কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত ছড়ানো রয়েছে যে সেনাবাহিনী, তার নাম বেঙ্গল আর্মি। কোম্পানির এই সেনাবাহিনীর মধ্যে অবশ্য বাঙালী সৈনিকের সংখ্যা অতি নগণ্য। বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের পেশাদার সিপাহীরা ইংরেজদের অধীনে সুশিক্ষিত হয়ে একই ক্যান্টনমেন্টে সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান করে। এখন ব্রিটেনের রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর একটি অংশও হিন্দুস্তানে নিযুক্ত।

বিনা রক্তপাতে অযোধ্যা রাজ্যের পতন হয়েছে ইংরেজের কাছে, এখন উত্তর ও পূর্ব ভারতে কোথাও কোনো সংঘর্ষ নেই; এখন শান্তির সময়, সিপাহীরা সকালে বিকালে নিয়মমাফিক কুচকাওয়াজ করে ও অন্য সময় জটলা ও হৈ-হল্লায় মেতে থাকে। সৈন্যরা মধ্যে মধ্যে স্থান থেকে স্থানান্তরে বদলি হয় বলে সারা ভারতবর্ষের সংবাদ মোটামুটি তারাই কিছুটা জানে। তাছাড়া, সম্প্রতি বিলাতের অনুকরণে এ দেশেও কোনো কোনো স্থলে রেল নামে বাষ্পশকট চালু হয়েছে এবং টেলিগ্রাফ নামক এক আশ্চর্য যন্ত্রে তার মারফৎ সংবাদ আদান প্রদান করা যায়।

ভারতীয় সিপাহীরা নিমকহারাম নয়। তারা কোম্পানির বেতনভুক, সেইজন্য তারা কোম্পানির জন্য প্রাণ দিতেও সর্বদা প্রস্তুত। বহুদিনের সুসম্পর্কের জন্য ঝানু ইংরেজ অফিসাররা ভারতীয় সিপাহীদের সঙ্গে খোলাখুলি মেলামেশা করে, তাদের সুখ দুঃখের অংশীদার হয়, তাদের উৎসবেও অংশগ্রহণ করে; আবার বিলাত থেকে সদ্য আগত তরুণ অফিসাররা সেনাবাহিনীতে নতুন রীতি নীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী। নতুন নতুন অস্ত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে, সেই অনুযায়ী বাহিনীকেও উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে। ভারতে ইংরেজ শাসনাধীন এলাকা যত বাড়ছে, সুদৃঢ় ও সুসংঘবদ্ধ সেনাবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা ততই বাড়ছে।

এখন শান্তির সময়, এখন এইসব জল্পনায় অনায়াসেই সময় কাটানো যায়।

একটি ব্যাপার নতুন ব্রিটিশ অফিসারদের কাছে বড়ই দৃষ্টিকটু লাগে। তারা খ্রীষ্টান সৈন্যবাহিনী দেখায় অভ্যস্ত, আর ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে হাজার রকম জাতি ভেদ। একজন রিশালদার পদমর্যাদায় অনেক উচ্চ হয়েও উর্দি পরিধান করে না থাকা অবস্থায় একজন সামান্য লস্করকে দেখে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, কারণ লস্করটি ব্রাহ্মণ, রিশালদারটি জাতে গোয়ালা। সেনাবাহিনীতে কখনো এমন চলে? একজন হিন্দু সিপাহী একজন মুসলমান সিপাহীর হুকুম তামিল করতে সর্বদা প্রস্তুত, কিন্তু মুসলমান সিপাহী তার খাদ্য একটু স্পর্শ করলেই সে ঘৃণাভরে সম্পূর্ণ খাদ্য ফেলে দেবে। শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের একটিই রন্ধনশালা আর ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে কত রন্ধনশালা, তার ইয়ত্তা নেই। বিরক্ত হয়ে কোনো নতুন রীতির প্রবক্তা ইংরেজ এক এক সময় বলে ওঠে, এর বদলে মধ্যপ্রাচ্য, মালয়, চীন, এমনকি লাতিন আমেরিকা থেকে খ্রীষ্টানদের ভাড়া করে এনে

ভারতীয় সেনাবাহিনী গড়লে হয় না ?

কয়েক বৎসর আগে ব্রহ্মদেশের কিছু অংশ জয় করা হয়েছে। সে সময় সিপাহীদের এক অংশ ব্রহ্মদেশে যেতে অস্বীকার করেছিল, কারণ তারা কালাপানি পার হবে না, তাতে তাদের ধর্ম নষ্ট হবে। এ তো বিদ্রোহেরই নামান্তর। লর্ড ক্যানিং গভর্নর জেনারেল হয়ে এসে এর প্রতিবিধান করতে উদ্যোগী হলেন। তিনি বিধান জারি করলেন যে, এর পর থেকে নতুন সৈন্য নিয়োগের সময় তাদের যে-কোনো স্থানে, যে-কোনো পরিবেশে লড়াইতে রাজি হওয়ার স্বীকৃতি দিয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে।

এখন শান্তির সময়, এখন কুচকাওয়াজের শেষে কোনো কোনো ব্রিটিশ অফিসার সিপাহীদের কাছে খ্রীষ্টধর্মের মহিমার কথা সরলভাবে ব্যাখ্যা করে শোনায়। খানা টেবিলে অফিসাররা আলোচনা করে। আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ দাসরা সকলেই তাদের প্রভুর ধর্ম গ্রহণ করে খ্রীষ্টান হয়েছে। ভারতীয় দাসরাও খ্রীষ্টত্ব গ্রহণ করলেই তো বহু সমস্যার অবসান হয়।

এখন শান্তির সময়, এখন সিপাহীদেরও বিশ্রম্ভালাপের প্রচুর অবকাশ। তাদের কানেও নানারকম কথা আসে। কোথাকার ব্যারাকের ফাটকে হিন্দুর উচ্ছিষ্ট পাত্রে নাকি মুসলমানকে খাদ্য দেওয়া হয়েছে। কানপুরে গোরুর হাড় চূর্ণ করে রুটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে না ? নতুন টোটা ব্যবহার করতে হবে খোলসটা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে, সেই খোলসটা গোরু ও শুয়োরের চর্বি মিশিয়ে তৈরি নয় ? সিপাহীর বেতন আট টাকা। কিন্তু ব্রিটিশ এলাকার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করলে বাট্টা দেবার কথা আরও চার টাকা। কিন্তু সেই এলাকা জয় হয়ে গেলেই বাট্টা বন্ধ হয়ে যাবে। এ কেমন নিয়ম ? সিপাহী প্রাণপণে লড়াই করে নতুন দেশ জয় করবে, আর তার ফলে তার আয় কমে যাবে ? বেতনই সিপাহীর নিমক, কিন্তু যে নিমক দেবে তার কেন কথার ঠিক থাকবে না ? হালালখোর ইংরাজ শুধু বোঝে নিজের স্বার্থ। পলাশীর যুদ্ধের পর ঠিক একশত বৎসর কাটলো, এর পরও কি সাহেবজাতি এদেশে রাজত্ব করতে পারবে ? আরে ভাই, দমদমার ছাউনিতে এই সেদিন কী হয়েছিল শুনিসনি ? এক ব্যাটা লস্কর এক ব্রাহ্মণ সিপাহীর কলসী থেকে পানি ঢেলে নিতে গিয়েছিল, ব্রাহ্মণ ঠিক সময় দেখতে পেয়ে সেই হারামী দুসাদটার মুখে মেরেছে এক লাথ্। সেই লাথ্ খেয়ে সেই নিচা আদমি লস্করটা কী বলেছিল জানিস ? বলেছিল, আর জাতের বড়াই করো না, নতুন টোটা দাঁত দিয়ে ছিঁড়বে আর হিন্দু মুসলমান সবার জাত যাবে। সব সিপাহী এক পতিত জাত হয়ে যাবে।

গঙ্গার কূলে, কলকাতা থেকে কিছুটা উজানে, এক অঞ্চলের জঙ্গল সাফ করে কোম্পানি বাহাদুর এক খুব বড় ক্যান্টনমেন্ট স্থাপন করেছে। একসঙ্গে অতগুলি সিপাহী ব্যারাক দেখে কাছাকাছি গ্রামের লোকেরা ঐ স্থানটির নাম দিয়েছে ব্যারাকপুর। দলিলে ডেসপ্যাচে এখন সেই নামটিই চালু। সম্প্রতি অন্যত্র থেকে চৌত্রিশ নং দেশী পদাতিক বাহিনীকে সরিয়ে এনে রাখা হয়েছে সেখানে। মার্চ মাসের শেষের দিকে এক সকালে সেই রেজিমেন্টের সার্জেন্ট মেজর হিউসন শুনতে পেলেন প্যারেড গ্রাউণ্ডে কে যেন বীভৎস গলায় চিৎকার করছে। ভুরু কুঁচকে গেল হিউসনের। কিছুদিন থেকেই এই রেজিমেন্টের ভাবভঙ্গী সন্দেহজনক, এর সিপাহীরা ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলে, শ্বেতাঙ্গ কোনো অফিসার দেখলেই হঠাৎ থেমে যায়। এখন উৎকট গলায় চিৎকার করছে কে ?

সার্জেন্ট মেজর হিউসন ছোটা-হাজরি খেতে খেতে বিরক্ত হলেন। তিনি পাঠালেন তাঁর আর্দালিকে। একটু পরেই, তখনো দূরে চিৎকার বন্ধ হয়নি, আর্দালির সঙ্গে এলো একজন দেশী অফিসার। তার মুখের বার্তা শুনে হিউসন সাহেব তৎক্ষণাৎ খানার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন এবং তাঁর অ্যাডজুটান্ট লেফটেনান্ট ব-কে সংবাদ দিতে বলে, চললেন প্যারেড গ্রাউণ্ডের দিকে।

সেখানে জনা কুড়িক সিপাহী নিঃশব্দ এবং স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। তাদের নেটিভ অফিসারের নাম ঈশ্বরী পাণ্ডে। সেও অল্প দূরে নিথর। আর একজন মাস্কেটধারী সিপাহী তাদের সামনে লাফিয়ে লাফিয়ে হিন্দুস্থানী ভাষায় কী যেন বলছে।

হিউসন কঠিন মুখ করে এগিয়ে গেলেন মাস্কেটধারী সিপাহীটির দিকে। সে সাহেবকে দেখেই বড় একটি কামানের পাশে গিয়ে সুবিধেমত জায়গা গ্রহণ করলো এবং চেঁচিয়ে বললো, ভাইয়ো, দাগাবাজ দুশমনকো খতম কর দো। খতম কর দো।

বোঝা যায় অনেকক্ষণ ধরেই চিৎকার করছে সেই সিপাহীটি, তার কণ্ঠস্বর খসখসে, পদক্ষেপ

নেশাখোরের মতন। সে অন্য সিপাহীদের বলছে সাহেবদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে। বাকি সিপাহীরা কেউ এসে তার পাশেও দাঁড়াচ্ছে না, আবার তার কথার প্রতিবাদও করছে না।

হিউসন ঈশ্বর পাণ্ডেকে ধমক দিয়ে প্রশ্ন করলেন, হু ইজ দ্যাট বাগার ? হোয়াই ইজ হি শাউটিং ?

ঈশ্বর পাণ্ডে সাহেবকে দেখে স্যালুট ঠুকলো না, সে প্রশ্নের কোনো উত্তরও দিল না।

হিউসন আবার বললেন, ক্যাপচার হিম !

কামানের পাশে লুকোনো সিপাহীটির নাম মঙ্গল পাণ্ডে। তার চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ, উত্তেজনায় তার সর্বশরীর কম্পিত হচ্ছে, সে মাস্কেট তুললো হিউসনের দিকে।

তারপর সেই ব্যাপারটি সংঘটিত হলো। ইংরেজের সৈন্য-ব্যারাকের মধ্যে দাঁড়িয়ে একজন দেশী সিপাহী আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে সত্যি সত্যি গুলি চালালো তার শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের এক প্রতিনিধির দিকে। এ এক অভাবনীয় কাণ্ড !

গুলি হিউসনের গায়ে লাগলো না, তবু আত্মরক্ষার জন্য তিনি দড়াম করে পড়ে গেলেন মাটিতে। ভয়ের চেয়ে তাঁর চোখে মুখে গভীর বিস্ময় মাখা। বিশজন সিপাহীর সামনে এক উন্মাদ গুলি ছোঁড়ার সাহস করলো তাঁর দিকে, তবু কেউ বাধা দিল না ? দেশী অফিসার তাঁর হুকুম শুনেও অমান্য করলো !

মঙ্গল পাণ্ডে মাস্কেটে আবার গুলি ভরছে, হিউসন তার মধ্যে গড়িয়ে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করলেন। তার মধ্যেই ঘোড়া ছুটিয়ে এসে উপস্থিত হলেন লেফটেনাণ্ট ব। মঙ্গল পাণ্ডে দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়লো সেই লেফটেনাণ্টের দিকে। এবারেও সামান্য দিকভ্রষ্ট হলো, লেফটেনাণ্টের গায়ে না লেগে লাগলো ঘোড়ার গায়ে। ঘোড়া সুদ্ধ লেফটেনাণ্ট ব পড়ে গেলেন মাটিতে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি কোমরবন্ধ থেকে টেনে বার করলেন তলোয়ার, মঙ্গল পাণ্ডেও তলোয়ার নিয়ে ছুটে এলো। এবং দেশী সিপাহীই প্রথম অস্ত্রাঘাত করলো রাজসৈনিকের ওপর। মঙ্গল পাণ্ডের তলোয়ার দু'বার আঘাত হানলো লেফটেনাণ্ট ব-এর মাথায় এবং ঘাড়ে। ততক্ষণে হিউসনও তলোয়ার নিয়ে তাড়া করে এলেন। চললো তিনজনের লড়াই, এর মধ্যে মঙ্গল পাণ্ডেই বেশী শক্তিশালী এবং উন্মত্তবৎ। দুপক্ষই চিৎকার করছে যুদ্ধরত অবস্থায়, মঙ্গল পাণ্ডে বলছে, ভাইয়ো, দুশমনকো খতম্ করো। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। তোমাদের অস্ত্র কেড়ে নেবে, তার আগে তোমরা কেড়ে নাও। আংরেজের দিন শেষ হয়ে এসেছে। আর হিউসন-ব চিৎকার করছে, গার্ড, ক্যাপচার হিম্। ডিজার্ম হিম্।

সিপাহীরা এই আবেদন বা আদেশের মধ্যে কোনোটাই শুনলো না। তারা দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। সাহেব দুজনের ওপরেই তলোয়ারের আঘাত বেশী পড়ছে দেখে সিপাহীদের মধ্যে একজন, শেখ পল্টু এগিয়ে এসে সাহেব দুজনকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো, কিন্তু মঙ্গল পাণ্ডেকে বন্দী করার কোনো চেষ্টাই করলো না। মঙ্গল পাণ্ডে আবার আশ্রয় নিল বড় কামানটির আড়ালে।

ইতিমধ্যে হুড়োহুড়ি করে আরও অনেক ব্রিটিশ অফিসার এসে পড়েছে। প্রবল গোলমাল ও দিশাহারা অবস্থা। কোনো ইংরেজই আর মঙ্গল পাণ্ডের দিকে এগিয়ে যেতে সাহস করছে না। সে কামানের আড়ালে এমনভাবে লুকিয়ে আছে যে দূর থেকে তাকে গুলি করে হত্যা করা যাবে না। পুনঃপুনঃ আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও সিপাহীরা কেউ মঙ্গল পাণ্ডেকে ধরতে গেল না।

ব্যারাকপুরের সম্পূর্ণ ডিভিশনের কমাণ্ডার, প্রৌঢ় জেনারেল হিয়ারসে-ও এসে পড়লেন অবিলম্বে। তাঁর অশ্ব একেবারে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ায় একজন ব্রিটিশ অফিসার সাবধান করে দিল, স্যার, ওর মাস্কেট কিন্তু লোড করা আছে।

ক্রোধে হিয়ারসের মুখখানি লাল। তিনি দাঁত নিষ্পেষণ করে বললেন, ড্যাম হিজ মাস্কেট !

তারপর নিজের পিস্তল তুলে সিপাহীদের উদ্দেশ্যে বললেন, যে প্রথম আমার হুকুম অমান্য করবে, সে একজন মৃত সৈনিক। ঐ উন্মাদটিকে ধরবার জন্য আমার সঙ্গে এসো।

কয়েক মুহূর্তের জন্য সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা।

তারপর মঙ্গল পাণ্ডে কান্নার সুরে কী যেন বলে উঠলো, অসীম সাহসী জেনারেল হিয়ারসে কয়েক কদম এগিয়ে গেলেন কামানটার দিকে, সিপাহীরাও দ্বিধা ত্যাগ করে এবার অনুসরণ করলো জেনারেলকে। জেনারেলের আদেশ যেন মন্ত্র, কয়েক পুরুষ ধরে ভারতীয় সিপাহীরা এ মন্ত্র অগ্রাহ্য করতে ভুলে গেছে।

একটি বিস্ফোরণ, একটি গুলি উড়ে যাওয়ার শিসের মতন শব্দ, ধোঁয়া। কেউ একজন পড়ে গেল মাটিতে। ধোঁয়া সরে যাবার পর দেখা গেল, জেনারেল নন, মাটিতে পড়ে আছে মঙ্গল পাণ্ডে। তার চেষ্টা ব্যর্থ হলো দেখে এবং ইংরেজের হাতে ধরা না দেবার চেষ্টায় শেষ মুহূর্তে সে মাস্কেটের নল

নিজের বুকের দিকে ফিরিয়ে ঘোড়া টিপেছিল।

তৎক্ষণাৎ ইংরেজ সৈনিকরা সেই কুড়িজন সিপাহীকে ঘিরে ফেলে নিরস্ত্র করে ফেললো এবং হাতে পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে বন্দী করা হলো তাদের। মঙ্গল পাণ্ডে গুরুতর আহত হয়েও তখনও জীবিত। তার পায়ে শিকল বেঁধে একটি অশ্বের সঙ্গে সেই শিকল জুড়ে দিয়ে সমস্ত কুচকাওয়াজের মাঠটিতে ছ্যাঁচড়ানো হলো। তবু সে মরে না।

যথানিয়মে কোর্টমার্শাল হলো মঙ্গল পাণ্ডের এবং বিচারে তার ফাঁসীর হুকুম হলো। সেই কুচকাওয়াজের মাঠেই গ্যারিসনের সমস্ত সৈনিকদের উপস্থিতিতে মুমূর্ষু মঙ্গল পাণ্ডেকে বহন করে এনে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো ফাঁসীর দড়িতে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে গালি-গালাজ করে গেল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। সিপাহীদের উদ্দেশে বললো, দাগাবাজ দুশমন আংরেজকো খতম কর দো, ভাইয়োঁ, সিপাহীয়োঁ....

বিশজন সিপাহীর কোয়ার্টার গার্ডের অধিনায়ক ঈশ্বরী পাণ্ডেও ফাঁসীর হুকুম থেকে রেহাই পেল না। বাকি সিপাহীদের কারাদণ্ড।

সামরিক ছাউনিতে এ অতি তুচ্ছ ঘটনা। কোর্টমার্শালে দু-একজন সিপাহীর ফাঁসী দেওয়া নতুন কিছু ব্যাপার নয়। এমন কি ব্রিটিশ সৈনিকরাও কোনো অপরাধ করলে তাদেরও কোর্টমার্শাল হয়। মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না অবশ্য, তবে কিছু না কিছু শাস্তি পায়। কিন্তু মঙ্গল পাণ্ডের প্রেতাত্মা যেন ভাসতে লাগলো ব্যারাকপুর সেনানিবাসের বাতাসে। চৌত্রিশ নং ইনফ্যানট্রির সিপাহীদের সকলকেই নিরস্ত্র করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে উত্তর ভারতে। বাকি সিপাহীদের মুখগুলিও যেন থমথমে মনে হয়। যদিও তারা সকলেই সমবেতভাবে নতুন করে আনুগত্যের শপথ নিয়েছে। তবু ইংরেজ অফিসাররা তাদের মুখের দিকে যখন তখন ভ্রূ-কুঞ্চিত করেন। অদ্ভুত এই এসিয়াটিকদের মুখ। এমন ভাবলেশহীন যে কিছুতেই মনের কথা টের পাওয়া যায় না। অফিসারদের কোয়ার্টারে অতি বিশ্বস্ত আর্দালি, সহিস ও বাবুর্চিদেরও যেন আর তেমন বিশ্বস্ত মনে হয় না এখন। এতদিন পর মনে হয়, ওদের প্রত্যেকের মুখের সঙ্গেই মঙ্গল পাণ্ডের মুখের যেন কিছুটা মিল আছে। ওরা কি গোপনে নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করে? ওদের ওষ্ঠে কি গোপনে ফুটে ওঠে ব্যঙ্গের হাসি? দুজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ সেনানী হিউসন এবং ব মিলিতভাবে মাত্র একজন দেশী সিপাহীকে লড়াইতে পর্যুদস্ত করতে পারেনি, বহুলোক এ দৃশ্য দেখেছে। এর পর নেটিভরা যদি মনে করে শ্বেতাঙ্গ মানেই অজেয় নয়?

এই ঘটনা গোপন রইলো না, ব্যারাকপুর থেকে ক্রমে কলকাতাতেও ছড়ালো। মঙ্গল পাণ্ডেকে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ঈশ্বরী পাণ্ডের ফাঁসী কার্যকর করতে কয়েকদিন দেরি হলো। ফাঁসীর হুকুম দেবার এক্তিয়ার ঠিক কার, তাই নিয়ে একটা প্রশ্ন দেখা দিল। আর যত দেরি হয়, ততই গল্প ছড়ায়। কলকাতায় বসে এই সংবাদ জেনে বিরক্ত হলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং। কঠিন শাস্তি যদি দিতেই হয়, তবে তা অতি দ্রুত সমাধা করাই উচিত। বিলম্ব হলে দুর্বলতাই প্রকাশ পায়: দেশী লোকদের সব সময় বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, ইংরেজ শাসনে কোনো প্রকার অস্থিরচিত্ততা বা সংশয়ের স্থান নেই।

খবরটি প্রথম সীমাবদ্ধ রইলো কলকাতার ইংরেজদের মধ্যে। সুখী, বিলাসী ইংরেজ সমাজে গোপন মৃদু ত্রাসের স্রোত প্রবাহিত হয়ে যায়। কেউ সহজে মুখে কিছু বলে না, কিন্তু চোখে চোখে কথা হয়। সত্যি একজন দেশী সিপাহী ইংরেজ সেনানায়কদের হত্যা করার জন্য গুলি ছুঁড়েছিল? মনুষ্যাধম এই জাতির কোনো একজনের এমন সাহস হয়? অন্য সিপাহীরা নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেনি? একশো বছর আগে বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লা আক্রমণ করেছিল কলকাতা, তখন সব ইংরেজকেই এই শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। ঠিক একশো বছর আগে।

ক্রমে এই গোপন ত্রাস আর শুধু মনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, কানাকানি হয়। হিন্দুস্থানে, কোম্পানির রাজ্যসীমা বড় বেশী বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এত বড় রাজ্য শাসনের জন্য দেশী সিপাহী নিয়ে সৈন্য গড়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কতখানি বিশ্বাস করা যায় তাদের? মঙ্গল পাণ্ডে হয়ে গেল এক বিভীষিকার প্রতীক। মঙ্গল বাদ দিয়ে শুধু পাণ্ডে, তাও ইংরেজরা পাণ্ডে ঠিক মতন উচ্চারণ করতে

পারে না। হলো পাণ্ডি। এই পাণ্ডির মতন দুশমন ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে কতজন আছে? যদি সহস্র সহস্র হয়?

মঙ্গল পাণ্ডের ঘটনার পর কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে, ঈশ্বরী পাণ্ডেরও ফাঁসী হয়ে গেছে, তারপর আর কোনো রকম গোলযোগ দেখা যায়নি। তবু ঘটনাটি ভোলা গেল না। রাজধানী কলকাতার সুরক্ষার জন্য জোরদার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত নয়? ইংরেজ সমাজের অনেকের মধ্যেই এ কথা গুঞ্জরিত হতে লাগলো।

খবরটি কিছুদিনের মধ্যে বাঙালীদের মধ্যেও ছড়ালো। প্রতিক্রিয়া হলো মিশ্র ধরনের। কারুর কাছে ঘটনাটি অত্যন্ত বিস্ময়কর, কারুর কাছে এমন কিছুই না। মঙ্গল পাণ্ডে কী তীব্র নেশাগ্রস্ত কিংবা উন্মাদ ছিল? একমাত্র কোনো বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির পক্ষেই এমন নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব। কিন্তু বাকি সিপাহীরাও নীরব এবং নিষ্ক্রিয় ছিল কেন? মঙ্গল পাণ্ডে ব্যর্থ হলেও এর পেছনে কোনো পরিকল্পনা ছিল কি?

একটি তথ্য অবশ্য বেশ মনে দাগ কাটলো বাঙালী সমাজে। পলাশী যুদ্ধের পর ঠিক একশো বছর কেটেছে। এ কথা ইংরেজরাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। ঠিক একশো বছর, এর কি কোনো গূঢ় মর্ম আছে? ঠিক একশো বছর পার হয়ে আবার কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটবে?
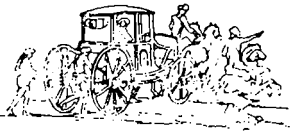
মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসীর ঠিক উনপঞ্চাশ দিন পর আগুন জ্বলে উঠলো। দমদম কিংবা ব্যারাকপুরে নয়, সেখান থেকে বহু দূরে। আম্বালায়। প্রথম প্রথম শুধুই আগুন, মধ্যরাত্রে সিপাহী ব্যারাকের এক একটি ছাউনিতে অকস্মাৎ দপ করে আগুন ধরে যায়, তারপর হুড়োহুড়ি, দৌড়োদৌড়ি। কে বা কারা সেই আগুন লাগায় টের পাওয়া যায় না। তবে বোঝা যায়, যে-সব সিপাহী স্যাঁতসেঁতে চর্বির মতন জিনিস মাখানো খোলস সমেত কার্তুজ ব্যবহার করছে, আগুনের শিখা লকলক করে উঠছে শুধু তাদের ছাউনিতেই। প্রথম দিন একটি ছাউনিতে, পরদিন পাঁচটি ছাউনিতে। পরদিন আরও।

ইতিমধ্যে চাপা অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। শহরে শহরে নানারূপ গুঞ্জন। দিল্লির জুম্মা মসজিদের গায়ে এই কিছুদিন আগে হঠাৎ দেখা গিয়েছিল এক দীর্ঘ ইস্তাহার ঝুলছে। পারস্যের শাহ হিন্দুস্তানের খাঁটি মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পবিত্র জেহাদে যোগ দেবার জন্য। তিনি শীঘ্রই আসছেন বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে কাফের ব্রিটিশ রাজকে উৎখাত করতে। মুসলমানদের ধর্ম নষ্ট করতে চায় যে ইংরেজ, এবার তার পতনের দিন ঘনিয়ে এসেছে। হিন্দুস্তানের মুসলমান, তুমি যদি খাঁটি মুসলমান হও, তবে জাগো, হাতিয়ার উঠাও।

কে দিল এই ইস্তাহার? এ তো সরাসরি পারস্য থেকে আসেনি, তবে কে লাগালো? দিল্লির ইংরেজ সেনানায়ক সাইমন ফ্রেজার ইস্তাহারটি টেনে ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেললেন সমবেত জনতার চোখের সামনে। কিন্তু ততক্ষণে তা অনেকেরই পাঠ করা হয়ে গেছে। এবং পরদিন অবিকল ঐ রকম আর একটি ইস্তাহার লটকাতে দেখা গেল লালকেল্লার দেয়ালে।

আফগানিস্তানের শাসক দোস্ত মহম্মদও নাকি তাঁর ফৌজ নিয়ে পারস্যের শাহের সঙ্গে যোগ দিয়ে আসছেন ভারতের দিকে। দোস্ত মহম্মদকে তো ইংরেজের মিত্র বলেই সবাই জানতো এতদিন। একটি ইস্তাহারে দেখা গেল, হিন্দুস্তানে ইসলাম বিপন্ন বলে দোস্ত মহম্মদও আর স্থির থাকতে পারছেন না। আর রুশ সম্রাটের বাহিনী যে ভারত আক্রমণ করবে, সে কথা তো অনেকদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে। এবার বুঝি সময় আসন্ন। রুশী বাহিনীকে ঠেকাতে পারবে ইংরেজ? এই তো কিছুদিন আগে তারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধে প্রচণ্ড মার খেয়েছে না?

কানপুরের সন্নিকটে বিঠুরে ক্ষুব্ধ, অপমানিত হয়ে রয়েছেন নানা সাহেব। তিনি পুণার বিখ্যাত পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী রাও-এর দত্তক পুত্র। ইংরেজ তাঁর জায়গির কেড়ে নেয় এবং বার্ষিক আট লক্ষ

টাকার পেনসন বন্ধ করে দেয়। আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে তিনি তাঁর হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছিলেন বটে কিন্তু ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিলেন। এই সময় নানা লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে এসে বুঝলেন, আবেদন-নিবেদনের দিন শেষ হয়ে গেছে। লক্ষ্ণৌয়ের তখন অদ্ভুত অবস্থা। নতুন রাজ্য শাসনের ভার হাতে নিয়ে ইংরেজ-রাজ সর্ব ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। এদিকে হাটে-বাজারে হাজার হাজার সবল সুস্থ চেহারার পুরুষ চাপা রাগে গজরাচ্ছে। এরা প্রাক্তন নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের সেনাবাহিনীর কর্মচ্যুত সৈনিক। বংশানুক্রমিকভাবে এরা যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো পেশা জানে না। এখন এদের সামনে আর কোনো জীবিকার পথ খোলা নেই, অনেকেই অনাহারের সম্মুখীন, এদের হাত নিসপিস করছে অস্ত্র ধরার জন্য।

হাটে-বাজারে এখন শুধু একটাই আলোচনা। হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এখন আর পৃথক করে দেখা চলবে না। ইংরেজ এখন যথেচ্ছভাবে হিন্দু ও মুসলমান জায়গিরদার ও ভূম্যধিকারীর সম্পত্তি কেড়ে নিচ্ছে, বনেদী বংশগুলির সম্মান লুটোচ্ছে ধুলোয়, অর্থ-সম্পদ সবই আস্তে আস্তে ভারতবাসীর কাছ থেকে চলে যাচ্ছে ইংরেজদের হাতে। হিন্দুস্তানের হিন্দু-মুসলমান সকলেরই ধর্ম বিপন্ন। এখনো তৈমুর বংশের শিখা, আকবর-সাহজাহানের প্রত্যক্ষ রক্ত-সম্পর্কিত উত্তরাধিকারী বাহাদুর শাহ বেঁচে আছেন। আবার ফিরিয়ে আনা যায় না লুপ্ত গৌরব?

মৌলভী আহমদ উল্লা নগরে নগরে পরিভ্রমণ করে প্রচার করছেন বিদ্রোহের বাণী। দিন ঘনিয়ে এসেছে, দেরি করা চলবে না। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক সেনা ছাউনি থেকে অন্য সেনা ছাউনিতে কারা যেন চালাচালি করতে লাগলো হাতে-গড়া রুটি। একখানা রুটি যে পাবে, সে আরও পাঁচখানা রুটি বানিয়ে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেবে। সঙ্গে কোনো চিঠি নেই, ঐ রুটিই গোপন আবেদনপত্র।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটলো মীরাটে।

ব্যারাকপুরের মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহের পর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মনে করেছিল, চর্বি মাখানো খোলস সমেত টোটার ব্যাপারে বুঝি শুধু হিন্দু সিপাহীরাই ক্ষুব্ধ। মুসলমান সিপাহীরা তো সে সময় মঙ্গল পাণ্ডেকে সমর্থন করেনি। কোনো কোনো সেনানায়ক প্রস্তাব দিলেন এনফিল্ড রাইফেলের ঐ নতুন কার্তুজ না হয় বাতিল করা হোক। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন সে প্রস্তাব। একটা গুজবকে প্রশ্রয় দিলে তা দুর্বলতারই পরিচায়ক হবে। কার্তুজের খোলসে তো সত্যিই গোরু-শুকরের চর্বি মিশ্রিত নেই। ও রকমভাবে চর্বি মেশানোর প্রশ্নই ওঠে না।

মীরাটে তৃতীয় লাইট ক্যাভালরি এক অতি বিশ্বস্ত বাহিনী। তাদের মধ্যে থেকেও বেছে বেছে নব্বই জন অতি দক্ষ সিপাহীকে পৃথকভাবে দাঁড় করানো হলো। কর্নেল স্মিথ সংক্ষিপ্ত ভাষণে সেনাবাহিনীকে বোঝালেন যে, কার্তুজের খোলসে চর্বি মেশানোর কথার কোনো ভিত্তিই নেই; এমনকি, ঐ কার্তুজ ব্যবহার করার জন্য মুখে দেবারও দরকার নেই। হাত দিয়ে ছিঁড়ে নিলেই চলে। এই বাছাই করা নব্বই জন সিপাহী তা সকলের সামনে দেখাবে।

মে মাসের প্রথম গরমের মধ্যে সকলে দণ্ডায়মান। আনা হলো কার্তুজ, সেগুলি সিপাহীদের মধ্যে বিলি করার জন্য সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। নব্বই জনের মধ্যে পঁচাশী জন সিপাহীই হাত গুটিয়ে রইলো। তারা গম্ভীরভাবে জানালো, ঐ অপবিত্র কার্তুজ তারা স্পর্শও করবে না। এ ব্যাপারে আর অনুরোধ করে যেন তাদের সম্মান হানি না করা হয়।

পরদিন কোর্ট মার্শাল হলো সেই পঁচাশী জন সিপাহীর। বিচারের সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না মোটেই। সমগ্র বাহিনীকে আবার রৌদ্রের মধ্যে দাঁড় করিয়ে শোনানো হলো শাস্তির কথা। ঐ পঁচাশী জন সিপাহী ব্রিটিশ রাজের হুকুম তামিল করতে অস্বীকার করায় গুরুতর অপরাধী, তাদের অধিকাংশকেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে আন্দামানে। বাকি কয়েকজনের দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

পঁচাশীজনের একজনও দয়া ভিক্ষা চাইলো না, একটি কথাও উচ্চারণ করলো না। তৎক্ষণাৎ তাদের উর্দি ও জুতো খুলে ফেলার হুকুম দেওয়া হলো। তারপর কয়েক ঘণ্টা ধরে প্রচণ্ড রৌদ্র দহনের মধ্যে তাদের প্রায় নগ্ন অবস্থায় রেখে হাতে পায়ে পরানো হলো শিকল। তারপর তাদের যখন নিয়ে যাওয়া হতে লাগলো কয়েদখানার দিকে, তখন একজন বন্দী সিপাহী তার একপাটি জুতো বিচারকদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, ফিরিঙ্গি রাজ জাহান্নামে যাক। তার সঙ্গীরাও গর্জন করে উঠলো ঐ একই কথা।

এর পর ঐ বন্দীদের দু'দিন মীরাট ক্যান্টনমেন্টে রাখা হলো খুব কড়া পাহারায়। কোনো রকম

বিক্ষোভের চিহ্ন দেখা গেল না। সব কিছু শান্ত। রবিবার সন্ধ্যার সময় ইংরেজ রাজপুরুষেরা মেম ও শিশুদের সঙ্গে নিয়ে গীর্জা থেকে ঘুরে এলো নিশ্চিন্তে। সারাদিন অসহ্য দাহের পর এই সময় একটু বাতাস বয়। এখন যথাসম্ভব স্বল্পবাস হয়ে বারান্দায় একটি ছোট পেগ নিয়ে আরাম করার সময়। মীরাট ক্যান্টনমেন্টের জেনারেল হিউট সৈনিকের উর্দি খুলে একটি পাজামা পরে তাঁর আর্দালিকে হুকুম দিলেন, বোয়, ড্রিঙ্কস্ লাও!

অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গেই ছাউনিতে ছাউনিতে জ্বলে উঠলো আগুন। যেন এক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত সিপাহী সশস্ত্র হয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে; পঁচাশীজন বন্দীকে মুক্ত করা হলো তৎক্ষণাৎ, নির্বিচারে তারা গুলি চালাতে লাগলো ইংরেজ অফিসারদের দিকে।

সিপাহীদের সামনে ইংরেজরা দাঁড়াতেই পারলো না। একদিনের মধ্যেই মীরাট ইংরেজ-মুক্ত হয়ে গেল। কিছু ইংরেজ প্রাণ দিল, কিছু ইংরেজ কোনোক্রমে খালি পায়ে, অর্ধনগ্ন অবস্থায় প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলো। শুধু ক্যান্টনমেন্টেই নয়, সমগ্র মীরাট শহরই সিপাহীদের অধিকারে চলে এলো।

এর পর কী? সিপাহীদের সিদ্ধান্ত নিতে একটুও দেরি হলো না। একটিই পথ খোলা আছে। এখন থেকে দিল্লি হবে আবার স্বাধীন ভারতের রাজধানী। সুতরাং, চলো দিল্লি।

দিল্লির লালকেল্লায় বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ প্রতিদিন এখনো দরবার বসান। তাঁর বয়েস এখন বিরাশী, অতি দুর্বল, হ্রস্বকায় পুরুষ, চোখে অহংকারের জ্যোতিটুকুও নেই। সাম্রাজ্য নেই, তবু তিনি এখনো সম্রাট। শুধু লালকেল্লার ভিতরকার ছোট নগরীটিই তাঁর অধিকারে, বাইরের দিল্লি শহরটি পরিচালনার ভার পর্যন্ত ইংরেজের হাতে। বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর তবু এখনো প্রতিদিন একটি লাঠিতে ভর দিয়ে ঠুকঠুক করে দরবারে আসতে ভালোবাসেন। তিনি এসে বসেন ধূলিমলিন ময়ূর সিংহাসনে। বেশীক্ষণ সোজা হয়ে বসে থাকার ক্ষমতা নেই, তাই তাঁকে একটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আধ-শোয়া হয়ে থাকতে হয়, হাতে থাকে আলবোলার নল।

রাজত্ব নেই, প্রজারা আসে। অভ্যেসবশত প্রজারা তাঁর কাছে এসে নানারকম অভিযোগ শোনায়, তিনি নিমীলিত নয়নে শুনে যান। নারীহরণ, জমি দখল, ইংরেজের অত্যাচারের কাহিনী। এসব শুনতে ভালোবাসেন বৃদ্ধ সম্রাট। তিনি মাথা নাড়েন, এবং তাঁরই মতন ক্ষমতাহীন সেনাপতি, আমীর বা মুন্সীদের উদ্দেশ্যে হুকুম দেন, এসব অন্যায়ের প্রতিবিধান করবার জন্য। তারাও দীর্ঘ সেলাম দিয়ে বলে, জো হুকুম, জাঁহাপনা।

এ সভায় সকলেই প্রায় বৃদ্ধ। যেন অতীতের কিছুই হারায়নি, এই রকম মুখ নিয়ে তারা বসে থাকে। সম্রাট প্রায়ই তাদের নানারকম খেতাব বিলি করেন। অথবা তাদের ইনাম দেন কল্পিত কোনো জায়গীর। তারাও মাথা ঝুঁকিয়ে সৌজন্যের সঙ্গে সব গ্রহণ করে।

কখনো কখনো সম্রাট আউড়ে ওঠেন কবিতা। তিনি কবি এবং গীত-রচয়িতা। তখন তিনি সম্রাট নন, শুধু জাফর। তিনি একটি একটি কবিতার পদ উচ্চারণ করলেই তাঁর সভাসদরা তারিফ করে বলে ওঠে, বাহাবা, বাহাবা, বোহুৎ খুব!

বাহাদুর শাহ শুধু স্বয়ং কবি নন, কবিদের পৃষ্ঠপোষক। রাজ্য নেই, তবু রাজকবি আছে। প্রসিদ্ধ কবি জৌক বাহাদুর শাহের গুরু এবং রাজকবি। মীর্জা গালিবকেও তিনি মাসোহারা দিয়ে রাজসভায় রেখেছেন এবং তাঁকে দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবময় ইতিহাস লেখাচ্ছেন। গালিব আগে লিখতেন ফার্সীতে, সম্রাট তাঁকে এনেছেন উর্দু ভাষায়। ছোকরা গালিবের একটি ছত্র বড় তাঁর মনে গেঁথে গেছে, যে-কোনো সময় তিনি অকারণে সেটা গুন গুন করে ওঠেন। ম্যায় হুঁ অপনী শিকস্ত কী আওয়াজ...আমি শুধু নিজের ভেঙে যাওয়ার শব্দ!

শুধু প্রজাদের অভিযোগ আর কাব্য আলোচনাই নয়, দরবারে অন্য অন্য পাঁচ রকম কথাও ওঠে। ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে নামে এক সিপাহীর ইংরেজের বিরুদ্ধে গুলিবর্ষণ কিংবা আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে অগ্নিসংযোগের কথাও তাঁর কানে এসেছে। সভাসদরা এইসব ঘটনার নানারকম ব্যাখ্যা করতে চায়, লোলচর্ম সম্রাট শুধু মাথা নেড়ে হুঁ হুঁ করেন। একদিন তিনি আপনমনে এক বয়েৎ আওড়ালেন: রুশীদের দেশের জার কিংবা বড় বড় সুলতানরা যা পারেনি, চর্বিমাখা এক কার্তুজ বুঝি তাই করে দিল। পারিষদরা বিস্মিত, একি কথা বলছেন সম্রাট, তাহলে এখনো কি তাঁর নির্জীব শরীরের মধ্যে কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা সুপ্ত রয়েছে?

সম্রাটের পুত্রেরা এবং আত্মীয় পরিজনবর্গ প্রতিদিন সন্ধ্যাকাল থেকেই নানারূপ বল্গাহীন ভোগলীলা এবং নৃত্য-গীত-লাস্যে সারারাত্রি অতিবাহিত করে। দিনের অধিকাংশ সময় তারা নিদ্রা যায়। সকালের

দিকে তাই লালকেল্লা প্রায় স্তব্ধ।

একদিন হঠাৎ খুব গোলমাল শোনা গেল : নগরের লোকজন বাইরে বেরিয়ে এসে হল্লা করছে, দূর থেকে ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছে এক ঘোড়সওয়ারবাহিনী। দিল্লির নাগরিকদের বহু অভিযানের স্মৃতি আছে। তারা সহজে বিস্মিত হয় না। তবু অনেকে ভুরু তুলে ভাবলো, এরা আবার কারা আসছে ? দেখতে দেখতে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো অশ্বারোহী সেনাবাহিনী দিল্লির পূর্ব দিকের সড়ক দিয়ে। এরাই মীরাটের তৃতীয় লাইট ক্যাভালরি।

সিপাহীরা মুসলমান বলে চিনতে পারায় দিল্লির নাগরিকরাই তাদের জন্য সাগ্রহে খুলে দিল লালকেল্লার সিংহদ্বার। বিদ্রোহীরা অশ্ব টগবগিয়ে সরাসরি চলে এলো সম্রাটের আবাসের সামনে। বাহাদুর শাহ লাঠি ভর দিয়ে অলিন্দে এসে দাঁড়াতেই তারা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো হিন্দুস্তানের বাদশা বাহাদুর শাহ্, আজ থেকে হিন্দুস্তানে আবার আজাদী এসে গেছে !

কম্পিত-বক্ষ সম্রাট প্রথমে দ্বিধান্বিত হয়ে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। একি সত্যিই সম্ভব ? সশস্ত্র সৈনিকরা তাঁকে সম্রাট হিসেবে গ্রহণ করতে চায় ! ইংরেজ সেনাবাহিনী এখনো দেশে রয়েছে না ? কামানের গোলায় তারা ছাতু করে দেবে এই তলোয়ার আস্ফালনকারী সিপাহীদের।

বিদ্রোহীরা তখন উল্লাসে সকলেই চিৎকার করছে একসঙ্গে। অনেকে ঘোড়া থেকে নেমে নৃত্য করতে শুরু করেছে। লালকেল্লার এতখানি অন্দরমহলে তারা কখনো আসেনি, সম্রাটকেও এত কাছ থেকে কখনো দেখেনি। সম্রাট বাহাদুর শাহ যে এত বৃদ্ধ, এত দুর্বল, তা তাদের ধারণা ছিল না। এই মানুষ তাদের নেতৃত্ব দেবে ? তবু যাই হোক, সম্রাট বংশের রক্ত তো আছে শরীরে, ঐ নামটিই যথেষ্ট। একজন কৌতুক করে চেঁচিয়ে বললো, বুঢ়া জাঁহাপনা আপ ডরিয়ে মাৎ। আপকো হাম লোগ ফিন সারে হিন্দুস্তানকো বাদশা বনা দেঙ্গে !

বাহাদুর শা প্রথমে আদেশ দিলেন তাদের চুপ করবার জন্য। কেউ শুনলো না। তারপর তিনি কাতর ভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন, এত সিপাহী যেন একসঙ্গে এখানে জমায়েত না হয়। তিনি দু-চারজনের সঙ্গে কথা বলবেন। সিপাহীদের কণ্ঠস্বর আরও তুমুল হলো। তারা এখনি সম্রাটকে তাদের সকলের মধ্যে পেতে চায়। সম্রাট তাদের হয়ে লড়ায়ের ফরমান জারি করুন।

সম্রাটের একটি ছোট দেহরক্ষী দল আছে, তাদের অধিনায়ক এক ইংরেজ, ক্যাপটেন ডগলাস। সম্রাট ক্যাপটেন ডগলাসকে ডেকে তার পরামর্শ চাইলেন। ডগলাস দেখলো, দেহরক্ষীর দলও ইতিমধ্যেই গিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিশেছে। দূরে তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে আরও দলে দলে বিদ্রোহী অশ্বারোহী বাহিনী প্রবেশ করছে নগরে। ডগলাস আর দ্বিরুক্তি না করে পেছন ফিরে পালালো এবং একটি প্রাচীর লাফিয়ে লঙ্ঘন করতে গিয়ে পা মচকালো। কিছুক্ষণের মধ্যে এক সিপাহীর তলোয়ারের এক কোপে তার মুণ্ডটি বিযুক্ত হয়ে গেল শরীর থেকে।

শুরু হলো ধ্বংসলীলা। শুধু ইংরেজ নয়, খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী যে-কোনো মানুষকেই খুঁজে খুঁজে হত্যা করতে লাগলো সিপাহীরা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই দেওয়াল ঘেরা শহর দিল্লি চলে এলো বিদ্রোহীদের করায়ত্তে। বাহাদুর শাহ জাফর দেখলেন তিনি সত্যি সত্যিই সম্রাট হয়ে গেছেন, তাঁর অধীনে আছে একটি সেনাবাহিনী। এবং প্রতিদিনই বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও সৈন্য আসছে। এখন ইচ্ছে করলে তিনি প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করতে পারেন। আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়ে তিনি আবার কবিতা রচনা করতে লাগলেন।

টেলিগ্রাফ যন্ত্রযোগে কলকাতায় গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের কাছে সংবাদ এসে পৌঁছোলো অবিলম্বে। লর্ড ক্যানিং ঠাণ্ডা মাথার অভিজ্ঞ প্রশাসক। তাঁর পূর্ববর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি অনেকগুলি যুদ্ধ বিগ্রহ বাধিয়ে গিয়েছিলেন লর্ড ক্যানিং চান এখন সারা দেশের শাসন ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় করে তুলতে। এর মধ্যে আবার যুদ্ধ ? দিল্লি দখলের গুরুত্ব অসীম। দিল্লিতে যদি সিপাহীদের একটি বিরাট বাহিনী জমায়েত হয়, তাহলে উত্তর ভারতে ব্রিটিশ শক্তির টিঁকে থাকাই অসম্ভব হবে। সিপাহীদের জয়ের সংবাদের প্রভাব পড়বে অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টে, যেখানে এখনো বিদ্রোহের ধোঁয়া দেখা যায়নি। দিল্লির কাছেই নবলব্ধ পাঞ্জাব, সেখানে যদি আবার যুদ্ধ শুরু হয়, তাহলে আর সামলানো যাবে না। তৎক্ষণাৎ প্রতি-আক্রমণের ব্যবস্থা না করে তিনি সারা ভারতের সিপাহীদের উদ্দেশে এক বিবৃতি দিলেন যে, ব্রিটিশ সরকার কিংবা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কখনোই ভারতবাসীদের ধর্মীয় অধিকারে কোনোক্রমেই হস্তক্ষেপ করতে চান না। সুতরাং সিপাহীদের জাতিভ্রষ্ট হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এবং তাদের উত্তেজিত হওয়ারও কোনো কারণ নেই।

এ বিবৃতির ফল হলো বিপরীত। দিল্লিতে বাহাদুর শাহের চারপাশে সম্মিলিত সেনানায়করা লাফিয়ে উঠলো আনন্দে। তারা বলে উঠলো, ফিরিঙ্গিরা ভয় পেয়েছে! ফিরিঙ্গিরা ভয় পেয়েছে! তারা এখন সিপাহীদের তোষামোদ করতে চায়।

জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবারের বাসগৃহটি এক শনিবারের সন্ধ্যাকালে আলোকোজ্জ্বল। বাড়ির সম্মুখদ্বারের কাছে অনেকগুলি জুড়ি গাড়ি ও পাল্কি। বাবু নবীনকুমার সিংহ প্রবাসের নৌকোবিহার থেকে কিছুদিন আগে সুস্থ ও সমর্থ দেহে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। আবার পূর্ণোদ্যমে চলেছে বিদ্যোৎসাহিনী সভা, প্রতি শনিবার চলছে বিক্রমোর্বশী নাটকের মহড়া।

বারমহলের ঠাকুরদালানে বাঁধা হয়েছে মঞ্চ। মূল অনুষ্ঠানের আর দেরি নেই। সেইজন্য পর পর কয়েকটি দিন এখন পূর্ণ পোশাকেই মহড়া চলেছে। প্রতিদিন মঞ্চ সাজানো হয় টাটকা ফুল দিয়ে। রাজা পুরুরবার ভূমিকায় দিব্যকান্তি যুবক নবীনকুমারকে ভারি সুন্দর মানায়। তার কণ্ঠস্বরও সুরেলা। একটি দৃশ্যে সে মঞ্চে প্রবেশ করে অশ্বে আরোহিত হয়, সেইজন্য কিছুদিন ধরে সে অশ্বারোহণ শিক্ষা করেছে।

মঞ্চের উপর উর্বশীর প্রতি প্রণয় সম্ভাষণ করছেন রাজা পুরুরবা, সামনে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্যেরা দর্শক, এমন সময় দারুণ উত্তেজিত ভাবে সেখানে প্রবেশ করলো যদুপতি গাঙ্গুলী। সে সরাসরি মঞ্চের সামনে উপস্থিত হয়ে বললো, এসব তোমরা কী কচ্চো, নবীন? দেশে একটা রাষ্ট্রবিপ্লব হচ্চে, আর তোমরা এখনো নাটক-নবেল নিয়ে মেতে আচো?

যদুপতির কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে মনোযোগ না দিয়ে উপায় নেই। থেমে গেল অভিনয়ের মহড়া। রাজা পুরুরবা জিজ্ঞেস করলেন, রাষ্ট্রবিপ্লব? সে আবার কী, যদুপতি?

যদুপতি সকলের দিকে ফিরে বললো, আপনারা কেউ কিছু শোনেননি? দেশে ইংরেজ রাজত্ব যে যায় যায়! দেশে আবার মোগল রাজত্ব স্থাপন হতে চলেচে। সেপাইরা দারুণ ঠ্যাঙাচ্ছে ইংরেজদেরকে।

মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে এসে রাজা পুরুরবা বললো, বলো কী, যদুপতি! আবার মোগল শাসন?

মধ্য গ্রীষ্মে শহর কলকাতায় বাস করা প্রায় অসহ্য হয়ে ওঠে, রোগভোগও এই সময় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে খুব করে, সেইজন্য জনাব আবদুল লতীফ খান বাহাদুর কিছুদিনের জন্য তাঁর জমিদারি পরিদর্শনে যাবেন ঠিক করলেন। মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতটে তাঁদের সুবৃহৎ প্রাসাদ আছে, যতই গ্রীষ্ম থাকুক সন্ধ্যাকালে নদীবক্ষ থেকে ছুটে আসা শীতল সুবাতাস সেখানে প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। তা ছাড়া, এই সময় আম কাঁঠাল ওঠে খুব, জমিদারিতে থাকলে সেগুলি টাটকা পাওয়া যায়। আবদুল লতীফ ভোজনরসিক, প্রতিটি ঋতুর ফলমূল তিনি পরিপাটিভাবে উপভোগ করেন।

খান বাহাদুরের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে অনেক উদ্যোগ আয়োজন লাগে। অন্দরমহলে তিন বেগম, তাঁদের লটবহরই তো অফুরন্ত, তা ছাড়া প্রচুর লোক-লস্কর ও খান বাহাদুরের নিজস্ব সরঞ্জাম। সপ্তাহখানেক ধরেই গোছগাছ চলছে। খান বাহাদুরের নিজস্ব পেয়ারের ভৃত্য মীর্জা খুশবখৎ কাজকর্মে অতি দক্ষ, তার মনিবের কখন কোন্ জিনিসের প্রয়োজন, সে সব তার নখদর্পণে। নবাব সব ব্যাপারে তার ওপরেই নির্ভর করেন।

যাত্রার দিন আসন্ন। একদিন বিকেলে নিদ্রাভঙ্গের পর জনাব আবদুল লতীফের মনে হলো, কী যেন একটা বাদ থেকে যাচ্ছে। কী যেন একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। অথচ কিছুতেই সেটা মনে পড়ছে না।

আবদুল লতীফ হাঁক দিলেন, মীর্জা! মীর্জা!

মীর্জা খুশ্‌বখত্ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধূমায়িত আলবোলা নিয়ে উপস্থিত হলো। দিবানিদ্রার পর তার প্রভুর প্রথমেই এটা দরকার হয়।

আলবোলার নলে টান দিয়ে লতীফ সাহেব বললেন, মীর্জা, সব ঠিকঠাক বন্দোবস্ত করেছিস?

মীর্জা সেলাম ঠুকে বললো, জী সরকার! কাল সুবে সুবে আমরা বেরিয়ে পড়বো!

—কোনো জিনিস ভুল হয়নি তো?

—নেহি সরকার। বেগম সাহেবাদের জন্য তিন তাঞ্জাম, আপনার ল্যাণ্ডো সব তৈয়ার।

—তবু কী যেন একটা গলত্ হয়ে যাচ্ছে।

—নেহি, সরকার। হ্যামিলটন কোম্পানির কাছে খবর পাঠানো হয়েছিল, সে কোম্পানির লোক পাঁচ পেটি সরাব দিয়ে গেছে।

—সে তো বুঝলুম। আর কিছু ভুল হয়নি?

—আপনার চাগোশিয়া টোপী পসন্দ্ নয়, তাই পঞ্জাগোসিয়া টোপী বানানো হয়েছে। সে টোপী তো আপনি আজ সকালেই মাথায় পরে দেখে নিয়েছেন। প্রজাদের সামনে ঐ পঞ্জাগোসিয়া মাথায় দিয়ে বসবেন।

—সে তো বুঝলুম। তবু যেন কী ভুল হয়ে যাচ্ছে!

—আপনি কন্‌কাওআ আর পতংগ্-এর কথা বলছেন তো? তা-ও নেওয়া হয়েছে। আসলি লক্ষ্ণৌয়ের চীজ। আপনি পতংগ ওড়াবেন আর প্রজাদের তাক্ লেগে যাবে। মুর্শিদাবাদে আগে কেউ কন্‌কাওআ পতংগ্ দেখেনি!

—সে ঠিক আছে। আর কিছু ভুল হয়নি?

—নেহি সরকার। সব ঠিকঠাক আছে, কাল আমরা যাবো। শেখ ইমদাদ এ বাড়ি পাহারা দেবে।

—আর কিছু ভুল হয়নি, ঠিক বলছিস?

হঠাৎ মীর্জা খুশ্‌বখ্‌তের মুখখানি সাদা হয়ে গেল, দৃষ্টি একেবারে বিহ্বল। সে মাটিতে বসে পড়ে বললো, গোলামের গুস্তাকি মাফ করবেন, সরকার। এত বড় গলত্ কী করে হলো, আমি নিজেই জানি না। সব করেছি, শুধু ভকিল সাহেবকেই এখনো কোনো খবর দেওয়া হয়নি। আপনি এক দু-মাসের জন্য বাইরে থাকবেন, অথচ ভকিল সাহেব তা জানবেন না, এ কী হয়!

আবদুল লতীফ হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন, তবে! বে-তমীজ! তোর গর্দান নেওয়া উচিত! ভকিল সাহেবের পরামর্শ না নিয়ে আমি এক পা চলি না, আর সেই তাঁকেই এখনো খবর দিস্‌নি? আমি মনে না করিয়ে দিলে কী হতো?

মীর্জা মাটিতে শির ঠেকিয়ে অপরাধীর মতন বললো, জী সরকার, সত্যিই বড় ভুল হয়ে গেছে।

—যা, এখনি ভকিল সাহেবের কাছে এত্তেলা পাঠিয়ে দে!

খবর পেয়ে সেদিন সন্ধ্যার সময়েই এসে হাজির হলেন মুন্সী আমীর আলী। হাতে একটি রূপো বাঁধানো ছড়ি, মুখখানি রাগত।

বৈঠকখানা ঘরে বসে ছড়িখানা কোলের ওপর রেখে তিনি বললেন, লতীফ সাহেব, আমি জানতুম, তুমি দিলদরিয়া ভোলাভালা লোক, কিন্তু তুমি যে এমন বেওকুফ তা জানা ছিল না।

প্রথমেই এমন কঠোর ধমক খেয়ে বেশ বিচলিত হয়ে পড়লেন লতীফ খাঁ। কাঁচুমাচু ভাবে বললেন, জনাব এমন কথা বললেন কেন? কী বেওকুফী করেছি আমি?

আমীর আলী বললেন, বেওকুফী করোনি? একশোবার বেওকুফী! তুমি হুট্ করে মুর্শিদাবাদ যাচ্ছো, দেশের অবস্থা জানো?

—দেশের কী অবস্থা? দেশের যাই অবস্থা হোক, আমি নিজের জমিদারি দেখতে যেতে পারবো না?

—জমিদারি দেখতে যাবে? বেগম সাহেবাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছো আশা করি? তাঁদের ছেড়ে তো তুমি এক পাও নড়ো না! পাহারাদার বরকন্দাজ যাচ্ছে ক'জন?

আবদুল লতীফ হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মীর্জা! কতজন বরকন্দাজের ব্যবস্থা করেছিস?

মীর্জা খুশ্‌বখত্ জানালো যে চল্লিশজন সশস্ত্র বরকন্দাজ পাহারাদার হয়ে সঙ্গে যাবে, তাদের দশজনের কাছে বন্দুক আছে।

আবদুল লতীফ বললেন, গত বৎসর তিরিশজন বরকন্দাজ ছিল, এবার পাহারা আরও জোরদার

করা হয়েছে।

মুন্সী আমীর আলী চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, যত বেশী বরকন্দাজ নেবে, ততই বেশী যে তোমার বিপদ, সেকথা বোঝার মতন বুদ্ধিও তোমার নেই, লতীফ খাঁ ! মুসলমান এখন হাতিয়ার নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে পারে ? তোমার চল্লিশজন বরকন্দাজকে হাতিয়ার নিয়ে লম্ফঝম্ফ করতে দেখলে গোরা সিপাহীরা তাদের একেবারে খত্‌ম করে দেবে, তোমার জেনানাদের বে-ইজ্জত করবে, তাই তুমি চাও ?

—এ কী কথা বলছেন, মুন্সী সাহেব ? গোরা সিপাহীরা মারবে ? বছর বছর খাজনার মোহর পৌঁছে দিই, তবু মারবে কেন ?

—সাধে কি তোমায় বেওকুফ বলেছি ? গদর শুরু হয়ে গেছে, শোনোনি ? মুসলমান আর ইংরেজ এখন পরস্পরের দুশমন। একজন হাতিয়ারধারী মুসলমান দেখলেই ইংরেজ তাকে মনে করে বাগী সিপাহী। দিল্লী স্বাধীন হয়ে গেছে। সেখানে আর একজনও ফিরিঙ্গি নেই। দিল্লির লালকেল্লার মশনদে আবার বসেছেন স্বাধীন সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফর। সারা হিন্দুস্তান জুড়ে লড়াই শুরু হয়ে গেছে, আর এখন তুমি আওরতদের নিয়ে মুর্শিদাবাদে চলেছো হাওয়া খেতে ?

—মুন্সী সাহেব, আপনি বলছেন, সারা হিন্দুস্তানে আবার মুসলমান রাজ কায়েম হবে ?

—আলবৎ হবে ! ইংরেজ কতখানি ভয় পেয়ে গেছে তুমি জানো না ? সব জায়গায় তারা পিছু হটছে। এই তো গত এতোয়ারের দিন কলকাতায় কী কাণ্ড হলো, তাও তুমি শোনোনি বোধহয় !

—বলুন, বলুন মুন্সী সাহেব, সব খুলে বলুন।

মুন্সী সাহেব সবিস্তারে মীরাটের ঘটনা, দিল্লি অভিযান এবং দিল্লি দখলের কাহিনী শোনাতে লাগলেন।

এই সময় অদূরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কান্নার আওয়াজ উঠতেই লতীফ খাঁ বিরক্ত বোধ করলেন। মীর্জাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কে কাঁদে রে এই অসময়ে ?

মীর্জা বললো, সরকার, ওরা পাশের বস্তির বেহুদা ছেলেমেয়ে। এই সময় ওদের বাপ মা ওদের ক্ষুধার খাদ্য দিতে না পেরে পেটায়, তাই ওরা কাঁদে !

অসহিষ্ণুভাবে আবদুল লতীফ বললেন, তুই জানিস না, আমি কান্না সহ্য করতে পারি না ! থামা ওদের ! যা, বস্তির সব ক'টা লোককে একটা করে টাকা দিয়ে আয়। মুন্সী আমীর আলী আজ একটা বিরাট সুসংবাদ শুনিয়েছেন। শেখ্ ইমদাদ, কতলু আর হেদায়েৎকে ডাক, তোরাও এসে শোন। তার আগে বস্তির সবাইকে টাকা দিয়ে বলবি মেঠাই কিনে খেতে। আর বলবি, এর পর আর কোনোদিন যেন না কাঁদে। মুসলমানের এখন কান্নার সময় নয়, সব মুসলমানকে ইমান রক্ষার জন্য এখন হাতিয়ার ধরতে হবে। দিল্লি এখন স্বাধীন !

মীর্জা সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো, দিল্লি স্বাধীন ? তার মানে কি, সরকার ?

আবদুল লতীফ বললেন, আরে কমবখ্‌ত, স্বাধীন মানে স্বাধীন। বাদশার মাথার ওপর এখন আর কোনো ইংরেজ নেই বাদশাহ এখন আবার শাহেনশাহ্। তোকে যা করতে বললাম, কর, যা, ছুটে যা !

মীর্জা চলে যাবার পর আবদুল লতীফ মুন্সী আমীর আলীর দু পা ছুঁয়ে কদমবুসী করে আনন্দাশ্রু ঝড়িয়ে বললেন, আপনি আমায় আজ যে সংবাদ শোনালেন, তাতে আমার জীবন ধন্য হলো। এ দেশে আবার মুসলমানের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমীর আলী বললেন, এখনো পুরো হয়নি, হতে চলেছে।

—তবু দিল্লি তো আর ইংরেজের হাতে নেই। মুঘল বাদশা এখন আমাদের জান মালের মালেক্। আজ যদি আমার মৃত্যুও হয়, তাও হবে আনন্দের।

—ঠিক বলছো কি, লতীফ সাহেব ? তোমরা তো শুধু নিজেদের সুখ আর আরামের জন্যই সর্বক্ষণ মত্ত। মুসলমানের গৌরব উদ্ধারের জন্য কতখানি কী চেষ্টা করেছো এতদিন ? এখন কিন্তু সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

—নিশ্চয়ই ! আমি তৈয়ার । আপনি এতোয়ারের দিন কলকাতায় কী হয়েছিল বলছিলেন ?

—সে কথাও তুমি শোনোনি ? জানো, সিপাহীরা কখন কলকাতায় ধেয়ে আসবে, সেই ভয়ে কলকাতার সাহেবলোগ একেবারে ভীতু জানোয়ারের মতন ছটফট করছে । যতসব ডরপুক না-লায়েক ইংরেজ মার্স্টন আর রডা কোম্পানি উজাড় করে বন্দুক পিস্তল কেনার ধুম লাগিয়েছে । আর কলুটোলার বানিয়া ইংরেজ কিংবা ইদ্রুস পিদ্রুস নামে যত সব হাফ-ফিরিঙ্গি জীবনে কখনো বন্দুক পিস্তল ছুঁয়ে দেখেনি, তারাও এখন হাতিয়ার মক্সো করতে লেগেছে । ক্যানিং সাহেবকে ধরাকরা করে তারা গড়েছে এক ভলান্টিয়ার গার্ডস বাহিনী, সিপাহীরা এলে লড়বে । তা গত শনিবারের রাতে নাকি খবর এসেছিল যে পরদিন ব্যারাকপুর আর দমদমের সিপাহীরা কলকাতা আক্রমণ করবে । জেনারাল হিয়ারসি তো তড়িঘড়ি এতোয়ারের দিন সকালে সব সিপাহীর অস্ত্র কেড়ে নিলো । কিন্তু তাতে কী, সেদিন বিকালে হুজুগ উঠলো যে সিপাহীরা ব্যারাকপুর কলকাতা থেকে শহর কলকাতার দিকে ধেয়ে আসছে । ব্যস তারপর কী শোরগোল ! জান মাল বাঁচাবার জন্য সব সাহেব লাগালো দৌড় । কেউ গেল ফোর্ট উইলিয়ামে কেউ গেল জাহাজে, কেউ নৌকা নিয়েই বোধহয় বিলায়েত পাড়ি দিতে গেল । রাস্তাঘাট একেবারে ফর্সা । যারা ভলান্টিয়ার্স গার্ডে যোগ দিয়ে লড়াই করবে বলেছিল, তারাই ভেগেছে সবচেয়ে আগে, লম্বা ছুট লাগিয়েছে !

আবদুল লতীফ হো হো করে হেসে উঠলেন ।

মুন্সী আমীর আলী বললেন, শুধু হাসির কথা নয়, ভালো করে ভেবে দেখার কথা । এই টাউন কলকাতা হলো কোম্পানির রাজধানী । এখানে এই অবস্থা । হুজুগ শুনেই ইংরেজরা দৌড়োচ্ছে । দশ-কুড়ি হাজার সিপাহী সত্যি এলে এ শহর খুব সহজে দখল হয়ে যাবে । কলকাতা যদি দখল হয়, তা হলে ভেঙে পড়বে ইংরেজের রাজ্য । তখন হিন্দুস্তানের তেগ্ লণ্ডন পর্যন্ত পঁহুছিয়ে যাবে ।

উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো লতীফ সাহেবের চক্ষু দুটি । আবেগের সঙ্গে বললেন, আসবে, সিপাহীরা কলকাতায় আসবে ? আমি আজই মসজিদে গিয়ে দোয়া করবো ।

মুন্সী আমীর আলী বললেন, শুধু দোয়া করলেই হবে না । নিজেদেরও কিছু মদত দিতে হবে ।

—কিন্তু মুন্সী সাহেব, কলকাতার হিঁদুরা কি আমাদের দলে যোগ দেবে ?

—যে সব হিঁদুরা দু' পাত আংরেজি পড়েছে, তারা ইংরেজের পা-চাটা হয়েই থাকবে । ওরা যারা ডেপুটি, মুন্সেফী কিংবা কুঠিওয়ালার নোকরির জন্য হন্যে হয়ে থাকে, তারা ইংরেজকে ছাড়বে না শেষ পর্যন্ত । তা বাঙালী হিঁদুরা থাকুক না ইংরেজদের দলে, তাতে কিছু যায় আসে না ! ওরা কি লড়াই করতে জানে ? কোনোদিন হাতিয়ার তুলে ধরতে শেখেনি । শুধু দুধ ঘি খায় আর লম্বা লম্বা বাত মারে । ওদের নিয়ে কোনো চিন্তা নেই ।

—কিন্তু ওদের সংখ্যাই বেশী । কোম্পানির সরকারে ওরাই বড় বড় পদ নিয়ে বসে আছে এখন । ওরা লড়াই করতে জানে না ঠিকই, কিন্তু ষড়যন্ত্র করতে তো ভালোই জানে । যদি ইংরেজের সঙ্গে মিলে আমাদের বিরুদ্ধে লাগে ?

—সেটা হবে ওদের নির্বুদ্ধিতা । এ গদরের আগুন ছড়িয়ে পড়বে সারা হিন্দুস্তানে । এতে যে যোগ দেবে না, সে মরবে । তবে, বাঙালী হিঁদুদের মধ্যেও অনেকের ইংরেজের ওপর ভক্তি চটে গেছে । প্রথম প্রথম তারা ভেবেছিল বুঝি মুসলমানের বদলে ইংরেজের কাছ থেকেই তারা সুবিচার পাবে । এখন আর সকলের সে ভাব নেই । সেদিন আমি বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা নামে একটি আখবর দেখলাম । আমার আদালতের দোস্ত বিধুশেখর মুখার্জিবাবুর এক দোস্তের ছেলে সে আখবরে একটা সন্দর্ভ লিখেছে । ছোকরা লিখেছে যে, এই ইংরেজের শাসনের চেয়ে আকবর বাদশাহের শাসন অনেক ভালো ছিল । আকবর বাদশার আমলে হিন্দু মুসলমান সকলেই গুণের অনুযায়ী কাজ পেত । আর এখন কোনো হিন্দু ইংরেজের চেয়েও বেশী পড়ালেখা জানলেও সে কোনো ইংরেজের চেয়ে বেশী বেতনের চাকরি পায় না ।

—লিখেছে এ কথা ?

—হাঁ, লিখেছে । তা ছাড়া, সিপাহীদের মধ্যে বাঙালী হিঁদু নেই, কিন্তু অন্য হিঁদু সিপাহীরা গদরে যোগ দিয়েছে । ব্যারাকপুরে প্রথম যে সিপাহী ইংরেজকে তাক করে গোলি চালালো, সে তো হিঁদু, তার নাম মঙ্গল পাঁড়ে । কানপুরে ধুন্ধপথ নানাসাহেব বিদ্রোহী সিপাহীদের মদৎ দিচ্ছে । মুসলমান, হিন্দু সকলেরই দেশ এই হিন্দুস্তান । ইংরেজরা শোষণকারী দুশমন, তাদের হঠাতে হবে এ দেশ থেকে । তারপর একবার ইংরেজ ভাগ্‌লে সারে হিন্দুস্তানের বাদশা হবেন বাহাদুর শাহ, সমস্ত মুসলমানেরই

আবার কদর বাড়বে।

-মুন্সী সাহেব, আপনি এত সব খবর জানলেন কোথা থেকে?

—তুমি তো কিছুই পড়ো না। বাংলা পড়ো না, কিন্তু ফার্সীতে এক আখবর বেরোয় কলকাতা থেকে, তার নাম 'দূরবীন', সেটা তো অন্তত পড়ে দেখতে পারো! সেই দূরবীনে ছাপা হয়েছে বাগী সিপাহীদের এক ইস্তাহার। তাতে বলেছে, হিন্দু মুসলমানকে এক হয়ে দুশমন ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে হবে। ইংরেজ হিন্দু মুসলমান সকলেরই ধর্ম কেড়ে নিতে চায়। হিন্দু কখনো মুসলমানের ধর্ম কাড়ে না, মুসলমানও হিন্দুর ধর্ম কাড়বে না।

—ইনসা আল্লা. এবার তবে ইংরেজের দিন শেষ। কিন্তু মুন্সী সাহেব, দিল্লির সিপাহীরা কতদিনে কলকাতায় এসে পৌঁছুছিবে?

—ওরা কেন আসবে? এখানকার সিপাহীদের দিয়েই কলকাতা দখল করাতে হবে। সিপাহীরা সব ফুঁসছে। একটা আগুনের ফুলকি পড়লেই সব দপ করে জ্বলে উঠবে। এখন দরকার শুধু একটিই। একজন সেনাপতি, যাঁর অধীনে থেকে সব সিপাহী লড়বে। সেরকম সেনাপতি কে হতে পারে?

—কে?

—আর পাঁচদিন পরই তেইশ তারিখ। জুন মাসের তেইশ তারিখ কী দিন জানো তো? ঐদিন পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ ছিনিয়ে নিয়েছিল বাংলার মশনদ। সেইদিন মুর্শিদাবাদের নবাব যদি বিদ্রোহী ফৌজদের নিয়ে কলকাতা আক্রমণ করতেন, তা হলেই কি সবচেয়ে ভালো হতো না?

—নিশ্চয়ই!

—মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছে খবর পাঠানো হয়েছিল গোপনে। তিনি রাজি হননি। একেবারে অপদার্থ একটি। তিনি বললেন, তিনি ইংরেজের নুন খেয়েছেন, কিছুতেই ইংরেজের বিরুদ্ধে যাবেন না। শুনছি, কোম্পানি নাকি ফৌজ পাঠিয়ে নবাবকে বন্দী করে আনবে। তা হলে বোঝো ব্যাপারটা!

—আর কেউ নেই?

—আর একজনই আছে, যাঁকে সবাই মানবে। তিনি হলেন আওধের রাজ্যহীন নবাব ওয়াজীর আলী শাহ্।

—ঠিক বলেছেন।

—এই ওয়াজীর আলী শাহই সব বিদ্রোহী সিপাহীর নেতা হতে পারেন। চলো, কালই আমরা নবাবের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি।

শহর থমথম করছে। যে শহরের রাজপথ গলিপথ সব সময় লোকের ভিড়ে গিসগিস করে, কোলাহলে কান পাতা দায় হয়ে ওঠে, টম টম, জুড়ি গাড়ি, কেরাঞ্চিগাড়ি মানুষজনের ওপর দিয়ে চলে যায়, আল্লার ষাঁড় গাঁদাফুলের মালা চিবোয়, খেঁকি কুকুরের দল কশাইয়ের দোকানের সামনে লড়ালড়ি করে, বামুন-মুদ্দোফরাসে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায় প্রায়ই, সেই কলকাতা আজ প্রায় জনশূন্য। দোকানপাট বন্ধ, অলিন্দে গবাক্ষে দেখা যায় কৌতূহলী, ভীত মুখ, কখনো কখনো এক আধজন লোক এক বাড়ি থেকে বেরিয়ে তড়িৎগতিতে রাস্তা পার হয়ে অন্য বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে! মাঝে মাঝে পদভারে পৃথিবী কম্পিত করে টহল দিয়ে যায় গোরা সৈন্যের দল।

আগে শহরের মধ্যে সৈন্যবাহিনী প্রায় দেখাই যেত না। এখন অনেকগুলি সরকারী ভবনেই সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে। শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে, পটলডাঙার নিকটবর্তী সংস্কৃত কলেজে গোরা সৈন্যরা আস্তানা গেড়েছে। যে-কোনো দিন বিদ্রোহী সিপাহীরা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা দখল করতে আসবে।

প্রায় প্রতিদিনই বন্দরে জাহাজ আসছে, তার থেকে নামছে খাস বিলেতি সৈন্যদল। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী থেকেও সৈন্যবাহিনী পাঠানো হচ্ছে উত্তর ও পূর্ব ভারতের দিকে। বর্মাদেশের

পেগু শহর এবং সিংহল দেশ থেকেও আনানো হচ্ছে ব্রিটিশ ফৌজ।

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। কিছুদিন ধরেই বিদ্রোহের নানা ঘটনা নিয়ে সংবাদপত্রগুলিতে নানারূপ অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রকাশিত হচ্ছিল। এখন সরকার সেনসর প্রথা চালু করায় ফল হলো বিপরীত। গুজব নামক বায়বীয় বস্তুটি নাবিক সিন্দবাদের কাহিনীর কলসীর দৈত্যের আকার ধারণ করেছে এখন। শিশু হত্যা, নারী হত্যার দারুণ রোমাঞ্চকর কাহিনী সকলের মুখে মুখে। ইংরেজ সংবাদপত্রগুলি এই উপলক্ষে সমগ্র ভারতীয় জাতিকে বর্বর, পিশাচ, মনুষ্যেতর প্রাণী বলে সম্বোধন করতে লাগলো। কিন্তু এসব ছাপিয়েও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠলো, ইংরেজরা ভয় পেয়েছে। বে-সামরিক ইংরেজরা তো পলায়নের জন্য এক পা তুলে প্রস্তুত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইংরেজ বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদই বেশী আসছে। দিল্লি পুনর্দখলের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। দিল্লির অস্ত্রাগার যাতে সিপাহীদের দখলে না যায় সেইজন্য ইংরেজ সেনানীরা কত বীরত্বের সঙ্গে সেই অস্ত্রাগার ধ্বংস করে দিয়েছে এ কাহিনী পল্লবিত করে ছড়ানো হয়েছিল। অস্ত্রাগার বিস্ফোরণের আওয়াজ নাকি চল্লিশ মাইল দূরেও শুনতে পাওয়া গেছে। কিন্তু এ সংবাদও কলকাতায় এসে পৌঁছেচে যে, দিল্লির অপর একটি বৃহৎ অস্ত্রাগার প্রায় বিনা যুদ্ধে সিপাহীদের করায়ত্ত হয়েছে, বিদ্রোহীদের কাছে এখন প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র।

যাতে ত্রাস ছড়ানো না হয় সেইজন্য লর্ড ক্যানিং কড়া হুকুম দিয়েছেন জীবনযাত্রা স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যেতে। অফিস, কাছারি সব খোলা রাখা হয়েছে, কিন্তু কেউ যায় না। বিশেষত আজকের দিনটি পলাশীর যুদ্ধের শতবার্ষিকীর দিন, আজ সর্বত্র একটা কী হয়, কী হয় ভাব।

রামগোপাল ঘোষ কয়েকদিন যাবৎ অসুস্থ, শয্যাশায়ী। তাঁর কয়েকজন বন্ধু তাঁকে দেখতে এসেছিলেন গতকাল, তারপর তাঁরা এ বাড়িতেই রয়ে গেছেন। ইদানীং রামগোপালের শরীর প্রায়ই ভালো থাকে না, মদ্যপানের মাত্রাও বেড়েছে। প্যারীচাঁদ, রাধানাথ প্রায়ই আসেন এ বাড়িতে, অনেকদিন পর এসেছেন দক্ষিণারঞ্জন। আর কৃষ্ণনগর থেকে রামতনুও এসেছেন। খাটের ওপর রামগোপাল আধো শোয়া, বন্ধুরা বসেছেন কয়েকটি আরাম কেদারায়। এখন আলোচনার বিষয় একটিই, তবে কাল রাত থেকেই বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক বেঁধে যাচ্ছে রামগোপালের।

রামগোপাল মুক্তকণ্ঠে বিদ্রোহী সিপাহীদের সমর্থক। তাঁর ধারণা, এবার ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবসান হবে।

রামগোপালের সবচেয়ে বেশী বিরোধী রাধানাথ। যদিও রাধানাথ অন্য সময় ইংরেজদের কড়া সমালোচক, কিন্তু এখন তিনি পুরোপুরি সিপাহীদের বিপক্ষে। তিনি বারবার জোর দিয়ে বলছেন, তুমি বলো কী হে রামগোপাল, তোমার মাতাটাতা সব গণ্ডগুলে হয়ে গেল নাকি ব্যাধিতে ? দু'কড়ায় সব তালপাতার সেপাই, তারা লড়ুয়ে জিতবে ইংরেজদের সঙ্গে ? হেঃ ! আমি দেকিচি, বুজলে, আমি হিন্দুস্তানের এ মাতা থেকে ও মাতা পর্যন্ত ঘুরিচি, আমি তো দেকিচি এই সাহেবদের ! এ ব্যাটাদের ধাতুই আলাদা। সেপাইরা ইংরেজ মাগীদের গায়ে হাত তুলেচে, কানপুরে কুয়োর মদ্যে মেম আর শিশুগুলোনকে ফেলে মেরেচে, এর যে কী শোধ নেবে ওরা তা তো জানে না ! ইংরেজরা তাদের ফিমেলদের সম্মানরক্ষার জন্য জান দিতে রাজি। এক খৃষ্টিয়ানকে বাঁচাবার জন্য সব খৃষ্টিয়ান এককাট্টা হয়। হিঁদু কিংবা মোছলমানদের কখনো নিজের জাতের জন্য এককাট্টা হতে দেকোচো ?

রামগোপাল বললেন, মাই ডিয়ার রাধু, হিন্দু আর মুসলমান তো এখন এককাট্টা হয়েই লড়চে ইংরেজদের বিরুদ্ধে। দ্যাট ইজ এ ফ্যাক্ট। আগে কখনো যা হয়নি, তা যে কখনো হবে না, তার তো কোনো মানে নেই।

রাধানাথ বললেন, ছাই লড়চে ! আর একটু গুঁতো খেলেই দেকবে সব ভয়ে উর্দি নষ্ট করে ফেলবে, আর তখন হিঁদু দোষারোপ করবে মোছলমানদের ওপর, আর মোছলমান দুষবে হিঁদুদের। এ লড়াইয়ের আয়ু আর বড়জোর সাত দিন। আমি বলচি, লিকে রাকো।

রামগোপাল বললেন, না, তা হতেই পারে না। ইংরেজ লড়চে একটা ইম্‌মরাল ওয়র। একটা জাগ্রত জাতিকে তারা দমিয়ে রাকবার চেষ্টা করচে। আর সেপাইরা লড়চে স্বাধীনতার জন্য। শুধু তাই নয়, তোমরা আরো ভালো করে বুঝে দ্যাকো। এ লড়াই শুধু সেপাইরা লড়চে না, সাধারণ মানুষরাও

যোগ দিয়েচে, অনেক জায়গায় চাষীরাও সেপাইদের পাশে দাঁড়িয়েচে। ইতিহাসের মর্মে গিয়ে দ্যাকো, যে-দেশে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কৃষকরা হাত মেলায়, সে দেশে বিপ্লব সফল হবেই। মনে করো আমেরিকায় ওয়র অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের কতা।

রাধানাথ বললেন, তুমি বিচিত্র কতা বললে আমেরিকায় লড়াই হয়েছেল সাহেবদের সঙ্গে সাহেবদের। আর এখানে লড়াই হবে সাহেবদের সঙ্গে নেটিবদের। সাহেবদের সঙ্গে নেটিব কখুনো পারে ?

রামগোপাল ক্লিষ্টভাবে হেসে বললেন, রাধু, আমি যদি ইংলণ্ডে যাই, তখন ইংরেজরাই হবে সে-দেশের নেটিব আর আমি হবো সাহেব। আমেরিকায় আমেরিকানরাও নেটিব। তুমি নিজেই তো প্রমাণ করেচো যে নেটিব হয়েও তুমি সাহেবদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

প্যারীচাঁদ বললেন, কিন্তু ভাই, রামগোপাল, সিপাহীরা জয়ী হলে আমাদের মঙ্গল হবে, না অমঙ্গলই বেশী হবে ? আমরা সবেমাত্র পশ্চিমী সভ্যতার সুফল পেতে শুরু করিচি, আবার আমরা পিছু পানে ছুটবো ? বুড়ো বাহাদুর শাহ্ করবেন এই দেশ শাসন ? তাঁর ছেলেগুলোও এক একটা অকাল কুষ্মাণ্ড ! মোগল শাসনের শেষ দিকে কি এ দেশে অন্ধকার যুগ নেমে আসেনি ? এতদিনের মোগল শাসনে আমরা কী পেয়েচি ? অশিক্ষা, কুসংস্কার, ভোগ-বিলাসের নক্কারজনক চিত্র, অবিচার, অত্যাচার ! মোগল-পাঠানরা কখনো এদেশের সর্বত্র ইস্কুল খোলার কতা ভেবেচে ? সর্বক্ষণ ধর্ম ধর্ম করে না চেঁচিয়েও যে সুস্থ সামাজিক জীবন গড়ে তোলা যায়, সে আদর্শ আমাদের চোখের সামনে রেকেচে ? নবাবী আমলের কোনো ভালো দিক তুমি দেকতে পাও ? সব তো একেবারে রসাতলে যেতে বসেছেল। আমি ভাই জোরগলায় বলবো, ইংরেজ আমাদের রক্ষাকর্তা।

রামগোপাল বললেন, শোনো, বিপ্লবের পর একটা বিরাট পরিবর্তন আসে। তখন বাহাদুর শা শাসক হবেন, না কে শাসক হবেন, তা ঠিক করবে এ দেশের নিয়তি। আর, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে একটা নবযুগ এসেচে, বিশ্বের নানা দিকের জানেলা খুলে গ্যাচে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো আমাদের দেশেও এসে পৌঁচোতোই। আবার পেচোন পানে ফিরে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। স্বাধীন দেশ নিজে থেকেই এগিয়ে যায়।

রাধানাথ বললেন, এ সব কতা যে বলচো এ সবও তো শিকেচো ইংরেজের লেকা বই পড়েই।

রামগোপাল বললেন, কোনো বই কোনো জাতের নিজস্ব সম্পত্তি নয়।

প্যারীচাঁদ বললেন, সেপাইরা কিন্তু তোমার মতন বই পড়েনি। তোমার ঐ বাহাদুর শা কিংবা ধুন্ধুপন্থও জ্ঞান-বিজ্ঞানের তোয়াক্কা করে না, তারা জিতলে মধ্যযুগই আবার ফিরে আসবে, তারা বর্বরতারই পুনঃপ্রবর্তন করচে।

রাধানাথ অট্টহাস্য করে বললেন, জিতবে ? ছোঃ ! ছোঃ ! এই সেপাইরা জিতবে, এমন কতা স্বপ্নেও ভেবো না।

রামগোপাল একটু আহতভাবে বললেন, তোমরা মহান ডিরোজিও'র শিষ্য হয়েও তোমাদের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগে না ? বিদেশীর পদানত হয়ে থাকাটাই তোমাদের কাচে সুখের ? হেয়ার, বীটনের মতন দু-চারটে ভদ্র ইংরেজের কতা আলাদা, কিন্তু অধিকাংশ ইংরেজ আমাদের কী চোখে দ্যাকে, তা কি তোমাদের জানতে বাকি আচে ?

প্যারীচাঁদ বললেন, মোগল আমলে আমরা হিন্দুরা কি স্বাধীন ছিলুম ? তুমি বলো কি রামগোপাল ? তখুনো তো আমরা পদানতই ছিলুম। যদি পদানত থাকাই আমাদের নিয়তি হয়, তা হলে একটু ভদ্রগোচের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পায়ের তলায় থাকাটাই ভালো নয় ?

এবার দক্ষিণারঞ্জন ওদের কথায় বাধা দিয়ে কথা বলে উঠলেন। তিনি বললেন, তোমরা এই লড়াইটাকে শুধু সেপাই আর ইংরেজদের লড়াই বলেই ভাবচো কেন। এ তো লড়াইয়ের একটা দিক মাত্র। সারা হিন্দুস্তান আজ ইংরেজ শাসনে বিক্ষুব্ধ। দেশটাকে চুষে একেবারে ছিবড়ে করে দিচ্চে ইংরেজ। ভারত এই সেদিন পর্যন্ত ছিল একটা পণ্য উৎপাদনকারী দেশ, আর আজ কী অবস্থা ! আগে দেশ-বিদেশে ভারতের দ্রব্যের চাহিদা ছিল আর আজ আমাদের দেশ সারা ইওরোপের কাঁচা বাজার। আমাদের তাঁতশিল্পকে ইংরেজ একেবারে ধ্বংস করে বিলিতি কাপড় এখন চালাচ্চে এদেশে। ভাই প্যারী, আমি একদিক থেকে রামগোপালের সঙ্গে একমত। তুমি মোগল শাসনের সঙ্গে তুলনা করলে, কিন্তু তুলনাটা একটু ভাসা ভাসা হয়ে গেল না ? তুমি ইংরেজের ভদ্রগোচের ফর্সা পা দেখেই ভুললে। কিন্তু ঐ পা যে দশ গুণ ভারী সেটা ভেবে দেকলে না ? মানচি যে মোগল আমলে অত্যাচার অবিচার

ছেল, কিন্তু মোগল শাসকেরা এদেশের ধনরত্ন অপহরণ করে সব দৌলত আরব পারস্যে পাটিয়ে দেয়নি। তারা এদেশেরই লোক হয়ে গ্যাচে। মোগলরা ব্যবসা করতে নামেনি, সাধারণ চাষীর উৎপাদনে হাত দেয়নি। আর দ্যাকো, নীলকরদের জ্বালায় সাধারণ চাষী তার মাঠে ধান না ফলিয়ে নীল চাষে বাধ্য হচ্চে। পেটের মার সবচে বড় মার। মোগলরা অত্যাচার করতো, নারীহরণ, লুঠপাট করতো, কিন্তু ইংরেজ সুকৌশলে গোটা দেশের মানুষকে পেটে মেরে দিচ্চে।

রামগোপাল বললেন, ঠিক বলেচো, দক্ষিণা।

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, এ লড়াই শুধু সেপাইরা লড়চে না। কিচুদিন আগে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করেছেল, ইংরেজ তাদের পিটিয়ে অনেকটা ঠাণ্ডা করলেও তারা শান্ত হয়নি, যে-কোনো সময় তারা আবার ফুঁসে উঠবে। ফরাজীরাও স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেল, তাদের নেতা দুদ্দু খাঁ এখন জেলে, কিন্তু তাঁর হাজার হাজার চ্যালা আচে বলে শুনিচি, তারা যে-কোনো দিন ইংরেজের বিরুদ্ধে আবার অস্ত্র ধরতে পারে। নীল চাষীরাই বা কতদিন এই অত্যাচার মেনে নেবে ? লড়াই লাগবে নানা দিক দিয়ে। ইংরেজ কী ভাবে সবাইকে ঠেকাবে ?

রামগোপাল বললেন, তোমরা বুজতে পাচ্চো না কেন, এটা কত বড় একটা শুভ লক্ষণ যে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে মিলে দেশের স্বাধীনতা চাইচে।

প্যারীচাঁদ বললেন, যদি কোনোক্রমে ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে চলে যায়, তা হলেই আবার দেকবে, হিন্দুর ভাগ্যে লবডঙ্কা ! হাতিয়ার তো মুসলমানদের হাতে, শাসনভারও তাদের হাতেই থাকচে।

রাধানাথ বললেন, যাবে না, যাবে না, ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে যাবে না, কোনো চিন্তা নেই। কী বলো, তনু ? তুমি চুপ করে রয়েচো, কিচু বলচো না ?

স্বল্পভাষী রামতনু বললেন, আমি শুনচি তোমাদের কতা। তবে আমার মত যদি জিজ্ঞেস করো, তা হলে বলি, আমি ইংরেজ শাসনের পক্ষে। এ দেশ সবেমাত্র জেগে উঠেচে, এখনো স্বাবলম্বী হবার মতন ঠিক উপযুক্ত হয়নি।

রামগোপাল উত্তেজনার সঙ্গে উঠে বসে বললেন, তোমরা যাই বলো, আজ যদি সেপাইরা কলকাতায় এসে পড়ে, আমি নিজে তাদের স্বাগতম জানাবো, তাদের বুকে জড়িয়ে ধরবো।

প্যারীচাঁদ বললেন, তার আগেই সেপাইরা তোমায় কচুকাটা করবে !

রাধানাথ আবার হেসে উঠলেন।

রামগোপাল বললেন, কেন ? সেপাইরা নিজের দেশের লোকদের মারচে, এমন তো শুনিনি।

প্যারীচাঁদ বললেন, বাঙালীদের ওপর তাদের ভারি রাগ। তুমি তো প্যাণ্টালুন না পরে রাস্তায় বেরোও না, প্যাণ্টালুন পরা লোক দেকলেই নাকি সেপাইরা ঠ্যাঙাচ্চে।

রাধানাথ বললেন, আর মেদ্নীপুর থেকে রাজনারায়ণ চিঠিতে কী লিখেচে, বলো ?

প্যারীচাঁদ বললেন, রাজনারায়ণ বড় মজার কতা লিকেচে। ও তো মেদিনীপুরের হেড মাস্টার। ওকে স্কুল আওয়ারে সর্বদা প্যাণ্টালুন-কোট পরে থাকতে হয়। এদিকে মেদিনীপুরে সেপাইদেরও একটা ছাউনি আচে। কখুন সেপাইরা বিদ্রোহী হয়ে রে-রে করে ছুটে আসবে তার ঠিক নেইকো। তাই রাজনারায়ণ প্যাণ্টালুন কোটের নিচে ধুতি আর পিরান পরে থাকে। সেপাইদের আসতে দেকলেই প্যাণ্টালুন-কোট ছেড়ে ভিড়ে মিশে যাবে।

রাধানাথ বললেন, একদিন শুধু হুজুকেই নাকি ইস্কুলের সব মাস্টাররা প্যাণ্টালুন-কোট খুলে একেবারে····।

প্যারীচাঁদ বললেন, দু দিন আগে বিদ্যাসাগর মশায়ের বাড়ি গেসলুম। তিনিও মুখ চুন করে বসে আচেন, দেকলুম।

রামগোপাল বললেন, কেন ? বিদ্যাসাগর মশাই তো প্যাণ্টালুন পরেন না !

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, হ্যাঁ, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ভয়ের কারণ আচে বটে, এমন আমিও অনুমান করিচি।

রামগোপাল আরও বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন ?

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, বিদ্যাসাগর মশাই বিধবা আইনের প্রবক্তা এ কতা সারা ভারতে কারুরই অবিদিত নেই। সেপাইরা বিধবা বিবাহের ব্যাপারটা খুবই কু-নজরে দেকেচে। তারা মনে করে, সতীদাহ নিবারণ, বিধবার বিবাহ, এই সব আইন পাশ করে ইংরেজ আমাদের ধর্মে আঘাত হেনেচে। আর কলকাতার ইংরেজী-জানা বাঙালীরা ইংরেজকে মদত দিয়েচে। তাই শিক্ষিত বাঙালীদের ওপর

তাদের রাগ।

প্যারীচাঁদ বললেন, শুনচি নাকি বিদ্যাসাগর মশাই সরকারের কাচে গিয়ে বলবেন, বিধবা বিবাহ আইন আবার রদ করে দিতে।

রামগোপাল গলা চড়িয়ে বললেন, কক্ষনো না। তা হতে পারে না। বিদ্যাসাগর একটা মহৎ কাজ করেচেন, আবার সেটা বন্ধ হবে? যারা বিধবা বিবাহের বিপক্ষে ছেল, তাদেরই মধ্যে কিছু মতলববাজ সেপাইদের নামে এ সব রটাচ্ছে।

রাধানাথ বললেন, তবেই বোঝো, রামগোপাল, তুমি তো খুব সেপাইদের নামে সাফাই গাইছেলে। তারা ইংরেজদের হটালে এই সব ভালো ভালো কাজ রদ করে দেবে। ইংরেজী পড়ার ইস্কুলগুলোও বন্ধ করে দিয়ে আবার আরবী-ফার্সী পড়াবে।

রামগোপাল দক্ষিণারঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমরা ডিরোজিও'র শিষ্যরা নানান ব্যাপারে আমাদের মত প্রকাশ করেচি, উপযুক্ত আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েচি, আর এখন দেশে এত বড় একটা কাণ্ড হচ্চে, আমরা কোনো কতা বলবো না? কোনটা মন্দ তাও জানাবো না?

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, ইংরেজ শাসনের দোষ-ত্রুটি ও অবিচার দেকিয়ে আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের চেষ্টা করতে হবে তো বটেই। কিন্তু আমার মনে হয়, এই সঙ্কটের সময় প্রকাশ্যে ইংরেজের বিরোধিতা না করাই ভালো। ঘটনার গতি কোন্ দিকে যায়, সেদিকে আমাদের এখন শুধু লক্ষ্য রাখাই উচিত কাজ হবে।

জোড়াসাঁকোর সিংহ বাড়িতেও এই একই সময় একই বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। বিদ্যোৎসাহিনী সভার কয়েকজন সভ্য এ বাড়িতেই কিছুদিনের জন্য বসতি নিয়েছেন। নাটক অভিনয়ের নেশা এমনই লেগে গেছে যে কিছুতেই আর মহলা বন্ধ করতে তাদের মন চায় না। মাঝে মাঝেই অবশ্য বিদ্রোহের কথা ওঠে।

অনেক আলোচনার পর বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্যরাও সিদ্ধান্ত নিল যে বর্তমান সময়ে ইংরেজ শাসনকে সমর্থন করাই সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। ইংরেজদের অনেক দোষ আছে সত্য, তবু ইংরেজরা এদেশে মোটামুটি সুশৃঙ্খল, সভ্য শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে, তার বদলে শিক্ষাহীন, নীতিহীন সিপাহীদের শাসন চালু হলে দেশের চরম দুর্দিন আসবে, চরম অরাজক অবস্থা চলবে। যদুপতি গাঙ্গুলী ও নবীনকুমার সিপাহীদের এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষে দু-চারটি কথা বলতে গিয়েছিল, কিন্তু হিন্দু প্যাট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ মুখুজ্যে যুক্তিপূর্ণ, তীব্র ভাষায় তাদের একেবারে নিরস্ত করে দিল। হরিশের কথাই শেষ পর্যন্ত মেনে নিল সকলে।

সেদিন ওদের বৈঠক শেষ হলো অনেক রাতে। পলাশীর যুদ্ধের শতবার্ষিকীর দিনটিতে কলকাতা শহরে কিছুই ঘটলো না। অন্যরা সকলে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লো মজলিশ কক্ষে, নবীনকুমার গেল নিজের ঘরে।

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেল নবীনকুমারের। পার্শ্বে শায়িত সরোজিনীকে ঠেলা দিয়ে ডেকে নবীনকুমার বললো, সরোজ, সরোজ, ওঠো, ওঠো।

সরোজিনী ধড়ফড় করে জেগে উঠে বললো, কী, কী হয়েচে?

নবীনকুমার বললো, আমি বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেকলুম। স্বপ্ন কিনা কে জানে। তুমি বাইরে রাস্তায় কোনো শোরগোল শুনতে পাচ্চো? আমি যেন এখুনো শুনচি!

সরোজিনী বললো, কই, কোনো শব্দ নেই তো! সব তো একেবারে শুনশান!

নবীনকুমার বললো, তা হলে স্বপ্নই। আমি কী দেকলুম জানো, সেপাইরা এসে পড়েচে আর কলকেতা শহর একেবারে কব্জা করে নিয়েচে এক লহমায়।

সরোজিনী বললো, ওমা, এ কী সব্বুনেশে কতা! এমন স্বপন কেউ দ্যাকে? সেপাইরা এলে আমাদেরও মেরে কুটে শেষ করবে না?

নবীনকুমার বললো, হ্যাঁ, হরিশ তো তাই বললে। সবাই বললে। আমি স্বপ্ন দেকলুম একেবারে সত্যের মতন। সেপাইরা সব সাহেব মেমদের কচুকাটা কচ্চে। তারপর একটা অদ্ভুত কাণ্ড হলো।

– কী?

—আমি তো বুঝে গেচি যে ইংরেজই আমাদের পক্ষে ভালো। সেপাইরা বর্বর। ইংরেজ শাসন না থাকলে আমাদেরই বিপদ। কিন্তু স্বপ্নে যখন দেকলুম, সেপাইরা ইংরেজদের মারচে, ইংরেজরা ভয়ে হাউ মাউ কচ্চে আর পোঁ পোঁ দৌড়চ্চে, তখন আমার খুব আনন্দ হলো। আমি আনন্দে নাচতে লাগলুম। বলো, ভারী আশ্চর্য না?

লক্ষ্ণৌ নগরী আবার ইংরেজমুক্ত। দিল্লিতে স্বাধীন সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর প্রতিদিন কোলাহলমুখর দরবারে বসছেন এবং এখন সত্যিকারের ফরমান জারি করছেন। সারা উত্তর ভারত জুড়ে চলছে হানাহানি, কাটাকাটি। বিদ্রোহী সিপাহীরা যে ঠিক কতখানি এলাকা দখল করেছে কিংবা ইংরেজ বাহিনী কত জায়গায় পরাজিত হয়েছে বা কোন্ কোন্ শহর পুনর্দখল করতে পেরেছে, তা সঠিকভাবে জানবার উপায় নেই। ঘটনার চেয়ে রটনার রূপ অনেক বেশী বিচিত্র এবং গতিবেগও প্রচণ্ড।

ইংরেজরা যাকে সিপাহী বিদ্রোহ নাম দিয়েছে, ইতিমধ্যে পৃথিবীর অনেকের কাছে তা বিপ্লব বলে প্রতিভাত হচ্ছে। নিস্পন্দ, ঘুমন্ত, অতিকায় ভারত বুঝি জেগে উঠলো এইবার। ভারতীয় বিপ্লবের ফলাফলের ওপরেই নির্ভর করছে এশিয়ায় ইওরোপীয় উপনিবেশগুলির ভবিষ্যৎ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানবপ্রেমিক এবং বিপ্লববাদীরা প্রকাশ্যে সমর্থন ও অভিনন্দন জানাচ্ছেন ভারতীয় যোদ্ধাদের কার্ল মার্কস্ নামে এক উনপঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক ইহুদী দার্শনিক এবং সমাজতাত্ত্বিক অত্যন্ত উৎসাহিত ও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ভারতের সিপাহী যুদ্ধের ঘটনায়। স্বদেশ থেকে নির্বাসিত এই দার্শনিকটি জীবিকার জন্য মাঝে মাঝে আমেরিকার নিউ ইয়র্কের ডেইলি ট্রিবিউন পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর লেখনী যেমনই ক্ষুরধার, তাঁর মতামতও সেরকমই সুচিন্তিত। ভারতে না এসেও তিনি ভারত সম্পর্কে অনেকদিন ধরেই পড়াশুনো করছেন। তাঁর মতে, ইংরেজ যদিও জঘন্য, বর্বরোচিত স্বার্থ নিয়েই ভারত শাসন ও শোষণ করতে এসেছে, তবু এই ইংরেজ শাসনের পরোক্ষ প্রভাবে ভারতের অনেক উন্নতি হয়েছে। ভারতের মৃতকল্প, গ্রামকেন্দ্রিক, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন যুগে। ব্রিটিশের আনা বাষ্পযান, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়েছে ভারতীয় জীবনযাত্রায়। ইংরেজ বুর্জোয়া শিল্পপতিরা নিজেদের প্রয়োজনেই রেলপথ এবং নতুন নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ করছে, তার ফলে এক শিল্প প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে ভারতে। এর পর ভারতের জনগণ সবল হয়ে ইংরেজের শাসনযন্ত্রকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলতে পারলেই পরিপূর্ণভাবে আসবে জনগণের মুক্তি। আর ভারত তথা এশিয়ায় সমাজ সংগঠনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন এলে তবেই মানবজাতি পৌঁছোতে পারবে পরিপূর্ণ লক্ষ্যে।

কার্ল মার্কস্ ভাবলেন, ভারতে এই সেই মুক্তির সময়। সিপাহীদের সংগ্রাম সার্থক হবে। তিনি দারুণ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন যুদ্ধের অগ্রগতি। তিনি লিখলেন:

“There cannot, however, remain any doubt but that the misery inflicted by the British on Hindusthan is of an essentially different and infinitely more intensive kind than all Hindusthan had to suffer before.”

এত নিপীড়নের প্রতিক্রিয়ায় এবার মুক্তি আসবেই।

মুঘল ভারতের রাজধানী দিল্লি এখন আবার মুঘল সম্রাটের অধিকারে। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা কবে মুক্ত হবে? বাঙালীদের প্রতি সিপাহীদের কোনো আস্থা নেই। বাঙালীদের মধ্যে বিশেষত হিন্দুরা ইংরেজের তল্পিবাহক, তাই বাঙালীদের নাম শুনলেই সিপাহীদের নাসিকা কুঞ্চিত হয়। উত্তর ভারতে সিপাহীরা ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে, দ্বিতীয় শ্রেণীর শোষণের প্রতিনিধি বাঙালী হাকিম-উকিল, ডাক্তার-মোক্তার-কেরানীদেরও পেটাবার জন্য ধাবিত হয়।

খিদিরপুরে জনাব আবদুল লতীফের বাড়িতে এক অপরাহ্ণে একটি নিভৃত বৈঠক বসেছে। মুন্সী আমীর আলী দুজন অপরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। একজন বেশ তরুণ বয়স্ক, অত্যন্ত সুপুরুষ, ধপধপে সাদা চুস্ত ও শেরওয়ানী পরা, মাথায় আলমপসন্দ, অর্থাৎ সূঁচোলো টুপী, গলায় একটি মোতির মালা। এঁর নাম আগা আলী হাসান খাঁ, ইনি এসেছেন লক্ষ্ণৌ থেকে এবং এঁর বেশভূষা দেখলে বোঝা যায়, ইনি খাস নবাবী দরবারের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। অন্য জনের পরনে ধুতি এবং সবুজ রঙের বেনিয়ান, মাথায় ফেজ, মধ্যবয়স্ক, এঁর নাম মুহম্মদ গরিবুল্লা।

এ কক্ষের জানালা ও দ্বার বন্ধ, বাইরে আবদুল লতীফের বিশ্বস্ত নিজস্ব ভৃত্য প্রহরায় রয়েছে। এঁরা কথা বলছেন ফিসফিস করে। আগা আলী হাসান খাঁ গোপনে লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছেন বিদ্রোহীদের দূত হয়ে। কলকাতা দখল করতে না পারলে হিন্দুস্তান থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করা যাবে না। সেজন্য কলকাতাবাসীরা কী করছে? কলকাতার হিন্দুরা কী বলে?

মুন্সী আমীর আলী বললেন, বেয়াদব, বাঙালী হিন্দুদের ওপর কোনো ভরসা করে লাভ নেই। বাঙালী হিন্দু একে তো লড়তেই জানে না, তার ওপর কলকাতার মাথা মাথা বড় মানুষ হিন্দুরা সবাই ইংরেজের তাঁবেদার। যত সব হাঁড়ি, মুচি, শুদ্দুর আর গরীব বামুন-কায়েত ইংরেজের গোড় চেটে দশ আধলার লায়েক হয়েছে। ও হারামখোরদের কথা বাদ দাও! আমাদের মুসলমানদেরই উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য আবদুল লতীফের মতন খানদানী ধনী ব্যক্তিদের সাহায্য চাই।

আবদুল লতীফ বললেন, আমি তৈয়ার। মুসলমানের ইমান রক্ষার জন্য আমি যথাসর্বস্ব দিতে প্রস্তুত।

আগা আলী হাসান খাঁ উর্দুতে বললেন, লক্ষ্ণৌতে, কানপুরে কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে লড়ছে। আপনারা জানেন বোধ করি, আওয়ধে অনেক হিন্দু তালুকদারের নিজস্ব রাজোয়ারা বাহিনী আছে, সেইসব রাজোয়ারা বাহিনী এখন সিপাহীদের সঙ্গে লড়ছে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। হিন্দুদের খুশী করার জন্য আমরা ওদিকে এখন গো-হত্যা নিষেধ করে দিয়েছি।

মুন্সী আমীর আলী বললেন, সে আপনাদের ওদিকে হতে পারে। কিন্তু আমাদের এদিকের হিন্দুরা বড় বেয়াড়া, বদ-নসীব।

গরিবুল্লা গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, আমি একটা কথা কইতে পারি?

মুন্সী আমীর আলী বললেন, হাঁ হাঁ, বলুন, বলুন।

তারপর অন্যদের সঙ্গে ভালো করে পরিচয় করে দিয়ে বললেন, এই জনাব গরিবুল্লা এসেছেন ঢাকা থেকে। ইনি একজন ফরাজী। দুদু মিঞার সাগরেদদের সব খবরাখবর ইনি রাখেন। ইনি গ্রাম দেশের কথা ভালো বলতে পারবেন। আমারও বিশ্বাস, গ্রামদেশ থেকেই আগে লড়াই শুরু করতে হবে।

গরিবুল্লা বললেন, আপনেরা কইলকেতার লোক, আপনেরা সকলেই নিশ্চয় জানেন যে আমাগো দুদু মিঞারে পুঙ্গিরপুত ইংরাজরা কইলকাতার জ্যালখানায় আটক কইরা রাখসে? হ্যারে আমরা ছাড়ামু, জ্যালখানা ভাইঙ্গা, দুদু মিঞারে বাইর করুম। আমাগো পঁচিশ হাজার লাইঠ্যাল আসে, এক সাথে সব হুড়মুড় কইরা আইস্যা পড়ুম।

মুন্সী আমীর আলী মোটামুটি এই বক্তব্য অনুবাদ করে বোঝালেন আগা আলীকে। তিনি জানালেন যে বাংলার মুসলমানরা কিছুকালের মধ্যে দু'বার বিদ্রোহে মেতে উঠেছিল। প্রথমে তাদের বিদ্রোহ স্থানীয় অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে হলেও ক্রমে সরকারের সঙ্গেও সংঘর্ষ হয়। বারাসতে আর নদীয়ায় কৃষকরা তীতু মীরের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান করেছিল। এই তীতু মীর বিখ্যাত ওয়াহাবী নেতা সৈয়দ আহমদের শিষ্য। আগা সাহেব সৈয়দ আহমদের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই।

আগা আলী বললেন, উনি তো সুন্নি?

মুন্সী আমীর আলী বললেন, বাংলার অধিকাংশ মুসলমানই সুন্নি। দয়া করে এখন আর শিয়া সুন্নির প্রশ্ন তুলবেন না। সৈয়দ আহমদের শিষ্য এই ওয়াহাবীরা হিন্দু জমিদার আর নীলকরদের বিরুদ্ধে তো লড়েছেই, এমনকি ইংরেজ কম্পানির ফৌজের সঙ্গেও মুখোমুখি লড়াই দিয়েছে। যুদ্ধে তীতু মীর মারা যান আর তাঁর সহকারীর ফাঁসী হয়। ওয়াহাবীরা সাময়িক ভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় বটে কিন্তু এখন তারা আবার জমায়েত হচ্ছে। বিদ্রোহী সিপাহীরা বাঙ্গলা আক্রমণ করলে ওয়াহাবীরাও তাদের সঙ্গে হাত মেলাবে। ঠিক কিনা, গরিবুল্লা সাহেব?

গরিবুল্লা বললেন, হ ছায়েব, আপনে ঠিকই কইসেন। এবার শোনেন, আমাগো ফরাজীগো কথা কই।

মুন্সী আমীর আলী বললেন, দাঁড়ান, আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলছি। ফরিদপুর থেকেই এই আন্দোলনের শুরু। শরিয়ৎউল্লা নামে এক তেজী মুসলমান মক্কা থেকে হাজী হয়ে আসেন, তারপর তিনি প্রচার করতে থাকেন যে আল্লার রাজত্বে সব মানুষই সমান, গরীবের ওপর কর বসাবার কোনো অধিকার জমিদারদের নেই। জমিদার যেমন দরিদ্র প্রজাদের দুশমন, সেই রকম জমিদারদের মদৎ দেয় যে ইংরেজ সরকার, তারাও সাধারণ মানুষের দুশমন। হাজী শরিয়ৎউল্লার ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র দুদু মিঞা ফরাজীদের নেতা হন। শুনেছি প্রায় লাখখানেক ফরাজী এই দুদু মিঞার নেতৃত্বে জান দেবার জন্য তৈয়ার ছিল। কয়েক জায়গায় লড়াইয়ের পর দুদু মিঞা ইংরেজের হাতে ধরা পড়েছেন এবং জেলে আছেন। কিন্তু দুদু মিঞার শিষ্যরা এখন ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য প্রস্তুত। কী, ঠিক বলেছি?

গরিবুল্লা বললেন, হ। জ্যালখানা থিকা দুদু মিঞা তেনার দামাদরে পত্তর ল্যাখসেন যে তেনারে একবার বাইর করাইতে পারলেই তিনি পুঙ্গির পুত ইংরাজদের ঘেটি ভাঙবেন! আমি সেই খবর লইয়া আইসি।

মুন্সী আমীর আলী বললেন, খুব ভালো কথা!

গরিবুল্লা বললেন, আরও একটা কথা আসে। ছায়েব, আপনেরা হিন্দুগো বাদ দেওয়ার কথা কইলেন না? তাইলে শোনেন। আমি মাহেদিগঞ্জ থানার করপায়া গেরামে গোলাম নবী কাসেদের বাড়ি গেসিলাম। হেহানে গিয়া দেহি, ফরাজীগো মইধ্যে কিছু হিন্দু লাইঠ্যালও বইস্যা আছে। তারাও ফরাজীগো লগে লগে ইংরাজদের সাথে যুইদ্ধ করতে চায়। তারাও গরীব পরজা। গোলাম নবী কাসেদ কইলেন, হ, আমরা হিন্দুগোও দলে নিমু! আমরা ফরাজীরা মনে করি, সব গরীব মানুষই সমান। তয় হিন্দু গো বাদ দিমু ক্যান? হিন্দু জমিদার, মুসলমান জমিদার হক্কলডিই আমাগো দুশমন।

জনাব আবদুল লতীফ সন্দেহসঙ্কুল নয়নে চাইলেন গরিবুল্লার দিকে। এ যে অন্য সুরে কথা বলে! মুন্সী আমীর আলী অতিশয় বুদ্ধিমান, তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটি চাপা দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভালো কথা। কিছু হিন্দু লাঠিয়ালকে যদি আমরা সঙ্গে পাই তো বেশ কাজে লাগানো যাবে তাদের। এখন আমাদের প্রধান শত্রু ইংরেজ, সেই কথাই ভাবুন, অন্য প্রসঙ্গ আনবেন না। আমরা হিন্দুস্তানে আবার মুঘল শাসন কায়েম করতে চাই।

আগা আলী বললেন, না, লক্ষ্ণৌতে আমরা মুঘল শাসন চাই না। মুঘলরা সুন্নি। আমাদের আওধে পবিত্র শীয়া ইসনা অশারী ধর্ম মানি। মুঘলরা দিল্লিতে থাক, কিন্তু আওধ পৃথক থাকবে।

মুন্সী আমীর আলী বিচলিত ভাবে বললেন, আগা সাহেব, ও কথাও এখন তুলবেন না। শীয়া হোক, সুন্নি হোক, ইংরেজ হটিয়ে ইসলামেরই তো জয় হবে। আওয়ধের নবাব ওয়াজীদ আলী শাহ তো কখনো শীয়া-সুন্নির বিভেদ মানেননি শুনেছি। ওসব থাক, এখন লক্ষ্ণৌয়ের কী হাল আমাদের বলুন।

আগা আলী বললেন, লক্ষ্ণৌ এখন পরিপূর্ণ স্বাধীন। মীরাট থেকে বাগী সিপাহীরা গেছে দিল্লি দখল করতে আর এলাহাবাদ-ফয়জাবাদ থেকে বাগী সিপাহীরা লক্ষ্ণৌতে এসে লাগিয়ে দিয়েছিল গদর। স্থানীয় লোকরাও যোগ দিল তাদের সঙ্গে। ইংরেজরা ভয়ে পালিয়ে বেলি গারদে আশ্রয় নিয়েছে। বিদ্রোহীরা লক্ষ্ণৌয়ের সিংহাসনে বসিয়েছিল নবাব ওয়াজীদ আলী শাহেরই এক পুত্রকে। তার নাম বীরজীস কদ্র, তার উমর মাত্র দশ বৎসর।

আবদুল লতীফ বললেন, দশ বৎসরের বালক নবাব? বলেন কী?

আগা আলী বললেন, শাহী বংশের কারুকে তো বসতে হবে। লক্ষ্ণৌয়ে আর কেউ নেই ও বংশের। বীরজা কদ্রসের জননী বেগম সাহেবা হযরত মহল হয়েছেন তার মুগতার। তিনিই আড়াল থেকে দরবার চালাচ্ছেন।

মুন্সী আমীর আলী বললেন, কিন্তু এক বালক আর এক নারী কতদিন আওয়ধের স্বাধীনতা রক্ষা করবে? সৈন্যদের পরিচালনা করবে কে?

আগা আলী বললেন, সিপাহীদের সামলানোই মুশকিল। প্রত্যেকেই নিজেকে মনে করছে নবাব। ফয়জাবাদের বিদ্রোহীদের নেতা এহমদউল্লাহ শাহ একজন নামকরা যোদ্ধা। তিনি নিজেই সেনাপতি হয়ে পৃথক দরবার বসাচ্ছেন। বেগম সাহেবা হযরত মহল এক রকম ফরমান দিচ্ছেন আবার এহমদউল্লা অন্য রকম ফরমান দিচ্ছেন। প্রচুর গোলমাল। আমি চেষ্টা করেছি দুই দরবারের সংযোগ সাধন করতে। তবু লক্ষ্ণৌ ছেড়ে এই সময় আমায় কলকাতায় আসতে হলো।

বাকি সকলে নীরব রইলেন কিছুক্ষণ। কল্পনায় অঙ্কিত করবার চেষ্টা করলেন লক্ষ্ণৌয়ের দৃশ্য। মুন্সী আমীর আলী সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছেন, সেইজন্য অনেকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। কিন্তু অন্য দুজন বাংলার বাইরের অবস্থা সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ।

আগা আলী গম্ভীরভাবে বললেন, আমার আগমনের উদ্দেশ্য দুটি। সুবে বাংলায় সিপাহী গদরের শুরু। কিন্তু তারপর আর কিছু হলো না। এখানকার সিপাহীদের জাগাতে হবে এবং তাদের সঙ্গে হাত মেলাবার জন্য আপনাদের সাহায্য চাই। এবং বাদশা ওয়াজীদ আলী শাহকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে লক্ষ্ণৌ নগরীতে। সবচেয়ে ভালো হয়, তিনি যদি এখানকার বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন, তাদের সাহায্যে কলকাতা দখল করেন। তা হলে বিজয়ীর বেশে তিনি ফিরতে পারবেন লক্ষ্ণৌতে।

মুন্সী আমীর আলী এবং আবদুল লতীফ পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর দুজনেই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মুন্সী আমীর আলী আড়ষ্টভাবে বললেন, জনাব, এ চিন্তা আগেই আমার মাথায় এসেছিল। বাংলার মুসলমান আর সিপাহীদের নেতৃত্ব দেবার প্রস্তাব নিয়ে আমরা দুজন দেখা করবার চেষ্টা করেছিলাম নবাব সাহেবের সঙ্গে। কিন্তু আমাদের নিরাশ হতে হয়েছে।

আগা আলী জিজ্ঞেস করলেন, বাদশা আপনাদের প্রস্তাব মানলেন না?

মুন্সী আমীর আলী বললেন, ওয়াজীদ আলী শাহের কাছে পহুঁছোতেই পারলাম না। নবাবের সুযোগসন্ধানী দোস্ত শাগির্দ-এর অন্ত নেই। তারা অন্য লোকদের নবাবের কাছ ঘেঁষতে দেয় না। আপনাকে কী বলবো আগা সাহেব, ইসলামে নাচগান অতি গুনাহ্। আর নবাব কি না সর্বক্ষণ তা নিয়েই মেতে আছেন। আরে ছিয়া ছিয়া তোবা তোবা!

আগা আলী বললেন, ও সব কথা আমি জানি। বাদশাহের ওখানে গিয়ে আর কী দেখলেন বলুন।

মুন্সী আমীর আলী বললেন, দেখে শুনে মনে হয়, নবাব আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা মনে করছে, তারা যেন লক্ষ্ণৌয়ের কায়সর বাগেই রয়েছেন। শুধু বিলাসিতার স্রোত। রাজ্য গেচে সেদিকে হুঁশ নেই, নবাব এখনো রমণী সম্ভোগেই মত্ত। চাকরাণী মেথরাণী জাতীয়া স্ত্রীলোকদেরও তিনি মুত্আ করে বেগম মহলে স্থান দিচ্ছেন।

আগা আলী বললেন, নবাবকে এই পঙ্কিল অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে হবে। আপনারা একটু ব্যবস্থা করে দিন, যাতে নবাবের সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে পারি।

মুন্সী আমীর আলী বললেন, সে বড় শক্ত কাজ হবে।

আগা আলী বললেন, শুনুন, স্বয়ং বাদশাহ আমাকে দেখলেই চিনবেন। তাঁর শার্গিদরাও অনেকেই আমাকে চেনে। মুখ দেখে না চিনলেও নামে চিনবে। আমার পক্ষে দেখা করা শক্ত কাজ নয়। কিন্তু আমার ওপর ইংরেজদের নজর আছে। জানেন, আমি এখানে এসেছি অতিশয় গোপনে। ইংরেজ একবার আমার সন্ধান পেলে আমার এই প্রিয়তম মুণ্ডটি আর আমার ধড়ের ওপর শোভা পাবে না। সেইজন্যই আমি আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী। আপনারা এমন কোনো ব্যবস্থা করুন, যাতে আমি কোনো কৌশলে, ইংরেজের অগোচরে বাদশাদের নূর মহলে পৌঁছোতে পারি। আমি শুধু বিলাসপ্রমত্ত বাদশাহের সামনে গিয়ে বলবো, "অ্যায় খুল বতুখুর সনদম তু বুআ্যায় কসে দারী" (ওগো ফুল এখনো আমি তোমার প্রতি মুগ্ধ, তোমাতে ও কিসের সৌরভ!)

মুন্সী আমীর আলী একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, একটি মাত্র উপায়ই বাৎলানো যায়। আমি যতদূর জানি, নবাব ওয়াজীদ আলী শাহ যে এই বিলাসের স্রোতে ডুবে আছেন, এতে কোম্পানির সরকারের প্রশ্রয়ই আছে। নবাব এখনো ইংরেজের কাছ থেকে খোরপোশ গ্রহণ করেননি, নিজেকে এখনো তিনি রাজ্যচ্যুত স্বাধীন নবাবই মনে করেন। নবাবের জননী ইংলণ্ডে গেছেন হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা করতে।

আগা আলী বললেন, এ সব তো আমরা জানি, আপনি এখন কী করা যায়, সেই কথা বলুন!

মুন্সী আমীর আলী পেশায় আইনজীবী, তাই যে-কোনো বক্তব্যই তিনি সবিস্তারে এবং পটভূমিকা অঙ্কিত করে বলতে ভালোবাসেন। অন্য সকলকে তাঁর চেয়ে অজ্ঞ মনে করাও তাঁর স্বভাব। তিনি হাত তুলে বললেন, আগে সব শুনুন, তা হলে বুঝবেন। যা বলছিলাম, ব্রিটিশ আদালত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির খেয়াল খুশী অনুযায়ী চলে না। কোম্পানির প্রতিনিধি হয়ে জেনারেল উট্রাম বেআইনীভাবে আওয়ধ দখল করেছে। ব্রিটিশ আদালতের মামলায় কোম্পানি হেরে যেতে পারে। নবাব ওয়াজীদ আলী শাহ আবার ফিরে পেতে পারেন তাঁর রাজ্য। সেইজন্য কোম্পানি চাইছে...

—মুন্সীজী, এ সব কূট কথা পরে শোনা যাবে। আমি চাই তুরন্ত বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে।

—কোম্পানীর ফৌজ ওয়াজীদ আলী শাহের বাড়ির ওপর নজর রেখেছে। দেখা করতে গেলেই আপনি ধরা পড়ে যাবেন। সেইজন্যই বলছিলাম, দেখা করার একটাই উপায় আছে। কোম্পানি চায় নবাব যত খুশী বিলাসে মত্ত থাকুক। নবাবের সঞ্চিত অর্থ খরচ হয়ে যাক।

—আমাদের বাদশাহের কাছে প্রচুর ধনরত্ন আছে।

—আপনি ওয়াজীদ আলী শাহকে বাদশাহ বলছেন। কিন্তু আমাদের কাছে হিন্দুস্তানের বাদশাহ একজনই, তিনি বাহাদুর শাহ জাফর। সে যাই হোক, আপনি নবাবের বিলাসের বহর দেখেননি, দেখলে বুঝবেন, দৈনিক কত মুদ্রা ব্যয় হয়। তাঁর শত শত মুসাহিব আর শাগিদ। আর আছে হাজার হাজার জানোয়ার আর চিড়িয়া আর স্ত্রীলোক। এ সব পুষতে কত খরচ হয় জানি না। যেখানে আয় নেই শুধু ব্যয় সেখানে অফুরন্ত ধনরত্নও একদিন ফুরিয়ে যায়। ইংরেজ কোম্পানি চায় নবাবের অর্থ ফুরিয়ে যাক। তারপর নবাব কোম্পানির কাছে খেসারত আর পেনসনের তনখা চাইতে বাধ্য হোক। ব্যস, একবার নবাব কোম্পানির কাছ থেকে টাকা নিলেই মামলা চুকে গেল। আয়ওধের ওপর নবাবের আর কোনো দাবি থাকবে না। বীরজীস কদ্র যতদিন লক্ষ্ণৌয়ের সিংহাসনে আছে, তার মধ্যে এটা হয়ে গেলেই ইংরেজের লাভ। কারণ, লক্ষ্ণৌ এখন ইংরেজের অধিকারে নেই। সুতরাং লক্ষ্ণৌ ফিরিয়ে দেবার মামলা এখন অচল।

—আমরা দেশ থেকে ইংরেজকেই তো উচ্ছেদ করে দিচ্ছি। তার মধ্যে এত মামলা মোকদ্দমার কথা কেন ? মামলায় কিছু হবে না। তলোয়ার বন্দুকে ফয়সালা করতে হবে। আপনি ওয়াজীদ আলী শাহের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন আমার।

—নবাবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে রেণ্ডী কিংবা নাচনেওয়ালী সাজতে হবে, পারবেন ? আপনার চেহারা খাপসুরৎ আছে, আপনাকে মানিয়ে যাবে, কিন্তু এই বুড়ো বয়েসে আমি মাগী সাজবো কী করে ? রেণ্ডি, নাচনেওয়ালী ছাড়া আর অন্য কারুকে এখন ইংরেজের প্রহরীরা নবাবের বাড়ির কাছ ঘেঁষতে দিচ্ছে না !

আগা আলী অধীরভাবে বললেন, মুন্সীজী, আপনি অযথা সময় বরবাদ করছেন। শহর কলকাত্তায় কি ঘুংঘটওয়ালী, নটকনওয়ালীর অভাব আছে ? শুনেছি তো রাতের সময় এখানে হুরীর মেলা বসে। যত টাকা লাগে লাগুক, আপনি দু-চারটি বেশ মনজিলওয়ালী ধরনের রেণ্ডী ভাড়া করুন। তাদের সঙ্গে আমরা দুজন তবলিয়া, সারেঙ্গিয়া সেজে বাদশার নূর মহলে ঢুকে যাবো।

—আপনি খানদান বংশের লোক, আপনি কি ওরকম ভেক ধরতে পারবেন ?

—ইংরেজ হঠাবার জন্য আমি এখন সব কিছু করতে পারি।

অল্পক্ষণ পরে সেদিনকার মতন গোপন সভা ভঙ্গ হলো। ঠিক সুবিধা মতন রূপসী নর্তকী সংগ্রহ করতে সময় লেগে গেল আরও দুদিন। মৌলা আলীর দরগার কাছেই চাঁদবিবি নামে এক নামকরা মালকান আছে, তার কুঠীতে সে দশ-বারোটি বিদ্যুৎ প্রভাময়ী রূপসী গুণবতী তয়ফাওয়ালী পোষে। তার মধ্য থেকে বেছে বেছে, এক নজরেই মস্তক ঘূর্ণিত হবার মতন চেহারার দুটি যুবতীকে ভাড়া করা হলো অগ্নিমূল্যে।

মুন্সী আমীর আলী এবং আগা আলী নিপুণভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। দুদিন তাঁরা মুখমুণ্ডন করেননি, পরণে ঢোলা পাজামা ও শস্তা সিল্কের বেনিয়ান। মুখ ভর্তি পান, সেই পানের পিক গড়িয়ে পড়েছে জামায়, গলায় লাল রঙের রেশমী রুমাল বাঁধা, মাথায় চকচকে জরির টুপী উল্টাভাবে বসানো। মুন্সী আমীর আলী জীবনে কখনো সুরা পান করেননি, তবু চক্ষু দুটি ঢুলু ঢুলু করে রেখেছেন, হাতে সারেঙ্গী, কিন্তু তিনি ছড় টানতেও জানেন না।

মেটিয়াবুরুজে পর পর অনেকগুলি বাড়ি নিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গো সমেত আস্তানা গেড়েছেন নবাব ওয়াজীদ আলী শাহ। পাল্কি থেকে সেখানে নেমে আগা আলী বুঝলেন যে মুন্সী আমীর আলী ঠিক কথাই বলেছেন। একদল গোরা সৈন্য সেখানে পাহারা দিচ্ছে, উটকো লোক নবাব মহলে প্রবেশ করতে চাইলে জিজ্ঞেসবাদ করা হচ্ছে তাদের।

মুন্সী আমীর আলীর কাজ পাকা। তিনি সঙ্গে করে একটি নকল এত্তেলা পত্র নিয়ে এসেছেন। গোরা সৈন্যরা কিছু প্রশ্ন করার আগেই তিনি পত্রটি দাখিল করে বোঝাতে চাইলেন যে নবাবের দরবারের আহ্বানেই তাঁরা এসেছেন। গোরা সৈনিক দেখে আগা আলীর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, জোর করে তিনি মাতালের ভান করতে লাগলেন। ইংরেজ প্রহরীরা অবশ্য বাধা দেবার কোনো চেষ্টাই

করলো না, পত্রখানি যাচাই করলো না তারা, জড়ির চুমকি বসানো নীল ওড়না পরা দুই সুন্দরীকে দেখেই তারা মৃদু হাস্য করলো এবং হাতের ইঙ্গিতে জানালো, যাও, যাও।

সদর পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে আগা আলী এবং মুন্সী আমীর আলী হাঁফ ছাড়লেন। আর কোনো ভয় নেই, নবাব মহলের মধ্যে সম্পূর্ণ অরাজকতা, কে কোন্ দিকে আসছে না যাচ্ছে, তাতে কারুর কোনো খেয়াল নেই। এখন প্রশ্ন, নবাবকে খুঁজে বার করা। এর মধ্যে একটি উৎপাত এই যে, যার কাছেই কিছু প্রশ্ন করা যায়, সে-ই আগে টাকা চায়। উৎকোচ বা বখশিশ না পেয়ে কেউ মুখ খুলবে না। যাই হোক, কোনোক্রমে জানা গেল যে নবাব এখন আছেন সুরসেস্ মঞ্জিলে। পাশের উদ্যানটি পার হলেই সেই মঞ্জিল।

সেই মঞ্জিলে প্রবেশ করার পর সমস্যা হলো, কোন্ কক্ষে নবাব আছেন সেটা জানা। পর পর দুজন ভৃত্যকে উৎকোচ দেবার পর, তৃতীয় জনের ক্ষেত্রে আগা আলী উগ্রমূর্তি ধারণ করলেন। সেই ভৃত্যের টুঁটি চেপে ধরে আগা আলী বললেন, বেওকুফ্, বল কোথায় বাদশা আছেন? সে ভৃত্যটি জোর করে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতেই আগা আলী বসনের অভ্যন্তর থেকে একটি ছুরি বার করে বললেন, এখনি তোর কলিজা ছিঁড়ে নেবো!

ভৃত্যটি কাঁপতে কাঁপতে তখন দ্বিতলের একটি কক্ষের কথা জানালো। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় আরও দু-একজন লোক বাধা দেবার চেষ্টা করতেই আগা আলী সবলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন তাদের। তারপর নর্তকী দুটির দিকে চেয়ে চক্ষু নরম করে বললেন, তোদের কাম ফতে হয়ে গেছে, এখন যেখানে খুশী যা। খবর্দার কারুর কাছে মুখ খুলবি না।

আগা আলী গলা থেকে রুমাল খুলে ফেললেন এবং ছুরিকাটি আবার গোপন করলেন। তারপর এক ধাক্কায় খুলে দিলেন নির্দিষ্ট কক্ষটির দ্বার।

বিকেল ও গোধূলির সন্ধিক্ষণে নবাব ওয়াজীদ আলী শাহ পাঁচজন সঙ্গীসহ সেই কক্ষে নামাজ আদায় করছিলেন। আগা আলী ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে টুপী খুলে নত মস্তকে অপেক্ষা করতে লাগলেন। একটু পরেই নামাজ শেষ হলো, নবাব মুখ তুলে চাইলেন আগন্তুকদের দিকে। আগা আলী কুর্নিশ করতে করতে পাঁচ পা এগিয়ে তারপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং নবাবের পা ছুঁয়ে কদমবুসী করলেন। তারপর ফারসী ভাষায় বললেন, বাদশাহের ভৃত্য আগা আলী হাসান খাঁ অনেক কষ্টে হুজুরের সমীপে হাজির হয়েছে। বাদশাহ দীর্ঘজীবী হোন। হুজুর তাঁর এই ভৃত্যটিকে চিনতে পেরেছেন নিশ্চয়ই।

নবাবের অঙ্গে সাদা রেশমের আঙরাখা, তার তলায় হালকা নীল রঙের শলূকা (ছোট জামা)। প্রখর গ্রীষ্মে তাঁর ললাট ঘর্মসিক্ত। আগা আলীর কথা শোনার পর তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন মুন্সী আমীর আলীর দিকে। এত রকম উত্তেজনার মধ্যে মুন্সী আমীর আলী গলায় রুমাল এবং মাথায় টুপী খুলতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাড়াতাড়ি সেগুলি খুলে বারবার কুর্নিশ করতে লাগলেন।

নবাব দণ্ডায়মান দুই আগন্তুকের উদ্দেশে বললেন, বয়ঠো!

আগা আলী বললেন, হে বাদশা, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটি অতি জরুরি ও গোপন কথা আছে, সেগুলি আমি আপনাকে নিভৃতে বলতে চাই।

নবাব এ কথার কোনো উত্তর দিলেন না এবং তাঁর সঙ্গীদেরও যেতে বললেন না। আগা আলী নিজেই গরম চক্ষে লোকগুলির দিকে তাকালেন। সেই লোকগুলি সম্ভবত আগা আলীকে চিনতে পেরেছে, তাই তারা বিনা বাক্যব্যয়ে নিজেরাই উঠে গেল।

আগা আলী নবাবের উদ্দেশে বললেন, হুজুরে আলম নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পেরেছেন? যে মসীহউদ্দীন খাঁ-কে আপনি মুখতার-এ আম দিয়ে বিলায়েতে পাঠিয়েছেন মামলা দাখিল করবার জন্য, আমি সেই মসীহউদ্দিন খাঁ-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। হুজুরে আলম অনেকবার আমাকে দেখেছেন।

নবাব নীরব রইলেন।

তারপর আগা আলী শোনালেন বর্তমান লক্ষ্ণৌয়ের অবস্থা। ওয়াজীদ আলীর সন্তান বিরজীস কদ্র এখন লক্ষ্ণৌয়ের সিংহাসনে আসীন, তার নামে মুদ্রাও বার করা হয়েছে, প্রজারা আবার কর দিচ্ছে। এখন সকলেরই ইচ্ছা বাদশাহ আবার লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসুন। বাঙ্গালায় মুসলমানরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত। হুজুরে আলম একবার ডাক দিলেই সকলে তাঁর অধীনে জমায়েত হবে, তখন সহজেই কলকাতা দখল করা যাবে।

মুন্সী আমীর আলী এবার শোনালেন ফরাজী এবং ওয়াহাবীদের প্রস্তুতির কথা। চট্টগ্রাম, ঢাকা, মেদিনীপুরে সিপাহী ব্যারাকেও উত্তেজনা চলছে, যে-কোনো দিন সিপাহীরা বিদ্রোহ করতে পারে। শুধু শাহী বংশের কারুর নেতৃত্বের অপেক্ষা।

নবাব সম্পূর্ণ নীরব রইলেন। পর্যায়ক্রমে তিনি দুই বক্তার মুখের ওপর দৃষ্টি স্থাপন করতে লাগলেন, কিন্তু একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না।

আগা আলী আরও বিশদভাবে ফুটিয়ে তুললেন বিদ্রোহের চিত্র। দিল্লিতে সিপাহীদের জয়লাভের কাহিনী। লক্ষ্ণৌতে এখন বইছে খুশীর জোয়ার। নবাবেরই বেগম হযরত মহলের নামে প্রজারা দিচ্ছে জয়ধ্বনি।

মুন্সী আমীর আলী বললেন, নবাব যদি এখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গোপনে কোথাও অবস্থান করতে চান, তাহলে সে ব্যবস্থাও করা আছে।

নবাব ওয়াজীদ আলী শাহ সময় বিশেষে বাক্‌সংযমী হিসেবে বিখ্যাত। এখন তিনি একেবারে পাথরের মূর্তির মতন নীরব নিথর হয়ে গেছেন। তাঁর মুখে কোনো ভাবের রেখাই ফুটলো না।

আগা আলী কাতরভাবে বললেন, হুজুরে আলম, কিছু বলুন!

কোনো উত্তর না দিয়ে নবাব উঠে দাঁড়ালেন। পেছনের দরজা দিয়ে তিনি চলে গেলেন পাশের কক্ষে। তারপর সেখানে একেবারে সাদা একটি দেয়ালের কাছে চলে গিয়ে, দেয়ালে নাসিকা ঠেকিয়ে তিনি কেঁদে উঠলেন উচ্চস্বরে।

নবাবের কান্নার আওয়াজ শুনে তাঁর অনেক সহচর-অনুচর ভিড় করে দাঁড়ালো সেই কক্ষের কাছে। আগা আলী এবং মুন্সী আমীর আলীও অপ্রস্তুত।

বেশ খানিকক্ষণ ধরে দেয়ালের দিকে মুখ করে ক্রন্দন করলেন নবাব। তারপর মুখ ফেরালেন এক সময়। তাঁর বস্ত্র ভিজে গেছে অশ্রুধারায়। নবাব অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, "খোআব থা জো কুছভী দেখা, জো সুনা আফসানা থা।" যা কিছু দেখেছি, সবই স্বপ্ন, যা কিছু শুনেছি, সবই কাহিনী।

তারপরই তিনি ডাক পাঠালেন কলমচীর উদ্দেশে। সে হাজির হতে তৎক্ষণাৎ মুসাবিদা করা হলো একটি পত্রের। নবাব কোম্পানির সরকারকে জানিয়ে দিলেন যে বিদ্রোহীরা এসে তাঁকে উস্কানি দিচ্ছে, তিনি এর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চান না একটুও। ইংরেজের বিরুদ্ধে আগেও লড়াই করেননি, এখনো লড়াই করবেন না। এবং এই অবস্থায় তাঁর পক্ষে বাইরে থাকাও নিরাপদ নয়, সরকার বাহাদুর যেন তাঁকে কেল্লার মধ্যে স্থান দেন।

পত্রপাঠ ইংরেজ সরকার নবাবকে নিয়ে গেল ফোর্ট উইলিয়ামে। আগা আলী এবং মুন্সী আমীর আলীও বন্দী হলেন, তাঁদের রাখা হলো ফৌজি গারদে।

কেল্লায় নিরাপদে অবস্থানের জন্য নবাবের নিজস্ব জিনিসপত্রের সঙ্গে এলো সতেরোটি বালিশ। দুদিকে পাশ ফিরে শোবার সময় নবাবের দুই কানের জন্যও ছোট দুটি কান-বালিশ লাগে। সেই বালিশের স্তূপের মধ্যে নিশ্চিন্তে শুয়ে থেকে নবাব আবার মন দিলেন কবিতা রচনায়। গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের মহানুভবতার জন্য তাঁর প্রতি প্রশস্তিমূলক এক দীর্ঘ কবিতা রচনা করে পাঠিয়ে দিলেন।

হীরা বুলবুলের তীর্থ দর্শনের সাধ দিন দিন বেড়েই চলছিল। রাইমোহন নানারূপ ওজর আপত্তি তুলে টালবাহনা করছিল বলে এক সময় জেদ ধরল যে রাইমোহনকে বাদ দিয়ে সে নিজেই সব ব্যবস্থা করবে। এখনো তার অর্থের অকুলান নেই। দেহ-ব্যবসায় এবং সংগীত-বৃত্তি পরিত্যাগ করার পর এখন সে তার বেশভূষার প্রতি কোনো মনোযোগ দেয় না, সাধারণ আটপৌরে শাড়ি পরে বাড়িতে থাকে। কলকাতার মাথা মাথা বাবুদের দেওয়া বেশ কিছু স্বর্ণালঙ্কার তার কাছে রয়ে গেছে।

রাইমোহনের অগোচরেই একদিন সে তার অনেকগুলি বিক্রয় করে দিয়ে এলো গুপী স্যাকরার দোকানে। এই অর্থ দিয়ে সে এবার বজরা ও লোক-লস্কর ভাড়া করবে। সে মনস্থ করেছে, সে যাবে জগন্নাথধামে। পতিতপাবন সকলকেই আশ্রয় দেন, তার মতন পতিতাকেও কি তিনি উদ্ধার করবেন না!

যথাসময়ে সব জানতে পেরে রাইমোহন একেবারে শশব্যস্ত হয়ে উঠলো। হীরা বুলবুলকে সে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলো যে এই সময় কি কেউ বিদেশ বিভুঁয়ে যায়! সেপাইদের হেঙ্গামা চলছে। চতুর্দিকে নানা রকম উৎপাত, দেশে একেবারে যেন অরাজক অবস্থা! এই সময় পথে-ঘাটে পদে পদে বিপদের ভয়। কিন্তু হীরা বুলবুল এসব কিছুই বুঝবে না। সে অনাথিনী, তীর্থযাত্রিণী, তার আবার ভয় কি!

এই পড়ন্ত যৌবনেও যে তার শরীরে মোহ উদ্রেককারী রূপ রয়েছে, সে বিষয়ে সে একেবারেই উদাসীন।

শেষ পর্যন্ত হীরা বুলবুলের একগুঁয়েপনার কাছে রাইমোহনকে বশ্যতা স্বীকার করতে হলো। বিদ্যোৎসাহিনী সভায় ইদানীং তার যাতায়াত একটু কমে গিয়েছে, সেখানকার নাট্য-অভিনয় কিছুদিনের জন্য স্থগিত আছে। সিপাহী যুদ্ধের যে-কোনো রকম নিষ্পত্তি না হলে নতুন করে কিছু শুরু করা যাবে না। রাইমোহন নিজে কখনো শ্রীরামপুরের ওদিকে কোথাও যায়নি। সুতরাং হীরার সঙ্গে যাওয়াই সে মনস্থ করল। জগন্নাথক্ষেত্র অতি প্রাচীন তীর্থস্থান, দেখাই যাক না গিয়ে একবার।

রাইমোহনের খুব একটা দেব-দ্বিজে ভক্তি নেই। জীবনের বহু রকম ঘূর্ণিপাকে পড়ে সে বুঝেছে যে যথাসময়ে যথারীতি কৌশল প্রয়োগ করাই জীবন ধারণের প্রকৃষ্ট পন্থা। যার পুরুষকার থাকে, সে সমাজের তুঙ্গে ওঠে, যার থাকে না, কোনো ঠাকুর দেবতা তার কান ধরে টেনেও তাকে ওপরে তুলতে পারে না। যে-যাতে আমোদ পায় তাই নিয়েই সারা জীবন মজে থাকে। কেউ ভালোবাসে যুদ্ধ বিগ্রহ, কেউ অর্থ, কেউ সন্তান উৎপাদন, কারুর থাকে রূপ-লালসা, কারুর বা শুধুই ফক্কুড়ি। রাইমোহনের ঝোঁক এই শেষোক্ত দুটির দিকেই। তাই নিয়েই তো প্রায় এতখানি জীবন কাটলো।

একটা বড় বাসনা ছিল রাইমোহনের, কিন্তু হীরা বুলবুলের জন্য সেটি পূর্ণ হলো না। সে চেয়েছিল সর্বসমক্ষে এই শহরের কিছু বড় মানুষের মুখোশ খুলে দিতে। তাদের কীর্তি কাহিনী নিয়ে সে গান বাঁধবে, আর হীরা বুলবুল গাইবে। জনসাধারণ ধিক্কার দেবে তাদের, এইভাবে হীরা বুলবুলের পুত্র চন্দ্রনাথের প্রতি অবিচার ও অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়া যেত। কিন্তু হীরা বুলবুলের আর ওসবে মন নেই, গান গাওয়াও সে সম্পূর্ণ বন্ধ করেছে। পুত্রশোক তার বুকে শেল হয়ে বিঁধে আছে, জীবনের আর কিছুতেই তার আর সাধ নেই, কথাবার্তার মধ্যেও একটু যেন পাগল পাগল ভাব।

রাইমোহনের নিজের কণ্ঠ সুরেলা নয়, সে সঙ্গীত শিক্ষক, কিন্তু গায়ক নয়, তার গান কেউ শুনবে না। সেইজন্য সে এখন মধ্যে মধ্যে ভাবে যে বড় মানুষের কেচ্ছা সমন্বিত গানগুলি সে লিখে পুস্তকাকারে ছাপাবে বেনামীতে, তারপর হাটে-বাজারে বিলি করবে।

একটি বজরা ভাড়া করা হলো আসা-যাওয়ার চুক্তিতে। দুজন হিন্দুস্থানী বরকন্দাজও নেওয়া হলো সঙ্গে। শুভদিন শুভ লগ্ন দেখে এবার বেরিয়ে পড়লেই হয়। যাত্রার প্রাক্কালে হীরা বুলবুল রাইমোহনকে বললো, তুমি যে আমার আঁচল ধরে যাচ্চো,একটা কতা কিন্তু মনে রেকো, আমি আর না ফিত্তেও পারি। যদি মন চায়,আমি সেখানেই ঠাকুরের চরণে পড়ে থাকবো।

রাইমোহন বললো, তুই কি জগন্নাথ ক্ষেত্তরে গিয়ে চৈতন্য ঠাকুর হবি নাকি রে বেটী? না ফেরার কতা বলচিস! যাবো, দেকবো, ফুত্তি করবো, ফিরে আসবো, এই হলো গে কতা!

—তিত্থির এস্থানে গে ফুত্তি? ফের ও-কতা বললে ঠেঙ্গিয়ে বিষ ঝেড়ে দোবো একেবারে।

—আরে ফুত্তি তো তোর সঙ্গে, অন্য কারুর কতা কি বলচি! আরে শোন, তিত্থিস্থানে বেশী দিন থাকলে পুণ্যের ফল হয় না। কতায় বলে তিত্থি দর্শন, তিত্থি থাকন কেউ বলে?

—তোমার ওসব ছেঁদো কতায় আমি ভুলচিনি। আমার মন না চাইলে আমি আর ফিরবো না। এই আঁস্তাকুড়ের জায়গায় আমার কি ফেরার ঠেকা? তোমার খুশী হয় তুমি ফিরো।

—আমায় ছেড়ে তুই থাকতে পারবি? তোর মন কাঁদবে না?

—মরে যাই, মরে যাই! থু থু থু! তোমায় দেকলে আমার অঙ্গ জ্বলে যায়। অলপ্পেয়ে, ঢ্যামনা! বেম্মদৈত্যির মতন আমার ওপর চেপে আচে, সারাটা জেবন একেবারে জ্বালিয়ে খেলে গা! কতায় বলে, যে বেটা রাঁড়ের ভাতার, তার নেই গুণের ওধার!

—আহা রে, মধু, মধু ! আরও বল ! রাগলে তোর মুক দিয়ে মণি মুক্ত ঝরে, কান যেন জুড়িয়ে যায়। একেই বলে শ্রবণ সাথক, নয়ন সাথক !

—তোমার তো দু কান কাটা, নাকও কাটা। ঐ হাড়গিলের মতন চোক দুটো যদি কেউ গেলে দিত !

—এ যে সেই গান হলো গে, 'ওরে প্রাণ প্রাণ রে বাকি নেই আর। নাক কাটাতে নাক কান কাটা প্রাণ তোমার হলো লাজে মরে যাই...' একটু শোনাবি ?

—চোপ। যা বললুম মনে রেকো, পরে যেন আমায় দুষো না। আমি যদি আর না ফিরি...

—ওরে আমার হীরেমণি, তুই না ফিরলে কি আমি ফিরতে পারি ? তোর ছিচরণে প্রাণ মন সঁপে একবার যখন ঠাঁই নিয়িচি, তখন তোর সঙ্গে তো আমি নরকেও যাবো ! তিথ্যিস্থান তো ভাগ্যের কতা।

—ঠিক আচে, দেকো বাবু, যেন তখন পেঁচপাও হোয়ো না।

—তোকে যদি আমি ফিরিয়ে আনতে না পারি তা হলে আমার নাম রাইমোহন ঘোষালই নয়। তখন দেকিস, আমি সত্যিই নাক কান কাটবো !

শরৎকাল, ঝড় বাদলার তেমন ভয় নেই, বজরা চললো তরতরিয়ে। একবার ভাবা হয়েছিল, জলপথের বদলে স্থলপথে গেলে কেমন হয়। রাজা সুখময় রায় পুরী যাত্রীদের জন্য উলুবেড়ে থেকে কটক পর্যন্ত পাকা সড়ক নির্মাণ করিয়ে দিয়ে গেছেন। মধ্যে মধ্যে ধর্মশালা। স্নান ও পানীয়ের জন্য পুষ্করিণী ও কূপ-ও খনন করিয়েছেন অনেকগুলি, সেইজন্য এখন স্থলপথ দিয়েই জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাওয়া সুবিধাজনক। কিন্তু হীরা বুলবুল এবং রাইমোহন দুজনেই বেশ কয়েকবার বাবুদের সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে বজরা ভ্রমণে এসেছে, জলপথে তারা অভ্যস্ত, সেই তুলনায় ডুলি-পালকিতে যাত্রা তাদের কাছে আরামদায়কও মনে হয়নি।

রাইমোহন আশা করেছিল যাত্রাপথটি বজরা বিহারের মতন মনোরম হয়ে উঠবে। পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কোন বাবু নেই, কিন্তু সে নিজেই বা কম কী, বিশেষত হীরা বুলবুলের মতন সঙ্গিনী রয়েছে যখন। জ্যোৎস্নার রাতে হীরা বুলবুল আবার আগেকার মতন জড়ির চুমকি বসানো গাঢ় নীল রঙের শাড়িতে সজ্জিত হবে, কপালে থাকবে চন্দনের টিপ। আর সে নিজে কোঁচানো ধুতি ও হলুদ রেশমী বেনিয়ানটি পরে বসবে। হাতে গোড়ের মালা, সামনে সুরার পাত্র। মুখের রঙ জ্বলে গেছে, ত্বক কুঞ্চিত হয়েছে, তবু এই বৃদ্ধ বয়েসেও তার চেহারাটি একেবারে ফেলে দেবার মতন নয়। হীরা বুলবুল গানে বাতাস মাতোয়ারা করবে, আর সে নেশার ঝোঁকে, মেরে ফেল, মেরে ফেল, মেরি জান বলে উঠবে। হীরেমণির কণ্ঠে সুরের তিন লহরী খেললে সে মোহর ছুঁড়ে উপহার দেবে তাকে। এই উপলক্ষে সে বেশ কয়েক বোতল ব্র্যাণ্ডি এবং একজন তবলিয়াকেও সঙ্গে করে এনেছে।

কিন্তু হীরা বুলবুল এর কিছুই হতে দিল না। সে একখানা সামান্য কস্তা ডুরে তাঁতের শাড়ি পরে থাকে। কিছুতেই আগের মতন বসন ভূষণ অঙ্গে চাপাতে রাজি নয়। গানের কথা শুনলে সে মুখ ঝামটা দেয়। এমনকি, এক রাত্রে দীপ্ত নক্ষত্রময় নীল আকাশ দেখে মোহিত হয়ে রাইমোহন ব্র্যাণ্ডি ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে যেই নিজের ভাঙ্গা গলায় একটা গান গেয়ে উঠলো, অমনি বিরক্ত ক্রুদ্ধ হয়ে হীরা বুলবুল তার হাত থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতল কেড়ে নিয়ে শূন্যে তুললো। রাইমোহন আহা হা করচিস কী, করচিস কী বলতে বলতেই হীরা বুলবুল সে বোতল ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীর জলে। রাইমোহন কোনো ভৎসনা না করে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো হীরা বুলবুলের দিকে। তার চোখে অন্য দৃশ্য ভেসে উঠলো। দু-তিন পাত্র সুরা পান করলেই একেবারে চনমনে হয়ে উঠতো হীরেমণি, গান গাইতে গাইতে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কোমর দোলাতো, ওষ্ঠাধর একটু স্ফীত, স্বেচ্ছায় ওড়না খসিয়ে দিত বুক থেকে। দু চোখে যেন দুটি বাগদাদের ছুরি, সুরার পাত্রটি একহাতে মাথার ওপর ধরা...। মাত্র তো কয়েক বৎসর আগেকার কথা, সেই রমণীর এ রকম পরিবর্তন !

কলকাতা থেকে যতই দূরে সরে যাচ্ছে, ততই উতলা হয়ে উঠছে হীরা বুলবুল, কতক্ষণে পৌঁছোবে। এখন জগন্নাথদেবই তার ধ্যান জ্ঞান, মুখে আর অন্য কথা নেই। মাঝে মাঝে সে ব্যাকুল ভাবে রাইমোহনকে প্রশ্ন করে, হ্যাঁ গা, যদি আমি ঠাকুরের কাচে হত্যে দিই, যদি বুক চিরে রক্ত দিয়ে ঠাকুরের পুজো দিই, তবু কি ঠাকুর আমার বুকের ধন চাঁদুকে ফেরৎ দেবেন না ? বলো না গো ?

রাইমোহন শুষ্ক কণ্ঠে সান্ত্বনা দেয়। গত দু তিন বৎসর অনেক অনুসন্ধান করেও চন্দ্রনাথের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। রাইমোহনের ধারণা, চন্দ্রনাথ শহর ত্যাগ করে পশ্চিমে পালিয়েছে। এই যুদ্ধের ডামাডোলে তার ভাগ্যে কী ঘটেছে কে জানে।

বজরা যাবে কটক পর্যন্ত, তারপরে পদব্রজে যাত্রা ছাড়া আর কোনো গতি নেই। মাঝি-মাল্লারা যেদিন জানালো যে কটক আর মাত্র তিন বেলার পথ দূরে, সেইদিন শেষ রাত্রেই চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটে গেল। দুটি ছিপ নৌকো ভর্তি ডাকাত পড়লো এ বজরায়। বরকন্দাজ দুজন যথানিয়মে বন্দুক পাশে রেখে নিদ্রিত ছিল, তারা কোনো বাধা দেবার আগেই মৃত্যু বরণ করলো। অন্য লোক-লস্কররা কেউ বা আহত হলো, কেউ ভয়ে লাফিয়ে পড়লো জলে। হীরা বুলবুলের সঙ্গে এক কামরাতেই শুয়ে ছিল রাইমোহন। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখলো, দ্বারের কাছে মশালধারী কয়েকটি যমদূত। কোনোক্রমে উঠে দাঁড়াবার আগেই মস্তকে প্রবল আঘাত পেয়ে সে সংজ্ঞাহীন হলো। নিশীথের স্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল হীরা বুলবুলের তীক্ষ্ণ আর্তনাদে।

মার্জারের মতন বোধহয় নয়টি জীবন রাইমোহনের। তাই সে প্রাণে বেঁচে গেল। পরদিন সকালে সে জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলো বজরাটি একেবারে লণ্ডভণ্ড অবস্থায় মহানন্দা নদীর বক্ষে ভাসছে। বাইরে পাটাতনের ওপর একটি মৃতদেহ ও দুটি মুমূর্ষু শরীর আর দুজন লোক জবুথবু হয়ে গলুইয়ের কাছে বসে আছে। হীরা বুলবুলের কোনো চিহ্ন নেই। কিংবা তার একটি মাত্র চিহ্নই পড়ে আছে। তার দক্ষিণ হস্তের একটি লাল রঙের ভাঙ্গা বালা।

রাইমোহনের সর্বাঙ্গ রক্তে মাখামাখি। কাঁধের ওপর মাথাটি যেন অতিশয় ভারী হয়ে গেছে একদিনেই, মুখের মধ্যে বমনের স্বাদ। তবু কোনো রকমে হামাগুড়ি দিয়ে এসে সে গলুইয়ের কাছে বসে থাকা লোক দুটিকে উদ্দেশ্য করে বললো, বাপধনরা, বোটটাকে একটু কিনারে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর, নইলে যে পচে গলে মরবো।

বজরা যেখানে তীরে ভিড়লো, সে স্থল জনমানবশূন্য। অক্ষত লোক দুটি ভয়ে এমন আধমরা হয়ে আছে যে তাদের উদ্যোগে কোনো সাহায্যের জন্য কোথাও যাবার আশা নেই। ওদের মধ্যে একজনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নিহত হয়েছে, সেইজন্য এই সময় সে বিকট স্বরে জুড়ে দিল কান্না। ইতিমধ্যে রাইমোহনের চেতনা আবার লুপ্ত হয়েছে।

খানিক বাদে দুটি খড়ের নৌকো এলো সেই পথে। তার মাঝিরা চিৎকারে আড়ষ্ট হয়ে বজরার নিকটবর্তী হলো এবং সব বৃত্তান্ত শুনে বজরাটি তারা বেঁধে নিল তাদের নৌকোর সঙ্গে। অপরাহ্ণে তারা পৌঁছোলো একটি ছোট গঞ্জে। সেখানে একটি পুলিসচৌকি আছে। গঞ্জে সেদিন হাটবার, শত শত লোক ভিড় ভেঙ্গে ছুটে এলো দস্যু-লুণ্ঠিত বজরাটি দেখতে। এক সহৃদয় ওড়িয়া বণিক দয়াপরবশ রাইমোহনকে স্থান দিলেন নিজের গৃহে। এবং শুশ্রূষার গুণে সে পরদিনই অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলো।

হীরা বুলবুলকে দুদিন পর পাওয়া গেল মহানন্দার পার্শ্ববর্তী এক মনুষ্যবসতিহীন জঙ্গলে। কাঠুরেরা তাকে দেখতে পেয়েছিল। তার শরীরে কোনো বস্ত্র নেই, কোনো হিংস্র পশু যেন তার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। যদিও কাঠুরেদের অভিমত এই যে, সে অরণ্যে কোনো হিংস্র পশু থাকে না।

হীরা বুলবুলও অবশ্য প্রাণে মরলো না। তাকেও চিকিৎসার জন্য আনা হলো গঞ্জটিতে। খবর পেয়ে রাইমোহন যখন তাকে দেখতে গেল, তখন হীরা বুলবুল শয্যায় উঠে বসেছে বটে কিন্তু নির্বাক, নিস্পন্দ। দৃষ্টিতে কোনো ভাষা নেই। পুলিসের লোক শত চেষ্টা করেও তাকে দিয়ে একটি কথাও বলাতে পারেনি। রাইমোহন তার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, হীরে, আমি এসিচি! যা হবার তো হয়েচে, তবু যে প্রাণটা যায়নি····

হীরা বুলবুল রাইমোহনকে চিনতে পারার কোনো ভাব প্রদর্শন করলো না, যেমন দেয়ালের দিকে চেয়ে ছিল, তেমনই রইলো। রাইমোহনের চক্ষে জল এলো, কিন্তু হীরা বুলবুলের দু চক্ষু শুষ্ক।

তারপর রাইমোহন অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু হীরা বুলবুলের মধ্যে কোনো বোধের সঞ্চার করানো গেল না। এর আগে অনেক পেড়াপেড়ি করেও তাকে কবিরাজি ওষুধ খাওয়ানো যায়নি। যে বাড়িতে সে রয়েচে, সেখানকার গৃহকর্তাটি বললেন, আহা, দেখলেই বোঝা যায়, কোনো বড় ঘরের বউ। তাঁর এমন দুর্দশা!

অচেনা, অজানা স্থানে এই অবস্থায় বেশীদিন থাকা যায় না। আশ্রয়দাতা ওড়িয়া বণিকটির কাছ থেকে রাইমোহন কিছু টাকা ঋণ নিয়ে পাল্কি ভাড়া করে আবার রওনা হলো কলকাতার দিকে।

পাল্কির মধ্যে বসে অঝোরে কাঁদতে লাগলো রাইমোহন। সে অতি পোড়খাওয়া কুশলী মানুষ, সহজে ভেঙ্গে পড়ে না। কিন্তু এখন যেন সে আর পারছে না। হীরা বুলবুলকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে সে বলতে লাগলো, হীরে, একবার আমার পানে চা, একটা কতা বল, ওরে, দু-পাঁচটা গুণ্ডো তোর শরীর ছেঁড়াছিড়ি করেচে, সে সব ভুলে যা, আমি তো রয়িচি, আবার ঠিক হয়ে যাবে সব। আমি তোকে বাহান্ন তিথি ঘুরিয়ে দেকাবো, হীরে, অমন অবুঝপনা করিসনি। হীরে, দ্যাক, আমাকেও ওরা কেমন মেরেচে, আমার মাতাটা একবার দ্যাক, হীরে, ওরে আমার হীরে···

হীরা বুলবুল তবু কোনো শব্দ করে না। তার দেহে একটি শাড়ি কোনোক্রমে আলুথালুভাবে জড়ানো, তার কোনো হায়া বোধ নেই। রাইমোহন জোর করে তার হাত দুটি তুলে, নিজের গালে ঠেকায়, হীরা বুলবুল বাধা দেয় না! আবার রাইমোহন ছেড়ে দিলেই ঝপ করে পড়ে যায়।

ধর্মশালায় হীরা বুলবুলকে নিয়ে রাত্রি যাপন করাও হলো এক সমস্যা। পাল্কি থেকে তাকে নামিয়ে ধরে ধরে নিয়ে যেতে হয়, তার গায়ের কাপড় খসে পড়ে। অন্য লোকেরা কৌতূহলী হয়ে তাকায়। নানা প্রশ্ন করে। লোকচক্ষে হীরা বুলবুল এখনো এক আকর্ষণীয়া রমণী। তার অঙ্গ থেকে শাড়ি খসে পড়লে তা দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। বারিপদার ধর্মশালায় এক সুরাপায়ী অতিরিক্ত উৎসাহী হয়ে পড়ে। দুটি পাশাপাশি ছোট খুপরির একটিতে রাইমোহন অন্যটিতে হীরা বুলবুল রয়েচে। ধর্মশালার দুটি বড় ঘরে একসঙ্গে অনেক যাত্রী থাকে। সেখানে হীরা বুলবুলকে রাখা যায় না। সুরাপায়ীটি হীরা বুলবুলের কক্ষের সামনে ঘুর ঘুর করে, সেজন্য রাইমোহনকে সারারাত জেগে বসে থাকতে হয়। তার শরীর যেন আর বয় না।

মধ্যপথে, মেদিনীপুর দিয়ে আসবার সময় একবার সিপাহী-সন্ত্রাসের গুজব উঠলো। পাল্কিবাহকরা ভয় পেয়ে রাজপথ ছেড়ে আশ্রয় নিল পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে। সেখানে একটি দিন গেল।

পঞ্চম দিন সকালে হঠাৎ আবার এক পরিবর্তন হলো হীরা বুলবুলের। রাইমোহন ওর পাশে বসে ঝিমোচ্ছিল। হঠাৎ এক চিৎকারে তার চটকা ভেঙ্গে গেল! তারপর বিস্ময়ে অনেকখানি ফাঁক হয়ে গেল তার মুখ।

বাঁ কান একহাতে চেপে ডান হাত সামনের দিকে ছড়িয়ে জোরালো গলায় গান ধরেছে হীরা বুলবুল :

সিঙ্গিবাগানে মাথা মুড়োলো এ কোন্ ভৃঙ্গীরে
কানে ধরে তাদের চর্কি নাচায় সে কোন্ ধিঙ্গি রে

আহ্লাদে তখন রাইমোহনের নিজেরই যেন নাচতে ইচ্ছে করলো। এ যে তারই রচিত। তারই শেখানো। শত চেষ্টা করেও কয়েক বছর ধরে সে হীরা বুলবুলকে দিয়ে এই গান গাওয়াতে পারেনি।

সে হীরা বুলবুলের উরুতে চাপড় মেরে বললো, বাহবা, গা, গা, আর একবার গা—

হীরা বুলবুল আবার অন্য গান ধরলো,—

ভিতরেতে ভোয়া ফলে,
কত কষ্টে দিন চলে
কোনোদিন অর্ধাশন,
কভু রহে শুকায়ে
পরিধেয় বাস যাহা,
রজকে দেখে না তাহা
তথাপি কি উঁচু চাল
চলে বুক ফুলায়ে
মরি, মরি, চলে বুক ফুলায়ে

অতি উৎসাহে রাইমোহন হীরা বুলবুলকে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললো, আহা হা, আর কোনো চিন্তে নেই। হীরে, তুই গান ধরিচিস, তোর গলা শুনে আবার বুক জুড়োলো—।

সঙ্গে সঙ্গে যেন আগুন জ্বলে উঠলো হীরা বুলবুলের চক্ষে। কাকাতুয়ার মতন কর্কশ কণ্ঠে বললো, তুই কে রে আবাগীর পুত? কে তুই গতর খেকো! কোন্ হতচ্ছাড়া মিনসে আমার গায়ে হাত দেয়!

যা, দূর হয়ে যা।

তারপরই সে সজোরে এক লাথি কষালো রাইমোহনকে। দু হাতের নোখ দিয়ে তার চোখ গালতে এলো। রাইমোহন অনেক প্রকারে শান্ত করার চেষ্টা করলো তাকে। কিন্তু হীরা বুলবুল আঁচড়ে কামড়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করলো তাকে। সে এখন অতি হিংস্র এক বদ্ধ উন্মাদ। শেষ পর্যন্ত পাল্কি বেহারাদের সাহায্য নিয়ে রাইমোহন কোনোক্রমে বেঁধে ফেললো তাকে।

প্রকৃতি কিংবা নিয়তির বিচিত্র পরিহাসে হীরা বুলবুল এবং রাইমোহন এই দুজনের কথাই সত্য হল। হীরা বুলবুল চেয়েছিল, সে আর কলকাতায় ফিরবে না, তাই সে ফিরে এলো না। রাইমোহন শপথ করেছিল, হীরা বুলবুলকে সে যে-কোনো প্রকারে ফিরিয়ে আনবেই, সত্যিই সে ফিরিয়ে আনলো।

হীরা বুলবুলের মধ্যে বিস্ময়করভাবে দ্বৈত সত্তার প্রকাশ দেখা যেতে লাগলো। তার দুরকম ভাব, দু প্রকার কণ্ঠস্বর, এমনকি মুখের চেহারাও ভাব অনুযায়ী পৃথক হয়ে যায়। সে সম্পূর্ণ উন্মাদিনী, কিন্তু তার উন্মাদ দশারও দুটি রূপ।

কখনো কখনো সে সম্পূর্ণ চুপ করে থাকে। দণ্ড, প্রহর, এমনকি সম্পূর্ণ দিনের মধ্যেও একটি শব্দ উচ্চারণ করে না। ঠায় বসে থাকে এক স্থানে, যেন কোনো জড় মূর্তি। তার দৃষ্টি তখন উদাস হয়ে যায়, ঔদাসীন্য মাখা মুখখানি অপূর্ব সুন্দর দেখায়। সে স্নান করে না, চুল বাঁধে না, পোশাক পরিবর্তন করে না, এমনকি কিছু খায় না পর্যন্ত। রাইমোহন তার কাছে এসে অনেক কাকুতিমিনতি করে, কিন্তু হীরা বুলবুলের ভ্রূক্ষেপ নেই। যেন সে কোনো গভীর ধ্যানে নিরত।

মাঝে মাঝে তার ধ্যান ভাঙ্গে, তখন সে গাইতে শুরু করে আপন মনে। হীরামণি নামে যে সঙ্গীত পটিয়সী বারাঙ্গনা এক সময় বুলবুল নামে খ্যাতি অর্জন করেছিল, এখন তার কণ্ঠে সপ্তসুর যেন আরও বর্ণাঢ্য হয়ে ভর করেছে। অতি সূক্ষ্ম মীড় ও টপ্পার কাজ।

হীরা বুলবুল যখন গান শুরু করে তখন রাইমোহনের বুকটা মুচড়ে মুচড়ে ওঠে। এমন মধুর গান। এমন সুরের মূর্চ্ছনা, অথচ অন্য কারুকে শোনানো যাবে না! হীরা বুলবুল এই গান গেয়ে তো কলকাতার বাবুসমাজকে মাতোয়ারা করে দিতে পারে আবার।

কলকাতায় ফিরিয়ে আনার পর প্রথম কয়েকদিন রাইমোহন অনেক ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছে
কলকাতায় ফিরিয়ে আনার পর প্রথম কয়েকদিন রাইমোহন অনেক ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছে
ওকে। এখন রাইমোহন শান্ত স্তব্ধ হীরা বুলবুলের সামনে গিয়ে যদি বা কিছু বলাবলি করেও, কিন্তু হীরা বুলবুল গান শুরু করার পর সে আর ভয়ে সামনে থাকে না।

গান গাইতে গাইতে অকস্মাৎ এক জায়গায় থেমে গিয়ে হীরা বুলবুল তার দ্বিতীয় মূর্তি ধারণ করে। তখন তার চক্ষু দুটি থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরোয়, মুখখানা হয়ে যায় কালী মূর্তির দু পাশের ডাকিনী যোগিনীর মতন, গলার আওয়াজও হয়ে যায় সানের মেঝেতে টিনের কৌটো ঘষার মতন। সামনাসামনি কেউ না দেখলে বা শুনলে বিশ্বাসই করবে না যে এই রমণীই একটু আগে এমন অপূর্ব সুরেলা গলায় গান গাইছিল।

তখন সাংঘাতিক হিংস্র হয়ে ওঠে সে, মুখ দিয়ে কুৎসিত কদর্য গালি-গালাজের ঝড় বইতে থাকে, চোখের সামনে যাকেই দেখতে পায় তাকেই মারতে ধেয়ে আসে। যে-কোনো কারণেই হোক তার সবচেয়ে বেশী আক্রোশ রাইমোহনের ওপর। হাতের সামনে যা পায়, তাই ছুঁড়ে মারে রাইমোহনের দিকে। একবার পান ছেঁচার পিতলের হামানদিস্তে সজোরে নিক্ষেপ করেছিল রাইমোহনের কপাল লক্ষ্য করে, সেটি ঠিক মতন লাগলে রাইমোহনকে আর পৃথিবীর বাতাসে নিশ্বাস গ্রহণ করতে হতো না।

সেই অবস্থায় হীরা বুলবুল কোনো যণ্ডকায় পুরুষের মতন দুপদুপিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায়,

খাদ্যদ্রব্য পেলে মুঠো মুঠো মুখে ভরে, দু দিকের কষ দিয়ে লালা গড়ায় এবং অকারণে হা-হা করে হেসে ওঠে। তখন তাকে দেখলে রাক্ষসী বলে মনে হয় অথবা অপ্রাকৃত কোনো ভীতিপ্রদ রমণী।

দাস-দাসীরা পালিয়েছে এ গৃহ ছেড়ে। রাইমোহনের এক সহচর হারাণচন্দ্র এখনো রয়ে গেছে শুধু। দু'জনে মিলে এ পাগলিনীকে কোনোক্রমে সামলায়। এখন সন্ধ্যার সময় অধিকাংশ ঘরেই আলো জ্বলে না। একতলার এক ছোট কুঠুরিতে হারাণচন্দ্র বসে বসে সুরা পান করে. রাইমোহন চুপ করে বসে থাকে সেখানে। সে যেন এখন আর সুরাপানেও স্বাদ পায় না। হঠাৎ একেবারে বিস্বাদ হয়ে গেল জীবনটা।

আজ হারাণচন্দ্রের পীড়াপীড়িতে রাইমোহন সুরার পাত্রে দু-একটা চুমুক দিয়েছে। বাতাসে শীত শীত ভাব, তাই সুরার প্রভাবে শরীরে উত্তাপ সঞ্চারিত হলে বেশ আমেজ আসে। রাইমোহন আক্ষেপের সঙ্গে বললো. সব কেমুন ভেব্‌লে গেল রে. হারাণে. সব ভেব্‌লে গেল!

হারাণচন্দ্রের আবার ছিলিমও চলে। চরসেই সে বেশী টং হয়। কল্কেটা রাইমোহনের দিকে এগিয়ে দিয়ে সে বললো. দু' টান দিয়ে দ্যাকো দাদা. রিদয়টা একদম খোলসা হবে। দিনরাত ভেবে ভেবে তুমি যে একেবারে কাহিল হয়ে গেলে!

এই সময় ওপর থেকে ভেসে আসে হীরা বুলবুলের সুমিষ্ট কণ্ঠের গান। গত দেড়দিন যাবৎ সে টুঁ শব্দটিও করেনি। এই সন্ধেবেলা আবার তার ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে।

গান শুনতে পেয়ে হারাণচন্দ্র বলে উঠলো. আহা. আহা. দিদি আমার সাখ্‌ক বুলবুল।

রাইমোহন মন দিয়ে খানিকক্ষণ গানটা শুনলো। হীরা বুলবুল গাইছে:

> পাসরিতে চাই তারে না যায় পাসরা
> আমারে মজালে আমার নয়নেরি তারা
> বাসনা করিয়ে মনে
> চাব না তাহার পানে
> আঁখি নিষেধ না মানে
> বহে বারিধারা...

রাইমোহন বললো, এ গান আমি শিক্যেচি ওকে। এ গান কার রচনা জানিস? কালী মীর্জার। নাম শুনিচিস?

হারাণচন্দ্র মাথা নেড়ে জানালো যে ঐ নাম সে শোনেনি।

রাইমোহন আফসোসের সুরে বললো, তা শুনবি কেন, তোরা তো সবাই নিধুবাবুর নামে নাচিস। কালী মীর্জাও কম বড় গায়ক ছেলেন না। লক্ষ্ণৌ, দিল্লি থেকে গান শিকে এয়েছিলেন। বর্ধমানের রাজা বাহাদুর প্রতাপচাঁদের সভায় গাইতেন। সেই যে রে, যাঁর নামে আর এক জাল প্রতাপচাঁদ বেইরেছেল। কালী মীর্জা কলকেতায় এসে গোপীমোহন ঠাকুরের আখড়াতেও গাইতেন। যেমন ভালো গান বাঁধতেন, তেমন ঢেউ খেলানো গলা, আর চ্যায়রা খানা ছেল কি. যেন নবাব আমীর কেউ হবে।

হারাণচন্দ্র জিজ্ঞেস করলো, তুমি ওনাকে দেকোচো, দাদা?

রাইমোহন বললো, হ্যাঁ, দেকিচি, গান শুনিচি। খানাকুলের রামমোহন রায়, ঐ যে রে যিনি এখুনকার বেম্যজ্ঞানীদের গুরু ঠাকুর, সেই তিনিও কিচুদিন গান শেকার জন্য এই কালী মীর্জার কাচে নাড়া বেঁধেছিলেন। আমি যখন কালী মীর্জার গান শুনি, আমার বয়েস তখুন অনেক কম, ধর চাঁদুর মতন বয়েস, আমি বাপ-মরা ছেলে, কেউ দেকবার নেই, ঘুরে ঘুরে বেড়াই...এই যা, কার নাম করলুম।

—কার নাম করলে দাদা?

—চাঁদুর নাম? হঠাৎ কেন মনে এলো?

—বাদ দাও ওসব কতা। আর এক ছিলিম টানো, গান শোনো।

হীরা বুলবুল তখন অন্য গান ধরেছে:

> ভালবাস, ভালবাসি, লোকে মন্দ বলে তাতে
> কাহারও নই প্রতিবাদী, তবু কেন মিছে তাতে।
> কি নৃপতি কি দীন
> সবে দেখি প্রেমাধীন
> কেউ ছাড়া নয় কোন দিন
> ভেবে দেখ যাতে-তাতে।

হারাণচন্দ্র বললো, আহা-হা, আহা-হা!

রাইমোহন বললো, এ গানটা হীরে অনেকদিন পরে গাইলে। আমিও প্রায় ভুলেই গেসলাম। বড় খাসা গান। এটি কার বাঁধা বলতে পারিস ?

—এটা আর বলতে হবে না ! টপ্পার টান শুনেই বুঝিচি ! এ গান নিধুবাবু ছাড়া আর কার ?

রাইমোহন ক্ষেপে উঠে বললো, নিধুবাবু আর নিধুবাবু ! সবই তোদের নিধুবাবু। সাধে কি আর দাশু রায় মশাই রেগে গিয়ে বলেচেন, "জুতোর চোটে ঘুচাব তোর নিধুর টপ্পা গাওয়া !"

—দাদা, তবে এ গান কার ?

—শ্রীধর কথকের। কত বড় গায়ক ছেলেন শ্রীধর কথক, আবার তেমনই দিলদরিয়া মানুষ। শুনিচি, কত গান বেঁধেচেন আর লোকের মধ্যে বিলি করে দিয়েচেন। তোদের নিধুবাবু শ্রীধর কথকের কত গান চুরি করেচে, জানিস ?

—দাদা, শোনো, শোনো, এবার অন্য গান ! আহা, আর পাঁচজন যদি এ গান শুনতো !

—সেই দুঃখেই তো আমারও বুক ফাটে রে, হারাণে ! এ কী হলো ? কেন এমন হলো ? দুটো উটকো দস্যু ওর শরীর ঠুগরেচে বলে মাতাটাও এমন বিগড়ে যাবে ? আগে কলকাতার বড় মানুষরা ওকে ঠোগরায়নি !

—দাদা, শোনো, মন দিয়ে শোনো।

হীরা বুলবুল এবার গাইছে :

রাজার দুলালী বটে আমি কাঙালিনী
লোকে যা জানে জানুক, আমি যে নিজেরে জানি
ধন রত্ন সবই মিলে
মন যদি নাহি দিলে
মনে যদি মরু গড়িলে,
তারেই কব রাজধানী ?

শুনতে শুনতে রাইমোহনের দুই চক্ষু দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। এক সময় শব্দ করে কেঁদে উঠলো সে।

হারাণচন্দ্র জড়িত স্বরে বললো, এ কি হলো, দাদা ? ভাবের ঘোরে একেবারে কেইন্দে ভাসালে যে ! তা এ গানটে কার বাঁধা একটু বলে দাও।

—কার বাঁধা, বল তো হারাণে ? বল কার বাঁধা ? আমার ! আমার বাঁধা গান, আমার সুর। বল, খারাপ বেঁধেচি ? ভালোবাসা যদি না পায়, তবে রাজকুমারীরেও আমি কাঙালিনী বলিচি। কোন্ বাপের ব্যাটা আগে এমন লিকতে পেরেচে বল ?

—অতি মধুর লিকোচো দাদা। বড় সরেস ! কিন্তু তুমি কাঁদচো কেন ?

—আমার কী হলো, বল ! হীরেকে সব গান শেকালুম, কিন্তু আর কি কেউ তা শুনতে পাবে ? সবই আমার গুখ্যুরি হলো ! আহা, হীরে এত করে চেয়েছেল জগন্নাথ ক্ষেত্তরে যেতে, তা সেখেনেও তাকে নিয়ে যেতে পারলুম নাকো।

কথাবার্তার মধ্যে ওপরে কখন যে গান থেমে গেছে, তা ওরা দুজনে খেয়াল করেনি। হঠাৎ রাইমোহন চোখ তুলে দেখলো, কুঠরির দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে হীরা বুলবুল। আঁচল খসে পড়ে লুটোচ্ছে মাটিতে, বক্ষে কোনো অন্তর্বাস নেই, ঘটির মতন বৃহৎ বর্তুল স্তন দুটি উন্মুক্ত, মাথার চুল খোলা, মুখ চোখে রক্তপিপাসুর মতন হিংস্রভাব, ঠিক যেন একটি ডাকিনী। হাতে আবার একটি আঁশবটি, সে স্থিরভাবে চেয়ে আছে রাইমোহনের দিকে।

রাইমোহনের সারা শরীর একবার কেঁপে উঠলো। তারপর সে অশ্রুজড়ানো কণ্ঠে বললো, কী হয়েচে, হীরে ? আমার ওপর তোর এত রাগ কেন ? আমি তোকে এ সময় যেতে কত নিষেধ করিচিলুম—তুই আমায় মারতে চাস কেন, হীরে আমি কি তোর ডান ?

হীরা বুলবুল মুখে হাসি ফুটিয়ে অদ্ভুত বিকৃত গলায় বললো, ওরে ডাকরা, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন !

সে ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। রাইমোহন বললো, বেশ, আয়, আমাকে মার, তাতে যদি তোর সাধ মেটে !

হারাণচন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বললো, দিদি, হীরে দিদি, ও কী কচ্চো ?

হীরা বুলবুল হারাণচন্দ্রের কথায় কানই দিল না।

মাতাল এবং চরসখোর হলেও হারাণচন্দ্রের শরীরে এখনো শক্তি আছে। সে পাশ থেকে লাফিয়ে পড়লো হীরা বুলবুলের ওপর। আঁশবটিটা কোনক্রমে হীরা বুলবুলের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তারপর সে শুরু করে দিল যুদ্ধ এবং চ্যাঁচাতে লাগলো, রাইদাদা, ধরো, ধরো!

এই সব সময় হীরা বুলবুলকে জোর করে মাটিতে ঠেসে ধরে নির্মমভাবে প্রহার করতে হয়, তা ছাড়া তাকে নিবৃত্ত করার আর কোনো উপায় নেই।

হীরা বুলবুলকে কিল চড় মারতে রাইমোহনের বুক ফেটে যায়, তবু হারাণকে সাহায্য করার জন্য সে বাধ্য হয় এগিয়ে আসতে। হারাণচন্দ্র বেশ জোওয়ান, কিন্তু এই সব সময়ে হীরা বুলবুলের শরীরে যেন অসুরের শক্তি ভর করে। রাইমোহন একলা কখনো হীরা বুলবুলের মুখোমুখি এই অবস্থায় পড়লে খুনই হয়ে যেত।

মারতে মারতে হীরা বুলবুলকে নিস্তেজ করে দেবার পর তারপর দুজনে তাকে ধরাধরি করে ওপরে শুইয়ে দিয়ে আসে।

এইরকম ভাবে কি দিনের পর দিন চলে? রাইমোহন এখন সর্বক্ষণ চিন্তিত ও বিমর্ষ থাকে। হীরা বুলবুলের চিকিৎসার জন্য এর মধ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। এনেছে সাহেব ডাক্তার, এনেছে মেডিক্যাল কলেজের পাশ করা অ্যালোপাথ, এনেছে একাধিক কবিরাজ, এমনকি দুজন ওঝাকেও এনেছিল। সকলেই গুচ্ছের টাকা নিয়েছে এবং কাঁড়িকাঁড়ি ওষুধ দিয়ে গেছে, কিন্তু সেই ওষুধ যে কী করে হীরা বুলবুলকে খাওয়ানো হবে, সে দিশা কেউ দিতে পারেনি। ওঝারা ওষুধ দেয় না কিন্তু উৎকটভাবে প্রহার করে। একজন কবিরাজ শুধু পরামর্শ দিয়েছিল, হীরা বুলবুলকে আর বাড়িতে আটকে রেখে কোনো লাভ নেই, এই পাগলিনীকে এখন পথে ছেড়ে দেওয়া হোক ভগবানের নামে উৎসর্গ করে, এখন ভগবানই এর একমাত্র ভরসা। আর, স্বেচ্ছাচারীদের পথই সঠিক আশ্রয়।

কিন্তু রাইমোহন প্রাণে ধরে হীরা বুলবুলকে ঘরের বার করে দেয় কী করে? বিশেষত, এ তো তার বাড়ি নয়, সে নিজেই বরং হীরা বুলবুলের আশ্রিত। হীরা বুলবুলের বিকৃত রূপ দেখে এক এক সময় তার নিজেরই ইচ্ছে করে বিবাগী হয়ে যেতে। অথচ এই বৃদ্ধ বয়েসে সে যাবেই বা কোথায়, পুরোনো অভ্যেসগুলি ছাড়াও সহজ নয়।

ইতিমধ্যে অর্থেরও অকুলান হতে শুরু করেছে। বজরায় দস্যুরা তাদের সর্বস্বান্ত করে গেছে। হীরা বুলবুলের আরও কিছু লুকোনো সম্পদ আছে কি না রাইমোহন তা জানে না, আর জানবার উপায়ও নেই। তার নিজেরও রোজগারপাতি নেই ইদানীং, হীরা বুলবুলের চিকিৎসার জন্যে যথেষ্ট ব্যয় করেছে, এর পর দিন চলা দুষ্কর হয়ে উঠবে।

হারাণচন্দ্রের ওপর নজর রাখার ভার দিয়ে রাইমোহন একদিন বেরুলো। বিদ্যোৎসাহিনী সভা আবার চালু হয়েছে কি না, সে সন্ধান নিতে হবে। সিপাহী বিদ্রোহ কিংবা হিন্দুস্তানে মুঘল শাসন পুনঃ প্রবর্তনের আশা এখন মরীচিকাবৎ প্রতিভাত হয়। নায়কহীন, শৃঙ্খলাহীন সিপাহীরা এখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে, ইংরেজবাহিনী একের পর এক শহর পুনর্দখল করে চলেছে এবং চলেছে নিষ্ঠুর প্রতিশোধের পালা।

অনেকদিন পর রাইমোহন এলো গুপী স্যাকরার দোকানে। সে গুপীও নেই, সে দোকানও নেই, যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের প্রভাবে সব কিছুর ভোল পালটে গেছে চমকপ্রদভাবে। এককালে ছিল মাঠকোঠার দোকান, এখন সাতখানি কুঠরিসমন্বিত পাকা বাড়ি, এবং প্রত্যেক কুঠরিতে লোহার দরজা। বিক্রয় কক্ষটির চারদিকের দেয়াল জোড়া ভেনিশিয়ান আয়না। আগে গুপী নিজেই দুর্গাপ্রদীপ জ্বেলে কাজে বসতো, এখন তার অধীনে কয়েক গণ্ডা কারিগর, সে ক্যাশ বাক্স নিয়ে বসে থাকে গদীর ওপর, থলথলে চর্বি এবং নেয়াপাতি ভুঁড়িটির জন্য তাকে দেখায় গণেশ ঠাকুরটির মতন। এখন আর

কেউ তাকে গুপী স্যাকরা বলে না, বর্তমানে সে গোপীমোহন সরকার, স্বর্ণকার ও মণিকার নামে পরিচিত। উত্তরোত্তর যতই শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে গুপীর, ততই রামবাগানে নতুন নতুন রক্ষিতা বদল করেছে। রঙ্গী নামে তার নবতম রক্ষিতাটিকে সে নাকি ছিনিয়ে নিয়েছে কালীপ্রসাদ দত্তের খপ্পর থেকে।

রাইমোহন গুপী স্যাকরার এতখানি শ্রীবৃদ্ধি দেখে প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গেলেও অবিলম্বে সামলে নিয়ে আগেকার মতন শ্লেষের সুরে বললো, কী রে, গুপী, কেমন চালাচ্চিস ? ঐ নাদা পেটটা যে একদিন ফেটে যাবে ফটাস্ করে !

গুপী স্যাকরা সামান্য একটু ওঠার ভান করে খাতির দেখিয়ে বললো, আসুন, আসুন, ঘোষালমোয়াই, আসতে আজ্ঞা হোক, বস্তে আজ্ঞা হোক। কতদিন পর আপনার পদধূলি পড়লো এই গরিবের দোকানে—

রাইমোহন ভেতরে এসে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে বললো, তুই গরিব ? তাহলে রাজা দিগম্বর মিত্তির কিংবা জমিদারের ব্যাটা নবীন সিংগী তো দেউলে রে ! তা কেমন আচিস বল্ ?

—আজ্ঞে আপনার মতন পাঁচজনের আশীর্বাদে কোনো রকমে কষ্টে ছিষ্টে আচি ! বসুন, ঘোষালমোয়াই, পান তামাক খান। এই যে এখেনে, আমার পাশটাতে এসে বসুন।

আসন গ্রহণ করে রাইমোহন বললো, তুই কষ্টে ছিষ্টে আচিস ? আহারে, আমায় আগে বলিসনি কেন ? মানুষের কষ্টের কতা শুনলে আমার বড় দুঃখু হয়, বিশেষত তোর মতন চেনাশুনো মানুষের। তা তোর কিসের কষ্ট ?

—আজ্ঞে এদানি রোজগারপাতি কিচু নেই বললেই হয়। সাহেব মেমরা ইদিকে ঘ্যাঁষে না, আর সেপাইর হেঙ্গামার ভয়ে সব বড় মানুষদের বাড়ি বিয়ে-শাদী এ বছর বন্ধ। তা হলে আমাদের চলে কী করে বলুন ?

—ভয় নেই, তোর আবার সুদিন আসচে। সাহেবরা সেপাইদের মাজা ভেঙে দিয়েচে, এখন শুদ্দু দুরমুশ করা বাকি ! তা তোর কাচে আজ এলুম একটা বিশেষ মন নিয়ে।

—বলুন ; মানে, ইয়ে আজ্ঞা করুন।

—শতখানেক টাকা দিতে হবে যে, একটু টানাটানির মদ্যে পড়িচি।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়, এ আর কী এমন কতা ? আপনার টাকা আর আমার টাকা কি আলাদা ? আপনার দয়াতেই তো করে খাচ্চি !

পান তামাক সেবা ও কিছুক্ষণ রহস্য কৌতুক করার পর গুপী স্যাকরা বললো, দোকান বন্ধ করার সময় হলো, কই ঘোষালমোয়াই, মালটা দেকান !

রাইমোহন বললো, আজ আর সঙ্গে কোনো মাল নেই রে, টাকাটা তোকে হাওলাং দিতে হবে।

বোকাসোকার মতন দেখালেও আজকাল গুপী স্যাকরা অনেক কিছুর সংবাদ রাখে। সে বললো, আপনার ইয়ে, মানে ঐ হীরে বুলবুল মাগীটার নাকি একেবারে মাতা বিগড়ে গ্যাচে, ঘোষালমোয়াই ? ও মাগীর তো অনেক আচ্চা-সাচ্চা হীরে-মুক্তোর গয়না আচে, এই বেলা যা পারেন হাতিয়ে নিন, নইলে পাঁচ ভূতে লুটে পুটে খাবে।

রাইমোহন বললো, সে সব কতা পরে হবে। তুই আজ টাকাটা দে, আমায় যেতে হবে।

গুপী স্যাকরার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সে একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, ঘোষালমোয়াই, আপনি নিশ্চয় অন্য কারুর সঙ্গে কারবার শুরু করেচেন ? তাই অনেকদিন এদিকে আসেন না। জগু সরকারের কাচে যাচ্চেন ? ভালো ভালো মাল জগু সরকারকে দিয়ে আমার কাচে এয়েচেন খালি হাতে টাকা চাইতে !

রাইমোহন ক্লান্তভাবে বললো, আমি আর মাল সরাবার কারবার করি না রে, গুপী ! তুই টাকাটা দিবি না ? শোধ দেবো, আমি কতার খেলাপ করি না।

গুপী সরকার ভালো ভাবে দেখলো রাইমোহনকে। মানুষটা বুড়ো হয়ে গেছে, অনেক বদলে গেছে। সেই খড়্গনাসা, শাণিত চক্ষু, অতি ধুরন্ধর মানুষটার বদলে যেন পড়ে আছে তার কঙ্কাল। এবার রাইমোহন টপ করে একদিন মরে যাবে। এইসব লোককে গুপী স্যাকরা বাতিল করে দিতে দ্বিধা করে না !

—এই মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে অত টাকা কোতায় পাবো, ঘোষালমোয়াই, আপনি পাঁচটা টাকা নিন্ ! নেহাৎ আপনি বলেই আমি খালি হাতে…

রাইমোহন স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই সেই গুপী? কত বড় মানুষের বাড়িতে রাইমোহন নিজে তদবির করে গুপীকে ঢুকিয়েছে। সেই সব কাজ পেয়েই তো আজ তার আঙুল ফুলে কলাগাছ, সেই থেকেই তার নাম ছড়িয়েছে। সেই গুপী আজ তাকে একশোটা টাকা দিতে চায় না!

রাগে রাইমোহনের শরীর জ্বলতে লাগলো। প্রতিশোধের স্পৃহা লকলক করে উঠলো বুকের মধ্যে। কিন্তু একটু পরে সে নিজেই বুঝতে পারলো, এ শুধু অক্ষমের ক্রোধ, এই প্রতিশোধ স্পৃহার আগুন শুধু তাকেই পোড়াবে, গুপীকে স্পর্শ করতে পারবে না। অর্থ মানেই ক্ষমতা, সেইজন্য গুপী এখন অনেক ক্ষমতাবান, সেই তুলনায় রাইমোহন একজন সামান্য ক্রুদ্ধ বৃদ্ধমাত্র। গুপী স্যাকরা এখন তার দোকান থেকে রাইমোহনকে সবলে বিদায় করে দিলেও রাইমোহনের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই। কৃতজ্ঞতা? রাইমোহন কৃতজ্ঞতা দাবি করবে গুপীর কাছে? কিন্তু কৃতজ্ঞতা তো শর্ত কিংবা লিখিত চুক্তি নয়।

অনেক কথাবার্তার পর গুপী পাঁচ টাকা থেকে দশ টাকায় উঠতে রাজি হলো। টাকাটা রাইমোহনের দিকে এগিয়ে দিয়ে সে হাত জোড় করে বললো, আর কতা নয়, ঘোষালমোয়াই, এবার আমার তবিল মেলাতে হবে যে, এবার আপনি আসুন!

রাইমোহনের একবার ইচ্ছে হয়েছিল, টাকাটা গুপীর মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে চলে আসবে। কিন্তু নিজেই সে বিস্মিতভাবে আবিষ্কার করলো, যৌবনের সেই দর্পও আর নেই, হাতের টাকা ছুঁড়ে ফেলার মতন তেজ তাকে ছেড়ে চলে গেছে, বরং দশ টাকায় যে অন্তত বিশ-পঁচিশ দিনের খাদ্য সংস্থান হবে, সে কথাই মনে পড়তে লাগলো বারবার।

ক্ষুব্ধ, অপমানিত মুখে রাইমোহন বেরিয়ে এলো। একটুখানি গিয়ে পেছন ফিরে রাইমোহন গুপীর দোকানের দিকে চেয়ে নিষ্ফল আক্রোশে বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, এত বাড় বেড়োনাকো, ঝড়ে পড়ে যাবে! তুই ঝাড়ে বংশে উৎসন্ন হবি, গুপি, এই আমি বামুনের ছেলে বলে রাকলুম, তোর হাড় গো-ভাগাড়ে পচবে, শকুনে তোর চোক খুবলে খাবে…।

বিধুশেখর মুখুজ্যের কাছ থেকে রাইমোহন কিছু মসোহারা পায় নবীনকুমারের ওপরে নজর রাখার বাবদে। কয়েক মাস সে টাকা পায়নি। সে বাড়িতে গিয়ে খবর নিয়ে জানলো, বিধুশেখর অসুস্থ, তাঁর খাজাঞ্চি কার্যান্তরে শহরের বাইরে গেছেন, সুতরাং এখন কিছু পাবার আশা নেই

বিরক্ত হয়ে হাতের দশ টাকা থেকে নগদ চারটি মুদ্রা খরচ করে রাইমোহন এক বোতল খাস্ ফরাসী ব্র্যান্ডি কিনে ফেললো। অনেকদিন পর আজ সে ভালো করে নেশা করবে।

দু একদিন পরেই হীরা বুলবুলের পাগলামি একটি তৃতীয় স্তরে এসে পৌঁছোলো। এই স্তরে আর গান নেই কিংবা ডাইনীপনাও নেই, শুধু বুক ফাটানো কান্না। আর সে কি কান্না, সেই করুণ স্বর শুনে পথের পথিকরাও থমকে দাঁড়িয়ে যায়। এখন আর রাইমোহনকে সামনে দেখলে হীরা বুলবুল মারতে আসে না, ডুকরে ডুকরে পুরোনো কথা বলে শুধু কাঁদে। তখন রাইমোহনও তার পাশে বসে কাঁদতে শুরু করে।

রাইমোহনের ধারণা হলো, এইবার হীরা বুলবুল আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। তার বুকের মধ্যে যত কান্না জমেছিল, সব নিষ্কাষিত হয়ে যাচ্ছে একসঙ্গে। এর পর বুক খালি হলে সে আবার সুস্থ, স্বাভাবিক হবে।

তিনদিনের মধ্যেই হঠাৎ মিটে গেল সব সমস্যা। হীরা বুলবুল নিজেই আত্মঘাতিনী হলো কিংবা কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তা নিশ্চিত ভাবে আর জানার কোনো উপায় রইলো না অবশ্য। হীরা বুলবুলের দেহটা পাওয়া গেল বাড়ির প্রাঙ্গণ সন্নিহিত কুয়োর মধ্যে। বাঈজী কন্যা হীরা বুলবুলের বহু ঘটনাসমন্বিত জীবনের পরিসমাপ্তি হলো এইভাবে। এক সময় তার গুণগ্রাহীর অন্ত ছিল না এই শহরে, মধুলোভী ভ্রমরের মতন অনেক বড় মানুষের ছেলেই উড়ে এসেছে তার কাছে। এখন একজনও এলো না। রাইমোহন এবং হারাণচন্দ্র পল্লীস্থ কয়েকটি যুবকের সাহায্য চাইল মৃতদেহ শ্মশানঘাটে নিয়ে যাবার জন্য। যতই দুষ্ট প্রকৃতির বা উচ্ছৃঙ্খল হোক, এই সব যুবকদের এই একটি গুণ। শবদাহের ব্যাপারে সাহায্য চাইলে অন্তত কখনো তারা বিমুখ করে না।

শীতকালের বেলা অতি দ্রুত শেষ হয়ে আসে। হীরা বুলবুলকে শ্মশানে নিয়ে যেতে যেতে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল। দুটি চিতায় দুটি শব দাউ দাউ করে জ্বলছে, রাইমোহনদের একটু অপেক্ষা করতে হবে।

অন্য শ্মশানবন্ধুরা চলে গেল নিকটবর্তী গঞ্জিকার আখড়ায়। হারাণচন্দ্র উসখুস করতে লাগলো,

রাইমোহনের অনুমতি পেলে সে-ও একটু দম দিয়ে আসে। কিন্তু রাইমোহন একহাতে হীরা বুলবুলের শব ছুঁয়ে চুপ করে বসে আছে। সে কান্নাকাটি করেনি, বরং সে যেন একটা মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। আর তো তার কোনো বন্ধন রইলো না।

একটি চিতা খালি হবার পর হীরা বুলবুলকে তোলবার উদ্যোগ করা হচ্ছে, এই সময় হই হই করে এসে পড়লো শ্মশান-পরগাছার দল। তারাও ঘাটে বসে এতক্ষণ কল্কেতে দম দিচ্ছিল। মৃতের বস্ত্র পাবার অধিকার তাদের। কাঠ কেনার টাকা কাকে দেওয়া হয়েছে? এসব তাদের প্রাপ্য।

শ্মশান-পরগাছার দলপতি একজন বলিষ্ঠকায় যুবা, গুম্ফ-দাড়িতে মুখ প্রায় ঢাকা, হাতে একটি ডাণ্ডা, যেন সে স্বয়ং মহাকাল। রাইমোহন একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। চেহারা দেখে চেনার উপায় নেই, কিন্তু ঐ কণ্ঠস্বর ভুল হবে কী করে?

সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দলপতির হাত চেপে ধরে আবেগ-কম্পিত গলায় বললো, চাঁদু!

গুম্ফ-দাড়ি সমন্বিত দলপতি হা-হা করে হেসে উঠে বললো, ছুঁয়ে দিলে তো? চাঁড়ালকে ছুঁয়ে দিলে? এবার যে গোবর খেতে হবে!

তার চ্যালারা সেই হাস্যের সঙ্গে দোয়ারকি ধরলো!

রাইমোহন বললো, ভগবান আচেন তাহলে! ঠিক সময় তোকে মিলিয়ে দিয়েচেন। আমি তোর কতাই ভাবচিলুম। চাঁদু, চেয়ে দ্যাক, ও যে তোর মা! ওরে হারাণে, মুকের কাপড়টা সরা।

হারাণচন্দ্র মৃতের মুখের ওপর থেকে চাদরটি সরিয়ে দিল। পাশের চিতার আগুনের আলো এসে পড়লো হীরা বুলবুলের মুখে। চক্ষু দুটি বিস্ফারিত, যেন চন্দ্রনাথকেই দেখছে সে।

চন্দ্রনাথ কয়েক পলক চুপ করে চেয়ে রইলো।

রাইমোহন বললো, বড় কষ্ট পেয়ে গ্যাচে রে হতভাগিনী। যাক, তবু একটু শান্তি যে শেষ সময়ে তুই···ওরে চাঁদু, তোর শোকেই তোর মা ম'লো···

নাটকীয় পরিস্থিতির জন্য অন্যান্য শ্মশানবন্ধুরা এবং চণ্ডালরাও এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে সেখানে। তাদের সকলকে বিস্মিত করে চাঁড়ালগুণ্ডা ছেলেদের নেতা চাঁদু সর্দার পরিষ্কার ইংরেজিতে জন কীটসের চার লাইন কবিতা আবৃত্তি করলো:

টু সরো
আই বেইড গুড-মরো
অ্যাণ্ড থট্ টু লীভ হার ফার বিহাইণ্ড
বাট চীয়ারলি, চীয়ারলি
শী লাভ্‌স মি ডিয়ারলি;
শী ইজ সো কনস্টান্ট টু মী, অ্যাণ্ড সো কাইণ্ড···

তারপরই সজোরে রাইমোহনের কাছ থেকে হাত ছাড়িয়ে দৌড় দিল উল্টো দিকে।

রাইমোহন আর্ত গলায় বললো, ওরে চাঁদু, দাঁড়া, যাসনি, তুই মুখাগ্নি করবি···শেষ সময়টায় তোর মা তবু শান্তি পাবে—

চন্দ্রনাথ কর্ণপাত করলো না। তার সঙ্গীদের ছেড়ে, শ্মশান ছেড়ে সে দূরে চলে যেতে লাগলো তীব্র গতিতে।

'স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তবে তা এখানেই, তা এখানেই!' ফারসী লিপিতে এই বাণী লালকেল্লার দেওয়ান-ই-খাসের অলঙ্কৃত দেওয়ালে উৎকীর্ণ। সেই স্বর্গে সেপ্টেম্বরের বিশ তারিখে হুড়মুড়িয়ে প্রবেশ করলো বিজয়ী ইংরেজ সেনানী। তাদের মুখে অসম্ভব ক্রোধ ও অস্থিরতা ঘাম ও রক্তের মতন মাখা। বিকটভাবে চর্ম পাদুকার শব্দ তুলে তারা ছোটাছুটি করতে লাগলো চতুর্দিকে, তাদের প্রত্যেকের হাতে উদ্যত অস্ত্র।

লালকেল্লা জনশূন্য। কয়েক মাসের বাদশাহ বাহাদুর শাহ সপরিবারে পলাতক। ইংরেজ সৈন্য তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁদের কারুকে না পেয়ে অপরিসীম ক্রোধে উন্মত্তবৎ হয়ে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আঘাত করে করে ভাঙতে লাগলো দেওয়ান-ই-খাসের স্বর্গোপম দেওয়ালসজ্জা। দুর্লভ প্রস্তরের কারুকাজ টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়তে লাগলো মেঝেতে। সেনাপতি কোনোক্রমে শান্ত করলেন তাঁর বাহিনীকে। প্রাঙ্গণে উড়িয়ে দেওয়া হলো ইউনিয়ন জ্যাক, যুদ্ধ বিজয়ের জন্য পরম করুণাময় ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য সেখানে অনুষ্ঠিত হলো থ্যাঙ্কস গিভিং প্রার্থনা।

লালকেল্লা থেকে চার মাইল দূরে হুমায়ুনের সমাধি ভবনে সম্রাট তখন সদলবলে আশ্রয় নিয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে তখনও হাজারখানেক সিপাহী। তাঁর পরমার্শদাতারা তাঁকে পরস্পর-বিরোধী উস্কানি দিচ্ছে তখনও। কেউ বললো, এখনো সময় আছে, জাঁহাপনা দিল্লি ছেড়ে পলায়ন করুন, লক্ষ্ণৌয়ের দিকে সিপাহীরা আজও আত্মসমর্পণ করেনি, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে। কেউ বললো, বাদশাহ বরং দূত পাঠান ইংরেজের কাছে, তিনি যে নির্দোষ তা প্রমাণ করার জন্য বলুন যে এ বিদ্রোহে তাঁর সম্মতি ছিল না, সিপাহীরা জোর করে তাঁর ওপর কর্তৃত্বের ভার চাপিয়ে গেছে।

বৃদ্ধ, বিমূঢ় সম্রাট এর কোনোটাই করলেন না, বিহ্বল ও জড়ের মতন তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন তাঁর পূর্বপুরুষ হুমায়ুনের সুবিশাল সমাধিভবনে। সেই হুমায়ুন, যিনি একবার সাম্রাজ্য হারিয়েও আবার তা পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

ইংরেজের বিশ্বস্ত গুপ্তচর একচক্ষু কানা রজব আলী সম্রাটের গতিবিধির সম্পূর্ণ বিবরণ এসে দাখিল করলো। পরদিনই ইংরেজ বাহিনীর সবচেয়ে দুঃসাহসী এবং হঠকারী সেনাপতি হডসন মাত্র পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে এগিয়ে গেল হুমায়ুনের সমাধির দিকে। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ এই যে সম্রাট বাহাদুর শাহকে সশরীরে বন্দী করতে হবে। সেইজন্য হাত নিসপিস করলেও হডসন সন্ধি করার আদেশ পাঠালেন সম্রাটের কাছে। পূর্ণ তিন ঘণ্টা রোদ্দুরের মধ্যে অপেক্ষা করতে হলো হডসনকে, কোনো উত্তর এলো না। যে সহস্রাধিক সশস্ত্র সিপাহী হুমায়ুনের সমাধি প্রহরায় রয়েছে, তারা ইচ্ছে করলে হডসনের ক্ষুদ্র বাহিনীটিকে অল্পকালের মধ্যেই পর্যুদস্ত করতে পারে, কিন্তু তাদেরও আক্রমণ করার নির্দেশ দিল না কেউ।

তারপর এক সময় মসলিনের পর্দাঘেরা একটা পালকি খুব ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো। তার মধ্যে শুয়ে আছেন এক ক্ষুদ্রকায় বৃদ্ধ, যাঁর গুম্ফ, দাড়ি ও মুখের রঙ একই রকম শ্বেত। ওষ্ঠে আলবোলার নল। সম্রাট সম্পূর্ণ বাক্যহীন।

বাহাদুর শাহকে বন্দী করে রাখা হলো লালকেল্লার একটি ক্ষুদ্র কক্ষে। তাঁর খাদ্য পানীয়ের জন্য সাময়িকভাবে ভাতা বরাদ্দ হলো দৈনিক দু আনা। সদ্য রাজ্যহীন, খেতাবহীন বাদশা সেখানে প্রায়ই বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, হিন্দুস্তানীওমে কুছ দোস্ত, কুছ শাগির্দ, কুছ আজীজ, কুছ মাসুক, উও সব কে খাকমে মিল গায়ে··· । সব বন্ধু, প্রিয়, দোসর, আত্মীয় শেষ হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল।

সম্রাটকে বন্দী করেই ক্ষান্ত হলো না হডসন ; এবার রাজকুমারদের পালা। উচ্ছৃঙ্খল, হঠকারী শাহী বংশের দুলালরা এই কয়েক মাস দিল্লিতে বসে ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে। এবারে হডসন সঙ্গে নিল একশো জন অশ্বারোহী, ওদিকে হুমায়ুনের সমাধির সামনেও প্রচুর ভিড় জমেছে। জনতা মাঝে মাঝে ধ্বনি তুলছে জেহাদের। কিন্তু রাজকুমারেরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করার বদলে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিল। রাজকুমাররা বেরিয়ে আসার পর তাদের সামনে পিছনে সৈন্য সাজিয়ে অগ্রসর হবার হুকুম দিল হডসন। আর তাদের পাশে পাশে বিলাপ করতে করতে চললো দিল্লির মুসলমানরা।

খানিক দূর যাবার পর আর ধৈর্য রাখতে পারলো না হডসন। রাজপুত্র নামধারী এই বর্বর যুবকদের এখনো দিনের পর দিন বন্দী অবস্থায় খাইয়ে পরিয়ে তোয়াজ করে রাখতে হবে! খ্রীষ্টান নারী ও শিশুদের হত্যার জন্য এরাও দায়ী নয়? রাজকুমারদের মান সম্ভ্রম ধূলিসাৎ করবার জন্য তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল গরুর গাড়িতে, নিজে ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো হডসন। রাজকুমারদের পথে নামিয়ে হডসন কর্কশ গলায় হুকুম দিল তাদের সব বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ তখনই খুলে ফেলবার জন্য। প্রায় নগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান সেই রাজকুমারদের একেবারে বুকের কাছে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপে নিজের হাতে প্রত্যেককে খুন করলো হডসন। তারপর উন্নত গ্রীবা ঘুরিয়ে হডসন তার অনুচরদের হুকুম দিল মৃতদেহগুলো কোতোয়ালির সামনে পথের উপর ফেলে রাখা হোক। দেখুক দিল্লির লোক!

সেখানেও শেষ নয়। কোনো এক অতিরিক্ত ইংরেজ-তোষামুদে দুই রাজকুমারের মুণ্ড কেটে নিয়ে তারপর সেই দুই ছিন্নমুণ্ড থালায় সাজিয়ে উপহার হিসেবে প্রেরণ করলো বাহাদুর শাহের কাছে।

রাজকুমারদের হত্যার পরই শুরু হলো প্রতিশোধ গ্রহণের পর্ব। সৈন্যবাহিনীকে দেওয়া হলো নির্বিচার হত্যা ও অবাধ লুণ্ঠনের অধিকার। দিল্লি নগরী নারকীয় রূপ ধারণ করলো, পথে পথে ছড়ানো মৃতদেহ, গৃহে গৃহে তাণ্ডব ও হাহাকার। খ্রীষ্টান হত্যার বদলা নেবার জন্য ইংরেজ জাতির মনে আর কোনো বিবেকের বাধা নেই। রুল অব ল এখন মুলতুবি। দিল্লির পর অন্যান্য বিদ্রোহী নগরীও একে একে ফিরে আসতে লাগলো ইংরেজের করায়ত্তে, সেসব স্থলের সামান্য সিপাহী-গন্ধযুক্ত হাজার হাজার মানুষকে ধরে এনে হত্যা করা হতে লাগলো। ফাঁসীতে ঝোলাতে সময় অযথা ব্যয় হয় বলে কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে মনুষ্য-শরীর ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া অনেক বেশী সুবিধাজনক। মানুষই এমনভাবে মানুষকে মারতে পারে।

বিজয় অভিযান শুরু হওয়ার পর কোম্পানির রাজত্বের রাজধানী কলকাতা নগরীতেও দেখা গেল প্রবল প্রতিক্রিয়া। ইংরেজ সমাজ এবং তাদের সংবাদপত্রগুলি হিংসা-ক্রোধে লেলিহান ভাষায় দাবি তুললো প্রতিশোধের। ভারতীয়দের তারা সম্বোধন করতে লাগলো কুকুর, বাঁদর, নরকের কীট এবং আরও কদর্য ভাষায়। কোনো ভারতীয়ই বিশ্বাসযোগ্য নয়, এবং যে-হেতু ভারতীয়রা পুরোপুরি মনুষ্য পদবাচ্য নয়, তাই তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব খোঁজারও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। যে-সব ইংরেজ এতদিন ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করেছে, কোনো ভারতীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে, তাদের উদ্দেশ্যেও বর্ষিত হতে লাগলো প্রচণ্ড বিদ্রূপ। একবার যখন ভারতীয়রা বিদ্রোহ করেছে, এর পর থেকে তাদের একেবারে পায়ের তলায় চেপে রাখতে হবে। কেই সরকারকে পরামর্শ দিলে, সৈন্যবাহিনীতে আর একজনও ভারতীয় রাখা উচিত নয়, আফ্রিকা থেকে ভাড়াটে সৈন্য এনে এ দেশটাকে চাবকানো হোক। কেউ বললে, এবার এই সুযোগে সমস্ত ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানদের ধরে ধরে জোর করে খ্রীষ্টান করে দেওয়া হোক। যেন করা হয়েছে আমেরিকায় ক্রীতদাসদের, তা হলে আর তারা কখনো খ্রীষ্টান প্রভুত্ব অস্বীকার করতে পারবে না। কেউ বললে, ভারতীয় রমণীদের বাধ্য করা হোক ইংরেজদের সঙ্গে রমণ-সহবাসে, ত হলে কিছুদিনের মধ্যেই এদেশে গড়ে উঠবে এক বেজন্মা জাতি, তারা আর নিজেদের হিন্দু বা মুসলমান বলে পরিচয় দিতে পারবে না, তারা রক্ত সম্পর্কে ইংরেজদের কাছে বশ্যতা মেনে থাকবে।

গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের অবশ্য যুক্তিসঙ্গত আইন প্রতিষ্ঠার বাতিক আছে। সারাজীবন তিনি সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য খ্যাতি পেয়েছেন, সব দিক বিচার করে ঠিক সুষ্ঠুভাবে তিনি সব কিছুর সিদ্ধান্ত নিতে চান। সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী এই অসম্ভব বিশৃঙ্খলা, প্রতিশোধের পাগলামি এবং অকারণ নরহত্যার দাবিতে তাঁর শিক্ষিত স্বদেশবাসীর এমন চিৎকার, হট্টগোল—এসবে তিনি সায় দিতে পারলেন না। তিনি কড়া-হাতে রাশ টানবার চেষ্টা করলেন এবং ইংরেজদের অনুরোধ করলেন মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য। কিন্তু তাতে যেন আরও ভস্মে ঘি ঢালা হলো, ইংরেজদের মধ্যে হিংসার আগুন আরও বেশী জ্বলে উঠলো লকলক করে। তারা ক্যানিংকে মনে করলো স্ত্রীলোকদের মতন দুর্বল, বিদ্রূপমিশ্রিত করে তাঁর নাম রাখলো ক্লিমেন্সি ক্যানিং, বিলেতে দরবার পাঠালো, যেন ক্যানিংকে অবিলম্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ভারত থেকে। ইতিমধ্যে ভারত জুড়ে হত্যালীলা চলতে লাগলো যথেচ্ছভাবে।

সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পরও ইংরেজদের এই প্রতিক্রিয়া দেখে কলকাতার বাবু ও ধনী সমাজ হতভম্ব হয়ে গেল একেবারে। বাঙালীদের প্রতিও ইংরেজদের সমান রাগ। বাঙালীদের প্রতি তাদের কটূক্তির মাত্রা যেন আরও বেশী। অথচ, বাঙালীরা তো সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন করেনি, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সিপাহীরা ফুঁসে উঠলেও বাংলার ধনী ও জমিদারশ্রেণী তো তাদের কোনোরকম সাহায্য করেনি। এই তার পুরস্কার? ইংরেজের তল্পিবাহক বলে উত্তর ভারতে সিপাহীরা বাঙালীদের ঠিক খ্রীস্টানদের সমান গণ্য করেই মারধোর করেছে, ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পর্যন্ত সিমলা পাহাড়ে সিপাহীদের ভয়ে পলায়নের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল, আর এখন সেই বাঙালীদের ওপরই ইংরেজদের এত রাগ?

ইংরেজের রাজত্বে বাংলায় এই প্রথম গড়ে উঠেছে একটা চাকুরিজীবী সমাজ। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের আর খাদ্যবস্ত্রের সমস্যা নেই এবং এই চাকুরির প্রভাবেই তারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তারা এদেশে ইংরেজের বদলে সিপাহীতন্ত্র চাইবে কেন? আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ এ

দেশের জামদারশ্রেণী আগের চেয়ে অনেক বেশী ধনী হয়েছে, তাদের ধনাগমের অনিশ্চয়তাও কেটে গেছে, এমন সুখের অবস্থায় তারা ইংরেজ-বিরোধিতা করবে কোন্ মূঢ়তায় ? আপামর জনসাধারণকে ইংরেজ যথাসাধ্য শোষণ করছে আর জমিদারদেরও শোষণ করার সুযোগ দিয়েছে, অতএব ইংরেজ ও দিশি জমিদার তো এক পক্ষে থাকবেই ! তবু আজ জমিদার-তালুকদারদের ওপর ইংরেজের এত উষ্মা কেন ?

কোনো অনিচ্ছাকৃত দোষ করে ফেলার ফলে প্রভু যদি লাথি ঝাঁটা মারে তাতে আক্ষেপের কিছু থাকে না। কিন্তু কোনো দোষ করা হয়নি, বরং প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর. হয়েছে, তা সত্ত্বেও প্রভু যদি প্রহার করার জন্য উদ্যত হন, তা হলে সেটা বড়ই মনস্তাপের ব্যাপার হয়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ সমান খড়্গহস্ত হওয়ায় এবং প্রতিশোধের নানান হৃৎকম্প উদ্রেককারী প্রস্তাব শুনে বাঙালীবাবু ও ধনীরা প্রথমে বিস্মিত, তারপর ম্রিয়মান, তারপর প্রতিকারের চেষ্টায় তৎপর হলো।

বাঙালীরা অনেকেই ইতিমধ্যে ইংরেজি ভাষায় বেশ দক্ষ হয়েছে। তারাও কয়েকটি ইংরেজী পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে। সেই সব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে লাগলো নানান কাহিনী, কোথায় কোথায় ভারতীয়রা ইংরেজের পক্ষ নিয়ে প্রতিহত করেছে সিপাহীদের। কোথায় কোন্ তাড়া খাওয়া, বিপন্ন ইংরেজ রাজপুরুষ আশ্রয় নিয়েছে দরিদ্র কৃষকের ঘরে। ইংরেজ রমণীদের মা ও ভগিনীজ্ঞানে আশ্রয় দিয়েছে কত পরিবার।

বাংলা সংবাদপত্রগুলিও পিছিয়ে রইলো না। অনেক ইংরেজ বাংলা পড়তে পারে কিংবা বাংলা সংবাদপত্রের মন্তব্য রেভারেণ্ড লঙ-এর মতন বাংলা-বিদ্‌দের কাছ থেকে জেনে নেয়। বাংলা পত্রপত্রিকাগুলিতেও শুরু হলো ইংরেজের কাছে কাতর ভাবে দয়া ভিক্ষার জন্য ভাষার কারিকুরি। কবিকুল-চূড়ামণি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বরাবরই ইংরেজের পক্ষ সমর্থনকারী, এবার তিনি সিপাহীদের সর্বনাশ কামনা করতে লাগলেন অকুণ্ঠভাবে। ইংরেজরা সিপাহীদের হত্যা করার ফলে উত্তর ভারত হাজার হাজার বিধবা রমণীর কান্নায় ডুবে যাচ্ছে শুনে তিনি কৃত্রিম সমবেদনা জানিয়ে লিখলেন, আহা, ওদের ওখেনে একটি বিদ্যেসাগর থাকলেই তো সমস্যা চুকে যেত। বিদ্যাসাগর সেই বিধবাদের আবার বিবাহ দিতেন, আর অমনি ওরা গায়ে নতুন গয়না পরে আবার আমোদ আহ্লাদ করতো আর সাধ মিটিয়ে খাওয়া দাওয়া করতো। সিপাহী বিদ্রোহের নেতাদের প্রত্যেকের নামে গালি-গালাজ করে তিনি তাদের একেবারে বাপ-পিতামহ-চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করতে লাগলেন। ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ সম্পর্কে নারীবিদ্বেষী ঈশ্বর গুপ্ত লিখলেন :

> পিপীড়া ধরেছে ডানা মরিবার তরে।
> হ্যাদে কি শুনি বাণী ?
> হ্যাদে কি শুনি ঝান্সীর রাণী
> ঠোঁটকাটা কাকী
> মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে সাজিয়াছে নাকি ?
> নানা তার ঘরের ঢেঁকী
> নানা তার ঘরের ঢেঁকী মাগী খেঁকী
> শেয়ালের দলে
> এতদিনে ধনে জনে যাবে রসাতলে

এসবের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো আবেদন নিবেদন। রাজা মহারাজার দল আগে থেকেই বিনয় বিগলিত স্মারকপত্র পাঠিয়ে তাদের ইংরেজ-আনুগত্য জানাতে শুরু করেছিল, দিল্লি পতনের পর তারা নবোদ্যমে অভিনন্দন জানাতে লাগলো সরকার বাহাদুর সমীপে।

বর্ধমানের মহারাজার উদ্যোগে সভা ডেকে ইংরেজের জয়ে উল্লাস প্রকাশ করা হলো এবং সুদীর্ঘ পত্রে তা জানানো হলো লর্ড ক্যানিংকে। সেই পত্রে বর্ধমানের মহারাজা ছাড়াও স্বাক্ষর করলেন কলকাতার ধনী শিরোমণি রাজা রাধাকান্ত দেব এবং আরও আড়াই হাজার হোমরা চোমরা। কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীশচন্দ্রও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদের নিয়ে পাঠালেন পৃথক পত্র। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখার্জি আগেভাগেই চিঠি দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি শুধু ইংরেজদের সমর্থনই করেননি, তাঁর প্রজাদের মধ্য থেকে আগুরি, গোয়ালা, বাগদী এবং ডোমদের নিয়ে একটি বাহিনী গড়ে রেখেছিলেন এক ইংরেজ সার্জেনের নেতৃত্বে, যাতে সিপাহীরা এসে পড়লে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা

যায়। হিন্দুরা একতরফাভাবে ইংরেজের দয়া আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো কলকাতার মুসলমান সমাজ। তারাও একযোগে একটি আবেদনপত্র দাখিল করে জানালো যে বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রতি তাদের কোনোই সমর্থন ছিল না। তারাও ইংরেজ-রাজ-ভক্ত প্রজা, ইংরেজ রাজত্ব তাদের কাছেও খুব সুখের। ঢাকার নবাব জানালেন, তিনি হাতি দিয়ে সাহায্য করেছেন ইংরেজ সরকারকে, সেখানকার অন্যান্য জমিদার ও মৌলবীরাও ইংরেজের পক্ষেই তো রয়েছে বরাবর।

নবীনকুমার সিংহের বাড়িতেও জমায়েত হয়েছে অনেকে। বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকেও একটি আবেদন পাঠানো দরকার। ইংরেজী সংবাদপত্রগুলিতে তারস্বরে চিৎকার করা হচ্ছে, দায়িত্বপূর্ণ চাকুরি থেকে বাঙালীদের সরিয়ে দেওয়া হোক। বাঙালী ধনীদের সশস্ত্র বরকন্দাজ রাখার অধিকার কেড়ে নেওয়া হোক। সুতরাং আত্মরক্ষার্থে বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও নতুন ধনীদেরও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন।

নবীনকুমার চুপ করে বসে আছে এক পাশে। তার মুখমণ্ডল থমথমে। যদুপতি গাঙ্গুলী, কিশোরীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রমুখ যুবকের মুখও চিন্তা-ভারাক্রান্ত। এরা কেউ একটিও বাক্য বিনিময় করছে না পরস্পরের সঙ্গে। ইংরেজের বিজয়ে এরা খুশী-প্রস্তাব পাঠাতে বলেছে। কিন্তু এদের মুখে খুশীর চিহ্নমাত্র নেই।

দরখাস্তটি রচনা করেছে কৃষ্ণদাস পাল, সে এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী এবং নিজের ইংরেজী ভাষাজ্ঞান সে নিজেই খুব তারিফ করে। লেখা সাঙ্গ হবার পর কৃষ্ণদাস মুগ্ধভাবে সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। তারপর পড়ে শোনাতে লাগলো। কেউ কিছু উচ্চবাচ্য করলো না।

নিজের স্বাক্ষরটি দেবার পর নবীনকুমার স্বগতভাবে বললো, আমি এতে সই কচ্চি বটে, কিন্তু আমার মন এতে সায় দিল না।

তারপর মুখ তুলে সে যদুপতিকে বললো, ব্রাদার, সত্যি কতাটি বলবো? আমরা সবাই মুখে সেপাইদের দুষেচি বটে কিন্তু এই যে-কটা মাস দিল্লি স্বাধীন ছেল, ততদিন আমিও যেন মনে মনে স্বাধীন মানুষ হয়ে গেসলুম। হাজার হোক, ইংরেজ আমাদের বিজাতি, তাদের অধীনে আমরা পরাধীন হয়ে থাকা কি আমাদের বুকের ওপর একটা পাষাণভার রাখা নয়কো?

যদুপতি বললো, আমি তো এ কতা তোমায় আগেই বলিচিলুম। তখন উড়িয়ে দিলে—।

নবীনকুমার বললো, ঐ যে হরিশ আমাদের বোজালে—।

হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ মুখুজ্যের মুখখানিও বিমর্ষ। সে বললে, নবীন, আমি স্বীকার কচ্চি আমার ভুল হয়েছেল। ইংরেজকে আমরা চিনতে পারিনিকো। হাজার তোষামোদ করেও ইংরেজের মন পাওয়া যাবে না। আজ আমার মনে হচ্চে, সেপাইদের যুদ্ধকে আমরা যে চোকে দেকিচি, ভবিষ্যতের ইতিহাস সে চোকে দেকবে না! এই আমি বলে গেলুম, দেকো, মেলে কিনা। আমাদের জীবদ্দশাতেই সুর উল্টো হয়ে যাবে। তোমাদের কাচে আজ আমি আর একটা কতাও বলে যাচ্চি, আর কখুনো আমার লেখনি দিয়ে ইংরেজের গুণগান করবো না। যদি করি, তা হলে আমি খানকিরও অধম!

কথা শেষ করেই হরিশ কুর্তার জেব থেকে একটা ব্র্যাণ্ডির শিশি বার করে সেই তরল আগুন ঢক ঢক করে ঢেলে দিল গলায়।
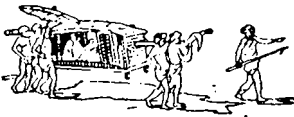
ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া যেদিন হিন্দুস্থানের সম্রাজ্ঞী হলেন, সেদিন নবীনকুমারের জীবনেও এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হলো।

সিপাহীদের দমনকার্য এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্তভাবে খণ্ডযুদ্ধ চলেছে, এর মধ্যেই অকস্মাৎ ইংলণ্ডেশ্বরীর ঘোষণা এসে পৌঁছেলো এ দেশে। কোম্পানির আমল শেষ। এখন থেকে ভারতবর্ষীয় নাগরিকেরা সকলেই সরাসরি ব্রিটিশ রাজবংশের প্রজা। রানী

ভিক্টোরিয়া আশ্বাস দিলেন যে, যে-সব দেশীয় নৃপতিদের অধীনে ছোট ছোট রাজ্য আছে সেইসব রাজ্য আর গ্রাস করা হবে না এবং "ভারতীয় সীমানার মধ্যেকার অধিবাসীরা আমাদের অন্যান্য সমস্ত প্রজাদের মতন সমানভাবে গণ্য হইবে এবং তাহাদের প্রতি আমাদের সমান দায়িত্ব থাকিবে, আমরা ইহাতে দায়বদ্ধ রহিলাম।"

এই উপলক্ষে বিরাট উৎসব হলো লাট প্রাসাদে। মিষ্টান্ন বিতরিত হলো সমস্ত স্কুলের বালকদের মধ্যে। পথে পথে মহা ধূমধাম। রানীর ঘোষণার বয়ানের বঙ্গানুবাদ এবং অন্যান্য দেশীয় ভাষায় অনুবাদ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পাঠ করে শোনালেন জেলা শহরগুলির জনসাধারণের কাছে। এর ফলে ভারতবর্ষীয়দের অবস্থার কতখানি উন্নতি হলো তা এখনই সঠিক বোঝা না গেলেও অনেকেরই মনে হল, একটা যেন বিরাট কিছু পরিবর্তন ঘটে গেল। রাজা-বাদশার অধীনে থাকাই এ দেশীয় মানুষের বহুকালের অভ্যেস, প্রায় শতবর্ষ যাবৎ এ দেশে সঠিক কোনো সম্রাট ছিল না, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজ্য চালালেও তাদের গায়ে খানদানী রাজবংশের গন্ধ নেই, ব্যবহারেও বেনিয়া সুলভ ভাব-ভঙ্গী প্রকট। এতদিন পর সত্যিকারের একজন মহারানীকে পেয়ে সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। স্থূলকায়া কুরূপা রমণী শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া অনেকের চক্ষে পরিত্রাতা দেবী হিসেবে প্রতিভাত হলেন।

শহর কলকাতার অনেক বিশিষ্ট পরিবারেও আনন্দ উৎসব হলো এইদিন। প্রবেশদ্বার সজ্জিত হলো ফুলমালায়, ছাদে উড়িয়ে দেওয়া হলো ইউনিয়ন জ্যাক এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত আত্মীয়-বান্ধবদের সঙ্গে খানাপিনা। জোড়াসাঁকোর সিংহসদনে অবশ্য এর ব্যত্যয় হলো। নবীনকুমার কোনো উৎসবের ব্যবস্থা করেনি। মল্লিক, ঠাকুর, দত্ত এবং বসুদের বাড়িতে তার নিমন্ত্রণ ছিল, শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে কোথাও যায়নি সে। দুদিন আগে একটি ঘটনায় বড় অপমানিত বোধ করেছে নবীনকুমার।

নবীনকুমার অর্থের কথা কখনো চিন্তা করে না। তার জননীর ঢালাও অনুমতি দেওয়া আছে, সে যখন যা চাইবে, সব পাবে। নবীনকুমার অর্থের মূল্য বোঝে না। সে দু হাতে অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। বিদ্যোৎসাহিনী সভার কাজকর্মের জন্য সে কত যে ব্যয় করেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। ইদানীং নাটকের মহলার জন্য আরও বেশী ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু গত পরশ্বদিন তার ইচ্ছায় প্রথম বাধা পড়েছে।

নাটকের কুশীলবদের জন্য পোশাক নির্মিত হবে সেইজন্য সভার এক সদস্য কিছু সিল্ক বস্ত্রের নমুনা সংগ্রহ করে এনেছে। তার মধ্যে এক প্রকার ইতালীয় সিল্ক সকলেরই খুব পছন্দ হলো। সে সিল্ক বস্ত্র অবশ্য খুবই মহার্ঘ, কিন্তু নবীনকুমার মূল্যের জন্য আবার কবে রেয়াৎ করেছে। তখনই দিবাকরকে ডেকে সে হুকুম দিল এক সহস্র মুদ্রা নিয়ে আসবার জন্য।

দিবাকর ঘাড়-মাথা চুলকে, শঙ্কায়-লজ্জায়-বিনয়ে একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে জানালো যে এখন টাকা দেওয়ার কোনো উপায় নেই। স্বয়ং বিধুশেখর সব হিসাবপত্র পরীক্ষা করছেন, এখন কয়েকদিন তহবিল থেকে টাকা তোলা বন্ধ।

নবীনকুমার প্রথম কথাটা বিশ্বাসই করতে পারেনি। চাওয়া মাত্র সে টাকা পাবে না, এমন অভিজ্ঞতা তার কখনো হয়নি।

সে কড়া স্বরে বললো, বাবুকে বলো, আমি নিইচি, এখন টাকা নিয়ে এসো। যাও।

দিবাকর বললো, আজ্ঞে তার উপায় নেইকো, তবিল বাক্সের চাবি বড়বাবু নিজের কাচে রেকেচেন।

নবীনকুমার তখন বললো, তা হলে যাও মায়ের কাচ থেকে আমার নাম করে নিয়ে এসো গে!

বিম্ববতীর কাছ থেকে ঘুরে এসে দিবাকর জানালো যে বিম্ববতীর হাতও একেবারে খালি। যা ছিল তা নবীনকুমারকেই দিয়েছেন। তহবিল থেকে না তুলে তিনিও কিছু দিতে পারবেন না।

বন্ধুবান্ধবদের সামনে বড় অপদস্থ হতে হলো নবীনকুমারকে।

পরের দুদিন সে আর শয্যা ছেড়ে উঠলো না, কারুর সঙ্গে কথাবার্তাও বললো না বিশেষ।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার ভারত গ্রহণ ঘোষণার দিনেও নবীনকুমার শয্যা ত্যাগ করেনি। সন্ধ্যার পর শোনা যেতে লাগলো পটকা ফাটার শব্দ, মাঝে মাঝে আকাশে ঝলসে ওঠে বাজির রোশনাই, পথে পথে মানুষের ফুর্তির হল্লা। রাত্রি নটার তোপ দাগার পর যখন নবীনকুমারকে আহার গ্রহণ করার জন্য ডাকতে এলো তার পত্নী, সেই সময় সে পালঙ্ক থেকে নামলো। কিন্তু আহার গ্রহণ করতে গেল না। পত্নীর সঙ্গে একটি কথাও না বলে সে চলে এলো তার জননীর কক্ষের দিকে।

অতি প্রাতঃকালেই বিম্ববতী ইদানীং প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যান সেইজন্য শুয়ে পড়েন সন্ধ্যা রাত্রেই। তাঁর কক্ষের বন্ধ দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে নবীনকুমার গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলো, মা, মা!

বিম্ববতীর সঙ্গে এখন আর প্রত্যহ তাঁর পুত্রের দেখা হয় না। সে তার বন্ধুবর্গের সঙ্গেই আলাপে বেশী ব্যাপৃত থাকে। পারিবারিক আদিখ্যেতা সে বিশেষ পছন্দও করে না। বিম্ববতী লোক মারফত প্রতিদিন খবরাখবর নেন। আধো ঘুম আধো তন্দ্রার মধ্যেও বিম্ববতী ধড়মড় করে উঠে বসলেন। প্রিয়জন সম্পর্কে প্রথমেই কোনো বিপদের কথা মনে আসে। তিনি দ্রুত এসে দরজা খুলে উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে?

নবীনকুমার বললো, মা, আমার কত সালে জন্ম, তোমার মনে আচে?

প্রগাঢ় বিস্ময়মাখা দৃষ্টি ফেলে বিম্ববতী জিজ্ঞেস করলেন, কেন? এত রাত্রে সে কতা কেন?

—রাত বেশী হয়নি, মা। তোমার মনে আচে কি না বলো?

—সেই যেবার আমাদের ইব্রাহিমপুরের তালুকটা কেনা হলো, সেটা কত সন, ছেচল্লিশ না সাতচল্লিশ?

—আমার মনে আচে মা, আমি হিসেব কষে দেকিচি, এই পরশুদিন আমার আঠারো বছর পূর্ণ হয়েচে।

—ওমা তাই নাকি! আমি খেয়ালই করিনি, তোর জ্যাঠাবাবুও কিচু বলেননি তো?

—কেন তোমরা খেয়াল করোনি? এখন থেকে এই বিষয় সম্পত্তির মালিক কে? আমি না জ্যাঠাবাবু?

—ওমা, তুই-ই তো সব কিচুর মালিক!

—আমি মালিক, আর তবিল বাক্সের চাবি থাকবে জ্যাঠাবাবুর কাচে?

নবীনকুমার হুংকার দিয়ে ডাকলো, দুলাল? যা তো দুলাল, জ্যাঠাবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।

দুলাল প্রায় অষ্টপ্রহরই নবীনকুমারের কাছাকাছি থাকে। বারান্দায় এক কোণে সে বসেছিল, ডাক শুনে কাছে এগিয়ে এলো।

বিম্ববতী বললেন, এ কি কতা বলচিস ছোটকু? এত রাতে তোর জ্যাঠাবাবুকে ডাকতে যাবে?

নবীনকুমার উত্তর দিল, বললুম না রাত বেশী হয়নি! রাস্তায় কত মানুষজন।

—উনি যে সন্ধের পরই শুয়ে পড়েন!

—শোবার পরও দরকার পড়লে মানুষ ওঠে।

—এখন কী দরকার পড়লো, ছোটকু?

—তবিল বাক্সের চাবি আমার এক্ষুনি চাই। আমি আর কচি খোকাটি নই। আমি টাকা চাইলে দিবাকর আমার মুখের ওপর না বলে! এবার দেকাচ্চি!

—ওরকম করিসনি, ছোটকু। তুই বরং কাল সকালে গিয়ে ওনার সঙ্গে দেকা করিস। উনি তোকে কত ভালোবাসেন।

—আমি দেকা করতে যাবো? কেন? ওঁকেই আসতে হবে। আজই, এক্ষুনি। এই দুলাল, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেকচিস কী? যা—

—তুই কি পাগল হলি? এই রাত্তিরেই তোর চাবি চাই?

—হ্যাঁ। চাই। আর তুমি ভেবো না মা, আমি কখনো জ্যাঠা বাবুর বাড়িতে চাবি চাইতে যাবো। তাঁকে নিজে এসে দিতে হবে।

বিম্ববতী অনেকভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু নবীনকুমারের ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। দুলালকে এক প্রকার জোর করে পাঠিয়ে ছাড়লো সে। ইতিমধ্যে তার স্ত্রী সরোজিনী তাকে আহার সেরে নেবার জন্য অনুরোধ জানালো। কিন্তু চাবি হাতে না পাওয়া পর্যন্ত নবীনকুমার অন্ন গ্রহণ করবে না। বিম্ববতী তার গায় মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে ঝট্‌কা মেরে সরে যেতে লাগলো। সে এমনই ছটফট করছে যেন তাকে কেউ তপ্ত কটাহে বসিয়ে দিয়েছে।

দুলাল ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে ফিরে এসে জানালো যে বিধুশেখর অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। এখন তাঁকে জাগানো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

ঠিক উন্মাদেরই মতন চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হয়ে গেল নবীনকুমারের, তারকা দুটি যেন ঘূর্ণিত হতে লাগলো। প্রচণ্ড জোরে দুলালকে এক চপেটাঘাত করে সে হিংস্র কণ্ঠে বললো, সম্ভব নয়? তাঁর

বাড়িতে আগুন লাগলেও তিনি ঘুম থেকে উঠবেন না ? এই সময় যদি আমি মরে যাই, তবুও তাঁকে ডাকা সম্ভব নয় ? উল্লুক কোথাকার !

বিম্ববতী দুলাল আর নবীনকুমারের মাঝখানে এসে পড়ে বিপন্ন, করুণ কণ্ঠে বললেন, কেন এমন করচিস, ছোট্‌কু ! আমার কতা শোন, কাল সকালে···

নবীনকুমার বললো, মা, জমিদার কে, আমি না জ্যাঠাবাবু ? জমিদারের রক্ত আচে আমার শরীরে। উনি তো শুদু উকিল, আমাদের সম্পত্তির অছি, যখন ডাকবো, তখুনি ওঁকে আসতে হবে।

বিম্ববতী নিথর হয়ে গেলেন, অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়লো তাঁর দুচোখ দিয়ে। বাষ্পজড়িত স্বরে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, আমার দিব্যি রইলো, আজকের রাতটার মতন ক্ষ্যামা দে, কাল সকালেই—

নবীনকুমার চিৎকার করে উঠলো, আমার চাই না। কাল সকালেই আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। বিষয় সম্পত্তি সব তোমাদের রইলো।

একটা চীনে মাটির সুদৃশ্য ভাস তুলে মাটিতে আছড়ে চুরমার করে সে বললো, চাই না ! আমার কিচু চাই না ! সব জ্যাঠাবাবু নিক।

বারান্দায় সার দেওয়া খাঁচাগুলি থেকে ডেকে উঠলো কয়েকটি পাখি। বিম্ববতী এবং সরোজিনী দুজনে মিলে ধরে রাখবার চেষ্টা করলো নবীনকুমারকে। কিন্তু সে সবলে নিজেকে ছাড়িয়ে আরও কিছু জিনিস ভাঙার জন্য ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলো। কিছু না পেয়ে সে ছুটে নিজের ঘরে ঢুকে বন্ধ করে দিল অর্গল। ভিতরে শোনা যেতে লাগলো দুম দাম শব্দ। সে অনেক কিছু ভাঙছে।

বিম্ববতী এবং সরোজিনী দুজনেই কাঁদতে কাঁদতে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বারবার তাকে অনুরোধ করতে লাগলো খোলার জন্য। কিন্তু নবীনকুমার ক্রোধে জ্ঞানশূন্য। খেয়ালী পুত্রটির জেদের পরিচয় বিম্ববতী এর আগেও পেয়েছেন কিন্তু এতখানি বাড়াবাড়ি কখনো দেখেননি। তিনি খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

বহু কাতর সনির্বন্ধ অনুরোধেও নবীনকুমার কর্ণপাত না করায় বিম্ববতী দুলালকে বললেন, বাবা দুলাল, তুই আর একবার যা। দিবাকরকে সঙ্গে নিয়ে যা। যেমন করে হোক ও বাড়ির বড়বাবুকে জাগিয়ে তোল। আমার নাম করে বলবি, বড় বিপদে পড়ে আমি তাঁকে ডেকিচি। সব বুঝিয়ে বলিস, যা দৌড়ে যা—

বিধুশেখর এলেন আধঘণ্টা পরে।

বারান্দায় একটি কেদারায় বিম্ববতী নিঝুম হয়ে বসেছিলেন, আর সরোজিনী তাঁর পায়ের কাছে। লাঠিতে ভর দিয়ে একটা পা টেনে টেনে বিধুশেখর এগিয়ে এলেন সেদিকে। বিধুশেখরকে দেখে সরোজিনী মাথায় ঘোমটা টেনে ছুটে চলে গেল আড়ালে।

বিধুশেখর একেবারে বিম্ববতীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েচে, বিম্ব ?

বিম্ববতীর মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। তাঁর শরীরের সেই অপরূপ রূপলাবণ্যরাশিতে যেন মেঘের ছায়া পড়েছে ইদানীং, নাকের ওপর একটু একটু মেছেতার দাগ, চিবুকের নিচে ভাঁজ। বিধুশেখরকে দেখে মাথায় অবগুণ্ঠন টানার কথাও তাঁর মনে এলো না। তিনি বিধুশেখরের প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না। প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু রোধ করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বিধুশেখর বললেন, ঐ দুলালটা একটা বেল্লিক। আগেরবার গিয়ে আমায় ডাকতে পারেনি ? ওপরে উঠে গেলেই তো পারতো। এমন কিছু রাত হয়নিকো, ছোটকু কোতায় ?

বিম্ববতী হাত তুলে বন্ধ ঘর দেখিয়ে দিলেন।

বিধুশেখর সেখানে গিয়ে ডাকলেন, ছোটকু, ছোটকু !

কক্ষের মধ্যে আপাতত কোনো শব্দ নেই। বিধুশেখরের ডাকের পর আবার কিছু একটা ভাঙার শব্দ হলো। বিধুশেখর গলা চড়িয়ে বললেন, ছোটকু খোল, আমি চাবি এনিচি !

তৎক্ষণাৎ সশব্দে দরজা খুলে গেল। নবীনকুমার হাত বার করে বললো, কই দিন।

সারা ঘরের মধ্যে লণ্ডভণ্ড অবস্থা, বিছানা বালিশও পড়ে আছে মেঝেতে। বিধুশেখর একটুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন নবীনকুমারের দিকে। তারপর সহাস্য মুখে প্রশ্ন করলেন, এত রাতে চাবি নিয়ে কী করবি? কাল সকাল পর্যন্ত তর সইছেল না?

নবীনকুমার জেদী বালকের মতন বললো, চাবি এখুন থেকে আমার হেপাজতে থাকবে। পরশু থেকে আমিই সব কিচুর মালিক।

বিধুশেখর বললেন, তা তো বটেই। শুধু তোর বাপের সম্পত্তি কেন, আমার যা কিচু আচে, সে সবও তো বলতে গেলে তোরই। আমার তো থাকবার মধ্যে আচে ঐ নাতি, আমি চোক বোজবার আগে তার ভার তো তোর হাতেই দিয়ে যাবো।

—আমি পশু থেকে সাবালক হয়িচি, তবু দিবাকর আমার মুখের ওপর না বলে কেন? আপনি ওকে বলে দেননি কেন?

—ঠিক, আমাদের অন্যায় হয়েচে, বুজলে বিম্ব, আমাদের অন্যায় হয়েচে সত্যি, আমি পাঁচ কাজে ব্যস্ত রইচিলুম, সেইজন্য দিনক্ষণের হিসেব করিনিকো। তবে আমি ভেবে রেকিচিলুম, তোর কোনো সন্তানাদি হলে তারপর সব বিষয়-আশয় তোর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হবো। সন্তান না হলে সংসারে মন বসে না। তা যাই হোক, তুই বড় হইচিস, জমিদারির কাজকম্ম শিকে নে, নিয়ম করে রোজ হৌসে বেরো। আমিও এবার সব দায়িত্ব থেকে মুক্তি চাই—

বিধুশেখর চাবির গুচ্ছ নবীনকুমারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, কিন্তু এত রাতে টাকা নিয়ে তুই কী করবি, বললি না? তোর এখুনি টাকার দরকার?

নবীনকুমার বললো, হ্যাঁ। আমার এখুনি টাকা চাই। আমার টাকার তোড়া নিয়ে লোপালুপি খেলার ইচ্ছে হয়েচে।

বিধুশেখর হা হা করে হেসে উঠলেন। সহজে হাসেন না তিনি। তাঁর অসময়ের হাসি শুনে অনেকে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু তিনি যেন আজ নবীনকুমারের গোঁয়াতুমি বেশ উপভোগ করছেন। হাসতে হাসতেই বললেন, আর যাই করিস বাপু টাকা নিয়ে কখনো লোপালুপি খেলতে যাস না। বড় পিছলে যায়। একবার হাত পিছলে গেলে আর ধরা যায় না।

বিম্ববতীর দিকে ফিরে তিনি আবার বললেন, আমাদের ছোটকুর কতকগুলোন দোসর জুটেচে, তারা বিজ্ঞের মতন খুব গেরেমভারি কতা বলে বটে, কিন্তু সবগুলোনেরই মতলোব ছোটকুর মাতায় কাঁটাল ভাঙা। আমি সবই টের পাই। সব কিচুরই খপর রাকি। আমি যে এখুনো মরিনি, সেটা তারা জানে না।

তারপর লাঠিটি বাগিয়ে ধরে তিনি বললেন, চলিগো, বিম্ব, আমার মাতা থেকে একটা গুরুভার নেমে গেল। আজ থেকে আমি নিশ্চিন্দি। রামকমলের জিনিস তার ছেলের হাতে তুলে দিইচি।

বিম্ববতী বললেন, ছোটকু, তোর জ্যাঠাবাবুকে পেন্নাম করলিনি?

বিধুশেখর বললেন, থাক থাক, রাত্তিরের দিকে আর পেন্নামের দরকার নেই। এই সামান্য কারণে রাগ করে ছোটকু খাওয়া-দাওয়া করেনি শুনলাম। যা এখুন খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়গে যা।

নবীনকুমার অবশ্য মায়ের এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলো না। বিধুশেখর যে এই রাতেই নিজে এসে এত সহজে তার হাতে চাবি তুলে দেবেন, এজন্য সে ঠিক প্রস্তুত ছিল না। সে এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে বিধুশেখরের পায়ে হাত ছোঁয়ালো।

বিধুশেখর নবীনকুমারের চিবুক স্পর্শ করে হাতটি নিজের ওষ্ঠে ছোঁয়ালেন। তারপর বললেন, বাবা ছোটকু, একটা কতা আমি বলে যাই। তবিলের চাবি শুধু নিজের কাচে রাকলেই হয় না। তবিল ভরাবার কৌশলটাও শিকতে হয়।

নবীনকুমারের বুকটা কেঁপে উঠলো। তা হলে কি তহবিল একেবারে শূন্য? চাবির গুচ্ছ হাতে নিয়ে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, বিধুশেখর লাঠি ঠুকে ঠুকে পা টেনে টেনে চলতে লাগলেন, সিঁড়ি পর্যন্ত শোনা গেল তাঁর চলে যাওয়ার শব্দ।

সেই রাত্রেই নবীনকুমার দিবাকরকে ডেকে তহবিল খোলালো। না। বিধুশেখর মিথ্যেই ভয় দেখিয়েছেন, তহবিল যথেষ্টই পূর্ণ।

পরদিন থেকে সে খোলামকুচির মতন অর্থ ছড়াতে লাগলো। বিক্রমোর্বশী নাটকের অভিনয়ের জন্য যত অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন ছিল, সে ব্যয় করলো তার প্রায় চতুর্গুণ। এমন সুসজ্জিত মঞ্চ এ শহরে কেউ কখনো দেখেনি। পোশাকের চাকচিক্যে চক্ষু ঝলসে যায়। নিমন্ত্রণ করা হলো সমস্ত মান্যগণ্য মানুষদের, তাঁদের প্রত্যেকের জন্য বহুমূল্য গালিচামোড়া আসন এবং নানা বর্ণের পুষ্পস্তবক। বেশ কয়েকজন সাহেব সুবোকেও নিমন্ত্রণ করা হলো, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এলেন না, কয়েকজন এলেন। মঞ্চের ওপর সাদা রঙের অশ্বের পৃষ্ঠে পুরোপুরি রাজোচিত পোশাকে ভূষিত নবীনকুমারকে পুরুরবার ভূমিকায় দেখে মুগ্ধ হতেই হয়। যেমন সুন্দর তার মুখশ্রী, তেমনই মধুর তার কণ্ঠ। দর্শকদের মধ্যে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। পরদিন সংবাদপত্রগুলিতেও এই নাট্য অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশিত হলো।

শুধু সামান্য একটু ত্রুটি হয়েছিল এই অনুষ্ঠানের; কুশীলবদের কারুর যখন গান গাওয়ার কথা, তখন প্রসেনিয়ামের পাশ থেকে আগেই জড়িত গলায় গান ধরছিল একজন। এরকম একবার নয়, দুবার। তাতে খানিকটা হাস্যের সঞ্চার হয়েছিল। যাই হোক, মঞ্চ ব্যবস্থাপকরা ঠেলাঠেলি করে রাইমোহনকে একেবারে পথে বার করে দিয়ে আসে।

পরদিন বিদ্যোৎসাহিনী সভার সদস্যরা আবার সমবেত হয়ে যখন তাদের সার্থকতার জন্য উল্লাস করছে, কোন্ বিখ্যাত ব্যক্তি কোন্ ভূমিকা সম্পর্কে কী মন্তব্য করেছেন সেই আলোচনা চলছে, সেই সময়ে আবার এসে উপস্থিত হলো রাইমোহন। একেবারে চুরচুর মাতালের দশা। পোশাকে লেগে আছে ধুলো কাদা, বোধহয় রাস্তায়ও কয়েকবার গড়াগড়ি দিয়েছে। ঢুকে জড়িত গলায় সে গান ধরলো, "লোকে যা বলে বলুক, আমি তো নিজেরে জানি···হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবা···"

রাইমোহনকে দেখেই নবীনকুমার একেবারে অগ্নিমূর্তি ধারণ করলো। কাল রাইমোহনের ব্যবহারে সে বড়ই মনে আঘাত পেয়েছিল। তার নিজের সভার সদস্যের এই ব্যবহার! মনে মনে নবীনকুমার এবং আরও অনেকের ভয় ছিল, পাইকপাড়ার সিংহ কিংবা প্যাথুরেঘাটার ঠাকুররা বোধহয় ভাড়াটে লোক পাঠিয়ে বিঘ্ন ঘটিয়ে নাটক পণ্ড করার চেষ্টা করবে। সে সব কিছুই হয়নি, আর রাইমোহনের এত সাহস!

নবীনকুমার লাফিয়ে এসে রাইমোহনের টুঁটি চেপে ধরলো। চিৎকার করে বললো, উল্লুক, তুমি আবার এসোচো! বেরোও! বেরোও!

রাইমোহন বললো, মাচ্চো কেন বাবা? কাল রাজা আর আজ জল্লাদ! অ্যাঁ? বড় খাসা হয়েছেল কিন্তু, সব বড় মানুষদের চোক টাটাচ্চে···এমন খেলা কেউ দেকায়নি···হে হে হে···কত টাকার খেলা···

নবীনকুমার তাকে মারতে উদ্যত হলে হরিশ মুখুজ্যে এসে বাধা দিয়ে সরিয়ে নিল তাকে। সে বললো, আহা আজ আনন্দের দিনে বেচারিকে মারধোর করো না। ও আনন্দের চোটে একটু বেশী খেয়ে ফেলেচে। মাতালকে মারতে দেকলে আমার বড় কষ্ট হয়।

রাইমোহন হরিশ মুখুজ্যের দিকে ঢুলু ঢুলু চোখে চেয়ে ফিক করে হেসে ফেললো। তারপর বললো, শুদু ফুকো দয়ার কতা কেন বাওয়া! কিচু দাও। এখুন দু ঢোঁক না পেলে···গলাটা বড় শুকো গ্যাচে!

হরিশ মুখুজ্যে একজন, যাকে বলে, নিজেই নিজেকে গড়া মনুষ্য। সমাজসংসার থেকে তিনি কখনো কোনো সাহায্য বা দয়া পাননি, কখনো কারুর মুখাপেক্ষীও হননি। কুলীন বংশের সন্তান, তাঁর পিতার মোট তিনটি পত্নী এবং হরিশ পিত্রালয়ে বাস করার সুযোগ থেকে জন্ম থেকেই বঞ্চিত। তাঁর পিতা পুত্রোৎপাদন করেই তাঁর মাকে ধন্য করেছেন, সেই পুত্রের জন্য কোনো দায় তিনি নিজে কখনো বহন করেননি।

মামাবাড়িতে অনাদরে অবহেলায় মানুষ হয়েছে হরিশ। মামারাও দরিদ্র, ভাগিনেয়র পড়াশুনোর জন্য পয়সা খরচ করতে তাঁরা পরাঙ্মুখ। এবং যেহেতু তাঁরা নিজেরাও কুলীন, সুতরাং তাঁদের

নিজেদেরও তো সন্তানাদি কম নয় ! বিদ্যালয়ে বিনা বেতনের ছাত্র হয়ে কিছুদিন পড়াশুনো করলো হরিশ, তারপর বিদ্যালয়ের পাঠ অসমাপ্ত রেখেই এক সময় তাকে বিদায় নিতে হলো। মামারা ইতিমধ্যেই তাদের নিজের ভার নিজেদের বুঝে নিতে বলেছেন। হরিশের ওপরে একটি ভাই আছে, কিন্তু সে একটি অপদার্থ। কোনোরকম জীবিকার পথ না পেয়ে সে ইতিমধ্যেই একটি বিবাহ করে ফেলেছে। কুলিন-সন্তানের পক্ষে এটাই সহজতম কাজ।

সংসার প্রতিপালনের জন্য হরিশকে চোদ্দ বছর বয়েসেই চাকুরির সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হলো। কিন্তু যে-বালক একটিও পাশ করেনি, তাকে কে কাজ দেবে ? ইংরেজের কেরানি উৎপাদনের জন্য প্রবর্তিত শিক্ষা প্রণালীর কুফল ইতিমধ্যেই ফলতে শুরু করেছে। অনেক পাশ করা যুবকই চাকুরির জন্য হন্যে হয়ে ঘোরে, কিন্তু সকলের উপযোগী চাকুরি নেই। বাড়তে থাকে বেকারের সংখ্যা।

হরিশ নিরুদ্যম না হয়ে ডাকঘরের সামনে দোয়াত-কলম নিয়ে বসতে লাগলো নিয়মিত। সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে লোকের মানি-অর্ডার ফর্ম পূরণ করে কিংবা দরখাস্ত বা চিঠিপত্র লিখে দেয়। তার হস্তাক্ষর সুন্দর, ইংরেজি বানান নির্ভুল। এই জন্য সে কিছু কিছু কাজ পায়। কয়েক বছর এইভাবে কাটাবার পর এক নিলামওয়ালার নজর পড়লো হরিশের ওপর। ছেলেটি চিঠিপত্র খুব ভালো লেখে। সেইজন্য নিলামওয়ালা হরিশকে ডাকঘরের দরজা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের অফিসে কাজ দিল। মাস মাহিনা দশ টাকা।

কৈশোর বয়স থেকেই হরিশের বুকের মধ্যে প্রবল অভিমান ও ক্ষোভ জমে আছে। তার মনে হলো, এই সমাজ যেন ষড়যন্ত্র করে তাকে একজন দশ টাকা বেতনের কেরানি বানিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সে কিছুতেই এই ব্যবস্থা মেনে নেবে না। বংশ মর্যাদা কিংবা বিত্ত কোনোটাই তার নেই, শুধু রয়েছে ব্রাহ্মণত্বের অহংকার। সে বুঝলো এখনো বিদ্যার কদর আছে, এ যুগ ইংরেজি বিদ্যার যুগ, উত্তমরূপে ইংরেজি আয়ত্ত করতে পারলে সাহেবদের কাছে সমাদর পাওয়া যায়। বিদ্যাচর্চাই ব্রাহ্মণের বৃত্তি, সুতরাং শুদ্দুর-কায়েতদের তুলনায় সে-ই বা পিছিয়ে থাকবে কেন ?

হরিশ নিজের উদ্যমে বিদ্যাচর্চার জন্য কোমর বেঁধে লাগলো। সারাদিন আপিসের পরিশ্রমের পর সে চলে যায় পাবলিক লাইব্রেরিতে। হাতের কাছে যে-বই পায়, সেই বই-ই পড়ে ফেলে। খানকয়েক এডিনবরা ক্রনিকল পড়ে থাকে সামনের তাকে, সেগুলিই রোজ এসে পড়ে পড়ে মুখস্ত করা শুরু করলে সে। কবিতা মুখস্ত করার বদলে সংবাদপত্র মুখস্ত করলে দ্রুত ভাষা শিক্ষা করা যায়। বাড়িতে গিয়ে শুয়ে শুয়ে হরিশ বিড় বিড় করে, সেইদিন অধীত সংবাদপত্রের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ আবৃত্তি করে।

ইংরেজি ভাষায় কিছুটা দক্ষতা অর্জনের পর হরিশ পড়তে শুরু করলে ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ। এই সদ্য যুবকের আর কোনো বাসনা নেই, আহার পরিচ্ছদ বিষয়ে হুঁশ নেই, একমাত্র নেশা বই পড়া।

দশ টাকা বেতনে আর কিছুতেই সংসারে ব্যয় সংকুলান হয় না। আবার সেই টাকা থেকেই কখনো কখনো হরিশ লোভ সংবরণ করতে না পেরে দু-একখানা পুস্তক ক্রয় করে ফেলে। নিলামওয়ালাকে একদিন হরিশ অনুরোধ জানালো কিছু বেতন বৃদ্ধি করার জন্যে। নিলামওয়ালা সে প্রস্তাবে তো কর্ণপাত করলোই না, উল্টে দু-একটা কটু কথা বলে ফেললো। সেদিনই এক কথায় কর্মত্যাগ করে বেরিয়ে এলো হরিশ।

আবার ডাকঘরের সামনে বসে দু-এক পয়সার বিনিময়ে দরখাস্ত ইত্যাদি লেখা। সেই সঙ্গে সঙ্গে পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে গ্রন্থপাঠ চলতে লাগলো সমান উদ্যমে। শিক্ষার ব্যাপারে তার কোনো গুরু নেই, সে নিজেই নিজের শিক্ষক। তার প্রধান সম্বল তার জেদ। এদিকে গৃহে ঘোর অশান্তি, অনিয়মিত উপার্জনে সংসার একেবারে পর্যুদস্ত। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জননীর শুচিবাতিক বাড়ছে এবং আরও বেশী মুখরা হচ্ছেন। ভ্রাতৃজায়াটিও তেমন শান্ত প্রকৃতির নয়, সেইজন্য শাশুড়ি-বধূর ঝগড়ায় বাড়িতে আর কাক-চিল বসতে পারে না।

ডাকঘরের সামনে আসন পেতে দোয়াত-কলম নিয়ে বসে থাকতে থাকতে সদ্য যুবক হরিশের মনে হয়, এই সমাজ তাকে পায়ের তলায় চেপে রাখার চেষ্টা করছে। হৃদয়বৃত্তি প্রসারের তো সুযোগ দেবেই না, বরং প্রতিদিনই অনাহারে থাকার আশঙ্কা। তবু সে দাঁতে দাঁত চেপে বলে, পারবে না, কিছুতেই পারবে না। সে এই সমাজকে একহাত দেখে নেবার জন্য প্রতিদিন তীব্র শপথ গ্রহণ করে মনে মনে।

এক একদিন দ্বিপ্রহরে কোনো খাদ্য জোটে না, তবু অপরাহ্নে পাবলিক লাইব্রেরিতে সে যাওয়া বন্ধ করে না। গ্রন্থপাঠের ক্ষুধা তার দিন দিন বর্ধিত হচ্ছে। প্রবল আত্মাভিমানের জন্য সে আর চাকুরির

উমেদারিতে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরবে না ঠিক করেছে। এই সময় একদিন সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়লো তার। মিলিটারি অডিটর জেনারেলের আপিসে একজন কর্মীর পদ খালি হয়েছে। সে পদে নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের মধ্য থেকে একজনকে বাছাই করা হবে। লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে। মাহিনাও ভদ্রগোছের, মাসে পঁচিশ টাকা। হরিশ সেই পরীক্ষায় বসলো এবং প্রথম স্থান অধিকার করলো।

চাকুরিতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর অনেকখানি স্থিতি এলো হরিশের জীবনে। এর পর সাধারণ মধ্যবিত্তদের জীবন যেভাবে চলে সেভাবেই হরিশের জীবন চালিত হবার কথা ছিল। কিন্তু হরিশ সে ধাতুতে গড়াই নয়। মায়ের অনুরোধে বিবাহ করতে হলো তাকে, কিন্তু সেই পত্নীর মৃত্যু হলো অবিলম্বে। অল্প দিনের মধ্যেই দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করলো। কিন্তু এ বিবাহও সুখের হলো না। পিতৃস্নেহ বঞ্চিত হরিশ বাল্যকাল থেকেই মাতৃভক্ত। কিন্তু তার মায়ের সঙ্গে বনিবনাও হলো না তার স্ত্রীর। তার মা পুত্রের বিবাহ দেবার জন্যও ব্যগ্র ছিলেন, আবার বিবাহিত পুত্রকেও বধূর কাছ থেকে সরিয়ে তিনি নিজে একলা আগলে রাখতে চান। বাঙালী পরিবারের সেই চিরকালীন শাশুড়ি-বধূর বিবাদ হরিশের বাড়িতে একেবারে সংহার মূর্তি ধারণ করলো। হরিশ মাকে কটু কথা বলতে পারে না আবার স্ত্রীকেও সান্ত্বনা দেবার কোনো উপায় নেই। আস্তে আস্তে সে সংসার সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যেতে লাগলো।

তখন কিছুদিন ধর্মের দিকে ঝুঁকলো হরিশ। ঈশ্বরের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। তার মতন এক সহায়সম্বলহীন বালকের প্রতি ঈশ্বর নজর রেখেছেন, তাই সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে। নতুন আপিসে যোগ দেবার এক বৎসরের মধ্যেই পদোন্নতি হয়েছে তার। বেতন হয়েছে দ্বিগুণ, ঈশ্বরের দয়া ছাড়া কি এমন সম্ভব! মাত্র উনিশ বৎসর বয়েসী ক'জন যুবক এত টাকা মাহিনার চাকুরি করে? প্রিন্স দ্বারকানাথের বিদ্রোহী পুত্র দেবেন্দ্রবাবু একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্ম প্রচার শুরু করলে হরিশ আকৃষ্ট হল সেদিকে। জননীর প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করেও সে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলো এবং তার বাসস্থান এলাকা ভবানীপুরে ব্রাহ্মসমাজের একটি শাখা স্থাপন করে প্রবল উৎসাহে প্রচার করতে লাগলো এই নতুন ধর্মের বাণী।

কিন্তু শুধু ধর্মের কাছে আশ্রয় নিয়েই তার মন শান্ত হলো না। তার আরও কিছু চাই। ইতিমধ্যে সে আর একদিকে পরীক্ষা চালাতে লাগলো। তার নিজের যত্নে শেখা ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান ঠিক কতখানি হয়েছে, সেটা তার জানা দরকার। তার যে স্কুল-কলেজের কোনো ডিগ্রি নেই, সে চিন্তা প্রায়ই তাকে পীড়া দেয়। সে কিছু কিছু ইংরেজি রচনা পাঠাতে লাগলো পত্র পত্রিকায় ছদ্মনামে। সেগুলি সবই ছাপা হলো অনায়াসে। কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' পত্রিকায় ছাপা হলো তার বেশ কয়েকটি রচনা। বাবু কাশীপ্রসাদ বিখ্যাত ইংরেজ নবীশ, তবু হাজার হোক তিনি একজন নেটিব। এবার হরিশ তার রচনা প্রেরণ করলো সাহেবদের বিখ্যাত পত্রিকা 'ইংলিশম্যান'-এ। সেই পত্রিকার সম্পাদক মিঃ কব্ হ্যারি সেই রচনা শুধু যে সাগ্রহে প্রকাশ করলেন তাই নয়, তিনি অনুসন্ধান করলেন এই অজ্ঞাতনামা লেখকটি কে, যার লেখনী এত ক্ষুরধার, যার ইংরেজি ভাষাজ্ঞান একেবারে সাচ্চা ইংরেজদের মতন। এবার হরিশের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলো। সমাজে আর কেউ তাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে না!

বিলাত থেকে প্রকাশিত ইংরেজি ভাষার পত্র-পত্রিকা এবং ইংরেজি গ্রন্থরাজি গোগ্রাসে গেলার ফলে একদিকে যেমন সে ব্রিটিশ জাতির ইতিহাস, তাদের সামাজিক রীতিনীতি ও রাজ্যশাসন প্রণালী সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে গেল, সেই রকম অন্যদিকেও তার এক নতুন জ্ঞানের উন্মেষ হলো। প্রায় বাল্যকাল থেকেই সে ইংরেজি সভ্যতার অনুরাগী। কিন্তু তাদের সম্পর্কে অনেকখানি জ্ঞান আহরণের পর সে এই সভ্যতার কিছু বৈপরীত্যেরও হদিশ পেল। ইংরেজরা স্বাধীনতা নামক বস্তুটিকে অতিশয় শ্রদ্ধা করে, স্বদেশে ইংরেজ তার সন্তানদের স্বাধীনচেতা এবং স্বাধীনতার প্রহরী হবার শিক্ষা দেয়, কিন্তু সেই ইংরেজই অন্য জাতির স্বাধীনতার কোনো তোয়াক্কা করে না। ইংরেজদের রচনা পড়েই হরিশের মনে আস্তে আস্তে স্বাধীনতার বোধ জাগতে লাগলো। সে চতুর্দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখে বুঝতে পারলো, তার দেশবাসীর মধ্যে এই বোধের এত অভাব! সেইজন্যই বুঝি ইংরেজ আজ ভারতবাসীকে মানুষ বলেই গণ্য করে না। ইংরেজ এ দেশ জয় করেছে বটে, কিন্তু এ দেশ শাসন করার ব্যাপারে কোনো ভারতীয়ের কোনো মতামত ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। এমনটি তো মুঘল আমলেও হয়নি! হরিশ ঠিক করলো, ইংরেজের কাছ থেকে দেশের জন্য যতখানি সুযোগ-সুবিধা আদায় করা যায় সেজন্য সে

কলম ধারণ করবে। কিছুদিন পরে সাংবাদিক হিসেবে বেশ খ্যাতি অর্জনের পর তার হাতে এসে গেল হিন্দু পেট্রিয়ট নামে একটি পত্রিকার পুরোপুরি সম্পাদনার ভার। এবার তার লেখনী থেকে আগুন ঝরতে লাগলো।

এখন হরিশ মুখুজ্যে দেশের কেউকেটাদের মধ্যে স্থান পেয়েছেন, এক ডাকে সকলে তাঁকে চেনে। স্বয়ং লর্ড ক্যানিং পেয়াদা পাঠিয়ে হিন্দু পেট্রিয়টের কপি অগ্রিম সংগ্রহ করে নিয়ে যান। সমাজের প্রধান ব্যক্তিরা হরিশকে স্কন্ধে তুলে নাচতে পারলে যেন বর্তে যান। সমাজের একেবারে নিম্নতলা থেকে হরিশকে এক পা এক পা করে এই শীর্ষস্থানে উঠতে হয়নি, তাঁর উত্তরণ লম্ফে লম্ফে। সেই একই অফিসে তিনি এখন চারশত টাকা বেতনে অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। হিন্দু পেট্রিয়ট চালাবার জন্য তিনি নিজে অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন, যেখানে শুধু জমিদার এবং অতি ধনাঢ্য এবং অতি খ্যাতিমান মানুষরাই সভ্য, সেখানে হরিশকেও সভ্য পদে বরণ করে নেওয়া হয়েছে এবং হরিশ সেখানে কিছু রাজনৈতিক কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেছেন আইন।

সিপাহী যুদ্ধ চলাকালীন হরিশের পত্রিকা একদিকে যেমন সিপাহীদের দুষ্কর্মের সমালোচনা করেছে, সেইরকমই প্রতিশোধ স্পৃহায় ইংরেজরা যখন উন্মত্ত হয়ে উঠলো, তখন তাদের সংযত হবার জন্য হরিশ যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করেছেন নিপুণভাবে। সেই সময় লেখনী চালনার জন্য তিনি আহার নিদ্রারও সময় পাননি।

সিপাহী যুদ্ধ নিবৃত্ত হবার পর হরিশের মধ্যে আর একটা পরিবর্তন এলো। ইংরেজের হাতে এই দেশ যে কতখানি অসহায়, তা যেন তিনি নতুনভাবে অনুভব করলেন। ইংরেজ দু-চারটি ভারতীয়ের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করতে পারে কিন্তু আবার যে-কোনো সময়ে সমগ্র ভারতীয় জাতিকে অবমাননা করতে কিংবা যে-কোনো প্রকার শাস্তি দিতে তাদের কোনো দ্বিধা নেই। সাধারণ মানুষের কোনো নিরাপত্তা নেই ইংরেজের হাতে।

সিপাহীদের বিদ্রোহ এক হিসেবে ব্যর্থ হলো না। সিপাহীরা যুদ্ধে হেরে গেল বটে, কিন্তু এই উপলক্ষে অনেক মানুষের মনে জেগে উঠলো দেশাত্মবোধ।

হরিশ ধনী সমাজের নয়নের মণি হয়ে উঠলেও তাদের সঙ্গ তাঁর বেশীদিন ভালো লাগলো না। তিনি যে অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান, এ কথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন না। তাঁর যখন অর্থ ছিল না, প্রতিপত্তি ছিল না, তখন কেউ তো তাঁর দিকে ফিরেও চায়নি। এখন ধনীরা তাঁদের গৃহে খানাপিনার জন্য হরিশকে ডাকেন। কিন্তু হরিশ তখনো তাঁদের কঠোর কথা শুনিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না। একমাত্র নবীনকুমার সিংহের সঙ্গেই তাঁর বেশ সৌহার্দ্য জন্মে গেল। বয়সের যথেষ্ট ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তাঁরা পরস্পরকে তুমি সম্বোধন করেন।

ধনীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে হরিশ মনোযোগ দিলেন দেশের সাধারণ মানুষের দিকে। সিপাহী বিদ্রোহ প্রশমিত হবার ঠিক পরেই হরিশ ঘুরে এলেন নদীয়ার যশোহরের কয়েকটি স্থান। পল্লীবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা তিনি দেখে এলেন স্বচক্ষে। নানাপ্রকার নিপীড়ন, নির্যাতন তো আছেই, ইদানীং কয়েক বৎসর ধরে নীলকরদের অত্যাচারে গ্রামের কৃষকদের মধ্যে একেবারে হাহাকার পড়ে গেছে। তাদের কথা কেউ জানে না। সেই সব অসহায় মানুষদের আর্তনাদ শহরে এসে পৌঁছয় না। হরিশ ঠিক করলেন, এবার থেকে এইসব মানুষদের কথা তিনি লিখবেন। কলম হাতে নিয়ে তিনি নীলকর সাহেবদের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

সারাদিন আপিসে পরিশ্রমের সঙ্গে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেন, তারপর সন্ধ্যাকালে এসে বসেন তাঁর পত্রিকার দফতরে। একাই তিনি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে ভরিয়ে দেন।

নবীনকুমার একদিন এলো হরিশের পত্রিকা কার্যালয়ে। বিক্রমোর্বশী অভিনয়ের সাফল্যের পর সে আবার নতুন কিছু করতে চায়। এ বিষয়ে সে পরামর্শ চায় হরিশের। কিন্তু সম্প্রতি হরিশ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় আসা বন্ধ করেছেন।

নবীনকুমারকে দেখে হরিশ বললেন, বসো। আগে লেখাগুলো শেষ করে নেই, তারপর তোমার সঙ্গে কতা কইব।

নবীনকুমার চুপ করে বসে দেখতে লাগলো। এবং তার বিস্ময় বর্ধিত হতে লাগলো উত্তরোত্তর।

একটি ছোট টেবিল ও একটি কেরাসিন কাষ্ঠের চেয়ারে হরিশ বসেন। ঐ রকমই আর তিনটি চেয়ার ও একটি আলমারি এই নিয়ে হরিশের বিখ্যাত হিন্দু পেট্রিয়টের দফতর। নিচের তলায়

ছাপাখানা। হরিশের টেবিলের ওপর একটি সেজ বাতি জ্বলছে। তার পাশে একটি গেলাস ও একটি বড় ব্র্যাণ্ডির বোতল। হরিশ গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে লিখে চলেছেন আর মধ্যে মধ্যে অন্যদিকে চোখ না ফিরিয়েই তিনি বোতল থেকে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে এক চুমুকে নিঃশেষ করছেন। নবীনকুমার এত দ্রুত হাতে লিখতে আর দেখেনি কখনো কারুকে। মুক্তার মতন হস্তাক্ষর, একটি কাটাকুটিও করছেন না হরিশ, ইংরেজি বাক্যগুলি যেন তাঁর মস্তিষ্ক থেকে অনর্গল বেরিয়ে আসছে।

এক সময় একটু লেখা থামিয়ে হরিশ বললেন, অঃ, একটা তো ভারি ভুল হয়ে গ্যাচে! তোমায় কোনো আপ্যায়ন করা হয়নি, ভাই নবীন। তা আর একটা গেলাস আনাই, তুমি ব্র্যাণ্ডি খাবে তো!

নবীনকুমার বললো, মাপ করো, আমি সুরাপান করি না।

হরিশ আর বাক্যব্যয় না করে নিজ গেলাসে আবার পানীয় নিয়ে গলায় ঢাললেন।

নবীনকুমার বললো, বন্ধু, তুমি যে এমন করে খাচ্চো...কিছুদিন আগেই পেটের ব্যামোয় কষ্ট পাচ্চিলে!

হরিশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বাঁ হাতটা নেড়ে বললেন, পিসীমাদের মতন লেকচার ঝেড়ো না! আমি কেন মদ খাই, তা আমি জানি! তুমি খেতে চাও না, খেয়ো না। আমায় মদ্যপান কে শিকিয়েচেন জানো? স্বয়ং রামগোপাল ঘোষ। তিনি কত বড় মানুষ তুমি জানো! ব্যস আর বেশী কতা কয়ো না!

আবার লেখা শুরু করলেন হরিশ। তাঁর লেখা শেষ হবার আগেই পুরো ব্র্যাণ্ডির বোতলটি শেষ হলো। শেষের দিকে হাত কাঁপতে লাগলো হরিশের। ছাপাখানার এক কর্মচারীকে ডেকে কপি সব বুঝিয়ে দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর জড়িত স্বরে নবীনকুমারকে জিজ্ঞেস করলেন, এবার তোমার কী বৃত্তান্ত বলো!

নবীনকুমার বললো, বন্ধু, তুমি আর আজকাল আমাদের বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে যাও না!

হরিশ বললেন, আর যাবোও না...তোমরা ধনীর দুলাল, তোমরা ঐ সভায় বক্তিমে মেরে কিংবা থিয়েটার করে দেশোদ্ধার করো, ওতে আর আমি নেই। আমি যদি দেশের গরিব দুঃখীর কিছুমাত্র উবগার কত্তে পারি, তাতেই আমার জীবন ধন্য হবে। আমি গরিবের ছেলে, এখন যদি অন্য গরিবদের ভুলে যাই, তা হলে আমি নিমকহারাম! চলো, আর এখেনে ভাল্লাগচে না! চলো—

নবীনকুমার বললো, বাড়ি যাবে তো? চলো।

হরিশ বললেন, বাড়ি? আমার আবার বাড়ি আচে নাকি? সে তো এক তপ্ত কটাহ, তার মধ্যে টগবগ করে তেল ফুটচে। তুমি সেখেনে আমায় পাটাতে চাও! কেন?

নবীনকুমার বললো, তা হলে এখন কোতায় যাবে, বন্ধু? তোমার শরীর ভালো নয়তো—

হরিশের মুখে এক অদ্ভুত হাস্য ফুটে উঠলো। ঢুলুঢুলু নেত্রে তিনি নবীনকুমারের মুখের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, আমি যাবো এখুন রামবাগানে, হরিমতি নামে একটা ভালো মেয়েমানুষ এয়েচে, টাটকা তাজা, চমৎকার নাচে! চলো, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে নাকি? চলো, চলো, এখুন তুমি সাবালগ হয়েচো, চলো—।

নবীনকুমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, ছিঃ। আমায় তুমি মাপ করো, বন্ধু!

হরিশ বললেন, কী? কি বললে আমায়? অ্যাঁ? জানো, প্রতিভাবান পুরুষরা যদি ঠিক আশ মিটিয়ে যোষিৎ সংসর্গ না কত্তে পারে, তা হলে তাদের বুদ্ধিতে মরচে পড়ে যায়? চলো না, একবার আমার সঙ্গে গিয়েই দেকো না—।

নবীনকুমার বললো, না!

সরোজিনীর ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে নবীনকুমারকে যেতে হয়েছে বর্ধমানে। কিছুকাল আগে সরোজিনীর পিতৃবিয়োগ হওয়ায় জ্যেষ্ঠ জামাতা হিসেবে নবীনকুমারই কন্যাকর্তা। পাত্রের বাড়ি ঠিক সদর বর্ধমানেও নয়, ঐ জেলার অন্তঃপাতী এক প্রাচীন গ্রামে। পাত্রের পিতা একজন ধনাঢ্য জমিদার, কলকাতায় তাঁদের একাধিক অট্টালিকা আছে, কিন্তু গ্রামের বসতবাড়ির কুলদেবতার সামনে বিবাহ যজ্ঞ সম্পন্ন করাই তাঁদের পারিবারিক প্রথা। কুলদেবতাকে কলকাতায় আনয়ন করা সম্ভব নয়, সেইজন্য কন্যাপক্ষকে সদলবলে যেতে হয়েছে সেই সুদূর গ্রামে। অবশ্য বন্দোবস্তের কোনো ত্রুটি নেই, মোট একচল্লিশটি পাল্কি সারবদ্ধভাবে রওনা হয়েছে কলকাতা থেকে। নবীনকুমার এখন বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্য ছাড়া থাকতে পারে না, তাই কয়েকজন বন্ধুকেও সে সঙ্গে নিয়েছে। যদুপতি আর উমানাথ তো আছেই, তা ছাড়া হরিশ মুখুজ্যেকেও সে জোর করে নিয়ে গেছে।

সরোজিনী বেশ কিছুদিন ধরেই পিত্রালয়ে। তাদের বাড়িতে এক একটি বিবাহের উদযোগপর্ব শুরু হয় অন্তত এক মাস আগে এবং পরে তার জের চলে আরও এক মাস। নবীনকুমার এবং সরোজিনীর সঙ্গে তাদের নিজস্ব দাসদাসীরাও চলে গেছে, তাই জোড়াসাঁকোয় সিংহ বাড়ির অন্দরমহলের দ্বিতল প্রায় শূন্য।

মধ্যরাত্রে বিম্ববতীর হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, তাঁর মনে হয়, তিনি যেন নির্জন নিশুতি কোনো প্রান্তরে শুয়ে আছেন। সে সময়ে তিনি তাঁর বুকের কাছে অনেকখানি শূন্যতা অনুভব করেন। এক সময় তাঁর বুকের পাশটিতে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকতো তাঁর খোকা, তখন মনে হতো এই বিশ্বসংসারে তাঁর আর কিছুই চাইবার নেই। কিন্তু সে তো অনেকদিন আগেকার কথা। আট নয় বৎসর বয়েস থেকেই নবীনকুমার বড় বেশী স্বাতন্ত্র্যবাদী, তখন থেকেই সে আর তার মায়ের পাশে শোয় না, তার শয্যা স্থাপিত হয়েছিল পৃথক কক্ষে। এখন নবীনকুমার তার পিতা রামকমল সিংহের বিরাট কক্ষটিতে অধিষ্ঠিত হয়েছে। বিম্ববতী তাঁর স্বামীকে যেমন কখনো সেরকম আপন করে পাননি, তাঁর সন্তানও তেমনই যেন দূরে সরে যাচ্ছে।

নবীনকুমার বাড়িতে নেই বলেই যেন এই চিন্তা কয়েকদিন ধরে বিম্ববতীকে বেশী পীড়া দিতে শুরু করেছে। অন্য সময় ছেলে একই বাড়িতে কাছাকাছি কোথাও আছে, এই অনুভব অনেকখানি শান্তি দেয়। সন্তান কামনায় এক সময় বিম্ববতী প্রায় উন্মাদিনী হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু সেই সন্তান পেয়েও তাকে নিয়ে তাঁর নিজের জীবন তো পূর্ণ হয়ে উঠলো না।

অথচ সন্তান সম্পর্কে অভিযোগ করারও কিছু নেই। এমন হীরের টুকরো ছেলে ক'জনে পায় ? এই বয়েসে ছেলেদের গৃহের বন্ধনে আটকে রাখা যে কতখানি দুষ্কর তা বিম্ববতী ভালোই জানেন। কর্তাদের ধরনই এই, সাবালক হবার আগে থেকেই পাখা গজায়, তখন আর তারা কিছুতেই বাড়িতে রাত কাটাতে চায় না। কিন্তু নবীনকুমার সে ধরনেরই হয়নি। ইয়ার মোসাহেবদের নিয়ে সে ফূর্তি করে না, একটি দিনও সে বাড়ির বাইরে থাকে না। সে বিদ্বান-সজ্জনদের সঙ্গে মেলামেশা করে, জ্ঞানের চর্চায় সময় কাটায়। সে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনে সাহায্য করার জন্য মেতে উঠেছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ব্রেহ্মজ্ঞানী হয়ে পিতৃপিতামহদের ধর্মে কালি দেয়নি। শুধু তার জেদ বা গোঁ বড় বেশী, এই যা। এই বয়েসেই তাঁর ছেলের যে কতখানি সুনাম রটেছে, সে কথা বিম্ববতীরও কানে এসেছে। শুধু দিনে একবার দুবার ছেলে যদি তাঁর কাছে এসে পাশটিতে বসে মা বলে ডাকতো, দুটো মনের কথা কইতো ! গত কয়েক বৎসর ধরে নবীনকুমার মায়ের কাছে এসেছে শুধু টাকা পয়সা চাইবার জন্য। সম্প্রতি সাবালক হয়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার পর থেকে সে আর একবারও আসে না।

জা হেমাঙ্গিনী ছিলেন বিম্ববতীর অনেকখানি সঙ্গিনী, গত বৎসর তিনিও ধরাধাম পরিত্যাগ করেছেন। এখন আর বিম্ববতীর সময়ই কাটে না। প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান আর ঠাকুরঘরে ধ্যান করে

আর কত সময় কাটানো যায় ! যদি একটি নাতিও থাকতো ! কতদিন এ গৃহে কোনো শিশুর কলহাস্য শোনা যায়নি। নাতির চিন্তা করলেই বিম্ববতীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে, চক্ষে জল আসে মনে পড়ে আর একজনের কথা। নবীনকুমারের এখনো কিছুই বয়েস নয়, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ বেঁচে থাকলে এতদিনে নিশ্চয়ই তিনি নাতি-নাতনীর মুখ দেখতেন। তাদের বুকে জড়িয়ে তিনি আবার জীবন ধারণের সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারতেন।

দুজন ভৃত্য ঝাড়পোঁছ করার জন্য নবীনকুমারের কক্ষের তালা খুলেছে, সে সময় বিম্ববতী এসে দাঁড়ালেন সেখানে। ভৃত্যদের কাজ শেষ হয়ে গেলে তিনি বললেন, তোরা যা, আমি বন্দো করে দেবো'খন।

বিম্ববতী ঢুকলেন সেই কক্ষে। কয়েক যুগ আগে নববধূর সাজে এই কক্ষে প্রথম প্রবেশ করেছিলেন বিম্ববতী, এখানেই তাঁর ফুলশয্যা হয়েছিল তখন বিম্ববতী নিতান্তই অবোধ বালিকা, পিতামাতার আশ্রয় ছেড়ে সেই প্রথম দিন এক অচেনা বাড়িতে রাত্রি যাপন। ভয় পেয়ে বিম্ববতী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন আর তাঁর স্বামী পরম স্নেহে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন, সেই স্মৃতি এখনো বিম্ববতীর মনে স্পষ্টভাবে জাগরূক।

রামকমল সিংহ পত্নীর জন্য পৃথক কক্ষ নির্দিষ্ট করেছিলেন দাম্পত্যজীবনের শুরু থেকেই। সেই সময়েই তিনি বিম্ববতীর চেয়ে বয়েসে অনেক বড় এবং অভিজ্ঞও ছিলেন, বিবাহের অভিজ্ঞতা তাঁর আগেই হয়ে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম মাসে কয়েকদিন, শেষের দিকে বৎসরে দু-একদিন রাত্রিকালে বিম্ববতীকে তিনি আহ্বান জানাতেন তাঁর শয্যার অংশভাগিনী হবার জন্য। তাও সারা রাত্রির জন্য নয়। রামকমল সিংহের নাসিকাগর্জন ছিল সুবিখ্যাত, সেই গর্জনে এক এক সময় তাঁর নিজেরই ঘুম ভেঙে যেত, তিনি কে রে? কে রে? বলে চিৎকার করে উঠতেন। অধিকাংশ নাসিকা গর্জনকারীরাই নিজেদের এই গুণপনাটি বিষয়ে অবহিত নন। কিন্তু রামকমল সিংহ জানতেন বলেই তিনি পছন্দ করতেন একাকী শয়ন। অবশ্য, যে-কটি দিন তিনি স্বগৃহে রাত্রি যাপন করার সময় পেতেন। নবীনকুমার অবশ্য পিতার স্বভাব পায়নি, সে পত্নীর সঙ্গে এক পালঙ্কেই ঘুমোয়।

শিয়রের কাছে দেয়ালের অভ্যন্তরে একটি বড় লোহার সিন্দুক। এর চাবি থাকতো কর্তার কাছে, মধ্যে এতগুলি বছর ছিল বিধুশেখরের জিম্মায়, এখন নবীনকুমারের কাছে। বিম্ববতী ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন, নবীনকুমার কক্ষটির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে : রামকমলের আমলে ছিল দরজার ঠিক ওপরেই এক বিলাতী শিল্পীর আঁকা জলকেলিরত তিন নগ্ন রমণীর চিত্র। রামকমল বিম্ববতীকে বুঝিয়েছিলেন যে ঐ রমণী তিনটি অপ্সরা, সেইজন্য তাদের পোশাক পরিধান করতে নেই। নবীনকুমার সে ছবি সরিয়ে ফেলেছে, সেখানে কালিঘাটের পটুয়াদের আঁকা কয়েকটি পট সারিবদ্ধ ভাবে সাজানো। পালঙ্কের দক্ষিণ পাশেই ছিল কর্তার আলবোলা, তার রূপা বাঁধানো নলটি খুবই সুদৃশ্য। নবীনকুমার ধূমপানের অভ্যেস করেনি। সে আলবোলাটি আর স্বস্থানে নেই, সেইজন্যই ঘরে ঢুকে কেমন যেন ফাঁকা লাগছিল বিম্ববতীর। আলবোলাটির স্থানে এখন একটি মেহগনি কাঠের এবং কাচের ছোট্ট আলমারি, তার মধ্যে কয়েকটি বই রাখা। রামকমল সিংহ বইপত্রের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখতেন না। নবীনকুমারের আরও একটি শখ আছে, যা তার পিতার ছিল না। দুটি বড় ফুলদানিতে তার কক্ষে প্রতিদিন টাটকা ফুল সাজানো থাকে। বিম্ববতী আগেও শুনেছেন যে নবীনকুমার প্রতিদিন সকালে উদ্যানের মালিকে ডেকে ফুল বাছাই করে। পূজা অর্চনার জন্য ছাড়া কেউ প্রতিদিন নিজের শয়ন কক্ষ ফুল দিয়ে সাজায়, তা বিম্ববতী আগে কখনো জানতেনই না। তাঁর পুত্র কোথা থেকে এসব শিখলো ?

ফুলদানি দুটি নতুন, খাগড়াই কাঁসার। আগে ছিল দুটি পোর্সিলিনের। সেই যে এক রাত্রে নবীনকুমার অত্যন্ত রাগারাগি করে অনেক জিনিসপত্র ভাঙচুর করেছিল, সেদিন ঐ ফুলদানি দুটিও গেছে। বিম্ববতী কাছে এগিয়ে এসে দেখলেন, ফুলদানিতে কয়েকদিনের বাসী ফুলের স্তবক শুকিয়ে আছে। ঘরের মালিক নেই, তাই কেউ ফুল বদল করেনি। বাসী ফুলগুলি তুলে নিয়ে কেন জানি বিম্ববতীর অকস্মাৎ কান্না পেয়ে গেল। অশ্রু মোচন করতে করতে তিনি নিজেই বিস্মিত হতে লাগলেন। কেন কাঁদছেন, তা তিনি জানেন না।

দ্বারের কাছে একটি শব্দ শুনে চমকিত হয়ে ফিরে তাকালেন বিম্ববতী। তিনি দেখলেন, কখন

বিধুশেখর এসে দাঁড়িয়েছেন সেখানে। আঁচল দিয়ে চোখ মুখ মুছে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কখুন এয়েচেন ?

উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন বিধুশেখর। তাঁর ওষ্ঠে মৃদু হাস্য। পার্বতীর মতন ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে রইলেন বিম্ববতী। বিধুশেখরকে এই কক্ষে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করতে বলবেন, না তিনি নিজেই এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন, তা বুঝতে পারলেন না।

লাঠি ঠকঠকিয়ে বিধুশেখর এগিয়ে এলেন কয়েক পা। জরিপ করার ভঙ্গিতে চতুর্দিকে মাথা ঘুরিয়ে কক্ষটি দেখলেন কয়েকবার। তারপর অস্ফুট স্বরে বললেন, এগারো বচর, প্রায় এক যুগ আগে এ ঘরে আমি শেষ এয়েচিলুম। সেবার রামকমলের সান্নিপাতিক হলো, তোমার মনে আচে, বিম্ব ?

বিম্ববতী নিঃশব্দে ঘাড় হেলালেন।

বিধুশেখর আবার বললেন, ছোট্‌কু বর্দ্ধোমানে গ্যাচে শুনিচি, কবে ফিরবে ? আজকাল লোকমুখে আমায় এসব খপর পেতে হয়।

বিম্ববতীও জানেন না যে নবীনকুমার ঠিক কবে প্রত্যাগমন করবে। তাই তিনি নিরুত্তর রইলেন।

বিধুশেখরের কণ্ঠে সামান্য অভিযোগের সুর এসেছিল, এবার সেটি মুছে ফেলে তিনি আবার হাসলেন। তারপর বললেন, বিম্ব, তোমার সঙ্গে এ ঘরে আমার কখনো দেকা হয়নি কো।

সে কথা ঠিক। মধ্যে মধ্যে রামকমল সিংহের সুদীর্ঘ প্রবাস কালে বিধুশেখর আসতেন বিম্ববতীর খোঁজ খবর নিতে। তখন বিম্ববতীর নিজস্ব কক্ষেই দেখা হতো।

সম্পূর্ণ অকারণেই প্রায়, বিম্ববতী গলায় আঁচল জড়িয়ে বিধুশেখরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন। বিধুশেখর বিস্মিত হলেন না। তিনি ডান হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন, চির-আয়ুষ্মতী হও, সৌভাগ্যশালিনী হও ! তুমি একা একা এ ঘরে ডাঁড়িয়ে কাঁদছেলে কেন, বিম্ব ?

বিম্ববতী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কী জানি।

বিধুশেখর এগিয়ে গিয়ে পালঙ্কের ওপর বসে পড়ে বললেন, তুমি আমায় কখনো কাঁদতে দেকেচো ? আমি পুরুষকারে বিশ্বাসী, কান্নায় বিশ্বাসী নই। কিন্তু এদানি আমার কী হয়েছে কে জানে, আমারও চোকে জল আসে, যকন তকন। আমি ভাবি, এ আবার কী জ্বালা ? বোধ হয় বুড়ো বয়সে আমার ভীমরতি ধরলো !

বিম্ববতী জিজ্ঞেস করলেন, আপনার শরীর ভালো আচে ?

বিধুশেখর বললেন, হ্যাঁ, ভালো, বেশ ভালো, হটাৎ যেন বেশী ভালো হয়ে গ্যাচে ! পিদিমের সল্‌তে নেববার আগে একবার বেশী করে জ্বলে ওঠে না ? এ বোধ হয় সেই দশা ! তুমি ভালো আচো বিম্ব ?

—হ্যাঁ।

—আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী। যতদিন বাঁচবো, তোমায় দেকে যাবো। তুমি তো জানো বিম্ব, আমি ইচ্ছে করলে এ বাড়ির মালিক হতে পাত্তুম ! এইসব বিষয় সম্পত্তি আমার হতে পাত্তো ! এই ঘরে, এই ছাপরখাটে আমার জন্য বিছ্না পাতা হতো—

মধ্যপথে কথা থামিয়ে বিধুশেখর হাসতে লাগলেন। রীতিমতন খুশীর, উপভোগের উপহাস্য।

বিম্ববতী আকুল নয়নে চেয়ে রইলেন বিধুশেখরের মুখের দিকে।

এক সময় হাসি থামিয়ে বিধুশেখর বললেন, দ্যাকো, এই আমার এক নতুন উপসর্গ। আগে কখনো আমায় অকারণে হাসতে দেকোচো ? কান্নার মতন হাসিও আমার এক নতুন ব্যাধি।

বিম্ববতীর মনে হলো, এই বিধুশেখর তাঁর অচেনা। ইনি একজন নতুন মানুষ। ডাকসাঁইটে পুরুষ বিধুশেখর মুখুজ্যের পক্ষে হঠাৎ হাসি বা কান্না অন্যদের কাছে অকল্পনীয়।

—এবার মনে পড়েচে, বিম্ব, কেন হাসলুম। পরে বলচি। তোমার সঙ্গে কটা কথা আচে, সেইজন্যই এয়েচি। ছোট্‌কু যে বড় ভাবিয়ে তুললে ! এ ছেলেকে সামাল না দিলে যে সব যাবে !

বিম্ববতী আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, কী করেচে ছোট্‌কু ?

—কলুটোলায় তোমাদের যে সাত বিঘে জমি ছেল, তা বেচে দিয়েচে ! এমন গোখুরির কাজ কেউ করে ? নগরের একেবারে মদ্যিখানে, ও তো জমি নয়, সোনা, দিন দিন দাম বাড়চে ! মেডিকেল হাসপাতালের একেবারে গায়ে। আমায় ঘুণাক্ষরে কিচু জানায়নি। কেন এমন কাণ্ড করলো, জানো ?

—কেন ?

—আমার ওপর টক্কর দেবার সাধ। সবাইকে দেকালে যে আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেও সে তার

বিষয় সম্পত্তি নিয়ে যা খুশী করতে পারে। এই যদি যা খুশীর নমুনা হয়, তা হলে দু'দিনেই তো সব ফুঁকে দেবে!

—ছোট্কু আমাকেও কিচু বলেনি।

—বিম্ব, গঙ্গাকে আমি সহ্য করতে পাত্তুম না, তুমি সেজন্য মনে ব্যথা পেতে, আমি জানি। কিন্তু গঙ্গা বড় অসমীচীন কাজ করেছেল, আমার বিধবা মেয়ে বিন্দু, সে তার ভগ্নীর মতন, তার প্রতি সে কু-নজর দিয়েছেল। ছিঃ! সেজন্য আমি তাকে ক্ষমা করতে পারিনি। কিন্তু ছোট্কু, সে তো আমার বুকের ধন, তার কোনো আবদারে আমি বাধা দিই না, সে আনন্দ ফূর্তি করতে চাইলেও···

—ছোট্কুর কোনো বদ অভ্যেস নেই।

কিন্তু আমার সঙ্গে সে কেন আকচা-আকচি করতে চায়? আমি তার দিকে দু হাত বাড়িয়ে দিলেও সে দূরে সরে যায়। আমি কি তার প্রতিপক্ষ হতে পারি? তাকে আমি দু' চক্ষের মণি করে রাকতে চাই, আর সে আমার চোকে ধুলো দিতে চায় কেন? আমার বড় কষ্ট হয়—

—ছোট্কু এখনো ছেলেমানুষ!

—কিন্তু তার ধরন ধারণ যে পাকা! সে তবিলের চাবি চাইলে, আমি এক কতায় দিয়ে দিলুম। সে টাকা চাইলে, যত লাখ টাকা চাক, আমি এক কতায় দিতে পারি। তবু তাকে জমি বেচতে হবে, আমায় নুকিয়ে? আমার এ দুঃখু আমি তোমায় ছাড়া আর কাকে জানাবো?

বিধুশেখর তাঁর একটু আগেকার উক্তির সত্য প্রমাণিত করার জন্য নিরত হলেন এবং তাঁর চক্ষু থেকে জল ঝরতে লাগলো।

বাঁ হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চক্ষু মুছে তিনি বললেন, কেন হাসচিলুম জানো? এই দ্যাকো—

বিধুশেখর দলিলের মতন একটি লম্বা তুলোট কাগজ বাড়িয়ে দিলেন বিম্ববতীর দিকে। সে কাগজ দেখে আর বিম্ববতী কি বুঝবেন, তিনি উৎসুকভাবে বিধুশেখরের কাছ থেকে আরও কিছু শোনার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

—কলুটোলার সেই জমি আমিই কিনে নিইচি। বলচিলুম না। তোমাদের এই সব বিষয়-সম্পত্তি আমিই কিনে নিতে পাত্তুম! এবার বুঝি তাই-ই হলো, ছোট্কু যা বেচবে, তা আমাকেই কিনে নিতে হবে! হে-হে-হে-হে! হাসির ব্যাপার নয়!

—আপনি না দেকলে ও যে একেবারেই ভেসে যাবে!

—দেকবো! ওকে দেকার জন্যই আমায় আরও বেঁচে থাকতে হবে! কিন্তু আমি আর আগের মতন নির্লোভি নই। তোমার ছেলের ভালোমন্দ আমি দেকবো, কিন্তু তার বিনিময়ে তোমার কাচ থেকে প্রতিদান চাই। প্রদীপের সলতে নেববার আগে দপ্ করে জ্বলে উঠেচে, আমার কামনা বাসনা বেড়ে গ্যাচে, পাপ-পুণ্যের চিন্তে ঘুচে গ্যাচে! লোভী, আমি আবার বিম্ব লোভী হয়িচি, আমি আবার তোমাকে চাই।

বিম্ববতীর মুখখানি রক্তশূন্য, বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি আর্তের মতন একবার দ্বারের দিকে চাইলেন।

বিধুশেখর ওষ্ঠে হাসি অঙ্কিত রেখে বললেন, বার্ধক্যে মানুষ দ্বিতীয়বার শিশু হয়, আমারও সেই দশা। উদ্ভট সব শক হয় আজকাল। যেমন, আমার ইচ্ছে হয়েচে, আমার বন্ধু রামকমলের এই পালঙ্কে আমি শয়ন করবো, আর তুমি এসে আমার সেবা করবে!

—না!

—বিম্ব—

—দয়া করুন, আমায় ক্ষমা করুন, আপনি কতা দিয়েচিলেন—

—সে সব কতা ভেসে গ্যাচে! এ যুগে কেউ কতা রাকে না। এ এক হতচ্ছাড়াদের যুগ এয়েচে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও হতচ্ছাড়া হবো। এসো বিম্ব, আমার বুকে এসো—

—না, আমায় ক্ষমা করুন। সে বিম্ব নেই, সে মরে গ্যাচে—

বিধুশেখর এবার মুখের রেখা কঠোর করলেন, তারপর নিজের পাশটা চাপড়ে গম্ভীরভাবে বললেন, এসো, এখেনে এসে বসো। তার আগে দোরটা দিয়ে এসো, যাও—

নবীনকুমার সিংহের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় বিক্রমোর্বশী নাটকের অভিনয়ের প্রবল সুখ্যাতির ফলে কলকাতার ধনী সমাজে বেশ একটা আলোড়ন পড়ে গেল। বাংলায় নাটকের অভিনয় ব্যাপারটি তো বেশ অভিনব। এর আগেও দু-চারটি জায়গায় হয়েছে বটে কিন্তু বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্যরা যেন একেবারে মাৎ করে দিয়েছে। সাহেব-মেমরা পর্যন্ত এসে দেখেছে এবং ইংরেজি সংবাদপত্রগুলিও প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সাহেবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার এই তো বেশ একটি প্রকৃষ্ট উপায়! শহরের বিভিন্ন স্থানে বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করার ধুম পড়ে গেল।

পাইকপাড়ায় রাজ ভ্রাতৃদ্বয় প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ সঙ্গীত-নৃত্যাদি সম্পর্কে খুব উৎসাহী। তাঁরা নব্য ধরনের বিলাসী পুরুষ। নবাবী আমলের রেশ ধরে এক দল ধনী এখনো বিকৃত আনন্দে মত্ত; সুরা, বারবনিতা ও কদর্য রস ছাড়া তাদের তৃপ্তি হয় না। নব্য ধরনের বিলাসী পুরুষরা পছন্দ করেন না ওসব কিন্তু রুচিশীল আমোদ প্রমোদে অজস্র অর্থ ব্যয় করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত নন। দেশীয় সংস্কৃতির উদ্ধার, সমাজ ও ধর্ম সংস্কার, বিদ্যালয় স্থাপন ও নারীশিক্ষার প্রসার—এইগুলিই নতুন আমোদ প্রমোদ, তার সঙ্গে যুক্ত হলো বাংলা নাটকের অভিনয়। স্বদেশ ও মাতৃভাষার উন্নতি ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে এঁরা পরস্পরের মধ্যে ইংরেজিতে চিঠি চালাচালি করেন এবং এই সব বিষয়ে সাহেবদের কাছ থেকে বাহবা না পেলে বড় অধীর হয়ে পড়েন।

রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সুবিখ্যাত বেলগাছিয়া ভিলা ক্রয় করেছেন এবং সেখানে 'আওয়ার ওউন ক্লাব' নামে একটি সঙ্গীত ও যন্ত্রবাদনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা সেখানে সপ্তাহে কয়েকটি সন্ধ্যা আসেন সঙ্গীত সুধালহরী আস্বাদনের জন্য। এবার তাঁরা ঠিক করলেন একটি মৌলিক বাংলা নাটকের মঞ্চাভিনয় করবেন নিজেরাই। অকালপক্ব যুবক নবীনকুমার সিংহ নিজেই সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছে বিক্রমোর্বশী, কিন্তু বেলগাছিয়া ভিলার ক্লাব-সভ্যদের কারুরই বাংলাজ্ঞান এমত নয় যে একটি বাংলা নাটক খাড়া করতে পারবেন, তাই তাঁরা গ্রহণ করলেন সম্প্রতি প্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী। প্রবল উৎসাহে শুরু হলো মহড়া।

গৌরদাস বসাক এই আওয়ার ওউন ক্লাবের একজন সদস্য এবং তিনি অতিশয় সুপুরুষ ও সুকণ্ঠের অধিকারী বলে তাঁকেও দেওয়া হলো একটি ভূমিকা। গৌরদাসও বেশ উৎসাহ পেয়ে গেলেন। মহড়া দেখতে অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি আসেন, অনেক উচ্চমার্গের কথাবার্তা হয়, রামগোপাল ঘোষের মতন প্রবীণ পুরুষেরা নানাবিধ পরামর্শ দেন, সময়টা বড় সুন্দর কাটে।

বেশ কয়েকদিন মহড়া দেবার পর একটি প্রশ্ন উঠলো। নাটক মঞ্চস্থ করার দিন ভূরি ভূরি রাজপুরুষদের নিমন্ত্রণ করা হবে সাব্যস্ত হয়েছে আগে থেকেই। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে সাহেবরা এমন অগ্নিশর্মা হয়ে রয়েছেন, তাঁরা নিমন্ত্রণ পেলেও আসবেন তো? বাংলা নাটকের তো কিছুই বুঝবেন না তাঁরা। নবীন সিংগীর বিক্রমোর্বশীতে তো সাহেবরা সাজপোশাক আর মঞ্চের চাকচিক্যই শুধু দেখেছে, নাটকের কথাবস্তু কিছুই তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। তাও সেখানে এসেছিলেন গুটি কয়েকমাত্র সাহেব।

রামগোপাল ঘোষ বললেন, একটি কাজ করলে হয়। এ নাটকের যদি একটি ইংরেজি অনুবাদ করিয়ে এবং ছাপিয়ে আগে থেকেই সাহেবদের মধ্যে বিতরণ করা যায়, তা হলে সাহেব দর্শকরা নাটকের কাহিনীটিও সম্যক অবগত থাকবেন, অভিনয় অনুসরণ করতে অসুবিধে হবে না।

অতি উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু কে করবে সেই অনুবাদ? রামগোপাল ঘোষ স্বয়ং করলেই কি সবচেয়ে ভালো হয় না?

রামগোপাল হেসে বললেন, আমি বড় জোর উগ্র ভাষায় কোনো প্যামফ্লেট রচনা কত্তে পারি, নাটক

কাব্যে হাত দেওয়ার স্পর্ধা করি না। ও রসে আমি বঞ্চিত।

তখন গৌরদাস বললেন, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে এ ব্যাপারে কতা কয়ে দেকতে পারি। সে রাজি হলে এ কাজ সে ভালোই পারবে।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বন্ধুটির নাম কী?

গৌরদাস বললেন, তার নাম মধুসূদন দত্ত। ইংরেজি সে অতি দক্ষতার সঙ্গে লেখে, ইংরেজিতে সে অনেক পোয়েট্রি রচনা করেচে।

রাজা প্রতাপচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, কে মধুসূদন দত্ত? কোন্ বাড়ির ছেলে?

এককালে রাজনারায়ণ দত্ত খুব ফেমাস লা ইয়ার ছেলেন, তাঁর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। তাঁর ছেলে এই মধু, অনেকদিন মাড্রাসে ছেল—

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, হ্যাঁ, ছাত্র বয়েসে আমি এঁর নাম শুনিচি বটে। খুব ডাকসাইটে ছাত্র ছেলেন, কেরেস্তান হয়েছেলেন না? মাইকেল না কী যেন নতুন নাম হলো—

গৌরদাস বললেন, হ্যাঁ, তিনিই।

রামগোপাল বললেন, আমিও এর কতা শুনিচি। প্যারীর ভাই কিশোরীর বাগানবাটিতে কিচুদিন স্টে করেছেলেন: তা তিনি তো বাংলা জানেন না, পাক্কা সাহেব, তিনি বাংলা নাটক কী ভাবে ট্রানশ্লেট করবেন?

গৌরদাস বললেন, তিনি বাংলায় একেবারে অজ্ঞ নন। ইচ্ছে করে লোকসম্মুখে বাংলায় কনভার্স করেন না। ইদানি তিনি সংস্কৃত চর্চা কচ্চেন, তাই বাংলা নাটক বুঝতে তাঁর খুব একটা ডিফিকালটি হবে না বোধ করি।

প্রতাপচন্দ্র বললেন, বসাকভায়া যখন বোধ কচ্চেন যে এই ব্যক্তিই এ কাজ ভালো পারবেন, তা হলে সেমতই চেষ্টা করা যাক। বসাকভায়ার ওপরই ভার রইলো, একদিন সেই বন্ধুটিকে এই মহড়ায় নিয়ে আসুন বরং।

মধুর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি গৌরদাসের, এই উপলক্ষে একদিন গেলেন মধুর চিৎপুরের বাড়িতে। যে ব্যক্তি প্রথম যৌবনেই নিজেকে মহাকবি বলে ঘোষণা করেছিল, বন্ধুদের বলেছিল একদিন তারা তার জীবনী রচনা করবে, সেই মধুসূদন এখন পুলিশ আদালতের একজন সামান্য দোভাষী মাত্র। কবিতা রচনা একেবারেই পরিত্যাগ করেছে। ফিরিঙ্গি পত্নী এবং নিত্যসঙ্গী অর্থাভাব নিয়ে একেবারে জেরবার অবস্থা। পত্নী সদ্য গর্ভবতী হয়েছেন, এ গৃহে দাস-দাসী টেঁকে না, সংসারে পূর্ণ বিশৃঙ্খলা। অসামাজিক, নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন মধুসূদন, গৌরদাস ছাড়া অন্য কোনো বন্ধুবান্ধব তাঁর কাছে আসে না। তিনিও যান না কারো কাছে! চাকুরিটি কোনোক্রমে রক্ষা করে তিনি দিনের অন্য সময় সুরাপান ও গ্রন্থপাঠে ডুবে থাকেন: বাকি জীবনটা এই ভাবেই কেটে যাবে!

গৌরদাসকে দেখে মধুসূদন বললেন, তুমিও ব্রুটাস? তুমিও আমায় ভুলে গেলে! একবার খোঁজও নিস না, হোয়েদার আই অ্যাম ডেড অর অ্যালাইভ!

গৌরদাস আসন গ্রহণ করে বললেন, বাঃ, বেশ কতা! তুই-ও তো একবারটি আমার খোঁজ নিতে পারিস!

মধুসূদন বললেন, আমি খোঁজ কর্বো! হু উইল পে মাই গাড়ি ভাড়া? আমি গরিব কেরানী, আমি তো তোর মতন সাকসেসফুল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নই।

গৌরদাস উচ্চহাস্য করলেন। ছাত্র বয়েসে মধু কতবার গৌরদাসকে গাড়ি ভাড়া দিয়েছেন, এখন তাঁর মুখে এই প্রকার দারিদ্র্যের কথা শুনলে বিসদৃশ লাগে।

মধুসূদন আবার বললেন, তা ছাড়া, ডিয়ার গৌর, আমি কেরেস্তান, হুটহাট করে যখন তখন তো তোমার বাড়িতে যেতে পারি না!

গৌরদাস বললেন, এও যে নতুন কতা শুনচি। তুই আমার বাড়িতে আগে যাসনি? সেখেনে থাকিসনি? আমার মায়ের হাতের রান্না খাসনি? তুই ক্রিশ্চান বলে আমাদের বাড়িতে কোনো অসুবিধে হয়েচে?

মধুসূদন হঠাৎ ব্যাকুলভাবে বললেন, ওঃ, তোর মায়ের রান্না ! সেই রুটি আর ফুলকপির ঘন্ট ! সে যে অমৃত ! কতদিন খাইনি ! গরু-শুয়োর খেতে খেতে জিব আউলে গেল, একদিন তোর মায়ের হাতের নিরিমিষ্যি রান্না খাওয়াবি, গৌর ?

—চল না, আজই চল !

—অ্যাট ওয়ান্স ! চল, আই অ্যাম রেডি, তোর জননীকে সাক্ষাৎ করে আসি।

—চল, ম্যাডামকেও সঙ্গে নে। তিনি কোতায় ?

—না, না, আঁরিয়েৎ যাবে না। ও রুটি ঘন্টের মর্ম বুজবে না। তা ছাড়া শী ইজ আনওয়েল, ও ফ্যামিলি ওয়েতে আচে।

—তা হলে তুই একলাই চল।

কেদারা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কোটটি পরিধান করতে গিয়েও আবার খুলে ফেললেন মধুসূদন। নিরাশভাবে বললেন, নাঃ, হবে না ! আমার ঘন ঘন তেষ্টা পায়। তোর বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারবো না !

—তেষ্টা পায় মানে ?

—তোর বাড়িতে গিয়ে মা জননীর সামনে কি তুই আমায় বীয়র সার্ভ করতে পার্বি ? আমি তোদের এই ক্যালকাটার ফিলদি ওয়াটার পান করি না। আই ডোনট টেক ওয়াটার অ্যাট অল। আমি জলের বদলে বীয়র পান করি !

—তুই একেবারেই জল খাস না ?

—এই কনটামিনেটেড ওয়াটার খেয়ে কি শেষে ওলাউটোয় মর্বো বলতে চাস ? না, না, সেটি হচ্চে না !

—আশ্চর্য কাণ্ড ! এই জল খেয়ে আমরা বেঁচে আচি কী করে ?

—তোদের সহ্য হয় ! তোদের হিন্দু পেটে গঙ্গার জলে সব শুদ্ধ হয়ে যায় ! গত মাসে আমি পেট ব্যথায় ধুম ভুগলুম ! বাপরে বাপ, লীবর, স্প্লীন, কিডনি যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে !

—তোর এই রোগের কতা জানতুম না তো ? চিকিৎসে করিয়েচিস ?

—নাঃ !

—আমার বেশ খুব ভালো একজন কোবরেজ আচেন, পেটের ব্যামোর মোক্ষম দাওয়াই দেন।

মধুসূদনের মুখমণ্ডলে যেন একটা দারুণ বিভীষিকার চিহ্ন ফুটে উঠলো। দুই ভুরু উত্তোলিত করে তিনি বললেন, কোবরেজ ? হাউ হরিবল ! আমি করাবো কোবরেজি চিকিচ্চে ! দোজ কোয়াকস ! তুই ভুলে যাসনে, গৌর, আমি তোদের একজন রাজার জাতের মানুষ, আমি আনসিবিলাইজড হতে পারি না !

—তবে তোর যা খুশী কর ! কিন্তু পেটের ব্যথা পুষে রাকা মোটেই সিবিলাইজড কাজ নয়।

—ও সব কতা থাক। এতদিন ফিগ্‌স ফ্লাওয়ার হয়ে কোতায় ছিলিস ?

—আমার একটা নতুন নেশা হয়েচে। বেলগেছেতে পাইকপাড়ার রাজাদের সঙ্গে আমরা নাটক করচি।

—নাটক ? কী নাটক ? কারা যেন মার্চেন্ট অব ভেনিস কচো, শুনিচি বটে !

—আমাদের নাটক বাংলা।

—বাংলা ? সে তো যাত্রা ! তুই শেষ পর্যন্ত গেঁয়ো যাত্রায় মেতিচিস, গৌর ? ছি, ছি, এই তোর নতুন নেশা !

—যাত্রা কেন হবে। ইওরোপীয় ঢঙে নাটক, স্টেজ বাঁধা হবে, পেছনে ব্যাক ড্রপ, দু পাশে প্রোসেনিয়াম, সামনে ফুট লাইট থাকবে নুকোনো হ্যাজাক বাতির। সাঁ সুঁসি থিয়েটারে যেমন দেকিচিস—

—জ্বালালি তুই আমায় গৌর ! ওসব কতা থাক, তুই অন্য কতা বল্ !

—অন্য কতা বললে তো চলবে না। আমরা তোর ঠেঙে একটু সাহায্য চাই। আমাদের নাটকটি তোকে ইংরেজিতে ট্রানশ্লেট করে দিতে হবে, ইংরেজ দর্শকদের জন্য।

—শুনিচি, যারা ভাঙ খায়, তারা অনেকে উদভট্টি কতা বলে। তুই কি আজকাল ঐসব নেশাও ধরিচিস নাকি ? যদি নেশা কত্তেই হয়, আমার মতন সিবিলাইজড নেশা—

—কেন, উদভট্টি কী বললুম ? ইংরেজদের খুশী করার উপযোগী ইংরেজি তোর মতন আর কে

লিকতে পারবে ?

—নো ডাউট, আমার থেকে ভালো ইংলিশ আর কেউ লিকতে পারে না। বাট হোয়াট ইমপার্টিনেন্স ! আমি ট্রানস্লেট কর্বো বাংলা থেকে ইংলিশে ? বড় ভাষা, গ্রেট ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে ছোট ভাষায় ট্রানস্লেসান হয়। যেমন হয় ইংলিশ থেকে বাংলায়।

—কিন্তু মধু, এটা যে আমাদের দরকার ! তুই সাহায্য না করলে—

—আমি সরি, গৌর, এ ধরনের প্রস্তাব দিয়ে তুই আমায় ইনসল্ট করিস না !

—কিন্তু আমি রাজাদের কতা দিয়িচি। তুই নাটকটা একবার অন্তত নেড়েচেড়ে দ্যাক। আমি বইটার কাপি এনিচি।

—কে লিকেচে ওটি।

—রামনারায়ণ তর্করত্ন।

—তিনি আবার কিনি ? কোনো টুলো পণ্ডিত নিশ্চয় !

—তুই নাটুকে রামনারায়ণের নাম শুনিসনি ? কুলীনকুল সর্বস্ব লিকে খুব নাম করেচেন।

—হেঃ, হে-হে-হে-হে, হে, হে, তুই ভারি মজার কতা বলিস গৌর ! একে তো এই নেটিব ল্যাঙ্গুয়েজ, তাতে লিকে আবার নাম করা ! হে-হে—

—তুই যতই হাসিস মধু, নেটিভ ল্যাঙ্গোয়েজেরও কদর বাড়চে ! দ্যাক, প্যারীচাঁদবাবু টেঁকচাঁদ ঠাকুর এই পেন নেম নিয়ে 'আলালের ঘরের দুলাল' নামে নবেল ছাপালেন। আমাদের দেশে প্রথম নবেল, খুব বিক্রি হচ্চে সে বই।

—চাঁড়াল, মুচিরাও আজকাল দু পাত বাংলা শিকচে, তারা ও বই ছাড়া আর কী-ই বা পড়বে, কী-ই বা বুজবে !

গৌরদাস রত্নাবলী নাটকটির একটি কপি তার হাতের মোড়ক খুলে বার করে বললেন, একবার একটু পড়ে দ্যাক। শক্ত কিচু নয়। তোর পক্ষে ট্রানস্লেট করা খুব সহজ।

মধুসূদন অতি অবজ্ঞার সঙ্গে বইটি নিয়ে প্রথম পাতা খুললেন। তারপরই নাক বেঁকিয়ে বললেন, প্রোজ ! একে তো বাংলা ভাষা একটি উইকলিং, তার ওপর এর প্রোজ আমার দু চক্ষের বিষ ! তোমাদের প্যারীবাবুই বলো আর বিদ্যেসাগরই বলো, কারুর প্রোজই আমার এই স্টমাক ডাইজেস্ট করতে পারবে না।

বইটা গৌরদাসের কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে মধুসূদন বললেন, অবনক্সাস রচনা, দু ছত্তর পড়েই বুঝিচি। প্লীজ ফরগিভ মী, গৌর, আই বিসীচ ইউ—

গৌরদাস বইটি মুড়ে রাখলেন। তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তুই কিশোরীচাঁদবাবুর বাগানবাড়িতে একদিন প্যারীবাবুর সামনে জাঁক করে বলিচিলি যে বাংলাতে কত ভালো লেকা যায় তা তুই লিকে দেকিয়ে দিবি ! তখন ভেবেচিলুম, বাংলার প্রতি তুই মনোযোগী হবি—

তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে মধুসূদন বললেন, সে নেশার ঝোঁকে কী বলিচিলুম, তুই অমনি সেটা ধরে বসে আচিস ! তা ছাড়া আমার সে উৎসাহও নেই, উদ্যমও নেই !

—তুই আমাদের রিহার্সালে একদিন তো এলেও পারিস, হপ্তায় দুদিন সন্ধেবেলা আমরা বেলগেছে ভিলায় জড়ো হই, জায়গাটিও মনোরম।

—ইভনিং-এ বাড়ির বাইরে থাকা আমার সয় না !

—তা হলে আমি উঠি, মধু। রাজারা তোকে ভালো অনারেরিয়াম দেবেন বলেচিলেন। এটা ট্রানস্লেট করলে ওঁরা তোকে পাঁচশো টাকা দিতেন।

মধুসূদন চমকিত হয়ে বললেন, কী ? কী বললি ? কত টাকা ?

—পাঁচশো টাকা।

—শোন্ গৌর, বোস, বোস, ভালো করে শুনি ব্যাপারটা। পাঁচশো টাকা? সত্যি দেবেন ?

—সত্যি নয় কি রাজারা মিচে কতা বলবেন ?

—ওয়েইট এ মিনিট, ওয়েইট এ মিনিট। দ্যাট মেকস এ গ্রেট ডিফ্‌রেন্স ? পাঁচশো টাকা ? সে যে আমার চার মাসের মাইনে ! অ্যাণ্ড আই ক্যান ফিনিস দিস ড্যাম থিং ইন ফোর ডেইজ ! ওরে বাপরে বাপ, পাঁচশো টাকা পেলে আমি বর্তে যাবো ! পাওনাদাররা আমায় ছিঁড়ে খাচ্চে !

—তুই করবি তা হলে কাজটা ?

—নিশ্চয়ই ! আলবাৎ ! কিন্তু গৌর, সব বাংলা যদি আমি বুঝতে না পারি ?

—আমি চেষ্টা করবো বুজিয়ে দেবার। কিংবা তুই আমাদের রিহার্সালে আয়, অ্যাক্টরদের মুখ থেকে কতাগুলো শুনলে তোর আরও বোজবার সুবিধে হবে!

মধুসূদন জোর করে গৌরদাসকে টেনে তুলে তার দুই গণ্ডে ফটাফট শব্দে কয়েকটি চুম্বন দিয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, হুর-রে, হু-ররে, আঁরিয়েৎ ডিয়ার, হোয়াট এ গ্রেট নিউজ...আমি পাঁচশো টাকা আর্ন কচ্চি, আই উইল বাই ইউ এ ফ্রেঞ্চ গাউন।

উল্লাস একটু প্রশমিত হলে মধুসূদন আবার কৃতজ্ঞতার সুরে বললেন, গৌর, তুই আমার প্রকৃত সুহৃদ, ঠিক সময়টিতে তুই সাহায্য করতে আসিস, পাঁচশো টাকা...লাইক এ গ্রেট ফুল আমি এ কাজটা রিফিউজ কচ্চিলুম...

এর পরও মধুসূদনের কণ্ঠস্বর ঘন ঘন পরিবর্তিত হতে লাগলো। একবার তিনি গর্বের সুরে বললেন, কাজটা যে অতি রেচেড, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কাজ আমি কল্লে লজ্জারও কিচু নেই। অনেক গ্রেট রাইটারকেও হ্যাক রাইটিং কত্তে হয়েচে টাকার জন্য...।

তারপরই আবার ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বললেন, আমি জানি, আমি গ্রেট রাইটার নই, আই অ্যাম নো লংগার এ রাইটার অ্যাট অল, আমি এখন আর কিছুই না, আই অ্যাম এ রেক, তাই না, গৌর?

খোলস ছাড়া নতুন প্রাণীর মতন অন্ধকার গুহা ছেড়ে কারুর বাইরের আলোকিত জগতে আসার মতন, লোয়ার চিৎপুর রোডের বাড়ির স্বেচ্ছা নির্বাসন ছেড়ে বেলগাছিয়া ভিলার বিশিষ্ট জনসমাগমে একবার এসে পড়ার পর মধুসূদনের জীবনে একটি বেশ বড় পরিবর্তন এলো। মানসিক জড়তা কেটে গেল, ফিরে এলো তাঁর কর্মে উদ্যম, জেগে উঠলো তাঁর অহঙ্কারী সত্তাটি। সকলের মধ্যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা, কিংবা আলাপচারির সময়ে তিনিই শুধু কথা বলবেন, অন্যরা শুনবে, যৌবনের এই স্বভাবটি যেন আবার ফুটে উঠলো মধুসূদনের মধ্যে।

প্রবল উৎসাহ নিয়ে মধুসূদন নিয়মিত আসতে লাগলেন বেলগাছিয়া ভিলায় মহলা দেখতে। গৌরদাস দু-একদিন অনুপস্থিত হলেই বরং তিনি গৌরদাসকে র্ভৎসনা করেন। রত্নাবলীর ইংরেজি অনুবাদ সাঙ্গ হয়ে গেল অবিলম্বে, রাজারা বেশ পছন্দ করলেন সেই অনুবাদ। মধুসূদন বেলগাছিয়া ভিলার থিয়েটারের দলের একজন সদস্যই হয়ে গেলেন প্রায়।

নাটকের মহড়া ও অভিনয়ের ব্যবস্থার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করছেন পাইকপাড়ার দুই রাজা। নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র আনা হয়েছে সুরসৃষ্টির জন্য। অভিনয়ের সার্থকতার জন্য সকলে অদম্য আগ্রহে অপেক্ষমান। কিন্তু মধুসূদন একটা কথা এখনো সকলের মুখের ওপর বার বার শুনিয়ে দিতে কসুর করেন না; এত আয়োজন, এত অর্থ ব্যয় করে এমন একটি দুর্বল নাটকের অভিনয় করা কেন? এ নাটকে না আছে কোনো গভীর ভাব, না আছে ভাষার সৌন্দর্য-ব্যঞ্জনা। অনেকে স্বীকার করেন যে রত্নাবলী নাটকটি প্রকৃতপক্ষে তেমন উচ্চাঙ্গের নয় কিন্তু উপায় কী? বাংলায় আর ভালো নাটক কোথায়? মধুসূদন এক এক সময় বলে ওঠেন, ভালো নাটক থাকবে কী করে? একমাত্র আমি লিখলেই তা ভালো নাটক হবে। গৌরদাস তখন তাঁকে বিপাকে ফেলার জন্য বলেন, তুই বাংলা লিকবি, মধু? ভূদেবের মুখে শুনিচি, কিচুদিন আগে তুই একটা চাকুরির পরীক্ষা দিতে গিয়ে পৃথিবী বানান লিকেচিলি, প্রথিবী।

মধুসূদন কারুকে কিছু না বলে একদিন সত্যিই লিখতে শুরু করে দিলেন। মহাভারতের কাহিনী ঘেঁটে শর্মিষ্ঠা-দেবযানী আখ্যান নিয়ে ফাঁদলেন নাটক। তার কয়েক পৃষ্ঠা লেখা হতেই পড়তে দিলেন গৌরদাসকে। গৌরদাস এক কথায় চমৎকৃত। এ যে নতুন ধরনের ভাষা, সম্পূর্ণ নতুন ভাব। গৌরদাস আবার সেই পৃষ্ঠা কটি পড়তে দিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দত্তক পুত্র যতীন্দ্রমোহনকে। এই যতীন্দ্রমোহন অতি সজ্জন, বিদ্বান এবং সাহিত্যরসিক। তিনিও সেই শর্মিষ্ঠা নাটকের অংশ পড়ে মুগ্ধ হলেন এবং আলাপ করতে চাইলেন মধুসূদনের সঙ্গে। বেলগাছিয়া ভিলাতেই সাক্ষাৎ হল উভয়ের এবং পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলো। কখনো যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে নিয়ে যান তাঁর এমারেল্ড বাউয়ার নামক বাগানটিতে। তাঁর উৎসাহে মধুসূদনের নাটক রচনা এগিয়ে চললো। এখন ঠিক হলো যে রত্নাবলীর পর মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকই মঞ্চস্থ হবে বেলগাছিয়া ভিলায়।

বাংলা কবিতা সম্পর্কে একদিন কথায় কথায় মধুসূদন বললেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দেই একমাত্র বাংলায়

সার্থক ও দৃঢ়সংবদ্ধ কবিতা রচিত হতে পারে। যতীন্দ্রমোহনের ধারণা, বাংলার মতন দুর্বল ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ সহ্য হবে না। অন্য একজন বললেন, বাংলার চেয়ে ফরাসী ভাষা অনেক বেশী সমৃদ্ধ, কিন্তু সে ভাষাতেও অমিত্রাক্ষর ছন্দ নেই, সুতরাং বাংলায় তার প্রয়োগ তো আরও দুষ্কর। দু-একজন তো আগে চেষ্টা করেছে, পারেনি।

মধুসূদন সগর্বে বললেন, যদি কেউ পারে তো একমাত্র একজনই পারবে। আমি ছাড়া আর কেউ নেই। বাংলা ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষাতেই তো অমিত্রাক্ষর ছন্দ আছে, বাংলায় থাকতে পারবে না কেন ?

যতীন্দ্রমোহন বললেন, আপনি লিখবেন ? তা হলে সেই বই মুদ্রণের ব্যয়ভার আমি বহন করবো।

কয়েকদিনের মধ্যেই মধুসূদন তিলোত্তমাসম্ভব নামে এক কাব্য রচনা শুরু করলেন এবং তার প্রথম সর্গ পড়তে দিলেন যতীন্দ্রমোহনকে। যতীন্দ্রমোহন সে রচনা পড়ে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন এবং সাগ্রহে সে রচনা দেখাতে লাগলেন অন্যদের। সকলেই মুগ্ধ, এ এক সত্যিকারের নতুন স্বাদের কবিতা।

প্রশংসায় মধুসূদনের সব সময়ই আত্মাভিমান বৃদ্ধি পায়। তাঁর প্রতিভার অগ্নিতে প্রশংসা যেন ঘৃত, এর অভাবে তা ঠিক মতন জ্বলতে পারে না। এতদিন পর কলকাতার উচ্চ সমাজের এক অংশে মধুসূদন ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে লাগলেন।

রত্নাবলী মঞ্চাভিনয়ের দিন সমাসন্ন, তার আগে একদিন চূড়ান্ত মহড়া উপলক্ষে বিশিষ্ট কয়েকজন অতিথিকে আহ্বান করা হয়েছে। মধুসূদন অন্তরে খুব চঞ্চল হয়ে আছেন, কবে রত্নাবলীর পালা চুকে যাবে, তারপর তাঁর স্বরচিত নাটকের মহড়া শুরু হবে। আজ মধুসূদন বেশ সুসজ্জিত হয়ে এসেছেন এবং অল্প সুরাপান করে শরীরটিকে চাঙ্গা রেখেছেন। এক সময় তাঁর মনে হলো, পাইকপাড়ার রাজাদ্বয় আজ যেন তাঁকে তেমন সমাদর করছেন না, অন্য একজন অতিথিকে খাতির করতেই ব্যস্ত। রাজাদের সঙ্গে সেই ব্যক্তিটি বসে আছে একেবারে সামনের সারিতে, পরনে ধুতি এবং মোটা সুতোর চাদর, পায়ে চটি, মাথার সামনের অংশ কামানো। লোকটির বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি, পোশাক ও চেহারা দুই-ই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পাশে বে-মানান।

মধুসূদন এক সময় জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি কে হে, গৌর ?

গৌরদাস সেদিকে চেয়ে বললেন, সে কি, ওকে চিনিস না ? উনিই তো স্বনামধন্য বিদ্যাসাগর মশাই!

মধুসূদন মৃদু হাস্য করে বললেন, ও, ইনিই তিনি। সেই বিধবা-কাণ্ডারী ? তা চেহারাখানা তো দেকচি আমারই মতন প্রায়, কন্দর্পকেও হার মানায়। আমি ভাবলেম বুঝি কোনো পাল্কি বেহারা ভুল করে গিয়ে ওখেনে বসে আচে!

গৌরদাস বললেন, ওঁর চোখ দুটো তো দেকিসনি, তা হলে বুঝতিস। একেবারে বীরসিংহের খাঁটি সিংহ। চ, তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই

মধুসূদন বললেন, না না। আমার আর পরিচয় কর্বার দর্কার নেই। অমন মহাপণ্ডিতের সঙ্গে পণ্ডিতি বাংলায় আমি কতা কইতে পারবো না কো!

গৌরদাস বললেন, তুই ভুল কচ্চিস মধু। বিদ্যেসাগরমশাই ইংরেজিও খুব ভালো জানেন।

একপ্রকার টানতে টানতেই গৌরদাস মধুসূদনকে নিয়ে এলেন বিদ্যাসাগরের সামনে। পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি আমার বন্ধু মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ইনি একজন কবি এবং নাটক লিকচেন —

অভ্যেসবশত মধুসূদন করমর্দনের জন্য দক্ষিণ হস্তটি বাড়িয়ে দিলেন বিদ্যাসাগরের দিকে।

বিদ্যাসাগর বয়েসে মধুসূদনের চেয়ে মাত্র বৎসর চারেকের বড়। কিন্তু মধুসূদনের মুখমণ্ডলে একপ্রকার শিশুসুলভ চাপল্য আছে, সে তুলনায় বিদ্যাসাগরের মুখের রেখাগুলি অনেক পরিণত, চক্ষের দৃষ্টি স্থির, তাঁর আত্মাভিমান অপরের প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। তিনি এই ইংরেজি পোশাকদুরস্ত, কৃষ্ণকায় মানুষটির মুখের ওপর তাঁর অচঞ্চল দৃষ্টি স্থাপন করলেন। তিনি মধুসূদনের প্রসারিত দক্ষিণহস্ত গ্রহণ করলেন না। নিজের দুই করতল যুক্ত করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, নমস্কার।

আর দ্বিতীয় কোনো বাক্য বিনিময় হলো না তাঁদের মধ্যে।

বিক্রমোর্বশী নাটকের দারুণ সাফল্যের পর নবীনকুমার কিন্তু বর্ধিত উৎসাহে আরও একের পর এক নাট্য-অভিনয়ে উদ্যমী হলো না। নাটকের দিক থেকে তার মনই চলে গেল বরং। দেশের আরও অনেক গণ্যমান্য ধনীরা নাটক নিয়ে উঠে-পড়ে লেগেছেন, সুতরাং সে আর সেই দলে মিশতে চায় না। তার মন নতুনতর কোনো বিষয় খুঁজতে লাগলো।

ছাপাখানা থেকে বিক্রমোর্বশী বই হয়ে এলো, নবীনকুমার এখন গ্রন্থকার। বইখানি উৎসর্গ করা হলো বর্ধমানের রাজা মহাতাপচাঁদকে। প্রথম দিন টাটকা নতুন গন্ধমাখা বইটা হাতে নিয়ে সে এক অনাস্বাদিতপূর্ব রোমাঞ্চ বোধ করলো। বড় বিস্ময়ও লাগলো তার। এই পুস্তকটির কোনো অস্তিত্বই ছিল না, সে আপন খেয়ালে একদিন নদীবক্ষে বজরা ভ্রমণের সময় লেখনী হাতে নিয়েছিল বলেই এই পুস্তকটির জন্ম হলো। এখন এই গ্রন্থ চিরস্থায়ী হবে, অজানা-অচেনা মানুষেরা তার রচনা পাঠ করবে, কেউ বাহবা দেবে, কেউ করবে নাসিকা কুঞ্চন, সে এসব কিছুই দেখতে বা জানতে পারবে না। ভারি আশ্চর্য না ?

নবীনকুমার ঠিক করলো, সে গ্রন্থকারই হবে, সে রচনা করে যাবে একটির পর একটি বই, দেশ-দেশান্তরে প্রসারিত হবে তার খ্যাতি। তবে আর অনুবাদ নয়, এবার সে স্বকপোলকল্পিত কাহিনী রচনা করবে। বিক্রমোর্বশী নাটক গ্রন্থটি সে বিভিন্ন খ্যাতিমান ধীমান ব্যক্তিদের কাছে প্রেরণ করলো, একটি কপি সে একদিন স্বহস্তে গিয়ে দিয়ে এলো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। বিদ্যাসাগর বেশ আগ্রহ ভরে বইটি নেড়েচেড়ে দেখলেন এবং তাকে অনেক স্নেহসূচক কথা বললেন। তার ফলে নবীনকুমারের আরও গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা বলবতী হলো। অবিলম্বেই সে শুরু করে দিল পরবর্তী গ্রন্থ রচনা।

অপরাপর লেখকদের মতন বহু চিন্তা সহকারে এবং বারবার পরিমার্জনা করে সাহিত্য নির্মাণ তার ধাতুতে নেই। সে যখন লিখতে শুরু করে তখন ঝড়ের মতন লিখে যায়, সাত আটদিনে একটি গ্রন্থ সমাপ্ত করে। এমনভাবে রচিত হলো তিন চারখানি গ্রন্থ। সেগুলি প্রকাশ করার জন্য সে নিজেই ক্রয় করে ফেললো একটি ছাপাখানা। অপরের ছাপাখানায় গিয়ে প্রত্যাশী হয়ে বসে থাকার ধৈর্য তার নেই। নতুন বিলাতী যন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত সেই ছাপাখানায় মুদ্রিত হবে শুধু তার নিজের রচিত গ্রন্থ।

কিন্তু গ্রন্থকার হবার গৌরবেচ্ছা তাকে বেশী দিন ধরে রাখতে পারলো না। হঠাৎ এক সময় তার মনে হলো, এও যেন খুব সাধারণ পাঁচপেঁচি ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়া। নবীনকুমারের শৈশবে বাংলা বই ছিল অতি দুর্লভ বস্তু, কিন্তু ইদানীং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সার্থকতা দর্শনে রাতারাতি যেন অসংখ্য গ্রন্থকার গজিয়ে উঠেছে শিলিন্ধ্রের মতন। কার উদরে ক ছটাক বিদ্যে আছে তার ঠিক নেই, কিন্তু অক্ষরজ্ঞান থাকলেই যে-কেউই যেন লেখক হয়ে যেতে পারে ! কোনো না কোনো ধনীর কাছে কাকুতি মিনতি করে তারা গ্রন্থের মুদ্রণ-ব্যয়ভার আদায় করে। তারপর একবার গ্রন্থকার সাজলেই তাদের বগলবাদ্যে কান পাতা দায়। নবীনকুমারকে এই সব পরভৃতদের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে নাম উচ্চারণ করবে লোকে ? যদিও এ কথা সত্য যে, বাংলা-ইংরেজি পত্রিকাগুলিতে তার সব কটি গ্রন্থ সম্পর্কেই দীর্ঘ প্রশংসামূলক মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু প্রশংসায় ইতিমধ্যেই নবীনকুমারের অরুচি ধরে গেছে। একটি সম্ভ্রান্ত ইংরেজী পত্রিকা তার বিক্রমোর্বশী গ্রন্থ সম্পর্কে লিখলো যে, এই গ্রন্থটি কার রচনা সে সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, নিশ্চয়ই এটি কোনো প্রবীণ পণ্ডিতের রচনাই হবে, নিশ্চয়ই সংস্কৃত কলেজের কোনো প্রাজ্ঞ শিক্ষক এটি রচনা করেছেন। সে মন্তব্য পড়ে খুব একচোট হেসেছিল নবীনকুমার। বস্তুত, বিক্রমোর্বশী রচনার সময় তার বয়েস সদ্য সপ্তদশ বৎসর !

যাই হোক, এসব প্রশংসাও তাকে আর ধরে রাখতে পারছে না। সে বুঝতে শুরু করেছে যে, বেশির ভাগ প্রশংসাই স্তুতিবাদের নামান্তর মাত্র। কেউ তো তার কখনো নিন্দা করে না। তার রচনার কিয়দংশ

যখন সে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সদস্যদের পড়ে শোনায়, তখন তারা একবাক্যে ধন্য ধন্য করে। নবীনকুমারের মনে সংশয় জাগে, তার রচনার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি কি কিছু নেই ? সে সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে, আপনারা আমাকে সুপরামর্শ দিন, আমার ভাষার দোষগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করুন, তার ফলে আমি নিজেকে সংশোধন করতে পারবো। কিন্তু সকলেই একবাক্যে বলে, আপনার রচনা অতি উচ্চাঙ্গের ! এর মধ্য থেকে ত্রুটি বার করে কার সাধ্য ! নবীনকুমার নিরাশ হয়।

একমাত্র ব্যতিক্রম হরিশ মুখুজ্যে। নবীনকুমার তার প্রত্যেকটি গ্রন্থই উপহার দেয় হরিশকে, তারপর এই কয়েক মাস সে হরিশের মতামত জানার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেছে, কিন্তু হরিশ সেসব বই পড়েই দেখেননি। হরিশ বলেছেন, বেরাদর নবীন, আমার মাতাটি এখুন পাঁচ রকম সমিস্যের কতায় ঠাসা, তোমাদের ঐ নাটক-কাব্য পড়ার সময়ও আমার নেই, ধৈর্যও নেই। এমনকি রুচিও নেই বলতে পারো !

একদিন নবীনকুমার প্রায় জোর করেই হরিশকে তার রচনার কয়েকটি পৃষ্ঠা পাঠ করে শুনিয়েছিল। মধ্য পথে বাধা দিয়ে হরিশ বলেছিলেন, ব্যস, ব্যস, থামো। আমার মাতা ঝিমঝিম করে ! এসব কি বিদঘুটে সংস্কৃত ভাঙ্গা বাংলা লিকোচো ? যেমনভাবে মুখে কতা কও তেমনভাবে, তেমন ভাষায় লিক্‌তে পারো না, যাতে পাঁচ-জনে বুজতে পারে ? আমি বাংলা ভাষার ধার ধারি না কেন জানো ? তোমাদের এই বাংলাভাষাটি বড় বুজরুগ ! কতা কইবে এক ভাষায় আর লিক্‌বে দাঁত ভাঙ্গা ভাষায়, যাতে ঠাকুর-দেব্‌তার গন্ধ ! ইংরেজীতে ওসব ছলাকলা নেই !

নবীনকুমার বলেছিল, বন্ধু, তবে অন্য সকলে আমায় প্রশংসা করে কেন ? তারা কেন আমায় সর্বদা উৎসাহ দেয় ?

হরিশ উত্তর দিয়েছিলেন, এটুকুও বোঝো না ? তুমি একটি বেশ কচি, নধর বড় মানুষের ছেলে। তুমি দু'পা হাঁটলে ঝম্‌ঝম্ শব্দ হয়। তোমার টাকায় পাঁচজনে লুচি মণ্ডা মেঠাই খাচ্ছে, তোমায় কেউ অসুখী করবে কোন্ সাধে ? আমি গরিব বামুনের ছেলে, কোনোদিন কারুর খাইওনি, পরিওনি, কারুর ঝাড়ে বাঁশ কাটতেও যাইনি, সেইজন্য আমি সাফ সাফ কতা বলি ! তোমার ঐ টুলো পণ্ডিতী বাংলা আমার পোষাবে না !

নবীনকুমার বলেছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায়ও তো এ-রকম বাংলাই লেকেন ! এরকমই তো বর্তমান কালের আদর্শ !

হরিশ হাত জোড় করে বলেছিলেন, বিদ্যেসাগর মাতায় থাকুন. তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি, তাঁর লেকা সম্বন্ধে কিচু বলতে চাইনে ! তবে ঐ যে টেকচাঁদ ঠাকুর নাম দিয়ে প্যারীবাবু 'আলালের ঘরের দুলাল' না কী যেন একটা লিকেচেন, তার কয়েকপাত পড়ে দেকিচি, বড় খাসা লেগেচে ! পড়ামাত্তর বোজা যায়। হ্যাঁ, আর একটা কতা। বিদ্যেসাগর লিকচেন লোকশিক্ষার জন্য, তোমাদের মতন রসের হাট খুলে বসেননি।

যত দেখছে ততই হরিশ মুখুজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে নবীনকুমার। মানুষটি বড়ই বিচিত্র। একই মানুষের মধ্যে যেন নানান বৈচিত্র্যের সমাহার। যেমন তেজী এবং জেদী আবার তেমনই কোমল। কখনো কখনো কারুর প্রতি ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে অশ্রাব্য কু-কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে দেন। আবার সেই মানুষই দেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনে অশ্রু বর্ষণ করেন। এক সময় তিনি খুবই দরিদ্র ছিলেন বটে কিন্তু এখন তিনি যথেষ্ট অবস্থা ও সঙ্গতিসম্পন্ন, কিন্তু আজও তিনি নিজের কৈশোর-যৌবনের দারিদ্র্যের কথা অহংকারের সঙ্গে বলে বেড়ান। এইটি বিষম বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে ! এ-শহরের নিয়মই এই, অধিকাংশ ব্যক্তিই নিজের প্রকৃত অবস্থার কথা গোপন করে। যার যা অবস্থা, তার থেকে চালচলন অন্য রকম। যার ঘরে দিবারাত্রি ছুঁচোর কেত্তন চলছে, সেও বাইরে বেরুবার সময় কোঁচার পত্তন করে। একমাত্র হরিশ মুখুজ্যেই যেন ব্যতিক্রম। দারিদ্র্য তাঁর কাছে শ্লাঘার ব্যাপার। যা আয় করেন, ব্যয় করেন তার চেয়ে অনেক বেশী।

হরিশ মুখুজ্যের চরিত্রে আরও অনেক রকম বৈপরীত্য আছে। দেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য তিনি তাঁর লেখনীকে তরবারি করে তুলছেন দিন দিন। ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি দৃঢ়ভাবে নিয়মনিষ্ঠ। সপ্তাহে অন্তত দুদিন তিনি রসাপাগলা অঞ্চল সন্নিহিত ভবানীপুরে ব্রাহ্ম মন্দিরে উপাসনার পূর্বে বক্তৃতা করেন। হিন্দু পেট্রিয়টের পৃষ্ঠাগুলি তিনি ভরাট করেন প্রায় একাই লিখে। আবার সেই মানুষই প্রতিদিন গলায় ঢালেন সুরা রূপী অগ্নি, ঢালতেই থাকেন। যতক্ষণ পদক্ষেপ ও কথাবার্তা অসংবদ্ধ হয়ে না যায়। প্রায় রাত্রেই তিনি নিজ ভবনে না ফিরে যান বেশ্যালয়ে। দেশের মানুষকে ভালোবাসেন তিনি, আবার দেশের মানুষকে এত বেশী গালিগালাজও আর কেউ দেন না তাঁর মতন।

লেখার নেশাটা খানিকটা কমে গেলে হরিশের কাছে নিত্য যাতায়াত করতে লাগলো নবীনকুমার। হরিশ সারাদিন আপিসের কাজে ব্যস্ত থাকেন, সন্ধ্যার পর তিনি কোনোদিন কোনো মিটিং, কোনোদিন ব্রাহ্মসভায় অথবা হিন্দু পেট্রিয়টের কার্যালয়ে কর্মে নিযুক্ত থাকেন। তিনি যেখানেই যান, নবীনকুমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। কেল্লা থেকে রাত্রি ন'টার তোপ দাগার পর হরিশ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হন, তারপর কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে তির্যক আলাপ করেন, সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে সুরাপান। তারপর এক সময় কণ্ঠস্বর জড়িত হয়ে এলে হরিশ উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, বেরাদর নবীন, এবার লেট আস পার্ট আওয়ার ওয়েজ, এখুন আমি যিদিকে যাবো, তুমি তো আর সিদিকে যাবে না, ঘরের ছেলে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফেরো! আমি এখন কোনো সুন্দরীর রূপসাগরে অবগাহন কর্বো, আর তার ঠোঁটের, না, তোমরা কী যেন বলো, অধরের অধরামৃত পান করে আমি অমর হবো।

দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠকায় হরিশ এর পর আপন বুক চাপড়ে সগর্বে বলেন, আমি কত বছর বাঁচবো জানো? তিনশো বছর! আমার এত কাজ, তার আগে ফুরুবে না!

নবীনকুমারের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তার খুব বাসনা আরও কিছুক্ষণ হরিশের সঙ্গে সময় যাপনের, কিন্তু হরিশ অবিলম্বেই এমন দাপাদাপি শুরু করবেন যে তাঁর সঙ্গে আর তাল রাখা যাবে না। তা ছাড়া তিনি যেখানে যাবেন, সেসব স্থানে যেতে নবীনকুমার ঘৃণা বোধ করে। মাঝে মধ্যে হরিশ কৌতুক ছলে মদের পাত্রটি নবীনকুমারের মুখের একেবারে সামনে এনে বলেন, খাও না বেরাদর, এক চুমুক নিয়েই দ্যাকো না। এ তোমাদের ঐ অধরামৃতের চেয়ে কিছু কম সরেশ নয়। বুদ্ধির জানলা খুলে দেয়! দারুণ বিতৃষ্ণার সঙ্গে মুখ সরিয়ে নেয় নবীনকুমার। এই সুরা বস্তুটির প্রতিও তার দারুণ ঘৃণা। এই বস্তুটি সেবনের পর কত মানুষকে সে অমানুষ হয়ে যেতে দেখেছে।

একদিন সে হরিশকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা বন্ধু, তুমি তো অ্যাত ভগবানকে মানো, ব্রাহ্মসমাজে প্রার্থনার সময় চোক বুঁজে বসে থাকো, সেই তুমিই এত সুরা পান করো কেন?

হরিশ বললেন, ভগবদভক্তির সঙ্গে সুরাপানের কী বিরোধ? ঈশ্বর কি কারুকে বলে দিয়েছেন, এটা খাবে না, ওটা খাবে না? আমি তেমন ঈশ্বরের কতা জানি না। তোমাদের শ্রীকৃষ্ণও তো অর্জুন আর পাণ্ডব-পুরস্ত্রীদের নিয়ে খাণ্ডব বনে পিকনিক কত্তে গিয়ে মদ খেয়ে খুব ফুর্তি করেছেলেন! যীশু নিজে তাঁর শিষ্যদের সুরা পরিবেশন করেচেন, পড়োনি এসব? হেঃ হেঃ হেঃ!

নবীনকুমার বললো, যত লুচ্চা লম্পট মদ খেয়ে ঝুম মাতাল হয়। তারা আর তুমি সমান তা হলে?

হরিশ বললেন, অন্যদের সঙ্গে আমার তুলনা করো না! আমি প্রতিভাবান, আমি যা খুশী কর্বো! আমি জানি, মাতার ওপরে ঈশ্বর আচেন, তিনি দেকচেন! আমি কোনো ভুল কর্লে তিনি আমায় অন্য পথে নিয়ে যেতেন। নবীন ভায়া, আমি ঈশ্বরকে মানি কেন জানো? আমি জানি, আমার সব রকম বিপদ-আপদে তিনি আমায় রক্ষা করেন। একটা দিনের ঘটনা তোমায় বলি। তখুন আমার বয়েস কত, এই পোঁয়োরো-ষোলো হবে। লোকের চিঠি চাপাটি, দলিলপত্তর লিকে দিয়ে দু-এক গণ্ডা পয়সা পাই, তা দিয়ে সংসার চলে! মাজখানে দিনকাল খুব খারাপ পড়লো, কোনো রোজগারপাতি নেই, দিন আর চলে না, দুদিন বাড়িতে চুলো জ্বলেনি পেটে একটা দানা পড়েনি, মা শেষমেষ বললেন, যা হরু, আমাদের এই শেষ কাঁসার থালাটা বন্দক দিয়ে যা পাবি দুটো চাল কিনে আয়! বেরুতে যাবো, এমন সময় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি! সে কী বৃষ্টি, তোমায় কী বলবো বেরাদর, যেন আকাশ একেবারে ফেটে গ্যাচে! তিন চার ঘণ্টাতেও সে বৃষ্টি থামে না। আমি না হয় সে বৃষ্টি মাতায় করেই বেরুতে পারি, কিন্তু কোনো দোকানপত্তর তো খোলা থাকবে না! বন্দকের দোকান আগেভাগেই ঝাঁপ গুটোবে। নিরুপায় হয়ে এক সময় কাঁদতে শুরু করলুম! পেটে খিদের অমন জ্বালা, কান্না আসবে না! কাঁদতে কাঁদতে বললুম, হে ভগবান, তুমিও আমায় দেকলে না? তারপরই কী হলো জানো, বেরাদর নবীন? সেই ঝড় জলের

সন্ধেতেই এক বড় জমিদার আর তার মোক্তার আমার বাড়ি খুঁজে এসে হাজির। তাদের এক দলিলের ইংরেজী কত্তে হবে, খুব জরুরি, পরদিন সক্কালেই আদালতে জাহির করার কতা। আমি সে কাজ করে দিলুম, আর অমনি নগদানগদি দুটো টাকা পেলুম। বল, ভগবানের দয়া ছাড়া এমন হয়?

নবীনকুমার চুপ করে রইলেন।

হরিশ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার জীবনে এমন হয়নি কখনো?

নবীনকুমার বললো, না।

—তুমি বয়েসে এখুনো বালক, তোমার সামনে অনেক দিন পড়ে আচে, কোনো না কোনো সময়ে হবেই, এমনিতেই ঈশ্বর তোমায় সোনার চামচ মুখে দিয়ে এ পৃথিবীতে পাটোচেন তো, তাই বুজতে পাচ্চো না!

—বন্ধু, আমি ব্রাহ্মদের সভায় অনেকবার গেচি। কখুনো অবশ্য বাপ-পিতেমো'র ধর্ম ছাড়বার কতা আমার মনে আসেনি। কিন্তু একটা কতা আমি স্বীকার কর্বোই, যদিও মিষ্টান্ন ভোজন কিংবা লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁদের নোলা সকসক করে তবু অন্য অনেকের চেয়ে ব্রাহ্মরা সচ্চরিত্র। তাঁরা সুরাপান কিংবা····

—রামমোহন রায় সুরাপান কত্তেন। দেবেন্দ্রবাবুও কত্তেন। রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ীর মতন পূজনীয় ব্যক্তিরা কে করেন না বলতে পারো?

—কিন্তু তুমি এই যে অবিদ্যার বাড়ি যাও?

—তুমি দেকচি মরালিটির এপিটোম একটি! অবিদ্যা কাদের বোলচো? স্ত্রীলোক মাত্রই এক-একটি রত্ন! তুমি জানো, প্রাচীন গ্রীস রোমে বড় বড় দার্শনিকরা সন্দেবেলা বারবনিতা পল্লীতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে দর্শন তত্ত্ব আলোচনা কত্তেন! সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী এবং নিষেধহীন কোনো রমণী নিকটে থাকলে পুরুষের শরীরে রক্ত চলাচল দ্রুত হয়, তাতে তার বুদ্ধি ও প্রতিভা বেশী খোলে!

—বেশী রক্ত চলাচলের জন্যই শুম্ভ-নিশুম্ভ নিধন হয়েচেন বোধহয়।

—হা-হা-হা-হা! এটি বেশ বোলোচো! খাসা বোলোচো! তা ঠিক। সেইজন্যই নিভৃতে এক রমণীর কাচে একাধিক পুরুষের থাকতে নেই। থাকলেই বিবাদ, মন কষাকষি, কিংবা রক্তারক্তি। কিন্তু বারাঙ্গনাদের কাচে সব পুরুষই অনন্য, দ্যাট ইজ দি বেস্ট পার্ট অফ ইট! তারা প্রত্যেকেই তোমার, আমার। তুমিও তাদের সকলের, কোনো ভেদাভেদ নেই। ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল!

এইভাবে তর্ক বিতর্ক চলে, কোনো নিষ্পত্তি হয় না। গৃহে মা ও স্ত্রীর বিবাদের ফলে কোনো শান্তি নেই, তাই হরিশ কাজের শেষে যায় কোনো নর্তকীর বাড়িতে, আর নবীনকুমার ক্ষুণ্ণমনে ফিরে আসে নিজের আলয়ে। হরিশ তাকে চুম্বকের মতন টানেন, আবার হরিশ নিজেই তাকে এক সময় ছেড়ে চলে যান বলে সে দুঃখ পায়।

প্রায়ই হরিশের কাছে এসে বসে থাকে রাইমোহন, হরিশ এই লোকটিকে খুব প্রশ্রয় দেন। রাইমোহনের দশা এখন একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে। সর্বক্ষণ চুরচুর নেশাগ্রস্ত, পোশাক-পরিচ্ছদে ধুলোকাদা মাখা, চক্ষুদ্বয় ঘোলাটে, দেখলেই বোঝা যায় তার আর বেশীদিন আয়ু নেই। অবশ্য, যে লোক নিজের প্রাণের মায়া একেবারে ত্যাগ করে বসে থাকে, তার মৃত্যু সহজে আসে না। হরিশের একটি স্বভাবের কথা নবীনকুমার আগেই শুনেছিল। যে-সব রাতে তিনি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরেন, তখনও তিনি একলা ফেরেন না। হয় রাস্তার কোনো ঘেয়ো কুকুর অথবা কোনো ভিখারিকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং মাতা কিংবা পত্নীর আপত্তি শুনলেই তিনি তুমুল হল্লা করেন। এমনকি একদিন এক কুষ্ঠরোগীকেও তিনি পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় সেই একই রকম মনোভাব নিয়ে তিনি রাইমোহনের জন্য অবারিত দ্বার রেখেছেন। রাইমোহন সুরাপানের জন্য হরিশের কাছে আসে, অনেকখানি জিভ বার করে সে হ্যাংলার মতন বলে, কই মুকুজ্জে ময়াই, একটু সেবন করান। কণ্ঠতালু পয্যন্ত যে শুকো গেল! কাজ ফেলে রেখে হরিশ তৎক্ষণাৎ বোতল বার করে দেন। আন্তরিকতার সঙ্গে বলেন, আহা, ওর আত্মার শুক পক্ষীটি সব সময় তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকে, তাকে কষ্ট দেওয়া পাপ!

নবীনকুমারকে দেখলে রাইমোহন আর ভয় পায় না। সে যেন সব ভয় ভাবনার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। তার কণ্ঠস্বরে পুরোনো মোসাহেবী সুরটি আর নেই, বরং মাঝে মাঝে সে বেশ খোঁচা দিয়েই কথা বলে।

এক একদিন এমন হয় যে হিন্দু পেট্রিয়টের জন্য লেখা শেষ করতে হরিশের দেরি হচ্ছে, পাশে নিঃশব্দে বসে আছে নবীনকুমার। অদূরে বসে সুরাপান করে চলেছে রাইমোহন, সে কিন্তু নিঃশব্দ নয়, প্রায়ই সে গান গেয়ে ওঠে আপন মনে। হরিশ কিন্তু তাতে বিরক্তও হন না বা তাকে চুপ করতেও বলেন না। সুরার বোতলটি নিঃশেষ হয়ে গেলে রাইমোহন হরিশকে তাড়া দিয়ে বলে, কই, মুকুজ্যে ময়াই, এবার উটুন। এই দুধের বাছাটিকে এবার বাড়ি যেতে বলুন! চলুন আমরা দুজনায় মিলে তিথ্যিস্থানে যাই! কম্‌লীর কাচে যাবেন? কম্‌লী? সে আবার দোকান খুলেছে! শেষবেলায় বড় চমৎকারিণী হয়েচে, চলুন, আমি যে যাবো!

এক একদিন সে নবীনকুমারকে বলে, ছোটবাবু, আপনার এত বড় বংশ, আপনি তার মান রাকলেন না? আপনার পিতা উদার ছেলেন, মদ-মাগীর জন্য কম পয়সা ঢেলেচেন! ওফ্! সে-জন্য কত নাম ছড়িয়েছেল তাঁর! এক ডাকে সবাই চিনতো! হ্যাঁ, বাবু বটে রামকমল সিংগী! বিংশ পঞ্চাশটা মাতালের মুখের অন্ন না জোগালে আর বড় মানুষ কিসের? তা আপনার হাতে যে বিষয় সম্পত্তি এলো, আপনি আমাদের জন্য কী কল্লেন! একদিন একটা মচ্ছবও লাগালেন না? বেশ দু-দশ গণ্ডা বাঈ নাচবে, বিশ পঞ্চাশটা বোতল মাটিতে গড়াবে, আর আমরাও গড়াবো, তবে না মচ্ছব!

নবীনকুমার ঘৃণাভরে রাইমোহনের অধিকাংশ কথারই উত্তর দেয় না। রাইমোহনকে দেখলে বেশির ভাগ দিনই সে বিরক্ত হয়ে চলে আসে। এক একদিন অসহ্য হলে সে রাইমোহনকে প্রচণ্ড ধমক দেয়, রাইমোহন হা-হা করে হাসে। হরিশও যোগ দেন সেই হাস্যে।

নবীনকুমার একদিন ঠিক করে, সে আর যাবে না হরিশের কাছে। কিন্তু দু'দিনের বেশী স্থির থাকতে পারে না। চতুর্দিকে অসংখ্য চাটুকার, শুধু হরিশ আর রাইমোহনই তোয়াক্কা করে না তার সামাজিক মর্যাদার। তবু ঐ দু'জনের কাছেই তার যেতে ইচ্ছে হয়। দু-তিনদিন রাগ করে থাকার পর সে আবার যায়।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার সদস্যদের মধ্যে দুজনের সঙ্গে নবীনকুমারের বেশী হৃদ্যতা ছিল, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এবং যদুপতি গাঙ্গুলী। এর মধ্যে কৃষ্ণকমল কিছুদিন যাবৎ আর একেবারেই আসে না, যদুপতি আসে, কিন্তু সেও নবীনকুমারের রচনার দারুণ অনুরাগী। প্রায় চাটুকারেরই মতন শোনায় তার কথা, যদিও নবীনকুমার লক্ষ করেছে, যদুপতি নির্লোভ স্বভাবের মানুষ। যদুপতি প্রায়ই বলে, এসো ভাই নবীন, আমরা দেশের জন্য বেশ বড় কোনো একটা কাজ করি। কিন্তু কি যে সেই বড় কাজ, সে সম্পর্কে যদুপতির নিজেরই কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। সে বড় জোর গ্রামে স্কুল খোলার কথা ভাবে।

যদুপতি হরিশকে পছন্দ করে না। হরিশের উগ্র কথাবার্তা এবং প্রকাশ্যে লজ্জাহীনভাবে মদ্যপান দেখে সে শিউরে ওঠে। আগে হরিশ আসতেন নবীনকুমারের বাড়িতে বিদ্যোৎসাহিনী সভায়, এখন আর আসেন না। এখন নবীনকুমারের মতন উচ্চবংশের মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ যে হরিশের কাছে যায়, এটা যদুপতির পছন্দ হয় না। সে নবীনকুমারকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু উজ্জ্বল বাতি যেমন পতঙ্গকে আকর্ষণ করে, সেইভাবে হরিশের কাছে বারবার ছুটে যায় নবীনকুমার। হরিশের মতন এমন প্রজ্বলন্ত ব্যক্তিত্ব সে আর কারুর মধ্যে দেখেনি। ক্ষুরধার বুদ্ধি হরিশের, এ দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা তার মতন আর কেউ নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে না।

একদিন হরিশও বড় অপমান করলো নবীনকুমারকে। কোনো কারণে সেদিন তাঁর মর্জি সাফ ছিল না, সম্ভবত সারাদিন ধরেই তিনি কিছু কিছু মদ্য পান করেছিলেন; সেই কারণে নিজের লেখাও মনঃপূত হচ্ছিল না তাঁর। এক একটি পৃষ্ঠা লিখেই ছিঁড়ে ফেলছিলেন। একটু পরেই উপস্থিত হলো রাইমোহন। তখনই তার টপভুজঙ্গ অবস্থা, তার ওপর এসেই সে বোতল দাবি করলো। হরিশও বোতল এগিয়ে দিলেন বিনা বাক্য ব্যয়ে। রাইমোহন পান করতে করতে শুরু করে দিল বেসুরো-বেতালা কণ্ঠে গান। নবীনকুমার আর থাকতে না পেরে বলে উঠলো, চুপ করো। বন্ধু, তুমি এ লোকটাকে সহ্য করো কী করে? এটাকে বিদায় করে দিতে পারো না!

অমনি দপ্ করে জ্বলে উঠলেন হরিশ। কর্কশ কণ্ঠে বললেন, কেন বার করে দেবো ওকে? তুমি ওর দুঃখ কী বুজবে! আমি ওর সব কতা বুজিচি! তুমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আদরের দুলাল, তুমি বুজবে না! তুমি সত্যিই দুধের বাছা, মনুষ্য জীবনের কিচুই জানো না! তুমি মাতালদের ঘেন্না করো। কিন্তু তোমার সাহস আছে? কোনদিন জিভে ছুঁইয়ে দেকোচো, মদ জিনিসটা কী?

নিজের বুকে চাপড় মেরে হরিশ বললেন, এই দেকচো আমার এই লোহার দরজার মতন শক্ত বুক, আমি পারি। আমি মুদ্দোফরাসদের পাশে বসে অন্নগ্রহণ কত্তে পারি, ভিখারীর সঙ্গে বসে নেশাও কত্তে

পার। তোমরা দুধ ঘি খাওয়া ধনী-র দুলাল, তোমরা কিছুই পারো না। তুমি মাতালকে ঘেন্না করো, কিন্তু কোনোদিন সাহস হলো না মদ জিনিসটা কী তা চেকে দেকতে! বেরাদর, আমার অতিথিদের তুমি কক্ষনো অপমান কর্বে না।

ধুতির কোঁচাটা সযত্নে বাঁ হাতে ধরে উঠে দাঁড়িয়ে নবীনকুমার বললো, আমি যাই।

হরিশ বললেন, আচ্ছা! গুড নাইট!

অপমান ও বন্ধুবিচ্ছেদের বেদনায় নবীনকুমারের মুখটি বিবর্ণ হয়ে গেল। কারুর কাছ থেকে এরকম ব্যবহার পাওয়ার অভ্যেস তার নেই। ক্রোধ যেন তার শরীরের প্রতিটি রন্ধ্র থেকে ফুঁড়ে বেরুতে চাইলো। একবার তার মনে হলো, এখুনি গিয়ে কয়েকটি পাইক ডেকে এনে এই লোক দুটিকে পিটিয়ে একেবারে ছাতু করে দিতে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, সে হবে শুধু শারীরিক শক্তির প্রকাশ। অর্থবলে হরিশ এবং রাইমোহনের মতন লোকদের জব্দ কিংবা চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া তার পক্ষে কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু এদের কাছে সে বুদ্ধিতে কিংবা কথায় কি হেরে যাবে?

মুখ ফিরিয়ে সে কাতরভাবে বললো, বন্ধু, মদ্যপানের মধ্যেই কি খুব বীরত্ব বা সাহসের পরিচয় আছে?

হরিশ বললেন, মদ্যপান না করার মধ্যেও কোনো বীরত্ব বা সাহসের পরিচয় নেই!

নবীনকুমার কয়েক পা এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বললো, দাও!

হরিশ একটুও বিস্মিত বা বিব্রত হলেন না। তৎক্ষণাৎ একটি গ্লাসে খানিকটা সুরা ঢেলে সেটি নবীনকুমারের হাতে তুলে দিলেন।

নবীনকুমার এক চুমুকে তরল পদার্থটি শেষ করে বললো, এই তো খেলাম, কী হলো?

হরিশ এবং রাইমোহন দুজনেই হেসে উঠলো উচ্চ স্বরে।

রাইমোহন বললো, এক গেলাসে তো শরীরের নোনা কাটবে গো, নোনা কাটবে!

হরিশ বললেন, ঠিক!

নবীনকুমার আবার হাত বাড়িয়ে বললো, দাও।

দ্বিতীয় গেলাসটিও সে এক নিশ্বাসে শেষ করে জিজ্ঞেস করলো, এবার?

হরিশ বললেন, দ্বিতীয় গেলাসে তো মাত্তর মুখের দুধের গন্ধ ছাড়বে। আমরা তো শিশু বয়েসে মায়ের বুকের দুধ খাই, সে গন্ধ অনেকদিন মুখে লেগে থাকে।

হাতের বোতলটি উঁচু করে তিনি বললেন, এটা কী জানো? টাট্‌কা, নতুন জিনিস এয়েচে। এতকাল তো এস্‌কাটিলিয়ান ব্র্যাণ্ডি খেয়ে জিব খস্‌খসে করিচি, এটা একেবারে খাস ফরাসিস্‌ দেশের, এর নাম কন্যাক। এর প্রতি ফোঁটায় রক্ত। এর চার গেলাস খেলে তবে না গা গরম হয়।

নবীনকুমার বোতলটি হরিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সরাসরি নিজের গলায় ঢালতে লাগলো সবটুকু তরল আগুন।

রাইমোহন হরিশের দিকে তাকিয়ে দারুণ কৌতুকের ভঙ্গিতে খচাং করে টিপে দিল এক চক্ষু। তার তোবড়ানো গালে ভেসে উঠলো এক ধরনের হাসি।

হরিশও হাসতে হাসতে নবীনকুমারকে বললেন, বন্ধু, আমায় মদ্য পানে দীক্ষা দিয়েচিলেন রামগোপাল ঘোষ। তোমাকেও দীক্ষা দিল আমার মতন একজন প্রতিভাবান, বিখ্যাত লোক। সুতরাং তোমার দুঃখ করার কিছু নেই তো।

হঠাৎ এমন বীরত্ব দেখাতে গিয়েও নবীনকুমার শেষরক্ষা করতে পারলো না। কয়েক ঢোঁক তীব্র কনিয়াক গলায় যেতেই সে বিষম খেল, যতখানি সে পান করেছিল তার অনেকটাই উল্টে বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে। চক্ষে এসে গেল জল।

হরিশ তার হাত থেকে বোতলটি নিয়ে নেবার চেষ্টা করতেও সে দিল না। বোতলের গলাটি শক্ত করে চেপে ধরে রইলো।
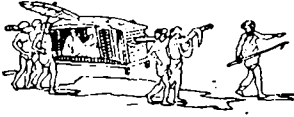
গৃহটি মনে হয় নবাব সিরাজউদ্দৌলার আমলের কিংবা তারও আগের, বয়সের যেন কোনো গাছ পাথর নেই। নবাব সিরাজউদ্দৌলা শহর কলকাতা আক্রমণ করে অনেক ঘর বাড়ি তোপ দেগে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন, এই বাড়িটিও বোধ হয় নবাবী সেনার তোপের মুখে পড়েছিল। দেউড়ি ভগ্ন, ছাদের এক পাশ হেলে পড়েছে, কোনো কোনো ঘরের দরজা-জানালা নেই। নিচেয় চাতালের যেখানে সেখানে শ্যাওলা-ধরা ইঁট-সুর্কির স্তূপ জমে আছে। কয়েকটি দেয়ালের পঞ্জর ভেদ করে মাথা চাড়া দিয়েছে বট-অশ্বত্থ গাছ। এককালে বাড়িটি বিশালাকারই ছিল অন্তত তিরিশটি প্রকোষ্ঠ, তার মধ্যে কিছু কিছু এখনো অক্ষত আছে, সেইসব প্রকোষ্ঠে ভারতের নানান প্রান্তের, নানান জাতির, নানান ভাষার কিছু কিছু মানুষ বাসা বেঁধে আছে। জানবাজারের রানী রাসমণির প্রাসাদের পিছনে কিছু সংখ্যক খুপরি খুপরি দালান, কিছু গোলপাতার কুঁড়েঘর ; আর কিছুটা দূরে নতুন নতুন সুদৃশ্য ভবন নির্মিত হয়েছে, যেসব ভবনে ইদানীং সাহেব ভাড়াটিয়ারা থাকে। এরই মধ্যবর্তী এই ভগ্ন অট্টালিকাটি।

এর দ্বিতলের অনেকগুলি ভাঙা ঘরের মধ্যে দুটি ঘর বেশ সাফ সুতরো করা। একটি ঘরে ঢালাও ফরাস ও তাকিয়া পাতা, সে ঘরটি যেন হট্টমন্দির, সেখানে কে কখন আসছে যাচ্ছে তার কোনো ঠিক নেই। অন্য ঘরটি আয়তনে অনেক বড়, তার এক পাশে সোফা কৌচ, অন্য পাশে পরস্পর যুক্ত কয়েকটি তক্তাপোশের ওপর জাজিম পাতা, মধ্যস্থলে লাল গালিচা, সেখানে কখনো কখনো নৃত্য প্রদর্শিত হয়।

নবীনকুমার একটা কৌচে হেলান দিয়ে বসে দেখছে এক পশ্চিম দেশীয়া যুবতীর নৃত্য। যুবতীটিকে ঠিক লাস্যময়ী বলা চলে না, তার নৃত্যের মধ্যেও মোহবিলাস নেই। প্রায় সর্বাঙ্গ ঢাকা অতিশয় আঁট পোশাক পরিধান করে আছে যুবতীটি, এক তবলিয়ার বোলের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রায় অঙ্কের ছক মেলানোর মতন পদক্ষেপ করে যাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে সমের মুখে এসে সে এবং তবলিয়াটি একসঙ্গে বলে উঠছে, ধা!

এ জাতীয় নৃত্যবাদ্য বিশেষ দেখার বা শোনার অভ্যেস নেই বলে নবীনকুমার এর ঠিক রস গ্রহণ করতে পারছে না। সে হাতের মদিরার গেলাসে চুমুক দিচ্ছে মাঝে মাঝে, তার ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত। কোনো কিছু ঠিক মতন বুঝতে না পারলেই সে বিরক্ত হয়। এই নৃত্য পদক্ষেপ এবং তবলার বোলের অঙ্কগুলি তাকে অবশ্যই শিখতে হবে।

মাঝে মাঝে গোলোকরাম মুলুকচাঁদ এসে বলছেন, আরে নুবিনবাবু, গেলাস একদম খালি। আবার লিবেন তো! হামায় বুলাবেন তো!

নবীনকুমার আপত্তি করে না, শূন্য গেলাসটি এগিয়ে দেয়। মুলুকচাঁদ আবার ভর্তি করে আনেন। মুলুকচাঁদের রসগোল্লার মতন গোল মুখখানি সদা হাস্যময়।

এই গোলোকরাম মুলুকচাঁদ হরিশ মুখুজ্যের বিশেষ প্রিয়পাত্র। হরিশ যখন প্রথম যৌবনে এক নিলামওয়ালার গুদামে চাকুরি করতেন, সেখানে ইনি ছিলেন তাঁর সহকর্মী। সেই জীবন থেকে হরিশ অনেক দূরে সরে এসেছেন, নিলামওয়ালার গুদামের সামান্য কেরানীর বদলে হরিশ এখন কলকাতার বুদ্ধিজীবী সমাজের শিরোমণি। যেমন এ দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, তেমনই ইংরেজরা এক ডাকে তাঁর নাম জানে, তবু হরিশ এই পুরাতন সহকর্মীর সঙ্গে সখ্য বজায় রেখে চলেছেন। গোলোকরাম মুলুকচাঁদও আর সেই নিলামওয়ালার কর্মচারী নন, এক সময় তিনি নিজেই স্বতন্ত্রভাবে নিলামের কুঠি খুলেছিলেন, প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর আগে হঠাৎ তাঁর ভাগ্য একেবারে ফিরে গেছে। এই জরাজীর্ণ অট্টালিকাটি তিনিই ক্রয় করেছেন। কিন্তু এটা মেরামত করার ব্যাপারে তাঁর কোনো উৎসাহ নেই।

গোলোকরাম মুলুকচাঁদ মানুষটি বড় বিচিত্র। অপরের সেবা করাই যেন তাঁর জীবনের একমাত্র আনন্দ। এই পড়ো বাড়ির মধ্যে কী করে যে অঢেল খাদ্য পানীয়ের সরবরাহ হয়, তা বোঝা দুষ্কর।

মুলুকচাঁদ নিজে নিরামিষাশী, কিন্তু অতিথিদের জন্য তিনি নানাপ্রকারের সুপক্ক মাংসও পরিবেশন করেন। এক একদিন রাত বেশ গভীর হলে, যখন শুধু অন্তরঙ্গ কয়েকজনই উপস্থিত থাকে, সেই সময় বসে নৃত্যগীতের আসর। এই পল্লীর আশেপাশে বারাঙ্গনা-নর্তকী-গয়ফাওয়ালীর কোনো অভাব নেই, একজন কারুকে ডাক পাঠালেই হলো! সকলেই জানে, মুলুকচাঁদ কোনোদিন কোনো রমণীর অঙ্গ স্পর্শ করেন না, কিন্তু তাঁর কোনো অতিথি এক একদিন এইসব রমণীদের সঙ্গে যতই বাড়াবাড়ি করে ফেলুক, মুলুকচাঁদ কোনো আপত্তি না করে মৃদু মৃদু হাসবেন। বয়েস চল্লিশ পার হয়ে গেছে মুলুকচাঁদের গৌরবর্ণ শরীরটি বেশী দীর্ঘ নয়, উদরদেশ বেশ স্ফীত, কপালে ও দুই কানের লতিতে চন্দনের ফোঁটা; সারা বৎসর তাঁর পোশাক এক, আটহাতি ধুতি ও সাধারণ ফতুয়া, শীতকালে বড়জোর একটি মুগার চাদর জড়িয়ে নেন।

মুলুকচাঁদের আর একটি বৈশিষ্ট্য, তিনি এই শহরের জীবন্ত গেজেট। গঙ্গার আর্মানিঘাট ও তক্তাঘাটে প্রতিদিন কোন কোন জাহাজ ভেড়ে, তা তাঁর নখদর্পণে হাওড়া-হুগলি রেলপথে কী কী মাল চালান যায়, তাও তিনি জানেন। চেতলার বন্দরে কিংবা পোস্তার বাজারে জিনিসপত্রের দর কেমন ওঠা-নামা করছে তার সঠিক সংবাদও মুলুকচাঁদের কাছ থেকেই জানা যাবে শুধু তাই নয়, ইংরেজ রাজ-কর্মচারীদের ভিতরের খবর, বড় বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলিতে কার কখন উত্থান-পতন হচ্ছে, সে সবও জানেন তিনি আরও কত খুচরো খবর। রাজস্থান থেকে মুলুকচাঁদের তিন ভাই এসে ইদানীং বড়বাজার অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেছে, কিন্তু তারা শুধুই ঘোরতর ব্যবসায়ী। আর মুলুকচাঁদজী সদানন্দ, হাস্যময়, অতিথিপরায়ণ, মজলিশী মানুষ।

হরিশের মুখে অনেকবার এই মুলুকচাঁদের কথা শুনেছিল নবীনকুমার। গল্প শুনলেই এরকম মানুষকে দেখতে ইচ্ছে করে। প্রায়ই সন্ধ্যার পর এখানে হরিশ আসে, নবীনকুমার একদিন হরিশের সঙ্গে এখানে আসতে চাওয়ায় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করেছিলেন হরিশ। বাঁকাভাবে হেসে হরিশ বলেছিলেন, বলো কী হে, তুমি যাবে সেখানে! সে এক ভাঙাচুরো পড়ো বাড়ি, আঁস্তাকুড়ের ভেতর দিয়ে রাস্তা, সেখেনে কী আর তোমার মতন মানুষ যায়! আর মুলুকচাঁদেরও কী খেয়াল কে জানে, ও বাড়ি কিচুতেই মেরামত কর্বে না!

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করেছিল, বন্ধু, তুমি যেতে পারো, আর আমি যেতে পারি না?

হরিশ কৃত্রিম বিস্ময়ে বলেছিলেন, তোমাতে আমাতে তুলনা? কীসে আর কীসে, চাঁদে আর হুলো বাঁদরের পোঁদে! তুমি হলে গিয়ে জমিদার, আর আমি এক হা-ঘরে বামুনের বাড়ির ছেলে!

নবীনকুমার বলেছিল, জমিদারের পরিচয় কি কারুর গায়ে লেখা থাকে? জমিদার হয়িচি বলে কি যেথেনে খুশী সেখেনে যেতে পারি না?

হরিশ বলেছিলেন, তুমি জমিদারকুলের নাম ডোবাবে দেকচি! জমিদার কখনো যেথেনে সেখেনে যায়? তুমি নিজের বাড়িতে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে, তোমার কাচে সবাই এসে হাত জোর কর্বে, এই হলো গে জমিদার! হ্যাঁ, তুমি যাবে কার কাচে, যে বংশমর্যাদায়, ধনে-মানে তোমার সমান কিংবা তোমার চেয়েও বড় তার কাচে। সেখেনেও যাবে হেঁক্কড়ের সঙ্গে, যত দামী শাল-দোশালা আচে সব গায়ে চাপিয়ে, হীরে-মুক্তো-চুনী-পান্নার আংটি-হার-মাদুলি সব পরে, সাঙ্গোপাঙ্গোদের নিয়ে হইহই করে জুড়ি-চৌঘুরী হাঁকিয়ে। তা না হলে আর জমিদার কিসের! একমাত্র ব্যতিক্রম মেয়েমানুষের বেলায়। শুনিচি অনেক জমিদার হাঁড়ি-মুচি-ডোমের ঘরেও মেয়েমানুষের টানে নুক্যে নুক্যে যায়, সে কতা আলাদা! আমার মতন এক খবরের কাগুচের কাচে তুমি যাতায়াত কর্চো, এতেই তোমার বদনাম রটবে, তার ওপর তুমি যেতে চাও জানবাজারের মুলুকচাঁদের আখড়ায়!

যেখানে বাধা, সেখানেই নবীনকুমারের জেদ। বাল্যকাল থেকেই নবীনকুমার মদ্যপানকে ঘৃণা করে এসেছে। তা কারুর উপদেশে বা নিষেধে নয়, নিজেরই রুচিতে। কিন্তু হরিশ যেদিন বললেন যে নবীনকুমার মদ্যপান করতে ভয় পায়, অচেনা কোনো জিনিসকে জানার সাহস তার নেই, সেদিনই সে ক্ষেপে উঠলো। নিজের কাছে করা প্রতিজ্ঞা ভেঙে সে সুরা গলাধঃকরণ করলো। প্রথম কয়েকদিন তার ঠিক সহ্য হয়নি, বমি হয়েছে বারংবার, কিন্তু হরিশের কাছে অপদস্থ হবার ভয়ে সে বমি মুছে আবার পান করেছে। কয়েক মাস কেটে যাবার পর এখনো সুরাপান তার ঠিক ধাতস্থ হয়নি, প্রথম প্রথম স্বাদ অত্যন্ত বিশ্রী লাগে, তবু জোর করে চালিয়ে যায়।

মুলুকচাঁদের আখড়া সম্পর্কেও নবনীকুমারের জেদ জেগে উঠলো। সে জমিদার হলেও অন্যান্য জমিদারদের রীতিনীতি সে অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে। সে সব পারে। একদিন জোর করেই

হরিশের সঙ্গে চলে এসেছিলো এখানে।

প্রথম দর্শনেই, হরিশ পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই, মুলুকচাঁদ চিনতে পেরেছিলেন নবীনকুমারকে। সত্যিই বিস্ময়কর এই লোকটির ক্ষমতা। নবীনকুমারকে দেখেই বললেন, আসুন, আসুন। রামকমল সিংগী বাবুজীর পুত্‌রা হামার কোঠিতে এসেছেন, কী সৌভাগ হামার! এ গরিবখানায় আপনাকে লিয়ে কুথায় বসাবো? বিদ্ধু মুকারজিবাবু কেমন আছেন? আপনার মা-জননীর তবিয়ৎ স্বাস্থ্য ভালো আছে তো?

হরিশ বলেছিলেন, এ আমার বেরাদর, দোস্ত, সব কিচু। দেকো, এর যেন কোনো রকম অযত্ন না হয়। বড় মানী লোক।

মুলুকচাঁদ বলেছিলেন, আরে রাম রাম! হামাদের এই ভাঙা কোঠিতে বাবুজী লিজে এসে পা দিয়েছেন, সে কি আমাদের খাতিরের পরোয়া করবেন উনি? সব কুছ লিজের বলে ধরে লিবেন।

প্রথম দিনই মুলুকচাঁদের আখড়ায় দুটি চমকপ্রদ খবর শুনল নবীনকুমার।

পানীয় খাদ্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করার পর মুলুকচাঁদ বললেন, আজ তো নানা সাহেব দশ্ বার মরে গিলেন!

হরিশ হাসতে হাসতে বললেন, তাই নাকি? তুমি শুনেচো, মুলুক?

মুলুকচাঁদ বললেন, হাঁ, জরুর। তুহার মনে নেই হরিশ, নওবারের বার নানাজী মরলেন গয়া টৌন মে। আঠবার মরলেন মুথুরায়—।

হরিশ জিজ্ঞেস করলেন, তা এবার মরলেন কোথায় নানা?

মুলুকচাঁদ বললেন, আজ খওবর এসেছে কি নানা সাহেব আউর একবার মরলেন নেপালে!

হরিশ বললেন, আরও কতবার মরেন উনি, দ্যাকো। আমি তো বোধ করি, উনি অন্তত একশো বার না মরে ছাড়বেন না!

মুলুকচাঁদ বললেন, তা ভি হতে পারে! ধুন্দুপন্থ বহুৎ ধুরন্ধর আদমি আছে।

নবীনকুমারের এ সব কথাবার্তা সবই ধাঁধা বলে মনে হচ্ছিল। নানা সাহেবের বারংবার মৃত্যু সংবাদ রটনার বিষয়ে সে অবহিত ছিল না।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরও চমকপ্রদ। কাফ্রিদের মতন চেহারার এক ব্যক্তি নাকি এক দরিয়ার ঘোড়া এনেচে কলকাতায় বড় মানুষের কাছে বেচতে।

হরিশ জিজ্ঞেস করলেন, দরিয়ার ঘোড়া আবার কী বস্তু?

মুলুকচাঁদ বললেন, সমুন্দর থেকে উঠে এসেছে এই ঘোড়া। বিলকুল পাক্কা সোনার মতন রঙ। এমুন চমকদার ঘোড়া কেউ কভি দেখেনি।

হরিশ বললো, ধোৎ! সমুদ্র থেকে আবার ঘোড়া উঠে আসে নাকি?

মুলুকচাঁদ বললেন, হাঁ আসে; কেনো আসবে না। সমুন্দর মনথনে ঘোড়া উঠে এসেছিল।

নবীনকুমারও অবিশ্বাসের হাসি হেসে উঠলো।

হরিশ নবীনকুমারের দিকে ফিরে বললেন, মুলুকচাঁদ কিন্তু কখনো পুরো আজগুবি কোনো সংবাদ বলে না। কিছুটা ভিত্তি থাকেই। মুলুক, তুমি ঘোড়াটা নিজের চোকে দেকোচো?

মুলুকচাঁদ বললেন, হাঁ, আপনা আঁখসে দেখেছি। পার্শীবাগানে বানধা আছে, তুমিও দেখতে পারো! দরিয়ার ঘোড়া কিনা জানি না, লেকিন এ এক আজিব জানবর। আসলি সোনার মতন রঙ। দাম কত মাঙছে জানো?

—কত?

—এক লাখ্ রূপিয়া!

—তা হলে তো কালই একবার সন্ধান কত্তে হচ্চে! এক লাখ টাকা দিয়ে ঘোড়া কে কিনবে?

—সব ইমানদার বাবুরা দাম শুনে পিছু হটছে। লাখো রূপিয়া, বাপ্ রে বাপ! কাফ্রি লোকটা বলছে কি সে বর্ধমানের মহারাজার কাছে যাবে!

ঘরের একপাশ থেকে রাইমোহন নবীনকুমারকে উদ্দেশ করে বললো, আমাদের ছোটবাবু ইচ্ছে কল্লে কিনতে পারেন। এক লাখ টাকা তো ওঁর হাতের ময়লা!

নবীনকুমার ঘাড় ঘুরিয়ে রূঢ়ভাবে উত্তর দিল, না, ঘোড়া কিনে বাজে খর্চা করার মতন ইচ্ছে আমার নেই!

হরিশ বললেন, দ্যাকো গে, ও ঘোড়ার গায়ের চামড়ায় একটু ঘষা দিলেই সোনার বদলে

পোড়াকাঠের বর্ণ বেরিয়ে আসে কি না!

মুলুকচাঁদ বললেন, বহুৎ লোক দলাই মলাই করে দেখেছে। রং একদম পাকা। ঝিলকি দিচ্ছে। এইসান ঘোড়া আগে কেউ দেখেনি এ বাৎ ঠিক।

কিছুক্ষণ পরে কথাবার্তা আবার চলে গেল বিষয়ান্তরে।

এখানে রাইমোহন নিয়মিত আসে। এই বৃদ্ধের এখন আর কোনোখানে গতি নেই, যেখানেই মিনি মাগনায় সুরাপান করতে পারে সেখানেই গিয়ে পড়ে থাকে। হরিশ যে একে কী চক্ষে দেখেছেন কে জানে, এর সব দোষ তিনি ক্ষমা করেন। রাইমোহন মাতাল অবস্থায় হেড়ে গলায় শোনায়, হরিশ মুগ্ধ হয়ে তাই তারিফ করেন। রাইমোহনের নেশার টান পড়লে হরিশ অবলীলাক্রমে তার হাতে টাকা তুলে দেন। এখন রাইমোহন এ জায়গাটির সন্ধান পেয়েছে, এখানে তার নিত্য আনাগোনা। নবীনকুমার এ লোকটিকে সহ্য করতে পারে না কেন যেন, কিন্তু হরিশের জন্য ওকে কিছু বলবারও উপায় নেই।

হরিশ অতিশয় কাজের মানুষ। সকাল থেকে সন্ধ্যাব্যাপী তাঁর কাজের অবধি নেই, অথচ রাত্রের দিকে এখানে এসে যখন গা এলিয়ে বসেন, তখন মনে হয় পৃথিবীর আর কোনো ব্যাপারে তাঁর শিরঃপীড়া নেই। মুলুকচাঁদের উদ্ভট গল্প, রাইমোহনের বাজে রসিকতা এবং বেসুরো গান তিনি বেশ উপভোগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরাপান। এই সব পরিবেশেই হরিশের চিত্ত-বিশ্রাম হয়।

মাঝে মাঝে হরিশ বলে ওঠেন, হ্যাঁগো মুলুক, এখানে যে বড্ড মদ্দামানুষের গায়ের গন্ধ! আমি বেশীক্ষণ এত মদ্দা গন্ধ সইতে পারি না। একটু সুরভী আনাও!

মুলুকচাঁদ অমনি শশব্যস্ত হয়ে উঠে দু-তিনজন নোকরকে পাঠিয়ে দেন। তারা কোনো নর্তকী ও তবলিয়াদের ডেকে আনে। এ পল্লীর সকলেই মুলুকচাঁদের আখড়া চেনে, অতিরিক্ত ইনামের আশায় তারা সাগ্রহে আসে।

ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী রচনা নিয়ে হরিশ সারাদিন নিযুক্ত থাকলেও এখানে এসে হরিশ পারতপক্ষে একটিও ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেন না আলাপচারির সময়। এবং তিনি দেশীয় গান ও উচ্চাঙ্গের নৃত্য-গীতের সমঝদার। তিনি ঠিক সমের মুখে মাথা ঝাঁকাতে পারেন, কখনো কখনো বাহবা দিয়ে নর্তকীদের উদ্দেশে টাকা ছুঁড়ে দেন।

নবীনকুমার এখানে আসে শুধু হরিশের টানে। সন্ধ্যা হলেই সে শ্রীকৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠিতা রাধার মতন হরিশের টানে উচাটন হয়। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার কার্যালয়ে হরিশের দেখা না পেলে সে নিজেই সটান মুলুকচাঁদের আখড়ায় চলে আসে। ক্রমে ক্রমে মদের নেশাটিও জমে আসছে। এখানকার রঙ্গ রসিকতা এবং চতুর কথাবার্তাও তার বেশ পছন্দ। প্রথম প্রথম অবশ্য স্ত্রীলোকদের আগমনে সে আড়ষ্ট বোধ করতো। স্ত্রীলোক সম্পর্কে তার মনে কোনো বিকার জন্মায়নি। তার পত্নী সরোজিনীকে সে যথেষ্ট পছন্দ করে, সরোজিনীর কাছ থেকে সে যতটুকু পায়, তার বেশী নারীসঙ্গলিপ্সা তার নেই। কিন্তু সরোজিনীর সঙ্গে খুব বেশীক্ষণ মানসিক আদান-প্রদান চলে না। সরোজিনীর জগৎটি বড় ক্ষুদ্র। পছন্দ মতন পুরুষ মানুষদের সাহচর্যেই নবীনকুমারের আত্মার স্ফূর্তি হয় বেশী।

যেহেতু সব ব্যাপারে নবীনকুমার এখন হরিশের অনুকরণ করতে শুরু করেছে, তাই সে এখন নৃত্য-গীতের সমঝদার হবারও চেষ্টা করতে লাগলো প্রাণপণে। গোড়ার দিকে এখানে এসে সে স্ত্রীলোকদের মুখের দিকে চাইতোই না, নাচের পালা এবং মাতালদের হল্লা এক সময় খুব বেড়ে উঠলে সে এখান থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিত বাড়ির দিকে। এখন সে সোজাসুজি এই সব স্ত্রীলোকদের দিকে তাকাতে পারে, তারা হাসি ছুঁড়ে দিলে সে উত্তর দেয় এবং হাততালি দিয়ে তাল দিতেও শিখেছে।

এই সব নর্তকীরা প্রায়ই বদলে যায়। ঘন ঘন নতুন মুখ দেখাই হরিশের পছন্দ। যে-কোনো নতুন রমণীর সঙ্গেই হরিশ ব্যবহার করেন অতি ঘনিষ্ঠের মতন, প্রথমেই তিনি তাদের নাম জেনে নেন এবং তারপর তাদের তুই সম্বোধন করে কথা বলেন। নবীনকুমারের মনে হয়, হরিশ বোধ হয় আসলে অন্তরে অন্তরে নারী বিদ্বেষী। জননী ও পত্নীর কাছ থেকে শান্তি পাননি বলেই সম্ভবত হরিশ পৃথিবীর আর কোনো রমণীকে শ্রদ্ধা করেন না। নারী তাঁর কাছে শুধুই যেন ভোগের সামগ্রী, তাদের আর যেন কোনো মূল্য নেই। প্রায়ই তিনি বলেন, মেয়েমানুষ হবে দু' রকম, হয় নিজের সন্তানের গর্ভধারিণী অথবা নাচুনী। যে নর্তকীকে হরিশের খুব পছন্দ, যাকে বাহবা দেন অনেকবার, পরের দিন তাকেই আবার আনবার কথা উঠলে হরিশ মুখ ঝামটা দিয়ে বলে ওঠেন, কেন, আর কি নাচুনীর অভাব! একটা নতুন মুখ আনো না!

মুলুকচাঁদ সন্ধানও রাখে প্রচুর। হরিশ নতুন মুখ চাইলেই তিনি অমনি নতুন স্ত্রীলোক এনে দেন। হরিশের জন্য তিনি সব কিছু করতে প্রস্তুত। শুধু এক জায়গায় মুলুকচাঁদ হার মেনেছেন। রাইমোহন একদিন বললো, এত নাচনেওয়ালী তো দেকচি বাওয়া, কিন্তু এরা কেউই একজনের নোখের যুগ্যি নয়! তাকে তো আনতে পাল্লে না!

মুলুকচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, জানি, আপনি কার কথা হামাকে বলছেন। চেষ্টার কোনো কসুর করিনি, কিন্তু সে কেনো আসবে হামার এই গরিবখানায়। শুনেছি তো কোতো কোতো রাজা-মোহারাজাকেও সে দরওয়াজা থেকে ভাগিয়ে দেয়!

হরিশ প্রশ্ন করেন, কে? কে সে?

রাইমোহন বললো, কমলি! সে মাগী বড় দেমাকী। বুড়ি হতে চল্লো, তবু দেমাক ছাড়ে না।

মুলুকচাঁদ বললেন, কোমলাসুন্দরী নাম আছে সে জেনানার। হাঁ, উমর হয়েছে ঢের, তবু বড় খুবসুরৎ! আর নাচ করে খুব ভালো।

রাইমোহন রহস্যময় ভাবে চোখ মটকে বলে, এখেনকার একজন পারে তার দেমাক ভাঙতে। ইচ্ছে কল্লেই পারে।

এই কথা বলে সে নবীনকুমারের দিকে তাকায়। নবীনকুমার এ কথার অর্থ বুঝতে পারে না। সে চোখ সরিয়ে নেয়।

একদিন হরিশ এলেন বেশ দেরি করে। তাঁর কাগজের জন্য অনেক লেখা বাকি ছিল, সব সমাপ্ত করে তিনি ছাপাখানায় বুঝিয়ে দিয়ে এসেছেন। নবীনকুমার আগেই পৌঁছে গিয়েছিল এবং ইতিমধ্যেই তার দু-তিন গেলাস সুরা পান করা হয়ে গেছে। হরিশ এসে যোগ দিলেন তার সঙ্গে। প্রথমে কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়, নেশাটি ঠিক মতন না জমলে হরিশ নর্তকী আনবার কথা বলেন না।

নেশা মধ্য পর্যায়ে এসেছে, নর্তকীর প্রসঙ্গ উঠেছে এবং একজনকে আনবার জন্য নোকররাও বেরিয়ে গেছে। এই সময় মুলুকচাঁদ হরিশকে বললেন, ও একটা ভারি জবর খোবর বলতে বিলকুল ভুলে গিয়েছিলুম হরিশ। এইমাত্র ইয়াদ হলো। কি, হামাদের লেফটেনাণ্ট গভরনর যো ছিল না, কালসে তার বদল্ হোয়ে গেলো। হ্যালিডে সাহেব আর থাকছেন না।

হরিশ চমকে উঠে বললেন, অ্যাঁ? হ্যালিডে আর লেফটেনান্ট গাভ্‌নার থাকছেন না? কে আসছেন সে জায়গায়?

মুলুকচাঁদ বললেন, গ্রাণ্ট নামে সাহেব আছেন না? সে ওহি সাহেব।

হরিশ বললেন, জন পিটার গ্রান্ট। তিনি আসছেন? তুমি ঠিক জানো, মুলুকচাঁদ?

মুলুকচাঁদ বললেন, আমি ঠিক ছাড়া কি ঝুট বলি তোমাকে? কালই তো পহেলা তারিখ আছে না? কাল সে বদল্ হোচ্চে!

হাতের গেলাসটি মাটিতে ঠক করে নামিয়ে রেখে হরিশ বললেন, ওরে বাপ রে বাপ! এত বড় খবরটা তুমি আমায় এতক্ষণ বলোনি মুলুক? আমায় এক্ষুনি যেতে হবে।

নবীনকুমার অতি বিস্মিত হলো। লেফটেনাণ্ট গভর্নরের বদলের সংবাদে এতখানি কী গুরুত্ব আছে সে কিছুই বুঝলো না। এক সাহেবের জায়গায় আর এক সাহেব আসবে, এতে আর নতুনত্ব কোথায়?

তার প্রশ্নের উত্তরে হরিশ বললেন, তুমি বুঝতে পারলে না, নবীন? অবস্থা অনেক বদলে গেল! এই হ্যালিডে আমাদের কম ক্ষতি করেচে? আমি আশাও করিনি যে এ বিদায় নেবে! আমি নীলচাষীদের হয়ে লড়চি আর ঐ হ্যালিডে নীলচাষীদের দুশমন! সে সব সময় নীলকর সাহেবদের স্বার্থ দ্যাকে। সে সবচেয়ে বদমাস নীলকরদের বেছে বেছে তাদের অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেটি ক্ষমতা দিয়েচে। বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট চাষীদের দুঃখ বোজেন, তিনি চাষীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটা আইন জারি করেছিলেন, এই হ্যালিডে ব্যাটা তার চাকরি খাওয়ার তালে ছেল। আমি চল্লুম, তোমরা থাকো।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, এত রাতে তুমি এজন্য কোথায় যাবে?

হরিশ বললেন, তুমি বুজতে পারচো না, অবস্থা কত বদলে গেল! আমার কাগজের সব লেখাগুলো পাল্টাতে হবে। এখুনি আবার নতুন করে লিকবো। জন পিটার গ্রাণ্ট বিচক্ষণ ভালোমানুষ, তাঁর সামনে নীলচাষীদের প্রকৃত চিত্র তুলে ধর্তে হবে। গ্রাণ্ট সাহেবকে যদি দলে পাই তবে এবার নীলকরদের সঙ্গে শুরু হবে আমাদের সত্যিকারের লড়াই।

কর্তব্যের ডাক পড়লে হরিশ আর দ্বিধা করেন না। হাতের মদের পাত্র ফেলে, নাচ গানের আসর ছেড়ে তিনি তখনই আবার চলে গেলেন হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার অফিসে।

সে রাতে নবীনকুমারেরও আর বাড়ি ফেরা হলো না।
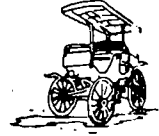
চক্ষু মেলে নবীনকুমার প্রথমে বুঝতেই পারলো না যে সে কোথায় ? ঘরের ছাদ অন্য রকম, এত সরু সরু কড়িকাঠের ছাদ সে আগে কখনো দেখেনি। জানলায় চৌকো সবুজ-রঙা কাঠের গরাদ, সেই জানলার বাইরে দিয়ে আকাশের ভাসমান মেঘ দেখা যাচ্ছে। নবনীকুমারের শয়নকক্ষ থেকে তো এমনভাবে আকাশ দৃশ্যমান নয়।

হঠাৎ তোপ দাগার শব্দ হতে সে বিষম চমকে উঠলো। এত জোরে তোপের শব্দ তো সে কোনোদিন সকালে শোনেনি, মনে হয় যেন খুব কাছে। পর পর সাত বার তোপ দাগা হলো কেল্লা থেকে, অর্থাৎ সকাল এখন সাত ঘটিকা। সে ধড়মড় করে উঠে বসলো। এ তার নিজ গৃহ নয়, এ তো মুলুকচাঁদের সেই ঘর। দিনের আলোয় কোনোদিন এখানে নবীনকুমার আসেনি বলে সব কিছুই তার অচেনা বলে বোধ হলো।

জাজিম পাতা তক্তপোষের ওপর শুয়ে ছিল সে, মেঝেতে লম্বা ঠ্যাং দুটি গুটিয়ে শরীরটাকে 'দ'-এর আকৃতি দিয়ে এখনো ঘুমোচ্ছে রাইমোহন, ফাটা বাঁশীর শব্দের মতন নাসিকা ধ্বনি হচ্ছে তার। মেঝেতে আর এক পাশে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে আর এক ব্যক্তি, তার ওষ্ঠের পাশ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। উচ্ছিষ্ট মাখা একটি খাবারের পিরীচের ওপর ভন্ ভন্ করছে এক রাশ নীল ডুমো মাছি, তার পাশেই পড়ে আছে শস্তা জরি বসানো একটি ঝ্যালঝেলে লাল ওড়না।

নবীনকুমার দু' হাতে চক্ষু ঘর্ষণ করলো। এখানে সে রাত্রি যাপন করেছে, এই নোংরা পরিবেশে ? কেন ? কী হয়েছিল গত রাত্রে ! তার কিছুই মনে পড়লো না। শরীরে একটা বিবমিষার ভাব। অন্যের ব্যবহৃত এমন অপরিচ্ছন্ন শয্যায় অন্য নীচু শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে একই কক্ষে সে কখনো শয়ন করেনি।

নবীনকুমার তক্তাপোষ থেকে মেঝেতে নেমে দাঁড়ালো। সে বসেছিল কৌচে, সেখান থেকে রাত্রে তক্তাপোষের ওপর গেল কী করে ? কী যেন একটা খবর পেয়ে হরিশ হঠাৎ চলে গেলেন। তারপর একটি নর্তকী এলো। এ নর্তকীটি অন্য ধরনের, অঙ্কের ছকে পা মেলানর বদলে ঘাগড়া ওড়াচ্ছিল বেশী, একটি সুরা ভর্তি গেলাস রেখেছিল মাথার ওপরে। হরিশ এ রকম নাচ পছন্দ করেন না, সেইজন্যই কি হরিশের অনুপস্থিতিতে চটুল নৃত্য শুরু হয়েছিল। হরিশ নেই বলে নবীনকুমারকেই সকলে প্রধান অতিথি হিসেবে খাতির করছিল। নর্তকীটি বার বার তার সামনে এসে অঙ্গভঙ্গি করছিল নানারকম। তারপর আর কিছু স্মরণে আসে না। সে কি চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল একেবারে ?

মুলুকচাঁদ এই সময় সেই কক্ষে ঢুকে উৎফুল্লভাবে বললেন, এই তো, আপনি উঠিয়ে পড়েছেন ? তবিয়ৎ ভালো আছে তো ? লিন, মুখ ধুয়ে লিন, তারপর একটু গরম গরম দুধ আর জিলাপি খান।

মুলুকচাঁদ এরই মধ্যে স্নান সেরে শুদ্ধ বস্ত্র পরেছেন। কপালে তিলক, দু' কানের লতিতে টাটকা চন্দনের ফোঁটা, মুখে বেশ একটা পরিতৃপ্তির ভাব। যেন তিনি সারাদিনের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত।

নবীনকুমার আচ্ছন্নের মতন জিজ্ঞেস করলো, আমার কী হয়েছিল কাল ? আমি বাড়ি যাইনি কেন ?

মুলুকচাঁদ বললেন, কুচ্ছু তো হয়নি। অচানক আপনার নিদ এসে গেলো, হাত থেকে গিলাসটা খসে পড়লো, তখন হামিলোক সব ধোরাধোরি করে আপনাকে শুইয়ে দিলাম। কোষ্ট হয়েছে খুব ? আহা-হা, বহুৎ মচ্ছর কেটেছে ! শালা, ইত্না মচ্ছর—

নবীনকুমার বললো, আমার ঘুম এসে গেসলো, তো আমায় ডেকে তুলে বাড়িতে পাটিয়ে দিলেন না কেন ? আমি কখুনো বাড়ির বাইরে থাকি না—

মুলুকচাঁদ বললেন, অনেক তো ডাকাডাকি করলুম। লেকিন সরাবের নিদ্ কি সহজে ভাঙে ! আপনি তো স্রিফ পাত্থর বনে গেলেন। হামি তখুন নাচা-গানা সোব বন্ধ করে দিলুম। বললুম কী, বাবুজীর নিদ্ এসে গেছে, আভি সব চুপ যাও ! হরিশেরও এমুন হয়, সে তখুন শুয়ে যায়।

নবীনকুমার আর কথা না বাড়িয়ে বললো, আমি বাড়ি যাবো, আমার জন্য গাড়ি ডাকতে হবে।

মুলুকচাঁদ বললেন, আপনার গাড়ি তৈয়ার আছে।

মুলুকচাঁদ শ্বেত পাথরের গেলাসে গরম দুধ এবং শাল পাতায় মোড়া এক চাঙ্গাড়ি জিলিপি এনে হাজির করলো, কিন্তু নবীনকুমারের কোনো খাদ্য গ্রহণেই প্রবৃত্তি নেই এখন। সে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

লম্বা টানা অলিন্দের একেবারে শেষ প্রান্তে দেয়ালে ঠেস দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে বসে ঘুমুচ্ছে দুলালচন্দ্র। সারারাত্রি সে এইভাবেই কাটিয়েছে। নবীনকুমার তার কাছে গিয়ে দুবার নাম ধরে ডাকতেই সে ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালো। নবীনকুমার বললো, চল ! হাঁটতে গিয়ে নবীনকুমার টের পেল, তার এখনো পা কাঁপছে, মস্তিষ্কের মধ্যে টলোমলো ভাব। ভাঙাচুড়ো প্রাসাদটির বহির্দ্বারে নবীনকুমারের জুড়ি গাড়িটি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সহিস এবং পিছনের ভৃত্যটি ছাদের ওপর ঘুমন্ত। দুলাল তাদের ডেকে তুললো। মুলুকচাঁদ প্রত্যুৎগমন করার জন্য দ্বার পর্যন্ত এসেছেন, কিন্তু নবীনকুমার আর কোনো কথা না বলে উঠে বসলো কোচের মধ্যে।

জোড়াসাঁকোর সিংহ সদনের সামনে সেই একই সুদৃশ্য, জমকালো জুড়ি গাড়িটি থামলো, যে গাড়ি ঠিক এমনই ভাবে অনেক বৎসর আগে এ রকম সকালে ফিরে আসতো রামকমল সিংহকে নিয়ে। আজ রামকমল সিংহের বদলে গাড়ি থেকে নামলো তাঁর অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক পুত্র। পোশাক মলিন, চক্ষু দুটি আরক্ত, চুল অবিন্যস্ত। মুখ নিচু করে গাড়ি থেকে নেমে নবীনকুমার চলে এলো ভিতরে। সে কারুকে ভয় পায় না, তবু নিজেকে তার মনে হচ্ছে অপরাধী। তার সর্বাঙ্গ যেন অশুচি হয়ে গেছে। গলার মধ্যে যেন জমে আছে বাষ্প, কান্না দমনের সময় এ রকম হয়।

নিজের ঘরে প্রবেশ করে পালঙ্কে বসা মাত্র সরোজিনীও এলো সেই ঘরে। নবীনকুমারের পায়ের কাছে হাঁটুগেড়ে বসে সে জুতো খুলে দিতে লাগলো। তারপর মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলো, আপনার স্নানের জল দিতে বলবো কি ?

নবীনকুমার শুধু বললো, হুঁ।

সরোজিনী আবার জিজ্ঞেস করলে, আজ তেল মাকাবেন ? যদুকে ডাকবো ?

নবীনকুমার পুনরায় বললো, হুঁ।

সরোজিনী উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আপনি স্নান সেরে নিন, আমি ঠাকুরকে খাবার দিতে বলচি।

সরোজিনী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। নবীনকুমার বিমূঢ়ের মতন বসে রইলো। সরোজিনী তো একবারও প্রশ্ন করলো না, কাল ফেরেনি কেন, কিংবা কোথায় ছিল। তার কথায় কোনো অভিমানের ছায়া পর্যন্ত নেই !

অনেকক্ষণ একই অবস্থায় বসে রইলো নবীনকুমার। সামনের আয়নায় সে তার মুখখানি দেখতে পাচ্ছে। এক রাত্রেই যেন অনেকখানি বদল হয়েছে তার। মুখভর্তি মশার কামড়ের দাগ, ওষ্ঠের ওপর যে সব গুম্ফের রেখা দেখা দিয়েছিল, এখন যেন তা হঠাৎ গাঢ় বর্ণ ধারণ করেছে।

একটু পরে সরোজিনী এসে তাড়া দিল, ও কি, আপনি চান কত্তে গেলেন না ? নুচি ভাজা হচ্চে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে ?

নবীনকুমার বললো, হ্যাঁ, যাই।

ভালো করে শরীরে সরষের তেল দলাই মলাই করিয়ে স্নান সেরে নিল সে। আহারে রুচি নেই, তবু কিছু খেতে হলো। মে মাসের আকাশ গুমোট হয়ে আছে, শরীরে জ্বালা ধরানো গ্রীষ্মের উত্তাপ, সরোজিনী পাখার বাতাস করতে লাগলো তাকে।

এক সময় নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, আমি যে কাল রাত্রে বাড়ি ফিরিনি, মা সে কতা জানেন ?

সরোজিনী বললো, হ্যাঁ, জানেন।

—মায়ের দাসীকে খপর দাও, মায়ের পুজোআচ্চা সারা হলে আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেকা কর্বো।

খাওয়া শেষ হলে সরোজিনী একটি রূপোর রেকাবিতে করে কয়েকটি সাজা পানের খিলি তার

সামনে ধরলো। নবীনকুমার বাড়িতে কোনোদিন পান খায় না, ধূমপানের অভ্যেসও তার নেই। কিন্তু মুলুকচাঁদের ওখানে কয়েকদিন সকলে বারংবার পীড়াপীড়ি করায় সে দু-একটি পান মুখে দিয়েছে। আজ সকালে তার ওষ্ঠাধর তাম্বুল রসে রক্তিম ছিল, তা দেখেই সরোজিনী পান এনে দিয়েছে।

নবীনকুমার হাত দিয়ে রেকাবিটা সরিয়ে দিয়ে বললো, থাক্!

সরোজিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, এবার সে প্রায় সারাদিনের মতন অদৃশ্য হয়ে যাবে। বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে বাড়ির নারীদের দিবাভাগে দেখা সাক্ষাতের প্রথা নেই। কিন্তু নবীনকুমারই এ প্রথা ভেঙেছিল, সে কোনো দাস-দাসীর কাছ থেকে তার নিজস্ব পরিচর্যা পছন্দ করে না। তার স্নানাহারের সময় সরোজিনীর উপস্থিতি চাই।

মস্তিষ্ক এখনো ঠিক পরিষ্কার হয়নি, তার ইচ্ছে করছে শুয়ে থাকতে। কিন্তু সে দুর্বলতা দমন করে সে দেখা করতে গেল তার মায়ের সঙ্গে।

বিম্ববতী পুত্রের জন্য প্রস্তুত হয়েই বসেছিলেন। নিজের হাতে দই, লেবুর রস ও মধু দিয়ে সরবৎ বানিয়েছেন, রাত্রি জাগরণের পর এই সরবৎ খেলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। তাঁর স্বামীও এই সরবৎ পান করতে ভালোবাসতেন। নবীনকুমারের হাতে গেলাসটি তুলে দিয়ে তিনি বললেন, নে, এক চুমুকে খেয়ে নে।

কোঁচার ফুলটি বাঁ হাতে ধরে মায়ের ঘরে একটি কেদারায় বসলো নবীনকুমার। গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কেমন আচো, মা? অনেক দিন তোমার শরীর গতিকের খপর নেওয়া হয়নি কো।

বিম্ববতী মুগ্ধ, বিগলিত হয়ে প্রায় ছলোছলো নেত্রে বললেন, আমি ভালোই আচি রে, খুব ভালো আচি। তোদের ভালোতেই আমার ভালো। আমার বউমাটি অতি সতীলক্ষ্মী, ভালো বংশের মেয়ে তো, খুব উঁচু নজ্জর, আমায় খুব দ্যাকে, পান থেকে চুনটি খসলেই একেবারে হা-হা করে আসে।

নবীনকুমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মায়ের দিকে চেয়ে রইলো। যেন এই রমণীটি তার অচেনা, সে এঁর অন্তর যাচাই করার চেষ্টা করছে।

অপ্রত্যাশিত ভাবে সে বললো, মা, ইব্রাহিমপুরে আমাদের কুঠিবাড়িটা আমি বেচে দেবো ঠিক করিচি!

বিম্ববতী বললেন, সে কি, তুই আবার সম্পত্তি বেচবি? কেন, তোর টাকার খামতি পড়লো কিসে?

—ইব্রাহিমপুরে আমাদের সব জমি নীলকর সাহেবদের ইজেরা দেওয়া হয়েছে, সুদু সুদু কুঠিবাড়িটা টিঁকিয়ে রেখে লাভ কী? চারটে লোকের মাসমাইনে ফালটুস খর্চা।

—ইজেরায় জমি তো আবার ফেরত পাওয়া যায় শুনিচি।

—বাঘের মুখ থেকে কেউ কখুনো ছাগল ছ্যানা ফেরত এনেচে, শুনেচো? ও জমি ইজেরা দেওয়াই ভুল হয়েছেল।

—এ সব বিষয় সম্পত্তির কতা আমার সঙ্গে ক্যানো বাপু? তোরা যা ভালো বুজিস করবি। তোর জ্যাটাবাবু রয়েচেন, তাঁর পরামর্শ নিয়ে চললে...

—হ্যাঁ ও বিষয়েও একটা কতা আচে, মা। জ্যাঠাবাবুকে যদি আমি এ বাড়িতে কখুনো ডেকে পাটাই, তাতে তাঁর কি অপমানিত বোধ হবে? উকিলের পরামর্শ আমার তো দরকার বটেই, কিন্তু আমি শপথ করিচি, ও বাড়িমুখো আমি কোনোদিন হবো না।

—ওমা, এমন শপত...তুই কী বলচিস ছোট্‌কু? কেন, যাবি না কেন ও বাড়িতে?

—তোমার মনে নেই, সেই যে জ্যাঠাবাবুর নাতির উপনয়নের দিনকে আমায় অপমান করেছিলেন? ওঁরা বামুন, আমরা কায়েত, আমরা কখুনো এক হতে পারি না।

—তোর জ্যাটাবাবুর সঙ্গে আমাদের আবার বামুন-কায়েতের সম্পর্ক কী? তুই কী সব অলুক্ষণে কতা কইচিস!

—আমি ঠিকই বলচি মা। আমি শিবুকে দেখতে যাচ্চিলুম, আমায় বারণ করা হয়েছেল, কারণ আমি বামুনের ছেলে নই। ও বাড়িতে আর আমি কোনোদিন পা দেবো না।

বিম্ববতী একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তাঁর মুখখানিতে বিষাদের ম্লান ছায়া একবার পড়েই আবার মিলিয়ে গেল। তিনি মিনতি মাখা আর্দ্র স্বরে বললেন, বাবা ছোটকু, তোকে একটা কতা বলবো? তুই রাকবি বল? আমার মাতার দিব্যি, তুই আমার এই একটা অনুরোধ যদি রাকিস...

নবীনকুমার তৎক্ষণাৎ কোমল কণ্ঠে বললো, কেন রাকবো না, মা? তোমার কতা কি আমি ফেলতে

পারি ? তুমি যা বলবে নিশ্চয়ই মানবো !

—তুই তোর জ্যাঠাবাবুর সঙ্গে অসৈরণ করিসনি। লক্ষ্মী মানিক আমার, উনি গুরুজন, আমাদের সোংসারের মাতার ওপর ছাতা ধরে আচেন অ্যাতদিন, তাঁকে তুই অচ্ছেদ্দা করিসনি ! উনি তোর ভালো বই মন্দ কখুনো চাইবেন না···

নবীনকুমার একটুক্ষণ হাসিমুখে চেয়ে রইলো জননীর দিকে। তারপর বললো, তুমি ভয় কেন প্যাচ্চো, মা ! আমি কতা দিলুম, জ্যাঠাবাবুর সামনে কখুনো অশ্রদ্ধার ভাব দেকাবো না।

আর কিছুক্ষণ কথা হলো এই বিষয়ে। নবীনকুমার বার বার আশ্বস্ত করলো বিম্ববতীকে, এমন কি একবার সে উঠে কাছে এসে জননীর বাহু ছুঁয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, তুমি কেন উতলা হচ্চো, মা ? আমি কি তোমার অবাধ্য ছেলে ?

মাতা পুত্রের এই আলাপচারির পর দু'জনের মনে প্রতিক্রিয়া হলো দু'রকমের। অনেকদিন পর বিম্ববতী আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। নবীনকুমারের এমন মধুর ব্যবহার তিনি প্রত্যাশাই করেননি। ছেলে ঠিক তার বাপের ধাত পেয়েছে। রামকমল সিংহও দু-চারদিন বাড়ির বাইরে রাত কাটিয়ে এলে তারপর বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে খুব নরম ব্যবহার করতেন, এমন কি ঝি চাকরদের সঙ্গেও কথা বলতেন মধু ঢালা কণ্ঠে। স্ত্রীর প্রতি তাঁর সোহাগ উথলে উঠতো। বিধুশেখরের সঙ্গে সন্ধি করতে নবীনকুমার এক কথায় রাজি হয়ে গেল। এবার বিম্ববতী নিশ্চিন্ত, এখন তাঁর প্রয়োজন শুধু বিধুশেখরের কাছ থেকে তাঁর নিজের মুক্তি। এবার তিনি এই সংসার থেকে বিদায় নেবেন, এবং বিধুশেখরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাবেন।

নবীনকুমার তার ঘরে ফিরে এলো ক্ষুব্ধ হয়ে। মনের মধ্যে চাপা ক্রোধ ও অপমান। তার মায়ের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তির আলোচনা করার বাসনা তার বিন্দুমাত্র ছিল না, বিশেষত আজ। কিন্তু একটা কিছু প্রসঙ্গ তুলে তো কথা শুরু করতে হয়, তাই সে ইব্রাহিমপুরের কুঠির কথা বলেছিল। সে অপেক্ষা করছিল, মা তাকে অন্য কথা বলবেন। সে নিজে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে, মা কি এর মর্ম বোঝেননি ? কাল রাত্রে সে বাড়ি ফেরেনি, সেজন্য একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না ? মা তাকে কখনো ভর্ৎসনা করেন না, কিন্তু স্নেহের সুরে তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা তো করতে পারতেন ; তুললেন কিনা বিধুশেখরের প্রসঙ্গ। মায়ের কণ্ঠে তার জন্য একটু উদ্বেগও প্রকাশ পেল না, এতই স্বাভাবিক গৃহের বাইরে রাত্রি যাপন ? সবাই ধরে নিয়েছে, সে তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে ?

সেই রাত্রেই নবীনকুমার আবার গেল মুলুকচাঁদের বাড়িতে। তারপর প্রতি রাতে। সুরাপানের নেশা শুরু হলো বল্গাহীন ভাবে। নৃত্য গীতের আসরে সে জাঁকিয়ে বসে। হরিশ নেই, তিনি গেছেন বারাসতে, সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসলি ইডেন রায়ত প্রজাদের জন্য যে রুবকারি জারি করেছিলেন, সেটা কার্যকর করবার জন্য তিনি নীলকরের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে লড়ছেন। হরিশের অনুপস্থিতিতে নবীনকুমারই মুলুকচাঁদের রাত্রি বাসরের প্রধান ভোক্তা। সে নিজেও অর্থব্যয় করতে লাগলো অফুরন্ত। প্রতি রাত্রেই বারাঙ্গনা-নর্তকী আনা হতে লাগলো একাধিক। প্রায়ই নবীনকুমার রাত্রে স্বগৃহে ফেরে না। একবার যখন শুরু করেছে, তখন সে এর চূড়ান্ত না দেখে ছাড়বে না।

বাঘের সঙ্গে ফেউ-এর মতন রাইমোহন ঠিক তার সঙ্গে লেগে আছে। আরও বেশ কয়েকজন ইয়ার বক্সীও জুটেছে ; সদ্য বখামি ধরা ধনী যুবকদের কীভাবে উস্কানি দিতে হয়, সে ব্যাপারে তাদের পেশাদারী দক্ষতা আছে ; তারা নানাপ্রকারে নবীনকুমারকে নাচাতে লাগলো এবং প্রমোদ আসরটি এর পর আর শুধু মুলুকচাঁদের আখড়াতেই সীমাবদ্ধ রইলো না। রাইমোহন কিছুদিন রামকমল সিংহের মোসাহেবী করেছিল, এখন তাঁর পুত্রের মোসাহেব হতে যেন তার আরও বেশী উৎসাহ।

রাইমোহন একটা কথা বলে প্রায়ই নবীনকুমারকে খোঁচা দেয়। সে যতই বড়-মানুষী করুক, যতই নৃত্যগীতের সমঝদার হোক, এ শহরের সবচেয়ে নামকরা নর্তকীর নাচ তো সে এখনো দেখেনি ! কমলাসুন্দরীর নাম দেশশুদ্ধ সব মানুষ জানে, বয়েস একটু হয়েছে বটে, কিন্তু এখনো কী রূপ, এখনো

কী কোমরের ছন্দ !

একদিন রাইমোহনের চেষ্টার ফল ফললো। সেদিন বেশ গোলাপী গোছের নেশা হবার পর নবীনকুমার রাইমোহনকে বললো, যাও নিয়ে এসো সেই বেটীকে ; কত টাকা নেয় সে ? গাধার মুখের সামনে যেমুন গাঁজরের টোপ ধরে, তেমনি তার সামনে টাকার তোড়া তুলে ধরো গে !

রাইমোহন জিভ কেটে বললো, ওরে বাপ্‌রে বাপ ! তার কাচে টাকার গরমটি দেকাবার উপায় নেই কো ! সে এদানি কারুর বাড়িতে যায় না। তার কুঠীতে যেতে হয় নাচ দেকবার জন্যে। তাও সকলকে দেয় না। শুনিচি, স্বয়ং লক্‌নৌয়ের নবাব নাকি ডেকে পাটোছেলেন, ও মাগী যায়নি !

নবীনকুমার বললো, সে আসে না, কিসের তার এত দেমাক ? নাচুক কুঁদুক যাই করুক, বাজারে-অবিদ্যা ছাড়া তো আর কিচু নয় !

রাইমোহন বললো, তাকে আর পাঁচটা মেয়েমানুষের মতুন ভাববেন না। তা হলে কি আর এত করে নাম কচ্চি ! কালো কষ্টিপাথরে গড়া যেন একখানি প্রতিমা, বয়েসের ছোঁয়া তার গায়ে লাগে না ; কত রাজা-রাজড়া তাকে বাঁধা রাঁড় কত্তে হা-পিত্যেশী হয়েছেন, কিন্তু ভবী ভোলবার নয় ! দেকতে অমন সুন্দর হলে কী হবে, তার কতাগুলো বড় চ্যাটাঙে। আপনার নাম শুনলে বোধ করি আপনাকে ঢুকতেই দেবে না !

—কেন, আমার নাম শুনলে ঢুকতে দেবে না কেন ? আমি কি ব্রহ্মদৈত্যি না মাম্‌দো ভূত ?

—সে একটা গুঢ় কতা আচে। সে আপনাকে বলা যাবে না !

নবীনকুমার টলতে টলতে উঠে এসে রাইমোহনের কণ্ঠ চেপে ধরলো দু হাতে। গর্জন করে বললো, তুমি আমার কাচে কী নুকোচ্চো ? সব সময় তুমি আমার কাচে ঐ মেয়েমানুষটার নাম বলো কেন ? আবার কেনই বা বলচো আমার নাম শুনলে সে ঢুকতে দেবে না ?

রাইমোহন বললো, আগে সে মাগীর সঙ্গে আমার যথেষ্ট এয়ার্কি ছেল, আমি অনেকবার ওখেনে গতায়াত করিচি। এদানি আমি আপনার সঙ্গে মেলামেশা কচ্চি শুনে সে ক্ষ্যাপচুন্নি হয়ে আচে, আমায় আর ঢুকতে দেয় নাকো !

নবীনকুমার আরও কুপিত হয়ে বললো, আমায় সে চেনে ? আমি এর মধ্যে এত নামজাদা হয়ে পড়িচি !

অন্য একজন ফোঁড়ন দিল, এত কতার দরকার কী, সব্বাই মিলে একবার তার কাচে গেলে তো হয়, তা হলে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাবে'খন !

নবীনকুমার রাইমোহনকে ছেড়ে দিয়ে বললো, চলো ! এখুনি চলো !

সদলবলে হই হই করে বেরিয়ে পড়লো সকলে। কমলাসুন্দরীর গৃহ অদূরেই ; হেমপীরের গলির মধ্যে সেই উদ্যান সমন্বিত বারান্দাওয়ালা বাড়ি। নবীনকুমার এলো জুড়ি গাড়িতে, অন্যরা পায়ে হেঁটে। রাত প্রায় এগারোটা। কমলাসুন্দরীর বাড়িতে আজ কোনো আসর বসেনি, অধিকাংশ কক্ষই অন্ধকার, দেউড়ির লোহার গেট বন্ধ, সেখানে পাহারা দিচ্ছে দুজন দ্বারবান।

দ্বারবানরা জুড়ি দেখেই চিনতে পারলো। বিস্মিত মুখে গাড়ির দরজা খুলে দিল তারা। রাইমোহন তার ওপরে তড়পে বললো, ব্যাটারা হাঁ করে দেকচিস কী, চিনতে পারিসনি ? বড়বাবু রামকমল সিংহের একমাত্র ছেলে নবীনকুমার। দেউড়ি খোল !

দ্বিরুক্তি না করে গেট খুলে দিল দ্বারবানেরা। নবীনকুমারের বেশ বেসামাল অবস্থা, কোঁচার ওপরে পা পড়ে যাওয়ায় সে হুমড়ি খাচ্ছিল, রাইমোহন তাকে ধরলো। নবীনকুমারের চেতনাও প্রায় লোপ পাবার পথে, সে এর মধ্যেই ভুলে গেছে যে কোথায় এসেছে। সে জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, এটা কার বাড়ি ?

রাইমোহন রঙ্গ করে বললো, এই তো কমলাসুন্দরীর বাড়ি। এটা আপনার নিজের বাড়িও বলতে পারেন।

অন্য একজন ইয়ার বললো, তবে যে বাওয়া বলেছেলে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না ! আগেই তো জাঁক করে বাবুর নাম শোনালে ! চিচিং ফাঁকের মতন দোরও খুলে গেল !

রাইমোহন তার দিকে ঘাড় ঘুড়িয়ে বললো, চোপ্ ! তারপর নবীনকুমারকে বললো, আসুন ছোটবাবু, আসুন।

নবীনকুমার বললো, নাচ দেকবো না ? নাচ ?

—নিশ্চয় দেকবেন ? এসে পড়িচি যখন···আসুন, ওপরে আসুন।

দ্বিতলে সিঁড়ির মুখে দু-তিনটি যুবতী আলুথালু বেশে দাঁড়িয়েছে এসে, রাইমোহন জিজ্ঞেস করলো, কই, বিবিসাহেবা কোতায় ?

একটি মেয়ে বললো, এত রাতে তোমরা কে গা ? দ্বারোয়ান ব্যাটারা তোমাদের দোর খুলে দিলে ?

রাইমোহন ধমকে বললো, চুপ কর বেটী। জানিস কে এসেচে ? কার বাড়িতে তোরা আচিস, জানিস ? স্বয়ং বাড়ির মালিক এয়েচেন। কম্‌লী কোতায় ?

—সে তো দোর আটকে শুয়ে পড়েচে !

নবীনকুমার জড়িত স্বরে বললো, নাচ কোতায়, নাচ ? কে নাচবে ? গলা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল !

রাইমোহনের সঙ্গেই বোতল ছিল, নবীনকুমারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, ভিজ্যে নিন গলা, শুকো গলায় কী আর নাচ জমে ?

কমলাসুন্দরীর নিজস্ব কক্ষ কোন্‌টি তা রাইমোহনের অজানা নয়। সে দরজায় ধাক্কা দিয়ে রাইমোহন চেঁচিয়ে বললো, কম্‌লী, অ্যাই কম্‌লী, ওট্, দ্যাক কাকে এনিচি।

হল্লা শুনে কমলাসুন্দরী আগেই জেগে উঠেছিল, দ্বার খুললো সঙ্গে সঙ্গেই। তার অঙ্গে ইহুদী-আনা কিংখাপের লম্বা ঝোলা পোশাক, গলায় এক ছড়া সবুজ পান্নার মালা, চুল খোলা। রাইমোহন মিথ্যে বলেনি, কমলাসুন্দরীর রূপ এখনো আগেকার মতন নিটোল আছে, শুধু বয়েসের জন্য খানিকটা মেদ লেগেছে।

রাইমোহন সাড়ম্বরে বললো, ওরে কম্‌লী, শাঁক বাজা, আজ তোর কত ভাগ্যি ! বড়বাবুর ছেলে এয়েচেন, দ্যাক, পাদ্যার্ঘ্য দে !

কমলাসুন্দরী তখনও ঠিক বুঝতে পারেনি। ভুরু দুটো তুলে জিজ্ঞেস করলো, কাকে এনোচো ? কার ছেলে বললে ? বড়বাবু কে ?

—বড়বাবু আবার ক'জন রে, অ্যাঁ ? বড়বাবু একজনই হয়। তোর বড়বাবু, যিনি কোলে শুয়ে মল্লে তুই বেধবা হইচিলি ! তেনার ছেলে তোর পীরিতের জন্যে এসেচেন !

নবীনকুমার বললো, নাচ কোতায়, নাচ ? আমার যে ঘুম পেয়ে যাচ্ছে !

কমলাসুন্দরী সত্যিই প্রস্তরমূর্তির মতন নিস্পন্দ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই চক্ষে জল এসে গেল তার। রাইমোহনের দিকে চেয়ে বললো, হ্যাঁ গা, তোমার শরীলে কি মানুষের রক্ত নেই ? অনেক পাপ করিচি জীবনে, তা বলে আমায় এমন শাস্তি দেবে ?

রাইমোহন বললো, ডাঁড়া ডাঁড়া, এখুনি কী হয়েচে ! তোর পাপের সরা পূর্ণ হতে এখুনো ঢের বাকি আচে। চুল বাঁদ, পায়ে ঘুঙুর দে, বাবু তোর নাচ দেকবেন !

নবীনকুমার বললো, ধ্যাৎ ! আমার ঘুম পেয়ে যাচ্চে ! বিছানার ওপর কেউ নাচ দেকায় তো শুয়ে শুয়ে দেকি !

রাইমোহন হো হো করে হেসে উঠে বললো, বাঃ খাসা বলেচেন। বিছ্‌নার ওপর নাচ ! তাই দেকা কম্‌লী, ছোটবাবুকে তুই বিছ্‌নার ওপর নাচ দেকা, আমরা পাঁচপেঁচি লোক, আমরা বাইরে থাকবো।

কমলাসুন্দরী বললো, তোমার মুকে এবার আমি মুড়ো ঝ্যাঁটা ভাঙবো ! পাহারাওয়ালাকে দিয়ে তোমায় চাবকাবো !

নবীনকুমার সম্পূর্ণ আচ্ছন্নের মতন মাথা দোলাতে দোলাতে বললো, আমি যে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পাচ্ছি না, আমায় কেউ একটা বিছানা দাও।

কমলাসুন্দরী নিজেই এগিয়ে এসে নবীনকুমারের এক হাত ধরে বললো, আহা রে, সাত রাজার ধন এক মানিক, তার কি দশা করেচে এই পাষুণ্ডেরা ! বাবু, তুমি বাড়ি যাও। তোমাকে এখানে থাকতে নেই।

নবীনকুমার বললো, আমায় বিছানা দাও ! আমায় এরা বেশী খাইয়ে দিয়েচে।

কমলাসুন্দরী বললো, আহা রে ! তোমায় আমি দুধের ফেনার মতন নরম বিছ্না দিতে পারি, সারারাত তোমার মাতায় পাখার হাওয়া কত্তে পারি। কিন্তু তেমন ভাগ্যি করে যে আসিনি। এ পাপের জায়গায় থাকলে তোমার বদনাম হবে !

রাইমোহন বললো, যা যা বেটী, বেশী বকিসনি। ওকে তোর বিছ্নায় শুয়ে নাচ দেকা ! কী ছোটবাবু, বিছ্নায় শুয়ে এখুনো নাচ···বেশ ভালো লাগবে না ?

নবীনকুমার তার কথার প্রতিধ্বনি করে বললো, হ্যাঁ···বিছ্নায় শুয়ে···নাচ··· আমার দাও বিছ্না···

কমলাসুন্দরী বললো, ছি, বাবু, তোমায় অমন কতা বলতে নেই। আমি তোমার কে হই, তুমি জানো না ? আমি যে তোমার মায়ের মতন !

নবীনকুমার অতিকষ্টে চোখ খুলে বললো, কই ? যাঃ ! কে বললে তুমি আমার মায়ের মতন ! আমার মা ভগবতী ঠাকুরকে যেমন দেকতে সেইরকম।

কমলাসুন্দরী বললো, তা হোক, তবু আমিও তোমার মায়ের মতন। তোমার বাপ যে আমার কাচে আসতেন, আমায় তিনি দয়া কত্তেন !

রাইমোহন বললো, তাতে কী হয়েচে, বাপ বেটায় কী এক জায়গা থেকে সওদা করে না ? তুই দোকান খুলে বসিচিস, কখন বাপ এলো, কখন ছেলে এলো, অত হিসেবে তোর দরকার কী ?

কমলাসুন্দরী বললো, তোর মুকে পোকা পড়বে ! শেয়াল-কুকুরে তোমায় ছিঁড়ে খাবে !

রাইমোহন সে অভিশাপে ভ্রূক্ষেপ না করে চিবিয়ে-চিবিয়ে বললো, মা ! তোর বড় মা হবার শক, না রে কমলী ! কুলটা স্বৈরিণী, বাজারের মাগী ! তোর মতন বেশ্যারা কখুনো কারুর মা হয় না, ভগ্নী হয় না, কন্যা হয় না ! যে বেশ্যা সে বেশ্যাই, আর কিচু না। বেশ্যার সন্তান কখুনো ভদ্দরলোক হয় না। এখন ছোটবাবুকে ঘরে নিয়ে যা ! বিছ্নায় তোল ! চলুন ছোটবাবু।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কোতায় ? আমি কোতায় যাবো !

রাইমোহন বললো, বিছ্নায়। শুয়ে শুয়ে নাচ দেকবেন।

রাইমোহন পিছন থেকে সামান্য একটু ধাক্কা দিতেই নবীনকুমার টলতে টলতে এগিয়ে গেল। কমলাসুন্দরী দরজার কাছে দু' হাত ছড়িয়ে বললো, না, কিছুতেই না, ওগো তুমি এমন ভালো মানুষের ছেলের এমন সব্বোনাশ করো না—

রাইমোহন যেন প্রতিশোধস্পৃহায় একেবারে মেতে উঠেছে। রুক্ষভাবে কমলাসুন্দরীকে এক ধাক্কা দিয়ে বললো, সর ! দেকচিস না বাবুর কষ্ট হচ্চে ! বাবু তোর বিছ্নায় শোবেন।

নবীনকুমার বললো, আমি শোবো···ওগো আমায় শুতে দাও—

নবীনকুমারকে কমলাসুন্দরীর বুকের ওপর ঠেলে দিয়ে রাইমোহন দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজা টেনে বাইরে থেকে শিকলি তুলে দিল।

তারপর সে নাচতে লাগলো ধেই ধেই করে। সে কি প্রবল নাচ ! যেন কোনো রোগা, চিমসে ধরা বৃদ্ধ মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য। সেই সঙ্গে হাসি এবং হাততালি।

অন্য ইয়াররা যারা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল, তারা বললো, এ কি, মাতা খারাপ হয়ে গেল নাকি বুড়োটার ? অ্যাঁ ?

রাইমোহন নাচ থামিয়ে ফেললো অবিলম্বেই। এখনো তার কাজ ফুরোয়নি। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দৌড়ে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। এখন তাকে বিধুশেখরের বাড়ি যেতে হবে এত বড় একটা সংবাদ তাকে না জানালেই নয়। আর বিধুশেখর যদি এই রাত্রেই এসে স্বচক্ষে দেখে যেতে চান, তা হলে তো সোনায় সোহাগা !

ইব্রাহিমপুর পরগণার বিরাহিমপুর গঞ্জের নদীতীরে বাঁধানো ঘাটের হাতনায় বসে আছে একজন মানুষ। মানুষটি বেশ দীর্ঘ এবং বলিষ্ঠকায়, মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে, মুখে গুম্ফ-দাড়ির জঙ্গল, শরীরের বর্ণ তামাটে। লোকটির পরণে একটি ধুতি লুঙ্গির মতন ফেরতা দিয়ে বাঁধা, কোমর থেকে উর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ। শীতের প্রাতঃকাল, বাতাসে বেশ শিরশিরে ভাব, কিন্তু লোকটির সেদিকে কোনো হুঁসই নেই, সে একদৃষ্টে চেয়ে বসে আছে জলের দিকে।

লোকটিকে দেখলে কোনো সন্ন্যাসী বা দরবেশ বলে বোধ হয়, কিন্তু অপরের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্য তার কোনো প্রয়াস নেই। সে স্থাণুবৎ ঐ একই জায়গায় বসে আছে দীর্ঘ সময় ধরে, চক্ষু জলের দিকে নিবদ্ধ, যেন সে পাঠ করতে চায় নদীর তরঙ্গের ভাষা।

বিরাহিমপুরের গঞ্জ এক সময় ছিল প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে আশপাশের বিশ পঞ্চাশখানা গ্রাম থেকে মানুষজন আসতো এখানে সওদা করতে। কিন্তু বছর পাঁচেক ধরে সেই গঞ্জ ভেঙে গেছে, হাটখোলায় কতকগুলি চালা এখনো টিকে আছে, কিন্তু মানুষজন আর আসে না। নদীর পাড় ভাঙলে অনেক সময় গঞ্জ-বাজার স্থান বদল করে, কিন্তু এখানে নদী বেশ শান্ত, তবু অন্য গ্রামের লোক পারতপক্ষে বিরাহিমপুরে এখন পা দিতে চায় না। ভয় পায়।

ঘাটে কিছু কিছু নারী-পুরুষ স্নান করতে আসে। নদীর পাড়ের মানুষের তো নদীকে বাদ দিয়ে জীবন চলে না। তবু স্নানের চেয়ে বিশ্রম্ভালাপে আর বেশী সময় কাটায় না কেউ আগের মতন, রমণীরা কলসী নিয়ে জল ভরতে এসে বারবার জল ফেলে জল ভরে না, ত্রস্তে চলে যায়। এরকম সকাল থেকেই আসছে তারা, চকিত বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে দেখছে এই আগন্তুককে। কিন্তু লোকটির কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

বিরাহিমপুর পরগণাটি মুসলমান প্রধান, দু-চার ঘর হিন্দু পরিবারও রয়েছে। সকলেরই এখন ছন্নছাড়া দশা। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের কৌতূহলও বাড়তে লাগলো। একই স্থানে ঠায় বসে থাকা এই মানুষটি কে? গলায় রুদ্রাক্ষের মালা নেই, বাহুতে তাবিজ মাদুলি নেই, ললাটে চন্দন নেই, চুল চূড়া করে বাঁধা নয় বলে মুসলমানরা তাকে স্বজাতীয় কোনো ধর্মিষ্ঠ মানুষ বলে ধরে নেয়। কয়েকজন নিম্নস্বরে লোকটির বিষয়ে আলোচনা করে। শেষ পর্যন্ত দু-একজন এগিয়ে এসে বললো, ছালাম আলেকুম, ফকির ছায়েব! এহানে বেশীক্ষণ বসবেন না, আমাগো গেরামে আহেন।

লোকটি কয়েকবার ডাকাডাকির পর মুখ তুলে তাকালো। ভাষাহীন নিথর দৃষ্টি, শান্ত কিন্তু জোরালো। কোনো উত্তর দিল না। লোকগুলি বারংবার ঐ একই কথা বললো, তবু এই মানুষটির কোনো সাড়া নেই। আবার তার চক্ষু জলের দিকে নিবদ্ধ।

প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় মানুষটি একটি বিশাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো। মন্ত্রচালিতের মতন এগিয়ে গেল জলের দিকে। বুক জলে যাবার পর সে ডুব দিল। ঘাটে স্নানরত কয়েকজন নারী-পুরুষ সবিস্ময়ে দেখছে লোকটিকে, কিন্তু সে ডুব দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠলো না, বেশ সময় কেটে গেল, তবে কি সে আত্মঘাতী হলো? প্রায় নদীর মধ্যস্থলে ভুস্ করে জেগে উঠলো তার মাথা, ধীর, সাবলীলভাবে সন্তরণ করে আবার সে ফিরে এলো তীরে। তারপরও সে আর একটি বিস্ময়কর কাজ করলো, ঘাটের পাশ থেকে একটুখানি মাটি তুলে জিভে ঠেকালো। এতক্ষণে যেন শীত বোধ হলো তার শরীরে, প্রবল ঝাঁকুনি লাগলো তার সর্বাঙ্গে।

এবার সে নিজে থেকেই স্নানার্থীদের কাছে এগিয়ে এসে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, শেখ জামালুদ্দীনকে চেনো? তার বাড়িটা আমায় দেখিয়ে দিতে পারো?

লোকগুলি বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতাকি করলো। একজন জিজ্ঞেস করলো, কোন্ শ্যাখ জামালুদ্দীনের কথা কইত্যাছেন, ছায়েব? হে কেডা?

আগন্তুক আবার প্রশ্ন করলো, শেখ জামালুদ্দীন এ গেরামে থাকে না ? তোমরা তাকে চেনো না ?

চিনবে না কেন, সবাই চেনে। কিন্তু শেখ জামালুদ্দীন এমনই একজন অকিঞ্চিৎকর মানুষ যে তার সম্পর্কে বিদেশ থেকে আসা কোনো ব্যক্তি শুদ্ধ ভাষায় খোঁজ করবে, এ কথা বিশ্বাসই হয় না। শেখ জামালুদ্দীনের মতন লোকেদের নিজের পরিবারের বাইরে কোনো মূল্যই নেই। তবে কি এতদিন পর জামালুদ্দীনের নসীব বদলালো ? আল্লাতালার কাছ থেকে কোনো ফেরেস্তা এসেছেন তার সৌভাগ্যের দ্বার খুলে দেবার জন্য ?

তখন সকলে সেই আগন্তুককে নিয়ে চললো গ্রমের দিকে। খবর ছুটে গেল আরও দ্রুত। নদী-তীরের এক রহস্যময় পুরুষ এসেছে জামালুদ্দীনের সন্ধানে, গ্রামের ঘর বাড়ি থেকে অনেকে বাইরে বেরিয়ে পড়লো ওই লোকটিকে দেখবার জন্য। বলবান, নগ্নগাত্র পুরুষটি সিক্ত বসনে হেঁটে চলেছেন, চারদিকে দেখছেন মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। গ্রামের অনেকগুলি বাড়ি ভাঙা, অনেক গৃহ পরিত্যক্ত, কেমন যেন একটা শ্রীহীন ছন্দহীন ভাব। গোরুগুলি এত কৃশকায় যে ওদের দেখলেই ওদের মনিবদের অবস্থা টের পাওয়া যায়।

জামালুদ্দীন শেখ নিজের বাড়ির উঠোনে বসে নারকোল ছোবড়া দিয়ে দড়ি পাকাচ্ছিল, বাইরে মনুষ্যকণ্ঠের গোলযোগ শুনেই সে সব কিছু ফেলে দৌড়ে গোয়াল ঘরের পিছনে লুকোলো। লোকেরা তাকে ডাকতে লাগলো, জামাল ? এ জামাইল্লা, বাড়ায়ে আয়, দ্যাখ আইস্যা···। কয়েকজন হুড়মুড় করে ঢুকে গেল ভেতরে, এদিক ওদিক খুঁজে গোয়ালঘর থেকে টেনে নিয়ে এলো জামালকে। সে তখন ভয়ে শালিক পাখির মতন থরথর করে কাঁপছে।

জামালুদ্দীনের বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশী নয়, অতিশয় শীর্ণ চেহারা, বক্ষের পাঁজরা ক'খানা পরিষ্কার গোনা যায়, পরণে একটি নেংটি। সবচেয়ে বেশী দৈন্যের ছায়া তার তৈলাক্ত মুখখানিতে মাখানো। সে বোধ হয় জীবনে কখনো কারুর সামনে, এমনকি নিজের সন্তানের সামনেও একটিও অহংকারের বাক্য উচ্চারণ করতে পারেনি।

আগন্তুকটি জামালুদ্দীনকে দেখে যেন অত্যন্ত নিরাশ হলো। সবিস্ময়ে বললো, তুমি···তোমার নাম জামালুদ্দীন শেখ ?

জামালুদ্দীন হাত জোড় করে বললো, আইজ্ঞা হুজুর, মুই, জামালুদ্দীন শ্যাখ···ছায়েবগো হুকুইম কহনো অমাইন্য করি নাই।

আগন্তুক আবার বললো, তুমি সত্যি জামালুদ্দীন ? তোমার টানে আমি এসিচি।

জামালুদ্দীন বললো, আমার কিছু গোস্তাকি হইলে মাফ করবেন, হুজুর !

—তোমার বিবিকে ফিরে পেয়েচো ?

সবাই আবার তাজ্জব। বাইরের জগৎ থেকে একজন মানুষ এসে জামালুদ্দীনের পত্নীর কথা বলছে। ইনি জামালুদ্দীনের পত্নীকে ফিরিয়ে দেবেন, ইনি কি জাদুকর ?

জামালুদ্দীন বিড়বিড় করে বললো, আমার বিবিরে ফিরা পামু···ক্যামনে ?

—তোমার বউ হানিফাবিবিকে ওরা ধরে নিয়ে গেস্‌লো।

—আইজ্ঞা না, হুজুর, আমার বিবির নাম ফতিমা···গত সনে ইন্তেকাল হইয়ে গ্যাচে তার···তিনডা পোলাপানরে থুইয়া।

—ফতিমা ? তবে কি আমি নাম ভুলে গেচি ? আমার যতদূর মনে পড়ে···জামালুদ্দীন শেখ···তার অন্য রকম চেহারা···তার বিবির নাম হানিফা।

এবার একজন মাতব্বর গোছের বৃদ্ধ এগিয়ে এসে লুঙ্গির গিঁট ঠিক করতে করতে জিজ্ঞেস করলো, আপনে কার কথা জিগাইত্যাছেন ? জামালুদ্দীনের বিবির কথায় আপনের কাম কী ?

আগন্তুক কিছুক্ষণ মাটির দিকে নীরবে চেয়ে রইলো, তার ললাট কুঞ্চিত। একটুক্ষণ পর মুখ তুলে সে বললো, এই গ্রামে একজন জামালুদ্দীন শেখ ছিল না ? যার বউ হানিফা বিবিকে নীলকর সাহেবদের কুঠিতে জোর করে ধরে নিয়ে গেস্‌লো ?

এবার সকলে হই হই করে উঠলো। এ যে অনেক পুরোনো কথা। হ্যাঁ, মাক গরগর সাহেবের গোমস্তা গোলোক দাস হানিফা বিবিকে লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল বটে। তখন তাগড়া জোয়ান

জামালুদ্দীন শেখ কারুর নিষেধ না শুনে গোঁয়ারের মতন সাহেবদের কুঠিতে গিয়েছিল বিবির খোঁজ নিতে। তারপর থেকে কেউ আর তাদের খোঁজ জানে না। কেই বা তাদের কথা মনে রাখবে, তারপর আরও কত ঘটনা ঘটেছে এ গ্রামে। এই যে কাদের মিঞা, এক চক্ষু কানা, এর চক্ষুটা গেল গত শীতে, ডানকান সাহেব ঠিক এর ঐ চক্ষুটার ওপর সপাটে চাবুক কষিয়েছিলেন। এই যে মইনুদ্দিন সর্বক্ষণ পাগলের মতন বিড়বিড় করে, তারও তো এমন দশা হয়েছে মারের চোটে, আর তোরাব মিঞা, সে এখানে নেই অবশ্য, তার বিবিকেও ধরে নিয়ে গেছে সাহেবদের অনুচরেরা···তোরাব মিঞারও দেওয়ানা হবার মতন অবস্থা···।

অনেক লোকের চিৎকার হট্টগোলের মধ্যে আগন্তুক এই সব কথা শুনলো। সে ভুল জামালুদ্দীন শেখের কাছে এসেছে। এবার তাকে নিয়ে যাওয়া হলো নিরুদ্দিষ্ট জামালুদ্দীন শেখের বাড়িতে। সেখানে জামালুদ্দীনের বৃদ্ধ পিতা এখনো জীবিত, চোখে একেবারেই দেখতে পায় না। আগন্তুক সেই বৃদ্ধের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে শান্তভাবে বললো, আমি তোমার ছেলের সন্ধান করবো বলে কথা দিয়েছিলুম, তারপর আমার কী যেন মতিভ্রম হলো, সে কথা রাখিনি, কিন্তু সেই টানে আমি আবার ফিরে এসিচি।

বৃদ্ধ এই আগন্তুকের কথা প্রায় কিছুই বুঝতে পারলো না। তার হাত জড়িয়ে ধরে খুঁ খুঁ শব্দে কাঁদতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আগন্তুক এদিক ওদিক চাইতে লাগলো অস্থিরভাবে। যেন তার পরবর্তী কর্মটি কী হবে তা সে ঠিক করতে পারছে না।

এই সময় কিছু দূরে শোনা গেল হট্টগোল। গ্রাম্য পথ দিয়ে আসছে দুজন অশ্বারোহী, তাদের সামনে দিয়ে সভয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটছে কিছু ছেলেমেয়ে। এখানকার এরাও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো অশ্বারোহীদের দেখে। তারা আগন্তুকটিকে অনুরোধ করতে লাগলো কোনো বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে লুকোতে, কারণ সবল চেহারার মানুষ দেখলে নীলকররা অকারণে অত্যাচার করতে প্রলুব্ধ হয় কিংবা জোর করে মজুরি খাটাবার জন্য কুঠিতে ধরে নিয়ে যায়। আগন্তুক সে সব অনুরোধে কর্ণপাত করলো না, স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রইলো সেই একই জায়গায়।

অশ্বারোহী দুজনেই সাহেব, তাদের পেছনে পেছনে পদব্রজে আসছে নীলকুঠির গোমস্তা গোলক দাস এবং কয়েকজন লাঠিয়াল। তারা যে এই গ্রাম পরিদর্শনেই বেরিয়েছে তা নয়, কিছু দূরেই নদীতে চড়া পড়েছে এবং স্বভাবতই সে চর গেছে সাহেবদের দখলে, সেই চরে যেতে হলে এই গ্রামের মধ্য দিয়ে গেলে পথ কম হয়। তা ছাড়া, মাঝে মাঝে সাহেবদের চেহারা দেখিয়ে গ্রামবাসীদের ভয় পাওয়ানো দরকার।

ভিড়ের অনেকেই ছুটে গিয়ে লুকোলো, দু-চারজন বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে রইলো আগন্তুকের পাশে। সাহেব দুজন পরস্পর কথাবার্তায় মগ্ন, গ্রামের লোকের দিকে ভ্রূক্ষেপও করছে না। কিন্তু গোলক দাসের তীক্ষ্ণ চোখ ঠিক পড়লো এদিকে। থমকে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, এ বেটা আবার কেডা রে? এডারে তো আগে দেহি নাই!

একজন বৃদ্ধ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললো, হুজুর, এ আমার ফুফাতো ভাই। ভেন্ন গেরামে থাকে।

গোলক দাস লোকটির আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে বললো, হুঁ, চ্যাহারাখান তো দেহি ষণ্ডার মতন, ডাকাইতি করে নাকি? এই, তোর নাম কী?

আগন্তুক কোনো উত্তর দিল না।

সেই বৃদ্ধটি আবার বললো, হুজুর, অর মাথার ঠিক নাই, বায়ু রোগ হইছে, পাকিমুড়া গেরামে মোর ফুফার বাড়িতে···

গোলক দাস একটুক্ষণ দ্বিধা করলো। তারপর মনস্থির করে পেছনের লাঠিয়ালদের উদ্দেশে বললো, ল, ল, দৌড়াইয়া আগা—।

ভয়-দেখানো দলটি চলে যাবার পর উপযাচক উপকারী বৃদ্ধটি বললো, বড় বাঁচা বাঁইচ্যা গ্যালেন, ছায়েব! এবার কন্ তো আপনি কেডা, কোন্ দ্যাশ থনে আইছেন?

—আমি গঙ্গানারায়ণ সিংহ।

এই নাম গ্রামবাসীদের মধ্যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো না। সাধারণ প্রজারা জমিদারের নাম মনে রাখে না, বা সে ব্যাপারে মাথাও ঘামায় না। তারা জমিদারকে চেনে জমিদারের কর্মচারীদের দিয়ে। কর্মচারীরা যাকে খাতির করে নিয়ে আসে সে-ই জমিদার। জমিদার বদলায় কিন্তু কর্মচারীরা

তো বদলায় না। তা ছাড়া জমিদারের সঙ্গে এ গ্রামের সম্পর্কও নেই অনেকদিন। তাদের জমিদার তাদের বিপদের সময় নীলকর সাহেবদের দিকে ঠেলে দিয়ে দূরে সরে গেছে।

তবে হিন্দু নাম শুনে অনেকের মধ্যে নতুনভাবে বিস্ময়ের সঞ্চার হলো। দু'একজন বৃদ্ধ সিংহ পদবীটিতে জমিদারী গন্ধ পেল কিছুটা, কিন্তু এই নগ্নদেহ, উন্মাদের মতন চেহারার মানুষটিকে জমিদার পরিবারের একজন মনে করার মতন স্মৃতি অতদূর প্রসারিত হলো না।

গঙ্গানারায়ণ আপনমনে বললো, আমি থাকবো এখেনে...আমি কোতায় থাকবো ? তোমরা আমায় থাকতে দেবে ? আমি তৃষ্ণার্ত, তোমরা কেউ একটু জল খাওয়াবে আমায় ?

একজন বললো, আপনে হেঁদু, আপনে আমাগো মইধ্যে থাকবেন ক্যামনে ? হেঁদু পাড়ায় যান গিয়া।

আর একজন বললো, আপনে পলান এহান থিকা, আপনে বিপদে পড়বেন !

গঙ্গানারায়ণ তখনও চিন্তিত। অন্যদের কথা ভালোভাবে শুনছে না। ললাট কুঞ্চিত করে বললো, এখেনে আমাদের কে যেন থাকতো ? কী যেন নাম ! ও, ভুজঙ্গ, সে আচে এখনো ?

অনেকেই ভুজঙ্গকে চেনে। বছর পাঁচেক আগে জমিদারী আমলে সেই-তো আসতো খাজনা আদায় করতে। তারা হই-হই করে উঠলো। হ্যাঁ, আছে। ভুজঙ্গ নায়েব এখনো আছে কুটিবাড়িতে।

এবার গ্রামবাসীরা গঙ্গানারায়ণকে নিয়ে চলো কুঠিবাড়ির দিকে।

কুঠিবাড়িটি গ্রামের এক প্রান্তে। এক সময়ে এখানে বেশ কয়েকজন কর্মচারী ছিল, জমিদাররা মহাল পরিদর্শনে এলে এখানে দু-একদিন অবস্থান করতেন। এখন জমিদারী কাজকর্ম এ অঞ্চলে কিছুই নেই, কুঠিবাড়িটি টিঁকে আছে কোনোক্রমে, বেতনভুক কর্মচারীর সংখ্যা চারজনে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন কুঠি ছেড়ে নিজ গ্রামেই বসবাস করছে। ভুজঙ্গ নায়েব অবশ্য কুঠিবাড়িতেই মৌরসীপাট্টা গেড়ে আছে, তার ধারণা জমিদাররা এ অঞ্চলে আর কোনোদিন আসবে না, কুঠি সংলগ্ন বিষয়-সম্পত্তি তারই ভোগে লাগবে। নীলকররাও এদিকের সমস্ত জমিই কুক্ষিগত করলেও জমিদারী কুঠিতে হস্তক্ষেপ করেনি।

অনেকদিন বাদে প্রজাদের দল বেঁধে এদিকে আসতে দেখে ভুজঙ্গ নায়েব বিস্মিত হয়ে বেরিয়ে এলো। দৈর্ঘ্য কিছু কম হলেও তার শরীরটি সুগঠিত, ডান বাহুতে একটি বড় রূপোর তাগা বাঁধা, ওষ্ঠের ওপর পাকানো গুম্ফ। লাল পেড়ে ধুতির খুঁট গায়ে জড়ানো, গলায় মালার মতন ভাঁজ করা মোটা সাদা ধপধপে উপবীত। ভুজঙ্গ তন্ত্রসাধনা করে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাকে তান্ত্রিক হিসেবেও সমীহ করে খানিকটা।

ভিড় ছেড়ে এগিয়ে এসে গঙ্গানারায়ণ বল্লো, কেমন আচো, ভুজঙ্গ ? আমি আবার ফিরে এসিচি।

ভুজঙ্গ চক্ষু সরু করে একটুক্ষণ চেয়ে রইলো এই লোকটির দিকে। তারপর ওষ্ঠের কোণে অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়ে বল্লো, তুই কেডা ? ফিরা আইছস মানে ? ব্রেহ্মদৈত্যি নাকি ? তা দিনের বেলা কী মনে কইর‍্যা ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, তুমি আমায় চিনতে পারচো না ? আমি তোমার মনিব।

ভুজঙ্গ বললো, আমার মনিব ? হেঃ, হে-হে-হে-হে ! দিনের বেলা এক বেহ্মদত্যি আইস্যা কয় কি না আমার মনিব।

প্রজাদের দিকে ফিরে সে ধমক দিয়ে বললো, ব্যাটারা কোন্ পাগলা-ছাগলারে ধইরা আনছস ! অ্যাঁ ? খেলা পাইছস ?

গঙ্গানারায়ণ এক পা এগিয়ে এসে বললো, ভুজঙ্গ, তোমার মনে নেই ? আমি গঙ্গানারায়ণ সিংহ। এক রাত্রে বোট থেকে হটাৎ চলে গিসলুম, আমার মতিভ্রম হয়েছিল—

ভুজঙ্গ এবার হাত জোড় করে বললো,হুজুর, আমার মাথাডা গরম করাইবেন না। এই চাষাভূষারা জানে, আমি একবার ক্ষ্যাপলে বড় সাংঘাতিক। এ পইর্যন্ত পাঁচ ছয়জন আইসা কইছে, মুই গঙ্গানারায়াইন, তোমাগো মনিব ! হেঃ ! হে-হে-হে ! আরে, হারামজাদা কোঁৎকা খাইতে না চাস তো আহনো পলা !

গঙ্গানারায়ণ হাসলো। মুখের জঙ্গল ভেদ করে দেখা গেল তার ধবল দন্তপঙক্তি। মৃদু স্বরে সে বললো, অনেক দিন হয়ে গ্যাচে, চিনতে না পারারই কথা। আমি নিজেই তো তোমায় দেকে ঠিক

চিনতে পারিনি, ভুজঙ্গ। তোমার চুলে পাক ধরেচে। কুঠিবাড়ির পাশে এমন জঙ্গলও আগে দেকিনি! একটা কামরা সাফসুতরো করো, আমি এখন এখেনে থাকবো।

—থাকবে? এটা কি তোমার বাপের জমিদারি?

—আমার বাপের জমিদারিই বটে! আমার না হোক, আমার বাপের তো নিশ্চয়ই। আমি রামকমল সিংহের পুত্র গঙ্গানারায়ণ!

—তুমি যদি রামকমল সিংহের ছেলে হও, তা হলে আমি নবাব সিরাজদৌল্লার নাতি! যত সব! গঙ্গানারায়ণ সিংহী মইরা ভূত হইয়া গ্যাছে কবে! তেনার ছেরাদ্দ-শান্তি পইর্যন্ত হইয়া গ্যাছে।

—আমি মরে যাইনি, ভুজঙ্গ। সন্ন্যাসী হয়ে গিসলাম। কেন মিচিমিচি সময়ের অপচয় কর্চো!

—এ যে দেহি জাল পরতাপ চান্দের মামলা। তুমি যদি গঙ্গানারায়ণ হও, তা হলে এহানে ক্যান, কইলকাতায় যাও, সিংহ পরিবারের সঙ্গে মামলামোকদ্দমা লড়ো? সেহানে গিয়া নিজের জমিদারির হিস্যা বুইঝ্যা লও, আমি কী করুম!

—মামলা-মোকদ্দমা লড়বার দরকার হবে না। আমার মা বেঁচে আছেন আশা করি, তাঁকে খবর পাঠাতে হবে একটা।

ভুজঙ্গ আরও কিছুক্ষণ ধরে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলো। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে গঙ্গানারায়ণ বললো একজন পরামানিক ডেকে আনতে। প্রজারা এতক্ষণ গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে এই নাট্যকৌতুক উপভোগ করছিল। তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে এমন আমোদ সহসা আসে না। তারাই কয়েকজন ছুটে গিয়ে হিন্দুপাড়া থেকে ধরে আনলো একজন পরামানিক।

কুঠির সামনে একটি বকুল গাছের নিচে মাটিতেই জোড়াসন করে বসলো গঙ্গানারায়ণ। পরামানিকের কাঁচিতে তার পাঁচ বৎসরের বর্ধিত কেশ, গুম্ফ ও শ্মশ্রু খসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো প্রজারা। এই চেহারা আর কোনোক্রমেই চিনতে ভুল হবার কথা নয়। এই গঙ্গানারায়ণকে তারা শুধু যে আগে দেখেছে তা নয়, ভূতপূর্ব জমিদার রামকমল সিংহের সঙ্গেও এর মুখের যথেষ্ট আদল আছে।

ভুজঙ্গ নায়েবেরও আর বাক্যস্ফূর্তি হলো না। গঙ্গানারায়ণ উঠে দাঁড়াতেই সে হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো তার সামনেই। নিতান্ত ব্রাহ্মণ বলেই সে জমিদারের পদধূলি গ্রহণ করলো না।

এই গঙ্গানারায়ণকে দেখে সকলে নির্ভুলভাবে চিনতে পারলেও আগেকার গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে অমিলও অনেক। সেই লাজুক, অন্তর্মুখী, নমনীয় শরীরের যুবকটি আর নেই। এখন সে মানুষের চোখের দিকে স্পষ্টভাবে তাকাতে পারে, তার কণ্ঠস্বর গভীর ও ভরাট, তার নীরবতার মধ্যেও অস্থিরতার চিহ্নমাত্র নেই।

ধীর পায়ে হেঁটে সে এগিয়ে গেল কুঠিবাড়ির দিকে।

জলে ঝাঁপিয়ে পড়েও বিন্দুবাসিনীর আর নাগাল পায়নি গঙ্গানারায়ণ। তখন সে নিজেও বিশেষ সন্তরণ পটু ছিল না, রাত্রির অন্ধকারে মধ্য গঙ্গায় এক নিমজ্জিতাকে উদ্ধার করার সাধ্যও ছিল না তার। বিন্দু হারিয়ে গেল এবং সে নিজে যে কী প্রকারে বেঁচে গেল, তা সে আজও জানে না। জলে পড়ার একটু ক্ষণের মধ্যেই সে চেতনা হারিয়েছিল, জ্ঞান হবার পর দেখলো সে নদীর ধারে কর্দমাক্ত এক ঝোপের মধ্যে শুয়ে আছে। জীবন ধারণের বাসনা আর ছিল না গঙ্গানারায়ণের, কিন্তু মৃত্যুর দেবতা তাকে কৃপা করেনি।

এর পর বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছে সে। বারানসীতেও কিছুদিন আত্মগোপন করে ছিল, তারপর সে

অগ্রসর হয়েছে গঙ্গাতীর ধরে দক্ষিণের দিকে। পাটনা পর্যন্ত এসে সে আবার গতি পরিবর্তন করেছিল, বাংলাদেশে ফিরতে তার একটুও ইচ্ছে হয়নি। সে মুখ ফিরিয়েছে উত্তর ভারতের দিকে। হরিদ্বার-লছমনঝোলা পেরিয়ে সে গঙ্গোত্রী পর্যন্তও গিয়েছিল। তখন তার মনে হয়েছিল, হিমালয়ের ক্রোড়েই বাকি জীবনটা সে কাটিয়ে দেবে।

বিস্ময়ের কথা এই যে বিন্দুবাসিনী সম্পর্কে সে আর তেমন শোক ব্যথা অনুভব করেনি। বারানসীতে বিন্দুবাসিনীকে দেখার আগে পর্যন্ত যে তীব্র ব্যাকুলতা বোধ ছিল, পরবর্তী কালে তা কোথায় হারিয়ে গেল। জলের অতলে বিন্দুবাসিনীর মৃত্যু যেন তার জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। লছমনঝোলা-গঙ্গোত্রী, যেখানে পাহাড় ও আকাশের মতন বিশালদের রাজত্ব, সেখানে আর অন্য ক্ষুদ্র কথা মনে স্থান পায় না।

কিছুদিনের জন্য গেরুয়া ধারণ করেছিল গঙ্গানারায়ণ। এই দেশে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হয় না। নদীতীরে চুপ করে বসে থাকলেও কেউ না কেউ এসে কিছু দিয়ে যায়। হরিদ্বারে বড় বড় সাধুদের আখড়া আছে, সেখানে ভিড়ে গেলে কেউ কোনো প্রশ্ন করে না। ডাল-পুরী ভোজের সময় অনায়াসে বসে পড়া যায় এক ধারে। কয়েক বৎসর সে তার মনকে যেন ছুটি দিয়ে শুধু শরীর নিয়ে বেঁচে ছিল। তখন গঙ্গানারায়ণকে দেখা যেত হৃষীকেশে পূর্ণবিতার বাবার আখড়ায় প্রতি সন্ধেবেলা অন্যান্য চেলাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভজন গান গাইছে।

কিন্তু মনের ঘুম এক সময় ভাঙবেই। জাগ্রত অবস্থায় না হোক স্বপ্নে। মানুষ অভ্যেসের দাস হতে হতেও একদিন হঠাৎ শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে গতানুগতিকতার বন্ধন। সুমহান প্রকৃতিও এক সময় আকর্ষণহীন হয়ে যেতে পারে। গঙ্গানারায়ণও একদিন শরীরে সেই রকম চাঞ্চল্য বোধ করলো। নিজেকেই নিজে এক সময় সে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল, তারপর থেকে দেব-দ্বিজের প্রতি সে আর কিছুতেই ভক্তিমান হতে পারে না। হিমালয়ের অধিকাংশ সাধুকেই তার আচারসর্বস্ব, উদ্দেশ্যহীন মানুষ বলে মনে হয়। প্রায়ই আখড়াগুলিতে ধুমধাম করে নানারকম যজ্ঞ হয়, তাতে অনেক ঘি পোড়ে, গঙ্গানারায়ণের কাছে এ সবই নিছক শিশু-ক্রীড়ার মতন। বিশাল চেহারার এক-একজন সাধু যেন এক-একটি শিশু, তবু শিশুর সাহচর্যই বা পূর্ণবয়স্ক মানুষের কতক্ষণ ভালো লাগে? নিরাকার, নির্বিকল্প ঈশ্বরের উপলব্ধিই যদি মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তার জন্য পাহাড় কন্দরে কৃচ্ছ্রসাধনের তো কোনো প্রয়োজন নেই।

একদিন গঙ্গানারায়ণ পাহাড় ছেড়ে আবার সমতলে ফিরে আসা মনস্থ করলো। কিন্তু কোথায় ফিরবে? এতগুলি বৎসর পর সে আবার কলকাতায় ফিরে যাবে কোন্ মুখে? জননী বিম্ববতীর সামনে অকস্মাৎ উপস্থিত হয়ে নাটকীয় ভাবে বলবে, মা, আমি এসেছি। বিম্ববতী এখনো জীবিত আছেন কিনা তারই বা ঠিক কী! বরং যেখান থেকে সে ছেদ টেনেছিল সেখান থেকেই আবার শুরু করা যেতে পারে।

হৃষীকেশে পূর্ণবিতার বাবার আশ্রমে থাকার কালে সে পর পর দু রাত্রি একই স্বপ্ন দেখেছিল। একজন দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ মুসলমান হাপুস নয়নে কাঁদছে, আর গঙ্গানারায়ণ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে যে আমি তোমার পুত্রের সন্ধান পাওয়ার জন্য সব রকম চেষ্টা করবো। এরূপ স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙার পর গঙ্গানারায়ণ খুব অবসন্ন বোধ করে। তার জীবনের ঐ পর্বটির স্মৃতি তার কাছে খুবই আবছা। এক মধ্য নিশীথে সে বজরা থেকে নেমে স্বপ্নচালিতের মতন এক দল তীর্থযাত্রীর সঙ্গ নিয়েছিল, ঠিক যেন ঘোরের দশা তখন তার। সেই ঘোর ভেঙেছিল প্রয়াগ তীর্থে এসে স্নান করার পর।

সে এক বৃদ্ধের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে প্রতিশ্রুতি পালন করেনি, স্বপ্নলব্ধ এই বোধ তাকে পীড়া দেয়। তার মনে পড়ে ইব্রাহিমপুরের কথা। যেন তার বজরা এখনো সেখানকার ঘাটে বাঁধা আছে তার অপেক্ষায়। সে আবার সেখানে ফিরে গেলেই নতুন করে আবার সব কিছু শুরু করা যাবে। গঙ্গানারায়ণ তাই ইব্রাহিমপুর ফিরে আসে।

কুঠিবাড়িতে আশ্রয় নেবার পর গঙ্গানারায়ণ দেশের বর্তমান অবস্থা বুঝে নেবার চেষ্টা করলো। ইতিমধ্যে যে সিপাহী বিদ্রোহের মতন একটা এতবড় ঘটনা ঘটে গেছে, তাও সে জানে না। কোম্পানির রাজত্ব শেষ, এখন চলছে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন। ভুজঙ্গ ভট্টাচার্য বহুদর্শী লোক, অনেক কিছুর

খবরাখবর রাখে। সে ইতিমধ্যেই গঙ্গানারায়ণের আগমনবার্তা জানিয়ে একজন বিশ্বাসী লোক মারফত পত্র পাঠিয়েছে কলকাতায় বাবুদের কাছে। গঙ্গানারায়ণের সে খাতির যত্নও করছে যথেষ্ট।

গঙ্গানারায়ণ দেখলো, এই এলাকায় তাদের জমিদারি কাজকর্ম আর কিছুই নেই এখন। সব জমিই সাহেবদের কাছে ইজারা দেওয়া। তাদের নিজস্ব যে কিছু খাস জমি ছিল, সেখানে আখের চাষ দেওয়া হতো এবং কয়েকজন চায়নাম্যান সেখানে খুলেছিল একটা চিনি কল। সে সব কিছুরই অস্তিত্ব নেই আর। আখের জমিতেও নীল চাষ হয়, চায়নাম্যানরা পালিয়েছে, চিনির কল তছনছ করে দিয়েছে কেউ। অথচ এক সময় ইব্রাহিমপুর পরগণাটি ছিল সিংহদের এস্টেটের প্রায় একটি সোনার খনি। এখন এর সবই নীলকরদের খপ্পরে।

নীলকর সাহেবরা যে সম্প্রতি কী করালরূপ ধারণ করেছে, সে খবরও ভুজঙ্গ ভট্টাচার্য শোনায় তাকে। পোশাক রঞ্জিত করার জন্য ইওরোপের বাজারে নীলের খুব চাহিদা, আর বাংলাদেশের নীল অতি উৎকৃষ্ট ধরনের, তাই এর চাহিদাও বেশী। নীল চাষ করে চাষী যদি ন্যায্য দাম পায় তা হলে অন্য চাষের চেয়ে সেটা তার পক্ষে লাভজনকই হবে। সেইজন্যই রামমোহন-দ্বারকানাথের মতন মানুষও মনে করেছিলেন, নীল চাষ বাংলার চাষীদের উন্নতির সহায়ক হবে। কিছু কিছু জমিদারও নিজ জমিদারিতে নীল চাষে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এই লাভজনক ব্যবসা অবিলম্বেই কুক্ষিগত করে নিল সাহেবরা এবং লাভের নেশায় উন্মত্ত হয়ে তারা পিঁপড়ের পেট টিপে মধু বার করতেও জানে। কয়েক দশকের মধ্যেই চাষীদের শোষণ করতে করতে একেবারে ছিবড়েতে পরিণত করেছে তারা। সব চাষীই নীলকরদের কাছে ঋণজালে আবদ্ধ এবং বছরের পর বছর সেই ঋণের বোঝা বাড়ছে। চাষীর জমিতে উৎপাদন যতই হোক, তাতে তার লাভ কিছুই নেই। নীলের বদলে ধান চাষ করলে চাষী তবু অন্তত সম্বৎসরের খোরাকী পায়, কিন্তু তার উপায় নেই, সাহেবদের অত্যাচারে তারা শুধু নীল চাষ করতেই বাধ্য। ব্যাপার এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে কোনো কোনো চাষী মরীয়া হয়ে চাষ করাই বন্ধ করে দিয়েছে এ বৎসর। চাষ করলেও অনাহার, না করলেও অনাহার, দুটোই যখন সমান, তখন চাষ না করাই তো ভালো। বর্তমানে অবস্থা সেইজন্য থমথমে।

গঙ্গানারায়ণ প্রতিদিনই একবার করে নিকটস্থ গ্রামগুলিতে পদব্রজে বেড়াতে যায়। ভুজঙ্গ ভট্টাচার্য এটা পছন্দ করে না মোটেই। সে বরং গঙ্গানারায়ণকে পরামর্শ দেয় কলকাতায় চলে যাবার জন্য। তার ধারণা, খুব শীঘ্রই গ্রামদেশে একটা ব্যাপক গোলযোগ শুরু হবে, সুতরাং এখন এখান থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। গঙ্গানারায়ণ অবশ্য এ পরামর্শে কর্ণপাত করে না, এমন কি ভুজঙ্গ ভট্টাচার্য তার সঙ্গে দু-একজন রক্ষী দেবার প্রস্তাব করলেও সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। জমিদারি চাল-চলনে সে অনেকদিন অভ্যস্ত নয়, সে-জীবনের প্রতি আর কোনো মোহও তার নেই। একবার যে মুক্ত জীবনের স্বাদ পেয়েছে সে আর কোনো রকম পোশাকী বন্ধনই মেনে নিতে চাইবে না। এখন সে স্বচ্ছন্দে নগ্ন পায়ে চলাফেরা করে, শুধু ধুতি পরিধান করে খালি গায়ে বাইরে বেরুতেও সে লোক-লজ্জা অনুভব করে না। ভুজঙ্গর অনেক পীড়াপীড়িতে সে গায়ে একটি উত্তরীয় জড়াতে সম্মত হয়েছে, কিন্তু জুতো আর পায়ে দেয় না।

গঙ্গানারায়ণ নিজে আর জমিদার বলে পরিচয় দিতে না চাইলেও গ্রামবাসীদের চক্ষে সে জমিদার। তার চমকপ্রদ প্রত্যাবর্তনের কাহিনী কাছাকাছি অনেকগুলি গ্রামে রটে গেছে, লোকের মুখে মুখে কাহিনী আরও পল্লবিত হয়। সাধারণ চাষী গৃহস্থেরা তার দিকে সম্ভ্রম ও ভয়ের দৃষ্টিতে তাকায়। চোখাচোখি হলে সেলাম জানায়। কেউ তার কাছে অন্তর খোলে না।

কয়েকদিন গঙ্গানারায়ণ এরকম গ্রামে ঘোরাঘুরি করার পর বৃদ্ধের দল তাকে সানুনয় অনুরোধ করলো আর তাকে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ না করতে। তার জন্য নিরীহ লোকরা বিপদে পড়তে পারে। পাশের গ্রামের নবীনমাধব নামে এক দৃঢ়চেতা যুবক এবং এ গ্রামের মহম্মদ রেজা খাঁ নামে এক বর্ধিষ্ণু চাষী নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সদরে মামলা দায়ের করেছিল। তার ফলে সাহেবরা একেবারে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে আছে। মামলায় দুজনেই যদিও পরাজিত হয়েছে, তবু সাহেবদের ধারণা কেউ একজন এসব ব্যাপারে গ্রামের লোকদের প্ররোচনা দিচ্ছে। এবং গঙ্গানারায়ণের মতন একজন ব্যক্তিকে ঘোরাফেরা করতে দেখলে সাহেবদের সন্দেহ হবেই।

বিপদ সত্যিই একদিন এলো।

বিরাহিমপুর কুঠিতেই একদিন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার একটি সংখ্যা হঠাৎ হাতে এলো গঙ্গানারায়ণের। আদ্যোপান্ত পত্রিকাটি পড়ে সে চমৎকৃত হলো, এ পত্রিকার প্রতি লাইনই যে

অগ্নিক্ষরা। সম্পাদকের নাম একজন কে হরিশ মুখার্জি, গঙ্গানারায়ণ তাকে চিনতে পারলো না। এমন চোস্ত ইংরেজি লেখে, নিশ্চয়ই হিন্দু কলেজের কোনো কৃতবিদ্য ছাত্রই হবে, কিন্তু হিন্দু কলেজের এ নামের কোনো ছাত্রের কথা গঙ্গানারায়ণের স্মরণে আসে না। পত্রিকার নাম 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কিন্তু মুসলমান চাষীদের সমস্যার কথাও সবিস্তারে লিখেছে।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পড়েই গঙ্গানারায়ণ বারাসতের হাকিমের হুকুমনামার কথা জানতে পারলো। সরকার নীল চাষীদের প্রাণান্তকর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে এবং নীলকর ব্যবসায়ীদের জোর জুলুম নীতির জন্য উদ্বিগ্ন। বারাসতের হাকিম সেইজন্যই তাঁর এলাকার থানার দারোগাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যে চাষীর নিজস্ব জমি আছে, সে তার জমিতে তার খুশীমতন ফসল চাষ করতে পারে। জবরদস্তি করে তার জমিতে যদি নীল চাষ করাতে যায় কেউ, তা হলে পুলিস তা প্রতিরোধ করবে।

এ সংবাদ পড়ে গঙ্গানারায়ণ যথার্থ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। হানিফা বিবি এবং তার স্বামী জামালুদ্দীন শেখকে সে ফিরিয়ে আনতে পারেনি বটে কিন্তু হানিফা বিবি কিংবা জামালুদ্দীন শেখের মতন আর কেউ যাতে নীলকুঠিতে গিয়ে গুম খুন না হয়, সে ব্যবস্থা সে করতে পারে। তা ছাড়া পুলিসের সাহায্য যদি চাষীরা পায় তা হলে নীল-ফসলের বদলে বাংলার মাঠ আবার সোনার ধানে ভরে যাবে।

গঙ্গানারায়ণের প্রথমেই মনে হলো, গ্রামে গিয়ে চাষীদের সে সঙ্ঘবদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানাবে। সবাই মিলে এককাট্টা হয়ে যদি নীল চাষ অস্বীকার করে তা হলে মুষ্টিমেয় নীলকর সাহেবরা কী করবে? বারাসতের চাষীরা যদি নীল চাষে বিরত হতে পারে তা হলে নদীয়াতেই বা পারবে না কেন?

পরে সে মাথা ঠাণ্ডা করে আরও কিছুক্ষণ ভাবে। এখনই নিরীহ, নির্জীব চাষীদের উস্কানি দিয়ে কোনো ঝঞ্ঝাটের মধ্যে টেনে আনা ঠিক হবে না। আগে প্রস্তুতি দরকার। সবচেয়ে নিকটবর্তী থানাই এখান থেকে দশ মাইল দূরে। গঙ্গানারায়ণ নিজে যাবে সেখানে। তার আগে এই এলাকার চাষীদের মনোভাব যাচাই করে নিতে হবে। চাষীরা যদি একযোগে নীল চাষে অস্বীকার করতে রাজি থাকে, তা হলে পুলিস-সেপাইদের উপস্থিতিতে তারা একই দিনে সকলের জমিতে মই দেবে।

পরদিন সকালে এক বাটি দুধ ও কিছু ফলাহার করে গঙ্গানারায়ণ গেল গ্রামের দিকে। ছোট একটি ডোবার পাশে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। পরনে ডোরাকাটা লুঙ্গি, তার বক্ষটি এমনই লোমশ যে আর কোনো পোশাকের দরকার হয় না। চোখের দৃষ্টিতে একটা পাগল পাগল ভাব। লোকটির নাম তোরাপ। এর শরীরের গড়ন দেখলে মনে হয় যে এককালে সে বেশ বলশালী পুরুষ ছিল, এখন খাঁচাখানি মাত্রই সার। লোকটিকে গঙ্গানারায়ণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছে একটি কারণে। অন্য গ্রামবাসীরা তাকে দেখলেই 'বাবু ছালাম' বলে সম্বোধন করে কপালে হাত তোলে, কিন্তু এই লোকটি কোনোদিন তাকে সেলাম জানায়নি, বরং গঙ্গানারায়ণের চোখের দিকে চোখ পড়লেই সে উল্টো দিকে ঘুরে যায়।

আজ গঙ্গানারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এগিয়ে এলো তোরাপের দিকে। সে-ও অমনি পিছন ফিরে দাঁড়ালো এবং উৎকট গলায়, যেন অশ্বত্থ বৃক্ষটিকেই উদ্দেশ করে একটি গান ধরলো।

গঙ্গানারায়ণ গানটির কথার ঠিক মর্ম বুঝতে পারলো না। অনেকটা যেন এই রকম:

ব্যাবালচোকো হাঁদা হেমদো
নীলকুটির নীল মেমদো!

এই দুটি লাইনই সে গাইতে লাগলো বারবার। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই গান শুনে তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বললো, কী মিঞা, কী গান গাইচো। ইদিকে ফিরে একটু ভালো করে গাও না, শুনি।

তোরাপ একটুখানি পাশ ফিরে ত্যারছা ভাবে দেখলো গঙ্গানারায়ণকে। তারপর বক্রস্বরে বললো, আমি পাগ্‌লা ছাগ্‌লা মনিষ্যি, আমি কী গান জানি! গান শোনবেন তো বেগুনবেড়েতে ঝান না ক্যান!

অপরকে প্রসন্ন করার জন্য মানুষ যেমন কণ্ঠস্বরে একটা কৃত্রিম অতিরিক্ত মিষ্টতা আনে, সেইভাবে গঙ্গানারায়ণ বললো, তুমি পাগল কেন হবে? বেশ তো গান গাইচিলে।

তোরাপ বললো, হ, পাগল হইছি, নীলির ঘায়ে পাগল হইছি।

তারপর সে সম্পূর্ণ ফিরে বললো, আগে জমিদারে মারছে, অহন মারে নীলির সাহেব। আমাগো ঝা

জেবন, তায়ের আর বাচা আর মরা। পাগল হওনই সবঝে ভালো, খাই না খাই বগোল বাজাই। গান শোনবেন কইলেন, শোনেন তয়

ঘর ভাঙ্গিলে জমিদারে
জাত মাল্লে পাদরি ধরে
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে।

গঙ্গানারায়ণের মুখে একটু অপ্রস্তুত ভাব ফুটে উঠলো। সে যে জমিদার বংশের সন্তান একথা কেউ তাকে ভুলতে দেবে না। সে ধীর স্বরে জিজ্ঞেস করলো, জমিদার তোমার ঘর ভেঙেছেল ? কবে ?

তোরাপ এবার হা হা করে হেসে বললো, আমার তো ঘরই নাই, তা ভাঙবে কী ? এ গানডা রচেছে আমার নানা বচোরদ্দি শ্যাখ। মোর ছ্যালো মোটে পাচ বিঘা জমি, তাও সাহেবরা নীলির জন্যি দেগে দিয়েলো। হাল গরু ব্যাচে দেয়েছি, চাষই করমু না, তাও সুমুন্দির পো-রা ছাড়ে না।

এবার গঙ্গানারায়ণ উৎসাহের সঙ্গে বললো, শোনো, তোরাপ, তোমার জমিতে যদি তুমি নীল রুইতে না চাও, ধান রুইতে চাও, আমি তোমায় সাহায্য করবো।

কিন্তু এ আলোচনা আর বেশী দূর অগ্রসর হতে পারলো না। গ্রামে একটা হই হই রব উঠলো। দাবানলের তাড়া খাওয়া জন্তুজানোয়ারদের মতন উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ছুটতে লাগলো মেয়ে-পুরুষ-শিশুরা। কুঠিয়াল সাহেবরা দলবল নিয়ে আসছে, সব জমি নীল চাষের জন্য দাগিয়ে দেবে। এবারে নাকি সাহেবরা এক ছটাক জমিও ছাড়বে না।

এমনকি পাগল তোরাপও বুঝলো যে এই সময় গঙ্গানারায়ণ সাহেবদের নজরে পড়লে বিপদ ঘটবে। সে বললো, ও বাবু, যদি পরানে বাচতি চাও তো হুই পগারের পানে দৌড়ি পলাও ! তুমি ভদ্দরনোক, তোমারে আগে বান্‌ধবে !

গঙ্গানারায়ণ তবু দাঁড়িয়ে রইলো। সে পালাবে কেন ? ব্রিটিশ রাজত্বে মহারানীর সমস্ত প্রজারই সমান অধিকার। লোভে উন্মত্ত কিছু ব্যবসায়ী যদি আইন ভাঙতে চায়, তা হলে তাদের শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে। এরা রুল অব ল' মানতে বাধ্য।

যেমন প্রথা, সেই মত তিনজন সাহেব অশ্বপৃষ্ঠে এবং তাদের দেওয়ান-গোমস্তা ও লাঠিয়ালের দলবল পিছন পিছন দৌড়ে দৌড়ে আসছে। অশ্বত্থ গাছের তলায় দণ্ডায়মান গঙ্গানারায়ণকে তারা দেখতেও পেল না, সোজা এগিয়ে গেল সামনের দিকে। গঙ্গানারায়ণ দেখলো, তার পাশ থেকে তোরাপ যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সাহেবরা সব কাজই অতি দ্রুত সারে। তাদের দলটি অবিলম্বেই বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো বিভিন্ন দিকে। একটু পরেই গঙ্গানারায়ণ শুনতে পেল কান্নার রোল।

খুব বেশী দূরে নয়। সামনের আম বাগানটির ওপার থেকেই কান্নার শব্দ আসছে। গঙ্গানারায়ণ আর থাকতে পারলো না, এগিয়ে গেল সেদিকে।

সেখানে একজন সাহেব, একজন আমীন ও তিনজন লাঠিয়াল দাঁড়িয়ে আছে। আর একজন চাষী সাহেবের জানু ধরে কেঁদে কেঁদে বলছে, ও সাহেব, এ জমিডা ছেড়ে দেও, এডা মোগো পুকুর ধাইর্যা জমি, গেরামের মাইয়া মানষেরা এহানে গোছল করতে আসে, ও সাহেব !

সাহেব বারবার লাথি দিয়ে লোকটিকে ফেলে দিচ্ছে, সে আবার উঠে আসছে মিনতি জানাতে। গঙ্গানারায়ণ হন হন করে এগিয়ে এসে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো, স্টপ দিস ! লিসন, ডু ইউ নো দি রিসেন্ট পরোয়ানা অব দি গবরমেন্ট ?

কুঠিয়াল ম্যাক্‌গ্রেগর বেশ কয়েক বৎসর এই অঞ্চলে বসবাস করার ফলে তার বাংলা ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি হয়েছে। গঙ্গানারায়ণের ইংরেজীর উত্তরে সে বললো, এ বাঞ্চৎ কোন্ আছে ?

গঙ্গানারায়ণ মুখ তুলে ভালো করে দেখলো সাহেবটিকে। স্মৃতির কুয়াশা ভেদ করে ক্রমশ মুখখানি স্পষ্ট হলো। এই সেই ম্যাকগ্রেগর। এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই গঙ্গানারায়ণ চূড়ান্ত অপমানিত হয়েছিল। কোনো উত্তরই দিতে পারেনি সেদিন। হঠাৎ রক্ত উঠে এলো তার মাথায়।

কয়েকজন চাষী চিৎকার করে উত্তর দিল, সাহেব, ইনি আমাগো জমিদার !

ম্যাকগ্রেগর হেসে বললো, এ না-লায়েক বেটা কোন্ জমিন্দার ! শ্যামচাঁদ খেলেই জমিন্দার ভাগবে ! দেকো, তুমলোগ সব দেকো।

হাতের চাবুকটি শূন্যে ঘুরিয়ে ম্যাকগ্রেগর সজোরে এক ঘা কষালে গঙ্গানারায়ণের শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের পিঠ দিয়ে রক্ত ফুটে বেরিয়ে এলো। সে তবু অবিচল ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে

মেঘমন্দ্র স্বরে বললো, নতুন আইন হয়েচে, তোমরা জানো না, এই অত্যাচারের জন্য তোমায় গারদে পাঠাবো। এই আমি এখেনে সকলের সামনে শপথ নিলুম। তুমি এই চাষীর জমিতে ট্রেসপাস করেচো—

ম্যাকগ্রেগর বললো, বজ্জাত, নিগার। তুই আমায় আইন ডেখাইটে চাস্ ? এই ড্যাখ্ তবে আমার আইন।

ম্যাকগ্রেগর আবার চাবুক কষাতেই গঙ্গানারায়ণ সেটা ধরে ফেললো। অতিরিক্ত মদ্যপ ও ভোগী ম্যাকগ্রেগরের চেয়ে সে অনেক বেশি শক্তিমান পুরুষ। হ্যাঁচকা টান দিয়ে চাবুকটা কেড়ে নেবার পর সে আর ক্রোধ দমন করতে পারলো না। পর পর কয়েক ঘা চাবুক সজোরে মেরে সে প্রতিদান দিল ম্যাকগ্রেগরকে। ম্যাকগ্রেগর পড়ে গেল ঘোড়া থেকে।

তারপর একটি ছোটখাটো বিদ্রোহের ব্যাপারই ঘটে গেল সেখানে। লাঠিয়ালরা এগিয়ে আসতেই অনেক চাষী একত্রে গর্জন করে উঠলো, খবর্দার, ওনার গায়ে কেউ হাত লাগাবি না। একজন অত্যাচারী সহেবকে ভূপাতিত হতে দেখে তাদের আনন্দ ও সাহস যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। কোথা থেকে একটা প্রকাণ্ড লাঠি নিয়ে এসে পড়লো তোরাপ। সকলে মিলে লাঠিয়াল তিনজনকে ঘায়েল করে ফেলল এবং অন্য সাহেবদের কাছ থেকে সাহায্য আসার আগেই ওরা গঙ্গানারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে দূরে পালিয়ে গেল।

সেইদিন মধ্যরাত্রে গ্রামের কয়েক স্থানে লক্ লক্ করে উঠলো অগ্নির লেলিহান শিখা। সবচেয়ে প্রথমে ভস্মসাৎ হলো জমিদার সিংহবাবুদের কুঠিবাড়িটি।

বিরাহিমপুর গ্রামটি একেবারে জনশূন্য। এ গ্রামের কিছু বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত, দু-একটিতে এখনো ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। যেসব বাড়িতে আগুনের স্পর্শ লাগেনি, সেখানেও আছে তাণ্ডবের চিহ্ন, যেন একপাল ক্রুদ্ধ দৈত্য সব কিছু তছনছ করেছে। শিশুদের ক্রন্দন বা হাস্যমুখর প্রাঙ্গণগুলিতে এখন শুধু বসে আছে ছন্নছাড়া, বিস্মিত দু-একটি বিড়াল বা কুকুর। এই দুটি প্রাণী মানুষের সঙ্গ ছাড়া বাঁচতে পারে না। অকস্মাৎ মনুষ্য-পরিত্যক্ত হওয়ায় তারা হতভম্ব ; মাঝে মাঝে শোনা যায় তাদের অদ্ভুত করুণ ডাক।

এ গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা দূরের গ্রামগুলির দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, কিছু সক্ষম জোয়ান পুরুষ আশ্রয় নিয়েছে পাতিসরের জঙ্গলে। উজানী নদীর দক্ষিণ দিকে এই জঙ্গল খুব প্রাচীন নয়। এককালে পাতিসর নাকি ছিল বেশ সমৃদ্ধ এক জনপদ, কোনো এক সময় মারাত্মক বিসূচিকা রোগ সেখানে মহামারী রূপে দেখা দেয়। প্রতিদিন একশো-দেড়শো করে চিতা জ্বলতো, তারপর আর চিতা জ্বালাবার লোক পাওয়া যায়নি। যারা প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিল তারা তো কেউ আর ফিরে আসেইনি, বহু বৎসর ধরে ভয়ে কেউ আর পাতিসারে পা দিত না। পরিত্যক্ত সেই জনপদে ধীরে ধীরে গজিয়ে ওঠে জঙ্গল। এখনো সেখানে দেখা যায় ইতস্তত কিছু কিছু গৃহের ভগ্নস্তূপ। বিষধর সাপ আর হিংস্র পশুরা সেখনে বাসা বেঁধে আছে।

পাতিসরের জঙ্গলে পলাতকদের মধ্যে রয়েছে গঙ্গানারায়ণ। তাকে এখন দেখায় কোনো দস্যু দলপতির মতন, তার হাতে বন্দুক। নীলকর সাহেবরা যখন তাদের কাছারি বাড়িতে আগুন দিতে আসে, তখন নায়েব ভুজঙ্গ ভটচাজ্ চম্পট দেবার আগে এই সাবেকী বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিল। গোঁয়ারের মতন গঙ্গানারায়ণ চেয়েছিল তখনই প্রতিরোধ করতে, কিন্তু ভুজঙ্গ ভটচাজ্ সে সময় তাকে উচিত পরামর্শই দেয় যে, সাহেবদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে নামা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ভুজঙ্গ ভটচাজ্ অবশ্য ওই জঙ্গলে আশ্রয় নেয়নি, সে সপরিবারে এই জেলা ছেড়েই চলে গেছে। বন্দুকটা এবং কিছু কার্তুজ রয়ে গেছে গঙ্গানারায়ণের কাছে।

চারপাশ ঘন গাছপালায় ঘেরা একটি ভগ্ন গৃহের চাতালে আস্তানা গেড়েছে গঙ্গানারায়ণ। তার সঙ্গে রয়েছে জনা পনেরো বলিষ্ঠকায় চাষী। একটি ব্যাপারে গঙ্গানারায়ণ রীতিমতন বিস্মিত। তারই জন্য বিরাহিমপুর গ্রামে যে এমন বিপদ ও বিপর্যয় নেমে এলো, সেজন্য কেউ কিন্তু তাকে দুষছে না। বরং গঙ্গানারায়ণের প্রতি তাদের সমীহ অনেক বেড়ে গেছে এই জন্য যে, সে সর্বসমক্ষে একজন সাহেবকে প্রহার করেছে। কয়েক পুরুষ ধরে তারা মার খেয়ে শুধু সহ্য করতেই শিখেছিল। এই প্রথম দেখলো একজন অন্তত অত্যাচারীকে ভূপাতিত হতে। ম্যাকগ্রেগর সাহেব একেবারে যমের দোসর, তার গায়েও হাত দিয়েছে গঙ্গানারায়ণ।

বস্তুত, বিরাহিমপুর গ্রামে এ আগুন জ্বলতোই, গঙ্গানারায়ণ যেন নিমিত্ত মাত্র। এই অঞ্চলের চাষীরা একেবারে বদ্ধপরিকর হয়েছিল যে এ বৎসর তারা কিছুতেই নীল চাষ করবে না। ভিতরে ভিতরে তারা ধূমায়িত হচ্ছিল, গঙ্গানারায়ণ শুধু আগুনের শিখাটি জ্বেলে দিয়েছে। বিঘা প্রতি দাদন মাত্র দুটি টাকা, অথচ নীল উৎপাদনের ব্যয় তার চেয়ে বেশী। এর পরও আছে প্রতি পদে পদে নীলকুঠির কর্মচারীদের উৎকোচ। উৎপাদন বেশী হলেও ফাজিলটুকু যাবে সাহেব ও তাদের কর্মচারীদের উদরে আর উৎপাদন কম হলে বা নীলফসলের মান নিকৃষ্ট হলে সহ্য করতে হবে বেদম প্রহার, ধারাবাহিক অত্যাচার, ঘরে যুবতী স্ত্রী বা কন্যা থাকলে তার শরীর দিয়ে মেটাতে হবে ঘাটতি। যে অবস্থায় হেলে সাপও ফণা তোলে, চাষীরা সেই অবস্থায় পৌঁছেচে।

গঙ্গানারায়ণের কাছে বন্দুক থাকায় লুক্কায়িতদের বুকে এসেছে বিপুল বল। তারা জানে, নীলকরদের কুঠিতেও একটি মাত্র বন্দুক আছে, সুতরাং তারা গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে কুঠি আক্রমণ করলে সাহেবদের এবার একেবারে ঝাড়ে বংশে নির্বংশ করে দিতে পারবে। বনের মধ্যে দু-তিনদিন থাকার পরই তারা ক্রমশ এই পরিকল্পনায় উত্তেজিত হতে লাগল। তারা শুধু তাদের গ্রাম, বড় জোর পরগণাটুকুর কথা চিন্তা করে, বাকি পৃথিবীর কোনো অস্তিত্ব নেই তাদের কাছে।

গঙ্গানারায়ণ অবশ্য রূপকথার গল্পের নায়ক হতে চায় না। তার মস্তিষ্ক অনেক ঠাণ্ডা, রুল অব ল'-তে তার এখনো দৃঢ় বিশ্বাস। তার হাতে একটি বন্দুক আছে বটে কিন্তু বন্দুক চালনায় তার দক্ষতা নেই। এই চাষা-ভূষোর দল প্রত্যেকেই হাতে একটা করে ডাণ্ডা বা লাঠি নিয়েছে বটে কিন্তু নীলকুঠির সুশিক্ষিত লাঠিয়ালদের তুলনায় এরা কিছুই না। এদের নিয়ে হই হই করে নীলকুঠি আক্রমণ করা কাজের কথা নয় মোটেই। ধরা যাক, যদি বা এখানকার নীলকুঠি দখল করেই নেওয়া যায়, তাতেই বা কী লাভ হবে?

গঙ্গানারায়ণের এখনো ধারণা, আইনের আশ্রয় নিয়েই চাষীরা নিজস্ব জমিতে ইচ্ছামত চাষের অধিকার ফিরে পেতে পারে। শুধু সেই আইনের কাছে একবার পৌঁছোনো দরকার। নীলকর সাহেবরাও এ কথা জানে বলে দরিদ্র হীনবল চাষীদের ওপর হাজার রকম অত্যাচার চালিয়ে পদানত করে রাখে যাতে তারা আইনের আশ্রয়ে পৌঁছোতে না পারে।

ম্যাকগ্রেগর এবং তার চালা-চামুণ্ডারা বিরাহিমপুর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে,এটা বেআইনী কাজ। এর উত্তরে রাতের অন্ধকারে দলবল নিয়ে রূপকথার নায়কের মতন গঙ্গানারায়ণও যদি নীলকুঠি আক্রমণ করে তবে সেটাও হবে একটা বেআইনী কাজ। অত্যাচারিতেরও অধিকার নেই আইনের বিচারভার স্বহস্তে গ্রহণ করার। তবে আগেকার তুলনায় অন্তত একটি বিষয়ে গঙ্গানারায়ণ দৃঢ় নিশ্চিত হয়েছে, চোখের সামনে কোনো অন্যায় সঙ্ঘটিত হতে দেখলে তখুনি তার প্রতিবাদ করতে হবে। পরে কখন বিচার হবে এই জন্য অন্যায় সহ্য করে গেলে মনুষ্যত্বের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সেইজন্যই সে ম্যাকগ্রেগরের চাবুক সহ্য করেনি।

সঙ্গে কিছু চাল-ডাল যে যা পারে নিয়ে এসেছিল, তাই ফুটিয়ে কোনো রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি হচ্ছে। কিন্তু যে সব মানুষ মরীয়া হয়ে সর্বস্ব খোয়াবার ঝুঁকি নিয়েছে, তারা কখনো চুপ করে বসে থাকতে পারে না। কিছু একটা করার জন্য, এমন কি সর্বনাশের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যও তারা চঞ্চল।

গঙ্গানারায়ণ ঠিক করলো, আগে এই এলাকার থানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আইন প্রয়োগের ভার পুলিসের হাতে, পুলিস সঙ্গে নিয়ে সবাই মিলে আবার গ্রামে ফিরবে। তখন যদি নীলকর সাহেবরা আবার ধেয়ে আসে, তখন তাদের মোকাবিলা করবে পুলিসের সেপাইরা। থানা

আছে কালীগঞ্জে, পাতিসর জঙ্গল পার হয়ে সেখানে যাওয়া যায়।

গঙ্গানারায়ণের সঙ্গীরা তাকে অনেকভাবে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলো। তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে পুলিস ফৌজ তাদের মতন সাধারণ মানুষের কোনো উপকারে আসবে। পুলিস বরাবর জমিদারের স্বার্থ রক্ষা করে এসেছে আর নীলকর সাহেবরা তো পুলিশের বাপ। কোনো সাহেবের গায়ে কোনো দেশী পুলিস সেপাই কখনো হাত তুলতে পারে? এটা অসম্ভব কথা নয়?

গঙ্গানারায়ণ কোনো কথা শুনলো না, সে যাবেই। অবশ্য সে পথ চেনে না। একা যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তার সঙ্গে কে যাবে? শেষ পর্যন্ত তোরাপ বলল, লয়েন কত্তা, মুই আপনেরে রাস্তা দেখামু। মরলে আপনার লগে এক সাথে মরুম!

বন্দুকটা উঁচু একটি বৃক্ষচূড়ায় লুকিয়ে রেখে রাতের অন্ধকারে জঙ্গল থেকে বেরুলো গঙ্গানারায়ণ আর তোরাপ। উজানী নদীর ধার ঘেঁষে উত্তর দিকে গেলেই কালীনগর পড়বে। এই কালীনগরে তোরাপের এক ফুফাতো ভাই থাকে। আগে তার কাছে গিয়ে ওরা জেনে নেবে এদিককার হালচালের সন্ধান।

ওরা যখন পৌঁছোলো তখন কালীনগর গঞ্জটি ঘুমন্ত। এমনই চুপচাপ, নিঃসাড় যে ঘুমন্তের বদলে মৃত বলে ভ্রম হয়। তোরাপের পিসীর সন্তানকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। সেখান থেকে জানা গেল কালীনগরের অনেক যুবকই গা ঢাকা দিয়েছে। নীলকর সাহেবরা এখানেও খুব জোর-জুলুম শুরু করেছে। গঙ্গানারায়ণ একটুখানি দমে গেল। কালীনগরে থানা আছে। সেখানে পুলিসের নাকের ডগার ওপরেই যদি এ রকম কাণ্ড হয়, তা হলে আর ভরসা কোথায়?

তোরাপ চাইলো জঙ্গলে ফিরে যেতে। জঙ্গলই একমাত্র নিরাপদ স্থান। সেখানে নীলকর কিংবা পুলিস কেউই যায় না। গঙ্গানারায়ণ একটা খিরিশ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করলো। তারপর সে সিদ্ধান্ত নিল একবার অন্তত থানার দারোগার সঙ্গে দেখা করা দরকার। অসহায়, অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা সরকারের নতুন নির্দেশের কথা কিছুই জানে না, তারা কিছু দাবি করে না বলেই পুলিস থেকেও তাদের অধিকার সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। অথচ হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় গঙ্গানারায়ণ পড়েছে যে কৃষকের অনিচ্ছাসত্বেও জোরজুলুম করে নীল চাষ চালাবার পক্ষপাতী নয় সরকার।

কালীনগর থানার দ্বারের সামনে দাউ দাউ করে জ্বলছে একটি মশাল, পাশে বর্শা হাতে নিয়ে বসে বসে ঢুলছে একজন সিপাহী। গঙ্গানারায়ণ তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সিপাহীটি জেগে ওঠার পর গঙ্গানারায়ণের বক্তব্য শুনে সে বাড়িয়ে দিল বাম হস্তটি। অর্থাৎ কিছু দর্শনী বা পার্বণী না দিলে দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অনেক বাক-ধস্তাধস্তির পর শেষ পর্যন্ত তাকে ভবিষ্যতে কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে সে গা মোচড়া-মুচড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

দারোগাবাবুর বাসগৃহ সন্নিকটেই। গায়ে একটা মলিদা জড়িয়ে তিনি একজন গৃহস্থ ভদ্রলোকের মতন সেজবাতির আলোকে একটি ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ করছিলেন। এই রাতে আগন্তুকদের দেখে তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন না বা সেপাই ডেকে ফাটকে পুরে দেবার আদেশ দিলেন না। গ্রন্থটি মুড়ে রেখে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, কী, ঘর পুড়িয়েচে তো? কোন্ গা? ক' বছরের দাদন? এলাকা চাষ, না বে-এলাকা?

গঙ্গানারায়ণ বিনীতভাবে বললো, আজ্ঞে, গোটা গ্রামেই আগুন জ্বালিয়ে দিয়েচে। গাঁয়ের নাম বিরাহিমপুর। ওদের অত্যেচারে গাঁয়ে আর একটাও মানুষ নেই।

দারোগাবাবু বলেন, বসো, ওখেনেই বসে পড়ো, তারপর বলো। প্রাণ খুলে বলো। কত আর শুনবো, এই নিয়ে আজ পাঁচজনা এলো।

তোরাপ দাঁড়িয়ে আছে বাইরের অন্ধকারে শরীর মিশিয়ে, সে দারোগাবাবুকে দেখাই দেয়নি। গঙ্গানারায়ণ উবু হয়ে বসলো, তারপর বললো, আমি হিন্দু পেট্রিয়ট কাগচে একটা খবর পড়িচি···।

দারোগাবাবুর দৃষ্টি তখনও সামনের বইটির ওপর ন্যস্ত ছিল, এবার তিনি চমকিত হয়ে মুখ তুললেন। তারপর তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কী পড়োচো বললে? কে তুমি? তুমি কি চাষী?

গঙ্গানারায়ণ বললো, না, আমি চাষী নই বটে, তবে কয়েকটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। আপনি যদি সবিস্তারে শোনেন—।

সেজবাতিটি উঁচু করে তুলে গঙ্গানারায়ণের মুখের সামনে ধরে দারোগাবাবু বললেন, তুমি···তুই···গঙ্গা না?

এবার গঙ্গানারায়ণেরও স্তম্ভিত হওয়ার পালা। সেও দারোগার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো।

দারোগাবাবু বললেন, তুই···গঙ্গা···আমাদের গঙ্গানারায়ণ নোস্ ? গলার স্বর শুনেই কেমন কেমন বোধ হচ্ছিল। আমায় চিনতে পাচ্ছিসনি ? আমি ভগীরথ। হিন্দু কলেজে আমরা একসাথে পড়তুম, মধু, রাজনারায়ণ, ভূদেব, বেণী, গৌর···আমার বাড়ি থেকে ভূদেবের বাড়ি খুব কাচেই—।

এবার গঙ্গানারায়ণের মনে পড়লো। এই মধ্যবয়স্ক, স্ফীতোদর, গুম্ফবান ব্যক্তিটি তার সহপাঠী ভগীরথই বটে। তবে ছাত্র হিসেবে তার তেমন চাকচিক্য ছিল না বলে সে ঠিক গঙ্গানারায়ণের বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল না।

ভগীরথ বললো, এ কী চেহারা করিচিস তুই ? খালি গা, খালি পা···তোর মতন বংশের সন্তান···তোদের বাড়িতে কত খেয়েচি ! কী ব্যাপার বল্ তো ! এ কী বিচিত্র বিধিলিপি, এমনভাবে, এমন অবস্থায় তোর সঙ্গে দেকা হবে—।

গঙ্গানারায়ণ কিছু বলতে শুরু করার আগেই ভগীরথ আবার বললো, থাম, থাম ! বিরাহিমপুরে এক ইণ্ডিগো প্ল্যান্টারকে একজন কেউ মেরেচে, সে কি তুই ? ওরে বাপ রে বাপ ! তা নিয়ে যে হুলুস্থুলু পড়ে গ্যাচে রে ! সিংগীবাড়ির এক ছেলে এই কীর্তি করেচে, এমন শুনিচিলুম বটে, কিন্তু তুই কখনো কারুর গায়ে হাত তুলবি, সে যে অকল্পনীয় !

গঙ্গানারায়ণ এবার সব বৃত্তান্ত খুলে বললো।

মাঝখানে বার বার বাধা দিচ্ছিল ভগীরথ। সে এ ব্যাপারের অনেক কিছুই জানে। সব শুনে সে বললো, গঙ্গা, আমার হাত-পা বাঁধা। তোকে দেকলে অ্যারেস্ট করার কতা ! ইণ্ডিগো প্ল্যান্টারদের কতখানি প্রতাপ এদিকে তুই জানিস না, তুই তো মাত্তর একজন দুজনকে দেকিচিস।

গঙ্গানারায়ণ বললো, তুই বারাসতের হাকিমের পরোয়ানার কতা কিছু শুনিসনি ? তিনি থানার দারোগাদের নির্দেশ দিয়েচেন—।

ভগীরথ বললো, শুনিচি, সব শুনিচি। ঐ হাকিমের বদলি হলো বলে ! অমন দু-একটা আইডিয়ালিস্ট ছোক্‌রা সদ্য বিলেত থেকে এসে এখানকার নেটিবদের হেল্প কত্তে চায়। তারপর ধাদ্ধারা গোবিন্দপুরে বদলি হয়ে কয়েক বচর পড়ে থাকার পরই তাদের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ঐ বারাসতের আরও দুজন হাকিম এমনধারা চাষীদের সাপোর্ট কত্তে গেস্‌লো। তারাও বদলি হয়ে গ্যাচে !

গঙ্গানারায়ণ বললো, কিন্তু দেশের এত চাষীকে জমি ছাড়া করে সরকারের কী লাভ ? নীলকরদের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য সরকার কি নিজের ক্ষতি করবে ?

ভগীরথ বললো, এ নীলের বাণিজ্যে অনেক সরকারী হোম্‌রা-চোমরার স্বার্থ আচে। তোকে আরো একটা কতা বলি, এই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ঐ ম্যাকগ্রেগরের কতায় ওঠেন বসেন। মাসে দুবার তিনি ম্যাকগ্রেগরের কুঠিতে আসেন খানা খেতে। লোকে বলে ম্যাকগ্রেগরের ওয়াইফের সঙ্গে নাকি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের রোমান্স চলচে অনেকদিন। তুই এই জেলায় বসে ম্যাকগ্রেগরের বিরুদ্ধে দাঁড়াবি কী করে ? চাষীদের মারধোর খাওয়া কিংবা এ ধরনের অত্যাচারের অভ্যেস আচে, কিন্তু তুই এর মধ্যে জড়ালি কেন ? তোকে পেলে ওরা তো একেবারে শেষ করে দেবে !

গঙ্গানারায়ণ একটু রেগে গিয়ে বললো, তুই বলতে চাস, এ সব অত্যেচারের কোনো প্রতিকার নেই ! তা হলে তোরা রয়িচিস কেন ? কুইনের প্রোক্লামেশানের পর প্রজা হিসেবে একজন নীলকর আর একজন চাষীর তো সমান অধিকার।

ভগীরথ হেসে উঠে বললো, তুই এখুনো তেম্নিই রয়ে গেচিস, গঙ্গা ! ইমপ্র্যাকটিক্যাল, রোমাণ্টিক···। বিজয়ী আর বিজিত মানুষ কখুনো সমান হয় ? সাহেবরা কি আমাদের মানুষ বলে মনে করে ?

হাসি থামিয়ে আবার গম্ভীর হয়ে গেল ভগীরথ। মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়লো। আস্তে আস্তে বললো, এতকাল পর তোর সঙ্গে দেখা, কত কী মনে পড়চে, কিন্তু প্রাণ খুলে যে তোর সঙ্গে দুটো কতা কইবো, এখুন সে সময় নেই। তুই আমার এখেনে এসেছিলি, এ কতা পাঁচ কান হলেই আমার গর্দান যাবে। তোকে আমি এক পরামর্শ দিচ্চি, শোন। এই রাতেই তুই নৌকো ধরে কেষ্টনগরের দিকে পাড়ি দে। তারপর যত শিগগির সম্ভব কলকেতায় চলে যা। একমাত্র কলকেতায় গেলেই তুই নীলকরদের ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারবি। আমি তোর জন্যে নৌকোর ব্যবস্থা করে দিচ্চি।

গঙ্গানারায়ণ বিবর্ণ মুখে বললো, আমি পালাবো ?

ভগীরথ বললো, তা ছাড়া তুই এখেনে আর কী করবি ? এখেনে তোর প্রাণ সংশয়। আমি মিথ্যে মিথ্যে তোকে ভয় দেখাচ্ছিনি, একজন মানুষকে গুমখুন করা ওদের পক্ষে কিছুই না।

গঙ্গানারায়ণ একটুক্ষণ নীরব রইলো। বিরাহিমপুরের চাষীদের ভাগ্যের সঙ্গে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। এখন সে ওদের ছেড়ে শুধু নিজের প্রাণ বাঁচাবে ?

ভগীরথ বললো, আর দেরি করিসনি, গঙ্গা, গা তোল্, এই রাতের মধ্যেই তোকে কেষ্টনগর পৌঁচে যেতে হবে !

গঙ্গানারায়ণ অস্ফুট কণ্ঠে বললো, আমি এসেচিলুম ভাগ্যহত চাষীদের পক্ষ নিয়ে বলবার জন্য। যদি তাদের প্রতি অন্যায়ের কোনো প্রতিকার করতে পারি। এখন তাদের সেই একই অবস্থায় ফেলে রেখে আমি চলে যাবো ?

ভগীরথ বললো, চাষীদের তুই সাহায্য কত্তে চাস, বেশ তো ভালো কতা। এখেনে তুই কী করবি ওদের জন্য ? বেশ তো কলকেতায় গিয়ে তুই ওদের হয়ে লড়ে যা। যদি মামলা কত্তে চাস্ কলকেতায় সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মামলা দায়ের কর। সাহেবদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা কি মফস্বলে হয় ? তুই এটাও জানিস না ? ওদের সাহায্য কত্তে গেলে তোকে কলকেতায় যেতেই হবে !

গঙ্গানারায়ণ একবার ভাবলো, এটাই বোধ হয় একমাত্র পন্থা। তোরাপকে দিয়ে সে চাষীদের কাচে খবর পাঠিয়ে দেবে। কলকাতায় মামলা দায়ের করে সেখান থেকে সে সাহায্য পাঠাবে।

পরক্ষণেই গঙ্গানারায়ণের সারা শরীরটাতেই একটা ঝাঁকুনি লাগলো। আবার প্রতিশ্রুতি ? কয়েক বছর আগে সে এ রকমই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারপর মধ্যরাত্রে উধাও হয়ে গিয়েছিল। আবার সে ওদের এই অবস্থায় ফেলে চলে গেলে আর ওরা তাকে বিশ্বাস করবে ? কলকাতায় গেলে তার নিজেরই কোন্ রূপান্তর ঘটবে কে জানে !

সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, না, ভগীরথ, আমার কলকাতায় যাওয়া হবে না এখন। আমি ওদের সঙ্গেই থাকবো।

আরও কিছুক্ষণ ধরে নানান যুক্তি দেখিয়েও ভগীরথ আর টলাতে পারলো না গঙ্গানারায়ণকে। গঙ্গানারায়ণ বাইরে বেরিয়ে এসে বললো, কই তোরাপ, চল রে !

ভগীরথও বেরিয়ে এলো বাইরে। জমিদারনন্দন গঙ্গানারায়ণের এই পরিবর্তন এখনো যেন সে ঠিক হৃদয়ঙ্গম করত পারলে না। গঙ্গানারায়ণকে চলে যেতে দেখে সে বললো, গঙ্গা, এই শীতের রাতে তুই যাবি...তোর খালি গা, এটা তুই অন্তত নে।

নিজের অঙ্গ থেকে শীতবস্ত্র খুলে সে তুলে দিল গঙ্গানারায়ণের হাতে। গঙ্গানারায়ণ এতে আর আপত্তি করতে পারলো না। অবিলম্বেই সে আর তোরাপ আবার মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

রোমাঞ্চকর কাহিনীর নায়কের মত কোনো ভূমিকা নেবার আদৌ ইচ্ছে ছিল না গঙ্গানারায়ণের, কিন্তু পাকেচক্রে তাকে প্রায় সেরকমই হতে হলো। জঙ্গলের আস্তানা থেকে সে দু-একবার বাইরে বেরুবার চেষ্টা করেই বুঝলো, আবহাওয়া অতিশয় উষ্ণ, চাষীদের সঙ্গে নীল কুঠীয়ালদের সংঘর্ষ লাগছে প্রায়ই। ম্যাকগ্রেগারের চ্যালা-চামুণ্ডারা শিকারী কুকুরের মতন গঙ্গানারায়ণের সন্ধানে চতুর্দিকে শুঁকে শুঁকে ফিরছে, গঙ্গনারায়ণের প্রহারে নাকি ম্যাকগ্রেগরের একটি চক্ষু বিষমভাবে জখম হয়েছে, এর প্রতিশোধ তারা নেবেই। গঙ্গানারায়ণের চেহারার বর্ণনা এবং পরিচয় এ তল্লাটে কারুর আর অজানা নেই। কোনো অপরিচিত গ্রামবাসীও গঙ্গানারায়ণকে দেখলে কাছে এসে মিনতি মাখা কণ্ঠে বলেন, বাবু, আপনে শিগগৈর পালান, আপনেরে ধরতি পাল্লি সাহেবরা আপনের কইল্জা টাইন্যে ছিড়ে ফেলবে !

তারা এই কথা বলে, আবার গঙ্গানারায়ণকে দেখবার জন্যও গ্রামসুদ্ধু লোক ভিড় করে আসে। কেউ কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পায়ে। সে ম্যাকগ্রেগরের মতন একজন চরম অত্যাচারী সাহেবের

চাবুকের মার ফিরিয়ে দিয়েও এখনো সশরীরে টিকে আছে, এ বিস্ময়ের আবেগ তারা কী করে প্রকাশ করবে, বুঝতে পারে না। আস্তে আস্তে তাদের কাছে গঙ্গানারায়ণ মানুষের বদলে অতিমানুষ হয়ে যায়।

গঙ্গানারায়ণ বুঝতে পারলো জঙ্গলের আস্তানা ছেড়ে বাইরে আসা তার পক্ষে এখন সত্যিই বিপজ্জনক। কলকাতায় সে কিছুতেই পালাবে না। এখানে থেকে আইনের আশ্রয় নেওয়াও সম্ভব নয়, কারণ পুলিসবাহিনীকে ক্রয় করে রেখেছে নীলকুঠীয়ালরা। জঙ্গলের মধ্যেও তারা যে-কোনো সময় আক্রান্ত হতে পারে বলে তোরাপ এবং অন্য সঙ্গী-সাথীরা ভাঙা ইঁট ও গাছের ডালপালা দিয়ে প্রায় ছোটখাটো একটা দুর্গের মতন বানিয়ে ফেলেছে, গঙ্গানারায়ণের বন্দুক তাদের ভরসা জোগায়।

মাঝে মাঝে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তার দু-একজন চর পাতিসর অরণ্য ছেড়ে বাইরে যায়, অত্যাশ্চর্য সব সংবাদ সংগ্রহ করে তারা ফিরে আসে। কোনোরকম প্ররোচনা ছাড়াই গ্রামের পর গ্রামের নিরীহ, দুর্বল চাষীরা কোথা থেকে এমন শক্তি পেল কে জানে! এতকাল অত্যাচার সহ্য করবার পর তারা হঠাৎ ঠিক করেছে, এ বৎসর কিছুতেই আর নীল চাষ করবে না। তার জন্য প্রাণ যায়, তাও সই। চতুর্দিকে আগুন জ্বলছে। কোন্ গ্রামে কবে কী ঘটনা ঘটছে, তা গঙ্গানারায়ণের জানা হয়ে যায়।

আহার্য সংগ্রহের জন্যও তোরাপ ও তার সঙ্গীদের যেতে হয় গ্রামে। গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছায় তাদের মুষ্টিভিক্ষা দেয়। সে সময় ওরা জঙ্গলের গুপ্ত আখড়া সম্পর্কে গ্রামবাসীদের কী বোঝায় কে জানে, কিন্তু এক নিরুদ্দিষ্ট জমিদারপুত্র বহুদিন পর ফিরে এসে বন্দুক হাতে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে চাষীদের নিয়ে দল গড়েছেন, ইংরেজ এখন তাঁর নামে ভয়ে কাঁপে। এই সব কাহিনীর সঙ্গে আরো অনেক কল্পনা মেশে। ফলে নানারকম অলৌকিক কাহিনীও ছড়াতে শুরু করে গঙ্গানারায়ণের নামে। অনেকের বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়ে গেল যে গরিবের উদ্ধারের জন্য এই মানুষটি দৈব প্রেরিত।

গঙ্গানারায়ণের নির্দেশে তার চরেরা হিন্দু পেট্রিয়টের কপিও সংগ্রহ করে আনে। লোকের মুখে এর নাম 'হরিশের কাগজ', অতিশয় দুর্লভ, কিন্তু নিষিদ্ধ গোপন ইস্তাহারের মতন, যার দরকার তার হাতে ঠিক পৌঁছেও যায়। সেই পত্রিকার পৃষ্ঠায় সারা দেশের চিত্রটি দেখতে পায় গঙ্গানারায়ণ। নীল চাষের ফলে বাংলার অনেক জেলা যে একেবারে ছারেখারে যাচ্ছে, সে কথা যুক্তি ও তথ্য দিয়ে সবিস্তারে বুঝিয়ে চলেছেন হরিশ মুখুজ্যে। সরকারী কর্মচারী ও নীলকর সাহেবরা যোগসাজস করে যে একই সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের এবং সরকারের কীভাবে ক্ষতি করে চলেছে, তার বাস্তব বিবরণ দিচ্ছেন তিনি প্রতি সংখ্যায়। যশোর থেকে শিশিরকুমার ঘোষ নামে এক ব্যক্তিও নীলকরদের অত্যাচার এবং বঞ্চিত চাষীদের জীবনের মর্মন্তুদ সংবাদ পত্রাকারে পাঠাচ্ছেন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজে। কে এই শিশিরকুমার ঘোষ! সে পরিচয় জানা যায় না, কিন্তু ইনি নিজ উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সত্য ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করে জানিয়ে দিচ্ছেন দেশবাসীকে।

এই পত্রিকা পড়ে গঙ্গানারায়ণ কিছু বিস্মিতও হয়। নীল চাষ সম্পর্কে এই সব ব্যক্তিদের এমন আগ্রহ কেন? নীল চাষের জন্য দুর্ভোগ তো শুধু গ্রামের চাষীদের, এমন কি জমিদাররাও এর সঙ্গে তেমন জড়িত নয়। তাদের কিছু কিছু জমি নীলকরদের ইজারা দিয়ে জমিদাররা এ ব্যাপার থেকে হাত ধুয়ে ফেলেছে, এখন এই চাষের লাভ-ক্ষতির সঙ্গে তাদের বিশেষ সম্পর্ক নেই। শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তো কিছুই যাবার আসবার কথা নয়। গঙ্গানারায়ণের মনে পড়ে না, গ্রামের কৃষকদের নিয়ে এত রচনা সে আগে কখনো কোনো ইংরেজী কাগজে দেখেছে। হরিশ মুখুজ্যে বা শিশিরকুমার ঘোষের মতন ব্যক্তিদের এত উদ্বেগ কেন নীল চাষীদের অবস্থা সম্পর্কে? যদি হরিশ মুখুজ্যে নামের লোকটির সঙ্গে কোনোদিন দেখা হয়, গঙ্গানারায়ণ এই প্রশ্নটি করবে। গঙ্গানারায়ণের নিজস্ব একটা দায় আছে, সেইজন্য ওদের ভাগ্যের সঙ্গে সে নিজেকে জড়িয়েছে। কিন্তু সে দায় তাদের জমিদারির কিংবা বংশের ঐতিহ্যের কাছে নয়, সম্পূর্ণই নিজস্ব।

একদিন দ্বিপ্রহরে তোরাপ 'বন্দুক' 'বন্দুক' বলে চিৎকার করতে করতে ছুটে এলো গোপন আস্তানায়। সে দেখে কয়েকজন সশস্ত্র লোক এসে প্রবেশ করেছে এই জঙ্গলে। নিশ্চয়ই নীলকরদের বাহিনী অথবা পুলিস। এ জঙ্গলে কেউ কেউ শখ করে শিকারের জন্যও আসে বটে কিন্তু বর্তমানের বিপজ্জনক সময়ে কে শিকারের শখ পুষে রাখবে!

তোরাপ ও তার সঙ্গীরা লাঠি নিয়ে গোপন আনাচে কানাচে মুখ লুকিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলো। গঙ্গানারায়ণ দাঁড়ালো বন্দুক হাতে নিয়ে। তার বক্ষ কম্পিত হচ্ছে। বন্দুক চালিয়ে তাকে মানুষ মারতে হবে? শুধু আত্মরক্ষার জন্য নয়, তার সঙ্গীদের বাঁচাবার জন্য সে অস্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য। তার মুহুর্মুহু মনে হতে লাগলো, এর চেয়ে হৃষীকেশের শান্ত, স্নিগ্ধ, মনোরম পাহাড়তলীর জীবন কি

অনেক শ্রেয় ছিল না ?

কিছু দূরে গাছপালার ফাঁকে দেখা গেল তিনটি লোককে। তাদের হাতে লাঠি আছে। কিন্তু বন্দুক রয়েছে কিনা বোঝা গেল না। তোরাপ উত্তেজিত চাপা স্বরে বললো, মারেন, বড়বাবু, হুম্মুন্দির পোগুলানরে লিকটে আইতে দিবেন না! মারেন!

গঙ্গানারায়ণ তবু বন্দুক উঁচিয়ে স্থির হয়ে রইলো।

দূরের দলটির মধ্য থেকে একটি লোক বেশী সামনে এগিয়ে এলো। বলিষ্ঠকায় ব্যক্তিটির গায়ে হলুদ রঙের নিমা, মল্লকচ্ছ দিয়ে ধুতি পরা, হাতে একটি পিতলের গাঁট দেওয়া লাঠি। সে চেঁচিয়ে বললো, সিংগীবাবু! সিংগীবাবু!

গঙ্গানারায়ণের সঙ্গীরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে বিস্ময় বিনিময় করলো। তোরাপ বললো, ও হালায় ফুইন্দাবাঝ, ওডারে শ্যাষ কইর্যো দ্যান।

দূরের লোকটি এবার দু' হাত তুলে বললো, আমি সিংগীবাবুর সাথে দ্যাখা করতে আইছি, আমার নাম দিগম্বর বিশ্বাস!

গঙ্গানারায়ণ এবার জোরে উত্তর দিল, তুমি যেই হও, হাতের লাঠিটা ফেলে দাও, তারপর একা এগিয়ে এসো!

লোকটি লাঠিখানাকে আস্তে, খুব সন্তর্পণে শুইয়ে দিল মাটিতে, তারপর মুখ তুলে গম্ভীর স্বরে বললো, আমি চৌগাছার দিগম্বর বিশ্বাস, আমার সময় অতি অল্প, দু' চারডি কথা কয়ে চলে যাবো। রাজি থাকেন তো বায়রায় আসেন, নচেৎ ফিরে যাই।

গঙ্গানারায়ণ বন্দুক নামিয়ে বললো, আসুন, আপনার বাঁ দিকে একটু ঘুরে আসুন, ওদিকে ঢোকার পথ।

দিগম্বর বিশ্বাসের বয়েস তিরিশের নিচে, মুখখানি তেজোদ্দীপ্ত। যে ভাঙা গৃহটিতে গঙ্গানারায়ণদের আস্তানা, সেখানে প্রবেশ করে সে প্রথমে গঙ্গানারায়ণের দিকে বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চেয়ে রইলো, তারপর বললো, আপনিই সেই লোক! লোকে তা হলে মিছে কথা বলে না। আমি ভেবেছিলাম বুঝি সবই গল্প কথা।

গঙ্গানারায়ণ বললো, আপনি কে? চিনলুম না তো!

দিগম্বর বিশ্বাস বললো, খাড়াইয়া সব কথা হবে না; আপনে বসেন, আমিও বসি। অনেক দূর থনে আসতেছি।

শুকনো পাতা জড়ো করে শয্যা প্রস্তুত করা আছে গঙ্গানারায়ণের, সে তার ওপর বসলো। দিগম্বর বিশ্বাস বসলো মাটিতেই, খানিকটা দূরত্ব রেখে। অন্যরা গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাদের। দিগম্বর বিশ্বাস তাদের দিকে হাত তুলে বেশ ব্যক্তিত্বসহকারে বললো,এই, তোরা যা করতেছিলি কর। আমার সাথে কয়েকজন লোক আছে,কেউ গিয়া তাদের ডাইক্যো আন। এখান থিকা যা,বাবুর সাথে আমার কথা আছে।

তারপর দিগম্বর বিশ্বাস মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে গঙ্গানারায়ণকে প্রণাম জানালো। মুখ তুলে বললো, আমি আপনেরে আগে দেখি নাই। তয় আপনের পিতা রামকমল সিংগীরে দেখছি বাইল্যকালে।

গঙ্গানারায়ণ নীরবে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

দিগম্বর বিশ্বাস বললো, আপনে আমারে দেইখ্যা অবাক হইছেন। আমিও কম অবাক হই নাই। হাটে-বাজারে সর্বত্র লোকে কয় যে সিপাহী বিদ্রোহের এক নেতা হিমালয় পাহাড়ে অ্যাতদিন পলাইয়া রইছিলেন, অখন নীল চাষীগো লইয়া বিদ্রোহ করবার জন্যে এদিকে আসছেন! তিনি আবার জমিদার সিংগবাবুগো বাড়ির এ পোলা!

গঙ্গানারায়ণ এবার হাসলো। সিপাহী বিদ্রোহের নেতা? লোকের কল্পনার দৌড় এতদূর পর্যন্ত গেছে! সিপাহী বিদ্রোহের কথা গঙ্গানারায়ণ জানতোই না, হরিদ্বার হৃষীকেশে সে বিদ্রোহের কোনো তরঙ্গই পৌঁছোয়নি।

—এবার কাজের কথা বলুন!

—হ, কাজের কথা তো আছেই। আমি চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের জন্য আসি নাই। আগে আমার পরিচয়ডা দিয়া লই। আমারে পাঠাইছেন আমার দাদা। তাঁর নাম বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস। তিনি দেবতুল্য মানুষ। তিনি মেহেরপুরের নীলকুঠীর দেওয়ান আছিলেন।

তোরাপ এবং তার সঙ্গীরা একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একথা শুনে তাদের মধ্যে একটা

গুঞ্জন উঠলো। নীলকুঠীর দেওয়ান একটি অতিশয় ঘৃণ্য পরিচয়। এই লোকটি তো তা হলে নীলকুঠীর সাহেবদেরই চর।

দিগম্বর বিশ্বাস তাদের উদ্দেশে ধমক দিয়ে বললো, আরে ব্যাটারা, কইলাম তো আছিলেন, এখন নাই। আমিও ছিলাম, ঐ কুঠীর গোমস্থা, ছিলাম, এখন নাই। দাদায় আর আমি চাকরিতে ইস্তফা দিছি। কেন দিছি জানেন? আগে ঐ কুঠীর ম্যানেজার ছিলেন ম্যাকফরসন সাহেব। তিনি মানুষ ভালো, ইস্কুল-হাসপাতাল কইরা দিছেন নিজ ব্যয়ে। সব ইংরেজই খারাপ না, ইংরাজগো মইধ্যেও ভদ্দরলোক, ছুটলোক, চোর, ছ্যাচোড় আছে। যত ছুটলোক আর ছ্যাচোড় সাহেবরাই নীলের ব্যবসা করে। অখন মেহেরপুরের কুঠীর ম্যানেজার ইয়ার্ডলি ঐ রকম এক ছুটলোক। দেওয়ান-গোমস্থাগো দিয়া হ্যায় চাষীগো অইত্যাচার করাইতে চায়। চক্ষুর চামড়া নাই, পিশাচ, সাদা পিশাচ, এ দ্যাশের মানুষরে মানুষ বইলা গইন্য করে না। রক্ত চুইষা খাইতে চায়। সেই দেইখ্যাই দাদায় আর আমি চাকরিতে ইস্তফা দিছি।

—বেশ, ভালো কতা। আমার কাচে এসেচেন কেন?

—আপনে ছাড়া আর কেউ পরিত্রাতা নাই।

—পরিত্রাতা? আমি? আপনি কী বলতে চান খুলে বলুন তো!

—আপনের মতন আমারে পাইলেও মাথা কাটবে নীল বান্দররা। আমার দাদার নামে পুলিসের হুলিয়া। চাকরি ছাড়ার পর চাষীরা আমাগো কাছে আইস্যা ধর্না দিত। খালি কান্দে আর কয়, বাঁচান কত্তা, আমাগো বাঁচান! জীব মাত্রেই বাঁচতে চায়। সাহেবের জীবন, জমিদারের জীবন, চাষার জীবন, সবই তো ভগবানের সৃষ্টি। আমরা দুই ভাই চাষীগো কইছি, যদি বাঁচতে চাও, নীলের চাষ দিও না। তোমাগো রক্তে জমি লাল হউক, তবু নীল য্যানো না হয়! চৌগাছা, মেহেরপুর—এইসব অ্যালাকায় কোনো চাষী এবার নীল চাষ দেয় নাই।

—এরকম কিচু কিচু খবর আমি শুনিচি।

—শুধু আমাগো অ্যালাকা নয়, অইন্য অ্যালাকাতেও আমরা চাষীগো গিয়া কই, নীল চাষ বন্ধ করো। এই বৎসরেই একটা হ্যাস্তন্যাস্ত হইয়া যাবে।

দিগম্বর বিশ্বাস একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর খানিকটা আবেগের সঙ্গে বললো, এবার আপনের উপর ভরসা!

এই লোকটির সঙ্গে আরও কিছু সময় ধরে কথাবার্তা বলে গঙ্গানারায়ণ বুঝলো, তার অজ্ঞাতসারেই সে একটি বেশ বড় ব্যাপারের কেন্দ্রে এসে গেছে। দিগম্বর বিশ্বাসের মনের জোর আছে, সে একবার যখন এই ব্যাপারে নেমেছে, এর শেষ না দেখে সে ছাড়বে না। ঠিক কোনো স্বার্থে নয়, এক ধরনের আত্মসম্মানবোধেই সে এত দৃঢ়। লোকটির ব্যক্তিত্ব গঙ্গানারায়ণকে বেশ স্পর্শ করে।

দিগম্বর বিশ্বাসের বক্তব্য এই যে, শুধু নীল চাষ বন্ধ রাখলেই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। এই বৎসরের ক্ষতি সহ্য করার ক্ষমতা নীলকর সাহেবদের আছে। কিন্তু তারা উৎপীড়ন, অত্যাচার আরও অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে চাষীদের মনোবল ভেঙে দেবে, পরের বৎসর চাষীরা আবার নীল চাষে বাধ্য হয়ে প্রবৃত্ত হবে। সুতরাং সাহেবদের অত্যাচারের প্রতিরোধ করা দরকার। বারবার সাহেবদের ওপর পাল্টা আক্রমণ করে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে বাংলার মানুষ তাদের জোর জুলুমের বাণিজ্য আর কিছুতেই মেনে নেবে না। গ্রামে গ্রামাঞ্চলে কুঠী স্থাপন করে তারা আর নিরাপদে বাঁচতে পারবে না।

কিন্তু এই পাল্টা আক্রমণের জন্য চাষীদের সংঘবদ্ধ করবে কে? নির্যাতিত, গরিব চাষীরা কখনো কি একযোগে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখেছে? যোগ্য নেতৃত্ব না থাকলে কার নির্দেশে তারা লড়াই করার জন্য এগিয়ে যাবে? বিশৃঙ্খলভাবে লড়তে গেলে তারা শুধু মার খেয়েই মরবে! দিগম্বর এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চাষীদের বোঝাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সকলে তাদের চেনে না কিংবা বিশ্বাস করে না। অন্যদিকে ফরাজীরাও নীল চাষীদের লড়াই করার ডাক দিয়েছে। সব দিকে যদি একসঙ্গে শুরু হয় লড়াই, তবে নীল ব্যবসার ভিত্ ধসে পড়তে পারে। এখন পাকেচক্রে এই নেতৃত্বের ভার গঙ্গানারায়ণের ওপরই বর্তেছে।

ইতিমধ্যেই মাঝে মাঝে এখানে ওখানে সংঘর্ষ বাঁধছে। কুঠীয়ালদের পাইকদের আক্রমণ করছে গ্রামবাসীরা। এক অত্যাচারী আমিনের লাশ ভাসতে দেখা গেছে নদীর জলে। ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন এক সাহেব, দূর থেকে কে তীর নিক্ষেপ করেছে, সে তীর সাহেবের গায়ে না লাগলেও ঘোড়াটি

তীরবিদ্ধ হয়ে ভূপাতিত হয়, সাহেবের পা ভেঙে যায়। গ্রাম-গ্রামান্তরে সমস্ত মানুষের বিশ্বাস, এই সব কীর্তিই গঙ্গানারায়ণের। মধ্যরাতে শোনা যায় দূরে কোথাও গোলাগুলির শব্দ। গৃহস্থরা ঘুম ভেঙে উঠে বসে বলে, ঐ গঙ্গানারায়ণ সিংগী যাচ্ছে সাহেবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। আর কিছুদিন পরেই বোধ হয় লোকে গঙ্গানারায়ণের কাল্পনিক মূর্তি গড়িয়ে পুজো করবে!

গঙ্গানারায়ণ বললো, কিন্তু আমি তো এসব কিছুই করিনি।

দিগম্বর বিশ্বাস বললো, আপনের নামে তো রটেছে। সেইতেই আমাগো লাভ। আপনের নামে এবার মন্তরের মতন কাজ হবে। আপনের ডাক শুইনলে সক্কলডি এক স্থানে এসে খাড়াবে, আপনে হুকুম দিলে এক দিকে ধেয়ে যাবে। লোকে ভাবে আপনের অলৌকিক শক্তি আছে। আপনে হিমালয় পাহাড়ের থনে আইছেন···বোঝলেন না, কুসংস্কারাচ্ছইন্য বদ্ধ জীব সব, তুক্-তাক্, মন্তর-তন্তর, এই সবের দিকে অন্ধের মতন টান। আপনে সেডারে কামে লাগান। আপনের নামে এত কিছু রটছে, এবার কিছু ঘটান।

গঙ্গানারায়ণের তবু জড়তা কাটে না। যতই হোক সে একজন অন্তর্মুখী মানুষ। এক সঙ্গে এতগুলি মানুষের জীবন-মরণের ঝুঁকি নিয়ে এত বড় একটা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তাকে। এক একবার সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, আবার ভেতর থেকে কেউ যেন রাশ টেনে ধরে। তখনি কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে সে দিগম্বর বিশ্বাসকে বললো, আরও পরামর্শের জন্যে সেখানেই দিন দু-এক থেকে যেতে।

পরের দিনই একদল গ্রামবাসী এসে উপস্থিত। দূর দূরান্তর থেকে যেমন লোকে কোনো জাগ্রত ঠাকুরের কাছে ধর্না দিতে আসে, সেইরকম তারাও এসেছে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন গঙ্গানারায়ণের কাছে তাদের দুঃখের কথা জানাতে। তারা গঙ্গানারায়ণের পায়ের কাছে কেঁদে পড়লো। নীলকুঠীর পাইকরা তাদের গ্রাম থেকে দুটি যুবতী বধূকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে একজন অন্তঃসত্ত্বা। এই অবস্থায় কোনো গৃহবধূর ধর্মনাশ হলে সবংশে নির্বংশ হবার অভিশাপ লাগে। গঙ্গানারায়ণ কি এর প্রতিকার করবে না?

তোরাপ ও তার দলবল হই-হই রই-রই করে উঠলো। বেশ কিছুদিন বনবাসের ফলে তাদের মধ্যে যেন বন্য আদিম শক্তি জেগেছে। তারা আঘাত হানবার জন্য উন্মুখ। ইদানীং নারী হরণের ঘটনা বেশী বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ কুঠীয়ালদের ধারণা, চাষীদের ঘরের লক্ষ্মী কেড়ে নিয়ে গেলে তারা কাঁদতে কাঁদতেই আধমড়া হয়ে যায়। তখন সামান্য অঙ্গুলি হেলনেই তারা গড়িয়ে গড়িয়ে এসে পা চাটে।

দিগম্বর বিশ্বাস গঙ্গানারায়ণকে বললো, চলেন না, একবার শক্তি পরীক্ষা হইয়া যাক্।

নানা কোলাহলের মধ্যে গঙ্গানারায়ণ সম্মতি জানাতে বাধ্য হলো।

সেই রাতেই প্রায় চল্লিশজন লাঠিধারী কৃষকের একটি দল নিয়ে তারা আক্রমণ করলো একটি নীলকুঠী। এবং প্রথমবারেই তাদের জয় হলো অতি সহজে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেই নীলকুঠীতে হয় বন্দুক ছিল না অথবা চালাবার মতন সম্বিৎ কারুর ছিল না। দুজন সাহেবই ছিল অত্যন্ত নেশাগ্রস্ত।

গঙ্গানারায়ণকে বিশেষ কিছু করতেই হলো না। বন্দুক হাতে নিয়ে সে শুধু গেল আগে আগে, আর হিংস্র উন্মাদনায় ছুটে এলো চাষীরা তার পিছু পিছু। এর আগে কোনো নীলকুঠী আক্রমণ করার মতন সাহস কেউ দেখায়নি, এরা সোজা গিয়ে ভেঙে ফেললো নীলকুঠীর দ্বার। একজন সাহেব কোনোক্রমে পলায়ন করলো, অপর সাহেবটিকে ভূপাতিত করে তার গলায় পা দিয়ে দাঁড়াল তোরাপ। যুবতী বধূ দুটিকে পাওয়া গেল অর্ধমৃত অবস্থায়।

যে-সব ঘটনায় গঙ্গানারায়ণের কোনো অংশ ছিল না, তারও কৃতিত্ব জমা হচ্ছিল গঙ্গানারায়ণের নামে। এবার তার সত্যিকারের একটি জয়-কাহিনী ছড়িয়ে পড়লো দশগুণ হয়ে। গ্রাম্য কবিয়ালরা গান বাঁধলো গঙ্গানারায়ণের নামে:

এবার নীলের ক্যাতায় আগুন লেগেছে
গঙ্গা সিংগী ঝাঁপিয়ে পড়েছে,
ওরে ওরে নীল হনুমান, দাঁড়া দাঁড়া
গঙ্গা সিংগী দুয়োরে আছে খাড়া।

কর্মযজ্ঞ একবার শুরু হবার পর আর দ্বিধার দোলাচলের সুযোগ রইলো না। গঙ্গানারায়ণ ঘন ঘন বদল করতে লাগলো তার আস্তানা। এবং এক একদিন এক এক গ্রামে সদলবলে ঝটিকার মতন উপস্থিত হয়ে কৃষকদের বিদ্রোহের দীক্ষা দিতে লাগলো। যে দু-চারজন চাষী তাদের জমিতে নীল চাষ

করেছিল, সে সব জমি থেকে উপড়ে ফেলা হলো নীল-ফসল। নীলকুঠীর পাইকদের সঙ্গেও সংঘর্ষ হলো কয়েকবার। দিগম্বর বিশ্বাস ঠিকই বলেছিল, তার উপস্থিতিই অলৌকিক শক্তির মতন কাজ করে। যেখানেই সে যায়, সেখানেই জোয়ারের স্রোতের মতন ছুটে আসে চাষীরা, তাদের বিরুদ্ধে নীলকুঠীর পাইকরা কী করবে!

একটি ক্ষেত্রে বন্দুকের গুলি চালাতে হয়েছিল গঙ্গানারায়ণকে। বিপরীত দিক থেকে এক সাহেবও গুলি ছুঁড়েছিল। উভয়পক্ষের কেউই হতাহত হয়নি, তবু তাতেও যেন গঙ্গানারায়ণের অলৌকিক শক্তির আরও বেশী করে প্রকাশ হলো! আকাশ ফাটানো চিৎকারে গঙ্গানারায়ণের নামে জয়ধ্বনি তুললো তার অনুগামীরা

প্রায় মাসাবধিকাল গঙ্গানারায়ণের জয়যাত্রা অব্যাহত রইলো। মনে হলো যেন সাহেবরা পশ্চাৎ অপসরণ করেছে অনেক আগেই। কোনো জায়গাতেই গঙ্গানারায়ণের দলকে তেমন বড় বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। নীলকর ও পুলিস হাত মিলিয়ে চলে, তেমনও দেখা গেল না। চাষীদের অনেকখানি মনোবল ফিরে এলো। ভিটেমাটি ছেড়ে যারা পলায়ন করেছিল, তারাও আবার ফিরে এলো বাস্তুভূমিতে। বহু বছর পর অনেক চাষী তাদের জমিতে নীলের বদলে আবার ধান চাষের উদ্যোগ শুরু করলো।

এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন ধরা পড়ে গেল গঙ্গানারায়ণ।

কিছু কিছু রায়তের নিজস্ব জমিতে সাহেবরা জোর করে নিজেদের মুনীষ দিয়ে নীল চাষ করেছিল। সেইসব জমি আবার দখলে এনে, নীলের চারা উৎপাটিত করে চাষীদের অধিকার ফেরত দেবার তদারক করছিল গঙ্গানারায়ণ। হঠাৎ এসে পড়লো অশ্বারোহী পুলিস বাহিনী। গত কয়েকদিন কোনো রকম পুলিস বা নীলকুঠীর পাইকদের সাড়া শব্দ না পেয়ে গঙ্গানারায়ণের সাহস বেড়ে গিয়েছিল, সঙ্গে নিজের পুরো দলটি আনেনি, আর দিনের আলোয় এমন ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ানো তার উচিত হয়নি।

পুলিস বাহিনী দূর থেকেই বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতে করতে আসছে। গঙ্গানারায়ণ দেখলো, ওদের কাছে অনেকগুলি বন্দুক। অসম যুদ্ধ চালিয়ে কোনো লাভ নেই, তাই অনর্থক রক্তপাত এড়াবার জন্য গঙ্গানারায়ণ তার সঙ্গীদের বললো, তোরা সরে পড়, চাষীদের মধ্যে মিশে যা ধীরে ধীরে, আমি দেকচি।

গোঁয়ারের মতন সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে কিংবা পলায়ন করতে গিয়ে পিছন থেকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মরলে চাষীদের মনোবল ভেঙে যেতে পারে। তার চেয়ে বরং সসম্মানে আত্মসমর্পণ করা ভালো। এর পর যদি আইনের আশ্রয় নিয়ে লড়াই করা চালিয়ে যাওয়া যায়।

বন্দুক সমেত দক্ষিণ হস্তটি উঁচু করে গঙ্গানারায়ণ এগিয়ে গেলো সামনের দিকে।

পুলিস বাহিনীটি পরিচালনা করছিল গঙ্গানারায়ণেরই স্কুলের সহপাঠী সেই ভগীরথ দারোগা। ঘোড়া থেকে নেমে সে নিজের হাতে গঙ্গানারায়ণের হাত ও কোমরে দড়ি বাঁধলো। দড়ির অগ্রভাগটি নিজের হাতে রেখে হাঁটতে হাঁটতে সে চুপি চুপি বললো, তোর ভালোর জন্যই তোকে অ্যারেস্ট কল্লুম রে, গঙ্গা। এছাড়া তোকে বাঁচাবার আর উপায় ছেল না। কলকেতা থেকে আরও ফৌজ আসচে, তোকে দেকা মাত্তরই গুলি করার অর্ডার বেরিয়েচে। এই কটা চাষাভুষো নিয়ে তুই এদের সঙ্গে লড়তে চাস! আমি কলকেতায় তোদের বাড়িতে চিটি লিকে দিইচি। সেখেন থেকে কেউ এসে তোকে জামিনে খালাস করে নেবে। আর যদি কেস লড়তে হয় লড়বে। আর একদিনও বাইরে থাকলে তোকে প্রাণে বাঁচানো যেত না!

গঙ্গানারায়ণের মুখখানি ভাবলেশহীন। বাল্যের সহপাঠীর মুখের দিকে সে একবার তাকিয়েও দেখলো না।

সেই রাত্রিটা গঙ্গানারায়ণকে আটক করে রাখা হলো হাজতে। পরদিন বিকেলে এত্তেলা এলো যে তাকে পাঠাতে হবে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের তাঁবুতে। খোদ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাকে দেখতে চান।

শৃঙ্খলিত অবস্থায় গঙ্গানারায়ণকে আনা হলো সেখানে। ম্যাজিস্ট্রেটের তাঁবুতে আরও একজন উপস্থিত ছিল। সাহেবের বিশেষ বন্ধু নীলকর ম্যাকগ্রেগর। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁর স্বদেশবাসী সুহৃদকে জিজ্ঞেস করলেন, ইজ দিস দা ম্যান?

ম্যাকগ্রেগরের একচক্ষে ঠুলি পরানো। চিবুকে এখনো চাবুকের দাগ। সে প্রায় গর্জন করে উঠলো, ইয়েস!

ম্যাজিস্ট্রেট সহাস্যে বললেন, বীট হিম!

সঙ্গে সঙ্গে চাবুক নিয়ে ম্যাকগ্রেগর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো গঙ্গানারায়ণের ওপরে। চাবুকের শব্দে বাতাস শিহরিত হতে লাগলো, আর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চুমুক দিতে লাগলেন চায়ের পেয়ালায়। খানিকবাদে তিনি বললেন, উহাকে একেবারে প্রাণে মারিও না, ম্যাকগ্রেগর। আমাদের এখানকার দারোগার ও বাল্যবন্ধু। উহাকে একেবারে হত্যা করিলে সে দুঃখ পাইয়া কিছু লিখিয়া ফেলিতে পারে। অবশ্য অচিরাৎ সে দারোগাকে বরখাস্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছি। তাহার পর সেই দারোগার উপরেও কয়েক ঘা মারিয়া হস্তের সুখ মিটাইও।

অচেতন, রক্তাক্ত অবস্থায় গঙ্গানারায়ণ পড়ে রইলো সেখানে।

বিধবা বিবাহের প্রচলন করবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন বিদ্যাসাগর। অকস্মাৎ তাতে বাধা পড়লো।

সরকারী কর্মচারীরা তাঁর কাজকর্মের তারিফ করেন, বিলাতের সংবাদপত্রে তাঁর প্রশস্তি ছাপা হয়, সেইজন্য বিদ্যাসাগর ধরেই নিয়েছিলেন যে তাঁর সব প্রগতিমূলক কাজে তিনি সরকারের সমর্থন পাবেন। গ্রামে গ্রামে স্কুল খোলার দায়িত্ব দিয়ে সরকার তাঁকে স্পেশাল ইন্সপেক্টর অব স্কুলস পদে নিযুক্ত করেছেন, সেইজন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করে বিদ্যাসাগর স্কুল খুলে চলেছেন। শুধু ছেলেদের জন্য নয়, বালিকাদের জন্যও। বেথুনের নামে কলকাতার স্কুলটি চলছে নানান বাধা বিপত্তি এড়িয়ে, বিদ্যাসাগর সেই স্কুল কমিটির সম্পাদক, কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন, গ্রামের অবলাদেরও মুখে ভাষা না জোগাতে পারলে দেশের নারী সমাজের অন্ধকার কিছুতেই দূর হবে না।

স্কুল খোলা খুব কষ্টসাধ্য কিংবা ব্যয়সাধ্য নয় · যে গ্রামের লোকেরা স্কুলের জন্য জমি দিতে চায় এবং গ্রামবাসীরাই চাঁদা তুলে একটি স্কুল ঘর নির্মাণ করে দিতে প্রস্তুত, সেখানেই বিদ্যাসাগর নিজে গিয়ে একটি স্কুলের পত্তন করে আসেন। সেই স্কুলের শিক্ষকের মাস মাহিনা দেবে সরকার। এক একটি স্কুলের জন্য মাসে পনেরো-কুড়ি টাকা, বড় জোর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকা খরচ। হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর, নদীয়ায় ঘুরে ঘুরে বিদ্যাসাগর একটার পর একটা বালিকা বিদ্যালয় খুলে যেতে লাগলেন। এই রকম ভাবে পঁয়তাল্লিশটা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর সরকারের টনক নড়লো।

সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে বিদ্যাসাগরকে ডেকে বলা হলো, এত স্কুল খুলে যাচ্ছো, এর খরচ দেবে কে?

বিদ্যাসাগর আকাশ থেকে পড়লেন। এই অশিক্ষিত মূর্খদের দেশে জ্ঞানের আলো বিতরণ করার জন্য ইংরেজরা কত বাণী দিয়েছে, এখন খরচের নামে তারা পিছিয়ে যাবে? আর কতই বা খরচ, এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত পঁয়তাল্লিশটি স্কুলের জন্য মাসিক মোট ব্যয় আট শো পঁয়তাল্লিশ টাকা। রাজকোষে এই সামান্য টাকার অকুলান?

কিন্তু ইংরেজ সরকার এ দেশে শিক্ষার প্রসার চায় কিছু কেরাণী বা নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী সৃষ্টির জন্য। স্ত্রীলোকদের শিক্ষিত করে সরকারের কোনো লাভ নেই, কারণ স্ত্রীলোকেরা তো চাকরি করতে আসবে না। এমন অকাজে অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছে সরকারের থাকবে কেন? বিদ্যাসাগর লম্বা লম্বা চিঠিতে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করলেন, তবু সরকার অটল। এদিকে মাসের পর মাস চিঠি চালাচালির ফলে ঐ পঁয়তিরিশটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বন্ধ হয়ে আছে। বিদ্যাসাগর নিজে ঐসব শিক্ষকদের নিযুক্ত করেছেন, সরকার বেতন না দিলে তাঁকেই দিতে হবে।

আর একটি ব্যাপারও বিদ্যাসাগর লক্ষ্য করলেন : দক্ষিণ বাংলার ইন্সপেক্টর অব স্কুলস পদটি খালি হওয়ার পর সকলেই ধরে নিয়েছিলেন যে এবার ঐ পদটি বিদ্যাসাগরকেই দেওয়া হবে। গ্রাম বাংলার বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা আর কারুর নেই। কোনো সাহেবের তো থাকতেই পারে না। তবু ঐ পদটি দেওয়া হলো আর একজন সাহেবকে। চাকুরির ক্ষেত্রে একটা সীমারেখা

আছে, তার উর্ধ্বে কোনো নেটিভকে বসানো হবে না।

বীরসিংহ গ্রাম থেকে আগত এই জেদী পুরুষটির আর একবার ঘাড় বেঁকা হলো। বিদ্যাসাগর পাঁচশো টাকা মাইনের সরকারী চাকরি থেকে পদত্যাগ করলেন।

এখন অবস্থা এমন নয় যে চাকরি ছাড়লে বিদ্যাসাগরকে দারিদ্র্য বরণ করতে হবে। গ্রন্থ রচনা করে তাঁর নিজস্ব আয় যথেষ্ট। কিন্তু তাঁর মন ভেঙে গেল। শুধু এই ঘটনায় নয়, পর পর আরও কয়েকটিতে।

কয়েক বৎসর আগে বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ধু প্যারীচরণ সরকারের বাড়িতে একদিন গিয়েছিলেন রসালাপ করতে। প্যারীচরণ বারাসতের স্কুলে পড়াচ্ছিলেন, সেখান থেকে তখন হিন্দু স্কুলের হেড মাস্টার হয়ে এসেছেন। প্যারীচরণ ইংরেজিতে যথেষ্ট পণ্ডিত। বারাসতে থাকার সময় একেবারে শিশুদের ইংরেজি শিক্ষার জন্য একটি বই লিখেছিলেন, তার নাম ফার্স্ট বুক—হিন্দু স্কুলে এসে সেই বইটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশের জন্য ঘষামাজা করছেন তখন। কথায় কথায় তিনি বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন, ঈশ্বর, তুমিও একটা শিশুশিক্ষার জন্য বাংলা বই লেখো না কেন! বিদ্যাসাগর প্রথমে কোনো উত্তর দেননি। প্যারীচরণ আবার বলেছিলেন, তুমি কি ভাবছো, তোমার মতন এতবড় পন্ডিত অ-আ-ক-খ'র বই লিখলে তোমার মান যাবে? কিন্তু শিশুকালে যদি শিক্ষার ভিত্তি পোক্ত না হয়, তাহলে বড় হয়ে পণ্ডিতী বই পড়বেই বা ক'জনা? এসো, তুমি আর আমি মিলে শিশুদের বাংলা ও ইংরেজি বর্ণ পরিচয়ের ভার লই।

কথাটা বিদ্যাসাগরের মনে লেগেছিল। এর পর একদিন পাল্কীতে যেতে যেতে তিনি অতি সরল কয়েকটি বাংলা বাক্য লিখলেন। "পাখী উড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে। গরু চরিতেছে। জল পড়িতেছে। ফুল ঝুলিতেছে।...গোপাল বড় সুবোধ, গোপাল আপনার ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে বড় ভালো বাসে...।" লিখতে লিখতে নিজেই অবাক হয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর। বাংলা এমন সহজভাবেও লেখা যায়? যুক্তাক্ষর ব্যতিরেকেও বাক্য হয়? সংস্কৃতের অভিভাবকত্ব ছাড়াও বাংলাভাষা নিজের পায়ে ভর দিয়ে চলতে পারে!

কিছুদিন পরে তিনি প্রকাশ করলেন বর্ণ পরিচয়, প্রথম ভাগ। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেল। ঠিক এই রকমই একটা গ্রন্থের যে অভাব ছিল, সেটা বোঝা গেল যখন বিদ্যাসাগর এই রকম একটি বই লিখলেন। বিক্রয় হতে লাগলো হাজারে হাজারে। বিদ্যাসাগর নিজেই প্রকাশক, সুতরাং অর্থাগম হতে লাগলো প্রচুর। তারপর রচনা করলেন বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ। পর পর আরও কয়েকটি পাঠ্য পুস্তক লিখে ফেলার পরে তাঁর নিয়মিত অর্থাগম হতে লাগলো। তিনি রীতিমত ধনী ব্যক্তি।

চাকরি ছাড়ার পরও তিনি ধনী, কিন্তু অর্থশূন্য এবং ঋণগ্রস্ত। আয়ের চেয়ে তাঁর ব্যয় বেশী। বিধবা বিবাহের জন্য তাঁকে ঋণ করতে হয়েছে প্রচুর। বিধবাদের বিবাহের জন্য তিনি শুধু আইনের প্রবর্তন করিয়েই নিরস্ত হননি। সামাজিক ভাবে এই বিবাহ চালু করার জন্য তিনি নিজে একের পর এক বিবাহের ব্যবস্থা করে যাচ্ছিলেন। ক্রমে দেখা গেল, এটি যেন তাঁরই একার দায়। খরচ বহন করতে হয় তাঁকেই। এমনও রটে গেল যে কলকাতায় গিয়ে কোনো বিধবা কন্যাকে বিবাহ করলে বিদ্যাসাগরই নববধূর গয়না-গাঁটি ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিজে কিনে দেন। বিধবা বিবাহের নামে কেউ কেউ তাঁকে তঞ্চকতা করতেও ছাড়লো না।

যেসব মান্যগণ্য ব্যক্তি এ কাজে তাঁকে সাহায্য করার আন্তরিক আশ্বাস দিয়েছিলেন, তাঁরাও একে একে পিছিয়ে গেছেন প্রায় সকলেই। অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েও ভুলে গেছেন। এমনকি তাঁর সুহৃদরাও অনেকেই উদাসীন এখন এ-ব্যাপারে।

চাকরি ছাড়ার পর বিদ্যাসাগর ঠিক করলেন, যে-কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে সেগুলিকে কিছুতেই বন্ধ হতে দেওয়া হবে না। তাঁর একার পক্ষে এতগুলি স্কুলের ব্যয় বহন করা দুঃসাধ্য। তিনি জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে চালাবেন। কিন্তু তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি সবিস্ময়ে টের পেলেন যাঁরা মুখে সর্বদা বলেন যে, স্ত্রী-শিক্ষা আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাঁরাও কার্যক্ষেত্রে কোনো সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন না। এ-দেশের মানুষের মুখের কথার সঙ্গে কাজের মিল নেই।

আঘাত শুধু এরকমই নয়, আঘাত আসে অতি কাছের মানুষের কাছ থেকেও। যাদের তিনি সাহায্য করেন, তারাই আড়ালে গিয়ে তাঁর নামে অপবাদ ছড়ায়। অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু মদনমোহন সামান্য টাকা

পয়সার প্রশ্ন তুলে ঝগড়া করলেন কিছুদিন আগে। অথচ, প্রথম যৌবনে এই মদনমোহনকেই তিনি ডেকে এনে সংস্কৃত কলেজে তাঁর থেকে উঁচু পদে চাকরির ব্যবস্থা করেছিলেন।

কিছুদিন অবসন্ন, নিরুদ্যম হয়ে রইলেন বিদ্যাসাগর। মনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যও ভগ্ন হলো। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকেন এবং গ্রন্থ পাঠ করেন।

কিন্তু এরকম অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। এক সময় তিনি ভাবলেন, আমি কি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি ? মানুষের কথা ভেবে, মানুষের জন্য তিনি ঈশ্বরের প্রতিও মনোযোগ দেননি। এখন মানুষের ওপর থেকেও যদি বিশ্বাস চলে যায়, তাহলে তিনি কী অবলম্বন করে বাঁচবেন ? আবার জোর করে ঝেড়ে ফেললেন মানসিক বিষাদ। ঠিক করলেন যে একটা কিছু কঠিন কাজের মধ্যে আত্মনিয়োগ করলে জড়তা কেটে যাবে। কিছুদিনের জন্য লেখার কাজ নিয়ে থাকবেন তিনি। এ পর্যন্ত টুকিটাকি ছোটখাটো বই লিখেছেন কতকগুলি কিন্তু বড় কিছু লেখার সময় পাননি। তিনি মহাভারতের অনুবাদ শুরু করলেন, এটি শেষ না করা পর্যন্ত থামবেন না।

মহাভারতের কিছু কিছু অনুবাদ করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাচ্ছেন এই সময় একদিন এক যুবক এলো তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। যুবকটি তাঁর পূর্ব পরিচিত, কিন্তু তাকে দেখে তিনি চিনতে পারলেন না। মুখখানি কালি বর্ণ, চক্ষু দুটি কোটরগ্রস্ত, এর ধুতি ও কুর্তা যথেষ্ট মূল্যবান হলেও পা দুটি খালি।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে হে, বাপু ?

যুবকটি বললো, গুরুদেব, আমায় বিস্মৃত হয়েচেন ? আমি নবীনকুমার সিংহ।

বিদ্যাসাগর নাম শুনে ভ্রূ কুঞ্চিত করে রইলেন। তাঁর ক্রোধের সঞ্চার হলো। এই সব অস্থিরমতি ধনীর দুলালদের সঙ্গে তিনি কোনো সংশ্রব রাখতে চান না। এই নবীনকুমার সিংহ অত্যুৎসাহ নিয়ে এক সময় তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম প্রথম প্রতিটি বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠানে সে নিজে উপস্থিত থাকতো। প্রতিটি বিবাহে সে এক সহস্র টাকা সাহায্য করবে, এমন ঘোষণা করেছিল সংবাদপত্রে। তারপর হঠাৎ ভোঁ ভাঁ। আর তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি, এক সহস্র টাকা দূরে থাক, এক পাই পয়সা দিয়েও আর সাহায্য করে না। অন্যান্য বনিয়াদী ঘরের ছোকরাদের মতন এরও যে পাখা গজিয়েছে এবং উড়তে শিখেছে, সে সংবাদ একটু একটু কানে এসেছে তাঁর। যতই মুখে আদর্শের বুলি আওড়াক, রক্তের দোষ যাবে কোথায়, সুরা আর বারনারী ছাড়া এরা বাঁচতে পারে না।

অপ্রসন্ন মুখে তিনি বললেন, চেহারা দেখে চিনবার উপায় নেই, তবে নাম শুনে চিনেছি। তবে আমি তোমার গুরু হলাম কিসে ? তোমার মতন দু চারটে চ্যালা দেখলেই লোকে টের পেয়ে যাবে আমি কী দরের গুরু।

নবীনকুমার বললো, আমি আপনার অতি অযোগ্য শিষ্য। আমি কি আপনার চরণারবিন্দ একবার স্পর্শ করতে পারি ?

বিদ্যাসাগর বললেন, যদি ব্রাহ্মণকে প্রণামের মতি থাকে, তবে করতে পারো।

উপবিষ্ট অবস্থায় প্রণাম গ্রহণ করতে নেই বলে বিদ্যাসাগর উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই নবীনকুমার একেবারে তাঁর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো, আমি পাপী, আমি অপবিত্র...।

হু-হু করে কাঁদতে লাগলো সে।

বিদ্যাসাগর এরকম কান্নাকাটি খুবই অপছন্দ করেন। অপরকে অশ্রু বিসর্জন করতে দেখলেই তাঁর চক্ষু সজল হয়ে আসে, এই তাঁর এক মহা দুর্বলতা। এই বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল যুবকটিকে তিনি অপছন্দ করেন, তবে এর কান্না দেখে তাঁকে কাঁদতে হবে, এ এক জ্বালা!

তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ওঠো, উঠে বসে যা বলতে চাও বলো। আমি কোনো মানুষকেই অপবিত্র মনে করি না। তবে তোমার মতন ধনী ব্যক্তিদের আবার কখনো পাপ হয় নাকি ? পাপ তো শুধু গরিব-হা-ভাতেদের জন্য।

নবীনকুমার তবু কান্না সামলাতে পারছে না। তার মতন তেজস্বী অহংকারী যুবক এরকম দুর্বলতা আগে কখনো দেখায়নি। কিন্তু তার মানসিক ভারসাম্যই যেন টলে গেছে। কমলাসুন্দরীর বাড়িতে রাত্রিযাপন করার পর তার যখন চৈতন্য হয়, তখনই সে কেঁদে উঠেছিল। নিজের কাছে নিজের এমন নিদারুণ পরাজয় সে সহ্য করতে পারেনি। সেদিন বাড়ি ফেরার পথেই সে সংকল্প নিয়েছিল সে আত্মহত্যা করবে।

প্রায় দশদিন সে নিজেকে বন্দী করে রেখেছিল নিজের শয়নকক্ষে। বাইরের কারুর সঙ্গে দেখা

করেনি। জননী কিংবা পত্নীর অনুরোধে সামান্য কিছু আহার মুখে তোলার ভান করেছে মাত্র। সে আত্মনিগ্রহের চরম দেখতে চেয়েছিল। ক্রমশই বেড়ে উঠছিল তার জেদ, সে ভেবেছিল আত্মহত্যাই তার একমাত্র পরিণতি হতে পারে। নির্জন দুপুরে সে চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল তাদের গৃহের পিছনের দিকে পুকুরে। সন্তরণ জানে না সে, জলের গভীরে তলিয়ে যেতে যেতে বুক ফাটা যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে সে তৃপ্তিতেও বলতে চেয়েছিল, আঃ! আমার শাস্তি শুধু আমি নিজেই দিচ্ছি। আর কেউ না! অবশ্য পরম বিশ্বস্ত এবং সদা অনুগামী দুলালচন্দ্র তাকে ঠিক সময় দেখতে পেয়ে জলে লাফিয়ে পড়ে এবং উদ্ধার করে আনে। নবীনকুমার দুলালচন্দ্রকে পাঁচবার চপেটাঘাত করে বলেছিল, আমার হুকুম ছাড়া তুই কেন আমাকে তুলিচিস, হারামজাদা!

এর পর সে একদিন দুপুরে বাবার আমলের পুরোনো কেলভিন কোম্পানির একটি পিস্তলে গুলি ভরে তার নলটি নিজের গলায় ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দেয়। বহুকাল অব্যবহৃত পিস্তলটি নিজেই ফেটে যায় বিকট শব্দ করে, নবীনকুমারের দুটি আঙুল কিছু জখম হয় মাত্র। দু'বার প্রাণে বেঁচে যাওয়ায় নবীনকুমার প্রাণ হননের চেষ্টা থেকে বিরত হয় বটে কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সামাজিক জীবন থেকে। মুলুকচাঁদের আখড়ায় সে আর কখনো পদার্পণ করেনি। তার বন্ধুরা তাকে কতবার এসে ডেকে ডেকে ফিরে গেছে, কিন্তু সে দেখা করেনি কারুর সঙ্গে।

কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলেই তার চক্ষে সেই দৃশ্যটি ভেসে ওঠে। স্থূলকায়া কমলাসুন্দরী অতিশয় কাতরভাবে আকুলি বিকুলি করে বলছে, ওগো, আমায় ছুঁয়োনি, আমায় ছুঁতে নেই। আমি যে তোমার মায়ের মতন···আর নেশার ঝোঁকে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য নবীনকুমার তাকে আলিঙ্গন করে জড়িত স্বরে বলছে, নাচ দেকাবে না, নাচ? শুয়ে শুয়ে নাচ? প্রতিবার দৃশ্যটি মনে পড়লে ঘৃণায় তার শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগে। এক বিগতযৌবনা বারবনিতার দূষিত শয্যায় রাত্রি যাপন করতে হয়েছে তাকে। লোকপরম্পরায় সে জেনেছে যে ঐ স্ত্রীলোকটিই ছিল তার পিতার রক্ষিতা। সহ্য হয় না, কিছুতেই সহ্য হয় না! এজন্য সে কারুকে দোষ দিতে পারে না নিজেকে ছাড়া। হরিশকে সে দায়ী করতে পারে না কিছুতেই, কারণ হরিশ কোনো দিন নিজে থেকে তাকে ডাকেনি, তাছাড়া নিজের কাজের সময় ঠিক সে উঠে যেতে পারে, তার মতন গা ভাসিয়ে দেয়নি!

চার পাঁচ মাস এই অবস্থায় কাটিয়ে দিয়েছে নবীনকুমার। গ্রন্থপাঠ করে সে মন ভোলাতে চেয়েছে। তারপর শুরু হলো একাকিত্বের যাতনা। তার পাপের কথা সে কারুকে জানাতে চায়। কিন্তু কাকে? ক্যাথলিকরা যেমন গীর্জায় গিয়ে সব কথা উজাড় করে দিতে পারে, সেইরকম ভাবে। বারবার একটি নামই মনে পড়ছিল তার, কিন্তু তাঁর কাছে আসতে ভয় পাচ্ছিল সে। শেষ পর্যন্ত বুঝলো যে, ওঁর কাছে যাওয়া ছাড়া গতি নেই।

এতদিন পর বাড়ির বাইরে এসে নবীনকুমার অনুভব করলো যে মানসিক বৈকল্যের প্রভাব তার শরীরের ওপরেও পড়েছে। চলতে গেলে তার পা কাঁপে, মস্তিষ্কের মধ্যে ঝিম ঝিম শব্দ। কয়েক বৎসর আগে সে গুরুতরভাবে পীড়িত হয়ে পড়েছিল, তখন তার বাঁচার জন্য ব্যাকুলতা ছিল প্রবল। এবারে সে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকবলিত হতে গিয়েছিল। এখনো সে জীবন সম্পর্কে বীতরাগ। জুড়ি গাড়িতে ওঠার অনেক পরে দেখলো যে তার দু' পায়ে দু' রকম পাটির জুতো।

বিদ্যাসাগর তার হাত ধরে টেনে তুলে বললেন, তোমার শরীরের এ অবস্থা হয়েছে কেন? বেশ দিব্যকান্তি ফুটফুটেটি ছিলে! কী পাপ করেছো তুমি শুনি?

অশ্রু সংবরণ করে নবীনকুমার স্থির হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। তখনো তার শরীর কাঁপছে।

বিদ্যাসাগর বললেন, বসো। শান্ত হও!

নবীনকুমার তারপরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। চক্ষু শুষ্ক হবার পর ধীর স্বরে সে বললো, আমাকে শাসন করার কেউ নেই। আমি স্বেচ্ছাচারীর মতন চলতে পারি, আমি কুপথে যাই না সুপথে যাই, সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু আমি আমার মনকে নিজের বশে রাকতে পারিনি, এই আমার পাপ।

এই নবীন যুবকটির কথা শুনে বিদ্যাসাগর খানিকটা সকৌতুক বিস্ময় অনুভব করলেন। এই রকম কাঁচা বয়েসের অধিকাংশ যুবকই তো নিজের মনকে সবশে রাখতে পারে না, এ আর নতুন কথা কী! সদ্য সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়ে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে, এদের পিছনে অজস্র ইয়ার-বক্সী-মোসাহেব জুটে যায়, তারপর মুণ্ডটি চিবিয়ে খায়।

তিনি বললেন, পুরুষকার থাকলেই মনকে নিজের বশে রাখা যায়। এ ব্যাপারে আমি তোমাকে কী

প্রকারে সাহায্য করতে পারি, বলো তো বাপু ?

—আমার মতন ব্যক্তির কি জীবন ধারণের প্রয়োজন আছে ? আমি মরতেও রাজি আছি, যদি আপনি বলেন।

—আমি বললেই মরবে, এ যে বড় বিষম কথা ! কেন, মরবে কেন ? কী এমন গর্হিত কাজ করেছো ? তোমার মতন যুবকের কোনো দিকেই কোনো অভাব নেই, তবু মৃত্যু-চিন্তা, এ তো ভারি আশ্চর্যের !

—আমায় কেউ সুরাপান কত্তে নিষেধ করেনি, আমি ঐ নেশা ধল্লে সবাই ভাবতো স্বাভাবিক, তবু আমি বাল্যকাল থেকে সুরাপানকে ঘৃণার চক্ষে দেখিচি অথচ কখন এক সময়ে আমি সুরাপায়ী হয়ে গেলুম। কুপল্লীতে নষ্ট মেয়েমানুষদের অঙ্গ আমি কখনো কামনা করিনি, অথচ এক রাত্রি অবসানে আমি দেকলুম, আমি সেখেনে শুয়ে আচি। কেন আমার এরূপ বিপরীত মতি ? যে কাজে আমার অনুশোচনা হয়, সে কাজ আমি নিজেই করি কেন ? আপনি আমায় আশ্বস্ত করে দিন।

—তুমি কি আমায় গুরুঠাকুর ঠাওরেছো নাকি ? আমি কোনো মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে তোমায় সারাতে পারবো না। যদি সুপথে থাকতে চাও, নিজেকে শোধরাতে চাও, নিজের মনকে শক্ত করো !

—মন যার নিজের বশে থাকে না সে কোন্ উপায়ে মন শক্ত করবে ?

—শোনো, যারা নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে ন্যায়-অন্যায় বুঝতে শেখে, তারা কখনো পরের কথায় নাচে না। তোমার এখনো বুদ্ধি পাকেনি বোঝা যাচ্ছে। বয়সোচিত দুর্বলতায় যদি কিছু কুকর্ম করে থাকো, এখনো ফেরো সময় বয়ে যায়নি। তোমার অর্থ আছে, দেশের কথা ভাবো, লোকহিতের জন্য কিছু করো। মদ টেনে বয়াটেগিরি করা অতি সহজ, গণ্ডায় গণ্ডায় বড় মানুষের ছেলেরা তো তাই করছে। তুমি যদি প্রকৃত মানুষ হতে চাও, তবে নিজের বিচার বুদ্ধিকে জাগ্রত করো।

—আপনি বলচেন, আমার জীবন ধারণের সার্থকতা আছে ?

—কোনো সৎ কাজ করতে পারলেই জীবন ধারণ সার্থক হয়। তুমি তো দু-একখানা বই লিখেছিলে, সেদিকেই আবার মন দাও !

—সামান্য গ্রন্থ রচনায় আমার আর আগ্রহ হয় না। গত পরশু থেকে আমি অন্য একটা কতা ভাবচি। আমি যদি সম্পূর্ণ মহাভারত বাঙ্গালাতে অনুবাদিত করি, তাতে কি আমার পাপস্খালন হতে পারে ? মুসলমানরা পুণ্য অর্জনের জন্য কোরান নকল করে, আমিও যদি সেই মতন—

বিদ্যাসাগর নবীনকুমারকে আপাদমস্তক দেখলেন একবার। তাঁর ওষ্ঠে হাস্য ফুটে উঠলো। সদ্য গুম্ফরেখা দেখা দিয়েছে এই যুবকের, এ সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করবে ? বলে কী ?

—কী বললে ? তুমি মহাভারত হাতে লিখে নকল করবে, না বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করবে ?

—বাঙ্গালা গদ্যে সমগ্র মহাভারত রচনা করবো।

—তুমি সমগ্র মহাভারত পড়েছো ? জানো সে গ্রন্থখানি কত বিশাল ?

—আজ্ঞে, বাল্যকাল থেকেই মহাভারত গ্রন্থ আমার বড় প্রিয়, কাশীদাস নয়, মহাত্মা ব্যাসদেব বিরচিত যেটি। সম্প্রতি গত কয়েক মাসে গৃহবন্দী থাককালীন আমি আবার আদ্যোপান্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিচি। এ কাজ বিপুল পরিশ্রমসাধ্য আমি জানি, কিন্তু এই শ্রম আমার প্রাপ্য।

বিদ্যাসাগর উচ্চহাস্য করে উঠলেন।

কয়েক মাস ধরে তিনি নিজেও মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন, তা কাটিয়ে ওঠার জন্যই তিনি মাহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এই যুবকও সম্পূর্ণ অন্য কারণে কিছুদিন যাবৎ মনোযোগী, সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য এ-ও মহাভারত অনুবাদের কথা চিন্তা করেছে। এই আকস্মিক মিলটি কৌতুকজনকই বটে।

আরও কিছুক্ষণ নবীনকুমারের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বললেন বিদ্যাসাগর। তারপর তাকে বললেন, সপ্তাহখানেকের মধ্যে সে যেন কয়েক পৃষ্ঠা অনুবাদ করে এনে দেখায়। সেই লেখা দেখে তিনি নবীনকুমারের আন্তরিকতা বিচার করতে পারবেন।

এক সপ্তাহ লাগলো না, দুদিন পরেই নবীনকুমার সঙ্গে নিয়ে এলো স্বরচিত তিন পৃষ্ঠা বাংলা মহাভারত। বিদ্যাসাগর মনোযোগ সহকারে পৃষ্ঠা তিনটি পড়লেন কয়েকবার। তারপর বললেন, তুমি তো সত্যি বড় বিস্ময়কর ছোকরা দেখছি ! তোমার রচনায় কয়কটি ভ্রম আছে, তিন জায়গায় তুমি শ্লোকের ঠিক মতন অর্থ অনুধাবন করতে পারোনি, স্পষ্টই বোঝা যায়, তোমার সংস্কৃত জ্ঞান তেমন নেই। কিন্তু তোমার বাঙ্গালা গদ্যভাষাটি তো বড় চমৎকার। যেমন সাবলীল, তেমনই ঝংকারময়।

অপরাপর লেখকদের রচনা আমি পড়ে দেখেছি, এমন গদ্যভাষা সহসা চোখে পড়ে না। এরকম প্রাঞ্জল অনুবাদ লোকে আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করবে। তুমি সত্য বলছো, তুমি সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করবে?

নবীনকুমার বললো, আপনার পা ছুঁয়ে শপথ কর্তে পারি।

বিদ্যাসাগর বললেন, উত্তম কথা। তুমি এ কাজ একা কিছুতেই পারবে না। সংস্কৃত উত্তমরূপে না জানলে তোমার সারা জীবনের পরিশ্রমেও কোনো কাজ হবে না। তোমার অর্থ আছে, কিছু পণ্ডিত নিযুক্ত করো। আমিই সেরকম কিছু পণ্ডিত ঠিক করে দিতে পারি। তাঁদের দিয়ে সংস্কৃত শ্লোকগুলির সঠিক অর্থ নির্ণয় করিয়ে নেবে, কিন্তু ওঁদের ঐ অং বং ওয়ালা বাঙ্গালা গদ্য চলবে না, তোমার এই সুন্দর ভাষায় সেই রূপ দাও।

নবীনকুমার বললো, আপনি যেরকম বলচেন সেরকমই হবে।

বিদ্যাসাগর বললেন, দেরি না করে কাজে লেগে যাও অবিলম্বে। লঘু আমোদ ছেড়ে তুমি এই কঠিন কর্মে নিযুক্ত হলে তোমার উপকার হবে, এবং তা আমারও আহ্লাদের বিষয় হবে। সেইজন্য, আমি নিজে মহাভারতের যে অনুবাদ শুরু করেছিলুম, তা বন্ধ করে দিলুম। তোমার মহাভারতই দেশে প্রচারিত হোক।

নবীনকুমার বললো, আপনি...আপনি মহাভারতের রূপান্তর শুরু করেছিলেন? আমি জানতুম না, তবে তো আমার...

বিদ্যাসাগর বললেন, আমি অল্পই করেছি, সেখানেই ক্ষান্ত হবো। ভালোই হলো, আমি অন্য কাজে মন দিতে পারবো। তোমার ভয় নেই, আমি মধ্যে মধ্যে তদারক করে আসবো তোমাদের অগ্রগতি। আমার যেটুকু সাধ্য, তা দিয়ে তোমায় সাহায্য করতে বিরত হবো না।
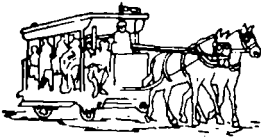
বাহির বাড়ির একটি অংশকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সজ্জিত করে একটি কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। বিশিষ্ট পণ্ডিতদের এনে রাখা হয়েছে সেখানে, তাঁদের সেবার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে কয়েকজন ভৃত্য। ব্রাহ্মণ পাচক নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন রন্ধন করে তাঁদের পরিবেশন করে, যেসব পণ্ডিত স্বপাকে আহার করতে চান, তারও ব্যবস্থা আছে। সংস্কৃত মহাভারতের অনেকগুলি পুঁথি, ছাপা বই, এমনকি পুণা থেকেও আনানো হয়েছে নির্ভরযোগ্য সংস্করণ। নীলকণ্ঠের টীকা সমন্বিত একটি ভাষ্যের পুঁথি নবীনকুমার ক্রয় করেছে বহু টাকা দিয়ে। ক্লৈব্য বা অবসাদ একেবারে দূরীভূত হয়ে গেছে, নবীনকুমার আবার এক অতি চঞ্চল যুবা। সে যেন ঝড়ের আরোহী, অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের বাংলা রূপান্তরের মতন বৃহৎ কাজ সে অনতিবিলম্বে শেষ করতে চায়। তার নিজস্ব ছাপাখানাটি পরিবর্ধিত হয়েছে, কাগজ কেনা হয়েছে রাশি রাশি, সিংহ এস্টেটের সকল কর্মচারী এখন এই কর্মে ব্যস্ত। টাকা-পয়সা যত লাগে লাগুক, তার জন্য কোনো চিন্তা নেই।

একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় এসে সবকিছু পরিদর্শন করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে গেছেন।

বাড়ির অন্দর মহলের সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক ঘুচে গেছে নবীনকুমারের। সে সর্বক্ষণ এখানেই পড়ে থাকে। যদুপতি গাঙ্গুলী এবং বিদ্যোৎসাহিনী সভার আরও কয়েকজন বন্ধু নবীনকুমারের এই নতুন উদ্যমে খুব খুশী হয়েছে, তারা প্রায়ই আসে। অনেকদিন সাক্ষাৎ হয়নি বলে হরিশ মুখুজ্যে একদিন ডেকে পাঠিয়েছিল, নবীনকুমার যায়নি।

কয়েকজন পণ্ডিত মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলির আক্ষরিক বাংলা তর্জমা করে দেন, কয়েকজন সেগুলিকে সাজিয়ে দেন বাংলা গদ্যে, তারপর নবীনকুমার সেই ভাষার ওপর ঘষামাজা করে। মূলের গাম্ভীর্য রক্ষা করেও সুবোধ্য এবং সাবলীল ভাষা সৃষ্টির যেন জাদু আছে তার হাতে। দুটি-একটি শব্দের বিকল্প এবং কোথাও কোথাও ক্রিয়াপদের স্থান পরিবর্তন করলেও যেন নতুন রূপ এসে যায়।

এক অপরাহ্নে নবীনকুমার এই কাজে গভীরভাবে নিমগ্ন, এমন সময় তার ডাক এলো অন্দর মহল থেকে। ডেকে পাঠিয়েছেন বিম্ববতী। ঈষৎ বিরক্ত হলেও নবীনকুমার জননীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারলো না। কলম নামিয়ে রেখে উঠে পড়লো। স্ত্রী সরোজিনী কিছুদিন হলো পিত্রালয়ে গেছে বলে নবীনকুমার রাত্রে নিজকক্ষে শুতেও আসে না ইদানীং। অধিক রাত্রি পর্যন্ত পণ্ডিতদের সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিগূঢ় তত্ত্ব অলোচনা করার পর সেখানকারই একটি কক্ষে শুয়ে পড়ে। এখন মহাভারতই তার ধ্যান জ্ঞান।

নতুন থান বস্ত্র পরে একটি হরিণের চামড়ার আসনে বসে আছেন বিম্ববতী। তাঁকে দেখে সবিশেষ বিস্মিত হলো নবীনকুমার। স্বতই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, একি, মা ?

স্বামীর মৃত্যুর পর কেশচ্ছেদন করেছিলেন বিম্ববতী। তারপর তাঁর পিঠছাওয়া গুচ্ছ গুচ্ছ চুল আবার ফিরে এসেছিল অনেকদিন আগেই। আজ নবীনকুমার দেখলো, বিম্ববতী আবার মস্তক মুণ্ডন করেছেন, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে চন্দনের তিলক, সম্পূর্ণ বৈরাগিণীর বেশ। তাঁর চক্ষু দিয়ে দর দর ধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

অন্তত আট নয় দিন এক পলকের জন্যও বিম্ববতীর সঙ্গে দেখা হয়নি নবীনকুমারের। মায়ের এই পরিবর্তনের ব্যাপার সে কিছুই জানে না। যতই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোক, তবু এখনো প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় দুর্গা প্রতিমার মুখের সঙ্গে সে তার মায়ের মুখের মিল খুঁজে পায়। তার মায়ের মতন রূপসী সে আর একজনও দেখেনি এ পর্যন্ত।

মায়ের এই বেশ এবং চক্ষে জল দেখে তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। সে ছুটে এলো মায়ের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য।

সঙ্গে সঙ্গে বিম্ববতী তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলেন. ছুঁসনি ! ছুঁসনি ! ওরে ছুঁসনি আমাকে !

নবীনকুমার স্থাণুবৎ হয়ে গেল। তার ম' তাকে স্পর্শ করতে নিষেধ করছেন ? এই সেদিনও কাছাকাছি এলেই মা তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন, ছোট্‌কু, তোকে বুকে ধরলে আমি যা শান্তি পাই, তেমন শান্তি ভগমান আর কিচুতে দেননি আমায়।

বিহ্বল কণ্ঠে নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, মা, তুমি আমায় ছুঁতে বারণ করচো ? আমি পাপ করিচি বলে ?

বিম্ববতী বললেন, ওমা, তুই পাপ কর্বি কেন ? বালাই ষাট। চতুর্দিকে এঁটো কাঁটা, সকড়ি, কেউ ছুঁয়ে দিলে আমায় আবার চ্চ্যান কত্তে হবে। তুই একটু দূরে বোস, তোর সঙ্গে আমার কতা আচে।

—তুমি কাঁদচিলে কেন মা ? আমি তোমার মনে নতুন কোনো দুঃখ দিয়িচি ?

—নারে, তুই কেন দুঃখ দিবি ? তুই আমার মানিক, আমার সোনা, আমার সাত রাজার ধন···আমি কানচিলুম মনের সুখে···ভগমান আমায় ডেকেচেন তাঁর ছিপাদপদ্মে আমার ঠাঁই হবে।

—ভগবান তোমায় ডেকেচেন ? ভগবানের কোন সাধ্য আচে মা, যে এক্ষুনি তোমায় ডেকে নেবেন ? আমি আচি না ? ডাকলেই হলো !

—শোনো ছেলেমানুষের কতা। আমি কি মরার কতা বলচি। ছোট্‌কু, আমি কাল হরিদ্বারে রওনা হবো।

—কাল ?···হরিদ্বারে ? তুমি কী বলচো, মা ? কোন্ হরিদ্বার ?

—তুই বাবু একটু ভালো করে বোস দিনি। অমন ঘোড়ায় জিন দিয়ে থাকলে কতা হয় ? আমি মনস্থির করে ফেলিচি, ছোট্‌কু। জগদ্‌গুরু একনাথজীর কাচে আমি দীক্ষা নিইচি, গুরু কৃপা করে তেনার ছিচরণে আমায় স্থান দেবেন বলেচেন। গুরু বলেচেন, আমায় সোংসার ধম্মো এবার ত্যাগ কত্তে। চতুর্দিকে এত নোংরা, কলকেতা শহরটা বড় অশুচি, কেউ এখন আর পাঁইখানা যাবার পর চ্চ্যান করে না, দাসী মাগীগুলো বাসী কাপড়ে বাসুন মাজে, সেই বাসুনে আমরা খাই, ঠাকুর পুজো হয়, এঃ, ঘেন্না, ঘেন্না ! ম্যাগোঃ ! এত অশুচি !

সত্যিকারের ঘৃণায় কেঁপে উঠলো বিম্ববতীর সর্বাঙ্গ। নবীনকুমার বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে লাগলো জননীকে। মাত্র এই কয়েকটি দিনে এত পরিবর্তন ? এরই মধ্যে অনেক শীর্ণা হয়ে গেছেন তিনি, চোখ দুটি অস্বাভাবিক।

বিম্ববতী বললেন, এখেনে আমার শরীল এমন অশুচি হয়ে গ্যাচে যে ঘষে ঘষে ছাল চামড়া তুলে ফেললেও দোষ কাটিবে না। আমি হরিদ্বারে চলে যাবো। কালই।

—হরিদ্বার কতদূরে, তুমি জানো, মা? বেশ তো, সেখেনে যেতে চাও, ব্যবস্থা করা যাবে। কালই কেন?

—তোকে আর কোনো ব্যবস্থা কত্তে হবে না। সব ব্যবস্থা আমি নিজেই করে ফেলিচি, পোঁটলা পুঁটলি বাঁদা হয়ে গ্যাচে। গুরুদেব কাল রওনা হচ্চেন। আমি তাঁর সঙ্গে যাবো। তোর যদি ইচ্ছে হয় আমায় দশ বিশ ট্যাকা মাসোহারা পাটাস, আর না পাটালেও আমার চলে যাবে। ঈশ্বর যা জোটাবেন তাই খেয়ে থাকবো।

—তুমি কার ওপরে রাগ করেচো বলো তো মা? আমি অনেক দোষ করিচি জানি।

—ওমা, ফের ঐ কতা। তুই কেন দোষ কর্বি, ছোট্‌কু। তুই পণ্ডিতদের দিয়ে মহাভারত লেকাচ্চিস, এ তো কত বড় পুণ্যের কাজ। তার জন্যে এ বাড়ি ধন্য হলো। এই বংশ ধন্য হলো। স্বগ্যো থেকে তোর বাবা তোকে আশীর্বাদ কর্বেন। কিন্তু আমায় চলে যেতেই হবে যে, ছোট্‌কু।

—তুমি আমাদের ফেলে চলে যাবে?

—তোকে কোতায় ফেলে যাবো? তুই আমার বুকের ধন, বুকের মধ্যে থাকবি। ভগমানের পর গুরুদেব, তারপর তুই। একনাথজী বলেচেন, মায়ার বাঁদন না কাটালে প্রকৃত ভালোবাসা হয় না। দূরে চলে গেলে তুই সবসময় আমার নয়নে নয়নে থাকবি।

—তোমার যাওয়া হবে না। এই একনাথজী সাধুটি আবার কে? কবে সে এ বাড়িতে এলো? তেনার সঙ্গে আমি দেকা করতে চাই।

—দেকা কর্বি, নিশ্চয়ই কর্বি। বাবা তোকে আশীর্বাদ কর্বেন। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। হরিদ্বারে নির্মল গঙ্গাজলে চ্চ্যান কর্বো, আমার শরীর মন পবিত্র হয়ে যাবে, আর ভগমানের কাচে প্রার্থনা কর্বো, যাতে তোরা সুখে থাকিস, ভালো থাকিস।

—মা, আমি যদি তোমায় জোর করে ধরে রাকি? যদি কান্নাকাটি করি, না খেয়ে থাকি, তাও তুমি যেতে পারবে?

—ছিঃ, অমন কতা বলতে নেই, ছোট্‌কু ভগমান যাকে ডেকেচেন, তাঁকে কি আটকাতে আচে?

অনেক পীড়াপীড়ি অনুনয় বিনয়েও নিবৃত্ত করা গেল না বিম্ববতীকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, তিনি যাত্রার পাকাপাকি ব্যবস্থা আগে থেকেই করে তারপর খবর দিয়েছেন নবীনকুমারকে। এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া কিংবা নিজের উদ্যোগে এতখানি ব্যবস্থা জীবনে আগে কখনো করেননি বিম্ববতী। তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি অনড়।

যাবেনই যখন তখন আর কয়েকটি দিন সময় চাইলো নবীনকুমার বিম্ববতীর কাছে। কিন্তু তাও সম্ভব নয়। আগামী কাল যাত্রার পক্ষে অতি শুভ দিন। তখনই নবীনকুমার মহাব্যস্ত হয়ে বন্দোবস্তের জন্য লেগে গেল। সাতজন দাসদাসী যাবে বিম্ববতীর সঙ্গে। একজন গোমস্তার হাতে টাকা দিয়ে দেওয়া হলো, যেন পৌঁছেই সে বিম্ববতীর জন্য হরিদ্বারের শ্রেষ্ঠ বাড়িটি ক্রয় করে ফেলে। তেমন বাড়ি না পাওয়া গেলে একনাথজীর আশ্রমেই যেন একটি পাকা বাড়ি তৈরি করে ফেলা হয়। সারা বাড়িতে একটা হুলুস্থুলু পড়ে গেল।

এর পর বিধুশেখরের কাছ থেকে বিদায় নেবার পালা। তাঁকে কেউ ডেকে পাঠায়নি। কিন্তু সেই বৃদ্ধের কানে সব খবরই যথাসময়ে পৌঁছোয়। তিনি এলেন বেশ গভীর রাত্রে।

তখন নবীনকুমার মায়ের ঘরে উপস্থিত। বিধুশেখরকে সে সব বৃত্তান্ত খুলে বললো। যথারীতি বিধুশেখর এক কথায় প্রস্তাবটি উড়িয়ে দিলেন প্রথমে। আবার বাদ-প্রতিবাদ চললো। কিন্তু যে বিম্ববতী ভয়ে বিধুশেখরের সামনে এতদিন কথা বলতেই পারেননি, আজ তাঁর মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। মাথায় আজ আর ঘোমটা দেননি তিনি, সব কথার উত্তরে তাঁর এক কথা, তাঁকে যেতেই হবে।

বিধুশেখর এক সময় নবীনকুমারকে বললেন, তুই একবার ঘরের বাইরে যা তো, তোর মাকে আমি একটু বুঝিয়ে বলি।

বিম্ববতী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না, ছোট্‌কু থাক।

তারপরেই উচ্ছ্বসিত কান্না এসে গেল বিম্ববতীর চক্ষে। তিনি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ধরা গলায় বললেন, আপনি···আপনি ছোট্‌কুকে স্নেহের চোকে দেকবেন··তার যাতে মঙ্গল হয়···সে কতা দিয়েচে কখুনো আপনার অবাধ্য হবে না, আপনার সঙ্গে তার অসৈরণ হবে না।

ধীর, শান্ত কণ্ঠে বিধুশেখর বললেন, এ কী কথা বলচো, বিম্ব। ছোট্‌কু আমার প্রাণাধিক, তার সঙ্গে আমার বিবাদ হবে কেন? বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে মতভেদ হয়, কিন্তু ছোট্‌কু যে আমাদের সকলের

বড় আদরের. তার কোনো ইচ্ছেতে আমি বাধা দি ? কি রে ছোট্‌কু বল ?

নবীনকুমার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো।

বিধুশেখর নবীনকুমারের কাঁধে হাত রেখে নরমভাবে বললেন. তোর মায়ের সঙ্গে আমি একটু একলা কতা বলবো. একবার শেষ চেষ্টা করে দেকি. বোঝাতে পারি কিনা। তীর্থ করতে হয় নবদ্বীপ যাক না. কিংবা বৈদ্যনাথধাম ঘুরে আসুক. ভালো রাস্তা। কী. ঠিক বলিচি কিনা ? তুই একটু বাইরে যা। দেকিস. ইদিকে যেন কেউ না আসে।

নবীনকুমার এই সন্ধ্যার ঘটনায় বড় দিশাহারা হয়ে পড়েছে। সে বাইরে বেরিয়ে গেল। বিধুশেখর খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে বিম্ববতীর বিছানায় ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। চোখ থেকে চশমা খুলে ঝুলিয়ে রাখলেন গলার কাছে।

বিম্ববতী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ঠিক করে ফেলেছেন যে বিধুশেখরের স্পর্শ করা পালঙ্কে তিনি আর ঘুমোবেন না। আজ রাতটা তিনি ভূমিশয্যায় কাটাবেন।

হাতের ছড়িটা মেঝেতে কয়েকবার ঠুকে বিধুশেখর বিম্ববতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন। তিনি এমনভাবে বিম্ববতীর দিকে চেয়ে আছেন যেন বনের ব্যাঘ্র দেখছে তার পলায়মান শিকারকে।

কড়া গলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছো ? তোমার ছেলেকে, না আমাকে ?

বিম্ববতী অন্যদিকে মুখ রেখেই বললেন, ভগমান আমায় ডেকেচেন, তাই আমায় যেতে হবে।

বিধুশেখর শুকনোভাবে হাসলেন। তারপর ছড়িটা আবার ঠুকতে ঠুকতে বললেন. অদ্ভুত কতা। ভগবান কখনো কোনো স্ত্রীলোককে ঘর ছাড়াবার জন্য ডাকেন না। স্ত্রীলোকদের ঠাঁই শুধু সংসারে।

—তিনি মীরাবাঈকে ডেকেচিলেন!

—হুঁ। মুখে বুলি ফুটেচে দেকচি। এসব বুলি ঐ একনাথজীর শেকানো। ও ব্যাটা বোষ্টম। ও বোষ্টম হয়ে শাক্ত বাড়ির বৌকে দীক্ষে দেয় কোন্ সাহসে ? আর তুমিই বা আমার মতামত না নিয়ে ওর কাচে গ্যালে কেন ?

এবার বিম্ববতী মুখ ফেরালেন। এখনো তাঁর দুই নেত্রে অবারিত জলোচ্ছ্বাস। এত কান্নাও বিম্ববতীর বুকে জমা ছিল!

তিনি হাত জোড় করে বললেন, আপনি দয়া করুন। যাবার সময় আপনি ভালো মনে আমায় বিদায় দিন। আমায় আশীর্বাদ করুন। আমি ঠাকুরের কাচে আপনার নামে···

বিধুশেখর বিছানার ওপর চাপড় মেরে বললেন, ইদিকে এসো। আমার পাশে এসো। আমার বুকের ওপরে মাতা দিয়ে কাঁদো। আমার বুক খালি করে তোমার জন্যে সব ন্যায় নীতি বিসর্জন দিয়িচি।

বিম্ববতী দুপা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, না। না। অশুচি। আমায় আর কেউ ছোঁবে না।

—বিম্ব, কেন আমায় দুঃখ দিচ্চো ? তোমায় ছেড়ে আমি যে আর থাকতে পারবো না, তা বুঝতে পারো না ? কেন খেলচো আমায় নিয়ে ? তুমি চলে গিয়ে আমায় মেরে ফেলতে চাও ? এই শেষ বয়েসে, তোমার জন্যে সব ন্যায় নীতি বিসর্জন দিয়িচি আমি। বহুদিন চেপে রাখা কামনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলচে। শুধু সামাজিকতা আর বিষয় সম্পত্তির কতা চিন্তা করে নিজেকে বঞ্চিত করিচি আমি। এ শরীরের আর কিচু নেই। এ চোখে দেখি না। বাঁ পায়ে জোর নেই, তবু এ শরীর তোমাকে চায়। বিম্ব, এসো, আমার বুকে মাতা রেকে একটু কাঁদো। আমিও কাঁদবো তোমার সঙ্গে।

বিম্ববতী স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বৃদ্ধ বয়েসে বিধুশেখরের লালসার চরম রূপ দেখেছেন তিনি। কোনো রকম খবর না দিয়ে যখন তখন বিধুশেখর চলে আসেন বিম্ববতীর কক্ষে। বিনা দ্বিধায় দ্বার বন্ধ করে দেন। চতুর্দিকে দাসদাসী গিস্ গিস্ করছে, তারা কি দেখে না ? নবীনকুমার এদিকে বিশেষ আসে না, কিন্তু পুত্রবধূর চোখে তো পড়তে পারে। বাধা দেবার সাধ্য নেই বিম্ববতীর, ভয়ে এবং লোকলজ্জায় তিনি চিৎকার করে উঠতে পারেননি। বিম্ববতীর শরীরে আর যৌবন নেই, রূপ নষ্ট করার জন্য তিনি চুল কেটে ফেলেছেন, তবু তাঁর প্রতি বিধুশেখরের অসম্ভব লোভ। ভোগ করার শক্তিও নেই বিধুশেখরের, যেন তাঁর উদরাময় রোগীর মতন ক্ষুধা। সব সময় আলিঙ্গনের জন্য হাহাকার করেন।

বিম্ববতীকে নীরব দেখে বিধুশেখর বললেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের শত দোষ ক্ষমা করিচি। আমি চাইলে এ্যাতদিন তোমাদের পথের ভিকিরি করে দিতে পাত্তুম। সেজন্য একটু কৃতজ্ঞতা নেই তোমার ? শোনো, আমার উইলে আমার সম্পত্তির অর্ধেক লিকে দিইচি ছোট্‌কুর নামে। আমি মলে সে আমার মুখাগ্নি করবে, আমায় পুন্নাম নরক থেকে বাঁচাবে। যতই সে উড়িয়ে পুড়িয়ে খর্চা

করুক, এত সম্পত্তি পেলে সে রাজসুখ ভোগ করে যাবে। তার বিনিময়ে তুমি আমায় কিছু দাও, বিম্ব। আমি ভিকিরি হয়ে তোমার কাছে হাত জোড় করে চাইচি, তুমি আমায় ছেড়ে যেও না। তুমি আমায় দয়া করো। আর যে কটা দিন বেঁচে আচি তোমার ঐ নরম হাতের সেবা থেকে আমায় বঞ্চিত করো না।

বিম্ববতী তার কোনো উত্তর দিলেন না। বিধুশেখর আরও অনেক কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন। কিন্তু বিম্ববতী প্রস্তর মূর্তি। অকস্মাৎ আবার রূপ বদলে গেল বিধুশেখরের।

—ইদিকে আয়, হারামজাদী!

বিম্ববতী মুখ থেকে সমস্ত ভয় মুছে ফেললেন। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, না। আর আমি পাপ কর্বো না।

—তোকে আমি ছেকল দিয়ে বেঁদে রাকবো। তুই কোতায় যাবি ভেবিচিস? চতুর্দিকে তোর কেলেঙ্কারির কতা রাষ্ট্র করে দোবো। ছেলে পাবার লোভে তুই একদিন স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে ব্যভিচার করিসনি? এখুন সতীপনা দেকানো হচ্চে? পাছায় কাপড় নেই, মাতায় ঘোমটা? আমার হাত ছাড়িয়ে পালাবি! দেকি তোর কেমন সাধ্য?

অকম্পিত কণ্ঠে বিম্ববতী বললেন, হ্যাঁ, আমি চলে যাবো, আমায় কেউ আর আটকাতে পার্বে না।

বিছানা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন বিধুশেখর। লাঠি ভর দিয়ে এক পা এক পা এগুতে এগুতে বললেন, আজ হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। বাইরে তোর ছেলে রয়েচে, সবাই রয়েচে, তাদের সবার সামনে বলে যাবো, তুই আসলে বিধু মুকুজ্যের রাঁড়। ভালো চাস তো এখুনো আমার বুকে আয়।

বিম্ববতী দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। বিধুশেখর খুব কাছাকাছি এসে পড়তে তিনি বললেন, ছোঁবেন না, আমায় ছোঁবেন না, নোংরা, নোংরা, সব নোংরা—

বাঁ হাতটি উঁচু করে মধ্যমার একটি আঙটি দেখিয়ে বিম্ববতী বললেন এর মধ্যে বিষ আচে, ক'দিন হলো জোগাড় করে রেকিচি, আর একবার অশুচি হলেই আমি বিষ খাবো।

দাতে দাঁত চেপে বিধুশেখর বললেন, তবে তাই খা। বিষ খেয়ে ছটপটিয়ে মর আমার সামনে, আমি তাই দেকি।

বিম্ববতী আঙটির ঢাকনাটা খুলে ফেললেন। তারপর কপালে হাত ঠেকিয়ে ইষ্টদেবের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে আঙটিটা ওষ্ঠে ঠেকাতে গেলেন।

ডান হাতের ছড়িটা তুলে বিধুশেখর খুব জোরে মারলেন বিম্ববতীর বিষময় আঙটি সমন্বিত হাতটিতে।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বললেন, ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি। আমি জানি। কামের দ্বারা কামের উপশম হয় না। বলপ্রয়োগে নারীকে ভোগ করা পশুর প্রবৃত্তি। সবই জানি। শুধু এটাই জানতুম না, মানুষের মন সব সময় যুক্তি মানে না। এক এক সময় ন্যায়-নীতি-ধর্ম সবই তুচ্ছ হয়ে যায়। বিম্ব, যদি হরিদ্বারে গিয়ে শান্তি পাও, তবে তাই যাও। আমি এখেনেই জ্বলে পুড়ে মর্বো, সেই আমার নিয়তি। আমা দ্বারা তোমার ছেলের কোনো ক্ষতি কখুনো হবে না। তুমি সেই কতাটাই শুনতে চাও তো? কতা দিলুম।

বিম্ববতী এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সাতদিনের মধ্যে পরপর দুজন বাহকের হাতে দুটি পত্র এসে পৌঁছোলো। একটি লিখেছে বিরাহিমপুর কুঠীর নায়েব ভুজঙ্গ ভট্টাচার্য আর একটি লিখেছে পুলিশের এক দারোগা। দুটি চিঠিতেই গঙ্গানারায়ণের সংবাদ আছে, কিন্তু দুজনের সংবাদ দু'রকম।

দাঁত পড়ে গেলে অনেকেই নিরামিষাশী হয়। হাটখোলার মল্লিকবাড়ির প্রবল বিলাসী পুরুষ কালীপ্রসাদ মল্লিক নিদারুণ উদরের ব্যামোয় ভুগে একেবারে মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এসে মদ্যপান একেবারে পরিত্যাগ করেছেন। পেটে আর এক ফোঁটাও সুরা সহ্য হয় না। সেজন্য তিনি এখন ঘোরতর সুরানাস্তিক। মদ্যপান রূপ অনাচারের ফলে দেশ যে একেবারে রসাতলে যেতে বসেছে, একথা তিনি এখন সর্বত্র বলে বেড়ান। সিমলের জগমোহন সরকার মদ্যপান বর্জনের জন্য যে আন্দোলন শুরু করেছেন, কালীপ্রসাদ মল্লিক তার জন্য চাঁদা দেন উদার হস্তে।

একটা কিছু নেশা তো দরকার। তাই কালীপ্রসাদ মল্লিক এখন মেতেছেন পুজোআর্চায়। ইয়ার-বক্সীদের নিয়ে আর মদের আসর বসান না বলে কালীপ্রসাদ মল্লিক তো আর দরিদ্র হয়ে যাননি। বাড়িতে নারায়ণ-শিলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর পিতার আমলেই, এক বেতনভোগী বামুন দু বেলা ঘণ্টা নেড়ে ফুল-বেলপাতা ছুঁড়ে দিয়ে যেত এতদিন। এবার কালীপ্রসাদের আনুকূল্যে সেই কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর খণ্ডটির ভাগ্য ফিরলো। অবিলম্বেই সেই নারায়ণ-শিলাকে বসানো হলো সোনার সিংহাসনে। তার জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো শ্বেতপাথরের নতুন মন্দির, প্রতিদিন মহা ধুমধামে পুজো হয় সেখানে। সন্ধ্যেবেলা সেখানে চক্ষু মুদে দু হাত জোড় করে ধ্যানাসনে বসে কালীপ্রসাদ উদাত্ত গলায় বলেন, প্রভো, দয়া করো! তুমিই মোক্ষ, তুমিই মুক্তি! রাখে হরি, মারে কে?

এছাড়া বারো মাসে তেরো পার্বণ তো লেগেই রইলো। এত কম পার্বণে কালীপ্রসাদের মন ভরে না। ইতু, মঙ্গলষষ্ঠী, সুবচনী, ত্রিনাথ, মনসা ইত্যাদি পূজারও প্রচলন করলেন তিনি। প্রায়ই ঢাক-ঢোল, খোল-করতাল ইত্যাদি পবিত্র বাজনার শব্দে পল্লীর বাতাস কাঁপে। শত শত কাঙাল-আতুর প্রসাদ পায়।

শতবর্ষ পার হয়েও বৃদ্ধ জগাই মল্লিক এখনো বেঁচে আছেন। আর তাঁর সান্ধ্যভ্রমণের ক্ষমতা নেই। সন্ধ্যাকালে ভৃত্যেরা তাঁকে ধরে ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় বারান্দার রেলিংয়ে। দন্তহীন মুখখানি নেড়ে বৃদ্ধ শুধু ম-ম-ম-ম শব্দ করে চলেন। পুত্রের যে মতি ফিরেছে, এটা বেশ বুঝতে পারেন জগাই মল্লিক, কানে কিছুই শুনতে পান না তিনি, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি একেবারে যায়নি। নতুন মন্দিরের প্রাঙ্গণে ঢাকী ঢুলীদের নৃত্য করতে দেখলেই তাঁর মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

কনিষ্ঠপুত্র চণ্ডিকাপ্রসাদের অবশ্য বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। কালীপ্রসাদ ছোট ভাইকে মদ-মেয়েমানুষের পথ থেকে সরিয়ে ধর্মকর্মের দিকে আনার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। এ পথেও আমোদ কম নেই। অনেকে বাহবা দেয়, অনেকে ধন্য ধন্য করে, বিশেষত হজমশক্তিটি ঠিক থাকে। আর মধ্যরাত্রে বুকজ্বালায় অস্থির হয়ে ঘটি ঘটি জল পান করতে হয় না কালীপ্রসাদকে। এখন প্রতিরাত্রেই তাঁর সুস্থির নিদ্রা হয়। কিন্তু চণ্ডিকাপ্রসাদ এ সব কথায় কর্ণপাত করেনি, এখনো তার যৌবন আছে, শরীরে শক্তি আছে এবং তার মস্তিষ্কে মগজ নামক বস্তুটি বরাবরই কম। উপরন্তু, দু বৎসর আগে সে একটি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করেছিল। এক যবনী বারাঙ্গনার বাড়িতে তার নিজস্ব রক্ষিতার শয্যায় তারই বেতনভুক্ এক তবলাবাদককে অসমীচীন অবস্থায় অকস্মাৎ দেখে ফেলে সে এমনই কুপিত হয়ে উঠেছিল যে, প্রকাণ্ড একটি জল-ভর্তি কলসী ওর মাথায় নিক্ষেপ করে। তবলাবাদকটির মৃত্যু হয় সঙ্গে সঙ্গে। এর ফলে পুলিসের হাঙ্গামায় পড়তে হয় চণ্ডিকাপ্রসাদকে। কালীপ্রসাদ অনেক অর্থ ব্যয় করে সেবার ছোট ভাইকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন কিন্তু এর পরও চণ্ডিকাপ্রসাদ সুপথে আসতে চায়নি।

বিরক্ত হয়ে কালীপ্রসাদ বিষয়সম্পত্তি ভাগ করে চণ্ডিকাপ্রসাদকে পৃথগান্ন করে দিয়েছেন। এক সঙ্গে অনেক টাকা হাতে পেয়ে চণ্ডিকাপ্রসাদ একেবারে কান্নিক খাওয়া ঘুড়ির মতন আরও বেশী লাট খেতে লাগলো। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় হাতের লাল রুমাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে গান গায়, 'অব্

হুজরত জাতে লণ্ডন কো…' আর বেসামাল অবস্থায় বাড়ি ফেরার সময় মুখে লেগে থাকে এই গান, 'পরেরো মনেরো ভাবো বুঝিতে কি পারে পরে…।'

এই তিন মহলা বাড়িটির তিনটি দৃশ্য এখানে উপস্থাপিত করা যাক।

কালীপ্রসাদের দুই পুত্র। এদের মধ্যে শিবপ্রসাদ বিবাহাদি করে সংসারী হয়েছে। এত ধনী পরিবারের সন্তান হয়েও সে স্বভাব-কৃপণ। হাত দিয়ে তার সহজে একটি আধলাও গলতে চায় না। এই কৃপণতার জন্যই সে কখনো উচ্ছৃঙ্খল হতে পারলো না, সে তার জীবনীশক্তিও ব্যয় করতে ভয় পায়। বাপের বিষয় সম্পত্তি এখন সে-ই দেখে। কালীপ্রসাদের তিন কন্যার মধ্যে একজন মাত্র বিধবা, সে তার জননী ক্ষেমঙ্করীর ছত্রছায়ায় থাকে। ক্ষেমঙ্করীর এখন বড় সুখের দিন, তাঁর স্বামী কালীপ্রসাদ সর্বক্ষণ বাড়ি থাকেন।

কালীপ্রসাদের কনিষ্ঠপুত্র অম্বিকাপ্রসাদ কিছুদিন কলেজে পড়েছিল, তার ফলে সে একজন অতিমাত্রায় নব্য যুবক। প্রিন্স অব ওয়েলসের ছবি দেখে সেই কায়দায় সে চুলের টেরি কাটে এবং গলায় একটি সিল্কের স্কার্ফ বাঁধে। তার স্বাস্থ্যটি বেশ ভালো এবং তার শিকারের খুব শখ। প্রায়ই সে বন্দুক ও বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে শিকারে যায়। কিছুদিন আগেই সে জয়নগর-মজিলপুরে গিয়ে একটি বাঘ মেরে এসেছে।

এই অম্বিকাপ্রসাদ তার পিতার আকস্মিক পরিবর্তনে তেমন প্রসন্ন হয়নি। আর কোনো কারণে নয়, এত ঢাক-ঢোল খোল-কর্তালের শব্দ তার সহ্য হয় না। এর আগে পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎকারই হতো কদাচিৎ। এখন পিতার এই সরব উপস্থিতিতে সে ব্যতিব্যস্ত। প্রায়ই সে তার ফ্রেণ্ডদের নিয়ে ঘরে বসে ফিলজফি কিংবা সোসিয়াল প্রব্লেম বিষয়ে আলোচনা করে নিজের ঘরে। তার বন্ধুরা দু-একজন ব্রাহ্ম, কয়েকজন নিরীশ্বরবাদী, তারা এ বাড়িতে এত পূজার ধুম দেখে হাসে, তাতে অম্বিকাপ্রসাদের বড় অপমান হয়।

স্বাস্থ্যচর্চার দিকে ঝোঁক বলে অবিম্বকাপ্রসাদ এতদিন নেশা-ভাঙ কিছু করেনি, পিতার প্রতি বিরক্ত হয়ে এক সময় শুরু করে দিল। প্রথমে একটু-আধটু, তারপর অবাধ। তা বন্ধুদের মধ্যে যারা নিরীশ্বরবাদী তাদেরই বোতল-আসক্তি বেশী! দার্শনিকতত্ত্ব আলোচনার সময় সহসা তারা কোটের পকেট থেকে চ্যাপ্টা ব্রাণ্ডির বোতল বার করে চুমুক দিতে শুরু করে।

একদিন বিধবা বিবাহের গুণাগুণ বিষয়ে আলোচনা এবং ব্র্যাণ্ডিপান বেশ জমে উঠেছে। ক্রমে নেশার মাত্রাটি বেশ চড়ে যাবার পর বাইরের মন্দিরে সাড়ম্বরে ঢাকঢোল বেজে উঠলো। অম্বিকাপ্রসাদের এক বন্ধু মুখ বিকৃত করে বলল, আঃ, একটু শান্তিতে ডিপ থিংকিং করারও উপায় নেই! আর এক বন্ধু বলল, অম্বিকে, তোমার ফাদারের-এই সাত্ত্বিক ড্রাম বিটিংয়ে যে আমাদের কর্ণপটাহ ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। আর একজন বললো, ওরে বাপ রে বাপ! উইণ্ডোগুলো সব ক্লোজ করে দে এক্ষুনি! আর একজন বললো, গুগ্‌গুলের ধোঁ আমার সহ্য হয় না। আমার হাঁচি আসচে—

বন্ধুদের বিদ্রূপে নিদারুণ মর্মপীড়া বোধ করে না, এমন পুরুষ দুর্লভ। তখন পিতা মাতা তুচ্ছ। অবিম্বকাপ্রসাদ দারুণ চটে উঠে হাতের অর্ধসমাপ্ত ব্র্যাণ্ডির বোতলটি জানলা দিয়ে ছুঁড়ে মারলো বাইরে। সেই সঙ্গে বলল, ধুর শালা!

ব্র্যাণ্ডির বোতলটি কারুকে আহত করলো না বটে, কিন্তু সেটি অদূরে ভেঙে যাবার পর ভিতরের তরল পদার্থটির গন্ধ কালীপ্রসাদের নাকে আসতেই তিনি দারুণ চমকে উঠলেন। মন্দিরের চাতালে মোসাহেব পরিবৃত হয়ে চক্ষু বুজে বসে তিনি তখন প্রভো, প্রভো করছিলেন, এমন সময় সেই পরিচিত গন্ধ যা নাকে এলেই তাঁর বিবমিষা আসে। আজ বিবমিষার বদলে এলো রাগ। তিনি সোজা চলে এলেন ছেলের ঘরে।

তার ছেলে বাড়িতেই সুরার আসর বসিয়েছে দেখে ক্রোধে তাঁর অন্তরাত্মা পর্যন্ত জ্বলে উঠলো। তিনি নিজে বাড়িতে কখনো এ জিনিস স্পর্শ করেননি। আর এখন তো তিনি মদ্যপানের ঘোর শত্রু, তাঁর ছেলে সে কথা জেনেও মান্য করেনি? তিনি কাঁপতে কাঁপতে বললেন, বেল্লিক! ছুঁচোর দল! বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা ফেঁদিচিস! আমি…আমি…আমি…

আর কথা বলতে পারলেন না কালীপ্রসাদ, ছুটে এসে সজোরে এক চড় কষালেন ছেলের গণ্ডদেশে।

চপেটাঘাত খেয়ে প্রথম কয়েক মুহূর্ত দিশাহারা হয়ে গেল অম্বিকাপ্রসাদ। বন্ধুদের সামনে এতখানি অপমান! বন্ধুরা তাকে মনে করছে দুগ্ধপোষ্য শিশু।

পরক্ষণেই উল্টে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো পিতার ওপরে। ইস্টুপিট, ওল্ড ফুল বলতে বলতে সে প্রাণপণে মারতে লাগলো কিল-চড়-ঘুষি। ব্যাপার বেগতিক দেখে বন্ধুরা দুদ্দাড় করে ছুটে পালালো! এর মধ্যে শব্দ শুনে এসে পড়লেন অম্বিকাপ্রসাদের জননী ক্ষেমঙ্করী। তিনি দু হাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আর্তস্বরে বলতে লাগলেন, ওরে কী কচ্চিস! এ কী সব্বোনাশ! ও ছোটখোকা, ও বাপ আমার!

এক সময় নিবৃত্ত হয়ে হাঁপাতে লাগলেন অম্বিকাপ্রসাদ। তখন কালীপ্রসাদ মাটিতে পড়ে গোঁ গোঁ শব্দ করছেন।

ব্যাকুলভাবে কেঁদে ফেলে ক্ষেমঙ্করী বললেন, ও অম্বিকে, এ কী কল্লি? লোকটা মরে গ্যালো নাকি? তুই পিতৃঘাতী হলি?

নেশায় চক্ষু দুটি করমচার মতন রাঙা, সমস্ত মুখ ঘর্মাক্ত অবস্থায় অম্বিকাপ্রসাদ সগর্বে বললো, মরুক। ঐ ওল্ড ফুলটা মরুক না, তাতে ক্ষতি কি? তুমি কাঁদচো কেন, মা? তোমার চিন্তা নেই। বেঁচে থাক বিদ্যেসাগর, তোমার আমি আবার বে দেবো! এবার ভালো করে দেকে শুনে একটা রিফর্মড বাবা নিয়ে আসবো! সেই বাবাতে আমাতে তোমার সঙ্গে বসে হেলথ ড্রিঙ্ক কর্বো! এই বুড়োটা না মলে নতুন বাবা আসবে কী করে?

সে যাত্রায় কালীপ্রসাদ মরলেন না অবশ্য। এবং কনিষ্ঠপুত্র যে-হেতু সব সময়ই বেশী প্রশ্রয় পায়, তাই গর্ভধারিণীর অনুরোধে অম্বিকাপ্রসাদকে তিনি ক্ষমাও করে দিলেন।

চণ্ডিকাপ্রসাদের মহলে দুর্গামণি প্রায় একাই বাস করে। তার স্বামী সপ্তাহান্তে একবারও ঘরে ফেরে কিনা সন্দেহ। এখন নিজেই হুণ্ডি-কাটার অধিকারী হবার ফলে অর্থ সংগ্রহের কারণেও তার বাড়িতে আসার তেমন কোনো দায় নেই। কখনো কখনো সে বিষয়-সম্পত্তির তদারকির অছিলায় মফস্বলে যায়, তখন সঙ্গে যায় বজরাভর্তি ইয়ার-বক্সী, পেটি পেটি মদ্য ও একাধিক বারবনিতা। যে গতিতে সে চলেছে, তাতে আর কয়েক বছরের মধ্যেই সে সব কিছু ফুঁকে দিতে সক্ষম হবে।

দুর্গামণি পুত্রহীনা। পঁচিশ বৎসর বয়স, যৌবনের সমস্ত সম্পদ এখন তার শরীরে। দুর্গামণির মুখশ্রীতে লাবণ্যের চেয়ে তেজের ভাবটাই বেশী। বেশ দীর্ঘকায়া, সবচেয়ে দর্শনীয় তার চুল। এক ঢাল কোঁকড়া, ঘন কৃষ্ণবর্ণ চুল তার পিঠ ছেয়ে থাকে। দুর্গামণি কখনো চুল বাঁধে না, পায়ে আলতা পরে না, মুখে পমেটম মাখে না। কিছুরই অভাব নেই তার। অনেক দাসদাসী, তবু সে এক বন্দিনী।

দুর্গামণি কিছুটা লেখাপড়া জানে। স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। আর সেটাই তার জ্বালা। তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই, তার সারাটা জীবন এমনভাবেই কাটবে। ফরাসডাঙ্গায় তার পিত্রালয়। বেশ বুনিয়াদী বংশের কন্যা সে, এখন সে বংশের অবস্থা পড়ন্ত। কাককে কিছু না বলে দু-বার এ বাড়ি থেকে পালিয়ে সে একা চলে গিয়েছিল ফরাসডাঙ্গায়। প্রথমবারের সময় তখনও এ বাড়িতে যৌথ সংসার ছিল, গৃহকর্তা হিসেবে কালীপ্রসাদ লোক পাঠিয়ে ভ্রাতৃজায়াকে আবার পিত্রালয় থেকে আনিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার দুর্গামণির ভাইয়েরাই জোর করে তাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে যায় কিছুদিন বাদে। বয়স্থা সধবা স্ত্রীলোকদের বেশী দিন বাপের বাড়িতে থাকতে নেই। তাতে দুই কুলেরই অপবাদ হয়। তা হলে দুর্গামণি কোথায় যাবে?

এ বাড়িতে কুসুমকুমারীই তার একমাত্র বন্ধু। যদিও কুসুমকুমারী তার থেকে বয়েসে বেশ কিছুটা ছোট। তবু তার সঙ্গেই দুর্গামণির মনের কথা হয়। দুর্গামণির কথা শুনে সরলা কুসুমকুমারী চমকিত, শিহরিত হয়ে ওঠে।

দুর্গামণি বলে, আমার এক এক সময় কী ইচ্ছে যায় জানিস, কুসোম? ইচ্ছে যায়, বাজারে গিয়ে নাম লেকাই। নটী হই!

কুসুমকুমারীর মুখখানি বিবর্ণ হয়ে যায়।

দুর্গামণি বলে, কেন এখুনো যাইনি জানিস? শুদ্ধু আমার মায়ের জন্যে। আমি পাপ-পুণ্যের পরোয়া

করিনি ! এই জীবনেই তো নরক যন্তোন্না পাচ্চি, এর চে আর কী বেশী শাস্তি পাবো ? কিন্তু আমার মা বড় ভালো, তার মনে দুঃখু দিই কী করে বল ? আমি নষ্ট হলে, আমি পাপ কল্লে আমার বাপ-মায়ের বংশে কলঙ্ক লাগবে, সেই কতা ভেবে আমি যেতে পারি না। তা হলে সারা জীবন এইভাবেই পচে মত্তে হবে ? আমাদের মতন পোড়াকপালীদের আর কোন্ পথ খোলা আচে ?

একটু থেমে সে আবার বলে, আর একটা পথ খোলা আচে বটে। কিন্তু আমি মত্তে চাই না রে, কুসোম। আমার বড় বাঁচতে ইচ্ছে করে !

দুর্গামণি অনেকবার কুসুমকুমারীকে প্ররোচনা দিয়েছে তার স্বামী অঘোরনাথকে বিষ খাইয়ে হত্যা করতে। দুর্গামণির মতে, এমন অনারোগ্য হিংস্র উন্মাদকে পৃথিবী থেকে অপসারণ করে দেওয়ায় কোনো পাপ নেই। তাতে সে-ও যন্ত্রণা থেকে বাঁচবে। কুসুমকুমারীও বাঁচবে।

এ সব কথা শুনে কুসুমকুমারী তার নীলবর্ণ চক্ষু দুটি পরিপূর্ণ ভাবে মেলে চুপ করে চেয়ে থাকে। কোনো উত্তর দেয় না।

এক এক সময় দুর্গামণি কুসুমকুমারীর চিবুকটি নিজের করতলে ধরে বলে, তুই বড় সুন্দর রে, কুসোম। তোর মিতেনীর বর যে তোর নাম দিয়েছিল 'বনজ্যোৎস্না', বড় সাথক নাম। আমি যদি পুরুষমানুষ হতুম, আমি নিশ্চয় বিয়ে কত্তুম তোকে। আর যদি তা না হতো, তা হলে জোর করে ব্যভিচার কত্তুম তোর সঙ্গে।

সমস্ত বড় মানুষদের বাড়ির মতন, এ বাড়িতেও একগুচ্ছের আশ্রিত পরিজন থাকে। কেউ পল্লবিত শাখা প্রশাখার আত্মীয়, কেউ গ্রাম সম্পর্কের। সত্যপ্রসাদ নামে একটি যুবক এ-বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করে। একদিন কী কারণে অম্বিকাপ্রসাদের সঙ্গে তার মতান্তর হওয়ায় তাকে বিদায় নিতে বলা হলো। নিজের বইপত্র ও পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে যুবকটি যখন গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কোনো কেরাঞ্চি গাড়ির অপেক্ষায়, সেই সময় ছাদ থেকে দুর্গামণি দেখতে পেল তাকে। ছেলেটির দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটির মধ্যে এমন কিছু ছিল যা দেখে মমতা হলো দুর্গামণির। সে একজন ভৃত্য পাঠিয়ে ডেকে আনালো ছেলেটিকে। তার মুখে সব কথা শুনে দুর্গামণি বললো, যেতে হবে না তোমায়, তুমি এ মহলার নিচের তলায় থাকো।

এ নিয়ে অন্য মহলে দুর্গামণির নামে পাঁচ কথা কানাকানি হলো ঠিকই। কিন্তু দুর্গামণি সে সব গ্রাহ্য করে না।

সত্যপ্রসাদ ছেলেটি লাজুক প্রকৃতির। শৈশবে পিতৃহীন। দুর্গামণির চেয়ে সে বৎসর চারেকের ছোট। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে। দুর্গামণি তাকে ডেকে এনে তার কাছ থেকে কলেজের গল্প শোনে। এক এক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, যদি পরজন্ম বলে কিছু থাকে, তবে যেন পুরুষ হয়ে জন্মাই। তখন তোমাদের মতন আমিও কলেজে পড়বো। যখন খুশী বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবো, আসবো।

সত্যপ্রসাদ নানাপ্রকার বাংলা বই এনে দেয় দুর্গামণিকে। ইংরেজী বই থেকে গল্প পড়ে পড়ে শোনায়। শ্রোতা হিসেবে কুসুমকুমারীও এসে জুটে যায়। মাঝে মাঝে তারা তাস খেলে। মল্লিকবাড়ির দ্বিতীয় মহলের এক নিভৃত কক্ষে ওরা তিন সঙ্গী একত্র অনেক সময় কাটায়।

একদিন দুর্গামণি কুসুমকুমারীকে বললো, জানিস কুসোম, আমাদের সত্যর কিন্তু তোকে খুব পচন্দ ! তুই অত দূরে দূরে বসিস কেন, ওর একটু কাচ ঘেঁষে বসলেও তো পারিস !

কুসুমকুমারীর মুখখানি লজ্জারুণ হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। সে বলে, যাও, খুড়ী, ও রকম কতা আর বলবে না। তা হলে আর তোমার কাচে আসবো না।

দুর্গামণি বলে, আহা, লজ্জায় তো মুখ একেবারে গোলাপ ফুলের বন্ন হয়ে গ্যাল। আমি সব বুজি, সত্য তোর দিকে কেমন ভারি ভারি চোক করে চায়, খেলায় তোকেই ইচ্ছে করে জিতিয়ে দেয়। আমি ফরাসডাঙ্গার দত্তবাড়ির মেয়ে, আমার চোককে কে ফাঁকি দেবে ?

কুসুমকুমারী শরীরে ভালো করে আঁচল জড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি চল্লুম।

দুর্গামণি তার হাত চেপে ধরে বলে, পুরুষমানুষের গা থেকে একটা তাপ বেরোয়, কাচে গেলেই টের পাওয়া যায়। তুই টের পাস না ? ঐ তাপে গা শেঁকতে বড় আরাম। পোড়ারমুখী, সারাটা জীবন

এমনভাবে কাটাবি ? শুদু কুঁকড়ে-মুকড়ে থাকবি।

কুসুমকুমারী এবারে খানিকটা ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর দেয়, তোমার যদি অত শক, তো তুমিই কেন বসো না ওর গা ঘেঁষে ?

দুর্গামণি বলে, দূর, ও তো আমার হাঁটুর বয়িসী। আমি কি ওকে ঐ চোকে দেক্‌তে পারি ? আমি যদি তেমন মনের মানুষ পেতুম, তা হলে প্রাণ খুলে তার সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা কত্তুম। আমার তো পাপ-পুণ্যির ভয় নেই। কিন্তু আমায় কেউ চায় না রে, কুসোম। আঁটকুড়ি হয়েই জীবনটা কাটাতে হবে আমায়।

একদিন সত্যপ্রসাদ আর ওরা দুজন তাস খেলছে এমন সময় নিচতলায় হল্লা শোনা গেল। এ হল্লার সঙ্গে ওরা পরিচিত। বিশেষ কোনো কারণে চণ্ডিকাপ্রসাদ বাড়ি ফিরেছে। তাকে পালকি থেকে নামানো, সিঁড়ি দিয়ে তোলা, সে এক বিরাট পর্ব, ভৃত্যদের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে যায়। সিঁড়ির কাছে শোনা যাচ্ছে চণ্ডিকাপ্রসাদের জড়িত কণ্ঠের সেই একই গান।

এই সময় খেলা ভেস্তে যায়, কুসুমকুমারী এবং সত্যপ্রসাদ দ্রুত প্রস্থান করে। কোনো কোনো সময় দিনের বেলা হলে দুর্গামণিও চলে যায় এ মহল ছেড়ে। আজ দুর্গামণি বললো, দাঁড়া। একটুক্ষণ ভেবে আবার বললো, তুই চলে যা, কুসোম। সত্যপ্রসাদ থাক।

কুসুমকুমারী চলে যাবার পর সত্যপ্রসাদের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকালো দুর্গামণি।

সত্যপ্রসাদ কম্পিত কণ্ঠে বললো, বৌঠান্—

হাত তুলে তার কথা থামিয়ে দিল দুর্গামণি। তারপর তুমির বদলে তুই সম্বোধন করে তাকে বললো, তোর কোনো ভয় নেই। আমি আচি না! যা বলবো শুনবি।

সত্যপ্রসাদের হাত ধরে তাকে দুর্গামণি নিয়ে এলো নিজের শয়নকক্ষে। বিছানা থেকে সুজনিটা তুলে বললো, তুই এখেনে শো, আমি তোর পাশে থাকবো। খপরদার, আমাকে ছুঁবি না, চোক বন্ধ করে থাকবি। আমি না বললে চোক খুলবিনি।

সত্যপ্রসাদের পাশে শুয়ে পড়লো দুর্গাগণি, বুক থেকে আঁচল খসিয়ে লাস্যময়ীর ভঙ্গি করে রইলো। তার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। কক্ষের দ্বার খোলা।

একটু পরেই ভিতর মহলে ঢুকে পড়লো চণ্ডিকাপ্রসাদ। পুরুষ ভৃত্যরা আর এ পর্যন্ত আসে না। টলতে টলতে নিজের কক্ষের দিকে এগোলো, মুখে তখনও সেই গান। নিজের রক্ষিতার শয্যায় এক তবলিয়াকে দেখে যার মাথায় খুন চেপেছিল, সে নিজের পত্নীর কক্ষের দিকে একবার দৃকপাত পর্যন্ত করলো না, দুর্গামণিকে ডাকলোও না, কোনোক্রমে কক্ষের পালঙ্কে ধড়াস করে পড়লো।

একটু পরেই তার প্রবল নাসিকা গর্জন শুরু হবার পর দুর্গামণি আস্তে উঠে নিজের বেশবাস সামলে নিয়ে বললো, তুই এবার যা, সত্য!

সত্যপ্রসাদ চলে যাবার পর দুর্গামণি নিজের আঙুলের নোখগুলো যেন মার্জারীর মতন ধারালো করে তুললো, তারপর ফালা ফালা করে ছিঁড়তে লাগলো নিজের মাথা-দেওয়ার রেশমী বালিশটা।

তৃতীয় মহলে অঘোরনাথকে নিয়ে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অঘোরনাথ নিজের পত্নী কিংবা জননীকে একেবারেই চিনতে পারে না। সে একমাত্র চেনে বাড়ির এক অতি বৃদ্ধা দাসীকে। তার জন্মের সময় এই দাসীটিই ধাত্রীর কাজ করেছিল। শুধু এই ধাত্রীর হাতে ছাড়া আর কেউ খাবার দিলে সে খায় না। মোটা লোহার শিকল দিয়ে দুই হাত ও পা বেঁধে রাখা হয়েছে অঘোরনাথের, কারণ সে অতিশয় হিংস্র। উন্মাদ হবার পর থেকে তার আর কোন রোগ হয় না, এমনকি জ্বর পর্যন্ত হয় না, দিন দিন তার শরীর হয়ে উঠছে দৈত্যের মতন, শরীরের পরতে পরতে ময়লা এবং নিজের মূত্র-পুরীষের মধ্যে বসে থাকে সে। প্রাচীনা দাসীটি তাকে মায়ের অধিক সেবা করেছে এতদিন, কিন্তু মাত্র দু'দিনের জ্বরে সে চিরকালের মতন চলে গেল।

এখন অঘোরনাথের কাছে কে যাবে ? কে তার মুখে আহার তুলে দেবে ? কেউ সামনে ঘেঁষতে সাহস পায় না। অঘোরনাথের জননী এর আগেই পুত্রের কাছ থেকে এমন পদাঘাত পেয়েছেন যে তাঁর কোমর ভেঙে গেছে, আর তিনি সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারেন না।

তিনদিন চারদিন হয়ে গেল অঘোরনাথের মুখে এক দানা অন্ন ওঠেনি। সে চক্ষু দুটি গোলাকার করে এদিক ওদিক চায়, মনে হয় সেই দাসীটিকে খুঁজছে। কয়েকজন তাকে খাওয়াবার চেষ্টা করেও প্রচণ্ড হুংকার শুনে পালিয়ে এসেছে। অঘোরনাথের জননী মেঝের পাথরে কতবার মাথা ঠুকলেন, কত চিকিৎসক ডেকে আনা হলো, কিন্তু কোনো সুফলই দেখা গেল না। সকলের মনোভাব এই যে, একমাত্র কুসুমকুমারীই আন্তরিক চেষ্টা করলে ওকে খাওয়াতে পারবে। সতী সাধ্বী রমণীরা স্বামীর জন্য কত কী করে, বেহুলা তার মৃত স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়েছিল, আর কুসুমকুমারী এটা পারবে না? দুর্গামণিই একমাত্র নিষেধ করেছিল, তুই খপরদার যাবিনি কুসোম, লোকে যাই বলুক, ও পাগল তোকে প্রাণে মেরে দেবে।

হলোও তাই। কুসুমকুমারী ঠাকুরঘরে প্রণাম করে, গুরুজনদের পায়ের ধুলো নিয়ে পায়েসের বাটি নিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল স্বামীর দিকে। যেন সে স্বামীর সঙ্গে চিতায় আরোহণ করতে যাচ্ছে! অঘোরনাথ প্রথমেই জোড়া পায়ে পদাঘাত করলো না, শিকারকে কাছে আসতে দিল। হাঁটু গেড়ে বসে কুসুমকুমারী যেই একটি হাত বাড়িয়েছে, অমনি অঘোরনাথ কামড়ে ধরলো তার কাঁধ, ঠিক যেন বাঘে ধরেছে এক হরিণীকে। দ্বারবানরা লাঠির ঘা মেরে ছাড়াবার চেষ্টা করলো, দুর্গামণিও হাতে লাঠি ধরে কষিয়ে দিল কয়েক ঘা। কুসুমকুমারীকে যখন ছাড়িয়ে আনা হলো তখন তার বামদিকের কাঁধের এক খাবলা মাংস উঠে এসেছে, সে চেতনা হারিয়েছে অনেক আগেই।

পরদিনই বাগবাজারে পিত্রালয়ে নিয়ে যাওয়া হলো কুসুমকুমারীকে। সেখানে থাকতে থাকতেই সে সংবাদ পেল যে একুশ দিন উপবাসের পর অঘোরনাথ প্রাণত্যাগ করেছে। সপ্তদশী কুসুমকুমারী বিধবা হওয়ায় একমাত্র অঘোরনাথের জননী ছাড়া খুশী হলো আর সকলেই। কুসুমকুমারীর শরীরে তার স্বামীর একমাত্র চিহ্ন রইলো বাম স্কন্ধের ঐ ক্ষতস্থানের দাগ।

মেদিনীপুর থেকে রাজনারায়ণ বসু এক পত্র লিখলেন তাঁর বন্ধুকে: মহাকবিরা যে কত অসম্ভব জায়গা থেকেই জন্মায়! স্বর্গ থেকে বেদব্যাস হঠাৎ নেমে এলে কতই না চমকিত হতেন আজ! যে-ব্যক্তির গায়ে সব সময় বীয়ারের গন্ধ, গোরু-শুয়োর-মুর্গীর মতন নিষিদ্ধ খাদ্য ছাড়া অন্য কিছু যার মুখে রোচে না, যার অঙ্গে সর্বসময় সাহেবী পোশাক, যে বিজাতীয় ইংরেজী ভাষাকে এতই ভালোবাসে যে নিজের দেশের ভাষা সম্পর্কে সব সময় ঘৃণায় নিন্দামন্দ করে, সেই ব্যক্তিই কিনা হঠাৎ হয়ে গেল এক প্রথম শ্রেণীর হিন্দু কবি! সে এমনই স্বর্গীয় সৌন্দর্যময় বিষয় নিয়ে লিখলো, যে-সব বিষয় নিয়ে মুনি-ঋষিরা ইঙ্গুদি গাছের ছায়ায় বসে আলোচনা করতে করতে ধন্য হয়ে যান!

কী ব্যাপার, মধু, এই অধঃপতিত দেশের কবিতাকে জাতে তুলবার জন্য, তুই এমন প্রতিদানহীন কাজের ভার গ্রহণ করলি যে? ইংরাজীতে লিখলে, ইংরাজী পত্রের সম্পাদনা করলে তোর কত সুনাম হতো!...বোধ হয় উপরওয়ালার অভিপ্রায়ই অন্য রকম। যা হোক, এই যে কাজ তুই করলি, তার জন্য একটা পুরস্কার তুই পাবি অন্তত—অমরত্ব।

মধুসূদন উত্তর দিলেন, কী করে জানলে, ভায়া, যে রেভারেণ্ড ডক্টর বেদব্যাস গোমাংস খেতেন না আর ছিলিপ ছিলিপ করে ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিতেন না? তুই জেনে রাখ, রাজ, রাশিয়ার সমস্ত রাজকীয় ধন রত্ন তুচ্ছ করেও আমি নিজের দেশের কবিতার সংস্কারের কাজে লেগে থাকবো!

মধুসূদন এখন অহংকার এবং অত্যুৎসাহে যেন ফেটে পড়ছেন। দেশের শিক্ষিত সমাজে তাঁর নামে জয়-জয়কার। যাতে হাত দিচ্ছেন, তাতেই সোনা ফলছে।

বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ হয় কি না এই নিয়ে তর্কাতর্কির পর লিখে ফেললেন, "তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য"। বিদ্বানপ্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর সম্পাদিত "বিবিধার্থ সংগ্রহে" খণ্ডে খণ্ডে তা প্রকাশ করলেন। সেই কাব্য পাঠ করে যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন রসিক পঞ্চজন। বাংলা ভাষাতে এমন উচ্চাঙ্গের

কাব্য সম্ভব ? শব্দ সংস্থাপনের গুণে একই সঙ্গে এতে মিলে আছে গাম্ভীর্য আর মাধুর্য।

এ হেন নির্জন স্থানে দেব পুরন্দর,
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপানি ! কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
নমিয়া জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি :

ছন্দ ও ভাব সম্পূর্ণ নতুন, অনাস্বাদিতপূর্ব। আর এ সব লিখেছে কি না হ্যাট-কোট পরা এক ট্যাঁস-ফিরিঙ্গি ! আদালতের দোভাষীর কণ্ঠে প্রাচীন আর্য সভ্যতার মনোরম চিত্র সংবলিত এমন মধুর সঙ্গীত !

একই সঙ্গে নাটক রচনায় হাত দিলেন মধুসূদন। অর্থের বিনিময়ে বেলগাছিয়ার রাজাদের জন্য তাঁকে "রত্নাবলী" নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করে দিতে হয়েছে বটে কিন্তু পদে পদে বিতৃষ্ণায় তাঁর মন ভরে গিয়েছিল। এই নাকি নাটক ! যেমন কাঁচা ভাব, তেমনই নীরস ভাষা। রাজারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে নাটক অভিনয়ের আয়োজন করেছেন, অনেক ভালো নাটক তাঁদের পাওয়া উচিত।

মধুসূদন নিজেই কলম ধরলেন, শুরু হলো শর্মিষ্ঠা। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী বাল্যকালেই কিছু জানা ছিল, মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে প্রথম দিকে খেয়াল বশে সংস্কৃত চর্চা করতে গিয়ে আবার ঐ দুটি মহাকাব্য পড়া হয়ে যায় মধুসূদনের। দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কলহ-কাহিনীর মধ্যে শর্মিষ্ঠাকেই বেশী পছন্দ হয়েছিল তাঁর। এই রাজনন্দিনী শর্মিষ্ঠাকে নিয়েই নাটক গড়ে তুলতে লাগলেন।

দু-এক পাতা লেখেন আর পড়েন মধুসূদন, সারা ঘরে ঘুরতে ঘুরতে উচ্চকণ্ঠে পঙ্‌ক্তিগুলি উচ্চারণ করেন। মনের মধ্যে একটা দ্বিধা থেকে যায়। কবিতা লেখা হয় আপন খেয়ালে অথবা আবেগের বশে, কিন্তু নাটকের কিছু নিয়ম কানুন আছে। এটা ঠিক নাটক হচ্ছে তো ? কারুর কাছ থেকে একটু পরামর্শ পেতে বাসনা হয়। আসলে পরামর্শ নয়, মধুসূদন চান তাৎক্ষণিক উচ্চ প্রশংসা। পাঠ করা মাত্রই কেউ ধন্য ধন্য করলে তাঁর প্রতিভার স্ফূর্তি হয়। কিন্তু সে রকম কেউ নেই। সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে এই যে চির অনুরক্ত বন্ধু গৌরদাস বসাক এখন কলকাতায় নেই, চাকুরি উপলক্ষে তাঁকে যেতে হয়েছে বালেশ্বরে।

গৌরদাসের সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ আছে নিয়মিত। এক চিঠিতে গৌরদাস লিখলেন, সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য তুই নাটকটি একবার রামনারায়ণ তর্করত্নকে দেখালে পারিস ! নাট্যকার হিসেবে ওঁর প্রভূত খ্যাতি, নাটকের রীতিনীতি ঠিক হয়েছে কিনা, উনিই বুঝবেন !

কিছুটা দ্বিধা করে তারপর মধুসূদন রাজি হলেন। কিছুটা অন্তত যাচাই না করেই সম্পূর্ণ নাটকটি বেলগাছিয়ার রাজাদের হস্তে দিলে তারপর সবাই যদি হাসাহাসি করে ? যদি বলে, এ তো নাটক নয়, এ যে গর্ভস্রাব !

পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নকে ডেকে পাঠালেন মধুসূদন। তিনি এলেন না। গোমাংসভোজী ফিরিঙ্গির বাড়িতে পদার্পণ করেন না তিনি। তবু মধুসূদন লোক মারফৎ "শর্মিষ্ঠা" নাটকের পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ পাঠিয়ে দিলেন তর্করত্নের কাছে। সঙ্গে এক পত্র লিখে অনুরোধ জানালেন যে, মহাশয় যদি এই নাট্যরচনার ব্যাকরণগত অশুদ্ধি সংশোধন করিয়া দেন, তাহা হইলে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইব। এজন্য যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রদানেও সম্মত রহিলাম।

পাণ্ডুলিপি-বাহক ফিরে এসে জানালো যে, সে ভুল করে কাগজের পুলিন্দাটি পণ্ডিত মহাশয়ের হাতে দিতে গেলে তিনি আঁৎকে উঠেছিলেন একেবারে। সেটি মাটিতে রাখার পর তিনি তার ওপর গঙ্গাজলের ছিটা দিয়ে শুদ্ধ করে নেন আগে। তারপর কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টে দেখে দু-চার দিবস পর মন্তব্য জানাবেন বলেছেন।

এর পর বেলগাছিয়ার রাজবাড়িতে একদিন নাটুকে রামনারায়ণের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মধুসূদনের। বক্ষ একটু দুর দুর করতে লাগলো তাঁর। ইনি কী বলবেন কে জানে ? নাটুকে রামনারায়ণের মন্তব্যের মূল্য আছে, অন্তত রাজাদের কাছে তো আছেই।

রামনারায়ণ শ্লেষ হাস্যে বললেন, মহাশয়, গঙ্গাজল দিয়া শুদ্ধ করেই লইলেই বা কী হয়, এখনো

আপনার নাটকে যে ম্লেচ্ছ গন্ধ ভুর ভুর করে। ব্যাকরণাশুদ্ধির কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু এ রচনায় সংস্কৃত নাটকের রীতি তো কিছুই মান্য করেন নাই ! নান্দী পাঠ কই, সূত্রধর কই ? একেবারে বিদেশী ভাব : এ যে সাহেবের লেখা বলে প্রতীয়মান হয় ! যদি বলেন, তো আগাগোড়া ঢেলে সাজায়ে দি।

মধুসূদন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, মহাশয়ের অত পরিশ্রম করবার প্রয়োজন নেই কো ! পাণ্ডুলিপি ফিরত পেলে কৃতার্থ হই !

ক্রোধে মধুসূদনের শরীর জ্বলে যেতে লাগলো। টিকিধারীটা বলে কি! তাঁর নাটক ঢেলে সাজাবে? অন্যের কলম ধার করে তাঁর নাটক দাঁড়াবে : কোনো প্রয়োজন নেই। উত্থান বা পতন যাই হোক, তাঁকে নিজের রচনা নিয়েই দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হবে। বিদেশী ভাব, থাকলোই বা বিদেশী ভাব, সাহিত্য কি কখনো দেশ কালের ওপর নির্ভর করে ? শেক্সপীয়রের রচনা তবে আমরা উপভোগ করি কী ভাবে ? মূরের কবিতায় প্রাচ্য তত্ত্ব আছে, সেজন্য কেউ কি তাঁকে নিন্দে করে ? বাইরনের কবিতায় এসিয়াটিক ভাব আছে, সেজন্য কি বাইরনকে ইংরেজদের কম ভাল লাগে ? কার্লাইলের গদ্যে তো জার্মান প্রভাব !

মধুসূদন ঠিক করলেন, তিনি নিজের সামর্থ্যেই রাস্কেল পণ্ডিতগুলিকে হতচকিত করে দেবেন। ওদের লেখনী পর্যন্ত স্তব্ধ করিয়ে দেবেন তিনি।

শর্মিষ্ঠা নাটক রচনা সমাপ্ত হলে মধুসূদন সেটি পাঠিয়ে দিলেন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের কাছে। রামনারায়ণ তর্করত্নের সঙ্গে মধুসূদনের বিসম্বাদের কথা আগেই রাজাদের কানে গেছে। তবু নাটকটির দোষগুণ বিচারের জন্য কোনো প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিশেষত এই নাটক মঞ্চে অভিনীত হলে দোষ ত্রুটি সকলের কানে লাগবে। তাঁদের সভাপণ্ডিত দেশবরেণ্য আলঙ্কারিক তর্কবাগীশের কাছে নাটকটি পাঠিয়ে দিয়ে অনুরোধ জানালেন যে, যে-সব স্থূল আপত্তিকর কিংবা দোষজনক, সে-সব জায়গায় দাগ দিয়ে দিতে।

নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে রীতিমতন একটি সভা ডাকা হলো 'শর্মিষ্ঠা' নাটক আলোচনার জন্য। মধুসূদন এবং প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশও উপস্থিত। তর্কবাগীশের হস্তে শর্মিষ্ঠার পাণ্ডুলিপি, ওষ্ঠে মৃদু মৃদু হাস্য। সে হাস্যে শ্লেষের বদলে যেন স্নেহের ভাবই বেশী। তর্কবাগীশ বয়েসে যথেষ্ট প্রাচীন, মধুসূদনের প্রায় দ্বিগুণ, জীবনে কখনো সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করেন না। ঠেঙো ধুতির ওপর গায়ে একটি মুগার চাদর। মধুসূদন তাঁর দিকে সরাসরি চেয়ে রইলেন, আজ আর তাঁর সংশয়ের লেশমাত্র নেই।

তর্কবাগীশ বললেন, বাপুহে, তোমার এই নাটকটি অনেকে অতি উত্তম বলবে, আবার এতে দোষেরও অবধি নেই।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আপত্তিকর জায়গাগুলোতে দাগ দিয়েচেন ?

তর্কবাগীশ ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, না, দেইনি। ভুলের সংখ্যা অসংখ্য, তাহলে পুরোটাই দাগাতে হয়, কিছুই বাকি থাকে না।

সভাপণ্ডিতের উদ্দেশে রাজা বললেন, পোন্‌মোয়াই, আপনার কতা তো ঠিক বুজতে পাচ্চিনি, কেমন যেন প্রহেলিকা মনে হচ্চে। একবার বলচেন, অনেকে অতি উত্তম বলবে, আবার বলচেন, পুরোটাই ভুলে ভরা !

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের ওষ্ঠে সেই মৃদু হাস্য লেগেই আছে। তিনি বললেন, আমি যে চোখ দিয়ে দেখছি, সে রকম চোখ এ দেশে আর গোটা দু তিন লোকের আছে। আমরা কিছুদিনের মধ্যেই ফতে হয়ে যাবো, তখন এই সব বই-ই চলবে, বাহবা বাহবা পড়ে যাবে !

মধুসূদন উঠে দাঁড়িয়ে সগর্বে বললেন, পণ্ডিত মহাশয়, আপনি ঠিকই বুঝেচেন, আপনাদের যুগ শেষ। আমি বাঙ্গালা কাব্য জগতে নতুন যুগ প্রবর্তন করবো। এই "শর্মিষ্ঠা" আমার দুহিতা সমা। এই নাটকটি রচনার কারণ দেকিয়ে আমি কবিতাকারে একটি প্রস্তাবনা লিকিচি। আপনাদের অনুমতি হলে সেটি এখেনে পড়ে শোনাতে পারি।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, অবশ্যই পড়ুন !

তর্কবাগীশ বললেন, হ্যাঁ বাবা, পড়ো, শুনি।

মধুসূদন একটু অস্বস্তির সঙ্গে একবার এদিক ওদিক তাকালেন। তাঁর বদলে অন্য কেউ পড়ে দিলে আরও ভালো হতো। তাঁর বাংলা উচ্চারণ ভালো নয়। কণ্ঠস্বরও চমকানো। সবচেয়ে ভালো হতো,

যদি অভিনেতা কেশব গাঙ্গুলী এটা পড়তেন, কিন্তু কেশববাবু এ সভাস্থলে উপস্থিত নেই। সকলে উদগ্রীবভাবে অপেক্ষা করছে বলে শেষ পর্যন্ত ভরসা করে মধুসূদন নিজেই পড়তে লাগলেন।

মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়,
যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুন গো ভারতভূমি কত নিদ্রা যাবে তুমি
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুমঘোর হইল, হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস কোথা তব কালিদাস
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়!
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে
তাহে হয় তনু, মনঃ ক্ষয়।
মধু বলে জাগো মাগো বিভু স্থানে এই মাগো
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয়।

মধুসূদনের পাঠ সাঙ্গ হওয়া মাত্র সভাসদরা বিলেতি কায়দায় চটাপট শব্দে করতালি ধ্বনি করে উঠলো। কেউ কেউ বললো, ব্রাভো, ব্রাভো। কেউ কেউ আহ্ আহ্ শব্দ করলো।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ধীরে ধীরে হেঁটে এলেন মধুসূদনের কাছে। নিজ পরিবারের কোনো অনুজের সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গিতে তিনি বললেন, বাপু, তুমি যে-টি পাঠ করলে, সেটি সঠিক কবিতা কিনা বলতে পারি না। কয়েক স্থলে মাত্রা স্খলন হয়েছে, লঘু স্বর গুরু স্বর মানোনি, তবু এ রচনা শুনে প্রাণে বড় আরাম হলো। নাম প্রেমচাঁদ, অন্তরে আমার প্রেস রস রয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই ব্যাকরণ আর ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করে মাথা তাতেই ঠাসা, সেগুলো ভুলতে পারি না।

তারপর মধুসূদনের মস্তকে বৃদ্ধ তাঁর কম্পিত দক্ষিণ হস্ত রেখে বললেন, আশীর্বাদ করি, তুমি সার্থক হও। বঙ্গবাসীর রুচি সংস্কার কার্যে ব্রতী থাকো!

বেলগাছিয়া মঞ্চে মহা সমারোহে অভিনীত হলো শর্মিষ্ঠা নাটক। দর্শকরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলো এমনটি আর কেউ কখনো দেখেনি। বাংলার লাট বাহাদুর স্যার জন পিটার গ্রান্ট, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এবং আরও অনেক হোমড়া চোমড়া রাজপুরুষ এসেছিলেন, মধুসূদন তাঁদের জন্য শর্মিষ্ঠার ইংরেজী অনুবাদ করে রেখেছিলেন আগেই। সাহেবরাও মুগ্ধ। অনেকেই বলতে লাগলেন, বাংলায় এটিই প্রথম সার্থক নাটক।

কাজের নেশা পেয়ে বসেছে মধুসূদনকে। "শর্মিষ্ঠা" মহড়ার সময় পাইকপাড়ার রাজারা একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, হাস্যরসাত্মক নাটক আমাদের তেমন নেই, অথচ মঞ্চে হাসি ভা... দাই জমে ভালো। মাইকেল, আপনি একখানা নাটক ট্রাই করুন না এবার!

একখানা নয়, ঝটাপট পর পর দুখানা প্রহসন লিখে ফেললেন মধুসূদন। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' আর 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'। কিছুদিন আগেও পুরো একটি বাক্য বাংলায় বলতে পারতেন না যে ব্যক্তি, প্রহসনের কথা ভাষায় তাঁর দক্ষতা দেখে সকলে দ্বিতীয়বার স্তম্ভিত হলো। এবং এত দ্রুত নাটক রচনা করতেও আর কারুকে দেখা যায় না। এ যেন এক জাদুকর!

প্রহসন দুটির পরই মধুসূদন আবার লিখতে বসলেন পদ্মাবতী নাটক। এবার কাহিনীর সারাংশ নিলেন গ্রীক পুরাণ থেকে। তাঁর রচনায় বিদেশী প্রভাবের কথা এদেশে অনেকে কানাঘুষো করে। এবার তিনি দেখিয়ে দেবেন, সরাসরি বিদেশী কাহিনী নিয়েই স্বদেশী নাটক রচনা করা সম্ভব কিনা।

পদ্মাবতী লিখতে লিখতেই মধুসূদনের আবার মন উচাটন হলো। এ তিনি কোন্ পথে চলেছেন?

নাটক মানেই তো গদ্য। বাল্যকাল থেকেই তিনি গদ্যের উৎপাত অপছন্দ করেন। কাব্যের সরোবরে অবগাহন করাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী আনন্দের। নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেতে তাঁকে কি শুধু গদ্য-নাটকই লিখে যেতে হবে!

পদ্মাবতী রচনা অর্ধপথে থেমে রইলো। তিনি আবার ফিরে যাবেন কবিতায়। তিনি এমন কাব্য রচনা করবেন যা বাংলায় কেউ কখনো চিন্তাও করেনি। কিন্তু কোন্ বিষয় নিয়ে লিখবেন, তা ঠিক করতে পারছেন না। কয়েকদিন এই রকম অস্থিরতায় কাটলো। আর অস্থিরতার সময় তাঁর বীয়ার পানও বেড়ে যায়।

মধুসূদনের নাট্য রচনার সাফল্যে তাঁর ছাত্র বয়েসের বন্ধুরা সবাই পুলকিত। চাকুরি উপলক্ষে অনেকে দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে আছে, তারা চিঠি লিখে অভিনন্দন জানায়। কলকাতায় যারা থাকে, তারা অনেকে দেখা করতে আসে। মাদ্রাজ থেকে ফেরার পর পুলিস আদালতে সামান্য চাকুরি নিয়ে মধুসূদন যখন দীন অবস্থায় বৎসরের পর বৎসর কাটাচ্ছিলেন, তখন একমাত্র গৌরদাস বসাক ছাড়া বন্ধুরা কেউ আর তাঁর কুশল সংবাদ নিত না। এখন বন্ধুরা আবার ফিরে আসায় মধুসূদন অভিমান করেন না, বরং তাঁর আত্মম্ভরিতায় সুড়সুড়ি লাগে। দরাজ হস্তে আপ্যায়ন করেন তিনি, কখনো টাকা পয়সা না থাকলে বন্ধুদের থেকে ঋণ গ্রহণ করে তাদেরই খাওয়ান।

রাজনারায়ণ আর গৌরদাস দুজনেই বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে কলকাতায় এসেছেন। মধুর বাড়িতে প্রায় নিত্য আসেন তাঁরা। খোস গল্পে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়।

একদিন গৌরদাস এসে বললেন, জানিস মধু, আমাদের গঙ্গা ফিরে এয়েচে অ্যাতদিন বাদে।

মধুসূদন জিজ্ঞেস করলেন, গঙ্গা? কোন্ গঙ্গা?

গৌরদাস বললেন, সেই যে রে, গঙ্গানারায়ণ, আমাদের সঙ্গে পড়তো, সিংগীদের বাড়ির ছেলে, খুব লাজুক, ইনট্রোভার্ট টাইপের—

মধুসূদনের মনে পড়লো না। অন্তত সতেরো বছর গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি, মনে না পড়ারই কথা। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন।

গৌরদাস বললেন, সে বড় অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। আমার সঙ্গে বেশী দেকা হতো না বটে কিন্তু রাজনারায়ণের সঙ্গে খানিকটা যোগাযোগ ছেল গঙ্গানারায়ণের! বছর পাঁচেক আগে জমিদারি তদারক করতে গিয়ে গঙ্গানারায়ণ উধাও হয়ে যায়, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি, সবাই ধরে নিয়েচিল যে সে মরেই গ্যাচে, তার শ্রাদ্ধশান্তিও হয়ে গেসলো। সেই গঙ্গা আবার ফিরে এয়েচে! তাজ্জব ব্যাপার!

মধুসূদন বললেন, তাজ্জব না তাজ্জব! এ যে দেকচি এক নতুন নাটকের বিষয়! একদিন নিয়ে আয় তো তাকে।

গঙ্গানারায়ণ নিদারুণ আহত অবস্থায় কৃষ্ণনগর জেলে বন্দী ছিল। সংবাদ পেয়ে নবীনকুমার কয়েকজন কর্মচারী ও উকিল সঙ্গে নিয়ে সেখানে চলে যায়। প্রচুর অর্থব্যয় ও তদারকি করে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সে জামিনে মুক্ত করে। চিকিৎসায় গঙ্গানারায়ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে কিন্তু তার সারা শরীরে প্রহারের দাগ মিলিয়ে যায়নি। তার নামে মামলা চলছে এখনো।

কলকাতায় এসে গঙ্গানারায়ণ প্রথমেই যোগাযোগ করেছে হরিশ মুখুজ্যের সঙ্গে। গঙ্গানারায়ণের নাম ইতিমধ্যেই হরিশের কাছে পরিচিত। তাঁর মফস্বল সংবাদদাতাগণ গঙ্গানারায়ণ সম্পর্কে নানা তথ্য জানিয়েছে। নদীয়া যশোহরের চাষীদের কাছে গঙ্গানারায়ণ একজন প্রবাদ-পুরুষ। গঙ্গানারায়ণ যে পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে, তা এখনো কেউ বিশ্বাস করে না। তাদের ধারণা এখনো যেখানে যত বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে, তার মূলে গঙ্গানারায়ণ। তার নাম করে স্থানীয় নেতারা আরও বিদ্রোহের উস্কানি দেয়।

গঙ্গানারায়ণ হরিশকে যতই বোঝাবার চেষ্টা করে যে এসবই গল্প কথা, কিছুই সত্যি নয়, হরিশ ততই হাসেন। তিনি বলেন, সত্য হোক, মিথ্যা হোক, লোকে বিশ্বাস তো করে! সেটাই তো বড় কতা। আপনি নীলচাষীদের বুকে ভরসা এনে দিয়েচেন।

গঙ্গানারায়ণ বলে, কিন্তু লাঠি-বন্দুক নিয়ে নীলকর সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করলে কি আর পার পাওয়া যাবে? আইনের সুযোগ নিয়ে দাবি আদায় করতে হবে চাষীদের।

হরিশ বলে, আইনের সুযোগ তো নিতেই হবে। তা ছাড়াও দু-চারটে নীলকর সাহেবকে যদি চাষীরা ঠ্যাঙাতে পারে তো ঠ্যাঙাক না। দু-দশটা নীলকুঠী জ্বলুক।

প্রতিদিন দলে দলে চাষী গ্রামাঞ্চল থেকে আসতে শুরু করেছে হরিশের বাড়িতে। তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা জানায়। হরিশ তাদের ধমকে বলে, ব্যাটারা কাঁদিস কেন ? লড় ! লড়তে পারিস না ? কেঁদে কেঁদেই তো জন্ম-জন্মান্তর গেল।

কৌশল হিসেবে প্রত্যেক চাষীকে দিয়ে নীলকরদের নামে মামলা ঠুকতে লাগলেন হরিশ। তিনি নিজেই দরখাস্তের মুসাবিদা করে দেন। নিজেই ওদের হয়ে দিয়ে দেন কোর্ট ফি। এমন কি চাষীদের কলকাতায় খাওয়া থাকার ব্যয়ভারও হরিশই বহন করেন।

গঙ্গানারায়ণ হরিশের এই কাজে সাহায্য করতে প্রবৃত্ত হলো। প্রতিদিন সকাল থেকে সে হরিশের সঙ্গে থাকে। সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ পর অবশ্য আর হরিশকে পাওয়া যায় না, তখন তাঁর সুরাপান ও আমোদ ফুর্তি চাই। হরিশ পরিশ্রম করেন অসুরের মতন, আবার তাঁর প্রমোদও সেই রকম।

হরিশ অবশ্য পই পই করে বলে দিয়েছেন, গঙ্গানারায়ণ যেন কোনোক্রমেই শহরে আসা চাষীদের কাছে আত্মপরিচয় না দেয়। গঙ্গানারায়ণের নামে মফস্বলে যে মীথ চলছে, তা চলুক।

একদিন গঙ্গানারায়ণকে মধুসূদনের বাড়িতে নিয়ে এলেন গৌরদাস। চেহারা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে গঙ্গানারায়ণের, এখন তার পোশাক অতি সাধারণ, একটি ধুতি ও উত্তরীয় ছাড়া আর কিছু ব্যবহার করে না গঙ্গানারায়ণ, তবু তাকে দেখে মুহূর্তের মধ্যে চিনতে পারলেন মধুসূদন। বাল্যবন্ধুরা কখনো কি বদলায় !

গঙ্গানারায়ণকে আলিঙ্গন করে মধুসূদন বললেন, বাই জোভ্, এ যে আমাদের সে গোবেচারা গঙ্গা, আমাদের হিন্দু কালেজের সাইলেন্ট ফিলজফার !

এতদিন পর মধুসূদনকে দেখে গঙ্গানারায়ণের চক্ষে জল এসে গেল। তার মনের অভ্যন্তরে মধুর জন্য সব সময়ই একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল।

মধুসূদন বললেন, গঙ্গা, আমিও অনেকটা তোরই মতন, প্রডিগ্যাল সান্ হয়ে কলকেতায় ফিরেচিলুম ! তুই ছিলিস্ জমিদারের সন্তান, এখুন যে সাধুসন্ন্যেসীর মতন দেকাচ্চে তোকে।

কিছুক্ষণ আবেগ বিনিময়ের পর ওরা শান্ত হয়ে বসলো। সেলিব্রেট করার জন্য এক বোতল শ্যাম্পেন খুলে ফেললেন মধুসূদন। গঙ্গানারায়ণ কোনোদিনও ওসব স্পর্শ করে না। আজ রাজনারায়ণ উপস্থিত, তিনিও সুরাপান পরিত্যাগ করেছেন।

রাজনারায়ণ বললেন, তুই জানিস, মধু, গঙ্গানারায়ণ বনে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে দল গড়েছেল। বন্দুক নিয়ে নীলকরদের সঙ্গে লড়েচে। সে এক রোমহর্ষক ব্যাপার ! ভাবাই যায় না, আমাদের সেই গঙ্গা, এত বড় হীরো।

গঙ্গানারায়ণ লজ্জা পেয়ে বললো, না, না, সেরকম কিছু নয়। তবে ভাই নীলচাষীদের দুর্দশা আমি নিজের চক্ষে দেকিচি। গ্রামে গ্রামে যে কী তাণ্ডব চলচে তা তোমরা ভাবতে পার্বে না !

মধুসূদন উৎসাহিত হয়ে বললেন, শুনি তো তোর এক্সপিরিয়েন্স, বেশ একটু গুচিয়ে বিশদ করে বল।

রাজনারায়ণ বললেন, কিছু কিছু আমাদেরও কানে আসে। হরিশ মুকুজ্যের কাগচেও পড়চি—

গঙ্গানারায়ণ বললো, হরিশ মুখুজ্যে চাষীদের জন্য মস্ত কাজ কচ্চেন। তিনি নমস্য।

মধুসূদন বললেন, শুনিচি লোকটা আমারই দরের একজন ড্রাঙ্কার্ড। তা মাতাল হলেও যে নমস্য হয়, সে কতা তোরা স্বীকার পেলি তো ?

গৌরদাস বললেন, আহা, গঙ্গানারায়ণের অভিজ্ঞতাগুলোই শোনা যাক না—

কথাবার্তা কিছুক্ষণ চলবার পর সেখানে উপস্থিত হলো একজন আগন্তুক। গল্পের মাঝখানে অচেনা লোক এসে পড়ায় ওরা বিরক্তই হলো একটু। মধুসূদন জিজ্ঞাসু চোখে লোকটির দিকে তাকালেন।

লোকটি বয়েসে ওদের চেয়ে ছোট, বৎসর তিরিশেকের হবে, সরকারী আমলার মতন পরিচ্ছদ। সে মধুসূদনের দিকে চেয়ে বললো, আপনিই বোধ করি মাইকেল ? দেকেই চিনিচি ! আপনাদের আসরে কি আমি একটু আসন গ্রহণ কত্তে পারি ?

মধুসূদন বললেন, আমরা এক বিশেষ আলোচনায় এনগেজড আচি। আপনার আগমনের উদ্দেশ্যটা বলবেন কী ?

লোকটি বললো, শুধু আপনার দর্শন লাভ। কয়েক মাস ধরেই আপনাকে দেকবার বাসনা আমার মনে বলবতী হয়েচে। অবশ্য আর একটা নিবেদনও আচে। আপনি সাম্প্রতিক বঙ্গের বিশিষ্ট কবি। নাট্যকার হিসেবেও আপনার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত, “শর্মিষ্ঠা” নাটক বড়ই অপূর্ব, মনোহর ! বেছে বেছে

আপনার মতন এক খ্রীষ্টধর্মীয়ের লেখনীতেই স্বয়ং মা সরস্বতী ভর করেচেন, এ বড় বিস্ময়ের কথা। আপনাকে দেকে চক্ষু সার্থক কত্তে এসেচি। আপনি আমার শ্রদ্ধার অভিবাদন লউন।

প্রশংসা শুনলে একটুও অস্বস্তি বোধ করেন না মধুসূদন। এ সব কিছুই যেন তাঁর প্রাপ্য এইভাবে কথাগুলি শুনলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, মহাশয়ের কী করা হয়? মহাশয়ের নাম?

লোকটি বললো, আমি সরকারের ডাক বিভাগে কর্ম করি। অধমের নাম শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

বড় মুখ করে আত্মপরিচয় দেবার মতন কিছুই নেই দীনবন্ধুর। দরিদ্রের সন্তান, কলকাতার বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতে কিংবা অভিজাত সমাজে প্রবেশ করার কোনো সুযোগ পায়নি। নদীয়ার এক গ্রামের পাঠশালায় বাংলা লেখাপড়া শিখেছিল, তারপরই তার পিতা তাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন এক জমিদারি সেরেস্তায় খাতা লেখার কাজে। কিশোর দীনবন্ধুর সে কাজে মন টেঁকেনি, পিতা ঠাকুরের নির্দেশ অমান্য করে গোপনে পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়। এক বৃহত্তর জগৎ তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল।

কিন্তু এক সহায়-সম্বলহীন কিশোরের পক্ষে কলকাতা শহর বড় কঠোর স্থান। বাহির সিমুলিয়াতে এক পিতৃব্যের বাড়ি খুঁজে খুঁজে বার করল অনেক চেষ্টায়, সেখানে শুধু আশ্রয় মিললো, আর কিছু না। আশ্রয়ের বিনিময়ে খুড়তুতো ভাইয়েরা তার ওপর রান্নার ভার চাপিয়ে দিল। কিন্তু গ্রামের জমিদারি সেরেস্তায় খাতা লেখার চেয়ে কলকাতায় আত্মীয় বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করার মধ্যে কী আর এমন পদোন্নতি ঘটলো। সর্বক্ষণ মনখারাপ হয়ে থাকে দীনবন্ধুর। একটু সময় পেলেই কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়ায় আর স্কুল-কলেজগুলির সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

পাদ্রী লঙ সাহেব একটি অবৈতনিক স্কুল চালান। একদিন ভরসা করে সেখানে ঢুকে পড়লো দীনবন্ধু। ইংরেজি শিক্ষার উপযোগিতা বুঝতে পেরে এখন দলে দলে ছেলে আসে স্কুলে পড়তে, সকলকে নেওয়া সম্ভব হয় না। লঙ সাহেব কিশোরটিকে দু চার কথায় পরীক্ষা করে বললেন, দেখো হে, তোমার কিছুদিনের জন্য সুযোগ দিব। যদি পাঠাভ্যাসে উৎকৃষ্ট মতি দেখাইতে পারো, তবেই তোমার স্থান হইবে এখানে, নচেৎ নহে।

লঙ সাহেবের কথার মান রেখেছিল সে। প্রত্যেকটি পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছে। বৃত্তি না পেলে বই-খাতা কেনার টাকাই বা আসবে কোথা থেকে· দীনবন্ধুর পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্বনারায়ণ, সবাই গন্ধা গন্ধা বলে ডাকে, মোটেই তার পছন্দ হয় না। স্কুলে পড়ার সময়ই সে নিজের নামটা বদলে নিয়েছে।

লঙ সাহেবের স্কুল ছেড়ে কলুটোলা ব্র্যাঞ্চ স্কুল, তারপর হিন্দু স্কুল। লঙ সাহেব লক্ষ রেখেছিলেন এই ছেলেটির ওপর, দীনবন্ধু পরীক্ষায় ভালো ফল করলে তিনি তাকে বইপত্র কিনে দেন। কিন্তু হিন্দু স্কুলে বেশীকাল পড়া হলো না দীনবন্ধুর, তার সহপাঠীদের তুলনায় তার বয়েস অনেক বেশী। যে-বয়েসে অন্যরা চাকুরিতে ঢুকে যায়, সেই বয়েসে সে স্কুলের ছাত্র। তাই শেষ পরীক্ষা দেবার আগেই সে ডাক বিভাগের চাকুরি গ্রহণ করলো।

কিছুদিন পাটনায় পোস্ট-মাস্টারী করার পর বদলি হলো উড়িষ্যায়। সেখান থেকে আবার নদীয়ায়, বর্তমানে ঢাকায়; ইতিমধ্যে বিবাহাদি করে সে সংসারী হয়েছে।

নদীয়ায় থাকার সময় তার পরিচয় হলো এক প্রতিভাবান যুবকের সঙ্গে। যুবকটি পাশের জেলা যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর। এর নাম বঙ্কিম চাটুজ্যে। ছাত্র বয়েসে দীনবন্ধু গুপ্ত কবির সংবাদ প্রভাকর কাগজে পদ্য লিখেছে মাঝে মাঝে, সে পত্রিকার পৃষ্ঠায় সে এই বঙ্কিমের পদ্যও দেখেছে। তারপর এ-ও শুনেছিল যে কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর প্রথম বি এ পরীক্ষায় এই বঙ্কিমও প্রথম দুই গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে একজন; চাক্ষুষ হলো এই প্রথম। যুবকটি বয়েসে তার চেয়ে বেশ ছোট হলেও স্বভাবে অতি গম্ভীর, অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে কথাই বলতে চায় না। দীনবন্ধুই উদ্যোগী হয়ে নারকোলের খোলা ভেঙে যুবকটির অন্তরের নরম শাঁস স্পর্শ করলো। বন্ধুত্ব

হয়ে গেল দুজনের।

বিবাহের পরই বঙ্কিমের পত্নী বিয়োগ হয়েছে। সে আবার বিবাহ করতে চায়। দীনবন্ধু বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে নানান জায়গায় পাত্রী দেখে বেড়ায়। এবার ঢাকা থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছে, বঙ্কিমের বিবাহের সম্বন্ধ একেবারে পাকা করে যাবে। তারই মধ্যে একদিন অবসর করে সে দেখা করতে এলো বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে উল্কার মতন প্রবেশকারী কবিবর মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে। দীনবন্ধু বঙ্কিমকেও সঙ্গে করে আনতে চেয়েছিল, কিন্তু সে আসেনি। অপরিচিতদের সঙ্গে উপযাচক হয়ে কথা বলা সে তো পছন্দ করে না বটেই, তা ছাড়া বাংলা সাহিত্য বিষয়েও তেমন কোনো আগ্রহ নেই বঙ্কিমের। ছাত্রাবস্থায় সে বাংলা পদ্য লিখেছে বটে কিন্তু এখন তার লেখনী দিয়ে ইংরেজী বাক্য ছাড়া আর কিছু বেরোয় না।

প্রাথমিক সম্ভাষণাদি এবং মধুসূদনের রচনাগুলির উচ্চ প্রশংসা করার পর দীনবন্ধু বললো, যদি অনুমতি দেন, তবে আপনার সমীপে আগমনের যে অন্য আর একটি উদ্দেশ্য আছে, সেটি ব্যক্ত করি।

মধুসূদন বললেন, নিবেদন ? অব কোর্স আপনি তা ব্যক্ত কর্তে পারেন, যদি ব্রিফ্লি হয়, আমি আমার এই বন্ধুর মুখ থেকে কিছু গল্প শুনচিলাম—

দীনবন্ধু বললো, হ্যাঁ, সংক্ষেপেই বলবো। দেখুন মিঃ ডাট্, আপনার কবিতা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়িচি নিশ্চয়ই, আপনার শর্মিষ্ঠা নাটকও বড় মনোরম, কিন্তু আপনার প্রহসন দুটি এক কথায় অনবদ্য। এমন জীবন্ত ডায়ালগ বাংলায় আর কেউ লেখেননি। আমার মুখস্ত আছে, শুনবেন ? তা এই যে আমার মনোমোহিনী এসেছেন ! (স্বগত) আহা, যবনী হোলো তার বয়ে গেল কি ? ছুড়ী রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ! এ যে আঁস্তাকুড়ে সোনার চাঙড় ! (প্রকাশ্যে গদার প্রতি) গদা, তুই একটু এগিয়ে দাঁড়া তো যেন এদিকে কেউ না এসে পড়ে। গদা বললো, যে আজ্ঞে ! ভক্ত বললো, ও পুঁটি, এটি তো বড় লাজুক দেখচি রে, আমার দিকে একবার চাইতেও নাকি নাই ?'

মধুসূদন বললেন, ব্যাস্, ব্যাস্, আর শোনাবার দরকার নেই।

গৌরদাস বললেন, তাজ্জব ! আপনি অ্যাক্টর নন, তবু নাটকের ভাষা এমন মুখস্ত করেচেন ?

দীনবন্ধু বললো, আরো গড়গড়িয়ে বলে যেতে পারি। এটা 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। এবার 'একেই কি বলে সভ্যতা' থেকে শুনবেন ?

মধুসূদন বললেন, দ্যাটস এনাফ্। কিন্তু আপনার নিবেদনটি কী। তা এখনো বুঝলাম না !

দীনবন্ধু বললো, এমন যাঁর ভাষা, তাঁর কাছে আমাদের অনেক কিছু চাইবার আচে। আপনি ইংরেজ মান্য লোক হলেও এমন দিশী কথা জানলেন কী করে ? সেটাই অবাক লাগে।

মধুসূদন বললেন, আমি যশোরের গ্রামে বাল্যকালে কতবার গেচি সে সব ভাষা আমার মেমারিতে ঘুমিয়ে ছেল, আবার ফিরে এসেচে।

দীনবন্ধু বললো, সেই জন্যই বলচি, আপনি মদ্যপানের কুপ্রথা, গ্রাম্য জমিদারদের ব্যভিচার নিয়ে স্যাটায়ার লিখে সমাজের অনেক উপকার করেচেন। এবার রায়তদের নিয়ে একটি লিখুন।

—কাদের নিয়ে ?

—গ্রামের রায়তদের নিয়ে। আমি কর্মোপলক্ষে নদীয়া-যশোরে ঘুরে দেখিচি, নীল চাষীদের ওপর কী দুঃসহ অত্যাচার হচ্চে। আপনার প্রহসন দুটি পড়বার পর থেকেই আমার মনে হচ্ছে, এই সব হতভাগ্য চাষীদের দুরবস্থার কথা নিয়ে আপনি যদি একটি নাটক রচনা করেন, তবে দেশের মানুষ সবাই জানবে।

—স্ট্রেঞ্জ কয়েনসিডেন্স ! আমরা আমাদের এই বন্ধুটির কাচ থেকে ইণ্ডিগো প্ল্যান্টারসদের কীর্তি-কাহিনীই শুনচিলুম এতক্ষণ। তার মাঝখানে আপনি এসে পড়লেন। আমাদের এই স্কুল-ফ্রেন্ডটি নিজে জমিন্দার, কিন্তু গ্রাম্য প্লাউমেনদের সঙ্গে মিশে রিবেলিয়ান অর্গানাইজ করেচে। গঙ্গা, তোমার বাকি কাহিনীটা বলো না।

ধুতি ও চাদর পরিহিত গঙ্গানারায়ণ এতক্ষণ নীরবে নবাগত ব্যক্তিটির কথা শুনছিল। এবার সে বললো, আমার আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। চাষীদের অবস্থা তো মোটামুটি জেনেচো, তারপর দু-এক জায়গায় সংঘর্ষ হলো আর কি।

গৌরদাস বললো, না না, বলো আমার শুনতে বড় আগ্রহ হচ্চে।

দীনবন্ধু বললো, আমি বাইরের লোক, তবু যদি আমায় আপনাদের বৈঠকে একটু স্থান দেন, তা হলে আমিও শুনতে পারি।

মধুসূদন বললেন, বিলক্ষণ ! বিলক্ষণ ! প্লীজ !

গৌরদাস বললো, তারপর সেই তোরাপ নামে লোকটি কী করলো ?

গঙ্গানারায়ণ ধীর স্বরে বললো, তোরাপ আর অন্যান্য গ্রামবাসীরা একেবারে মরীয়া হয়ে একটা কিছু করতে চায়। বিশেষত একটি দুটি নারী-হরণের পর তারা টগবগ করে ফুটচে। তখন একরাতে জঙ্গলের ডেরা ছেড়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। আমার হাতে বন্দুক দেখে ওরা ভরোসা পেয়েচে, আমার অবশ্য বন্দুক দাগতে হয়নি। একটা নীলকুঠি সহজেই দখল করা গেল।

রাজনারায়ণ বললেন, অমন ছাড়া ছাড়া করে বলচিস কেন, গঙ্গা, সব ব্যাপারটা ডিটেইলসে বল ! তুই এমন ভাব কচ্চিস যেন একটা নীলকুঠি দখল করা চাট্টিখানি মুখের কথা ? এ যে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার— ।

এরপর গঙ্গানারায়ণকে তার অভিজ্ঞতার আদ্যোপান্ত বর্ণনা দিতেই হলো।

শেষ হবার পর দীনবন্ধু বললো, আপনিই তা হলে গঙ্গানারায়ণ সিংহ ? নদীয়ায় গিয়ে বহুবার আপনার নাম শুনিচি। গরিবগুর্বো লোকেরা আপনাকে দেবতার মতন মানে।

গঙ্গানারায়ণ লাজুক মুখে বললো, না, সে রকম কিছু নয়।

দীনবন্ধু বললো, আপনাকে নিয়ে অনেক গল্প-কথা আছে ওদিকে। আপনিই সেই সব গল্পের নায়ক। আপনাকে চোখে দেখাও ভাগ্যের কতা !

মধুসূদন সহাস্যে বললেন, ইট্ সিমস্, গঙ্গা, ইউ আর মোর ফেমাস দ্যান মি !

দীনবন্ধু মধুসূদনের দিকে ফিরে বললো, দত্তজা, আপনার ফ্রেণ্ডের মুখে শুনলেন তো সব কথা ? আমিও এ সব কথাই বলতে এসেছিলুম। আপনার দুর্দান্ত লেখনীতে এই সব চিত্র ফুটিয়ে তুলুন। আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না।

মধুসূদন বললেন, প্রোজ ! আমি আর প্রোজ লিক্তে চাই না। পোয়েট্রি, শুধু পোয়েট্রিই আমার আলোবাতাস। এখন আমি একটা গ্রেট পোয়েট্রি লেখার কতা ভাবচি। হয় তো কালই শুরু কর্বো।

দীনবন্ধু বললো, আপনি নিশ্চয়ই পোয়েট্রি লিকবেন। কিন্তু এখন প্রয়োজন নাটকের। প্রহসন দুটি লিকে আপনি যে-রূপ কশাঘাত করেচেন, এবার নীলচাষীদের দুঃখ নিয়ে এমন কিছু লিকুন, যা পড়ে সবাই কাঁদবে। আপনারা জানেন বোধ হয়, নীলচাষের প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য সরকার থেকে এক কমিশন বসানো হয়েচে। সীটনকার সাহেব তার সভাপতি। শোনা যাচ্চে, এই সীটনকার চাষীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। লেফটেনান্ট গভর্নর গ্র্যান্ট সাহেব গোড়ার দিকে চাষীদের দিক একটু টেনেছিলেন বটে, কিন্তু এখন আবার বেঁকে গ্যাচেন। এই গঙ্গানারায়ণ সিংহের মতন কেউ যদি চাষীদের সাহায্য কত্তে যায়, তবে তাদের ফাটকে পোরবার জন্য ১১ আইন চালু হয়েচে। আমাদের উচিত ইণ্ডিগো কমিশনারের সামনে প্রকৃত তথ্যগুলি তুলে ধরা, যদি ঐ আইন পাল্টানো যায়—

মধুসূদন বললেন, এ সব বেশ ভালো কতা। কিন্তু এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী ?

—ঐ যে বললুম, আপনি নীল চাষীদের নিয়ে একটি নাটক রচনা করুন। আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না। আপনি স্বয়ং বীণাপাণির আশীর্বাদপুষ্ট।

—আমার এখুন আর গদ্য রচনায় মন নেই। আমার মন শুধু কাব্যের দিকে ঝুঁকে আচে। আমি রামায়ণের মেঘনাদকে নিয়ে একটা কাব্য শুরু কচ্চি। রাম আর তার দলবল যেমন অসভ্যের মতন অন্যায় যুদ্ধে মেঘনাদকে মেরেচে, আমি আমার কাব্যে তার শোধ তুলবো।

—আপনি আর নাটক লিকবেন না !

রাজনারায়ণ বসু দীনবন্ধুকে বললেন, আপনি···আপনি তো ভারি অদ্ভুত লোক মশায়। মধু লিকবে না শুনে অমনি আপনার মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেল। আপনি নিজেই লিকুন না। আপনার যখন নীলচাষীদের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আচে।

দীনবন্ধু বললো, হায়, আমি লিখবো ! আমার কি সে ক্ষমতা আচে। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা যিনি লিখেচেন তিনিই যদি না লেখেন—কয়েক লাইন পদ্য ছাড়া আমার হাত দিয়ে আজ পর্যন্ত কিচুই বেরোয় নি।

গগ্যানারায়ণের দিকে ফিরে দীনবন্ধু জিজ্ঞেস করলো, আপনি লিকতে পারেন না ?

গঙ্গানারায়ণ হেসে বললো, কোনোক্রমে আমি দু-একবার বন্দুক চালিয়েচি বটে, কিন্তু লেখনী আমার হাতে একেবারেই চলে না।

মধুসূদন উঠে এসে দীনবন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, মাই ফ্রেণ্ড, ইউ বেটার ট্রাই ইয়োর

হ্যাঁ···নীলচাষীদের অবস্থা দেকে আপনার মনে হয়েচে এই বিষয় নাটক লেখার যোগ্য···এই মনে হওয়াকেই বলে ইন্‌সপিরেশান। বড় বড় লেখকরা এই ইনস্‌পিরেশান দ্বারাই চালিত হন, সুতরাং আপনি আর দ্বিধা কর্বেন না। কাগজ-কলম নিয়ে বসে পড়ুন গে।

মধুসূদনের স্পর্শে রোমাঞ্চিত বোধ করলো দীনবন্ধু। সে আর কোনো কথা না বলে নীরব হয়ে রইলো। এবং সেদিন ঐ আসর থেকে বিদায় নেবার পর মধুসূদনের শেষ কথাগুলিই অনবরত ঘুরতে লাগলো তার মস্তিষ্কে।

হালিশহরে বন্ধু বঙ্কিমের বিবাহে নিমন্ত্রণ খেয়েই দীনবন্ধু আবার চলে গেল তার কর্মস্থল ঢাকায়। সরকারি নিরস কাজকর্মের মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকের মতন এক একটি কাল্পনিক চরিত্রের সংলাপ তার মাথায় আসে। কবি মধুসূদন একেই কি বলেছেন ইনস্‌পিরেশান ? নইলে হঠাৎ এই সব কথা মাথায় আসে কেন ? তা হলে তো লিখতে হয়। বেশী দেরী করে ফেললেও লাভ নেই, ইণ্ডিগো কমিশন চলাকালীন বার করতে পারলেই এর উপযোগিতা।

কর্মোপলক্ষে দীনবন্ধুকে নৌকাযোগে প্রায়ই ঢাকা থেকে নানা স্থলে যেতে হয়, দু দিন তিনদিন, কখনো এক সপ্তাহও নৌকোয় কাটাতে হয়। নিরিবিলিতে লেখার সেই প্রকৃষ্ট সময়। লিখতে লিখতে এক এক সময় গঙ্গানারায়ণ সিংহের বর্ণনার কথা মনে পড়ে। কিন্তু গঙ্গানারায়ণ সিংহের নামে আদালতে মামলা ঝুলছে। তার নাম নাটকে উল্লেখ করা সমীচীন হবে না বলে দীনবন্ধু এড়িয়ে যায়।

তিন সপ্তাহের মধ্যে নাটক লেখা সম্পূর্ণ হয়ে গেল। নাম আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, নীলদর্পণ। সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিখানি হাতে নিয়ে দীনবন্ধু উঠে এলো নৌকোর ছাদে। যে-কোনো একটি সৃষ্টিকার্য সম্পূর্ণ করার আনন্দ তো আছেই, কিন্তু এখন বক্ষের মধ্যে ভয়ের দুম দুম শব্দও হচ্ছে। এই নাটক প্রকাশিত হলে রাজরোষে পড়ার ভয় আছে। চাকরি হারানোও অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এখন আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই।

একটু বাদেই প্রবল ঝড় উঠলো। দীনবন্ধুর নৌকো তখন মেঘনার বুকে। ভাদ্রের মেঘনা ঝড়ের সময় অতি ভয়ঙ্করী, কালো রঙের ঢেউগুলি যেন অকস্মাৎ অতি জীবন্ত হয়ে ওঠে। অনেক চেষ্টা করেও মাঝিরা হাল ধরে রাখতে পারলো না। তারা হায় হায় করে উঠলো। আর বুঝি নৌকো রক্ষা পায় না।

দীনবন্ধুর সারা শরীর কম্পিত হতে লাগলো। মানুষ মাত্রেরই মৃত্যুভয় থাকে, দীনবন্ধু ভাবলো, সে সামান্য মানুষ, তার জীবনের আর এমন মূল্য কী, কিন্তু নীলদর্পণের পাণ্ডুলিপিও সলিলসমাধি লাভ করবে ? তবে কি জগদীশ্বরের ইচ্ছে নয় যে এই নাটক প্রকাশিত হোক ? কিছুক্ষণের জন্য দীনবন্ধুর মন ভালো-মন্দ চিন্তার অতীত হয়ে গেল, ক্রুদ্ধ ঝড়ের দাপাদাপি চললো বাইরে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য নৌকো নিমজ্জিত হলো না। দীনবন্ধু নিরাপদেই এসে পৌঁছোলো ঢাকায়। নাটকটির গুণাগুণ বিচারের আর সময় নেই, অতি দ্রুত ছাপিয়ে ফেলা দরকার। ঢাকায় দীনবন্ধুর দু-একজন গুণগ্রাহী জুটেছে। তাদেরই মধ্যে রাম ভৌমিক নামে এক ব্যক্তি যত্ন করে সেখানে নীলদর্পণ ছাপিয়ে দিল। নাট্যকারের কোনো নাম রইলো না। কশ্চিৎ পথিকস্য এই নামে একটি ভূমিকা জুড়ে দিল দীনবন্ধু। তারপর মুদ্রিত নাটকের কয়েক কপি নিয়ে চলে এলো কলকাতায়।

বন্ধু বঙ্কিমকে পড়াবার সুযোগ নেই। কারণ সে ইতিমধ্যে মেদিনীপুরের নেগুয়ায় বদলি হয়ে গেছে। দীনবন্ধুর প্রথমেই মনে পড়লো তার কৈশোর পৃষ্ঠপোষক লঙ সাহেবের কথা। লঙ তাকে সব সময় উৎসাহ দিয়েছেন নানা ব্যাপারে, তাঁকে একবার পড়ানো দরকার।

পাদ্রী লঙ পেশায় সরকারী অনুবাদক। দেশীয় ভাষায় রচনার সারমর্ম তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করে সরকারের গোচরে আনেন। আসলে লঙকে দিয়ে সরকার গোয়েন্দার কাজ করিয়ে নেয়। দেশী ভাষায় রাজদ্রোহমূলক কিছু লেখা হচ্ছে কিনা সেটা জানাই সরকারের উদ্দেশ্য। সরলমনা পাদ্রী লঙ অত বোঝেন না। তিনি এ দেশের ভাষা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে এ দেশের মানুষকে ভালোবেসে ফেলেছেন। এ দেশের চাষীদের দুরবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তদন্ত করেছেন। লঙকে নাটকটি পড়ে শোনালেন দীনবন্ধু। শুনতে শুনতে লঙ উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ ও কাতর হয়ে পড়লেন। বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, তুমি সত্য লিখেছো ? গ্রাম দেশে এমন অত্যাচার হয় ! এ সব তুমি নিজের চোখে দেখেছো ?

দীনবন্ধু বললো, কিছু আমার নিজের চোখে দেখা। কিছু কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে শোনা। লঙ বললেন, তুমি অবিলম্বে এ বইখানি ইংরেজিতে অনুবাদিত করাও। এমন চলতি গ্রাম্যভাষা তো

আমি ইংরেজি করতে পারবো না। তুমি কোনো যোগ্য ব্যক্তির হাতে সত্বর এ-ভার দেও। সে পুস্তক ছাপাবার ব্যবস্থা আমিই করবো। তারপর সেই ইংরেজি ভাষ্য ইণ্ডিগো কমিশনে পেশ করা হবে।

নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ কে করবে ? দীনবন্ধুর প্রথমেই মনে পড়লো মধুসূদন দত্তের কথা। তিনি এ নাটক লিখতে সম্মত হননি। কিন্তু ইংরেজি অনুবাদও কি করে দেবেন না ? ইংরেজি তিনি অতি উত্তম জানেন তো বটেই, তা ছাড়া তিনি এ রকম ভাষায় স্বয়ং নাটক লিখেছেন। শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতীর ইংরেজি করেছেন। সুতরাং নাটক অনুবাদের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে।

দীনবন্ধু আবার গিয়ে ধরলেন মধুসূদনকে। সেদিনও সেখানে তাঁর বন্ধুরা উপস্থিত। সকলের অনুরোধ তিনি ঠেলতে পারলেন না। ঠিক হলো, তিনি অনুবাদ করে দেবেন বটে কিন্তু তাঁর নাম যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়। তাঁরও তো সরকারি আদালতে চাকুরি।

লঙ সাহেবই পরামর্শ দিয়েছিলেন দীনবন্ধুকে এই সময় কলকাতা ত্যাগ করতে। তাই দীনবন্ধু ঢাকায় ফিরে গিয়ে নিরীহভাবে চাকুরি করতে লাগলেন। ঝামাপুকুরে এক বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো মধুসূদনকে। তিনি বললেন, এক রাত্রেই তিনি অনুবাদ শেষ করে দেবেন। তবে তাঁর দুটি শর্ত আছে। অন্তত বারো বোতল বীয়ার চাই তাঁর। আর গঙ্গানারায়ণকে তাঁর সঙ্গে থেকে প্রতিটি লাইন পড়ে শুনিয়ে সঠিক অর্থ বুঝিয়ে দিতে হবে। মাঝে মাঝে সংলাপে মুসলমানী ভাষা আছে। গঙ্গানারায়ণ ওদের মধ্যে ছিল। সে-ই ও সব কথার ঠিক মানে বুঝতে পারবে।

সন্ধে থেকে শুরু হলো কাজ। মধুসূদনের একহাতে বীয়ারের বোতল, অন্য হাতে লেখনী। গঙ্গানারায়ণ সংলাপগুলো পড়ে পড়ে তার সাধারণ অর্থ বুঝিয়ে দেয়। মধ্যপথেই মধুসূদন হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলেন, ঠিক আচে, ঠিক আচে, বুঝিচি, বুঝিচি। তার পর তিনি গড়গড়িয়ে লিখে যান।

অনুবাদ চলতে লাগলো দ্রুত তালে। মধ্যরাত্রি পেরিয়ে যাবার পর মধুসূদনের নেশাও প্রায় চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছোয়। মাঝে মাঝে তাঁর চক্ষু ঢুলে আসে, হাত থেকে খসে পড়ে কলম। গঙ্গানারায়ণ তখন বলে, তা হলে আজ আর থাক, মধু! বাকিটা কাল হবে।

আবার কলম তুলে নিয়ে এবং গলায় একঢোক বীয়ার ঢেলে মধুসূদন বলেন, নো-ও-ও। আই মাস্ট ফিনিস দিস ড্যাম থিং টু নাইট। যাই বলিস, গঙ্গা, এই পোস্টমাস্টারবাবুটি কিন্তু নাটকটি লিকেচে বেড়ে। 'সুমুন্দি দেঁড়িয়ে যেন কাটের পুতুল, গোড়ার বাকি্য হয়ে গিয়েচে!' ড্যাম গুড! ভেরি রিয়েলিস্টিক। তারপর বল্, নবীনমাধব কী বললে ? নবীনমাধব ক্যারেকটারটা যেন তোর আদলে গড়েচে।

গঙ্গানারায়ণ বললো, মধু, তুই আর বীয়ার পান করিস নি! যথেষ্ট তো হলো।

মধুসূদন ধমকে বললেন, সাট্-আপ, মাই ডিয়ার বয়। তোর কাজ তুই করে যা, আমার কাজ আমি করবো।

পঞ্চম অঙ্কে এসে মধুসূদন বললেন, এ কি রে বাপু, সব্বাইকে মেরে ফেলচে যে! এ যে বাবা হ্যামলেটকেও ছাড়িয়ে গেল! পোস্টমাস্টারবাবুটি প্রথম নাটক লিকেই শেক্সপীয়ার। হা-হা-হা-হা! তারপর বল গঙ্গা, আদুরী কী বললে ? ফাইন ক্যারেকটার, দিস আদুরী, আই লাইক দিস গার্লি···ওরে বাপ্‌রে, এই বিন্দুমাধব আবার খুব সংস্কৃত ঝাড়ে যে।

নাটকের শেষ বাক্যটি লেখামাত্র মধুসূদন নেশায় জ্ঞান হারিয়ে সেই টেবিলের ওপরেই শুয়ে পড়লেন।

কুসুমকুমারীর পিত্রালয়ে প্রায়ই নানা উপলক্ষে খুব ধুমধাম হয়। এ গৃহে সুখ ও সমৃদ্ধি যেন পরস্পরের হাত ধরে আছে।

কুসুমকুমারীর পিতারা পাঁচ ভাই, তাঁরা সকলেই একান্নবর্তী। তাঁদের পুত্র কন্যার সংখ্যাও বর্তমানে সব মিলিয়ে সাতাশ, কুসুমকুমারীর নিজের সহোদর সহোদরার সংখ্যাই নয়। সুতরাং এতবড় পরিবারের একেবারে এক কোণে বিধবা কুসুমকুমারীর হারিয়ে যাবার কথা ছিল। কিন্তু তা হলো না। বিধবা বলেই কুসুমকুমারীকে ঠেলে দেওয়া হলো না ঠাকুরঘরে। তার পিতা-মাতা ভালো করে খোঁজ খবর না নিয়েই যে এক উন্মাদের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছিলেন, সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তাঁরা কুসুমকুমারীর প্রতি আদরের বন্যা বইয়ে দিলেন। তার জন্য নির্ধারিত হলো এ গৃহের একটি সুসজ্জিত কক্ষ, দুটি দাসী নিযুক্ত করা হলো তার সেবার জন্য।

কুসুমকুমারীর পিতা কৃষ্ণনাথ রায়ের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের কিছু ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে। কিছুদিনের মধ্যেই কৃষ্ণনাথকে কার্যোপলক্ষে ত্রিপুরায় যেতে হলো, তিনি কুসুমকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবতী বিধবার পক্ষে দেশ ভ্রমণ প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার, কিন্তু কৃষ্ণনাথ নিছক আচারবদ্ধ মানুষ নন, তিনি তেজস্বী পুরুষ, নিজের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করেন, পাঁচজনের কথা অগ্রাহ্য করার সাহস রাখেন। বদ্ধ জীবন ছেড়ে কিছুদিন বাইরে ঘুরে শোকসন্তপ্তা কন্যাটির যে যথেষ্ট উপকার হবে, সে কথা ভেবেই তিনি কুসুমকুমারীকে নিয়ে গেলেন ত্রিপুরায়।

কুসুমকুমারীর অবশ্য সন্তাপ ছিল, কিন্তু শোক ছিল না। যে স্বামীর সঙ্গে তার কোনো দিন একটিও স্বাভাবিক বাক্য বিনিময় হলো না, হৃদয় বিনিময় তো দূরের কথা, যাকে দেখে সে শুধু ভয়ই পেয়েছে, তার মৃত্যুতে আবার শোক কী? শুধু বুকের ওপর সর্বক্ষণ যেন পাষাণভার চেপে থাকে।

ত্রিপুরার পথে পাহাড় ও অরণ্যানীর মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে আস্তে আস্তে তার হৃদয় উন্মোচিত হয়। প্রকৃতি দর্শনে মুগ্ধ হবার মতন চক্ষু তার আছে। প্রতিটি দৃশ্যই তার কাছে নতুন মনে হয়। নদীবক্ষে শত শত কাঠের গুঁড়ি ভেসে যেতে দেখলে একই সঙ্গে সে বিস্মিত ও উল্লসিত হয়ে ওঠে। এই ভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে কাঠ চালান যায়, বাঃ ভারি বুদ্ধির ব্যাপার তো! মধ্যে মধ্যে চোখে পড়ে শিশুর মতন দুষ্টুমিভরা দৃষ্টি নিয়ে ছুটে যাওয়া ধূসর রঙের বন-খরগোশ। কুসুমকুমারীর ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে ওদের ধরতে।

যাত্রীদলটির সঙ্গে প্রহরা দিয়ে চলেছে ত্রিপুরা রাজবাহিনীর কয়েকজন সৈনিক। সুতরাং বিপদের কোনো ভয় নেই। কৃষ্ণনাথ বাইরে এসে কন্যার আব্রুর ব্যাপারেও বিশেষ কড়াকড়ি করেন নি, জনপদের বাইরে দিয়ে যাবার সময় কুসুমকুমারীর পালকির দু' পাশ খোলা থাকে। কখনো ইচ্ছে হলে সে তার পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে বনের মধ্যে হেঁটেও আসতে পারে।

ত্রিপুরায় ধর্মনগর নামে এক স্থানে এক রাত্রিবেলা ওদের তাঁবু পড়েছে। কাছেই একটি জলাশয়ের ওপারে খানিকটা জঙ্গল। পূর্ণিমার রাত, আকাশ ধুয়ে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। কুসুমকুমারী সেই জলাশয়ের ধারে এসে বসেছে। এক একবার সে জল দেখছে, এক একবার দেখছে আকাশ। আজ চন্দ্রকিরণের এত জোর যে পাতলা মেঘ ভেদ করেও দেখা যায় পূর্ণ চাঁদ। মেঘগুলি শন্ শন্ করে ছুটছে, অথবা এক এক সময় কুসুমকুমারীর ভ্রম হয় মেঘগুলিই বুঝি থেমে আছে, আর চাঁদ ছুটছে অমন করে

হঠাৎ অদূরে চক্ চক্ শব্দ হতেই কুসুমকুমারী চমকে তাকালো। তার পর সে যেন নিজের চক্ষুকেই বিশ্বাস করতে পারলো না। সেই সরোবরে জলপান করতে এসেছে দুটি চিত্রল হরিণ। কুসুমকুমারী এর আগে কখনো জীবন্ত হরিণ দেখে নি। সমস্ত হৃদয়টাকে দু' চক্ষে এনে সে দেখতে লাগলো হরিণ দুটিকে এবং তাকে সাহায্য করার জন্যই যেন সেই সময় মেঘ সরে গিয়ে বেশী করে আলো পড়লো সেখানে। হরিণ দুটি এত কাছাকাছি মানুষের উপস্থিতি টের পায় নি আগে, একটু পরে সজাগ হতেই তারা এক

সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো। তাদের সেই ছন্দময় লম্ফ এবং সমস্ত শরীরে ঢেউ খেলিয়ে ছুটে যাওয়ার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কুসুমকুমারী, তার সর্ব শরীরে রোমাঞ্চ হলো। পৃথিবীটা এত সুন্দর!

সেইখানে আচ্ছন্নের মতই বসে ছিল কুসুমকুমারী, একটু পরেই একসঙ্গে অনেক মানুষের চিৎকারে সজাগ হলো সে। রক্ষীর দল হরিণ দুটিকে দেখতে পেয়েছে, ওদের বধ করার জন্য তারা পিছু ধাওয়া করেছে। কুসুমকুমারী তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো। তার পিতাকে বলে সে ওদের নিবৃত্ত করবে। এমন স্নিগ্ধ, সুষমাময় রাত্রেও কি মানুষের হিংসার কথা মনে আসে! কুসুমকুমারীর মনে পড়ে গেল শকুন্তলার গল্পের কথা। এই স্থানটি যেন তপোবন, এখানে জীব হত্যা নিষেধ। তারপর তার মনে হলো, এমন জ্যোৎস্নাময় রাত্রে, সমস্ত পৃথিবীটাই তপোবন, কোথাও কারুর মনে এখন হিংসা থাকা উচিত নয়।

কুসুমকুমারী এগিয়ে যেতে লাগলো তাঁবুর দিকে। লোকগুলি হরিণ দুটিকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পায়নি শুনে সে নিশ্চিন্ত হলো। আবার ফিরে এলো সেই জলাশয়ের কাছে। জলের ওপর ভাসছে চাঁদ, আকাশেও চাঁদ, এই দুই চাঁদ দেখতে দেখতে মগ্ন হয়ে রইলো সে, যেন তার শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে সুখানুভূতি হচ্ছে। তার সতেরো বছরের জীবনে এমন আনন্দ সে যেন আর কখনো পায় নি।

তবু, চতুর্দিকে এত সুন্দরের মধ্যে বসে থেকেও কুসুমকুমারীর এক সময় মনে হলো, চিত্রল হরিণ দুটি কেন সে দেখলো? শকুন্তলার গল্পটা না মনে পড়লেই ভালো হতো এ সময়। সে কিছুতেই দমন করতে পারলো না একটা দীর্ঘশ্বাস। শকুন্তলা তার মতন বিধবা ছিল না!

ত্রিপুরা থেকে প্রায় তিন মাস পরে কুসুমকুমারী আবার ফিরে এলো কলকাতায়। তখন তাদের বাড়ির ছেলেরা মিলে একটি নাটক অভিনয়ের ব্যাপারে মেতে উঠেছে।

এই পরিবারের পুরুষরা কেউ প্রকাশ্যে মদ-মেয়েমানুষের চর্চা করে না। গোপনে কার কোন্ দিকে যাতায়াত আছে, তা কে জানে, কিন্তু বাড়িতে ও সবের কোনো স্থান নেই। কুসুমকুমারীর পিতা কৃষ্ণনাথ অবশ্য প্রকৃতই সচ্চরিত্র পুরুষ, তাঁর ঝোঁক আছে ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রতি। এ গৃহের বালকদের স্কুল-কলেজে পড়া বাধ্যতামূলক। যুবকরা পায়রা ও ঘুড়ি ওড়ানোর মতন নির্দোষ আনন্দে মত্ত থাকে। দোল-দুর্গোৎসবে যাত্রা ও পালাগান হয়। এবার তারা নিজেরাই নাটক করবে। নির্দেশক, অভিনেতা, গায়ক-বাদক প্রায় সকলেই এ বাড়ির ছেলে। বাড়ির মেয়েদের অংশ গ্রহণ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, তবে নাটমহলে মহড়ার সময় মেয়েদের উপস্থিত থাকায় কোনো দোষ নেই। নাটকের নাম বিক্রমোর্বশী। জোড়াসাঁকোর সিংহবাড়িতে নবীনকুমার সিংহের এই নাটকের অভিনয় দেখে বাগবাজারের ছেলেরা মুগ্ধ হয়েছিল, তাই তারা সেই নাটকই মঞ্চস্থ করতে চেয়েছে। কুসুমকুমারী আগাগোড়া বসে বসে মহড়া দেখে, এক একবার সে তার মেজদা, ছোড়দা, ফুলদাদের কিছু কিছু নির্দেশও দেয়।

একদিন দুর্গামণি একটি পত্র পাঠালো তাকে।

"আমার পরম স্নেহের ধন কুসুম সোনা, আজ ছয় মাস হইল তোরে দর্শন করি নাই। দিবারাত্র বার ২ মনে পড়ে তব ফুল্ল কুসুমিত মুখখানি। ঐ নীল নয়নমণি দুইটি কী কহিব সর্বদা আমার সঙ্গে ২ ফেরে। তুই এই পাপের গৃহে আর কোনোদিন পদস্পর্শ করিবি না জানি, কেনই বা করিবি, তোর উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। আমি হতভাগিনী আর কোথায় যাইব এই পাপ পুরীতেই পচিয়া মরা বৈ আর কোনো গতি নাই। শ্রীমান সত্যপ্রসাদ মধ্যে ২ তোমার কথা বলে। বেচারি বড় মুষড়াইয়া পড়িয়াছে, উহার বোধহয় এস্থান হইতে বাস উঠিল। উহার মাতা বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন সে পাশ না দিয়া বিবাহ করিতে চাহে না। আর খেলা জমে না।

ওরে কুসোম, তুই বড় বাঁচা বাঁচিয়া গিয়াছিস। রাক্ষস পাগোল স্বামীর সহিত সারা জীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরার চাহিতে স্বাধীন বৈধব্য শতগুণ ভালো। স্বাধীন বৈধব্য এমন কথা সত্যপ্রসাদ একবার তোর সম্পর্কে বলিয়াছিল, আমার বড় মনে ধরিয়াছে। আহা আমি যদি এমত স্বাধীন বৈধব্য পাইতাম! তুই বিধবা থাকিবি কেন আমার মতন তোর বয়স তো তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকে নাই— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অবলাদিগের সুরাহা করিয়াছেন। তোর কাঁচা বয়স, তোর পুনরায় বিবাহ হইবে, হইবেই হইবে, এমন যার রূপ সেই যে বৃন্দাবন গোস্বামী ঠাকুর একবার গান শুনাইয়াছিলেন 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি' তুই যেন সেই। বলিব কি কুসোম, আমি যদি পুরুষ মানুষ হইতাম তবে বলপূর্বক তোরে হরণ করিয়া লইয়া যাইতাম কোনো দূর দেশে। আমার এই জীবনটা বৃথাই গেল, তুমি ভাগ্যবতী হও, কোনো রূপবান গুণবান পুরুষ তোমারে গ্রহণ করিয়া ধন্য হউন। সত্যপ্রসাদ এই পত্র পাঠ করিবার জন্য আকুতি করিতেছে তাহাকে দেখাইব না সুতরাং আর লিখিব না। আর অধিক কী। ইতি আং

তোমার খুড়ী ঠাকুরানী দুর্গামণি।"

পত্রখানি অন্তত দশবার পাঠ করলো কুসুমকুমারী। পড়তে পড়তে সে হাসলো, কাঁদলো, তার পর সেখানি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে সে উড়িয়ে দিল বাতাসে। এই পত্র অন্য কেউ দেখে ফেললে কতখানি লজ্জার ব্যাপার হবে! দুর্গামণির মুখের কোনো বাঁধন নেই। আবার বিবাহ? ছিঃ!

কুসুমকুমারী অবশ্য জানে না যে তার পুনর্বিবাহ নিয়ে ইতিমধ্যেই খানিকটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। কুসুমকুমারীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা নৃপেন্দ্রনাথের দুটি শিশুপুত্রের গৃহশিক্ষক যদুপতি গাঙ্গুলী, তার সঙ্গে নৃপেন্দ্রনাথের মাঝে মধ্যে দেশ ও সমাজ বিষয়ে আলোচনা হয়। যদুপতি গাঙ্গুলী বিদ্যোৎসাহিনী সভার সদস্য এবং বিদ্যাসাগরের চ্যালা। নৃপেন্দ্রনাথ ঐ যদুপতির প্ররোচনায় কয়েকটি দুঃস্থ বিধবার বিবাহের সময় কিছু আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। কুসুমকুমারী এ বাড়িতে বিধবা হয়ে ফিরে আসার কিছুদিন পর যদুপতি একদিন নৃপেন্দ্রনাথকে বললেন, আপনি বিধবা বিবাহের সমর্থক, আপনি আপনার এই ভগিনীর আবার বিবাহ দিন না কেন! প্রস্তাব শুনে নৃপেন্দ্রনাথ আমতা আমতা করতে লাগলেন। তৎক্ষণাৎ সায় দিতেও পারেন না আবার গৃহশিক্ষকের কাছে প্রাচীনপন্থী সাজতেও চান না। তিনি বললেন, আমার অমত না থাকলেও আমার বাবা এ পরিবারের কর্তা, তাঁর সম্মতি বিনা তো কিছু হতে পারে না। যদুপতি তখন বললেন, আপনার বাবার কাছে এ প্রস্তাব পেশ করুন তবে। শুনেছি আপনার বাবা রামতনু লাহিড়ী মশায়ের একজন সুহৃদ। আপনি জানেন নিশ্চয় যে রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বিধবা বিবাহ কার্যে মহোৎসাহী?

আচ্ছা দেখি, বলে নৃপেন্দ্রনাথ তখনকার মতন এড়িয়ে যান। রাশভারী কৃষ্ণনাথের কাছে এরকম কথা বলতে নৃপেন্দ্রনাথের সাহস হয় না। কৃষ্ণনাথ যদি রাজি হন তো তখুনি এমন সুপরামর্শের জন্য পাত্রকে স্নেহ-সম্ভাষণ করবেন, আর যদি রাজি না হন তো অমনি একেবারে ক্রোধে অগ্নিশর্মা!

নাছোড়বান্দা যদুপতি কিছুদিন অন্তর অন্তরই বিষয়টা মনে করিয়ে দেয় নৃপেন্দ্রনাথকে। নৃপেন্দ্রনাথ এখন গৃহশিক্ষকটিকে দূর থেকে দেখলেই সোজা একেবারে শয়ন ঘরে ঢুকে দ্বার রুদ্ধ করে বসে থাকেন। তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দুই ভাইকে একটু বাজিয়ে দেখেছেন নৃপেন্দ্রনাথ। সেই ভাই দুটির কোনো আপত্তি নেই কুসুমকুমারীর পুনর্বিবাহে, কিন্তু তারাও কেউ কৃষ্ণনাথের কাছে গিয়ে এই প্রসঙ্গ তোলার সাহস পায় না।

এক ভাই একটি কার্যকর বুদ্ধি দিল। কৃষ্ণনাথের মনোভাব যাচাই করার সাহস যখন তাদের নেই, তখন অন্য একটা পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে গিয়ে যদি অনুরোধ করা যায়, তিনি কৃষ্ণনাথকে কুসুমকুমারীর পুনর্বিবাহের কথা বলুন। কৃষ্ণনাথ রাজি না হলেও রামতনু লাহিড়ীর মতন মান্য বন্ধুর ওপর তো রাগ করতে পারবেন না! সেই অনুযায়ী রামতনু লাহিড়ীর খোঁজ নেওয়া হলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় লাহিড়ী মহাশয় এখন কৃষ্ণনগরে। তাঁর কলকাতায় আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।

কুসুমকুমারীর ফুলদাদা হেমেন্দ্রনাথ সাজছে উর্বশী। সে বেচারির দু পা হাঁটিলেই শাড়ি খুলে যায়। তা দেখে নাটমঞ্চের সিঁড়িতে বসা বাড়ির মেয়েরা একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়ে। সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ হেমেন্দ্র রাগ করে বলে, দিদিরা থাকলে আমি পার্ট বলবো না! মহড়ার সময় ওদের থাকা চলবে না!

তখন মেয়েরা কল্‌কল্ করে ওঠে। কুসুমকুমারীর সেজদিদি বলেন, ওরে হেমু, আসল থ্যাটারের দিনে অ্যাক্টো করার সময় তোর যদি শাড়ি খুলে যায়, তখন ভালো হবে?

কুসুমকুমারী বলে, অ সেজদি, হেমু বলেচে, উর্বশী মালকোঁচা মেরে শাড়ি পরবে!

এক হাতে তলোয়ার ধরা পুরুষরা পর্যন্ত হেসে ওঠে!

নাট্য নির্দেশক পিসতুতো দাদা নগেন্দ্রনাথ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলে, অ্যাই, কী হচ্চে! এটা ছ্যাবলামোর জায়গা? ইন্দু, শশী, কুসী, ক্ষেমী তোরা এবার ভাগ্ এখেন থেকে!

সেজদিদি ইন্দুমতি বলেন, তোরা থ্যাটারের সময় লোক হাসালে আমাদের বাড়ির নাম খারাপ হবে না? মেয়েদের পার্ট আমরা করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোরা শিখে নে।

যাও, যাও, তোমাদের আর ধিঙ্গিপনা কর্তে হবে না! এখুনি ইদিকে বড়োদাদা এসে পড়লে দেকাবে মজা!

—ওমা, ওমা, নন্তু ওর শাড়িতে বেল্ট বেঁধেচে দ্যাক। অ নন্তু, সখীরা বেল্ট বেঁধে এস্টেজে নামবে নাকি রে? হি-হি-হি!

মেয়েদের রঙ্গরস অবশ্য অকস্মাৎ থেমে গেল। এই সময় সেখানে এসে পড়লো স্বয়ং নাট্যকার

নবীনকুমার সিংহ। ঠিক পাশের গৃহেই তার শ্বশুরালয়।এ বাড়ির যুবকরা তাকে অনুরোধ জানিয়েছিল একবার এসে মহড়া দেখে যেতে এবং কিছু পরামর্শ দিতে।

সরোজিনীদের সঙ্গে এ বাড়ির কিছুটা আত্মীয়তা আছে, সেই হিসেবে নবীনকুমার এ বাড়ির কুটুম্বের মতন। তাকে দেখে মহিলারা ঘোমটা দিয়ে মুখ ফেরালো,কেউ কেউ আড়ালে সরে গেল, কয়েকজন একই জায়গায় বসে রইলো, তাদের সঙ্গে নবীনকুমারের রসিকতার সম্পর্ক।

কোঁচানো ধুতি ও নীল মখমলের বেনিয়ান পরা নবীনকুমার চত্বরের মাঝখানে গম্ভীর মুখে দাঁড়ালো, তার হাতে একটি রূপো বাঁধানো ছড়ি। তার চেয়েও বেশী বয়েসী যুবকদের উদ্দেশ করে ভারিক্কী গলায় সে বললো, তা কেমন হচ্চে–টচ্চে শুনি! সুরেন্দ্রবাবু বুঝি পুরুরবা সেজেছেন?

কুসুমকুমারী সিঁড়ির আসন ছেড়ে উঠে অবনতমুখে চলে গেল অন্দর মহলে। যাবার সময় নবীনকুমারের সামনে দিয়ে আসতে হলো তাকে। সে মুখ তুললো না একবারও। এই নবীনকুমারের ব্যাধির সময় সে একবার দেখতে গিয়েছিল, তখন নবীনকুমার একটিও কথা বলেনি তার সঙ্গে। সে কথা তার মনে আছে। নবীনকুমার এবারেও অবশ্য থান কাপড় পরা এই তরুণীটির দিকে চেয়েও দেখলো না।

পরদিন সরোজিনী এলো এ বাড়িতে। সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎসেরে একেবারে শেষ কালে সে এলো কুসুমকুমারীর কাছে। সরোজিনী এর আগেও কুসুমকুমারীর সঙ্গেদেখা করে গেছে কয়েকবার। যখনই সে পিত্রালয়ে আসে,এ বাড়িতেও একবার ঘুরে যায়। আজ এসে সরোজিনী কুসুমকুমারীর হাত জড়িয়ে ধরে বললো,অ কুসুমদিদি, তুমিএকবার আমাদের বাড়িতে চলো! এখুনি চলো।

কুসুমকুমারী বললো, কেন রে, তোদের বাড়িতে যাবো কেন?

সরোজিনী তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করে বললো, চলো না! একবারটি চলো! আমার আজ্জপুত্র তোমার সঙ্গে কতা কইতে চেয়েচেন!

—কী বললি! কী পুত্র!

—আজ্জপুত্র! আমি সব সময় অন্যদের কাচে আমার বর, আমার বর বলি তো, তাই উনি বলেচেন, বর বর বলো কেন? বর তো শুধু বিয়ের দিন হয়। তোমাকে কি এখুন আমি আমার কনে, আমার কনে বলবো? তুমি আমায় আজ্জপুত্র বলবে।

কুসুমকুমারী হেসে বললো, ও, আর্যপুত্র! বরের বদলে আর্যপুত্র! এ যে কেমন যাত্রা যাত্রা শোনায়!

—কী করি বলো দিদি! ওনার যে খেয়াল! কত রকম খেয়াল যে ওঁর হয়!

—তা তোর বরের সঙ্গে আমি কী কতা কইবো!

—একবার চলোই না! তুমি যে বেধবা হয়েচো, সে কতা তো উনি জানতেনই না, আমি কাল রাতের বেলায় বল্লুম! তা শুনে উনি বললেন, আহা, কোন্ মেয়েটি গো? সেই যার সঙ্গে আমাদের পুতুলের বে হয়েছেল? তাকে একবার ডাকো না?

—সরো, তুই যেমন পাগল, তোর বরও তেমনি পাগল! সেই পুতুল খেলা, সে সব কবেকার কতা! বিধবা মেয়েকে কি পরের বাড়ি যেতে আচে!

—আমরা তোমার পর? আমাদের বাড়ি তোমার হলো গে পরের বাড়ি?

সরোজিনীর স্বভাবটি এখনো ছেলেমানুষীতে ভরা। কুসুমকুমারীর চেয়ে সে বয়েসেও কিছুটা ছোট। একটু অমনোমত কথা শুনলেই সে অভিমানে ওষ্ঠ ফোলায়। তা সরোজিনীর অভিমানের কারণ আছে। দুই পরিবারের প্রাসাদ একেবারেই সংলগ্ন বলা যায়, এ ছাদে ও ছাদে কথা হয়, অন্দর মহলের পিছন দিকে দুই বাড়িরই বাগান এবং ঝিল। এ বাড়ি ও বাড়ির মেয়েরা সব সময়ই যাতায়াত করে।

তবু কুসুমকুমারীর যেতে লজ্জা করে। সরোজিনীও কিছুতেই ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত কুসুমকুমারী গেল তার মায়ের কাছে অনুমতি চাইতে। তার মা পুণ্যপ্রভা বললেন, ওমা, তুই বোসেদের বাড়ি যাবি, তাতে আবার কতা কী! তিনি সরোজিনীর চিবুক ছুঁয়ে অনেক আদর করলেন।

নবীনকুমার পালঙ্কে শুয়ে একখানি বই পড়ছিল, সরোজিনী ঘরে ঢুকে বললো, এই যে, কাকে এনিচি দেকুন!

নবীনকুমার দেখলো, একগলা ঘোমটা টানা এক থান পরা মূর্তি ঈষৎ পাশ ফিরে দাঁড়ানো। মুখখানা দেখবার কোনো উপায় নেই।

নবীনকুমার বললো, এই যে মিতেনী, আমায় চিনতে পারো?

কুসুমকুমারী কোনো উত্তর দিল না।

নবীনকুমার বললো, সরোজ, তোমার মিতেনী কি অমন উল্টো দিকে ফিরে থাকবে?

সরোজিনী বললো, আপনি ভুলে গ্যাচেন, ও আমার মিতেনী কেন হবে। কুসোমদিদি তো ছেল আমার দিদির মিতেনী!

নবনীকুমার বললো, তা না হয় হলো। উনি কি আমার সঙ্গে কতা বলবেন না?

সরোজিনী বললো, ও কুসোমদিদি, তুমি অ্যাত লজ্জা পাচ্চো কেন গো? তুমি তো আগে আমার বরের···অ্যাই! থুড়ি···আমার আজ্জপুত্রের সঙ্গে কতা কইতে।

কুসুমকুমারী ফিসফিস করে কী যেন বললো তাকে।

সরোজিনী বললো, তুমি ওরকম করো না তো! বিধবা হলে বুঝি কতা কইতেও নেই। শান্তি মাসী কি চন্দনগরের পিসেমশাইয়ের সঙ্গে কতা বলেন না?

নবীনকুমার হাত জোড় করে ছদ্মকৌতুকে বললো, হে দেবী, একবার আমায় দর্শন দান করে ধন্য করুন। আপনি কি জানেন না, বিধবা কুন্তী তাঁর দেবর বিদুরের সঙ্গে কতা কইতেন।

সরোজিনী জোর করে সরিয়ে দিল কুসুমকুমারীর মুখের ঘোমটা। তবু সে এদিকে তাকাবে না। আবার মুখখানা জোর করে স্বামীর দিকে ফিরিয়ে দিল সরোজিনী। কুসুমকুমারীর চক্ষু দুটি বোঁজা। তার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হচ্ছে লজ্জায়।

কুসুমকুমারীকে দেখে চমকে উঠলো নবীনকুমার। ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা পার হয়ে এসেছে বলে এই মেয়েটির মুখখানি সে ভুলেই গিয়েছিল। এখন মনে পড়লো। অস্ফুট কণ্ঠে সে বললো, তুমি····তুমি সেই বনজ্যোৎস্না!

এবার নীল রঙের চক্ষু দুটি মেলে কুসুমকুমারী তাকালো নবীনকুমারের দিকে।

বিম্ববতী বাণপ্রস্থ গ্রহণের পর বিধুশেখর আর একদিনও সিংহবাড়িতে যাননি। আর কোনো আগ্রহ নেই তাঁর। শুধু দূর থেকে তিনি নজরে রাখবেন, নবীনকুমার বিষয়সম্পত্তি সব একেবারে উৎসন্নে না দেয়। অবশ্য হিসাবপত্রের শুষ্ক ব্যাপার নিয়েও তাঁর আজকাল আর মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে না, তবু এতদিনের অভ্যাস। দিনের মধ্যে একবার না একবার কাগজ-কলম নিয়ে বসবেনই। তাঁর নিজস্ব ঐশ্বর্যও কম জমেনি। এরও ঠিক মতন বিধিব্যবস্থা করে যেতে হবে। কোন্ দিন তিনি চোখ বুজবেন, তার ঠিক নেই। ভরসা তো একমাত্র নাবালক নাতি, আর নবীনকুমার—তার ওপর কি ভরসা করা যায়?

এরই মধ্যে বিধুশেখরের কানে এসে পৌঁছোলো গঙ্গানারায়ণের আগমন বার্তা। তিনি খুব একটা বিস্মিত হলেন না। গঙ্গানারায়ণের মৃত্যু সম্পর্কে তিনি কখনোই খুব একটা ধ্রুব নিশ্চিত হননি। পুরুষমানুষ এত সহজে মরে না। বিশেষত যার মৃত্যু হলে অপর কারুর খুশী হবার কারণ আছে। যম যেন ইচ্ছে করে তাদেরই স্পর্শ করতে ভুলে যায়। তাঁর ধারণ হয়েছিল গঙ্গানারায়ণের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে, তাতেই তিনি ভেবেছিলেন, যাক, আপদ গেছে!

দিবাকর যখন এসে প্রথম জানালো যে গঙ্গানারায়ণ ফিরে এসেছে, বিধুশেখর তৎক্ষণাৎ চক্ষু বুজে মনে মনে বললেন, নিয়তির যেমন বিধান, সেই মতনই ঘটুক, আমার আর কোনো দায় নেই। গঙ্গানারায়ণের সহিত কেমন ব্যবহার করা উচিত, তা ছোট্‌কুই বুঝবে, আমি আর মাথা গলাতে যাবো না।

কিন্তু তিনি অন্তরে একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করলেন। তাঁর অশক্ত, পঙ্গু শরীরটা যেন মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠলো, যেন তিনি এখনো তাঁর ছড়িটা দিয়ে গঙ্গানারায়ণকে সাপ-পেটা করতে পারেন! গঙ্গানারায়ণের প্রতি এমনই এক বিতৃষ্ণা ও ক্রোধ জমে আছে তাঁর মনে, যা তিনি কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারেন না। গঙ্গানারায়ণ যে কিছুদিন বারানসীতেও ঘোরাঘুরি করেছে সে সংবাদ লোকপরম্পরায়

তিনি অবগত হয়েছিলেন। তাতে তাঁর ক্রোধে আরও ইন্ধন পড়েছিল। এই মতিচ্ছন্ন যুবকটি তাঁর প্রিয়তমা কন্যা বিন্দুবাসিনীকে নষ্ট করেছে। বিন্দুকে চিরকালের মতন দূরে সরিয়ে দিয়েছে তাঁর কাছ থেকে। বিন্দুকে সরিয়ে দেবার জন্য তাঁকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। কিন্তু সে জন্য তাঁর মন যে কতখানি পুড়েছে, সে কথা তো কেউ জানে না।

চাপা শ্লেষের সঙ্গে তিনি দিবাকরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হুঁ, ফিরে এসেচে! ভালো কতা! আসল লোক কি না দেকে নিইচিস তো? নাকি আবার জাল প্রতাপচাঁদের মামলা হবে? নিজের ভাগের সম্পত্তি দাবি করেচে নিশ্চয়?

দিবাকর আমতা আমতা করে উত্তর দেয়, আজ্ঞে, দেকে তো মনে হয় আমাদের সেই বাবু-ই বটে। তবে কি না হলফ্ করে কে বলতে পারে? সম্পত্তির কতা তো কিচু বলেননিকো এখুনো, অনেকটা সন্ন্যেসীদের মতন ভাব।

বিধুশেখর বললেন, হুঁ।

একটু থেমে বিধুশেখরকে খুশী করবার জন্য দিবাকর বললো, ভেক্ ধরেচেন কি না তা আর আমাদের মতন ছার লোকে কী বলবে! আজকাল কে আসল, কে নকল বোজা শক্ত। আপনি তো সবই জানেন।

বিধুশেখর মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

দিবাকর জিজ্ঞেস করলো, একবার ছোট্‌কুবাবুকে দেকা কত্তে বলবো আপনার সঙ্গে?

এবার বিধুশেখর উদাসীনভাবে বললেন, না, থাক। যদি তার ইচ্ছে হয় আসবে, ডাকবার দরকার নেইকো। আমি আর এ-সবের মধ্যে থাকতে চাই না।

ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু কৌতুকও বোধ করছিলেন বিধুশেখর। গঙ্গানারায়ণ ফিরে এলেও যাতে সে-কোনো সুবিধে করতে না পারে, সে ব্যবস্থা তিনি আগেই করে রেখেছেন। গঙ্গানারায়ণ মৃত বলে রটিত হবার পর তার ভাগের সম্পত্তি নবনীকুমারের নামেই বর্তে ছিল। ইদানীং মহাভারত অনুবাদের হুজুগে নবীনকুমার প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। সে জন্য কিছু সম্পত্তি বিক্রয় করার প্রয়োজন হয়েছিল। বিধুশেখর কৌশলে নবীনকুমারকে দিয়ে গঙ্গানারায়ণের জায়গা-জমিই সব বেচে দিয়েছে। এখন কার্যত গঙ্গানারায়ণ কপর্দকশূন্য, এবার সে বুঝুক! কনিষ্ঠ ভ্রাতার কাছে সে হাত-তোলা হয়ে থাকতে পারবে? যে পুরুষমানুষের হাতে পয়সা থাকে না, বাড়ির কুকুর-বিড়ালটা পর্যন্ত তাকে সমীহ করে না। আবার না নিরুদ্দেশে চলে যেতে হয় গঙ্গানারায়ণকে। আর যদি ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ বাধে, তখন বাধ্য হয়েই হস্তক্ষেপ করতে হবে বিধুশেখরকে।

মুখে যা-ই বলুন, বিধুশেখর মনে মনে প্রত্যাশা করেছিলেন যে ছোট্‌কু ঠিকই আসবে তাঁর কাছে। বিষয়-বুদ্ধি ছোট্‌কুর খুবই কম। গঙ্গানারায়ণের ফিরে আসা জনিত সংকটে পরামর্শ নেবার জন্য বিধুশেখরের কাছে আসতেই হবে ছোট্‌কুকে। কিন্তু দিনের পর দিন যায়, ছোট্‌কু আর আসে না। বিধুশেখর জানেনই না যে ছোট্‌কু আর এবাড়িতে কোনোদিনই আসবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে।

ছোট্‌কু এলো না, তার বদলে গঙ্গানারায়ণ নিজেই এলো একদিন।

ছোটভাই নবীনকুমার নিজের উদ্যোগে জেলখানা থেকে জামিনে খালাস করে এনেছে গঙ্গানারায়ণকে। কলকাতায় এসে গঙ্গানারায়ণ দেখলো, যে গৃহে সে আবাল্য প্রতিপালিত হয়েছে, সে গৃহে তার আর কোনো চিহ্নই নেই। বিম্ববতী নেই শুনে গঙ্গানারায়ণের অন্তর হাহাকার করে উঠেছিল, সে চেয়েছিল, সেই দণ্ডেই হরিদ্বারের দিকে রওনা হবে, জননীর সঙ্গে দেখা করে আসবে। নবীনকুমার অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে নিবৃত্ত করেছে। কারণ গঙ্গানারায়ণ এখনো আসামী, তার নামে মামলা ঝুলছে, তার যত্রতত্র গমনের স্বাধীনতা নেই।

গঙ্গানারায়ণের নিজস্ব কক্ষটিও এখন অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়। সেজন্য কারুকে দোষও দেওয়া যায় না। কেই-বা ভেবেছিল গঙ্গানারায়ণ ফিরে আসবে? তার পত্নী লীলাবতী বাপের বাড়ি থেকে আর কখনো এ-বাড়ীতে আসেনি। সেই নিরপরাধ বালিকাটি কত কষ্টই না পেয়েছে। বিনা দোষে সে পতি-সহবাসে বঞ্চিতা হয়ে বিধবা সেজে রইলো। শেষ পর্যন্তও সুখের মুখ দেখতে পেল না সে। মাত্র

আট মাস আগে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে সে এই ভবধাম পরিত্যাগ করেছে। কানাঘুষো শোনা যায় যে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি লীলাবতীর, কিছু একটা অসমীচীন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার ফলে আত্মঘাতিনী হয় সে। তার মৃত্যুর ঠিক দুই দিন পরেই তার পিত্রালয়ে তার এক পিসতুতো দাদা গলায় ফাঁস লাগিয়ে অপঘাতে মরে বলেই এমন গুজবের জন্ম হয়। সে যাই হোক, লীলাবতী মুছে গেছে এ পৃথিবী থেকে।

পত্নীর মৃত্যুসংবাদ শান্তভাবে গ্রহণ করে গঙ্গানারায়ণ। লীলাবতীর প্রতি সে সীমাহীন অবিচার করেছে ঠিকই, কিন্তু সেজন্য যেন সে নিজে দায়ী নয়, দায়ী তাদের দুজনের নিয়তি। লীলাবতী বেঁচে থাকলেও গঙ্গানারায়ণ কি তাকে এখন আবার গ্রহণ করতে পারতো?

নবীনকুমার এখন মহাভারত অনুবাদ-কার্যে খুবই ব্যস্ত বলে গঙ্গানারায়ণের ফিরে আসা নিয়ে খুব বেশী হই হই করলো না। এক একজন মানুষ থাকে, যাদের দেখলেই মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। গঙ্গানারায়ণকে দেখা মাত্র নবীনকুমার অনুভব করেছিল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাটির পরতি তার অন্তরের টান আছে। এর সঙ্গে তার শৈশব স্মৃতিগুলি মধুর। দু-তিনদিন অনবরত গল্প শোনার পর নবীনকুমার বলেছিল, দাদামণি, তুমি এসে পড়ে আমায় বড় বাঁচা বাঁচিয়েচো! জমিদারি দেকাশুনোর ভার এবার থেকে তুমি আবার নেবে, ওসব আমার পোষায় না। বাপ্‌রে!

গঙগানারায়ণ হেসে উত্তর দিয়েছিল, অমিও আর ওসব পার্বো না রে, ছোট্‌কু! এতকাল পথে পথে ঘুরে ঘুরে আমি জমিদারি চালচলন সব ভুলে গেচি। আমায় আর কেউ মানবে না।

নবীনকুমার বলেছিল, ওসব কতা শুনচিনি! তুমি গায়ে ফুঁ দিয়ে থাকবে ভেবোচো! তোমার কাঁধে সব জোয়াল চাপিয়ে আমি এবারে নিশ্চিন্দি। দুদিন থাকো না তারপর নিজেই দেকবে, আমার এখন কত কাজ! বিদ্যেসাগর মশাইয়ের পায়ে হাত দিয়ে শপথ করিচি, মহাভারত অনুবাদের কাজ আমার সম্পন্ন কর্তেই হবে!

বিধুশেখর এ বাড়িতে আসে না দেখে খট্‌কা লেগেছে গঙ্গানারায়ণের। এ বিষয়ে ছোট্‌কুকে কিছু প্রশ্ন করলে সে এড়িয়ে যায়। বিধুশেখরের প্রসঙ্গই যেন তার কাছে অস্বস্তিকর। তবু গঙ্গানারায়ণের মনে হলো, সৌজন্য এবং ঔচিত্যবোধে তারই একবার যাওয়া দরকার বিধুশেখরের কাছে।

আগে ছিল ইঁটের দেওয়াল। এখন লোহার রেইলিং দিয়ে ঘেরা হয়েছে সামনের বাগানটি। যে পামগাছগুলিকে গঙ্গানারায়ণ ছোট দেখেছিল, এখন সেগুলি পূর্ণ বয়স্ক। তাদের পত্ররাজিতে বাতাসের হিল্লোলে এ গৃহটিকে দূর থেকে আরও সুশ্রী দেখায়। গেটের এক পাশে দ্বারবানদের বসার জন্য একটা গুমটি ঘর, এটাও ছিল না আগে। দ্বারবান গঙ্গানারায়ণকে চেনে না, অবশ্য তাকে বাধাও দিল না। ভেতরে এসে গঙ্গানারায়ণ দেখলো, দক্ষিণ দিকের উদ্যানে একটি বালক আঁকশি দিয়ে একটা পেয়ারা গাছ থেকে পেয়ারা পাড়ার চেষ্টা করছে। ঐ বালকটিকে চেনে না গঙ্গানারায়ণ। সুহাসিনীর পুত্রকে সে চিনবেই বা কী করে! গঙ্গানারায়ণ নিজেও বাল্যকালে ঐ গাছে চড়ে অনেক পেয়ারা পেড়েছে। ঐ গাছের পেয়ারা পাকলে ভেতরটা লাল টুকটুকে হয়।

গঙ্গানারায়ণের বক্ষ কম্পিত হলো না। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসও বেরুলো না। গঙ্গানারায়ণ নিজেই যেন একটু অবাক হলো। মানুষ অনেক সময় নিজের থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে যাচাই করে। অপর কোনো দর্শকের মতন লক্ষ্য করে নিজের গতিবিধি। গঙ্গানারায়ণ ধরেই নিয়েছিল, এ গৃহে পা দেওয়া মাত্রই বিন্দুবাসিনীর স্মৃতিতে মন উচাটন হবে তার। সে দুর্বল হয়ে পড়বে। কই, সে রকম কিছুই হলো না তো, বিন্দুবাসিনীর স্মৃতি যেন এরই মধ্যে তার হৃদয়ে হালকা ফিকে হয়ে এসেছে। যে-সব দিনগুলি যন্ত্রণার, কাতরতার, আশাভঙ্গের, তা মুছে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, শুধু সুখকর দিনগুলিই এখন ধরে রাখতে চায় স্মৃতি। সময় এমনই ধন্বন্তরী!

সিঁড়ি দিয়ে গঙ্গানারায়ণ উঠে এলো বৈঠকখানায়। সে কক্ষ শূন্য। পাশে আর একটি বৈঠকখানা আছে, সেখানে বিধুশেখর শুধু তাঁর মক্কেলদের সঙ্গে দেখা করতেন। সেখানেও উঁকি দিয়ে দেখলো গঙ্গানারায়ণ। সারা বাড়িতেই কেমন যেন খাঁ খাঁ ভাব। এক সময় প্রতিদিন সকালে এখানে প্রচুর লোকসমাগম হতো। বেশ কয়েক বৎসর হলো, বিধুশেখর ওকালতি সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছেন।

একজন নতুন ভৃত্য গঙ্গানারায়ণের দিকে উৎসুক ভাবে চেয়ে আছে। একবার সে কিছু জিজ্ঞেসও করলো, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ তাকে কোনো উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেল ভেতরের দালানের দিকে। সেখানে বসে থাকা এক বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বললো, কেমন আচো, নরহরি?

এই নরহরি এ-বাড়িতে কাজ করছে বহুকাল ধরে। তার বয়েসের যেন গাছপাথর নেই। গঙ্গানারায়ণ এর কোলে-পিঠে চড়েছে শৈশবে। গঙ্গানারায়ণকে নরহরি ভারি ভালোবাসতো। স্নেহ

জিনিসটা যত পুরোনো হয়, ততই পাক ধরে। অতকাল পরে ছানি পড়া চোখে নরহরি গঙ্গানারায়ণকে দেখামাত্র চিনতে পারলো। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সে একেবারে হেসে কেঁদে অস্থির। একবার সে গঙ্গানারায়ণের গায়ে হাত বুলোয়, আবার সে গঙ্গানারায়ণের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্যাকুলভাবে বলতে থাকে, কোতায় গিসলে, দাদু আমার ? কেঁদিচি তোমার জন্যে, ও-বাড়ির মা-ঠাকরুণকে গিয়ে জিগিয়িচি··· ।

অন্যান্য দাস-দাসীরাও ভিড় করে দেখতে এলো গঙ্গানারায়ণকে। অন্দর মহলের কেউ এখনো খবর পায়নি, বিধুশেখরও নিচে নামেনি আজ। আগে বিধুশেখরের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করা উচিত, কিন্তু এ-বাড়িতে লোকমুখে সংবাদ পাঠিয়ে তারপর দেখা করার মতন সম্পর্ক নয় গঙ্গানারায়ণের। সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। সে আগেই জেনেছে যে এ-বাড়ির জ্যাঠাইমা মারা গেছেন, তাঁর দুই মেয়ে রয়েছে এখানে।

একজন দাসী গঙ্গানারায়ণের আগে আগে ওপরে উঠে এসেছিল, সে তড়িঘড়ি ডেকে আনলো সুহাসিনীকে। ধীর পায়ে হেঁটে সুহাসিনী এসে তার কাছে দাঁড়ালো। গঙ্গানারায়ণ চিনতে পারলো না তাকে। মুখের অবগুণ্ঠন সরিয়ে সুহাসিনী বললো, গঙ্গাদাদা, তুমি ফিরোচো, শুনিচি······এতদিন পরে এলে ?

—কে ?

—চিনতে পাল্লে না ? সুহাসিনীকে মনে নেই তোমার ?

গঙ্গানারায়ণ প্রায় স্তম্ভিত। এই সুহাসিনী ? কত ছোট দেখেচে ওকে, গঙ্গানারায়ণের বিবাহের পরে পরেই বিবাহ হয়েছিল ওর। সে আজ বিধবা, শরীর অত্যন্ত শীর্ণ। মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে। মনে হয় কত না যেন বয়েস! অথচ সে তো বিন্দুবাসিনীর চেয়েও ছোট। বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে চেহারারও কোনো মিল নেই সুহাসিনীর। গঙ্গানারায়ণের চকিতে মনে পড়লো কাশীতে গঙ্গার ওপরে রামনগরে পাল্কীর মধ্যে বিন্দুবাসিনীকে দেখার কথা। ঠিক যেন রাজরাজেন্দ্রাণীর মতন রূপ। না, ঠিক হলো না। কোনো রাজেন্দ্রাণীর পাথরে গড়া মূর্তি।

—তুই ? সেই সুসি ?

—আমি কিন্তু তোমায় দেকা মাত্তর চিনিচি। তুমি সেই একই রকম রয়োচো!

—তাই ? সবাই যে বলে আমি অনেক বদলে গেচি ? খুব একটা উচ্ছ্বাস বা আবেগ নেই সুহাসিনীর ব্যবহারে। এককালে কী ছটফটেই না ছিল এই মেয়ে! গঙ্গানারায়ণের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সুহাসিনীর দুই চক্ষু দিয়ে নেমে এলো অশ্রুবিন্দু।

—ও কি, সুসি, তুই কাঁদচিস কেন ?

—এতকাল পরে তোমায় দেকেও কাঁদবো না, আমি কি এমনই পাষাণ। গঙ্গাদাদা, পৃথিবীটা কেমন হয়ে গেল বলো তো ?

—লক্ষ্মী দিদি আমার, কাঁদে না। চোখ মুছে ফ্যাল! আয়, তোকে অনেক মজার মজার গল্প শোনাবো—

—চলো, ঘরে গিয়ে বসবে চলো। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কতা আছে। ছোট্‌কু তো মস্ত লোক হয়েচে, এ বাড়িতে আসেই না! দিদি গঙ্গাচ্চান কত্তে গ্যাচে, এক্ষুণি এসে পড়বে!

—আগে জ্যাঠাবাবুকে প্রণাম করে আসি।

—বাবা বোধহয় ঘুমুচ্চেন।

—এখন, এই সকাল দশটার সময় ঘুমুচ্চেন ?

—বাবা তো এদানিং সব সময় প্রায় ঘুমোন। দাঁড়াও, দেখি জেগেচেন কি না।

বিধুশেখরের ঘরের পাশ দিয়েই ছাদে ওঠার সিঁড়ি। গঙ্গানারায়ণ একবার সেদিকে তাকালো। ছাদে শুধু ঠাকুর ঘর।

বিধুশেখরের ঘরের দরজা খোলা। পালঙ্কের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন তিনি, চক্ষু মুদিত, হাত দুটি বক্ষের ওপর আড়াআড়ি করে রাখা। সুহাসিনী বাবা বলে ডাকাতেও বিধুশেখর সাড়া দিলেন না।

একটু আগে সুহাসিনীর সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের কথোপকথন কিছু কিছু কানে গেছে তাঁর, তিনি গঙ্গানারায়ণের উপস্থিতি টের পেয়েছেন। তবু তিনি সময় নিচ্ছেন ওর মুখোমুখি হবার জন্য।

সুহাসিনী বললো, গঙ্গাদাদা, তুমি শিয়রের কাচে গিয়ে ডাঁরাও, ডাকো, তা'হলেই জেগে উঠবেন'খন।

গঙ্গানারায়ণ বললেন, এখন থাক বরং, পরে আসবো।
—না, তুমি ডাকো না, সারাদিনই তো অমনি ! শিয়রের কাছে নয়, বিধুশেখরের পায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো গঙ্গানারায়ণ। মৃদুকণ্ঠে ডাকলো, জ্যাঠাবাবু, জ্যাঠাবাবু।
ধীরে চক্ষু মেলে বিধুশেখর বললেন, কে ?
—জ্যাঠাবাবু, আমি গঙ্গা।
বিধুশেখর এক চক্ষু দিয়ে চেয়ে রইলেন নির্নিমেষে। যেন তিনি ঠিক ঠাহর করতে পারছেন না।
শায়িত ব্যক্তির পদধূলি গ্রহণ করতে নেই তাই গঙ্গানারায়ণ বিধুশেখরের পা স্পর্শ করলো না, বিনীত মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলো।
—হাতখানা একটু ধর্ তো, সুসি।
সুহাসিনী এসে সাহায্য করতে বিধুশেখর উঠে বসলেন আস্তে আস্তে। নষ্ট চক্ষুটির ঠুলিটা কপালের ওপর তোলা ছিল, সেটাকে ফিরিয়ে আনলেন যথাস্থানে। পালঙ্কের বাইরে পা ঝোলাতে হবে, অসাড় বাঁ পা-টি নিয়ে এলেন অতি কষ্টে। তারপর বললেন, গঙ্গা ? তুমি সত্যিই ফিরোচো তাহলে।
গঙ্গানারায়ণ এবার বিধুশেখরের পদধূলি গ্রহণ করলো। অভ্যেসবশে বিধুশেখর একটি হাত তুললেন তার মাথার কাছে, মুখে কিছু বললেন না।
—আপনার শরীর গতিক ভালো আচে তো, জ্যাঠাবাবু ?
—হ্যাঁ, বেশ ভালোই আচি। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো। সুসি, কারুকে বল্ মিষ্টি এনে দিতে। তোরঙ্গ খুলে একটা রূপোর রেকাবি বার করে দিগে যা। হ্যাঁ, তারপর বলো, গঙ্গা, এতদিন তুমি গেস্‌লে কোতায় ?
বসলো না গঙ্গানারায়ণ, দাঁড়িয়ে থেকেই বললো, বোধকরি আমার মস্তিষ্কে কিছু গোলমাল হয়েছেল, তাই বিনা কারণে দেশে দেশে ঘুরিচি।
—হুঁ। ইব্রাহিমপুর থেকে উধাও হয়েছেলে, আবার সেখানেই ফিরে এয়োচো, এমন শুনতে পাই।
—আজ্ঞে হ্যাঁ।
—তোমার পত্নী ইতিমধ্যে গত হয়েচেন শুনিচি, তুমি কি অন্যত্র বিবাহ করোচো ?
—আজ্ঞে না।
—তোমাদের জননী তো হঠাৎ হরিদ্বারে চলে গ্যালেন। আর ফিরবেন না বলেচেন। দ্যাকো দিকি কাণ্ড। ও বাড়ি একেবারে ফাঁকা। তুমি এখুন কলকেতাতেই থাকবে ?
—আজ্ঞে, সে রকম কিছুই ভাবিনি। ছোট্‌কু আমায় জেলখানা থেকে এনেচে, এখনো মোকদ্দমা ঝুলচে—
—দেশের রাজার সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা করে কেউ জেতে ? যতসব আজগুবি কাণ্ড। দু'পাঁচ বচর যদি জেল খাটতে হয়, সে তোমায় রাজ-সরকার আগেও খাটাতো, পরেও খাটাবে, মধ্যেখান থেকে টাকাকড়ির ছেরাদ্দি হবে।
—ছোট্‌কু এসব ব্যাপারে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করেনি ? আমি তো অত শত জানি না, কেষ্টনগরে সে দু'জন উকিল নিয়ে পৌঁচোলো, তারাই সব ব্যবস্থা কর্লে।
—ছোট্‌কুর মাতাটা বিগড়েচে ছোটবেলা থেকেই। আমার সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার বোধ করে না সে। টাকাকড়ি একেবারে নয় ছয় কচ্চে। শোনো, আমি বলি কি, তুমি এখেনে থাকচো যখন···দিবাকরটা বুড়ো হয়েচে, ওর দ্বারা আর কাজ কম্মো হয় না, চুরি করেও তো ফাঁক কল্লে, তুমি ওর কাজটা নাও, হিসেব পত্তরগুলো যদি ঠিকঠাক রাকা যায়, তুমি লেকাপড়া শিকেচো—
কাটা কাটা শুষ্ক ধরনের কথা। শেষের বাক্যটিতে বিধুশেখর পরিষ্কার ইঙ্গিত করলেন যে, গঙ্গানারায়ণকে ও বাড়িতে দিবাকরের মতন কর্মচারী হয়ে থাকতে হবে। গঙ্গানারায়ণের মামলার জন্য অর্থ ব্যয় হবে, সেটাও বিধুশেখরের একেবারেই মনঃপূত নয়। এতকাল বাদে দেখা হবার পর এই আপ্যায়ন !
গঙ্গানারায়ণ নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো বিধুশেখরের দিকে। অপমান বোধ অল্প অল্প জ্বালা ধরাতে শুরু করেছে তার শরীরে। এই মানুষটির সঙ্গে সে একবার সম্মুখ যুদ্ধে নামবে বলে মনস্থ করেছিল। এতকাল পরেও যে বিধুশেখর ঠিক সেই আগেকার মতনই ব্যবহার করবেন, সে ভাবতে পারেনি। আবার শুরু হবে দ্বৈরথ ?
কিন্তু বিধুশেখরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার বক্ষে ক্রোধের বদলে জেগে উঠলো

অনুকম্পা। লড়াই হবে কি, বিধুশেখর তো আগে থেকেই হেরে বসে আছেন। এই সেই বিধুশেখর, সেই কঠোর তেজী, আদর্শনিষ্ঠ পুরুষ ? একচক্ষু নেই, বাঁ হাতটা অক্ষমভাবে ঝুলে আছে, বাঁ পায়ে জোর নেই, সারা শরীরটাই যেন মর্চে ধরা, এ তো এক ভগ্নস্তূপ ! আর কিছুই অবশিষ্ট নেই বলেই প্রাণপণে প্রতাপ দেখাবার চেষ্টা। কী করুণ, কী হাস্যকর। এঁকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেই বা ইনি কী করবেন ? কিন্তু গঙ্গানারায়ণের দয়া হলো, জীবিত অবস্থায় বিধুশেখরের ঐ প্রতাপটুকুও কেড়ে নেওয়া সঙ্গত হবে না।

সে হাঁটু গেড়ে বসে বিধুশেখরের পা জড়িয়ে ধরে বললো, জ্যাঠাবাবু, আমি আপনার কাচে অনেক অন্যায় করিচি, আপনার মনে দুঃখ দিয়িচি, জানি, আমার ওপর এখনো আপনার রাগ আচে, আপনি আমায় ক্ষমা করুন, যা হবার তা তো হয়েই গ্যাচে, আপনি আমার গুরুজন, আপনি ক্ষমা না কর্লে...এবার থেকে আপনার সব কতা শুনে চলবো—

বেদব্যাসের উপমা ধার করে বলা যায়, একটু ক্ষণের জন্য বিধুশেখরের হৃদয় গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নের দীঘির মতন হয়ে উঠলো। উপরিভাগের জল খুব উষ্ণ, আবার তলদেশের জল তেমনই ঠাণ্ডা। হৃদয়ের সেই তলদেশের অংশে তিনি চাইলেন ছেলেটিকে ক্ষমা করতে, ক্ষমার মতন একটা শান্ত স্নিগ্ধ ব্যাপার উপভোগ করার বাসনা হলো তাঁর। জীবনে সায়াহ্নে এসে তো সকলকেই ক্ষমা করে যেতে হয়। কিন্তু এ মনোভাব একটুক্ষণের জন্য মাত্র। গঙ্গানারায়ণকে কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না তিনি। এ তাঁর জীবনের রাহু, এ কেন ফিরে এসেছে ? এই যে ক্ষমা চাইছে, এটাও ওর প্রতারণা ?

গঙ্গনারায়ণ তখনও বিধুশেখরের পা ধরে আছে, কিন্তু একটা আশ্বাস বা স্বস্তিবচন উচ্চারণ করতে পারলেন না বিধুশেখর। আশীর্বাদের জন্য তাঁর হাত উঠলো না। তিনি শুধু বললেন, যাক, যাক, হয়েচে, হয়েচে, এবার ওঠো।
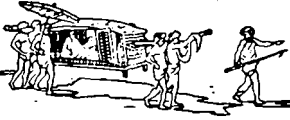
—তোমার কুসুমদিদির আমি আবার বিয়ে দোবো !

শুনে আঁতকে উঠলো সরোজিনী। তার পতি দেবতাটি যে একটু ক্ষ্যাপাটে ধরনের তা সে অনেক দিন আগেই জেনে গেছে। নিত্য নতুন বাতিক তার মস্তকে ভর করে। কিন্তু এ আবার কী উদ্ভট কথা !

দুই চক্ষু প্রায় কপালে তুলে সরোজিনী বললো, আপনি কুসোমদিদির বে দেবেন ? আপনি খোয়াব দেকচেন বুজি ? ওর বে হয়ে গ্যাচে সেই কবে, তারপর বেধবা হলো, আপনি দেকলেন না সিদিনকে, মাতায় সিঁদুর নেই, হাতে নোয়া নেই, কপাল পুড়িয়ে বাপের বাড়ি এয়েচে—

—বিধবা বলেই তো ওর বিয়ে দোবো আবার !

—বিধবার বে, সে তো ছোট-লোক, অজাত-কুজাতের মধ্যে হয় ! চার ঘরের কায়েত বাড়ির মেয়ে সম্পর্কে ও কি অলুক্ষণে কতা ! আপনার কি পরকালেরও ভয় নেই ?

—ঠিক এই কতাটাই বিদ্যেসাগর মশাই বলচিলেন ! আমরা এ শহরে যে কটা বনেদী ঘর রয়িচি, আমরা মুখে মুখে বিদ্যেসাগর মশাইয়ের বিধবা-বিবাহ কর্মে সায় দিয়িচি, কেউ কেউ অর্থ সাহায্যও করিচি, কিন্তু নিজেদের বাড়িতে কেউ বিধবা-বিয়ে চালু করিনি ! উনি যেদিনকে কতাটা বললেন, লজ্জায় আমার মাথা নিচু হয়ে গেল। উনি তো হক্ কতাই বললেন। আমাদিগের যত প্রগতি সব শুধু জিবের ডগায়, কাজে নয় ! কিন্তু কী করবো বলো, আমার বাড়িতে তো বিধবা কেউ নেই যে তার বিয়ে দোবো ! তুমি যদি বিধবা হতে, কত ঘটাপেটা করে তোমার বিয়ে দিতুম আবার !

সরোজিনী স্বামীর পায়ের কাছে বসে পড়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো, আমার মাতার দিব্যি, আপনি এসব কতা বলবেন না, এই দেকুন, আমার বুকের মধ্যে কেমুন তোপ দাগার মতন গুড়ুম গুড়ুম শব্দ হচ্চে ?

নবীনকুমার হাসতে হাসতে বললো, তুমি বিধবা হলে আমি মরে যেতুম, এই তো ! তা এতবড় মহৎ

উদ্দেশ্যের জন্য আমি মত্তেও রাজি আচি। দেশের কাজে মরণেও সুখ!

এর পর সরোজিনী, ওগো আমার কী হবে গো, বলে ডুকরে উঠলো। নবীনকুমার তার হাত ধরে টেনে তুলে বললো, অবোধ বালিকা আর কাকে বলে! আরে আমি কি সত্যিই মত্তে যাচ্চি নাকি? এ হলো গে কতার কতা! সেই জন্যই তো বলচি তোমার কুসুমদিদির বিয়ে দোবো! সরোজ, শুধু অন্ধকারেই রয়ে গ্যালে, এত বই কাগচ-পত্তর এনে দি, কিচুই পড়ো না! পড়লে জানতে আজকাল ভদ্রঘরেও বিধবার বিয়ে হয়! চার ঘরের কায়েত কী বলচো, শ্রোত্রিয় কুলিন ব্রাহ্মণরাও বিধবা মেয়ে বিয়ে কচ্চেন! তোমার কুসুমদিদি পাত্রী হিসেবে খুবই ভালো!

অশ্রু মার্জনা করে সরোজিনী বললো, আপনি কুসোমদিদির বে দেবেন, এ কেমনতরো কতা! কুসোমদিদি কি আপনার বাড়ির মেয়ে? তার বাপ-দাদারা রয়েচেন না, ওঁয়ারা এই কতা শুনলে লাঠি নিয়ে আপনাকে তাড়া করবে।

—কেন? ওঁরা কি নির্বোধ? বাড়িতে এমন খাসা একটি বিধবা পাত্রী থাকতেও ওঁরা বিদ্যেসাগর মশাইকে খুশী কত্তে চাইবেন না?

—বিদ্যেসাগর না কে খুশী হবে বলে ওঁয়ারা এমন পাপ কাজ কত্তে যাবেন? ঝাঁটা মারি এমন খুশী হওয়ার মুকে!

—এই হলো মেয়েমানুষের বুদ্ধি! নিজের ভালো নিজেরা বোঝে না! তোমার কুসুমদিদি সারাজীবন বিধবা হয়ে কষ্ট পাবে, তাতে তুমি খুশী?

—বিধবা হয়েচে···যার যেমুন ভাগ্য, ভাগ্যে থাকলে হবে না?

—আমি ভাগ্য পাল্টে দেবো! কালই কতা বলবো কুসুমের বাবার সঙ্গে। ওর বিয়েতে আমি দশ-বিশ হাজার টাকা খরচা কত্তেও রাজি আচি!

পর দিনই কথা বলা হলো না অবশ্য, কিন্তু বিষয়টা নবীনকুমারের মনে রয়ে গেল। সে এখন বিষম ব্যস্ত। মহাভারত অনুবাদের কাজ নিপুণভাবে চলছে প্রায় অষ্টপ্রহর ধরে। এতদিন কেউ সঠিক বিশ্বাসই করতে পারেনি যে নবীনকুমারের মতন এক বিংশতিবর্ষীয় অস্থির স্বভাবের যুবক সমগ্র মহাভারতের অনুবাদের মতন বিশাল কাজ হাতে নিয়ে সত্যিই তাতে মন দিয়ে লেগে থাকবে। কিন্তু এখন আর অবিশ্বাসের উপায় নেই। কাজ অগ্রসর হচ্ছে অতি দ্রুত বেগে, ইতিমধ্যে প্রথম পর্ব সম্পূর্ণ হয়ে মুদ্রিত হয়েও বেরিয়েছে। দ্বিতীয় পর্বও যন্ত্রস্থ!

অনুবাদের প্রথম পর্ব পাঠ করেও সকলে বিস্মিত। আট দশ জন সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিতদের দিয়ে নবীনকুমার অনুবাদের কাজ করাচ্ছে, এ খবর সকলেই জানে, কিন্তু এমন গাম্ভীর্যপূর্ণ অথচ সুললিত, সরস বাংলা লেখা তো কোনো পণ্ডিতের কর্ম নয়! এতে বিশেষ একজন কারুর হাত আছে, এবং সেই একজন নবীনকুমার স্বয়ং। সে-ই রচনার ভাষা আদ্যোপান্ত পরিমার্জনা করে।

নিজের বাড়িতে স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না বলে শুধু এ কাজের জন্যই নবীনকুমার বরাহনগরে একটি প্রশস্ত উদ্যান বাটী ক্রয় করেছে, এবং তার নাম দিয়েছে 'সারস্বতাশ্রম'। পণ্ডিতরা সবাই সেখানেই স্থায়ী হয়েছেন। আর একটি বাড়ি কিনে সেখানে স্থাপিত হয়েছে মুদ্রাযন্ত্র। প্রতিদিন জোড়াসাঁকো থেকে জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে নবীনকুমার যায় বরাহনগরে। পথে বাগবাজারে তার শ্বশুরালয় পড়ে। এক একদিন বরাহনগরে অধিক রাত্রি পর্যন্ত কাজ চললে সেদিনটা আর নবীনকুমার নিজের বাড়িতে ফেরে না, শ্বশুর বাড়িতেই রাত্রি যাপন করে। সরোজিনী সেখানেই আছে।

কাজের নেশায় যেন পেয়ে বসেছে নবীনকুমারকে। এতবড় একটা কাজ তো রয়েছেই, তার ওপরেও সে নিয়েছে "বিবিধার্থ সংগ্রহ"-এর মতন উচ্চমানের পত্রিকার সম্পাদনা ভার। রাজেন্দ্রলাল মিত্র পদত্যাগ করায় বঙ্গভাষানুবাদক সমিতির এই পত্রিকাটির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠেছিল, তখন নবীনকুমার নিজের স্কন্ধে এই দায়িত্ব নেয়। মান্যবর এবং পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরিবর্তে কুড়ি বৎসর বয়েসের এক যুবক "বিবিধার্থ সংগ্রহ"-এর মতন পত্রিকার সম্পাদক! অবশ্য অনুবাদক এবং লেখক হিসেবে নবীনকুমার তার যোগ্যতা ইতিমধ্যেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে।

তবু এতেও ক্ষান্ত নয় সে। প্রতিদিন সংস্কৃত-অনুবাদ ও গুরু গম্ভীর শব্দাবলী শুনতে শুনতে এক এক সময় তার কান ঝালাপালা হয়ে যায়। তার চরিত্রে একটা লঘু আমোদ-প্রিয় দিক আছে। এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ সে উচ্চাঙ্গের চিন্তাভাবনা চালিয়ে যেতে পারে না। মাঝে মাঝে তার চিত্ত বিনোদন দরকার। মুলুকচাঁদের আখড়ায় সে আর যায় না। হরিশ মুখুজ্যের সঙ্গে দেখা হয় না, বন্ধুবান্ধব সংস্পর্শে কালযাপন করার মতনও তার অবসর নেই। সেই জন্যেই সে বরাহনগরে মহাভারত চর্চার

মাঝে মাঝে হঠাৎ উঠে চলে যায়, সেখানে নিজস্ব একটি কক্ষ আছে, তাতে প্রবেশ করে দ্বার রুদ্ধ করে দেয়। সেই কক্ষের একটি দেয়াল জুড়ে রয়েছে একটি বেলজিয়ান আয়না। নবীনকুমার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করে। লাফায়, ডিগবাজি খায়। এই তার বিনোদন! একা একা সেই কক্ষের মধ্যে সে কখনো শ্রীকৃষ্ণ সাজে, কখনো শ্রী রাধিকা, কখনো সে ভীম, আবার সে নিজেই বক রাক্ষস। আয়নার সামনে যাকে দেখা যায়, তাকে সে জিহ্বা প্রদর্শন করে, নানা রকম ভেংচি কাটে! একটু পরে সে যখন আবার বেশ-বাস ঠিকঠাক করে কাঁধে চাদরটা দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে গম্ভীর ভাবে, তখন তাকে দেখে কে বুঝবে যে এই মানুষটিই একটু আগে কতরকম ছেলেমি করছিল!

সংস্কৃত ঘেঁষা, সন্ধি সমাস সমন্বিত গুরুগম্ভীর বাক্যগুলি মাথা থেকে তাড়াবার জন্য সে আরও একটা উপায় অবলম্বন করেছে। নিজের গোপন কক্ষটিতে সে একটি ছোট খাতায় যা খুশী লিখে যায়। কিছুদিন আগেই চড়ক গেছে, সেই উৎসবে কলকাতা শহর কেমন মেতে উঠেছিল তার একটা বিবরণ লেখে সে, কিন্তু লেখবার সময় সতর্ক থাকে, পারতপক্ষে সে সংস্কৃত কথা ব্যবহার করবে না।

আপন খেয়ালে এই ভাবে সে লিখে যায়, "এদিকে দুলে বেয়ারা, হাড়ি ও কাওরারা নূপুর পায়ে উত্তরি সুতো গলায় দিয়ে নিজ নিজ বীরব্রতের মহত্ত্বব স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও দশ লাঠি হাতে করে প্রত্যেকে মদের দোকানে, বেশ্যালয়ে ও লোকের উঠোনে ঢাকের সঙ্গতে নেচে ব্যাড়াচ্চে! চাষীরা ঢাকের টোয়েতে চামর, পাখির পালক, ঘণ্টা ও ঘুঙুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্চে; গুরু মহাশয়ের পাঠশালা বন্দ হয়ে গিয়েছে—ছেলেরা···ঢাকের পেচোনে পেচোনে রপ্তে রপ্তে ব্যাড়াচ্চে···"

ঠিক যেমন তার মুখের ভাষা সেই রকম লেখা। একই সঙ্গে মহাভারতের বিশুদ্ধ ভাষা এবং এই রকম পথ চলতি গদ্য লিখে চলেছে একই লোক। এই নতুন ধরনের লেখা লিখতে লিখতে বেশ মজা পেয়ে গেল নবীনকুমার। চড়ক পার্বণের পর লিখলো বারোইয়ারি পূজা বিষয়ে। ক্রমে ছোট খাতাটি ভর্তি হয়ে যাওয়ায় নবীনকুমারের মনে হলো, এই লেখাগুলি ছাপিয়ে প্রকাশ করলে কেমন হয়? তারই নিজস্ব ছাপাখানা হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকারের নাম কী থাকবে। তার নিজের নাম দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মহাভারতের অনুবাদক হিসেবে যে পরিচিত, তার কলম দিয়ে এই লেখা বেরিয়েছে, কেউ বিশ্বাস করবে? এ লেখা পড়লে যদি সবাই ছি ছি করে? ন', নাম দেওয়া চলতেই পারে না। মুলুকচাঁদের নামটা দিয়ে দিলে হয় না? মুলুকচাঁদ কাকপক্ষীর মতন ঘুরে ঘুরে শহর কলকাতার সব সংবাদ সংগ্রহ করে। কাকপক্ষী না প্যাঁচা? হুতোম প্যাঁচার নকশা নাম দিলে কেমন হয়?

মাঝে মাঝেই মনে পড়ে কুসুমকুমারীর কথা। ঐ নীল নয়না বালিকাটির গাঢ় চোখের দৃষ্টি যেন নবীনকুমারের মনে গেঁথে গেছে। ওর কথা মনে এলেই নবীনকুমার মাথা ঝাঁকায়, যেন সে-ই কুসুমকুমারীর অভিভাবক, **কুসুমকুমারীর** জীবনের সুব্যবস্থা করে দেবার দায়িত্ব তারই। একটা কিছু করতেই হবে খুব শীঘ্র, কুসুমকুমারীর পিতার সঙ্গে কথা বলা হয়েই উঠছে না। তিনি কলকাতায় নেই।

একদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে গেল নবীনকুমার। হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রবল দুর্ভিক্ষ চলছে, শত সহস্র মানুষ অনাহারের সম্মুখীন, তা নিয়ে কিছু আলোড়ন হচ্ছে সংবাদপত্রগুলিতে। সেই উপলক্ষে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ ভবনে একটি সভা ডেকেছেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের বিন্দুমাত্র বাসনা নেই নবীনকুমারের, কিন্তু ইদানীং সে প্রায়ই ওঁদের সভায় যায়। দেবেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা শুনতে তার ভালো লাগে, এমন সুমিষ্ট বাংলা সে অন্য কারুর মুখে শোনেনি। সভার বেদীস্থলে বসে দেবেন্দ্রবাবু এ দেশের সুদূরতম প্রান্তের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের চিত্র বর্ণনা করলেন মর্মস্পর্শী ভাষায়। দেবেন্দ্রবাবু নিজে ঐ সব দেশ ঘুরে এসেছেন, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। পাহাড়ী জাতির লোকেরা বড় সরল হয়, দেবেন্দ্রবাবুর ভাষায় তাদের দুর্দৈবের চিত্র যেন চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। দেবেন্দ্রবাবু যে-ই বললেন, যে দেশবাসীর বিপদে আমরা যদি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত না করি তবে কি আমাদের মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ হবে না, অমনি নবীনকুমার আর থাকতে পারলো না, উঠে এগিয়ে গেল দেবেন্দ্রবাবুর দিকে। তার গায়ে যে একটি শাল রয়েছে, যার মূল্য অন্তত দুই সহস্র মুদ্রা, সেটি খুলে দেবেন্দ্রবাবুর পদপ্রান্তে রেখে সে বিনীতভাবে বললো, এই আমার সামান্য দান। পরে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করবো!

তখনই সভাস্থলের অন্য সকলেই নিজেদের অঙ্গুরীয়, সোনার বোতাম ও গার্ড চেইন সম্বলিত ঘড়ি খুলে দিতে লাগলেন।

আশ্চর্যের বিষয়, এই সময়ও নবীনকুমারের মনে পড়ে গেল কুসুমকুমারীর কথা। কোথাও কোনো মানুষের দুঃখের কথা শুনলেই তার কুসুমকুমারীর কথা মনে আসে। না, ঐ অপাপবিদ্ধা বালিকাটিকে কিছুতেই সারাজীবন কষ্ট পেতে দেওয়া হবে না। শীঘ্রই কুসুমকুমারীর জন্য একটি পাত্র জোগাড় করতে হবে। নবীনকুমার তার পরিচিত অকৃতদার কিংবা মৃতদার ব্যক্তিদের কথা চিন্তা করতে লাগলো। যেন কুসুমকুমারীর পিতার অভিমত গ্রহণ করা এমন কিছু জরুরী নয়, একজন উপযুক্ত বিধবা-বিবাহেচ্ছু পাত্রের সন্ধান করাই এখন প্রধান কর্তব্য।

দেবেন্দ্রবাবুর পাশে তাঁর দুই পুত্র বসে আছে, একজনের নাম দ্বিজেন্দ্র। অন্য জন্য জ্যোতিরিন্দ্র। দেবেন্দ্রবাবুর সন্তান-ভাগ্য খুব ভালো, এর মধ্যেই তাঁর ত্রয়োদশটি পুত্র-কন্যা জন্মেছে। জ্যোতিরিন্দ্র বেশ ছোট, কিন্তু দ্বিজেন্দ্র বোধ হয় নবীনকুমারের সমবয়েসী হবে। নবীনকুমার একবার ভাবলো, দেবেন্দ্রবাবুর কাছে প্রস্তাব দিলে হয় না যে তাঁর এক পুত্র ঐ কুসুমকুমারীকে বিবাহ করুক। দেবেন্দ্রবাবু নব্য পন্থী, উদার মনস্ক ব্যক্তি, তিনি নিশ্চয়ই এতে আপত্তি জানাতে পারবেন না। অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী কুসুমকুমারী ঠাকুর বাড়ির বধূ হবার অনুপযুক্ত নয়। কিন্তু একটু পরেই তার খেয়াল হলো, এ রকম প্রস্তাব করা যায় না। দেবেন্দ্রবাবুরা ব্রাহ্মণ, কুসুমকুমারীরা কায়স্থ। পিরিলির বামুনই হোক আর যে-রকম ব্রাহ্মণই হোক, এঁরা এখনো বিবাহ-ব্যাপারে জাতি-ভেদ ঘোচাতে পারেননি।

কয়েক দিনের মধ্যেই অবশ্য নবীনকুমার অন্য এক ব্যাপারে মেতে উঠলো, আর মনে রইলো না কুসুমকুমারীর কথা।

এক প্রাতঃকালে বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে নবীনকুমারকে ধরলো গঙ্গানারায়ণ। সে বললো, ছোট্‌কু, ক'দিন থেকেই তোকে খুঁজচি, তোর আর দেখাই পাই না। মহাভারতের অনুবাদটি বড় সরেশ করিচিস রে! আমায় আরও খানকতক বই দিবি?

নবীনকুমার বললো, তোমার যত খুশী নাও না, দাদামণি! দুলালকে বলো, আনিয়ে দেবে। আমি তো মহাভারত বেচবো না, তিন হাজার কপি ছাপিয়েচি, সব বিলিয়ে দেবো, যে যা চাইবে, মহাভারত নিয়ে আমি ব্যবসা কত্তে নামিনি!

—এটা বড় মহৎ কাজ করলি রে ছোট্‌কু! আমার বন্ধুদের দেকালুম, তারা তো থ! এমন বিশুদ্ধ বাংলা এমন স্বচ্ছন্দ অনুবাদ, যেন মনে হয় নতুন রচনা।

—দাদামণি, তুমি তো হরিশ মুকুজ্যের ওখেনে গতায়াত করো, ওঁকে বই দিও এক কাপি।

—তুই আমায় যে বইখানা দিইচিলি স্যেটা আমার এক বন্ধু জোর করে নিয়ে নিলে! কিচুতেই ছাড়লে না। তার বদলে সে তার লেখা নতুন একটা বই তোকে পড়তে দিয়েচে, তুই পড়ে দেকবি?

—কে তোমার বন্ধু?

—মধু, আমার সহপাঠী ছেল, এখন তো বেশ ক'খানা বই লিখেচে, বেশ নামও হয়েচে, তুই নাম শুনিসনি? মাইকেল মধুসূদন দত্ত—

নবীনকুমার হাত বাড়িয়ে বইখানি নিয়ে জুড়ি গাড়িতে উঠে পড়লো। এখান থেকে বরাহনগর যেতে অনেক সময় লাগে, তার মধ্যে বইখানি পড়ে ফেলবে। মধুসূদন দত্তর নাম সে শুনেছে বটে, পাইকপাড়ার রাজাদের বাঁধা নাট্যকার। নবীনকুমার নিজে বাড়ির মঞ্চে থিয়েটারের প্রচলনের পর অনেকেই তার অনুকরণ করছে। পাইকপাড়ার রাজারা বহু অর্থব্যয়ের আড়ম্বর করে। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে এক ধনী তার চেয়ে একটু বেশী কোনো ধনীকে ঠিক পছন্দ করতে পারে না। সেই অনুযায়ী পাইকপাড়ার রাজাদের সম্পর্কে নবীনকুমারের মনে একটা বিরাগ ভাব আছে। স্বভাবতই তাদের বাঁধা নাট্যকার সম্পর্কেও সে প্রসন্ন নয়।

বইখানি অবশ্য নাটক নয়, কাব্য। 'মেঘনাদ বধ'। শুধু নামটি দেখেই নবীনকুমারের মনে একটা চিন্তা-তরঙ্গ খেলে গেল। মহাভারত নয়, রামায়ণের কাহিনী। রামায়ণেরও কোনো বিশুদ্ধ গদ্যে বঙ্গানুবাদ নেই। মহাভারত শেষ করেই রামায়ণ অনুবাদে হাত দিতে হবে তো!

তারপর প্রথম পাতা উল্টে সে পড়তে শুরু করলো: 'সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি/বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে/অকালে; কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী...।' নবীনকুমারের ভুরু উত্তোলিত হলো। এইভাবে আরম্ভ, এরকম মাঝখান থেকে? শুরু থেকেই এক বীর চূড়ামণির পতন? এ যে নাটকের মতন। এরকম কাব্য নবীনকুমার কখনো পড়েনি।

অন্যদিন হুতোমের নকশা লেখার মাল-মশলা সংগ্রহের জন্য সে পথের দু পাশ দেখতে দেখতে যায়। আজ আর অন্য কোনো দিকে তার আর খেয়ালই রইলো না। এ কী অবিশ্বাস্য রকমের কবিতা?

কবিতা সম্পর্কে নবীনকুমারের মনে এমনিতেই একটা বিস্ময়ের ভাব আছে। সে অনেক চেষ্টা করে দেখেছে, কিন্তু কবিতা তার হাতে ঠিক আসে না। গদ্য রচনা বিষয়ে তার আত্মবিশ্বাস জন্মে গেছে, কিন্তু কবিতা জিনিসটা কেমন যেন হয়েও হয়ে ওঠে না। এ রকম কবিতা নবীনকুমার কখনো পড়েনি। এমন ঝঙ্কারময় শব্দ, এমন উন্নতভাব, লাইনের শেষে মিল নেই অথচ প্রতিটি লাইনই দৃঢ় সংবদ্ধ।

…শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে, কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!

দুলাল চন্দ্র দাঁড়িয়ে থাকে জুড়ি গাড়ির পিছনে। চলন্ত গাড়ি থেকেই নেমে দৌড়ে দরজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী বলচেন, ছোটবাবু?

নবীনকুমার কখন আপনমনে উচ্চস্বরে পাঠ করতে শুরু করেছে। এমন কবিতা মনে মনে পড়া যায় না। হাতের ইশারায় দুলালকে যা, যা বলে সে পাঠে নিমগ্ন হয়ে রইলো। খানিক পরে আবার সে মুখ বাড়িয়ে কোচোয়ানের উদ্দেশে বললো, এই ঘোরা, ঘোরা, শিগগির গাড়ি ঘুরিয়ে নে! দুলাল আবার নেমে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েচে, ছোটবাবু?

নবীনকুমার এমন ঘোরের মধ্যে আছে যেন দুলালকে চিনতেই পারলো না প্রথমে। তীব্র দৃষ্টি মেলে বললো, কে? কে বিরক্ত করে এখন?

পরক্ষণেই আবার সে বললো, ও, দুলাল, আমি আজ কাজে যাবো না, আজ্ঞে বাড়ি ফিরবো, গাড়ি ঘোরাতে বল, তুই দৌড়ে বরানগরে চলে যা—পণ্ডিত মশাইদের খপর দিগে যা—।

সারাদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে নবীনকুমার মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করলো। এমন নেশা সে অনেকদিন পায়নি। তারপর চারদিন ধরে নবীনকুমারের মুখে শুধু ঐ কাব্যের কথা। যাকে পায় তাকে ডেকে ডেকে শোনায়। এই ফিরিঙ্গি কবি সম্পর্কেও তার মনে দারুণ কৌতূহল জেগেছে। ছোটভাই-এর এতখানি উৎসাহের আতিশয্য দেখে গঙ্গানারায়ণ বললো, তুই মধুর সঙ্গে পরিচয় কত্তে চাস? ডেকে আনবো'খন একদিন তাকে আমাদের বাড়িতে!

কিন্তু মধুসূদনকে এত সাধারণভাবে ডাকা হলো না এ-বাড়িতে। এর মধ্যে একদিন বিখ্যাত অধ্যাপক রিচার্ডসনের বিদায় অভ্যর্থনা হয়ে গেল। আগেকার হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডি এ রিচার্ডসন বৃদ্ধ হয়েছেন, চিরকালের মতন তিনি ভারত ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ইংলণ্ডে। মধুসূদন, গৌর, গঙ্গানারায়ণ, ভূদেব প্রমুখ ছিল রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র, তারা ওঁকে টাউন হলে সম্বর্ধনা জানালো এবং তারাই চাঁদা করে রিচার্ডসনের ফেরার জাহাজ ভাড়া তুলে দিল। সেই সভাতে উপস্থিত রইলো নবীনকুমার। সভা শেষে বাইরে বেরিয়ে এসেই সে বললো, আমরা প্রধান প্রধান সাহেবদের বিদায়ের প্রাক্কালে রিসেপশান দি. আমরা অদ্যাবধি আমাদের দেশীয় কোনো ব্যক্তিকে তা দিয়িচি?

যদুপতি গাঙ্গুলি বললো, এটা তুমি ঠিকই বলেচো, নবীন। আমাদের দেশে সত্যিকারের বড় মানুষদের পেচোনেও আমরা ঘোঁট পাকাই, গুণের সমাদর করি না। নইলে বলো, বিদ্যাসাগর মশাইকে পাবলিক রিসেপশান দেওয়া উচিত ছিল না কি? তুমি একটা ব্যবস্থা করো না!

নবীনকুমার একটুক্ষণ ভেবে বললো, উনি কি এ সব তোয়াক্কা করেন? কে বলতে যাবে ওঁকে। যদি উনি ধমকে ওঠেন? আমি বলি কী, যে নতুন জ্যোতিষ্কের উদয় হয়েচে আমাদের সাহিত্যাকাশে, তাঁকেই প্রথমে সম্বর্ধনা জানানো যাক। আগেকার দিনে রাজা-বাদশারা কবিদের শিরোপা দিতেন। এখন রাজা থাকেন বিভূঁয়ে। আমাদেরই সে দায়িত্ব লওয়া কর্তব্য।

নবীনকুমার পায়ের তলায় জল গড়াতে দেয় না। পরের সপ্তাহেই ব্যবস্থা হলো সম্বর্ধনার। এই সম্বর্ধনা দেওয়া হবে সিংহবাড়ির বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে। কার্ড ছাপিয়ে বিতরণ করা হলো শহরের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে। ব্যাপারটি সত্যিই অভিনব, কলকাতা শহরের পত্তনের পর এ পর্যন্ত কোনো কবিকে এমনভাবে প্রকাশ্য অভিনন্দন জানানো হয়নি। শুধু মানপত্র নয়, কবিকে একটি উপহারও দেওয়া হবে। উপহারের দ্রব্যটি নবীনকুমারই ঠিক করলো। সুরা-প্রেমিক কবিকে দেওয়া হবে একটি রৌপ্যনির্মিত পানপাত্র।

গঙ্গানারায়ণ গিয়ে সম্মতি নিয়ে এসেছিল মধুসূদনের। নির্দিষ্ট দিনে মধুসূদন সেজেগুজে তৈরি, সঙ্গে যাবে গৌরদাস এবং একজন মাইনেকরা পণ্ডিত। গৌরদাসের অনুরোধেও মধুসূদন দেশীয় পোশাক পরিধান করতে রাজি হলেন না। কিন্তু যাবার আগে মনের জোর আনার জন্য মধুসূদন ব্র্যাণ্ডির বোতল

খুলে যেই গলায় ঢালতে যাবেন, তখন গৌরদাস চেপে ধরলেন তার হাত। অনুনয় করে বললেন, প্লীজ মধু, অন্তত আজ থাক। ওখেনে পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসবেন, তোর মুখ থেকে কিছু শুনতে চাইবেন—

বোতলটি নামিয়ে রেখে মধুসূদন বললেন, থাক, আজ আর নিজের পয়সায় কেন খাই! ওরা নিশ্চয়ই সার্ব কর্বে? বড় মানুষের বাড়ির ব্যাপার, আশা করি ওরা বেস্ট কোয়ালিটিই দেবে!

গৌরদাস বললেন, মনে হয় না। যতদূর জানি, ও-বাড়িতে ড্রিঙ্কস্-এর চল নেই।

—কী বললি? সভা খুলেচে, ইংলিশ কায়দায় রিসেপশান দিচ্চে, আর ওয়াইন সার্ব কর্বে না? বিদ্যোৎসাহিনী সভা তো শুনিচি আসলে মদোৎসাহিনী সভা!

—তুই ভুল শুনিচিস মধু!

—তবে আর যাই কেন? হোয়াই বদার! মিচিমিচি গণ্ডাখানেক লোকের বকবকানি শুনতে যাই কেন?

—তুই কী বলচিস, এত বড় সম্মান! চল, প্লীজ, ব্যাপারটা সেরে এসে বাড়ি ফিরে তুই যত খুশী ড্রিংক করিস।

ঘোড়ারগাড়ি মাঝরাস্তা পর্যন্ত আসার পর আবার ছটফটিয়ে উঠলেন মধুসূদন! গৌরকে তিরস্কার করে বললেন, তুই কী কল্লি বল তো? আমার গলা শুক্যে আসচে। ওরা কি ডায়াস তৈরি করে তার ওপর আমায় বসাবে? ওরে বাপ্ রে বাপ্!

গৌরদাস বললেন, বেশীক্ষণ লাগবে না। তোর লেকচারটা শেষ হলেই তুই বাড়ি চলে আসবি।

—হোয়াট? লেকচার? কে দেবে লেকচার? তোর মাতা খারাপ?

—বাঃ, ওদের সম্বর্ধনার উত্তরে তোকে দু-চার কতা বলতে হবে না? সেটাই তো ভদ্রতা!

—তোরা আমায় মেরে ফেলতে চাস? আমি দোবো বেঙ্গলিতে লেকচার? শুনেই আমার সারা গা কাঁপচে। ওরে বাপ রে বাপ, আমি যাবো না, আমি পালাবো—

পণ্ডিতটি হো হো করে হেসে উঠলেন। মধুসূদন চক্ষু গরম করে তার দিকে ফিরে বললেন, তুমি হাসচো কেন, পণ্ডিত! ভাবচো, আমি প্রহসন কচ্চি? আমি বেঙ্গলিতে লেকচার দোবো? নেভার।

পণ্ডিতটি বললেন, বলেন কি মশাই, হাসবো না? বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি যিনি, তিনি বাংলা বক্তৃতা করতে ভয়ে কাঁপছেন, এতে হাসি পাবে না?

এবার গৌরদাসও হেসে উঠলেন সশব্দে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে কিন্তু মধুসূদনের সব কিছুই বেশ পছন্দ হতে লাগলো। বিদ্যোৎসাহী সভার সভ্যদের উৎসাহ-উদ্দীপনা খুবই আন্তরিক। বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলী ঔৎসুক্যের সঙ্গে চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। আবেগকম্পিত কণ্ঠে নবীনকুমার পাঠ করলেন মানপত্র। সেই আবেগের স্পর্শ লাগলো মধুসূদনের কণ্ঠে, উত্তর দেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বেশ গড়গড় করেই বাংলা বলতে লাগলেন তিনি। অবশ্য একটুখানি বলার পরই তাঁর হাঁটুদ্বয় কম্পিত হতে লাগলো। হঠাৎ একটুখানি থেমে তিনি বললেন, আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন···কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম···। তারপরই বসে পড়লেন। তাতেই বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালিধ্বনি হলো। এরপর অভিনেতা কেশব গাঙ্গুলি পাঠ করলেন মেঘনাদবধের নির্বাচিত অংশ। মধুসূদন বেশ নিবিষ্টচিত্তে শুনতে লাগলেন। তাঁর আর বাড়ি ফেরার তাড়া দেখা গেল না।

ফেরার পথে ঘোড়ার গাড়িতেও গৌরদাসের সঙ্গে মধুসূদন অলোচনা করতে লাগলেন সভাটির সার্থকতা সম্পর্কে। নবীনকুমারকে বেশ পছন্দ হয়েছে মধুসূদনের। ঐ অল্পবয়সী ছোকরাটি এ শহরের সমস্ত খ্যাতিমান ব্যক্তিদেরই আনতে পেরেছে এই সভায়, এটা কম কথা নয়। গৌরদাস বললেন, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র হরিশ মুখুজ্যেকেই দেকলুম না। তিনি বোধ হয় অন্য কর্মে ব্যস্ত—।

মধুসূদন ললাট কুঞ্চিত করে বললেন, আর একজনকে দেকিনি। অথচ দেকবো বলে একস্‌পেকট করিচিলুম। তোমাদের ঐ বিদ্যাসাগর। তিনি এলেন না কেন? তাঁর বুঝি খুব অহংকার! ইফ ইউ মিট হিম, ওঁকে বলে দিও, ঐ সব অহংকারী পণ্ডিতদের মাইকেল এম এস ডাট্ গ্রাহ্য করে না।

নীলদর্পণ বইখানি নিয়ে ইংরেজ সরকার এক মজার মুশকিলে পড়ে গেল।

নেটিভদের ভাষায়, নেটিভদের বই-পত্র-পত্রিকায় তাদের মনোভাব কেমন প্রতিফলিত হচ্ছে তা সরকারের গোচরে আনা পাদ্রী লঙের কর্তব্য। লঙ সাহেব সেই অনুযায়ী নীলদর্পণের সারমর্ম জানালেন বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নরের সেক্রেটারি সীটন-কার সাহেবকে। এবং লঙ্ যেহেতু দেশীয় লোকদের অবস্থা উন্নয়নে আগ্রহী, সেই কারণে তাঁর কণ্ঠস্বরে খানিকটা আবেগও ফুটেছিল।

সীটন-কার-এর বয়েস কম, একটু আদর্শবাদী ধরনের, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে সজাগ। তা ছাড়া, বড়লাট লর্ড ক্যানিং এবং ছোটলাট জন পিটার গ্রান্ট দু'জনেই যদিও কলকাতায় অধিষ্ঠিত, তবু বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি শাসনের সব ঝক্কিঝামেলা সেক্রেটারি সীটন-কারকেই পোহাতে হয়। সিপাহী যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি এখনো সকলের মনে জাগরূক। নিরীহ প্রজাদের ওপর বেশী অত্যাচার চালালে আবার না একটা অগ্ন্যুৎপাত ঘটে যায়। সুতরাং সীটন-কার এই বিষয়টি তাঁর ওপরওয়ালা জন পিটার গ্রান্টকে অবহিত করালেন অবিলম্বে।

গ্রান্ট এদেশে চাকরি করছেন অনেকদিন। পদোন্নতি হতে হতে বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর হয়েছেন। এদেশের গ্রাম গঞ্জের অবস্থা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অবহিত। এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ পদ পাবার পর তিনি প্রথম কিছুদিন পূর্ণ-উদ্যমে কাজ শুরু করেছিলেন, ইদানীং সেই উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। বয়েসও হয়েছে যথেষ্ট, তিনি জানেন, আর তাঁর পদোন্নতির আশা নেই, ছোট লাট থেকে বড় লাট হওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হবে না, তার আগেই অবসর নিতে হবে। এই অবস্থায় উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা খানিকটা আলস্যে গা ভাসিয়ে দেয়।

প্রবল গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। গ্রান্ট তাঁর চৌরঙ্গি সম্মুখবর্তী আলয়ের দ্বিতলের বারান্দায় হালকা কুর্তা গায়ে বসেছিলেন। বিকেলের শেষাশেষি বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে কিছুক্ষণ প্রবল বাতাস ছুটে আসে কলকাতার দিকে, সেইটুকুই যা আরামের। বাঁ হাতে ছোটা পেগ, ডান হাতে আলবোলার নল, দেশীয় প্রথায় ধূমপানের অভ্যেস হয়েছে তাঁর কিছুদিন। এই সময় জরুরি কাজে সীটন-কার দেখা করতে এলেন।

নীলদর্পণ বইটির বিষয়বস্তু শুনে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন গ্রান্ট। অলস হলেও তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তি। নাটকটিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র গ্রামের চাষী একযোগে প্রতিরোধ করতে নেমেছে, এ ঘটনা যদি সত্যি হয়, তা হলে সত্যিই আশঙ্কার কথা। গ্রামের নিরীহ গরিব চাষী আবহমানকাল ধরেই নিপীড়িত হয়ে আসছে। কিন্তু ধনবান বা শিক্ষিত শ্রেণী কখনো চাষীদের পাশে দাঁড়ায় না, তাঁরা চেষ্টা করে সরকারের পক্ষে থাকতে। নবীনমাধব এবং তোরাপের স্বার্থ আলাদা, নবীনমাধবদের পরিবার তো ইচ্ছে করলেই কিছু অর্থ ব্যয় করে সব মিটমাট করে নিতে পারতো, তবু তারা কেন তোরাপ ক্ষেত্রমণিদের হয়ে লড়াই করতে গেল ? এর মধ্যে বিপদের বীজ আছে। এইভাবেই বিদ্রোহ শুরু হয়।

বিষয়টি নিয়ে গ্রান্ট কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন সীটন-কার-এর সঙ্গে। সীটন-কারেরও বক্তব্য এই যে শুধু গ্রামের মধ্যবিত্ত নয়, এমনকি শহরের কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী, যাদের সঙ্গে জমিজমার কোনো সম্পর্কও নেই, তারাও চাষীদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছে। ইণ্ডিগো কমিশানে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আগুন ছোটাচ্ছে হরিশ মুখুজ্যে। এই হরিশ মুখুজ্যের কী সম্পর্ক গ্রামের চাষীদের সঙ্গে ? যার নিজের কোনো জমি-জমা নেই। এটা একটা নতুন ঝোঁক।

গ্রান্ট জিজ্ঞেস করলেন, এই নাটকের একটি ইংরাজী অনুবাদ করানো সম্ভব কী ? তাহা হইলে রাজকর্মচারীরা ইহা পাঠ করিয়া বর্তমান অবস্থার চিত্রটি সম্যক অনুধাবন করিতে পারিত !

সীটন-কার বললেন, ইহার অনুবাদ করা শক্ত কিছু নহে। লঙের সহিত বহু শিক্ষিত নেটিভের যোগাযোগ রহিয়াছে, সে অনায়াসেই সত্বর অনুবাদের ব্যবস্থা করিতে পারে।

গ্রান্ট বললেন, তাহা হইলে অনুবাদ সংগ্রহ করিয়া আপনি আমাদের ব্যয়ে তাহা মুদ্রণের ব্যবস্থা করুন। যাহাদের যাহাদের আপনি উপযুক্ত মনে করিবেন, তাহাদের নামে এক কপি বই প্রেরণ করুন। আমাদিগের সকলের ইহা জানা দরকার।

এই নির্দেশ দিয়ে গ্রান্ট কয়েকদিন পরেই চলে গেলেন মফঃস্বল পরিদর্শনে।

অনুবাদ তো লঙের কাছে প্রস্তুত। কালক্ষেপ না করে তা মুদ্রণের ব্যবস্থা হলো। সরকারি খরচে সীটন-কার পাঁচশো কপি ইংরেজি নীলদর্পণ ছাপিয়ে তার এক এক কপি সরকারি লেফাফায় ভরে শুধু এদেশের নয়, ইংলণ্ডেরও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে প্রেরণ করতে লাগলেন। এর পর বারুদে অগ্নি সংযোগ হলো।

ইংরেজি কেতাবখানির সন্ধান পেয়ে ক্রুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়তে লাগলো নীলকর সাহেবরা। 'ইংলিশম্যান' নামে সংবাদপত্র হৈ হৈ রৈ রৈ তুললো। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের শক্তিশালী সংস্থা ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাণ্ড কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশন কড়া ভাষায় বাংলা সরকারের কাছে এক পত্র লিখে জানতে চাইলো, সরকারি উদ্যোগেই এ গ্রন্থ প্রকাশিত ও বিতরিত হয়েছে কি না। যে গ্রন্থে ইংরেজ জাতিকে এত হেয় করে দেখানো হয়েছে, ইংরেজ সরকারই সে রচনার পৃষ্ঠপোষক! সমস্ত নীলকরদের চিত্রিত করা হয়েছে অমানুষ হিসেবে, খুন ও ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়েছে ইংরেজের নামে, নীলকর পত্নীর সঙ্গে জেলা ম্যাজিসট্রেটের প্রণয়ের ইঙ্গিত করে ইংরেজ ললনাদের সতীত্বে কুৎসা আরোপিত হয়েছে, এমনই একটি কদর্য, বিদ্বেষমূলক অপকৃষ্ট পুস্তকের জন্য ব্যয়িত হয়েছে সরকারি অর্থ?

চিঠি পেয়ে সরকার একেবারে অপ্রস্তুতের একশেষ। ব্যাপারটা তো এদিক থেকে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখা হয়নি। সরকারি স্বীকৃতি মানেই গ্রন্থটির সব অভিযোগ স্বীকার করে নেওয়া। ব্যবসায়ীদের চটিয়ে কখনো সরকার চালানো যায়? নীলকরদের খানিকটা সংযত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন বটে সরকার, তা বলে তাদের একেবারে বিরুদ্ধবাদী করে তোলা যায় কি? নেটিভদের এতখানি প্রশ্রয়ই বা দেওয়া চলে কী করে? স্বয়ং বড় লাট লর্ড ক্যানিং পর্যন্ত এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে বিব্রত ও ক্রুদ্ধ হলেন।

বেগতিক দেখে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন গ্রান্ট। তিনি জানালেন যে সে সময় তিনি মফঃস্বল পরিদর্শনে ব্যস্ত ছিলেন, সব ব্যাপারটা তিনি জানেন না। সরকারি খরচে মুদ্রণের নির্দেশও কি তিনি দেননি? গ্রান্ট জানালেন যে তিনি বলেছিলেন বটে যে আমাদের খরচে, স্পষ্টাক্ষরে সরকারি ব্যয়ের কথা তো বলেন নি?

তাহলে সব দায়িত্ব সীটন কার-কেই নিতে হয়। কিন্তু বাংলা সরকারের সেক্রেটারি প্রকৃতপক্ষে সরকারের মুখপাত্র, তাঁর অবমাননায় সরকারেরই অবমাননা। সুতরাং সরকারের পক্ষ থেকে ঐ চিঠির উত্তরে জানানো হলো যে, নীলদর্পণ প্রকাশের ব্যাপারটা সরকারের পক্ষে একটা অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়ে গেছে, সেজন্য সরকার অনুতপ্ত।

কিন্তু ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স অ্যাণ্ড কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যরা ওতে শান্ত হলো না, তারা হাইকোর্টে ঐ গ্রন্থের লেখক, প্রকাশক এবং অনুবাদকের নামে মামলা দায়ের করলো।

বাংলা বইটিতে যেমন, তেমন ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থটিতেও লেখক, অনুবাদক, প্রকাশকের কোনো নাম নেই। দীনবন্ধু মিত্র ও মধুসূদন দত্তের নাম সযত্নে গোপন রাখা হয়েছে। ইংরেজি অনুবাদে শুধু মুদ্রাকর হিসেবে ছাপাখানার মালিক ম্যানুয়েল নামে এক সাহেবের নাম রয়েছে। সে বেচারিকেই শমন পাঠালো আদালত। যেহেতু ইংরেজি গ্রন্থ নিয়েই মামলা, তাই প্রকাশক হিসেবে বাংলা সরকারের দুই প্রতিনিধি গ্রান্ট এবং সীটন-কারেরই এগিয়ে আসা উচিত, কিন্তু তাঁরা ঢোঁক গিলে বসে রইলেন এবং খুঁজতে লাগলেন একজন বলির পাঁঠা।

খোঁজার প্রয়োজন অবশ্য অবিলম্বেই ফুরিয়ে গেল, নির্দোষ ম্যানুয়েল সাহেবের সাজা হবে ভেবে এগিয়ে এলেন পাদ্রী লঙ, তিনি জানালেন, এই গ্রন্থের সব কিছুর জন্য তিনি একা দায়ী। আদালতের সামনে তিনি ধীর শান্ত গলায় বললেন, যতদিন আমি জীবিত আছি, যতদিন আমার মস্তিষ্কে চিন্তাশক্তি থাকিবে ততদিন আমি দরিদ্র জনসাধারণের উন্নতির চেষ্টা করিয়া যাইব। আমি খৃষ্টান এবং ইহাই খৃষ্টানের প্রকৃত ধর্ম।

শুরু হয়ে গেল নীলদর্পণের মামলা।

নবীনকুমার তখন একদিকে মহাভারত অন্যদিকে হুতোমের নকশা রচনায় ব্যাপৃত। এই সময় হরিশ মুখুজ্যে তাকে একটি চিঠি পাঠালেন। কিছুটা শ্লেষ ও পরিহাসের সঙ্গে হরিশ লিখেছেন,

বেরাদর, বেশ কিছুকাল তোমার দর্শন পাই না, তবে তোমার অগ্রজ মারফৎ তোমার সুকীর্তির কিছু সংবাদ পাই। আমোদ-প্রমোদ সব বাদ দিয়া একেবারে কর্মবীর হইয়া উঠিলে। সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করিতেছ। অহো কী মহীয়সী কীর্তি ! ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তোমায় ধন্য ধন্য করিবে, অবশ্য যদি ভবিষ্যতে এ দেশের মানুষ টিঁকিয়া থাকে ! শত সহস্র মানুষ অনাহারের সম্মুখীন, নীলকরের অত্যাচারে গ্রামের পর গ্রামে আগুন জ্বলিতেছে, দেশ ছারখার হইয়া গেল, এই সময় মহাভারতের মতন পুণ্য গ্রন্থ রচনাই যোগ্য কাজ বটে।

আরও শুনিয়াছি, তুমি কবিবর মাইকেল দত্ত এস্কোয়ারকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এক মহতী সভার আহ্বান করিয়াছিলে। তিনি প্রকাণ্ড কবি, আমি যদিও এক অক্ষরও পাঠ করি নাই, তবু লোক মারফৎ শুনিলাম দত্ত কবি মেঘনাদ বধ কাব্য রচনার নামে রামায়ণকেই বধ করিয়া ছাড়িয়াছেন ! তাঁহাকে মানপত্র দেওয়ায় নববাবু সমাজের যোগ্য কাজই হইয়াছে বলিতে হইবে। বুলবুলির লড়াই ও বাঈ নৃত্য দর্শন ছাড়িয়া এক্ষণে কাব্যকলা লইয়া মত্ত হইবারই উপযুক্ত সময় বটে। তোমাকে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম তুমি কিঞ্চিৎ বেতর পথে চলিবে, পিতৃসঞ্চিত অর্থ সমুচিত কার্যে ব্যয় করিবে।

এত তোমার পুস্তক প্রীতি, নীলদর্পণ নামে একটি কেতাব বাহির হইয়াছে, তাহার সংবাদ রাখো কি ? গ্রন্থকার কে তাহা জানি বটে, কিন্তু নাম বলিব না। তবে নীলকরদিগের অত্যাচারের বড়ই সত্য, বড়ই মর্মন্তুদ চিত্র অঙ্কিত তিনি করিয়াছেন। সে গ্রন্থ প্রচারেরও বুঝি উপায় রহিল না, বাঘা বাঘা সাহেবেরা তাহাকে মামলায় ফাঁসাইয়াছে, পাদ্রী লঙ সপ্তরথীর বিরুদ্ধে অভিমন্যুর মতন একাকী আর কতদিন লড়িবে !

আমারও বোধ করি নিষ্কৃতি নাই। আমি ইণ্ডিগো কমিশানে সাক্ষ্য দিয়া সকল প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করিতেছি বলিয়া কুপিত ইংরাজগণ আমারও নামে মোকদ্দমা আনিয়া আমাকে সর্বস্বান্ত করিবার উদ্যোগ করিতেছে। তবে আমার জন্য চিন্তা করিয়ো না, আমার শরীরে অসুরের শক্তি, ইংরেজ বেটাদের অপেক্ষা আমার মেধাও বেশী। আমি আরও কিছু না হউক পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিব এবং ও বেটাদের সহিত লাঠালাঠি করিয়া যাইব। তুমি শরীফ মেজাজে রহিয়ো. এই মনস্কামনা জানাই।

পত্রটি পেয়ে রীতিমতন ক্ষুব্ধ হলো নবীনকুমার। সে চাটকারদের পছন্দ করে না বলেই এক সময় হরিশ মুখুজ্যের সাগরেদী করতে গিয়েছিল। কিন্তু হরিশ এবার তাকে অন্যায্য কটাক্ষ করেছে। তৎক্ষণাৎ সে কাগজ কলম নিয়ে উত্তর রচনা করতে বসলো।

বন্ধু,

ক্ষুধার্ত মানুষের কাচে সৌন্দর্যের কোনো মূল্য নেইকো, তা বলে সব সুন্দর জিনিস মুচে ফেলতে হবে ? যে লোক না খেয়ে রয়েচে, বসরাই গোলাপের কোনো কদর নেই তার কাচে, কারণ গোলাপ-টগর-চাঁপা এগুলো তার খাদ্য নয়, খেলে পেটও ভরে না। সেইজন্য তুমি পৃথিবী থেকে সব ফুলগাচ উপড়ে ফেলতে চাও ? গ্রাম দেশে রায়তরা কষ্ট পাচ্চে, তাদের কষ্ট দূর কত্তে তো হবে বটেই, যেমন তুমি চেষ্টা কচ্চো, তা বলে লোকে মহাভারত পড়বে না ? কবিরা মাতৃভাষার সাধনা কর্বে না ? কতায় বলে, 'অক্ষরে পণ্ডিত তুষ্ট, ফুলে তুষ্ট ভোমরা,/ক্ষুধা ভোজনে তুষ্ট, কিলে তুষ্ট বর্বরা— ' যার যা কাজ তার তা সাজে, নইলে সব যজ্ঞিই নষ্ট। চাষীদের দুর্দশা ঘুচোবার জন্য শুধু সেদিকেই সবাই মন দেবে, আর ইদিকে নব্য শিক্ষিত ছোঁড়াগুলো বাংলা ভাষার অনাদর করে শুদু ইংরিজি ফড়ফড়াবে, কিংবা দলে দলে কেরেস্তান হয়ে যাবে, এটাই বা কেমন কতা ! মধুসূদন দত্ত সাহেবমন্য ও ইংরেজিতে কৃতবিদ্য ব্যক্তি, তিনি যে বাংলার জন্য লেখনী ধারণ কচ্চেন এবং এমন অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য উপহার দিয়েচেন সেজন্য অমরা ধন্য ও কৃতজ্ঞ। তাঁর গুণের সমাদর না কল্লে আমাদের এই কুঁদুলে বাঙালী জাতির উপযুক্ত কাজই হয় বটে ! নীলদর্পণ আমি পড়িচি, লেকাটি তেমন সরেশ নয়, একটাও সাহেব মল্লে না, আর দিশি ক্যারেকটারগুলো পটাপট মরে গ্যালো, এ কেমন ? অবশ্য সোসিয়াল রিফর্মেশানের জন্য এই প্রকার নাটকের মূল্য খুবই আচে। তোমার শরীরে এখুনো অসুরের মতন শক্তি জেনে বড় প্রীত হলেম। এত বল কোতায় পাও ! এত ব্যস্ততার মধ্যেও যে মাদৃশ সামান্য ব্যক্তিকে স্মরণে রেকেচো তাতে যার-পর-নাই সুখী হয়িচি।...

এই পত্র লেখা সত্ত্বেও অবশ্য নবীনকুমার নীলদর্পণ মামলার প্রতি আকৃষ্ট হলো। গঙ্গানারায়ণের কাছ থেকে এর আগেই সে নীলদর্পণ গ্রন্থ সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা শুনেছে। মধুসূদনের জন্য তাঁর বন্ধুরা চিন্তিত, কোনোক্রমে অনুবাদক হিসেবে তাঁর নাম ফাঁস হয়ে গেলে তাঁকে বিপদে পড়তে হবে। চাকুরিও হারাতে হতে পারে। সেইজন্য সব প্রমাণপত্র বিলোপ করা হয়ে গেছে। পাদ্রী লঙ অবশ্য

আদালতে অবিচল, তিনি আর কারুকে জড়াতে চান না।

বিচারের সময় প্রতিদিন আদালত লোকে লোকারণ্য। ব্যবসায়ী ইংরেজরা তো আসছেই, তাছাড়া দেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেও অনেককে দেখা যায়। এমন বিচার-প্রহসন বহুদিন দেখা যায়নি। সাহেবের আদালতে সাহেবের বিচার, যদিও উপলক্ষ সাধারণ নিপীড়িত প্রজাবৃন্দ। সকলেই জানে যে পাদ্রী লঙ এ নাটক রচনাও করেননি, প্রচারের দায়িত্বও তাঁর নয়। তবু সেই লঙকেই শাস্তি পেতে হবে। শাস্তি যে হবেই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিচার চলছে মর্ডাণ্ট ওয়েলসের এজলাশে, এই মর্ডাণ্ট ওয়েলসই কিছুদিন আগে এক বিচারের সময় মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতীয়রা সকলেই জুয়াচোর এবং বদমাশ।

বরানগরে মহাভারত অনুবাদ কার্যালয়ে না গিয়ে নবীনকুমার এখন হাইকোর্টে চলে আসে প্রত্যহ। যদুপতি গাঙ্গুলীকেও এখানে সে দেখতে পায়। আদালতে দর্শকদের গ্যালারিতে স্থান সঙ্কুলান হয় না, যদুপতি আগেভাগে এসে দু'জনের জন্য আসন সংরক্ষণ করে রাখে। সওয়াল জবাব শুনতে শুনতে নবীনকুমারের গ্লানি বোধ হয়। সে যদুপতিকে ফিসফাস করে বলে, আমাদের প্রজাদের নিয়ে মামলা, অথচ আমাদের দেশী লোক একজনও কাঠগড়ায় দাঁড়ালো না? এ বড় লজ্জার কতা নয়?

যদুপতি বলে, ভাই, তবু এ একরকম ভালো! দিশী লোক কখুনো সাহেবদের সাথে মামলায় জিততে পারে? তার ওপর এ হলো গে মানহানির মামলা। এ মামলায় হারলে প্ল্যাণ্টার সাহেবগুলোর মুখে একেবারে চুনকালি পড়ে যাবে!

—এ মামলায় জয় হবে, তুমি আশা করো?

—দ্যাকোই না কী হয়! হাজার হোক লঙ একজন পাদ্রী এবং ভালোমানুষ বলে সব্বাই জানে। এমন মানুষকে সাজা দিলে অনেক ইংরেজও ক্ষেপে যাবে। বিলেতেও এর প্রতিক্রিয়া হবে!

—নীলকরদের সঙ্গে ইংরেজি কাগচওয়ালারাও যোগ দিয়েচে, ওদের কামড় একেবারে কচ্ছপের কামড়:

—কাগচওয়ালাদের ক্ষেপবার তো কারণ রয়েচেই! 'হরকরা' আর 'ইংলিশম্যান' তো ক্ষেপে একেবারে লাল! নীলদর্পণ-এর ভূমিকায় কী লেকা আচে দ্যাকোনি? রসিক নাট্যকার লিকেচেন যে চাঁদির কত গুণ! জুডাস যেমন মাএ তিরিশটি টাকার বিনিময়ে প্রভু যীশুকে পন্টিয়াস পাইলেটের হাতে ধরিয়ে দিইচিলেন, সেই রকমই এই দুই কাগচওয়ালা নীলকরদের কাচ ঠেঙে মাএ হাজার টাকা ঘুষ খেয়েই গরীব চাষীদের বিপক্ষে লেখনী ধারণ করে অত্যাচারী ব্যবসায়ীদের গুণ গাইচে। বেড়ে লিকেচেন, যাই বলো!

এক এক সময় আসামী পক্ষের উকিলদের সওয়াল শুনে নবনীকুমার বিরক্ত হয়ে উঠে চলে যায়। তার শরীর নিশপিশ করে। এই বুঝি উকিল? নীলকরদের দ্বারা নিয়োজিত দুঁদে উকিলদের বিরুদ্ধে লঙের পক্ষের একজন উকিল মিনমিন করে কতা বলে, কী যে বলে তা ভালো করে শোনাই যায় না! আর একজন উকিল সকালের দিকটায় জিভ ছুঁচোলো করে কিছু চোকা চোকা বাক্য বলে বটে, কিন্তু বেলা বারোটা বাজতে বাজতেই তার জিভ এলিয়ে যায়, পা টলতে থাকে, কথার কোনো সঙ্গতি থাকে না। বিচারকও তেমনি চতুর, নিউমার্চ নামে এই মদ্যপ উকিলটি সওয়াল করতে এলেই কোনো ছুতোনাতায় অ্যাডজোর্ন করে দেয়। অপরাহ্ণে আবার আদালত বসলে নিউমার্চ তখন শুধু হাসির খোরাক জোগায়।

নবীনকুমারের মনে হয়, এখানে এসে শুধু সময়ের অপব্যয় হচ্ছে। মহাভারতের কাজ দেখাশুনো স্থগিত রয়েচে, তাছাড়া কুসুমকুমারীর বিবাহের চিন্তাও সে পরিত্যাগ করেনি, প্রায়ই মনে পড়ে, কিন্তু সে ব্যাপারে সে সময় দিতে পারছে না। মধ্যপথে সে চলে যাচ্ছে দেখে যদুপতি গাঙ্গুলী তাকে বাধা দেয়। তার মতে এর চেয়ে বড় ঘটনা এখন আর দেশে কিছু ঘটছে না।

সে বলে, বুঝতে পারচো না, ভাই—

নবীনকুমার তাকে বাধা দিয়ে বলে, অত ভাই ভাই করো না তো! আমি কি বেম্ম হয়িছি? ও তোমার বেম্ম সতীর্থদের যত খুশী ভাই ভাই করো গে।

ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে যদুপতি বলে, ব্রাহ্মদের প্রতি তোমার এমন বিতৃষ্ণা আচে জানতুম না তো! তুমি তো দেবেন্দ্রবাবুর বাড়িতে নিয়মিত যাও দেকিচি!

নবীনকুমার বললো, সে আলাদা কতা। ব্রাহ্ম তো হইনি, কোনোদিন হবোও না। দেবেন্দ্রবাবুকে শ্রদ্ধা করি বটে, কিন্তু ধম্মো নিয়ে মাতামাতিতে আমার মন নেই।

যদুপতি বললো, সে যাই হোক ! শোনো একটা কতা বলি, এই নীলদর্পণের মামলায় জয় হলেও আমাদের জিৎ, হারলেও আমাদের জিৎ !

—কী রকম ?

—জয় হলে তো কতাই নেই ! আর হার হলে, নিরপরাধ পাদ্রী লঙ সাজা পেলে দেকো সারা দেশে কত শোরগোল পড়ে যাবে। বিলাতেও এ নিয়ে আন্দোলন হবে। কোনো পাদ্রীকে জেলে ভরার কতা আগে কখনো শুনোচো ?

—কিন্তু পাদ্রী লঙ আইরীশ, সে কতা ভুলে যেও না ! আইরীশদের সম্পর্কে ইংরেজদের খানিকটা বিরাগ ভাব আচে না ?

—তা হোক, তবু বিলেতে আইরীশদেরও মুরুব্বি রয়েচে অনেক।

যথাসময়ে জুরিদের পরামর্শ নিয়ে বিচারক মর্ডান্ট ওয়েলস রায় দিলেন। জুরিমণ্ডলীও গঠিত হয়েছে অপূর্বভাবে, বারোজন ইংরেজ, একজন পর্তুগীজ, একজন আর্মেনিয়ান আর একজন পার্শী। বাংলার চাষীদের ব্যাপার, বাঙালী মুখপাত্র একজনও নেই। জুরিরা একবাক্যে লঙকে দোষী সাব্যস্ত করলো। শেষ মুহূর্তেও লঙকে বাঁচাবার জন্য তাঁর পক্ষের উকিলরা পুনর্বিচার দাবি তুললো জোরালো ভাবে। তখন চীফ জাসটিস বার্নস পীকক বিচারের ভার নিলেন। তাতে হেরফের কিছু হলো না। এমনকি একটু সৌজন্যও তিনি দেখালেন না। লঙের বক্তব্যের মাঝপথে অকস্মাৎ বাধা দিয়ে তিনি রায় দিলেন, লঙের এক মাস কারাদণ্ড এবং এক সহস্র মুদ্রা জরিমানা !

দণ্ড শুনে সাহেবেরা হর্ষধ্বনি করে উঠলো। দেশীয় ব্যক্তিরা স্তম্ভিত। তারপর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উঠে দাঁড়াতেই নবীনকুমার হাত তুলে নিরস্ত করলেন সকলকে। অন্য কেউ পা বাড়াবার আগেই নবীনকুমার ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল ধর্মাধিকরণের দিকে। হাকিমের পার্শ্বে বসা পেশকারের সামনে একটি টাকার তোড়া নামিয়ে দিয়ে সে বিনীত ভাবে বললো, লঙ মহোদয়ের জরিমানার অর্থ আমার তরফ হইতে গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয় !

উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই নবীনকুমার আবার পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলো। দ্বারের কাছাকাছি এসেই সে দৌড় দিল, পাছে কেউ কেউ তাকে অভিনন্দন জানাতে আসে ! বাইরে বেরিয়েই সে শুনতে পেল আদালত কক্ষের মধ্যে তার উদ্দেশে করতালি ধ্বনি, সে দুই হাতে চাপা দিল কান। যদুপতি গাঙ্গুলী তাকে এসে ধরবার আগেই সে হাঁকিয়ে দিয়েছে জুড়িগাড়ি।

পরদিন দল বেঁধে অনেকেই এলো তার গৃহে। যদুপতির উৎসাহই সবচেয়ে বেশী। তারা নবীনকুমারকে সম্বর্ধনা জানাতে চায়। নবীনকুমার লজ্জায় আরক্ত হয়ে বার বার থামিয়ে দিতে গেল তাদের। সামান্য এক সহস্র মুদ্রা সে দিয়েচে, এ নিয়ে বেশী কথা বলার কী আছে ! সে তো লঙের হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করতে পারেনি !

সকলে এই বিষয়ে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে চায়, কিন্তু নবীনকুমার উঠে পড়লো। বিশেষ কারণে তাকে এখন বার হতে হবে। উত্তম সাজসজ্জা করতে গেল নবীনকুমার। আজ দেবেন্দ্রবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ। কয়েকমাস আগে দেবেন্দ্রবাবুর আর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আজ তার নামকরণ উপলক্ষে উৎসব।

নাম অবশ্য আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠিক আগের পুত্রটির নাম সোম, সেইজন্য এই নবজাতকের নাম রাখা হবে রবি।

যদুপতি গাঙ্গুলী ব্রাহ্মদের এক প্রার্থনা সভায় হঠাৎ ঘোষণা করলো, আগামী বৈশাখ মাসের পয়লা তারিখে সে তার উপবীত বিসর্জন দেবে। সে তারিখটি বেশী দূর নয়,আর মাত্র এগারো দিন বাকি।

বাতাসে আগুনের ফুলকির মতন খবর রটে যায় সর্বত্র। সারা শহরে শোরগোল পড়ে গেল একেবারে। এ যে ঘোর কলি! কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান পৈতা ত্যাগ করবে, তা হলে আর সর্বনাশের পাঁচ পোয়া পূর্ণ হতে বাকি থাকে কী? এই সব পাপ তো শুধু একজনের ওপর অর্সায় না, গোটা সমাজের প্রতিই অভিশাপ নেমে আসে। দলে দলে লোক যদুপতি গাঙ্গুলীর বাড়ির সামনে এসে তর্জন গর্জন করতে লাগলো। একদল লোক রাধাকান্ত দেবের কাছে ধর্না দিয়ে পড়লো। এর একটা বিহিত করতেই হবে।

পৈতা পরিত্যাগের চেষ্টা এর আগেও কয়েকজন নবীন ব্রাহ্ম করেছে কিন্তু সার্থক হতে পারেনি। হয় সেই সব নবীন ব্রাহ্মদের মাতা আত্মঘাতিনী হবার ভয় দেখিয়েছেন অথবা পিতা পানাহার বন্ধ করে ছেলেকে আবার ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করেছেন। মানুষ জন্মায় শুধু একবার, শুধু ব্রাহ্মণেরই এক জীবনের মধ্যে দ্বিতীয় জন্ম হয়। তাই তিনি দ্বিজ, আর সেই দ্বিজত্বের চিহ্ন ঐ যজ্ঞসূত্র। ব্রাহ্মণের কাজ ধর্মরক্ষা করা, আর সেই ব্রাহ্মণই যদি অধর্মচারী হয়, তা হলে হিন্দুসমাজের সর্বনাশ রোধ করবে কে?

যদুপতির আত্মীয় পরিজন কেউ কলকাতায় নেই, সে একা বাসা ভাড়া করে থাকে। সে বিপত্নীক এবং গোঁয়ার প্রকৃতির। একবার জেদ ধরলে সে কিছুতেই ছাড়বে না। ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করার পর থেকেই তার মধ্যে এই বিবেক দংশন চলছিল। ব্রাহ্মেরা একেশ্বরবাদী নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসক, তবু তাদের মধ্যে জাতিভেদ থাকে কী প্রকারে? এখনো ব্রাহ্মদের পুত্র-কন্যাদের বিবাহের সময় অনুলোম-প্রতিলোমের কথা চিন্তা করা হয়। এ তো কুসংস্কারকেই প্রশ্রয় দেওয়া। যদুপতি সেই জন্যই একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চায়।

যদুপতির কিছু কিছু শুভার্থী বন্ধু তাকে পরামর্শ দিল এ ব্যাপার থেকে নিবৃত্ত হতে। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিন তাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, এখনই এ রকম হঠকারিতার প্রয়োজন নেই, তা হলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ আরও মারমুখী হয়ে উঠবে। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে বিঘ্ন ঘটবে। কিন্তু যদুপতি অনমনীয়। তার ধারণা আপোসের মনোভাব নিয়ে কোনো বড় কাজ করা যায় না। ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কী, তা সারা দেশের কাছে স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করা উচিত। সনাতন হিন্দুধর্মের মতন এতে যে জাতিভেদের স্থান নেই তার প্রমাণ রাখার প্রয়োজন আছে। এতে যদি সংঘর্ষ বাধে তো বাধুক। কেশবচন্দ্র ও আরও কয়েকজন তরুণ ব্রাহ্মের কাছ থেকে এ ব্যাপারে উৎসাহ পেল যদুপতি।

নির্দিষ্ট দিনে যদুপতির সমর্থকরা সমবেত হয়েছে তার গৃহের অভ্যন্তরে। আর বাইরে একদল লোক টিটকারি ও কুৎসিত মন্তব্য করছে। যদুপতির কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, একবার সে অলিন্দে এসে দাঁড়ালো। তাকে দেখে বাইরের লোকগুলি উচ্চগ্রামে গালিগালাজ শুরু করে দেওয়ায় যদুপতি পাশ ফিরে তার এক বন্ধুকে বললো, যারা এমন কুরুচিপূর্ণ কুবাক্য বিনা দ্বিধায় উচ্চারণ করতে পারে, তারাই ধর্মের রক্ষক! হায় হিন্দুধর্ম, এই তোমার দশা!

ঘরের মধ্যে ফিরে এসে সে গলা থেকে উপবীতখানি খুলে হাত জোড় করে তার স্বর্গীয় পিতৃদেবের উদ্দেশে বললো, পিতঃ, আমাকে মার্জনা করুন! আমি সজ্ঞানে যাহা সৎকর্ম বলিয়া বিবেচনা করি তাহাই পালন করি। আপনি শৈশবে আমাকে এমনই শিখাইয়াছিলেন!

তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তার বাঁকুড়া নিবাসিনী মাতার উদ্দেশে বললো, মা, তুমি জানো, আমি কখনই ভালো বই মন্দ কাজ করবো না। পরের কথায় তুমি কান দিও না, আমার ওপর বিশ্বাস রেখো, তুমি জানো যে তোমার যদু কোনোদিন কোনো অন্যায় কাজ করবে না।

তারপর সেই নগাছি সুতো মালার মতন হাতে দুলিয়ে আবেগ কম্পিত কণ্ঠে সে বললো, বিদায়। আজ থেকে আমার কণ্ঠ বন্ধনহীন হলো।

এই সময় একটি আন্দোলনের সৃষ্টি হলো। এক যষ্টিধারী হৃষ্টপুষ্ট চেহারার মধ্যবয়েসী ব্যক্তি ভিড় ঠেলে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বললো, একি সব্বুনেশে কতা। মাতায় বাজ ভেঙ্গে পড়বে, ভূমিকম্প হবে, তিরিশ সালের মত আবার বন্যা হবে। ওরে বাপ রে বাপ, ওরে বাপ রে বাপ!

লোকটি দ্বিতলে যদুপতির কক্ষের মধ্যে ঢুকে পড়ে বললো, আমার ওপর এ অত্যাচার কেন, আমি পুত্র কলত্র নিয়ে ঘর করি, ও মোয়াই, আমার এ সব্বোনাশ কচ্ছেন কেন? আপনাকে ভালো মানুষের ছেলে জেনেই তো বাড়িভাড়া দিইচিলুম। ও মোয়াই, এ কী কল্লেন?

আদর্শ ব্রাহ্মের মতন বিনীত, সুভদ্র কণ্ঠে যদুপতি বললো, কী হয়েচে, নয়নচাঁদবাবু? আপনি এত বিচলিত কেন?

গৃহস্বামী নয়নচাঁদ হঠাৎ যেন থমকে গেলেন। তারপর ঘরের চারদিক তাকিয়ে আবার যদুপতির মুখে দৃষ্টি স্থাপন করে মহা বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, ও বাবা, এ যে সুস্থ মানুষের মতন কতা বলে! তবে যে সবাই বলে, দাঁত কিড়মিড় করে বক রাক্ষসের মতন চক্ষু ঘুরোচ্চে! বামুন পৈতে ত্যাগ কল্লে ব্রহ্মদৈত্যি হয়ে যায়।

যদুপতি সমেত সেখানকার সকলেই উচ্চহাস্য করে উঠলো। কৃষ্ণদাস পাল বললো, এ পারফেক্ট স্পেশিমেন অব ইমবেসিলিটি!

যদুপতি বললো, ভয় পাবেন না নয়নচাঁদবাবু, আমি ব্রহ্মদৈত্য হইনি এখোনো . বসুন। আমি শুধু গলা থেকে এই সুতোগাছি খুলে ফেলিচি।

নয়নচাঁদ প্রায় ছটফটিয়ে লাফাবার ভঙ্গি করে বললো, বসবো, এখেনে বসবো, বলেন কী? নেহাৎ প্রাণের দায়ে এয়িচি, আমার গিন্নী বল্লেন, যাও, এখুনি যাও, সারা বাড়ি গঙ্গাজল দিয়ে ধুইয়ে এসো গে, তারপর পুরুত ডেকে···মোয়াই, এই হাতজোড় কচ্চি, আমার ঘাট হয়েচে, কোন পাপে আপনাকে বাড়িভাড়া দিইচিলুম জানি না, এবার এখেন থেকে পাট তুলুন! আজ্ঞি, বলেন তো আমি গাড়ি ডেকে দি—।

তারপর সেখানে এক মহা কোলাহল শুরু হলো। নয়নচাঁদ সেই দণ্ডেই যদুপতিকে বাড়িছাড়া করতে চায়। যদুপতির বন্ধুরা তা কিছুতেই মেনে নেবে না। কৃষ্ণদাস পাল চোখা চোখা বাক্য বলতে খুব ওস্তাদ, সে ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে যুক্তিজালে নয়নচাঁদকে একেবারে ফাঁদে পড়া পশুর মতন বেঁধে ফেললো। উপায়ান্তর না দেখে তখন হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো নয়নচাঁদ। শান্তিপ্রিয় যদুপতিই শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল গৃহত্যাগ করতে। তার এক বন্ধু অবনীভূষণ তাকে আশ্রয় দিতে রাজি। তখনই একটা কেরাঞ্চিগাড়ি ডেকে তোলা হলো মালপত্র। বাইরের বিরুদ্ধবাদী জনতা মনে করলো, এতে যদুপতির যথেষ্ট হেনস্থা হয়েছে। তারা দুয়ো দিয়ে উঠলো।

মালপত্র নিয়ে চলে গেল অবনীভূষণ। যদুপতি তার অন্য বন্ধুদের নিয়ে সারবদ্ধভাবে চললো গঙ্গার ঘাটের দিকে। হাজার হাজার লোক অনুসরণ করতে লাগলো তাদের। গঙ্গার ঘাট একেবারে ভিড়ে ভিড়াক্কার। সকলের সব মন্তব্য উপেক্ষা করে যদুপতি তার পৈতেগাছা ছুঁড়ে ফেলে দিল জলস্রোতে। তারপর সে মুখ ফেরালো যুদ্ধজয়ী বীরের মতন।

পরদিনই যদুপতি গেল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সংবাদ জানাতে। যদুপতি যেমন দেবেন্দ্রবাবুর ব্রাহ্মসভায় যায়, তেমনই আবার সে বিদ্যাসাগরের চ্যালা। বিদ্যাসাগর খুশী বা অখুশী—কোনো রকমই ভাব প্রকাশ করলেন না। তিনি বললেন, কে কেমনভাবে ধর্মাচরণ করবে, সে তার নিজস্ব ব্যাপার। তবে, বাপু, হুজুগে পড়ে করোনি তো? সমাজকে ধাক্কা দিলে সমাজ যে প্রতিশোধ নেয় তার ধাক্কা সামলাতে পারবে তো? তখন যেন পেছুপা হয়ো না!

যদুপতি বল[illegible], আজ্ঞে না। আমি সব জেনেশুনেই একাজ করিচি।

বিদ্যাসাগর [illegible]লেন, এখন দিন-কাল অনেক পাল্টেছে, তেমন দুর্বিষহ অবস্থা নাও হতে পারে। তুমি খুব একটা [illegible] কিছু করো নি। রামতনু লাহিড়ী মশায়ের নাম শুনেছো?

—আজ্ঞে সেই শিক্ষাব্রতী মহাত্মার নাম কে না শুনেচে!

—আজ থেকে বোধ করি বছর দশেক আগে ঐ রামতনু লাহিড়ীও উপবীত ত্যাগ করেছিলেন। তখন তোমরা নিতান্ত বালক, তাই সে ঘটনা তোমরা জানো না। কী কোন্দলই না শুরু হয়েছিল সেই উপলক্ষে। রামতনুর কৃষ্ণনগরের বাড়িতে তো ধোপা-নাপিত বন্ধ হলোই, তিনি উত্তরপাড়ায় চলে

এলেন শিক্ষকতা নিয়ে। সেখানেও অত্যাচারের শেষ নেই।কোনো লোক তাঁর বাড়িতে কাজ করে না। দোকানদার তাঁর কাছে চাল-ডাল পর্যন্ত বেচে না। মহা-দুর্দৈব। রামতনু পৈতে ত্যাগ করে মহৎ কাজ করেছিলেন কিনা সে প্রশ্নে আমি যাই না। কিন্তু বন্ধু মানুষ বিপদে পড়েছেন। তাই আমি কলকাতা থেকে নৌকায় তার জন্য চাল-ডাল পাঠিয়ে দিতুম। রাঁধুনী বামুনও পাঠিয়েছি। সে ব্যেটা দুদিন কাজ করার পরই স্থানীয় লোকের তাড়নায় ভেগে যায়। আমি আবার পাঠাই। এইভাবে মোট পাঁচটি রাঁধুনী বামুন পাঠিয়েছিলুম। তবে নাপিত পাঠাতে পারিনি।সেই কারণে কিছু দিন লাহিড়ী মশায় লম্বা দাড়ি রেখেছিলেন।

বিদ্যাসাগর সেই দৃশ্য যেন চোখের সামনে দেখতে পেয়ে হা-হা করে হেসে উঠলেন। একটু থেমে আবার বললেন, ইদানীং আর তেমন উৎপাত নেই। তোমার বিশেষ বিপদের কারণ দেখি না। লোকে অবশ্য পশ্চাতে গালি দেবে ঠিকই, গালি না দিলে যে এদেশের লোকের পেটের ভাত হজম হয় না।

নবীনকুমারের সঙ্গেও দেখা হলো যদুপতির। নবীনকুমার সব শুনে বললো, তা করোচো বেশ করোচো! আমার ওপর টেক্কা দিলে হে। আমার তো পৈতে নেই যে তোমার মতন সেটি ত্যাগ করে দশজনের বাহবা নেবো! তা একটা কথা জিগ্যেস কচ্চি, পৈতে খুলে ফেল্লে বেশ কত্তা, কিন্তু সিটিকে আবার ঘটা করে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে গেলে কেন? তার মানে গঙ্গাজল যে পবিত্র তা মানো! আর একথাও মানো যে পৈতে জিনিসটা খুলে ফেল্লেও যেখেনে সেখেনে সেই জিনিসটে ফেলা যায় না, গঙ্গায় বিসর্জন দিতে হয়।

একটু অপ্রস্তুত হলো যদুপতি। তারপর আমতা আমতা করে বললো, তা নয়, তা নয়। আমি পৈতে পায়খানার মধ্যেও ফেলে দিতে পাত্তুম। কিন্তু রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো, সব্বাই দেখলে, এই প্রচারই তো দরকার। যত প্রচার হবে, ততই লোকে সাহস করে এগিয়ে আসবে।

নবীনকুমার হাসতে হাসতে বললো, তা যা বলোচো। এ রকম একটা দুঃসাহসিক কাজ কি ঘরের মধ্যে চুপেচাপে সারা উচিত? দশজনের বাহবা না পেলে মন ভরবে কেন!

শুধু বাহবা পাওয়া নয়। যদুপতির উপবীত ত্যাগের মূলে যে একটি অন্য উদ্দেশ্যও আছে। সে কথা নবীনকুমার টের পেল কয়েকদিন পরে।

রাত্রে শয়নকক্ষের দরজা এঁটে দিয়েই সরোজিনী দৌড়ে তার স্বামীর পালঙ্কের কাছে এসে এক দারুণ সংবাদ জানাবার ভঙ্গিতে বললো, আপনি ঠিকই বলিচিলেন, আপনার কতাই মিলে গেল।

নিদ্রার আগে কিছুক্ষণ সেজবাতির আলোকে পুস্তক পাঠ নবীনকুমারের অভ্যাস। তবে বড্ড পোকার উৎপাত হয়। আর মশার ঝাঁক তো আছেই। একে গ্রীষ্মকাল, তায় কদিন ধরে নিদারুণ গুমোট চলছে। দুজন পাঙ্খা-বরদার পালা করে সারা রাত্রি জেগে বাইরে বসে এ-ঘরের পাখার দড়ি টানে। তাতেও মশা যায় না। ইদানীং সাহেবদের বাড়ির অনুকরণে নবীনকুমার তার শয়নকক্ষের জানলাগুলিতে মশারির মতন সূক্ষ্ম তারের জাল লাগিয়েছে। তবু যে কোথা থেকে ঢুকে পড়ে মশা, তার ঠিক নেই।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েচে? কোন কতা মিললো আমার?

সরোজিনীর ওষ্ঠাধর পানের রসে লাল। রাতের জন্য অতি সূক্ষ্ম নীলরঙের তাঁতের শাড়ি পরে এসেছে। পালঙ্কের ওপর উঠে বসে সে তার মাথার চুল খুলতে খুলতে বললো, ঐ যে আপনি বলিচিলেন না কুসোমদিদির আবার বে'র কতা? ছি, ছি, কী ঘেন্না, এক পরপুরুষের সঙ্গে ঐ বেধবা মেয়েমানুষ আবার শোবে!

নবীনকুমার তাড়াতাড়ি উঠে বসে জিজ্ঞেস করলো, তোমায় কে বল্লে এ কতা?

সরোজিনী বললো, হ্যাঁ গো, আমি তো আজই শুনিচি, আপনি বিশ্বেস কচ্চেন না? আমার মা তো শুনেই কাঁদতে বসলেন। মা বললেন, ওরে বাবা, কী হবে। আমাদের পাশের বাড়িতে এত অনাচার...হতভাগিনী কুসোমের পরকাল বলে কিচু রইলো না।

নবীনকুমার এক ধমক দিয়ে বললো, তোমার মা কী বল্লেন, তা আমি শুনতে চাই না। ও-বাড়িতে তুমি কী শুনেচো তা বলো।

কথাটা আসলে সত্যি। কুসুমকুমারীর দাদাদের উদ্যোগ সার্থক হয়েচে। রামতনু লাহিড়ী কালীঘাটের নিকটবর্তী রসাপাগলা গ্রামে শিক্ষকতা করতে এসেছেন সম্প্রতি। কুসুমকুমারীর দাদারা গিয়ে ধরে তাঁকে। তিনি প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন কৃষ্ণনাথ রায়ের কাছে। কুসুমকুমারীর পিতা কৃষ্ণনাথ রামতনুবাবুকে খুবই মান্য করেন। সুতরাং তিনি এককথায় উড়িয়ে দিলেন না, বিষয়টি নিয়ে

আলাপ-আলোচনা করলেন কিছুক্ষণ। কৃষ্ণনাথ বৈষয়িক ও ঐতিহ্যবিশ্বাসী পুরুষ। কিন্তু গোঁড়া নন, যুক্তিবাদী। সব কথা শুনে তিনি বললেন, আপনার কতা আমি অস্বীকার কত্তে পারি না। কুসুম আমার প্রাণাধিক, সে জীবনে সুখী হয় আমি সর্বান্তঃকরণে চাই। ভুল করে তার বিবাহ দিয়েছিলুম এক পাগলের সঙ্গে—এখন এই প্রকার বিবাহ যদি শাস্ত্রসম্মত হয়, তবে তাই হোক। আপনি সুপাত্র দেকুন। আর হ্যাঁ, আর একটা কতা আচে, তার জননীর মত করাতে হবে, তিনি বেঁকে বসলে সেখেনে আমি জোর খাটাতে পারবো না।

কুসুমকুমারীর জননী পুণ্যপ্রভার ওপর জোর খাটাতে হলো না। নৃপেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ভাইরা জননীকে ঘিরে বসে বললো, মা, তোমার মত কত্তেই হবে, বাবা মশায় যখন হ্যাঁ বলেচেন—। পুণ্যপ্রভা অশ্রু বিসর্জন করে বললেন, ওরে, অবলা বেধবা নারীদের যখন বিদ্যেসাগর বে দিয়েচেন তখন আমি মনে মনে দু হাত তুলে বিদ্যেসাগরকে আশীর্বাদ করিচি। এখন নিজের মেয়ের বেলায় কি আমি অমত কত্তে পারি। সে পাগোলের কতা ভেবে বাছা যে এখনো শিউড়ে শিউড়ে ওটে।

এখন চতুর্দিকে কুসুমকুমারীর জন্য পাত্রের অনুসন্ধান চলেছে।

কয়েকদিন মহাভারত অনুবাদের কাজে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ায় নবীনকুমার এ সব কিছুই জানতো না। সে সরোজিনীর চিবুক ছুঁয়ে আদর করে আনন্দের সঙ্গে বললো, সরোজ, তুমি আজ একটা বড্ড ভালো খপর শোনালে! তোমার কুসোমদিদির একটা বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা কত্তে হবে।

সরোজিনী বললো, ওমা, কুসোমদিদির বিয়ের ব্যবস্থা আপনি করবেন কেন, সে তো অন্য বাড়ির মেয়ে! আমার মা বলেচেন,ও বিয়ে যদি হয়ও আমরা কেউ নেমুন্তন্ন খেতে যাবো না। আপনার পায়ে ধচ্চি, আপনিও যাবেন না। ঐ পাপের সঙ্গে আপনি নাম জড়াবেন না।

—সরোজ, এ রকম কতা আর দ্বিতীয়বার বলো না আমার সামনে! তোমায় কতবার বুঝিয়িচি যে বিধবার বিয়ে পাপ নয়? বিধবার যদি আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে হয়, তবে সে আর পরপুরুষ থাকে না। সেও ঐ বিধবার ধর্মপতি! তোমার কুসুমদিদি সারাজীবন এ দুঃখ পাক, তুমি তাই চাও!

নবীনকুমারের কণ্ঠস্বরে উষ্মার পরিচয় পেয়ে সরোজিনী তাড়াতাড়ি বললো, না, না, তা আমি চাই না। আপনি যখুন বলচেন, তখন পাপ নয়!

—অনেক পণ্ডিতলোক বিধবা বিবাহ করেচেন, তারা স্বামী-স্ত্রীতে সুখে আচে!

—কুসোমদিদির সঙ্গে বুঝি কোনো পণ্ডিতের বে হবে? তাই হেমু বলছেল।

—পণ্ডিত মানে কি তুমি টুলো পণ্ডিত ভেবেচো? তা কেন? তোমার কুসুমদিদির জন্য আমরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রূপবান পাত্র জোগাড় করবো। বুঝলে না, বাগবাজারের রায় বাড়ির মেয়ে, অত বড় বংশের কোনো বিধবা মেয়ের এ পর্যন্ত বিয়ে হয়নি। সেইজন্যই তো আমার এত উৎসাহ। এতদিনে বিদ্যেসাগর মশায়ের সত্যিকারের জয় হবে। দাঁড়াও, কাল থেকেই আমি পাত্রের সন্ধানে লেগে পড়ছি!

—শুনুন, হেমু বললো, আপনার এক বন্ধু, ঐ যে যদুপতি গাঙ্গুলী না কে, যে নাকি পৈতে পুড়িয়ে চাঁড়াল হয়েচে, সে কুসোমদিদিকে বে কত্তে চায়!

—অ্যাঁ?

—ঐ যদুপতি না ফদুপতি লোকটা তো নেপেনদাদার ছেলেদের পড়ায়। ও বাড়িতে যায়। কী জানি কখুনো কুসোমদিদিকে দেখে ফেলেচে কি না!

নবীনকুমার আপন মনে হেসে উঠলো।

সরোজিনী উৎকণ্ঠিতভাবে বললো, আপনি হাসচেন? মা বলছেল, কুসোমদিদির এমন ধিঙ্গিপনা করা বড়ই দোষের কতা! থ্যাটারের মহড়ার সময় বসে থাকে—

—আবার ঐ রকম কতা?

—মা বলছেল যে!

—তোমার মাকে বলবে, ঐ রকম কতা শুনলে আমার হাড়পিত্তি জ্বলে যায়! বুঝলে? ফের যদি তুমি তোতাপাখির মতন তোমার মায়ের কতা আমায় শোনাও, তোমায় খাঁচায় আটকে রাখবো!

—আর বলবেন না, আপনি রাগ কর্বেন না!

—যদুপতির মনে তা হলে এই ছেল! হা-হা-হা-হা—

পরদিন যদুপতি নিজেই এসে উপস্থিত। মুখখানি ম্লান, বিষণ্ণ। তাকে দেখেই সরোজিনীর কথার

সত্যতা বুঝতে পারলো নবীনকুমার।

যদুপতি অন্য লোক মারফত কুসুমকুমারীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা নৃপেন্দ্রনাথের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। নৃপেন্দ্রনাথ রাজি হন নি, ব্রাহ্মণের সঙ্গে কায়স্থ বিধবার বিবাহ, এতখানি বৈপ্লবিক কাজ করতে তাঁর পিতাও সম্মত হবেন না! মাঝখান থেকে যদুপতির লাভের মধ্যে হয়েছে এই যে রায়বাড়িতে তার ছেলে পড়াবার চাকুরিটিও গেছে। বিবাহের উমেদারকে আর গৃহশিক্ষক হিসেবে রাখা যায় না।

নবীনকুমারের কাছে খোলাখুলি সব কথা স্বীকার করে যদুপতি বললো, ভাই, এ যে মহাজ্বালা। উপবীত ত্যাগ করলুম, তাও আমায় বলে ব্রাহ্মণ? আর কিসে ব্রাহ্মণত্ব ঘোচাতে পারি বলো তো!

নবীনকুমার বললো, তা হলে এই জন্যেই ঢাক ঢোল পিটিয়ে পৈতে ফেলে দিয়েচিলে?

যদুপতি নবীনকুমারের হাত চেপে ধরে বললো, বিশ্বাস করো, আমার কোনো অশুচি মতলোব নেই। কন্যাটিকে আমি একবারও চক্ষে দেখিনি। আমি যে বালক দুটিকে পড়াতুম তারাই অনেক গল্প করেচে ঐ মেয়েটির গুণপনার। তাই শুনে আমি মুগ্ধ হয়িচি!

নবীনকুমার বললো, তাকে চক্ষে দেখলে তুমি বুঝি তা হলে মুচ্ছো যেতে! সে মেয়েটি সাক্ষাৎ সরস্বতী ঠাকরুণটি যেন.।

যদুপতি বললো, আমি মরে গেলেও কোনো বামুনের মেয়েকে বিবাহ করবো না! আমি যে প্রকৃতই জাত মানি না, তার প্রমাণ দিতে চাই। সেই জন্যই তো আমার এত আগ্রহ এই কন্যাটি সম্পর্কে! ভাই, তুমি একটু চেষ্টা করে দেকবে। তোমার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে ওঁদের কুটুম্বিতে আচে—

নবীনকুমার বললো, আচ্ছা দেকি!

নবীনকুমার অবশ্য আগেই জানে যে ওখানে যদুপতির কোনো আশা নেই। ব্রাহ্মণ-কায়স্থের তফাত তো কৃষ্ণনাথ রায়ের বাড়িতে একটা বড় ব্যাপার বটেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় ব্যাপার আছে, সেটা যদুপতি বুঝবে না। যদুপতির কোনো বংশ মর্যাদা নেই। সে সাধারণ গ্রাম্য পরিবারের সন্তান। বিদ্যাশিক্ষা করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। বনেদী রায় পরিবারের সঙ্গে এমন পাত্রের বিবাহ সম্পর্ক হয় না। ওঁরা নিশ্চয়ই চাইবেন নিজেদের সমান সমান কোনো বাড়ির সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে।

যদুপতি তো খারিজ হয়ে গেলই, কুসুমকুমারীর জন্য আর যে চার পাঁচজন পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেল, তাদের কারুকেই মনঃপূত হলো না নৃপেন্দ্রনাথ এবং তাঁর অন্যান্য ভাইদের। একবার ভুল বিবাহ হয়েছিল, দ্বিতীয়বার তাঁরা অতি সতর্ক হয়ে সম্বন্ধ পাকা করতে চান। রূপে ও স্বভাবে অনিন্দিতা কুসুমকুমারীকে তো আর যার তার হাতে দেওয়া যায় না। তার চেয়ে কুসুমকুমারীর বৈধব্য দশাও ভালো। বাপের বাড়িতে তার যত্নের কোনো অভাব নেই।

নবীনকুমারও অনেক চেষ্টা করে কুসুমকুমারীর যোগ্য পাত্র সংগ্রহ করতে পারলো না। পরিচিতদের মধ্যে সে রকম কেউ নেই। কোথাও কোনো বিবাহযোগ্য উপযুক্ত যুবকের সন্ধান পেলে সে নিজেই উদ্যোগ নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যায়। যেন সে নিজেই কন্যাকর্তা। এদিকে ক্রমশ সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। এরপর যদি কুসুমকুমারীর বিয়ের কথাটা চাপা পড়েই যায়! বয়েসেরও তো একটা ব্যাপার আছে। বেশি দিন ধৈর্য ধরে থাকা নবীনকুমারের ধাতে নেই, কুসুমকুমারীর বিবাহ সঙ্ঘটিত না হওয়া পর্যন্ত নবীনকুমারের শান্তি নেই।

তারপর একদিন যেন তার দিব্য দর্শন হলো। মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে শয্যার ওপর উঠে বসে সে ভাবলো, আশ্চর্য,এমন সহজ কথাটাই তার মনে পড়েনি! কুসুমকুমারীর জন্য সুযোগ্যতম পাত্র আর কে হতে পারে? দু-একদিনের মধ্যেই এবার ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে, এই ভেবে সে ঘুমিয়ে পড়লো আবার।
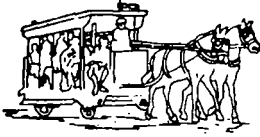
সকালের দিকে বিদ্যাসাগরের বাড়ির লাইব্রেরি কক্ষে যথেষ্ট লোক সমাগম হয়। অনেকেই আসে কিছু সাহায্যের আশায়। ইতিমধ্যেই চারিদিকে রটে গেছে যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে বিপদের কথা জানিয়ে কেঁদে পড়তে পারলেই তিনি কিছু না কিছু সাহায্য করবেনই। এমনকি তিনি অনেকের জন্য সারা জীবন মাসিক সাহায্য বরাদ্দ করে দেন। এ ব্যাপারে তাঁর শত্রু-মিত্র ভেদ নেই। কলকাতায় মস্ত মস্ত ধনী আছে অনেক, কিন্তু তাদের কারুর কাছেই গিয়ে এরকম নিঃসঙ্কোচে হাত পাতা যায় না।

এক সময় নবীনকুমার সিংহ এসে সেই ভিড়ের মধ্যে এক পাশে আসন গ্রহণ করলো। বিদ্যাসাগর একটু বিস্মিত হয়ে তাকালেন তার দিকে। তিনি প্রায়ই বরাহনগরে নবীনকুমারের সারস্বতাশ্রমে যান মহাভারত অনুবাদের কাজ পরিদর্শনের জন্য, কখনো কোনো বিশেষ প্রয়োজন ঘটলে নবীনকুমার তাঁর কাছে লোক পাঠায়। অর্থাৎ নবীনকুমারের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ আছে। আজ এত সকালে নবীনকুমার যখন বিনা এত্তেলায় হাজির হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর কারণ ঘটেছে।

তিনি ভুরু উত্তোলন করে প্রশ্ন করলেন, কী খবর হে, নবীন?

নবীনকুমার বললো, আপনি আগে অন্যদের সঙ্গে কতা শেষ করুন, আমি অপেক্ষা করছি।

লাইব্রেরি কক্ষটিতে কাঠের তাকে তাকে মূল্যবান গ্রন্থরাজি সুন্দরভাবে সাজানো। বইয়ের প্রতি যেমন যত্ন, তেমনই বই সংগ্রহের জন্য অর্থব্যয়েও কোনো কার্পণ্য নেই বিদ্যাসাগরের। অধিকাংশ বই-ই মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো। একবার কে-যেন বলেছিল, আপনি বই-বাঁধাই-এর জন্য এত খরচ করেন কেন, এটা কি অপব্যয় নয়? উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, তুমি বাপু পাঁচশো টাকা দামের শাল গায়ে দাও কেন? আমার তো পাঁচ সিকে দামের চাদরেই কাজ চলে যায়।

কক্ষের উত্তর দিকের দেওয়ালে এক রমণীর তৈলচিত্র টাঙ্গানো আছে। ছবিটি বিদ্যাসাগরের জননী ভগবতী দেবীর। ছবিটি নবীনকুমার আগেও কয়েকবার দেখেছে, আজ তার মনোযোগ যেন সেদিকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলো। কী নিরাভরণ সরল মূর্তি। ভগবতী দেবী গৌরবর্ণা, পরনে শুধু একটি অতি শস্তা কস্তা ডুরে শাড়ি, আর অলঙ্কারের মধ্যে হাতে শুধু শাঁখা। ঈষৎ লজ্জামিশ্রিত মুখখানি দেখলেই বোঝা যায়, এই রমণী কত মমতাময়ী। মাতৃমূর্তি দেখলেই নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে। নবীনকুমারেরও মনে পড়লো গত দু' মাসের মধ্যে বিম্ববতীর কাছ থেকে কোনো সংবাদ আসেনি। যদিও বিম্ববতী আর কোনোদিন ফিরবেন না বলে গেছেন, তবু এবার একবার তাঁকে হরিদ্বার থেকে আনাবার চেষ্টা করতেই হবে। নবীনকুমারের জননীর এমন কোনো ছবি নেই।

অন্য লোকজনদের বিদায় দিয়ে বিদ্যাসাগর নবীনকুমারের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

নবীনকুমার বললো, আপনার মায়ের এই চিত্রটি আগেও দেকেচি তবে আজ যেন বেশী করে চোখ টানলো। ইটি কার তৈরি? কোনো সাহেব ছাড়া তো এমন মনোহর চিত্র আঁকতে পারে না!

বিদ্যাসাগর বললেন, তুমি ঠিকই ধরেছো। হডসন সাহেবের নাম শুনেছো? তিনিই এই ছবি বানিয়েছেন।

নবীনকুমার বললো, ঠিক বুজলুম না। না দেকে কি এমন পোর্ট্রেইট আঁকা যায়? একজন সাহেব আপনার মায়ের ছবি আঁকলেন কী ভাবে?

—না দেখে আর আঁকবে কেমন করে? সাহেব দেখেই এঁকেছেন।

—সাহেব আপনাদের গ্রামের বাড়িতে গেসলেন?

—না, আমার মা তখন এখানে। পাইকপাড়ার রাজারা হডসন সাহেবকে আনিয়েছিলেন। আমি সেখানে যাতায়াত করি, তা একদিন সাহেব ধরে বসলে আমার একটা চিত্র-মূর্তি গড়াবে। আমি না না করি, তো সে সাহেব কিছুতেই সে কথা কানে তোলে না। নাছোড়বান্দা হয়ে শেষ পর্যন্ত আমায় রাজী করিয়ে ছাড়লে। তারপর ভালো করে গিল্টি ফ্রেমে বাঁধিয়ে সেখানা আমায় উপঢৌকন দিলে, কিছুতেই

দাম লবে না। বলে কি-না বিধবা বিবাহের পক্ষে আমি যা লিখেছি তার ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করে সাহেব খুব খুশী হয়েছে। ঐ চিত্র তার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন। তখন আমি মনে করলুম, তবে আমার জননীরও একটা চিত্র গড়িয়ে নিই না কেন ?

—আপনার মা রাজী হলেন ?

—আমার মায়ের সব কিছুই আমার উপর বরাৎ ! তিনি বললেন, নিন্দা হলে লোকে তো আমার নিন্দা করবে না, তোরই নিন্দা করবে। আমি বললুম, বেশ তাই। আমার কপালে তো নিন্দা কম জোটে নি, অধিকন্তু আর কী হবে ! মাকে নিয়ে গেলেম সাহেবের বাড়ি !

—আপনি....হিন্দু ঘরের সধবাকে....সাহেবের বাড়ি নিয়ে গেলেন ?

—সাহেবের বাড়িতে সব জিনিসের জোগাড় আছে, সে আড্ডা ভেঙে এখানে আনতে গেলে ছবি ভালো হয় না। আমি সাহেবসুবোদের বাড়ি যেতে পারি, আমার জননী গেলেই বা দোষ কী ?

—দোষের কতা নয়, আমি ভাবচি সাহসের কতা।

—এবার বলো, তোমার কি সংবাদ !

—অ্যাঁ...ইয়ে—আজ্ঞে, আমাদের গৃহে একদিন কবিবর মাইকেল মধুসূদনকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলুম, আপনি এলেন নাকো সেদিন। লোকমুখে শুনতে পেলুম, আপনি মেঘনাদবধ কাব্যখানা তেমন পছন্দ করেননি।

—তোমরা পছন্দ করেছো তো, তাতেই যথেষ্ট। কাব্যরুচি যার যা নিজস্ব। আমার ভালো লাগে ভারতচন্দ্র, ঐ রকম দিশী মতের বাংলাভাষা পড়ে আমি আনন্দ পাই। তোমরা যদি কাব্যে বিলিতি বাংলা চালাতে চাও তো চলুক !

—মাইকেলের কাব্যে আপনি বিলিতি বাংলা কী দেকলেন ? সবই তো সংস্কৃত ভাঙা শব্দ।

—তুমি কি এই সাত সকালে আমার সঙ্গে কাব্য-আলোচনা করতে এসেছো ? আমার তো হাতে এখন সময় নেই, বাপু। একবার প্রেসে যেতে হবে। আমি কালিদাসের কুমারসম্ভব সম্পাদনা করে ছাপাচ্ছি, সেই কাজ আছে।

—আমি আপনাকে একটা সুখবর দিতে এয়েচি।

—বটে ? শুনি, শুনি, আজকাল সুখবরের বড় আকাল পড়েছে।

—আপনি বাগবাজারের কৃষ্ণনাথ রায়ের নাম শুনেচেন নিশ্চয়ই।

—তিনি একজন বুনিয়াদী ধনী। এইটুকু মাত্র জানি।

—ধনী তো বটেই। ত্রিপুরার রাজ-সরকারের দেওয়ান, হিন্দুসমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি। তাঁর এক কন্যা সদ্য বিধবা হয়েচে। তিনি সেই কন্যাটির আবার বিবাহ দেওয়ায় রাজি হয়েচেন। বিধবা বিবাহ এদানি খুব কমে গেচে বলে আপনি মনঃকষ্ট পাচ্চিলেন। এই বিবাহটি হলে আবার খুব জোর একটা সাড়া পড়ে যাবে। এ রকম বড় বংশে বিধবা বিবাহ একটিও হয়নি। দেশের লোক আবার ভরোসা পাবে।

—যদি হয় তবে তো সুখবর ঠিকই।

—নিশ্চয় হবে ! কন্যাটি যেন রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। তার যোগ্য পাত্র পাওয়া যাচ্চে না বলে বিয়েটা আটকে রয়েচে। যদুপতি গাঙ্গুলী পৈতে ত্যাগ করেচে আপনি জানেন বোধ করি, সে ঐ কন্যাটিকে বিবাহ করতে চায়। কিন্তু কন্যাপক্ষ তাতে রাজি নয়। পৈতে না থাকলেও যদুপতি বামুনের ছেলে। তায় আবার ব্রাহ্ম। ওঁরা অতটা বাড়াবাড়ি করতে চান না।

—যদুপতির অমন প্রস্তাব দেওয়া উচিত হয় নি। বিধবা বিবাহের নামেই এত বাধা। তার ওপর যদি বর্ণাশ্রম ভাঙ্গতে যাওয়া হয়, তা হলে একেবারে ধুন্ধুমার কাণ্ড লেগে যাবে।

—শেষ পর্যন্ত কন্যাটির জন্য আমি একটি পাত্র ঠিক করিচি, তাই আপনার অনুমতি নিতে এলুম।

—পাত্রটি কে ?

—আজ্ঞে, আমি !

—তুমি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কন্যাটি আমার স্বর্গতা পত্নীর সখী ছিল। বাল্যকাল থেকেই ওকে আমি দেকচি। ওদের সঙ্গে আমাদের পালটি ঘর। সব দিক থেকেই এ বিবাহ মানানসই হবে।

বিদ্যাসাগর যেন কিছুতেই কথাটা বিশ্বাস করতে পারলেন না। সুবিখ্যাত সিংহ পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী নবীনকুমার সিংহ করবে বিধবা বিবাহ? রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ এটা মেনে নেবে? বিধবা বিবাহের পক্ষে এত বড় জয় যে কল্পনাই করা যায় না। এ রকম একটি বিবাহ সত্যিই সঙ্ঘটিত হলে তার প্রচার হবে সমস্ত ভারতবর্ষে।

তিনি বললেন, তুমি···তুমি পারবে? তোমার পরিবার, আত্মীয়স্বজন···রাধাকান্ত দেবের সঙ্গেও তোমাদের কী রকম আত্মীয়তা আছে শুনেছি···।

নবীনকুমার দৃঢ়কণ্ঠে বললো, আপনি যদি আশীর্বাদ করেন, আমি কোনো বাধাই গ্রাহ্য করি না। আমি মনে মনে বহুকাল যাবৎ আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আচি, আমি সর্বদা আপনার প্রদর্শিত পথে চলতে চাই!

এরপর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগর। এই চঞ্চল যুবকটি বারবার তাঁকে বিস্মিত করছে। এত ধনী পরিবারের এই বয়েসের সন্তানরা তো আর কেউ এ রকম নয়। এর চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনা সবই যেন দেশের মঙ্গলের জন্য! প্রেসের কাজ ভুলে গিয়ে তিনি অনেকক্ষণ কথা বললেন নবীনকুমারের সঙ্গে।

দারুণ উৎফুল্ল হয়ে বাড়ি ফিরে এলো নবীনকুমার। বিদ্যাসাগরকে খুশী করতে পেরেছে। এতেই তার বেশী আনন্দ। ভাগ্যিস ঠিক সময় কথাটা মনে পড়েছিল। কুসুমকুমারীর জন্য অন্য পাত্র খোঁজার কোনো মানে হয়? কুসুমকুমারীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি এবং নীলবর্ণ চক্ষু দুটি বারবার তার মনে আসে। সেই কুসুমকুমারীকে সে নিজেই পরের ঘরণী করতে পাঠাচ্ছিল? এমন আহামুক্কি কেউ করে? কুসুমকুমারী শুধু তার হবে, সে আর কারুর হতে পারে না।

নবীনকুমার অবশ্য এখনো এ প্রস্তাব আর কারুকে জানায়নি। সে যেন ধরেই নিয়েছে এ বিষয়ে কারুর কোনো আপত্তির প্রশ্নই উঠতে পারে না। এমন কি কুসুমকুমারীর পিতার বা অন্যান্যদের মতামত নেবার যে প্রয়োজন আছে, তাও সে ভাবলো না। সে, নবীনকুমার সিংহ, ধনে-মানে-গুণে এই সমাজের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত। তার যোগ্যতা সম্পর্কে কে প্রশ্ন করবে? সে প্রস্তাবটি জানানো মাত্র সকলেই নির্বাক হয়ে যাবে! এই বিবাহে এমন জাঁকজমক করবে নবীনকুমার, যে রকমটি কলকাতার মানুষ বহুদিন দেখেনি।

স্নান-আহারাদি সেরে সে বরাহনগরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। আজ রাতটি সে শ্বশুরালয়ে কাটাবে। রাত্রেই সরোজিনীকে সুসংবাদ দিয়ে আগামীকাল সকালে কৃষ্ণনাথ রায়ের সঙ্গে দেখা করবে। অথবা, সে কি নিজেই যাবে না কোনো লোক মারফৎ আগে খবরটি জানাবে? প্রথমে দূত পাঠানোই বুঝি শ্রেয়।

শয়নকক্ষের বিশাল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নবীনকুমার নিজেকে দেখতে পেল না। দেখলো কুসুমকুমারীকে। আবেগকম্পিত কণ্ঠে সে বললো, বন-জ্যোৎস্না, তুমি আমার হবে! আমি সহকার তরু, তুমি মাধবীলতা। আমি সরোবর, তুমি আমার বক্ষে পঙ্কজিনী হয়ে ফুটে থাকবে।

সেদিন অপরাহ্নেই যদুপতি গাঙ্গুলী চলে এলো বরাহনগরে। খুব ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে বললো, ভাই, তোমাকে বিদ্যাসাগর মশাই আজই একবার ডেকে পাঠিয়েছেন। যথাসম্ভব শীঘ্র গেলে ভালো হয়।

নবীনকুমার বললো, কী ব্যাপার?

যদুপতি বললো, তা তো জানি না। তবে উনি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েচেন মনে হলো। তুমি বিদ্যাসাগর মশাইকে আমার নামে কী বলেচো? হঠাৎ আমাকে একচোট বকাঝকা কল্লেন।

শ্বশুরবাড়ি আর যাওয়া হলো না। নবীনকুমার তখনই চলে এলো বাদুড়বাগানে। সদ্য সন্ধ্যা হয়েচে। বিদ্যাসাগর নিজের কক্ষে একলা রয়েছেন, মুখখানি থমথমে। যদুপতিকে সঙ্গে নিয়ে নবীনকুমার প্রবেশ করতেই তিনি বললেন, যেদো, তুই বাইরে যা, নবীনের সঙ্গে আমার সবিশেষ কথা আছে। যাবার সময় দরজাটা টেনে দিবি।

দরজাটা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর রাগে একেবারে ফেটে পড়লেন। নবীনকুমারের দিকে অগ্নিবর্ষী নেত্রে চেয়ে তিনি বলতে লাগলেন, তোমার মনে এই ছিল? তুমি আমার সঙ্গেও তঞ্চকতা করতে চাও! তোমাদের বড়মানুষদের রক্তে রয়েছে লাম্পট্য আর ভণ্ডামি! সে তোমরা কখনো ছাড়তে পারবে না জানি, তবু এর সঙ্গে আমার নাম না জড়ালে বুঝি তোমাদের সুখ হয় না? আমি তো তোমায়

সাধ করে কখোনো ডাকি নি, তুমি কেন আস আমার কাছে ?

সারা জীবনেই নবীনকুমারের কখনো ধমক খাবার অভ্যেস নেই। অভিমানে তার ওষ্ঠ কম্পিত হতে লাগলো। অতি কষ্টে সে বললো, আমি···আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্চি না···আপনি আমায় কেন এ সব কতা বলচেন···· ?

—তুমি কিছুই বুঝতে পারো না ? তুমি সেয়ানা দুষ্ট। তুমি অম্লানবদনে আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে যেতে পারো, আর আমার কথা বুঝতে পারো না। তোমাদের অর্থ আছে, লাম্পট্য করতে চাইলে তোমাদের কে বাধা দেবে। যদি বিবেক না বাধা দেয় ! তোমার বিবেক বলে যদি কিছু থাকতো, তবে তুমি আমায় এমন মিথ্যা বুঝ দিয়ে যেতে না ! লাম্পট্য করতে চাও, করো, কিন্তু তার মধ্যে একজন বিধবা কন্যাকে জড়াতেই হবে !

—লাম্পট্য ? মিথ্যে কতা ! বিধবা বিবাহ কত্তে চেয়ে আমি অন্যায় করিচি ? আপনাকে কী মিথ্যে কতা বলিচি ?

—তুমি বলেছো, এই বিধবা কন্যাটি তোমার স্বর্গতা পত্নীর সখী ? কেন এই তঞ্চকতা ? তোমার পত্নী জলজ্যান্ত বর্তমান নেই ? আমারও জানা ছিল সে কথা, কিন্তু তোমার কথার ফেরে পড়ে ভুলে গিয়েছিলুম।

—যে বিধবা কন্যাটির কথা আপনাকে বলিচি, সে সত্যিই আমার স্বর্গতা পত্নীর সখী ছেল। এর মধ্যে মিথ্যে কিছু নেই। তবে আমি আর একটি বিবাহ করিচি বটে, সে কতার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করিনি, কারণ তা সবাই জানে, ভেবিচিলুম, আপনিও জানেন।

—এক পত্নী বর্তমান থাকতেও তুমি একটি বিধবাকে বিবাহ করতে চাও ?

—একাধিক পত্নী রাখা কি শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ না দেশাচার বিরুদ্ধ ?

—বিধবাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে উপপত্নী রাখার বদলে লোকে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য একটি করে বিধবাকে বিয়ে করবে, আমি কি এই উদ্দেশ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে চেয়েছি ? কচি বয়েসের বিধবা মেয়েগুলি যাতে সম্মানের সঙ্গে সংসারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, যোগ্য সহধর্মিণীর পদ পায়, সেই ছিল আমার আশা। তোমার যা খুশী করো গে যাও, আমি তোমার আর মুখ দর্শন করতে চাই না।

—আপনি আমার ওপর অকারণে রাগ কচ্চেন। আমি আপনার সঙ্গে কোনো তঞ্চকতা কত্তে চাইনি। একাধিক বিবাহ যে অন্যায়, সে কতা আমার মনে আসেনি !

—ছি, ছি, ছি, কোনোক্রমে এই বিবাহের সঙ্গে আমার নাম জড়ালে সকলে মনে করতো, আমি বড়মানুষদের লোভ চরিতার্থ করার সুযোগ করে দিয়েছি। তোমার একটি পত্নী রয়েছে, তাকে তুমি বঞ্চনা করবে কোন্ অধিকারে ? এক বিধবার মুক্তির জন্য এক সধবার সর্বনাশের কোন্ যুক্তি ?

—আমি জানি, আমার পত্নী এ বিবাহে আপত্তি কত্তেন না। তিনি এই বিধবা কন্যাটিকে খুব ভালোবাসেন, দুজনে মিলেমিশে থাকতেন !

—তোমাদের মতন বংশের বধূদের আবার আপত্তি সম্মতি কী ? তাদের মতামতের কোনো মূল্য আছে ? তোমরা যা করবে, তাই তাঁরা মেনে নিতে বাধ্য হবেন ! তোমরা যখন উপপত্নী রাখো, বারবনিতা-গমন করো, তখন বাড়ির বউদের আপত্তির কোনো তোয়াক্কা করো ? নাকি সব বউরাই সাগ্রহে সম্মতি দেন ? তোমার সঙ্গে আমি আর কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না ! তোমার ঐ মহাভারত অনুবাদও একটা ভড়ং মাত্র ! নাম কেনার হুজুগ ! আমি সোমপ্রকাশে ছাপিয়ে দেবো যে তোমার কোনো কীর্তির সঙ্গে আমার কোনো সংযোগ রইলো না। তোমার এই বিবাহেও আমি প্রকাশ্যে বিরোধিতা করবো। এখন থেকে আমি বহু বিবাহ নিরোধ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে লাগবো !

নবীনকুমার নতমস্তকে নীরব হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। বিদ্যাসাগর সবেগে পায়চারি করছেন ঘরের মধ্যে। এক একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছেন নবীনকুমারের দিকে।

নবীনকুমার আস্তে আস্তে বললো, আমার স্ত্রীর কোনো সন্তান হয়নি এ পর্যন্ত। যদি সে আমাদের বংশে কোনো উত্তরাধিকারী দিতে না পারে—

বিদ্যাসাগর দু হাতে কান চাপা দিয়ে বললেন, উঃ, এসব কথা শুনলেও গাত্রদাহ হয়। তোমার কত বয়েস, যে এর মধ্যেই নিজেকে অপুত্রক ভাবছো ? তোমার পিতার কত বয়েসের সন্তান তুমি ? তুমি আমায় আর উত্তেজিত করো না। তুমি নিজের পথ দেখো।

নবীনকুমার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার বুকটা বিষম দমে গেছে। আজ সকালেই সে আনন্দ

সাগরে ভাসছিল, এখন এ কী হলো ? দেশের এতগুলি মানুষের মধ্যে সে একমাত্র বিদ্যাসাগর মশাইকেই আঁকড়ে ধরেছিল, তিনিও তাকে দূরে ঠেলে ফেলে দিলেন।

যদুপতি উন্মুখভাবে অপেক্ষা করছিল, সে জিজ্ঞেস করলো, কী হলো ?

উত্তর না দিয়ে নবীনকুমার তীক্ষ্ণভাবে তাকালো যদুপতির দিকে। যদুপতির ঠোঁটে যেন বিদ্রূপের হাস্য লেগে আছে! সে নিশ্চয়ই সব জানে। সে কুসুমকুমারীকে বিবাহ করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে, তাই সে চায় নবীনকুমারও যেন তাকে না পায়। সেই তা হলে বিদ্যাসাগরের কানে এই সব কথা তুলেছে।

নবীনকুমার আবার ফিরে এলো কক্ষের মধ্যে। বিদ্যাসাগর পিছনে ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন, সে তাঁর কাছে গিয়ে বললো, আপনি আমাকে আর একবার সুযোগ দিন। .

বিদ্যাসাগর মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আবার— ?

—একজন সামান্য নারীর জন্য আমি আপনার কৃপা থেকে বঞ্চিত হতে পারি না কিছুতেই। আমার এই অভিপ্রায়ের কথা আমি আপনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে জানাইনি, আর কেউ জানবেও না।

—তুমি এই বিবাহ করবে না ?

—আমি আপনার কাচে শপথ করে বলতে পারি। এর আগে শপথ করে গেচি, মহাভারতের অনুবাদ বিষয়ে, জীবন থাকতে সে কাজ আমি সম্পূর্ণ করবোই, আজ ফের শপথ করে যাচ্চি, ইহজীবনে আর দার পরিগ্রহের চিন্তা স্বপ্নেও স্থান দেবো না। আপনি একবার আপনার পদস্পর্শ করার অনুমতি দিন!

বিদ্যাসাগরের সারা শরীরে অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠলো, মুখখানা কুঁকড়ে গেল। তিনি বললেন, আঃ, কেন যে তোমরা আমাকে দিয়ে এত কঠিন কথা বলাও···আগে থেকেই যদি···লোকে কুকথার জন্য মুখিয়ে আছে, একটা ছিদ্র পেলেই···তুমি মনে নিশ্চয়ই আঘাত পেয়েছো···আহা থাক, থাক—

বিদ্যাসাগরের চক্ষু দিয়ে জলের ফোঁটা ঝরে পড়তে লাগলো!

এবারেও বেরিয়ে এসে নবীনকুমার যদুপতির প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করে সোজা উঠে গেল জুড়ি গাড়িতে। দুলালকে নির্দেশ দিল, বাড়ির দিকে চ!

কিছুদূর যাবার পরই সে আবার দুলালকে ডেকে বললো, থাক, গাড়ি ফেরাতে বল, আমি বাগবাজারে যাবো।

সেখানেও গেল না নবীনকুমার, খানিকটা যাবার পরই সে আবার মত বদলালো। সে যাবে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে। বেশ রাত হয়েছে, এ সময় গঙ্গার ধার নিরাপদ স্থান নয়। তবু সে আর্মেনিয়ান ঘাটের কাছে এসে গাড়ি থেকে নেমে এলো। সর্বক্ষণের সঙ্গী দুলালচন্দ্রকে সেখানেই অপেক্ষা করতে বলে সে হাঁটতে লাগলো একা। তার মাথার মধ্যে ঝড়, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস সব যেন একসঙ্গে চলছে। মাঝে মাঝে ক্রোধে ওষ্ঠ কামড়ে ধরছে সে। তার নিশ্বাস ছুটন্ত অশ্বের মতন উষ্ণ।

গঙ্গার ধারে ধারে জাহাজ থেমে আছে অনেক। আজকাল অধিকাংশই কলের জাহাজ আসে, সেগুলির চোঙা দিয়ে ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়। বেশ কয়েকটি জাহাজে জ্বলছে সার সার রঙীন লণ্ঠন, সেখান থেকে ভেসে আসছে নেশাগ্রস্ত নাবিকদের হল্লা। তীরেও চলছে নাবিকদের আনাগোনা, কেউ কেউ এক একটি বারবনিতার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে হিড়হিড় করে। এ সময় কোনো ভদ্র নাগরিক এ তল্লাটে আসে না।

নবীনকুমারের সেসব দিকে কোনো খেয়ালই নেই। সে ভাবছে, একটা জাহাজ ক্রয় করে নিরুদ্দেশে ভেসে পড়লে কেমন হয় ? এখুনি, এই মুহূর্তে! সেই জাহাজে আর কেউ থাকবে না, একজন নাবিকও না, শুধু সে একা! পৃথিবীর অজানা প্রান্তে যেসব দ্বীপে এখনও মানুষের পদস্পর্শ ঘটেনি, সেখানে সে একটি কুটির বানাবে।

একটু পরে নবীনকুমার জাহাজঘাট ছেড়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হেঁটে এসে কেল্লার প্রান্তবর্তী গড়খাইয়ের পাশে একটি গাছের নিচে দাঁড়ালো। তারপর সম্পূর্ণ অকারণে সে লাফিয়ে লাফিয়ে ধরার চেষ্টা করতে লাগলো সেই গাছের একটি ডাল। সে ডালটি তার নাগাল পাবার কথা নয়, তবু সে চেষ্টা করে যেতে লাগলো, এক-আধবার নয়, অন্তত পঞ্চাশবার।

গাড়ির কাছে ফিরে এসে সে দুলালকে বললো, ভবানীপুর!

দুলাল সভয়ে বললো, ছোটবাবু, অনেক রাত হলো, বাড়ি যাবেন না ?

নবীনকুমার দুলালের দিকে এমন ভাবে চাইলো যেন তাকে ভস্ম করে ফেলবে।

হিন্দু পেট্রিয়ট অফিসে হরিশ মুখুজ্যের খোঁজ করে পাওয়া গেল না। কার্যালয় তখন বন্ধ হয়ে

গেছে। নবীনকুমার তখন চলে এলো জানবাজারে মুলুকচাঁদের আখড়ায়। সেখানে হরিশ রয়েছেন। বিরাট আসর বসেছে, এক দঙ্গল অচেনা লোকের সঙ্গে হরিশ প্রায় নেশায় উন্মত্ত। নবীনকুমারকে দেখে সকলে রই রই করে উঠলো, টলতে টলতে উঠে এসে হরিশ আলিঙ্গন করলেন তাকে। হাতের ব্র্যাণ্ডির বোতলটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী, চলবে ?

নবীনকুমার হাত বাড়িয়ে বোতলটি গ্রহণ করে ওষ্ঠে ছোঁয়ালো।

হরিশ বললেন, কী বেরাদর, ফিরে এলে যে ? বিদ্যেসাগরের চ্যালা হয়ে তো ভিজে বেড়ালটি সেজেচিলে ? আর্ট-কালচার দিয়ে দেশোদ্ধার কর্বে ! এসব গর্হিত নেশা তো তোমাদের করার কতা নয় ?

ব্র্যাণ্ডির বোতলে একটা বেশ বড় চুমুক দিয়ে এবং অনেকদিন অনভ্যাসের ফলে দু-একবার বিষম খেয়ে সামলে নিয়ে নবীনকুমার বললো, আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাচে দুটি ব্যাপারে শপথ করিচি, আমার প্রাণ দিয়েও তা আমি রক্ষা কর্বো। আর সব ব্যাপারে আমি মুক্ত।

নিয়তি ঠাকুরাণী বড়ই কৌতুকপরায়ণা। প্রকৃতির রাজ্যে যে-সব নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে, মাঝে মধ্যে তার কিছু কিছু ভণ্ডুল করে দিতেই তাঁর বেশী আমোদ। প্রকৃতির পাখিরা মুক্ত আকাশে স্বাধীনভাবে উড়ে যায়, আবার নিয়তির পাকচক্রে তাদের মধ্যেই দু' দশটি পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়। নিয়তির কৌতুকে আজ যে রাজা কাল সে ফকির, আবার ঘুঁটে-কুড়ানীর পুত্রও অর্ধেক রাজত্ব সমেত রাজকন্যা পায়। পথের ঝাঁকা-মুটে কঠোর পরিশ্রম করেও পরিবারের জন্য দু বেলার গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে পারে না, অথচ ধনীর দুলাল, যে সারাদিন নিজের হাতে কুটোটিও নাড়ে না, সে নানাবিধ অত্যুত্তম খাদ্য সামগ্রীর সামনে বসে নাক ছাঁটা দিয়ে বলে, এটা খাবো না, ওটা খাবো না ! নিয়তি অতি নিষ্ঠুর, এতই নিষ্ঠুর যে মানুষ কোনোদিন তার মূর্তি পর্যন্ত কল্পনা করেনি !

সিংহ পরিবারের প্রতি নিয়তির নেকনজর যেন একটু বেশী। এ বাড়ির গঙ্গানারায়ণকে নিয়ে তিনি কম খেলা খেলেন নি, আবার আর একবার খেললেন।

নীলকর সাহেবরা গঙ্গানারায়ণের নামে যে বিভিন্ন মামলা দায়ের করেছিল, আদালতের বিচারে গঙ্গানারায়ণ তার সব কটিতেই বে-কসুর খালাস পেয়ে গেল। বিচারকদের মধ্যেও তো দু-একজনের সত্যি সত্যিই আইনের প্রতি আনুগত্য থাকে। এমনকি শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেও তেমন ব্যতিক্রম আছে। জাস্টিস পীকফোর্ড গঙ্গানারায়ণকে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে মন্তব্য করলেন যে নিঃস্বার্থভাবে এই ব্যক্তি নীলচাষের ব্যাপারে কয়েকটি অযৌক্তিক ব্যবস্থার প্রতিকার বাসনায় সাধারণ নিরীহ চাষীদের সাহায্য করতে গিয়েছিলেন, তার ফলে ইনি নিজেই অত্যাচারিত হয়েছেন। এই প্রকার ব্যক্তিদের শাস্তি দিলে দেশের আইনশৃঙ্খলার প্রতি প্রজাদের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে।

এদিকে ইণ্ডিগো কমিশন চলছে। গঙ্গানারায়ণের মামলায় এরকম রায়ে অনেক সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা, সেই জন্যই দেশীয় ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিতে ফলাও করে এই বৃত্তান্ত ছাপা হলো। অতি ঘনিষ্ঠমহল ছাড়া গঙ্গানারায়ণকে বিশেষ কেউ চিনতো না, সে বিখ্যাত হয়ে পড়লো রাতারাতি। তার কীর্তিকাহিনী নানাভাবে অতিরঞ্জিত হয়ে এবার ছড়িয়ে পড়লো শহরের লোকের মুখে মুখে। অনেকে গঙ্গানারায়ণকে একবার চাক্ষুষ দেখার জন্যও সিংহসদনের দ্বারের সামনে এসে ভিড় করে।

গঙ্গানারায়ণ অবশ্য এই ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো খুবই। সে লোকের সামনে থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, নিজের কক্ষে লুকিয়ে থাকে। এমনকি সে চিন্তা করতে লাগলো যে কলকাতা ছেড়ে কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও ঘুরে আসবে কি না। ঠিক এই সময় নিয়তি দেবী অলক্ষ্যে গঙ্গানারায়ণের দিকে চেয়ে হাসলেন।

আধুনিক কালের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে যিনি শিরোমণি, সেই এজু-রাজ রামগোপাল ঘোষ স্বয়ং একদিন গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে দেখা করে একটি প্রস্তাব দিলেন। না ভেবেচিন্তে হুট করে কোনো কথা বলেন না বলেই রামগোপাল ঘোষের মতামতের বিশেষ গুরুত্ব আছে। হরিশ মুখুজ্যে রামগোপাল ঘোষের বিশেষ অনুগত, এক সময় হরিশ রামগোপালের গৃহের সান্ধ্য আড্ডায় নিয়মিত যেতেন। কিন্তু সেখানে পরিমিত মদ্যপান হয় বলে ইদানীং হরিশ আর বড় একটা যান না, কিন্তু রামগোপালের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ আছে।

রামগোপাল বললেন, হরিশের কাচ থেকে আপনার বৃত্তান্ত সব শুনিচি। ইউ আর এ মারভেল্স! অথচ আপনি এত মডেস্ট, এত সফ্ট স্পোকেন, এই আপনিই বন্দুক ধরেচেন কতকগুলিন ব্লাড হাউণ্ড ঐ প্ল্যানটারগুলিনের বিরুদ্ধে···এ যে বিশ্বাসই করা যায় না।

গঙ্গানারায়ণ মস্তক অবনত করে বললো, হরিশ সব কিছুই বাড়িয়ে বলেন, বন্দুক ধরিচি বটে কিন্তু ফায়ার করিচি মাত্র একবার।

রামগোপাল অল্পকালের মধ্যেই সরাসরি চলে এলেন মূল প্রসঙ্গে। তিনি বললেন, আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং আরও অনেকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি একটি নিবেদন আচে। আপনি বাগবাজারের কৃষ্ণনাথ রায়ের বিধবা কন্যা কুসুমকুমারীকে বিবাহ করার কথা বিবেচনা করে দেখুন।

গঙ্গানারায়ণের মাথায় যেন একেবারে আকাশ ভেঙে পড়লো!

গঙ্গানারায়ণের মতন, কুসুমকুমারীর নামটিও এখন একেবারে অপরিচিত নয়! কৃষ্ণনাথ রায়ের মতন একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি যে তাঁর বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিতে চেয়েছেন এবং সেজন্য পাত্র খোঁজাখুঁজি চলছে, এ সংবাদ ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে শহরে। এখন ঐ বিবাহের ব্যাপারটি আর শুধু বাগবাজারে কৃষ্ণনাথ রায়ের পরিবারেই আবদ্ধ নেই। বিধবা বিবাহের সমর্থকরা এই উপলক্ষে আবার কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লাগলেন, যেমন করেই হোক, এই কন্যার বিবাহ দিতেই হবে। অন্যদিকে গোঁড়ার দলও নিশ্চেষ্ট হয়ে নেই, তারা ভেবেছিল, এর মধ্যেই বিধবা বিবাহের ঝোঁক স্তিমিত হয়ে গেছে, আর কিছুদিনের মধ্যেই লোকে এই অনাচার সম্পূর্ণ বর্জন করবে। তার মধ্যে আবার এ কি হাঙ্গামা! কৃষ্ণনাথ রায়ের মতন ধীর, স্থির ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কি হঠাৎ বুদ্ধিনাশ হলো! গোঁড়ার দল রাজা রাধাকান্ত দেবকে গিয়ে ধরলো, আপনি যেমন করেই হোক এই বিয়ে আটকান!

কৃষ্ণনাথ রায়ের সঙ্গে শহরের অন্য অনেক ধনী ব্যক্তির ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রে সম্পর্ক আছে। তারাও এই বিবাহ বন্ধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো নানাপ্রকারে। কৃষ্ণনাথ নিজ সিদ্ধান্তে অবশ্য এখনো অনড় আছেন, তবে তাঁর একটাই শর্ত। কুসুমকুমারীর প্রথম বিবাহের সময় তিনি ভুল করেছিলেন, এবার ভালো করে দেখে শুনে পছন্দ মতন পাত্র না পেলে যার-তার হাতে তিনি তাঁর এই আদরিণী কন্যাকে তুলে দেবেন না।

পাছে বিরুদ্ধ পক্ষীয়রা কোনো ষড়যন্ত্র করে কিংবা অকস্মাৎ আবার কৃষ্ণনাথ রায়ের মত পরিবর্তিত হয়, তাই বিধবা-বিবাহ-সমর্থকরা যত শীঘ্র সম্ভব এই বিবাহ সঙ্ঘটিত করতে চায়। এ সব ব্যাপারে কালহরণ মানেই অশুভ। এ পর্যন্ত কোনো পাত্রকেই কৃষ্ণনাথ রায় মনোনীত করেন নি। কুসুমকুমারীকে যারা চক্ষেও দেখেনি, কৃষ্ণনাথ রায়ের পরিবারের সঙ্গে যাদের কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই এমন শত শত ব্যক্তি কুসুমকুমারীর জন্য পাত্র অন্বেষণে তৎপর। এদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষের মতন ব্যক্তিও আছেন। বিদ্যাসাগর অবশ্য এ ব্যাপারে কোনো নিজস্ব উদ্যোগ নেননি, তবে কুসুমকুমারীর বিবাহের দিনক্ষণ ধার্য হলে তিনি স্বয়ং যে বিবাহ বাসরে উপস্থিত থাকবেন সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

বলা যায় সত্যিই প্রায় শতাধিক ব্যক্তির মুখপাত্র হয়েই এসেছেন রামগোপাল। বিভিন্ন সম্মিলনীতে আলোচনায় এই জনমতই গড়ে উঠেছে যে গঙ্গানারায়ণ সিংহই কুসুমকুমারীর যোগ্যতম পাত্র। এমন উদার ও মহৎ মানুষ এখন সারা দেশেই দুর্লভ, তদুপরি সে ধনী ও অভিজাত বংশের সন্তান, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান, সুগঠিত শরীরের অধিকারী এবং বিপত্নীক। কৃষ্ণনাথ রায় কোনো কারণেই গঙ্গানারায়ণকে অপছন্দ করতে পারবেন না।

গঙ্গানারায়ণকে সম্পূর্ণ নীরব দেখে রামগোপাল ঘোষ আবার বললেন, আমি কন্যাপক্ষের লোক নই, সুতরাং আমার কাচ থেকে এ প্রস্তাব শুনে ইউ মে বী জাস্টিফায়েবলী সারপ্রাইজড···কিন্তু আসলে আমরা পাত্রপক্ষেরই, আপনার কাচ থেকে সম্মতি পেলে মেয়ে পক্ষের কাচে গিয়ে কতা পাড়বো!

গঙ্গানারায়ণ এবার ধীর কণ্ঠে বললেন, আপনি কষ্ট করে আমাদের বাড়িতে এয়েচেন, আমরা কৃতার্থ

হয়িচি, আমার ছোট ভাই এখন গৃহে নেই, সে আপনাকে দেখলে খুবই আহ্লাদিত হতো, তবে···দুঃখের বিষয় এইটুকুই যে, আপনাদের নির্বাচন ভুল হয়েচে, আমার আর বিবাহ করার ইচ্ছে নেই। আমি আর সংসারী হতে চাই না।

রামগোপাল হেসে বললেন, আপনি বন-জঙ্গল ছেড়ে সংসারে ফিরে এশ্চেন। সংসারে থাকলে তো সকলকেই সংসারী হতে হয়।

—অনেক সংসারেই আবার দু-একজন আলগোচ ধরনের মানুষ থাকে, যারা সাতে-পাঁচে যেতে চায় না। মিঃ ঘোষ, আমি বাকি জীবনটা খোলামেলা থাকতে চাই!

—আপনি চাইলেই বা আমরা দোবো কেন? দেশের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে আমরা চাই আপনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

—দেশের জন্য আপনি আর যা হোক কর্তে বলুন, কিন্তু বিবাহ কর্তে বলবেন না।

—দেশের জন্য মানুষ প্রাণ পর্যন্ত দেয়, আর আপনি বিবাহের মতন একটা সামান্য কাজ কত্তে পারবেন না? এই দেকুন না, সিপয় মিউটিনির সময় দিল্লির বারুদখানা দখল রাখবার জন্য কজন ইংরেজ কেমন স্বেচ্ছায় প্রাণ দিলে—।

—মিঃ ঘোষ, আমার গায়ে গেরুয়া হাওয়া লেগে গ্যাচে, আমার আর দারা-পুত্র-পরিবারে মন বসবে না।

—হাওয়া পালটাতে আর কতক্ষণ! দেকুন না, দেশের হাওয়াই এখন উল্টো দিকে বইচে।

আরও কিছুক্ষণ এরকম কথার পিঠে কথা চলল, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ বিবাহে সম্মতি দিল না। শেষ পর্যন্ত তাকে আরও একটু বিবেচনা করতে বলে রামগোপাল ঘোষ বিদায় নিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই ক্ষান্ত হলো না। এরপর গঙ্গানারায়ণের ওপর আক্রমণ আসতে লাগলো নানা দিক দিয়ে। হরিশ মুখুজ্যের কাছেও এ সংবাদ পৌঁছেচে, তিনিও এতে খুব উৎসাহী। গঙ্গানারায়ণের বন্ধুরা গৌরদাস, রাজনারায়ণ, ভূদেব এমনকি মধুসূদন পর্যন্ত দেখা হলেই তাকে ঐ কথা বলেন। সকলেই একমত যে একটা বড় কাজ-এর জন্য গঙ্গানারায়ণের এই বিবাহ করা উচিত।

রাজনারায়ণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার ভঙ্গিতে বললেন, ওরে গঙ্গা, সেকেলে স্বয়ম্বর সভার কতা শুনিচিস তো, তোর হলো গে একেলে স্বয়ম্বর সভা। আমরা সবাই মিলে ভোটে তোকে বর নির্বাচন করিচি, এখন তো তোর পেচপাও হলে চলবে না!

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমি কি নমিনেশান পেপার সাবমিট করিচিলুম যে তোরা আমায় ইলেক্ট কল্লি—

রাজনারায়ণ বললেন, ক্রমওয়েলকে যখন রাজা করা হলো, তখন তিনি কি নমিনেশান পেপার সাবমিট করেচিলেন? সবার ক্ষেত্রে লাগে না!

—অর্থাৎ আমার দশাও ক্রমওয়েলের মতই হবে।

—তা ভাই বিয়ে করা মানেই তো একরূপ ফাঁসী কাঠে চড়া নয়? তুই একবার বিয়ে করেই এত ভয় পেয়ে গেলি? এই দ্যাক না, গৌর, মধু, আমি আমরা সবাই তো দুবার করে মাথা মুড়িয়িচি, আর দেরি করিস নি, তুই এবার দুর্গা বলে ঝুলে পড়!

—আমাকে এমন অনুরোধ করে আর বিব্রত করিস নি তোরা!

—তুই কি বিধবা বিবাহ কত্তে ভয় পাচ্ছিস? দ্যাক্ বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের অনেক আগেই আমার দ্বিতীয় বিয়ে হয়ে গেচে, নইলে আমি নিশ্চয়ই কোনো বিধবার পাণিগ্রহণ করে অন্তত একজন দুঃখিনী বালিকার দুঃখ দূর কত্তুম। কিন্তু আমি নিজে উদ্‌যুগী হয়ে আমার দুই ভায়ের বিয়ে দিইচি দুই বিধবার সঙ্গে। তখন লোকে ভয় দেখিয়েছেল আমায়। আমি মেদিনীপুরে বাংলা বাড়িতে থাকি, বলে কিনা রাতের বেলা আমার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে! আমি বলেচিলুম, দিক দেখি একবার। বোড়ালের লোকেরা বললো, আমি গ্রামে গেলে আমায় ইঁট মারবে। আমি একটা মোটা লাঠি হাতে নিয়ে গ্রামে যেতুম। তোর যদি কোনো বিপদ হয়। আমরা সকলে মিলে তোর পাশে থাকবো!

গঙ্গানারায়ণ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, না, না, আমি সে কতা বলচি না, সে কতা বলচি না—!

গঙ্গানারায়ণ তর্কবাগীশ নয়। সকলের কাছেই সে যুক্তিতে হেরে যায়, কিন্তু তার মন মানে না। অবস্থা এমন হয়েছে যে তার এখন আর কোথাও যাবার উপায় নেই, সব জায়গাতেই ঐ এক কথা। এরা সকলে মিলে গঙ্গানারায়ণের মনের কষ্ট অনেক বর্ধিত করে দিল।

এতদিন পর আবার বারবার মনে পড়তে লাগলো বিন্দুবাসিনীর কথা। কুসুমকুমারীকে চক্ষে দেখেনি

গঙ্গানারায়ণ, কিন্তু তার যে বয়সের কথা সে শুনেছে, সেই বয়সেই বিন্দুবাসিনীকে গোপনে চিরতরে প্রেরণ করা হয় কাশীতে। কৈশোরের ক্রীড়াসঙ্গিনী বিন্দুবাসিনীর মুখ, ঠিক যেন গর্জন তেল মাখা প্রতিমার মুখের মতন, আর সেই সময়কার সুমধুর দিনগুলি গঙ্গানারায়ণের স্মৃতিপটে কতকগুলি স্থির চিত্রের মতন দোলে। তারপর বারানসীর বিন্দুবাসিনীকে মনে পড়া মাত্র তার বুকের মধ্যে যাতনা শুরু হয়। যেন সবকটি তন্ত্রী থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্তপাত হচ্ছে। শেষের সেই অমোঘ কালরাত্রিতে বজরা থেকে নেমে নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে বিন্দু আঃ আঃ শব্দ করেছিল, সে রকম বুক ফাটা আর্তনাদ মানুষের কণ্ঠ থেকেও বেরোয়! তার আগে বিন্দুবাসিনী নেশাচ্ছন্ন গলায় অন্তত দুবার বলেছিল, আমার কিচুই পাওয়া হলো না রে, গঙ্গা! এমন বঞ্চিত কাতরোক্তি কি গঙ্গানারায়ণ কোনোদিন ভুলতে পারবে? সে প্রাণপণে ভুলে থাকার চেষ্টা করেছিল। কেন সকলে মিলে তার সেই দুঃসহ স্মৃতিকে আবার উস্কে দিতে চায়!

বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের কথা গঙ্গানারায়ণ কারুকে বলেনি, এই গোপনীয়তার বিপুল ভার সে সারা জীবন একলা বহন করবে। কোথায় গেল বিন্দুবাসিনী? সে নিশ্চয় সাঁতার জানতো না। নগর কলকাতার বনেদী পরিবারের পুরাঙ্গনা, তাও বালবিধবা, তার সন্তরণ শিক্ষার সুযোগ কোথায়? তা ছাড়া বাঁচতে সে চায়নি, ইচ্ছে করে লাফ দিয়েছিল নৌকো থেকে, জলের গভীরে তলিয়ে গেছে, হাঙরে-কুমীরে ঠুকরে খেয়েছে তার দেহ!

একরাত্রে বিন্দুবাসিনীকে স্বপ্নে দেখলো গঙ্গানারায়ণ। বারানসীর বিন্দুবাসিনী নয়, সেই প্রাণোচ্ছলা কিশোরী যার সঙ্গে একসাথে গঙ্গানারায়ণ পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে সংস্কৃত পাঠ নিত। স্বপ্নের বিন্দুবাসিনী অভিমানে ভুরু বাঁকিয়ে বললো, তুই না বলিচিলি আমায় মেঘদূত কাব্যখানা পড়াবি? মিথ্যুক! তোর কোনো কতার ঠিক নেই।

স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠে গঙ্গানারায়ণ অনেকদিন পর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো। অন্ধকার কক্ষ, রাত্রি নিশুতি, তার এই কান্নার কথা আর কেউ জানবে না।

মুলুকচাঁদের আখড়ায় হরিশ মুখুজ্যে একদিন নবীনকুমারকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দাদা এ বিয়ের ব্যাপারে কিছু ঠিক কল্লেন? আমার কাচেও কদিন যাবৎ আসচেন না!

নবীনকুমার মুলুকচাঁদের আখড়ায় আবার নিয়মিত যাওয়া আসা শুরু করেছে। প্রতিদিনই অত্যধিক সুরা পান করে শেষে একসময় চেতনা হারায়। এখন সে ঠিক যেন হরিশ মুখুজ্যেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, সারাদিন মহাভারত অনুবাদ এবং অন্যান্য কাজে প্রভূত পরিশ্রম করে, তারপর সন্ধ্যা থেকেই এখানে এসে শুরু করে মদ্যপান। তবে আগের তুলনায় সে অনেক গম্ভীর, অন্য সকলকে চুপ করিয়ে রেখে নিজে একা কথা বলার অভ্যাস একেবারেই পরিত্যাগ করেছে, মাতলামির হুল্লোড়েও সে যোগ দেয় না এবং বারনারীদের সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই। নর্তকীরা এলে সে পাশের কক্ষে শুতে চলে যায়।

মুলুকচাঁদের ব্যবসার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে ইতিমধ্যে। রাজস্থান থেকে সে তার ভাই ও আত্মীয় স্বজনদের এনে নানান ব্যবসায়ে জুড়ে দিয়েছে, বড়বাজার অঞ্চলে অনেকগুলি বাড়ির মালিক সে নিজে। জানবাজারের এই আখড়ায় সে আর প্রতি সন্ধেবেলা আসতে পারে না, তবে ব্যবস্থাদি সবই ঠিক থাকে। মনে হয় এই আখড়াটি সে টিকিয়ে রেখেছে শুধু হরিশ মুখুজ্যের জন্যেই। রাইমোহন এখানে আর আসে না, এটা নবীনকুমারের পক্ষে একটা স্বস্তির বিষয়।

হরিশের প্রশ্নের উত্তরে নবীনকুমার সংক্ষেপে বললো, কী জানি!

হরিশ সচকিত হয়ে বললেন, অ্যাজ এ মেটার অফ ফ্যাক্ট্ আই ওয়াজ গোয়িং টু আস্ক ইউ। তোমার এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহ নেই কেন বলো তো, বেরাদর? কদিন ধরেই লক্ষ করচি, তুমি এ সম্পর্কে একটাও কতা কও না! সবাই যখন এত মাতামাতি কচ্চে!

নবীনকুমার বললো, আমি আর কি বলবো?

—তুমি তোমার দাদাটিকে বোঝাওনি? গঙ্গানারায়ণ আমাদের গর্ব! উই হ্যাভ্ মেনি প্ল্যানস্ টুগেদার। গঙ্গাতে আমাতে দেকো না সামনের বছর থেকে একটার পর একটা মুভমেন্ট লনচ কর্বো—আগামী দশ বছরের মধ্যে আমি এই ইংরেজ ব্যাটাদের টিট্ করে ছাড়বো।

—এইসব মুভমেন্ট কত্তে গেলে কি নতুন বিয়েতে জড়িয়ে পড়লে চলে? তাতে বাধার সৃষ্টিই তো হবার কতা!

—না, না, এই বিয়েটা করা বিশেষ দরকার। এই উদাসীন জাতিকে বারবার ঘা মারতে হবে! এক

একটা মহৎ একজামপল্ সেট কত্তে হবে। গঙ্গানারায়ণ সিংহের মতন মানুষ যদি বিধবা বিবাহ করেন তা হলে আরও কত লোক এ রকম কাজ কত্তে ভরসা পাবে।

—আমার মনে হয়, এ বিয়ে হবে না।

—কেন ?

—আমার মা বেঁচে রয়েচেন, তিনি হরিদ্বারে থাকুন আর যেখানেই থাকুন। এ খবর ঠিকই তাঁর কানে পৌঁচবে, তিনি ডুকরে ডুকরে কাঁদবেন। দাদা নিশ্চয়ই মায়ের মনে এরকম দুঃখ দিতে চান না।

হাতের গেলাসটা নামিয়ে রেখে হরিশ মুখুজ্যে মহা উত্তেজিতভাবে বললেন, তুমি···তুমি এই কতা বললে, নবীন ? তুমি প্রতিটি বিধবা-বিবাহের জন্য এক হাজার টাকা দান ঘোষণা করেচিলে, সেই তোমার মুখে এমন কতা ! তুমি না বিদ্যাসাগরের চ্যালা ! এখন নিজের পরিবারে এই বিয়ে ঢুকচে বলেই অন্য সুর গাইচো : জানি, জানি, তোমরা সব একটু এদিক ওদিক হলেই বাপ-মায়ের সুপুত্তুর হয়ে যাও ! মুখেন মারিতং জগৎ, তারপর দায় পড়লেই ভালো মানুষের মতন মুখটি করে বলবে, কী কর্বো ভাই, মা অনেক করে বল্লেন, তাই এই বিয়েটা করে ফেল্লুম ! হেঃ ! আমি যে কাগজ চালাবার জন্য সর্বস্বান্ত হচ্চি, সাহেবদের সঙ্গে মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়চি, সে কি আমার মায়ের মত নিয়ে ? তোমার দাদা যদি এ বিয়ে করতে ভয় পান, তা হলে তাঁর সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্কই রইবে না ! আমি একাই আমার ক্রুসেড চালিয়ে যাবো :

এমন ভর্ৎসনার উত্তরে নবীনকুমার একটাও কথা বললো না। সে গালিচার ওপর বসে ছিল, হাতের গেলাসটি শেষ করে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে চোখ বুজলো।

হরিশ বললেন, তোমাদের জননী হাজার হাজার মাইল দূরে রয়েচেন, তবু তোমরা মায়ের দোহাই পেড়ে সটকাচ্চো !

নবীনকুমার নীরবে দুটি হাতের পাঞ্জা স্থাপন করলো দুই চক্ষুর ওপর।

—কী, কোনো উত্তর দিচ্চো না যে ?

—আমাকে এখন বিরক্ত করো না !

—জানি, যখন তোমরা কোনো যুক্তি দেকাতে পারো না তখন ঘুমিয়ে পড়ো। খাঁটি ভারতীয় একেই বলে, হেঃ !

নবীনকুমার এবার উপুড় হয়ে গেল। হরিশ মুখুজ্যের অনেক প্ররোচনাতেও সে আর একটি শব্দও উচ্চারণ করলো না।

এর দশ দিনের মধ্যেই বিবাহের দিন ও লগ্ন ঠিক হয়ে গেল। গঙ্গানারায়ণ হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ, যে লোকের অনুরোধের উত্তরে বারবার না বলার চেয়ে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক কোনো ক্রমে মেনে নিয়ে স্বস্তি বোধ করে। সৌজন্য ও ভদ্রতার খাতিরে এবং বন্ধুদের উপরোধে সে বোধ হয় বিষও খেতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে কুসুমকুমারীর সঙ্গে বিয়ের উপমা দেওয়া কোনো ক্রমেই ঠিক হলো না। সেই এক রাত্রে বিন্দুবাসিনীকে স্বপ্নে দেখার পর থেকেই গঙ্গানারায়ণের মন একটু একটু পরিবর্তিত হচ্ছিল। তার মনে হলো, বিন্দুবাসিনীর বয়সী এক বিধবাকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে সে ঐ মেয়েটিকে বিন্দুবাসিনীর মতনই দুর্ভাগ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই মেয়েটিকে স্ত্রীর সম্মান দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিতা করলে বিন্দুবাসিনীর আত্মা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবে। সেই ইঙ্গিত দেবার জন্যই স্বপ্নে আবির্ভূতা হয়েছিল বিন্দুবাসিনী। সুতরাং গঙ্গানারায়ণ বিবাহে এই ভেবেই সম্মতি দিল যে, সে যেন অন্য মূর্তিতে বিন্দুবাসিনীকেই গ্রহণ করছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, এই বিবাহ উপলক্ষে বিধুশেখর কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টাই করলেন না। সিংহ পরিবারে এত বড় একটা কাণ্ড হতে চলেছে, অথচ তাতে বিধুশেখরের যেন পক্ষে বিপক্ষে কোনো উদ্দীপনাই নেই। যথা সময়ে গঙ্গানারায়ণ বিধুশেখরের অনুমতি নিতে গিয়েছিল, তিনি শুকনো গলায় বলেছিলেন, তুমি বিবাহ কত্তে চাইচো···এতে আর আমার বলবার কী আচে ! যা ভালো বুঝবে, কর্বে। এটুকু বলেই পাশ ফিরে শুয়েছিলেন তিনি। গঙ্গানারায়ণ তখন সুহাসিনীকে জিজ্ঞেস করেছিল, সুসি, সব তো শুনিচিস, আমি যদি এই বে করি, তোরা খুশী হবি ? উদ্‌গত অশ্রু কোনো ক্রমে রোধ করে সুহাসিনী উত্তর দিয়েছিল, গঙ্গাদাদা, দেশসুদ্দু সব দুঃখিনী মেয়েরা তোমায় দু হাত তুলে আশীর্বাদ কর্বেন।

বাগবাজারে কৃষ্ণনাথ রায়ের প্রাসাদে এই বিবাহের দিন সমারোহ হলো বিস্তর। আসরে উপস্থিত রইলেন গণ্যমান্য বহু ব্যক্তি। নবীনকুমারের অবশ্য যাওয়া হলো না।

বর-বেশী গঙ্গানারায়ণকে কুসুমসজ্জিত জুড়ি গাড়িতে চাপিয়ে এবং অন্যান্য গাড়ি ও পাল্কীতে বরযাত্রীদের চাপিয়েই নবীনকুমার চঞ্চল হয়ে উঠলো। বিকেলেই এক নিদারুণ দুঃসংবাদ এসেছে, অতিকষ্টে সে সংবাদ গোপন করে রাখা হয়েছে গঙ্গানারায়ণের কাছ থেকে। গত রাত্রি থেকে হরিশ মুখুজ্যে অনবরত রক্ত-বমি করছেন। তাঁর মাথার কোনো শিরা ছিঁড়ে গেছে বোধ হয়, বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম।

দু'জন সাহেব চিকিৎসক এবং ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে নবীনকুমার খানিক পরেই উপস্থিত হলো হরিশের বাড়িতে। সেখানেও একটি ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে। গঙ্গানারায়ণের বিবাহের নিমন্ত্রণ সেরে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন ছুটে এসেছেন এত দূরে হরিশকে দেখবার জন্য। তাঁরা বললেন, নবীনকুমারকে এখন একবার বাগবাজারে যেতে, সকলেই তাকে খোঁজাখুঁজি করছে। গঙ্গানারায়ণকে হরিশ ও নবীনকুমারের অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কে নানা রূপ ভুজুং-ভাজুং দেওয়া হয়েছে, এখন নবীনকুমারের একবার যাওয়া অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু মুমূর্ষু বন্ধুর শয্যাপার্শ্ব ছেড়ে নবীনকুমার কিছুতেই উঠে যেতে রাজি নয়।

রাত্রি ভোর হবার পর বহু কার্য অসমাপ্ত রেখে, বহু মানুষকে কাঁদিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন হরিশ। আগের দিন থেকেই তাঁর বাক্‌রোধ হয়েছিল, মৃত্যুর আগে ঘনিষ্ঠজনদের একটি কথাও বলে যেতে পারলেন না।

হরিশের গৃহের সামনে যে ছোটখাটো একটা জটলা জমেছিল, সেখানে মাঝে মাঝে এসে উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল রাইমোহন। ভেতরে যায়নি। যাবার মতন অবস্থাও নয়। তার পোশাক শতচ্ছিন্ন, বার্ধক্যে শরীর ন্যুব্জ হয়ে গেছে, চক্ষু দুটি স্তিমিত, ঠিক পথের পাগলের মতন চেহারা, চেনাই যায় না আগেকার মানুষটিকে। শেষ সংবাদ শোনার পর সে বেসুরো জড়িত কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ রচিত একটা গান শুরু করে দিল :

নীল বাঁদরে সোনার বাংলা
  করলে রে ভাই ছারখার
অসময়ে হরিশ মোলো
  লঙের হলো কারাগার
প্রজার প্রাণ বাঁচানো ভার···

একটু আগে জোর বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা। চিৎপুরের রাস্তা একেবারে কাদায় মাখামাখি। পথের দু'পাশের পগারের থকথকে কাদায় নতুন জল মিশেছে বলে সোঁদা গন্ধ উঠে আসছে। ভন্ ভন্ করছে নীল ডুমো মাছি। এরই মধ্যে বাজার করতে বেরিয়েছেন বাবুরা, গোড়ালি উঁচু করে বকের মতন পা ফেলে ফেলে চলেছেন, তাঁদের পিছু পিছু ধামা মাথায় করে সঙ্গে চলেছে বাড়ির ভৃত্য বা দাসী। হৌসের বাবুরা আপিসের দেরি হয়ে গেল বলে ছুটছে পড়ি মরি করে, তাদের অনেকেরই জুতো জোড়া বগলদাবা এবং ধুতি তুলে ধরেছে উরু পর্যন্ত। ছ্যাকরাগুলোর আষ্টেপৃষ্টে ভিড়, কেউ কেউ মাথাতেও চেপে বসেছে।

এই সকালবেলাতেও দু' চারটি মাতাল ও গাঁজাখোর ঢলাঢলি করছে পথের এখানে ওখানে। পাহারাওয়ালা মাঝে মাঝেই গাড়ি-ঘোড়া সামলানোর কর্ম ছেড়ে বলে, 'বাগবাজারে গাঁজার আড্ডা, গুলীর কোন্নগরে, বটতলায় মদের আড্ডা, চণ্ডুর বৌবাজারে।' কিন্তু একথাও পুরোনো হয়ে গেছে, এখন সবরকম নেশাই ছড়িয়ে পড়েছে শহরের সর্বত্র। ন'টার তোপ্ পড়তেই এক মাতালবাবু এমন ভাবে আঁতকে উঠলেন যে এক লাফ দিতেই কাদার ওপর ডিগবাজি দিলেন দু'বার। তারপর আর তাঁর পদদ্বয়ের ওপর কোনো কর্তৃত্ব রইল না। এই অবস্থায় কোনো পালকী বা কেরাঞ্চী গাড়ি তাঁকে নেবে না, কারণ এখন তেজীর সময়, খদ্দেরের অভাব নেই। মাতালবাবু এক নগ্‌দা ঝাঁকামুটেকে ধরলেন

তাঁকে মাথায় করে নিয়ে যাবার জন্য। তা সে ঝাঁকামুটেও গলা ঝামড়ে বলে কি না, পুঙ্গির বাই, আমারে মুদ্দোফরাস পাইচেন ?

এ সময় খরিদ্দার সমাগমের সম্ভাবনা কম বলে বারাঙ্গনারা বারান্দায় দাঁড়িয়ে পথের রঙ্গ দেখে। মাঝে মধ্যে তারা ওপর থেকে নানারকম মন্তব্যও ছুঁড়ে দেয়। এক কেরাঞ্চী গাড়িতে উঠে বসেছেন দুই বাবাজী, একজনের উদরটি জয়ঢাকের মতন, আর মুখখানি তেলো হাঁড়ি। কামানো মস্তকে চৈতন ফক্কা। অন্য বাবাজীর চেহারাটি ফড়িং-এর মতন পল্‌কা। হাতে একটি শামুকের ডিবে যেন জন্ম ইস্তক সাঁটা, তিনি এতই নস্যি নেন যে তাঁর লালাও খয়েরি রঙের। এই দুই বিসদৃশ চেহারার গোঁসাই গাড়িতে চাপার ফলে সে গাড়ি আর নড়তে চায় না, গাড়োয়ান জিবে টক্ টক্ শব্দ করে চাবুক মাথার ওপর ঘোরালেও ঘোড়া নড়ে না এক পা। সেই দৃশ্যে পথের লোক বেশ কৌতুক পেয়ে গেল। নিকটবর্তী বারান্দা থেকে এক বারাঙ্গনা বললো, ওরে, ঐ এক গোঁসাই-ই তো এক গাড়ি ! মিনসে যেন কুম্ভকর্ণ ! আরেকটা তো ওঁয়ার দাঁত খোঁটার খড়কে কাটি ! এক চীনেবাদামওয়ালা বললো, ওরে গাড়োয়ান, একদিকে এক ধুম্রলোচন, আর একদিকে এক চিমসে সওয়ারি ! আগে পাষাণ ভেঙে নে, তবে তো গাড়ি চলবে ! অমনি ওপর থেকে সেই বারাঙ্গনাটি বললো, ওরে ঐ রোগা মিনসেটার গলায় গোটা কতক পাতর বেঁদে দে, তবে তো পাষাণ ভাঙা ! আমোদখোর জনতা হে-হে-হে করে হেসে উঠলো। গাড়ির মধ্যে তটস্থ বিপুলকায় বাবাজী বললেন, ভায়া, শহরের স্ত্রীলোকগুলি কি ব্যাপিকা দেখচো ! প্রভো, তোমার ইচ্ছা ! অন্য বাবাজী বললেন, জন্ম ইঁস্তক ওঁয়ারা কোঁনো উঁপদেশ পাঁঞি নাঁঞি, ওঁয়াদের রাঁমা রঞ্জিকাঁ পাঁঠ দেঁওএ্যা উঁচিত ! এক মাতাল তার মধ্যে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী বল্লে ? কী বল্লে ? আবার বলো।

বিশিষ্ট মার্জিত শিক্ষিত সুসভ্য দুই বাবু পাশ দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে যেতে যেতে এই দৃশ্য দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করলেন এবং একজন অপরজনকে বললেন, হোয়াট ডিগ্রেডেশান ! এই কান্ট্রি দিন দিন গোয়িং টু হেল !

একটু দূরে এক কালীমন্দিরের সামনে পাঁঠার মাংস বিক্রয় হচ্ছে। ভাগা ভাগা করে সাজানো, এগুলি প্রসাদী মাংস তাই খদ্দেরের টান বেশী। দামও একটু বেশী। যারা কিনতে পারে না তারা বলে, এখন শহরের দেবতারা পর্যন্ত রোজগেরে। মাংসের ব্যবসা কচ্চে। ইদানীং মাংস খাওয়ার একটা জোর হুজুগ উঠেছে, ওতে নাকি সাহেবদের মতন স্বাস্থ্য হয়, চামড়ায় জেল্লা লাগে। সেইজন্য পাঁঠার মাংস বেশ দুষ্প্রাপ্য। মাতাল, বেনে ও বেশ্যারাই আগেভাগে বেশী দামে মাংস কিনে নিয়ে যায়। তাই পাঁঠার মাংসেও ভেজাল চলছে কখনো কখনো শোনা যায়। কুকুর-বিড়ালও বাদ যায় না। ভাবগতিক এখন এমন হয়েছে যে জলচরের মধ্যে শুধু নৌকো, খেচরের মধ্যে ঘুড়ি আর চতুষ্পদের মধ্যে শুধু খাট এখন খাওয়া নাই !

পথের মোড়ে মোড়ে বড় বড় লাল-কালো অক্ষরে ছাপা ইস্তাহার লটকানো। হাওড়া থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত রেলওয়ে খুলচে, দেশ ভ্রমণের অপূর্ব সুযোগ ! অপূর্ব সুযোগ ! অল্প খরচে এবং দিন সংক্ষেপে বারাণসীধাম এবং ত্রিবেণীতীর্থে স্নানের জন্য অনেকেই এখন ব্যস্ত। আরমানি ঘাট সর্বদা লোকে লোকারণ্য।

হঠাৎ একটা হই হই রই রই শোরগোল শোনা গেল। পথের সব লোক উর্ধ্বমুখী হয়ে চেয়ে রইলো আকাশের দিকে। গৃহস্থবাড়ির বুড়ো-বুড়ী ছেলে-মেয়ে সবাই দুপ্‌দাপ্ করে উঠে গেল ছাদে। আকাশে আশ্চর্য দৃশ্য, শূন্যে ভাসছে মানুষ। সাহেব জাতি যে কত খেলাই জানে, আকাশেও মানুষ ওড়ে ! প্রায় ফি বছরই ফরাসীদেশের এক সাহেব এসে এই মানুষ ওড়ার কেরামতি দেখায়। কেল্লার মাঠে হাজার হাজার মানুষ চাঁদা দিয়ে সেই মানুষ ওড়া দেখতে যায়। তলায় যন্ত্র বসানো এক পেল্লায় কাপড়ের গোল্লা, সাহেবেরা তাকে বলে বেলুন, আর দেশী লোকেরা বলে ফানুস। সেই ফানুসে এক সাহেব উঠে বসার পর দড়ি কেটে দেওয়া হয়, অমনি ফানুস দুলতে দুলতে ওপরে ওঠে। উঠতে থাকে তো উঠতেই থাকে, গগনবিহারী সাহেব শূন্য থেকে হাত নাড়ে। আবার ইচ্ছে মতন নেমেও আসতে পারে সেই ফানুস।

একদল লোক আঙুল তুলে বলতে লাগলো, ওই, ওই ওই ! যারা দেখতে পায়নি তারা বলতে লাগলো, কই, কই, কই ? কেউ বললো, দ্যাক, দ্যাক একটা শকুন ঐ ফানুসটার কাচে যাচ্ছে, এবার ঢুঁসো মারবে।

পথের গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ, সকলেই দেখতে লাগলো সেই ফানুসের লীলা। অত উঁচুতে

সাহেবটিকে মনে হচ্ছে যেন রথের মেলার পুতুল। ফানুসটি দুলতে দুলতে এক একবার একদিকে সরে যায়, অমনি সবাই হে-হে করে ওঠে। একটু পরেই বৃষ্টি নামতেই সকলে দুদ্দাড় করে ছুটলো। ফানুসটি আর দেখা গেল না। কেউ বললো, সাহেব ছাতা নিয়েচেন তো ? কেউ বললো, সাহেব এখন চাঁদের ওপর বসে একটু বিশ্রাম কচ্চেন।

আরমানি ঘাটে রেলের টার্মিনাস। টিকিটের কাউন্টারগুলির সামনে মানুষের ভিড়ের অন্ত নেই, মনে হয় যেন একদল লোক বাড়ি থেকে এখানে এসেছে শুধু নিজেদের মধ্যে ঠ্যালাঠেলি করবার জন্যে। রেলের চাপরাসীরা বেত হাতে নিয়ে মাঝে মাঝে সপাসপ পেটাচ্ছে তাদের। ভাগ্যবান যারা কোনোক্রমে টিকিট কাটতে পারে তারাও টাকা দিয়ে খুচরো ফেরত পায় না। আবেদন নিবেদনও নিষ্ফল।বুকিং ক্লার্ক মহাশয় তখন আপন মনে গুনগুনিয়ে গান করেন, "মদন আগুন জ্বলচে দ্বিগুণ কল্লে কী গুণ ঐ বিদেশী।" খুচরো ফিরতের দাবিতে কেউ যদি তর্জন গর্জন করে তখন রেল-পুলিস ও জমাদাররা তাদের কণ্ঠে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে। দেশী লোকদের ফার্স্ট ক্লাস ভ্রমণের অধিকার নেই বলে ফার্স্ট ক্লাস কাউন্টার জনবিরল ও নিঃশব্দ। দু-চারটি সাহেব মেম সেখান থেকে সকৌতুকে থার্ড ক্লাসের এই ভূতের নৃত্য দেখেন।

ঘাটে স্টিম ফেরি দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করে, লোকের ভিড়ে কুমড়ো-গাদাগাদি হলে সেগুলি টুনুনাণ্টাং টুনুনাণ্টাং ঘণ্টা বাজিয়ে ছেড়ে দেয়। গঙ্গার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেন। কেউ কেউ বলে সাহেবরা ব্ল্যাকহোল ট্রাজেডির প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যেই রেল লাইন খুলেছে। কাঁকড়ার গর্তে যেমনভাবে ডিম থাকে সেইভাবে মানুষ পোরা হয় থার্ড ক্লাসে, তারপরও স্টেশন মাস্টার ও গার্ড এসে উঁকি দিয়ে দেখে যান এখনো নিশ্বাস ফেলার জায়গা আছে কি না, তা হলে আরও কিছু যাত্রী ঠুসে দেওয়া হবে।

আরমানি ঘাটের ভিড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক সুঠাম সবল চেহারার যুবাপুরুষ, পরনে নীল রঙের কোট প্যাণ্টলুন, মাথায় একটা শোলার হ্যাট, মুখের রেখা সুগম্ভীর। আর একজন ধুতি-বেনিয়ান পরা অভিজাত চেহারার ব্যক্তি সেকেণ্ড ক্লাস কাউণ্টার থেকে ফেরার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো, তারপর এগিয়ে এসে বললো, তুমি···আপনাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে। মশায়ের নামটা জানতে পারি ?

হ্যাটকোটধারী যুবকটি ভাবলেশহীন মুখে বললো, আই ডোনট্ থিংক আই মেট ইউ বিফোর!

ধুতি-ভদ্রলোকটি বললো, তা হলে কি আমার ভুল হলো ! তবে আপনাকে দেকেই আমার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো কেন ?

হ্যাট-কোট আর কোনো উত্তর দিল না।

—মশায়ের নামটি যদি জানতে পারি !

—তার কোনো প্রয়োজন আছে কি ?

ধুতি-বেনিয়ান যেন দারুণ একটা সমস্যায় পড়ে গেছে। চেনা চেনা মনে হচ্ছে, অথচ নাম মনে পড়ছে না। হ্যাট-কোটের ব্যবহার বেশ রূঢ়, কোনো সাহায্য পাবার আশা নেই। বিড় বিড় করে ধুতি-বেনিয়ান স্টিম-ফেরীর দিকে এগিয়ে গেল। তারপর আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললো, ও মনে পড়েচে, মনে পড়েচে ! তুমি তো চন্দ্রনাথ !

হ্যাটকোট ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে। ধুতি-বেনিয়ান দৌড়ে এসে তাকে ধরে বললো, তুমি নিশ্চয় চন্দ্রনাথ ! আমি এবার ঠিক ধরিচি।

হ্যাটকোট ফিরে দাঁড়িয়ে আরও কর্কশভাবে বললো, সো হোয়াট ?

অপর ব্যক্তিটি তার হাত চেপে ধরে বললো, ভাই চন্দ্রনাথ, আমায় চিনতে পাচ্চো না ? আমি তো তোমাকেই খুঁজচিলুম। আমার নাম রতনমণি, বাগবাজারের রতনমণি রায়। আমি জানি, তুমি আমায় দেকে রাগ করবে, কিন্তু তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

মাথা থেকে টুপিটি খুলে চন্দ্রনাথ বললো, আমি মনে করি না, আমার সঙ্গে কাহারো কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে !

—চন্দ্রনাথ, আমরা হিন্দু কালেজে এক কেলাসে পড়তুম।

—না।

—জানি, তুমি কি বলতে চাও। তুমি ভর্তি হবার পর আমরা সবাই কেলাস ছেড়ে দিইচিলুম, তবু দু-চারদিন এক সঙ্গে বসিচি। তোমাকে আমার মনে আচে, আমাকে তোমার মনে নেই ?

সাহেবী পরিচ্ছদে ভূষিত এই চন্দ্রনাথ আমাদের পূর্ব পরিচিত। সে হীরা-বুলবুলের পুত্র। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে রতনমণির মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে রইলো। সে কিছুই বিস্মৃত হয় না, তার স্মৃতিশক্তি আয়নার মধ্যে অসংখ্য প্রকোষ্ঠের মতন, রতনমণিকে সে দেখা মাত্র চিনতে পেরেছে। কিন্তু সে কারুকেই চিনতে চায় না।

—তুমি কোতায় যাচ্ছো, চন্দ্রনাথ? টিকিট কেটেচো? চলো, আমরা এক সঙ্গেই যাই। আমি তোমার সঙ্গে থার্ডক্লাসেই যাবো না হয়।

—আমি কোথাও যাচ্চি না। আমি কলকাতায় ফিরচি।

—অ্যাঁ, তুমি যাচ্চো না? তোমাকে এখেনে দেকে ভাবলুম···তুমি কলকেতা থেকে কোথাও যাচ্চো?

—না!

—তোমার এমন ধড়াচুড়ো, প্রথমে ভাবলুম বুঝি সাহেব—তোমাকে আমার বিশেষ দরকার।

—এ কথাটা দু'তিনবার শুনলুম। কিন্তু কী দরকার তা এখনো বুজলুম না।

—তোমার কাচে আমি ক্ষমা চাইবো।

—আপনার ফেরী ছেড়ে যাচ্চে।

—যাক গে, চুলোয় যাক ফেরী। না হয় আজ যাবোই না, শ্রীরামপুরে আমার দিদির শ্বশুরবাড়ি, ভাগনেটার বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়েছে, সেইজন্যই একবার···তা না হয় কাল যাবো। তোমাকে দেকে আমার বুক থেকে যেন একটা পাষাণভার নেবে গেল। এতদিন এমন একটা বুকচাপা কষ্ট ছেল···

—আপনি কী বলচেন, কিচুই বুজতে পাচ্চি না।

—ভাই, অল্প বয়েসে কী নির্বোধ ছিলুম, জ্ঞান বুদ্ধি কিচুই ছেল না, তোমার ওপর অবিচার করিচি। পরে যখুন উপলব্ধি হয়েচে, তখন থেকে আমার বুকের মধ্যে অনুতাপানল ধিকিধিকি জ্বলচে।

—আমার এখনো বিশ্বাস, আপনি ভুল কচ্চেন, আপনি আমাকে অন্য মানুষ ভেবেচেন।

—আপনি? তুমি···তুই বলে ডাকো আমায়। আমরা সহপাঠী···হায় কী মূর্খ, কী মূর্খ আমরা, তোমার জন্মবৃত্তান্তের সাত কাহন তুলে আমরা তোমার সঙ্গে পড়তে চাইনি···তুমি জীবনে উন্নতি করেচো দেকে বড় খুশী হলুম।

—এবার যাই।

—কোতায় যাবে তুমি। একবার পেয়িচি, তোমায় আর ছাড়চিনি। তোমায় তো আসল কতাটাই বলা হয়নি।

—আমি শোনার জন্য প্রস্তুত।

—এখেনে? এই পাঁচপেঁচি ভিড়ের মধ্যে? চলো, আমরা কোনোখানে গিয়ে বসি। অনেকক্ষণ ধরে মনের কতা কই।

—আপনার সঙ্গে মনের কথা কইবার মতন সখ্য আমার ছিল বলে তো মনে পড়ে না।

—সেই কতাই তো বলচি। তেমন সখ্য হলো না সেটা তো আমারই দুর্ভাগ্য। কিংবা দুর্ভাগ্যই বা বলচি কেন, আমারই সম্পূর্ণ নিজস্ব দোষ। যে পাপ আমি করিচি···

—আমাকে সত্যিই এবারে যেতে হবে।

—যাবে মানে? তুমি আমায় ক্ষমা করোচো কিনা না জেনেই আমি তোমায় ছাড়বো ভেবোচো? কক্ষনো না।

—ক্ষমা?

—চন্দ্রনাথ, আমিই সেই মহাপাতক। তোমার মনে আচে কি না জানি না, আমিই মনে করিয়ে দিচ্চি···সেই যে একদিন সন্ধেবেলা বাগবাজারে আমাদের বাড়িতে···কিসের যেন নেমন্তন্ন ছেল···হ্যাঁ, মনে পড়েচে, আমার ছোট বোনের বিয়ে···বাইরে কাঙালী ভোজন হচ্চিল···আহা-হা ভাবলেও এখন বুক ফেটে যায়···তুমি আমার সতীর্থ হয়ে কিনা কাঙালীদের মধ্যে বসেচিলে···আমার কি উচিত ছেল না তোমার হাত ধরে তোমায় ভেতরে নিয়ে গিয়ে পঙ্‌ক্তিভোজে বসানো···তা না করে আমি কী করিচি! আমার ছোটকাকাকে ডেকে বলিচি, ছোটকাকা, এই সেই বেশ্যার ছেলেটা আমাদের কলেজের নাম ডোবাচ্চে···তোমাকে মারতে মারতে হটিয়ে দেওয়া হলো···তোমার মনে আচে?

চন্দ্রনাথ চুপ করে রইলো। জীবনের এইসব ঘটনা কেউ কি কখনো ভুলতে পারে?

রতনমণি বললো, তখন ভেবেচিলুম, কতই যেন বাহাদুরীর কাজ করলুম...তারপর তিন চার বচর পরে একদিন...তখন আমি আরও অনেক পড়াশুনো করিচি, অনেক শাস্ত্র পাঠ করিচি, দর্শন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিচি...হঠাৎই একদিন মনে হলো, আমি কতখানি অমানুষের মতন ব্যবহার করিচি তোমার সঙ্গে। তোমাকে কতখানি দাগা দিইচি!

রতনমণির চক্ষু দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগলো। চন্দ্রনাথ তা সত্ত্বেও কোনো প্রতি-উত্তর দিল না, একদৃষ্টে চেয়ে রইলো রতনমণির দিকে।

পকেট থেকে রুমাল বার করে চক্ষু মুছে রতনমণি আবার বললো, আজ আমার প্রায়শ্চিত্ত হলো। চলো, তুমি কোতায় যাবে, তোমার সব কতা শুনবো।

চন্দ্রনাথ কোথায় যাবে তা সে নিজেই জানে না। চার বৎসর পর সে ফিরলো কলকাতায়। শ্মশানে মাতৃমুখ দেখে সেই যে ছুট দিয়েছিল, তারপর তার জীবনের অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এ শহরে আর কোনদিন সে আসবে না ভেবেছিল। হঠাৎ এক সময়ে এক সাহেবের নেকনজরে পড়ে যায়। তার ইংরিজিজ্ঞান দেখে মুগ্ধ হয়ে সাহেবটি তাকে বর্ধমান রেল স্টেশনে একটা চাকরি দিয়েছে। নিতান্ত উদ্দেশ্যহীনভাবেই তার এবার কলকাতায় হঠাৎ আসা।

রতনমণি চন্দ্রনাথের কোনো আপত্তিই শুনলো না। প্রায় জোর করেই তাকে টানতে টানতে নিয়ে এলো রাস্তায়, তারপর একটা পাল্‌কি ডেকে তাকে নিয়ে চললো নিজের বাড়িতে।

চন্দ্রনাথ কলকাতা শহরে ফিরে এসেছে নতুন মানুষ হয়ে। এখন সে উত্তম পরিচ্ছদে ভূষিত, তার শারীরিক শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্থবল। রেলওয়েতে কয়েক বৎসর চাকুরি করে সে বেশ কিছু অর্থ সঞ্চিত করতে পেরেছে। সে মিতব্যয়ী, মিতাহারী এবং কোনোরকম নেশা ভাং করার অভ্যেস তার নেই, তা ছাড়া এই চাকুরিতে উপরি রোজগার হয় অনেকটা বিনা আয়াসেই। আকৃতিতেও সে প্রকৃত রূপবান, তার দিকে যে-কেউ একবার দৃষ্টিপাত করলেই দ্বিতীয়বার তাকাবে। এমন দীর্ঘকায় পুরুষ বঙ্গবাসীদের মধ্যে কচিৎ দেখা যায়, গাত্রবর্ণ গৌর, শুধু তার ওষ্ঠের রেখায় যেন ঈষৎ বাঁকা ভাব পরিস্ফুট।

রতনমণি জোর করে চন্দ্রনাথকে টেনে নিয়ে এলো স্বগৃহে এবং এমন আদরযত্ন করতে লাগলো, যেন কোনো গুরুঠাকুর এসেছেন। বাগবাজারে তাদের প্রকাণ্ড তিনমহলা বাড়ি, বাইরের দিকের এক অংশে আছে সুসজ্জিত অতিথিশালা, সেখানে স্থান দেওয়া হলো চন্দ্রনাথকে। কিন্তু এত খাতিরের আদিখ্যেতায় দু'দিনেই অস্থির হয়ে উঠলো চন্দ্রনাথ, তা ছাড়া রতনমণি যতই ভাবোচ্ছ্বাস দেখাক কিছুতেই তাতে চন্দ্রনাথের হৃদয়ে সাড়া জাগে না।

কিছুদিন আগে এ বাড়িতে রতনমণির বিধবা ভগিনী কুসুমকুমারীর পুনর্বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে উৎসবের রেশ এখনো যায় নি, দূর দূর থেকে আগত আত্মীয়স্বজনে ভবন পরিপূর্ণ। বাড়িতে এত ভিড় বলেই রতনমণি চন্দ্রনাথের কাছে এসে নিভৃতি খোঁজে। তার গল্পের আর শেষ নেই।

তাদের বাড়িতে এই বিধবা বিবাহ যে কতখানি গর্বের ব্যাপার সে কথা বারবার সবিস্তারে শোনায় রতনমণি। আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই এর বিরোধিতা করেছিল প্রথমে। কিন্তু রতনমণির পিতা কৃষ্ণনাথ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এই বিবাহে যারা আসবে না তাদের সঙ্গে ইহজীবনে তিনি আর কোনো সম্পর্ক রাখবেন না। তখন প্রায় সকলেই আমতা আমতা করে মত পরিবর্তন করেছে। যে বনস্পতির ছায়ায় তাদের আশ্রয়, সেই বনস্পতির গাত্রে কুঠারাঘাত করতে তাদের সাহসে কুলোয় নি। বিবাহের দিন গোলমালের আশঙ্কায় প্রায় একশত পুলিস নিযুক্ত করা হয়েছিল প্রহরায়, শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি অবশ্য। আর কত গণ্যমান্য মানুষ এসেছিলেন, তাঁদের নাম বলে শেষ করা যায় না।

এই বিবাহের ফলে রতনমণির বুকে অনেকখানি ভরসা জেগেছে। কিছুদিন ধরেই সে একটি বাসনা পরিপোষণ করছিল, সে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিতে চায়। এ বাড়িতে এ পর্যন্ত কেউ ব্রাহ্ম হয়নি। তবে

রতনমণির পিতা যখন কন্যার পুনর্বিবাহ দেবার মতন উদার হয়েছেন, তখন এক পুত্রের ধর্মান্তর গ্রহণেও হয়তো আপত্তি করবেন না।

রতনমণি বললো, চন্দ্রনাথ, তুমি ব্রাহ্ম হবে ? চলো, তোমাতে আমাতে একদিন দেবেন্দ্রবাবুর কাছে যাই।

চন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছে লোহার শিক বসানো গবাক্ষের ধারে। এখান থেকে এ বাড়ির সদর দেউড়ি স্পষ্ট দেখা যায়। ঐ দেউড়ির বাইরে সে একদিন কাঙালী পংক্তির মধ্যে খাওয়ার আশায় বসেছিল, তাকে মারতে মারতে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এখনও প্রত্যেকদিনই ওখানে কাঙালীরা এসে আশায় আশায় বসে থাকে, সেদিকে তাকালেই চন্দ্রনাথের মনে হয়, সেও যেন কৈশোরের শরীর নিয়ে ওদের মধ্যে রয়েচে।

মুখ ফিরিয়ে সে অন্যমনস্কভাবে বললো, ব্রাহ্ম ? কেন ?

রতনমণি বললো, তুমি ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে কিছু জানো না ? বেশ তো আমি তোমায় খানকতক বই পড়তে দোবো। ভাই, আমি এই নবধর্মের মধ্যে সংস্কারমুক্ত পবিত্রতার সন্ধান পেয়েচি। একেশ্বরবাদী হওয়া ছাড়া এই অনড় স্থবির হিন্দুধর্মের কোনো মুক্তি নেইকো। এত জাতপাত ছোঁয়াছুঁয়ি। এত অবিচার...

চন্দ্রনাথ বললো, বর্ধমানে আমি এতদিন একা একা থেকিচি, সেই সময় পড়িচি অনেক বই, ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে আমার কিছু জানতে বাকি নেই। শুধু একটা বিষয় জানতে পারিনি বা বুঝতে পারিনি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরমশায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার ঘোচাতে চাইচেন বেশ কতা, কিন্তু তিনি কি তাঁর পাল্কী বেহারা কিংবা বাড়ির চাকর-বাকরদের ঐ ধর্মে দীক্ষা দিয়েচেন ?

রতনমণি খাঁটি বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, চাকরদের দীক্ষা দেবেন ? কেন ?

—কেন, চাকররা বুঝি হিন্দু নয় ? তাদের মুক্তির দরকার নেই ?

—তুমি কী বলচো, মাথামুণ্ডু ছাই বুজতেই পাচ্চি নি ! চাকররা দীক্ষা নেবে ? তারপর পাঁচজন ভদ্দরলোকের সঙ্গে এক সাথে প্রার্থনায় বসবে ? হে-হে-হে ! কেউ দীক্ষা দিতে চাইলেই বা সে ব্যাটাদের সাহস হবে কেন ? তারা রাজিই হবে না !

—আফ্রিকা থেকে যে-সব নিগ্রোদের আমেরিকায় ক্রীতদাস হিসেবে নেওয়া হয়েচে, তারাও কিন্তু খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা পেয়েচে। সেখেনে প্রভু-ভৃত্য সব এক ধর্মের। তোমাদের বুঝি আলাদা।

—তুমি যা বলচো, এবার বুজিচি, হ্যাঁ, একদিন সারা দেশের সকলেই ব্রাহ্ম হবে, কিন্তু তার আগে, দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগে দলে আনা হোক, আগে ভালো করে দানা বাঁধুক !

—আমি দীক্ষা নিতে চাইলে আমায় দেওয়া হবে ?

—কেন হবে না ? তোমার মতন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান মানুষকে আমাদের মধ্যে পেলে...

—সেখেনে আমায় নিশ্চয়ই আত্মপরিচয় দিতে হবে ? আমি বলবো, আমার জননী ছিলেন বেশ্যা, আমার পিতা কে তা আমি জানি না।

—এ হে হে, ওসব থাক্। তুমি ওসব আগবাড়িয়ে বলতে যাবে কেন ?

—অর্থাৎ আমাকে মিথ্যে পরিচয় দিতে বলচো ! অথচ বইপত্তর পড়ে দেকিচি, ব্রাহ্মদের জীবনে মিথ্যার কোনো স্থান নেই, তাঁরা সত্যের উপাসক। আমি জানি, তোমাদের এই সব সংস্কার আন্দোলন শুধু সমাজের উচ্চবর্ণ বামুন কায়েতদের জন্য। আর আছে বণিকশ্রেণী। একালে জমিদারদের চেয়ে বণিকরাই বেশী শক্তিমান। তারা অভিজাত সাজবার জন্য পুরোনো জমিদারি কিনে নিচ্চে অপর সমাজের চূড়ায় ওঠবার জন্য দু' হাতে টাকা ছড়িয়ে দয়ালু পরোপকারী আর সমাজ সংস্কারক সাজচে !

—তুমি এত রেগে যাচ্চো কেন ?

—তোমাদের বিদ্যেসাগর মশাইয়ের কাছেও গিয়ে আমি একটা কথা জেনে আসবো। বিদ্যায় বুদ্ধিতে আমি অন্য অনেকের চেয়েই খাটো নই। কিন্তু আমি যদি বিধবা বিবাহ কত্তে চাই, তিনি আমার বিয়ে দিতে রাজি হবেন ? তিনি নিজে উপস্থিত থেকে আমার বিয়ে দেবেন ? মন্ত্রপাঠের সময় যখন আমার পূর্বপুরুষদের নাম জিজ্ঞেস করা হবে, আমি পরিষ্কার বলবো, আমি জারজ, আমার কোনো পিতৃপরিচয় নেই।

—চন্দ্রনাথ, ঐ জ্বালা তুমি আর বুকে পুষে রেক না। ওসব পুরোনো কতা ভুলে যাও !

—আমি কিছুই ভুলবো না ! আর জীবনে কখনো মিথ্যে কতা বলবো না বলে শপথ নিয়েচি !

—কিন্তু সর্বক্ষণ বুকের মধ্যে এরকম রাগ বইলে তুমি তো জীবনে কিছুই কত্তে পারবে না। জীবনে

ভালো ভালো দিকগুলোন উপভোগ কত্তে গেলে মনটাকে নির্মল রাখতে হয়।

—যে মানুষ অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার করতে চায়, তার ক্রোধী ও জেদী থাকাই উচিত। দেকো, তোমাদের এই সমাজটার একদিন আমি ঘাড় মটকাবো!

—হা-হা-হা-হা-হা।

—হাসচো, হাসো। শোনো, তোমাদের এই ব্রাহ্মধর্ম কিংবা বিধবা বিবাহটিবাহ এসবই অতি ছেঁদো ব্যাপার। মুষ্টিমেয় লোকের হুজুক। মানুষের মধ্যে কোনো উচ্চ নীচ শ্রেণী থাকবে না, সব মানুষ সমান হবে, সমান অধিকারের সুযোগ পাবে, এই কতাটা প্রচার করাই এখন প্রকৃত ধর্ম।

—সব মানুষ সমান হবে? এইসব আজগুবী কতা তোমার মাতায় ঢুকলো কী করে? হাতের পাঁচটা আঙুল কখনো সমান হয়? হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হলে সে হাতে যেমন কোনো কাজ চলে না, তেমনি সব মানুষ সমান হলে তখুন আর সমাজও চলবে না! তা হলে কেউ আর প্রজা থাকবে না, সবাই রাজা হতে চাইবে!

—কেউ রাজাও হবে না, কেউ প্রজাও থাকবে না। গুণ অনুসারে যে-যার নিজের কাজ করবে। আসল কতা হলো, সকলে সমান অধিকার পাবে। চণ্ডীদাস নামে এক কবির নাম শুনেচো? তিনি গেয়েছিলেন, শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

—ও, তিনি তো বোষ্টম ছেলেন না? তা তুমি বোষ্টমদের দলে ভিড়তে পারো অবশ্য। ওরা শুনিচি জন্ম পরিচয়ের ধার ধারে না। যার তার সঙ্গে কণ্ঠী বদল কল্লেই ওদের বে হয়ে যায়। ওদের খুব মজা।

—অর্থাৎ তুমি ওদের বিদ্রূপ কচ্চো। ওরা জাতের বিচার মানে না, বংশ পরিচয় তোয়াক্কা করে না বলেই তোমাদের চক্ষে ওরা বিদ্রূপের পাত্র। তুমি আমাকে এ বাড়িতে ডেকে এনোচো শুধু তোমার আত্মশ্লাঘায় সুড়সুড়ি লাগাতে, আমাকে সম্মান করতে নয়! সে আমি প্রথমেই বুঝিচি। আই নো ইয়োর টাইপ। আই হ্যাভ সীন এনাফ অফ দিস কাইণ্ড অফ হিপোক্রিসি।

এর অল্প পরেই চন্দ্রনাথ নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে রতনমণির গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো। তারপর একটি কেরাঞ্চি গাড়িতে অনেকক্ষণ ঘুরে শেষ পর্যন্ত একটা বাসা ভাড়া পেল বৈঠকখানা অঞ্চলে। বর্ধমান ছেড়ে কলকাতায় আসবার সময় তার মাথায় কোনো পরিকল্পনা ছিল না, ভেবেছিল দু-চারদিন ঘুরে চলে যাবে। এখন সে ঠিক করলো, এখানে বেশ কিছুদিন থাকবে। রেলের চাকুরিতে ইতিমধ্যেই সে মনে মনে ইস্তফা দিয়ে ফেলেচে।

সন্ধ্যাকালে বাড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো পথে। গাড়ি ধরলো না, পদব্রজেই ঘুরতে লাগলো উদ্দেশ্যহীনভাবে।

কলুটোলার কাছে অনেক দোকানপাট এই সময়েও খোলা থাকে। প্রত্যেক দোকানের বাইরে দাউ দাউ করে জ্বলছে মশাল। খরিদ্দারদের ভিড়ে স্থানটি রম্ রম্ করে। এক দোকান থেকে চন্দ্রনাথ একটি মজবুত ছড়ি কিনলো, তার ইংরেজি-আনা পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে। তার গাত্রবর্ণ ও পোশাকের সামঞ্জস্যের জন্য অনেকে তাকে সাহেব মনে করে। দেশীয় লোকরাই এমন ভুল করবে, সাহেবরা নয়। অবশ্য ট্যাঁস ফিরিঙ্গি হিসেবে সে নিজেকে চালিয়ে দিতে পারে স্বচ্ছন্দেই। ছড়িতে ভর দিয়ে সে অলস পদক্ষেপে হাঁটিতে লাগলো।

মনের গতি অনেক সময় মানুষ নিজেই বুঝতে পারে না। চরণের গতির সঙ্গে মনের গতি মিলে যায়, তবু মানুষ অবাক হয়। এক সময় চন্দ্রনাথ সত্যিই বিস্মিত হলো দেখে যে কখন অজান্তে সে শ্মশানের ধারে পৌঁছে গেছে। এইখান থেকেই একদিন এক দৌড়ে সে কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিল; সেইজন্যই এই একই স্থানে তাকে কে যেন টেনে এনেছে।

শ্মশানের পরগাছাদের নিয়ে চন্দ্রনাথ এখানে যে একটি দল গড়েছিল, সেরকম যে দু'জন চণ্ডালকে চন্দ্রনাথ এখানে দেখে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন এখনো আছে, অন্যজনের বদলি নতুন লোক এসেছে। পুরোনো চণ্ডালটি কি চিনতে পারবে যে এই নীল রঙের কোট-প্যান্টালুন ও মাথায় হ্যাট পরা মানুষটিই এককালের সেই চাঁদু, যে এখানে নেংটি পরে ডাণ্ডা হাতে নিয়ে হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে বেড়াতো? চন্দ্রনাথ অবশ্য চণ্ডালটিকে দেখা মাত্র চিনতে পেরেছে। সে কিছুই ভোলে না, জ্ঞান-উন্মেষের পর থেকে তার জীবনের সমস্ত ঘটনাই তার মনে আছে।

সব মিলিয়ে শ্মশানের দৃশ্য ঠিক একইরকম রয়েছে মনে হয়। পর পর তিনটি চিতা জ্বলছে, একদিকে জমিয়ে তাড়ি ও গাঁজা খাচ্ছে শ্মশান-বন্ধুরা, আর এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে শোকে মুহ্যমান আত্মীয়স্বজন। মাংসপোড়ার গন্ধ চন্দ্রনাথের খুব পরিচিত লাগে। কতদিন সে এখানে

চিতার পোড়া কাঠ দিয়ে দাঁত মেজেছে।

চন্দ্রনাথ এসে গঙ্গার ঘাটের কাছে দাঁড়ালো। নদীটি যেন তাকে চিনতে পেরেছে, নদী মুখ ফুটে কোনো সম্ভাষণ জানায় না, তবু বোঝা যায়। অন্ধকারের মধ্যে চন্দ্রনাথ নামতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। একেবারে শেষ ধাপে খালি গা, ধুতি মালকোচা মেরে পরা একটি তেরো-চোদ্দ বছরের কিশোর দাঁড়িয়ে আছে জলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে।

চন্দ্রনাথ আমূল চমকে উঠলো। এ যেন তারই প্রতিরূপ। গৃহত্যাগ করে একদিন ঠিক এই বয়সে, এই রকম অবস্থাতেই সে শ্মশানের প্রান্তে ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল না ? চন্দ্রনাথের বিভ্রম হলো, যেন মনে হলো সত্যিই সে নিজেই এভাবে দাঁড়িয়ে আছে, আবার দ্বিতীয়বার তার জীবন শুরু হচ্ছে।

সে জিজ্ঞেস করলো, এই, তুমি কে ?

ছেলেটি মুখ ফেরালো। তার দু' চোখে শুকনো জলের রেখা। বোধ হয় সে তার পিতা বা মাতাকে দাহ করতে এসেছে। চন্দ্রনাথের বুকটা মুচড়ে উঠলো। সে প্রায় তার হাত রাখতে গেল ছেলেটির কাঁধে। যদিও পুরোনো অভিজ্ঞতায় চন্দ্রনাথ জানে, শ্মশানে কারুকে সান্ত্বনা জানাতে নেই। এখানে কান্নাতেই চিত্তশুদ্ধি হয়। তা ছাড়া কী সান্ত্বনাই বা সে দেবে !

কাছাকাছি একজন অচেনা মানুষকে দেখে ছেলেটি নিজেকে সামলে নিয়ে ওপরে উঠে গেল। চন্দ্রনাথ নিচু হয়ে গঙ্গা থেকে এক আঁজলা জল তুলে নিয়ে মাথা থেকে টুপী খুলে সেখানে সেই জল ছোঁয়ালো। চন্দ্রনাথের এ পৃথিবীতে প্রিয় বস্তু কিছুই নেই, তবু একথা ঠিক, একদিন সে এই নদীকে ভালোবেসেছিল।

অন্ধকারে প্রবহমানা নদীর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো চন্দ্রনাথ। এক সময় তাকে ঘিরে ধরলো শ্মশানের নন্দী ভৃঙ্গীরা চন্দ্রনাথ সচকিত হয়ে ফিরে তাকালো। তারপরই সজোরে হেসে উঠলো হা-হা করে। সত্যিই তো কিছু বদলায় না। এক সময় এরকম অন্ধকারে কোনো শাঁসালো-মালদার চেহারার লোককে একা দেখলে সেও তার দলবল নিয়ে তাকে ঘিরে ধরতো না ? লোকটার সব কিছু কেড়েকুড়ে সর্বস্বান্ত করে ছাড়তো। এখন এই ছেলের দলও তাকে সেইরকম কোনো লোক ভেবেছে। হাতের ছড়িটা তুলে সে অনেকটা সস্নেহেই বললো, যাঃ ! যাঃ ! অন্য জায়গায় যা।

চন্দ্রনাথ এর পর চলে এলো বউবাজারে। এ পথেও রাত্রি যত বেশী হয়, তত লোকজন জাগে। ফেরিওয়ালারা ঘন ঘন বেলফুল হেঁকে যায়, সেই সঙ্গে তপসে মাছ, গুলাবি রেউড়ি আর ধূপধুনো। দু'দিক থেকে আসা দুই ল্যাণ্ডো বা ফিটন গাড়ির ঘোড়া পাশাপাশি গ্রীবা বাঁকিয়ে ফ-র-র শব্দে কিছু বাক্য বিনিময় করে। এই সব কিছু ছাপিয়ে যায় মাতালের হল্লা।

যে বাড়িতে হীরা বুলবুল থাকতো, যেখানে চন্দ্রনাথ জন্মেছে, সেই বাড়িটির রঙ পালটানো হয়েছে, আগে ছিল ফিকে নীল, এখন হলুদ। মেরামতির কাজও কিছু হয়েছে মনে হয়। সব ঘরে আলো, সব ঘরে ঘুঙুর-তবলার শব্দ এবং কলকণ্ঠ। হীরা বুলবুলের সব চিহ্ন হারিয়ে গেছে এখান থেকে, তবু জীবন তার নিজের নিয়মে চলেছে!

ছড়িতে ভর দিয়ে সেই বাড়ির অদূরে পথের ওপর দাঁড়িয়ে রইলো চন্দ্রনাথ। তার বক্ষে কোনো স্মৃতির উদ্বেলতা নেই, বরং ক্রমশ পুঞ্জীভূত হচ্ছে ক্রোধ। এই গৃহটিকে সে যেন সহ্য করতে পারছে না কিছুতেই। এটাকে যেন সে এখুনি ভেঙে ফেলতে চায়, পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক এই পাপ-পুরী।

কয়েকটি দালালশ্রেণীর লোক ঘোরাঘুরি করছে বাইরে। চন্দ্রনাথকে বাড়িটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে দেখে তারা তাকে কোনো লোভী ইদুস-পিদুস জাতীয় ফিরিঙ্গি মনে করলো। একজন কাছে এসে বললো, কম্ কম্ সার, প্রেটি গার্ল, হিন্দু গার্ল, মুসলমান গার্ল, চীপ্ রেট সার—।

চন্দ্রনাথ কিছু বলবার আগেই হুড়মুড়িয়ে একটা ল্যাণ্ডো গাড়ি এসে পড়লো প্রায় তার গায়ের ওপর, ঘোড়াটি শূন্যে সামনে দু' পা উঁচে তুলে চি হিঁ-হিঁ-হি করে উঠলো। ল্যাণ্ডো থেকে নামলো স্থূলকায় এক বাবু। বাঁ হাতের কব্জিতে গোড়ের মালা জড়ানো, চক্ষু দুটি জবাফুলের মতন লাল। গাড়ি থেকে নেমেই বাবুটি বেসামাল অবস্থায় ঘুরে গেলেন এক পাক, তাঁর ধুতিটি দুলতে লাগলো ঘাগরার মতন। তিনি জড়িত কণ্ঠে বললেন, ওরে কে আচিস, ধন্না আমায়।

সামনে চন্দ্রনাথকে দেখে তিনি তার কাঁধটাই খামচে ধরলেন এক হাতে। চন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁকুনি দিয়ে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। তার মধ্যেই এক দালাল এসে তাঁকে ধরে ফেলেছে।

বাবুটি বক্রচোখে চন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ হুম্‌দো মদ্দোটা ক্যা র‍্যা ? রাস্তার মদ্যিখানে ধম্মের ষাঁড়ের মতন খাড়িয়ে আচে কেন ?

দালাল বলল, চলুন, চলুন, আমি ধচ্চি !

বাবুটি বললেন, চ, আমায় নিয়ে চ, আজ বিম্‌লি খালি আচে তো ? যিদিনকেই আসি সিদিনেই শালী ঐ যেদো মল্লিকের সঙ্গে···ঐ তো ওর ঘরে নীল লণ্ঠন জ্বলচে।

এই বাবুটিকে চন্দ্রনাথ কোনোদিন আগে দেখেনি, এর প্রতি তার বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ হবার কোনো কারণ নেই, তবু যেন দপ্‌ করে তার সারা শরীরে আগুন ধরে গেল। লোকটি যে ঘরটির দিকে আঙুল তুলে দেখালো, ঐটাই ছিল তার জননী হীরা বুলবুলের শয়নকক্ষ।

হাতের ছড়িটা তুলে চন্দ্রনাথ বাবুটিকে সপাং সপাং করে প্রাণপণে পিটিয়ে যেতে লাগলো পাগলের মত।
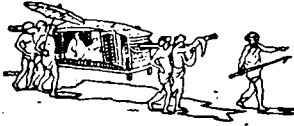
হরিশের মৃত্যু নবীনকুমারের বক্ষে একেবারে তীব্র শেলসম বাজলো। কয়েক দিন প্রায় হতচেতনের মতন পড়ে রইলো সে। অমন স্বাস্থ্যবান, অমন তেজস্বী, সব সময় উৎসাহে ভরপুর মানুষটি চলে গেল অকস্মাৎ ! আর যে সময় হরিশকে দেশবাসীর সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল, সেই সময়টা সে অপসৃত হলো ! বিশ্বনিয়ন্তার এ কি অবিচার ! আর কী-ই বা বয়েস হয়েছিল হরিশের, মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর !

এক সময় শোক সামলে উঠতেই হলো নবীনকুমারকে। হরিশ বহু কাজ অসমাপ্ত রেখে গেছেন, এখনই সেগুলি জোড়া লাগাবার চেষ্টা না করলে একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। বিশেষত হিন্দু পেট্রিয়টের মতন পত্রিকা বন্ধ হতে দেওয়া চলে না কিছুতেই।

হরিশ অর্থ উপার্জন করেছেন প্রচুর, আবার তাঁর খরচের হাতও ছিল অতি দরাজ, নীল চাষীদের জন্য তিনি অকুণ্ঠভাবে ব্যয় করেছেন। মৃত্যুর পর দেখা গেল হরিশ ভবানীপুরে একটি ছোট বসত বাড়ি আর হিন্দু পেট্রিয়টের মুদ্রাযন্ত্র ছাড়া আর কিছুই রেখে যাননি। তাঁর বিধবা পত্নী ও মাতার গ্রাসাচ্ছাদন হবে কী করে তারও কোনো ব্যবস্থা নেই !

হরিশের শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে যাবার পর নবীনকুমার একদিন ধীর পদে হিন্দু পেট্রিয়ট দফতরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো। এখানে হরিশ নেই, তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বর, দরাজ হাস্য আর শোনা যাবে না, এ যেন কল্পনাই করা যায় না। নবীনকুমারের শরীর অবশ হয়ে আসে। তার মনে হয়, পৃথিবীতে তার আর একজনও বন্ধু নেই।

পত্রিকা দফতরে একটি যুবক একলা চুপ করে বিষণ্ণ বদনে বসে আছে। এই যুবকটির নাম শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এই যুবকটি কিছুদিন হরিশের সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদনায় সহকারিত্ব করেছে। ছাত্রাবস্থা থেকেই অনেক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শম্ভুচন্দ্র, এক সময় সে নিজেও স্বতন্ত্রভাবে একটি কাগজ বার করতে চেয়েছিল, কিন্তু অর্থের সঙ্গতি নেই। যুবকটি ইংরেজী লেখে চমৎকার, যুক্তিজ্ঞান বেশ তীক্ষ্ণ এবং হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতি আছে। এই দফতরেই শম্ভুচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাকে নবীনকুমারের ভালো লেগে যায়, এক কথায় নবীনকুমার তার পরিকল্পিত পত্রিকার জন্য কিনে দেয় একটি মুদ্রণ যন্ত্র। শম্ভুচন্দ্র তখন 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন' নামে পত্রিকা বার করলো, কিন্তু চললো না বেশীদিন।

শম্ভুচন্দ্র নবীনকুমারের চেয়ে সামান্য বয়েসে বড় হলেও নবীনকুমারকে দেখে সে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো। দু'জন পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত, একটিও কথা বললো না। পুরুষ মানুষ অন্য পুরুষ মানুষের সামনে আর কী ভাষায় শোক প্রকাশ করবে ! নীরবতাই এখানে বাঙ্ময়।

হরিশ নেই বলেই ঘরখানি যেন নিদারুণ শূন্য মনে হচ্ছে। নবীনকুমার চর্তুদিকে চক্ষু বোলাতে লাগলো। সর্বত্রই হরিশের চিহ্ন। দেওয়ালে একটি হুকে ঝুলছে এক গাদা পৈতে। ব্রাহ্মণ সন্তান হরিশ

মুখুজ্যে ব্রাহ্ম হবার পর ঢাক ঢোল পিটিয়ে, লোকজন ডেকে উপবীত পরিত্যাগ করেননি বটে, তবে ঐ সুতোগাছিগুলোর প্রতি তাঁর বিশেষ সম্মানবোধও ছিল না। প্রায়ই গা থেকে পৈতে খুলে ঝুলিয়ে রাখতেন দেয়ালে, কখনো কখনো গ্যালি প্রুফের আপতন বোঝার জন্য ঐ পৈতে দিয়েই মেপে নিতেন, আবার বাড়ি ফেরার সময় পরে নিতেন গলায়। শেষদিন আর পরা হয়নি।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, এ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবে?

শম্ভুচন্দ্র বললো, আর তো উপায়ান্তর দেখি না! এ ছাপাখানাও রক্ষা করা যাবে না বুঝি। নীলকর সাহেবরা ওঁর নামে মানহানির মামলা ঝুলিয়ে রেখেছে, ওঁর মৃত্যু হলেও প্রতিশোধ নেবার জন্য সাহেবরা এই ছাপাখানা ক্রোক করে নিতে পারে।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, তা পারে?

শম্ভুচন্দ্র বললো, সাহেবদের পক্ষে অবশ্যই সম্ভব। এই ছাপাখানাটিও গেলে হরিশের পরিবার একেবারে সর্বস্বান্ত হবে!

নবনীকুমার কয়েক মুহূর্ত মাত্র চিন্তা করলো। তারপর প্রশ্ন করলো, আর কেউ যদি তার আগেই এই ছাপাখানা এবং পত্রিকার স্বত্ব কিনে নেয়!

—তা হলে বাঁচানো যেতে পারে অবশ্য!

—এই ছাপাখানার মোট দাম কত হবে বলে আপনার মনে হয়?

—যন্ত্রটি পুরোনো হয়ে গ্যাচে, টাইপগুলিও বহু ব্যবহৃত, তা তবুও হাজার বারোশো টাকা দাম উঠবে নিশ্চয়!

—আপনি হরিশের মা ও স্ত্রীকে গিয়ে বলুন, আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে এই সমুদয় কিনে নিতে চাই।

—কত টাকা বললেন?

—পাঁচ হাজার টাকা। আশা করি সেই টাকার সুদে দুই বিধবার সারা জীবনের খরচ চলে যাবে।

শম্ভুচন্দ্র খানিকক্ষণ বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইলো। তারপর অস্ফুট স্বরে বললো, আপনি হাজার টাকার জিনিস পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কিনবেন? এমন অদ্ভুত দরাদরির কতা কখনো শুনিনি। কলকাতা শহরে বড় মানুষ অনেকই আচে, কিন্তু আপনার মতন সৎ কাজে ব্যয় করতে জানে ক'জন? আপনি...

নবীনকুমার হাত তুলে এই সব অবান্তর কথা বন্ধ করিয়ে দিয়ে বললো, আপনি ব্যবস্থা করুন, আমি কালকের মধ্যেই টাকা দিয়ে সইপত্তর করে সব পাকা করে নিতে চাই। আমি নামে মালিক হলেও এ পত্রিকা চালাতে হবে আপনাকেই।

—আমি চালাবো?

—হ্যাঁ। আপনি একা না পারেন, গিরিশ ঘোষকে ডেকে নিন, কাগজের ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা আচে—আপনারা সম্পাদনার ভার নেবেন, খরচপত্তরের দায়িত্ব সব আমার। এ পত্রিকা কিছুতেই বন্ধ হতে দেওয়া হবে না!

যে কথা সেই কাজ! নবীনকুমারের অধ্যবসায়ে কয়েকদিনের মধ্যেই হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা আবার চালু হয়ে গেল। সেখানেই নিবৃত্ত হলো না নবীনকুমার। হরিশের স্মৃতি রক্ষার জন্য সে উঠে-পড়ে লাগলো। স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হরিশকে যদি দেশবাসী ভুলে যায় তবে তার চেয়ে কৃতঘ্নতা আর কিছুই নেই।

কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে নবীনকুমার গঠন করলো হরিশচন্দ্র মেমোরিয়াল কমিটি। হরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থে যার যথাসাধ্য দান করার জন্য আবেদন জানিয়ে মর্মস্পর্শী ভাষায় একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করে বিতরণ করলো সে। এই স্মৃতিভাণ্ডারে প্রথমে সে নিজেই দিল পাঁচ শত টাকা। কিন্তু দেখা গেল দরিদ্র সাধারণ মানুষ অনেকেই এক টাকা, দু টাকা, পাঁচ টাকা পাঠালেও বিশিষ্ট ধনী যাঁরা পাঁচ শত, হাজার টাকা দানের মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁরা কেউ আসলে কিছুই দিলেন না। নবীনকুমার তখন মেমোরিয়াল কমিটির কাছে এক প্রস্তাব দিল, হরিশের নামে এক স্মৃতি মন্দির নির্মাণ করা হোক, যেখানে থাকবে একটি গ্রন্থাগার, উৎসাহী ছাত্রদের জন্য গবেষণার সুযোগ এবং একটি পাবলিক হল, যেখানে দেশীয় লোকেরা সভাসমিতি করতে পারবে। এ শহরে স্থানীয় লোকদের ব্যবহার উপযোগী একটিও হল নেই। এবং এই স্মৃতি মন্দিরের জন্য নবীনকুমার এখুনি বাদুড়বাগানে দুই বিঘা জমি দান করতে প্রস্তুত আছে।

তবু কমিটির সভ্যদের বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। সকলেই যে-যার স্বার্থ সামালাতে ব্যস্ত। চাঁদা যা উঠেছে তা অন্য কাজে লাগাবার জন্য এক একজন এক একরকম পরামর্শ দেয়। কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের খুব আগ্রহ ও লোভ হরিশের পত্রিকাটি হস্তগত করার।

বীতশ্রদ্ধ হয়ে নবীনকুমার নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেল এই সব ব্যাপার থেকে। হরিশের মতন স্বার্থত্যাগী মানুষকেও যদি মৃত্যুর পরেই লোকে এমন অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তা হলে এ দেশে আর সত্যিকারের আদর্শবান পুরুষ জন্মাবে কী করে? জীবিতাবস্থায় হরিশকে নিয়ে যারা মাতামাতি করেছে, যারা তার স্তুতি গেয়েছে, এখন তারাই বক্রভাবে বলে, হ্যাঁ, হরিশ অনেক বড় বড় কাজে হাত দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু নিজেই অমিতাচার করে অকালে প্রাণটা খোয়ালেন।

মেমোরিয়াল কমিটির সভা থেকে একদিন রাগতভাবে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে নবীনকুমার মনে মনে বলতে লাগলো, বন্ধু, পরকাল বলে কিছু আচে কিনা আমি জানি না, তুমি কোনো জায়গা থেকে আমার কতা শুনতে পাবে কি না তাও জানি না, তবু আমি বলচি, আর যে-ই তোমায় ভুলে যাক, আমি যতকাল বেঁচে থাকবো, আমি তোমায় কখনো একদিনের জন্যও বিস্মৃত হবো না! বন্ধু, এমনভাবে আমায় একা ফেলে চলে গ্যালে!

নিজ গৃহে সারা দিনের মধ্যে বোধ হয় একদণ্ডও কাটায় না নবীনকুমার। শোক ভুলবার জন্য সে নিজেকে যেন শত কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে। শুধু কাজ আর কাজ! সান্ধ্য বিনোদনের জন্যও সে যায় না কোথাও। হরিশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মুলুকচাঁদের আখড়া বন্ধ হয়ে গেছে, নবীনকুমারও আর মদ্য পান করে না। সর্বক্ষণ সে লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত।

একেবারে মুখের ভাষায় সে যে ছোট ছোট নকশাগুলি লিখছিল, সেগুলি একসঙ্গে মিলিয়ে সে বই আকারে ছাপিয়ে বার করে দিল নিজের নাম গোপন করে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-সমাজ একেবারে তাজ্জব। এ কার রচনা? এমন নির্মম সত্য, রঙ্গব্যঙ্গময় সমাজচিত্র কার হাত দিয়ে বরুলো? টেকচাঁদ ঠাকুরের চেয়েও এ লেখার ভাষায় জোর অনেক বেশী। মহাভারত অনুবাদের সুগম্ভীর ভাষা যার হাত দিয়ে বেরুচ্ছে, সেই ব্যক্তির পক্ষে যে এমন তীক্ষ্ণ, তীব্র, চটুল চলতি বাংলা লেখা সম্ভব, তা কারুর সুদূরতম কল্পনাতেও এলো না। একই সঙ্গে নবীনকুমার হাত দিল আবার নতুন নাটক রচনায়, আর মহাভারতের কাজ তো চলছেই। 'নীলদর্পণ' নাটকখানি প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হবার পর আর কেউ ভয়ে প্রকাশের ভার নিতে চাইছে না, নবীনকুমার নিজ ব্যয়ে নিজের মুদ্রণশালা থেকে সেই বই ছাপিয়ে বার করে দিল।

সরোজিনী প্রতি রাত্রে সাজগোজ করে স্বামীর ঘরে আসে, তার স্বামী তার দিকে মনোযোগ দেবারও সময় পায় না। রূপোর জাল দিয়ে ঘেরা একটি বিদেশী লণ্ঠন কিনেছে নবীনকুমার, যা বাতাসের ঝাপটায় নিবে যায় না। সেই লণ্ঠন জ্বেলে সে অধিক রাত্রি পর্যন্ত লেখাপড়ার কাজ করে যায়।

সরোজিনী কিছুক্ষণ দ্বারের কাছে কুণ্ঠিতার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর এক সময় স্বামীর কাছে এসে আড়ষ্টভাবে বলে, অনেক রাত হলো যে, আপনি এবার শুতে আসবেন না?

নবীনকুমার মুখ না ফিরিয়েই বলে, আমার দেরি হবে, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো গে!

সরোজিনী তবু জিজ্ঞেস করে, আপনার কত দেরি হবে?

নবীনকুমার পাঠে নিমগ্ন থেকে অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয়, তার ঠিক নেই।

এক প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞেস করলে নবীনকুমার হঠাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় বলে সরোজিনী আর কিছু বলে না। নিঃশব্দে আরও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে ফিরে যায়। তার সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র পরা, বাহুতে ফুলের সাজ আর সারা শরীরে চন্দন সৌরভ ব্যর্থ হয়। নিজের শয্যায় ফিরে গিয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কিছুদিন হলো তার পতি দেবতাটির কেন এমন পরিবর্তন হলো, সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। আগেও তো উনি অনেক কাজে ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু রাত্রে শয়ন কক্ষে সরোজিনীকে কাছে ডেকে নরম সোহাগ বাক্য বলতেন প্রতিদিন! নিত্য নতুন কত না কৌতুক উদ্ভাবন করতেন উনি। কত না খুনসুটি। সেই মানুষটি এই ক' মাসে এমন বদলে গেলেন!

সরোজিনী এই নিয়ে তার মা ও দিদিদের কাছে কান্নাকাটি করেছে। সকলেই শুনে বিস্মিত হয়। বাড়ির বাইরে রাত কাটায় না, বাগানবাড়িতে রক্ষিতা পোষে নি, নিজ গৃহে থেকেও পত্নীর দিকে নজর দেয় না; এ আবার কেমন ধারা কাণ্ড! এমন তো হয় না। হরিশ মুখুজ্যে ওর বন্ধু ছিল, তাঁর মৃত্যুতে নবীনকুমার মনে আঘাত পেয়েছে ঠিক কথা, কিন্তু সেও তো হয়ে গেল কয়েক মাস। ব্যাটাছেলে বন্ধু

মারা গেলে কোনো পুরুষমানুষ এমন মনমরা হয়ে থাকে ? তা ছাড়া, এরকম সময়ে তো সবাই ঘরের মানুষকেই বেশী করে আঁকড়ে ধরে।

সবাই সরোজিনীকে দোষ দেয়। সে-ই নিশ্চয়ই তার স্বামীকে বশ করতে পারছে না। যে সধবা মেয়েমানুষ নিজের স্বামীর সঙ্গে এক শয়নকক্ষে থেকেও স্বামীকে কাছে পায় না, সে মেয়েমানুষের মরণও ভালো। দিদিরা পরামর্শ দেয়, ওরে সরো, একদম হাত-আলগা দিস্‌নি, সাপ্‌টে ধর, দরকার হয় পায়ে পড়বি, একবার মন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে কেঁদেও কূল পাবি না।

সরোজিনী সত্যিই এক মধ্য রাত্রে দৌড়ে এসে নবীনকুমারের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

নবীনকুমার চমকে উঠে বলে, এ কি, এ কি !

সরোজিনী সর্বাঙ্গে বহু অলঙ্কার পরে, ঝলমলে বেনারসী শাড়িতে নববধূর সাজে সেজেছে। কিন্তু তার চোখে জল। নবীনকুমারের পায়ে মাথা কুটতে কুটতে সে বললো, আজ আপনাকে বলতেই হবে, আমি কী দোষ করিচি ! কেন আমায় দেকলেই আপনি হাত নেড়ে বলেন, চলে যাও, চলে যাও ! আমি কি বিষ পিম্‌ড়ে, আমায় আপনার সহ্য হয় না ? বলুন তবে, আমি আগুনে ঝাঁপ খেয়ে মর্বো !

নবীনকুমার টেবিলের ওপর মস্ত বড় একটা কাগজ বিছিয়ে তার ওপর পেন্সিলের দাগ কেটে কী সব হিসেব করছিল। হাতের পেন্সিলটি সরিয়ে রেখে সে সরোজিনীর মুখখানি ধরে ওপরে তুললো। তারপর বিরক্তিচাপা ঈষৎ অস্থির কণ্ঠে বললো, আঃ, সরোজ, কেন ছেলেমানুষী করো। দেকচো না আমি ব্যস্ত রইচি। কাজের সময় এ রকম বিরক্ত করো না।

সরোজিনী চোখের জল মুছে ফেলে হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ঠিক, কাজের সময় বিরক্ত করতে নেই। আর আপনাকে বিরক্ত কর্বো না। তবে আমার মা জিজ্ঞেস করতে বলেচেন, রাত জেগে আপনি কী এত কাজ করেন, তা দিনের বেলা সারা যায় না ? এ রকম রাত জাগলে যে আপনার শরীর নষ্ট হবে। যারা পেটের ভাত জোটাবার জন্য কাজ করে তারাও তো এমন দিনরাত্তির খাটে না। ভগমানের কৃপায় আমাদের অভাব নেই—

নবীনকুমার শুকনো হেসে বললো, পেটের ভাত জোটাবার জন্য বেশী খাটতে হয় না ঠিকই, কিন্তু মনের ভাত জোটাতে গেলে সময়ের হিসেব কল্লে চলে না। আমি এখন যে কাজে হাত দিইচি, সেটা তোমায় বোঝালেও বুঝবে না।

সরোজিনী বললো, তবু বলুন একটু, মা জানতে চেয়েচেন।

—আমি বাংলা দৈনিক কাগজ বার কচ্চি।

—কী ?

—ঐ যে বললুম, তুমি বুঝবে না। সাহেবরা ইংরেজীতে ডেলি ন্যুজ পেপার বার করে, কখনো দেকোচো ? লোকে সকালে জলখাবার খেতে বসার আগেই ফেরিওয়ালারা বাড়ি বাড়ি সেই কাগজ দিয়ে যায়। আমি এবার সেই রকম বার কচ্চি, বাংলা ডেলি ন্যুজ পেপার। তার নাম 'পরিদর্শক'।

এবারেও কিছু হৃদয়ঙ্গম হলো কিনা বোঝা গেল না, সরোজিনী তার স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো।

বস্তুত নবীনকুমারের এই নতুনতম উদ্যমটি দেখে তার পরিচিত সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেছে। পত্র-পত্রিকার ব্যাপারে নবীনকুমারের আগ্রহ সেই কৈশোর থেকেই। কোনো পত্রিকাই বন্ধ হয়ে যাক, সে সহ্য করতে পারে না। আর্থিক অনটনে কোনো পত্রিকা উঠে যাবার উপক্রম হলেই, নবীনকুমার সেটি কিনে নিয়ে আবার চালু করে দেয়। এমনকি একবার 'দূরবীন' নামে একটি উর্দু পত্রিকার সঙ্কটদশার কথা শুনে নবীনকুমার তৎক্ষণাৎ সেই পত্রিকাটি ক্রয় করে তার এক মুসলমান বন্ধুকে সেটি আবার দিয়ে দেয় চালাবার জন্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুবিখ্যাত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকেও সে একটি মুদ্রণ যন্ত্র কিনে উপহার দিয়েছে। কিন্তু এবারের ব্যাপারটি সব কিছুকে ছাড়িয়ে যায়। দুই ব্রাহ্মণ মিলে পরিদর্শক নামে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং কয়েক মাস পরেই তাদের সামর্থ্যে ও উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। নবীনকুমার অমনি সেই পত্রিকার স্বত্ব কিনে নিয়েছে, এবং এটা সে নিজেই চালাতে চায় দৈনিক পত্রিকা হিসেবে। বাংলায় আবার দৈনিক পত্রিকা, তাও একুশ বৎসর বয়েসের যুবক তার সম্পাদক ! এ যে ঈশ্বর গুপ্ত মশাইকেও টেক্কা দেবার চেষ্টা !

পত্রিকাটির প্রকাশ কবে থেকে শুরু হবে তার ঠিক নেই এখনো, তবে কয়েকদিন ধরেই প্রবলভাবে সেই পত্রিকা সংক্রান্ত হিসেব নিকেশ চলছে। সকলেরই ধারণা, নবীনকুমারের যখন একবার ঝোঁক চেপেছে, তখন ও পত্রিকা সে বার না করে ছাড়বে না। একদিকে মহাভারত অনুবাদের মতন বিশাল

কাজ, অন্যদিকে দৈনিক পত্রের প্রকাশ !

নবনীকুমার সরোজিনীকে দৈনিক পত্রের ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করছিল, মধ্য পথে হঠাৎ সরোজিনী বললো, আমি একটা কতা জিগ্যেস করবো ?

—বলো !

—আপনি কুসোমদিদির বে'র জন্য কত কথা বলেচিলেন, কত আপনার উৎসাহ, সেই কুসোমদিদি আমাদের এ বাড়িতে বউঠান হয়ে এলো, আর আপনি তার সঙ্গে একটাও কথা বলেন না কেন ?

প্রসঙ্গটির আকস্মিকতায় নবীনকুমার থমকে গেল। চক্ষু তারকা দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার। নিশ্বাস যেন স্তব্ধ হয়ে গেল।

তারপর সে বললো, তোমার কুসুমদিদির বিয়ে হবার দরকার ছেল, বিয়ে হয়েচে···ভালো হয়েচে···আমরা সবাই খুশী হয়িচি···

—আপনি কুসোমদিদি-বউঠানের সঙ্গে একদিনও কতা বললেন না···এ বাড়িতে এলো···

—আমি কাজে ব্যস্ত, আমার কারুর সঙ্গেই কতা বলার সময় নেই। তোমার সঙ্গেও তো কতা কইতে পারি না।

—কুসোমদিদি-বউঠান সুধোচ্ছিলেন,উনি আপনাকে কী বলে ডাকবেন, ঠাকুরপো না আগের মতন মিতেনীর বর ?

—ওনার যা খুশী তাই ডাকবেন···আমি কী জানি !

—আপনি তা'লে আজও এখন শুতে যাবেন না ? আমি যাই ?

—যাও !

সরোজিনী চলে যাবার পর নবীনকুমার খানিকক্ষণ বিবর্ণ মুখে গুম হয়ে বসে রইলো। তারপর থরথর করে কাঁপতে লাগলো তার শরীর, ঠিক অত্যধিক জ্বরতপ্ত রোগীর মতন। চেয়ার থেকে নেমে সে ভুঁয়ের ওপর শুয়ে পড়লো টানটান হয়ে। তার শরীরের একেবারে অতল থেকে কাতর শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগলো আঃ ! আঃ !

বিম্ববতীর কক্ষ এবং সেদিকের মহলটি এখন নিয়েছে গঙ্গানারায়ণ। টানা অলিন্দে এখনো সার সার টাঙানো রয়েছে পাখির খাঁচাগুলি, অযত্নে অবহেলায় বেশ কিছু পাখি ইতিমধ্যেই মরেছে, জীবিত আছে আঠারো-কুড়িটি। এতদিন পর কুসুমকুমারী আবার সেই পাখিগুলির ভার নিল। সে তাদের খাদ্য ও জল দেয়, প্রত্যেকটি পাখির সামনে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সুমিষ্ট স্বরে কথা বলে তাদের সঙ্গে।

প্রকৃতি শূন্যতা সহ্য করে না। বিম্ববতী চলে যাবার পর কুসুমকুমারী এসে যেন তা আবার ভরে দিয়েছে।

প্রথম প্রথম কুসুমকুমারী লজ্জায় ঘরের বার হতেই চাইতো না। সরোজিনী ছাড়া আর কোনো নারী কথা বলতেও আসেনি তার সঙ্গে। সে ভেবেছিল, এ বাড়ির অন্যান্য মহিলারা এ বিবাহ সুচক্ষে দেখেননি। কুসুমকুমারী বুদ্ধিমতী, সে জানতো এমনটি হবেই। বিধবা বিবাহের ব্যাপারে পাত্র পক্ষের বাড়িতেই প্রতিরোধ বেশী হয়।

কুসুমকুমারী অবশ্য একথা জানতো না যে জোড়াসাঁকোর সিংহদের মতন এত খ্যাতিমান ও ধনী পরিবারে জনসংখ্যা বিস্ময়করভাবে কম। নিকট আত্মীয়ও প্রায় কেউ নেই-ই বললে চলে। হেমাঙ্গিনীর মৃত্যু হয়েছে, বিম্ববতী তীর্থবাসিনী হয়েছেন, সুতরাং এঁদের অবলম্বন করে যেসব দুঃস্থা দূর সম্পর্কিত আত্মীয়রা থাকতেন, তাঁরাও ঝরে গেছেন এক এক করে। তিন তলায় হেমাঙ্গিনীর মহলে চার-পাঁচ জন বয়স্কা স্ত্রীলোক এখনো রয়ে গেছেন বটে, কিন্তু তাঁরা সচরাচর নিচে নামেন না। বিধবা বিবাহকে তাঁরা ব্যভিচারের নামান্তর বলেই মনে করেন, সুতরাং নববধূকে তাঁরা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি।

এ সংসারের হাল ধরবার কেউ নেই। সরোজিনী নিতান্তই বালিকা, এবং তার বয়সী অন্যান্য বধূদের তুলনায় তার সাংসারিক বোধ আরও কম। তা ছাড়া সে প্রায়ই পিত্রালয়ে থাকে। বিম্ববতী নেই বলেই তার যাতায়াত আরও অবাধ হয়েছে। তা ছাড়া পিত্রালয়ে থাকাই তার পক্ষে এখন সুবিধাজনক, বরাহনগর থেকে মহাভারত অনুবাদের কাজ সেরে নবীনকুমার অধিক রাত্রে প্রায়ই জোড়াসাঁকো ফিরতে পারে না, সে বাগবাজারেই থেকে যায়।

এ সংসারে কোনো গৃহিণী নেই বলেই ভৃত্যতন্ত্রই সব কিছু চালায়। পুরোনো আমলের গোমস্তা দিবাকর এখনো রয়ে গেছে, দৈনিক বাজার হাট থেকে শুরু করে, গৃহ মেরামত এমনকি দোল-দুর্গোৎসবের ব্যবস্থাও তার হাতে। বিধুশেখরের তীক্ষ্ণ নজর এবং খবরদারিও নেই, সেই জন্য দিবাকরের এখন রীতিমতন পোয়া বারো।

সরোজিনী থাকলে তার সঙ্গে গল্প করে কুসুমকুমারীর সময় কাটে। তা ছাড়া তরু আর নীরু নাম্নী দুটি দাসীকে সে নিয়ে এসেছে বাপের বাড়ি থেকে। কুসুমকুমারীর ভাই ও দাদারাও প্রায়ই তার খবর নিতে আসে। এই বিবাহে কুসুমকুমারীর পিত্রালয়ের সকলেই খুব সন্তুষ্ট। গঙ্গানারায়ণের মতন পাত্র পাওয়া তো অতি ভাগ্যের কথা বটেই, তা ছাড়াও সিংহ পরিবারে কুসুমকুমারীর প্রতি অনাদর বা অযত্ন হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, আজ হোক, কাল হোক, সেই তো এই সংসারের কর্ত্রী হবে।

দুর্গামণির কথা প্রায়ই মনে পড়ে কুসুমকুমারীর। এই বিবাহের কথা দুর্গামণির কানে গেছে নিশ্চয়ই। এ সংবাদ শুনে বোধহয় তার মতন আর কেউ খুশী হয়নি। কুসুমকুমারী আশা করেছিল, দুর্গামণির কাছ থেকে একটি পত্র পাবে। না পেয়ে তার একটু উদ্বেগ হয়, দুর্গামণির কোনো বিপদ ঘটেনি তো! কুসুমকুমারী নিজেই একটা পত্র লেখার কথা ভাবে, লিখতে গিয়েও নিরস্ত হয়, ঐ বাড়ির সঙ্গে কোনো রূপ যোগাযোগ রাখা সমীচীন কিনা সে বুঝতে পারে না। বস্তুত, কুসুমকুমারী তার পূর্ব স্বামীর পরিবারের সকলের কথাই মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে চায়, একমাত্র দুর্গামণিকে ছাড়া। ওখানকার দুঃসহ দিনগুলিতে দুর্গামণিই ছিল তার একমাত্র ভরসা।

দুর্গামণিকে পত্র লেখা উচিত কিনা এ-সম্পর্কে সে গঙ্গানারায়ণকে জিজ্ঞাসা করার কথা ভেবেছে। কিন্তু বলি বলি করেও বলতে পারে নি। কুসুমকুমারীর পূর্ব-জীবনের কথা একবারও উত্থাপন করে নি গঙ্গানারায়ণ। তা হলে কি সে প্রসঙ্গ কুসুমকুমারীর নিজে থেকে তোলা উচিত? কুসুমকুমারী কিছুতেই মনঃস্থির করতে পারে না। এ-ব্যাপারে তাকে পরামর্শ দেবারও কেউ নেই। অথচ দুর্গামণির জন্য তার মন কেমন করে। সে দুর্গামণির কোনো খোঁজ খবর নিচ্ছে না বলে নিজেকে তার অকৃতজ্ঞ মনে হয়।

গঙ্গানারায়ণ সারাদিন ব্যস্ত থাকে। কলকাতার তাদের বিভিন্ন হৌসের পরিচালকগণ ও খাতকেরা আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে নবীনকুমারের দেখা না পেয়ে তার কাছেই আসে। বিধুশেখরও যেন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে গেছেন। বাধ্য হয়েই গঙ্গানারায়ণকে দায়িত্ব নিতে হয়। ছোট্কুর সঙ্গে দু-চার কথা বলতে গিয়েও সুবিধে হয়নি। নবীনকুমার সব দায় তার জ্যেষ্ঠের স্কন্ধে চাপিয়ে দিতে চায়। তহবিল থেকে সে তার প্রয়োজনীয় অর্থ পেলেই হলো, কী ভাবে অর্থাগম হবে, সে সম্পর্কে তার কোনো দুশ্চিন্তাই নেই। ক্রমশ বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে গঙ্গানারায়ণ জড়িয়ে পড়ছে, যদিও তার মন এর মধ্যে নেই, ঐশ্বর্য ও সম্পদের প্রতি সে কোনোরূপ মোহ বোধ করে না।

মামলায় জয় হবার পর গঙ্গানারায়ণ ভেবেছিল সে আবার ইব্রাহিমপুরে ফিরে যাবে, সেখানকার চাষীদের সাহায্য করবে। সে খবর পেয়েছে যে সেখানে এক সদাশয় ন্যায়নিষ্ঠ ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হওয়ায় সেখানকার নীলকর সাহেবরা ইদানীং একটু ঠাণ্ডা হয়ে আছে। চাষীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার এটাই উপযুক্ত সময়। কিন্তু গঙ্গানারায়ণের যাওয়া হলো না, তার বিবাহ এবং হরিশ মুখুজ্যের মৃত্যুর মতন দুটি ঘটনায় সব বদল হয়ে গেল। হরিশের মৃত্যুতে গঙ্গানারায়ণও খুব ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু তা সে সামলে উঠতে পারলো শুধু কুসুমকুমারীর জন্য। এতখানি জীবনে এই প্রথম গঙ্গানারায়ণ একজনকে পেয়েছে, যার কাছে মন উজাড় করে দেওয়া যায়। যার সঙ্গে সব কিছু ভাগ করে নেওয়া যায়। সারাদিন গঙ্গানারায়ণ উৎসুক হয়ে থাকে, কখন রাত্রিকালে কুসুমকুমারীর সঙ্গে তার দেখা হবে। এখন গঙ্গানারায়ণ কুসুমকুমারীতে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। যদিও তার বিবাহের পর তিনমাস কেটে গেছে, তবু এখনো গঙ্গানারায়ণের আদ্যরস হয়নি।

উকিল, মোক্তার ও খাজাঞ্চীদের সঙ্গে কথা সারতে সারতে এক একদিন অনেক রাত হয়ে যায়। ওপরে উঠে এসে শয়নকক্ষের দ্বার ঠেলে গঙ্গানারায়ণ দেখতে পায়, মেঝের ওপরেই উপুড় হয়ে শুয়ে কুসুমকুমারী সেজবাতির আলোয় কোনো বই পড়ছে। বইখানির আকার দেখেই সে বুঝেছে সেটি কোন বই। গঙ্গানারায়ণ একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। এই তন্ময় পাঠিকাকে সে বিঘ্নিত করতে চায় না। তবু নারীগণের সহজাত প্রবৃত্তিতেই কুসুমকুমারী অল্প সময়ের মধ্যেই অপরের উপস্থিতি টের পায়, সে ধড়মড় করে উঠে বসে।

গঙ্গানারায়ণ নিয়ম করেছে যে রাত্রির আহার সে নিজের শয়নকক্ষেই সেরে নেবে। রাত্রে সে ভাত বা আমিষ কিছুই খায় না, চিড়ে-মুড়ি-ফল-দুধ দিয়ে হালকা ভোজন সেরে নেয়। হিমালয়ের ক্রোড়ে কিছুদিন অবস্থান করার পর থেকেই আমিষ আহারে তার রুচি চলে গেছে। নেহাত কেউ পেড়াপেড়ি করলেই সে দু-এক টুকরো মাছ বা মাংস মুখে তোলে। যেমন কুর্তা পাতলুন সে পরতেই চায় না।

গঙ্গানারায়ণকে দেখে কুসুমকুমারী বই মুড়ে রেখে উঠে আসে। দাসীদের ডাকে না, সে নিজেই গঙ্গানারায়ণের খাবার পরিবেশন করে। মেঝেতে গালিচার আসন পেতে সামনে একটু জল ছিটিয়ে দিয়ে সেখানে রূপোর থালাটি রাখে। জল ভরে আনে রূপোর গেলাসে। থালায় সাজানো বিশেষ কোনো প্রকার সন্দেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কুসুমকুমারী জিজ্ঞেস করে, এগুলো মা নিজে তৈরি করে পাটিয়েচেন। আপনাকে আর দুটো দিই?

গঙ্গানারায়ণ হাসে। কুসুমকুমারীর মা প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু খাদ্যব্যঞ্জন হাতে তৈরি করে এখানে পাঠান। গঙ্গানারায়ণ ভাবে, দেখা যাক, এরকম কদিন চলে

গঙ্গানারায়ণের আহার শেষ হলে তারপর কুসুমকুমারী খেত যাবে। প্রথম প্রথম গঙ্গানারায়ণ ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, তার ফিরতে দেরি হলে আগে খেয়ে নিতে। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। কোনো এয়োস্ত্রীকেই নাকি স্বামীর আগে অন্নগ্রহণ করতে নেই। গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, হালফিল তো অনেক নিয়ম পালটাচ্ছে, এটা পালটাতে পারে না? কুসুমকুমারী তার উত্তর দিয়েছিল, যে-সব নিয়ম ভালো, সেগুলো তো পালটাবার দরকার নেই!

কুসুমকুমারীর এই ধরনের কথা শুনেই গঙ্গানারায়ণ বেশী মুগ্ধ হয় যে-কোনো বিষয়েই কুসুমকুমারীর পরিষ্কার স্পষ্ট মতামত আছে। সে মনের কথা মুখের ভাষায় প্রকাশ করতে জানে। গঙ্গানারায়ণের মনে পড়ে লীলাবতীর কথা। শুধু লীলাবতী কেন, অধিকাংশ রমণীই তো নিছক ঘরোয়া কথা ছাড়া আর কোনো বিষয়ে কিছু বলতেই জানে না। প্রথা-বিরুদ্ধ কোনো প্রসঙ্গ ওঠালেই, ওমা, সে কি! দিয়ে কাজ সারে।

খাওয়া শেষ করে হাত-মুখ প্রক্ষালন করে এসে গঙ্গানারায়ণ কুসুমকুমারীর বইটি খুলে বসলো। কুসুমকুমারী আহার সেরে ফিরে এলে সে বললো, তুমি তো অনেকখানি পড়ে ফেলেচো! কেমন লাগচে?

কুসুমকুমারী উৎফুল্ল মুখে বললো, ভাবি ভালো, একবার ধল্লে আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না!

—তুমি সব বুঝতে পারো? তোমার কোনোখানে খটোমটো লাগে না?

—একটুও না! মাঝে মধ্যে একটা দুটো কতার মানে জানি না বটে তবু সব বুঝতে পারি। আমি আগে কাশীদাসী পড়িচিলুম, কিন্তু তার সঙ্গে কত তফাৎ!

—সত্যি, আমাদের ছোট্‌কু এই একটা মস্ত বড় কাজ কচ্চে! কতই বা বয়েস ওর। আমার চেয়ে অন্তত তের-চোদ্দ বছরের ছোট, এই বয়েসেই গোটা মহাভারত অনুবাদের কাজ হাতে নেওয়া···কেমন সুন্দর ভাষা···আমাদের এই বংশে ছোট্‌কু একটা প্রতিভা। ওর সঙ্গে তোমার ভালো করে আলাপ-পরিচয় হয়েছে?

নীল চক্ষু দুটি স্থিরভাবে মেলে, ওষ্ঠাধরে সামান্য হাসি মেখে, আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে কুসুমকুমারী বলে, না। তবে আগে দেকিচি, আমার মিতেনীর বর হিসেবে—

গঙ্গানারায়ণ বললো, ও খুব ব্যস্ত, তবে আলাপ-পরিচয় তো হবেই, তখন দেকো, ও কেমন পাগল! সব সময় বড় কোনো কাজের চিন্তা মাতার মধ্যে টগবগ করে ফোটে!

মহাভারতের মোট তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এ পর্যন্ত। তা কয়েকদিনের মধ্যেই কুসুমকুমারীর পড়া হয়ে যায়। আরও পড়বার জন্য সে ছটফট করে। এ বাড়িতে এসে অফুরন্ত অবসরের মধ্যে তার

বই পড়ার নেশা অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু অত বাংলা বই সে পাবেই বা কোথায় !

এক রাতে গঙ্গানারায়ণ ফিরলে কুসুমকুমারী জিজ্ঞেস করে, আপনাকে একটা কতা বলবো ? আপনি রাগ করবেন না ?

গঙ্গানারায়ণ অবাক হয়ে গেল. কী কতা ? তোমার ওপর রাগ করবো কেন, কুসুম ? তোমার ওপর রাগ কত্তে পারে এমন পাষণ্ড কেউ আচে ?

আপনি সারাদিন খেটেখুটে আসেন, তাই বলতে সাহস পাই না। এক একদিন একটু তাড়াতাড়ি এসে আমায় একটু পড়াবেন ? আমি তো সংস্কৃত পড়তে পারি না, যদি আমায় পড়ে পড়ে বুঝিয়ে দেন।

গঙ্গানারায়ণের শরীরে অকস্মাৎ রোমাঞ্চ হয়। স্বপ্নে দেখা বিন্দুবাসিনীর কথা মনে পড়ে। বিন্দুবাসিনী অভিমান করে বলেছিল, তুই আমায় মেঘদূত পড়াবি বলিচিলি, পড়ালি না তো, গঙ্গা ! এ যেন অবিকল সেই কণ্ঠস্বর !

গঙ্গানারায়ণ একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর আপন মনে বলতে শুরু করে : কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা/স্বাধিকারপ্রমত্তঃ/ শাপেনস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ···তারপর ষষ্ঠ শ্লোকের শেষে যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা···এই পর্যন্ত বলে সে থামে। শ্লোক বলতে বলতে গঙ্গানারায়ণ যেন অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল, সেখান থেকে আবার ফিরে আসে। তারপর বললো, আমার অনেক কাল থেকেই ইচ্ছে, কারুকে মেঘদূত পড়ে শোনাই···তুমি আজ বললে, এসো, কুসুম, আমার পাশে এসে বসো, তোমায় আমি মেঘদূত পড়াবো।

কুসুমকুমারী বললো, মেঘদূত কী ? এ বইয়ের নাম তো শুনিনি কখনো। আমার খুব ইচ্ছে করে শকুন্তলা বইটা পড়বার— ।

গঙ্গানারায়ণ একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, শকুন্তলা ? হঠাৎ শকুন্তলা পড়বার জন্য ইচ্ছে হলো কেন ? মেঘদূত পছন্দ নয় ?

কুসুমকুমারী হেসে বললো, আমি কি ছাই কোনোটাই জানি ! ছেলেবেলায় আমার দাদাদের পো'ন মশাইয়ের মুকে শকুন্তলার গপ্পোটা শুনিচিলুম, তাও পুরোটা নয়···সেই গপ্পোটা জানতে ইচ্ছে করে। মেঘদূতের তো আমি নামই জানি না !

একটু থেমে থেকে গঙ্গানারায়ণ বললো, তবু প্রথমে মেঘদূতটাই শোনো। শকুন্তলার কতা পরে একদিন বলা যাবে।

মেঘদূত গঙ্গানারায়ণের আগাগোড়া কণ্ঠস্থ। তার বই লাগে না। ফুঁ দিয়ে সে সেজবাতিটা নিবিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ এক ঝলক জ্যোৎস্না এসে পড়ে ঘরের মধ্যে। কুসুমকুমারীর হাত ধরে সে নিয়ে আসে গবাক্ষের ধারে। শরৎকাল, এ সময় আকাশে কাশফুল বর্ণের লঘু মেঘ ভেসে বেড়ায়। সেই রকম একখণ্ড মেঘ দেখিয়ে গঙ্গানারায়ণ বললো, ঐ দ্যাকো মেঘদূত যাচ্ছে···তুমি মহাভারতে নল দময়ন্তীর গল্প পড়েছো ? একটি হংস হয়েছিল ওদের দূত···তেমনি রামগিরি পাহাড়ে এক নির্বাসিত যক্ষ সুদূর অলকায় তার প্রিয়াকে একটি বার্তা পাঠাবার জন্য একখণ্ড মেঘকে দূত হিসেবে নিয়োগ করেছিল।

কুসুমকুমারী জিজ্ঞেস করলো, রামগিরি কোথায় ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, তোমার মতন সকলেরই এ প্রশ্ন মনে আসবে বলে কবি কালিদাস প্রথম শ্লোকেই সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন···জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু। স্নিগ্ধছায়াতরুষু বসতিং ···জনকতনয়া মানে সীতা। বনবাসের সময় রাম আর সীতা এই রামগিরিতে ছিলেন কিছুদিন, এখানকার জলে সীতা স্নান করেছিলেন বলে তাঁর অঙ্গস্পর্শে জল পবিত্র···এইখানেই সেই যক্ষ···

—ঐ যক্ষের নাম কী ?

—এটাই আর একটা মজা। কালিদাস তাঁর এই কাব্যের নায়কের কোনো নাম দেননি। অর্থাৎ এ যেন জগতের সমস্ত বিরহী মানুষেরই মনের কথা। ধরো, আমি যদি কোনোদিন খুব দূরে চলে যাই, আমায় যদি কেউ নির্বাসিন দেয়, তখন আমিও তোমার কতা ভেবে এমনভাবেই বিলাপ কর্বো।

—তারপর বলুন।

—আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানুং···সেই অভিশপ্ত যক্ষ আটমাস নির্বাসিনে কাটিয়েচে, দুঃখে-বিরহে রোগা হয়ে গ্যাচে সে, হাত থেকে বলয় খসে পড়ে যায়···এরই মধ্যে এলো আষাঢ় মাসের প্রথম দিন, যক্ষ দেখলে পর্বতের সানুদেশ আলিঙ্গন করে আচে একখণ্ড মেঘ, তার যেন মনে হলো এক পরিণত গজ বপ্রক্রীড়া কচ্চে, অর্থাৎ এক খ্যাপা হাতি মেতে উঠেচে ভূমিখননের খেলায়···কী অপূর্ব সেই

দৃশ্য ! তখন সে মেঘকে ডেকে বললো···

—মেঘ কি মানুষের কতা শুনতে পায় ?

—ঠিক মতো আকৃতি দিয়ে ডাকলে নিশ্চয়ই শুনতে পাবে, যেমন এই যক্ষের ডাক শুনেছিল.···তা ছাড়া কবিও বলে দিয়েচেন, যারা কামার্ত, চেতন-অচেতনের প্রভেদ বোঝা তাদের কাচে আশা করা যায় না···

বেশ কয়েকটি শ্লোক শোনবার পর কুসুমকুমারী বললো, ছাতে যাবেন ?

গঙ্গানারায়ণ আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল। থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ছাতে ? কেন ! তোমার ভালো লাগচে না ?

কুসুমকুমারী গঙ্গানারায়ণের বাহুতে গণ্ড ছুঁইয়ে বললো, ভীষণ ভালো লাগচে, এমন আমি কখনো শুনিনি, আপনি যদি এখন থেমে যান আমি মরে যাবো···চলুন ছাতে যাই, সেখেনে খোলা আকাশ, মাতার ওপর দিয়ে মেঘ উড়ে যাবে, সেখেনে বসে শুনতে আরও বেশী ভালো লাগবে।

রাত্রি নিশুতি, সারা বাড়ি নিস্তব্ধ, সকলেই ঘুমন্ত। খুব সন্তর্পণে শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো কুসুমকুমারী আর গঙ্গানারায়ণ। পা টিপে টিপে উঠে এলো ওপরের সিঁড়ি দিয়ে। যাতে কোনো শব্দ না হয় এমন সাবধানে খুললো দরজা। শরৎকালীন আকাশ থেকে অল্প অল্প শিশিরপাত হচ্ছে, ছাদ ঈষৎ ভিজে ভিজে, কিন্তু তা ওরা গ্রাহ্য করলো না। ছাদে কতকগুলি বৃহৎ মাটির জালায় জল ভরা থাকে, সেরকম একটা জালায় পিঠের ভর দিয়ে পাশাপাশি বসলো ওরা দু'জনে। আজকের রাত্রিটিও বড় উপযুক্ত, কোমল, মিহিন সু-পবন বইছে।

চোখ আকাশের দিকে তুলে তদগতভাবে গঙ্গানারায়ণ বললো, কোথাও নদীর তীরে তীরে চাঁপা ফুল ফুটে উঠচে···কোথাও দাবাগ্নিতে বন পুড়ে গিয়েচিল, হে মেঘ, তোমার বর্ষণে সেখানকার মাটি থেকে মধুর গন্ধ উঠচে। আর সেই গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ছুটে যাবে চিত্রল হরিণ···।

সম্পূর্ণ পূর্বমেঘ সমাপ্ত করে গঙ্গানারায়ণ চুপ করলো।

কুসুমকুমারী বললো, থামলেন কেন ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আজ এই পর্যন্ত থাক। উত্তরমেঘ তোমায় কাল শোনাবো। খুব ভালো জিনিস একদিনে বেশী গ্রহণ কত্তে নেই···যেমন ধরো মধু, এক সঙ্গে যদি বেশী পান করো, কষ্ট হবে।

—আমার কিন্তু এখন ছাত থেকে যেতে ইচ্ছে কচ্চে না।

—এসো, এখানেই বসে থাকি।

—যদি সারা রাত থাকতে চাই, থাকবেন ?

—পাগল মেয়ে, তুমি যদি থাকতে পারো, আমি পারবো না ?

—আমার ভীষণ ভালো লাগচে, এত ভালো, যেন কষ্ট হচ্ছে বুকের মধ্যে, এমন সুন্দর দিন আমার জীবনে কখনো আসেনি। দেকুন আকাশের দিকে, মনে হচ্চে না চাঁদ যেন ঠিক আমাদের দু'জনকেই দেকচে ?

—আমাদের দু'জনকে নয়, শুধু তোমাকে। চাঁদ তোমায় হিংসে কচ্চে !

—তা তো হিংসে হতেই পারে। চাঁদ বড় একা।

বেশ কিছুক্ষণ ওরা চুপ করে বসে রইলো এরপর। জাগ্রত মানুষের মন কখনো থেমে থাকে না, ওদের চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হতে লাগলো দু'দিকে।

এক সময় গঙ্গানারায়ণ পাশ ফিরে জিজ্ঞেস করলো, কুসুম, তুমি একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারো ? এই যে মানুষের জীবন, এর উদ্দেশ্য কী ?

কুসুমকুমারী বললো, জানি না তো, কখনো ভাবিও নি।

গঙ্গানারায়ণ বললো, এই কতাটা আমার এখন প্রায়ই মনে হয়। এই জগৎ সংসারের একজন পরম পিতা আচেন, একদিন তাঁর পায়ের কাচে যখন যাবো, তিনি শুধোবেন, মানুষের জীবন পেয়েছিলে, সে জীবন চরিতার্থ করে এসোচো তো ? তখন কি উত্তর দোবো ?

—আমি সামান্য মেয়ে, আপনি আমাকে এ কথা জিজ্ঞেস কচ্চেন ?

—তুমি সামান্য হবে কেন, কুসুম ! তোমারও মন আচে—।

—জীবনের উদ্দেশ্য কী তা আমি জানি না। আসুন আজ থেকে আমরা দু'জনে মিলে খুঁজি···এর উত্তর খোঁজবার জন্য আপনি একলা একলা আমায় ছেড়ে কোতাও চলে যাবেন না কতা দিন ! প্রশ্নটা

শুনে প্রথমটায় যেন ভয় করে উঠলো, কিন্তু আর ভয় পাবো না, আমিও খুঁজবো, আমায় সাহায্য কর্বেন, বলুন ?

—কতা দিলুম, কুসুম।

কুসুমকুমারী গঙ্গানারায়ণের পায়ে হাত রাখলো। সেই মৃদু জ্যোৎস্নালোকে গঙ্গানারায়ণ দেখলো এই নীলনয়না, স্নিগ্ধ, কোমল, কুমুদিনীর মতন মুখের মেয়েটি বিন্দুবাসিনী নয়, এ অন্য নারী, এর নিজস্ব চরিত্রপ্রভায় আর অন্য কারুর কথা মনে পড়ায় না।

গঙ্গানারায়ণ উঠে দাঁড়াতেই কুসুমকুমারী বললো, আপনি চলে যাচ্চেন ? এই যে বললেন—

গঙ্গানারায়ণ দু' হাত বাড়িয়ে বললো, এসো—।

কুসুমকুমারীও উঠে দাঁড়ালো এবং গঙ্গানারায়ণের আহ্বানে বক্ষলগ্না হলো। গঙ্গানারায়ণ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে বললো, জীবনের উদ্দেশ্য যাই হোক, মানুষের একাকিত্ব বড় সাংঘাতিক। আমি অনেকদিন বড় একা ছিলুম গো, কুসুম, এখন থেকে তুমি আমার সেই শূন্যতা সম্পূর্ণ ভরিয়ে দাও।

ঠিক সোহাগবালার মতন থাকোমণির শরীরেও মেদ জমতে শুরু করেছে। এটা বুঝি এই ছোট জলচৌকিখানিরই গুণ। নিচের তলার এই দরদালানের জলচৌকিতে যে বসবে ভৃত্য মহলের কর্ত্রীত্ব যেমন তার হাতে আসবে তেমনি তার চেহারাতেও পুষ্টি লাগবে। কয়েক বছর আগেও থাকোমণির দেহ ছিল যেন পাথরে কোঁদা, সাধারণ রমণীদের তুলনায় একটু বেশী লম্বা বলে তার মেদবিহীন শরীরটি ছিল রীতিমতন আকর্ষণীয়। এখন তার চিবুকে দুটি ভাঁজ পড়েছে, হাত-পা গোল গোল হয়ে এসেছে এবং আঙুলের ডগাগুলো যেন সব সময় টসটস্ করে।

মাঝখানে দু মাস থাকোমণি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় এই জলচৌকিটি প্রায় বেদখল হবার উপক্রম হয়েছিল। মানদা দাসী এখানে বসেছিল জাঁকিয়ে। মানদা এবং অন্যান্যদের ধারণা হয়েছিল যে থাকোমণি আর বাঁচবে না। প্রায় সেই রকমই দশা হয়েছিল তার, হাত-পা নাড়ার ক্ষমতাও চলে গিয়েছিল, একলা ঘরে পড়ে থেকে চিঁ চিঁ করতো, তবু ভাগ্যক্রমে সে আবার সেরে উঠলো।

তারপর এই জলচৌকি থেকে মানদা দাসীকে সরানোর জন্য প্রায় ধস্তাধস্তি করতে হয়েছিল থাকোমণিকে।

সেই অসুখের পর থেকেই থাকোমণি এ রকম স্ফীত হতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত সোহাগবালার মতনই পরিণতি তার হবে কি না এই কথা ভেবে প্রায়ই থাকোমণির বক্ষ কাঁপে। তা ছাড়া, এই জলচৌকিটা সে এখনো আঁকড়ে ধরে আছে বটে, কিন্তু সে টের পেয়ে গেছে, যে-কোনো মুহূর্তে তার পায়ের তলা থেকে মাটি ধসে যাবে। মানদা দাসী এবং অন্যান্য কয়েকজন সব সময় তার দিকে শকুন-চক্ষে তাকায়। থাকোমণির আর ভালো লাগে না, কিচ্ছু ভালো লাগে না।

নকুড় আর দুর্যোধন মাছ কুটছে চাতালে বসে। থাকোমণি অলসভাবে চেয়ে আছে সেদিকে। বড়বাবুর কুটুমবাড়ির কয়েকজন আজ নেমন্তন্ন খাবেন এ-বাড়িতে, তাই আজ বেশি মাছ এসেছে। কুটতে কুটতে দু-একটা টুকরো বাঁ দিকে ছুঁড়ে ফেললে দুর্যোধন, আর নকুড় তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। ঐভাবে প্রায় সেরখানেক মাছ সরিয়ে ফেলে ওরা বাইরে বিক্রি করে আসবে। থাকোমণি ইচ্ছে করে দেখছে না। ওরা কি ভাবছে, ওরা থাকোমণির চোখে ধুলো দিতে পারবে ? থাকোমণি সবই জানে। তবু নিত্যি তিরিশ দিন আর ওদের সঙ্গে খ্যাট খ্যাট করতে থাকোমণির ইচ্ছে করে না। মাছের দরের যা হিসেব দিলে নকুড়, তা শুনেও তাজ্জব হবার কথা। বলে কি না রুইমাছের মন বারো টাকা, এ কী মগের মুলুক পেয়েছে ? ন টাকা সাড়ে ন টাকা মন দরে পাকা রুই বাড়িতে এসে বয়ে দিয়ে যায় ! থাকোমণি তবু ওদের কাছ থেকে চুরির টাকার বখরা চায়নি।

টাকাপয়সার প্রতিও লোভ কমে গেছে থাকোমণির। কী হবে টাকা দিয়ে ? এক সময় ভাবতো বটে,

'বন্ধু নাহি কড়ি বই' কিন্তু বয়েস অস্তাচলের দিকে ঢলে পড়ায় সে উপলব্ধি করেছে যে কড়ি থাকলেও মেয়েমানুষের জীবনে নিরাপত্তা নেই। বলতে গেলে থাকোমণি তো টাকার ওপরেই শুয়ে আছে ; তার শয্যার নিচে তোড়ায় বাঁধা বাঁধা টাকা আর খুচরো পয়সা। বিশ বৎসর ধরে সে যা উপার্জন করেছে, তার থেকে পাই-পয়সাও খরচ হয়নি, সবই জমা আছে, তবু থাকোমণির অন্তরে অশান্তির আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলে কেন ?

এই যে ইদানীং সে নকুড় বা দুর্যোধনের কাছ থেকে চুরির বখরা নেয় না সেইজন্যই বরং সে কিছু খাতির পায়। থাকোমণির এবংবিধ পরিবর্তনে নকুড় আর দুর্যোধন খুব আতান্তরে পড়ে গেছে, ব্যাপারটির আগা-পাশ-তলা কিছুই তারা বুঝতে পারছে না। সেই সোহাগবালার আমল থেকেই এই দরদালানের জলচৌকির অধিকারিণী প্রত্যেকটি চুরির আধুলারও ভাগ না নিয়ে ছাড়েনি। থাকোমণি যে এখন আর ভাগ চায় না, তার মানে কি তার গভীর কোনো মতলব আছে ? দিবাকরকে বলে থাকোমণি যে-কোনো দাসী বা ভৃত্যের চাকরি যখন খুশী খেয়ে দিতে পারে। থাকোমণির ক্ষমতা সোহাগবালার চেয়েও বেশি, কারণ সে দুলালের মা।

রাত্তিরবেলা সব কাজ মিটে গেলে নকুড় থাকোমণির ঘরের দোরের সামনে এসে জিজ্ঞেস করে, ও থাকোদিদি, ঘুমুলে নাকি, আসবো ? পিছনের গোলপাতার ঘর অনেক দিন হলো ছেড়ে এসেছে থাকোমণি। দিবাকরের অনুগ্রহে সে নিচের মহলেই একটা পাকা ঘর পেয়েছে। ঘর থেকে যখনই বেরোয়, তখনই থাকোমণি সে ঘরের দরজায় তালা লাগায়। হুটহাট করে এ-ঘরে কারুর প্রবেশ করার হুকুম নেই। নকুড় বয়েসে থাকোমণির চেয়ে যথেষ্ট বড় তো বটেই, এক সময় সে ছিল থাকোমণির উপপতি, তবু এখন সে থাকোমণিকে দিদি বলে সম্বোধন করে। প্রথম দিন যে আচমকা থাকোমণির ঘরে ঢুকে তার ওপর বলাৎকার করতে এসেছিল, সেই নকুড় এখন থাকোমণির ঘরে ঢোকার আগে বিনীত কণ্ঠে অনুমতি নেয়।

থাকোমণি বলে, না। ঘুমুইনি, আয়, ভিতরে আয়।

এই ভৃত্য মহলে নকুড়ের মতন শয়তান আর দুটি নেই। চুরির নেশায় সে এমনই পাগল যে পিঁপড়ের পেট টিপে মধু বার করতেও সে ছাড়ে না। কয়েক বছর অন্তর অন্তর নকুড়ের বউ মরে। আবার সে গাঁয়ে গিয়ে একটি করে বিয়ে করে আসে। এবং অন্যান্য ভৃত্যদের মতনই, দেশের বাড়িতে একটি বউ থাকলেও এখানেও সে একজন সঙ্গিনী রাখে। গ্রামের বাড়িতে যাবার জন্য তো বছরে ছুটি মেলে একবার, তাও বেশী দিন থাকা চলে না, পয়সার টানে নিজেরাই তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। নকুড় আবার ঘন ঘন সঙ্গিনী বদলায়। যথেষ্ট বয়েস হলেও তার শরীরটি এখনো অসুরের মতন এবং সারা দিন ধরে সে এত রকম কাজ করতে পারে যে তার স্বভাবের যতই দোষ থাকুক, প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো কাজে নকুড়কে প্রয়োজন হয়।

নকুড়ের সঙ্গে থাকোমণির শারীরিক সম্পর্ক নেই অনেকদিনই। নকুড় এখন মঙ্গলা নাম্নী এক দাসীকে নিয়ে খুব মেতে উঠেছে। তা থাক, সেজন্য থাকোমণির কোনো খেদ নেই। নকুড় এখন তার সেবা দাস।

ঘরে ঢুকে নকুড় দেয়ালের এক কুলুঙ্গি থেকে একটা বটুয়া বার করে মেঝের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে। থাকোমণি বসে থাকে তক্তাপোশের ওপরে। বটুয়াটা খুলে কল্কে বার করে গাঁজা সাজতে শুরু করে নকুড়। সারা দিনের পর এই সময়টার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে থাকোমণি। এই নকুড়ই তাকে এক সময় গাঁজার নেশা ধরিয়েছে। এখন কয়েক ছিলিম গাঁজা না টানলে থাকোমণির ঘুমই আসে না রাত্রে। থাকোমণি নিজে যে গাঁজা সাজতে জানে না তা নয়, তবু অন্য কেউ সেজে দিলে ভালো লাগে। কিছুদিন হলো নকুড় আবার নিজেই গায়ে পড়ে এসে এই ভার নিয়েছে।

নকুড় ছিলিম সেজে ফুঁ দিতে দিতে ডান হাতের কনুই বাঁ হাত দিয়ে ছুঁয়ে সেটি এগিয়ে দেয় থাকোমণির দিকে। তার একদা-শিষ্যা থাকোমণিকেই সে প্রথম টানটি লাগাবার সম্মান দেয়। থাকোমণি দু হাতে কল্কেটি ধরে প্রথমে কপালে ঠেকায়, তারপর শিবনেত্র হয়ে টানতে শুরু করে। পট পট করে বীজ ফাটার শব্দ হয়, অনেকখানি ধোঁয়া বুকে টেনে দম বন্ধ করে থেকে কল্কেটা সে ফিরিয়ে দেয় নকুড়কে। তারপর এইভাবে কল্কেটি হাতবদলাবদলি হতে থাকে। ছিলিম শেষ হলে নকুড় আবার

সাজতে বসে।

নকুড়ের চেয়ে থাকোমণিই আগে বুঁদ হয়। চোখ বুজে থেকে সে একটু একটু মাথা দোলাতে থাকে। নকুড়ের এর পরও অন্যত্র বহু কাজ আছে। সে একটু পরেই উঠে যাবে, তার আগে থাকোমণিকে খুশী করবার জন্য বললো, থাকোদিদি, তোমার হাঁটুতে আজ বেদনা আচে ? তারপরই সে হাত বাড়িয়ে থাকোমণির পদসেবা শুরু করে। থাকোমণি চোখ মেলে ঘোর-লাগা দৃষ্টিতে নকুড়ের দিকে চেয়ে থাকে, কোনো কথা বলে না।

ঠিক সেই সময়টিতে কোনো রাজ-রাজেন্দ্রাণীর সঙ্গে থাকোমণির কিছু তফাত থাকে না। বস্তুত উপরতলা ও নিচতলায় অনেক কিছুই একই ভাবে চলে। অনেক কাহিনী-কিস্যায় পড়া যায় যে কোনো স্বেচ্ছাচারিণী রানী প্রতি রাতে এক একজন প্রেমিক পুরুষকে অন্দরমহলে নিয়ে আসতেন। এই ভৃত্যতন্ত্রে থাকোমণি এখনো সম্রাজ্ঞী, সেও কি তা পারে না ? এই তো নকুড়ের মতন একজন সা-জোয়ান তার পা টিপছে। এই নকুড় এক সময় তাকে অসহায় অবলা পেয়ে মাটির পুতুলের মতন ভাঙচুর করতে চেয়েছিল।

একটু পরেই এক পা তুলে নকুড়ের বুকে একটা ঠোক্কর মেরে থাকোমণি বলে, যাঃ, এবার তুই যাঃ।

নিতান্ত বাধ্যের মতন নকুড় উঠে পড়ে এবং যাবার সময় দরজাটি টেনে দিয়ে যায়। দিনের পর দিন থাকোমণি চুরির পয়সার বখরা চায় না, তার বদলে একটা করে পায়ের ঠোক্কর তো সে দিতেই পারে।

নকুড় চলে গেলে থাকোমণি ক্রন্দন শুরু করে, ক্রমশ তার কান্না বাড়তে থাকে। গাঁজার ধোঁয়ার মতন এই কান্নাও তার ঘুমের ঔষধ, চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে থাকোমণি ঘুমিয়ে থাকে।

দিবাকর এখনো সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেনি থাকোমণিকে। শরীরে আর জোর নেই দিবাকরের, তবু এখনো সে নিচের মহলের প্রভু। বাড়ির কর্তাদের কোনো নজর নেই বলে দিবাকরের ক্ষমতা এখন অনেক বেশী। একা আর বেশীদিন সামাল দিতে পারবে না বলে সে গ্রাম থেকে তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আনিয়েছে। ছেলেটির নাম পঞ্চানন, অপুত্রক দিবাকরের এই পঞ্চাননই উত্তরাধিকারী। ছেলেটি মাথায় টেরি কাটে, সন্ধে হলেই উড়নি গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। গ্রামে দিবাকরের যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি, সেইজন্য ছেলেটির স্বভাব হয়েছে বাবু ধরনের। একদিন নবীনকুমার বাড়ি থেকে নির্গত হচ্ছে, সেই সময় পঞ্চানন তার সামনে পড়ে গিয়েও কোমর বাঁকিয়ে নিচু হয়ে হাত জোড় করে থাকেনি। ছোটবাবু অবশ্য লক্ষ্যই করেনি কিন্তু দূর থেকে দিবাকর দেখতে পেয়ে পঞ্চাননকে কান ধরে হিড় হিড় করে ভেতরে টেনে এনে খড়ম পেটা করে কপাল ফাটিয়ে দিল। যে-কোনো উপায়েই হোক, দিবাকর তার এই ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে মানুষ করবেই।

দিবাকর থাকোমণিকে হাতে রাখতে চায় বিশেষ উদ্দেশ্যে। এক একদিন সন্ধ্যেবেলা দিবাকর ডেকে পাঠায় থাকোমণিকে। ওরা স্বামী স্ত্রী নয়। তবু যেন ওদের অনেককালের দাম্পত্য সম্পর্ক, এমনভাবে কথা হয় সুখ-দুঃখের। বাইরের জগতের একটু-আধটু সংবাদ দিবাকরের কাছ থেকেই শুনতে পায় থাকোমণি। গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে তিন চারবার মাত্র থাকোমণি এ বাড়ির বাইরে গেছে।

দিবাকরের কাছ থেকেই থাকোমণি এই অত্যাশ্চর্য খবরটি শুনেছে যে বড়বাবুর নতুন বউমণি গান গায়।

শুনে থাকোমণি চক্ষু কপালে তুলেছিল। বলে কি, একে বিধবা, তার ওপর গান করে নতুন বউ ! এ কেমন বংশের মেয়ে ?

থাকোমণির অবিশ্বাস দেখে দিবাকর বলেছিল, হ্যাঁ রে, থাকো, আমি নিজের কানে শুনিচি। আদালতের বেলিফ এশ্চিলো, আমি সে কাগচ নিয়ে ওপরে গিচি বড়বাবুকে সই করাতে, হঠাৎ শুনি কত্তামার ঘরে কে গুনগুনোচ্চে ! কী অনাছিষ্টি ভেবে দ্যাক, কত্তামা আমাদের সতী সাবিত্তির, তেনার ঘরে ঐ অজাত-কুজাতের মেয়েকে ঢোকালেন বড়বাবু !

গঙ্গানারায়ণ বিধবা বিবাহ করায় এ বাড়ির দুজন রসুই ঠাকুর চাকরি ছেড়ে চলে গেছে পাপের ভয়ে।

বধূবরণের সময় কুসুমকুমারীকে দেখেছে থাকোমণি। নতুন বধূর রূপ দেখবে কী, বিধবার কপালে সিঁদুর, এটা ভেবে সেদিকে তাকাতেই ভয় করছিল তার। সবাই যখন উলুধ্বনি দিচ্ছিল, থাকোমণির

জিহ্বা নড়েনি।

—এবার কোন্‌দিন দেখবি হিজড়ে মাগীদের মতন বাবুদের বউ ধেই ধেই করে নেত্য কচ্চে।

—অমন কতা বলোনি গো, অমন কতা বলোনি! বাবুদের অমঙ্গল হলে যে আমাদেরও অমঙ্গল।

—তোকে আমি বলে রাকচি, থাকো, মিলিয়ে নিস, এ বাড়ি থেকে মা লক্ষ্মী বিদেয় নিয়েচেন! এত বড় বংশ এবার ছাগলে মুড়োবে। ছোটবাবু যেমন দুহাতে ট্যাকা খর্চা কচ্চেন তাতে কোন্‌দিন না দেউলে হতে হয়। আমার চে তো কেউ বেশী জানে না! মাতার ওপর তো দ্যাকার কেউ নেই—

—ও বাড়ির বড়বাবু আর আসেন না।

—তেনার ভীমরতি হয়েচে, তিনি আর কী কর্বেন!

কথায় কথায় দিবাকর আসল কথাটা পাড়ে। পঞ্চাননকে থাকোমণি নিজের ছেলের মতন দেখে, তাকে শিখিয়ে পড়ে মানুষ করে নেয়। দিবাকর চোখ বুজলে তো পঞ্চাননকেই গোমস্তাগিরি করতে হবে। সুতরাং থাকোমণির সঙ্গে পঞ্চাননের মিল না হলে নিচের মহলের রাজ্যপাট ঠিকঠাক চলবে না।

থাকোমণি পোড় খেয়ে অনেক কিছু শিখেছে, সে দিবাকরের আসল মতলবটি ঠিকই বোঝে। দিবাকর চিরকালই স্ত্রীলোকদের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করে, শয্যাসঙ্গিনীদেরও সে একটিও নরম কথা বলে না। অথচ ইদানীং থাকোমণির সঙ্গে তার ব্যবহার একেবারে মধুমাখা। এমনকি নিজের পানের ডিবে থাকোমণির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বলে, নে থাকো, একখিলি প্যান খা!

দিবাকর থাকোমণিকে তার ছেলের বিপক্ষে দাঁড় করাতে চায়। দিবাকর জেনে গেছে যে দুলাল তার মাকে একটুও ভক্তিশ্রদ্ধা করে না। ছোটবাবুর পেয়ারের লোক দুলাল এখন সময় সময় দিবাকরের ওপরেও চোখ রাঙায়। সেই জন্যই দুলালের বিরুদ্ধে একটা জোট বাঁধা দরকার, তাতে থাকোমণিকেও দলে টানতে হবে। থাকোমণির যে এতবড় অসুখ গেল, দুলাল একদিনের জন্যও তার মায়ের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করেনি। সুতরাং অমন ছেলেকে আর থাকোমণির দরকার কী?

থাকোমণির সত্যিকারের দুঃখের জায়গায় ঘা দেয় দিবাকর। সে ভেতরে ভেতরে পুড়তে থেকেও বলে, হ্যাঁ, পাঁচু তো আমার ছেলেরই মতন। একটু ভবিষ্যিব্যির জ্ঞান কম, তা বয়েসকালে শুধ্‌রে যাবে। আমি বলি কি, পাঁচুর বে দাও, তার বউ এসে এখেনে থাকুক।

একটা নয়, ইতিমধ্যে দু-দুবার বিবাহ হয়ে গেছে পঞ্চাননের। কোনো স্ত্রী-ই বাঁচেনি। আবার বিয়ে তো দিতে হবেই দেখে শুনে, তার আগে ছেলেটা খুঁটে খেতে শিখুক।

—পাঁচুর বউ এলে তখন তাকে আমি জলচৌকি ছেড়ে দোবো। ঐ মানদা হারামজাদীকে কোনোদিন দোবো না।

দিবাকর এমন মুখ করে থাকে যেন মানদাকে সে চেনেই না। অথচ থাকোমণির অসুখের সময় মানদা যে জলচৌকিতে গ্যাঁট হয়ে বসেছিল, সে কি দিবাকরের অনুমতি ছাড়াই? দিবাকরের শয্যায় হয়তো এখনো মানদার শরীরের গন্ধ লেগে আছে। থাকোমণি সব জানে। দিবাকর যতই চতুর হোক, সে এটুকু বোঝে না যে, মা কখনো তার সন্তানের বিরুদ্ধে যায় না।

থাকোমণির খুব বাসনা ছিল যে দুলালের পত্নী সুবালাকে ক্রমে ক্রমে সব হিসেবপত্র বুঝিয়ে দিয়ে একদিন তাকেই নিজের জায়গায় বসাবে। কিন্তু তা হলো না। সুবালা নিজে যেমন দেমাকী, দুলালও হয়েছে সেরকম। দুলাল তার মাকে ধমকে বলেছিল, তার বউ ভদ্দরলোকের বাড়ির মেয়ে, সে কখনো দাসীবাঁদীগিরি করতে যাবে না। ছুতোর মিস্তিরির মেয়ে হলো ভদ্দরলোক আর দুলালের নিজের মা দাসী!

দুলাল এখন প্রাণপণে ভদ্রলোক হবার চেষ্টা করছে। বাগানের মধ্যে একখানি একটেরে ঘরে সে তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকে। সে বা সুবালা ভুলেও কখনো দাসদাসী মহলে পা দেয় না। তাদের জন্য খাবার পাঠাতে হয়। দুলাল ঘরের মধ্যেও জামা পরে থাকে, জুতো পায় দেয় এবং হুঁকোয় তামাক খায়। নিজে সে বই পড়ে এবং বউ ও ছেলেকে পড়তে শেখায়। এমনকি দুলাল নিজের জন্য একটি চাকর পর্যন্ত রেখেছে!

থাকোমণি দেখা করতে গেলে দুলাল বা সুবালা বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলে, একবারও ভেতরে গিয়ে বসতে বলে না। নাতিকে নিয়ে সোহাগ করা আর থাকোমণির এ জন্মে হলো না। নাতি তাকে চিনলোই না ভালো করে। কেন যে মায়ের ওপর দুলালের এ রাগ তা থাকোমণি বুঝেও বুঝতে চায় না। সেটাও বুঝলে তার জীবনের আর বাকি রইলো কী!

একদিন দুলাল তা অতি নির্দয়ভাবে বুঝিয়ে দিল।

থাকোমণির একটাই শুধু স্বপ্ন আছে। কোনো জমি কিনে ঘর তুলবে, পুকুর কাটাবে, ধান চাষ করবে। দাসীবৃত্তি ছেড়ে সে আবার চাষীর বাড়ির গৃহিণী হবে। সেরকম পয়সা তো তার রয়েছেই, কিন্তু একা তো যাওয়া যায় না, ছেলে-বউকে সঙ্গে নিয়ে না যেতে পারলে সুখ কোথায় ? কিন্তু দুলাল এ প্রস্তাব কিছুতেই কানে তোলে না। তবু সে যতই বকুনি-ঝকুনি দিক থাকোমণি প্রায়ই এই কথাটা বলে।

একরাত্রে থাকোমণির মাথায় এই স্বপ্নটা আবার বেশী চাগিয়ে উঠলো। গাঁজায় একটু দম দিলেই তার না-কেনা জমি, না-কাটা পুকুর, না-তৈরী বাড়ির চমৎকার ছবি ফুটে ওঠে মানস নেত্রে। সেই জন্যই সে কাঁদে। সে রাত্রে থাকোমণি আর থাকতে পারলো না একলা ঘরে। নকুড় ছুটি নিয়ে দেশে গেছে, দিবাকরের ঘরের দ্বার বন্ধ, শুনশান করছে নিচের মহল। একা একা গাঁজা টেনে থাকোমণির বেশী ঘোর লেগে গেল, সে বাইরে এসে বাগানের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ধাক্কা মারতে লাগলো দুলালদের দরজায়। ঘুম ভেঙে উঠে দুলাল দরজা খুলতেই থাকোমণি তার হাত ধরে নেশাজড়িত কণ্ঠে আন্তরিকতম কাকুতি করে বললো, অ দুলে, চ না, আমরা গাঁয়ে যাই, সেখেনে মায়ে পুতে সুখে থাকবো, তোর বউকে আমি মাতায় করে রাখবো, অ দুলে, চ না যাই! এক্ষুনি চলে যাই—।

দাঁতে দাঁত চেপে হিংস্র কণ্ঠে দুলাল বললো, বেবুশ্যে মাগী, এত রাত্রে এয়েচিস ঢলানী কত্তে, এতটুকু হায়া নেই কো, তোর মুখ দেখলে পাপ হয়! ফের যদি কোনদিন—

বলতে বলতেই মাতৃবক্ষে সজোরে পদাঘাত করলো দুলালচন্দ্র। বিস্ফারিত নেত্রে থাকোমণি ধরাশায়ী হতেই সশব্দে দোর বন্ধ করে দিল তার পুত্র।

পরদিন ভোর থেকে থাকোমণিকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। তাড়া খাওয়া বন্য পশুর মতন ছুটতে ছুটতে থাকোমণি একসময় গঙ্গা পেয়ে গেল। তার ছেলে বলেছে তার মুখ দেখতে চায় না, তবে এ মুখ আর সে কাকে দেখাবে ? ভোরের প্রথম খেয়ায় গঙ্গা পার হয়ে ওপারের মানুষদের জনে জনে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, ওগো, ভিনকুড়ি গাঁ কোতায় বলতে পারো ? আমি সেখেনে যাবো, ওগো, তোমরা আমায় পথ বলে দাও—। দু চারজন তাকে সাহায্য করার চেষ্টায় জানতে চায়, কোন জেলা, কোন পরগনা কোন মৌজা ? কিন্তু থাকোমণি সে সব কিছুই জানে না। ধানকুড়ি আর ভিনকুড়ি পাশাপাশি এই দুটি গ্রামের নাম ছাড়া তার আর কিছুই মনে নেই। কিন্তু শুধু গ্রামের নাম শুনে পথ বা দিকের সন্ধান দিতে পারে না কেউই। তবু থাকোমণি অন্ধের মতন ছুটতে থাকে। সে তার স্বামী শ্বশুরের ভিটেয় ফিরে যেতে চায়। সেখানে পৌঁছুতে পারুক বা না পারুক, সে আর পিছন পানে চাইবে না।

দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রর একদা সহপাঠী কেশব ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর থেকেই ব্রাহ্মদের মধ্যে যেন আবার নতুন রক্ত সঞ্চারিত হলো।

কিছুদিন ধরে ব্রাহ্মদের মধ্যে নির্জীব ভাব এসে গিয়েছিল, ভিতরে ভিতরে নানা রকম মনোমালিন্য ও মতভেদ। কেউ কেউ বুদ্ধি ও জ্ঞানচর্চায় যতটা আগ্রহী ততটা ঈশ্বর বা ধর্মচর্চায় নয়। তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কিন্তু তাঁর মুখে ঈশ্বরের কথা কখনো শোনা যায় না। অক্ষয়কুমার দত্তও যেন দিন দিন সংশয়বাদী হয়ে পড়ছেন। দেবেন্দ্রনাথ মনে মনে এঁদের প্রতি বিরক্ত। রাগ করে তিনি পাহাড়ে চলে গিয়েছিলেন, ফিরে এসেও ব্রাহ্মদলের ঠিক মতন হাল ধরতে পারছিলেন না।

দেবেন্দ্রনাথ এখন প্রৌঢ়। এক কালের তরুণ বিপ্লবী এখন রক্ষণশীল। কিছু ব্রাহ্ম সভ্যদের চাপে

পড়ে তিনি স্বীকার করেছেন যে বেদ কোনো অভ্রান্ত, পবিত্র গ্রন্থ নয়। কিন্তু ব্রহ্মসভার বেদীতে কোনো ব্রাহ্মণের বদলে অব্রাহ্মণ বসে শাস্ত্র পাঠ করে শোনাবে, এতটা তিনি মেনে নিতে পারছেন না। পৈতা-বিসর্জন, জাতিভেদ প্রথার অবসান কিংবা বিধবা বিবাহ—এর কোনোটারই ঠিক বিরোধী না হলেও দ্রুত কোনো পরিবর্তনের তিনি পক্ষপাতী নন। তিনি ব্রাহ্ম হলেও তাঁর বাড়িতে দুর্গাপূজা হয়, তিনি বাধা দেন না, আবার পূজার সময় নিজে উপস্থিতও থাকেন না।

কেশবচন্দ্রের মধ্যে তিনি দেখলেন নব যৌবনের এক মূর্ত প্রতীককে। এ ছেলেটি যেমন তেজস্বী তেমনই এর মধ্যে ধর্মের প্রতি উন্মাদনা রয়েছে। প্রবল পাপ বোধ আছে বলে সে পুণ্যের অভিলাষী। বেহালা বাজানোয় বেশী আসক্তি হয়ে যাচ্ছিল বলে নিজের হাতেই সেই বেহালা ভেঙে ফেলেছে কেশব।

বিখ্যাত রামকমল সেনের পৌত্র কেশবকে দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই দেখছেন। প্রায়ই সে এ বাড়িতে তাঁর ছেলেদের কাছে আসে। বৈষ্ণব বংশের সন্তানকে এক সময় কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হয়, কিন্তু কেশব সেই দীক্ষা নেয়নি, পরিবারের সকলের মতের বিরুদ্ধে গিয়েই সে ব্রাহ্ম হয়েছে। এতেই বোঝা যায় তার সাহস।

কৈশোর ছাড়বার পর থেকেই কেশব আদর্শ ও নীতিচর্চা নিয়ে মেতে আছে। তার একটা বড় গুণ, সে কোনো কাজই একা করে না, অনেককে একসঙ্গে নেয়। নেতৃত্বের সহজাত গুণ আছে তার মধ্যে, যুবকের দল বিনা দ্বিধায় তাকে নেতা হিসেবে মেনে নেয়। 'ইয়ং বেঙ্গল, দিস ইজ ফর ইউ !' নামে সে একটা ইংরেজী পুস্তিকা লিখেছে, তাতে যেন আগুন ঝরছে একেবারে।

ছেলেদের নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ একবার বোটে করে বেড়াতে গেলেন রাজমহলে, সঙ্গে আছেন রাজনারায়ণ বসু, আর এসেছে পুত্রবন্ধু কেশব। বোটের এক কোণে বসে উপনিষদ পড়েন দেবেন্দ্রনাথ, অন্য কোণে বসে কেশব পড়ে বাইবেল। আবার হঠাৎ হঠাৎ কেশব আর সত্যেন্দ্র এক সঙ্গে গান করে। বৈষ্ণব বাড়ির ছেলে কেশব, বাল্যকাল থেকেই গানের চর্চা আছে তার। কেশবের অনুপ্রেরণায় সত্যেন্দ্রও গান লিখতে ও গাইতে শুরু করেছে। দু'জনের গান শুনে প্রাণ জুড়িয়ে যায় দেবেন্দ্রনাথের। শুধু শুষ্ক তত্ত্ব নয়, ভক্তিরসের সঞ্চার করে এই দুই যুবক।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ব্যাপারে কেশবের খুব উৎসাহ। প্রায়ই সে বলে, মাত্র এক হাজার দু'হাজার লোক ব্রাহ্ম হলে কী হবে ? এই নব ধর্ম ছড়িয়ে দিতে হবে সারা দেশে, এমন কি সারা পৃথিবীতে ! যেমন তেমন করে হোক আমরা সকলকেই এই ধর্মে দীক্ষা দেবো ! আমাদের ধর্মেতে পাগল হতে হবে। উন্মত্ত না হলে কোনো কাজ হবে না।

ব্রাহ্মধর্মের মূল কথাটাও বড় সরল করে বলে কেশব। সে বলে, আমাদের এই ব্রাহ্মধর্মের ঈশ্বর তর্কলব্ধ বর্ণিত ঈশ্বর নন। এই ঈশ্বর জীবন্ত ঈশ্বর। বিশ্ব এই ধর্মের মন্দির, প্রকৃতি এর পুরোহিত। সকল অবস্থায় মানুষ ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয়ে পূজা করবার অধিকারী।

তরুণ কেশবের মুখে এসব কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান দেবেন্দ্রনাথ। যত শোনেন আরও শুনতে ইচ্ছে হয়। বিষয়-সম্পত্তি কিংবা পারিবারিক সুখ সম্ভোগের জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই এর, কেশব চায় তার সর্ব সময় ব্রাহ্মধর্মের জন্য দেবে, সে সারা দেশে প্রচারে বেরিয়ে পড়বে।

যেন এই রকম একজনের জন্যই এতদিন অপেক্ষা করছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। শুধু একটা বিষয়ে তাঁর খট্‌কা লাগে। কেশব যেমন তেমন বলে কেন ? সে যেমন তেমন ভাবে সকলকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দিতে চায়, তা হলে কি সে কোনো কৌশল বা চাতুর্যের আশ্রয় নেবে ? কেশব জাতিতে বৈদ্য, লোকে বলে বৈদ্যরা ফিচেল হয়, কিন্তু পবিত্র ধর্মের প্রচারের মধ্যে তো ফিচলেমি থাকলে চলে না। রাজনারায়ণ বসুকে দেবেন্দ্রনাথ চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, তুমি কি জানো, বৈদ্যজাতি ফিচেল বলে অপবাদ আছে কিনা ?

রাজনারায়ণ হাসতে হাসতে উত্তর দেন, হ্যাঁ, তা আছে !

দেবেন্দ্রনাথের এ সংশয়ও এক সময় কেটে যায়। তাঁর মনে হয় কেশব ছেলেটি একেবারে খাঁটি সোনা। সে ভাবাবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, পৃথিবীর সকল জাতি সমস্বরে এই গান করুক, ঈশ্বর আমাদের পিতা, সকল মানুষ ভাই-ভাই ! তা শুনে দেবেন্দ্রনাথের মনে হয়, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য এই তো আদর্শ বাণী।

পরের বছর দেবেন্দ্রনাথ সদলবলে গেলেন সিংহলে। জাহাজে চড়ে কালাপানি পার। এবারও সঙ্গী হলেন কেশব এবং কালীকমল গাঙ্গুলী নামে দুই যুবক। বাড়ির লোকের ঘোর অমতে কেশব চুপি চুপি

জাহাজে উঠে এক কুঠুরির মধ্যে লুকিয়ে রইলো। জানলা দিয়ে বাইরে কোনো বাঙ্গালীকে দেখা মাত্র চমকে চমকে ওঠে, এই বুঝি তার কোনো আত্মীয় তাকে ধরে নিতে এসেছে। সিংহল যাতায়াতের দীর্ঘ সময়ে দেবেন্দ্রনাথ তাকে আরও ভালো করে চিনলেন।

কেশব যে কতখানি উৎসাহী প্রচারক তার প্রমাণ পাওয়া গেল সিংহল থেকে ফেরার পরের বৎসর। শারীরিক অসুস্থতার জন্য কেশব বায়ু পরিবর্তনের জন্য কিছু দিনের জন্য গেল কৃষ্ণনগর। কলকাতার চেয়েও কৃষ্ণনগর প্রাচীন এবং বহু শিক্ষিত লোকের বাস সেখানে। পাদ্রীরা সেখানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করার জন্য বড় ঘাঁটি বানিয়েছে। কেশব সেখানে সভা ডেকে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতে গিয়ে ঝগড়া লাগিয়ে দিল পাদ্রীদের সঙ্গে। পাদ্রী ডাইসন কেশবকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলে কেশব সিংহগর্জনে মুখের মতন জবাব দিলো তাঁর। বহু লোক ভিড় করে এলো কেশবকে দেখতে ও তার মুখের কথা শুনতে। একটার পর একটা সভা, স্থানীয় ছাত্র, শিক্ষকের দল, এমন কি রক্ষণশীল হিন্দুরাও এলো কেশবকে সমর্থন জানাতে। এতদিন পর একজন এসে পাদ্রীদের রোধ করবার জন্য নিখুঁত যুক্তিজাল দিয়ে পাদ্রীদের চুপ করিয়ে দিয়েছে। কেশব খ্রীষ্টধর্মের নিন্দা করে না, সে বাইবেল থেকেই অজস্র উক্তির উদ্ধৃতি দেয়, দেশের অবস্থা এবং সমাজের অবস্থাও আলোচনা করে সে বুঝিয়ে দেয় যে ধর্ম সমাজ-ছাড়া নয়, আবার সমাজও ধর্ম-ছাড়া নয়।

কেশবের এই বিজয়-অভিযানের বিবরণ শুনে চমৎকৃত হন দেবেন্দ্রনাথ।

ক্রমে অবস্থা এমন হলো যে কেশবকে না দেখে তিনি থাকতেই পারেন না। পুত্রসম এই যুবকটি হয়ে উঠলো তাঁর পুত্রদের চেয়েও প্রিয়তর। কেশব বাড়িতে এলে তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ান। কেশব অন্য আর পাঁচজনের সঙ্গে বসতে গেলে তিনি তাকে জোর করে টেনে এনে বসিয়ে দেন নিজের কৌচের এক পাশে। তাঁর জন্য মিছরি বা অন্যান্য কোনো খাদ্য এলে তিনি এক চামচ কেশবের মুখে তুলে দিয়ে তারপর নিজে এক চামচ খেয়ে বলেন, একবার তুমি খাও, একবার আমি খাই !....তোমাকে দেখলেই আমার আত্মার আরাম হয়, তুমি যে ব্রহ্মানন্দ !

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেশবের সঙ্গে আলাপচারি করে কাটান দেবেন্দ্রনাথ। কেশব বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কেরানিগিরি করে, আপিস ছুটি হলেই সে চলে আসে। সঙ্গে আসে তার বন্ধু ও সমর্থকরা। হল ঘরে লম্বা মাদুর পেতে তার ওপরে বসে সকলে। ছেঁড়া ও ময়লা পোশাক পরা যুবক কেরানির দল ধর্ম আলোচনায় গলা ফাটায়, কখনো গেয়ে ওঠে গান। ঘন ঘন চা আসে। অধিক রাত্রি হয়ে গেলে কেউ কেউ ওঠবার জন্য ঘড়ি দেখলে দেবেন্দ্রনাথ তার হাত চেপে ধরে বলেন, রাখো তোমার ঘড়ি, ঘড়ি কি ঠিক সময় রাখে ?

কেশবের প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথের মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্তন হলো। কেশব তার যুবক বন্ধুদের সঙ্গে এই সংকল্প নিয়েছে যে তাদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ তারা আর কেউ উপবীত ধারণ করবে না। এই কথা শুনে দেবেন্দ্রনাথ নিজের পৈতের দিকে তাকিয়ে বললেন, তা হলে আর এটা রাখা কেন ? এতদিন পর তিনিও পৈতে ত্যাগ করলেন।

দেবেন্দ্রনাথ জানতেন, পিরালী সংসর্গ থাকায় তাঁদের কেউ খাঁটি ব্রাহ্মণ মনে করে না। ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনার সময় উপাচার্য হিসেবে খাঁটি ব্রাহ্মণরাই বেদীতে বসে শাস্ত্র পাঠ করে। দেবেন্দ্রনাথ উপদেশ দেবার সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, সেই বেদীতে কখনো বসেননি। কেশব একদিন তাঁকে বললো, আপনি আমাদের চক্ষে সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনি মহর্ষি, আপনি কেন বেদীতে বসবেন না ? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা এই ধর্মের সার কি বোঝে ? এই অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না দেবেন্দ্রনাথ, দু-একদিন দ্বিধা করার পর বেদীতে বসলেন। ব্রাহ্ম সমাজের এতদিনকার এক প্রথার পরিবর্তন হলো।

এর পর একটু বেশী সাহসের কাজ করে ফেললেন দেবেন্দ্রনাথ।

কেশব নারীদের স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তার বন্ধু সত্যেন্দ্র অল্প বয়েসেই স্ত্রী স্বাধীনতা নামে একটি বই লিখেছে। দুই বন্ধু স্ত্রীলোকদের শিক্ষা দান এবং বাড়ির ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি দান বিষয়ে আলোচনা করে। এসব দেবেন্দ্রনাথের কানে আসে, তিনি আপত্তি করেন না। তিনি বুঝতে পারেন, যুগের

পরিবর্তন হচ্ছে।

কেশব কৃষ্ণনগর থেকে ফেরার দু মাস পরে দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারীর বিবাহ। কেশব এবং অন্যান্য যুবকরা খুব একটা উচ্চ কণ্ঠে দাবি না তুললেও গুনগুনিয়ে বলাবলি করতে লাগলো, ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান পুরুষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ের বিয়ে কেন হিন্দু মতে হবে। সেই নারায়ণ শিলা আর অগ্নিসাক্ষী ? ব্রাহ্মরা এই সব পৌত্তলিকতা মানে না, অথচ সামাজিক অনুষ্ঠানে এগুলো মেনে চলতে হবে ?

দেবেন্দ্রনাথ রাজি হয়ে গেলেন যুবকদের কথায়। তিনি ঘোষণা করলেন, ব্রাহ্মমতেই কন্যার বিবাহ দেবেন। একেবারে সব কিছু অস্বীকার না করে একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা নিলেন তিনি। হিন্দু রীতি প্রায় সব কিছুই রইলো, শাঁখ বাজলো, উলুধ্বনি হলো, বিয়ের আসরে সাজানো রইলো দান সজ্জা। অর্ঘ্য, অঙ্গুরীয়, মধুপর্ক ও বস্ত্রাদি নিয়ে বরকে বরণ করলেন দেবেন্দ্রনাথ, স্ত্রী-আচারও হলো, শুভদৃষ্টি, মালা বদল, গ্রন্থি বন্ধন এসব কিছুই বাদ গেল না। শুধু রইলো না কোনো পুরোহিত আর নারায়ণ শিলা, আগুনের সামনে যজ্ঞও হলো না। তার বদলে বর ও বধূকে নিয়ে হলো ব্রহ্ম-উপাসনা আর পুরোহিতের বদলে প্রবীণ ব্রাহ্মরা দিলেন উপদেশ।

উগ্র ব্রাহ্মরা এতখানি হিন্দুয়ানী মেনে চলায় পুরোপুরি খুশী না হলেও এটাই হলো প্রথম ব্রাহ্মমতে বিবাহ। হিন্দু সমাজের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এটি। এ কাহিনী ছড়িয়ে পড়লো নানা দিকে। ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স সম্পাদিত বিলাতি সংবাদপত্র 'অল দা ইয়ার রাউণ্ড'-এ এই বিবাহের বর্ণনা ছাপা হলো ফলাও ভাবে।

আর এরই ফলে বিরাট কোলাহল পড়ে গেল হিন্দু সমাজে। নতুন ভাবে দ্বন্দ্ব শুরু হলো। ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচলনের পর প্রথমে প্রবল আলোড়ন হলেও আস্তে আস্তে তা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। দেশের মানুষ ধরে নিয়েছিল যে এটা কিছু আলাভোলা বড় মানুষ আর কিছু কলেজীয় ছোকরাদের ব্যাপার। হিন্দু ধর্মের অসংখ্য শাখা আছে, ব্রাহ্মরাও না হয় আর একটা শাখা হয়ে ঝুলে থাকবে।

কিন্তু ব্রাহ্মরা বেদকে অস্বীকার করায় হিন্দুরা আবার নড়ে চড়ে ওঠে। খ্রীষ্টানদের আছে বাইবেল, মুসলমানদের কোরাণ, আর হিন্দুদের বেদ থাকবে না ? এই সব দৈব গ্রন্থের কেউ ভুল ধরতে পারে ? আর ব্রাহ্মরা বলে কিনা বেদ অভ্রান্ত নয়। এমন কি কেউ কেউ বলতে শুরু করেছে, বেদ একখানি কাব্যগ্রন্থ মাত্র। এমন কথা যারা বলে, তারা হিন্দু ধর্মের শত্রু।

এর পর ঠাকুরবাড়িতে শালগ্রাম শিলা বাদ দিয়ে বিবাহের কথা প্রচারিত হওয়ায় ক্রোধের ফুলকি ছড়াতে লাগলো। ঈশ্বর ও অগ্নিসাক্ষী না রেখে বিবাহ হয় ? সে তো ব্যভিচার। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো সারা দেশের ঘৃণা। শুধু উপহাস ও বিদ্রূপ নয়। ব্রাহ্মদের ওপর যখন তখন আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিল। ব্রাহ্মরাও যুদ্ধের জন্য কোমর বাঁধলে নবোদ্যমে।

এই সময় ব্রাহ্মদের একজন সেনাপতি দরকার। আর কে হবে সেই সেনাপতি, কেশব ছাড়া ?

শহরে দেবেন্দ্রনাথের মন টেঁকে না। সুকুমারীর বিবাহের সময় আত্মীয় পরিজনদের কাছ থেকেও অনেক লাঞ্ছনা ও কটূক্তি সইতে হয়েছে তাঁকে। দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা শহর থেকে বেশ দূরে কোনো নিরালা জায়গায় একটা আশ্রম তৈরি করবেন। সেই উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে, স্থান নির্বাচনের জন্য ঘুরতে ঘুরতে বর্ধমানের গুসকরায় এক আম্রকুঞ্জে তাঁবু খাটিয়ে রয়েছেন তিনি, হঠাৎ যেন এক রাত্রে প্রত্যাদেশ পেলেন। যেন স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে ডেকে বলছেন, কেশবচন্দ্রকে সমাজের আচার্য করো, তাতেই সমাজের কল্যাণ হবে।

কলকাতায় ফিরে গিয়েই তিনি ঘোষণা করলেন যে কেশবচন্দ্রকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আচার্যের পদে বরণ করবেন। তাঁর বয়েস হয়েছে। সব কাজের ভার তিনি একার হাতে আর রাখতে পারেন না, তা ছাড়া এখন তিনি বেশীর ভাগ সময়েই বাইরে বাইরে থাকবেন। তিনি নামে মাত্র প্রধান আচার্য থাকলেও সব কাজের দায়িত্ব এখন থেকে নেবে কেশবচন্দ্রই।

কেশবচন্দ্রের বয়েস সবে মাত্র তেইশ বৎসর পার হয়েছে, তাকে বসিয়ে দেওয়া হবে সমস্ত প্রবীণ ব্রাহ্মদের মাথার ওপরে ! এবং অব্রাহ্মণ হয়েও সে আচার্য হবে ! এ কি সকলে মেনে নিতে পারে ? কয়েকজন বয়স্ক শুভানুধ্যায়ী দেবেন্দ্রনাথকে আড়ালে বললেন, এখনই এতটা বাড়াবাড়ি করা কি ঠিক হচ্চে আপনার ? আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে হয় না ? ঐ মাথা-গরম ছোকরাকে আপনি এতখানি সম্মান ও দায়িত্ব দিয়ে একেবারে সমাজের আচার্য করে দিচ্ছেন ? ঐ 'বোধ হয়' আর 'চেষ্টা করিব'-কে দিয়ে কতটা কাজ হবে !

'বোধহয়' আর 'চেষ্টা করিব' নিয়ে কেশবচন্দ্রের আড়ালে অনেকেই কৌতুক করে। কেশবচন্দ্রের সত্যানুরাগ এখন এমনই স্তরে গেছে যে যাতে ভুল করেও একটা মিথ্যে বলে ফেলতে না হয়, সেই জন্য কেশবচন্দ্র সব কথার মধ্যে বোধ হয় বা চেষ্টা করিব জুড়ে দেয়। ব্যাঙ্কে অঙ্কের হিসাব মেলাবার পর সাহেবের কাছে নিয়ে গেলে সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন, হিসেব মিলেছে? কেশবচন্দ্র উত্তর দিয়েছিল, বোধহয় মিলেছে! সাহেব ধমক দিয়ে বললেন, হিসেব মিলেছে কিংবা মেলেনি, এর মধ্যে আবার বোধহয় কী? কেউ কেউ রসিকতা বানিয়েছে যে, কেশবচন্দ্র ভাত খেতে বসে বলে, এবার আমি ভাত খাইবার চেষ্টা করিব। খাওয়ার পর হাত ধুয়ে এসে বলে, এবার বোধহয় আমি আঁচাইয়াছি!

প্রবীণদের আপত্তিতে কান দিলেন না দেবেন্দ্রনাথ। কেশবের মতো এমন সত্যনিষ্ঠ, কর্মিষ্ঠ আর কে আছে? সবচেয়ে বড় কথা, তার অন্তরে জ্বলছে আগুন। আগামী ১লা বৈশাখে মহা ধুমধামের সঙ্গে তাকে বরণ করা হবে আচার্য পদে।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কেরানির চাকরি ছেড়ে দিয়েছে কেশব। প্রায় সর্বক্ষণই সে ঠাকুরবাড়িতে থাকে। উৎসবের দু'দিন আগে সত্যেন্দ্র তার বন্ধুকে বললেন, ভাই, এত বড় একটা ব্যাপার হবে সেদিন—তোমার স্ত্রীকে আনবে না? তিনি দেখবেন না?

কেশব বললো, এ তো অতি উত্তম কথা। অবশ্যই বোধহয় তাঁকে আনা উচিত।

এবারে কিন্তু কেশবের পরিবারের সকলে একেবারে বেঁকে বসলেন। বাড়ির বউ যাবে ঐ ঠাকুরদের মতন ম্লেচ্ছ ও পতিতদের বাড়িতে? তা একেবারেই অসম্ভব। কেশব যদি তার স্ত্রীকে নিয়ে যায় তা হলে একেবারেই চলে যেতে হবে, এ বাড়িতে আর তার ফিরে আসা চলবে না। এমন কি সম্পত্তির অংশ থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হবে।

কেশবচন্দ্র তাতেও নিরস্ত হলো না। সম্পত্তির চিন্তা না হয় পরে করা যাবে, এখন যেমন ভাবেই হোক সে তার স্ত্রীকে নিয়ে যাবে। সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও কেশব তার স্ত্রীকে কোথাও খুঁজে পেল না। এর মধ্যেই তাকে কোথাও লুকিয়ে ফেলা হয়েছে।

সেই রাত্রেই একটা শিবিকা সঙ্গে নিয়ে কেশব চলে এলো বালীতে। এখানে তার শ্বশুরালয়। ভৃত্যদের কাছে প্রথমে সন্ধান নিল তার পত্নী জগন্মোহিনী সেখানে আছেন কি না। আছেন জেনেও কেশবচন্দ্র বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো না, এক ভৃত্যকে দিয়ে সংবাদ পাঠালো যে সে বাইরে অপেক্ষা করছে, জগন্মোহিনী ইচ্ছে হলে এসে সাক্ষাৎ করতে পারে।

জগন্মোহিনী তৎক্ষণাৎ নেমে আসতেই কেশবচন্দ্র তাকে সমস্ত ঘটনাটি প্রথমে বোঝালো। তারপর বললো, শোনো, তুমি খুব ভালো করে ভেবে দ্যাখো। তুমি যদি আমার সঙ্গে আসো, তবে তোমাকে জাত, ধর্ম, টাকা-পয়সা, সোনা-গহনা সব ত্যাগ করতে হবে। তোমার পিতা-মাতা ও অন্যান্যরা যাঁদের সঙ্গে তুমি স্নেহভালোবাসার বন্ধনে বদ্ধ, তাঁদের সঙ্গে নষ্ট হবে তোমার সম্পর্ক। ক্ষুধার অন্ন কখন কী জুটবে ঠিক নেই। আমাকে ছাড়া আর সব কিছুই হারাবে তুমি। এতখানি ত্যাগের বিনিময়ে শুধু আমি কি তোমার যোগ্য?

কোনো উত্তর না দিয়ে কেশবের দিকে এগিয়ে এলো জগন্মোহিনী।

ভোরবেলা সস্ত্রীক কেশব এসে পৌঁছলো জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দেউড়ির সামনে। দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা করছিলেন তার জন্য। কেশবকে আলিঙ্গন করার জন্য দু' হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন, এসো ব্রহ্মানন্দ, আমার এ গৃহ, তোমার গৃহ। তুমি সুখে এখানে বাস করো।

পরিদর্শকের কার্যালয়ের জন্য চিৎপুরে একটি বাড়ি ক্রয় করেছে নবীনকুমার। নতুনভাবে সব কিছু সজ্জিত করা হচ্ছে। সম্পাদকের কক্ষটি দ্বিতলে।

অগ্রহায়ণ মাসের এক দ্বিপ্রহরে নবীনকুমারের জুড়ি গাড়ি সেই গৃহের সামনে থামলো। আজ থেকে সে এই দৈনিক পত্রিকাটির পরিচালনা ও সম্পাদনার ভার গ্রহণ করবে। জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও

মদনমোহন গোস্বামী নামে দুই ব্রাহ্মণ নবীনকুমারকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সসম্ভ্রমে নিয়ে এলো দ্বিতলে। এই দুই ব্রাহ্মণই পত্রিকাটি শুরু করেছিল, ক্ষুদ্র আকারের এক পাতার কাগজ, তাও চালাতে পারেনি, নবীনকুমার ওদের কাছ থেকে পরিদর্শকের সর্বস্বত্ব গ্রহণ করেছে। হরিশের মৃত্যুর পর সাপ্তাহিক হিন্দু পেট্রিয়টের সে-ই মালিক। দূরবীন নামে একটি উর্দু পত্রিকাও চলে তার অর্থানুকূল্যে। এবার সে অধিগ্রহণ করলো এই দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র।

সম্পাদকের কেদারায় আসীন হয়ে নবীনকুমার অন্যদের বললো, অনুগ্রহ করে আপনারাও বসুন। প্রথমেই আমি প্রয়োজনীয় ক'টা কতা বলে নিতে চাই।

প্রাক্তন দুই সম্পাদক ছাড়াও আর আটজন মুদ্রাকর এই কাগজের কর্মী। এ ছাড়াও নানাভাবে সংশ্লিষ্ট সাত-আট জন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত। কয়েক জন আসন গ্রহণ করলো, কয়েক জন রইলো দণ্ডায়মান।

বাইশ বৎসর বয়স্ক সম্পাদক গম্ভীর কণ্ঠে বললো, প্রথমেই জানাই, তর্কালঙ্কার মশাই ও গোস্বামী মশাই সমেত এই পত্রিকার যাঁরা যাঁরা কর্মী ছিলেন, সকলেই ভবিষ্যতে এ কাগজে বহাল থাকবেন।

সকলে একসঙ্গে সাধু! সাধু! বলে উঠলো। ছলছল করে উঠলো তর্কালঙ্কার ও গোস্বামীর চক্ষু। তারা এতটা আশাই করেনি।

নবীনকুমার বললো, আপনারা আরও যোগ্য লোক খুঁজুন, আমার আরও কর্মী লাগবে। একপাতা নয়, এই পত্রিকা হবে চার পৃষ্ঠা।

এবার সকলে আরও বিস্মিত। চার পৃষ্ঠার বাংলা কাগজ ? প্রতিদিন ? এমন কথা কেউ কখনো শুনেছে!

অন্যদের মুখে বিস্ময়-লেখা পাঠ করেই নবীনকুমার আবার বললো, হ্যাঁ, প্রতিদিন চার পৃষ্ঠা। এ কাগচ হবে ইংরেজি পত্রিকাগুলির সমতুল্য। আপনারা সকলেই জানেন, এতকাল যে সব বাংলা সংবাদপত্র বেরিয়েচে, তা ইংরেজি কাগচগুলির উচ্ছিষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। ইংরেজি কাগচের বস্তাপচা পুরোনো খবর বাংলা কাগচে বেরোয়। আমি নাম কত্তে চাই না, এমন বাংলা কাগচ আচে যার সংবাদ অংশ ইংরেজি কাগচের চোথো অনুবাদ, কী তাই না ?

অন্যরা আর কী বলবে! এ তো জানা কথাই। বাংলা কাগজের নিজস্ব সংবাদ সংগ্রহের সুযোগ কোথায় ?

আমরা পরিদর্শকের জন্য নিজস্ব রিপোর্টার নিয়োগ কর্বো। তারা হাইকোর্টে যাবে। মফস্বলে যাবে, হাটে-বাজারে ঘুরবে, গবরমেণ্টের হাই হাই ব্যক্তিদের সঙ্গে কতা বলবে, তারপর নিরপেক্ষ সংবাদ দেবে। দেখুন, অনেক সংবাদ আচে, যা সাহেবদের কাজে লাগে কিন্তু আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। তবু বাংলা কাগচে ইংরেজির অনুকরণ করে সেগুলি ছাপে। যেমন ধরুন, অমুক জাহাজ অমুক স্থল থেকে এসেচে। অমুক জাহাজ অমুক দিনেতে কলকাতা ছেড়ে ইংলণ্ডে যাবে। এই সংবাদ পাঠে বাঙালীর কী উপকার ? আমাদের আচার-ব্যবহার সমুদয়ই ইংরেজ জাতি হতে ভিন্ন। সুতরাং বাঙলা কাগচে বাঙ্গালার নিজস্ব খবর, যাতে দেশের কল্যাণ হয়, মানুষের চেতনা জাগ্রত হয়, এমন বিষয় পরিবেষণ কত্তে হবে। তা ছাড়া আপনাদের সকলকে এক শপথ নিতে হবে, আপনারা রাজি ?

সকলের মুখপাত্র হয়ে মদনমোহন গোস্বামী বললেন, সিংহমশাই, আপনার বাক্যগুলি শুনে আমাদের মনে এক নতুন ভাবের উদ্রেক হতেছে। এ সব যে বড়ই সত্য কথা। তত্রাচ তাহা আমরা এতদিন উপলব্ধি করি নাই।

নবীনকুমার বললো, মেডিক্যাল কলেজ থেকে ছাত্ররা পাশ করে যখন ডাক্তার হয়, তখন মানবসেবার জন্য তাদের শপথ নিতে হয়। সংবাদপত্রেও মানুষের মনের চিকিৎসা হওয়া কর্তব্য। সে কারণে আসুন আমরা শপথ গ্রহণ করি, জ্ঞানপূর্বক সত্য পথ থেকে বিচলিত হবো না। যাতে কোনো বিষয়ের অতি বর্ণন না হয় সে বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হবো...আর...পৃথিবীর কোনো মানুষই পক্ষপাতের হাত এড়াতে পারেন না যদিও, তবু আমরা অঙ্গীকার কচ্চি যে, জ্ঞানত কোনো পক্ষপাত দোষে লিপ্ত হবো না। কেমন, এ শপথ ঠিক ?

—অবশ্যই, অবশ্যই!

—আপনারা জানেন, আমি মহাভারত অনুবাদ-কার্যে ব্যস্ত আছি। অর্ধেকের বেশী হয়ে গ্যাচে, এ সময় সে কাজে ঢিল দেওয়া চলে না। সেজন্য এখানে আমি খুব বেশী সময় দিতে পারবো না। দায়িত্ব নিতে হবে আপনাদেরই। আমি সকাল আট ঘটিকা থেকে দুপুর দুই ঘটিকা পর্যন্ত মহাভারত কার্যালয়ে

থাকব। সেখান থেকে আসতে আমার এক ঘণ্টা লাগবে। অর্থাৎ তিন ঘটিকা থেকে রাত্র আট-নয় ঘটিকা পর্যন্ত আমি আপনাদের সঙ্গে এখানে কাজ কর্বো!

—সে কি মহাশয়! আপনি আহার-বিশ্রামেরও সময় রাখবেন না?

—আমার এ শরীরের পক্ষে খুব বেশী আহার্যের প্রয়োজন হয় না, আর বিশ্রামের জন্যও আমার শয্যার প্রয়োজন হয় না। সেজন্য আপনাদের চিন্তা করবার দরকার নেই। বাংলার ঘরে ঘরে এই কাগচ পৌঁচে দেওয়া চাই। যাতে লোকে ইংরেজি দৈনিক ফেলে সাগ্রহে এই কাগচ পড়ে। আর একটা কতা! গোস্বামী মশাই, এ কাগচে লেকবার সময় আপনাদের ভট্টাচার্যি-বাংলা ছাড়তে হবে। সংস্কৃত আর নস্যির গন্ধওলা বাংলা আমার চাই না। সাধারণের বোধগম্য সহজ সরল ভাষাতেই সংবাদপত্র প্রচারিত হওয়া উচিত। তাতে ব্যাকরণ একটু ক্ষুণ্ণ হলে কিংবা ব্যোপদেব রাগ কল্লেন কিনা তা নিয়ে মাতা ঘামালে চলে না!

শুরু হয়ে গেল দৈনিক পরিদর্শক। চার পৃষ্ঠার কাগজ, দাম চার পয়সা। সম্পূর্ণ নতুনভাবে সংবাদ পরিবেশন, ঝকঝকে ছাপা, সবই অভিনব। লোকে প্রাতরাশ গ্রহণ করবার আগেই যাতে এই কাগজ পেয়ে যায়, তেমন ব্যবস্থা করা হলো। শিক্ষিত ব্যক্তিরা সকলেই স্বীকার করলেন, বাংলায় এমনটি আর কেউ দেখেনি।

বিদ্যাসাগর প্রথম দিন পরিদর্শক পেয়ে বিস্মিত হলেন। নবীনকুমার কী কাণ্ড শুরু করেছে! দৈনিক সংবাদপত্র বার করা কি সোজা কথা! ওদিকে মহাভারত অনুবাদের মতন অত বড় কাজ হাতে রয়েছে···হুজুগে যুবক, তবে কি মহাভারতের কাজ মুলতুবি রেখে এবার এটাতে মেতেছে?

একদিন তিনি চলে এলেন বরাহনগরে। সারস্বত-আশ্রমে মহাভারত অনুবাদের কাজ কিন্তু একটুও থেমে নেই। নবীনকুমার পণ্ডিতদের একদণ্ডও নিবৃত্তি দেয় না। পণ্ডিতরা মহাভারতের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি থেকে মিলিয়ে একটি একটি মূল নির্বাচন করে তার আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ করে রেখে দেয়। নবীনকুমার প্রত্যেক দিনের প্রথমার্ধ এখানে কাটিয়ে ভাষার পরিমার্জনা করে। তারপর সে চলে যায় পরিদর্শক কার্যালয়ে।

বিদ্যাসাগর ভাবলেন, তা হলে এই বাংলা সংবাদপত্র বেশীদিন বেরুবে না।

অথচ দিনের পর দিন ঠিক সময়ে পরিদর্শক প্রকাশিত হতে লাগলো।

এক সন্ধ্যাকালে পরিদর্শকের সম্পাদকের কক্ষে এসে প্রবেশ করলো সম্পাদকেরই সমবয়সী এক যুবক। নবীনকুমার সম্পাদকীয় লিখছিল অভিনিবিষ্টভাবে, যুবকটি গলা খাঁকারি দিয়ে বললো, কী হে, নবীনবাবু, একটু বসতে পারি?

নবীনকুমার মুখ তুলে, ঈষৎ বিস্মিত হয়ে বললো, এ কি কৃষ্ণকমল নয়? আরে, আরে, বসো বসো! অ্যাদ্দিন বাদে হটাৎ কী মনে করে?

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য নবীনকুমারের সহপাঠী ছিল হিন্দু কলেজে, কিছুদিন সে বিদ্যোৎসাহিনী সভাতেও যোগ দিয়েছিল উৎসাহের সঙ্গে। তারপর বেশ কিছুদিন তার দেখা নেই। কৃষ্ণকমল যেমন মেধাবী, তেমনই খেয়ালী।

কৃষ্ণকমল বললো, কেমন দেশোদ্ধার কত্তে মেতেচো, তাই দেখতে এলুম।

নবীনকুমার বললো, একটু বসো, কৃষ্ণকমল। আমি হাতের এই কাজটা সেরে নি আগে, তারপর তোমার সঙ্গে কতা কইবো।

সম্পাদকীয় লেখা শেষ করে, কপি বয়কে ডেকে তার হাত দিয়ে সেটি ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিয়ে নবীনকুমার বললো, কৃষ্ণকমল, তুমি এসেচো বড় ভালো হয়েচে, তোমার মতন একজনকেই খুঁজচিলুম!

—ঘরে হুঁকো-গড়গড়া কিছুই রাখোনি?

—আমি তো ধূমপান করি না।

—তুমি না হয় নাই কল্লে, কিন্তু অতিথি আপ্যায়নের জন্য তো অন্তত রাকবে, সম্পাদকের ঘরে কত রকম মনুষ্য আসবে।

—এখুনি আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা কচ্চি!

—থাক, থাক, আপাতত নস্যিতেই কাজ চালাই। ভট্টাচার্যি বংশের ছেলে, সঙ্গে সব সময় নস্যির ডিবেটা রাকি।

—তা ভট্টাচার্যির বংশের সন্তান হয়েও তুমি তো পুরোপুরি নাস্তিক শুনিচি! আরও কী কী যেন

কচ্চো, যা ঠিক ভট্টাচার্য-সুলভ নয় ?

—আরে, নাস্তিক হয় বামুনরাই। চাঁড়াল কখনো নাস্তিক হয় না। বামুন ব্যাটারা জানে যে অন্য জাতের লোকদের ভগবানের নাম করে খুব ভয় দেকাচ্ছি বটে, আসলে ভগবান-টগবান কিচু নেই। মন্দিরের পুজোরিরা দেকবে টপ করে ঠাকুরের প্রসাদ এঁটো করে খেয়ে নেয়।

—হা-হা-হা-হা।

—তোমরা কায়েতরা আর বেনেরা ধূমধাম করে মা-বাপের ছেরাদ্দ যজ্ঞ করো, ব্রাহ্মণকে গোরু-বাছুর দান করো। কত না যেন পবিত্র পুণ্যের কাজ। আর সে বামুন বাছুরের গলায় দড়ি বেঁধে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে কশাইয়ের কাচে বিক্‌কিরি করে দেয়।

—হ্যাঁ। ছেলেবেলায় এ রকম দেকিচিলুম বটে, তখন রাগ করে সেই বামুনের টিকি কেটে নিইচিলুম। যাক সে কতা। তুমি এসে পড়েচো, তোমাকে আমার দরকার।

কৃষ্ণকমল দীর্ঘাঙ্গি, কৃশকায়, গাত্রবর্ণ মাজা মাজা, এই বয়েসেই একটু একটু টাক পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু গুম্ফটি বেশ পুরুষ্টু। পরনে ধুতি, বেনিয়ান ও চায়না কোট, পায়ে তালতলার চটি। ওষ্ঠে একটু যেন বিদ্রূপ হাস্য সব সময় লুকিয়ে থাকে।

এক টিপ নস্য নাকে ঠুসে দিয়ে সে বললো, আমার মতন লোককে তোমার কী দরকার পড়লো বলো তো ?

—তুমি 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' নামে একখানা বেশ সরেশ গ্রন্থ রচেচিলে, পড়ে বড় মজা পেয়েচিলুম। আর তো বাংলায় তেমন লিকলে না ! তোমার মতন বিদ্বান, তীক্ষ্ণধী লোককে আমাদের চাই। তোমরা কলম ধরলে দেশের অনেক উপকার হবে। তুমি আমাদের কাগচের জন্য লেগে পড়ো না !

—হুঁ, তোমার কাগচে দেশসেবার বিষয়ে অনেক বড় বড় কতা থাকে তো দেকচি। তা এ জন্য তোমার কত খর্চা হচ্ছে ?

—খর্চার কতা ভাবলে কি কোনো ভালো কাজ হয় ?

—সাহেব ব্যবসায়ীরা তোমার কাগচে বিজ্ঞাপন দেয় না। অর্থাৎ রেভিনিউ নেই। সবটাই তোমার পার্স থেকে যাচ্চে, তাই না ?

—কাগচ ঠিক মতন চললে ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপন ঠিকই দেবে।

—বাংলা কাগচে ? হেঃ !

—কৃষ্ণকমল, তুমি বিশ্বাস করো না বাঙালী ইংরেজের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে ? ইংরেজিতে ভালো ন্যুজ পেপার হয় আর বাংলায় আমরা তেমন পারি না ?

—ঈশ্বর গুপ্ত কিংবা গুড়গুড়ে ভট্চার্যের মতন খিস্তি-খেউড় ছাড়ো, কাগচ চলবে। তোমার এই বড় বড় আইডিয়ালিজ্‌ম-এর কথা ক'জন বুঝবে ? দেশাত্মবোধ, হুঃ, ক'জন লোক জানে দেশ কাকে বলে ?

—কৃষ্ণকমল, তুমি কি আমায় নিরাশ করে দেবার জন্যই আজ এখেনে এসোচো ! তোমার এ সব বিনি পয়সার উপদেশ আমি শুনতে চাই না। তুমি আমার কাগচে লিকবে কি না ?

—পয়সা পেলে লিকতে পারি বটে।

—পয়সা পাবে। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপনা করচো শুনিচি, তোমার কি এমনই পয়সার অভাব যে লেকার আগেই পয়সার কথা মনে এলো ?

—পয়সার চিন্তা কার নেই ! স্বয়ং লর্ড ক্যানিং পর্যন্ত বলেন যে সরকারি ফাণ্ডে টাকার অভাব। তোমাদের মতন দেশের উপকার করবার জন্য আমি মাতা ফাটাফাটি করতে রাজি নই। সমাজ পরিবর্তনের জন্য যাঁরা উজিয়ে বেড়াচ্চেন বেড়ান, আমি প্রফেশনাল মানুষ।

—বেশ ভালো কতা। প্রফেশনাল লেখক হিসেবেই তুমি আমাদের নতুন কী দিতে পারো ? সাহেব-সুবোর গল্প কিংবা বিলেতি চালের বাংলা আমার চলবে না।

—তুমি দেশীয় বিষয় চাও। এ দেশের কোতায় কী কাণ্ড ঘটেচে তুমি কতটুকু জানো ? তুমি এমন কোনো স্থানের কতা জানো, যেখেনে হাজার হাজার নারী-পুরুষ প্রকাশ্য স্থানে পাশাপাশি বসে খাওয়া-দাওয়া করে, নাচে গায় ?

—হাজার হাজার নারী-পুরুষ ?

—তার বেশী ছাড়া কম নয়। পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যাই বেশী, এক পুরুষের পাশে তিন-চারজন যুবতী—

—এ সব কী গাঁজাখুরি চালাচ্চো, কৃষ্ণকমল ? নারী-পুরুষ প্রকাশ্য স্থানে বসে আহারাদি করবে ? এ কি তোমার সাধের ইংলণ্ড না সুদূর আমেরিকা ? হিন্দুস্তানে এমন সম্ভব নয়।

—হিন্দুস্তান বাদ দেও, কলকেতা থেকে মাত্র ষোল ক্রোশ উত্তরেই এমন হয়, আমি নিজের চক্ষে দেকে এসিচি। রেলযোগে কাঁচড়াপাড়া চলে যাও, তার কাচেই ঘোষপাড়া গ্রাম। সেখানে প্রতি দোল-পূর্ণিমায় আউলে সম্প্রদায়ের মেলা বসে। আউলে সম্প্রদায়ের নাম শুনেচো ? শোনোনি ? অথচ দেশের অবস্থা বদলাতে চাও ? সেইজন্যই বলচিলুম, ক'জন জানে দেশ মানে কী ?

—বাংলায় হিন্দুদের কত সম্প্রদায় আচে। তার মধ্যে সব কটি সম্প্রদায়ের পরিচয় না জানলেই দেশকে জানা হলো না ?

—নবীন, তোমায় একটু ক্ষেপাচ্চিলুম। আমি নিজেই কি ছাই জানতুম ? নেহাত গতবারে গিয়ে পড়িচিলুম। সে দেকি কি ষাট সত্তর হাজার মানুষের মেলা। তার মধ্যে চোদ্দ আনাই স্ত্রীলোক। কুলকামিনীরা আর অমন ধেই ধেই করে মেলায় যাবে এমন বিশ্বাস হয় না, মনে হলো বেশ্যার সংখ্যাই বেশী। কেউ হত্যে দিয়ে আচে, কেউ পুজো দিচ্চে, কেউ বা নাচা-গানা করে চলেছে, আবার কেউ বা নিজের লোককে বোবা সাজিয়ে 'বোবার কথা হোক' বলে রোগ আরামের ভেল্কি দেকাচ্চে !

—এত লোক এক সঙ্গে ?

—হ্যাঁ। আউলে সম্প্রদায়ের কর্তা এখন ঈশ্বরচন্দ্র মহাশয়। তার সঙ্গে দেকা করতে গিয়ে দেকলুম, কর্তাবাবু একটা শয্যায় শয়ন করে আচেন আর অনেকগুলি স্ত্রীলোক তাকে ঘিরে বসে কেউ পদসেবা কচ্চে, কেউ গা টিপে দিচ্চে, কেউ মুখে সন্দেশ তুলে দিচ্চে, কেউ অঙ্গে চন্দন লেপচে আর কেউ গলায় মালা পরাচ্চে। বেড়ে ব্যাপার। কর্তাবাবু আমার সঙ্গে কতা বলার সময়ই পেলেন না। শুনলুম নাকি বৃন্দাবনের কেষ্টলীলার মতন এখানেও স্ত্রীলোকদের বস্ত্রহরণ হয় !

—কৃষ্ণকমল, তোমার ঝোঁকটা কোন দিকে বলো তো ? তুমি যেন আদি রসের ব্যাপারে বেশী মজা পেয়েচো ? আমার কাগচে ওসব আমি প্রচার কত্তে চাই না।

—ওঃ হো, তোমার বুঝি আদি রসের দিকে ঝোঁক নেই। ঐ যে হুতোম প্যাঁচার নক্সা বাজারে ছেড়েচো, তাতে তো আদিরসের টিপ্পনী কম নেই !

—ওটা, ওটা—

—বুঝিচি, ওটাও সমাজসংস্কার ! শোনো, আমি এই মেলার কতা সবিস্তারে বললুম কেন জানো ? ঐ মেলাটা দেকে আমি মুগ্ধ হয়িচি। শুধু আদিরসের জন্য নয়, এই প্রথম আমি একটা মেলা দেকলুম, যেখানে কোনো জাতিভেদ নেই। এখানে হিঁদু-মোছলমান সব সমান। মোছলমান এখানে সানন্দে বামুনের মুখে অন্ন দেয়, বামুন আহ্লাদ করে খায়। সদগোপ, কলু, মুচি, বৈষ্ণব সব ওখেনে এক। এমনকি নারী-পুরুষেও প্রভেদ নেই। অবস্থাবৈগুণ্যে যে-সব অবলা নারী বেশ্যা হয়েচে, তাদেরও কেউ ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাকে না ! এ যেন এক মহামিলন মেলা। এ কতা সারা দেশকে জানাবার দরকার নেই ?

—বেশ তো তুমি লিকে দাও !

কৃষ্ণকমল প্রায়ই সন্ধ্যের দিকে আসতে লাগলো পরিদর্শকের সম্পাদকীয় দফতরে। কিন্তু গাল-গল্পই করে, লেখার ব্যাপারে অলস। ঈষৎ ঝাঁঝালো বিদ্রূপ মিশ্রিত গল্প বলায় তার জুড়ি নেই, কাজ বন্ধ করে নবীনকুমারকে শুনতে হয়।

নবীনকুমার তাকে লেখার জন্য তাড়া দিলেই সে বলে, আরে দাঁড়াও, তোমার কাগচ ভালো করে চলুক। আগে দেকি, তোমার এলেম কতদূর ! এর মধ্যে কত টাকা গলে গ্যাচে, ঠিক করে বলো তো ভাই ?

নবীনকুমার এই শেষের কথাটিতে অপ্রসন্ন হয়। সে হাত তুলে বাধা দিয়ে বলে, ও প্রসঙ্গ তুলো না। আমি টাকা-পয়সা নিয়ে চিন্তা করতে চাই না !

হরিশের মতন কৃষ্ণকমলও বেশ খানিকটা প্রভাব বিস্তার করলো নবীনকুমারের মানস-জগতে, যদিও হরিশের সঙ্গে কৃষ্ণকমলের অনেক প্রভেদ। হরিশ যথেষ্ট কৃতবিদ্য হয়েও তাঁর মধ্যে সব সময় জ্বলন্ত ছিল দুর্বার দেশপ্রেম এবং তীব্র প্রাণশক্তি। হরিশের কর্মচাঞ্চল্য অন্যদেরও জাগিযে দিত। সেই তুলনায় কৃষ্ণকমল শুধুই বুদ্ধিজীবী, তার মধ্যে কর্মের উদ্যম নেই, বরং অন্য সকলের সশ্লেষ সমালোচনা করতে সে খুব পারদর্শী।

কিছুদিন আগে কৃষ্ণকমলের দাদা রামকমল আত্মহত্যা করেছেন। সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত মেধাবী ছাত্র এবং রূপবান, গুণবান রামকমল স্বহস্তে নিজের জীবনের অবসান ঘটানোয় দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই বিস্মিত হয়েছিলেন। ইদানীংকালের মধ্যে এরকম ঘটনা আর শোনা যায়নি। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান এই মানব-জীবন, তা কেউ নিজের হাতে নষ্ট করে? দাদার মৃত্যুর পর থেকে কৃষ্ণকমল যেন আরও তিক্ত হয়ে উঠেছে, সব কিছুর প্রতিই তার বিদ্রূপ হাস্য। একমাত্র রমণীদের প্রসঙ্গ উঠলেই সে সরস হয়ে ওঠে।

'পরিদর্শক' কার্যালয়ে সে নিয়মিত আসতে লাগলো কিন্তু তার লেখার নামটি নেই। একদিন সে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি যুবককে সঙ্গে করে এনে নবীনকুমারকে বললো, এ বেশ কবিতা-টবিতা লিখচে, দ্যাখো না, একে কোনো কাজে লাগাতে পারো কি না! আর একদিন সে বললো, দেবেন্দ্রবাবুর বড় ছেলে দ্বিজেন্দ্রকে কিছু লিখতে বল না! দ্বিজেন্দ্র তোমার-আমার সমবয়েসী হবেন বোধ করি, মগজে বিদ্যা-বুদ্ধি কিঞ্চিৎ আছে।

একদিন সন্ধ্যার পর বিদ্যাসাগর 'পরিদর্শক' কার্যালয় দেখতে আসবেন শুনে কৃষ্ণকমল তড়িঘড়ি পায়ে চটি গলিয়ে বললো, তা হলে আমি উঠি।

নবীনকুমার অবাক হলো। সে জানতো, কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের বিশেষ প্রিয় পাত্র, শিশু কৃষ্ণকমলকে বিদ্যাসাগর নিজে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কেন, বিদ্যাসাগর মশায়ের সঙ্গে দেকা করে যাবে না?

কৃষ্ণকমল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, না হে, উনি আমায় দেখলে ব্যাজার হবেন। কেন আর মিছামিছি ওঁর বকুনি শুনি!

—কেন, উনি তোমায় বকবেন কেন?

—কারণ আচে। তুমি জানো না, উনি চেয়েছিলেন আমি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে ডাক্তার হই। তাতে আমার রুচি হয়নি। ওঁর আদেশ আমি মানি নি!

—সে তো অনেকদিন আগের কথা। উনি তো পুরোনো রাগ পুষে রাখেন না!

—ইদানীং অন্য একটি কারণেও উনি খুব কুপিত হয়ে আচেন আমার ওপরে। বীরসিংহার ঐ ব্রাহ্মণটির একটা দোষ কি জানো, যার সঙ্গে নিজের মত না মিলবে, তাকেই আর উনি সহ্য করতে পারেন না।

—কিন্তু উনি তো অন্যায্য বিষয়ে রাগ করেন না। তোমার ওপর কোন্ কারণে রাগ করেচেন?

—সেটি এখন বলা হচ্ছে না! আমি যাই!

বেশ ব্যস্তসমস্ত হয়েই চলে গেল কৃষ্ণকমল।

একটু পরেই এলেন বিদ্যাসাগর। বিশেষ যত্ন নিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন সংবাদপত্র-পরিচালনার কাজকর্ম। তারপর বললেন, সোমপ্রকাশে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তোমার এই উদ্যমের খুবই প্রশংসা করেছেন। এখন দেখছি, তিনি অতিরঞ্জন করেন নি মোটেই। তবে এটিকে টিকিয়ে রাখাই দরকার।

নবীনকুমারের মাথায় কৃষ্ণকমলের কথাটাই ঘুরছিল। সে ফস্ করে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কৃষ্ণকমলকে পচন্দ করেন না?

বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর। উদাসীনভাবে বললেন, লোকে ভাবে আমি যা বলবো কৃষ্ণকমল বুঝি তা সবই শুনবে। আসলে সে আমাকে মোটেই মানে না।

পরদিন কৃষ্ণকমল আবার আসতেই নবীনকুমার তাকে চেপে ধরলো। সে বললো, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে তোমার কী নিয়ে মনোমালিন্য হয়েচে, তা বলতেই হবে। ঐ চিন্তাটা কিচুতেই মাতা থেকে তাড়াতে পারচি না।

কৃষ্ণকমল হেসে বললো, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে তোমার এত কৌতূহল কেন, নবীন ?

নবীনকুমার বললো, আমার কৌতূহল তোমার ব্যাপারে নয়, আমার গুরু কোন্ কারণে তোমার মতন প্রিয়জনের ওপরেও রাগ করেন সেইটি শুধু আমি জানতে চাই।

কৃষ্ণকমল বললো, সেটি জানতে হলে তোমাকে এক স্থানে যেতে হবে আমার সঙ্গে। তুমি যেতে পারবে ?

নবীনকুমার বললো, কোথায় ?

কৃষ্ণকমল বললো, সে যে-স্থানেই হোক না কেন, তুমি যেতে পারবে কি না বলো ?

নবীনকুমার বললো, কেন পারবো না ? আমি পুরুষমানুষ হয়ে এমন কোন্ স্থান আচে, যেখেনে যেতে পারি না ?

—তা হলে আগে কাজ সেরে নাও !

রাত্রি ন'টায় পরিদর্শক কার্যালয় থেকে বেরুলো দু'জনে। জুড়ি গাড়িতে উঠেই দার্শনিক আলোচনা শুরু করে দিল কৃষ্ণকমল। ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ-এর সে খুব ভক্ত, প্রায়ই সে কোঁৎ-প্রচারিত পজিটিভিজম তত্ত্ব বোঝাতে চায় নবীনকুমারকে। নবীনকুমারের অবশ্য দর্শনের জটিল ব্যাপার নিয়ে মস্তক ঘর্মাক্ত করার তেমন আগ্রহ নেই।

কৃষ্ণকমল বললো, দ্যাখো, ইংরেজি মাসের নামগুলি যে ঠাকুর দেবতাদের নামে, এটা আমার মোটেই পছন্দ হয় না। এ বিষয়ে কোঁৎ একটা চমৎকার ব্যবস্থা দিয়েছেন। তিনি বৎসর ভাগ করেছেন তের মাসে, প্রত্যেক মাসের নাম হবে মোজেস, হোমর, আরিস্টট্ল, আর্কিমিডিস, শেক্সপীয়র, এঁদের নামে।

নবীনকুমার বললো, তা বেশ তো। কিন্তু আমাদের বেদব্যাস, বাল্মীকি এঁরা কি দোষ কল্লেন ? ব্যাস-বাল্মীকি কি হোমর-শেক্সপীয়রের চেয়ে কিছু খাটো ?

—কোঁৎ সারা মাসটা ভাগ করেছেন আঠাশ দিনে। প্রত্যেক দিনের নামও হবে এক একজন মহাপুরুষের নামে। মনু, মুহম্মদ, বুদ্ধ, নিউটন, কলম্বাস এঁরা।

—তা আগে থেকে এই সব মহাপুরুষদের নামে মাস আর দিনের নাম ঠিক করে ফেল্লে, ভবিষ্যতেও যে এঁদের চেয়ে আরও বড় মহাপুরুষ জন্মাবেন না, তার কোনো ঠিক আচে ? তখন আবার নাম বদলাবে ? তা ছাড়া এই নাম নিয়ে পৃথিবীর সব দেশের লোক একমত হবে কেন ?

—আমি কোঁৎ-এর মতটিই শ্রেষ্ঠ মনে করি।

—আমি কিন্তু ফ্রেডারিক দি গ্রেটের চেয়ে সম্রাট অশোককে বড় বলবো। আমরা এখন কোতায় যাচ্চি বলো তো ?

—আমি কোচোয়ানকে বলে দিয়েছি। শোনো, জন স্টুয়ার্ট মিল এই পজিটিভিস্ট ক্যালেণ্ডার সম্পর্কে কী বলেছেন জানো ? এতে পরস্পর বিরোধী, বিভিন্ন মতাবলম্বী এমন সব ব্যক্তিদের নাম পাশাপাশি রাখা হয়েছে যারা জীবিত অবস্থায় দেখা হলে পরস্পরের গলা কাটাকাটি করতেন নিশ্চয়ই। কোঁৎ-এর এই যে বিশ্ব মানবিক উদার মনোভাব, এটি পৃথিবীর আর কোনো দার্শনিকের মধ্যে দেখেছো ? ডিস্টিংকশান অফ ফাংশান, অর্থাৎ কর্মে অধিকার ভেদ কোঁৎ-এর একটা প্রধান কথা।

গাড়ি এসে থামলো এক জায়গায়। পিছন থেকে দুলাল এসে জিজ্ঞেস করলো, এবার কোন্ দিকে যাবো ?

কৃষ্ণকমল বললো, সামনের গলিতে লাল বাড়িটির সামনে।

গাড়ি থেকে নেমে নবীনকুমার এদিক ওদিক তাকিয়ে সন্দিহান হলো। এ যে রামবাগানের কু-পল্লী। কোঁৎ-শিষ্যের এখানে কী জন্য আগমন ? বিশ্বের সমস্ত সতী রমণীদের সম্মানার্থে কোঁৎ চার

বৎসর অন্তর বিশেষ একটি দিনে সারা পৃথিবীতে একসঙ্গে একটি উৎসবের প্রস্তাব দিয়েছেন, সেই কোঁৎ-এর শিষ্য হয়ে কৃষ্ণকমল অসতী নারীদের কাছে এলো কেন এত রাত্রে ?

লাল রঙের বাড়িটির দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকমল বললো, এসো, তিনতলায় যেতে হবে।

কোনো আপত্তি না জানিয়ে নবীনকুমার তাকে অনুগমন করলো।

আলো-ঝলমল কক্ষ এবং রমণীকণ্ঠের নির্লজ্জ হাস্যধ্বনি শুনে বাড়িটির চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

ওপরে উঠে এসে একটি বন্ধ দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকমল ডাকলো, প্রমদা, প্রমদা।

চওড়া লালপেড়ে ধনেখালির শাড়ি পরা এক যুবতী দ্বার খুলে ওদের দেখে একটু সরে দাঁড়ালো।

ঘরের মধ্যে একটি মোটা জাজিম পাতা, আর দেয়ালের সঙ্গে ঠেসান দেওয়া কয়েকটি চেয়ার। জুতো না খুলে ধুতির কোঁচাটি বাঁ হাতে ধরে নবীনকুমার গিয়ে বসলো একটি চেয়ারে। এখনো যেন সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। পূজারী ব্রাহ্মণের সন্তান, পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বিভোর কৃষ্ণকমল এরকম বাড়িতে যাতায়াত করে। অথচ নানা প্রসঙ্গে সে কৃষ্ণকমলের মুখে শুনেছে যে সে মদ্যপানের ঘোর বিরোধী।

যুবতীটির মুখ মাত্র এক ঝলক দেখেছে নবীনকুমার। এখন সে লজ্জায় সঙ্কুচিতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দূরের এক কোণে।

কৃষ্ণকমল বললো, একটু চা পান করবে নাকি, নবীন ?

নবীনকুমার সবেগে দু'দিকে মাথা আন্দোলিত করলো। বাড়ির বাইরে কোথাও সে পারতপক্ষে কোনো খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে না।

কৃষ্ণকমল বললো, আমি একটু চা পান করবো। প্রমদা, একটু চায়ের জোগাড়ে লেগে পড়ো তো !

যুবতীটি একটি দরজার পর্দা সরিয়ে চলে গেল পাশের কক্ষে।

কৃষ্ণকমল বললো, আমি ওকে চা প্রস্তুত করা শিকিয়িচি। এ বাড়ির অন্য কোনো স্ত্রীলোক চা কী দ্রব্য তাই আগে জানতো না।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে সংশোধনের ভঙ্গিতে আবার বললো, অবশ্য প্রমদাকে তুমি এ বাড়ির অন্য স্ত্রীলোকদের মতন মনে করো না। সে কোনো এক মর্যাদাসম্পন্ন ভদ্রবাড়ির মেয়ে। বালবিধবা। পরিবারের কয়েকটি অমানুষের অত্যাচারে সে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আমার এক পরিচিত লোকের সাহায্যে এখানে এসে উঠেছে। প্রমদা বিশেষ গুণবতী। আমি তাকে বিবাহ করবো ঠিক করেছি।

—বিবাহ করবে ?

—কেন, তোমারও আপত্তি আছে নাকি ?

—তোমার তো একটি পত্নী বর্তমান !

—তা থাক না। আমার একটি পত্নী আছেন বটে কিন্তু তিনি আমার সহধর্মিণী নন। তাই আমি প্রমদাকে সহধর্মিণী করতে চাই। তাতেই তোমার গুরুর ঘোর আপত্তি ! এইবার বুঝলে তো !

নবীনকুমার হাসলো।

কৃষ্ণকমল আবার বললো, তিনি বিধবা বিবাহের প্রতিষ্ঠাতা অথচ এই বিধবা রমণীটিকে আমি গ্রহণ করতে চাই শুনে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

নবীনকুমার বললো, আমার গুরু যে আপত্তি কর্বেন তা জানি। তিনি বিধবা বিবাহের নামে পুরুষের একাধিক বিবাহের ঘোর বিরোধী। কিন্তু তোমার মতন ঘোর নাস্তিক এবং পজিটিভিস্ট যে হঠাৎ বামুন পণ্ডিতদের ধারা অনুসরণ করে একাধিক বিয়ে করতে চাইবে, তাতে আশ্চর্য হচ্চি। তোমার গুরু ফরাসী কোঁৎ সাহেব বেঁচে থাকলে কী বলতেন ? তিনি একাধিক বিবাহ সমর্থন কত্তেন ?

—কোঁৎ-এর জীবনেও একজন ক্লোটিল্‌ড নাম্নী রমণী ছিলেন, তা জানো না বুঝি ?

—মাদাম ক্লোটিল্‌ড-কে দার্শনিক কোঁৎ কোনোদিন সামাজিকভাবে বিবাহ করেচিলেন, এমনও তো শুনিনি !

—শোনো, তাঁর মতে বিবাহ তিন প্রকার। প্রথম তো হলো সিভিল ম্যারেজ, যাতে বিবাহ একটা চুক্তি মাত্র, দম্পতির মনের অমিল হলে সে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হতে পারে। দ্বিতীয় হলো তোমার রিলিজিয়াস ম্যারেজ, ধর্মের নামে বিবাহ, যা চিরদিনের জন্য অবিচ্ছিন্ন। এই বিবাহের পর শুধু বিধবা নয়, বিপত্নীক পুরুষও আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারবে না। আর এক রকম বিবাহকে তিনি আখ্যা

দিয়েছেন চেইস্‌ট ম্যারেজ। এ বিবাহে স্ত্রী পুরুষের মানসিক মিল হলে তবেই তারা একত্র বাস করবে কিন্তু সহবাস করবে না। আমি প্রমদাসুন্দরীকে এই চেইস্‌ট বিবাহ করতে চাই। পারস্পরিক সাহচর্যই বড় কথা।

—তাতে বাধা কোতায় ?

—মুশকিল কি জানো, এ দেশের লোককে তো চেনো তুমি, তারা এর মর্ম বুঝবে না। মনে করবে আমি বুঝি অন্য ভড়ং করে একটি উপপত্নী রেখেছি। তাই একে একটা সামাজিক বিবাহের আবরণ দিতে চাই।

নবীনকুমার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তোমার চেইস্‌ট বিবাহ মাথায় থাক, আমিও ওতে বিশ্বাস করি না। আমিও বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে একমত। কৃষ্ণকমল, আমি আর তোমার সংসর্গে থাকতে চাই না। চল্লুম !

—আরে, আরে, দাঁড়াও, অত চটলে কেন ?

কিন্তু নবীনকুমার আর অপেক্ষা করলো না। সিঁড়ি দিয়ে জুতো মশমশিয়ে, কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে নেমে এলো নিচে। তার শরীর কির্‌কিস করছে বিরক্তিতে! চেইস্‌ট ম্যারেজ না ঘোড়ার ডিম !

পরিদর্শক নিয়ে কয়েক মাস উঠে পড়ে লেগে থাকলেও নবীনকুমার কাগজটিকে ঠিক দাঁড় করাতে পারলো না। কেচ্ছা-খেউড় পড়ায় যারা অভ্যস্ত তারা পরিচ্ছন্ন সংবাদ সম্পর্কে আগ্রহী নয়। বাঙালী শিক্ষিত সমাজ কিছুতেই বাংলা কাগজ পড়তে চায় না। ইংরেজি সংবাদপত্র বাড়িতে না রাখলে তাদের মান যায়। যাদের একাধিক পত্রিকা রাখার সামর্থ্য আছে তারাও মনে করে বাংলা সংবাদপত্র পাঠ করলে অন্য লোকেরা বুঝি তাদের কম শিক্ষিত মনে করবে।

কিন্তু নবীনকুমারের জেদ, পরিদর্শক সে চালাবেই। কাগজের চাহিদা যত কমতে লাগলো ততই সে পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়িয়ে দাম কমিয়ে দিতে লাগলো। কমতে কমতে দাম হলো এক পয়সা। এর পর বোধহয় সে বিনা পয়সায় বিলি করবে। অর্থ ব্যয় হতে লাগলো জলের মতন।

এক সময় গঙ্গানারায়ণ পর্যন্ত সচকিত হলো। বেঙ্গল ক্লাব নামে সাহেবদের বিখ্যাত একটি ক্লাব আছে। সেই ক্লাববাড়িটি এবং জমির মালিক নবীনকুমাররা। খুব মূল্যবান সম্পত্তি। নবীনকুমার সেই বেঙ্গল ক্লাবের বাড়ি-জমি বিক্রয় করে দিতে চায়।

গঙ্গানারায়ণ একদিন নবীনকুমারকে ডেকে বললো, তুই এ কি ঠিক করিচিস, ছোট্‌কু ? ওদিকে জমির দাম যে হু-হু করে বাড়চে। এসপ্লানেড ছাড়িয়ে সাহেবরা পার্ক স্ট্রিটের দিকে বিস্তর বসতি কচ্চে, ওদিকে যে দু' চারদিন বাদে জমি হবে সোনা !

নবীনকুমার বললো, উপায় কী, দাদামণি ! তোমার তবিল যে শূন্য দেকচি! আমার এখন অনেক টাকার দরকার।

গঙ্গানারায়ণ বললো, তুই যে-ভাবে টাকা ব্যয় কচ্চিস, তত টাকা আসবে কোতা থেকে ! গত পাঁচ মাসে তুই এক লক্ষ টাকার ওপরে নিয়িচিস !

—আমার আরও টাকা লাগবে। তুমি দেকলে তো দাদামণি, হরিশ যেই ম'লো, অমনি বেমালুম সব্বাই তাকে ভুলে গেল। তার কাজ তো কারুকে না কারুকে চালিয়ে যেতে হবে ? এখন টাকার জন্য চিন্তা কল্লে চলে ? তুমি বরং একবার জমিদারি দেকতে বেরোও, দ্যাকো যদি আদায় পত্তর কিচু যদি বাড়ানো যায়। দাদামণি, তুমি কি আমায় হার মানতে বলো ?

অনেকদিন পরে গঙ্গানারায়ণ গেল বিধুশেখরের সঙ্গে দেখা করতে। বিধুশেখর ইদানীং প্রায়ই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে শয্যাশায়ী থাকেন। কেউ সাক্ষাৎ করতে গেলে হুঁ-হাঁ ছাড়া কিছু বলেন না। কয়েকদিন হলো তাঁর পীড়া খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। সুহাসিনী সেই সংবাদ দিয়ে সকালবেলা লোক পাঠিয়েছিল।

কবিরাজ ছাড়া অন্য কারুকে দিয়ে চিকিৎসা করান না বিধুশেখর। গঙ্গানারায়ণ তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলো যে বহুমূত্র রোগের খুব ভালো চিকিৎসা আছে অ্যালোপ্যাথিতে, সেই একজন চিকিৎসক ডাকলে বিধুশেখরের যন্ত্রণার উপশম হবে।

বিধুশেখর উদাসীনভাবে বললেন, আর কী হবে, আমি তো এখন দিন গুণচি, আর এই শেষ সময় ম্লেচ্ছ ওষুধ গলায় দিয়ে কী হবে !

আরও কিছুক্ষণ অন্যান্য কথার পর গঙ্গানারায়ণ খানিকটা ইতস্তত করে বললো, জ্যাঠাবাবু, আপনাকে আর একটা কতাও জানানো দরকার বোধহয়। আমাদের ছোট্‌কু এক সঙ্গে অনেক বড় বড় কাজ হাতে নিয়ে নিয়েচে, এমন দু' হাতে টাকা খরচ কচ্চে যে আর বুঝি সম্পত্তি রাখা দায়। আমি তো কোনো দিকে তাল সামলাতে পাচ্চি না।

জীর্ণ শরীরখানা একটু কাত করে বিধুশেখর মুখ উঁচু করলেন। তাঁর বিবর্ণ ওষ্ঠে একটু যেন হাস্যের ছায়া দেখা গেল। চোখে জ্বলে উঠলো আগ্রহ। এতদিন পরে সিংহ বাড়ির এই উদ্ধত যুবক তাঁর কাছে এসেছে বিষয়-সম্পত্তির জন্য পরামর্শ নিতে! তিনি জানতেন, আসতেই হবে একদিন না একদিন।

সমস্ত বিবরণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন তিনি। তারপর মন্তব্য করলেন, ওর ঐ দৈনিক পত্রিকা বন্ধ করে দেবার জন্য কৌশল করো। আর, নবীনকে একবার পাঠিয়ে দিতে পারো আমার কাচে? তাকে অনেকদিন দেখিনি, একবার দেকতে সাধ হয়।

কিন্তু নবীনকুমার বিধুশেখরের কাছে যাওয়ার সময় পেল না এবং সত্বর বেঙ্গল ক্লাবের সম্পত্তি বিক্রয় করে দিল।

গঙ্গানারায়ণকে কোনো কৌশল করতে হলো না অবশ্য, তার আগেই শেষ দশা ঘনিয়ে এলো পরিদর্শক সংবাদপত্রের। শুধু অর্থব্যয় করেই তো পাঠকদের মন বদল করা যায় না। শেষ পর্যন্ত এই অবস্থা দাঁড়ালো যে ঐ পত্রিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয় দেড়শত ব্যক্তিকে আর নগদ মূল্যের ক্রেতা মাত্র চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন। বাণ্ডিল বাণ্ডিল অবিক্রিত কাগজ স্তূপাকার হয়ে থাকে। এমনকি কর্মচারীরাও আড়ালে হাসাহাসি করে মালিককে নিয়ে। যে কাগজ পাঠকরা কিনে পড়ে না, সে কাগজের জন্য মন দিয়ে লিখতেই বা ইচ্ছে করে কার? পত্রিকার মানও কমতে লাগলো দ্রুত।

কৃষ্ণকমলের সংসর্গ পরিত্যাগ করতে চেয়েছিল, তবু আর একদিন নিজে থেকেই এসে বিদ্রূপ করে গেল সে। পঁয়তাল্লিশ জন, অ্যাঁ? এদের নিয়ে তুমি দেশোদ্ধার করবে আর সমাজ বদলাবে! তোমাদের এই এক মুঠো সমাজ নিয়েই যত নাচানাচি। আসল দেশটাকে তোমরা কেউ এখনো চিনলে না!

নবীনকুমার ক্ষুব্ধ ভাবে বললো, বাঙালীরা বাংলা কাগজ পড়বে না, শুধু ইংরেজি কাগজ পড়বে? এটা কী রকম কথা?

কৃষ্ণকমল হাসতে লাগলো।

পরিদর্শক যে-দিন বন্ধ হয়ে গেল সেদিন নবীনকুমার বাড়ি ফিরলো মধ্যরাত্রে। নিজের পায়ে ভর দিয়েও ফিরতে পারলো না সে। দুলাল এবং আরও দু' একজন তাকে ধরাধরি করে নিয়ে এলো অন্দর মহলে। নেশার ঘোরে সে সংজ্ঞাহীন।

সৌভাগ্যলক্ষ্মী যেন দু' হাত উজাড় করে উপহার দিতে শুরু করেছেন মধুসূদনকে। এক সঙ্গে এতদিকের সার্থকতা খুব কম মানুষের জীবনেই আসে।

মাত্র তিন বছর সাহিত্য রচনা করেই এত সুনাম, এত যশ কে কবে পেয়েছে? পুলিস-আদালতের এই দোভাষীটির নাম এখন সকলের মুখে মুখে। সকলেরই কৌতূহল, কে এই মাইকেল মধুসূদন। এই ম্লেচ্ছের রচিত কবিতা পাঠ করে অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু রমণীদেরও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। তাঁর জনপ্রিয়তা যে কতদূর পৌঁছেচে তা একদিন নিজের চোখেই দেখলেন মধুসূদন। চীনেবাজার দিয়ে তিনি এক সকালে পদব্রজে আসছিলেন, দেখতে পেলেন এক মুদিখানার মালিক নিবিষ্টভাবে একটি বই পড়ছে। লেখক মাত্রই নিজের বইয়ের দিকে একপলক নজর দিলেই চিনতে পারে। মধুসূদন বুঝতে পারলেন, সেই বইটি মেঘনাদবধ কাব্য। লোকটির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী মধুসূদন জিজ্ঞেস করলেন, মহাশয়, কী বই পাঠ কচ্চেন, জানতে পারি কি? মুদিটি চোখ তুলে হ্যাট-কোটধারী কালোকোলো

ফিরিঙ্গিপানা লোকটিকে দেখে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, মশায়, এই বইয়ের ভাষা আপনি বুঝবেন না। এ এক অপূর্ব কাব্য! আহা কী লিকেচেন! 'বাঁচালে দাসীরে আশু আসি তার পাশে হে রতিরঞ্জন!'

এমনকি বই লিখে বেশ দু পয়সা আয় হচ্ছে মধুসূদনের। হু হু করে বিক্রি হচ্ছে তাঁর সব রচনা, এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে মেঘনাদের দ্বিতীয় সংস্করণ। তাতে দীর্ঘ, জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা লিখেছে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে উদীয়মান এক কবি। এই যুবক কবিটি যথেষ্ট পণ্ডিত। বি এ পাস।

পিতৃ সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘকাল মামলা মোকদ্দমা চলার পর এই সময় জয়ী হলেন মধুসূদন। খিদিরপুরের বাড়ি, সুন্দরবনের জমিদারি সমেত অনেক কিছুই তাঁর হস্তগত হলো। অর্থ-কষ্ট কাটলো এতদিন পর। রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র বহুকাল পর আবার যথেচ্ছ টাকা ওড়াবার স্বাধীনতা ফিরে পেলেন। লোয়ার চিৎপুরের বাড়ি ছেড়ে মধুসূদন চলে এলেন খিদিরপুরে, পৈতৃক বাড়িটির ভগ্নদশা বলে, কাছেই ভাড়া নিলেন বৃহৎ একটি উদ্যানবাটি। এর মধ্যে তাঁর দুটি সন্তান জন্মেছে। একজনের নাম রাখা হয়েছে শর্মিষ্ঠা, অন্যজনের নাম মিল্টন। সংসারে এখন সুখের অবধি নেই। কর্মের প্রবল উৎসাহে এখন তাঁর সুরাপানও পরিমিত।

এত খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও আর্থিক সচ্ছলতার সময়ে পুলিস আদালতের সামান্য চাকুরিটি চালিয়ে যাওয়ার আর কোনো মানে হয় না। মধুসূদন কিছু দিন যাবৎ মনে মনে অন্য একটি চিন্তা নিয়ে খেলা করছেন। ইতিমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর স্কন্ধে অন্য একটি দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন। হরিশের মৃত্যুর পর তাঁর হিন্দু পেট্রিয়ট আর কিছুতেই ঠিক মতন চলছে না। নবীনকুমার তাই তার গুরু বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেছিল, আপনি এটার যা-হোক কিছু ব্যবস্থা করুন। বিদ্যাসাগর মাইকেলকেই যোগ্যতম ব্যক্তি মনে করে তাঁকে ডেকে এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে এসে মুগ্ধ হয়ে গেছেন মধুসূদন, ধুতি চাদর পরা এই খর্বকায় ব্রাহ্মণকে তাঁর মনে হয়েছে বঙ্গকুলচূড়ামণি। বিদ্যাসাগরকেই তাঁর সদ্য রচিত কাব্য 'বীরাঙ্গনা' উৎসর্গ করলেন সশ্রদ্ধ চিত্তে।

খিদিরপুরের বাড়িতে একদিন মধ্যাহ্নে বসে লেখাপড়ার কাজ করছেন মধুসূদন। এমন সময় শুনতে পেলেন বাইরে পথে তুমুল বাদ্যধ্বনি ও লোকজনের কোলাহল। কৌতূহলী হয়ে তিনি এলেন জানালার ধারে। সহধর্মিণী হেনরিয়েটা এতদিনে সুন্দর বাংলা শিখে নিয়েছেন। স্বামীর কবিতা পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই তিনি পাঠ করতে পারেন। একটি বই থেকে মুখ তুলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ও কিসের শব্দ, ডিয়ার?

মধুসূদন পত্নীকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বললেন, ডারলিং, এদিকে এসো, দেকবে এসো!

পথ দিয়ে চলেছে মহরমের সাড়ম্বর বর্ণাঢ্য মিছিল। মস্ত বড় রঙীন তাজিয়া, দুলদুল অশ্ব, অল্পবয়স্ক ছেলেরা কোমরে ছোট ছোট ঘণ্টা-সমন্বিত দড়ি বেঁধে, হাতে তলোয়ার বা লাঠি নিয়ে নকল যুদ্ধের অভিনয় করতে করতে চলেছে। আর বয়স্করা বুক চাপড়ে চাপড়ে বিলাপ করছে হায় হাসান, হায় হোসান।

তিন বছরের শিশু শর্মিষ্ঠা এসে দাঁড়িয়েছে বাবা-মায়ের পাশে। বাইরে অত কোলাহল শুনে শর্মিষ্ঠা প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারপর সে তার রিনিঝিনি কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞেস করলো, ওঁরা কাঁদচে কেন?

মধুসূদন কন্যাকে বক্ষে তুলে নিয়ে মহরম উৎসবের পশ্চাৎ-কাহিনী শোনাতে লাগলেন।

হেনরিয়েটারও খুব আগ্রহ, তিনি প্রশ্ন করতে লাগলেন, এটা সেটা নিয়ে। মধুসূদন বললেন, অহো, কি মহান বিষাদ কাহিনী। জানো আরিয়েৎ, মুসলমানদের মধ্যে কেউ যদি হাসান-হোসেনের মর্মান্তিক পরিণতি নিয়ে কাব্য রচনা করে, তা হলে সে মহাকবির স্বীকৃতি পাবে। এই বিষয়বস্তু নিয়ে সে সমগ্র মুসলমান জাতির মর্মবেদনা ফুটিয়ে তুলতে পারবে। আমাদের ধর্মে এমন তীব্র শোকের বিষয়বস্তু নেই।

হেনরিয়েটা হঠাৎ মুচকি হাসলেন।

মধুসূদন ভ্রূ-কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলেন, তুমি হাসলে যে!

হেনরিয়েটা বললেন, ইউ সেইড, 'আমাদের ধর্মে'!

এবার অট্টহাসি করে উঠলেন মধুসূদন। হাসতে হাসতে বললেন, মুখের কতায় ওরকম এসে যায়! হোয়াট আই মেন্ট, হিন্দুদের ধর্মে! ব্রজাঙ্গনা লেকবার পর অনেকে আমাকে বোষ্টম বলতে শুরু করেচে! কিন্তু আমি খাঁটি ক্রিশ্চিয়ান।

একটু পরে মধুসূদন আবার বললেন, আমার বাল্যকালে আমাদের গ্রামে এরকম মহরমের উৎসব দেকিচি। সে স্মৃতি আমার মনে দেগে আচে। হাসান-হোসেনের দুঃখে আমিও কাঁদতুম। আহা, আমার ছেলে-মেয়েরা কেউ আমার জন্মস্থান দেকলে না কখনো।

হেনরিয়েটা বললেন, তোমার জন্মস্থান দেকতে আমারও সাধ হয়। আই লাভ দিজ কিউট লিটল বেঙ্গলি ভিলেজেস।

—যাবে? তা হলে চলো!

—আমরা ক্রিশ্চিয়ান। গ্রামের লোকেরা আমাদের টলারেট কর্বে কি?

—আমার জন্মস্থানে যাবো, কে বাধা দেবে! ড্যাঙ্গডেঙ্গিয়ে চলে যাবো! আমি এখন সে গ্রামের জমিদার।

যে-কথা, সেই কাজ। সপরিবারে যশোরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন মধুসূদন। সঙ্গে আরও অনেক লোক-লস্কর। অর্থের কোনো অভাব নেই। যশোরে পৌঁছে মধুসূদন ভাড়া করলেন একটি বৃহৎ বজরা। তারপর সেই বজরায় চেপে কপোতাক্ষ নদীবক্ষে চললেন সাগরদাঁড়ি গ্রামের দিকে।

সেই শৈশবের আকাশ। নদীর দু ধারে সেই চিরতরুণ তরুশ্রেণী, মধুসূদনের হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠতে লাগলো! হেনরিয়েটা একবার নিজের কামরা থেকে বাইরে এসে দেখলেন বজরার ছাদের ওপর মধুসূদন প্রস্তরমূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর দুই চক্ষু দিয়ে দরদর ধারে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। জন্মভূমির সন্নিকটে এসে মধুসূদনের মনে পড়ে গেছে নিজের জননীর কথা। কত কষ্ট পেয়েই না তিনি প্রাণত্যাগ করেছেন।

হেনরিয়েটা আর ডাকলেন না স্বামীকে।

একটু পরে শিশুপুত্র মিল্টনের জন্য দুধের প্রয়োজন হওয়ায় বজরা ভেড়ানো হলো এক স্থলে। দু'জন পরিচালক গেল কাছাকাছি গ্রামে দুধের সন্ধানে। তাদের ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে বলে অতিব্যস্ত মধুসূদন নিজেই নেমে পড়লেন পাড়ে। অদূরে কয়েকটি ঘরবাড়ি দেখে সেদিকে এগিয়েছেন, অমনি তাঁকে দেখে গ্রামের লোকেরা ছুটে পালাতে লাগলো। কয়েকটি শিশু কেঁদে উঠলো তারস্বরে। এ রকম হ্যাটকোট পরা কোনো ট্যাঁস ফিরিঙ্গি সেই গণ্ডগ্রামে এ পর্যন্ত পদার্পণ করেনি। গ্রামের লোক ভেবেছে এ কোন্ গ্রহান্তরের প্রাণী।

মধুসূদনও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি পাল্লা দিয়ে ছুটলেন ওদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত একটি লোককে ধরে ফেলে বললেন, ওরে, আমায় দেকে ভয় পাচ্চিস? আমি যে তোদেরই এখেনকার মধু। ছোটবেলায় আমিও যে তোদেরই মতন এখেনে খালি গায়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে ধুলো মেখে খেলা করিচি। আমি এখুনো তোদের ভাষায় কতা কইতে পারি, দেকবি! খাতি নাতি বেলা গেল, শুতি পাল্লাম না।

এক এক করে লোকেরা ফিরে এলো তাঁর কাছে। মধুসূদন এক একজনের গলা জড়িয়ে ধরে কুশল সংবাদ নিতে লাগলেন, পকেট থেকে মুঠো মুঠো টাকা বার করে বিলিয়ে দিতে লাগলেন শিশুদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীরা এত দুধ এনে উপহার দিল হেনরিয়েটাকে যা দিয়ে তিনি সপরিবারে সচ্ছন্দে স্নান সেরে নিতে পারেন।

গ্রামের স্বগৃহে মধুসূদনের ফেরা যেন মৃত্যুলোক থেকে প্রত্যাবর্তন। মাদ্রাজ প্রবাসকালে এক সময় মধুসূদনের মৃত্যু সংবাদ রটে গিয়েছিল। রাজনারায়ণ দত্তের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বংশনাশ হয়ে গেল ধরে নিয়ে আত্মীয়-পরিজনরা দখল করে নিয়ে নিল ঘরবাড়ি। সেই সব আত্মীয়স্বজন অবশ্য এখন বেশ সাদরেই বরণ করলো মধুসূদনকে। মধুসূদন দেখলেন, যে চণ্ডীমণ্ডপে বসে তিনি প্রথম বাংলা অ-কা-ক-খ শিখতে শুরু করেছিলেন, সে চণ্ডীমণ্ডপের এখন ভগ্নদশা। সেই বিশাল বাদামগাছটা অবশ্য এখনো টিকে রয়েছে। যার নিচে বসে তিনি প্রপিতামহের কাছ থেকে রামায়ণের কাহিনী শুনেছিলেন। সেই সব মনে পড়ে আর বারবার চক্ষে অশ্রু আসে।

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বহু মানুষ ভিড় করে এলো মধুসূদনকে দেখবার জন্য। হেনরিয়েটা সম্পর্কে কৌতূহল আরও বেশী। ঐ স্বর্ণকেশিনী স্ত্রীলোকটি নদীর জলে পা ধুয়ে যখন ওপরে উঠে আসে, তখন সকলেরই সে দৃশ্যটি যেন অলৌকিক বোধ হয়। অমন গাত্রবর্ণ মানুষের হয়? আর ঐ শিশু দুটি? ঠিক যেন দেব-শিশু!

বহুদিন পরে গ্রামে ফিরে মধুসূদন খুব আমোদে মেতে উঠলেন। খুড়ীমা জেঠীমা সম্প্রদায়ের যাঁরা এক সময় তাঁকে কোলে নিয়ে আদর করতেন, তাঁরা এখন দ্বিধায় সঙ্কোচে দূরে সরে থাকলেও

মধুসূদন নিজে গিয়ে হাজির হন তাঁদের ঘরে। কারুকে ডেকে বলেন, আমায় ভয় পাচ্ছো খুড়ীমা ? ছুঁয়ে দেবো কিন্তু। তা হলেই তোমার জাত যাবে। কী সুন্দর খিচুড়ি রাঁধতে তুমি খুড়ীমা, এখন একদিন রেঁধে খাওয়াবে না ? কারুর কাছে গিয়ে বলেন, ও জ্যাঠাইমা, এতদিন পর তোমার হাতের পায়েস খাবো বলে এলুম, আর তুমি মুখ লুকিয়ে রইলে ? কখনো বা হেনরিয়েটাকে সঙ্গে করে কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে ঢুকে বলেন, কই গো, গাঁয়ে এলুম, তোমরা বউ বরণ কল্লে না ? শাঁক বাজাও, বউয়ের সিথেয় সিঁদুর পরাও।

ছোট ছোট বালকদের ধরে ধরে কোলে পিঠে নিয়ে মধুসূদন বলেন, আয় বেটা, আমার মুখের এঁটো খাইয়ে তোর জাত মেরে দিই!

তিনি নিজেও যেন পুনরায় শিশু হয়ে গেলেন আটত্রিশ বছর বয়েসে।

কিছুদিন নিজের গ্রামে বাস করে মধুসূদন বেড়াতে গেলেন কাটিগ্রামে মামার বাড়িতে। জাহ্নবী দেবীর ভ্রাতা বংশীধর ঘোষ এখনো জীবিত রয়েছেন এবং তাঁর সংসারের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। এতকাল পরে ভাগিনেয়কে দেখে তিনি একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। মধুসূদনের প্রভূত খ্যাতির কথা পৌঁছেছে তাঁর কানে। তিনি জাতপাত তেমন মানেন না। মধুসূদনের হাত ধরে একেবারে নিজের শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়ে একটি পালঙ্ক দেখিয়ে বললেন, ছোট্টবেলায় এই খাটে তোর মা আর আমি দুই ভাই-বোনে শুতাম, তুই এইখানে বোস, মধু!

মামা-ভাগ্নেতে অনেক সুখ-দুঃখের কথা হলো।

বংশীধর ঘোষ তাঁর বাড়ির লোকেদের হুকুম দিয়ে দিলেন, তাঁর এই বিখ্যাত ভাগিনেয়কে সমস্ত আহার্য দ্রব্য পরিবেশন করা হবে স্বর্ণপাত্রে। সেই জন্য সিন্দুক খুলে সোনার থালা, ঘটি-বাটি-গেলাস বার করা হলো কিন্তু অন্তঃপুরের মহিলারা অতখানি উদার হতে পারেন না, তাঁদের ধারণা, খ্রীষ্টান মধুসূদন ছুঁয়ে দিলে সেই সব স্বর্ণপাত্র আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। তাই গৃহকর্তার অগোচরে অন্য ব্যবস্থা হলো। বংশীধর হঠাৎ এক সময় দেখে ফেললেন, এক ভৃত্য স্বর্ণ-গাড়ুর বদলে মাটির কলসী থেকে জল ঢেলে দিচ্ছে মধুসূদনের হস্ত প্রক্ষালনের জন্য। ক্রোধে উন্মাদ হয়ে ছুটে এসে তিনি এত জোরে এ লাথি মারলেন যে মূর্ছিত হয়ে গেল ভৃত্যটি। মহিলাদের উদ্দেশ করে তিনি বলতে লাগলেন, ছিঃ, এত নীচু মন তোমাদের ? না হয় একসেট সোনার বাসনই নষ্ট হতো! আমার ভাগ্নের জন্য আমি এটুকু পারি না ?

মধুসূদন মামার হাত ধরে তাঁকে থামিয়ে বললেন, মামা, করেন কী! করেন কী! মাটিতে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে কলাপাতায় চাট্টি গরম ভাত খেতেই যে আমার সব চেয়ে বেশী আনন্দ হয়! সেই আনন্দ থেকে আমায় বঞ্চিত করেন কেন ?

মূর্ছিত ভৃত্যটিকে নিজে সেবা করলেন মধুসূদন, তারপর তাকে দশটি টাকা দিলেন।

মামাবাড়ি থেকে আবার সাগরদাঁড়িতে ফেরা হলো। মধুসূদনের বেশী সময় কাটে নদীতীরে। নদীর ঘাটলায় বসে তিনি কপোতাক্ষীর দিকে চেয়ে বসে থাকেন, দেখে দেখে যেন আশ মেটে না। নৌকোয় করে যারা যায়, তাদের সঙ্গে তিনি ডেকে ডেকে কথা বলেন। তারা কেউ তাঁকে কবি হিসেবে চেনে না। কিন্তু কোনো জমিদারকে এমন সহজ আন্তরিকভাবে কথা বলতে তারা কখনো শোনে নি।

হেনরিয়েটার স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না বলে এবার এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। শেষবারের মতন বাল্যসঙ্গী নদীটিকে সম্বোধন করে বললেন, কপোতাক্ষ, যে তোমার তীরে পাতার কুটীর বেঁধে বাস করতে পায়, সেও পরম সুখী। একদিন আমি আবার ফিরে আসবো। তোমার কাছেই থাকবো। আমায় ভুলে যেও না

কলকাতায় ফিরেই মধুসূদন একদিন বন্ধুদের ডেকে বললেন, তিনি বিলাতে যাবেন কৈশোরের সেই স্বপ্ন! আলবিয়ানস ডিসট্যান্ট শোর কতবার তাঁকে ডেকেছে, এই তো সময় সেই সাধ চরিতার্থ করার।

রাজনারায়ণ বললেন, সে কি, মধু! গ্রন্থকার হিসেবে তোর কত খ্যাতি হয়েছে, লোকেরা একবাক্যে তোকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলে মেনে নিয়েছে। কেউ বলে তুই বঙ্গের মিলটন কেউ বা বলে তুই ভারতের নব কালিদাস। এখন পাঠকরা তোর কাচ থেকে আরও কত প্রত্যাশা করে। এই সময় তুই দেশ ছেড়ে চলে যাবি ?

মধুসূদন বললেন, সার্থকতা পেয়েছি বলেই তো এখন ছেড়ে যেতে পারি ! এসিচি, লিখিচি, জয় করিচি ! বঙ্গ সরস্বতীকে দিয়িচি অমিত্রাক্ষর ছন্দ, তিনি গলায় মালা করে পরেছেন । যদি ব্যর্থ হতুম, তা হলে মোটেই পালাতুম না । আরও আরও চেষ্টা করে দেশের জন্য কিছু না কিছু দিয়ে যেতুম । এখন আমি যেতে পারি বিজয়ী বীরের মতন ।

কোনো বন্ধুর পরামর্শই গ্রহণ করলেন না মধুসূদন । তিনি যাবেনই । তাঁর প্রধান যুক্তি, এ রকম বসে বসে খেলে বিপুল পিতৃ-সম্পত্তিও তিনি দু দিনে উড়িয়ে দেবেন । এ দেশে কাব্য লিখে তো আর সংসার চলে না ! সুতরাং রোজগারের জন্যই তিনি লণ্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে আসবেন ।

বিষয়সম্পত্তি সব গচ্ছিত করা হলো মহাদেব সরকার নামে এক ব্যক্তির কাছে । সে মধুসূদনের বিলাতে পড়ার খরচ পাঠাবে এবং মাসে মাসে কলকাতায় হেনরিয়েটাকে দেবে দেড় শো টাকা । মধুসূদনের সব কিছুই তড়িঘড়ি, অর্থের ব্যবস্থা হওয়া মাত্র তিনি টিকিট কিনে ফেললেন জাহাজের ।

বন্ধুদের মনের মধ্যে একটা ভয় সব সময় উঁকি মারে । কিন্তু কুসংস্কার মনে হবে, এই জন্য কেউ কারুকে মুখ ফুটে বলেন না । রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর কেউই বিলেতে গিয়ে আর ফিরতে পারেননি । তারপর অবশ্য অনেকে গিয়েছে এবং ফিরেও এসেছে, তবু, ঐ দুটি মানুষের কথাই বেশী করে মনে পড়ে । ওঁদের দু জনের পর বিখ্যাত ব্যক্তি হিসেবে মধুসূদনই তৃতীয় ।

মধুসূদন নিজেও এই কথাটা বোঝেন এবং সেই জনাই তাঁর বন্ধুদের বলেন, তোরা কিছু চিন্তা করিস নি । আমি ঠিক ফিরে আসবো। কিন্তু তোরা আমায় মনে রাকবি তো ? চক্ষের আড়াল হলেই কি এ দেশের মানুষ আমায় ভুলে যাবে ?

আগামী কাল ক্যাণ্ডিয়া জাহাজ ছাড়বে । সন্ধ্যার সময় মধুসূদন নিজ বাসভবনে বন্ধু-বান্ধব ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পান-ভোজনের জন্য ডেকেছেন । নানা রকম হাস্য পরিহাস হচ্ছে, এর মধ্যে এক সময় গঙ্গানারায়ণ মধুসূদনকে ডেকে বললেন, মধু, তুই যে আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্চিস, তোর মন কেমন কচ্চে না ? তুই এত হাসতে পাচ্চিস কী করে ?

মধুসূদন বললেন, একটা নতুন কবিতা লিকিচি, তুই শুনবি, গঙ্গা ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, শুধু আমায় কেন, সকলকেই পড়ে শোনা না ? তোর নতুন কবিতা !

সকলে নিঃশব্দে একাগ্র হলে মধুসূদন কুর্তার পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে বললেন, বায়রণের সেই লাইন মনে আচে ? মাই নেটিভ ল্যাণ্ড গুড নাইট ! সেই মর্মে আমি এটা লিকিচি, আপনারা শুনুন ।

রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে…

আবার বল্গাহীন অসংযমের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে নবীনকুমার ।

কোনো কাজে ব্যর্থতা সে মেনে নিতে পারে না, প্রচণ্ড উদ্যম সত্ত্বেও ব্যর্থ হলে বিমর্ষতার বদলে তার মনে জেগে ওঠে ক্রোধ, আর সেই ক্রোধে সে নিজেকেই আঘাত করতে চায় সবচেয়ে বেশী ! বঙ্গবাসীদের জন্য সে একটি পরিচ্ছন্ন সুরুচিসম্মত দৈনিক পত্রিকা চালাতে চেয়েছিল, সেজন্য একটুও ব্যয়কুণ্ঠ হয়নি, তবু তার দেশবাসী গ্রহণ করলো না সে পত্রিকা ! 'রসরাজ'-এর মতন আদি রসাত্মক খেউড়ে ভরা পত্রিকা চলে আর 'পরিদর্শক' চললো না !

ক্ষুব্ধ নবীনকুমার মনে মনে শপথ করলো, সে আর দেশের মানুষের উপকার করবার জন্য মস্তক ঘর্মাক্ত করবে না!

দু'জন পণ্ডিতের মৃত্যু হওয়ায় কিছুদিন মহাভারত অনুবাদের কাজ বন্ধ আছে, অন্য পণ্ডিতের অনুসন্ধান করা হচ্ছে। সুতরাং এখন নবীনকুমারকে বরাহনগরে যেতে হয় না, সারাদিন সে বিছানায় শুয়ে বই পড়ে কিংবা কড়িকাঠ নিরীক্ষণ করে, সন্ধ্যাকালে সে সেজেগুজে বাড়ির বার হয়। সঙ্গে কোনো ইয়ারবক্সি কিংবা মোসাহেবও থাকে না, এখন কোনো পরিচিতের সঙ্গও পছন্দ হয় না নবীনকুমারের। জুড়ি গাড়ির মধ্যে সে একা একা সারা শহর টহল দিয়ে বেড়ায়, কখনো কিছুক্ষণের জন্য থামে বাগবাজারের ঘাটে, ব্র্যাণ্ডির বোতল ওষ্ঠে ঠেকিয়ে গলায় ঢেলে দেয় সেই তরল গরল। অনির্দিষ্ট দুঃখ তাকে উতলা করে তোলে। নেশা যত বাড়তে থাকে দুঃখ ততই বাড়ে, একলা গাড়ির মধ্যে বসে সে কাঁদে। এক সময় জড়িত পদে গাড়ি থেকে নেমে নদীর ওপরের প্রশস্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এরকম একা-ভ্রমণ বেশী দিন চলে না। একদিন কৃষ্ণকমলের সন্ধানে রামবাগানে চলে এলো সে। কৃষ্ণকমল কথায় কথায় তাকে বিদ্রূপ শেলে বিদ্ধ করে, তবু ঐ লোকটি তাকে টানে। রামবাগানে সেই গৃহটির ত্রিতলে এসে পূর্ব পরিচিত কক্ষটির দ্বারে করাঘাত করে সে একটু অপ্রস্তুত হলো। প্রমদাসুন্দরী নামে সেই রমণীটির বদলে দ্বার খুলেছে অন্য এক রমণী। প্রমদাসুন্দরীর বসন ছিল সাদামাটা, এ স্ত্রীলোকটি গাঢ় নীল রঙের শাড়ী পরে আছে, তাতে চুমকি বসানো, দু' চোখে সুর্মা টানা।

মাপ করবেন, বলে নবীনকুমার পিছন ফিরতেই স্ত্রীলোকটি বললো, একটু দাঁড়ান।

নবীনকুমার আবার ঘুরে দাঁড়াল।

স্ত্রীলোকটি মুগ্ধভাবে নবীনকুমারের দিকে তাকিয়ে বললো, আহা, কী রূপ! এ যেন গিরিগোবর্ধনধারী গোপাল! এ যেন যমুনা পুলিনে বংশীধারী! আহা, কী টানা টানা চোখ, এমন কন্দর্পকান্তি আপনি কে গা?

নবনীকুমার বললো, আমার ভুল হয়ে গ্যাচে, আমি অন্য একজনকে খুঁজতে এয়েচিলুম।

স্ত্রীলোকটি রহস্যময় হাস্য দিয়ে বললো, আপনি যাকে খুঁজচেন, তাকে কোনোদিনই পাবেন নাকো!

—আমি খুঁজচিলুম আমার এক বন্ধুকে। তিনি এখেনে অন্য একজনার কাচে আসতেন।

—এ দুনিয়ায় কেবা বন্ধু, কেবা শত্তুর! তবু এ অধীনার কাচে এক দণ্ড দাঁড়ান, একটু প্রাণ ভরে দেকি আপনাকে! আহা কী রূপ, মানুষের এমন রূপ হয়! এমন প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ নাসিকা, নব-দূর্বাদল-শ্যাম, তুমি যে হৃদয়-রঞ্জন মানভঞ্জন!

নবীনকুমারের মুখমণ্ডল অরুণবর্ণ ধারণ করলো। এমনিতেই রমণীদের সামনে সে স্বাভাবিক হতে পারে না। সে যুগপৎ লজ্জিত ও বিস্মিত হলো। কাব্য-সাহিত্যে সে পাঠ করেছে যে পুরুষরাই নারীদের সামনে এমন রূপের স্তুতি করে। আর এখানে এই রমণীই করছে তার রূপ নিয়ে অতিরঞ্জিত প্রশংসা! তার বিস্মিত হবার কারণ এই যে, এই স্ত্রীলোকটি কথা বলছে প্রায় শুদ্ধ ভাষায়, এমন ভাষা তো কোনো বারবনিতার মুখে শোনা যায় না!

সে মুখ তুলে তাকাতেই রমণীটি যেন তার মনের কথাই পাঠ করে বললো, কী ভাবচো, আমি বাজারে-খানকি নই! ওগো, আমার ঘরে একবার পায়ের ধুলো দেবে?

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে?

স্ত্রীলোকটি উৎফুল্ল জ্যোৎস্নার মতন হাসি ছড়ালো সারা মুখে। তারপর বললো, আমায় চিনতে পাচ্ছো না, আমি যে তোমার রাইসোহাগিনী গো!

নবীনকুমার এবার ফিরে যাওয়া মনস্থ করলো। এ স্ত্রীলোকটি বেশ্যা ছাড়া কিছুই নয়, নানারকম নকশা জানে। সম্ভবত কোনো যাত্রা-পালা শুনে শুনে এই কথাগুলি মুখস্থ করেছে, এসবই ওর খদ্দের ধরার ছল।

নবীনকুমার আবার ফিরতেই হাস্যমুখী তরুণীটির মুখখানি সঙ্গে সঙ্গে আঁধার বর্ণ হয়ে গেল, সে ছলো ছলো কণ্ঠে বললো, হ্যাঁগো, আমি কি নরকের কীট যে আমার দিকে অমন ঘৃণার দৃষ্টিতে

তাকালে ? ঠিক আছে, আমি আজ রাত্তিরে মরে যাবো।

এবার নবীনকুমার স্ত্রীলোকটির কক্ষের চৌকাঠের এদিকে পা দিল। এর বিষয়ে কৌতূহল দমন না করে ফিরে যাওয়া যায় না।

পূর্বেকার আসবাবপত্র সব বদলে গেছে। ঘরের মধ্যে কৌচ নেই, তার বদলে পুরু জাজিম পাতা, তার ওপরে মখমলের আস্তরণ। দুটি সুদৃশ্য তাকিয়াও রয়েছে সেখানে। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো একটি নতুন কাচের আলমারি, তার মধ্যে সাজানো সারি সারি কাচের গ্লাস।

জাজিমের ওপরেই বসতে হলো নবীনকুমারকে। তার একটু ভয় ভয় করছে। এভাবে কোনো বারবনিতার ঘরে একলা সে আগে আসেনি। স্ত্রীলোকটির হাবভাবও যেন অদ্ভুত। পাগল নয় তো ?

স্ত্রীলোকটি নবীনকুমারের পায়ের কাছে বসে পড়ে বললো, আমার নাম সুবালা। তোমার নাম বলবার দরকার নেইকো, তুমি আমার কেষ্টঠাকুর। তুমি কী ড্রিঙ্ক কর্বে বলো তো ! তুমি রম্ খাও ? এ অভাগিনীর কাচে রম্ ছাড়া তো আর কিচু নেই !

এতক্ষণে নবীনকুমার বুঝতে পারলো, সুবালা নামের স্ত্রীলোকটি বেশ খানিকটা নেশা করে আছে। সেই জন্যই ওর ধরন-ধারণ খানিকটা পাগলিনী, খানিকটা রহস্যময়ীর মতন।

আদর-কাড়া গলায় সুবালা বললো, বুঝিচি, আমায় তোমার একটুও মনে ধরেনি, আমি কালো কুচ্ছিত শ্মশানকালী, তুমি ত্রিভঙ্গমুরারি, আমি অষ্টাবক্র···

অর্থাৎ সুবালাও নবীনকুমারের মুখ থেকে রূপস্তুতি শুনতে চায়। কারণ সে কালোও নয়, কুৎসিতও নয়, বেশ রূপসীই সে, মুখখানা ভালো কুমোরের গড়া প্রতিমার মতন, শুধু তার কপালের ঠিক মাঝখান দিয়ে তিলকের মতন একটা কাটা দাগ।

নবীনকুমার বললো, আপনার···তোমার কথা শুনলে মনে হয়, তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে। এখেনে কী করে এসোচো ?

খিল খিল করে হেসে উঠলো মেয়েটি। হাসতে হাসতে নুয়ে পড়ে কপাল ঠেকে যায় মাটিতে। সেইরকম হাসতে হাসতেই উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল পাশের ঘরে। তিন-চতুর্থাংশ পূর্ণ একটি রামের বোতল এবং দুটি কাচের গেলাস নিয়ে ফিরে এসে আবার নবীনকুমারের সামনে বসে পড়ে বললো, তোমরা পুরুষমানুষরা সবাই আমাদের কাচে এসে আমাদের হিস্টোরি-জিয়োগেরাফি জিজ্ঞেস করো কেন গো ? তাতে বুঝি তোমাদের বেশী মজা লাগে ? ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়ে মজালে বেশী আমোদ হয় ?

নবীনকুমার বললো, হিসট্রি ? জিয়োগ্রাফি ? এসব তুমি জানলে কী করে ? তুমি লেকাপড়া শিকোচো ?

—বাঃ, শিকিচি না ? বেথুনের ইস্কুলে তিন কেলাস পড়িচি ! সেই দোষেই তো আমার কপাল পুড়লো।

নবীনকুমার স্তম্ভিত হয়ে গেল। বেথুন স্কুলে পড়া মেয়েদেরও পতিতা বৃত্তি গ্রহণ করতে হয় ? ফিমেল-উদ্ধারের জন্য নব্য শিক্ষিতদের যে এত উদ্দীপনা, তার পরিণাম এই ! সে হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারলো না।

সুবালা বললো, শোনো তবে আমার গপ্পো !

দুটি গ্লাসে সে রাম ঢাললো। এই সব গৃহের কোনো পাত্রে পানাহার করতে নবীনকুমারের রুচি হয় না। কৃষ্ণকমল একদিন বিদ্রূপ করে বলেছিল, তুমি বড়মানুষের ছেলে, তুমি জুড়ি-গাড়ি না হাঁকিয়ে কোনো দিন কোথাও যাও নি, তুমি আর এ দেশকে কী চিনবে ? আমার মতন পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে পারো তো বুঝি ! তখন কৃষ্ণকমলের সঙ্গে বেশ কয়েকপদ পদব্রজেই কলকাতার অলি-গলি ঘুরেছিল নবীনকুমার। সেই পর্যন্ত সে পারে। কিন্তু বারোয়ারি থালা-গেলাসে মুখ দিতে গেলেই তার বংশ-মর্যাদা ভেতর থেকে ঠেলে ওঠে !

নিচে গাড়িতে তার ব্র্যাণ্ডির বোতল আছে। সেই জন্য নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, তোমার কোনো নোকর নেই ?

সুবালা বললো, আচে একজনা, সে এখন নেই, কেন !

তা হলে আর কী হবে ? নবীনকুমারের পক্ষে নিচে নেমে গিয়ে নিজে হাতে করে ব্র্যাণ্ডির বোতল নিয়ে আসা শোভা পায় না। এই স্ত্রীলোকটিকেও বলতে পারে না সে কথা। অগত্যা সে সুবালার দেওয়া গেলাসটি সরিয়ে রেখে সরাসরি রামের বোতল থেকেই এক চুমুক দিল। এই রকম নির্জলা

মদ্যপানে সে বেশ অভ্যস্ত, এটা শিখেছে হরিশের কাছ থেকে।

সুবালা মাটির ওপর পা ছড়িয়ে বসে উরুর ওপর দুটি হাত রেখে বললো, বেথুনে তিন কেলাস পড়ার পরই আমার বিয়ে হলো। ভালো ঘর, অনেকটা তোমার মতন সোন্দর বর। আমাদের বংশও খারাপ নয়কো, আমার বাবা সদর দেওয়ানির উকিল ছেলেন। আমার স্বোয়ামী প্রেসিডেন্সি কালেজের ছাত্তর। কপালে সইলো না। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তিনি স্বগ্যে গেলেন : আমার শাশুড়ী আমায় বললেন, লক্ষ্মীছাড়া, নেকাপড়া শিকে কপালে বৈধব্য নিয়ে এয়েছিল, আমার ছেলেটাকে খেলো ! বাবা নেই, ছোটবেলা থেকেই নেই, আমরা মামার বাড়িতে মানুষ। শাশুড়ী দিলেন গলাধাক্কা, চলে এ ম মামার বাড়িতে ফের !

—ছেলে প্রেসিডেন্সি কালেজে পড়ে, তবু সেই ছেলের মা বললে তুমি লেখাপড়া শিকোচো বলেই বিধবা হলে ?

—তাই তো বললে। আমি কি ছাই গপ্পো বানাতে পারি ?

—তখন তোমার বয়েস কত ?

—এগারো !

—তোমার মামারা তোমার আবার বিয়ে দিতে পারলেন না ?

—শোনোই না ! মামাদের পয়সার জোর নেই, তেনারা চিটি লিকলেন বিদ্যেসাগরকে।

—তিনি কিছু ব্যবস্থা করেন নি ?

—কর্বেন না কেন ? নইলে কি আর এমনি এমনি দয়ারসাগর বিদ্যেসাগর নাম ! চটি ফটফটিয়ে একদিন সটাং চলে এলেন আমাদের বাড়িতে। ওমা, কত নাম শুনিচিলুম বিদ্যেসাগরের, চেহারাখানা দেকে একেবারে ভির্মি খাবার জোগাড়। মাতা কামানো সে এক পাল্কী বেহারার হদ্দ। তবে গলার আওয়াজটি শুনলে বোজা যায় যে হ্যাঁ, বীরসিংহের ব্যাটা বটে ! তিনি এক মাসের মধ্যে ঠিক করে ফেললেন আমার বিধবা বিয়ে। এবারে বিয়ে হলো আরও বিরাট বংশে, সব্বাই এক ডাকে সে বাড়ির কত্তার নাম জানে : সে বাড়িতে আমি মাইকেল মধুসূদনকে দেকিচি।

—অ্যা ! সত্যি ?

—হ্যাঁ গো, বলচি, যে আমি মিছেকতা বানাতে জানি না। তা মাইকেল মধুসূদন তখনও পদ্য লেকেন নি। ও বাড়ির কত্তার কাচে আসতেন বীয়র খাবার জন্য। কী বীয়র খেতে পারেন গো তিনি, ছ' বোতল সাত বোতল, যত খান ততই মুখ দিয়ে গলগলিয়ে কতা বেরোয়···

—সেখেনে বিয়ে হবার পর আবার কী বিভ্রাট হলো ?

—যা হবার তাই হলো ! ঐ যে কতায় বলে না, তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে। আমার শ্বশুরের কত নাম ডাক, কত দ্যান ধ্যান, গরিব দুঃখীর জন্য মন কাঁদে, কিন্তু এ হতভাগিনীর দুঃখটাই শুধু তিনি বুঝলেন না।

—কী নাম তোমার শ্বশুরের ?

—ছিঃ, তা কখনো বলতে আচে ? আমি কপাল খুইয়িচি বলে কি ঐ সব মানী লোকের নামে দুর্নাম ছড়াতে পারি ? শোনো না, তারপর কী হলো ! আমার দ্বিতীয় বিয়ে হলো একজন পোকায় খাওয়া মানুষের সঙ্গে ! বিদ্যেসাগর মশাই তো বিয়ে দিয়েই খালাস, তিনি তো পরে আর দেকতে যান না সেই সব বিয়ে হওয়া বিধবার কী দশা হয় !

—এ কী তাঁর পক্ষে সম্ভব ?

—না, না, তাঁর নামে দোষ দিচ্চি না। তিনি মহাপুরুষ ! সব দোষ আমার নিয়তির। আমার শ্বশুরের ঐ এক ছেলে, তাঁর ছেল ক্ষয়কাশ রোগ। সবাই জানতো বেশীদিন বাঁচবে না। শ্বশুরমশাই সে খপর চেপেচুপে তাড়াহুড়ো করে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তাই জন্যই তো বিধবার জন্য অত দরদ। আমি মামার বাড়িতে ভাত-ঠ্যালা হয়ে আচি, মামারা কি আর অত খোঁজ খপর নেয়, না বিদ্যেসাগর মশাইয়ের সময় আচে ? আমার শ্বশুর ভেবেচিলেন যদি ছেলে মরার আগে কোনোক্রমে একটি বংশধর জন্মায়···। আচ্ছা কেষ্টঠাকুর, সত্যি করে বলো তো, ভগবান বলে কেউ কি সত্যিই আচে ?

—ভগবান বলে কেউ থাকলেও তিনি যে তোমার প্রতি দয়া করেননি, বোঝাই যাচ্চে !

—কেন কল্লেন না ? আমি কী দোষ করিচি ? এই মা কালীর দিব্যি তোমায় বলচি, ক্ষয়কাশ থাক আর যাই থাক, আমার সেই স্বোয়ামীকে আমি মনপ্রাণ দিয়ে সেবা করিচি, রক্ত বমি কত্তেন তিনি, আমি নিজের হাতে···মানুষটি খারাপ ছিলেন না, যখন বুকে খুব কষ্ট হতো, আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে

তাকিয়ে বলতেন, আহা সুবালা, আমার তো বাঁচার খুব ইচ্ছে···

ঝরঝর করে জল পড়তে লাগলো সুবালার দুই চক্ষু দিয়ে। নবীনকুমার রামের বোতলে আর একটি চুমুক দিয়ে বললো, থাক, আর বলতে হবে না।

সুবালা মেয়েটি সত্যিই বড় বিচিত্র। এই সে কাঁদছিল, আবার তক্ষুনি ফিক করে হাসলো। চক্ষে জল শুকোয়নি অথচ হাস্য মুখে সে বললো, জানো, যেই সে মলো অমনি সবাই আমায় আবার বললো, রাক্কুসী! এই দ্যাকো, আমি রাক্কুসী! হ্যাঁ, আমি তোমায় খেয়ে ফেলতে পারি।

—তুমি মদ খাওয়া কোতায় শিকলে? এখেনে তোমায় কে নিয়ে এলো।

—অতবড় মানী শ্বশুর আমার, তিনি পর্যন্ত বললেন, তাঁর বাড়িতে আমার আর ঠাঁই নেই। যে-মেয়ে দু-দুবার স্বামীকে খায় সে রাক্কুসী ছাড়া আর কী? সে অপয়া, তার মুখ দর্শনেও পাপ, তাই না গো?

—তোমার তো কোনো দোষ ছিল না! ক্ষয়কাশ হলে কেউ বাঁচে? ক্ষয়কাশের রুগীর সঙ্গে জেনে শুনে বিয়ে দিয়েছেল···বিদ্যেসাগর মশাই নিশ্চয়ই জানতেন না সে কতা!

—বিয়ে হয়ে যাবার পর তিনি জানলেই বা কী কত্তেন?

—জানলে তিনি তোমার শ্বশুরের সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন না কোনো দিন। সে ব্রাহ্মণের জেদ আমি জানি!

—তাতেই বা কী আমার স্বগ্য লাভ হতো! তিনি আমার শ্বশুরের ওপর রাগ করে আমার সে বিয়ে পরে ভেঙে দিতে পাত্তেন না! দ্বিতীয়বার বিধবা হবার পর তিনি আবার আমার বিয়ে দিতেন?

—তখন তোমার কত বয়েস?

—তের। পুরুষমানুষ কী বস্তু তখনো জানিনি।

—তোমার শ্বশুর তোমায় রাস্তায় বের করে দিলেন?

—অতবড় মানী লোক, একেবারে কী আর রাস্তায় ফেলবেন? তা হলে লোকে যে তাঁকেই দুষবে। পাইক দিয়ে আমায় মামাদের বাড়িতে ফেরত পাটিয়ে দিলেন। সেখেনেও একই অবস্থা। মামারা চোক মোটা মোটা করে তাকায়। ভদ্দরঘরের মেয়ে মানুষ দু' বার বিধবা, এমন কতা কেউ সাত জন্মে শুনেচে! আমি যেন এক সৃষ্টিছাড়া। আমি নিজেই ভাবতুম, আমার ওপরে শনির দৃষ্টি আচে, আমার জীবনে সুখ মানে মরীচিকা। ছিলুম মামাদের বাড়িতে দাসী বাঁদী হয়ে, মামীরা শত বকুনি দিলেও রা কাড়িনি কোনো দিন, সেজোমামীর এক ভাই কত লোভ দেকিয়েচে, ইতি উতি হাত টেনে ধরেচে, কোনোদিন তার সঙ্গে নষ্ট হইনি, এই মা মনসার দিব্যি তোমায় বলচি। একদিন রাগ করে মেরিচিলুম তাকে এক থাবড়া! সেই যে বলে না, পায়ের যুগ্যি মানুষ নয়, গায়ে হাত দিয়ে কতা কয়!

—শেষ পর্যন্ত সেই মামীর ভাই-ই তোমায় এ পথে এনেচে?

—মোট্টেই না। সতেরো বচ্ছর বয়েস পর্যন্ত কোনোদিন কারুকে ঘেঁষতে দিইনি, তখুনো পর্যন্ত ভগবানে বিশ্বাস ছেল···এখন আমার বয়েস উনিশ, কত্ত বড় হয়ে গ্যাচি, না? সত্যি গো এখন উনিশ, আমি মিছে কতা বলি না!

—তোমাকে কে বাড়ির বার কল্লো?

—তোমার এত কৌতূহল কেন গো, কেষ্টঠাকুর? হঠাৎ আজ কোতা থেকে তুমি উদয় হলে, তোমায় দেকে একেবারে চমক খেয়ে গেলুম। ঠিক যেন মন্দিরে বসানো মূর্তিটি!

—তোমাকে মদ খাওয়া কে শেখালো তা বললে না?

—কেউ শেখায়নি তো, আমি নিজে শিখিচি। এ পথে এলে সবাই শিখে যায়। তুমি জিগ্যেস কচ্চো তো কী করে এ পথে এলুম? তোমরাই এনোচো!

—তার মানে? তুমি মামার বাড়িতে থাকতে পারতে না?

—পাত্তুম! লাথি ঝাঁটা খেয়েও সেখেনে পড়ে থাকতুম। কিন্তু কপাল যাবে কোথায়? একদিন আমার মামার বাড়িতে পাল্কী নিয়ে উপস্থিত হলো অনাদিচরণ। সে আমার দ্বিতীয় পক্ষের খুড়তুতো দেওর। হি-হি-হি-হি! পুরুষমানুষেরই শুধু আগে দ্বিতীয় পক্ষ হতো, এখন মেয়েমানুষেরও দ্বিতীয় পক্ষ হয়। সেই অনাদিচরণ এসে আমার শ্বশুর মশায়ের নাম করে বল্লে, তিনি আমায় ডেকে পাটিয়েচেন!

বাড়িতে কোনো শুভ কাজ আছে, বাড়ির বৌ সেখেনে উপস্থিত না থাকলে কেমন কেমন দেকায়। মামারা তো এক কতায় রাজি। মনে মনে বললে বোধহয়, আপদ গেল! আর যেন ফিরে না আসে! থান কাপড়ে ঘোমটা টেনে আমি তো উঠে বসলুম পাল্কিতে। সে পাল্কি যখন থামলো, আমি দেকি, ওমা, এ তো হালসীবাগান নয়, এ যে অন্য জায়গা, কী রকম বিচ্ছিরি মতন বাড়ি···এই যাঃ! বলে ফেললুম যে—

নবীনকুমারও চমকে উঠলো। হালসীবাগানে বিধবাবিবাহ? সে তো নীলাম্বর মিত্রের বাড়িতে। কলকাতার পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ বিধবাবিবাহ। নবীনকুমার স্বয়ং উপস্থিত ছিল সে বিবাহে নিমন্ত্রিত হিসেবে। পাত্রকে তার মনে আছে, শিবপ্রসাদ মিত্র, হ্যাঁ, একটু শীর্ণ, দুর্বল চেহারা ছিল বটে। ঘোমটায় ঢাকা নববধূর মুখ সে ভালো করে দেখতেই পায় নি। এই সেই রমণী? নীলাম্বর মিত্র, যিনি প্রতিটি সামাজিক সংস্কারে এগিয়ে আসেন, সব ব্যাপারে মুক্তহস্তে চাঁদা দেন, বিধবাবিবাহ আন্দোলন যখন শুরু হয়, তখন তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের মস্ত বড় সমর্থক, সেই ব্যক্তিই নিজের পুত্রবধূকে এইভাবে ঠেলে দিয়েছেন? শুধু একটি বংশধর পাবার লোভে নিজের রুগ্‌ণ সন্তানের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে এরকম একটি সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী মেয়ের সর্বনাশ করলেন? এইসব লোকই দেশের মাথা, এরাই ইংরেজি শিক্ষিত, এরাই রিফর্মার!

নবীনকুমার আর শুনছে না। তবু বলেই চলেছে সুবালা।

—তারপর কী হলো জানো, সে মুখপোড়া আমায় নিয়ে তুললো হাড়কাটার একটা বাড়িতে। হাড়কাটা কোতায় জানো তো, যেখেনে হাড়ের বোতাম বানায়, সেই পাড়ায়···সে বাড়িটা বেবুশ্যেদের, আমার মুখ চেপে ধরে একটা ঘরে বন্ধ করে রাকলো···তারপর···সেই অনাদি···রাত্তিরবেলা···আমি একা মেয়েমানুষ কী করে নিজেকে বাঁচাবো···তবু সে কতা কেউ ভেবে দেকলে না, আমায় সবাই এই নরকে ফেলে দিলে···আমার মামারা কিংবা শ্বশুর ঠাকুর একবার খোঁজ নিলে না পর্যন্ত আমার, আমি যে একটা মানুষ, বাঁচলুম না মলুম কেউ তা জানতে চাইলে না গো···

আবার কাঁদতে কাঁদতে সুবালা নবীনকুমারের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন সরে গেল। তারপর বললো, ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না তুমি!

নবীনকুমারের মতন বড় মানুষের সন্তান, বিশেষত সম্পত্তির অধিকারী স্বাবলম্বী যুবকের পক্ষে বেশীদিন একা থাকা সম্ভব নয়। সান্ধ্য অভিযানে সে আর কতদিন একা একা ঘুরবে! তা ছাড়া অনেকে তাকে দেখেই চিনতে পারে। বাইশ বৎসর বয়েসেই সে এই নগরীর প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য, অনেক সভা সমিতিতে তাকে দেওয়া হয় সম্মানিত আসন।

তার খ্যাতির কারণ দু'রকম। সুধীজন ও বিদ্বজ্জনমণ্ডলী তাকে চিনেছে ধনীদের মধ্যে একজন ব্যতিক্রম হিসেবে। অতুল সম্পদের অধিকারী হয়েও সে বিলাসিতায়, অমিতাচারে গা ভাসায় নি, ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর করুণা পাবার জন্যও তেমন লালায়িত হতে দেখা যায়নি, আবার ধর্ম সংস্কারের নামেও উন্মত্ত হয়নি। প্রায় কৈশোর বয়সে বিপুল আড়ম্বরের সঙ্গে সে নিজগৃহে নাটক অভিনয়ের আয়োজন করেছিল, স্বয়ং নায়ক সেজে সুনামও পেয়েছিল যথেষ্ট, কিন্তু থিয়েটারকেই জীবনের পরাকাষ্ঠা মনে না করে সেই মোহ সে বর্জন করেছে অচিরেই। ক্রমশই বৃহত্তর কাজের প্রতি তার আগ্রহ। সমাজ হিতকারী যে-কোনো অনুষ্ঠানে সে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে আসে।

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সদ্য গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাকে চিনেছে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং ভিন্ন স্বাদের সাহিত্য রচনাকারী হিসেবে। মহাভারত অনুবাদের মতন বিরাট কর্মযজ্ঞের হোতা এই যুবকটির প্রতি তাদের সশ্রদ্ধ বিস্ময় ও কৌতূহল। খণ্ড খণ্ড বাংলা মহাভারত সে বিনামূল্যে বিতরণ করছে তো বটেই, তা ছাড়া সম্প্রতি সে সংবাদপত্রে ঘোষণা করেছে যে, ভারতবর্ষের যে-কোনো প্রান্ত থেকে

যে-কেউ এই গ্রন্থ চাইলেই পাবে, এবং সেজন্য কারুকে ডাকমাশুলও প্রেরণ করতে হবে না, সে ব্যয়ও সে নিজেই বহন করবে। যত দূরে ডাক যায়, ততই মাশুল বাড়ে, তা হোক, কন্যাকুমারী থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত যে-কোনো স্থানে সে মহাভারত পৌঁছে দিতে প্রস্তুত।

অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ তাকে চিনেছে দাতা হিসেবে। শুধু যে নীল দর্পণের মামলায় জরিমানার এক সহস্র মুদ্রা সে তৎক্ষণাৎ ঝনাৎ করে ফেলে দিয়েছিল তাই নয়, ওরকম সহস্র মুদ্রা সে যখন তখন দান করে। প্রকৃত-অভাবী, সৎ-দরিদ্র এবং জুয়াচোরদের মধ্যেও রটিত হয়ে গেছে যে জোঁড়াসাঁকোর সিংহবাড়ির ছোটবাবুর কাছে যে-কোনো ছুতোনাতায় কিছু চাইলেই রিক্ত হাতে ফিরতে হয় না। কত বিচিত্র কারণ দেখিয়ে যে লোকে তার কাছে দান চাইতে আসে তার আর ইয়ত্তা নেই। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র থেকে শুরু করে কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণরা তো তার কাছ থেকে সত্য মিথ্যা কারণ দেখিয়ে অর্থ সাহায্য নিয়ে যায় বটেই, এছাড়া পত্রপত্রিকার সম্পাদক, বিধবাবিবাহের উমেদার ও ইস্কুল খোলার উৎসাহী ব্যক্তিরাও তার কাছে নিয়মিত আসে। নবীনকুমারের আত্মগরিমা প্রবল হলেও নিছক দানের অহংকারেই দান করে না সে। সে অর্থ জিনিসটাকে যেন খোলামকুচির মতন জ্ঞান করে। তার এত অর্থ আছে, অথচ অন্য অনেকের নেই, এই চিন্তা তাকে স্বস্তি দেয় না।

এক প্রাতঃকালে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কাছ থেকে এক দূত এলো তার কাছে। কী বৃত্তান্ত? দূতটি জানালো যে ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলে সম্প্রতি দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। সেখানকার অনাহার প্রপীড়িত ব্রিটিশ প্রজাদের সাহায্যকল্পে কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ একটি ফাণ্ড গঠনে উদ্যোগ নিয়েছেন। সেই কারণেই তাঁরা বাবু নবীনকুমার সিংহের কাছ থেকে সাহায্য চান।

প্রস্তাবটি শুনে হা-হা করে অট্টহাস করে উঠলো নবীনকুমার। নব-দূর্বাদলের মতন তার কচি গুম্ফে হাত বুলিয়ে সে বললো, বটে, বটে! এদেশের মানুষের সব দুঃখ-দারিদ্র্য ঘুচে গ্যাচে, এখন আমাদের সাহায্য কত্তে হবে ইংলণ্ডের সাহেব দুঃখীদের জন্য, অ্যাঁ? তাই না?

দূতটি ঠিক বুঝতে পারলো না নবীনকুমারের বিদ্রূপ। সে বললো, আজ্ঞে, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রানী স্বর্ণময়ী, বাবু হরলাল শীল, আমাদের কর্তাবাবু, এঁয়ারা সক্কলে এর মধ্যেই এক হাজার টাকা করে দিয়েচেন।

ওষ্ঠের কোণে হাস্যটি মজুত রেখে নবীনকুমার বললো, তা হলে তো আমাকেও হাজার টাকা দিতে হয়, কী বলো? নইলে মান থাকবে না! তা আমাদের পয়সায় ল্যাঙ্কাশায়ারের সাহেবরা তা হলে কিচুদিন খাক গরু-শোর! আমরা দান কচ্চি শুনে তারা দু' হাত তুলে আশীর্বাদ কর্বে তো? নাকি ড্যাম্-সোয়াইন-নিগার বলে গালাগালি কর্বে? এশ্চো যখন, নিয়ে যাও টাকা। ওরে দুলাল—

এই নবীনকুমারের দানের ধরন!

অর্থীদের মধ্যে অনেকে নবীনকুমারের সঙ্গ ছাড়তে চায় না। বারবার নানান্ কারণ দেখিয়ে অর্থ আদায় করতে চক্ষুলজ্জায় আটকায়, তার চেয়ে বাবুর সঙ্গে নিত্যপ্রহর থাকতে পারলেই কিছু না কিছু পাওয়া যায়। বড় মানুষের হাত ঝাড়লেই দু' পাঁচ শো! তা ছাড়া, নবীনকুমারের মোসাহেবের পদ খালি আছে দেখে সেই পদ দখল করার জন্য অনেকের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। এতবড় একজন ধনীর সন্তানের মোসাহেব থাকবে না, এ কী হয়!

নবীনকুমার পোকা-মাকড়ের মতন এদের ঝেড়ে ফেলতে চায়, তবু ছিনে জোঁকের মতন দু' একজন রয়ে যায়। সকালবেলা বৈঠকখানায় অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্যে এরা ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে।

এক সন্ধ্যায় রামবাগানের সেই গৃহটিতে সুবালার ঘরে যাবে বলে নবীনকুমার সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, এমন সময় ওপর থেকে নামতে নামতে এক ব্যক্তি তাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। তারপর জিভ কেটে বললো, আরেঃ! ছোটবাবু যে? আপনি এখেনে? এখেনকার যে-মাগীকে আপনার পছন্দ, আমাদের হুকুম কর্বেন, আমরা তাকে আপনার বাগান বাড়িতে পৌঁচে দোবো! এরকম পল্লীতে আপনার মতন মানুষের একলা একলা আনাগোনা কি উচিত হয়?

নবীনকুমার এই লোকটিকে কোনদিন দেখেনি। তবু ঐ লোকটি তাকে চিনেছে দেখে সে বিস্মিত হলো। সে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে?

লোকটি বিনয়ে সারা শরীর কুঁকড়ে বললো, আজ্ঞে আমি আপনার দাসানুদাস।

নবীনকুমার ভাবলো, সারা শহরে তার এত দাসানুদাস ছড়িয়ে আছে, অথচ সে নিজেই তাদের চেনে না, এ তো বড় আশ্চর্য! এই লোকটি ধুতি ও বেনিয়ান পরা, নাকের নিচে পুরুষ্টু গুম্ফ, মাথায় তেল চকচকে চুল দু'দিকে পাট করা, ভদ্রমানুষের মতন চেহারা, এ কেন তার দাসানুদাস হতে যাবে?

দীর্ঘকায় এই লোকটির সঙ্গে অনেকটা যেন রাইমোহন ঘোষালের মিল আছে। কিন্তু রাইমোহনের চেয়ে এর বয়েস অনেক কম। রাইমোহন তো বৃদ্ধ হয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে।

লোকটি হাত জোড় করে বললো, আপনি কষ্ট করে আসবেন কেন ? কোনটিকে চাই একবার বলুন, এখুনি আপনার গাড়িতে তুলে দিচ্চি, আপনাদের সেবা করাই তো আমাদের কাজ !

লোকটিকে অগ্রাহ্য করে ওপরে উঠে এলো নবীনকুমার। তখুনি মনে মনে সংকল্প গ্রহণ করলো, এভাবে সুবালার কাছে আর আসা হবে না।

সুবালার ঘরে উপস্থিত হয়ে সিঁড়িতে-দেখা লোকটির বর্ণনা দিয়ে নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, ঐ লোকটি কে বলতে পারো ?

সুবালা বললো, ও তো এখেনকার দালাল গো। ঐ মিনসেই তো আমায় এখেনে এনে তুলেচে !

নবীনকুমার ঈষৎ ক্রুদ্ধ ভাবে প্রশ্ন করলো, ও তোমায় এখেনে এনেচে ? কী করে ?

সুবালা হাসতে হাসতে বললো, তুমি বড্ড ছেলেমানুষ, তুমি কিচুই জানো না। আমি হাড়কাটার গলিতে ছিলুম, কিন্তু আমি কি সেখেনে থাকার যুগ্যি ? নিজের মুকে বলতে নেই, তবু আমায় দেকতে পটের বিবিটির মতন নয় কো ? হি-হি-হি-হি।

আজও সুবালা নেশা করেছে এরই মধ্যে। সম্ভবত সে সারাদিন ধরেই একটু একটু নেশার দ্রব্য পান করে। সুস্থ, স্বচ্ছ চোখে সে বোধহয় এই পৃথিবীকে আর দেখতে চায় না।

সে বললো, হাড়কাটার গলিতে তো থাকে শস্তার মেয়েমানুষরা। আমার দেওর নাগরটি যখন আমায় ফেলে পিঠটান দিলে, তখন আমিও এপথে নামলুম, ঐ সস্তার কারবার, দু' টাকা এক টাকার খদ্দের সব ! এই সব দালালরা আড়কাঠি লাগায়, নিজেরাও পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে, সুন্দরপানা, ভালো গা-গতরের মেয়েমানুষ দেকলে ভালো পাড়ায় নিয়ে আসে। ঐ রামখেলাওনই তো আমায় এখেনে এনে, এইসব আসবাবপত্তর নিজের গাঁটের টাকা দিয়ে কিনে আমায় এ ঘরে বসিয়েচে। আমার রোজগারের আদ্দেক ও পায় !

নবীনকুমার অস্ফুটভাবে বললো, ওর নাম রামখিলাওন ?

—সব্বাই তো তাই বলে। ওর কতা শুনে বোজবার উপায়টি নেই যে ও হিন্দুস্থানী ! ভারি সেয়ানা লোকটা !

—ঐ রকম লোক আমায় চিনলো কী করে ?

—তোমার এমন কেষ্টঠাকুরের মতন রূপ, যে একবার দেকবে, সে-ই মনে রাকবে !

—তোমার আর এখানে থাকা হবে না !

কয়েকদিনের মধ্যেই মৌলা-আলীতে একটি বাসা ভাড়া করে সেখানে সে নিয়ে গেল সুবালাকে। এজন্য রামখেলাওন দালালকে খেসারৎ দিতে হলো সাত শো টাকা। সুবালার জন্য নবীনকুমার পৃথক বাসা ভাড়া করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বাতাসে আগুনের মতন ছড়িয়ে পড়লো সে সংবাদ। অনেকেই নিশ্চিন্ত হলো এ খবর শুনে। যাক, ছোকরা তবে এতদিন পর বাজারে মেয়েমানুষকে রক্ষিতা করেছে। এতদিন নবীনকুমারকে অনেকেই ঠিক বুঝতে পারছিল না। ছোকরা শুধু দান-ধ্যান বদান্যতা করবে, মহৎ ব্যাপার নিয়ে মগ্ন থাকবে আর মদ-মেয়েমানুষ করবে না, এ কি হয় ?

নবীনকুমার অবশ্য সুবালার অঙ্গ স্পর্শ করেনি একদিনও। দৈবাৎ সুবালার সঙ্গে দেখা হবার পর, সুবালার পূর্ব পরিচয় জেনে তার কাছে সে নিয়মিত আসা শুরু করেছিল একটা বিস্ময় বোধ নিয়ে। বয়সের তুলনায় নবীনকুমার যতই ভারিক্কী ভাব দেখাক, তার ভিতরের শিশুটি যাবে কোথায় ? সে প্রথম প্রথম বিশ্বাসই করতে পারেনি যে হালসীবাগানের বিখ্যাত মিত্র পরিবারের এক বধূ এরকম বাজারে বারবনিতা হয়েছে। হালসীবাগানের নীলাম্বর মিত্রের বংশ তো অনেকটা নবীনকুমারদের বংশের মতনই মর্যাদাসম্পন্ন। তা হলে কি তাদের পরিবারের কোনো রমণীও কি কার্যকারণের যোগাযোগে এরকম বার-নারী হয়ে যেতে পারতো ?

নবীনকুমারের ধারণা ছিল, কলকাতার পণ্যা স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই পশ্চিম দেশীয়। শুধু তার একার নয়, এরকম ধারণা অনেকেরই। নিজের সমাজের রমণীরাও যে জীবিকার জন্য এই আদিম পেশা গ্রহণ করে, তা পুরুষরা স্বীকার করতে চায় না। সেই জন্য অন্য সমাজের ওপর দায় চাপিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে এবং ভোগেও কোনো গ্লানি থাকে না। এইসব স্ত্রীলোকরাও নিজেদের কদর বাড়াবার জন্য পশ্চিমা বলে পরিচয় দেয় নিজেদের। হয়তো মুর্শিদাবাদ থেকে আগতা কোনো সাধারণ পাঁচপেঁচি ঘরের বউ, সে-ও তালতলায় ঘর ভাড়া নেবার পর বাবুদের বলে, মুই লক্নৌ থেকে এয়েচি গো, খোদ

লক্‌নৌ থেকে। লাচ জানি। দেক্‌বে ?

সুবালাকে বারবার জেরা করে নবীনকুমার নিশ্চিন্ত হয়েছে যে এই রমণীটি সত্যিই বিখ্যাত নীলাম্বর মিত্রের এককালের পুত্রবধূ। এর বিবাহে নবীনকুমার নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছিল ; সেই কারণেই সুবালার শরীর ভোগ করার প্রবৃত্তি হয়নি কোনোদিন তার। সেই বিবাহ সভার সন্ধ্যাটির কথা স্মরণ করলেই তার শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। কত গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন সেদিন, বিধবাবিবাহের মতন একটি মহৎ ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করে তাঁরা নিশ্চয়ই শ্লাঘা বোধ করেছিলেন। কিন্তু সেই মেয়েটির ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে কারুরই কোনো দায়িত্ব নেই। আর নীলাম্বর মিত্তির নিজে ? ক্ষয় রোগী পুত্রের সঙ্গে এক বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়ে সমাজের কাছ থেকে বাহবা নিলেন, আর পুত্রের মৃত্যুর পরই নির্লজ্জভাবে বিদায় করে দিলেন সেই পুত্রবধূকে ? নীলাম্বর না বাগাড়ম্বর ?

নবীনকুমারের ইচ্ছে হয় নীলাম্বর মিত্তিরকে একদিন ঘাড় ধরে টেনে আনে সুবালার কাছে। কিন্তু তা সম্ভব নয়, নীলাম্বর মিত্তিরের প্রতিষ্ঠাও যথেষ্ট। প্রতিশোধ নেবার জন্য হাত নিশপিশ করে নবীনকুমারের। তারপর তার মনে পড়ে, প্রতিশোধ নেবার একটি মোক্ষম অস্ত্র তো তার হাতেই আছে। আবার সে লিখতে শুরু করে হুতোম প্যাঁচার নক্সা। এই সব বাগাড়ম্বর মিত্তিরদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে দেবে সে, দেশবাসী এদের চিনুক।

নবীনকুমার না চাইলেও সুবালা প্রায়ই নানারকম ছলাকলা দেখিয়ে নবীনকুমারকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। নেশাটি বেশ জমে ওঠার পর তার শরীর কোন পুরুষের শরীর চায়। নবীনকুমার চেষ্টা করেও সুবালার নেশার অভ্যেস ছাড়াতে পারে নি। মর্মান্তিক সত্যটি হচ্ছে এই যে ভদ্র পরিবারের কন্যা, উচ্চ পরিবারের বধূ সুবালা, কিছু লেখাপড়াও শিখেছে, বইপত্র পাঠ করেছে যথেষ্ট, তবু মাত্র দু'তিন বছরের মধ্যেই সে একেবারে ঝানু বেশ্যা হয়ে গেছে। বাধ্য হয়েই হোক, অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, একবার এই পেশা গ্রহণ করার পর সবাই অন্যান্যদের চেয়ে যোগ্যতর পেশাধারিণী হতে চায়। এটাই নিয়ম। সুবালা জানে তার আর ফেরার পথ নেই, পতিতা রমণী হয়েই যদি থাকতে হয় সারা জীবন, তা হলে সে অযোগ্য পতিতা হবে কেন ?

নেশা তুঙ্গে উঠলে সে নবীনকুমারকে নিজের বক্ষে আহ্বান করে প্রতিদিন। প্রত্যাখ্যাতা হবার পর সে রাগে জ্বলে ওঠে, নবীনকুমারকে নিয়ে নিষ্ঠুর কৌতুক করে, তার পুরুষত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জানায়। এমনকি নবীনকুমারের গায়ে জিনিসপত্র ছুঁড়ে মারে। স্ফুরিতাধরা হয়ে সে বলে, তুমি আমায় দয়া দেকাচ্চো ? কে চায় তোমার দয়া ? ভারী এলেন আমার দয়াল ঠাকুর রে ! আমার রূপ-যৌবন আচে, আমি কারোকে পরোয়া করি না ! ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কী ? তোমার মতন অনেক বড় মানুষের ছেলে এখনো আমার পা চাটতে আসবে !

নবীনকুমার চায় সুবালাকে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও যে একজন পতিতা রমণীকে সমাজে ফিরিয়ে আনা যায় না, এ সত্য তাকে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে হলো। যদিও এ সত্যটিকে সে মানতে চায় না। তবে কি কৃষ্ণকমলই ঠিক বলেছিল ?

সবচেয়ে সহজ ছিল সুবালাকে কোনো তীর্থস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া। হিন্দুদের সব তীর্থস্থানগুলিই ঘিরে আছে বড় বড় পতিতাপল্লী। সুবালা যদি সে-রকম কোনো তীর্থে গিয়ে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকে এবং স্বেচ্ছায় ধর্মকর্ম নিয়ে জীবন কাটায়, তা হলে তার পূর্ব-জীবন নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না। কিন্তু সুবালার একেবারেই ঈশ্বরের ওপর ভক্তি নেই, তীর্থস্থানের নাম শুনলেই যেন তপ্ত কটাহে বেগুনভাজার মতন চিড়বিড় করে ! ঝাঁঝালো গলায় বলে, কেন আমি পালাবো ? কেন ? সবাই আমায় তাড়িয়ে দিয়েচে আঁস্তাকুড়ের কুকুরের মতন। কিন্তু কলকেতা শহরটা কি কারুর কেনা ? আমি আমার মাংস বেচে টাকা কর্বো, এখেনেই পায়ের ওপর পা তুলে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবো।

এই সুবালা নবীনকুমারের জীবনের একটা পর্ব। অন্য কেউ সাধারণত এইরকম সমস্যায় স্বেচ্ছায় এতখানি জড়িয়ে পড়ে না। অন্য কোনো ভদ্র সজ্জন সুবালার মতন কোনো রমণীর সন্ধান পেলে দুঃখিত হতেন ঠিকই, কিন্তু মেয়েটি যখন বেশ্যা হয়েই গেছে তখন আর কী করা যাবে, এই ভেবে এড়িয়ে যেতেন নিশ্চিত। বড়জোর, 'অহো আমাদের সমাজের সর্বাঙ্গে কত দুষ্ট ক্ষত।' এই বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন।

কিন্তু নবীনকুমার সে ধাতুর নয়। যে উদ্যম নিয়ে সে পরিদর্শক পত্রিকা চালাতে চেয়েছিল, প্রায়ই সেই উদ্যম নিয়েই সুবালাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে চায়। মৌলা-আলীর ভাড়াবাড়িটির সদরে সে দু'জন চৌবে দ্বারবান বসিয়েছে, সুবালার জন্য নিযুক্ত করেছে দু'টি বয়স্কা দাসী। তার আহার,

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো ত্রুটি রাখে নি। এর ফলে নবীনকুমারের খ্যাতির সৌরভ আরও ছড়িয়ে পড়ছে অবশ্য। লোকে বলাবলি করছে, মহাভারতের নাম করে অত টাকা খর্চা কচ্চেন উনি, আর মেয়েমানুষের জন্য দু'দশ টাকা ওড়াবেন না, এ কী হয়! হাত খুলুক, হাত খুলুক, তাতে আরও দু' দশটা মাতালের প্রতিপালন হবে।

নবীনকুমারের গৃহেও এই ব্যাপার জানাজানি হয়েছে। সরোজিনী নিভৃতে কাঁদে। গঙ্গানারায়ণ আভাসে-ইঙ্গিতে দু' একবার তার কনিষ্ঠকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু নবীনকুমার কান দেয় নি।

মহাভারতের কাজে তিন চার দিন ব্যস্ত থাকে, তারপর এক একদিন সে যায় সুবালার কাছে। গাড়ি থেকে নেমেই সে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখে, দ্বিতলের কোনো গবাক্ষের গরাদ ধরে সুবালা উৎসুক নয়নে তাকিয়ে আছে পথের দিকে। এ যেন বিলাতি কাহিনীর কোনো নায়িকা তার প্রেমিকের প্রত্যাশায় উৎসুক চক্ষে প্রতীক্ষমানা। কিন্তু এ দেশ বিলাত নয়, এ দেশে কোনো ভদ্র পরিবারের কন্যা অমন জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পথচারীদের শরীর দেখায় না। বারবনিতাদেরই এমন করা সাজে।

নবীনকুমারের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। অনেক চেষ্টা করেও সে সুবালার এই অভ্যেসটি ছাড়াতে পারছে না। পরক্ষণেই মনে পড়ে, এ তো সুবালাকে খাঁচায় বন্দী করে রাখা, এমন ভাবেই বা কতদিন চলবে? এরই মধ্যে এক মধ্যরাত্রে কয়েকজন মাতাল হল্লা করে এ বাড়ির মধ্যে জোর করে ঢুকতে চেয়েছিল, দ্বারবানদের সঙ্গে তাদের লাঠালাঠি হয়েছে।

নবীনকুমারকে দেখতে পেয়েই দ্বিতল থেকে লজ্জাহীনার মতন সুবালা তাকে ডেকে ওঠে। এও ঠিক খাঁচার পাখির ডাকের মতন।

একজন কারুর সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। কিন্তু সে-রকম কে আছে? হরিশ চলে গিয়ে নবীনকুমার একেবারে বন্ধুহীন হয়ে পড়েছে। অনেক ভেবে সে আবার কৃষ্ণকমলকেই খুঁজে বার করলো।

সব শুনে কৃষ্ণকমল কাষ্ঠ হাসি দিয়ে বললো, মেয়েটি দেখতে কেমন? রূপসীই বললে তো? তা বেশ্যা যখন হয়েই গিয়েছে, তখন আর তাকে টানাটানি করে কী লাভ? রসিক পঞ্চজন এরকম একটি রূপসী বেশ্যা থেকে বঞ্চিত হবে কেন?

কৃষ্ণকমলের মুখে এরকম সাধারণ ব্যক্তিদের মতন উত্তর শুনে নবীনকুমার ভুরু কুঞ্চিত করে তাকিয়ে রইলো।

কৃষ্ণকমল আবার বললো, এ সমাজে বেশ্যারও প্রয়োজন রয়েছে। তুমি যদি ভোগ করতে না চাও, আটকে রাখবে কেন, রসিকদের জন্য ছেড়ে দাও! মাঝে মাঝে ভদ্রঘর থেকে সাপ্লাই না এলে সুন্দরী রূপসী বারবনিতার ডিমাণ্ড মেটানো যাবে কী করে? চেষ্টা করেও ওকে তুমি বেশীদিন ধরে রাখতে পারবে না।

নবীনকুমার এবার বাঁকা সুরে বললো, তোমার প্রয়োজন আচে নাকি? তুমি তা হলে ওকে একবার দেকে আসতে পারো—

কৃষ্ণকমল বললো, না, ভাই, আমার প্রয়োজন আমি অন্যভাবে মিটিয়ে নিয়েছি। শোনো, নবীন, এ সমাজে যুবতী নারীর পতি বিনে গতি নেই। বিধবা হলে এ বাড়ি ও বাড়ির লাথি-ঝ্যাঁটা খাবে, নয়তো বাজারে গিয়ে নাম লেখাবে। এই তো নিয়তি। তোমার গুরু বিদ্যাসাগর যতই চেষ্টা করুন কিছুতেই কিছু হবে না। দু' দশটা বিধবার বিবাহ দিলেই কি তিনি মানুষের মন পাল্টাতে পারবেন? যে জাতি যত বেশীদিন পরাধীন, সে জাতি নৈতিক ভাবে তত বেশী রুগ্‌ণ।

নবীনকুমার বললো, তা হলে তুমি বলচো, বিবাহ দেওয়া ছাড়া এ মেয়েটির আর কোনো উপায় নেই।

কৃষ্ণকমল বললো, বেশ্যার বিবাহ দেবে, তুমি তো কম নও হে! এ মেয়েটির বিবাহ হবে তার মানে তৃতীয়বার, এমন কথা তোমার গুরুও স্বপ্নে স্থান দেননি! শোনো, তুমি টাকার জোর খাটিয়ে কোনো লোকের সঙ্গে জোর করে ওর বিবাহ দিয়ে দিতে পারো, কিন্তু তা কতক্ষণ টিকবে? তুমি নিজে বিবাহ করবে না নিশ্চিত, কারণ তুমি ডবল্ বিবাহের ঘোর বিরোধী!

নবীনকুমার নিরাশ হয়ে উঠে দাঁড়াতেই কৃষ্ণকমল মুচকি হেসে বললো, একটা কথার উত্তর দাও তো? ভদ্রঘরের একজন বধূ ভাগ্য বিড়ম্বনায় বেশ্যা হয়েচে, সেইজন্যই তুমি এত উতলা হয়েচো, তাই না? আর ছোটলোকের ঘরের কত মা-বউ যে পেটের দায়ে ঘরের বার হয়ে এসে বেশ্যাবৃত্তি করে,

তাদের জন্য নিশ্চয়ই তোমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। পথে-ঘাটে যারা হাজারে হাজারে ঘুরে বেড়ায়, তাদের দেখোনি কখনো? এই তো তোমাদের দেশোদ্ধার!

কৃষ্ণকমলের কথাই ঠিক হলো। কিছুদিনের মধ্যেই এক সন্ধ্যায় নবীনকুমার মৌলা-আলীতে গিয়ে শুনলো যে পাখি উড়ে গেছে। সুবালা নিজেই পলায়ন করেছে, না অপর কোনো পুরুষ তাকে হরণ করে নিয়ে গেছে, তা অবশ্য বোঝা গেল না। দ্বারবানদ্বয়কে তর্জন গর্জন করায় তারা স্বীকার করলে বটে যে কয়েকদিন ধরে এক সুদর্শন বাবু এ বাড়ির সামনে দিয়ে অনেকবার যাতায়াত করেছে।

নবীনকুমার বিশেষ আশ্চর্য হলো না। গত এক মাস ধরে সুবালা তার জীবন বিষময় করে তুলেছিল, দেখা হলেই তাকে নপুংসক বলে গালিগালাজ করতো। পুরুষের সাহচর্যহীন তথাকথিত সুস্থজীবনে সুবালা ফিরে যেতে চায় না। সুবালার অনুসন্ধান করে আর কোনো লাভ নেই বলে নবীনকুমার মৌলা-আলীর বাড়িটির পাট তুলে দিল শীঘ্রই।

সুবালা-পর্বটি নবীনকুমারের জীবনে সংক্ষিপ্ত হলেও বেশ একটি বড় দাগ রেখে গেল।

সারাদিন পরিশ্রম, তার উপরে রাত্রি জাগরণ ও মাত্রাহীন সুরাপানের ফলে এক সময় নবীনকুমার গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী হলো। সপ্তাহকালের মধ্যেই জীবনসংকট দেখা দিল তার, বড় বড় চিকিৎসকরা হতাশ হলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশিষ্ট বন্ধু, প্রখ্যাত চিকিৎসক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও নবীনকুমারকে দেখতে এসে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন, তিনি হরিশ মুখুজ্যের চিকিৎসা করেছিলেন, নবীনকুমারের রোগে যেন হরিশেরই লক্ষণ দেখতে পেলেন। কিন্তু হরিশের তবু সাঁইত্রিশ বৎসর বয়স হয়েছিল, নবীনকুমারের যে সবে মাত্র তেইশ!

সাহেব ডাক্তাররা এসে নিয়মমাফিক ঔষধ দিয়ে গেছেন, দুজন কবিরাজকে এনেও দেখানো হয়েছে। ছোট ভাইয়ের চিকিৎসার জন্য গঙ্গানারায়ণ পরামর্শ নিয়েছে শহরের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের কাছে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের খরচে যে-দুজন বঙ্গসন্তান প্রথম বিলাতে ডাক্তারি পড়তে যায়, তাদের মধ্যে একজন সূর্যকুমার চক্রবর্তী। খ্রিস্টিয়ান হয়ে ফিরে এসে সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী নাম নিয়েছেন। বর্তমানে দেশীয় চিকিৎসকদের মধ্যে তাঁরই সবচেয়ে বেশী নাম ডাক। এই সূর্যকুমারের সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিল, সুতরাং সূর্যকুমারের মতামতের ওপরেই বেশী নির্ভর করতে লাগলো সে।

সূর্যকুমার একদিন গঙ্গানারায়ণকে নিভৃতে বললেন, মিঃ সিংহ, আমি আপনাকে একটি প্লেইন ট্রুথ বলতে চাই। যে-কোনো রোগেই, যত ভালো মেডিসিনই থাক, সর্বোত্তম ঔষধ হলো উইল টু লিভ, উইল টু সারভাইভ...এই উইল পাওয়ারের মতন ঔষধ আর নেই। আপনার কনিষ্ঠের মধ্যে সেইটিই আমি ল্যাকিং দেকচি। হোয়াই...দিস ইয়াং ম্যান ইজ সো মোরোজ! একটি কথা পর্যন্ত বলে না...

গঙ্গানারায়ণ বললো, শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়েচে।

সূর্যকুমার বললেন, এমন উইক নয় যে বাকশক্তি নেই, এমন ফীবল নয় যে কতা শুনতে পাবে না! অথচ সে আমাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয় না, আমাদের কতা শুনতে পাচ্ছে কি না, তাও বোঝা যায় না...

—ডক্টর চক্রবর্তী এর প্রতিকার তো আপনাকেই কত্তে হবে।

—দিস ইয়ং ফেলো ইজ অ্যানাদার ভিকটিম অব ইনটেমপারেন্স, তা তো বোঝাই যাচ্চে! সাচ ইজ দি স্যাড স্টেট অফ অ্যাফেয়ার ইন আওয়ার কান্ট্রি যে ভালো ভালো ইয়ংম্যানেরা বিলাতি প্রথার মোহে...সে যাক, কিন্তু বয়েস বেশী হয়নি, লীবারটি এমন কিছু ড্যামেজড্ হয়নি যে সারিয়ে তোলা যাবে না। কিন্তু এই নৈরাশ্য কেন? অর্থ-সম্পদ, সুখ-ভোগ কোনো কিচুরই অভাব নেই কো!

—কিন্তু ও তো এমন কিচু বেশী ড্রিঙ্ক করে না। কত হুমদো হুমদো মাতাল দিবারাত্র বোতল সেবা

করে, তারপরও তারা অনেক বয়স পর্যন্ত দিব্য চলে ফিরে বেড়ায় আর ছোটকু তো মাত্র কয়েক মাস···

—সেই কতাই তো বলচি ! এক্ষেত্রে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট হচ্চে উইল পাওয়ার···একটি রোগ আচে, তার নাম মেলানকোলিয়া, প্রাচীন গ্রীস দেশের উচ্চবংশীয় ব্যক্তিদের এই রোগ হতো, অতিরিক্ত সুখভোগ ও স্বেচ্ছাচার থেকে এই জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা রোগ জন্মায়—

—ডক্টর চক্রবর্তী, আমার ভাইটি যে নিছক ভোগী ও স্বেচ্ছাচারী নয়, তা নিশ্চয় আপনি জানেন ? কত বড় মহৎ অন্তঃকরণ তার, দেশের লোক তার নামে ধন্য ধন্য করে, সে প্রতিভাবান।

—তবু এ রোগের লক্ষণ দেখে মেলানকোলিয়াই বোধ হয় আমার। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে এ ব্যাধির কোনো দাওয়াই নেই। এ বিষয়ে আপনি আমাদের রেসপেকটেড সীনিয়র কলিগ দুর্গামোহনবাবুর সঙ্গে কনসালট্ করতে পারেন।

—তিনিও তো দেকচেন।

—তিনি আপনাদের ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড, তিনি যদি পারেন আপনার ভাইকে কতা বলাতে, তবেই উন্নতি সম্ভব। আমার কোনো প্রশ্নের তো সে জবাবই দেয় না !

একথা ঠিকই, অসুস্থ হবার পর থেকে নবীনকুমার কারুর সঙ্গে বিশেষ কথা কয় না। সরোজিনী বা গঙ্গানারায়ণের শত প্রশ্নের সে শুধু হুঁ-হাঁ উত্তর দেয়। কয়েক বৎসর পূর্বে নবীনকুমার কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হয়ে শ্রবণ ক্ষমতা একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিল। এবার তার তেমন কিছু হয়নি, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণ সজাগই আছে, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, সে তার জিহ্বার ব্যবহার করতে নারাজ। এবারে তার রোগের প্রধান উপসর্গ বমি। কিচ্ছু তার পেটে সহ্য হয় না, যে-কোনো খাদ্য, এমনকি ঔষধ পর্যন্ত গলাধঃকরণ করলেই সে উগরে দেয়। কোনো চিকিৎসকই এই বমি বন্ধ করতে পারছেন না। শরীর একেবারে কঙ্কালসার হয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে আছে, শুধু তার চক্ষুদুটি অত্যুজ্জ্বল। মুখখানিতে বিমর্ষতার কালিমা লিপ্ত। যতক্ষণ জাগ্রত অবস্থায় থাকে, সে শুধু ঘরের কড়িকাঠ দেখে।

কোনো প্রবল দুঃখ বা অভিমানে যে নবীনকুমার জীবন ত্যাগের সঙ্কল্প নিয়েছে, তাও নয়। কোনো অভিযোগ নেই তার, কোনো দাবি নেই। এমনিই তার আর কিছু ভালো লাগে না। তার মতন চঞ্চল ও জেদী স্বভাবের যুবকের এই আকস্মিক পরিবর্তনই সকলের কাছে অস্বাভাবিক লাগে। কথা বলে না কেন সে ?

সরোজিনী মনের দিক থেকে আজও প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি। যে-কোনো বিপদেই সে শুধু পাশবদ্ধ পক্ষিণীর মতন ছটফট করতে জানে। তার এমন রূপবান, গুণবান স্বামী, অথচ গত দু-এক বৎসর ধরেই সে সরোজিনীর প্রতি কেমন যেন নিরাসক্ত হয়ে পড়েছে। কী করে স্বামীকে ফেরাতে হয়, সে বুদ্ধি তার নেই। নবীনকুমারের নিদারুণ অসুখের সংবাদ শুনে তার পিত্রালয়ের লোকেরা ছুটে এসেছে। কিন্তু তারা আসায় হই-চই হাঙ্গামাই বেড়েছে এ বাড়িতে, গঙ্গানারায়ণ চিকিৎসার ব্যাপারে তো কোনো কিছু বাদ রাখেনি !

গঙ্গানারায়ণ বারবার কাতরভাবে জিজ্ঞেস করে, তোর কী হয়েচে, ছোটকু, আমায় খুলে বল। ডাক্তাররা তো বলেচেন, তুই সেরে উঠবি ! বমি বন্ধ হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবু তুই এত মন-মরা হয়ে থাকিস কেন ? কী হয়েচে তোর মনে ?

নবীনকুমার সংক্ষিপ্তভাবে বলে, কিচু না !

—তোর কিচু খেতে ইচ্ছে করে ? কারুকে দেকতে ইচ্ছে করে ? ওস্তাদ ডাকবো, তুই গান শুনবি ?

—নাঃ !

—হাওয়া ফেরাবার জন্য তুই কোতাও যেতে চাস ?

—নাঃ !

—সবি না না করিস কেন ? তুই কী চাস বল ! লক্ষ্মী ভাইটি আমার, তোর মনের মধ্যে কী আচে আমায় বল !

—কিচু না !

এইভাবে কী করে আর কথা চালানো যায়। তবু গঙ্গানারায়ণ হার মানে না। নিজের স্ত্রী কুসুমকুমারীকেও সে বলেছে নবীনকুমারের সেবা করতে। সরোজিনীর সঙ্গে কুসুমকুমারী এই কক্ষে প্রায়ই এসে বসে থাকে। তার সঙ্গেও কথা বলে না নবীনকুমার। এর আগে কুসুমকুমারীর বিবাহের পর এ বাড়িতে যে-কয়েকবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, নবীনকুমার তাকে সম্ভ্রমের সঙ্গে বৌঠান ও আপনি

বলে সম্বোধন করেছে। কুসুমকুমারী যে এক সময় তার প্রথমা পত্নীর মিতেনী ছিল, সে সম্পর্ক সে অস্বীকার করেছে।

কুসুমকুমারী কৌতুক করতে চেয়েছে তার সঙ্গে, দেবরের সঙ্গে সে তো কৌতুক করতেই পারে কিন্তু নবীনকুমার আমল দেয়নি। হরিশের মৃত্যুর পর থেকেই সে পারিবারিক জীবন সম্পর্কে উদাসীন।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিদিনই একবার করে আসেন। অন্যান্য রোগী দেখার পাট চুকিয়ে এখানে আসতে তাঁর একটু রাত হয়। নবীনকুমারের শয্যার শিয়রের পাশে তিনি চিন্তিত ও বিষণ্ণ মুখে বসে থাকেন। এমন রোগ তাঁর আগে চোখে পড়েনি। সামান্য বমি থামানো যাচ্ছে না। এ ভেদ বমিও নয়, তাহলে তিনদিনের বেশী কাটতো না। কোনো আহার্যই পেটে না গেলে এ রোগী বাঁচবে কী করে?

দুর্গাচরণের মনে পড়ে, এই নবীনকুমারেরই হাতে-খড়ির সময় তিনি আচার্য হয়ে এসেছিলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। তখন এ পঞ্চমবর্ষীয় বালক। সেই বয়সেই কী চমকপ্রদ ছিল এর ব্যবহার, একদিনেই ইংরেজী-বাংলা বর্ণমালার একটি করে অক্ষর লিখে দেখিয়েছিল। তারপর থেকে তিনি এই বালকটির উত্থান লক্ষ করছেন। এর সব কিছুই এর বয়েসের তুলনায় অতি অগ্রসর। ত্রয়োদশ বৎসরে এ স্থাপন করেছে বিদ্যোৎসাহিনী সভা, চতুর্দশ বৎসরে স্বগৃহে মঞ্চ বেঁধে এমন নাটকের অভিনয় করলো, যাতে সাহেবরা পর্যন্ত তাজ্জব। সে নিজেই ছিল পরিচালক ও নায়ক। পঞ্চদশ বৎসরে সে তারও ওপরে হলো স্বয়ং নাট্যকার। অষ্টাদশ বৎসরে সে হাত দিল মহাভারত অনুবাদের মতন সুবিশাল কাজে। সেই যুবকের এই পরিণতি! তেইশ বৎসর বয়সে সে অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে যকৃৎ আহত করে শয্যাশায়ী। চক্ষু দুটি ব্যতীত সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ মুখ, যেন হতাশার প্রতিচ্ছবি! অতিরিক্ত প্রতিভাবানদের কি এমনই হয়? তাদের মেধা ধারণ করার মতন ক্ষমতা শরীরের থাকে না!

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও নবীনকুমারের এই রূপান্তরের কথা শুনে খুব দুঃখ পেয়েছেন। দুর্গাচরণের কাছ থেকে তিনি নিয়মিত সংবাদ নেন নবীনকুমারের। তিনি দুর্গাচরণকে সখেদে বলেছেন, বুনিয়াদি বংশগুলির মধ্যেই বুঝি এই অভিশাপ আছে, বাপ-পিতামহর ধারা ছাড়তে পারে না কিছুতেই। তবে যাই বলো, ঐ ছেলেটির ওপর আমি ঠিক রাগ করতে পারি না।

দুর্গাচরণ মাথা ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা নবীন, শুনলুম তো আজ সারাদিনে তুমি এককণা খাদ্যও গ্রহণ করো নি। এখন একটু ঘোলের সরবত খাবে?

নবীনকুমার বললো, না।

দুর্গাচরণ বললেন, একেবারে কিছু না খেলে কী করে চলে? বমির ভয় পাচ্ছো তো? এক বাটি ঘোল খেয়েই দ্যাখো না।

—নাঃ!

—একেবারেই ইচ্ছে নেই!

—নাঃ!

দুর্গাচরণ চমকে উঠলেন। নবীনকুমারের মুখে কিসের গন্ধ? এ তো ব্র্যাণ্ডি ছাড়া কিছু নয়!

—নবীন, তুমি আবার মদ্যপান শুরু করেছো?

নবীনকুমার চুপ!

দুর্গাচরণ নিচু হয়ে দেখলেন, পালঙ্কের তলায় ফরাসী কনিয়াকের একটি বোতল রক্ষিত আছে। কী সর্বনাশের কথা! যে রোগীর উদরে একদানা অন্ন নেই, সে করছে মদ্যপান! এ যে বিষ! ঘরে কোনো গেলাস বা জলের পাত্রও নেই, অর্থাৎ কোনো সময়ে নিরালা পেয়ে নবীনকুমার ঐ বোতল থেকে নির্জলা চুমুক দিয়েছে।

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল গঙ্গানারায়ণ, তার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, এ সব কী? এ যে ছেলেটাকে একেবারে মেরে ফেলার পাকা ব্যবস্থা! কে ওকে ঐ ব্র্যাণ্ডির বোতল এনে দিয়েছে?

গঙ্গানারায়ণ তখনই লোকজন ডাকাডাকি ও হইচই শুরু করে দিল। এবং আসামী খুঁজে পেতে মোটেই বিলম্ব হলো না। কে আর নবীনকুমারকে ব্র্যাণ্ডি এনে দেবে, অতি প্রভুভক্ত দুলালচন্দ্র ছাড়া? দুলালচন্দ্র তো এ কক্ষের দ্বারের পাশে প্রায় সর্বক্ষণই দণ্ডায়মান থাকে।

একটু জেরা করতেই দুলালচন্দ্র স্বীকার করে ফেললো, সে কী করবে, সে তো জীবনে কখনো নবীনকুমারের কোনো হুকুম অমান্য করে নি! প্রভু চাইলেও সে দেবে না, তার ঘাড়ে ক'টা মাথা!

অত্যন্ত উত্যক্তের মতন হয়ে দুর্গাচরণ বললেন, আর আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। মানুষটাকে যদি বাঁচাতে চাও, তো জোর করে কিছু খাওয়াতে হবে। নিয়ে এসো এক বাটি ঘোল।

নবীনকুমারের সামনে এসে তিনি চিকিৎসক নয়, পারিবারিক অভিভাবকের মতন কঠোর স্বরে বললেন, ওসব মতলোব তোমার খাটবে না আর ! এবার জোর করে···ঐ গঙ্গা একদিক ধরবে, আমি একদিক ধরে জোরের সঙ্গে ঠোঁট ফাঁক করে গেলাবো; এত সহজে তুমি আমাদেরকে ফক্কি দিয়ে চলে যেতে চাও ?

নবীনকুমার কোনো প্রতিবাদ করলো না, একটি কথাও বললো না, মুখ হাঁ করলো। সরোজিনী ঝিনুকে করে ঘোলের সরবত ঢেলে দিতে লাগলো তার মুখে। পুরো এক পাথরের বাটি ভর্তি ঘোলই পেটে গেল নবীনকুমারের। এবং শেষ হওয়া মাত্র সে উঠে বসে ওয়াক তুললো। সবটাই বেরিয়ে গেল আবার।

সকলে কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক। স্বেচ্ছায় মানুষ এভাবে বমি করতে পারে না। সত্যিই কোনো খাদ্য-পানীয় নবীনকুমারের পেটে সইছে না।

দুর্গাচরণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আগে থেকেই খালি পেটে ব্র্যাণ্ডি গিলেছে, এর পর আর ঘোল সইবে কেন ? তবু হাল ছাড়া চলবে না। কাল সকাল থেকে এরকমভাবে আবার খাওয়াবে। না খেতে চায় জোর করবে !

এর পর সরোজিনী এবং গঙ্গানারায়ণ যুগপৎ অনেকক্ষণ ধরে হা-হুতাশ ও কাকুতি-মিনতি করলো নবীনকুমারের সামনে। নবীনকুমার নীরব, নিঃস্পন্দ হয়ে রইলো।

গঙ্গানারায়ণ দুলালচন্দ্রকে শাসিয়ে দিল, ফের যদি সে নবীনকুমারের কাছে মদের বোতল নিয়ে যায়, তা হলে তৎক্ষণাৎ তার চাকরি তো খতম হবেই, তাকে মারতে মারতে দেশ-ছাড়া করে দেওয়া হবে।

পরের দিনটিও কাটলো প্রায় একইভাবে। সারা দিনে তিন চার বার খাদ্য খাওয়ানো হলো নবীনকুমারকে। প্রত্যেকবারই সে বমি করলো। সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী একটি রবারের নল দিয়ে তার পেটের একেবারে মধ্যে তরল খাদ্য পৌঁছে দেবার চেষ্টা করলেন, তাতেও বিশেষ সুফল হলো না।

সূর্যকুমার জিজ্ঞেস করলো, নবীনবাবু, শুধু একটি কতার উত্তর দিন আমাকে। যাস্ট ওয়ান আন্‌সার। আপনার বাঁচতে ইচ্ছে করে না ?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ঈষৎ ভ্রুকুঞ্চিত করে চিন্তান্বিত হলো নবীনকুমার। তারপর ম্লান খসখসে গলায় বললো, হ্যাঁ, করে !

সেদিন রাত্রি দশটার পর কিছুক্ষণের জন্য নবীনকুমারের কক্ষ ফাঁকা। এক সময় পা টিপে টিপে প্রবেশ করলো দুলালচন্দ্র। চোরের মতন এদিক ওদিক চেয়ে ঝট্‌ করে চাদরের আড়াল থেকে বার করলো একটি ব্র্যাণ্ডির বোতল। ফিসফিসিয়ে বললো, ছোটবাবু এনিচি !

সঙ্গে সঙ্গে একটি নাটকীয় কাণ্ড হলো। সেই কক্ষটি যেন একটি মঞ্চ। দু'দিকের দুই দ্বার যেন উইংস। সেই দুই দ্বার দিয়ে ঝটিতি এসে ঢুকলো দুই নারী, সরোজিনী ও কুসুমকুমারী। তারা এসে দাঁড়ালো দুলালের দু'পাশে।

কুসুমকুমারী বললো, ওটা দে আমাকে।

দুলাল প্রভুর দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করতে কুসুমকুমারী দাপটের সঙ্গে এক ধমক দিয়ে বললো, দে বলচি ! তোর এত সাহস ! আজ তোর এ বাড়ি থেকে পাট উঠলো, যা বিদেয় হয়ে যা !

সরোজিনী বললো, আপদ, তুই এক্ষুনি দূর হ !

দুলালচন্দ্র বোতলটি মেঝেতে নামিয়ে রেখে দৌড়ে প্রস্থান করলো।

কুসুমকুমারী বললো, আমরা দুই বোনে এখেনে উপোসী হয়ে বসচি। সারা রাত থাকবো, আপনি না খেলে আমরাও খাবো না। আয় সরোজ—

সত্যিই এই বাড়ির দুই বধূ পালঙ্কের কাছে মেঝেতে বসলো পাশাপাশি। এই নাট্যে অবশ্য নবীনকুমার এখনো একটিও সংলাপ উচ্চারণ করলো না।

ব্র্যাণ্ডির বোতলটি এখনো মেঝের ওপর দাঁড় করানো। কুসুমকুমারী সেদিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে। তার চক্ষে জল এসে যাচ্ছে। তার পিত্রালয়ে এ দ্রব্যটির কোনো প্রভাব সে দেখেনি। কিন্তু অনেকদিন আগে, যেন তার পূর্বজন্মে, অর্থাৎ তার প্রথম বিবাহের সময় সে দেখেছে ঐ বোতলের জন্য দুর্গামণির জীবনটা কেমন নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক দিন পর দুর্গামণির কথা মনে পড়ে মুচড়ে উঠছে তার বক্ষ। সরোজিনীর জীবনও সে কিছুতেই বিনষ্ট করতে দেবে না।

একটু পরে সে বললো, কোনো দাসীকে ডাক্, ওটা নিয়ে গিয়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে আসুক !

এবার নবীনকুমার বললো, ওটা আমায় দাও, সরোজ !

সরোজিনী সভয়ে তাকালো কুসুমকুমারীর দিকে।

নবীনকুমার পাশ ফিরে তার দৃষ্টির চুম্বকে সরোজিনীকে আকৃষ্ট করতে চেয়ে এবং একটি হাত বাড়িয়ে হুকুমের সুরে বললো, দাও !

সরোজিনী বললো, ও দিদি⋯।

কুসুমকুমারী উঠে দাঁড়ালো। পালঙ্কের কাছে এসে তার নীল চক্ষুমণি দুটি স্থিরভাবে নবীনকুমারের দিকে রেখে কোমল অনুনয়ের স্বরে বললো, ছিঃ, অমন করে না ! কেন এই সর্বনাশ কচ্চেন আপনি—

নবীনকুমার খুব থেমে থেমে বললো, অনেক রাত হয়েচে, নিজের ঘরে যান, বৌঠান—।

—না, আমি যাবো না। আমি সরোর সঙ্গে এখেনে থাকবো। সরো ছেলেমানুষ, আপনাকে ভয় পায়, আমি তো পাই না⋯আপনি কিছু না খেলে আমরাও না খেয়ে থাকবো, দেকি আপনি কতদিন পারেন !

গা থেকে চাদরটি সরিয়ে নবীনকুমার আস্তে আস্তে উঠে বসলো। দেখলে ভয় হয়, যেন একটা জীবন্ত কঙ্কাল। তার গায়ের নিমাটি ঢলঢল করছে। গলার ওপর মাথাটা যেন শরীরের তুলনায় অনেক বড়।

নবীনকুমারকে পালঙ্কের বাইরে একটা পা বাড়াতে দেখে কুসুমকুমারী বললো, ও কি, ও কি কচ্চেন ?

উত্তর দেবার কোনো প্রয়োজন বোধ না করে অমানুষিক চেষ্টায় নবীনকুমার নামতে চেষ্টা করলো পালঙ্ক থেকে। ইদানীং অন্তত দুজন ধরাধরি না করলে সে মাটিতে দাঁড়াতেই পারে না, এখন সে একা যাবার চেষ্টা করছে !

সরোজিনী চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলতে লাগলো, ও মা গো, কী হবে, কী সর্বনাশ, ওগো কে কোতায় আচো—

দাসী-বাঁদী, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ছুটে এলো গঙ্গানারায়ণ। নবীনকুমার তখন মাটিতে নেমে দাঁড়িয়েছে। সরোজিনী আর কুসুমকুমারী তাকে দু'দিক থেকে ধরতে যেতেই সে রুক্ষস্বরে বললো, ছেড়ে দাও !

গঙ্গানারায়ণ ভাইকে জড়িয়ে ধরে বললো, কী হয়েচে, ছোট্‌কু ? তুই কী চাস্ !

নবীনকুমার বললো, সবাইকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলো। নইলে আমি এখেনে থাকবো না।

—বলচি, বলচি, সবাই চলে যাবে, তুই আগে শো—।

নবীনকুমারকে প্রায় জোর করেই ধরে এনে গঙ্গানারায়ণ শুইয়ে দিল পালঙ্কে। অন্যান্য কৌতূহলীদের চলে যাবার হুকুম দিয়ে গঙ্গানারায়ণ কুসুমকুমারীকে বললো, দোরটা বন্ধ করে দাও !

নবীনকুমার বললো, ঐ ব্র্যাণ্ডির বোতলটা দাও আমাকে !

—তুই, তুই⋯এই অবস্থায়⋯ডাক্তাররা বলেচেন—

—দাও !

—না, কিছুতেই না ! তুই এমন ছেলেমানুষী করিস নি, ছোট্‌কু !

—তোমরা আমায় মেরে ফেলতে চাও ? এ কতা বোঝো না যে শুধু ঐ ব্র্যাণ্ডি খেলেই আমার বমি হয় না !

—কিন্তু খালি পেটে ওটা খেলে—

—দাও !

—ছোট্‌কু, তুই শুয়ে পড়। যদি খেতেই হয় আমি তোর গলায় দু'চার ফোঁটা ঢেলে দিচ্চি, আর জেদ করিস নি, ছোট্‌কু—

অতি শীর্ণকায় এবং মৃতপ্রায় নবীনকুমার যে এখনো এই সিংহ পরিবারের প্রধান পুরুষ, তা তার ব্যবহারে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। গঙ্গানারায়ণের কথা গ্রাহ্য না করে শয্যার ওপর উপবিষ্ট অবস্থায় সে হাত বাড়িয়ে বসে রইলো।

গঙ্গানারায়ণ মেঝে থেকে তুলে নিল বোতলটি। কুসুমকুমারী আর্তস্বরে বললো, আপনি দিচ্চেন ?

গঙ্গানারায়ণ তবু নিরুপায়ভাবেই বোতলটি এগিয়ে দিল কনিষ্ঠের হাতে।

কম্পিত হাতে ছিপিটি খুলে বোতলের মুখটি ওষ্ঠে ছোঁয়ালো নবীনকুমার। কিন্তু দু'চার ফোঁটার বেশী তার মুখে গেল কি না সন্দেহ ! বোতলটি সে ধরে রাখতে পারলো না। তার হাত থেকে খসে পড়ে সেটি ভেঙে গেল টুকরো টুকরো হয়ে। সমস্ত কক্ষ পূর্ণ হয়ে গেল তীব্র সুরার গন্ধে।

রেলওয়ের চাকরিতে আর ফিরে গেল না চন্দ্রনাথ। বৈঠকখানার বাসাবাড়ি ছেড়ে সে চিৎপুরে ফৌজদারি বালাখানার পাশে একটি মাঝারি ধরনের গোটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসলো! হাতে কিছু সঞ্চিত অর্থ আছে, কিন্তু তা দিয়ে সারা জীবন চলবে না, সুতরাং সে গ্রহণ করলে নতুন পেশা।

সে নিজেই একটি পদবী জুড়ে দিয়েছে তার নামের সঙ্গে, বাড়ির সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছে একটা সাইন বোর্ড। তাতে ইংরেজি ও বাংলায় এই মর্মে লেখা আছে : অপূর্ব সুযোগ! অপূর্ব সুযোগ! হিমালয়ের সন্ন্যাসীর নিকট হইতে প্রাপ্ত দৈব ঔষধ! ভূত-প্রেত-পেত্নী, ধনুষ্টংকার, স্বপ্ন-দোষ, চোয়াল-আটক, সাহেব-ভয়, পত্নী-প্রহার ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধির প্রত্যক্ষ চিকিৎসা করিয়া থাকি। ফিস মাত্র দুই টাকা এক পক্ষকালের মধ্যে হাতে হাতে ফল না পাইলে মূল্য ফেরত। সাক্ষাৎকারের সময় সকাল নয়টা হইতে এক ঘটিকা। প্রোঃ চন্দ্রনাথ ওঝা।

প্রথম প্রথম খদ্দের তেমন আসে না, লোকে সাইন বোর্ডটি পড়ে, মুচকি হাসে, কেউ কেউ বলে, ওঝাও ইংরিজি শিকেচে, এঃ? কালে কালে কতই দেকবো!

দু' একজন ওঝার চেম্বারে উঁকিঝুঁকি মেরেও বিশেষ রকম কৌতুক ও বিস্ময় বোধ করে। ভূত কিংবা সাপের বিষ-ঝাড়ানো ওঝা কে না দেখেছে, তাদের চেহারা হয় কাপালিকদের মতন, রক্তাম্বর ভূষিত, মাথার চুলে জট। কিন্তু এ যে একেবারে সাহেব-ওঝা! হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট পরা, সামনের টেবিলে পা তুলে চেয়ারে বসে ফুক ফুক করে সিগারেট টানে! পায়ে আবার ইংলিশ জুতো!

মেডিক্যাল কলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র এবং পরে এম ডি পাশ করা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সম্প্রতি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পক্ষে প্রচার শুরু করায় শহরে নতুন হুজুগ উঠেছে! হেকিমী-কবিরাজি-টোট্‌কা চিকিৎসা ছাড়িয়ে এতদিনে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাতেও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল অনেকে। এ আবার কী নতুন জিম্মিস এলো! শুধু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারই নয়, প্রসিদ্ধ ধনী অক্রূর দত্তের নাতি রাজা দত্ত-ও এই হোমিওপ্যাথি নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন, এবং সঙ্গে আছেন কয়েকজন সাহেব! চিনির দানার মতন ছোট ছোট কয়েকটা সাদা রঙের বড়ি আর জলের মতন স্বচ্ছ, দেখলে মনে হয় জলই, তার কয়েকটা ফোঁটা খেলেই সেরে যাবে বড় বড় রোগ? এও আর এক রকমের ভেল্কি নয়?

চন্দ্রনাথের সাইন বোর্ড দেখে অনেকে ভাবলো, কোনো ট্যাঁস ফিরিঙ্গি বোধহয় আর এক রকম ভেল্কি দেখাতে এসেছে।

কাল্লু শেখ নামে একটি মুসলমান কিশোরকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে চন্দ্রনাথ। ছেলেটি তার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছিল একদিন। ছেলেটিকে এক নজর দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিল চন্দ্রনাথ। ছেলেটির মাথায় চুল নেই, এমনকি ভুরুও নেই। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে তার সম্পূর্ণ শরীর কেশহীন, নির্লোম। বাপ-মা হারা ঐ কাল্লুর স্থান ছিল শহরের আস্তাকুঁড়ে, পোকামাকড়ের মতন আবর্জনা খুঁড়ে খেত, তার ঐ বিচিত্র চেহারার জন্য তাকে দেখলেই ঢিল মারতো পল্লীর বালকেরা।

চন্দ্রনাথ তাকে স্বগৃহে স্থান দিয়ে উত্তম খাদ্য খাইয়ে কয়েক দিনেই চাঙ্গা করে তুললো। জীবনে কারুর কাছ থেকে একটিও স্নেহ-বাক্য না শুনলেও ছেলেটি বেশ হাসি-খুশী। চন্দ্রনাথের বেশ ভালো সময় কাটে তার সঙ্গে। কাল্লু শেখের নাম বদলে দিয়ে সে বলেছে, শোন, এখন থেকে তোর নাম হলো সুলতান, তুই মনে করবি এই কলকাতা শহরটার তুই-ই মালিক, কারুকে ভয় পাবি না, বুঝলি। এবার বল, হোয়াট ইজ ইয়োর নেম?

ছেলেটি বললো, মাই নেম ইজ কাল্লু শেখ !

—অ্যাই ও ! বললুম না, তোর নাম আজ থেকে সুলতান ?

—জী সরকার, সুলতান !

—ফের জী সরকার বলছিস ? বলবি, ইয়েস স্যার !

—ইয়াস যাঁড় !

—ওতেই হবে। এবার বল্, শশার ইংরিজি কী ?

—কুকামবার !

—লাউ কুমড়ো ?

—পমকিন !

—চাষা ?

—প্লৌমান !

—বাঃ ! বাঃ !

মাত্র ছ' মাসে এতখানি ইংরেজি শিখে নিয়েছে সে। তাছাড়া সে চন্দ্রনাথের সঙ্গে কুস্তি করে, গঙ্গায় গিয়ে সাঁতার কাটে, অনেক উঁচু উঁচু স্থান থেকে লম্ফ দেয়। চন্দ্রনাথ তাকে এ সব শিক্ষা দেয় বিশেষ উদ্দেশ্যে।

চন্দ্রনাথের প্রথম খরিদ্দার এলো এক আর্মেনিয়ান জুতোর ব্যবসায়ী। কলকাতা শহরে ভূত-প্রেতের উপদ্রব নিত্য লেগে আছে। এই আর্মেনিয়ান সাহেবটি কাশীপুর অঞ্চলে শখ করে একটি বাগান বাড়ি কিনেছিল। গত এক মাস ধরে সে বাড়িতে ভূত লেগেছে। শুধু শোনা কথা নয়, আর্মেনিয়ান সাহেবটি নিজে সেখানে গিয়ে থেকে দেখেছে। যখন তখন ভূতে ঢালা ছোঁড়ে, মাথায় হিসি করে দেয়, দরজা-জানলা বন্ধ থাকলেও কালো বেড়াল হয়ে ঘরে ঢোকে—ইত্যাদি। গ্রাম্য ওঝা নিয়োগ করে কোনো কাজ হয়নি, তাই সে এসেছে এই ট্যাঁস ফিরিঙ্গির কাছে।

পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে চন্দ্রনাথ কাজটি হাতে নিল এবং সাত দিনের মধ্যে সেই কাশীপুরের বাগানবাড়ি ভূত-মুক্ত করে ফেললো। তাতে তার নাম হলো একটু, ক্রমে একটি দুটি করে খরিদ্দার বাড়তে লাগলো।

লোকজন এলে চন্দ্রনাথ নানা রকম রঙ্গ কৌতুক করে। রাজস্থানের এক ব্যবসায়ী এসেছে তার ভাগ্নেকে নিয়ে, ভাগ্নেটির চোয়াল আটক হয়েছে। মুখখানি হাঁ করা। বন্ধ করতে পারছে না কিছুতেই, চক্ষু দুটি বিস্ফারিত, তিনদিন ধরে এই অবস্থা। রাত্রিবেলা বাড়ির বাইরে মাঠে গিয়ে প্রাকৃতিক কার্য সম্পন্ন করার সময় কিছু দেখতে পেয়ে ভয়ে নাকি এ রকম হয়েছে।

সব বিবরণ শুনে চন্দ্রনাথ হাঁক দেয়, সুলতান !

তখনই ঘরের মধ্যে থপ্ থপ্ করে কী যেন ঢোকে। দেখেই আঁতকে ওঠে ব্যবসায়ী এবং তার ভাগ্নেটি। সারা অঙ্গে আঁটি মখমলের পোশাক পরা সুলতান হেঁটে আসে দু' পায়ে নয়, দু'হাতে, পা দুটি ওপরে।

ব্যবসায়ীটি চেঁচিয়ে ওঠে, সীয়া রাম, সীয়া রাম ! এ কৌন্... ?

চন্দ্রনাথ খুব সংক্ষিপ্তভাবে বলে, ভয় পাবার কিছু নেই। ও আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট !

ভাগ্নেটির অবশ্য এতেও চোয়াল বন্ধ হয়নি।

সুলতানের মুখে কামড়ানো একটি কলম। চন্দ্রনাথ সেটি নিয়ে সাদা কাগজে প্রেসক্রিপশন লেখে, তারপর সুলতানের পায়ের আঙুলের ফাঁকে সেটি গুঁজে দিয়ে বলে, চটপট ওষুধ নিয়ে এসো !

সুলতান নাকি সুরে বলে, ইয়াস যাঁড় ! তারপর একই রকমভাবে থপথপিয়ে চলে যায়।

চন্দ্রনাথ তখন সিগারেট ধরিয়ে বলে, ওকে এনেছি ছিলকি গড়ের একটা হানা বাড়ি থেকে। সব রকম কাজ জানে !

একটু পরেই ঘরের ছাদ থেকে কী যেন একটা মিশমিশে কালো রঙের প্রাণী লাফিয়ে পড়ে একেবারে ভাগ্নেটির ঘাড়ের ওপরে। ব্যবসায়ী এবং তার ভাগ্নে একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, আই বাপ, আই বাপ, মর গায়া, মর গায়া।

হাসতে হাসতে দুদিকে অনবরত মাথা দোলাতে থাকে চন্দ্রনাথ। সুলতানই কালো চাদর জড়িয়ে লাফিয়ে পড়েছে কড়িকাঠ থেকে। কোন্ কৌশলে সে ওখানে আসে, তা বাইরের কারুর জানবার উপায় নেই।

হাসি থামিয়ে চন্দ্রনাথ বলে, দিন, আমার ফিস্ দু' টাকা।

চন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশী আমোদ পায় সাহেবভীতি রোগের চিকিৎসা করে। বর্ধমানে চাকরি করার সময় সে দেখেছে যে গ্রাম দেশে এই রোগ খুব প্রবল। কোনো ক্ষুদ্র পল্লী গ্রামে দৈবাৎ কোনো সাহেব উপস্থিত হলে গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে পলায়ন করে তো বটেই, কখনো কখনো দু' একজনের ঐ রোগ ধরে যায়। দূর থেকে কোনো সাহেব দেখলেই কিংবা সাহেব শব্দটি উচ্চারিত হলেই তারা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। এমনকি কোনো দয়ালু, হৃদয়বান সাহেবও তাদের কাছে ঘেঁষতে পারে না। শিশু যুবা বৃদ্ধ সকলেরই এই রোগ হতে পারে।

হয়তো কোনো বর্ধিষ্ণু চাষীর সন্তানের সারা গায়ে খুজ্‌লি কিংবা দাঁতের রোগ হয়েছে, শহরে এনে চিকিৎসা করাবার সঙ্গতি আছে সেই চাষীর। কিন্তু সেই চাষীর ছেলের যদি সেইসঙ্গে সাহেব-ভীতি রোগও থাকে, তা হলেই মুশকিল। শহরে এলে একটি দুটি সাহেব চোখে পড়বেই, আর তখনই তার হাত পা ঠকঠকিয়ে কেঁপে মৃগী রোগীর মতন ফেনা বেরুবে মুখ দিয়ে। এমনকি চীনেম্যান দেখলেও ওরা সাহেব ভেবে ভয় পায়। অথচ খুজ্‌লি কিংবা দাঁতের রোগ, দুটোরই চিকিৎসা চীনেম্যানরাই খুব ভালো জানে।

চাষীর সঙ্গে এসেছে তার পুত্র, হ্যাট-কোটধারী চন্দ্রনাথকে দেখেই বাবারে, সাহেবরে! বলে সে দাঁতে দাঁতে বাদ্য শুরু করে দেয়।

চন্দ্রনাথ তখন তাকে আরও ভয় দেখিয়ে বলে, হাঁ, হামি সাহেব আছি। টুম্ ডাকু। হামি টুমাকে মারিব!

চাষীর দিকে তাকিয়ে বলে, ভয় নেই। আধ ঘন্টার মধ্যে আপনার এই ছেলে সিধে হয়ে যাবে।

ছেলেটির কণ্ঠ পাকড়ে জোর করে ঠেলতে ঠেলতে চন্দ্রনাথ নিয়ে যায় ভিতরে। অন্য একটি ঘরে ঢুকে সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে দেয়, যাতে কোনো আওয়াজ বাইরে না যায়। একটি কাঠের টুলের ওপর জ্বলছে টেমী, তার পাশেই রাখা রয়েছে একটি হাতখানেক লম্বা কাঠের মুগুর।

চাষী ছেলেটির বয়েস ষোলো-সতেরো, বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা, সারা গায়ে খুজ্‌লি। ছেলেটিকে সামনে দাঁড় করিয়ে চন্দ্রনাথ আচমকা টেনে এক বিরাশি সিক্কা থাপ্পড় কষায়। ছেলেটি ছিটকে দেয়ালে পড়ে হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে।

তখন চন্দ্রনাথ হাঁক দেয়, সুলতান!

সেই ঘরেরই একটা কালো পর্দা ঠেলে বেরিয়ে আসে সুলতান। বিচিত্র তার সাজপোশাক! এক একটি রোগের জন্য তার পৃথক পৃথক সাজ আছে। আজ সে পাক্কা সাহেব। বুট জুতো, প্যাণ্ট-কোট-টুপী। মুখে একটি জ্বলন্ত চুরুট। ছোট্টখাট্টো চেহারার সুলতানকে দেখায় পুতুলের মতন।

সে এসেই নাক-মুখ ফুলিয়ে ভয়ানক রাগের ভঙ্গি করে বলে, ড্যাম কুকাম্বার! ড্যাম পামকিন! ড্যাম! ড্যাম!

তারপরই সে চাষীর ছেলেটির কাছে এসে কাটে এক রাম চিমটি। ছেলেটি বাবারে, মারে, গেলুম রে, ওগো ছোট পিসী তুমি কোহানে গ্যালে গো, বলে ডাক ছেড়ে কাঁদে আর সুলতানের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ঘর জুড়ে দৌড়োয়। সুলতান অনবরত ড্যাম, ড্যাম বলতে বলতে তাকে তাড়া করে আর চিমটি কেটে যায়। মাঝে মাঝে সুড়সুড়িও দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটি নাজেহাল হতে হতে মরীয়া হয়ে সুলতানকে উল্টে আঘাত করে একটা। সুলতান এর পরে একটা ছোট ছুরি হাতে নিয়ে ছেলেটিকে মারতে উদ্যত হয়ে ভয়ঙ্করভাবে দাঁত কিড়মিড় করে। আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টায় ছেলেটি তখন হাতে তুলে নেয় সেই কাঠের মুগুরটি।

চন্দ্রনাথ গার্ড চেইন দেওয়া ঘড়ি বার করে কোটের পকেট থেকে। সে হিসেব করে দেখেছে, প্রায় সবার ক্ষেত্রেই পঁয়তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট লাগে। পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এসে সে বলে, ব্যাস, ব্যাস, যথেষ্ট হয়েছে।

সুলতানও তখন ছুরি সমেত হাতটি নামিয়ে হি হি করে হেসে বলে, তোমার নাম কী গো ? অ ছেলে ? আমার নাম সুলতান ছায়েব।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করে, আর কোনো দিন সাহেব দেখলে ভয় পাবে ? কতায় আচে না, যেমন কুকুর তেমন মুগুর ! তুমি শোনোনি !

চন্দ্রনাথের এই চিকিৎসায় সত্যিই কাজ হয়। ক্বচিৎ কদাচিৎ দু একটি রোগী ফিরে আসে পুনরায় চিকিৎসার জন্য।

রাত্রে সুলতান আর চন্দ্রনাথ একত্রে খানাপিনা করে। নানারকম গল্প হয়। তারপর সুলতান ঘুমিয়ে পড়লে চন্দ্রনাথ একবার রোঁদে বেরোয় ; শহরের পথে পথে একা একা টহল দেওয়া তার এক নেশা। তার আর একটি শখ মাতাল ধরে পেটানো। কু-পল্লীতে গিয়ে ঘোরাঘুরি করে সে, নিশাচর প্রমোদসন্ধানীদের সঙ্গে পায়ে পা লাগিয়ে বিবাদ বাধায়, তারপর তাদের বেদম প্রহার করে। চন্দ্রনাথের যা শারীরিক শক্তি, তাতে তিন চারজন ব্যক্তিকে সে কাবু করে দিতে পারে খালি হাতেই।

কখনো কখনো চন্দ্রনাথের ডাক না পড়লেও সে নিজেই কোনো ভূতের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। পাথুরেঘাটায় এক স্যাকরার একমাত্র পুত্রের দম-ফটকা রোগ হয়েছে। যখন তখন সে গেল গেল রব তুলে চোখ উল্টে দড়াম করে পড়ে যায়। তারপরই সে ওরে বিষ্টু, ওরে বক্কা, ওরে জয়হরি প্রভৃতি অচেনা লোকের নাম ধরে ডাকে। স্যাকরাটির যা পয়সা তাতে সে এ শহরের অনেক হঠাৎ নবাবকে আহিরীটোলায় কিনে শালকের বাঁধাঘাটে বিক্রি করে দিতে পারে। ইনি সেই গুপী স্যাকরা, এখন গোপীমোহন স্বর্ণকার হয়েছেন। এক পাথুরেঘাটাতেই তাঁর তিনখানা বৃহৎ অট্টালিকা।

পুত্রের চিকিৎসার জন্য গোপীমোহন ইংরেজি ডাক্তার, বদ্যি হাকিম সবই ডেকেছেন। বাড়ির মেয়েরা কালীঘাটে স্বস্ত্যয়ন, কালভৈরবের স্তব পাঠ ও নানা স্থানের চরণামৃত ও মাদুলীর ব্যবস্থাও চালিয়ে গেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। এ খুব জবরদস্ত প্রেতাত্মার ব্যাপার। গোপীমোহনের পুত্র লক্ষ্মীমোহনের পীড়া দিন দিনই দুরূহ রূপ নিচ্ছে, এখন তার দম ফেলতে খুবই কষ্ট হয়, কুকুরের মতন জিভ বার করে হাঁপায় এবং অন্য লোকের কণ্ঠে কথা বলে।

এবার আনানো হয়েছে মস্ত বড় এক গুণিনকে। পারিবারিক গুরুঠাকুরের মতন এই গুণিনের সঙ্গে সব সময় অনেক চ্যালা চামুণ্ডা ঘোরে। গোপীমোহন স্যাকরার বসত বাড়িতে একতলায় তিনখানা ঘর নিয়ে ছ-সাত জন চ্যালা সমেত উঠেছেন সেই গুণিন। খুব ধুমধাম করে যাগযজ্ঞ চলছে কয়েকদিন ধরে, তারপর লোকের মুখে মুখে রটিত হয়ে গেল যে সামনের অমাবস্যার রাতে সেই গুণিন ভূত নামাবেন।

সন্ধে থেকেই সেদিন গোপীমোহনের বাড়ির সামনে প্রবল ভিড়। দ্বারবান দিয়েও তাদের গতি রোধ করা যাচ্ছে না। চল্লিশ পঞ্চাশজন ঠেলেঠুলে ঢুকে পড়েছে একেবারে ভিতর মহলে। বলা বাহুল্য, তাদের মধ্যে রয়েছে চন্দ্রনাথ এবং সুলতান। আজ দুজনেরই পরনে ধুতি-কামিজ, সুলতানের মস্তকে আবার পাগড়ি।

বড় একটি হলঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার করে বসে আছেন গুণিন, সঙ্গে তাঁর সাকরেদরা। লক্ষ্মীমোহনকে শুইয়ে রাখা হয়েছে এক পাশে কম্বল শয্যায়। ঘরের এক কোণে একটি আসন পাতা এবং তার সামনে অনেকগুলি বাসনে লুচি-মণ্ডা সমেত বহুবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন। সে সমস্ত খাবার দশটা মানুষে খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তা রাখা হয়েছে ভূতের সেবার জন্য।

গ্রাম্য ওঝারা ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রচুর গালমন্দ করে ভূতকে বার করে আনে। এই গুণিন অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করে দিলেন দর্শকদের উদ্দেশে ! কেরেস্তানি ও ব্রাহ্ম-হুজুকের ওপরেই গুণিনের বেশী রাগ, দু পাত ইংরেজি পড়ে যেসব ছোকরারা দেশে অবিশ্বাসের ঝড় বইয়ে দিয়েছে, তাদের জন্যই আজকাল এইসব রোগ সারে না ! এর ফলে কিছু গোলযোগ দেখা দিল, দর্শকরা এতখানি কড়া গালিগালাজ হজম করতে রাজি নয় !

উত্তেজনা যখন চরমে ওঠার মতন অবস্থা, তখন গুণিন হঠাৎ ঘোষণা করলেন, তিনি ভূত নামাবেন না, আর একদণ্ডও এ বাড়িতে থাকবেন না। গোপীমোহন অসহায় ভাবে সকলের কাছে হাত জোড় করে কাকুতি-মিনতি করছে, মশায়রা শান্ত হোন, শান্ত হোন!

শেষ পর্যন্ত রফা হলো, যারা অবিশ্বাসী তাদের চলে যেতে হবে, আর যারা বিশ্বাস করে তারা থাকতে পারে। অবিশ্বাসীদের দূষিত বাতাসে কোনো শুভ কাজ হয় না। একদল লোক তর্জন গর্জন করতে করতে বেরিয়ে গেল, রয়ে গেল বেশীর ভাগই।

চন্দ্রনাথ এর মধ্যে একবারও টুঁ শব্দ করেনি। সুলতানকে নিয়ে শান্তভাবে বসে আছে এক পাশে।

এরপর গুণিন যথারীতি চিৎকার করে দুর্বোধ্য মন্ত্র পড়তে লাগলো, এবং চ্যালারা ধূপ-ধুনোর ধোঁয়ায় কাঁদিয়ে অস্থির করলো সকলকে। এক সময় হঠাৎ সব শব্দ থেমে যেতেই কিছুক্ষণের জন্য নেমে এলো অদ্ভুত নীরবতা। তারপর প্রথাসিদ্ধ ভূতের মতন নাকি সুরে কে যেন বললে, দূঁর হঁয়ে যাঁও, সঁবাই ঘঁর থেঁকে দূঁর হঁয়ে যাঁও!

গুণিন এবং তাঁর চ্যালারা সমেত সমস্ত দর্শককেই বেরিয়ে যেতে হলো ঘর থেকে, কিন্তু সামনের দরজা ও জানলা দুটি রইলো খোলা। দূর থেকেই যেন দেখা গেল ধোঁয়ায় ভর্তি অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেন ঘুরছে একাধিক ছায়ামূর্তি। এবং চক-চকাস, কড়র-মড়র শব্দ হতে বোঝা গেল প্রেতাত্মা খাবার খেতে বসেছে। দর্শকদের সকলেরই সর্বাঙ্গে শিহরণ হলো, দু' চারজন ভয়ে আর্ত শব্দ করে উঠলো, এক রমণী মূর্ছা গেল।

ভূত শুধু খাদ্যই গ্রহণ করছে না, মটর মট্ শব্দে তামাকও টানছে। সত্যিই অলৌকিক, রোমাঞ্চকর কাণ্ড!

কয়েক মুহূর্ত পরেই অবশ্য অন্য রকম কাণ্ড শুরু হলো। হঠাৎ ওয়াক ওয়াক শব্দ শুরু হলো। ভূতে বমি করছে। সে কি সাংঘাতিক বমি, যেন ভেদ বমির বাবা, ভোজন-বিলাসী প্রেতের যেন একেবারে শেষ দশা!

হতভম্ব দর্শকদের মধ্য থেকে হো-হো করে হেসে উঠলো চন্দ্রনাথ। অন্যদিকে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। বাতি জ্বালিয়ে ভৃত্যরা ছুটে এলে দেখা গেল, সেই গুণিন এবং তার দু-তিনজন চ্যালাই মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে বমি করছে। অতি করুণ দৃশ্য।

ব্যাপার আর কিছুই না, অন্ধকার ও ধোঁয়ার সুযোগ নিয়ে চন্দ্রনাথ সুলতানকে পাঠিয়ে অনেকখানি টারমেরিক অ্যাসিড মিশিয়ে দিয়েছে ঐ খাদ্যদ্রব্যে। ঐ অ্যাসিড পেটে গেলে পাঁচ মিনিটের বেশী উদরে কিছু রাখা সম্ভব নয়।

হাসতে হাসতেই সুলতানের কাঁধে হাত দিয়ে চন্দ্রনাথ বললো, এবার চল।

ছাদের ছোট ঘরটিতে বসে নিবিষ্ট মনে পড়াশুনো করছে কুসুমকুমারী।

সারা দিনের প্রায় অধিকাংশ সময়ই কুসুমকুমারী এইখানে কাটায়। স্থানটি বড় নির্জন, বড় মনোরম। গৃহের অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না। দ্বিপ্রহরে চতুর্দিক একেবারে শুনশান, মধ্যে মধ্যে শুধু শোনা যায় পথের ফেরিওয়ালাদের হাঁক, শিল কোটাও! কুয়ো'র বালতি তোলাবে গো! দাঁতের পোকা ভালো করবে গো! বাসন চাই, বাসন! মীর্জাপুরী কাঁসার বাসন! হিং চাই, হিং! প্রত্যেকের একটি নিজস্ব সুর আছে। কাকের ডাক, শালিকের ডাকের সঙ্গে ফেরিওয়ালাদের এই হাঁক যেন ঠিকঠাক মিলে যায়, সবই মনে হয় প্রকৃতির অঙ্গ।

ছাদের আলসেতে বসেছে এক জোড়া চিল, মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় কুসুমকুমারীর দিকে। চিল দেখলে বড় ভয় হয় তার। কী তীক্ষ্ণ ঠোঁট, আর সব সময় রাগী রাগী চোখ। খুব ছেলেবেলায় কুসুমকুমারীদের বাপের বাড়িতে হিমু নামে একটি বালক ভৃত্য ছিল, একদিন তার কী অবস্থা!

বাগবাজারের ভুবন ময়রার দোকান থেকে রসগোল্লা আর রাধাবল্লভী আনতে পাঠানো হয়েছিল তাকে, দু' হাতে দুটো চাঙ্গারি নিয়ে আসছিল হিমু, এমন সময় আট দশটা চিল এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপরে। ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে আছড়ে পড়েছিল হিমু, তার গালে চিলের নোখের আঁচড়ের ফালা ফালা দাগ! সেই থেকে চিল দেখলেই কুসুমকুমারীর বুক কাঁপে। সে যে উঠে গিয়ে চিল দুটোকে তাড়িয়ে দেবে, সে সাহসও নেই।

মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, আবার পাঠে মনোনিবেশ করে কুসুমকুমারী। গঙ্গানারায়ণ বড় কড়া শিক্ষক, রোজ তাকে পড়া দিয়ে যায়, রাত্রে এসে ধরে। বৎসর খানেকের মধ্যেই গঙ্গানারায়ণ তাকে অনেকখানি ইংরেজিও শিখিয়েছে। ব্যাকরণের ওপর বেশী জোর দেয়নি গঙ্গানারায়ণ, প্রথমে সে কুসুমকুমারীকে কিছু ইংরেজী কবিতা মুখস্থ করিয়ে দিয়েছে, অর্থ না বুঝে শুধু তোতা পাখির মতন কণ্ঠস্থ করা, তারপর এক এক করে প্রতিটি শব্দের অর্থ বুঝিয়েছে। এরপর এক একটি পুরো কবিতার অর্থ কুসুমকুমারীকে বাংলায় লিখতে হবে। এই রকম এখন কিছুদিন চলছে তার হোম টাস্ক। কোনো ইংরেজী শব্দের অর্থ ভুলে গেলে অভিধান দেখে নিতেও শিখেছে কুসুমকুমারী।

আজকের পাঠ্য শেলীর একটি কবিতা। লাইনস টু অ্যান ইণ্ডিয়ান এয়ার।

গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, দ্যাকো, আমাদের কবি কালিদাস যেমন মেঘকে উদ্দেশ করে লিকেচিলেন মেঘদূত কাব্য, সেই রকম একজন ইংরেজ কবি লিকেচেন হাওয়াকে উদ্দেশ করে। ইনি মস্ত বড় কবি, জানো তো পি বি শেলী, মারা গ্যাচেন অল্প বয়েসে, কিন্তু সৃষ্টি করে গ্যাচেন অমর কাব্য। আরও মজার কতা শোনো, ইনি কখনো আসেননিকো আমাদের দেশে, অথচ এই ভারতের সুস্নিগ্ধ বাতাসকে এত ভালোবেসেচেন যে তার ওপরেই লিকে ফেলেচেন একখানা এমন মধুর কবিতা!

দি ওয়াণ্ডারিং এয়ারস দে ফেইন্ট
অন দা ডার্ক দা সাইলেন্ট স্ট্রিম—
দি চম্পক ওডারস ফেইল
লাইক সুইট থট্স ইন আ ড্রিম;
দি নাইটিঙ্গেল কমপ্লেইন
ইট ডাইজ আপ অন হার হার্ট
অ্যাজ আই মাস্ট ডাই অন দাইন
ও বিলাভেড অ্যাজ দাও আর্ট!

ভাবাবেগে উদাত্ত কণ্ঠে পড়তে পড়তে গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, মাঝখানে ঐ যে একটা শব্দ শুনলে, দি চম্পক, ওটা কিন্তু আমাদের চাঁপা ফুল। হিন্দু কলেজে আমাদের রিচার্ডসন সাহেব পড়াতে পড়াতে ওটা উচ্চারণ করতেন, দি ছামপাক! আমি বলেছিলুম, স্যার আমাদের চম্পককে কেন ছামপাক বলবো! শুনে রিচার্ডসন সাহেব হেসেছিলেন। আমার বন্ধু মধু, ঐ যে সেদিন বিলেত গ্যালো, ঐ মধু ছিল ছেলেবয়েসে বড্ড ইংরেজ গোঁড়া। সে বলেছিল, না, ইংরেজি বলার সময় কোনো দেশী শব্দ এসে গেল তো তাও উচ্চারণ করতে হবে ইংরেজদের মতনই। মধু গৌরকে ডাকতো গাউর, আমায় ডাকতো দি গ্যানজেস!

একা নিরালায় ইংরেজী কাব্য পাঠ করতে করতে অকস্মাৎ এক সময় লজ্জায় কুসুমকুমারীর গণ্ডদেশ ও কর্ণমূল আরক্ত হয়ে যায়। যেন কোনো অপার্থিব সুখের আলো এসে পড়ে মুখে।

…লেট দাই লাভ ইন কিসেস রেইন
অন মাই লিপ্স অ্যাণ্ড আইলিডস পেইল…

এই লাইন দুটির অর্থ বোঝাবার সময় কী কাণ্ডই না করেছিল গঙ্গানারায়ণ! মাঝে মাঝে কুসুমকুমারীর স্বামীটি যেন একেবারে শিশুর মতন হয়ে যায়!

গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, কিসেস রেইন মানে কী বুঝলে তো? বৃষ্টির মতন চুম্বন ঝরে পড়া, কেমন ভাবে ঝরে পড়ে দেখবে? বলতে বলতেই লম্ফ দিয়ে উঠে এসে কুসুমকুমারীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে আবার বলেছিল, এই এমনি ভাবে…ঠোঁটের ওপরে…চোখের পাতার ওপরে…। ইস, তখনও বেশী রাত নয়, ঘরের বাইরে একজন দাসী বসেছিল, সে যদি কিছু দেখে থাকে!

সুন্দর একটি বাঁধানো খাতায় কুসুমকুমারী সেই ইংরেজী কবিতার বাংলা অর্থ লেখে। এক সময় হঠাৎ ঘোর গর্জন শুনে সে আমূল চমকিত হয়ে যায়। বই খাতা রেখে সে চলে আসে দ্বারের সামনে।

আকাশে যে কখন এত মেঘ ঘনিয়েছে, সে টেরই পায়নি। দক্ষিণের আকাশ ভল্লুকবর্ণ মেঘে একেবারে সমাকীর্ণ। দৈত্যসম্রাটের হুংকার কণ্ঠস্বরে বাজ হেঁকে উঠছে, আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত চিরে চলে যাচ্ছে বিদ্যুৎ। এমন জোর একটা ঝড়ের ঝাপটা এলো যে কুসুমকুমারীর প্রথমে মনে হলো সে অন্ধ হয়ে গেছে। আঁচল চাপা দিল চক্ষে। জানলা দরজাগুলি এই সুযোগে জীবন্ত হয়ে উঠে ছটফট করতে লাগলো।

এই সময় ছাদে একা থাকতে কুসুমকুমারীর গা ছমছম করে। ঝড়ের বেগ প্রশমিত হবার কোনো লক্ষণ নেই। ছোট ঘরটি থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে পৌঁছোবার আগেই কুসুমকুমারী ধরা পড়ে গেল ঝড়ের হাতে। সে তার শাড়ি সামলাবার জন্য শক্ত করে চেপে ধরে রইলো নিজেকে, এদিকে তার মাথার সব চুল যেন ঝড়ের সঙ্গী হতে চায়। এক পা হাঁটতে গেলেই ঘুরে পড়ে যাবার মতন অবস্থা। তারপর হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি আসতেই সব প্রতিরোধ তুলে নিয়ে আত্মসমর্পণ করলো কুসুমকুমারী।

কাছাকাছি আর কোনো উচ্চ প্রাসাদ নেই, এই অট্টালিকার ছাদেও উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, সুতরাং এখানে বৃষ্টি-স্নান করতে কোনো বাধা নেই তার। আঃ কী সুখ, কী সুখ! জীবন এত সুন্দর! স্বর্গলোক থেকে নেমে আসা কোনো অপ্সরার মতন কুসুমকুমারী দু হাত ছড়িয়ে নৃত্যের ভঙ্গিতে ঘুরতে লাগলো বৃষ্টির মধ্যে। কাব্যের বর্ণনার চেয়েও সত্যিকারের প্রকৃতির রূপ দুই চক্ষু মেলে দেখা আরও কত বেশী উপভোগ্য। আকাশজোড়া এই যে বিদ্যুৎ-চমক, এই যে প্রবল বজ্র-নির্ঘোষ, এর বর্ণনা করতে পারে মানুষের কোনো ভাষা? এই যে এত বড় একটা আকাশ, তাও কি কোনো দিন কোনো কাব্যে ধরা পড়েছে? বাগানের গাছগুলি বৃষ্টির অভ্যর্থনায় নুয়ে নুয়ে পড়ছে।

এক সময় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে কুসুমকুমারী ডাকলো, সরোজ, সরোজ! শিগগির শুনে যা!

দু' তিনবার ডাকার পর সরোজিনী শুনতে পেয়ে সিঁড়ির কাছে এসে বললো, কী গো, ডাকচো কেন?

—শিগগির ওপরে উঠে আয়!

—ওমা, দিদি, তুমি একেবারে ভিজে গ্যাচো যে!

—উঠে আয় না মুখপুড়ী! দেরি কচ্চিস কেন?

সরোজিনী ওপরে উঠে আসতেই কুসুমকুমারী বললো, আয় বৃষ্টিতে স্নান করি। আমি তো কতক্ষণ ভিজচি, হঠাৎ মনে হলো, আহা আমি একলা একলা এত আনন্দ কচ্চি, সরোজকেও ডাকি!

সরোজিনী ভয় পেয়ে যায়। একটু সিঁটিয়ে গিয়ে বলে, এই বৃষ্টিতে ভিজবো? তুমি কি পাগল না কি দিদি, এ রকম ভিজলে যে সান্নিপাতিক হবে।

—আঃ, এই মেয়েটাকে নিয়ে আর পারি না! সব তাতেই তোর ভয়, সান্নিপাতিক হবে তো হবে! নে আয়!

—ছাতে···ভিজে কাপড়ে···কেউ যদি আমাদের দেকে ফ্যালে?

—এখেনে কে দেকবে! আচ্ছা নে, সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিচ্চি—

সরোজিনীকে জোর করেই টেনে বৃষ্টির মধ্যে নিয়ে এলো কুসুমকুমারী। উদ্ভাসিত মুখে জিজ্ঞেস করলো, কী, ভালো লাগচে না?

সরোজিনী তেমন উৎসাহিত হতে পারে না. একটু আড়ষ্ট হয়েই থাকে। কুসুমকুমারী তাকে আবার বললো, ইস্, একটু আগে যদি আসতি, ঝড়ের সময় যদি দেকতি আকাশটা। ঠিক যেন পাগলা হাতির মতন শুঁড় তুলে ছুটে আসছিল মেঘগুলো। একেই বলে মেঘের বপ্রক্রীড়া।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে স্নান করবার পর দুই তরুণী নেমে যায় নিচে। তারপর ওদের বেশ শীত করতে থাকে। কুসুমকুমারী রান্নাঘরে তার দাসীকে পাঠিয়ে দেয় বিশেষ নির্দেশ দিয়ে। দারুচিনি, এলাচ আর আদা ফোটানো এক প্রকার তরল তপ্ত পানীয় সে একটু পরে এনে দিলে কুসুমকুমারী বলে, নে, গরম গরম খেয়ে নে, সরোজ, দেকবি আর কিচ্ছু হবে নাকো!

কুসুমকুমারী এর পর গুন গুন করে একটা গান ধরে। জীবন তাকে চতুর্দিক থেকে ভরিয়ে দিয়েছে, সুখ যেন আর ধরে না তার শরীরে। হাটখোলার দত্ত বাড়িতে সে যখন বালিকা বয়েসে বধূ হয়ে গিয়েছিল, তখন উন্মাদ স্বামীকে দেখে সে ভেবেছিল, তার ভবিষ্যৎ একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে, কিন্তু আবার তার জীবনে যে এমন পরিপূর্ণতা আসবে সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তার স্বামী গঙ্গানারায়ণ একেবারে দেবতার মতন মানুষ, জন্ম-জন্মান্তর তপস্যা করেও কটা মেয়ে এমন স্বামী পায়!

শুধু একটি ব্যাপারে কুসুমকুমারীর মনে একটু অস্বস্তি রয়েছে। তার দেবর নবীনকুমার তার সঙ্গে

কথা বলতে চায় না। এই মানুষটিকে সে কত কম বয়েস থেকে চেনে, তার মিতেনীর স্বামী ছিল, এখন একমাত্র দেবর, তার সঙ্গে সে কত গল্প করবে ভেবেছিল। বিষয় সম্পত্তির দেখাশুনো সব গঙ্গানারায়ণকেই করতে হয় বলে সে সারাদিন খুব ব্যস্ত থাকে, কিন্তু নবীনকুমারের বাড়ি থেকে বহির্গত হবার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। পরিদর্শক যে-কয়েক মাস চলেছিল তখন নবীনকুমার নিশ্বাস ফেলারও সময় পেত না। তারপর থেকে তার আর কোনো কাজে উৎসাহ নেই। মহাভারত অনুবাদের কাজটি এখনো সে চালিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু কখনো কখনো তিন চার দিন সে নিজ কক্ষ থেকে বাইরেই আসে না। তিন চার মাস সে কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী ছিল, এখন সেরে উঠেও সে অনেকটা নিরুদ্যম হয়ে আছে।

নবীনকুমার কুসুমকুমারীকে দেখলেই এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। দু' একটি শুষ্ক ভদ্রতার বাক্য বলে সে স্থান থেকে চলে যায়। কেন যে তার ব্যবহার এরকম আড়ষ্ট, সে কথা বুঝতেই পারে না কুসুমকুমারী। সে বিধবা হবার পর নবীনকুমারই যে তার দ্বিতীয় বিবাহের সবিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল, তাও তো সে জানে। অথচ এখন তার প্রতি এত অনীহা! কুসুমকুমারী আশা করেছিল এ বাড়ি কত জমজমাট হবে, কত সমারোহ! তার বিবাহের আগেই সে এ বাড়িতে এসে দেখে গেছে দুটি নাটকের অভিনয়, সে কি অপূর্ব সুন্দর ব্যাপার! বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধিবেশনে এখানে কত সব খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সমাবেশের কথা সে শুনেছে। এ সব কিছুতেই কুসুমকুমারীর খুব আগ্রহ। অথচ সে এ বাড়ির বধূ হয়ে আসবার পর সেই সবকিছুই যেন বন্ধ হয়ে গেছে।

নবীনকুমারের ব্যবহারে কোনো ত্রুটি থাকলে সে অভিযোগ জানাতে পারতো গঙ্গানারায়ণের কাছে বা স্বয়ং নবীনকুমারের কাছেই। কিন্তু তা তো নয়। নবীনকুমারের ব্যবহারে বিনয় বা সম্ভ্রমের কোনো ঘাটতি থাকে না। কিন্তু এত বিনয় বা সম্ভ্রমই বা কেন? নবীনকুমারের চেয়ে সে বয়েসে প্রায় পাঁচ বছরের ছোট, তবু নবীনকুমার তার সঙ্গে আপনি আজ্ঞে বলে কথা বলে। অথচ এই মানুষই এক সময় তার নাম দিয়েছিল বনজ্যোৎস্না। এই পরিবারে কি এমন নিয়ম যে, বয়সের তফাত যাই থাক সম্পর্কে গুরুজন হলেই আর কারুর সঙ্গে হাসি-তামাশা করা নিষিদ্ধ? কুসুমকুমারীর বাপের বাড়িতে তো এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তার সেজদাদার স্ত্রী আর তার ন'দাদা প্রায় সমান বয়েসী, তারা তো সব সময় খুনসুটি করে; সেজদাদার স্ত্রী সকলের সঙ্গেই খেলার সময় খেলুড়ি হতো।

বিকেলের দিকে বৃষ্টি কিছু ধরে গিয়ে আবহাওয়া থমথমে হয়ে গেল। আকাশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেই রইলো এবং ওপরের দিকে তাকালেই মনে হয় আকাশ অনেক নিচে নেমে এসেছে। কেমন যেন অস্বাভাবিক অবস্থা, খুব ঘন ঘন চমকে উঠছে বিদ্যুৎ, কিন্তু বজ্রপাতের কোনো শব্দ নেই। এই সব ঘনঘোর দিনগুলিতে একা থাকতে বড় মন উতলা লাগে কুসুমকুমারীর। এত কাল সে বৃহৎ পরিবারে কাটিয়ে এসেছে, তার পিত্রালয়ে আত্মীয়স্বজন মিলিয়ে পঞ্চাশের বেশী নারী পুরুষ থাকে। সেই তুলনায় যেন খাঁ খাঁ করে জোড়াসাঁকোর সিংহদের এত বড় প্রাসাদ।

কার সঙ্গেই বা গল্প করে সময় কাটাবে কুসুমকুমারী। এক তো ঐ সরোজিনী, কিন্তু সে যেন কিছুদিন ধরে কেমন মন-মরা হয়ে গেছে। কুসুমকুমারী অনেক চেষ্টা করেও ওকে প্রফুল্ল করতে পারেনি। তা ছাড়া সরোজিনীর বুদ্ধি যে তেমন প্রখর নয়, তা বুঝতে পারা গেছে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

সন্ধের পর খুব মিহিন বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আবার বইতে লাগলো জোর বাতাস। ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগলো বাতাসের বেগ, সমুদ্র-গর্জনের মতন অবিরাম শব্দ বাইরে, দরজা-জানলা সব বন্ধ করা হলেও মনে হতে লাগলো সারা বাড়িটা যেন কাঁপছে। ঘরের সব দরজা-জানলা বন্ধ রাখা একটুও পছন্দ নয় কুসুমকুমারীর, কিন্তু এখন আর খোলার উপায় নেই, চতুর্দিকে দুমদাম শব্দ হচ্ছে, কী সব যেন ভাঙছে।

প্রকৃতি আজ ক্রুদ্ধ খেলায় মেতেছে, কিন্তু তা দেখতে পাচ্ছে না বলেই কুসুমকুমারীর আরও বেশী ছটফটানি। বন্ধ ঘরে সে একা বসে থাকেই বা কী করে? বই পড়ায় আর মন বসে না। গঙ্গানারায়ণ কখন ফিরবে কে জানে।

একজন দাসী এসে খবর দিল, তাদের বাড়ির পিছনের বাগানে কয়েকটি গাছ উপড়ে পড়েছে, কারা নাকি বলছে গঙ্গার বান ওপরে উঠে এসে ভাসিয়ে দিয়েছে কেল্লার মাঠ। আর একটু পরে খবর পাওয়া গেল দাস-দাসীদের গোলপাতার ঘরের ছাউনিগুলো আকাশে উড়ে যে কোথায় চলে গেছে, আর

দেখাই গেল না। আরও একটু রাতে খবর এলো, পাথুরিয়ার ঠাকুরদের বাড়ির একটি অংশ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এবং ঝড়ের তাণ্ডব বৃদ্ধিই পাচ্ছে ক্রমশ।

বাপের বাড়ি থেকে আনা দুই দাসীর সঙ্গে তাস নিয়ে বিন্তি খেলে সময় কাটাচ্ছিল কুসুমকুমারী, রাত্রি দশটা বেজে গেলে তার বক্ষের ভিতরকার ঝড়ের আন্দোলন বাইরের ঝড়কেও ছাড়িয়ে গেল। গঙ্গানারায়ণ ফিরলো না এখনো! এমন দুর্যোগের রাতে পথে বোধ হয় আর একটিও মানুষ নেই, গঙ্গানারায়ণ তবে কোথায় গেল!

কুসুমকুমারী অসহায় বোধ করে; কাকে গিয়ে বলবে, কে ব্যবস্থা নেবে? কর্মচারীদের খবর পাঠাতে পারে, কিন্তু কর্মচারীরা কতটা কী করতে পারে? এরই মধ্যে একটি বন্ধ জানলা খুলে গেল ঝড়ের ধাক্কায়, ঝনঝন ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়লো কাচ, প্রবল বাতাসে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সব কিছু। অতি কষ্টে সেই জানলা আবার বন্ধ করা হলো, তারই মধ্যে বাইরের ঝড়ের দিকে তাকিয়ে ছমছম করে উঠলো সকলের শরীর। আস্তো আস্তো গাছ উড়ে যাচ্ছে আকাশ দিয়ে!

কুসুমকুমারী আর পারলো না, বারান্দার অন্য প্রান্তে ছুটে গিয়ে সরোজিনীর ঘরে ধাক্কা দিয়ে বললো, ও সরোজ, খোল, খোল!

সরোজিনী দরজা খুলে উদ্‌ভ্রান্ত কুসুমকুমারীকে দেখে বললো, ও দিদি, আমারও বড্ড ভয় কচ্চে! আজ বুঝি পৃথিবী রসাতলে যাবে!

—ছোটবাবু কোতায়? বাড়িতে আচেন?

—হ্যাঁ আচেন। সারাদিনই তো শুয়ে রয়েচেন!

—একবার ডাক তাকে। আমার বুঝি সর্বনাশ হয়ে গ্যালো!

ভীতি-বিহ্বল মুখে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইলো সরোজিনী। নবীনকুমার সম্প্রতি স্বগৃহে বসেই একাকী মদ্যপান করতে শুরু করেছে। সে সময় নিজের ঘরেই সে আবদ্ধ থাকে, কারও সঙ্গে দেখা করে না। সরোজিনী কথা বলতে গেলে ধমক খায়। রাত্রির এই সময়ে সে আর সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ থাকে না।

—দাঁড়িয়ে রইলি কেন, সরোজ? উনি যে এখনো ফেরেননি!

—ও মা, সে কি সর্বনাশের কতা!

—আমি আর কাকে বলবো, কোতায় যাবো? ছোটবাবুকে একবার ডাক।

এই সময় ডাকলে উনি যে বড্ড রাগ করেন, কুসুমকুমারী আর এক মুহূর্ত সময়ক্ষেপ করতে চায় না। সরোজিনীর সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ নেই বুঝে সে নিজেই দৌড়ে গিয়ে নবীনকুমারের ঘরের বন্ধ দরজায় দুম দুম করে আঘাত করতে লাগলো।

ভেতর থেকে নবীনকুমার ক্রুদ্ধ স্বরে বললো, কে? দূর হয়ে যা!

—ছোটবাবু...একবার খুলুন...মহা বিপদ...

দরজা খুলে নবীনকুমার আরও জোর ধমক দিতে যাচ্ছিল, কুসুমকুমারীকে দেখে দৃষ্টির উষ্মা মুছে ফেললো। তারপর সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করলো, এ কি, বউঠান, আপনি...এত রাতে?

—আমার...আপনার দাদা এখনো ফেরেননি...বাইরে এই কাণ্ড চলচে...

—কী হয়েচে বাইরে?

—আপনি টের পাননি কী সাংঘাতিক ঝড়...আজই বুঝি প্রলয়...

—আপনি শান্ত হোন, বউঠান! এত ভয়ের কী আচে! দাদা কোতায় গ্যাচেন!

—জানি না।

নবীনকুমার কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলো, যেন সে বুঝতে চায় গঙ্গানারায়ণ কোথায় যেতে পারে। তারপর ডান পাশে সরে গিয়ে একটা জানলা খুলতেই ঝড়ের আচমকা ধাক্কা লাগলো তার গায়ে। তবু সে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বেশ শান্ত ভাবে বললো, হ্যাঁ, বেশ জোরেই ঝড় হচ্চে বটে!

তারপর সে গলা চড়িয়ে ডাকলো, দুলাল? দিবাকর! ওরে কে কোতায় আচিস! সহি-কোচোয়ানদের বল গাড়ি যুততে, আমি বেরুবো।

কুসুমকুমারীর সারা শরীর কম্পিত হচ্ছে, অতি কষ্টে সে রোধ করে আছে উদগত অশ্রু।

সরোজিনীর মুখখানি সম্পূর্ণ বিবর্ণ।

নারী দু'জনের উপস্থিতি গণ্য না করে নবীনকুমার ফিরে গিয়ে তার পালঙ্কের পাশের টেবিলের ওপর থেকে ব্রাণ্ডির বোতল তুলে নিয়ে গলায় ঢাললো খানিকটা। বাঁ হাতের তালুর উল্টো পিঠ দিয়ে ওষ্ঠ মুছে সে খুঁজতে লাগলো তার ছড়িটা! সেটা পেয়ে এবং হাতে নিয়ে সে দ্বারের কাছে এসে বললো, আপনার ভয় নেই, বউঠান, আমি যাচ্চি, দাদামণিকে ঠিক খুঁজে নিয়ে আসবো!

সরোজিনী এবার প্রায় কঁকিয়ে বলে উঠলো, আপনি...এখুন বাইরে যাবেন? বাড়ি ভেঙে পড়চে, গাচ উল্টে যাচ্চে...'

সে কথার উত্তর দেবার কোনো প্রয়োজনই বোধ করলো না নবীনকুমার। ততক্ষণে দুলাল এসে বারান্দায় সিঁড়ির কোণায় দাঁড়িয়েছে। তার দিকে তাকিয়ে বললো, গাড়ি বার হয়েচে?

—ছোটবাবু, বাইরে যে মহাকাণ্ড! এক পা হাঁটা যায় না!

—হুঁ! চল, দেরি করিস না!

সরোজিনী কুসুমকুমারীর হাত চেপে ধরে বললো, ও দিদি!

ততক্ষণে কুসুমকুমারীও বুঝতে পেরেছে।

স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সে তার দেবরকে পাঠাচ্ছে বিপদের মধ্যে! তার নিজের যদি সর্বনাশ হয়ে গিয়েও থাকে, তার ওপর সে আবার সরোজিনীরও সর্বনাশ করতে চলেছে! এমন কি দুলাল পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে বাইরে যেতে।

সে বলে উঠলো, না, না, আপনি যাবেন না...যাবেন না...লোকজনরা যদি পারে একটু এগিয়ে দেখুক।

নবীনকুমার কোনো উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। সরোজিনী আর কুসুমকুমারী এক সঙ্গে ছুটে গেল তাকে আটকাতে।

—যাবেন না আমার মাথার দিব্যি...আপনার পায়ে পড়ি...

দেখা গেল নারীদের মস্তিষ্ক সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই নবীনকুমারের, বরং সে দুলালের মাথা লক্ষ্য করে মারবার জন্য ছড়িটা তুলে বললো, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আচিস যে? চল!

শত কাকুতি-মিনতি উপেক্ষা করে বেরিয়ে গেল নবীনকুমার। দিবাকর ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রইলো কোথাও, দুলাল এবং আরও দুজন ভৃত্য গেল তার সঙ্গে। জুড়ি গাড়ি নেবার কোনো উপায় নেই সত্যিই। পথকে আর পথ বলে চেনাই যায় না। একে তো ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, শব্দহীন বিদ্যুৎ ঝলকে ক্ষণিকের জন্য দেখা যায় সারা পথে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গাছের ডালপালা। খড়, খাপড়া, বাঁশ, ইঁটকাঠ। তার মধ্য দিয়েই নবীনকুমার এগোতে লাগলো, দুলাল ঠিক তার সামনে।

অবশ্য বেশী ঝুঁকি নিতে হলো না ওদের। অতি কষ্টে খানিক পথ এগোবার পর ওরা শুনতে পেল মানুষের কণ্ঠ। গঙ্গানারায়ণই ফিরচে কয়েক জনের সঙ্গে। একটা কাজে গঙ্গানারায়ণ গিয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে, দুর্যোগে আটকা পড়ে যায়। তবু দুঃসাহস নিয়ে সে ফিরতে শুরু করেছিল, এক স্থলে তার জুড়ি গাড়ি উল্টে যায়। ঘোড়া দুটিই মারা গেছে, কোচোয়ান গুরুতর আহত, সৌভাগ্যবশত গঙ্গানারায়ণের কোনো আঘাত লাগেনি।

বাড়ি ফিরে এসে প্রায় সমস্ত রাতই জেগে থাকতে হলো সকলকে। এই প্রাসাদের একটি অংশও হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে এক সময়। বাইরে গেলে নিস্তার নেই, ঘরের মধ্যে বসে থাকতেও প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা। সত্যিই বুঝি প্রলয় শুরু হয়েছে, এই রাতটিই বুঝি পৃথিবীর শেষ রাত্রি।

পরদিন সকালেও তেমন কিছু বোঝা যায় নি, দ্বিপ্রহরের পর রোমহর্ষক সব সংবাদ আসতে লাগলো। ঝড় প্রশমিত হলেও বৃষ্টির বিরাম নেই, তারই মধ্যে লোকজন এসে পৌঁছতে লাগলো এ গৃহে। এক একজনের মুখে এক এক রকম চমকপ্রদ বিবরণ।

সত্যিই বুঝি এক প্রলয়ের মহড়া হয়ে গেছে গত রাত্রে এই শহরের বুকে। যে-ই আসে, সে-ই বলে, কী কাণ্ড গো বাবু, একটাও বুঝি বাড়ি আস্ত নেইকো! রাস্তাঘাট কিছুই চেনা যায় না, শতেক বছরের পুরোনো গাচও উপড়ে পড়েচে। অতবড় বাড়ি মিত্তিরদের, যেন দৈত্যে তুলে নিয়ে গ্যাচে, সেখেনে এখন ফাঁকা মাঠ। একজন বললো, আমি কাল রেতের বেলা আকাশ দিয়ে একটা নৌকো উড়ে যেতে দেকিচি, হ্যাঁ গো, ঝুটো কতা নয়, সত্যি বলছি…।

স্মরণকালের মধ্যে এরকম ঝড় এ দেশে আঘাত হানে নি। গুজব ও ঘটনা, সত্যমিথ্যে রটনার মধ্য থেকে প্রকৃত চিত্রটি ফুটে উঠতে লাগলো ক্রমে ক্রমে। কলকাতা শহরের শত শত গৃহ ভূপাতিত, মৃতের সংখ্যা সঠিক কত কেউ জানে না এখনো, গোলপাতা, খড় ও টিনের চালের ঘরগুলির অধিকাংশেরই চাল উড়ে গেছে, পান্তির মাঠে মরে পড়ে আছে বহু গরু-মহিষ, আর্মেনি ঘটের জাহাজবন্দরে এমনই ধ্বংস কাণ্ড হয়েছে যে, একটি জাহাজও অক্ষত নেই। আকাশে নৌকো উড়ে যাবার কাহিনীও অলীক নয়, বাগবাজারের ঘাট থেকে একটি ডিঙ্গি নৌকো উড়তে উড়তে গিয়ে উল্টোডিঙ্গিতে পড়ে সে স্থানটির নাম সার্থক হয়েছে। আকাশ পথে ডালপালা শিকড়সুদ্ধ উড়ন্ত বৃক্ষেরও অনেক প্রত্যক্ষদর্শী আছে।

ভদ্রশ্রেণীর ব্যক্তিরা কাল সন্ধ্যার পর থেকে আর কেউ পথে বার হয়নি, কিন্তু দাস-দাসী, ফিরিওয়ালা এবং নিত্য রোজগেরেদের তো উপায় নেই, তারা আজও বৃষ্টি মাথায় করে ঘোরাঘুরি করছে। তাদের মুখ থেকেই শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন এলাকার সংবাদ।

এক আনাজওয়ালী স্ত্রীলোক এসে হাউ হাউ করে কেঁদে পড়লো। তার চার বছরের খোকাটিকে পাওয়া যাচ্ছে না, সর্বনেশে ঝড় খোকাটিকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। ঝটিকার বেগ কত প্রবল হলে মানুষ পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে, তা চিন্তা করে সকলে তাজ্জব। এমন আর কখনো শোনা যায়নি। তার কান্না কেউ থামাতে পারে না। এছাড়া দুধওয়ালা, ছোলাওয়ালা, তেলের কলু, বাজারের মেছুনি ইত্যাদি সকলেরই বাড়ি-ঘর নিশ্চিহ্ন, সকলেই দুঃখের কথা বলতে চায়, কিন্তু কে কার কথা শুনবে!

নবীনকুমারদের প্রাসাদটি তিন পুরুষের, বেশ মজবুতভাবে গড়া। তাই বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি। একটি মহলের দেয়াল ভেঙে পড়েছে, পিছন-বাড়ির ভৃত্যদের গোলপাতার ঘরগুলি নিশ্চিহ্ন। গঙ্গানারায়ণ বড় বাঁচা বেঁচে গেছে গত রাত্রে, ঐ দুর্যোগের মধ্যে অতখানি পথ এসে সে খুবই ঝুঁকি নিয়েছিল। অবশ্য ঝড় সবচেয়ে বেশী রুদ্ররূপ ধারণ করেছিল মধ্যরাত্রির পর।

নবীনকুমারের দান-খ্যাতি অনেকদূর পৌঁছেছে বলে বহু বিপন্ন মানুষ এসেছে সিংহ-ভবনে সাহায্য প্রার্থনা করতে; এক সঙ্গে অনেকের আর্ত-আকুল প্রার্থনায় কারুর কথাই ঠিক মতন বুঝতে পারা যায় না। বার-মহলের দ্বিতলের একটি কক্ষের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে নবীনকুমার চেয়ে আছে সেই জনতার দিকে। সদরের ঠিক বিপরীত দিকে ছিল পুরোনো আমলের আস্তাবলখানা, নবীনকুমার চেয়ে আছে বটে, কিন্তু দেখছে কিনা সন্দেহ, তার দৃষ্টি উদাসীন। একভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে প্রায় এক ঘণ্টা কিন্তু কোনো রকম প্রতিক্রিয়া নেই। তাদের বাড়ির সদরের ঠিক বিপরীত দিকে ছিল পুরোনো আমলের আস্তাবলখানা, নবীনকুমারের পিতামহ কিছুদিন কোম্পানির ফৌজে ঘোড়ার জোগানদারের কাজ করেছিলেন। তারপর সেখানে কয়েকটি ছোট ছোট ঘর নির্মিত হয়ে রাজমিস্তিরিদের একটি আস্তানা গড়ে উঠেছিল। সেই সব ক'টি ঘরের ওপর পড়ে আছে বিশাল একটি আম গাছ। ঐ আম গাছটিকে নবীনকুমার তার জন্ম থেকে দেখছে। তার পিতামহের আমলের গাছ, আর ওকে দেখা যাবে না।

এক সময় গঙ্গানারায়ণ এসে বললো, ছোট্‌কু তুই এখেনে ? আর আমি তোকে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্চি।

নবীনকুমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার দিকে ফিরে দাঁড়ালো, কোনো কথা বললো না।

গঙ্গানারায়ণ বললো, এদের চিৎকার আর চেঁচামেচিতে তো আর কান পাতা যায় না ! কী করা যায় বল তো ?

নবীনকুমার গঙ্গানারায়ণের চোখে চোখ রেখে এখনো নিঃশব্দ রইলো।

—তুই কী বলিস ? এদের কিছু দেওয়া হবে ?

এবার নবীনকুমার বললো, সে তুমি যা ভালো বুঝবে !

—তবু তোর একটা মত না নিয়ে তো কিছু কত্তে পারি না !

—আমার আর মত কি ?

—এরা এসে কেঁদে পড়েচে, কিছু না দিয়ে চক্ষু বুজে রইলে এ বাড়ির সুনাম হানি হয়। জনা তিরিশ-চল্লিশেক এসেচে, আমি বলি কী, ওদের দশটা করে টাকা অন্তত দিয়ে দেওয়া হোক।

—বেশ তো।

—তুই মত দিচ্চিস তো ? তা হলে এখুনি দেওয়া শুরু করি ?

নবীনকুমার ঘাড় হেলন করলো।

গঙ্গানারায়ণ যেতে গিয়েও ফিরে এসে বললো, ও, আর একটা কতা ! কোচোয়ান কলিমুদ্দিন সাঙ্ঘাতিক খবর এনেচে ! ও বাড়িতে নাকি ভীষণ অবস্থা, ছাত ভেঙে পড়েচে এক দিকে···

—ও বাড়ি ?

—বিন্দুদের বাড়ি···মানে, জ্যাঠাবাবুদের বাড়ি ! একবার তো সেখেনে যেতে হয় ?

—তুমি যাবে ? যাও !

—তুই যাবি না ?

—নাঃ !

—সেটা কি ভালো দেকায় ? জ্যাঠাবাবু ভাববেন, এই বিপদের সময় আমরা কেউ গেলুম না।

—লোকজন পাঠিয়ে দাও, সত্যিকারের কতটা বিপদ হয়েচে, জানো আগে !

—ঠিক বলিচিস। তাই করা যাক্‌ বরং !

গঙ্গানারায়ণ এবার ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হতেই নবীনকুমার বললো, দাদা, শোনো, তুমি যখন এই লোকগুলোকে কিছু সাহায্য কত্তেই চাইচো, তখন দশ টাকা দিও না !

—দশ টাকা দোবো না ? তবে কত দোবো, পাঁচ ?

—অন্তত এক শো টাকা করে দাও !

—এ—ক—শো ? তুই বলিস কি ? আরও কতজন আসবে তার ঠিক আচে ? পাঁচ টাকায় ঘরের ছাউনি হয়ে যায় আর পাঁচ টাকায় মাসখানেকের খোরাকি—

—তুমি আমাদের বাড়ির সুনামের কতা বলছিলে, একশো টাকা না দিলে কি সে সুনাম থাকে ?

—খবর পেয়ে যদি আরও দলে দলে লোক ছুটে আসে ?

—সবাইকেই দিও। কেউ যেন ফিরে না যায়।

কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রস্তাবে গঙ্গানারায়ণ একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেল। এ ছেলেটা বলে কী ! এ রকম দানছত্র খোলা কি সম্ভব ? একশো টাকা হাতে হাতে পাওয়া যাচ্ছে শুনলে শহরসুদ্ধ লোক ধেয়ে আসবে না ?

—তুই কি ঠিক মতন ভেবে বলচিস, ছোটকু।

—দাদা, তুমি আমার মত জিজ্ঞেস করলে কেন ? তুমি তো নিজের ইচ্ছে মতন যা খুশী করতে পারতেই !

—তবিলে যদি অত টাকা না থাকে তখন ?

—যতক্ষণ কুলোয়, ততক্ষণ দিও !

এর ওপর আর কথা হয় না। গঙ্গানারায়ণ আর দ্বিরুক্তি না করে চলে গেল।

এ যেন টাকা পয়সা হরির লুঠ দেবার মতন। অকারণে অপব্যয়। যে লোকগুলি সাহায্য চাইতে এসেছে, তারাও এতটা আশা করে না। এদের মধ্যে অনেকেই এক সঙ্গে একশো টাকা চক্ষেই দেখেনি কখনো। যারা মাস মাইনের কাজ করে, তাদের বেতন বড় জোর পাঁচ দশ টাকা, আনাজপাতির ব্যবসা

করেও কেউ মাসে পনেরো বিশ টাকার বেশী মুনাফা করতে পারে না।

একটু বাদে গঙ্গানারায়ণ আবার ফিরে এসে বললো, টাকা পয়সা বিলির কাজটা তুই নিবি, ছোট্‌কু ?

নবীনকুমারের সে ব্যাপারে কোনো উৎসাহ নেই। সে সরাসরি বলে দিল, গঙ্গানারায়ণের সময়াভাব হলে কর্মচারীদের দিয়ে ও কাজ চালানো হোক।

এত টাকার ব্যাপার, কোনো কর্মচারীকে বিশ্বাস করা যায় ? গঙ্গানারায়ণ প্রথমেই প্রার্থীদের সকলকে দেউড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে লৌহ দ্বার বন্ধ করে দিল। তারপর স্বহস্তে সে একটি খেরো খাতায় লিখে নিল সকলের নাম ঠিকানা। সেই নামের পাশে বসিয়ে নিল প্রত্যেকের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টিপ ছাপ। এবার সে দিবাকরকে বসিয়ে দিল বিলি-বন্দোবস্তের ভার দিয়ে। টাকা পয়সা নাড়াচাড়া করতে গঙ্গানারায়ণ নিজেও পছন্দ করে না। সে জানে, দিবাকর এই লোকগুলির কাছ থেকে দস্তুরি আদায় করবে, সেই জন্য দুলালকে দাঁড় করিয়ে দিল পাশে। এবং তার কাছে নির্দেশ দেওয়া রইলো, আর কোনো লোককে যেন দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয়।

তারপর সেই বৃষ্টির মধ্যেই সে চলে গেল বিধুশেখরের বাড়ি।

সেখানে ক্ষতি হয়েছে খুবই, কিন্তু বাড়ির কেউ আহত বা নিহত হয়নি। গোয়াল ঘরের ওপর গাছ পড়ে দুটি দুধেলা গাভী মারা গেছে। বিধুশেখর যে কক্ষে শয়ন করেছিলেন, ছাদ ভেঙে পড়েছে তারই পাশের ঘরে। গঙ্গানারায়ণ দেখে চমৎকৃত হয়ে গেল যে অশক্ত শরীর নিয়ে বিধুশেখর আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং স্বয়ং তদারক করছেন সব কিছু। বিশেষ বিচলিতও মনে হলো না তাঁকে। গঙ্গানারায়ণের দিকে একচক্ষু দিয়ে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের বাড়ির খবর কী ? আমি নিজেই যাচ্ছিলুম একটু পরে—।

পরদিন সংবাদপত্রগুলিতে ফলাও করে প্রকাশিত হলো এই দুর্যোগের বিবরণ। ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ যে কত, তার ইয়ত্তা নেই। ইংরেজি সংবাদপত্রগুলিতে শুধু সাহেব পাড়ার ধ্বংসচিত্রই ছাপা হয়েছে, কোথায় কোন সাহেবের বাড়ির বাগান নষ্ট হয়েছে, কতগুলি জাহাজ ডুবি হয়েছে, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে কত, সেইসব কথাই সাত কাহন। যেন এ দেশটি সাহেবদেরই। নেটিভদের বাড়ি ঝড়ে উড়ে গেল কিংবা কয়েক শো মানুষের অপঘাত মৃত্যু হলো, তাতে কিছু যায় আসে না।

বাংলা মাসিক-সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিও অতি দ্রুত বিশেষ সংস্করণ বার করলে, কিন্তু শুধু হা-হুতাশে ভরা। ইংরেজদের মতন রিপোর্টিং-এর ধারায় তারা রপ্ত নয়, পরিসংখ্যান কিংবা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দেওয়ার বদলে তারা শুধু উচ্ছ্বাস প্রকাশেই বেশী পারঙ্গম। দু-একটি পত্রিকা আবার মুদ্রিত করেছে জ্যোতিষীদের ভাষণ : আমরা পূর্বেই তো কহিয়াছিলাম যে ইং ৬৪ সনে এক প্রলয়ংকরী ঝঞ্ঝাবাত আসিবে তাহাতে মানুষ-গবাদি পশু যে কত প্রাণ হারাইবে তাহার সীমা পরিসীমা নাই...এ বৎসরে দুঃসময়ের করাল ছায়া ঘনাইয়াছে এই জাতির ভাগ্যাকাশে...শনি বক্রী হইয়াছেন, অশ্লেষা ও মঘার যোগাযোগে...আমরা পূর্বেই কহিয়াছিলাম যে এইসব কলির পাঁচ পোয়া পূর্ণ হইবার লক্ষণ...

অসীম বিরক্তিতে সব পত্রিকাগুলি মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল নবীনকুমার।

সে পরিদর্শক নামে ভূতপূর্ব দৈনিক সংবাদপত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক। জেগে উঠেছে তার ভিতরের সাংবাদিক চরিত্রটি। এখন পরিদর্শক পত্রিকা চালু থাকলে সে দেখিয়ে দিত রিপোর্টিং কাকে বলে। কিন্তু এই পোড়া দেশ তার পত্রিকা পছন্দ করলো না, কেউ গ্রহণ করলো না। ঐ পত্রিকার জন্য সে কত অর্থ ব্যয় করেছে বলে সকলে তাকে মনে করে নির্বোধ। চলে কিনা এই সব পত্রিকা ! এরা সকলেই হয় সাহেবদের পা-চাটা অথবা নিয়তিবাদী !

তার মনে পড়লো হরিশের কথা। শহরবাসীর এই দুঃসময়ে হরিশের লেখনীর কত প্রয়োজন ছিল। কেউ হরিশের শূন্য স্থান পূর্ণ করতে এলো না। হিন্দু পেট্রিয়ট এখনো চলছে, নবীনকুমারই তার স্বত্বাধিকারী, কিন্তু সে নিজে কিছু আর দেখে না। মধুসূদন ইওরোপে চলে যাওয়ার পর কৃষ্ণদাস পালই ঐ পত্রিকার পুরো দায়িত্ব নিয়েছে।

কয়েক মাস নবীনকুমারের মনে যে ক্লৈব্য জমেছিল এই ঝড়ে যেন তা উড়িয়ে নিয়ে গেল। দিনের পর দিন সে নিজের পালঙ্কে শুধু শুয়ে থেকেছে, কারুর সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে চায়নি। বসত বাটিতেই মদ্য পান চালু করে দিয়েছিল পুরোপুরি, যেন জীবন সম্পর্কে তার আর কোনো আগ্রহ নেই।

আবার সে জেগে উঠলো। বেলা দশটায় সে হাঁক দিয়ে বলল, দুলাল ! গাড়ি জুততে বল !

দুলাল জানালো যে, এখনো পথঘাটে গাড়ি চালাবার কোনো উপায় নেই। বৃষ্টি প্রশমিত হয়েছে বটে, কিন্তু সব পথই ভাঙা বাড়ি আর উৎপাটিত বৃক্ষে পরিপূর্ণ। সে নিজে অনেকখানি ঘুরে দেখে এসেছে।

নবীনকুমার বললো, বেশ, আমি তবে পায়ে হেঁটেই বেরুবো। তুই তৈরি হয়ে নে !

দুলাল সভয়ে জিজ্ঞেস করলো, এমন দিনে কোতায় যাবেন, ছোটবাবু ?

নবীনকুমার বললো, যাবো বরানগরে। কাজ কম্মো কত্তে হবে না ? সব কিছু দিনের পর দিন ফেলে রাখলে চলবে ?

—বরানগর ? পায়ে হেঁটে ?

—কেন ? যাওয়া যাবে না ? কেউ যাচ্ছে না ? সবাই কি ঘরের মধ্যে সেঁদিয়ে বসে আচে ?

যাওয়া যাবে না কেন, অনেকেই যায়। কিন্তু এ বাড়ির কোনো মানুষ কোনোদিন দিবাকালে পায়ে হেঁটে বেরিয়েচে নাকি ? জোড়াসাঁকো থেকে বরানগর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাবেন ত পথের লোকজন চক্ষু কপালে তুলে বলবে না, ঐ যাচ্চেন রামকমল সিংগীর ছেলে নবীনকুমার সিংগী ! এই জলকাদা আর আদাড় পগারের মধ্য দিয়ে উনি হেঁটে হেঁটে যাচ্চেন কি গো, বৈরিগী হয়েচেন নাকি ?

কারুর নিষেধই গ্রাহ্য করলো না নবীনকুমার। তার চোখ-মুখের চেহারাই সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সে আবার আগেকার মতন জেদী ও চঞ্চল যুবা। ধুতিতে মালকোঁচা মেরে নিল, তার ওপর সাধারণ একটি কুর্তা, হাতে ছড়ি, পায়ে কালো বার্নিস করা পাম্প শু। নিচে নেমে এসে সে দুলালকে বললো, চ !

লোকের মুখে শোনা কিংবা সংবাদপত্রের বিবরণ পাঠের সঙ্গেও চাক্ষুষ দেখার অনেক তফাত ! যতটা সে কল্পনা করেছিল, ধ্বংসের রূপটি তার চেয়েও ভয়াবহ। একটি গৃহও বুঝি অক্ষত নেই। একটি বৃক্ষও হয়তো পুরোপুরি অটুট নয়। পথ চলা সত্যিই দুষ্কর। অতি প্রয়োজনে কোনো কোনো ভদ্র গৃহস্থ পাল্কী নিয়ে বার হয়েছিল, এরকম পথ দিয়ে চলা পাল্কী বেহারাদেরও অসাধ্য, মাঝপথে তারা সওয়ারি নামিয়ে দিয়েছে

পথ পরিষ্কার করা কিংবা আর্ত বিপন্নদের সাহায্য করার কোনো উদ্যোগই নেই সরকারের। কিংবা কে জানে, যাবতীয় উদ্ধারকার্য বুঝি চলছে সাহেব-পল্লীগুলিতে, নেটিভ টাউন বিষয়ে চিন্তা করার এখনো সময় আসেনি।

নবীনকুমারের মনে হলো সমস্ত নগরীটিই একটি ধ্বংসস্তূপ। তার মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে তার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলো অন্য একটি চিত্র। যা কিছু প্রাচীন, যা কিছু ঠুনকো সব খসে গেছে। আবার গড়ে উঠেছে এক নতুন দেশ, সুন্দর উজ্জ্বল। মানুষের মনে নতুন আশা ! সব কিছুর সঙ্গে মানানসই করে নিতে হলে জীবনটাকেও তো নতুন করে নিতে হবে !

প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে কলকাতা নগরীর অন্যান্য বহু অট্টালিকার মতন ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা ভবনটিরও প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত এই ভবনটির একাংশ কাত হয়ে পড়েছে। ছাদ ভেঙে কড়ি-বরগা এমন খুলে ঝুলছে যে উত্তমরূপে মেরামত করার আগে ওখানে প্রবেশ করাই বিপজ্জনক।

ঝড়ে শুধু উপাসনা ভবনটিই ভাঙেনি, সেই ধাক্কায় ব্রাহ্ম সমাজও ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল।

প্রবীণ দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে জ্বলন্ত তেজী যুবা কেশবের মিলনে ব্রাহ্ম সমাজ নতুনভাবে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে। গুসকরা গ্রামের এক আম্রকুঞ্জে তাঁবুর মধ্যে রাত্রিবাস কালে দেবেন্দ্রবাবুর মনে যে বিদ্যুৎ চমক হয়েছিল তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কেশব এই ধর্ম আন্দোলনটিকে স্থানীয় গণ্ডি থেকে মুক্তি দিয়ে সর্ব ভারতে ছড়িয়ে দেবার উদ্যম নিয়েছেন। সুদূর বোম্বাই শহরে গিয়ে পর্যন্ত তিনি প্রচার

করে এসেছেন এই নতুন ধর্ম মত। এখন সারা ভারতে ব্রাহ্ম সমাজের শাখার সংখ্যা পঞ্চাশ। দীক্ষিত ব্রাহ্মের সংখ্যা দু'হাজারের কিছু বেশী। যারা দীক্ষা নেয়নি এমনও অনেকে এই মুক্ত-চিন্তা ও কালোপযোগী ধর্ম-সংস্কারের প্রতি আকৃষ্ট।

পারিবারিক বাধা অগ্রাহ্য করে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্যে মাঘ উৎসবে যোগ দিয়েছেন কেশব, এই উপলক্ষে চিরকালের মতন গৃহত্যাগ করতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। তখন দেবেন্দ্রবাবুর সনির্বন্ধ অনুরোধে সস্ত্রীক তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। সকলের এমন আন্তরিক, আপন-করা ব্যবহার যে, এ যে পরের বাড়িতে বাস, তা একদিনের তরেও বোঝা যায় নি। কেশবের স্ত্রী জগন্মোহিনীর কী-ই বা বয়েস। এর আগে কখনো সে থাকে নি কোনো অনাত্মীয়ের গৃহে। কিন্তু দেবেন্দ্রবাবুর কন্যা ও পুত্রবধূরা তাকে একেবারে নিজেদের মধ্যে মিশিয়ে নিয়েছিলেন। সকলে মিলে অন্দরমহলে কত আনন্দ-ফূর্তি। জগন্মোহিনীর তবু মন কেমন করে তার একেবারে ছোট ভাইটির জন্য। সে দুঃখও তিনি ভুলে যান দেবেন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র রবিকে দেখে। রবির মুখে সদ্য আধো আধো বোল ফুটেছে, জগন্মোহিনী প্রায়ই তাকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। রবির বড় ভাই সোম আর দেবেন্দ্রবাবুর এক নাতি সত্যও তার পায়ে পায়ে ঘোরে, এই শিশুরা তাঁকে "মাচি" বলে ডাকে।

কিছুদিন ঠাকুরবাড়িতে থাকার পর কেশবের শরীরে একটি বিষম ফোঁড়া হলো। কার্বঙ্কল জাতীয়। দেবেন্দ্রবাবু খ্যাতনামা চিকিৎসকদের ডাকিয়ে চিকিৎসার কোনো ত্রুটি রাখলেন না। তবু বেশ কিছুকাল শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন কেশব। তখন কেশবের আত্মীয়-স্বজন অনুতপ্ত হয়ে কাকুতি-মিনতি করে আবার কেশব ও জগন্মোহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল কলুটোলার বাড়িতে।

সেরে ওঠবার পর কেশব আবার বিপুল বিক্রমে লাগলেন ব্রাহ্ম সমাজের কাজে।

প্রথম যৌবনে বিষয়-কার্যের প্রতি দেবেন্দ্রবাবুর মনে একটা খুব বিরাগের ভাব ছিল। তাঁর মনে হতো, নিত্য তিরিশ দিন অর্থ সম্পদের চিন্তা মানুষের নৈতিক উন্নতি ও ধর্ম সাধনার অন্তরায়। বিশেষত তাঁর পিতা অত্যন্ত বৈষয়িক বিলাস-আড়ম্বরপ্রিয় এবং ভোগী দ্বারকানাথকে দেখেই দেবেন্দ্রবাবু তার বিপরীতমুখী হয়েছিলেন। প্রায়ই সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সুদূর, নির্জন শৈলশিখরে সুমহান প্রকৃতির সান্নিধ্যে গিয়ে তিনি বেশী সান্ত্বনা পেতেন।

কিন্তু এখন তিনি মধ্যবয়স্ক এবং একটি সুবৃহৎ পরিবারের অধিপতি। সাংসারিক ব্যয় বিপুল তো বটেই, তা ছাড়া ব্রাহ্ম আন্দোলন পরিচালনার জন্যও তাঁকে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে হয়: তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং ইণ্ডিয়ান মিরার নামে ইংরেজি পাক্ষিকও চলে তাঁর অর্থানুকূল্যে। সুতরাং দেবেন্দ্রবাবু এই সময়ে মন দিয়েছেন জমিদারি দেখাশুনোর কাজে। পিতার ঋণ পরিশোধ করা হয়ে গেছে, জমিদারির আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্ট। এক সময় যিনি প্রায় দেউলিয়া হতে বসেছিলেন, সেই দেবেন্দ্রবাবু এখন আবার দেশের ধনী সমাজের শিরোমণি। এখন তিনি মনে করেন, পুরোপুরি সংসার ধর্ম পালন করেও ধর্মানুশীল এবং আত্মশুদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত রাখা যায়। তাঁর পরিমণ্ডলের সকল মানুষের প্রতি তাঁর ব্যবহার সহৃদয় ও উদার। মুক্তহস্তে তিনি দানশীল। কিন্তু তিনি গোষ্ঠীপতি। সকলকে মেনে চলতে হবে তাঁর বিধান, তাঁর মুখের কথাই আদেশ। যেকোনো বিষয়ে তাঁর মতই চরম, মত পার্থক্যের কোনো স্থান নেই। আসলে তো তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে পৈতৃক রক্ত!

কেশবকে খুবই পছন্দ করেন দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু একটা ব্যাপারে তাঁর খটকা লাগে। কেশব এত বাইবেল আর যীশুখ্রীষ্টের জয়গান করে কেন? এর মধ্যে যেন খ্রীষ্টানী গন্ধ আছে। সাহেব জাতি এবং খ্রীষ্টানী ভাবকে ঘোর অপছন্দ করেন দেবেন্দ্রনাথ। ইংরেজ রাজপুরুষদের সংস্পর্শেও তিনি পারতপক্ষেও যেতে চান না। ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর বিরাগ নেই। তিনি ফার্সী শিক্ষা করেছেন, সূফী তত্ত্বের প্রতি তাঁর ঝোঁক আছে। তবে তাঁর ব্রাহ্ম ধর্মকে তিনি হিন্দু ধর্মেরই পরিশীলিত অঙ্গ মনে করেন, পৌত্তলিকতা যেমন হিন্দু সমাজ ছেয়ে ফেলেছে, সেই রকম একেশ্বরবাদও তো হিন্দু দর্শনের প্রধান কথা, সুতরাং একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মরা হিন্দু ধর্মেরই সংস্কারক। সেই জন্যই পুরুষানুক্রমে প্রচলিত হিন্দু সমাজের পারিবারিক আচার-ব্যবহারগুলি পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। তিনি বিপ্লব পছন্দ করেন না। তিনি ধীরে ধীরে সব কিছু পরিবর্তনের পক্ষপাতী।

কিন্তু তরুণ কেশবের হৃদয় আরও অনেক বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষী। দেবেন্দ্রবাবুর ব্রাহ্মধর্ম শুধু বাঙালী

উচ্চ বর্ণের হিন্দুর ধর্ম, কিন্তু কেশব মনে করছেন, তিনি সারা ভারতবর্ষ, এমন কি সারা পৃথিবীর জন্য এক নতুন ধর্মমতের প্রচারক। শুধু বাইবেল নয়, কোরান আবেস্তাও তিনি পাঠ করেন নিয়মিত। তাঁর মতে, পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলিতে যে সব পৃথক বিধান আছে, তা আংশিক সত্য, কোনোটাই পূর্ণ সত্য নয়। অতএব এই সব ধর্মের আংশিক সত্যগুলি মেলাতে পারলেই হবে পৃথিবীর সব মানুষের উপযোগী এক আদর্শ ধর্ম এবং ব্রাহ্মরা গ্রহণ করবে সেই দায়িত্ব।

কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু আর কেশবের মধ্যে বিভেদটা শুধু তাত্ত্বিক নয়, ভেতরে ভেতরে বিচ্ছেদ ধূমায়িত হতে শুরু করেছে কিছুদিন ধরেই। তরুণ বয়সী ব্রাহ্মরা সকলেই কেশবের চ্যালা, তারা নিত্য নতুন এক একটা ব্যাপার নিয়ে মেতে আছে। কেশব যেন ম্যাসিডোনিয়ার সেই তরুণ রাজকুমার, মুষ্টিমেয় একটি দল নিয়ে যে দুনিয়া জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু যে-হেতু বহু শতাব্দী যাবৎ পরাধীন, যুদ্ধবিমুখ, হিন্দুর সন্তান এই কেশব, তাই তলোয়ার নয়, জিহ্বাই তাঁর অস্ত্র।

পৈতেধারী আচার্যদের ব্রাহ্মসমাজ থেকে একেবারে বিদায় করে দেবার জন্য কেশবরা তৎপর। ব্রাহ্মধর্মে জাতিভেদ নেই, শুধু দ্বিজের ঐ চিহ্ন থাকবে কেন ? কেশবদের দৃষ্টান্তে দেবেন্দ্রবাবু নিজে উপবীত ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু যে-সব ব্রাহ্মণ আচার্যরা ব্রাহ্ম সমাজের একেবারে পত্তনের সময় থেকে আছেন, তাঁদের তিনি সমাজ থেকে সরিয়ে দিতে চান না। লোকাচারের জন্য কিংবা পারিবারিক গণ্ডগোল এড়াবার জন্য যদি তাঁরা পৈতেটা রাখতে চান তো রাখুন না ! কেশবরা উদ্যোগ নিয়ে ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের মধ্যে বিবাহ ঘটাচ্ছেন, এটাই দেবেন্দ্রবাবুর মোটেই পছন্দ নয়। এমন কি বিধবা বিবাহ ব্যাপারটাকেও তিনি মনের খুব গভীরে সায় দিতে পারেন না।

কেশবের উৎসাহদাতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নামে আর এক তরুণ। মেডিক্যাল কলেজের এই প্রাক্তন ছাত্রটি বাঘ-আঁচড়া নামে এক গ্রামে গিয়ে দারুণ বিক্রমের সঙ্গে প্রচারের কাজ করছেন ! বিজয়কৃষ্ণের মতামত যেন কেশবের চেয়ে উগ্র ! পৈতেধারী আচার্যদের ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার বেদী থেকে না সরালে যেন তাঁর কিছুতেই স্বস্তি নেই। শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রবাবু রাজি হলেন ওঁদের কথায়।

তারপর এলো সেই ঝড়।

ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব গৃহের ভগ্নদশা, কিন্তু সেজন্য তো প্রতি বুধবারের উপাসনা বন্ধ রাখা যায় না ! তত্ত্ববোধিনীতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো যে যতদিন না সে গৃহের সংস্কার হয়, ততদিন সমাজের উপাসনা হবে জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে।

নির্দিষ্ট সময়ে কেশবের দলবল সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, উপাসনা এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে, আর আচার্যের বেদীতে বসে আছেন অযোধ্যানাথ পাকড়াশী। আর যায় কোথায় ! এই পাকড়াশী মশাই শুধু যে পৈতেধারী তাই-ই নয়, একবার রটেছিল যে তিনি উপবীত ত্যাগ করেছেন, পরে আবার তিনি জানালেন যে না তিনি পৈতে ছাড়তে রাজি নন। সেই লোক আচার্য ? অথচ কথা ছিল আজ বিজয়কৃষ্ণ এবং কমলাকান্ত আচার্য হবেন।

উপাসনার মাঝখানেই ছোকরারা উত্তেজিতভাবে গোলযোগ শুরু করে দিল। দেবেন্দ্রবাবু এভাবে কথার খেলাপ করলেন কেন।

দেবেন্দ্রবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এটা তো ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান নয়, এটা তাঁর নিজের বাড়ি। এখানে তাঁর ইচ্ছে মতন অনুষ্ঠান পরিচালনার অধিকার তাঁর আছে।

নবীনরা বললো, মোটেই না। সকলের সম্মতি নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার স্থান বদল হয়েছে। সে স্থানটি যার বাড়িতেই হোক, সেখানে ব্রাহ্মসমাজের বিধি মতই সব কিছু চলতে হবে।

দেবেন্দ্রবাবু তখনও দু'দলের মধ্যে আপোস করবার জন্য বললেন যে, তা হলে এক কাজ করা যাক, না। পাকড়াশী মশাই বসেছেন বসুন, তাঁর পাশে আর একজন পৈতে ত্যাগী আচার্য আসন নিন। তা হলে আর কারুর কিছু বলার থাকে না। বিজয়কৃষ্ণই হতে পারেন দ্বিতীয় আচার্য।

কিন্তু তরুণদল তা মানতে মোটেও রাজি নয়। আপোস কিসের ? প্রাণটা তো আদর্শের। একই সঙ্গে পৈতে পরে ব্রাহ্মণ সেজে থাকা, আবার জাতিভেদহীন ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী, এ আবার কী রকম কথা।

বাইরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বিজয়কৃষ্ণ চিৎকার করে বলতে লাগলেন, দেবেন্দ্রবাবু কি পোপ নাকি যে

তাঁর ইচ্ছে অনিচ্ছে অনুযায়ী আমাদের চলতে হবে ?

এবার কঠোর হলেন দেবেন্দ্রবাবু। হ্যাঁ, তাঁর নির্দেশই চূড়ান্ত। পাকড়াশী মশাইকে তিনি আচার্যের বেদী থেকে নেমে আসতে বলতে পারবেন না। যার ইচ্ছে হয় এই উপাসনায় যোগ দিক, যার ইচ্ছে হয় চলে যাক।

সদলবলে কেশব-বিজয়কৃষ্ণরা চলে গেলেন সেই উপাসনা সভা ছেড়ে। অন্য এক ব্রাহ্ম বন্ধুর বাড়ির ছাদে গিয়ে বসলেন তাঁরা।

যেন স্বপ্নাদেশ পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ তরুণ কেশবকে আর সব প্রবীণ ব্রাহ্মদের ডিঙ্গিয়ে সমাজের আচার্য পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, বস্তুত কেশবের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন সমাজের ভার, আজ দেখা গেল সেই স্বপ্ন ভ্রান্ত। ব্রাহ্মসমাজের ভবন এবং যাবতীয় সম্পত্তির যে ট্রাস্টি বোর্ড ছিল তা থেকে কেশব এবং অন্যদের তিনি সরিয়ে দিলেন কলমের এক খোঁচায়। ওঁদের কারুকে তাঁর দরকার নেই। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রকে করলেন ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক সেই অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এবং নিজের হাতে রাখলেন সর্বময় কর্তৃত্ব !

দেবেন্দ্রনাথের এই ব্যবহারে তরুণরা প্রথমে একেবারে হতবাক্। ব্রাহ্মসমাজের সব সম্পত্তি কি দেবেন্দ্রবাবুর নিজের নাকি ? তিনিই বেশী টাকা-পয়সা দিয়েছেন বটে, কিন্তু এখন তো তা একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠানের অধীনে এবং ব্রাহ্মসমাজের কনস্টিটিউশনও আছে। সে সব অগ্রাহ্য করে দেবেন্দ্রবাবু নিজস্ব হুকুম জারি করলেন। এ যে স্বৈরাচার ! রামমোহন রায়ের এই মত ছিল না যে ব্রাহ্মসমাজ ভবনে সব ধর্মের লোকেরই উপাসনার অধিকার থাকবে ?

ব্রাহ্মসমাজ ভঙ্গ হয়ে যদি দুটি টুকরোই হয়, তা হলে ট্রাস্টের বিষয়ও ভাগ হওয়া উচিত। এমন মনে করলেন কেশব এবং তাঁর সমর্থকরা। কিন্তু সে সব কিছুই হলো না। ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন কেশব, সে পত্রিকায়ও রাতারাতি অন্য সম্পাদক নিযুক্ত করা হলো। এতটা কেশব কিছুতেই মানতে রাজি নন। যিনি আর্থিক সাহায্য করেন, পত্রিকার ওপরে কি শুধু তাঁরই অধিকার ? আর যে সম্পাদক পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ পত্রিকাটি বার করছেন, তিনি কেউ না ? কেশবের লেখনী গুণেই মিরর-এর খ্যাতি।

কেশব ঠিক করলেন, যদি মিরর নামে দুটি পত্রিকা বেরোয়, তাতেও ক্ষতি নেই, তবু তিনি মিররের সম্পাদকত্ব ছাড়বেন না। পক্ষকালের মধ্যে তিনি স্বাধীনভাবে প্রকাশ করলেন মিরর-এর নতুন সংখ্যা।

নিজের নীতিতে অবিচল থাকলেও কেশবের সঙ্গে বিচ্ছেদে মনে বড় আঘাত পেলেন দেবেন্দ্রনাথ। তারুণ্যের শক্তিকে ঠিক পথে চালিত করে তাঁর অতি প্রিয় ব্রাহ্ম আন্দোলনকে উজ্জীবিত করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তরুণরা যখন তখন আঘাত দেয়। আর তারুণ্যের ধর্মই এই। প্রবীণদের চিন্তাধারা থেকে অন্তত কয়েক পা এগিয়ে থাকা. দল কার্যত দু' ভাগ হবার পর উত্তেজিত যুবকেরা তাঁর নামে নানারকম অভিযোগ, এমন কি কটু-কাটব্য করতেও ছাড়লো না। অভিজাত দেবেন্দ্রনাথ একটি প্রতিবাদও না করে নিঃশব্দ রইলেন।

কিন্তু হঠাৎ যেন নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন তিনি। যদিও তাঁর অনুগত ব্রাহ্মের সংখ্যাও কম নয়, বিদ্রোহী তরুণদের চেয়ে অনেক বেশীই হবে বোধ হয়, তবু দেবেন্দ্রনাথ আর আগেকার সেই উদ্দীপনা বোধ করেন না। এমন কি, তিনি যেন অনুভব করছেন, তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমে আসছে, শ্রবণ ক্ষমতাও ক্ষীণ হয়ে আসছে, শরীরে আর সেই জোর নেই। সাতচল্লিশ বৎসর বয়েস, এর মধ্যেই যেন তাঁর জীবনসায়াহ্ন এসে গেল।

দ্বিতলের অলিন্দে আরাম-কেদারায় তিনি চুপ করে বসে থাকেন। মনকে সব কিছুর উর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারেন না। বারবার মনে পড়ে কেশবের প্রজ্বলন্ত মুখখানি। নিজের সন্তানদের চেয়েও ওকে তিনি বেশী প্রীতি করেছিলেন। এখন কেশব দূরে গেছে, তবু তিনি কেশবের ওপর রাগ করতে পারেন না। আপন মনে বলেন, কেশব বিজয়ী হোক, ওর আত্মার প্রভায় আর সকলে আলোকিত হোক, সারা বিশ্ব কেশবকে চিনুক, জানুক।

ব্রাহ্মদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য শহরের অপর দলের বড় মানুষরা নানা রকম উপায় অবলম্বন করছেন, তার মধ্যে মোক্ষমটি হলো পশ্চিম থেকে সন্ন্যাসী আমদানী। নির্জন পর্বত-অরণ্যানী থেকে ধ্যান ভঙ্গ করে ঋষি-যোগীরা দলে দলে আসছেন কলকাতায়। এখানে ভক্তের অভাব নেই। আর চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়র অতি উত্তম ব্যবস্থা।

দু'চার গণ্ডা মোসাহেব আর দু-চারটে রক্ষিতা রাখলেই ঠিক বড় মানুষীর জাঁক হয় না, ও তো রামা ধোপা কিংবা পুঁটে তেলীরাও আজকাল রাখে। বিশেষত পূর্ববঙ্গের জমিদাররা এসে এমন ঢলাঢলি করে যে ও জিনিসের আর ইজ্জৎ রইলো না। তার চেয়ে বড় কোনো সন্ন্যাসী এনে জাঁক-জমক করলে বেশ নতুন রকমের হেঁকড় দেখানো যায়। ধর্ম রক্ষাও হলো আর পয়সার গরম দেখানোও হলো। সন্ন্যাসীকে দিয়ে পুজো-আর্চা, যাগ যজ্ঞ, কাঙালীভোজন সংকীর্তন ইত্যাদি ব্রাহ্মদের অনুষ্ঠানের তুলনায় অনেক বেশী বর্ণাঢ্য। ব্রাহ্মদের তো শুধু উপাসনা, পুরুষে-পুরুষে ভাই ভাই বলে জড়াজড়ি আর প্রেমাশ্রু বর্ষণ।

বঙ্কুবিহারীবাবুর ইদানীং বেশ কাঁচা পয়সা হয়েছে। ইনি আগে ছিলেন এক অ্যাটর্নির বাড়ির হেড কেরানী। যে-হেতু উকিল-মোক্তার-অ্যাটর্নীর বাড়ির ভূষোকালি রঙের বেড়ালটা কিংবা দাড়িওয়ালা রামছাগলটা পর্যন্ত আইনের প্যাঁচ-ঘোঁচ শিখে যায় সেই সুবাদে বঙ্কুবিহারীবাবুও ক্রমে মস্ত আইনবিদ হলেন এবং পাড়াগেঁয়ে বড়লোকদের উচিত মতন শলা-পরামর্শ দিয়ে নিজে ফুলে-ফেঁপে তারকেশ্বরের কুমড়োপানা রূপ ধারণ করলেন। মধ্য বয়েসে এসে তাঁর হঠাৎ উপলব্ধি হলো পয়সা তো যথেষ্ট রোজগার কল্লুম, এবার একটু নাম কেনা যাক। ধরা-বাঁধা পথে কিছুদিন রাঁঢ়-ভাঁড়-মদে প্রচুর পয়সা উড়িয়েও এক সময় তাঁর একঘেয়ে লাগলো। সে রকম যেন ঠিক নাম হয় না। বস্তুত ছেলেবেলা থেকেই তাঁর একটি আড়ালের নাম আছে। তিনি সেটা জানেনও, কিন্তু সেটা ঘোচাতে পারছেন না কিছুতেই। বাল্যকালে তিনি দৈবাৎ একবার পাতকুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন, তাতে তাঁর নাকের একটি দিক থেঁৎলে যায়। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে যায় নাককাটা বঙ্কু। তারপর বড় হয়ে তিনি যে এত কীর্তি করলেন, তবু লোকে তাঁকে আড়ালে আবডালে ঐ নাককাটা বঙ্কু বলেই ডাকে।

কিছুদিনের জন্য সিমলেয় বেড়াতে গিয়ে বঙ্কুবিহারীবাবু এক সন্ন্যাসী ধরে আনলেন। সে এক জবরদস্ত সন্ন্যাসী বটে, দেখলে মনে হয় বয়েসের গাছ-পাথর নেই। চলমান পাহাড়ের মতন দেহ, আর পা থেকে মাথা পর্যন্ত এত চুল যে কোনো মানুষের থাকতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ইনি কথা বলেন না। খোরাকী অবশ্য একটি প্রমাণ আকারের হস্তীর সমতুল্য। দশ জন চ্যালা সমেত সেই সন্ন্যাসী কাঁসাড়ীপাড়ায় বঙ্কুবিহারীবাবুর বাড়িতে অধিষ্ঠিত হলেন।

দিনে দিনে সেই সন্ন্যাসীর সুনাম এমনই ছড়িয়ে পড়লো যে কাঁসারীপাড়ায় সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ভিড়ে ভিড়াক্কার। এ অঞ্চলের বিখ্যাত সঙযাত্রার সময়ও বুঝি এত মানুষের জমায়েত হয় না। সন্ন্যাসী এক একদিন এক এক রকম কীর্তি দেখিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। ক্রমে এমন কথাও রটে গেল যে এই সন্ন্যাসী লোহাকে সোনা বানাতে পারেন এবং উপযুক্ত তিথির জন্য অপেক্ষা করছেন। সন্ন্যাসীর শিষ্যদের এই দাবি এক কথায় নস্যাৎ করা যায় না। কারণ মদ্যকে দুগ্ধে পরিণত করেছেন তিনি সর্ব সমক্ষেই। এক কোপে বলি দেওয়া হলো একটি পাঁঠাকে, তারপর সন্ন্যাসী তার শরীরে কয়েকবার হাত বুলিয়ে দিতেই সেই পাঁঠা অমনি জীবন্ত হয়ে লাফাতে লাফাতে ব্যা ব্যা করতে লাগলো।

সন্ন্যাসীর খ্যাতি মানে তো বঙ্কুবিহারীবাবুরও সুনাম। তিনি ভাড়াটে লোক দিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সন্ন্যাসীর কৃতিত্বের কথা প্রচার করতে লাগলেন সারা-শহরময়। ব্রাহ্মদের ওপর বঙ্কুবিহারীবাবুর বড় রাগ, কেন রাগ তা তিনি নিজেই সঠিক জানেন না, তবু রাগ এবং সেই জন্য খ্যাতনামা ব্রাহ্মদের বাড়ির

সামনেও তিনি ঢাক-ঢোলওয়ালাদের পাঠালেন বেশী করে। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তিনি চিঠি দিয়ে আহ্বান করলেন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে যাবার জন্য যে এখনো সনাতন বৈদিক ধর্মের কত মহিমা! মন্ত্রশক্তির কত জোর! অবিশ্বাসীরা হেঁট মুণ্ডে ফিরে যাক।

সত্যিই যেন সন্ন্যাসীর চমকপ্রদ অলৌকিক শক্তি দেখে অনেকের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে।

কৌতূহলী নবীনকুমার একদিন এলো কাঁসারীপাড়ায়। প্রথমে সে ভেবেছিল বুঝি ভিড় ঠেলে ঢুকতেই পারবে না। দুলাল একটু ধাক্কাধাক্কি শুরু করেছিল বটে. কিন্তু সামনে যেন পরপর অনেকগুলি স্তরের মনুষ্য-প্রাচীর। কিন্তু একটু পরেই অন্যরূপ ব্যাপার হলো। কিছু লোক তাকে চিনতে পেরে বলে উঠলো, ওরে, নবীনকুমার সিংহ এয়েচেন, পথ ছেড়ে দে! পথ ছেড়ে দে! আবার অন্য কয়েকজন লোক বললো. কই, নবীন সিংগী কই, দেকি দেকি!

ভিড় দু ফাঁক হয়ে গিয়ে উদ্‌গ্রীবভাবে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। সন্ন্যাসীর তুলনায় নবীনকুমারও কম দর্শনীয় নয়।

নবীনকুমার যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি তা সব সময় তার নিজের মনে থাকে না। তার মনের মধ্যে একটি বিস্ময় ও রগড়-সন্ধানী বালক আছে, যে মন নিয়ে সে হুতোমপ্যাঁচার নক্সা লেখে, সেই মন নিয়েই সে এখানে এসেছে। কিন্তু লোকচক্ষে সে প্রখ্যাত দাতা, মহাভারতের অনুবাদক, হিন্দু পেট্রিয়টের মালিক ইত্যাদি. এবং বিপুল ধনী তো বটেই! এ ব্যাপারে সজাগ হতেই সে মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলে ধীর পদক্ষেপে ভিতরে চলে এলো।

নাককাটা বঙ্কু ওরফে বঙ্কুবিহারীর সাজসজ্জা দেখবার মতন! পরনে "বেঁচে থাকুক বিদ্যেসাগর চিরজীবী হয়ে" পাড়ের শান্তিপুরী ধুতি, লাল গজের পিরাণ, তার ওপরে ডুরে উড়নি, মস্তকে জড়িয়ে কাবলি তাজ এবং হাতে একটি লাল রঙের রুমাল। যাতে রিং সমেত গুটি কতক চাবি বাঁধা। তিনি খুব খাতির করে প্রথম দফায় নবীনকুমারের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন কয়েক বার। তারপর একখিলি পান দিয়ে নিয়ে এলেন ঠাকুর-দালানে। একদিকে চ্যালা পরিবৃত হয়ে বসে আছেন সন্ন্যাসী। মাঝখানে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচাবার জন্য কিছুটা স্থান বাদ রেখে তারপর পাতা হয়েছে বিশিষ্ট দর্শকদের জন্য গালিচা। সেখানে এক পাশে বসলো নবীনকুমার। আশেপাশে অনেক চেনা মুখ।

এই সব সম্ভ্রান্ত দর্শকরা প্রত্যেকে ইচ্ছে করলে দুটি প্রশ্ন করতে পারবেন সন্ন্যাসীকে। সরাসরি কথা বলবার অবশ্য উপায় নেই। বঙ্কুবিহারীবাবুর বিশেষ সুহৃদ চূড়ামণি রায় উত্তম হিন্দী জানেন বলে দাবি করেন, প্রশ্নটি শুনে তিনি সেটি হিন্দী অনুবাদ করে বলবেন সন্ন্যাসীর এক চ্যালাকে, চ্যালা আবার সেটি দুর্বোধ্যতর হিন্দী করে শোনাবেন গুরুকে। মৌনী সন্ন্যাসী দু-চারবার মাথা নাড়বেন শুধু। সেই মস্তক সঞ্চালনের ভাষা আবার হিন্দীতে অনূদিত হয়ে প্রশ্নকারীর কাছে উত্তর হয়ে ফিরে আসবে।

বঙ্কুবিহারী নবীনকুমারকে বললেন, সিংহমোয়াই, আপনি ভাবুন তা হলে, দু-খানা কোয়েশ্চেন ভাবুন!

নবীনকুমারের পাশেই বসে আছেন সিমলের জগমোহন সরকার। দাঁত সব পড়ে গেছে। ফোকলা মুখ, মাথায় ইন্দ্রলুপ্ত, গোঁফজোড়া পাকা, সেই আগের মানুষটিকে আর চেনাই যায় না। ইদানীং তিনি খুব বৈষ্ণব হয়েছেন, যে-কোনো নারীকেই মা বলে সম্বোধন করেন। এমন কি কখনো কখনো নিজের পত্নীকেও মা বলে ফেলেন।

সেই জগমোহন সরকার হেঁকে বললেন, আহা, যোগিবর যেন সাক্ষাৎ বেদব্যাস। বাবা আমার মনের দুটি সংশয় দূর করুন। কোন্ সাধনায় জীবাত্মা মিশে যায় পরমাত্মার সহিত? যাতে আর পরজন্ম থাকে না! আর, পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের মধ্য দিয়েই কি পরমেশ্বর এই জগতে লীলা করেন?

চূড়ামণির মারফত ঘুরে সেই প্রশ্ন গিয়ে পৌঁছোলো সন্ন্যাসীর কাছে। সন্ন্যাসী আঙুল তুলে বাতাসের গায়ে কী সব অদৃশ্য লিপি লিখতে লাগলেন। একজন শিষ্য সেদিকে চেয়ে রইলো একদৃষ্টে। তারপর সে উত্তরটি জানালো। এমনই দুর্বোধ্য ও জটিল উত্তর যে অনেকেরই তা বোধগম্য হলো না। না বুঝলেই আরও ভক্তি বাড়ে। সাধারণ মানুষ তো নন যে সাধারণ ভাষায় কথা বলবেন।

এই রকম চলতে লাগলো আরও প্রশ্নোত্তর। এর মধ্যে দু-একটি প্রশ্নের উত্তর শুনে হাস্যরোলও ওঠে। যেমন সীতাপতি রায় জিজ্ঞেস করলো, প্রভু, আপনি বলে দিন, আমার আয়ু আর কতদিন? এর উত্তরে সন্ন্যাসী জানালেন, তুমি তো ইতিমধ্যেই মরে গেছো! জানো না, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কী বলেছিলেন?

ভিড়ের মধ্যে একটি থামের পাশে দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রনাথ তার সাগরেদকে নিয়ে। কদিন ধরেই

নিয়মিত আসছে সে। তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে সন্ন্যাসীর ক্রিয়াকলাপ দেখে এ পর্যন্ত সে একটিও কথা বলেনি। সাগরেদটি ছটফট করলেও সে তার কাঁধ জোর করে ধরে রাখে।

নবীনকুমার কোনো প্রশ্ন করলো না। তবে দেখে শুনে তার তাক লেগে যাচ্ছে ঠিকই। তার মনে পড়লো, কৈশোর বয়সে, কলেজ-জীবনে সে ভূকৈলাশের রাজবাড়িতে এক মহাপুরুষ দর্শন করতে গিয়েছিল, যিনি সত্যযুগের মানুষ, গায়ে উইয়ের ঢিপি। কিছুদিন পরেই ধরা পড়ে গিয়েছিল তার বুজরুকি। কিন্তু এ সন্ন্যাসীকে তো সেরূপ মনে হয় না। এমন ক্ষমতা তিনি প্রদর্শন করছেন যা ব্যাখ্যার অতীত। একজন কেউ ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতেই তিনি শুধু খালি হাতটি তুললেন তার দিকে। অমনি সেই লোকটির গায়ের ওপর একটি গাঁদা ফুল এসে পড়লো। একটি বিড়াল হঠাৎ ঢুকে পড়েছিল এর মধ্যে। তার পর এত লোক দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এদিক ওদিক ছুটতে গিয়ে সোজা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো সন্ন্যাসীর কোলে। সকলে হা হা করে উঠলো কিন্তু সন্ন্যাসী সকলকে শান্ত হবার ইঙ্গিত করে বিড়ালটির গায়ে কয়েকবার হাতের স্পর্শ দিতেই সেটি একটি পারাবত হয়ে উড়ে গেল ডানা ঝটপটিয়ে। সকলে একেবারে তাজ্জব। এ জিনিস কেউ কখনো দেখেনি।

জগমোহন সরকার নবীনকুমারের গায়ে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, ভায়া, আমার তো কোটা ফুইরে গ্যাচে, তবু আরও কিছু জিজ্ঞেস কত্তে সাধ হচ্ছে। আপনি দুটো কোয়েশ্চেন আস্ক করুন না!

কিন্তু কী প্রশ্ন করবে, তা নবীনকুমারের মনে আসছে না। তার কোনো ধর্ম সংশয় নেই, জীবাত্মা-পরমাত্মার মতন ব্যাপারগুলি সম্পর্কেও সে কোনো মাথাব্যথা বোধ করে না। সে শুধু দেখতে এসেছে।

জগমোহন সরকার বললেন, আপনি শুধোন যে, ঈশ্বর যে সর্বত্র উপস্থিত, তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভব?

নবীনকুমার লজ্জা পাচ্ছে দেখে তিনি নিজেই হেঁকে বললেন, নবীন সিংহী মশাই জানতে চাইচেন...।

চূড়ামণি ও শিষ্য মারফত এই প্রশ্ন সন্ন্যাসীর কাছে পৌঁছোবার পর তিনি মস্তক আন্দোলন করলেন না কিংবা বাতাসে অদৃশ্য লিপিও লিখলেন না। সামনের একটি ঘটের দিকে স্থির নেত্রে চেয়ে রইলেন।

দু-তিনজন শিষ্য তখন এক যোগে জানালো যে সকলকে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে ঐ ঘটের দিকে চেয়ে থাকতে হবে। কেউ যেন কোনো শব্দ না করে।

ঘটটি সন্ন্যাসীর থেকে দু-তিন হাত দূরে। তার ওপরে অনেকগুলি জবা ফুল। পাশে একটি পেতলের পরাতের ওপর শালগ্রাম শিলা। সন্ন্যাসী নিথর হয়ে চেয়ে আছেন ঘটটির দিকে।

হঠাৎ সেই ঘটের চূড়া থেকে একটি জবা ফুল লাফিয়ে উঠে এসে পড়লো শালগ্রাম শিলার মাথায়।

একসঙ্গে সকলের কণ্ঠ থেকে দারুণ বিস্ময়ের গুঞ্জন বেরিয়ে এলো। নবীনকুমার যেন নিজের চক্ষুকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যিই যেন একটি কড়কটো ব্যাঙের মতন ফুলটি জীবন্ত হয়ে লম্ফ দিয়ে উঠলো। এও কি সম্ভব?

তারপরের কাণ্ডটি আরও যেন অলৌকিক। বঙ্কুবিহারীবাবু এই সময় একটি মদের বোতল এনে উপস্থিত করলেন। যারা আগে দু-একদিন এসেছে, তারা জানে এবার মদ্যকে দুগ্ধে পরিণত করবেন সন্ন্যাসী। জিনিসটা যে সত্যিই মদ, তার মধ্যে কোনো কারচুপি নেই, সেটা প্রমাণ করবার জন্য একটি নতুন মাটির সরায় বোতলের সবটুকু মদ ঢেলে দেওয়া হলো, ঘর আমোদিত হয়ে গেল পরিচিত সুরার গন্ধে। কিছু কিছু দর্শকের মন আনচান করে উঠলো।

তারপর একজন শিষ্য জিজ্ঞেস করলো, গুরুজী, এ কটোরেমে ক্যা হ্যায়?

গুরুজী কিছু না বলে এক কুশি জল ঢেলে দিলেন সেই সরায়, অমনি সেই তরল পদার্থ দুগ্ধধবল হয়ে গেল।

আবার সকলের সেই বিস্ময়ধ্বনি। নবীনকুমার ভাবলো, এই ভেল্কির সঙ্গে ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রত্যক্ষ প্রমাণের কী সম্পর্ক আছে তা বোঝা গেল না বটে, কিন্তু মদ্য যে দুগ্ধে পরিণত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই ক্রিয়াকাণ্ডটির ঠিক আগে চন্দ্রনাথ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সেও কয়েকদিন ধরে এসে এই ব্যাপারটি দেখেছে। সকলে দুধ দুধ বলে চেঁচিয়ে উঠতেই সে এবার তার সাগরেদকে ঠেলে দিয়ে বললো, যাঃ!

বাঁটকুল সাগরেদটি ছুটে গেল দুধের সরাটির দিকে। দুজন শিষ্য হা হা করে উঠে তাকে ধরে ফেলতেই সে নাকি নাকি আদুরে গলায় বললো, আঁমি দুঁধ খাঁবো, আঁমি ঐ দুঁধ খাঁবো!

বঙ্কুবিহারী বললেন, আরে মোলো, এ ছোঁড়া আবার এলো কোথ্ থেকে! যা, যা, দূর হ্ আপদ!

সুলতান আবার আবদার ধরলো ঐ দুধ খাবার জন্য।

তখন জনতার মধ্য থেকে দু-একজন বললো, মোশাই, মদ যখন দুধ হয়েই গ্যাচে, তখন ও ছোঁড়াকে একটু চেখে দেকতে দিন না!

শিষ্যরা প্রবলভাবে আপত্তি জানাতে লাগলো তাতে।

চন্দ্রনাথ কয়েক পা এগিয়ে এসে বললো, না মশাইরা, ঐ বাচ্চা ছেলেকে ও জিনিস পান করানো ঠিক হবে না। রং বদলালেও ওটা মদই রয়েছে, যে-কেউ জিব ছুঁইয়ে দেকতে পারেন।

পেছন থেকে একজন গর্জে উঠলো, ঠিক বলেচেন মশাই! মদ কখনো দুধ হয় না। আমরা খবর নিয়ে জেনেচি, আমেরিকান রাম, মার্কিন আনীশ নামের মদে জল দেবা মাত্তর দুধের মতন সাদা হয়ে যায়। ওতে বাহাদুরি কিছু নেই।

এই বক্তা একজন মেডিক্যাল কলেজের তরুণ ছাত্র। ভিড় ঠেলে সেও এগিয়ে এলো সামনে।

চন্দ্রনাথ মদের সরাটি তুলে ধরে বললো, যে-কেউ খেয়ে দেকুন, এটা ঐ আমেরিকান মদ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি আর একটা কতা বলচি। ঐ সন্ন্যেসীর আলখাল্লার ভেতর থেকে আমি যদি একটা মরা বেড়াল বার করতে না পারি তাহলে আপনারা আমাকে পঞ্চাশ ঘা জুতো মারবেন!

গুপী স্যাকরার বাড়িতে জ্যান্ত ভূতদের যা অবস্থা হয়েছিল, এবার সন্ন্যাসী আর তার চ্যালাদেরও সেরকম হল, বহুলোক ঝাঁপিয়ে পড়ে একেবারে তছনছ করে দিল তাদের। সত্যিই সন্ন্যাসীর কম্বলের তলা থেকে বেরুলো মড়া বেড়ালটি। কী অসীম শক্তি ঐ লোকটির, বেড়ালটিকে অতি দ্রুত এমনভাবে গলা মুচড়ে মেরেছে যে সে টুঁ শব্দটি করতে পারেনি। দুর্গন্ধযুক্ত একটি কাটা ছাগলও পাওয়া গেল। আর চন্দ্রনাথের বাঁটকুল সাগরেদটি শূন্যে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে এলো সেই লম্ফমান জবাফুলটি। সেটার বোঁটায় একটি ঘোড়ার লেজের বালামচি বাঁধা। ঐ বালামচির অন্যদিক যুক্ত ছিল সন্ন্যাসীর পায়ের অঙ্গুলিতে।

জনতার হুড়োহুড়ি এড়িয়ে নবীনকুমার দাঁড়িয়ে ছিল দ্বারের এক পাশে। সাগরেদ সমেত চন্দ্রনাথকে বেরুতে দেখে সে বললো, মশায়, একটু দাঁড়াবেন কি? মশায়ের নাম জানতে পারি?

বক্র চোখে নবীনকুমারের দিকে চেয়ে চন্দ্রনাথ বললো, আমার নাম সম্পর্কে আপনার কৌতূহলের কারণ জানতে পারি কি আগে?

নবীনকুমার সহাস্যে বললো, আপনাকে আমার বেশ পচন্দ হয়েচে। আমি এই ধাতের মানুষ ভালোবাসি। আপনি আমার সঙ্গে চলুন।

নবীনকুমার তার প্রীতিপূর্ণ দক্ষিণ হস্ত বাড়িয়ে দিল চন্দ্রনাথের দিকে।

শীতের প্রারম্ভে বৃক্ষ থেকে খসে পড়া পাতার মতন অনবরত চিঠি আসছে মধুসূদনের কাছ থেকে। বিদ্যাসাগরকেই এখন একমাত্র অবলম্বন করেছেন মধুসূদন, প্রবাসে গ্রহ-বৈগুণ্যে বিষম দারিদ্র্য ও অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে তিনি বুঝেছেন, ঐ জেদী ব্রাহ্মণটি শুধু বিদ্যার সাগর নন, করুণাসাগরও বটে। আর যাঁদের তিনি বন্ধু বলে মনে করেছিলেন, তাঁরা সবাই বিমুখ করেছেন, একমাত্র বিদ্যাসাগরের কাছ থেকেই সাহায্য এসেছে বিনা শর্তে। রাজা দিগম্বর মিত্র মধুসূদনের বাল্য সুহৃদ, দেশের বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে মধুসূদন তাঁর ওপরেই নির্ভর করেছিলেন সবচেয়ে বেশী, সেই দিগম্বর মিত্রই তাঁর সর্বনাশের পথ সুগম করেছেন। অর্থ প্রেরণ করা তো দূরের কথা, একটা চিঠিরও উত্তর দেন না। অথচ এই রাজা দিগম্বর মিত্রকেই তিনি মেঘনাদবধ কাব্য উৎসর্গ করেছেন!

স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে দেশে রেখে একাই লণ্ডনে পাড়ি দিয়েছিলেন মধুসূদন। হেনরিয়েটার সংসারের ভরণপোষণের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করে দিয়ে গিয়েছিলেন সম্পত্তির পত্তনীদারদের কাছে, তারা সে অর্থ নিয়মিত দেয় না। তাই নিরুপায় হয়ে হেনরিয়েটা পুত্র-কন্যাকে নিয়ে চলে গেলেন লণ্ডনে। বিপদ তাতে বৃদ্ধি পেল শতগুণ। মধুসূদনের ব্যারিস্টারি পড়ার ব্যয় ছাড়াও এত বড় একটি সংসার চালানো একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়লো। নিতান্ত খাদ্যচিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তার অবকাশ রইলো না। ইংলণ্ডের তুলনায় ফরাসী দেশে জীবনধারণ-ব্যয় কিঞ্চিৎ কম বলে মধুসূদন সদলবলে চলে এলেন প্যারিসে। কিন্তু যখন হাতে একটি মুদ্রাও থাকে না, তখন কোন্ দ্রব্যের মূল্য কত সে বিচারে লাভ কী ? অবস্থা পৌঁছলো একেবারে চরমে। শিশু পুত্র-কন্যা অনাহারের কষ্টে রোদন করে, পিতা হয়ে মধুসূদনকে তা দর্শন করতে হয়। রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র, মুখে সোনার চামচ নিয়ে যাঁর জন্ম, যিনি যৌবনে-কৈশোরে খোলামকুচির মতন দু হাতে মুদ্রা ছড়িয়েছেন, আজ তাঁর নিজ সন্তান-সন্ততির এই দশা ! যদিও দেশে তাঁর যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, সুন্দরবনের এক আবাদ থেকেই বার্ষিক আয় দশ সহস্র মুদ্রা, শুধু স্বদেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতায় বিদেশে তিনি মরণাপন্ন। 'দত্ত কারো ভৃত্য নয়' এই দম্ভোক্তি যাঁর মুখে সর্বদা শোনা যেত, আজ সেই তাঁকেই সামান্য ভিখারীর মতন চ্যারিটেবল সোসাইটিতে গিয়ে হাত পাততে হয়।

নিজস্ব জিনিসপত্র বিক্রয় ও বন্ধকী দিতে দিতে আর কিছুই বাকি নেই। নবীনকুমার সিংহ প্রদত্ত রৌপ্য পাত্রটি মধুসূদনের অতি প্রিয়, সেটি শেষ পর্যন্ত রেখে দিয়েছিলেন। স্বদেশে তাঁর কাব্য রচনার স্বীকৃতিতে একমাত্র সংবর্ধনা সভায় তিনি এটা পেয়েছিলেন। তবু একদিন সেটিকেও নিয়ে যেতে হলো বন্ধকী দোকানে। এর বিনিময়ে যে অর্থ পাওয়া গেল, তাতে পুত্র-কন্যাদের কয়েকদিনের দুগ্ধের খরচ সঙ্কুলান হবে।

অন্য সকলের কাছ থেকে হতাশ হয়ে তারপরই মধুসূদন সাহায্যের আবেদন করেছিলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। এমন যে অপ্রত্যাশিত ফল হবে, তিনি স্বপ্নেও আশা করেন নি। কোনো রকম জামিন ছাড়াই টাকা পাঠালেন বিদ্যাসাগর ! কলকাতায় এত সব মহা মহা ধনী ব্যক্তি, তাঁদের তুলনায় বিদ্যাসাগর কী আর ! অতি লোভনীয় সরকারী চাকুরি ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন বিদ্যাসাগর, এখন তাঁর যাবতীয় আয় শুধু গ্রন্থ বিক্রয় থেকে ! জমিদার বা ধনীরা কেউ নয়, গদ্য গ্রন্থকার বিদ্যাসাগরই শুধু সাহায্য করলেন কবি মধুসূদনকে।

কিন্তু তাতেও যে চলে না ; বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে দুই তিন সহস্র টাকা আসে, আর দু-এক মাসের মধ্যেই তা উড়ে যায়। তখন আবার কাকুতি-মিনতিপূর্ণ পত্র। এখন মধুসূদনের সমস্ত প্রতিভা নিয়োজিত হয়েছে করুণা-নিষ্কাষণী পত্র রচনায়। বিদ্যাসাগরকে খুশী করবার জন্য তিনি ইংরেজি চিঠির মধ্যে মধ্যে কয়েক ছত্র লেখেন বাংলা অক্ষরে, বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের কাব্য পছন্দ করেন বলে প্রায়ই ভারতচন্দ্রের রচনার উদ্ধৃতি দেন, ফ্রান্সের শীতের বর্ণনা দিতে গিয়ে ভারতচন্দ্রের ভাষায় বলেন, "বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী !" বিলাতি পত্র-পত্রিকায় কখন কোথায় বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হয়, সে খবরও জানান সাগ্রহে। একদিন প্যারিসের এক দোকানে দেখলেন বিদ্যাসাগরের লেখা কয়েকটি বই। দারুণ গর্ব হলো মধুসূদনের। দোকানদারকে বলেই ফেললেন, এই লেখক আমার বিশিষ্ট বন্ধু। তাই শুনে দোকানদার বললেন, নাকি, আমাদের ধারণা, এই লেখক এখন জীবিত নেই। মধুসূদন বললেন, কী সাঙ্ঘাতিক কথা ! না, না, তাঁর দেশ এবং তাঁর সুহৃদরা তাঁর বিয়োগ সহ্য করতে পারবেন না।

সনির্বন্ধ পত্র প্রেরণ করলে বিদ্যাসাগর ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে টাকা পাঠাবেনই, এরকম একটা কুসংস্কারের মতন বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়ে গেল মধুসূদনের। কিছুদিনের জন্য তিনি সপরিবারে এসে রয়েছেন ভার্সাই নগরীতে, বিদ্যাসাগর প্রেরিত অর্থ দ্রুত নিঃশেষিত হতে চলেছে, আবার সাহায্যের আবেদন করে পাঠানো হয়েছে পত্র। এক সকালে মধুসূদন কিছু পড়াশুনোর চেষ্টা করছেন, এমন সময় হেনরিয়েটা অশ্রুপূরিত নয়নে এসে বললেন, আর যে পারি না ! এভাবে আর কতদিন বেঁচে থাকতে হবে !

নতুন কী আবার হলো ? ব্যাপার অতি সামান্য, কিন্তু বড়ই মর্মভেদী। তাঁদের বাসগৃহের সন্নিকটেই ধুমধাম করে একটি বেশ বড় মেলা বসেছে। পল্লীর সব শিশুরা ছুটে চলেছে সেদিকে। তাই দেখে হেনরিয়েটার পুত্র-কন্যাও সেই মেলায় যাবার জন্য বায়না ধরেছে। অবোধ শিশু, ওদের কীভাবে নিরস্ত করা যাবে ? কিছু না ভেবেই মধুসূদন বললো, যাবে না কেন, যাক না। মেলা দেখে আসুক।

হেনরিয়েটার বিলাপ উচ্চতর হলো। তাঁর হাতে রয়েছে মাত্র তিন ফ্রাঁ, তা দিয়ে কিছু কেনাকাটা তো দূরের কথা, মেলার প্রবেশ মূল্যই যে ওর চেয়ে বেশী।

একটুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন মধুসূদন। তিনি অক্ষম পিতা, আজ প্রাতে নিজের সন্তানদের মুখে হাসি ফোটাবার মতন সাধ্য তাঁর নেই। উপায়ান্তর না দেখে তিনি বলে উঠলেন এক সময়, একটু অপেক্ষা করো, দেখো, আজই নিশ্চিত বিদ্যাসাগরের নিকট থেকে অর্থ এসে পঁহুছোবে! তিনি কি যে সে মানুষ! তাঁর প্রতিভা ও প্রজ্ঞা প্রাচীন ঋষিদের মতন, তাঁর কর্মোদ্যম ইংরেজদের মতন আর তাঁর হৃদয়খানি বাঙালী মায়ের মতন! তিনি ঠিকই বুঝবেন!

এমনই কাকতালীয় যোগাযোগ, এক ঘন্টার মধ্যেই ডাকে এলো বিদ্যাসাগরের এনভেলাপ, তার মধ্যে দেড় হাজার টাকা!

নিয়মিত বিদ্যাসাগর প্রেরিত অর্থে মধুসূদন সাংসারিক অনটন কিছুটা সামলে উঠে আবার পড়াশুনোর কথা ভাবতে লাগলেন। ইতিমধ্যে কয়েকটি ভাষা শিক্ষা করেছেন শখ চরিতার্থ করবার জন্য, কিন্তু তাতে তো উদরান্নের সংস্থান হবে না! অনিশ্চিতকাল ধরে প্রবাসে থাকাও সম্ভব নয়, আর দেশে ফেরার আগে ব্যারিস্টারি পাশ না করলে ফিরে গিয়েও তো সেই একই অবস্থায় পড়তে হবে। দেবেন্দ্রবাবুর পুত্র সত্যেন্দ্র সসম্মানে আই সি এস পরীক্ষায় পাশ করে সকলকে চমকিত করে দিয়েছে। সাহেবদের সঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে সে প্রথম ভারতীয় আই সি এস। সত্যেন্দ্র যথেষ্ট মেধাবী বটে, তা ছাড়া ধনীর সন্তান, তাকে পড়াশুনোর সময় অর্থচিন্তা করতে হয় নি। শোনা যাচ্ছে যে, সত্যেন্দ্র আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে ঐ পরীক্ষার মান আরও কঠিন করার কথা চিন্তা করছেন। ভারতীয়রা করবে ইংরেজদের সঙ্গে সমান পদে চাকুরি! মধুসূদন ভয় পেলেন, তা হলে কি ব্যারিস্টারি পরীক্ষাও আরও কঠিন হয়ে যাবে? ভারতের বিভিন্ন নগরে, বিশেষত কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে ইংরেজ ব্যারিস্টারদের উপার্জন যথেষ্ট, সেখানে কি তারা সহজে ভারতীয়দের প্রতিযোগিতায় নামতে দেবে? সুতরাং, দ্রুত ব্যারিস্টারি পাশ করতে গেলে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে আরও অর্থ চাই। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় বা বন্ধক দেবার অধিকার দিয়ে বিদ্যাসাগরের নামে পাঠিয়ে দিলেন এক ওকালতনামা।

মধুসূদনের চিঠিপত্র এবং সংবাদাদি পাঠ করে শুধু করুণ রস নয়, মাঝে মাঝে কৌতুকও পান বিদ্যাসাগর। একদিন তিনি কয়েকজন বন্ধুকে বললেন, ওহে, তোমাদের অমিত্রাক্ষরের কবির আর একটি নতুন খবর শুনেছো? ফরাসী দেশের পুলিস নাকি তাঁকে পলাতক ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেব বলে সন্দেহ করেছে!

সকলে বিস্মিত।

কাহিনীটি একেবারে অলীক নয়। সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান নায়ক নানা সাহেবকে এখনো বন্দী করতে পারে নি ব্রিটিশ ফৌজ। প্রায়ই তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার গুজব রটে। বিদ্রোহ প্রশমনের পর সাত-আট বৎসর পার হয়ে গেলেও ইংরেজ সরকার এখনও তাঁর অনুসন্ধানে তল্লাসী চালিয়ে যাচ্ছে। পাওনাদারবৃন্দের ভয়ে মধুসূদন প্রায় সময়ই গৃহের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন, বাইরে নির্গত হন কদাচিৎ। সেইজন্য ফরাসী পুলিসের মনে সন্দেহের উদয় হলো এই কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলকায়, মুখ গুম্ফ-দাড়িতে ভরা ব্যক্তিটিই ছদ্মবেশী নানাসাহেব নন তো!

মধুসূদনের আর এক পত্রে বিদ্যাসাগর জানতে পারলেন যে, প্রখ্যাত পণ্ডিত গোল্ডস্টুকার সাহেব মধুসূদনকে অনুরোধ করেছেন লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে বাংলার অধ্যাপক পদ গ্রহণ করবার জন্য। পদটি অতি সম্মানের হলেও অবৈতনিক। ব্যারিস্টারি পাঠ শেষ করার জন্য মধুসূদন প্যারিস থেকে চলে এসেছেন লণ্ডনে। কিন্তু গোল্ডস্টুকার মহোদয়ের অনুরোধ মানা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু সম্মান নিয়ে তিনি ধুয়ে খাবেন! এক প্রকার বিষাক্ত কীটের আক্রমণে ব্রিটেনে গবাদি পশুর মড়ক শুরু হয়েছে বলে বর্তমানে সকল প্রকার মাংসই অগ্নিমূল্য, অন্তত মাসিক সাড়ে তিন শো টাকার কমে সংসার চালানো দুঃসাধ্য। এই টাকা তাঁকে কে দেবে?

চিঠিখানি পড়ে বিদ্যাসাগর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বাংলা অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করবেন একজন বিশিষ্ট বাঙালী কবি, এটাই তো স্বাভাবিক, কিন্তু ইংরেজ

সরকার সে জন্য কোনো পারিশ্রমিক দিতে পরাঙ্মুখ ! আর এ দেশ থেকেই বা কে সাহায্য করবেন। তিনি কতকাল একার চেষ্টায় চালিয়ে যেতে পারবেন ? সে চেষ্টাও অবাস্তব।

ভিতরে ভিতরে বিদ্যাসাগর যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তা অনেকে বোঝে না। দাতা হিসেবে একবার নাম রটে গেলে তার বিড়ম্বনাও কম নয়। এখন আর কারুকে বিমুখ করার উপায় নেই। দশজনকে দান করার পর একজনকে ফিরিয়ে দিলে সেটাই লোকে বড় করে দেখবে। তিনি বুঝতে পারেন, অনেকে তাঁর সঙ্গে তঞ্চকতা বা বঞ্চনা করে টাকা নিয়ে যায়। পিতৃদায়ের অজুহাতে যে ব্যক্তি অর্থ সাহায্য নিয়ে যায়, সে-ই পরে ইয়ার বক্সীদের নিয়ে মদ্যপান করে। যে সব অনাথিনী যুবতীদের জন্য তাঁর মাসিক সাহায্য বরাদ্দ আছে, অকস্মাৎ তিনি এক সময় জানতে পারেন, তাদের কেউ কেউ বেশ্যাবৃত্তিতে নিযুক্ত।

এর চেয়েও সাঙ্ঘাতিক কথা, সত্যিকারের কোনো কোনো অভাবী ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে সঙ্কটমুক্ত হবার পর তারাই বিদ্যাসাগরকে আড়ালে নিন্দা-মন্দ করে। কৃতজ্ঞতা একটা বিষম বোঝা। অনেকেই সারা জীবন এ বোঝা বহনে অক্ষম। তাই এই বোঝা ঝেড়ে ফেলে উপকারী ব্যক্তির শত্রুতা করে তারা স্বস্তি বোধ করে। বিদ্যাসাগর এটা বুঝতে পারেন, তবু প্রত্যেকবার মনে নতুন করে আঘাত লাগে।

দান কখনো নিঃস্বার্থ হয় না। তার বিনিময়ে আত্মশ্লাঘার সুখ অনুভব করা যায়। বিশেষত দরিদ্র অবস্থা থেকে যিনি প্রাচুর্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁর দানের মধ্যে কিছু অহমিকা থেকেই যায়। বিদ্যাসাগর ধর্মভীরু বা পুণ্যলোভী নন, সুতরাং তিনিও দান করেন আত্মসুখের জন্যই। যদিও অপরের দুঃখের কথা শুনে তাঁর চক্ষে জল আসে, কিন্তু এমন অশ্রুপাতও সুখের।

তবু, এরও একটা সীমা আছে। দান যখন নিত্য-নৈমিত্তিক বাঁধা-ধরা ব্যাপার হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে থাকে শুধু ক্লান্তি। নিজেকে মনে হয় অর্থ মোক্ষণের একটি যন্ত্র। কারুর মুখে দু-একটি প্রশংসা বা স্তুতিবাক্য শুনলেই ভয় হয়। এই রে, এবার বুঝি অর্থ চাইবে ! মানুষের আন্তরিকতা সম্পর্কেই একটা সন্দেহের ভাব আসে। এভাবে যতই দিন কাটে, ততই নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে হয়।

বিদ্যাসাগর বেশী দিন নিস্তেজ হয়ে বসে থাকতে পারেন না। কর্মচাঞ্চল্য তাঁর রক্তের অন্তর্গত। দেশবাসীর প্রতি ক্ষোভ করে তিনি কিছুদিন নিজেকে গুটিয়ে রাখেন নিরালায়, আবার তাঁকে বেরিয়ে আসতেই হয়। বিধবা আইন পাশ হলেও তার প্রয়োগ ব্যাপক হলো না দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। যাঁরা তাঁকে মৌখিক সমর্থন জানিয়েছিলেন, কার্যকালে তাঁরা অনেকেই পিছিয়ে গেছেন। এবার তিনি আবার উদ্যমী হলেন বহু বিবাহ নিরোধ করবার জন্য। এই বহু বিবাহ নামক সামাজিক ব্যবস্থাই তো বিধবা উৎপাদনের কারখানা। সুতরাং, এটা বন্ধ করতে পারলেই মূল সমস্যায় আঘাত করা যাবে। আর একটি উপায় অবলা নারীগণকে স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া। গ্রামাঞ্চলে স্কুল খোলার ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই সরকারের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়, সেই উপলক্ষে তিনি চাকুরি পরিত্যাগ করেন। এবার আবার তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এই সময় এক সচ্চরিত্রা বিবি এলেন কলকাতায়। এঁর নাম মেরি কার্পেন্টার। এই প্রৌঢ়া নারী ইংলণ্ডে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য বহুদিন যাবৎ অনলসভাবে ব্যাপৃতা। ভারত সাম্রাজ্যেও তিনি রমণীকুলের মধ্যে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা পৌঁছে দিতে চান। ইনি পূর্বেই বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের নাম ও কর্মোদ্যমের কথা জানেন . সুতরাং, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী।

দেবেন্দ্রবাবু সাহেব-মেমের সংসর্গ এড়িয়ে থাকতে চান, প্রায় বলতে গেলে মেরি কার্পেন্টারের ভয়েই তিনি পলায়ন করলেন মফস্বলে। এক রাজপুরুষ একদিন মেরি কার্পেন্টারকে নিয়ে এলেন বেথুন স্কুলে, সেখানে প্রাথমিক পরিচয় হলো বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। তরুণ ব্রাহ্মরা মহোৎসাহে সভাসমিতি করতে লাগলো মেরি কার্পেন্টারকে নিয়ে। কেশব সেনের উদ্যোগে এক সভায় উপস্থিত হতে হলো বিদ্যাসাগরকে, সেখানে মেরি কার্পেন্টার প্রস্তাব দিলেন এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশীয় শিক্ষিকা, শুধু মেম-শিক্ষিকা দিয়ে এ কাজ হবে না, সুতরাং শিক্ষিকা তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য ঝটাপট তৈরি হয়ে গেল একটি কমিটি, তাতে বিদ্যাসাগরের নামও স্বভাবতই অন্তর্ভুক্ত হলো।

কিন্তু পরে বিদ্যাসাগর ভাবলেন, তার এ সবের মধ্যে না থাকাই ভালো। ইংরেজদের উদ্যোগে এ দেশে শিক্ষা বিস্তার হবে, এটা তাঁর আর মানতে ইচ্ছে করে না। এ দেশীয়দের যে কোনো উদ্যম

কোনো না কোনো ইংরেজ নারী-পুরুষকে কেন্দ্র করেই হতে হবে কেন ? শুধু নিজেদের চেষ্টায় কিছু করা যায় না ? অত্যুৎসাহী ব্রাহ্মদের উপরেও তিনি আর আস্থা রাখতে পারেন না। তিনি পাঠিয়ে দিলেন তাঁর পদত্যাগপত্র ঐ কমিটি থেকে।

কিন্তু মেরি কার্পেন্টার তাঁকে ছাড়তে চান না। ঘন ঘন দূত পাঠাতে লাগলেন তাঁর কাছে। বিদ্যাসাগরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নানা স্থানের চালু বালিকা বিদ্যালয়গুলির অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে চান। অগত্যা বিদ্যাসাগরকে রাজি হতে হলো।

উত্তরপাড়ার হিতকারী সভার অধীনে কিছুদিন যাবৎ একটি বালিকা বিদ্যালয় চলছে, একদিন যাওয়া হলো সেখানে। ছোট লাট স্বয়ং অনুরোধ করেছেন বিদ্যাসাগরকে। সঙ্গে রয়েছেন স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টার উড্রো সাহেব এবং ডিরেক্টর অ্যাটকিনসন সাহেব। ফেরার পথে বগী গাড়িতে হলো নিদারুণ এক দুর্ঘটনা।

এক স্থানে বগী গাড়িটি সবেগে মোড় ঘুরবার সময় উল্টে গেল, বিদ্যাসাগর ছিটকে গিয়ে পড়লেন পথের ওপর, তাঁর মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত লাগায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলেন। অকস্মাৎ এই দুর্দৈবে ঘোড়াটি দিশাহারা হয়ে লাফালাফি করছে, যে-কোনো সময় অচৈতন্য বিদ্যাসাগরের মুখে বা বক্ষে তার পদাঘাত লাগতে পারে। অপরাহ্ণ কাল, পথ জনবিরল নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমে গেছে, এবং এ দেশীয় ব্যক্তিদের স্বভাব অনুযায়ী সকলেই হায় হায় করছে, কেউই বিদ্যাসাগরের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলো না। এই সময় পিছনের বগীটি এসে থামতেই উড্রো ও অ্যাটকিনসন সাহেব লম্ফ দিয়ে নেমে এসে অসীম সাহসে সেই উন্মত্ত অশ্বের বল্গা চেপে ধরে বিদ্যাসাগরের প্রাণ রক্ষা করলেন। মেরি কার্পেন্টার পথের ধূলায় বসে পড়ে অচৈতন্য বিদ্যাসাগরের মস্তক তুলে নিলেন নিজের ক্রোড়ে, তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো।

ঊষাকালে ব্রাহ্মমুহূর্তে নিমতলার ঘাটে গঙ্গায় তিনবার ডুব দিল নবীনকুমার। হেমন্ত ঋতুর আকাশ পরিচ্ছন্ন, বাতাস উষ্ণ-মধুর, নদীর জল অনাবিল। নবীনকুমার সন্তরণপটু নয় বলে বুকজলের বেশী দূরে যায় না, কাছেই দুলালচন্দ্র প্রহরায় দণ্ডায়মান। তিনবার ডুব দেবার পর নবীনকুমার পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে উচ্চারণ করলো, আঃ ! তারপর সে চক্ষু মুদে, দুই কর যুক্ত করে সূর্যস্তব পাঠ করতে লাগলো, ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্...

আজ নবীনকুমারের মস্তক থেকে যেন একটা পাষাণ ভার নেমে গেল, এখন থেকে সে প্রতিশ্রুতিমুক্ত। আজ দ্বিপ্রহরে বাংলা মহাভারতের ১৭শ' বা শেষ খণ্ড প্রকাশিত হবে।

মাত্র আট বৎসরের মধ্যে এই বিপুল মহৎ কর্মটি সে শেষ করেছে। এর খরচ সংকুলানের জন্য কলকাতার কিছু সম্পত্তি ও জমিদারির কিয়দংশ বিক্রয় করে দিতে হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে কোনো ক্ষোভ নেই, সে অবিশ্বাসীদের দেখিয়ে দিয়েছে যে সে পারে। বর্ধমানের মহারাজ তার সঙ্গে টেক্কা দিতে চেয়েছিলেন ; তাঁর ধনবল, লোকবল অনেক বেশী, তিনিও পণ্ডিতমণ্ডলী নিযুক্ত করে শুরু করে দিয়েছিলেন মহাভারত অনুবাদের কাজ, কিন্তু তিনি পারলেন আগে শেষ করতে ?

তীরে উঠে এসে সিক্ত বস্ত্রেই দাঁড়িয়ে নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, দুলাল, তুই আমার কাচে কী চাস, বল ?

দুলাল ঠিক বুঝতে না পেরে বললো, আজ্ঞে ?

নবীনকুমার আবার বললো, আজ আমি কল্পতরু হবো। তোর মন যা চায়, তুই নিঃসঙ্কোচে আমায়

বল, তোকে আমি তা-ই দেবো।

দুলাল হাত কচলে বললো, আজ্ঞে, আপনার কাচে আমি আর কী চাইবো, ছোটবাবু, আপনি তো আমার কোনো অভাব রাকেন নি কো!

—তবু তুই কিচু চা আমার কাচে।

—আপনার স্তেহ-ভালোবাসা যা পেইচি তার অধিক আর কী চাইবো, ছোটবাবু!

—দূর বেল্লিক কোথাকার! তোর কোনো সাধ আহ্লাদ নেই? তোর বউ-ছেলের জন্যও যদি কিচু চাস।

—সবই তো আমাদের দিয়েচেন, ছোটবাবু!

—বরানগরের বাড়িটা তোর ছেলেকে দিলুম।

—আজ্ঞে, না, না, না, বড়বাবু শুনলে···

—চোপ্! আমার কতার ওপর কতা! ও বাড়ি আজ থেকে তোর ছেলের। বাড়ি ফিরেই লেখাপড়া করে দোবো। কী, খুশী তো?

—আপনি ভিজে কাপড় ছেড়ে নিন।

—বললি না, খুশী কি না? বেওকুফ হাস একবার। তোর দন্তপাটি দেখি। বাঃ, এইতো।

পোশাক পরিবর্তনের জন্য ব্যস্ত না হয়ে নবীনকুমার সেইভাবেই একটুক্ষণ চেয়ে রইলো নদীর দিকে। এদিকটায় কলের জাহাজ আসে না। এত ভোরেও খেয়া নৌকোয় যাত্রী পারাপার চলছে, জেলে ডিঙ্গি থেকে কেউ একজন গাইছে: বাইতে বাইতে জেবন গেল তবু জেবনের মুখ দ্যাখলাম না··· ।

অস্ফুট স্বরে নবীনকুমার বললো, এ পৃথিবীটা বড় সুন্দর, তাই না রে দুলাল?

—আজ্ঞে।

—এই নদীর মতন কালস্রোত বয়ে চলেছে, তার মধ্যে আমরা সবাই এক একজন যাত্রী।

—আজ্ঞে।

—কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাবো, কেউ জানে না, তবু যতটুকু দেখে যাওয়া যায়···বড় মধুর বড় আশ্চর্য, না রে?

—আজ্ঞে।

—শুধু সঙের মতন ঘাড় নেড়ে নেড়ে আজ্ঞে আজ্ঞে করে যাচ্চিস কেন? তোর কিচু নিজের কতা নেই? এ জীবনটা তোর ভালো লাগে না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভালো লাগে।

—মাছ ভাজা ভালো লাগে?

—আজ্ঞে।

—আর ঘোড়ার ডিম? তাও ভালো লাগে না? অপদার্থ কোথাকার! সবই এক রকম ভালো লাগে···কোনো বোধই নেই।

—একটা কতা বলবো ছোটবাবু?

—এতক্ষণ কী শুনতে চাইচি, অ্যাঁ?

—অনেকদিন পর যে আজ আপনি খুব হাসি-খুশী হয়েচেন, এইটে আমার সব চাইতে ভালো লাগচে।

—বটে! শ্মশানের ধার থেকে তুই ঐ কাঙালীগুলোনকে ডাক, ওদের সবাইকে দশটা করে টাকা দোবো।

দুলালচন্দ্র হাঁক দিতেই গণ্ডায় গণ্ডায় কাঙালী ছুটে এসে চিলুবিলু করতে লাগলো। জুড়ি গাড়ি থেকে টাকার থলি এনে নবীনকুমার দুলালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, দে, ওদের টাকা দিয়ে দে, একজনও যেন না ফেরে!

দুলাল বললো, আপনি নিজের হাতে দিন, ছোটবাবু! নিজের হাতে না দিলে দানের পুণ্যি হয় না।

নবীনকুমার অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, দূর গরু কোতাকার। আমি কি পুণ্যের জন্য দান কচ্চি? পরকালের জন্য পুণ্য জমাবার কোনো দরকার নেইকো আমার। আমি ওদের দিতে চাই, দিতে আমার ভালো লাগে বলে।

দুলাল যতক্ষণ টাকা বিলি করতে ব্যস্ত রইলো, ততক্ষণ নবীনকুমার মুগ্ধভাবে চেয়ে থাকলো গঙ্গার দিকে। হঠাৎ একসময় তার মনে পড়লো নিজের জননীর কথা। এই গঙ্গা নদীই তো আসছে হিমালয় থেকে। হরিদ্বার ক্ষেত্রে এই নদী সমতলে নেমেছে, সেই হরিদ্বারে এই নদীর তীরেই রয়েছেন তাঁর মা বিম্ববতী। কতদিন সে মাকে দেখেনি!

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে বস্ত্র পরিবর্তন এবং জলপান সেরে নেবার পরই নবীনকুমার আবার বেরিয়ে পড়ল। বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়িতে শেষ খণ্ডের এক কপি সে নিজে পৌঁছে দেবে। আজ অপরাহ্ণে মহাভারত সমাপ্তি উপলক্ষে এক বিশেষ সভা হবে, কিন্তু বিদ্যাসাগর সেখানে আসতে পারবেন না। বগি-গাড়ি ওল্টাবার সেই দুর্ঘটনায় তিনি বিশেষভাবে আহত, তাঁর মেরুদণ্ডে আঘাত লেগেছে।

বাদুড়বাগানে উপস্থিত হয়ে নবীনকুমার শুনলো বিদ্যাসাগর প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলা এখন চিকিৎসকদের নিষেধ। তবু নবীনকুমার চাইলো একবার শুধু দর্শন করতে। বিদ্যাসাগরের সুহৃদ রাজকৃষ্ণবাবু এবং ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র অন্যসব দর্শনার্থীদের নিরস্ত করেছেন, কিন্তু নবীনকুমার সিংহকে তাঁরা না বলতে পারলেন না।

সাদা চাদর পাতা সাধারণ একটি খাটে বিদ্যাসাগর নিদ্রিত রয়েছেন, ললাটে চিন্তার রেখা, ওষ্ঠদ্বয় সামান্য কুঞ্চিত। আসবাবহীন কক্ষটিতে শুধু শোনা যাচ্ছে একটি দেওয়াল ঘড়ির টক্ টক্ শব্দ। নবীনকুমার তার হাতের গ্রন্থটি রাখলো বিদ্যাসাগরের শয্যার এক পাশে, তারপর একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। মনে মনে বলতে লাগলো, আপনার কাছে আমি শপথ করেচিলুম, তা আমি রক্ষা করিচি, আজ থেকে আমি মুক্ত।

তারপর সে এক অভিমানের দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বললো, আপনি আমার ওপর সুবিচার করেননি। আপনি আমার কার্যকলাপ দেকেচেন। কিন্তু আমার হৃদয় পরীক্ষা করেননি। বিদায়, গুরুদেব।

নবীনকুমারের সারাদিন কেটে গেল কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে। আকাশে উড্ডীয়মান লঘুপক্ষ বিহঙ্গমের মতন নিজেকে হাল্কা বোধ হচ্ছে। এতবড় একটা কাজ যে সে সত্যিই শেষ করতে পেরেছে এজন্য ঠিক গর্ব নয়, বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দ যেন ছড়িয়ে পড়েছে তার সর্বাঙ্গে। অপরাহ্ণের সভায় অনেক মাননীয় বক্তা তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং অনুরোধ জানালেন, এরপর পূর্ণাঙ্গ রামায়ণের গদ্যানুবাদে হাত দেবার জন্য। নবীনকুমার জানালো যে শুধু রামায়ণ নয়, হরিবংশ মদ্ভাগবৎ গীতা এবং অন্যান্য আরও অনেক গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশের বাসনা তার আছে। অনুবাদক পণ্ডিতদের শাল-দোশালা, পিত্তলের কলসী এবং স্বর্ণ মুদ্রা উপহার দেওয়া হলো। সভা শেষ হলো সাতটার তোপধ্বনি শুনতে পাওয়ার পর।

অতিথিরা সকলে চলে যেতেই নবীনকুমার অকস্মাৎ খুব নিঃসঙ্গ বোধ করলো, এরপর সে কী করবে? শুধু মহৎ আদর্শ আর সাধুবাদ শুনলেই তার মানসিক ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। তার আরও কিছু প্রয়োজন। বাড়িতে তার মন টেঁকে না। তার স্ত্রী সরোজিনী কার্যত বোবা। অনেক চেষ্টা করে দেখেছে নবীনকুমার, শুধু ঘর-সংসার আর পিত্রালয়ের গল্প ছাড়া অন্য কিছুই সরোজিনীকে আকৃষ্ট করে না। ইদানীং তার পুজো-আচ্চার বাতিক চরমে উঠেছে, নবীনকুমার একেবারে পছন্দ না করলেও এ গৃহে সাধু-সন্ন্যাসী ও গণৎকারদের আনাগোনা চলছে কিছুদিন ধরে। তারা সরোজিনীর কাছে আসে। এতদিনেও সন্তান হয়নি বলে সরোজিনীর আশঙ্কা হয়েছে যে সে বুঝি বাঁজা। সে কারণেই তার স্বামী তাকে পছন্দ করে না।

সন্তান অবশ্য কুসুমকুমারীরও হয়নি এখনো, কিন্তু সে এসব দিকে ঝোঁকেনি। গঙ্গানারায়ণ-কুসুমকুমারী যে মহলে থাকে, সেখানে প্রায়ই সন্ধ্যার পর গান বাজনার আসর বসে। কুসুমকুমারীর সঙ্গীত অনুরক্তি প্রবল। নবীনকুমারেরও বিশেষ সঙ্গীতপ্রীতি আছে, কিন্তু সে ঐ মহলে কদাচ যায় না। গঙ্গানারায়ণ এবং কুসুমকুমারী এসে অনেকবার অনুরোধ জানিয়েছে, প্রতিবারই নবীনকুমার কোনো না কোনো ছুতো দেখিয়ে এড়িয়ে গেছে। এখনো সে কুসুমকুমারীর সঙ্গে পারতপক্ষে বাক্যালাপ করে না, নেহাৎ কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হলেও তার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। নবীনকুমারের যে কেন

এত বিরাগ কুসুমকুমারীর প্রতি, তা কুসুমকুমারী এ পর্যন্ত বুঝতে সক্ষম হয়নি।

খানিকবাদে নবীনকুমার আবার বেরিয়ে পড়লো জুড়িগাড়ি নিয়ে। কোথায় যাবে সে বিষয়ে আগে থেকে মনস্থির করেনি, তাই কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করে উপস্থিত হলো ফৌজদারি বালাখানার সন্নিকটে চন্দ্রনাথ ওঝার বাড়িতে।

দ্বার খুলে দিল চন্দ্রনাথের সহকারী কাল্লু শেখ ওরফে সুলতান। এবং জানালো যে চন্দ্রনাথ গৃহে নেই।

তবু অফিস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে নবীনকুমার বললো, কোতায় গেচেন তোর বাবু?

সুলতান বললো, বাবু রোদে গিয়েসেন।

বুঝতে না পেরে নবীনকুমার বললো, রোদে মানে?

সুলতান বললো, আজ্ঞে হাঁ, ইয়াস ষাঁড়, বাবু রোদে গিয়েসেন। রেতের বেলা রোদ্দুর না থাকলেও আমার বাবু একবার করে রোদে যান।

নবীনকুমার বললো, ও, রোঁদে গ্যাচেন। তোর বাবু রোজ রাতে রোঁদে যান কেন, তিনি কি সেপাই নাকি?

—আমার বাবু সেপাই দ্যাখলে ভয় পান না। সাহিব-পুলুশ দ্যাখলেও ভয় পান না।

—ঠিক আচে, তোর বাবু ফিরবেন তো? আমি একটু বসচি।

—বসেন, বসেন ষাঁড়, বসেন। সিক্রেট খাবেন? আমার বাবু সিক্রেট খান।

—না, আমি সিগারেট-পান-তামাক কিচুই চাই না। এই কদিন আগে দেকলুম তোর মাতায় চুল নেই, ভুরু নেই, আজ সব হঠাৎ গজিয়ে গেল কী করে?

—এটা পরচুল। বাবু পরায়ে দিয়েসেন। আর কালি দিয়ে ভুরু আঁকে দিয়েসেন। বাবু আমারে বলেন, ন্যারামুণ্ডি থাকলে ছুলতান হওয়া যায় না।

মৃদু মৃদু হাস্যে নবীনকুমার সুলতানের কথাবার্তা উপভোগ করতে লাগলো।

কয়েকমাস ধরে চন্দ্রনাথের সঙ্গে তার এক অদ্ভুত সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এই ষণ্ডামার্ক স্বভাবের লোকটির প্রতি নবীনকুমার বেশ আকর্ষণ বোধ করে, এই ওঝা কোনো সাধারণ চিকিৎসক নয়, এ আক্রমণ করতে চায় সামাজিক ব্যাধিগুলিকে। এইসব বিষয়ে নবীনকুমারও খুব কৌতুক পায়, তাই সে চায় চন্দ্রনাথের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে। কিন্তু চন্দ্রনাথ কিছুতেই নবীনকুমারের সংশ্রবে থাকতে চায় না, নবীনকুমার নিমন্ত্রণ জানালে সে যায় না, নবীনকুমার সাক্ষাৎ করতে এলেও সে বিরক্ত হয়। ধনিক শ্রেণীর প্রতিই যেন তার এক তীব্র ঘৃণাবোধ আছে।

তবু নবীনকুমার আসে। বিপরীত ধরনের মানুষের প্রতিই যেন তার কৌতূহল বেশী। মোসাহেব, খোসামুদে বা আজ্ঞে-হুজুরের দলকে সে দুচক্ষে দেখতে পারে না। চন্দ্রনাথ তার মুখের ওপর ভর্ৎসনা করে, তাতেই সে বেশী মজা পায়।

একমাত্র চন্দ্রনাথই নবীনকুমারের মহাভারত অনুবাদের গৌরব নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে। সে একদিন বলেছিল, ভারি একটা কাজ! আপনার জমিদারির গরিব প্রজাদের টাকায় আপনি মচ্ছব কর্চেন। কিচু হাফ এজুকেটেড লোকের মধ্যে ঐ বই বিলি কর্চেন বিনি পয়সায়। যারা গায়ের রক্ত জল করে জমিতে ধান ফলায় তাদের কী উপকারটা হচ্চে এতে?

নবীনকুমার একথা শুনে ক্রুদ্ধ হয় না। হাসতে হাসতে বলে, আমি ধনী বংশে জন্মেচি, সেটা আমার অপরাধ? কর্ণের মতন আমিও বলতে পারি, দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম…।

—তবে ধনীর দুলালের স্বভাব অনুযায়ী কাজ করুন। আমার কাচে আসেন কেন? একদিকে মদ-মেয়েমানুষে টাকা ওড়ান আবার একটা মন্দির বানিয়ে দিয়ে সুনাম কিনুন। এদানি আবার মন্দির বানাবার বদলে ইস্কুল খোলার ফেসিয়ান হয়েচে।

—আমি মন্দিরও বানাইনি, ইস্কুলও খুলিনি, বড় ভুল হয়ে গ্যাচে তো। তা ভাই তোমার

ভূত-তাড়ানোর কারবারটি আমার বড় পচন্দ।

—ভূত আপনার মাথার মধ্যেও রয়েচে।

—বটে, বটে ? সেটা কেমন ধারা ভূত তুমি বলে দিতে পারবে ? যত টাকা খর্চা লাগে আমি দোবো।

—মিঃ সিংহা, যারা কতায় কতায় টাকার গরম দেকায়, আই হেইট দেম।

—কিন্তু এটাই তো তোমার পেশা, তাই না ? আমার কেইসটা তুমি টেকআপ করো। তুমি যখন বললেই যে আমার মাতার মধ্যে ভূত আচে···

—আমি দুঃখিত, মাই হ্যাণ্ড ইজ ফুল। এখন আমি আর কোনো কেইস নিতে পারবো না।

শহরে ভূত-প্রেত আর বুজরুগ যোগী-সন্ন্যাসীর ধূম ধাড়াক্কা লেগেই আছে, খবর পেলেই নবীনকুমার সেখানে যায়। সে জানে, চন্দ্রনাথ তার সাগরেদকে নিয়ে সেখানে আসবেই। প্রতিবারই বিভিন্ন প্রকার কৌশলে চন্দ্রনাথ জুয়াচুরি ফাঁস করে দেয়। এজন্য কয়েকবার তাকে রীতিমতন বিপদেও পড়তে হয়েছে, বিরুদ্ধপক্ষীয়রা আক্রমণ করতে ধেয়ে এসেছে চন্দ্রনাথকে। মুসলমানপাড়ায় এক বাড়িতে এরকম হাঙ্গামার সময় এক সাধুর ক্ষিপ্ত চ্যালারা চন্দ্রনাথকে মারার জন্য ধেয়ে আসে, তখন নবীনকুমারই দুলালের সাহায্যে ওকে রক্ষা করে নিজের জুড়ি গাড়িতে তুলে নেয়। সেজন্য অবশ্য কোনো কৃতজ্ঞতাবোধ নেই চন্দ্রনাথের, কোনোরকম সৌজন্য বা ধন্যবাদ বাক্য না বলে সে একটু পরেই গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিল।

চিৎপুরের রাস্তায় চন্দ্রনাথের বাড়ির প্রায় বিপরীত দিকেই আর একটি গৃহের সামনে প্রতিদিন বহু মানুষ সমাগম হয়। একদিন কৌতূহলী হয়ে সেখানে গিয়েছিল নবীনকুমার। সে গৃহের একখানি কামরা ভাড়া নিয়ে বাস করেন একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, তিনি সাধারণ গরিব-গুর্বো লোকদের চিকিৎসা করেন এবং ওষুধ দেন। সবই বিনা মূল্যে। ভদ্রলোকের নাম প্রাণগোপাল বিষয়ী, কিন্তু তাঁর মনে বিন্দুমাত্র বিষয়বুদ্ধি নেই। নবীনকুমার ওঁর সঙ্গে কথা বলে জানলো যে প্রাণগোপালবাবু রীতিমতন মেডিক্যাল কলেজের পাশ করা ডাক্তার, লক্ষ্ণৌতে সরকারি হাসপাতালে কর্ম করতেন, কিছুকাল আগে পত্নী বিয়োগ হওয়ায় তিনি এক প্রকার গৃহী-সন্ন্যাসী হয়েছেন। তাঁর যাবতীয় সঞ্চয় তিনি ব্যয় করছেন দরিদ্র মানুষদের সেবায়।

মাত্র একঘণ্টা আলাপ করবার পরই নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, আপনার এই বাড়িটির মালিক কে ? তিনি কোথায় থাকেন ? আমি এই বাড়িটি কিনতে চাই। এই বাড়িতে আপনি একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলুন। আমি প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা দেবো।

নবীনকুমারের যে কথা সেই কাজ এবং সবই অতি দ্রুত। কয়েকদিনের মধ্যে সেই গৃহ ক্রয় করে সেখানে স্থাপিত হলো দাতব্য চিকিৎসালয় এবং প্রাথমিক যন্ত্রপাতির জন্য নবীনকুমার আরও অতিরিক্ত দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করলো।

তারপর একদিন সে চন্দ্রনাথের কাছে এসে বলেছিল, ওহে ব্রাদার, মন্দির স্থাপন করিনি, ইস্কুলও খুলিনি। দাতব্য চিকিৎসালয় বসিয়েচি, এটা তোমার পচন্দ। এবার তুমি খুশী ?

চন্দ্রনাথের মুখখানা রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল। সে গম্ভীরকণ্ঠে বলেছিল, এও আপনার বড়-মানুষের দেমাকী। আমার বাড়ির উল্টোদিকেই কি এটা করতে হবে ? আপনি নিজের নাম জাহির করবেন, তা দুবেলা দেকতে হবে আমায় !

নবীনকুমার হাসতে হাসতে বলেছিল, সাইন বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দ্যাকো, লেকা আচে, সাধারণ দাতব্য চিকিৎসালয়। আমার নাম কোতাও নেই। তোমায় দেকচি খুশী করা বড় শক্ত। আমোদের জন্য টাকা ওড়ালে তোমার আপত্তি, আর গরিবের জন্য ব্যয় কল্লেও তোমার আপত্তি ?

আজ সুলতানের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করবার পরও চন্দ্রনাথ ফিরলো না দেখে নবীনকুমার ভাবলো, আর অপেক্ষা করে কোনো লাভ নেই।

সে উঠে দাঁড়াতেই বাইরের দ্বারের সামনে একটি কেরাঞ্চি গাড়ি এসে থামলো, তার থেকে অবতরণ করলো চন্দ্রনাথ। কয়েক পা অগ্রসর হয়েই সে একবার টলে পড়ে যেতে যেতে দেওয়াল ধরে সামলে নিল নিজেকে। নবীনকুমার রীতিমতন বিস্মিত। সে আগে কখনো চন্দ্রনাথকে সুরাপান করে মাতাল

হতে দেখেনি। শুধু তাই নয়, কেরাঞ্চি গাড়ি থেকে চন্দ্রনাথের পশ্চাতে নেমেছে এক অবগুণ্ঠিতা যুবতী।

সুলতান লণ্ঠন নিয়ে তার প্রভুর দিকে ছুটে যেতেই সেই আলোকে নবীনকুমার দেখলো চন্দ্রনাথের সমস্ত পোশাক রক্তাক্ত। তার একটি চক্ষুসমেত কপাল জুড়ে গভীর ক্ষত।

চন্দ্রনাথ যে বেশ বড় রকম একটা মারদাঙ্গায় জড়িয়ে পড়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ তার মতন তেজস্বী ও বলশালী মানুষটিও কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলো না। একটি চেয়ারে বসে পড়ে ক্লিষ্ট কণ্ঠে সে বললো, সুলতান, একটু গরম জল করে নিয়ে আয় জল্‌দি।

চন্দ্রনাথের কোট ছিন্নভিন্ন, কোনো ধারালো অস্ত্রের একাধিক ঘা খেয়েছে সে, তার শরীর থেকে ফোঁটাফোঁটা রক্ত পড়ছে মাটিতে।

নবীনকুমার রক্তাক্ত দৃশ্য সহ্য করতে পারে না। সে এগিয়ে এসে চন্দ্রনাথকে কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারলো না। গুরুতর আহত চন্দ্রনাথের এখনি চিকিৎসার প্রয়োজন বুঝে সে বললো, ডাক্তার, একজন ডাক্তার ডাকা দরকার। আমাদের হাসপাতাল থেকে ডাক্তারবাবুকে বরং ডেকে আনুক সুলতান।

অবনত মস্তক দুহাতে চেপে ধরে চন্দ্রনাথ বললো, না, তার কোনো দরকার নেই। আমি নিজেই নিজের ব্যবস্থা কত্তে পার্বো।

নবীনকুমার বললো, তোমার এমন অবস্থা হলো কী করে?

চন্দ্রনাথ কোনো উত্তর দিল না।

নবীনকুমার বললো, কাচেই যখন ডাক্তার রয়েচেন,—আচ্ছা আমি নিজেই ডেকে আনচি।

চন্দ্রনাথ ধমকের সুরে বললো, বলচি যে আমার দরকার নেই!

অবগুণ্ঠিতা রমণীটি দ্বারের বাইরে এক পাশ বেঁকে আড়ষ্টভাবে দণ্ডায়মান। তরুণীটি বেশ দীর্ঘাঙ্গী, পরনে একটি নীল রঙের সিল্কের বসন। শরীরে যৌবন একেবারে পরিপূর্ণ। তার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত বোধ করলো নবীনকুমার। নিশ্চিত আর একটি কুলটা নারী। শহর কলকাতা এমন গৃহত্যাগিনী স্ত্রীলোকে ভরে গেছে। স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক বা সামাজিক তাড়নাতেই হোক, এই সব রমণীরা একবার পথে নামবার পর ক্রমশ তারা সেই পথকেই পিচ্ছিল করে। সুবালা-পর্বের পর এই সমস্ত রমণীদের সম্পর্কে নবীনকুমারের মনে একটা দারুণ বিরাগ জন্মে গেছে।

গোঁয়ার চন্দ্রনাথ যদি চিকিৎসক না ডাকতে চায়, তা হলে এ স্থানে এখন আর নবীনকুমারের করণীয় কিছু নেই। তবু প্রস্থানের জন্য উদ্যত হয়েও নবীনকুমার চলে যেতে পারছে না। চন্দ্রনাথের অভিযান-কাহিনীটি শোনার জন্য তার দারুণ কৌতূহল।

চন্দ্রনাথ একবার মুখ তুলে রমণীটিকে উদ্দেশ করে বললো, আপনি ভেতরে এসে বসুন। সুলতান, বাইরের দোর বন্ধ করে দে!

রমণীটি এবার কুক্ তুলে কান্না শুরু করে দিল। চন্দ্রনাথ মাথার ক্ষত স্থানটি এক হাতে চেপে ধরে উঠে দাঁড়ালো। একটি চোখ তার বন্ধ হয়ে গেছে, অন্য চক্ষুটিতে নিদারুণ ক্রোধ।

কর্কশ স্বরে সে বললো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদাকাটি করে আপনি পাড়াপড়শীর ভিড় জমাতে চান! ভেতরে এসে যতখুশী কাঁদুন!

স্ত্রীলোকটি বললো, আমার এখন গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরাই ভালো! আমাকে ছেড়ে দিন!

—মত্তে চান মরবেন। তার জন্য এত ব্যস্ততার কী আচে!

—আমার কপালে আগুন নেগেচে, আপনি কেন শুধুমুদু নিজের হাত পোড়াবেন?

—সে চিন্তা আপনাকে কত্তে হবে না!

সুলতান এর মধ্যেই একটা ছোট গামলা ভর্তি গরম জল, তুলো আর খানিকটা সাদা কাপড় নিয়ে এসেছে।

—আগে বাইরের দরোজাটা বন্দ করে দে!

দরজা বন্ধ করে এসে সুলতান অতি দক্ষ হাতে গরম জলে তুলো ভিজিয়ে চন্দ্রনাথের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে দিতে লাগলো। চন্দ্রনাথ বললো, আঃ, আস্তে, সাবধানে, দ্যাক বোধহয় একটা কাঁচ ফুটে আচে!

নবনীকুমার সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। স্ত্রীলোকটির দিকেও সে সোজাসুজি তাকাতে পারছে না। সে এখনো স্ত্রীলোকটির মুখ দেখতে পায়নি। স্ত্রীলোকটির মুখ দেয়ালের দিকে। নবীনকুমার বেশ অস্বস্তিজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলো।

সুলতান বললো, উরি বাস রে ! কেটে একেবারে ফাঁক হয়ে গিইয়েচে। কোন্ দুশমন বোতল দিয়ে মেইরেচে। অ্যাত্ত বড় একটা কাঁচ।

চন্দ্রনাথ মুখ দিয়ে কোনো যন্ত্রণার শব্দ করছে না। সে বললো, তুই হাত দিয়ে তুলতে পারবি না, একটা সন্না নিয়ে আয়···আমার শোবার ঘরে দেরাজে আচে দ্যাক।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কে তোমায় এমন মারলো, চন্দ্রনাথ ?

এবারও চন্দ্রনাথ নীরব।

আর এখানে থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নবীনকুমার কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই চন্দ্রনাথ মুখ তুলে বললো, আপনাকে একটি রিকোয়েস্ট জানাতে পারি ?

নবীনকুমার থমকে গিয়ে বললো, কী ?

—এই রমণীকে আপনি আজ রাতের মতন কোনো জায়গায় আশ্রয় দিতে পারেন ?

—আমি একে আশ্রয় দোবো ? আমি কোতায় আশ্রয় দোবো ?

—বাঃ ! ওউনার অফ ডজনস্ অ্যাণ্ড ডজনস্ অফ বিল্ডিংস ইন ক্যালকাটা, তিনি জিজ্ঞেস করচেন, কোতায় ?

চন্দ্রনাথের তীব্র ব্যঙ্গোক্তিতে নবীনকুমার অপ্রস্তুত হয়ে গেল, তার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করলো। তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর না দিয়ে সে চুপ করে রইলো একটুক্ষণ। তারপর ঈষৎ হাস্যের সঙ্গে সে বললো, হ্যাঁ, বাড়ি আমার অনেকগুলোন আচে বটে, তা বলে এই মাঝরাতে একজন অজ্ঞাতকুলশীল স্ত্রীলোককে নিয়ে গিয়ে তুলবো, তাই-ই বা কেমন কতা !

—অজ্ঞাতকুলশীল নিরাশ্রয় বলেই ঠাঁই দেবার প্রশ্ন ওঠে। যার ভদ্রস্থ বাড়িঘর আছে, সে আপনার কাচে রাতের বেলা এমন সাহায্য চাইবে কেন ?

—এই রমণীটি কে ? কোতায় একে পেলে ?

—সে সব কতা পরে জানলে চলে না ? আপনি এক্ষুনি যা বললেন, ধরে নিন তাই, অজ্ঞাতকুলশীল—

—তুমি একে এনেচো, তোমার বাড়িতেই রাকচো না কেন ?

—দিস্ ইজ এ ব্যাচেলরস্ অ্যাবোড, এখানে কোনো স্ত্রীলোকের থাকা সমীচীন হয় না। সে কারণেই আপনার ওপর এ দায়িত্ব দিতে চাই—

—বাঃ, তুমি কোতায় না কোতায় ইচ্ছে করে হেঙ্গামায় জড়িয়ে পড়বে, নারীহরণ করে আনবে। তারপর তার দায়িত্ব নিতে হবে আমাকে ?

—তা হলে সেপাইদের ছাড়া ঘোড়ার মতন আপনার এখানে ফালতু ল্যাজ নাড়াবার তো কোনো প্রয়োজন দেখি না। রাত হয়েচে, আপনি এবার বাড়ি যান।

নবীনকুমারের মুখের ওপরে যেন কশাঘাত হলো। তার কথার মধ্যে সব সময়ই একটা কৌতুকের সুর থাকে। চন্দ্রনাথ তার কাছে এই রমণীটিকে আশ্রয় দেবার ব্যাপারে সাহায্য চেয়েছে, এটা এমন কী আর কঠিন ব্যাপার। দুলালকে হুকুম দিলেই সে যে-কোনো উপায়ে একটা ব্যবস্থা করবেই। ইচ্ছে করলে সে এই রাত্রেই একটি নতুন গৃহ ক্রয় করে সেখানে এই রমণীকে স্থাপিত করতে পারে। কিন্তু কোনখানে মারপিট হলো এবং কী ভাবে বা কেন এই রমণীটিকে নিয়ে আসা হলো সেই ইতিহাস চন্দ্রনাথ বলতে চাইছে না বলেই নবীনকুমার উল্টো সুরে কথা বলছিল তার সঙ্গে। কিন্তু রঙ্গ-রস বোঝার ক্ষমতা এমনিতেই চন্দ্রনাথের কম, তা ছাড়া সাঙ্ঘাতিক আহত অবস্থায় কৌতুক অনুধাবন করা সহজও নয় মোটেও।

এবার নবীনকুমার গম্ভীর স্বরে বললো, দ্যাকো চন্দ্রনাথ ওঝা, বেয়াদপির একটা সীমা আছে। কার সঙ্গে কেমন ভাবে কতা কইতে হয় তুমি জানো না। যদি সমূলে ধ্বংস হতে না চাও তো আমার সামনে মুখ সামলে চলো।

চন্দ্রনাথও এবার একটু সুর নরম করে বললো, আদপ-কায়দা শেকবার তো সুযোগ পাইনি জীবনে, তাই মানী লোকের মান কীভাবে রাকতে হয় হয়তো জানি না। আপনার মতন মানী লোক যেখেনে সঠিক মান পাবেন, সেখেনেই আপনার গতায়াত করা উচিত। আমার মতন একটা চাঁড়ালের বাড়িতে···

পরক্ষণেই সে চেঁচিয়ে উঠলো, আঃ, আঃ, মেরে ফেলবি, আস্তে, ওরে আস্তে—ইতিমধ্যে সুলতান ওপর থেকে সন্না নিয়ে এসে চন্দ্রনাথের মাথা থেকে কাচের একটি বড় টুকরো তোলার চেষ্টা করছিল। ভুল করে একটা খোঁচা লাগিয়ে দিয়েছে, চন্দ্রনাথের মস্তক থেকে আবার রক্তপাত হচ্ছে।

স্ত্রীলোকটি কান্না থামিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে এতক্ষণ স্থাণুবৎ দাঁড়িয়েছিল, চন্দ্রনাথের আর্ত স্বর শুনে সে আর স্থির থাকতে পারলো না। এগিয়ে এসে সুলতানের পাশে দাঁড়িয়ে সে লজ্জা-শঙ্কামিশ্রিত কম্পিত স্বরে বললো, আমি চেষ্টা করবো ?

স্ত্রীলোকটির মুখ থেকে অবগুণ্ঠন সরে গেছে।

সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মতন বিস্ময়ের এক ঝাপটা লাগলো নবীনকুমারের শরীরে। এই রমণীটি কে ? এ নবীনকুমারের সম্পূর্ণ অচেনা, অথচ বিষম চেনা বলে মনে হচ্ছে।

রমণীটি প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া, অত্যুজ্জ্বল গৌর গাত্রবর্ণ, আয়ত চক্ষু, মাথায় ভ্রমর-কৃষ্ণ এক রাশ চুল। কিন্তু তার মুখমণ্ডলে রূপের উগ্রতা নেই, তার দৃষ্টি থেকে ওষ্ঠের ভঙ্গিমা পর্যন্ত কোমল, কমনীয়, স্নিগ্ধ। যেন নবীনকুমারের জননী বিম্ববতীর মুখখানা হুবহু বসানো।

নবীনকুমারের বক্ষ স্পন্দন অতি দ্রুত হয়ে গেল। আজ প্রাতেই সে বহুদিন পর তার জননীর কথা স্মরণ করেছিল, আজ রাতেই সে এ কোন্ রূপ দেখলো ? মানুষে মানুষে এমন মিল সম্ভব ? সময় ও স্থানের দূরত্বে বিম্ববতী আজ সুদূরবাসিনী, তবু কোন্ মন্ত্রবলে যেন তিনি এখানে যৌবনবতী হয়ে উপস্থিত। তবে কি এ বিম্ববতীর কোনো সহোদরা ? কিন্তু নবীনকুমার যত দূর জানে, তার মাতৃকুলে কেউ আর জীবিত নেই।

যুবতীটি কুশলী হস্তে সন্না দিয়ে চন্দ্রনাথের মাথা থেকে কাচের একটি বড় টুকরো তুলে আনলো। তারপর সুলতানকে জিজ্ঞেস করলো, বাড়িতে গাঁদা ফুলের গাছ নেই ?

সুলতান তৎক্ষণাৎ কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে, প্রায় চক্ষের নিমেষেই হনুমানের বিশল্যকরণী আনয়নের ভঙ্গিতে একরাশ গাঁদাফুলের গাছ নিয়ে এলো দুই বগলে। কোনো প্রতিবেশীর বাগান থেকে সেগুলি সে সমূলে উপড়ে এনেছে।

যুবতীটি অনেকগুলি পাতা একসঙ্গে নিয়ে থেঁতো করে সেই রসের প্রলেপ দিতে লাগলো চন্দ্রনাথের ক্ষতস্থানে। চন্দ্রনাথ এখন চেয়ারে হেলান দিয়ে স্থির হয়ে বসে আছে, অনেক রক্তক্ষরণে তার মুখখানি পাণ্ডুর বর্ণ। চক্ষু বুজে ফেলেছে সে সুলতান তার ছিন্নভিন্ন কোট খুলে নিতে দেখা গেল তার ঘাড়ে ও বুকেও তলোয়ারের মতন কোনো ধারালো অস্ত্রের দাগ।

যুবতীটি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, কেন আপনি নিজের জীবনটা এমন ভাবে···কেন আপনি আমার জন্য···

সাদা কাপড় দিয়ে মাথার ক্ষতটি ভালোভাবে বেঁধে দিয়ে যুবতীটি অন্যান্য ক্ষত তুলো দিয়ে পরিষ্কার করতে করতে বললো, কোনো ওষুধ-বিষুধ না লাগালে···আমি তো কিছুই জানি নাকো···

নবীনকুমার নির্বাক হয়ে সব কিছু দেখে যাচ্ছিল, একবার যুবতীটির সঙ্গে চোখাচোখি হতে সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি···আপনি কে ?

যুবতীটি চক্ষু নত করে উত্তর দিল, আমি এক হতভাগিনী !

চন্দ্রনাথ অকস্মাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, সুলতান, আমার হাতটা ধর, আমি এবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বো, আর বসে থাকতে পাচ্ছি নি—

নবীনকুমার বললো, চন্দ্রনাথ, তা হলে এঁকে আমি নিয়ে যাবো ! তোমার কোনো চিন্তা নেই, ইনি ভালো জায়গায় থাকবেন। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

যুবতীটি যেন অত্যন্ত ভয়ার্ত হয়ে চন্দ্রনাথের হাত চেপে ধরে বললো, না, না, আমি আর কোতাও যাবো না !

নবীনকুমার বললো, আপনার কোনো ভয় নেই, আপনি সসম্মানে, নিরাপদে থাকবেন।

যুবতীটি ফের বললো, আমি এঁকে ছেড়ে যাবো না ! এঁর এত বিপদ···কেউ যদি সেবা না করে···আমি যতটুকু পারি···

নবীনকুমার বললো, আমি ওর জন্য চিকিৎসক ডাকতে চেয়েছিলুম, উনি রাজি হন নি। তবু আমি এখুনি গিয়ে ডাক্তার আর সারা রাত জেগে সেবা করবার জন্য লোক পাটিয়ে দিচ্চি···

চন্দ্রনাথ বললো, মিঃ সিংহ, আপনি আমার উপকার করবার চেষ্টা করবেন না। আমি কারুর কাচ থেকে উপকার নিই না। কারণ, প্রত্যুপকার করবার বোধশক্তি আমার নেই।

—তুমি বালখিল্যের মতন কতা বলচো, চন্দ্রনাথ। এখন তোমার চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন, তাই ডাক্তার আসবে। এর মধ্যে উপকারের প্রশ্ন আসচে কোতায় ?

—অনেক মার খাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার আচে। এতে আমার কিছু হবে না। আমি আবার বেঁচে

উঠবো ঠিকই।

তারপর সে যুবতীটিকে উদ্দেশ করে বললো, ইনি নবীনকুমার সিংহ, একজন বিশিষ্ট মানী ব্যক্তি, আপনি এঁর সঙ্গে ইচ্ছা করলে যেতে পারেন। ইনি আপনাকে তোয়াজের সঙ্গে রাকবেন—

যুবতীটি অতি দ্রুত বললো, নাঃ!

নবীনকুমার মিনতি করে বললো, আপনি চলুন, আমি শপথ করে বলচি, আপনার কোনো ভয় নেই—

যুবতীটি ঝাঁঝের সঙ্গে চন্দ্রনাথকে বললো, আপনি যদি আমায় অন্যের হাতে সঁপেই দেবেন, তবে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আমায় বাঁচালেন কেন? এখেনে নিয়ে এলেন কেন? আমি আর কোতাও যাবো না, মত্তে হয় তো এখেনেই মর্বো!

চন্দ্রনাথ খুব ক্লান্ত ভঙ্গিতে বললো, আমি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আপনাকে বাঁচাই নি···কতগুলো রাফিয়ান, পাষণ্ড পথের মধ্যে আপনাকে কুৎসিতভাবে টানা-হ্যাঁচড়া করছিল, তাই তাদের শাস্তি দিতে গেসলুম···তারপর আপনি আমার সঙ্গে এলেন···মিঃ সিংহ প্রথমে আপনাকে আশ্রয় দিতে চান নি, তারপর বোধ হয় আপনার মুখ দেকে আপনাকে পচন্দ হয়েচে···

নবীনকুমার বললো, ছিঃ!

চন্দ্রনাথ বললো, ইনি একজন মস্ত বড় বড়মানুষ, আর আমি একটা চাঁড়াল, তা জেনেও যদি আপনি এখেনে থাকতে চান, ···তা হলে থাকুন···সুলতান আপনার ব্যবস্থা করে দেবে···

নবীনকুমার বাইরের দিকে দ্বার খুলে উত্তেজিতভাবে ডাকলো, দুলাল! দুলাল!

চন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ঘুমে জড়িয়ে এসেছে। সে বললো, তা বলে যেন এঁকে জোর করে নিয়ে যাবেন না! আমি স্ত্রীলোকদের ওপরে জোর-জবরদস্তি খাটানো একদম সহ্য কত্তে পারি না।

অপেক্ষমান জুড়িগাড়ি থেকে দুলাল তৎক্ষণাৎ এসে উপস্থিত হতেই নবীনকুমার ব্যগ্রভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জিজ্ঞেস করলো, দ্যাক তো দুলাল, এঁকে চিনতে পারিস?

দুলাল একটুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বিমূঢ়ভাবে বললো, আজ্ঞে, না তো।

—এঁকে দেখে কারুর কতা মনে পড়চে না তো!

দুলালও অতি বাল্যকাল থেকে বিম্ববতীকে দেখেছে। সুতরাং নবীনকুমার আশা করেছিল, দুলালও যুবতীটিকে দেখা মাত্র তারই মতন চমকিত হবে। কিন্তু দুলালের মুখে কোনো রেখাই ফুটলো না। সে আমতা আমতা করে বললো, আজ্ঞে না, ছোটবাবু।

নবীনকুমার অস্থিরভাবে হতাশ নিশ্বাস ফেললো। তারপর যুবতীটির দিকে দু'এক পা এগিয়ে এসে অত্যন্ত আন্তরিক কাতরতার সঙ্গে বললো, আপনি চলুন আমার সঙ্গে, এর পর আপনি যা চান, আপনি যেখানে খুশী যেতে চান···আপনাকে সম্মানের জীবন ফিরিয়ে দোবো আমি···

যুবতীটি পুনরায় বললো, না: আমি একে ছেড়ে যাবো না!

চন্দ্রনাথ বললো, আমার ঘুম পাচ্চে, আমার বিষম ঘুম পাচ্চে মিঃ সিংহ, তা হলে আপনি বাড়ি যান···

নবীনকুমার এদিক ওদিক মুখ ফেরালো। একটা কোনো ভারি বস্তু পেলে সে হয়তো কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হয়ে তখুনি তা দিয়ে চন্দ্রনাথের মাথায় আঘাত হানতো। অতি কষ্টে সে নিজেকে সামলে নিল।

দুলালচন্দ্র কোনোদিন তার প্রভুকে এই অবস্থায় দেখে নি। সে ভয়ে ভয়ে বললো, ছোটবাবু, বাড়ি যাবেন না?

—চল।

যুবতীটির দিকে শেষবারের মতন তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিপাত করে নবীনকুমার নির্গত হয়ে গেল সেই কক্ষ থেকে। তারপর চন্দ্রনাথের বাড়ির দ্বার থেকে তার জুড়িগাড়ি পর্যন্ত যেন বহু দূরের পথ এইভাবে হেঁটে গেল সে।

ভেতরে উঠে বসবার পর বিভ্রান্ত দুলাল মুখ বাড়িয়ে প্রশ্ন করলো, ছোটবাবু, ঐ মেয়েছিলেটি কে? অমনি নবীনকুমার তার গালে প্রচণ্ড জোরে এক চপেটাঘাত করে বলে উঠলো, চুপ কর, বেল্লিক! গাড়ি চালাতে বল্।

আজ সকালেই নবীনকুমার দুলালের সন্তানকে একটি বাড়ি দান করেছে। সুতরাং, একটা চপেটাঘাত তো তার বিনিময়ে অতি সামান্য। জুতো মেরে গরু দানের সঙ্গে এর তুলনাই চলে না।

জুড়িগাড়ির মধ্যেই ব্র্যাণ্ডির বোতল মজুত থাকে। সেই বোতলের ছিপি খুলে নবীনকুমার ঢক ঢক করে গলায় ঢালতে লাগলো। একটু পরেই সে কাঁদতে লাগলো খুঁক খুঁক শব্দে। তার বুকের মধ্যে যে শিশুটি লুক্কায়িত আছে, সেই শিশুটিই যেন অভিমানে কাঁদে। এ এমনই অভিমান, যা কিসের বা কার প্রতি কিংবা কী জন্য তা বোঝা যায় না।

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে নবীনকুমার স্নান-আহার কিছুই করলো না। তার কোনো কিছুতেই যেন রুচি নেই। তার মুখখানিতে নৈরাশ্যের কালিমা মাখানো। আজই অপরাহ্ণে সে মহাভারতের অনুবাদক হিসেবে কত বিজ্ঞ-মানী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সাধুবাদ পেয়েছে, তার নামে সবাই ধন্য ধন্য করেছে, আর এখন এই মধ্য রাত্রে সে যেন একজন নিঃস্ব, পরম দুঃখী মানুষ।

নিজের পৃথক কক্ষে শুয়েও তার ছটফটানি কমলো না। একটু পরেই সে উঠে পড়ে অন্য একটি দ্বারে করাঘাত করে ডাকলো, সরোজ! সরোজ!

সরোজিনী শশব্যস্তে উঠে এলো শয্যা ছেড়ে। ঘুম জড়িত চক্ষে সে একেবারে বিস্মিত, বিহ্বল। তার বিদ্বান, বিখ্যাত স্বামী তার প্রতি আর মনোযোগ দেয় না। কতদিন পর যে সে এই গভীর রাত্রে আবেগের সঙ্গে ডাক দিয়েছে!

দ্বার খুলে সরোজিনী বললো, আসুন, ভেতরে আসুন।

অল্প নেশাচ্ছন্ন এবং অতিশয় ব্যাকুল কণ্ঠে নবীনকুমার বললো, সরোজ, আমার কিছুই ভালো লাগচে না, আমার একদম কোনো কিচু ভালো লাগচে না, আমি কী করি বলো তো?

এবার সরোজিনীর চক্ষে দেখা দিল ত্রাস। আবার কি সেই রকম রোগ ধরলো তার স্বামীকে? সে বললো, আপনার শরীর খারাপ লাগচে? মাতা ব্যাতা কচ্চে? কোবরেজ মশাই, ডাক্তার···দুলালকে ডাকবো?

—না, না। আমার সে রকম কিচু হয়নি। আমার শরীর ভালো আচে, কিন্তু আমার মনটাকে কে যেন খিমচে ধরেচে, আমাকে কে যেন বেড়ালছানার মতন টুঁটি টিপে দুলিয়ে নিয়ে চলেছে···

—ওমা, কী সব্বোনাশ! আপনি সিরাপ খাবেন? সিরাপ খেলে যদি মন ভালো হয়···আপনার ঘর থেকে বোতল এনে দোবো?

—না, না, ও সব চাই না।

—মাতা টিপে দোবো? পা টিপে দোবো?

—সরোজ, তুমি আমার মনটা সুস্থির করে দিতে পারো? আমার সারা গায়ে যেন হাজার হাজার কাঁটা ফুটচে···

সরোজিনীর যতখানি সাধ্য, তার বেশী সে আর করবে কী করে! অনেক দিন পর স্বামী যে তার শয্যায় এসে বসেছেন, এতেই সে ধন্য। নবীনকুমার পত্নীর স্কন্ধে হাত রেখে চঞ্চল নেত্রে দেখতে লাগলো এদিক ওদিক। আসঙ্গ লিপ্সার উষ্ণতা তার স্পর্শে নেই। বরং তার ওষ্ঠের ভঙ্গিমায় গভীর কষ্ট লেখা আছে।

সরোজিনী অতি যত্নে স্বামীর পদসেবা করতে লাগলো।

একটু পরেই নবীনকুমার ধপ্ করে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়েই তন্দ্রাচ্ছন্ন হলো। গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যাবার ঠিক আগে সে ভাবলো, যত সত্বর সম্ভব সে হরিদ্বারের দিকে যাত্রা করবে। সে তার জননীকে কতদিন দেখে নি!

পরদিন সকালে নবীনকুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হলো অনেক দেরিতে।

সরোজিনী ইচ্ছে করেই তাকে জাগায় নি। বারবার এসে স্বামীকে দেখে গেছে। দু' একবার শিয়রের কাছে বসে সন্তর্পণে হাত রেখেছে স্বামীর মাথায়। দেখে দেখে আর আশ মেটে না। নবীনকুমারের শয়ন ভঙ্গিটি কেমন যেন করুণ ধরনের। তেজী, অহংকারী মানুষটি ঘুমের মধ্যে একেবারে অন্যরকম। হাত দুটি বুকের কাছে গুটোনো, হাঁটুর কাছে পা ভাঁজ করা, তার এক কাত হওয়া দীর্ঘ শরীরটি এই সময় ক্ষুদ্র দেখায়। যেন জননীর ক্রোড়ের কাছে শুয়ে আছে শিশু।

ঠিক আটটার তোপ পড়ার মধ্যেই সরোজিনী প্রতিদিন স্নান সেরে নিয়ে পূজায় বসে যায়। এমনই অভ্যেস হয়ে গেছে যে পরিপূর্ণ দিন শুরু হবার আগেই স্নান না করলে তার গা কিট কিট করে। আজ সেই নিয়মের ব্যত্যয় হলো। অনেক দিন পর তার শয্যায় তার স্বামী নিজে থেকে এসে শয়ন করেছেন, সারা রাত সরোজিনী ঘুমোতেই পারে নি। এর পর জেগে উঠে নবীনকুমারের কী মর্জি হবে, হঠাৎ কী চেয়ে বসবে, তার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পালঙ্কের পাশে একটি ছোট মোড়া টেনে নিয়ে বসে রইলো সরোজিনী। ঘুমন্ত মৃদু নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নবীনকুমারের বক্ষস্পন্দন দেখছে সে। কাল রাতে নবীনকুমারের অস্বাভাবিক ব্যাকুলতা দেখে সরোজিনী ভয় পেয়েছিল, বুঝি আবার কোনো নতুন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলো তার স্বামী। আজ সে ভয় ভেঙে গেছে। অনভিজ্ঞ চক্ষেও নবীনকুমারের নিদ্রামাখা মুখখানি দেখলে কোনো রোগব্যাধির আশঙ্কা জাগে না। নবীনকুমারের চক্ষের পাতা দুটি মাঝে মাঝে কম্পিত হচ্ছে, অর্থাৎ সে স্বপ্ন দেখছে। তার ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত।

এক একবার নবীনকুমার পাশ ফিরতেই সরোজিনী চমকিত হয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। পালঙ্কের একেবারে কিনারায় এসে পড়লেও সে স্বামীকে সরিয়ে দিতে সাহস পায় না। স্বামীর মেজাজকে সে ভয় পায়। হঠাৎ জাগিয়ে দেওয়া যদি তিনি পছন্দ না করেন।

সরোজিনীর অঙ্গে যৌবন একটু তাড়াতাড়ি এসেছে এবং যেন বেশী করেই এসেছে। সবে বিংশতি বর্ষে পা দিয়েছে সে, এর মধ্যেই বেশ ভারভাত্তিক চেহারা, মুখখানি প্রায় গোলাকার হয়ে এসেছে। সে খেতে খুব ভালোবাসে, আর ভালোবাসে ঘুম। পছন্দমত আহার, বিশেষত নানারকম ঝাল, ব্যঞ্জন আর আচার তার খুবই প্রিয়, তারপর নিশ্চিন্তে ঘুম, জীবনে এর চেয়ে শান্তির আর কী আছে! স্বামীসঙ্গ বিশেষ পায় না বলে সরোজিনী সম্প্রীতি করে নিয়েছে আলস্যের সঙ্গে, আলস্য তার অতি বিশ্বাসযোগ্য সঙ্গিনী, সে মনের দ্বার বন্ধ করে রাখে, কোনো ক্ষোভ জমতে দেয় না। সকালবেলা ঘন্টাখানেক পুজোআচ্চা করা ছাড়া সারাদিন তার আর কোনো কাজ নেই।

নবীনকুমার ঘুমের মধ্যে বলে উঠলো, অকৈতব···

সরোজিনী ব্যগ্র হয়ে উঠে এসে শোনবার চেষ্টা করলো। ঘুমেলা জড়ানো কণ্ঠস্বর এমনিতেই দুর্বোধ্য হয়, তার ওপরে ঐ শব্দটি সরোজিনীর একেবারেই অপরিচিত। সে বিস্মিত মুখখানি ঝুঁকিয়ে রইলো স্বামীর বুকের কাছে!

নবীনকুমার আবার বললো, রক্ত···সবই কি রক্তের দোষ···

তারপর পাশ ফেরা থেকে চিৎ হয়ে চোখ মেললো। সরোজিনীর মুখখানা অত কাছে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো, কে?

—আমি! আমি সরোজ।

নবীনকুমার আবার চক্ষু মুদে বললো, অত সহজ নয়···যে কোনো একটা পথ···।

নিদ্রা আর জাগরণের মধ্যকার সীমারেখাটি নবীনকুমার এখনো পুরোপুরি অতিক্রম করেনি, দু' একবার চোখ মেলেছে, আবার চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করছে আপন মনে।

একটু পরেই সে আবার চোখ চেয়ে বললো, সরোজ, এক গেলাস জল দেবে ? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

উঠে বসে, বড় রূপোর গেলাসের ভর্তি জল প্রায় এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষ করে সে বললো, আমি বুঝি তোমার খাটে এসে শুয়েচিলুম কাল ? তুমি কখন উটোচো ?

সরোজিনী যে ঐ শয্যায় আর স্থান নেয়নি, সারারাত ভূঁয়ে বসে কাটিয়েছে, সে কথা আর জানালো না।

সামান্য হেসে নবীনকুমার বললো, আজ তোমায় বেশ খাসা দেকাচ্ছে, সরোজ। কালীঘাটের পটের বউয়ের মতন গাবলা-গোবলা…।

সরোজিনী লজ্জা পেয়ে হাসলো। তার স্বামীর মুখে তার রূপের প্রশংসা। এ কথার কী উত্তর দিতে হয়, তা অবশ্য সরোজিনী জানে না।

—আচ্ছা সরোজ, আমি যদি বিলেতে গিয়ে রামমোহন কিংবা দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতন মরে যাই, তা হলে কেমন হয় বলো তো ? সাহেবরা আমার কবরের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে বেড়াবে আর তার দরুণ এ দেশে আমার অনেক সুনাম হবে।

সরোজিনীর চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হলো।

—হ্যাঁ, তুমি বিশ্বাস পাচ্ছো না ? ওদেশে মড়া পোড়াবার নিয়ম নেই, মুসলমান আর খ্রীস্টানদের মতন হিঁদু মল্লেও মাটি চাপা দেয়। আমি স্বপন দেকলুম, রামমোহনের কবরের ওপর কতকগুলোন চ্যাঙ্গড়া-চেঙ্গড়ি সাহেব মেম ধেই ধেই করে নাচচে। তারপরই দেকি যে, রামমোহনেরই কবর বটে, কিন্তু চ্যাঙ্গড়া-চেঙ্গড়িরা সাহেব মেম নয়। আমাদেরই এখেনকার হিন্দু কলেজে পড়া ছেলে আর তাদের বেটার হাফ্। তারা গান গাইচে, গাড সেইভ দি কুইন…

অকস্মাৎ কথা থামিয়ে পালঙ্ক থেকে নামবার জন্য পা বাড়ালো নবীনকুমার। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো, তারপর সরোজিনীর গাল টিপে দিয়ে বললো, তুমি বড্ড ভালো, সরোজ। ঐ যে কতায় বলে না, বোবার শত্রু নেই।

—আপনার স্নানের জল গরম কত্তে বলবো ?

—বাঃ, এই তো কতা ফুটেচে। এবার বলো, 'আপনার জন্য ভিজে ছোলা আর গুড় এনে দোবো ?' তার চেয়ে আজ অন্য কিচু করা যাক বরং। ধরো, আজ আমি দাঁতন কল্লুম না, মুখ ধুলুম না, তুমি আমার হয়ে মুখ ধুয়ে নিলে। কিংবা ধরো, আজ আমি খেলুম না, তুমি আমার হয়ে খেয়ে নিলে। আমি আজ আর ঘুমোলুম না, তুমি আমার হয়ে ডবল ঘুমিয়ে নিলে…কী, পারবে না ?

—আমি মুখ্যু বলে আপনি আমায় এইসব কতা বলচেন ?

—না, না, না, কে বলেচে তুমি মুখ্যু। ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস্। তুমি তো সুখী। লেকা পড়া করে যে, অতি অসুখী হয় সে। আহা, তোমার কোলে আজও একটা ছেলে দিতে পাল্লুম না।

—ও কতা বলবেন না। আমাদের এখুনো ঢের সময় রয়েছে…আমার ন'মাসীমা…

—তোমার ঢের সময় আচে বটে, কিন্তু আমার কি আচে ? আমি যে কাজের মানুষ, ব্যস্ত মানুষ, টুক্ করে কোন সময় সব কাজ ফুরিয়ে যাবে। একটা গান আচে জানো ? "অকাজের কাজী অকূলে ডুবালে তরী, দিন না ফুরালো, না ফুরালো বিভাবরী।" হাঃ হাঃ হাঃ…আজ সকালবেলা আমার মনটা বড় হাল্কা লাগচে, অথচ রাত ভোর কত বিদ্‌ঘুটে স্বপন দেকলুম। আমার আর একটা স্বপ্ন শুনবে ? গাদাগুচ্ছের লোক আমায় মিথ্যেবাদী বলে গঞ্জনা দিচ্চে, আঙুল দেকিয়ে দুয়ো দিচ্চে আমাকে…কিন্তু কোন্ মিথ্যের কাজ করিচি, বলো তো ? লোকগুলোনই বা কে, জায়গাটাই বা কোতায়…তাই কিচুই চিনলুম নাকো। ও হ্যাঁ, আর একটা জিনিস মনে পড়েচে, কাল রাতে ঠিক আমার মায়ের মতন…

এই সময় সরো, ও সরো বলে ডাকতে ডাকতে কুসুমকুমারী এসে দাঁড়ালো সেই কক্ষের দ্বারের সামনে। নবীনকুমারকে দেখে সে হঠাৎ থমকে গেল। কুসুমকুমারী অতি প্রাতে জেগে উঠে রোজ সারা বাড়ির তদারকি করে। নবীনকুমার ও সরোজিনীর শয়নকক্ষ পৃথক হয়ে যাওয়ার পর সে যখন তখন সরোজিনীর ঘরে আসতে দ্বিধা বোধ করে না।

স্নান সারা হয়ে গেছে কুসুমকুমারীর, চুল পিঠের ওপর খোলা। পরনে একটি হলুদ বর্ণ শাড়ী।

সরোজিনীর চেয়ে সে বয়সে কিছু বড় এবং নানারকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এলেও তার মুখমণ্ডলে এখনো বালিকা-ভাবটি লেগে আছে। তার চোখের নীলবর্ণ মণি দুটি থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়ে।

অপ্রস্তুত ভাবটি কাটিয়ে উঠে কুসুমকুমারী বললো, আজ সকালে আমাদের কী সৌভাগ্য! লক্ষ্মী-জনার্দনকে অনেকদিন পর একসঙ্গে দেকলুম। তাই ভোরবেলা উঠেই বাতাসে বসন্তকালের গন্ধ পাচ্চিলুম যেন!

নবীনকুমার চুপ করে রইলো।

কুসুমকুমারী এবার সরাসরি নবীনকুমারের দিকে চেয়ে বললো, আমাদের সরো কোনো দিন যা ভোলে না, আজ আপনি ওকে সেই ঠাকুরের পুজো পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েচেন। আপনার জন্য ওর ঠাকুর-দেবতা সব তুচ্ছ হয়ে গেল।

কুসুমকুমারীর এই রঙ্গ-সুরের কথার উপযুক্ত কোনো উত্তরই দিল না নবীনকুমার। সে শুষ্কভাবে বললো, ভালো আচেন, বৌঠান?

তারপর তার পাশ কাটিয়ে নবীনকুমার বেরিয়ে গেল সেই ঘর থেকে।

উপযাচিকার মতন নবীনকুমারের সঙ্গে ভাব করতে চেয়েও প্রত্যাখ্যাত হয়ে কুসুমকুমারীর মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়ল। তখনই তাঁর মনে হল, তার স্বামীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে কেমন হয়? নবীনকুমার যদি তাকে এতই অপছন্দ করে, তবে আর এর ছত্রছায়ায় থাকার প্রয়োজন কোথায়?

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সে সামলে নিল। সরোজিনীকে সে কিছু বুঝতে দিতে চায় না এখনই, ও বেচারির তো কোনো দোষ নেই। আবার মুখখানি সহাস্য করে সে সরোজিনীর বাহু ছুঁয়ে বললো, কী হয়েচে রে, সরোজ? মুখখানা বেজার কেন?

সরোজিনী কুসুমকুমারীকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। সে কিছুই বুঝতে পারে না বলে মাঝে মাঝে তার মধ্যে এক ধরনের তীব্র, বন্য দুঃখ জেগে ওঠে।

প্রতি সকালেই নানা ধরনের মানুষ জন অপেক্ষা করে থাকে নবীনকুমারের জন্য। সে কারুর সঙ্গেই দেখা করলো না। গতকাল রাত্রির সম্পূর্ণ দৃশ্যটি তার মাথায় বারংবার ফিরে ফিরে আসচে। চন্দ্রনাথের গৃহের সেই অজ্ঞাতনামা যুবতীটি। অবিকল তার জননীর মতন। অথচ দুলাল কোনো সাদৃশ্য পর্যন্ত লক্ষ্য করলো না। নবীনকুমারের তো চোখের ভুল নয়। তার শৈশবে সে বিম্ববতীকে ঐ রকম রূপেই দেখেছে। বিম্ববতীর একখানি অয়েল পেইণ্টিংও নেই এ গৃহে। বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর জননীর অয়েল পেইণ্টিং করাবার পর নবীনকুমারও জিদ ধরেছিল সেই সাহেব শিল্পীকে দিয়ে তার মায়ের একখানি ছবি গড়াবে। বিম্ববতী কিছুতেই রাজি হলেন না। কোনো পরপুরুষের সামনেই তিনি তাঁর অবগুণ্ঠন খুলবেন না, কোনো সাহেব তো দূরস্থান!

চন্দ্রনাথ তাকে অপমান করে দিল, তবু চন্দ্রনাথের বাড়িই তার মন টানছে। নবীনকুমার হরিদ্বার যাবার চিন্তা বিসর্জন দিয়ে আবার সে ফৌজদারি বালাখানার দিকেই যাবে বলে মনস্থ করলো। তার আগে সে ভাবতে চেষ্টা করলো যে, তার মাতৃকুলে কেউ কোথাও আছে কিনা। সে তার মায়ের মুখে অনেকবার শুনেছে যে বিম্ববতী বিবাহের পর একবারও পিত্রালয়ে যান নি। এখন কি না রাণী ভিকটোরিয়ার আমল, তাই একালের মেয়েরা অনেক সুবিধে পেয়েছে, ইচ্ছে হলে বাপের বাড়ি যেতে পারে। কিন্তু কোম্পানির আমলের শেষাশেষি অবধিও নারীদের এত সুযোগ ছিল না।

নবীনকুমার জ্ঞান হবার পর থেকেই জানে, তার মামাবাড়ি বলে কিছু নেই। তার মাতামহ ও মাতামহীর ততদিনে দেহান্ত ঘটেছে, আর কোনো পুত্র-কন্যা নেই তাদের। এতদিন পর অবিকল বিম্ববতীর মত চেহারার এক যুবতী কোথা থেকে এসে উদয় হলো তবে?

আহারাদি না করেই দুলালকে সঙ্গে নিয়ে গৃহ থেকে নির্গত হলো নবীনকুমার। সহিসকে সে ফৌজদারি বালাখানার দিকে যাওয়ার হুকুম করায় দুলাল রীতিমতন অবাক। ও রকম একটা বাড়িতে বার বার কেন সেধে সেধে যেতে চান ছোটবাবু? আবার কিসের মধ্যে তিনি জড়িয়ে পড়তে চলেছেন?

কিন্তু চন্দ্রনাথের বাসাবাড়ির কাছে এসে ওরা সম্পূর্ণ অন্য রকম দৃশ্য দেখলো।

সে স্থান একেবারে ভিড়ে ভিড়াক্কার। তার মধ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কাছাকাছি কোম্পানির বাগানের পুকুর থেকে বড় বড় মাটির জালায় করে জল বয়ে আনছে অনেক লোক। কিছু লোক অনর্থক চিৎকার চ্যাঁচামেচি করছে।

গাড়ি থেকে তড়াক করে নেমে নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কোন বাড়িটা রে, দুলাল?

—মনে তো হচ্ছে সেই বাড়িই, ছোটবাবু?

—যে করে হোক আমাদের ভেতরে যেতে হবে; তুই ব্যবস্থা কর!

কিন্তু অত মানুষের ভিড় ঠেলে এগোয় কার সাধ্য। সঠিক কী যে হয়েছে, তাও জানার উপায় নেই, গুজবে কান পাতা দায়। কেউ বলছে, শেষ রাতে এক দল দুর্বৃত্ত এসে পুরো মহল্লাটা জ্বালিয়ে দিতে গিয়েছিল। কেউ বললো, ভূত ধরার ওঝাকে ভূতে এসে শাস্তি দিয়ে গেছে। কেউ বললো, পাঁচজন লোক জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে, কেউ বললো, পনেরো জন। কেউ বললো সর্বাঙ্গ জ্বলন্ত অবস্থায় একজন রমণীকে ছাদ থেকে ঝাঁপাতে দেখা গেছে, কেউ বললো, তিনটি আধ-ঝলসানো স্ত্রীলোককে চিকিৎসালয়ে পাঠানো হলো এইমাত্র।

একটি কথা শুধু পরিষ্কার জানা গেল, এই অগ্নিকাণ্ড কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা-প্রসূত নয়, একদল হামলাকারী এসে চন্দ্রনাথের বাড়িটিতে চড়াও হয়ে তারপর অগ্নিসংযোগ করে দিয়েছে।

কারণটি অনুমান করতেও নবীনকুমারের অসুবিধে হয় না। গত রাত্রে কোন অভিযান থেকে চন্দ্রনাথ রক্তাক্ত-আহত হয়ে ফিরেছিল, তা সে কিছুতেই জানাতে চায়নি। কিন্তু বোঝাই যায় সে ঐ রমণীটিকে কেন্দ্র করেই সে কোনো সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল। সে সবলে ওকে কেড়ে এনেছে। সেই প্রতিপক্ষই পরে কোনোক্রমে চন্দ্রনাথের গৃহের সন্ধান পেয়ে প্রতিশোধ নিতে এসেছিল।

চন্দ্রনাথদের পরিণামের কথা চিন্তা করতেই নবীনকুমারের বক্ষঃস্পন্দন যেন থেমে যেতে চাইলো। দুর্বৃত্তরা কতজন এসেছিল, তা জানবার উপায় নেই, তবে যে-ক'জনই আসুক, তাদের প্রতিরোধ করবে কে? চন্দ্রনাথ গুরুতর রকমের অসুস্থ, তার আর অঙ্গুলি উত্তোলনেরও ক্ষমতা নেই, সঙ্গে এক অবলা নারী এবং সুলতান নামের ঐ ছোকরাটি। অস্ত্রধারী একটি মাত্র ব্যক্তিই ওদের পর্যুদস্ত করতে পারে।

বাড়িতে ওরা অগ্নিসংযোগ করলো কেন? নিশ্চয়ই রমণীটিকে ওরা পুনরায় হরণ করে তারপর চন্দ্রনাথ ও সুলতানকে জীবন্ত দগ্ধ করতে চেয়েছে। চন্দ্রনাথ ভালো করে না জেনেশুনে কোনো দারুণ হিংস্র পশুর গুহায় পা দিয়েছিল। এরকম কিছুর আশঙ্কা করেই সে কাল নবীনকুমারকে অনুরোধ করেছিল রমণীটিকে অন্যত্র আশ্রয় দেবার জন্য।

দুলাল অনেক চেষ্টা করেও জনতা ভেদ করে পারলো না পথ করতে। এখানকার পাঁচ মিশেলি মানুষজন কেউ নবীনকুমারকে দেখে চেনেনি। কিন্তু নবীনকুমার একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে।

ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী কয়েকজন সেপাই-হাবিলদার ছাড়াও দু'জন ইংরেজ অফিসারও এসেছে। নবীনকুমার সেই অফিসারদ্বয়ের সামনে এসে ইংরেজিতে আত্মপরিচয় দিয়ে বললো, মহাশয়, ঐ গৃহের বাসিন্দারা আমার পূর্ব পরিচিত। উহাদের ভাগ্যে কী ঘটিয়াছে তাহা আমি অবিলম্বে জানিতে চাই।

অপেক্ষাকৃত বর্ষীয়ান ইংরেজটি বললো, ওয়েল, বাবু, তোমাকে আর কী বলিব! এই সমস্ত হুজুগ-পরায়ণ নেটিভরা অকারণে ভিড় জমাইয়া আমাদের উদ্ধারকার্যে বিঘ্ন ঘটাইতেছে। উহারা সুশৃঙ্খল রূপে দূরে দাঁড়াইলে আমাদের কার্যে অনেক সুবিধা হইত। এইসব নেটিভরা কোনো সাহায্যে লাগিবার বদলে শুধু বাধারই সৃষ্টি করে। ইহাদের দূরে সরাইবার কোনো উপায় বাৎলাইতে পারো?

নবীনকুমার বললো, আপনারা হুংকার দিউন। তাহা হইলেই ব্যাঘ্রের হুংকারে মেষপালের মতন সকলে দূরে পলাইবে।

সাহেব বললো, আমরা অকারণে হুংকার খরচ করি না। তাহার বদলে নেটিভ পুলিসদের লেলাইয়া দিয়া গুটি কতক লোককে লাঠির বাড়ি খাওয়াইলে কাজ হইতে পারে মনে হয়।

ততদূরও যেতে হলো না, সাহেব দু'জন খোলা পিস্তল হাতে নিয়ে এগিয়ে যেতেই লোকদের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, কয়েকজন ছিটকে পড়লো মাটিতে, কয়েকজন ছুটে গেল তাদেরও ওপর দিয়ে, বিকট স্বরে চিৎকার শুরু করলো অনেকে।

নবীনকুমার সাহেব দু'জনের পিছু পিছু চলে এলো অনেকখানি। অগ্নিকাণ্ড এমনই ভয়াবহ হয়েছিল

যে চন্দ্রনাথের ভূতপূর্ব দ্বিতল বাসা বাড়িটি এখন একটি কঙ্কাল মাত্র। চটের বস্তা মাথায় দিয়ে কয়েকজন উদ্ধারকর্মী ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সন্ধান করে এলো কারুকে পাওয়া যায় কিনা। একটি মাত্র মৃতদেহই তারা দেখতে পেয়েছে। ইট-কাঠের জঞ্জাল যতদূর সম্ভব সরিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেও আর কারুকে পাওয়া গেল না।

সাহেব দু'জন নবীনকুমারকে ডেকে নিয়ে গেল মৃতদেহটি সনাক্ত করবার জন্য। এসব দৃশ্য সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। কিন্তু এখন উপায় নেই, সে নিজেই সাহেবদের কাছে ধরা দিয়েছে।

মৃতদেহটির দিকে এক লহমার জন্য তাকিয়েই নবীনকুমার করুণ বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, এ কে? একে তো আমি চিনি না!

লোকটি মধ্যবয়েসী, বলবান, ওপরের ঠোঁটের খানিক অংশ কাটা, মাথার চুল পুড়ে গেছে, শরীরটাও কাঠ কয়লার মতন, এমন কোনো লোককে আগে এ বাড়িতে দেখে নি নবীনকুমার। গত রাত্রে সে চলে যাবার আগে পর্যন্ত এই ব্যক্তি এখানে ছিল না।

ব্যাপারটা যেন জতুগৃহদাহের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের মতন। চন্দ্রনাথ তার সঙ্গের রমণীটি কিংবা সুলতানের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও, যে-ভাবেই হোক তারা পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। আর তাদের পরিবর্তে পুড়ে মরেছে একজন অজ্ঞাত-পরিচয় মানুষ।

খানিক বাদে অকুস্থল থেকে দূরে চলে আসার পর গাড়িতে উঠে গিয়ে নবীনকুমার চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করলো, ওরা কোতায় গেল বল তো, দুলাল।

দুলাল কোনো উত্তর দিতে পারলো না।

নবীনকুমার একটুক্ষণ চুপ করে রইলো; তার চোয়াল কঠিন হয়ে এলো। সে আবার বললো, তুই লোক জোগাড় কর। যত টাকা লাগে লাগুক, ওদের খুঁজে বার করতেই হবে।

"কোটাল, ছেড়ে দে মোরে
নিয়ে যা তুই চোর, দিগে ফাঁসি!
মালীর মেয়ে ফুল বেচে খাই,
কোন্ বেটী বা চোরের মাসী।
এ যে দেখি সৃষ্টি ছাড়া
দেখি নাক এমনি ধারা
যেমন শনিবারের মড়া,
রবিবারে হয়েছে বাসি…"

হার্মোনিয়াম সহযোগে এই গান তারস্বরে ভেসে আসছে দ্বিতলের এক কক্ষ থেকে। গৃহের সামনের পথে হুজুগ-খোর, উনপাঁজুরে লোকেরা ভিড় জমিয়েছে এই উপলক্ষে, কেউ অহো-হো বলে তারিফ করছে মাঝে মধ্যে, কেউ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠছে, কে রে? কে গায়? এ যে দেকচি স্বয়ং গোপাল!

গানটি পুরুষকণ্ঠের বটে, কিন্তু কখনো কখনো তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে কোনো নারীর বেসুরো স্বর। ভালো করে সন্ধ্যা নামেনি, এর মধ্যেই মজলিশ বেশ জমে উঠেছে বোঝা যায়। এই সব বাড়ি একেবারে বারদুয়ারী, যার খুশী প্রবেশ করতে পারে। তবে যার জেবে কড়ির জোর নেই, তাকে নোকরের হাতে কোঁৎকা খেতে হয়। নোকররাও মুখ দেখেই মানুষ চেনে।

এরই মধ্যে এক দল লোক একটা ঠেলাগাড়ি টানতে টানতে এনে এমন জমাটি ভিড় দেখে থেমে গেল। একজন হ্যাট-কোট পরা ব্যক্তি হেদোর মোড়ের কালো সাহেবের খ্রীষ্টানী বক্তৃতার ঢং-এ চিৎকার করে উঠলো, কালো জগতের আলো! আইস, আইস, দ্যাখো, দ্যাখো! কলিযুগের কী বাহার, অল্প রান্নায় অপূর্ব আহার! গিন্নীর হইল ভাবান্তর, পাকশালায় যুগান্তর!

বাঈজী গানের শ্রোতারা এবার কৌতূহলী হয়ে এদিকে মুখ ফেরালো।

ক্যাটি কেষ্ট ভায়ার মতন চেহারার হ্যাট-কোট পরা লোকটি এবার ঠেলাগাড়ির ওপরে এক লাফে চড়ে চারদিক ঘুরে দেখে নিল একবার। তারপর এক হাত কোমরে দিয়ে এক হাত ওপরে তুলে কেষ্ট যাত্রার সখীদের মতন নাচের ভঙ্গি করে গান গেয়ে উঠলো।

ময়লার সাথে মিল দেবে কী ?
গয়লা আছে হাতের কাছে
গয়লার সাথে মিল দেবে কি ?
গয়লা বেচে সাদা দুগ্ধ
বুড়ো গুঁড়ো সব যা খেয়ে মুগ্ধ
সেই দুধ কেউ ময়লা করে কি ?
গয়লা ভেয়েরা মাথায় পাগুড়ি
ডাণ্ডা হাতে লয়ে এসো আগুরি
ময়লা কইলে মেনে লবে কি ?

গায়কটি এখানে একটু থেমে মাথার শোলার টুপিটি খুলে একবার ঘাম মুছে নিল। পুনশ্চ দম নিয়ে সে বললো, ওয়েল, জেন্টেলমেন, ময়লার সাথে কেউ কি গয়লার মিল দেয়, আপনারাই বলুন ? ভেবেচিন্তে বলুন! আপনাদের ব্রেনের মধ্যে জাঁতাকল ঘুরিয়ে একেবারে ঠিকঠাক বলুন !

একজন হেঁড়ে গলায় বললো, দূর বেটা অনামুখো ! ময়লার সঙ্গে মিল দেবার জন্য মাতা খুঁড়ছিস কেন ? কয়লাই তো রয়েচে !

সবাই হো-হো করে অট্টহাস্য করলো।

হাসির রেশ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত গায়কটি অদ্ভুত মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বললো, হীয়র ! হীয়র ! ওয়েল সেইড। ভাই বেরাদরগণ আমাদের এই লার্নেড ফ্রেণ্ডের সম্মানে সবাই ক্ল্যাপ দিন ! চটাপট চটাপট চটাপট ! উনি ঠিক বলেচেন ! ময়লার সঙ্গে আমি মিল দেবার জন্য মাথা খুঁড়চিলুম, উনি কেমন যুগিয়ে দিলেন। কয়লা হলো ময়লা !

এবার সে ঠেলাগাড়ির ওপরে একটি বস্তা চাপা দেওয়া চ্যাঙারি থেকে এক ঢেলা কয়লা তুলে নিয়ে বললো, এই দেখুন, কয়লা, প্রকৃতই ময়লা, তাই না ? কয়লা হলো কালো, কুচকুচে কালো। কাক কালো, কোকিল কালো, কেষ্টঠাকুর কালো, যুবো বয়েসের মাতার চুল কালো, তা হলে এই সবই হলো গে ময়লা ! ম্যাগো ! ছিঃ, এই কয়লা, তুই ময়লা কেন রে ?

দর্শকদের একজন বললো, এ আবার কোন্ নতুন সং রে বাবা !

হ্যাট-কোটধারীটি আবার বললো, শুনুন মশায়েরা। কালো, জগতের আলো, কেমন কিনা ? ধলা, পায়ের তলা !

তারপর আবার পূর্বোক্ত ভঙ্গিতে গান :

এই যে কয়লা
এমন ময়লা
এ হলো আমার প্রাণের সয়লা !...

কেন ? বুঝিয়ে দিচ্ছি ! বাড়িতে গিন্নীর চাঁদবদনে হাসি ফোটাতে পারলে দুনিয়াটাই স্বগ্যো স্বগ্যো মনে হয় কিনা ? আপনার গিন্নীর যদি গেঁটে বাত হয়, কোমরে ফিক ব্যথা হয়, তা হলে আপনার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় কিনা ? কেন গিন্নীদের গেঁটে বাত হয় আর ফিক ব্যথা হয় ? জানেন ? কেউ জানেন ? এনিবডি ? আমাদের লার্নেড ফ্রেণ্ডটি এর রিপ্লাই দিতে পারেন ? পারবেন না ! আমি বলচি, শুনুন ! সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবার মতন এই যে বাড়ির গিন্নীদের দু বেলা অন্তত দশবার চুল্লির মুখে ফুঁ দিতে হয়। সেই জন্যই তো কোমরে ফিক ব্যথা আর গেঁটে বাত !

সকলে আবার অট্টহাস্য করে উঠলো।

লোকটি এবার কণ্ঠস্বর বদলে গম্ভীরভাবে বললো, যদি ডবকা নীরোগ গিন্নী চান, বাড়িতে কয়লা নিয়ে যান। কয়লা দিয়ে রান্না করুন। চ্যালা কাঠের যুগ শেষ ! এক বোঝা চ্যালা কাঠের বদলে এইটুকখানি কয়লায় আপনার রান্না শেষ ! কয়লার চুল্লি জ্বালাতে কোনো হ্যাপা নেই, ফুঁ দিয়ে চোখ লাল কত্তে হয় না। দুখানা ঘুঁটে তলায় দিলেই দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। কী করে সহজে কয়লার উনুন জ্বালাতে হয়, তা এখুনি দেকিয়ে দিচ্চি ! প্রাণকেষ্ট !

ঠেলা গাড়ির নিচে বসে এক ছোকরা ততক্ষণে এক তোলা উনুন সাজিয়ে ফেলেছে। সেটি এবার

ওপরে স্থাপন করলো। হ্যাট-কোটধারী সেটির দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বললো, এই যে দেকুন ! সাজাবার ক্যায়দা আচে। এতে কম কয়লা খর্চা হয়, আগুনও জ্বলে জলদি। যারা এই কায়দা শিকতে চান, আমাদের কোম্পানির প্রতিনিধি গিয়ে শিকিয়ে দিয়ে আসবে। ফ্রি অব চার্জ ! প্রাণকেষ্ট, আগুন জ্বাল !

সব সরঞ্জাম ওদের সঙ্গে তৈরিই আছে। একটি বড় মাটির মালসায় তুষের আগুন। ডগায় গন্ধক মাখানো এক টুকরো প্যাঁকাটি তার মধ্যে ঠুসে ধরতেই সেটা ফস করে জ্বলে উঠলো। তারপর তার সাহায্যে প্রাণকেষ্ট তোলা উনুনে সাজানো কয়লা ধরিয়ে ফেললো সহজেই।

সে আগুন দেখে দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো এক ধরনের। তা ঠিক বিস্ময়ের নয়। কেউ যে আগে কয়লার আগুন দেখেনি, তা নয়। কয়লার ফেরিওয়ালাও এই প্রথম নয়। তবু অনেকের মনেই কয়লা সম্পর্কে একটা বিরাগের ভাব আছে।

ফেরিওয়ালাটি উত্তম প্রচারক। সে সব রকম প্রতিক্রিয়ার কথা জানে। এবার সে বলতে শুরু করলো, মশায়েরা, জেণ্টলমেন, কয়লার এক হাজার গুণ, কিন্তু সে গুণগান না করে আমি এর কিচু দোষের কতা বলি, কেমন ? যেমন, কয়লা সত্যিই ময়লা। চ্যালা কাঠ ময়লা নয়। তাই নয় ? কয়লায় হাত দিলে কালি লাগে। ঠিক ! কিন্তু হাত ধুয়ে ফেললেই সে কালি উঠে যায়। যে-কেউ পরীক্ষা করে দেকতে পারেন। চ্যালা কাঠ থেকে যে যখন তখন চোঁচ ফুটে হাত রক্তারক্তি হয়, কয়লায় কিন্তু সে ভয় নেই। কয়লায় ধোঁয়া হয়। বেশী ধোঁয়া হয় ! ঠিক। কিন্তু কয়লার ধোঁয়ায় যে মশা মাছি পালায়, সে খবর জানেন ? পরীক্ষা প্রার্থনীয় ! বোকা লোকেরা কয়লার নামে যে আর একটা অপবাদ দেয়, সেটা কিন্তু আমরা মানবো না ! কোনো এক বাংগালা কাগচে এক পত্রদাতা লিকেচেন যে কয়লার রান্না খেলে নাকি খাদ্য ঠিক পরিপাক হয় না, হজমের দোষ হয়, অম্লরোগ হয় ! এমন গোমুখ্যুও এ দেশে আচে ! আমি আপনাদের শত শত সার্টিফিকেট দেকাতে পারি যে, কয়লায় রান্নাও যেমন তাড়াতাড়ি হয়, হজমও হয় তেমন ঘোড়দৌড়ের মতন ! কয়লার রান্না খেলে ছোট শিশুদের উদরাময় সেরে যায়। সাহেবদের কতা বাদই দিলুম, সাহেবরা তো কয়লার নাম আদর করে দিয়েচে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড, জানেন বোধ হয়, যা কয়লা, তাই হীরে ! এ ছাড়া, আমাদের দেশে শত শত বামুন পণ্ডিত, জমিদার, উকিল-মোক্তার, ডাক্তার-মাস্টার কয়লার রান্না খেয়ে ভুরি ভুরি প্রশংসা করেচেন। এই দেকুন না, আমার সঙ্গেই যে চারজন রয়েচেন, একজন বামুন, একজন কায়েত, একজন সোনার বেনে আর একজন তেলী। জিজ্ঞেস করে দেকুন, ওঁয়ারা সব্বাই গত এক বচ্ছর কয়লার রান্না খেয়ে কেমন আচেন ! আমার সামনে জিজ্ঞেস করতে হবে না, আপনারা প্রাইভেটেলি টক করে দেখুন ! ওদিকে আমাদের মোছলমান ভায়েরাও কয়লার রান্নায় দিব্যি বিরিয়ানি-পোলাও-কারি-কাবাব খাচ্ছেন ! আর ক্রিশ্চানদের তো কয়লার আঁচ ছাড়া কেক্-পুডিং তৈরিই হয় না ! আমাদের রয়াল বেঙ্গল কোল কোম্পানি চোদ্দ পয়সায় এক মণ কয়লা দিচ্চেন ! প্রথম দশ সের ফিরি। আমাদের কয়লাঘাট গুদামে গিয়ে চাইলেই প্রথম দশ সের সেম্পেল হিসেবে ফিরি পাবেন ! মনে রাখবেন মশায়েরা, নতুন যুগ আসচে, পাড়াগেঁয়ে রীত্ আর চলবে না, রান্নাঘরের আমূল সংস্কার করুন ! গিন্নীদের মুখে হাসি ফোটান ! উদরের প্রকৃত আদর করুন তা হলেই সমাজে সমাদর পাবেন !...

সন্ধ্যার পর অন্য দৃশ্যও দেখা যায়। ব্রাহ্মদের মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাব অনুপ্রবেশ করায় প্রায়ই তাঁরা দল বেঁধে সংকীর্তনে বার হন। ব্রাহ্মরা প্রায় সকলেই বিদ্বান ও উচ্চবর্ণের মানুষ বলে পথের পাঁচমিশেলি লোকদের টুটকো মন্তব্য বা ব্যঙ্গোক্তিতে তাঁরা কর্ণপাত করেন না। এ ছাড়া আছে পাড়ায় পাড়ায় হরিসভা, ব্রাহ্মদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁরাও বার করেন কীর্তনের দল। এবং ছুটির দিন হলেই শুরু হল অষ্টপ্রহরব্যাপী নাম গান, সেই সঙ্গে মুড়কি ও বাতাসা বিতরণ।

বিশেষ বিশেষ পল্লীতে বিশেষ রকম গান বাজনা। সাহেবপাড়ায় চলছে বড়দিনের মহড়া। ইডেনের বাগানে গোরারা প্রতি সন্ধ্যাবেলা হাইল্যাণ্ডার ব্যাণ্ড বাজায়, তা দর্শন ও শ্রবণ করার জন্যও প্রচুর জমায়েত হয়। নেটিভ পাড়াও পিছিয়ে নেই। দুর্গা পূজা কালী পূজার পর আর কাছাকাছি বড় কোনো পূজার উৎসব নেই, সুতরাং দেশী লোকেরা ইদানীং সাহেবদের দেখাদেখি বড়দিন পূজা শুরু করেছে। ডিসেম্বর মাস পড়তে না পড়তেই শুরু হয়ে যায় গান বাজনার ধূম। এই উপলক্ষে বড় মানুষের

সন্তানরা দেদার টাকা-পয়সা শুঁড়ি ও বারনারীদের ঘরে ঢালে।

তালতলার দিকে দেখা গেল এক চমকপ্রদ দৃশ্য। একখানি বিচিত্র আকৃতির জুড়ি গাড়ি আসছে, সেটিকে দেখতে অবিকল একটি বিশাল খাঁচার মতন! তার মধ্যে তিন-চার জন সাকরেদের মধ্যিখানে বসে আছে এক অদ্ভুত পোশাক পরা ব্যক্তি। এই বাবুটি রীতিমতন সুপুরুষ, উত্তম কোঁচানো ধুতি এবং আলপাকার কোট, মাথার চুল তো কোঁচকানো বটেই, নাকের নিচে পুরুষ্ট গুম্ফটিও কুঞ্চিত মনে হয়। এবং তাঁর দু' বাহুর সঙ্গে জোড়া রয়েছে দুটি ডানা। তিনি মৃদু মৃদু হাসছেন।

অল্প বয়েসী ছোকরাদের কাছে এই দৃশ্য অভিনব। তারা পথ চলা বন্ধ করে হাঁ করে চেয়ে থাকে। শহরের প্রবীণ লোকরা কিন্তু ঠিকই চিনতে পারে। তারাও বিস্মিত হয়ে বলে, আরে, এ সেই পক্ষীর গাড়ি না? খুব কাছে এসে তারা সেই মধ্যমণি ডানাওয়ালা বাবুটিকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে বলে, এ কি, এ তো স্বয়ং রূপচাঁদ পক্ষী মশায়!

পক্ষীর দলের শিরোমণি রূপচাঁদ পক্ষী মহাশয় ইদানীং আর বাড়ি থেকে বিশেষ বের হন না। পক্ষীর দলের সেই রবরবা অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। সেই রাজা নবকেষ্টও নেই, গোপীমোহন ঠাকুরও নেই, তেমন পৃষ্ঠপোষক আর পাওয়া যাবে না। আর সেই এক আসনে বসে একশত ছিলিম গাঁজা টানার মতন কলজের জোর দেখানো মানুষই বা কোথায়! রূপচাঁদ পক্ষী মহাশয় অনেক দিন পর্যন্ত দল টিঁকিয়ে রেখেছিলেন, তারপর কালের নিয়মে সবই নষ্ট হয়ে গেছে।

অনেক দিন পর তিনি বাগবাজারের বাসা থেকে কয়েকজন ইয়ার বক্সীর সঙ্গে বেরিয়েছেন তাঁর সেই পুরাতন, মার্কামারা গাড়িটি নিয়ে। উদ্দেশ্য বাগবাজারে গিয়ে আগেকার দিনের সঙ্গীরা যে কয়েকজন বেঁচে বর্তে আছেন, তাঁদের নিয়ে আবার একটি ঘরোয়া আসর বসাবেন। কিন্তু তাঁকে চিনতে পেরে পথচারীরা চার পাশ দিয়ে ঘিরে ধরে খাঁচা-গাড়ি আটক করে দিল। সকলের অনুরোধ, একখানা গান শোনাতেই হবে।

রূপচাঁদ দাস পক্ষী মশায়ের বয়েস এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি, কণ্ঠে আর সেই আগেকার মতন জোর কিংবা লহরী নেই। তবু এত লোকের উপরোধে তাঁকে গাইতেই হলো। গলা খাঁকারি দিয়ে তিনি ধরলেন:

চিরদিন সমান যায় না রে ভাই,
উন্নতি বিলয় প্রায় দেখতে পাই,
ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসিচে সদাই
কালে হত হবে দুনিয়া।...

কয়েকজন এনকোর, এনকোর বলে উঠলো। কয়েকজন বললো, এ গান নয়। এ বড় উঁচু ভাবের গান। একখানা রসের গান হোক!

খগপতি রূপচাঁদ হাত জোড় করে বললেন, সে রকম আর পারি না। এখন ক্ষমা দাও, ভাইগণ।

কিন্তু জনতা তা মানবে না। রসের গান শোনাতেই হবে। কেউ কেউ বলে উঠলো, সঙ্গে কল্কে নেই? দু-চার দম দিয়ে নিন না, তা হলে গলা খোলতাই হবে!

বাধ্য হয়েই রূপচাঁদ আবার ধরলেন:

গো মেনকা শোন তোর অম্বিকার গতি
গাঁজা টেনে শ্মশানে যায় পশুপতি
মাঠে ঘাটে বেড়ায় ছুটে কার্তিক-গণেশ দুই নাতি।
শৈশবে যদি শিখাতে দুটিরে
বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা আসিত পাশ করে
অনায়াসে দুটিতে বিদ্যাবুদ্ধির জোরে।
হতো হাইকোর্টের বিচারপতি...।

এতেই হাসির হর-রা পড়ে যায়। শব্দে আকৃষ্ট হয়ে নতুন লোক এসে জমে। দু' চারজন ইংরেজী শিক্ষিত যুবক অভক্তিও প্রকাশ করে। একজন বললো, ড্যাম! এই গেঁজেল পক্ষীর দল তো গোল্লায় গেসলো, আবার কি রিটার্ন করলো? কালটা কি পেচিয়ে যাচ্চে না এগুচ্চে!

কিন্তু উপভোক্তাদের সংখ্যাই বেশী। আরও কয়েকখানি গান শোনাতে হলো রূপচাঁদ পক্ষী মহাশয়কে। তারপর অনেকে মিলে সমস্বরে চিৎকার করতে লাগলো: আমারে ফ্রড করে! আমারে ফ্রড করে! ওটা একবার না শোনালে ছাড়ান-ছেড়ন নেই।

তখন রূপচাঁদ ধরলেন তাঁর বিখ্যাত গান :

আমারে ফ্রড করে কালিয়া ড্যাম তুই কোথা গেলি
আই য়্যাম ফর ইউ ভেরি সরি,
গোল্‌ডেন বডি হলো কালি।
হো মাই ডিয়ার, ডিয়ারেস্ট
মধুপুরে তুই গেলি কৃষ্ট
ও মাই ডিয়ার, হাউ টু রেস্ট
হিয়র ডিয়র বনমালী।
(শুন রে শ্যাম তোরে বলি।)
পুওর কিরিচর মিল্ক গেরেল
তাদের ব্রেস্টে মারলি শেল
নন্‌সেন্স তোর নাইকো আক্কেল
ব্রিচ অব কন্ট্রাক্ট করিলি।
(ফিমেলগণে ফেল করিলি।)

গান থামিয়ে রূপচাঁদ বললেন, আর মনে নেই।

কিন্তু মনে করিয়ে দেবার মতন মানুষ আছে। শ্রোতাদের মধ্য থেকেই দু' তিন জন বলে উঠলো, *লম্পট শঠের ফরচুন! লম্পট শঠের ফরচুন!*

রূপচাঁদ আবার ধরলেন :

লম্পট শঠের ফরচুন খুললো
মথুরাতে কিং হলো
আংকেলের প্রাণ নাশিল
কুবুজার কুঁজ পেলে ডালি....।

তালতলার রাস্তায় এই সন্ধ্যায় রূপচাঁদ পক্ষীকে পেয়ে বিনি পয়সায় দুশো মজা লুটলো পথের মানুষ। তাদের মধ্যে আগাগোড়া প্রচ্ছন্নভাবে মিশে রইলো নবীনকুমার।

দুলালের ধারণা, তার বাবুর মাথাটি বিগড়ে গেছে একেবারে। অতি অল্প বয়েস থেকেই সে নবীনকুমারের নানা প্রকার উৎকট বাতিকের সঙ্গে পরিচিত, যুবাবয়েসে তার খামখেয়ালিপনা বেড়েছে বই কমেনি, সদাসর্বদা দুলাল ছায়ার মতন তার পশ্চাতে থেকে তাল সামলেছে। কিন্তু এখন এ কী অবস্থা, এর যে কোনো প্রকার মাথামুণ্ডু নেই। এ নিশ্চয়ই এক প্রকার গুপ্ত উন্মাদ-রোগ।

এ বিষয়ে দুলাল আর পাঁচ জনের সঙ্গে পরামর্শ করারও সাহস পায় না। অন্তত গঙ্গানারায়ণকে একবার জানানো কর্তব্য, কিন্তু গঙ্গানারায়ণের সামনে এসেও দুলাল বলি বলি করেও কথাটি মুখ ফুটে বলতে পারে না। তার পশ্চাতে তার সম্পর্কে দুলাল কিছু আলোচনা করেছে, একথা নবীনকুমার জানতে পারলে চটে একেবারে আগুন হবে, এমন কি দুলালের গর্দানও চলে যেতে পারে।

নবীনকুমারের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে এই নগরীর বড় মানুষদের সমাজ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে যথেষ্ট, বাইরের ঠাট-ঠমক ভেদ করে অনেকেরই ভেতরের আসল স্বরূপটি জানতে তার বাকি নেই। সেই সব মানুষদের তুলনায় তার মনিব নবীনকুমার সিংহকে সে অগাধ শ্রদ্ধা না করে পারে না। তবু, এতদিন পর দুলালের ইচ্ছে হয় তার মনিবকে ছেড়ে চলে যেতে।

এতকাল নবীনকুমারের সংস্পর্শে থেকে তার চরিত্রের খানিকটা প্রভাব দুলালের ওপরেও পড়েছে। অন্যান্য সাধারণ মানুষদের তুলনায় তার মন অনেকখানি মুক্ত, ভূত-প্রেত কিংবা দেব-দ্বিজের প্রতি তার

অহেতুক ভয় বা ভক্তি নেই। কোনোদিন পাঠশালা-বিদ্যালয়ে না গেলেও সে নিজের চেষ্টায় কিছুটা লেখাপড়া শিখেছে। সে নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ করে এবং সুন্দর চিঠি লিখতে পারে। সিংহ-বাড়ির অনেকেই পত্র-রচনার প্রয়োজনে দুলালের শরণাপন্ন হয়। তার হস্তাক্ষর দেখে চমৎকৃত হয়ে নবীনকুমার একদিন বিশেষ তারিফ করেছিল। এবং যে-ক'মাস নবীনকুমার 'পরিদর্শক'-এর সম্পাদক ছিল, তখন মধ্যে মধ্যে সে দুলালকে দিয়ে নিজের রচনা কপি করিয়েছে।

দুলাল যেমন নবীনকুমারের সব হুকুম বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করে, সেইরকম নবীনকুমারও দুলালের প্রতি সর্বদা উদার হস্ত। কিছুদিন আগে সে দুলালের পুত্রের নামে একটি বেশ বড় বাড়ি লিখে দিয়েছে, দুলালের বর্তমান বেতন একশো পঁচিশ টাকা, সওদাগরি হৌসের ইংরেজী জানা, পাশ করা কেরানীরা এর অর্ধেক বেতনও পায় না। এ ছাড়া নবীনকুমারের যখন তখন খুশির বখশিশ তো আছেই। দুলালের আহার বাসস্থান বাবদ কোনো ব্যয় নেই, তার পুত্রটি বেশ ডাগরটি হয়েছে, এখন ইস্কুলে পড়তে যায়, নবীনকুমারের নির্দেশে সে-খরচও বহন করে এস্টেট। পদমর্যাদায় দুলালচন্দ্র যদিও এখনো নবীনকুমারের নিজস্ব ভৃত্য এবং শরীররক্ষী, কিন্তু মনে মনে সে রূপান্তরিত হয়ে গেছে মধ্যবিত্তে। এবং মধ্যবিত্তের প্রধান কাম্য সামাজিক পরিচিতির ঠাট, দুলালের অন্তরেও সে আকাঙ্ক্ষা জাগা স্বাভাবিক। তাই সে আর ভৃত্য থাকতে চায় না, সে নিজেই নিজের জন্য ভৃত্য রাখতে চায়।

বস্তুত,সারা জীবন সে যদি শুধু পরের গোলামীই করে যাবে, তা হলে আর অর্থ সঞ্চয় করে লাভ কী হলো! স্ত্রী-পুত্র নিয়ে নিজস্ব গৃহে সে যে পৃথক একটি সংসার পেতে বসবে, তার উপায় নেই, কারণ, তার নিজস্ব কোন সময়ই নেই! নবীনকুমার কখন হুটহাট করে কোথায় যায় তার ঠিক নেই, এবং যখনই ডাক আসবে, তখনই দুলালকে যেতে হবে। জুড়িগাড়ির পশ্চাতে দণ্ডায়মান থাকতে হয় দুলালকে, লোকে মনে করে সে বুঝি সহিস শেখ ইদ্রিসের সহকারী। যে-সব মানুষ তার নোখেরও যুগ্যি নয়, তারাও তাকে 'তুই' সম্বোধনে কথা বলে। মধ্যবিত্ত মানসিকতা সদ্য যার মনে জেগেছে, তার কাছে এর চেয়ে অসহ্য পীড়াদায়ক আর কী হতে পারে!

দুলালের হাতে এখন যা নগদ অর্থ আছে, তা দিয়ে অনায়াসেই সে একটি ব্যবসা শুরু করতে পারে। তার খুব ইচ্ছে একটি বইয়ের দোকান খোলা। স্কুল-কলেজের সংখ্যা যেমন দিন দিন বাড়ছে, তেমন বই-খাতা-কালি-কলম-দোয়াতের চাহিদাও বাড়ছে হু-হু করে। পটলডাঙ্গা কিংবা সানকিভাঙা অঞ্চলে একখানা বাড়ি ভাড়া করে সে দিব্যি একটি দোকান খুলে বসতে পারে। বইয়ের দোকান খুললে অতিরিক্ত লাভ হবে এই, সে নিজে বিনি পয়সায় সব বই পড়ে ফেলতে পারবে। দুলাল ইদানীং প্রায়ই এই স্বপ্নটি দেখে। মস্ত বড় দোকানে খাটাখাটি করছে কর্মচারীরা, পেছন দিকে ক্যাশের টেবিলে বসে আছে দুলাল, পরণে ফরাসডাঙার তাঁতীদের বেঁচে থাক বিদ্যেসাগর ধুতি, মলমলের পাঞ্জাবী, কাঁধে গোলাপী রঙের উড়ুনি, চোখে চশমা, মুখে পান, মাথার চুল টেরি-কাটা, বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পাঠ্য বইয়ের লট কেনবার সময় বেশী কমিশন পাবার লোভে,এই যে দুলালবাবু, আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা ছিল, এই বলে খাতির করে কথা বলবে। নবীনকুমারের জন্য বিভিন্ন সময় পুস্তক ক্রয় করতে গিয়ে দুলাল এইরকম দৃশ্য দেখেছে। ...পুস্তক ব্যবসায়ী বলে পাড়া-প্রতিবেশীরা অতিরিক্ত খাতির করবে দুলালকে, চাঁদা চাওনীরা এসে বলবে, আপনার মোশাই দোকানের অমন রমরমা, আপনি অন্তত পঞ্চাশটি টাকা না দিলে কী মান থাকে.....।

কিন্তু নবীনকুমার স্বেচ্ছায় মুক্তি না দিলে দুলালের এই স্বপ্ন সম্ভব হবেই বা কী করে! দুলাল কারুর কাছে দাসখৎ লিখে দেয় নি, মহারানীর রাজত্বে সে স্বাধীনভাবে যেখানে খুশী চলে যেতে পারে, কিন্তু এতখানি কৃতঘ্ন আর নিমকহারাম যে সে নিজেই হতে পারবে না।

রাত কত তার ঠিক নেই, চতুর্দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, এক মজা পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে আছে নবীনকুমারের জুড়িগাড়ি। পেছনের তক্তাটিতে বসে আছে দুলালচন্দ্র। মুখখানি তার বিরক্তিতে তিক্ত, ইচ্ছে থাকলেও ঘুমোবার উপায় নেই, এমন মশার উপদ্রব। মাঝে মাঝে ঢুলুনি আসছে আবার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে এক ঝাঁক মশার আক্রমণে। মশা মারার চটাস চটাস শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। ঘোড়ারা দাঁড়িয়েই ঘুমোয়, গাড়ির ছাদে শেখ ইদ্রিশও কাঁথা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, মশার কামড়ে তারাও ছটফট করে মাঝে মাঝে। নবীনকুমার কোথা থেকে কী অবস্থায় বা কখন ফিরবে, তার কোনোই ঠিক নেই। এইরকম অবস্থায় আরও বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে দুলাল, কিন্তু এখন যেন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। শারীরিক কষ্টটাই বড় কথা নয়, নবীনকুমারের অদ্ভুত জীবন-যাপন পদ্ধতিই তার কাছে বেশী কষ্টকর। জোড়াসাঁকোর সিংহ-বাড়ির প্রধান পুরুষের এই পরিণতি!

চন্দ্রনাথের বাসাবাড়িটি ভস্মীভূত হবার পর তাদের আর কোনোরকম সন্ধান পাওয়া যায় নি। তাদের খুঁজে বার করবার জন্য নবীনকুমার গণ্ডা গণ্ডা লোক নিযুক্ত করেছিল, ব্যর্থ হয়েছে সকলেই। চন্দ্রনাথ যেন উপে গেছে কর্পূরের মতন। অথবা ভূত ধরার ওঝা নিজেই এখন ভূতপূর্ব।

কিন্তু নবীনকুমার কিছুতেই তা মানতে রাজি নয়। চন্দ্রনাথের শরীরের গুরুতর জখম সে নিজের চক্ষে দেখেছে, ওরকম আহত অবস্থায় কোনো মানুষের পক্ষে কিছুতেই বেশী দূর যাওয়া সম্ভব নয়। শত্রু পক্ষের চক্ষু এড়িয়ে সে নিশ্চিত এই নগরীর কোথাও আত্মগোপন করে আছে।

নবীনকুমার-নিযুক্ত চরেরা ব্যর্থ হবার পর নবীনকুমার নিজেই সে ভার নিয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভূতগ্রস্তের মতন সে গৃহ থেকে নির্গত হয়, তারপর বিভিন্ন কু-পল্লীত অনুসন্ধান চালায়। নবীনকুমারের ধারণা, আত্মগোপন করার পক্ষে ঐ সব অঞ্চলই বেশী সুবিধাজনক। কারুর কাকুতি-মিনতি, অনুরোধ-উপরোধে সে কর্ণপাত করে না। সবচেয়ে ভয়ংকর কথা, সম্প্রতি সে একা যেতে শুরু করেছে। বাড়ি থেকে সে জুড়ি গাড়িতেই বার হয় বটে, তারপর কোনো এক স্থানে সে গাড়িকে অপেক্ষা করতে বলে পরিভ্রমণ করে পদব্রজে। হ্যাঁ, পদব্রজে, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে ধনীকুলচূড়ামণি রামকমল সিংহের একমাত্র সন্তান নবীন্‌কুমার সিংহ সাধারণ পাঁচপেঁচি মানুষের মতন পায়ে হেঁটে পথে পথে ঘুরছে। অনেক সময়ই লোকে তাকে চিনতে পারে, সবিস্ময়ে তাকায়। সমাজের উঁচু মহলে এই বিষয়ে নানা রকম গুঞ্জন শুরু হয়েছে, দু' একটি বাংলা সংবাদপত্রে বাঁকা মন্তব্যও প্রকাশিত হয়েছে। লোকে চিনুক বা বিরূপ মন্তব্য করুক, তার চেয়েও বড় কথা, এর মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা আছে পদে পদে। এই সব পল্লীতে খুনে-ঠ্যাঙাড়ের অবাধ বিচরণ, তাদের হাতে যে-কোনো মুহূর্তে পড়তে পারে নবীনকুমার। তবু সে ভ্রূক্ষেপহীন। দুলালকেও সে সঙ্গে নিতে চায় না। দুলাল গোপনে তাকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। নবীনকুমারের এ আচরণের অর্থ বার করা সত্যিই তো দুঃসাধ্য। যদি শখ হয় রাখুক না সে দশ-বিশটা রক্ষিতা, যদি মদ্যপানের নেশা ধরে থাকে, এক সমুদ্র ব্র্যাণ্ডি-শ্যাম্পেন পান করতে তাকে কে বাধা দেবে ? কিন্তু অন্ধকার গলি ঘুঁজিতে পায়ে হেঁটে হেঁটে ঘুরে সে বুনিয়াদী সমাজের নাম ডোবাতে চাইছে কেন ? একে উন্মাদ-দশা ছাড়া আর কী বলা যায় ?

কোনো গলির মাথায় হলুদ রঙের অর্ধেক চাঁদ উঠেছে, বাকি আকাশে মেষরোম মেঘ, কেমন যেন অপ্রাকৃত আলো পড়েছে পৃথিবীতে, শীতের বাতাসে যাই যাই শব্দ। পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যায় নবীনকুমার। তার মনে প্রশ্ন জাগে, আমি এমনভাবে কোথায় চলেছি, কেন চলেছি ? কোন্ আলেয়ার সন্ধানে আমি এমন ঘুরে ঘুরে মরছি !

আলেয়াই বটে ! শুধু তো চন্দ্রনাথকে খুঁজে বার করার জন্য তার এত শিরঃপীড়া নয়। সে চায় সেই রমণীটিকে আর একবার দেখতে। কে সেই রমণী ? কোনো ভদ্রঘরের কুলবধূ নিশ্চয়ই নয়, তা হলে অত রাতে চন্দ্রনাথের সঙ্গে সে আসবে কেন ? চন্দ্রনাথকেও নবীনকুমার যতটা চিনেছে, তাতে তাকে কারুর বাড়ির বউ-ঝি ফুস্‌লে আনার মতন প্রবৃত্তির মানুষ মনে হয়নি। বরং স্ত্রী জাতি সম্পর্কে তার ব্যবহারে খানিকটা বিরাগ ভাবই প্রকাশিত হতো। তা হলে কে ঐ নারী ?

নবীনকুমার তো একথা কারুকে বলতে পারবে না যে এক অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীকে অবিকল তার মায়ের মতন দেখতে বলেই সে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ! সে নিজের মাকেই দেখেনি কতদিন, হরিদ্বারে মাতৃ সন্নিধানে যাবে বলে সঙ্কল্প নিয়েছিল, তাও এখন শিকেয় তোলা। ঐ রমণীটিকে দ্বিতীয়বার না দেখতে পেলে তার কিছুতেই শান্তি হবে না।

মাঝে মাঝে সে নিজেই নিজের কাছে প্রশ্ন তোলে যে, ওর সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হলেই বা কী হবে ? একজন বিপথগামিনী স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার মায়ের মুখের আদল যদি থাকেও, তাতেই বা কী আসে যায় ? তাকে খুঁজে বার করবার জন্য এই গোঁয়ার্তুমি কেন ? এর উত্তর নবীনকুমার নিজের কাছে দিতে পারে না। দুলাল ঐ স্ত্রীলোকটির সঙ্গে বিম্ববতীর কোনো মিল খুঁজে পায়নি, হয়তো সবটাই নবীনকুমারের দৃষ্টিবিভ্রম। তবু সে আর একবার মিলিয়ে দেখবেই। সন্ধে হবার পর এই জেদ ছাড়া তার আর কিছুই মনে থাকে না।

সুস্থ মস্তিষ্কে, স্বচ্ছ চোখে নবীনকুমার ঐ সব গৃহে প্রবেশ করতে পারে না, কারণ নোংরা পরিবেশ, নানা রকম খাদ্য পানীয়ের মিশ্রিত বিকট গন্ধ তাকে পীড়া দেয়। অপরিচ্ছন্নতার প্রতি তার তীব্র ঘৃণাবোধ আছে। সেই জন্য সে শুরু থেকেই মদ্য গলায় ঢেলে চক্ষু রঙীন করে নেয়, তখন আর নাকে অন্য কোনো ঘ্রাণ আসে না। এক গৃহ থেকে অন্য গৃহে পরিক্রমার সময় মদ্যপান বাড়তেই থাকে।

এক-একটি বারবনিতার কক্ষের দ্বারে আঘাত করে সে বাইরে দাঁড়ায়। প্রথমে বারবনিতাটির মুখ দেখে সে নিরাশ হয়, গলায় এক ঢোক ব্র্যাণ্ডি নেয়, তারপর চন্দ্রনাথ ও সেই রমণীটির বর্ণনা দিয়ে বলে, এরা কোতায় থাকে জানো? দ্বিতীয়বার নিরাশ হয়ে সে কুর্তার পকেট থেকে দশ-বিশ টাকা বার করে বারবনিতাটির দিকে ছুঁড়ে দেয়।

এইভাবে গত কয়েক মাসে নবীনকুমার দুই সহস্র চারশত বাহাত্তরটি রূপোপজীবিনীর মুখ দর্শন করেছে। কিন্তু স্পর্শ করেনি একজনকেও। তার পরিচ্ছন্নতার বাতিক, অপরের উচ্ছিষ্ট খাদ্য সে প্রাণ গেলেও গ্রহণ করতে পারবে না।

দিনের বেলায় নবীনকুমার স্বাভাবিকভাবে কিছু কাজ কর্ম করে। গীতা অনুবাদের কাজ শুরু হয়েছে, সম্পূর্ণ রামায়ণের গদ্য অনুবাদের জন্য তোড়জোড় চলছে। দরিদ্র গ্রন্থকারদের পুস্তক রচনায় সাহায্য ও প্রকাশের ব্যয় বাবদ সে মুক্তহস্তে সাহায্য করে। দুটি স্কুল ও একটি মাদ্রাসা স্থাপনের ব্যাপারে সে প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আদালতে দেশীয় বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে একটা আন্দোলন গড়ে তোলায় সে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু রাত্রিকালে সে অন্য মানুষ।

একদিন নবীনকুমারের নামে পার্শেল যোগে একটি পুস্তিকা এলো। সেটির নাম 'আপনার মুখ আপনি দেখ'। কয়েকটি পৃষ্ঠা অবহেলার সঙ্গে ওল্টাতেই তার মনোযোগ আকৃষ্ট হলো বিশেষ ভাবে। পুস্তিকাটি তার সম্পর্কেই লিখিত। হুতোম প্যাঁচার নক্সা লিখে সে সমাজের অনেক ভণ্ড মহৎবাবুদের বিষ নজরে পড়েছিল, তাদেরই কেউ কোনো ভাড়াটে লেখক দিয়ে এই আক্রমণাত্মক রচনাটি লিখিয়েছে। এতে নবীনকুমারের নাম দেওয়া হয়েছে নববাবু। ওষ্ঠে মৃদু-মৃদু হাস্য রেখে নবীনকুমার পুস্তিকাটি পড়ে যেতে লাগলো। ভাড়া করা লেখকটি লিখেছে অনেক কিছুই, নবীনকুমারের বাল্যকাল, তাঁর নাটক ও অভিনয়ের প্রশংসাই করেছে, যদিও এর ভাষা একেবারে হুতোমের নকশারই অক্ষম নকল। ক্রমে দেখানো হয়েছে, এই নববাবু কেমন ভাবে মদ, মেয়েমানুষে আসক্ত হলো। বিদ্যোৎসাহিনী সভা স্থাপনের ভড়ং করে নববাবু আসলে ইয়ার-বক্সীদের নিয়ে পঞ্চ ম-কারের চর্চা করেন,...."নববাবু সভাবাবুদিগকে মেয়েমানুষের কথা জিজ্ঞাসা করায় ঘোষজা বলিলেন, মহাশয়, অনেক বেটীর সঙ্গে আলাপ আছে, আর আলাপ না থাকলে অবিদ্যাদের সঙ্গে আলাপ করবার মুশকিল কি? মিত্রবাবু বলিলেন, মহাশয়, আলাপ নাই এমত মেয়েমানুষ নাই!...বাবু বলিলেন, কেন গো, আপনি যে সতী সাবিত্রীর মতন কথা কোচ্চেন, তবে এ পথে এসে কেন দাঁড়ালেন? খান্‌কী হয়ে তোমাদের কি এরূপ কথা বলা সাজে?..."

পড়া শেষ করে নবীনকুমার খুব এক চোট হাসলো। এর আগে সংবাদপত্রে দু-একটা ছুটোছাটা মন্তব্য তারও চক্ষু এড়ায়নি। ব্যাপার তবে এতদূর গড়িয়েছে যে এখন তাকে নিয়ে বই লেখা হয়! এই লেখকের ধারণা যে নবীনকুমার এ শহরের কোনো মেয়েমানুষকেই ভোগ করতে বাকি রাখেনি। ভাবুক, ওদের যা ইচ্ছে ভাবুক।

মধ্যরাত পার হয়ে গেছে কখন, দুলাল জুড়িগাড়ির পশ্চাতের তক্তায় বসে মশার দংশনে ছটফট করছে, আর সেই সময় নবীনকুমার একাকী ঘুরছে ওলাইচণ্ডী তলার একটির পর একটি বাড়িতে। তার চক্ষু জবাফুল বর্ণ, পদদ্বয় আর মস্তিষ্কের ভার বহন করতে চাইছে না, তবু তার গৃহে ফেরার কথা মনে নেই। যত নেশা বাড়ে, তত বাড়ে তার জেদ আর দুঃখ, কেন সে তার মাতৃ-মুখী সেই রমণীকে আর দেখতে পাবে না? কেন একই রকম রূপের দুটি রমণীর একজন হয় স্নেহময়ী পুতচরিত্রা নবীনকুমারের জননী আর অন্যজন হয় বারনারী?

একটি কক্ষের দ্বারে করাঘাত করে নবীনকুমার বললো, খোলো!

ভিতর থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর এলো, হবে না, হবে না, যাও। আমার লোক আচে!

নবীনকুমার বললো, সে থাকগে যাক, একবারটি শুধু তোমার মুখটি দেকবো, যত টাকা লাগুক—

—কে রে, মুখপোড়া, দূর হ !

—একবারটি খোলো, আমি আর কিছুই চাই না, শুধু দেকবো—

—আরে আমার পিরীতের নাগর রে ! শুধু দেকবো ! যা, যা—

এরূপ কিছু বাক্য বিনিময়ের পর তিতিবিরক্ত হয়েই স্ত্রীলোকটি দ্বার খোলে। দু' জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে যেন তড়িতাহতের মতন স্থাণু হয়ে গেল।

স্ত্রীলোকটিই কথা বললো প্রথম। সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে সে বললো, তুমি ? কেষ্টঠাকুর! আমায় খুঁজতে খুঁজতে এত দূর এসোচো ? এসো, এসো, ভেতরে এসো, তোমায় আমার আঁচল পেতে বসতে দোবো ··

স্ত্রীলোকটি বিস্মিত স্তম্ভিত নবীনকুমারের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে।

নবীনকুমারকে বিস্ময় বিমূঢ় অবস্থায় চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রমণীটি হা হা শব্দে উচ্চহাস্য করে উঠলো, তার শরীরটি দুলতে লাগলো বেতস লতার মতন। পশ্চিমা বাঈজীদের মতন তার অঙ্গে অত্যুজ্জ্বল লাল মখমলের কামিজ, দুই চক্ষে গাঢ় সুর্মা, চুড়ো করে চুল বাঁধা। চক্ষের মণি দুটি যেন দু' টুকরো হীরে। প্রথম নজরে রমণীটিকে মনে হয় যেন এক ভয়ংকরী অগ্নিশিখা !

নবীনকুমারের হাত চেপে ধরে সে বললো, হাঁ করে দেকচো কী গো ? ওগো নবদুর্বাদলশ্যাম, আমায় চিনতে পারো নি ? আমি যে তোমার সেই শিক্‌লিকাটা পাখি !

নবীনকুমার অস্ফুট কণ্ঠে বললো, সুবালা !

প্রায় হ্যাঁচকা টানে নবীনকুমারকে কক্ষের মধ্যে এনে সুবালা বললো, না গো, সে সুবালা আর নেই কো ! আমি এখুন পুত্‌লী বাঈ। তবে জানতুম, তুমি একদিন না একদিন আসবে ! প্রাণের টান কি কোনোদিন ছেঁড়া যায় ?

কক্ষের এক ধারে মদ্যপানরত দুই ব্যক্তি এদের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসেছিল। তাদের একজনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে বললো, ছেলাম আলেকুম, বস্তে আজ্ঞা হোক, ছায়েব, আমায় চিনতে পারেন নি !

নবীনকুমারের তখনও বিস্ময়-বিমূঢ় অবস্থা কাটেনি। তাছাড়া চক্ষে নেশার ঘোর। লোকটির মুখখানি সামান্য পরিচিত হলেও আর কিছু সে ধরতে পারলো না। বস্তুত সুবালাকে দেখার পর থেকেই তার শরীরে একটু একটু করে ক্রোধের উত্তাপ সঞ্চারিত হচ্ছে। এই সুবালা তার জীবনের একটি ব্যর্থতার প্রতীক।

সে আর কোনো কথা না বলে তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই সুবালা ছুটে গিয়ে দ্বার রুদ্ধ করে সেখানে পিঠ ঠেস দিয়ে দু' বাহু ছড়িয়ে দাঁড়ালো। তারপর হীরামন পাখির মতন তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, কোতায় যাচ্চো, নাগর ! এতদিন পর তোমায় পেয়েচি। আমারই খোঁজে এতদূর এসে আবার অমনি সট্‌কান দিতে চাইচো যে ? এ কী খেলা তোমার, নাথ ? ঘরে অন্য লোক দেখে বুঝি তোমার গোঁসা হয়েছে ?

নবীনকুমার বললো, পথ ছাড়ো !

সুবালা দু'দিকে ঘাড় হেলিয়ে বললো, উঁহু ! সেটি হচ্চে না। যাবো বললেই কি যাওয়া হয় ? এতদিন পরে এসোচো, বঁধু, আধো আঁচরে বসো, পান খাও, দুটো রসের কতা শোনাও···ওরা দু'জনে এক্ষুনি চলে যাবে···ওরা আমার রোজকার নুন-পান্তা, আর তুমি হলে গে পোলাও কালিয়া···

নবীনকুমার বললো, আমায় যেতে দাও ! আর কোনোদিন তোমার মুখ দেকতে হবে আমি ভাবিনি—

সুবালাও কম নেশাগ্রস্ত নয়। কথার ফাঁকে ফাঁকে সে বারবার তার জিহ্বা দিয়ে ডালিম-রঙা ওষ্ঠ লেহন করছে। উত্তম সাজসজ্জায় এবং মাজাঘষায় তার রূপ অনেকটা বৃদ্ধি পেলেও এই কয়েক বৎসরের ব্যবধানে তার মুখে যেন একটা নিষ্ঠুর ভাব এসেছে।

সে বললো, আহা-রে মরে যাই ! মরে যাই ! আমার মুক দেকতে হবে ভাবো নি ! ও মুক দেখিলে অঙ্গ জ্বলে, না দেখিলে মন সদা উচাটন ! তোমার তবে সেই অবস্থা ! এতদিন পর খুঁজে খুঁজে তবে আমার দুয়োরে এসে কেন দাঁড়ালে, বংশীধারী ? তোমায় দেকে আমারও গা জ্বলে যাচ্চে, তুমি আমার

শত্তুর, পরম শত্তুর, তবু তোমারই প্রতীক্ষেতে এতকাল ঘুমহারা নয়নে বসে আছি।

এর পর সুবালা গান ধরলো :

এক কর্ণ বলে আমি কৃষ্ণনাম শুনিব,
আর এক কর্ণ বলে আমি বধির হয়ে রব।
(ও নাম শুনবো না, শুনবো না, নিলাজ বঁধুর নাম
শুনবো না, শুনবো না)
এক নয়ন বলে আমি কৃষ্ণরূপ দেখিব
আর এক নয়ন বলে আমি মুদ্রিত হয়ে রব
(ও রূপ দেখবো না, দেখবো না, কালীয় কুটিলের রূপ
দেখবো না, দেখবো না !)

এই গানের সময় মাতাল বাবু দুটির একজন অপরের পৃষ্ঠদেশকে ডুগিতবলা বানিয়ে তাল দিতে শুরু করে, রীতিমতন আড়ে ঠেকা সহযোগে।

নবীনকুমার বিরক্তি কুঞ্চিত মুখে আর এক পা অগ্রসর হয়ে বললো, আমায় যেতে দাও ! তোমাদের ছুঁতে চাই না আমি, নইলে জোর করে তোমায় সরিয়ে দিতুম !

সুবালা বললো, কী, আমাদের ছুঁতে চাও না ? আমাকে তুমি ঘরের বার করে এনোচো, ভদ্রঘরের বউ ছিলুম, বাজারে মাগী করোচো, এখন বলে ছুঁতে চাই না ! এখন বিড়েল তপস্বী সাজচো !

সুবালার এমন নৃশংস মিথ্যাভাষণে নবীনকুমার একটুক্ষণের জন্য আবার বাক্যহীন হয়ে যায়। এ সর্বনাশিনী বলে কি ? এক কদর্য পতিতালয় থেকে একে উদ্ধার করে নবীনকুমার একে সুস্থ জীবন ফিরিয়ে দেবার সর্বরকম চেষ্টা করেছিল, তা সে তুচ্ছ করে আবার এই নারকীয় জীবনে ফিরে এসেছে। সে এখন অপর লোকদের সামনে এই অপবাদ দিচ্ছে !

সুবালা অন্য লোক দুটির দিকে চেয়ে আদেশের সুরে বললো, তোরা এই মিনসেটাকে পেড়ে ফ্যাল তো ! আজ আমি ওর বুকে বসে দুরমুস্ করবো !

সুরাপায়ী দু'জনের মধ্যে যে নবীনকুমারকে সনাক্ত করেছিল, তার মাথায় একটি ফেজ, চিবুকে ছুঁচোলো দাড়ি অনেকটা মেহেদী রঙের, সে জিহ্বা বার করে বললো, তোবা, তোবা ! এসব কী বলছো গো পুত্লীবিবি ! এই বাবু কতবড় ইমানদার আদমী, সারা বাংলা মুলুকে কে না ইনাকে চিন্‌হে !

লোকটি এসে নবীনকুমারের সামনে দাঁড়িয়ে অনেকখানি ঝুঁকে সেলাম বাজিয়ে বললো, সিংহী ছায়েব আপনে যখন উর্দু 'দূরবীন' আখবরের মালেক ছিলেন, তখন আমি সেখানে কুছুদিন সব্ এডিটারি করেছি। আপনার মনে নেই····

নবীনকুমারের মনের মধ্যে এমনই ঝঞ্ঝা চলছে যে সে এই লোকটি বিষয়ে মনঃসংযোগই করতে পারলো না। সে যে-কোনো প্রকারে এখান থেকে চলে যেতে চায়।

ফেজ পরিহিত লোকটি তার সঙ্গীর হাত ধরে টেনে, নবীনকুমারকে এড়িয়ে সুবালার কাছে এসে জানালো যে, সুবালার পুরোনো প্রেমিক এসেছে, তাদের মান-অভিমানের পালায় অন্যলোকের উপস্থিতি শোভা পায় না। সুতরাং তারা এখন বিদায় নিচ্ছে। তবে বাবু নবীনকুমার সিংহের যাতে কোনোরকম বে-ইজ্জতী না হয়, সেটা তার দেখা উচিত।

লোক দুটি নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্র দরজায় অর্গল লাগিয়ে সম্পূর্ণ অন্যরকম কণ্ঠস্বরে সুবালা বললো, আমি আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়িচি, না ? আপনার দাঁড়ের সোনার শিক্‌লি কেটে আমি একদিন ফুরুৎ করে উড়ে গিয়ে নীল আকাশে ডানা মেলেচিলুম···

নবীনকুমার কক্ষের সব দিকে চক্ষু বুলিয়ে বললো, এই নীলাকাশ ?

সুবালা আবার হাসলো। এগিয়ে এসে নবীনকুমারের কণ্ঠে দু'টি হস্ত স্থাপন ক'রে বললো, যার যা নিয়তি ! এই দুনিয়াটাই হলো গে ধোঁকার টাটি। চক্ষু বুজলে এই ঘরটাই আকাশ। তেমন তেমন কপাল হলে চোখ মেললেও কেউ কোনোদিন আকাশ দেকতে পায় না। আসলে এই শরীরটাই তো খাঁচা গো ! শোনো নি সেই গান, খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কমনে আসে যায়। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে এক ফকির এই গান গাইতে গাইতে যেত। এ বাড়ি নয়গো, আমার বাপের বাড়ি, সে অনেককাল আগেকার কতা ! সেই অচিন পাখিটা যেদিন এই খাঁচা ছেড়ে যাবে, সেইদিন নীলাকাশের সন্ধান পাবো !

সুবালার হাত দুটি নামিয়ে দিয়ে নবীনকুমার একটু সরে দাঁড়ালো। সুবালা সম্পর্কে শুধু ক্রোধ নয়,

ঘৃণাও অনেকখানি জমে ছিল তার মনের মধ্যে। কিন্তু এ কথাও ঠিক, এরকম রহস্য ভরা সুন্দর কথা সে এ পর্যন্ত আর কোনো স্ত্রীলোকের মুখে শোনেনি। প্রথম সাক্ষাতে এই ধরনের কথা শুনেই সে সুবালার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। এরকম রমণীরও কেন এই বারবনিতার জীবনই পছন্দ হলো!

সঙ্গের সুরার বোতলটি বার করে নবীনকুমার গলায় ঢাললো অনেকখানি। এরকম অবস্থায় কণ্ঠে তরল আগুনের আঁচ না পেলে সে মনের জোর ফিরিয়ে আনতে পারে না।

সুবালা বললো, ডাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো! এই তোষক-জাজিম যদি তোমার অপবিত্র বোধ হয়, তা হলে আমার চোখের জল দিয়ে সব ধুয়ে দিচ্চি! হ্যাঁ গা, আমায় খুঁজে পেতে তোমার খুব কষ্ট করতে হয়েচে, তাই না? আমি ইচ্ছে করেই তোমার কাচ থেকে এতদিন নুকিয়ে রয়েচি। জানতুম, তুমি নিজে থেকে একদিন না একদিন আসবেই।

—আমি তোমায় খুঁজতে আসিনি!

—আহা-হা, আমি যেন আর জানি না! আর ডাঁড়িয়ো না গো, ডাঁড়িয়ো না! চাদ্দিকে একেবারে টি টি পড়ে গ্যাচে, আর উনি এখনও ছাঁটা মেরে বলচেন, তোমায় খুঁজতে আসিনি! কত লোক আমায় এসে বলে যাচ্চে, ওগো, নবীনকুমার সিংগী যে সব পাড়ায় পাড়ায় তোমায় হন্যে হয়ে খুঁজচেন! ঐ যে ফকিরুদ্দীন, ঐ ফক্‌রা ছোঁড়াই তো তোমায় দেকেচে কতদিন, তুমি এক একজন রাঁঢ়ের বাড়ি যাচ্চো, আর তার মুখ দেকে ভিরকুট্টি মেরে বলচো, এ না! এ তো সে না! হি-হি-হি-হি! তুমি আমায় সহজে পাবে কী করে, আমার সেই আগেকার নাম নেই, এখন আমি যবনী হইচি, আর আমার সুরৎও পাল্টে গ্যাচে!

—তোমায় আমি খুঁজবো কেন? তুমি আমার ব্যবস্থায় থাকতে চাওনি—

—কেন চলে এসিচিলুম, তুমি বুঝতে পারো নি? তুমি আমায় সব দিয়েচিলে, খাওয়া-পরার সুখ, দাস-দাসী, আরও কত কী, শুধু তুমি নিজেকে দাওনি! কোনো মেয়েমানুষ এতে খুশী হয়? ব্রজের রাখালরাজার মতন মুখখানি তোমার, আর তুমি মেয়েমানুষের মনের এই খবরটা জানো না! তবে আমি জানতুম, তুমি একদিন না একদিন আসবেই—

—আমি তোমার জন্য আসিনি। আমি অন্য একজনকে খুঁজচিলুম—

—কাকে গো, কাকে? সে আবাগীর বেটী কী এমন পুণ্যি করেচে যে আমার চেয়ে তাকে তোমার মনে ধরবে? বলো না গো, কে? ওগো দুঃখী, তুমি কার সন্ধানে সবার দোরে দোরে ঘুরচো? তোমার বুঝি কোনো বন্ধু নেই, কেউ প্রাণের দোসর নেই, তাই তুমি একজন সঙ্গী খুঁজে বেড়াচ্চো? তোমার কত টাকা, তুমি টাকা ছড়ালে গণ্ডায় গণ্ডায় হুরী-পরী কিনতে পারো, তবু কেন সন্ধ্যেবেলাগুলোতে আমাদের মতন পাতকিনীদের মধ্যেই ঘুরতে হয় তোমায়? আহা গো!

আর কোনো উত্তর না দিয়ে নবীনকুমার গলায় আর কয়েক ঢোঁক ব্র্যাণ্ডি ঢাললো। সত্যি সত্যিই সে কাকে খুঁজছে, সে কথাটা এখানে আর বলার কোনো মানে হয় না। তা ছাড়া অজান্তে একটা কথা বলে সুবালা তার হৃদয়ের এক গোপন দুঃখের তন্ত্রীতে ঘা দিয়েছে। তোমার কোনো বন্ধু নেই! এর চেয়ে সত্য আর কী হতে পারে! সেইজন্যই কি তার এমন অবুঝ ছটফটানি!

ফকিরুদ্দীন ও তার সঙ্গীর ফেলে যাওয়া সুরার বোতলটি তুলে নিয়ে সুবালাও পান করলো খানিকটা। বড্ড গরম, এই বলে সে তার ঊর্ধ্বাঙ্গে জড়ানো অতি সূক্ষ্ম ওড়নাখানি ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

তারপর নবীনকুমারের দিকে তীব্র দৃষ্টি ন্যস্ত করে বললো, সে বাবু, তুমি যাই বলো, তমি আমায় খোঁজো বা নাই-ই খোঁজো, আমি তো জানতুমই, তুমি একদিন না একদিন আসবেই⋯তুমি এসেচো, আর আমি তোমায় ছাড়চি নি। তুমি কতক্ষণ ডাঁড়িয়ে থাকবে? এবার একটু এসো।

—না।

—সে তুমি ডাঁড়িয়ে থাকো বা বসেই থাকো, আজ আমি তোমায় খাবো! আমি রাক্কুসী! এই দ্যাকো আমার দাঁতের ধার, আমার নোখ দেকোচো! ঈগল পাখির ঠোঁটের মতন⋯তুমিই আমায় ঘরের বার করে পথে নামিয়োচো, এখন আমার ওপর ঘেন্না! আমায় ছোঁবে না!

নবীনকুমার দু' পা পিছিয়ে গিয়ে বললো, তুমি কী সব বকচো পাগলের মতন! কেন বলচো, আমিই তোমায় পথে নামিয়িচি? তুমিই তো গপ্পো শুনিয়েচিলে তোমার কোন্ দেওর না দেওরের শালা⋯

—সে তো তুমিই—

—পাপীয়সী, পথ ছাড়ো আমার! তোমার প্রলাপ শোনবার মতন সময় নেই আমার! শরীর নিয়ে

পাপের বেসাতি করাতেই তোমার সুখ, তাই নিয়েই থাকো ! আমার সঙ্গে তোমার কোনো সংস্রব নেই।

—শরীর নিয়ে পাপের বেসাতি···ঠিক বলোচো ! এসব বড্ড ভালোবাসি আমি। শরীর আমার বাঘিনী, পুরুষ মানুষের রক্ত খেতে চায়। তোমার রক্ত না খেয়ে কি আর ছাড়বো ? তুমি আমার নাগর, মৌলাআলীতে আমার জন্য সুন্দর বাসা ভাড়া করেচিলে, কত দয়া তোমার ! তুমি সব বোঝো, শরীর বোঝো না, তাই না ? মেঠাই খাবার লোভ অথচ হাত বাড়াতে নজ্জা। এসো, সব তোমায় শিকিয়ে-পড়িয়ে দিচ্চি !

—তোমাকে আমি অনেকবার বলিচি, তোমাদের শরীরের প্রতি আমার লোভ নেই—

—লোভ নেই তো বাজারে মাগীদের দরজায় দরজায় রোজ রোজ ঘোরো কেন ? তারা শরীর ব্যাচে না অমৃত ব্যাচে ? ওগো আমার সন্নিসী ঠাকুর রে, উনি বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্চেন আর ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরকে খুঁজচেন। এই বেবুশ্যেপাড়া তোমার সেই গহন বন, আর আমি তোমার ঈশ্বর !

কথা বলতে বলতে সুবালা তার শরীরের সমস্ত বসন ত্যাগ করতে লাগলো। সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে সে নবীনকুমারের একেবারে সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়ে বললো, এবার ?

সুরার প্রভাবে ও নগ্ন নারীরূপের ঝাঁঝে নবীনকুমারের শরীর টলমল করে উঠলো। সে সবেগে মস্তক আন্দোলিত করে বলতে লাগলো, না, না !

সুবালাকে স্পর্শ না করে সে দ্বারের দিকে এক লম্ফে চলে যেতে গিয়ে পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। দেয়ালের কোণে মাথা ঠুকে গেল বেশ জোরে।

মাঠের মধ্যে জুড়ি গাড়ির পিছনের তক্তায় বসে মশার কামড় খেতে খেতে সারা রাত কেটে গেল দুলালের। ভোরের মধ্যেও ফিরলো না নবীনকুমার। বিরক্তিতে, গ্লানিতে এবং দুর্ভাবনায় তার মাথা খারাপ হবার মতন অবস্থা। এখন তার কী কর্তব্য ? সে কোথায় তার প্রভুকে খুঁজতে যাবে ? নবীনকুমারের যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, তা হলে এখুনি কি গৃহে ফিরে গিয়ে গঙ্গানারায়ণকে তা জানানো উচিত ? আবার, নবীনকুমার যখন তাকে এখানেই অপেক্ষা করতে আদেশ করে গেছে, তখন এ স্থান ত্যাগ করাও কি তার পক্ষে সঙ্গত ?

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই বেলা বাড়তে লাগলো। কোচোয়ানও কোনো পরামর্শ দিতে পারলো না। ন'টার তোপ্ পড়বার পর দুলাল যখন নিজ দায়িত্বে ঘরে ফেরার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, সেই সময় এসে উপস্থিত হলো নবীনকুমার। চক্ষু দু'টি রক্তবর্ণ, কপালের এক কোণে একটি সরু কাটা দাগ, মুখখানি গম্ভীর। কোনো রকম কারণ দর্শাবার চেষ্টা না করে সে গাড়িতে উঠে হুকুম করলো, বাড়ি চল্ !

এরপর নবীনকুমার কয়েকদিন পুরোপুরি একেবারে গৃহে অবস্থান করলো। শারীরিক কোনো অসুস্থতা না থাকলেও সে প্রায় শয্যাত্যাগই করলো না। দিন চারেক পরে যেন তার যোগনিদ্রা ভঙ্গ হলো।

দুলালকে দিয়ে সে খবর পাঠালো গঙ্গানারায়ণের কাছে, বিশেষ প্রয়োজনে সে একবার দেখা করতে চায়। গঙ্গানারায়ণ বাড়িতেই ছিল। সে নিজেই চলে এলো কনিষ্ঠ ভ্রাতার মহলে।

নবীনকুমার শান্ত ভাবে জানালো যে সে আগামী দু' একদিনের মধ্যেই কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চায়। কবে ফিরবে তার ঠিক নেই। তার প্রথম উদ্দেশ্য হরিদ্বারে গিয়ে জননী বিম্ববতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। তাঁর কাছে কয়েকটি দিন কাটিয়ে তারপর সে নানান দেশ পরিভ্রমণ করবে।

গঙ্গানারায়ণ অতিরিক্ত উৎসাহিত হয়ে বললো, বেশ তো, বেশ তো, এ তো খুব ভালো কতা ! তোর শরীরটাও অনেক শুকিয়ে গ্যাচে, পশ্চিমে হাওয়া পরিবর্তন করলে উপকার হবে ! মায়ের সঙ্গে আমিও একবার দেকা করতে যাবো ভাবচিলুম, কিন্তু তুই আর আমি দু'জনে এক সঙ্গে গেলে এখেনকার বিষয়-তদারকি কে করবে !

নবীনকুমার বললো, আমি ঘুরে আসি, তারপর তুমি যেও ! আমি মাকে প্রায়ই স্বপ্নে দেকচি, মা বোধহয় আমায় ডাকচেন !

নবীনকুমারের অনুপস্থিতির জন্য যে-সব কাগজ-পত্রে সই-সাবুদ করে যাওয়া দরকার সে-সব সারা হলো। তা ছাড়া নবীনকুমার বাইরে যাবে, সেজন্য এলাহী বন্দোবস্তের দরকার। লোক-লস্কর নিতে হবে প্রচুর।

এই প্রথম দুলাল কাঁচুমাচু হয়ে জানালো যে সে যদি সঙ্গে না যায়, তা হলে কি ছোটবাবুর খুব অসুবিধে হবে? দুলালের পত্নী দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হয়েছে, সেই জন্য সে এখন দূরে যেতে চায় না। কিন্তু নবীনকুমার দুলালচন্দ্রের এই প্রার্থনা খারিজ করে দিল। দুলালকে সঙ্গে না পেলে তার চলবে না। তার স্ত্রীর সন্তান প্রসবের আরও মাস চারেক দেরি, দুলাল অন্তত হরিদ্বার পর্যন্ত তো সঙ্গে চলুক, তারপর না হয় তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।

গঙ্গানারায়ণ শুধু একবার নবীনকুমারকে বললো, ছোট্‌কু, তুই যাওয়ার আগে একবার জ্যাঠাবাবুর সঙ্গে দেকা করে যাবি না? মা নিশ্চয়ই জ্যাঠাবাবুর কতা জিজ্ঞেস করবেন।

অতি বাধ্য বালকের মতন নবীনকুমার বললো, হ্যাঁ, যাবো! এক সময় সে শপথ করেছিল, আর কোনো দিন সে ও গৃহে প্রবেশ করবে না। এখন সে কথা তার মনে পড়লো না। গেলও সে পরদিন সকালে। বিধুশেখর তখন পূজার কক্ষে ঢুকেছেন, অন্তত একটি ঘণ্টা তো সেখানে কাটাবেনই। অতক্ষণ অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই নবীনকুমারের, আবার পরে আসবো বলে সে বিদায় নিল নিচের তলা থেকেই। আর আসা হলো না। দেখাও হলো না।

তিনখানি বজরা ও পিনিসের বহর নিয়ে শুভ লগ্নে যাত্রা করলো নবীনকুমার। কলকাতা ত্যাগ করার জন্য সে অস্থির হয়ে উঠেছিল। সে যেন সত্যই পল্লী প্রকৃতির শোভা দর্শন ও মুক্ত বায়ু সেবনের জন্য তৃষ্ণার্ত। একটি ব্যাপারে দুলালও খুব বিস্মিত। এতদিনের জন্য যাত্রা, অথচ ছোটবাবুর বজরায় একটিও সুরার বোতল নেওয়া হয়নি। যেভাবে ছোটবাবু পতিতালয়গুলিতে সন্ধ্যাযাপন করতে শুরু করেছিলেন, তাতে দুলালের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে ছোটবাবুর এই বিদেশ যাত্রা শহরের অন্যান্য বড় মানুষের সন্তানদের মতন প্রমোদ ভ্রমণ ছাড়া আর কিছুই নয়। নারী-সুরা ও নৃত্য-গীতই চলবে। সেই কারণেই দুলালের এত অনিচ্ছা ছিল এই ভ্রমণের সঙ্গী হওয়ার। অথচ সে সব কিছুই নেই!

নবীনকুমার কলকাতা পরিত্যাগ করার পক্ষকাল পরে একদিন এক তরুণ সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালো সিংহ সদনের দ্বারে। সে গঙ্গানারায়ণ সিংহ কিংবা তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাক্ষাৎ প্রার্থী। গঙ্গানারায়ণও তখন গৃহে ছিল না। সন্ন্যাসী ঠায় এক বেলা দাঁড়িয়ে রইলো দ্বারের বাইরে। ভৃত্য ও অন্যান্য কর্মচারীদের বিশেষ অনুরোধেও সে ভিতরে এসে বসলো না, কারণ সে কোনো গৃহস্থ বাড়িতে পদার্পণ করে না।

সন্ধ্যাকালে গঙ্গানারায়ণ প্রত্যাবর্তন করার পর সন্ন্যাসী তার হাতে একটি পুঁটুলি দিয়ে দুর্বোধ্য হিন্দীতে জানালো যে রামকমল সিংহের পুত্রের হাতে ঐটি তুলে দেবার জন্যই সে তার গুরুর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে হরিদ্বার থেকে কলকাতায় এসেছে। আজ রাত্রেই সে আবার ফিরে যাবে।

পুঁটুলির মধ্যে রয়েছে একখানি নামাবলী, একখানি রুদ্রাক্ষের মালা এবং একটি অঙ্গুরীয়। এই গুলিই বিম্ববতীর শেষ চিহ্ন। প্রায় দু' মাস কাল আগে বিম্ববতী এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে তাঁর সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেছেন।

গঙ্গানারায়ণের প্রথমেই মনে হলো ছোট্‌কুকে খবর দিতে হবে!

নবীনকুমার ঠিক কোন পথে এবং কতদিন সময় নিয়ে হরিদ্বার পৌঁছোবে, সে কথা সবিস্তারে জানিয়ে যায় নি। তবে মোটামুটি এই প্রকার ঠিক আছে যে, প্রথমে সে নৌকাযোগেই কলকাতা থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত যাবে, তারপর সেখান থেকে স্থলপথে অন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করবে। এর মধ্যে সে কত দূরের পথ পার হয়েছে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই।

এখন রেলপথে অনেক দূর পর্যন্ত যাওয়া যায়, কিন্তু ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেউ সহসা রেলওয়ে

ক্যারেজে উঠতে চান না। শৌখিন, আরামদায়ক প্রথম শ্রেণীর কামরা দখল করে থাকে সাহেবরা, আর অন্যান্য কামরাগুলিতে কুমড়ো গাদাগাদি অবস্থা। তা ছাড়া নবীনকুমার ধীরে সুস্থে দেশ পরিভ্রমণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত জননীর কাছে পৌঁছোবে, এই রকম বাসনা প্রকাশ করে গিয়েছিল।

দিবাকর এখন বাতে প্রায় পঙ্গু, নকুড় আর দুর্যোধন নামে দুজন এখন গোমস্তা'র কাজ চালায়। এদের মধ্যে দুর্যোধন খুব করিৎকর্মা। একবার গঙ্গানারায়ণ ভেবেছিল, সে নিজেই যাবে। প্রবাসে অকস্মাৎ মাতৃবিয়োগের সংবাদ পেয়ে যদি ছোট্কু একেবারে ভেঙে পড়ে! তারই উচিত স্বয়ং গিয়ে ছোট্কুকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা। কিন্তু সব কিছু অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে তার পক্ষে হঠাৎ চলে যাওয়া সম্ভব নয়, ব্যবস্থা করতে দু'চারদিন সময় লাগবে। অথচ নবীনকুমারকে সংবাদ পাঠাতেও দেরি করা আর কোনোক্রমেই উচিত নয়।

সন্ন্যাসীটিকে কোনোক্রমেই আতিথ্য গ্রহণে সম্মত করাতে না পেরে গঙ্গানারায়ণ চলে এলো অন্দর মহলে। কুসুমকুমারী কুরুস কাঠি দিয়ে টেবিল-ঢাকার জন্য নকশা বুনছিল, স্বামীর পদশব্দ শুনে মুখ তুলে চাইল। গঙ্গানারায়ণের মুখ দর্শন করেই কুসুমকুমারী অমঙ্গল অনুভব করল, হাতের জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে দ্রুত পদে কাছে এগিয়ে আসতেই গঙ্গানারায়ণ কম্পিত কণ্ঠে বললো, কুসুম. মা আর নেই!

শুধু শোক নয়, তার চেয়েও বেশী অনুতাপানলেই যেন দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে গঙ্গানারায়ণের হৃদয়। বহুকাল সে বিম্ববতীকে দেখেনি। ভাব-বৈকল্যে দেশান্তরী হবার পর থেকেই তো আর সে দেখেনি জননীর মুখ। কলকাতায় পুনরায় ফিরে বিবাহ-টিবাহ করে থিতু হয়ে বসবার পর সে কতবার ভেবেছে না হরিদ্বারে গিয়ে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আসবে? যাওয়া যে হয়নি, সে জন্য তার কর্মব্যস্ততাই শুধু দায়ী নয়, তার মনে কি একটা অপরাধবোধও সুপ্ত ছিল না? সে জানে, সে যে বিধবা বিবাহ করেছে তা বিম্ববতী কখনোই সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে পারবেন না। তার বিবাহ হয়েছিল অনেকটা হুড়োহুড়ি করে, জননীর সম্মতি চাওয়ার সময় ছিল না, সে প্রশ্নও ওঠেনি। পরে অবশ্য গঙ্গানারায়ণ দীর্ঘ পত্র লিখেছিল। বিম্ববতীর অক্ষরজ্ঞান নেই, অপরের দ্বারা লিখিত একাধিক পত্র তিনি এর মধ্যে যদিও পাঠিয়েছেন, কিন্তু সেই সব পত্রও তাঁর ব-কলমে নয়। অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষভাবে কারুকে সম্বোধন করেন নি, তাঁর হয়ে অন্য কেউ কুশল সংবাদ জানিয়েছে। কোনো পত্রেই গঙ্গানারায়ণের বিবাহের কোনো উল্লেখ ছিল না। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এ বাড়ি থেকে একাধিকবার লোক প্রেরণ করা হয়েছে বিম্ববতীকে দেখে আসবার জন্য, একবারও কারুর হাত দিয়ে বিম্ববতী সামান্যতম কোনো উপহারও প্রেরণ করেন নি তাঁর পুত্রবধূদের জন্য। এ জন্য গঙ্গানারায়ণের মনের মধ্যে একটি কাঁটা বিঁধে ছিল।

কুসুমকুমারী অবশ্য এই অপরাধবোধ কিংবা গ্লানি থেকে মুক্ত। সে যে এক সময় বিধবা ছিল এই স্মৃতিই যেন মুছে গেছে তার মানসপট থেকে। যেন গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে মিলনই তার পক্ষে বিধির নির্বন্ধ ছিল। বধূ হিসেবে না হলেও এ বাড়িতে কুসুমকুমারী আগে যে কয়েকবার এসেছে তখন বিম্ববতীকে দেখেছে এবং তাঁর কাছ থেকে অনেক সাদর সম্ভাষণ পেয়েছে। বিম্ববতী তার চোখে স্বর্গের দেবীর তুল্য। সুতরাং, এই দুঃসংবাদ শোনা মাত্র কুসুমকুমারীর দুই চক্ষে অশ্রু উদ্গত হল।

স্বামী-স্ত্রী দুজনে বসে কাঁদলো কিছুক্ষণ।

গঙ্গানারায়ণই সামলে নিল প্রথমে। পরিবারের কর্তার পক্ষে এমন ভেঙে পড়লে চলে না। এখন অনেক কাজ বাকি।

বিধুশেখরকে এই সংবাদ জানাতে হবে। সে ব্যাপারেও গঙ্গানারায়ণের ভয়। সে নিজের মুখে কী করে এই নিদারুণ দুঃসংবাদ দেবে সেই বৃদ্ধকে! আবার কোনো কর্মচারী মারফতও এমন খবর পাঠানো শোভা পায় না!

সেই রাত্রেই গঙ্গানারায়ণ গেল ও বাড়িতে। যদি বিধুশেখর এর মধ্যে নিদ্রা গিয়ে থাকেন, তা হলে এক পক্ষে গঙ্গানারায়ণের পক্ষে ভালোই। কিন্তু বিধুশেখর জেগেই আছেন। প্রথমেই বিধুশেখরের সঙ্গে দেখা না করে গঙ্গানারায়ণ খোঁজ করলো সুহাসিনীর।

সুহাসিনীর পুত্র প্রাণগোপাল এখন সদ্য কৈশোরে পদার্পণ করেছে, সুন্দর মুখশ্রী, উজ্জ্বল দুটি চক্ষু, তীক্ষ্ণ নাসিকা। ঐ বয়েসের নবীনকুমারের সঙ্গে তার মুখের কিছুটা সাদৃশ্য আছে এমন হঠাৎ মনে হয়। তবে ছেলেটি নবীনকুমারের তুলনায় অতিশয় লাজুক। সে এখন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে পড়ে। এই প্রাণগোপালের সঙ্গেই প্রথম দেখা হলো গঙ্গানারায়ণের। একে জানিয়ে কোনো লাভ নেই, তাই গঙ্গানারায়ণ প্রাণগোপালকে দিয়েই ডেকে পাঠালো সুহাসিনীকে।

গঙ্গানারায়ণ এ গৃহে ক্বচিৎ-কদাচিৎ আসে। সেই বড় ঝড়ের পর এই আর একবার। নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর ব্যাপার। সে প্রায় ছুটে এসে ভয়-চকিত নেত্রে প্রশ্ন করলো, কী গঙ্গাদাদা ? কী হয়েচে ? কর্তামা'র কোনো চিটি পেয়েচো ? তিনি ভালো আচেন তো ?

পুরুষের তুলনায় নারীর বোধ-অনুভূতি হয় অনেক বেশী তীক্ষ্ণ, অথবা ভিন্নপথে চলে। সুহাসিনী এমন সঠিক অনুমান করলো কী করে ? সন্ন্যাসীটিকে দেখেও তো গঙ্গানারায়ণের এরকম কিছু মনে আসে নি।

চক্ষে আঁচল চাপা দিয়ে মাটিতে বসে পড়লো সুহাসিনী। গঙ্গানারায়ণ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বললো, সুষি, ওঠ। কাজের কতা আচে। শান্ত হ, বোনটি।

সুহাসিনী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, এ পৃথিবীতে···কত পাপী-তাপী···কত পাষণ্ড-কুষণ্ড বেঁচে থাকে···আর কর্তামা···অমন সতী সাধ্বী···অত দয়া-মায়া···তিনি রইলেন না···গঙ্গাদাদা, তিনি যে আমাদের মায়ের চেয়েও বেশী আপন ছিলেন গো···

আরও একটু পরে গঙ্গানারায়ণ জিজ্ঞেস করলো, সুষি, তুই একটা পরামর্শ দে তো ! কী করে বড়বাবুর কাচে কতাটা ভাঙি ? তাঁর শরীরগতিক ভালো নয়, এত বড় একটা আঘাত যদি পান···আবার তাঁর কাছ থেকে গোপন করেও রাখা যায় না···কোনো এক সময় তাঁর কানে ঠিক উঠবেই।

ঠিক ন'টার তোপ পড়লে বিধুশেখর দ্বিতলেরই এক কক্ষে রাত্রির আহার গ্রহণ করতে আসবেন। তার আগে কি তাঁকে এই সংবাদ দেওয়া উচিত হবে ? তাঁর আহার মানে তো রোগীর পথ্য, তা বাদ দেওয়া তাঁর শরীরের পক্ষে আরও অনিষ্টকর। সুতরাং, গঙ্গানারায়ণ অপেক্ষা করাই মনস্থ করলো।

কিন্তু কার্যকারণের যোগাযোগ সব সময় মানুষের হিসেব মতন হয় না। বিধুশেখর নিজের ঘরের জানালা দিয়ে একটু আগে গঙ্গানারায়ণকে তাঁর বাগানের মধ্যেকার সুরকিঢালা পথ দিয়ে আসতে দেখেছেন। গঙ্গানারায়ণ স্বেচ্ছায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি বিস্মিত হন, এ বাড়িতে এসেও কিছুক্ষণের মধ্যে গঙ্গানারায়ণ তাঁর দর্শনপ্রার্থী হলো না, এটা আরও আশ্চর্যের কথা। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন।

কেল্লা থেকে পর পর ন'বার তোপ্ দাগার শব্দ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতলের বারান্দায় শোনা গেল বিধুশেখরের খড়ম ও লাঠির যুগপৎ ঠকঠক শব্দ। বিধুশেখর খাবারের ঘরে আসছেন। সুহাসিনীই তাঁর পরিচর্যা করে। সে দ্বারের কাছে প্রস্তুত হয়েই ছিল, পিতার হাত ধরে মেঝেতে পাতা পশমের আসনে বসিয়ে দিল। খাড়া অবস্থা থেকে নিচে মাটিতে বসতে বিধুশেখরের প্রয়োজন হয় অপরের সাহায্যের। শ্বেত পাথরের গেলাস থেকে একটু জল হাতে ঢেলে নিয়ে বিধুশেখর প্রথমে পঞ্চ দেবতাকে অন্ন নিবেদন করে আচমন করলেন। তারপর মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, সুষি, ও বাড়ি থেকে গঙ্গা এয়েচে দেকলুম যেন !

বিধুশেখরের সামনে মিথ্যে বলবে এমন সাধ্য কার ! সুহাসিনী ধরা গলা কোনোক্রমে সংযত করে বললো, হ্যাঁ, গঙ্গাদাদা এয়েচে !

বিধুশেখর কনিষ্ঠা কন্যার দিকে তাঁর এক চক্ষু স্থির রেখে আবার জিজ্ঞেস করলেন, এই রাতে কেন এসেচে সে ?

—কী জানি ! আপনার সঙ্গে কোন জরুরি কাজের কতা আচে।

—ডাক তাকে এখেনে !

—বাবা, আপনি আগে খেয়ে নিন বরং···গঙ্গাদাদা বলেচে, এমন কিছু তাড়া নেই—

বিধুশেখর গলা চড়িয়ে বললেন, ওরে, কে আচিস ? ও বাড়ির গঙ্গাবাবু কোতায় বসে আচে দ্যাক। তাকে খপর দে, বল্, আমি এখেনে ডাকচি !

গঙ্গানারায়ণ মাত্র দু'খানি ঘর পরে প্রাণগোপালের পাঠকক্ষে অপেক্ষারত ছিল। ডাক শুনে তাকে আসতেই হলো।

বিধুশেখর ঘাড় ঘুরিয়ে গঙ্গানারায়ণের আপাদমস্তক দেখলেন একবার। গঙ্গানারায়ণ দাঁড়িয়ে আছে দরজার বাইরে। বাল্যকাল থেকেই এ গৃহে তার অবারিত দ্বার। তবু যেন কোনো সংস্কার বশে সে জানে যে একমাত্র ঠাকুরঘরে এবং কেউ রন্ধন করা অন্ন গ্রহণ করার সময় তখন সে ঘরে তার প্রবেশ করতে নেই। কারণ, যত আত্মীয়তাই থাকুক, এটা ব্রাহ্মণের বাড়ি।

বিধুশেখর জিজ্ঞেস করলেন, কে মারা গ্যাচে?

গঙ্গানারায়ণ তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর দিল না, কিন্তু সুহাসিনী আবার কান্না শুরু করতেই সব বোঝা গেল।

গঙ্গানারায়ণ সবিস্ময়ে দেখলো, বিধুশেখর একেবারেই বিচলিত হলেন না। মৃত্যু সম্পর্কে তিনি যেন উদাসীন হয়ে পড়েছেন একেবারে। সামনের একটি ছোট বাটি হাতে তুলে নিয়ে তিনি নিরাসক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, হরিদ্বার থেকে পত্তর এসেচে?

এবার সন্ন্যাসী সংক্রান্ত বৃত্তান্তটি গঙ্গানারায়ণ বিবৃত করলো।

বিধুশেখর বললেন, তা, যা হয়েচে, ভালোই তো হয়েচে। তিনি সংসার ত্যাগ করেছিলেন স্বেচ্ছায়, তারপর আর বেঁচে থাকা না থাকা ও একই কতা! তিনি পুণ্যবতী, ঈশ্বরের পাদপদ্মে ঠাঁই চেয়েছিলেন, এখন ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হলেন...এই শোকতাপের পৃথিবীতে বেঁচে থেকেই বা কী লাভ...এখানে থাকলেও নানারকম অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেকে দুঃখ পেতেন...

গঙ্গানারায়ণের কর্ণকুহরে এসব কথা যেন প্রবেশ করছেই না। দু' এক বৎসর পর বিধুশেখরকে দেখে তার বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিধুশেখর যেন শেষ বয়সে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। একটি চক্ষু অবশ্য চিরতরে গেছে, বাঁ পা-টিও অবশ, কিন্তু আগেকার মতন জড়দ্গব ভাবটি নেই, কণ্ঠস্বরও বেশ সুস্থ মানুষের মতন পরিষ্কার।

তাঁর সামনের খাদ্য দেখেও গঙ্গানারায়ণের চক্ষু কপালে ওঠার উপক্রম। বড় একটি থালার মাঝখানে যুঁই ফুল রঙের কিছুটা ভাত এবং সেই থালা ঘিরে অবিকল ষোড়শ ব্যঞ্জন যাকে বলে। এমনকি এই শোকের অবস্থাতেও গঙ্গানারায়ণ গুণে দেখলো, ঠিক ষোলোটি বাটিতেই নানা রকম রান্না সাজানো। তবে যে সুহাসিনী বলেছিল, উনি রাত্রে নিছক রোগীর পথ্য খান!

সুহাসিনী অবশ্য মিথ্যে বলে নি, রাত্রে বিধুশেখর শুধু একটুখানি নুন-চিনি ছাড়া সাদা ছানা এবং এক টুকরো মাগুর মাছ খান। সম্পূর্ণ তণ্ডুল-বর্জিত খাদ্য খেয়েই তিনি বহুমূত্র রোগ থেকে কিছুটা নিরাময় হয়েছেন। শুধু চিকিৎসকের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তিনি মাঝে মাঝে খান তাঁর অতি প্রিয় মুসুর ডাল ছোট এক বাটি ভর্তি। অতুল সম্পদের অধিকারী বিধুভূষণ মুখুজ্যের নিজের আহার্যের জন্য দু' বেলার ব্যয় দু' আনাও নয়। তবে সম্প্রতি এই একটি নতুন বাতিক হয়েছে তাঁর: তিনি নিজে খান বা না খান প্রতিদিন দু' বেলা এরকম ষোড়শ ব্যঞ্জন সাজিয়ে দিতে হবে তাঁর সামনে। বড় গলদা চিংড়ি মাছের মুড়ো ভাজা কিংবা আলু পোস্তের তরকারি ভক্ষণ তাঁর বাকি সারা জীবনের মতন নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু এগুলো রোজ অন্তত একবার করে দেখতে দোষ কী! আর ঘ্রাণে অর্ধভোজনও চিকিৎসাশাস্ত্রে নিষেধ করে না। বিধুশেখর কোনোদিনই খুব একটা ভোজনরসিক ছিলেন না, ইদানীং তিনি উত্তম উত্তম খাদ্যের দৃষ্টিলোভী বা ঘ্রাণ-লোভী হয়েছেন। অথবা, তিনি হয়তো নিশ্চিন্ত হতে চান যে তাঁর আত্মীয়-পরিজনরা অন্তত দু'বেলা এগুলি খেতে পাবে।

ডালের বাটিটি এক চুমুকে শেষ করে বিধুশেখর বললেন, শুনে যা বুঝচি, প্রায় মাস দু' এক আগেই তোমাদের মাতা-ঠাকুরাণীর মৃত্যু ঘটে গ্যাচে; তবে আর বিলম্বে কাজ নেই, তোমরা দু'ভায়ে মিলে কাল-পরশুর মধ্যে শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়ে ফেল। বেশী ঘটা করারও প্রয়োজন নেই কো, তিনি সন্ন্যাসিনী হয়েছিলেন, ওঁদের শ্রাদ্ধ নিয়ে বেশী ঘটাপেটা করা শোভন হয় না। পুরুত ঠাকুরদের ডাকাও, যেটুকু না করলে নয়...তবে পিণ্ডদান যেন শুধু ছোটকুই করে, তোমার আর করবার দরকার হবে না—।

নবীনকুমার শহরে উপস্থিত নেই শুনে বিধুশেখর খাওয়া বন্ধ করে ফের মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে বললেন, অ্যাঁ? সে এখেনে নেই মানে? কোতায় গ্যাচে?

বিম্ববতীর মৃত্যু সংবাদের চেয়েও যেন নবীনকুমারের অনুপস্থিতির সংবাদ বিধুশেখরকে অনেক বেশী বিচলিত করে। তিনি বারবার নবীনকুমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে সব জেনে নিলেন। তারপর

নৈরাশ্যের সুরে বললেন, সে গেল, একবার আমার সঙ্গে দ্যাকা পর্যন্ত করে গেল না ?

—সে আসেনি ? সে যে বলেছিল, যাবার আগে আপনাকে প্রণাম করে যাবে ?

—নাঃ ! ছোটকু আমার কাচে আসে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, সুখি, আজ চিঁড়ের পায়েস করিস নি ? দে, আজ একটু পায়েস খাই, মুখটা তেতো তেতো লাগচে··· ।

অতঃপর নকুড় আর দুর্যোধনকেই পাঠানো হলো কিছু লোকজন সঙ্গে দিয়ে। যেমন করে পারে, তারা যেন নবীনকুমারকে ভারতের যে কোনো অঞ্চলে খুঁজে বার করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

গঙ্গানারায়ণ সংক্ষিপ্তভাবে বিম্ববতীর শ্রাদ্ধ সেরে নিল নিজে একাই। বিধুশেখর যা-ই ইঙ্গিত করে থাকুন না কেন, বিম্ববতীকে সে নিজের জননীই মনে করে থাকে। পিণ্ডদান বিষয়ে অবশ্য তার নিজেরও কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। সে ব্রাহ্মসমাজের সদস্যভুক্ত হয়নি বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে গুপ্ত ব্রাহ্ম, বারাণসীতে প্রবেশের পূর্বে সে নিজেই নিজেকে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল, তার থেকে সে আর সরে আসেনি। শ্রাদ্ধের সময় নারায়ণ শিলার পূজা কিংবা পিণ্ডদানে সে বিশ্বাসী নয়।

দুই গোমস্তা ছোটকুকে সঙ্গে নিয়ে কিংবা তার সংবাদ বহন করে এক সপ্তাহের মধ্যেও ফিরলো না। গঙ্গানারায়ণ প্রতিদিন অধীরভাবে প্রতীক্ষা করে। তার প্রবল ইচ্ছা জেগেছে তারা দুই ভাই কাছাকাছি বসে অনেকক্ষণ ধরে তাদের মায়ের সম্পর্কে কথা বলবে। বিম্ববতী আর নেই বলেই গঙ্গানারায়ণের মনে আসছে তাঁর সম্পর্কে অসংখ্য স্মৃতি।

শ্রাদ্ধের সময় গঙ্গানারায়ণের আরও একটা কথা বার বার মনে আসছিল, এই সিংহ পরিবারে একটা পর্বের সম্পূর্ণ সমাপ্তি ঘটে গেল। বিম্ববতী এত বছর অনেক দূরে রইলেও এ গৃহ থেকে তাঁর অস্তিত্ব মুছে যায় নি। দাস-দাসী-কর্মচারীরা বলতো, ওটা কর্তামা'র ঘর, ওটা কর্তামা'র স্নানের পাল্কী, খাঁচা-বন্দী পাখিগুলি ছিল কর্তামার পাখি, এ ছাড়া বিম্ববতীর নামে এস্টেটের পৃথক তহবিল, পৃথক সম্পত্তি আরও কত কিছু। এখন তার সব শেষ। বিম্ববতীর দেওয়া ওকালতিনামার জোরে গঙ্গানারায়ণ এতকাল তাঁর সব কিছুর তদারকি করতে পেরেছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সব কিছুর মালিকানা নবীনকুমারের ওপরেই বর্তাবে।

বিধুশেখর নিজে একদিন এসে সে কথা গঙ্গানারায়ণকে জানিয়েও দিয়ে গেলেন। নবীনকুমার ফিরে আসার আগে বিম্ববতীর সম্পত্তির অংশ যেমন আছে তেমনই থাকবে।

গঙ্গানারায়ণের বিষণ্ণতার ভার বেশ কয়েকদিনেও কাটলো না। হৌসে বেরুতে ইচ্ছে করে না ; নেহাত যেটুকু কাজ না করলে নয়, তা সেরে দিয়ে সে বইপত্র পাঠ করে মন ফেরাতে চায়। মা ও বাবা দু'জনেই চলে যাবার পর একটা বিরাট শূন্যতার ভাব আসে। কিন্তু তা যে এতখানি শূন্যতা, তা গঙ্গানারায়ণ আগে জানবেই বা কী করে !

রাত্রিবেলা ছাদে পায়চারি করতে করতে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে গঙ্গানারায়ণ চেয়ে থাকে। শিশুদের মতন তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে আকাশে একটি নতুন নক্ষত্র উঠেছে, সেই নক্ষত্রটি বিশেষ আলো ফেলে চেয়ে আছে তার দিকে। পরজন্ম বলে যদি কিছু থাকে, তবে বিম্ববতীই যেন তার জননী হন আবার ! পরজন্ম··· ? কে যেন বলেছিল পরজন্মের কথা ?

কাশীর গঙ্গায়, নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বিন্দুবাসিনী বলেছিল, আবার পরজন্মে···। গঙ্গানারায়ণের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো। কয়েকদিন আগে বিধুশেখরদের গৃহে গিয়ে তার একবারও মনে পড়েনি বিন্দুবাসিনীর কথা। আশ্চর্য ! মানুষের মন এমনও হয় !

—আপনি এমন হিমের মধ্যে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আচেন !

গঙ্গানারায়ণ চমকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। কুসুমকুমারী তাকে ডাকতে এসেছে। কুসুমকুমারীর মুখখানির চার পাশে যেন আভা ফুটে আছে, এমনই সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়েও রোধ করলো গঙ্গানারায়ণ। পরজন্ম না ছাই ! ওসব কিছুই নেই। বিন্দুবাসিনী এ জন্মে কিছুই পেল না, শুধু লাঞ্ছনা আর বেদনা নিয়ে চলে গেল। অথচ সে তো কুসুমকুমারীকে পেয়েছে। সে স্বার্থপর !

এর কয়েকদিন পর একটি চমকপ্রদ রোমহর্ষক সংবাদে কেঁপে উঠলো সারা শহর। সব সংবাদপত্রগুলি হুলুস্থুল করতে লাগলো এই ব্যাপার নিয়ে। এক অত্যন্ত ধনী পরিবারের কুলবধূ তার স্বামীকে স্বহস্তে খুন করে রক্তাক্ত খড়্গ হাতে চামুণ্ডার মতন বেশে পথে নেমে এসে বলেছে, হ্যাঁ, আমি আমার স্বামীকে খুন করিচি! বেশ করিচি!

সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হয়, তার চেয়ে রটে আরও বেশী। কেউ বললো, সেই খড়্গধারিণীকে ধরতে গিয়ে দু'জন সেপাই জখম হয়েছে। কেউ বললো, না, না, সে তো স্বেচ্ছায় গিয়ে গারদে ঢুকেচে। কেউ বললো, নন্দকুমারের যেমন ফাঁসী হয়েছেল, এবার এক হিন্দু ঘরের বউকে গড়ের ময়দানে সর্বসমক্ষে ফাঁসীতে লটকাবে ইংরেজ সরকার বাহাদুর। কেউ বললো, না, না, সে বেটী আদালতে ডাঁড়িয়ে নিজেই নিজের সওয়াল করেচে আর জজ-ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেচে, অনন্ত নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই সে নিজের হাতে তার স্বামীকে নিধন করেচে। যে আদালত তার পাপিষ্ঠ-নরাধম স্বামীকে শাস্তি দিতে পারেনি, সে আদালত কোন্ এক্তিয়ারে তার মতন নির্যাতিতা রমণীকে শাস্তি দিতে আসে! কেউ বললো, না গো না, কোর্টে কোনো মেয়েমানুষের কতা কইবার এক্তার নেই, ব্যারিস্টার এম এস্ ডাট্, তার মানে সেই যে আমাদের মেঘনাদের কবি শ্রীমধুসূদন গো, তিনিই ঐ খুনে মেয়ের হয়ে সওয়াল করবেন। কেউ বললে, মেয়েমানুষের এত্ত বাড়, হিন্দু ধর্ম এবার রসাতলে গেল৷ কেউ বললে, মেয়েমানুষ যদি এমনভাবে কুলাঙ্গার পতির বিনাশ করতে পারে, তবে বুঝতে হবে দেশটা একটু নড়াচড়া দিয়ে উঠচে।

সংবাদের মধ্যে সত্যতা শুধু এইটুকুই যে হাটখোলার প্রখ্যাত ধনী মল্লিক পরিবারের এক বধূ, তার নাম দুর্গামণি, তার লম্পট দুশ্চরিত্র স্বামী চণ্ডিকাপ্রসাদের গলায় এক রাতে ক্রোধের বশে ছুরি বসিয়ে তারপর নিজেও আত্মঘাতিনী হতে গিয়েছিল। কিন্তু সে পুলিস হেফাজতে এখনও বেঁচে আছে।

এ খবর কুসুমকুমারী শোনা মাত্র সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল গঙ্গানারায়ণের পায়ের কাছে।
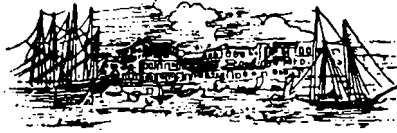
যদুপতি গাঙ্গুলীর মনে একেবারেই সুস্থিরতা নেই। অন্নচিন্তা এমনই চমৎকার যে ঈশ্বরচিন্তায় পর্যন্ত মন বসে না। গ্রাম থেকে তার তিনটি বেকার ভাগিনেয় এসে তার ঘাড়ের ওপর আছে। ভাগিনেয় তিনটির কোনো কাজকর্মের সুরাহা করা যায় নি এখনো, দু'বেলা গ্রাসাচ্ছাদন জোটানোই দায়। উপরন্তু গ্রাম থেকে বিধবা দিদি বারংবার চিঠি লিখে শাসাচ্ছেন যে তিনিও কলকাতায় এসে ভাইয়ের আশ্রয়ে থাকতে চান। গ্রামে গ্রামে এখন হাহাকার। উড়িষ্যায় নিদারুণ দুর্ভিক্ষ হয়ে গেছে, বাংলার গ্রামেও খাদ্য নেই। যা কিছু লভ্য খাদ্যবস্তু ব্যবসায়ীদের কেরামতিতে কলকাতা এবং অন্য বড় শহরগুলিতে এসে জমছে, যেখানে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আছে। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ পরিণতি সুবে বাংলার ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শহরে শুধু খাদ্যবস্তুই পাচার হয়ে আসছে না, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আসছে দলে দলে ক্ষুধার্ত মানুষ! সর্বত্র জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য। সবচেয়ে বেশী বিপন্ন হয়ে পড়েছে, সেই সব নিম্নবিত্ত মানুষের দল, যারা সমাজে ভদ্রলোক নামে পরিচিত। তারা পোশাক-পাদুকা পরিধান না করে পথে বেরুতে পারে না, সম্পূর্ণ অভুক্ত থাকলেও লোকের কাছে হাত পেতে ভিক্ষে চাইতে পারে না। তাদের এখন পেটে কিল মেরে পড়ে থাকার মতন অবস্থা। আবার এই ভদ্র সমাজেরই উঁচু তলার বিত্তবান মানুষেরা এ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন, তাদের মধ্যে নাচ-গান-ফুর্তি, ধর্মসভা, বক্তৃতাসভা, দোল-দুর্গোৎসব, বিবাহ, শ্রাদ্ধের মচ্ছব দিব্য চলছে।

ভাগ্নে তিনটির জন্য কোনো কর্মসংস্থান করতে না পারলেও যদুপতি নিজে সকালে-বিকেলে দু' জায়গায় দুটি ছাত্র পড়াবার কাজ জুটিয়েছে আবার। তাতে কোনোরকমে অনাহার থেকে রক্ষা পাওয়া যাচ্ছে। এইসব ছেড়ে ছুড়ে সে পুরোপুরি ধর্মসাধনায় মনোনিবেশ করবে ঠিক করেছিল, তা আর হলো কই! দ্বিতীয় বিবাহ না করলেও সংসার তাকে ছাড়লো না। সময়ের অভাব তো আছেই, তা ছাড়াও

নানারকম দুশ্চিন্তায় সে ব্রহ্ম-উপাসনার সময় ঠিক মতন মনঃসংযোগ করতে পারে না। তাতে সে আরও অনুশোচনায় ভোগে। আর সবকিছু ছাড়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরকে ছাড়া মোটেই সহজ নয় ! যদুপতি মাঝে মাঝেই শোকাশ্রু বিসর্জন করতে করতে ভাবে, হায় আমার এ কী হলো ! ক'টি অপোগণ্ড ভাগেনর জন্য আমি সাধারণ মানুষ হয়ে গেলুম ! অথচ, সমাজে বাস করে এদের পরিত্যাগ করাই বা যায় কী ভাবে !

একদিন এক বন্ধুর বাড়িতে সাপ্তাহিক উপাসনার শেষে প্রিয়নাথ নামে এক সতীর্থ ব্রাহ্ম তাকে নিম্ন গলায় প্রশ্ন করলো, ভ্রাতঃ তুমি বঙ্কিম চাটুজ্যের নবেলখানি পড়েছো নাকি ?

যদুপতির মন অপ্রসন্ন হয়েই ছিল কারণ আজও উপাসনার মধ্যপথে দু'বার অর্থচিন্তা করেছে। সেইজন্য ঈষৎ বিরক্তভাবে সে বললো, কে বঙ্কিম চাটুজ্যে ? তার নবেল আমি পড়তেই বা যাবো কেন ?

প্রিয়নাথ বললো, বড় সরেস লিখেছেন বইখানি। তুমি তো এক সময় কবিতা আদি রচনা করতে, সেই জন্যই ভাবলুম ও বই নিশ্চয়ই তুমি আগে ভাগেই পড়ে ফেলেছো। তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করা যাবে।

যদুপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বললো, আর কবিতা ! সে সব কবেই চুকে গিয়েছে।

কাব্যলক্ষ্মী স্বয়ং অন্তর্হিতা হয়েছেন না যদুপতি জোর করে তাঁকে নিজের মন থেকে বিদায় দিয়েছে, তা বলা যায় না। কুসুমকুমারীর বিবাহের আগে সে শেষ কয়েকটি কবিতা রচনা করেছিল। তারপর সে বিবাহ ঘটে যাবার পর যদুপতি নিজের যাবতীয় কাব্যকীর্তির পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে কুটিকুটি করে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

পাশে আর একজন যুবক বসেছিল। এই যুবকটিকে যদুপতি আগে কয়েকবার দেখেছে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে, কেশব সেনের বাড়িতে এবং অন্যান্য আলোচনাসভায়। কিন্তু সে যে দীক্ষিত ব্রাহ্ম নয়, তা যদুপতি জানে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মতন পোশাক-আশাক। সেই যুবকটি ব্যগ্রভাবে বললেন, সে কি মশায়, আপনি এখনো বঙ্কিমবাবুর লেখা পড়েন নি ? আপনার কবিতা তো আমরা পড়েছি, আমার সহাধ্যায়ীরা বলাবলি করে যে যদুপতি গাঙ্গুলীর কবিতা অতি উচ্চ ভাবের।

যদুপতি বললো, আমা সদৃশ সামান্য ব্যক্তির কবিতাও আপনি পড়েছেন ? এ যে বড় বিস্ময়ের কথা ! আমাকে আপনি চেনেন, কিন্তু আপনার পরিচয়টা তো জানা হলো না।

প্রিয়নাথ বললো, তুমি এঁকে চেনো না ! ইনি তো সোমপ্রকাশের সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভাগনে। এঁর নাম শিবনাথ—

যদুপতি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভাগ্নে আর তার নিজের ভাগ্নে—কত তফাত !

—এই শিবনাথও কবিতা লেখেন ! সোমপ্রকাশে দ্যাকো নি ? শিবনাথ আরও একটি কাণ্ড করেছিলেন···এক হিসেবে আমাদের শিবনাথ বিশ্বে অদ্বিতীয়, ইনি নিজের বউয়ের বিয়ে দেবার উদ্‌যোগ করেছিলেন—।

শিবনাথ বললো, আঃ প্রিয়বাবু, আপনি থামুন তো !

প্রিয়নাথ বললো, হ্যাঁ হে, যদুপতি, আমি ঠিকই বলছি। অল্প বয়েসে শিবনাথের পিতা ওঁর দু'বার বিবাহ দিয়েছিলেন···কিছুদিন আগে শিবনাথ উঠে পড়ে লেগেছিলেন, দ্বিতীয় পত্নীটির পুনর্বিবাহ দেবেন। ইনি বিদ্যাসাগরের এককাঠি বাড়া—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

শিবনাথ বললো, ওসব কথা ছাড়ুন তো। হচ্ছিল বঙ্কিম চাটুজ্যের কথা—প্রিয়বাবু, আপনি বঙ্কিমবাবুর কোন্ উপন্যাসটির কথা বলছেন ?

—'কপালকুণ্ডলা' ! আমি তো একটির কথাই জানি। আরও লিখেছেন নাকি ?

—কেন, আপনি দুর্গেশনন্দিনী পড়েন নি ! সে তো দু'তিন বছর আগেই বেরিয়ে গেছে। অহো, সে কি অপূর্ব ব্যাপার ! আমি বলে দিচ্ছি শুনে রাখুন, আমাদের দত্ত কবির একজন সমকক্ষ লেখক এসে গেছেন !

—মাইকেল দত্ত তো বিলেত থেকে পাক্কা সাহেব হয়ে এসেছেন। আর কি তিনি বাংলা লিকবেন ? এক দু' বছরে কিছুই তো লিখছেন না দেখি—খালি মদ ওড়াচ্ছেন।

—এখন তিনি ব্যারিস্টার, কত ব্যস্ত, সাহেব মহলে দহরম মহরম···তবে একটু থিতু হয়ে বসলে আবার লিখবেন নিশ্চয়।

যদুপতি বিস্মিত হয়ে শুনছিল। অনেক দিন সে এইসব ঘটনা থেকে বিযুক্ত, ঠিক খবর রাখে না। মেঘনাদবধ কাব্য প্রণেতা মাইকেল মধুসূদন বিলাতফেরত হয়ে বাংলা লেখা বন্ধ করে দিয়েছে। এই মাইকেলকে তারা নবীনকুমার সিংহের বাড়িতে সংবর্ধনা দিয়েছিল, মনে আছে সেই দিনটির কথা—।

শিবনাথ বললো, সংবাদ প্রভাকরে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পর একটা সংবর্ধনা পত্র বেরিয়েছিল, আপনারা সেটাও দেখেন নি?

যদুপতি বললো, কিন্তু তত্ত্ববোধিনী কিংবা মিরর-এ তো আমি এই বঙ্কিমবাবু বিষয়ে কিছু লেখা দেখিনি!

শিবনাথ বললো, রহস্য সন্দর্ভ, সোমপ্রকাশ, হিন্দু পেট্রিয়টে অনেক কথা লেখা হয়েছে। আমার মাতুল অবশ্য বঙ্কিমবাবুর লেখা তেমন পছন্দ করেন নি।

যদুপতি বললো, কে এই বঙ্কিমবাবু? কোনো অজ্ঞাতকুলশীল হঠাৎ উৎকৃষ্ট বই লিখে ফেললো? এর নিবাস কোথায়? কোথাকার চাটুজ্যে? পিত' কী করেন।

—বাঃ, মনে নেই এই বঙ্কিম চাটুজ্যের কথা? যেবার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ পরীক্ষা নেওয়া হলো, তাতে দুজন মাত্র ছাত্র পাস করেছিল, বঙ্কিমবাবু ফার্স্ট হলেন. পাস করার সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটির চাকরি—।

শিবনাথ বললো, ইনি একসময় সংবাদ প্রভাকরে কবিতাও লিখেছেন অনেক।

এবার ওঁদের কথায় বাধা দিয়ে যদুপতি বললো, দাঁড়াও, দাঁড়াও, ইনি কি সেই বঙ্কিম চাটুজ্যে যিনি 'ললিতা তথা মানস' নামে একখানি চটি কবিতা-পুস্তক ছাপিয়েছিলেন? সে বই আমি কিনেছিলুম এক কাপি, কিন্তু সে তো অনেককাল আগেকার কথা।

প্রিয়নাথ বললো, তুমি কিনেছিলে? তবে তো তুমি ভাগ্যবান ব্যক্তি। কৃষ্ণকমলের মুখে গল্প শুনলুম, ঐ কবিতা পুস্তক মাত্র ছ' কাপি বিক্রি হয়েছিল—তাই বঙ্কিমবাবু রাগ করে আট দশ বছর বাংলা লেখাই ছেড়ে দিয়েছিলেন!

শিবনাথ বললো, বঙ্কিমবাবু সম্পর্কে আমি আরও অনেক গল্প শুনেছি। ইনি নাকি চাকরিতে যাবার সময় খানিকটা গঙ্গাজল নিজের জননীর পায়ে ঠেকিয়ে একটা শিশিতে ভরে সঙ্গে নিয়ে যান। ওঁরা ভাটপাড়া-নৈহাটীর বামুন, খুব গোঁড়া হিন্দু মনে হয়। তবে যাই বলুন, রচনাশক্তি অসামান্য।

প্রিয়নাথ বললো, আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ক্রিশ্চিয়ান আর এমন অপূর্ব বাংলা নবেলের লেখক গোঁড়া হিন্দু। আমাদের ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের মধ্যে কেউ তেমন প্রতিভা দেখাতে পারেন না!

যদুপতি বললো, কেন, দেবেন্দ্রবাবুর বড় ছেলে দ্বিজুবাবু বেশ লেখেন, সত্যেন্দ্রবাবুও ভালো গান রচনা করেছেন।

—রাখো তোমাদের দেবেন্দ্রবাবুর ছেলেদের কথা। ওসব শখের লেখায় কিছু হবে না...মন-প্রাণ ঢেলে দেওয়া যে রচনা, তা লিখেছেন এই বঙ্কিমবাবুই, অহো, 'কপালকুণ্ডলা' গদ্য তো নয়, যেন কাব্য! তবে বঙ্কিমবাবুর একটাই দোষ, রচনাটিতে কোনো উচ্চ ভাব নেই, বড় বেশী প্রণয়...দেশের মানুষের জন্য কোনো নীতি প্রচার করেন নি।

শিবনাথ বললো, দোষ কি মশাই, সেটাই তো গুণ। সেক্সপীয়ার-কালিদাস কোন নীতি প্রচার করেছেন?

যদুপতি ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে বললেন, এই বঙ্কিমবাবুটি যদি গোঁড়া হিন্দুই হবেন, তবে নিজের জননীকে দিয়ে এমন পাপটা করালেন? গঙ্গাজলে পা ছোঁয়ালেন? এ কেমনতর হিন্দু! ওঁদের কাছে গঙ্গাজলের স্থান তো মাথায়।

শিবনাথ বললো, ওসব যাই বলুন, বইখানি পড়লে একেবারে মোহিত হয়ে যাবেন।

যদুপতি বললো, নিছক প্রণয়ের গল্প পড়বার আমার সাধ নেই। আমি এখন মরছি অন্য জ্বালায়।

প্রিয়নাথ বললো, না হে, যদু, তুমি তবু একবার বইখানি পড়ো। চাও তো আমিই দিতে পারি। 'কপালকুণ্ডলা' আমার বাসাতেই আছে।

শিবনাথ বললো, 'দুর্গেশনন্দিনী'ও আমি সংগ্রহ করে দিতে পারি।

যদুপতি ফস্ করে বলে ফেললো, পড়তে পারি বইখানি, যদি সেই সঙ্গে পাঁচটি টাকা ঋণ দাও। ঘরে এককণা চাল নেই, শূন্য উদরে কি কাব্য-সাহিত্য পাঠ করা যায়?

প্রিয়নাথ হাসতে হাসতে বললো, বা রে, বা, আমি কি বঙ্কিমবাবুর ফড়ে যে জোর করে তাঁর বই লোকজনকে পড়াবো? সেজন্য আমায় অর্থ ব্যয় করতে হবে?

সে রাতে প্রিয়নাথের কাছ থেকে তিনটি টাকা এবং এক কপি 'কপালকুণ্ডলা' নিয়ে যদুপতি বাসায় ফিরলো। বাড়িতে মহাহাঙ্গামা, মধ্যম ভাগ্নে লাড়লীমোহন পল্লীর কয়েকটি দুর্বৃত্ত যুবকের সঙ্গে কোন্দল করে মাথা ফাটিয়ে এসেছে, এখন সে একটি দরজার খিল খুলে নিয়ে তা দিয়ে ফের সে মারামারি করতে যেতে চায়। অপর দুই ভাই তাকে জাপ্‌টে ধরে আছে।

সত্যিকারের ব্রাহ্মসুলভ সংযম ও স্থৈর্যের পরিচয় আর দিতে পারলো না যদুপতি, পা থেকে চটিজুতো খুলে লাড়লীমোহনকে পেটালো কয়েকবার। বইখানা ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। অতিরিক্ত ক্রোধের ফলে যদুপতির নিজের বুকের মধ্যেই ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে গেল, অসুস্থ বোধ করে সে শুয়ে পড়লো শয্যায়। তখন তিন ভাগ্নে তার চৌকির পাশে বসে শুরু করে দিল মড়াকান্না তাতে আর এক বিপদ প্রতিবেশীরা না ছুটে আসে।

খানিকবাদে কিছুটা সুস্থ হয়ে যদুপতি উঠে বসে বললো, হতভাগারা, খেতে পাস না, তবু তোদের এত তেজ কিসে? কাল থেকে সকাল-সন্ধ্যা অন্তত আধঘণ্টা ধরে যদি প্রার্থনায় না বসিস, তবে তোদের খাওয়া বন্ধ।

ছোট ভাগ্নে ভুবনমোহন বলে উঠলো, মামা, আজ রাতে কী খাবো?

যদুপতি পকেট থেকে একটি টাকা বার করে বড়টিকে বললেন, যা, বাজার থেকে চাল আর ডাল নিয়ে আয়। যদি পাস তো খানিকটা মাছও আনিস। আর সেরখানেক আলু। আজ পেট পুরে খিচুড়ি খাবো। যা, ছুটে যা!

সব সরঞ্জাম যোগাড়ের পর খিচুড়ি রান্না শেষ করতে বেশ রাত্রি হয়ে গেল। তবে ভোজনটা হলো বেশ তৃপ্তিপূর্ণ। বড় ভাগ্নেটা কোনো বাড়িতে রসুইবামুনের কাজ নিলে পারতো, ওর রান্নার হাত ভালো। খিচুড়ি-আলুসেদ্ধ আর খলসে মাছ ভাজা। রান্না হয়েছিল এক হাঁড়ি চারজনেও শেষ করতে পারলো না। লাড়লীমোহন বললো, কাল আবার খাবো। বাসি খিচুড়ির সোয়াদ বেশী ভালো হয়।

একটি পান মুখে দিয়ে শুতে যাবার আগে যদুপতির মনে পড়লো বইটির কথা। সেখানা কোথায় গেল? ঐ বইয়ের লেখকের সুবাদেই তো আজ রাত্তিরে এমন খাওয়া-দাওয়া হলো। এখন বইটি অন্তত উল্টেপাল্টে দেখা দরকার।

তখন মনে পড়লো, ভাগ্নেকে প্রহার করবার সময় উঠোনে বইটি খসে পড়েছিল হাত থেকে। আর তোলা হয়নি ভাগ্নেরাও উঠিয়ে রাখেনি। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে উঠোনের এককোণে বইটি পেয়ে গেল যদুপতি। সে নিজে যখন কাব্য রচনা করতো, তখন কোনো গ্রন্থের প্রতি এতখানি অবজ্ঞা প্রকাশ করা যদুপতির স্বপ্নাতীত ছিল দিন-কাল কেমনভাবে বদলে গেছে!

শিয়রের কাছে সেজবাতি জ্বেলে যদুপতি শুয়ে শুয়ে খুললো বইটির প্রথম পৃষ্ঠা। প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম সাগর সঙ্গমে। তার নিচে শেক্সপীয়ারের 'কমেডি অব এররস্' থেকে একটি কোটেশন। তারপর শুরু: প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রি শেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্তুগীজ ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালে প্রথা ছিল…।

পাঠ করতে করতে যদুপতির ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। 'যাতায়াত'? এই লেখকটি বি এ পাশ যখন, তখন শিক্ষিতই বলা যায়, তবে যাতায়াত লেখে কেন? 'গমনাগমন' শব্দটি জানে না? যাতায়াত মুখে বলি বটে কিন্তু ভাষার শুদ্ধতার জন্য গমনাগমনই লেখা সঙ্গত ছিল নয় কি?

যাই হোক, প্রিয়নাথ এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভাগ্নে যখন অত উচ্চ প্রশংসা করলে, তখন আর একটুখানি পড়ে দেখা যাক।

…যুবা উত্তর করিলেন, 'আমি তো আগেই বলিয়াছি যে সমুদ্র দেখিবার বড় সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।' পরে অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্বরে কহিতে লাগিলেন, 'আহা! কী দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না…'

পরদিন সকালবেলাতেই যদুপতি প্রিয়নাথের গৃহে উপস্থিত। চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ, মাথার চুল অবিন্যস্ত, শয়নের ধুতিটিও পরিবর্তন করেনি। প্রিয়নাথকে দেখামাত্র আলিঙ্গন করে সে তীব্র আবেগের সঙ্গে বললো, ভ্রাতঃ, তুমি আমার এ কী করলে! কাল সারা রাত্র এক ফোঁটা ঘুমাতে পারিনি। কপালকুণ্ডলা আমি তিনবার পড়েছি, এখনও মনে হচ্ছে আবার পড়ি। আবার পড়ি বাংলাভাষাতে এমন রচনা সম্ভব? ইচ্ছে হচ্ছে, বইখানি মাথায় নিয়ে নৃত্য করি!

প্রিয়নাথ বললো, আরে রও, রও, একেবারে যে পাগল হলে দেখছি। বলেছিলুম কিনা, বইটি ধরলে

আর ছাড়তে পারবে না!

—কোথায় থাকেন এই বঙ্কিমবাবু? আমায় এক্ষুনি দেখিয়ে দাও, আমি তাঁর পায়ের ধুলো নেবো!

তুমি ব্রাহ্ম হয়ে হিন্দুর পায়ের ধুলো নেবে? না হয় একখানা ভালো বই লিখেছেন···

—একখানা ভালো বই? এ লেখক বিশ্বজয় করতে এসেছেন। তুমি 'কপালকুণ্ডলা'র মতন গদ্যবাক্য ইংরেজী ভাষাতে কয়খানা আছে বলো দেখি। আমাদের বাংলাভাষার যে এমন ক্ষমতা কে জানতো? কোথায় থাকেন বঙ্কিমবাবু, আমি এখুনি তাঁর কাছে যাবো!

—কোথায় থাকেন তা তো জানি না। তবে কৃষ্ণকমলের কাছে শুনেছি, বঙ্কিমবাবু এখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ছেন।

—তার মানে? দশ বছর আগে তিনি বি এ পাস করে গেছেন। ডেপুটিগিরি করেন মফস্বলে, তিনি আবার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র হন কীভাবে?

—অত উত্তেজিত হয়ো না, চুপ করে একটু বসো। ছাত্র হতে পারবেন না কেন? বি এ পাশ করবার সময় তিনি আইন পড়া শেষ করতে পারেন নি। ঝটিতি চাকরি পেয়ে গেছেন তো···তাই এখন আইন পড়াটা সম্পূর্ণ করে পরীক্ষা দিতে চান। সেই জন্য ক্লাস করছেন···তুমি তো কৃষ্ণকমল ভটচাজকে চেনো।

—খুব ভালোই চিনি। সে সন্ধান দিতে পারবে?

—হ্যাঁ। কৃষ্ণকমলও এখন আইনের ক্লাস করছে। উকিল হতে চায়। তার মুখেই আমি বঙ্কিমবাবুর নাম প্রথম শুনি। কৃষ্ণকমল এখন বঙ্কিমবাবুর সহপাঠী।

যদুপতি তখনই ছুটে গেল কৃষ্ণকমলের কাছে। কিন্তু সেখানে বিশেষ সুবিধে হলো না। কৃষ্ণকমল জানালো যে বঙ্কিম চাটুজ্যে অতি সুলেখক হলেও মানুষটি অতি গম্ভীর ও রাশভারি। অচেনা ব্যক্তিদের সঙ্গে কথাই বলতে চান না। কেউ উপযাচক হয়ে সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে তিনি রীতিমতন বিরক্ত হন। সুতরাং যদুপতির পক্ষে এখনি বঙ্কিম চাটুজ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না যাওয়াই ভালো। তাতে বরং প্রিয় লেখক সম্পর্কে আশাভঙ্গ ও স্বপ্নভঙ্গ হতে পারে।

যদুপতি তাতেও সম্পূর্ণ নিরস্ত হলো না। আলাপ না করলেও সাক্ষাৎ সে একবার করবেই। অন্তত দূর থেকেও। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো তীর্থের কাকের মতন। এক সময় তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ক্লাস শেষ হতে ছাত্ররা বেরিয়ে এলো বাইরে। কৃষ্ণকমলের কাছ থেকে বঙ্কিমবাবুর চেহারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সে শুনে এসেছিল, সেই জন্য যদুপতির চিনতে দেরি হলো না। এ কেমন অদ্ভুত ছাত্র! চোগা-চাপকান পরিহিত শামলা আঁটা প্রকৃত ডেপুটির মতনই চেহারা, গম্ভীর পদক্ষেপে হেঁটে চলেছেন, এক আর্দালি তাঁর মাথার ওপর ছাতা ধরে চলেছে পেছনে পেছনে। যদুপতির চেয়ে বেশ ছোটই হবেন। বরং কৃষ্ণকমল-নবীনকুমারের সমবয়েসী বলে মনে হয়।

বঙ্কিম চাটুজ্যের ভাবভঙ্গি দেখে যদুপতি এগিয়ে গিয়ে কথা বলার সাহস পেল না। যতক্ষণ দেখা যায় একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। উনি চোখের আড়াল হতেই যদুপতি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো নিজের বাড়ির দিকে। তৎক্ষণাৎ আবার খুলে বসলো 'কপালকুণ্ডলা'।

···'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে। কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল, যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল, বৃক্ষপত্র মর্মরিত হইতে লাগিল···।

পাঠ করতে করতে সত্যি সত্যিই বইখানা নিয়ে নৃত্য শুরু করে দিল যদুপতি।

অতিশয় উৎফুল্ল চিত্ত নিয়ে নবীনকুমার প্রতিদিন ভোরে জেগে ওঠে। বস্তুত সন্ধ্যার একটু পরেই তার মনে হয়, কখন আবার প্রত্যূষ আসবে। রাত্রি তার পছন্দ হয় না, বিশেষত এখন অমাবস্যা, চতুর্দিকে দেখা যায় না কিছুই। শীতের ধারালো বাতাসের মধ্যে অন্ধকারে অন্ধের মতন বসে থাকতে কেনই বা তার ভালো লাগবে। সায়াহ্নের পর কিছুক্ষণ সে নিজের কামরায় বসে গ্রন্থপাঠে নিমগ্ন থাকে। তারপর আহার সেরে নিয়ে সে শয্যাগ্রহণ করে।

ভোরগুলি সত্যিই বড় মনোরম।

ঘুম ভাঙা মাত্র নবীনকুমার উঠে চলে আসে গবাক্ষের কাছে। বাইরের দিকে তাকালে চক্ষু যেন জুড়িয়ে যায়। মদ্যপান সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করার ফলে তার শরীরে কোনো অবসাদ নেই, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সক্রিয়, মস্তিষ্ক যেন এই ধরণীর রূপ রস গন্ধ শুষে নেবার জন্য উন্মুখ। সব মানুষেরই শরীর এরূপ থাকে, নাকি যারা এক সময় নেশায় অসাড় হয়ে যেত, তারাই শুধু শরীরের এই অসাধারণ ধারণক্ষমতা টের পায়? নবীনকুমারের মনে হয়, সে যেন পুনর্জীবন পেয়েছে।

আগে মাত্র একবার নবীনকুমার নদীপথে পরিভ্রমণে এসেছে। সেবারে সে এসেছিল গুরুতর অসুস্থতার পর ভগ্ন শরীর নিয়ে, শ্রবণক্ষমতা প্রায় লুপ্ত ছিল। এবার, নবীনকুমার ভাবে, সে এসেছে তার অন্ধত্ব সারাতে। সত্যিই যেন সে নতুন করে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাচ্ছে। এই জগৎ তার কাছে উদ্ভাসিত হচ্ছে নতুন রূপে।

ব্যস্ততা কিছু নেই। নবীনকুমার মাতৃসন্দর্শনে চলেছে বটে, কিন্তু এই নদীমেখলা সবুজ-শ্যামল ভূমিও যে তার মায়ের মতন, নবীনকুমার তা এই প্রথম অনুভব করছে। 'দেশ' নামক আদর্শটির কথা লেখা থাকে ইংরেজী বইতে। ভারতবর্ষে 'দেশ' শব্দটির ব্যবহার আছে বটে, কিন্তু ঐ আদর্শটি নেই। এখানে শুধু বিভিন্ন রাজা ও রাজত্ব। হিন্দু রাজত্ব, পাঠান রাজত্ব, মুঘল রাজত্ব, এখন যেমন ব্রিটিশ রাজত্ব। শতাব্দীর পর শতাব্দী আসে, রাজত্ব বদলায়, দেশ আপন মনে শুয়ে থাকে, মাঝে মাঝে শুধু পাশ ফেরে। দিগন্তবিস্তৃত শয়ান সেই দেশ নবীনকুমারের চক্ষে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ভোর হতেই গায়ে একটি শাল জড়িয়ে নবীনকুমার বজরার ছাদে উঠে এসে একটি কেদারায় পা ছড়িয়ে বসে। তখনও দাঁড়ী-মাঝিরা সকলে প্রস্তুত হয়নি। রাত্রে বজরার বহর বাঁধা থাকে কোনো ঘাটের কিনারে, সন্ধ্যায়-সকালে কাছাকাছি কোনো লোকালয় থেকে আনাজ-তৈজসপত্র সংগ্রহ করা হয়, তারপর রোদ চড়বার আগেই যাত্রা শুরু।

দুলাল এক ঘটি খেজুররস নিয়ে আসে। ক'দিন ধরে নবীনকুমার এই খেজুররসের জন্য লোভীর মতন অপেক্ষা করে থাকে। শ্বেতপাথরের গেলাসে ভরতি করে রস ঢেলে দেয় দুলাল, নবীনকুমার হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে প্রায় এক নিঃশ্বাসে সবটুকু শেষ করে দেয়। দুলাল জিজ্ঞেস করে, ছোটবাবু, আর একটু দিই? নবীনকুমার সাগ্রহে ঘাড় নাড়ে। পর পর তিন গেলাস পান করার পর তার অন্তঃকরণ পর্যন্ত জুড়িয়ে যায়।

খানিক পরে, বেলা বাড়লে দুলাল নিয়ে আসে দু-তিনটি ডাব।

নবীনকুমার এই আর একটি নতুন ব্যাপার আবিষ্কার করেছে। সে যে আগে কখনো খেজুরের রস কিংবা ডাবের জল পান করেনি তা তো নয়। কিন্তু এই যাত্রায় এসে তার মনে হচ্ছে এমন সুন্দর পানীয় আর হয় না। কী আশ্চর্যের ব্যাপার। প্রকৃতি গাছের ডগায় মানুষের জন্য এমন সুস্বাদু পানীয় রেখে দিয়েছেন। ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ মদ্য-ব্যবসায়ীও কি অবিকল এই পানীয় উৎপন্ন করতে পারবে?

একদিন দুলাল তীরবর্তী কোনো গ্রাম থেকে সদ্য গাছ থেকে কাটা এক ছড়া মর্তমান কলা এনেছিল। কলাগুলোর ওপরে তখনো মিহিন সাদা গুঁড়ো ছড়িয়ে আছে, সবগুলো পাকেনি, কয়েকটা ফেটে ফেটে গেছে। তার থেকে একটি কলা ছিঁড়ে নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে এক কামড় দেওয়া মাত্র

নবীনকুমার যেন দিব্য আনন্দ পেয়েছিল। তৎক্ষণাৎ তার মনে হয়েছিল, মানুষের কোনো রন্ধনপ্রণালীই তো এমন অপূর্ব খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। একেবারে ঠিকঠাক মিষ্টি। একটু বেশীও নয়, কমও নয়, শক্তও নয়, নরমও নয়। মনে মনে নবীনকুমার ঘোষণা করেছিল, ঈশ্বর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাঁধুনী। বিভিন্ন লঙ্কায় তিনি বিভিন্ন রকমের ঝাল দিয়ে রেখেছেন ; নিম পাতা, পলতা পাতা, তুলসী পাতায় তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন নানা রকমের স্বাদ, লেবুতে দিয়েছেন তিনি অম্ল রস, আম-কাঁঠালে মিষ্ট রস, আবার বেল কিংবা কালো জাম কিংবা হরীতকীতে এমন রস, যার ঠিক বর্ণনা করা যায় না। এত বহু বিচিত্র রকমের রন্ধন আর কার পক্ষে সম্ভব ?

তবে, এই বিরাট রন্ধনশালাটি কার, ঈশ্বরের না প্রকৃতির ? এ নিয়ে মাঝে মাঝে নবীনকুমারের খটকা লাগে। তবে যাঁরই হোক, তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। নবীনকুমারের মধ্যে আস্তিকতার গোঁড়ামি যেমন নেই, তেমন সে নাস্তিকতার বিদ্রোহী ধ্বজা তুলে ধরতে চায় না।

সবচেয়ে বড় কথা, ঈশ্বর বা প্রকৃতি যেই হোন, তাঁর সৃষ্টিশালায় রয়েছে কত রকম অপ্রয়োজনের সৌন্দর্য। যে সব ফুল থেকে কোনো দিন ফল হয় না, ফুটে আছে সেই রকম শত-সহস্র নয়ন-সুখ অপূর্ব সুশ্রী ফুল।

আগেরবার নবীনকুমার মানুষের কথার শব্দ শোনার জন্য ব্যগ্র অধীর হয়ে থাকতো, এবার যেন সে করছে নীরবতার সাধনা। দুলালের সঙ্গেই শুধু দু-চারটি বাক্যবিনিময় হয়, এ ছাড়া সারা দিনে সে পারতপক্ষে অপর কারু সঙ্গে কথা বলে না। এর মধ্যে একবারও সে তীরের কোনো লোকালয়ে যায় নি। দু-এক জায়গায় তাদের জমিদারির পাশ দিয়ে যেতে হয়েছে, সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছে প্রজারা, কিন্তু নবীনকুমার বজরা থামাবার আদেশ দেয়নি। যদি ইচ্ছে হয়, তা হলে ফেরার পথে সে জমিদারি পরিদর্শন করবে।

বজরার বহরে লোকজন অনেক রয়েছে বটে, তবু এর মাঝে থেকেও যে একাকিত্ব, তাতে বোধশক্তি সূচ্যগ্র হয়ে ওঠে। কল্পনা ও স্মৃতি মিলে-মিশে চক্ষের সমুখে অজস্র স্থাণু মুহূর্তের সৃষ্টি করে। এ অনুভূতি সব সময় সুখকর নয়। নদীর দু-পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে তার মধ্যে স্থাপিত হয়ে যায় এক একটি অন্য ছবি। রৌদ্র-ঝলমল বর্তমানের মধ্যে বসে থেকে নবীনকুমার বার বার ফিরে যায় তার ছায়াচ্ছন্ন অতীতে। নিজের জীবনের প্রাক্তন ঘটনাগুলিকে সে যাচাই করে, তাতে কষ্ট বাড়ে বই কমে না। স্লেটের লেখার মতন অতীতটাকে ভিজে ন্যাতা দিয়ে একেবারে মুছে ফেলা যায় না বলে সে মাঝে মাঝে নিজের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েও ওঠে।

দুটি নারীর মুখ বারবার ফিরে আসে তার মানসপটে। একজন নারীকে সে দেখেছে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য, চন্দ্রনাথের বাড়িতে, তাও সে বেশির ভাগ সময় অবগুণ্ঠিতাই ছিল। কেন সেই পথ থেকে কুড়িয়ে আনা রমণীকে মনে হলো অবিকল তার মায়ের মতন ? নবীনকুমারের সর্বাঙ্গে ঝাঁকুনি লেগেছিল। এমন অভিজ্ঞতা যার হয় নি সে এর মর্ম বুঝবে না। পরদিন সকালেই রমণীটি একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল বলেই তো নবীনকুমারের এতখানি যাতনা। যদি তার সঙ্গে আবার দেখা হতো, তার সঠিক পরিচয় জানতো, তা হলে এতদিনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যেত।

আর একটি মুখ, সে বড় গোপন, বিষম গোপন। সে মুখ নবীনকুমার কিছুতেই মনে আনতে চায় না। কিছুতেই না। যাতে মন থেকে একেবারে মুছে যায়, সেই জন্য নবীনকুমার তার সংস্রব এড়িয়ে চলে, দেখা হলে বাক্যবিনিময় পর্যন্ত করে না। তবু কেন কল্পনায় ফিরে আসে সেই মুখ !

মানুষের কি দুরকম চিন্তাশক্তি থাকে ? নবীনকুমার প্রবল চিন্তাশক্তি দিয়ে যে মুখখানি ভুলে যেতে চায় তবু সেই মুখ কেন ফিরে আসে ? এ তবে কার ইচ্ছাশক্তি ? তখন কোনো গ্রন্থপাঠেও নবীনকুমার মনোনিবেশ করতে পারে না, প্রকৃতির দিকে চোখ মেললেও কিছু দেখতে পায় না। প্রাণপণে কোনো কিছু জোর করে ভুলে যাবার চেষ্টা যে এমন অসাধ্য, এমন যন্ত্রণাদায়ক তা সে আগে জানতো না। মানুষ কোনো কিছু পাবার জন্য সর্ব শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু কোনো কিছু থেকে নিজেকে

বঞ্চিত করবার জন্য কি তার চেয়েও বেশী শক্তি লাগে ?

নবীনকুমারের বজরা বেশী দূর অগ্রসর হয়নি, নকুড় ও দুর্যোধনের দলবল তাকে ধরে ফেললো নদীয়ায়।

বিম্ববতীর মৃত্যুসংবাদ নবীনকুমার গ্রহণ করলো খুব শান্তভাবে। যেন সে মনে মনে প্রস্তুত হয়েই ছিল যে মায়ের সঙ্গে তার দেখা হবে না। এ কথাটা তার প্রথম মনে আসে চন্দ্রনাথের গৃহে তার মাতৃমুখী সেই রমণীটিকে দেখে। এই চিন্তাটিকে কুসংস্কারের মতন উড়িয়ে দেবার জন্যই সে হরিদ্বার যাত্রা করতে চেয়েছিল।

গঙ্গানারায়ণের পত্র পাঠ করে সে কিছুক্ষণ বসে রইলো চুপ করে। নবীনকুমারের চক্ষু অশ্রুহীন, কিন্তু দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দুলাল উচ্চ স্বরে কাঁদছে বালকের মতন। বিম্ববতী তার কাছে ভগবতীতুল্যা। বিম্ববতীর জন্যই তার যা কিছু। বয়স হবার পর সে বুঝতে পেরেছে যে পাছ-মহলের ভৃত্যতন্ত্র থেকে সে যে ওপরতলায় প্রভুপুত্রের সহচর হিসেবে স্থান পেয়েছে, তা শুধু বিম্ববতীর দয়ায়।

দুলালকে কিছুক্ষণ কান্নাকাটির সময় দিল নবীনকুমার।

তারপর মৃদু কণ্ঠে সামনে দণ্ডবৎ হয়ে থাকা নকুড় ও দুর্যোধনকে বললো, দুলালকে ভেতরে ডাক—

দুলাল চক্ষু মুছে ভেতরে এসেও আবার হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলে বললো, ছোটবাবু, ছোটবাবু, কত্তামা চলে গ্যালেন—

নবীনকুমার মুখ তুলে বললো, কাছাকাছি কোনো বড় জায়গায় বজরা ভেড়াতে বল। তারপর পুরুত যোগাড় করতে হবে, আর সব যোগাড়-যন্তর করতে হবে, আমি এই নদীর ধারে মায়ের পারলৌকিক কাজ করবো।

নকুড় হাত জোড় করে বললো, কলকেতায় ফিরে যাবেন না, ছোটবাবু! বড়বাবু অনেক করে বলে দিয়েচেন—

নবীনকুমার বললো, না, এখন আমার ফেরা হবে না। তোরা ফিরে যা—।

অদূরেই রাসপুর নামে একটি গঞ্জ মতন এলাকা। সেখানেই এসে থামলো বজরার বহর। দুলালের খুবই ইচ্ছে এখনই কলকাতার দিকে রওনা হওয়ার, সে প্রস্তাব একবার নবীনকুমারের কাছে তুলে ধমক খেল। নবীনকুমার আগে মায়ের শ্রাদ্ধাদি কৃত্য সম্পন্ন করবে, তারপর অন্য কথা।

নদীবক্ষে শালগ্রাম শিলার পূজা এবং পিণ্ডদান ঠিক শাস্ত্রসম্মত নয়। তীরে নামতেই হবে। আবার, অপরের জমিতে বসে নবীনকুমারের মতন জমিদারপুত্র মাতৃদায় থেকে উদ্ধার হবে, এটাও মোটেই ভাল দেখায় না। পুরোহিত ও দুলালের এই মিলিত যুক্তি শুনেও নবীনকুমার নিবৃত্ত হলো না। সে আদেশ দিল যে সেদিনের মধ্যেই কাছাকাছি কোথাও দু-দশ বিঘে জমি সমেত একটি বাড়ি কিনে ফেলার ব্যবস্থা করা হোক। আগামীকাল সেইখানেই কাজ হবে।

এ আদেশ অমান্য করার সাধ্য দুলালের নেই। তৎক্ষণাৎ সে পাঁচ-সাতজন লোক পাঠিয়ে দিল জমির সন্ধানে। পুরোহিতের তালিকা অনুযায়ী শ্রাদ্ধের দ্রব্য-সম্ভার সংগ্রহে সে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এত সব জিনিস রাসপুরে পাওয়া যাবে না। ঘোড়া ভাড়া করে লোক পাঠাতে হবে দূরে দূরান্তরে।

এগারো বিঘে জমি সমেত একটি ছোট বাড়ি পাওয়া গেল আধ ক্রোশের মধ্যেই এবং নদীর ধারে। পরদিন সেখানে সব ব্যবস্থা হলো। ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে নবদ্বীপ থেকে আনানো হল দানের ষোড়শ উপচার। মস্তক মুণ্ডিত করে নদীতে স্নান সেরে নবীনকুমার এসে বসলো যজ্ঞে।

প্রথম দিনে একশোটি ব্রাহ্মণের সেবা এবং প্রত্যেককে পিতলের কলস, এক জোড়া ধুতি ও দশটি করে রৌপ্যমুদ্রা দেওয়া হলো। সুখের বিষয়, এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণের কোনো অভাব নেই। বৃষোৎসর্গও বাদ গেল না।

পরদিন কাঙালীভোজন। সেদিন এলো প্রায় দু' তিন হাজার লোক। বিনা নিমন্ত্রণে এত গ্রামবাসীকে আসতে দেখে দুলালদের চক্ষু স্থির হবার উপক্রম। গ্রামে এত কাঙালী? যাই হোক, ব্যবস্থার ত্রুটি হলো না কোনো। প্রথম পঙ্‌ক্তিটি বসে গেলে নবীনকুমার নিজের হাতে অন্ন পরিবেশন করলো।

সব কিছু মিটে যাবার পর সন্ধ্যাকালে নবীনকুমার নদীর ধারে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে, সে সময় তার চক্ষু থেকে বিমোচিত হলো কয়েক বিন্দু অশ্রু। তার ভিতরের শুষ্কতায় সে নিজেই বিস্মিত হচ্ছিল। যত আড়ম্বরের সঙ্গেই তর্পণ করা হোক, চোখের জল ছাড়া কি লোকান্তরিত জনক-জননীর পূজা সম্ভব! মনে মনে সে বললো, মা, আমি জানি, আমি যদি তোমায় এক কোটিবারও দুঃখ দিয়ে থাকি, তবু জানি, তুমি তার সবই ক্ষমা করোচো!

শীতের পরিষ্কার আকাশে, নদীর পরপারে বর্ণাঢ্য সূর্যাস্ত হচ্ছে। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নবীনকুমারের মনে হলো, এরকম সূর্যাস্ত প্রতিদিনই হয়, কিন্তু প্রতিদিন এ দৃশ্য এক রকম নয়। আছে, অন্য কিছু আছে। যা আমরা শুধু চোখ দিয়ে দেখি, যুক্তি দিয়ে বুঝি, তার আড়ালেও অন্য রকম কিছু আছে। নইলে জীবন বড় এক-ঘেয়ে হতো।

একটু পরেই নবীনকুমারের নির্জনতা বিঘ্নিত হলো। নদীর ওপার থেকে একটি বড় নৌকো এসে থামলো এপারে। তার থেকে নেমে একজন মধ্যবয়স্ক লোক নবীনকুমারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে বললো, নমস্কার ছোটবাবু!

নবীনকুমার খানিকটা বিরক্ত, কিছুটা কৌতূহলী হয়ে লোকটির দিকে চাইলো। সে যে একজন বড় জমিদার, তা ইতিমধ্যেই রটে গেছে। সচরাচর গ্রামবাসীরা তার সঙ্গে কথা বলতে এলে ভূমিতে কপাল ঠেকিয়ে আগে প্রণাম সেরে নেয়। এই লোকটি তার ব্যতিক্রম। এর কথার মধ্যে খুব একটা বিনয়ের ভাবও নেই, যদিও লোকটি তাকে চেনে। ছোটবাবু বলে সম্বোধন করেছে।

এই ব্যক্তিটির বেশ গোলগাল চকচকে চেহারা। ধুতিটির রং টকটকে লাল, উত্তমাঙ্গে একটি মুগার চাদর জড়ানো। নবীনকুমারের থেকে সামান্য দূরত্ব রেখে মাটিতে বসে পড়ে সে বললো, আমি খবর পাইলাম আজ সকালে। আইস্যা বুঝতে পারছি, অনেক দেরি হয়ে গ্যাছে।

লোকটি নবীনকুমারের মুণ্ডিত মস্তকের দিকে হাতের ইঙ্গিত করলো। অর্থাৎ শ্রাদ্ধ-শান্তি যে চুকে গেছে, সেই কথাই সে বলতে চাইছে।

—আপনি কে?

—আপনি না, আমাকে তুমি বলেন। সেইডাই মানানসই হইবে। একেবারে যে তুই-তুকারি দিয়া শুরু করেন নাই এই আমার বাপের ভাইগ্য। অধীনের নাম ভুজঙ্গ শর্মা।

—আমার কাছে কী প্রয়োজনে আসা?

—সে রকম কোনো প্রয়োজন নাই। এইরকম খবর শুনলে আইসতে হয়, সেই আর কি! আসছি আমি ইব্রাহিমপুর থিকা। সেখানে এককালে আপনাগো জমিদারি আছিল, জানেন বোধ হয়?

—ছিল? এখন নেই?

—নাইও কইতে পারেন, আছেও কইতে পারেন!

—অর্থাৎ?

—কাগজে-পত্তরে আইজও আছে, কাজে-কম্মে নাই। যেমন ধরেন, এককালে আমি আপনেগো নায়েব আছিলাম। এখন আমারে আপনেগো নায়েব কইতেও পারেন, নাও কইতে পারেন। আছিও বটে, নাইও বটে।

—আপনি হেঁয়ালি করে কতা বলচেন কেন আমার সঙ্গে? আমি এসব পছন্দ করি না। যদি প্রয়োজনের কোনো কতা থাকে চটপট শেষ করুন, নইলে বিদেয় হোন।

ভুজঙ্গ ভট্টাচার্য আকর্ণবিস্তৃত হাসি দিল। ঘাড় ঘুরিয়ে চতুর্দিক দেখে নিয়ে বললো, এ বাড়িখান কার? আরে রাম রাম, রামকমল সিংহের একমাত্র সন্তান, কত্তামার নয়নের দুলাল নবীনকুমার সিংহ কালাশৌচ পালন করতাছেন পরের বাড়িতে? ছি ছি, কী লজ্জা!

নবীনকুমার তীব্র স্বরে বললো, এ বাড়িটি আমার!

—তা ক্যামনে হয়, ছোটবাবু। ইদিকে তো আপনেগো কোনো ভূ-সম্পত্তি নাই! আমারে আপনে ভুল বুঝাইবেন? আমি যে সব জানি!

লোকটির ঔদ্ধত্যে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো নবীনকুমার। একে এক্ষুনি ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বিদায় করে দেবার জন্য নবীনকুমার হাঁক দিল, দুলাল! ওরে কে আচিস, দুলালকে ডাক্।

ভুজঙ্গ ভট্টাচার্য তৃপ্তির সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললো, হুঁ, ফোঁস শুনলেই জাত চেনা যায়। সিংহের ছাওয়াল সিংহ। রাগ করেন ক্যান, ছোটবাবু! আগে আমার সব কথা শুইন্যা লন।

—আপনার যা বলবার আচে, দুলালকে গিয়ে বলুন। আমার চোখের সমুখ থেকে দূর হয়ে যান!

—দুলাল-টুলালের সঙ্গে কথা কওয়া তো আমার সাজে না ! আমি নিজেও যে একজন জমিদার।

—এটা কি আপনার জমিদারি ? আমি আপনার জমিদারির মধ্যে বসে আছি ?

—না, সে কথা কইতাছি না। আমার না হউক, অপরের জমিদারির মইধ্যে বইস্যা থাকাও আপনার শোভা পায় না। এটা কীর্তিচন্দর রায়গো জমিদারির মইধ্যে পড়ে। আমার জমিদারি এর লগে লগেই। তয়, আমিও আসল জমিদার নয়, নকল। চেহারাখান দ্যাখছেন না, এই কি জমিদারের চেহারা ! আমি নকল।

—ফের হেঁয়ালি ?

—এবার তয় সাদা কথাই কই। আসলে জমিদারের ব-কলমা দিতে দিতে আমি এখন পেরায় জমিদার হইয়া গেছি। লোকে অবইশ্য এখনো আমারে নায়েববাবুই কয়।

—আপনি ইব্রাহিমপুর পরগনার নায়েব ?

—ইব্রাহিমপুরে আপনেগো জমিদারি আছিল, সে কথা আপনে জানেন ? খবর রাখেন কিছু ?

—কেন জানবো না ?

—বৎসর ছয়-সাতের মইধ্যে সেখানে জমিদারবাবুগো একজনারও পায়ের ধূলি পড়ে নাই। তাগাদায় কেউ আসে নাই। কাজে কাজেই আমি এখন সর্বেসর্বা। ও জমিদারি এখন আমার !

—আমাদের জমিদারি আপনি আত্মসাৎ করেছেন ?

—নামে আপনাগোই। কোম্পানির আমলে সেই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কইরা গ্যাছে, তারপর না ব্যাচলে তো কেউ জমিদারি কাইড়া নিতে পারে না। তেমন তেমন নায়েব হইলে জমিদারি ফোঁপরা কইরা দিতে পারে। আমিও তাই দিছি।

লোকটির কথা বলার বিচিত্র ধরনে নবীনকুমার আকৃষ্ট না হয়ে পারলো না। নিজের মুখেই স্বীকার করছে যে তাদের একটি পরগনা এই লোকটি ভোগদখল করছে সে কথা নিজের মুখে জানাতে এসেছে কেন ? এ কথা সত্য যে নবীনকুমার তাদের জমিদারির আদায় তহশিলের ব্যাপারে কখনো কোনো আগ্রহ দেখায় নি। যখনই প্রয়োজন হয়েছে, সে গঙ্গানারায়ণের কাছ থেকে অর্থ নিয়েছে কিংবা কলকাতার সম্পত্তি বিক্রয় করেছে। ইব্রাহিমপুর পরগনার তা হলে এই অবস্থা !

—এখনো বুঝতে পারলুম না, আপনি আমার কাছে কেন এসেচেন ?

—বাতাসের মাথায় খবর রটে। লোকে কইত্যাছে যে জমিদারের পোলা নবীন সিংহ মায়ের ছেরাদ্দ করতাছেন অইন্যের জাগায়। নদীর ধারে অনথের মতন বইস্যা আছেন। তাই দৌড়াইয়া আইলাম। ইব্রাহিমপুরে নতুন কুঠিবাড়ি বানাইছি, থাকতে হয় সেখানে আইস্যা থাকেন। চলেন আমার সঙ্গে।

—আপনি আমায় নিতে এসেচেন ?

—হ।

—আশ্চর্য। সেখানে গিয়ে যদি আমাদের জমিদারি আমি আবার দখল করে নিই !

—নিতে ইচ্ছা হয় নিবেন ?

—এত বছর ধরে আমাদের ঠকিয়েচেন, টাকা-পয়সা কিচ্ছু দ্যান নি, সে জন্য যদি আপনাকে জেলে দিই ?

—সেটি পারবার উপায় নাই, ছোটবাবু। কাগজ-পত্তর একেবারে পাক্কা। হিসাব নিতে গেলে দ্যাখবেন আয় কিছুই নাই, বরং ধার দেনা, শুধু ধার দেনা। খাজনার দায়ে বাজনা বিকাইবার উপক্রম। আমারে ধরতে-ছুঁইতে পারবেন না।

—আপনাকে বরখাস্ত করে নতুন নায়েব নিযুক্ত করতে পারি। সে ক্ষমতা নিশ্চয়ই আমার আছে। নামে যখন আমিই জমিদার ?

—তা পারেন, নিশ্চয় পারেন। কিন্তু নূতন নায়েব দুই দিনেই ল্যাজ গুটাইয়া পলাইব, দ্যাখবেন। প্রজারা যে সক্কলেই আমারে মানে।

—অর্থাৎ আপনাকে কিছুতেই হঠানো যাবে না। ও জমিদারি আমাদের যাবেই।

—আপনেরা কইলকেতায় বইস্যা আমোদ-আহ্লাদ করবেন, বছরের পর বছর এদিকে একবার পাও দিবেন না, প্রজারা বাঁইচলো না মরলো সে তল্লাশও করবেন না, তাইলে নায়েবরা সেই সুযোগ সব হাতাইব না ? কন ? সুযোগ পাইছি, আমিও নিছি

—আপনার নাম ভুজঙ্গ, আপনি দেখচি সত্যিই একটি কাল-ভুজঙ্গ !

—হাঃ হাঃ হাঃ ! এডা কী কইলেন, ছোটবাবু ? নাম শুইন্যা কি মানুষ চিনা যায় ? কাউর বাপ-মায়ে

কখনো শখ কইরা সন্তানের নাম ভুজঙ্গ রাখে ? ভুজঙ্গ না, ভুজঙ্গ না, আমার আসল নাম ভুজঙ্গধর। ভুজঙ্গ মানে সাপ, আর ভুজঙ্গধর হইলো শিব। আপনে বিদ্বান মানুষ, এডা জানেন নিশ্চয়। তাইলেই দ্যাখেন কত তফাত হইয়া গেল! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

হঠাৎ হাসি থামিয়ে ভুজঙ্গ ভট্টাচার্য বললো, আপনের দাদা কেমন আছেন ? তিনি দ্যাবতুল্য মানুষ। তিনি বিবাহ করেছেন শুনিছি। আমারে একখান নিমন্ত্রণপত্র পর্যন্ত পাঠান নাই। এমন কথা ভূ-ভারতে কেউ কোনো দিন শুনেছে যে জমিদারের বিবাহ হয়, আর প্রজারা তো দূরের কথা, নায়েবগো পর্যন্ত নিমন্ত্রণ হয় না ? এমন জমিদারের জমিদারি কখনো রক্ষা পায় ?

নবীনকুমার চুপ করে রইলো।

এই সময় দুলালকে এদিকে আসতে দেখে ভুজঙ্গ ভট্টাচার্য নিজেই তাকে ডেকে বললো, দিবাকর গোমস্তা কোথায় ? সে সঙ্গে আসে নাই ? তারে একবার ডাকো, সে আমারে চেনে।

দুলালও তার প্রভুর মত বিস্মিত।

দিবাকর আসে নি শুনে ভুজঙ্গ ভট্টাচার্য অপ্রসন্ন স্বরে বললো, সেই জইন্যেই এমন অব্যবস্থা। যত সব পোলাপানের কাণ্ড, জমিদারকে পথের ধূলায় বসাইয়া রাখছে। চলেন, ছোটবাবু, কুঠিবাড়িতে চলেন। আপনার লোকগুলোরে তল্পি-তল্লা গুটাইতে কন। বেশী দূর না, এক বেলার পথ।

আরও কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বলবার পর নবীনকুমার ইব্রাহিমপুরে যাওয়াই মনস্থ করলো।

ইব্রাহিমপুরের প্রাক্তন কুঠিবাড়িটির পাশেই নির্মিত হয়েছে নতুন এক ইমারৎ। পুরোনো কুঠীবাড়িটির ধ্বংসস্তূপ এখনো বিদ্যমান। প্রকৃতির যা নিয়ম, ধ্বংসস্তূপের ওপরেও আবার প্রাণের আবির্ভাব হয়, সেখানে জন্মে গেছে অনেক গাছপালা।

সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ভুজঙ্গধর বললো, ঐ দ্যাখেন, ঐ ছিল আসল কুঠীবাড়ি, নীলকর সাহেবগো প্যায়দারা এক রাইতে আগুন লাগাইয়া দিছিল। বউ-ছাওয়াল-মাইয়া লইয়া আমি সেই রাইতেই নিরাশ্রয়। তাড়া-খাওয়া ইন্দুরের মতন আমি প্রাণের ভয়ে সকলডিরে লইয়া পলাইছি।

নবীনকুমার সেদিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ভুজঙ্গধর পুনরায় বললো, আপনে যেখানে খাড়াইয়া আছেন, ঠিক ঐখানেই একদিন আপনের অগ্রজ গঙ্গানারায়ণ সিংহ অকস্মাৎ আইসে খাড়াইয়াছিলেন। মুখ ভরতি দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। আমি তেনারে চেনবো ক্যামনে ? আমি ঠাওরাইছিলাম বুঝি এ আর এক জাল প্রতাপচন্দ্র। পরে নরসুন্দর ডাকাইয়া ক্ষৌরি করাইতেই তেনার আসল রূপ বাইর হইল···।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, নীলকর সাহেবরা এখন প্রজাদের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করে ?

ভুজঙ্গধর বললো, কমু, সব আপনেরে খুইলা কমু। আগে মুখ-হাত ধোন, বিশ্রাম করেন। পাঁচজনে কয় যে আমার ব্রাহ্মণীর রান্নার হাত নাকি সরেস, যদি আজ্ঞা হয় তবে আইজ আমার ঘরেই আপনের আহারাদির ব্যবস্থা করি।

নদীকূলে বজরা থেকে নেমে বেশ খানিকটা হেঁটে আসতে হয় এই কুঠীবাড়িতে। ভুজঙ্গধর পালকির ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল, কিন্তু নবীনকুমার তাকে নিরস্ত করে পদব্রজেই এসেছে। গ্রামের কোনো প্রজাই তাকে চেনে না। অনেকে তার মুণ্ডিত-মস্তক দিব্যকান্তির দিকে বিস্ময়ভরা নয়নে চেয়ে থেকেছে। কিন্তু জমিদার ভেবে সম্ভ্রমে সামনে লুটিয়ে পড়েনি।

ভূতপূর্ব কুঠীবাড়ির আঙ্গিনা থেকে ভুজঙ্গধর তাকে নিয়ে এলো নতুন গৃহে। তার মধ্যে একটি কক্ষের দ্বারের তালা খুলে ভুজঙ্গধর বললো, এই দ্যাখেন ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি রাখি নাই। এ-ঘরের খাট-আলমারি, তোশক বালিশ বিছানা সবই নতুন। জমিদারবাড়ির কেউ যদি কোনোদিন আসেন সেই লাইগ্যা সাজাইয়া রাখছি। কিন্তু গত ছয় বৎসরের মধ্যে কেউ আসে নাই!

নবীনকুমার কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, ভুজঙ্গধরের ঈষৎ বাঁকা সুরের কথায় সে জুতসই উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না। এই বিষয়টি নিয়ে সে আগে বিশেষ কোনো চিন্তাই করেনি। বাংলা ও উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের জমিদারি আছে, সে এই কথাই শুধু জানে, সেই জমিদারি পরিচালনা বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান নেই। প্রায় কৈশোর বয়স থেকেই সে নিজস্ব নানান পরিকল্পনায় মত্ত থেকেছে। অর্থের প্রয়োজন হলেই সে তলব করেছে খাজাঞ্চিকে। এস্টেটের তহবিল থেকে সে চাহিদা মতন পর্যাপ্ত অর্থ না পেলে এক একবার বিক্রয় করেছে কলকাতার এক একটি সম্পত্তি। বিষয়-তদারকির ভার গঙ্গানারায়ণের ওপরে। অবশ্য একা গঙ্গানারায়ণই বা কতদিকে সামলাতে পারবে! কিন্তু সেকথা নবীনকুমার এতদিন ভাবেনি।

দুজন ভৃত্য অবিলম্বে কক্ষটি ঝাড়-পোঁছ করে দেবার পর নবীনকুমার সে-কক্ষে প্রবেশ করলো। সেটি আয়তনে বেশ বড়, আসবাবগুলি রুচিসম্মত, কোনো জমিদারের সাময়িক বসবাসের অনুপযুক্ত নয়। গ্রীষ্মে টানা পাখার ব্যবস্থা আছে। পালঙ্ক ছাড়াও রয়েছে একটি আরামকেদারা। ভুজঙ্গধরের অনুরোধে নবীনকুমার সেটিতে বসলো।

ভুজঙ্গধর ভূমিতে আসন গ্রহণ করে আবার সেই বিদ্রূপ ও কৌতুক মিশ্রিত সুরে বললো, আমি আপনেগো জমিদারি গ্রাস কইরা লইছি বটে, কিন্তু আমারে একেবারে নিমকহারাম কইতে পারবেন না। তাইলে আর জমিদারের লাইগ্যা এমন ঘর সাজাইয়া রাখছি ক্যান? এই ঘরে কিন্তু আইজ পর্যন্ত কেউ শোয় নাই! আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বাবু গঙ্গানারায়ণ সিংহ মশায় অন্তত একবার আসবেন এমন আশা কইরাছিলাম। তিনি আইলে নিজেও খুব খুশী হইতেন। তিনি প্রজাগো পক্ষ লইয়া নীলকর সাহেবগো বিরুদ্ধে জবর লড়াই দিছিলেন, এবার আইলে তিনি স্বয়ং সেই লড়াইয়ের ফলাফল স্বচইক্ষে দ্যাখতে পারতেন।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে ফলাফল?

—যে ম্যাকগ্রেগর সাহেবের নাম শোনলে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাইতো, এমনকি আমাগো বুকের মইধ্যেও গুড়গুড়াইতো, সেই ম্যাকগ্রেগর সাহেব আত্মহত্যা করছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের লেডীর সাথে তার যেন কী সব হইছিল। যাউক সেকথা। সে বেটা পাইছে তার পাপের শাস্তি। তারপর একদিন নীলকুঠীতেও আগুন লাগে। সাহেবরা সব পিঠটান দিছে, এহানে আর নীলকুঠী নাই। আমাগো কুঠী যারা পুড়াইয়া দিছিল, তারা নিজেরাও নিস্তার পায় নাই। এখন আর এই এলাকার জমিতে নীলচাষ হয় না, আবার সোনার ধান ফলে।

—শুনে আমিও খুশী হলুম যে আমার দাদা যে কারণের জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তা সার্থক হয়েচে!

—কিন্তু তিনিও শহরে গিয়া অইন্যগো মতন ফুকা জমিদার হইলেন। আর গ্রামে আইলেন না।

—আমার দাদা অনেক রকম কাজ নিয়ে ব্যস্ত। না আসতে পারা তাঁর পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কলকাতা থেকে আমাদের এস্টেটের আর কোনো কেউ কখনো আসেনি বলতে চান? তা হতেই পারে না।

—আইছে, আইছে। গোড়ায় গোড়ায় প্রত্যেক বছরেই একবার দুইবার আমলা-গোমস্তারা আইছে। আমি তাগো হাঁকাইয়া দিছি। ঐ দিবাকরই তো আইছিল তিনবার। আমি তারে কইছি, যা বেটা, ফের এদিকে আইলে তুর মাথা ফাটাইয়া দিমু!

—আমাদের প্রতিনিধিকে কেন আপনি হাঁকিয়ে দিয়েচেন, তা জানতে পারি কি

—নিশ্চয় জানতে পারেন। দিছি আমার খুশী! শোনেন, শোনেন, অমন উত্তেজিত হন ক্যান? স্পষ্ট কথা শোনার অভ্যাস আপনাগো নাই! তাই মাথা গরম হইয়া যায়। শোনেন, আমি যদি হই শিয়াল, তাইলে আপনেগো ঐ আমলা-গোমস্তারা হইলো কুমোইর, অর্থাৎ আপনেরা যারে কন কুমীর। পরের ধনে পোদ্দারি করতে গ্যালেও আমারে তবু খাটতে হয়। আর অরা আইস্যা লুটের বখরা চায়। অগো হাতে আমি টাকা দিমু ক্যান! জমিদার আইলেও না হয় হিস্যা বুজাইয়া দিতাম, অগো হাতে টাকা দিলে সে টাকা আপনেগো এস্টেটের তবিলে জমা পড়বে কইতে চান? কোনোদিন না। অন্তত তিন ভাগের দুই ভাগ অরা নিজেরা হজম করবে! তাই আমি ঠিক করলাম অগো দিমু ক্যান, পুরাপুরি আমি নিজেই খাই। আমারও পরিপাক শক্তি কম নয়। দিব্যি হজম হইয়া যায়!

—অর্থাৎ যে-কোনো কৌশলে জমিদারকে ঠকানোই আপনার মূল উদ্দেশ্য।

—তাইলে ছোটবাবু, এই কথার জবাব দ্যান তো! নীলকরের অত্যাচারে আমি যখন বউ, ছাওয়াল,

মাইয়া লইয়া নিরাশ্রয় হইছিলাম, তখন জমিদার আমারে দেখছিলেন ? জমিদার একবারও কি চিন্তা করছিলেন যে আমি কোথায় থাকুম, কী খামু ? আমি মরলাম না বাঁচলাম, হ্যার কেউ খোঁজ নিছে ? এই যে কী সাঙ্ঘাতিক আকাইল গ্যাল, গেরামের প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে হাহাকার, তখন প্রজাগো একটুও কি সাহায্য করছে জমিদার ? সে সব যদি না করে, তবুও আমি জমিদারের গোমস্তা আইলেই তার পা ধোওয়নের জল দিয়া খাতির করুম আর তার হাতে টাকার থলি তুইল্যা দিমু ?

—অন্য সব জমিদাররা মহালে নিয়মিত আসে বলতে চান ?

—যারা আসে না, তাগো জমিদারি আইজ না হউক কাইল লাটে ওঠবেই। আপনের পিতামহ নিয়মিত আসতেন, আপনের পিতাঠাকুরও যৌবনে আসছেন বেশ কয়েকবার। তারপর আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতারে পাঠাইতেন। তারপর যেই আসা বন্ধ হইল, আপনেগো জমিদারির দশাও জল-শুকনা নদীর মতন হইল। আর বেশী দিন নাই—।

—আমরা যদি এ জমিদারির অংশ বিক্রি করে দিতে চাই ?

—তা পারবেন। কিন্তু দাম পাইবেন না ! এই ফোঁপরা জমিদারি কেনবে কেডা ?

—আপনিই ফোঁপরা করে রেকেচেন, বোঝা যাচ্ছে !

—বোঝা অত সহজ নয়, ছোটবাবু। আগে গেরামের অবস্থা ভালো কইরা নিজের চইক্ষে দ্যাখেন, তারপর বোঝবেন।

—জমিদারির অবস্থা যে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, সে কতা আপনি আমাদের চিঠি লিকে ত জানাননি কো !

—আমার বিপদের সময় অন্তত সাতখান্ পত্র পাঠাইছিলাম আপনেগো কাছে, একখানেরও কোনো জবাব পাই নাই। মানলাম, আপনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা তখন জেল খাটতে আছিলেন, কিন্তু আপনেও তখন নিতান্ত অবোধ বালকটি তো না, আপনের কুড়ি-একুইশ বৎসর বয়স, কিন্তু আপনে তখন একটুও নজর দ্যান নাই। আপনে তখন মহাভারত রচনার মতন মহৎ কর্মে ব্যস্ত আছিলেন। আপনে নমইস্য ব্যক্তি, আমি ব্রাহ্মণ না হইলে আপনের পায় হাত দিয়া প্রণাম করতাম। কিন্তু আপনে জমিদার হিসাবে অপদার্থ। আপনে বিধবা বিবাহের জন্য লক্ষ টাকা ব্যয় করছেন শুনছি, কিন্তু আপনে আমার গ্রামগুলার অনাহারী মানুষগো জইন্যে এক মুঠা অন্নও দ্যান নাই।

—আমি বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য অর্থ সাহায্য করে ভুল করিচি বলতে চান ?

—না। ভুল ক্যান কমু ? অতি মহান আদর্শের কাম করছেন। কিন্তু এদিগে যে আপনেগো অবিবেচনার ফলে গেরামের কত গেরস্থ বাড়ির বউ অকালে বিধবা হইল, সে খবর রাখেন নাই।

নবীনকুমারকে নিরুত্তর অবস্থায় গুম হয়ে যেতে দেখে ভুজঙ্গধর উঠে দাঁড়িয়ে কণ্ঠস্বর বদলে বললো, আরে রাম রাম, আমি শুধু বকবকই করতে আছি, আপনের খাওন-দাওনের কোনো ব্যবস্থা হইল না এহনও···আপনে বিশ্রাম করেন, ছোটবাবু, আমি একটু ভিতরে যাই—।

দিন তিনেক ভুজঙ্গধরের কুঠীবাড়িতে কাটিয়ে দিল নবীনকুমার। লোকটির সঙ্গে দু' বেলাই তার কথা কাটাকাটি হয়। ভুজঙ্গধর ইংরেজিতে নিরক্ষর হলেও বাংলা ও সংস্কৃতে যথেষ্ট পড়াশুনো করেছে, এই পরগনার বাইরের জগৎ সম্পর্কেও খবরাখবর রাখে। স্তাবক বা খোসামুদেদের বদলে স্পষ্টবাদীদের নবীনকুমার বরাবরই পছন্দ করে। কিন্তু এই লোকটির কথাবার্তা সে পুরোপুরি সহ্যও করতে পারছে না, আবার অগ্রাহ্য করতেও পারছে না।

একদিন প্রাতঃকালে নবীনকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হলো একটি গান শুনে। অতি সুমিষ্ট সুর, গানের কথাগুলিও সুমধুর। নবীনকুমার ঘুম-জড়িত চক্ষে উঠে এসে দেখলো বাইরের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে একজন বৈষ্ণব গায়ক গুপীযন্ত্র বাজিয়ে গান গাইছে, আর সামনে একটি জলচৌকিতে বসে মুগ্ধ ভাবে শুনছে ভুজঙ্গধর।

নবীনকুমারকে দেখে ভুজঙ্গধর শশব্যস্তে উঠে এসে জিজ্ঞেস করলো, আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হইল নাকি, ছোটবাবু ?

নবীনকুমার বললো, না। ভট্টচাজমশাই, গায়কটিকে এদিকে ডাকুন তো, গানটি ভালো করে শুনি।

গায়কটি নবীনকুমারের পরিচয় আগে থেকেই শুনে থাকবে নিশ্চয়। কাছে এসে ভূমিতে মস্তক

ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়ে বললো, দণ্ডবৎ, হুজুর। আপনার পিতারে আমি গান শুনাইছি। তিনি গান বড় ভালোবাসতেন।

নবীনকুমার বললো, ঐ গানটি আর একবার গান তো। কতাগুলো সব বুঝতে পারিনি।

গায়কটি আবার শুরু করলো :

হৃদিবৃন্দাবনে বাস, যদি কর কমলাপতি !
ওহে ভক্তপ্রিয় ! আমার ভক্তি হবে রাধা সতী ॥
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দেরপুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী ॥
আমায় ধর ধর জনার্দন ! পাপ-ভার গোবর্ধন
কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি ॥
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মন-ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদিগোষ্ঠে, পুরাও ইষ্ট, এই মিনতি...

নবীনকুমার সহর্ষে তারিফ করে বললো, বাঃ, বাঃ, ! বড় খাসা বাঁধুনী ! এমন সুন্দর রূপক-গান বহুদিন শুনিনি। এ গান কে রচেচে ? এ তো রামপ্রসাদেরও নয়, তিনি কালীভক্ত, আর এ গান বৈষ্ণবদের।

গায়কটি বললো, আজ্ঞে, এ গান দাসু রায় মশাইয়ের।

নবীনকুমার সবিস্ময়ে বললো, দাসু রায় ?

ভুজঙ্গধর বললো, সে কি ছোটবাবু, আপনি দাসু রায়ের নাম শোনেন নাই ? বর্ধমান-কাটোয়ার দাসু রায়ের গান বাংলায় কে না শোনছে ? আমাগো এই দিকে কাশীমবাজারে গাওনা করতে আইসাই তো তিনি দেহরক্ষা করলেন। সে বোধকরি সেই সেপাই যুদ্ধের বৎসরে।

নবীনকুমার বললো, দাসু রায়ের নাম কেন জানবো না ? কিন্তু সে লোকটা তো অতি কুচ্ছিৎকদর্য খেউড়ের পাঁচালী গাইত। কতাগুলো সব ইতরামিতে ভরা। তার মুখ দিয়ে এমন গান বেইরেচে, বিশ্বাস হয় না।

ভুজঙ্গধর বললো, ঐ তো মজা, পঙ্কেই পদ্ম ফোটে। ডাকাইত রত্নাকরই বাল্মীকি হয়। এ গানও দাসু রায়ের। এমনকি নবদ্বীপের পণ্ডিতরাও দাসু রায়কে সম্মান দিছে শ্যাস্ পইর্যন্ত। আইচ্ছা, এইডা শুইন্যা কন্ তো, কার ? নেতাই, সেইডা গাও তো, দোষ কারো নয়গো, মা—।

নিতাই আবার ধরল :

দোষ কারো নয় গো, মা
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড়রিপু হলো কোদণ্ড স্বরূপ
পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ
সে কূপ ব্যাপিল, কালরূপ জল কালমনোরমা।
আমার কী হবে তারিণি
ত্রিগুণ ধারিনী
বিগুণ করেছি স্বগুণে...

নিতাইয়ের গান মধ্যপথে থামিয়ে দিয়ে ভুজঙ্গধর জিজ্ঞেস করলো, এ গান শুনছেন কখনো ছোটবাবু ? কন তো, কার ?

নবীনকুমার বললো, এটি শ্যামাসঙ্গীত, অতি উচ্চাঙ্গের। এ গান নিশ্চয়ই রামপ্রসাদ কিংবা কমলাকান্তের।

ভুজঙ্গধর বললো, হইল না। এই গানও ঐ দাসু রায়েরই। একই মানুষ এই শ্যামাসঙ্গীত আর আগের বৈষ্ণব গান ল্যাখছে।

—আমরা তাকে অশ্লীল পাঁচালীকার হিসেবেই জানি। এই দুটি গানে তো একটাও নোংরা কতা নেই।

—তাহলেই বোঝেন আপনেরা কত কিছু ভুল জানেন শহরে বইস্যা। শোনেন তয় একটা গল্প কথা। এই গানে ঐ যে একখান্ কথা আছে না, 'ষড়রিপু হল কোদণ্ড স্বরূপ'—ঐ কোদণ্ড শব্দটার ঠিক অর্থ দাসু রায় মশায় জানতেন না। তিনি ভাবছিলেন কোদণ্ড মানে কোদাল, তাই সে কোদণ্ড দিয়া কূপ

খুঁড়াইছেন। কিন্তু আপনে সংস্কৃত অতি উত্তম জানেন, আপনের জানা আছে নিশ্চয়ই যে কোদণ্ড মানে হইল ধনুক! শুধু ধনুক, তীরও না, সুতরাং কোদণ্ড দিয়া কূপ কাটা যায় না, দাসু রায় মশাই ভুলই করছেন। এই জইন্য এক টোলের পণ্ডিতের ছাত্তররা দাসু রায় মশাইরে উপহাস করছিল। ল্যাখাপড়া তেমন শেখেন নাই দাসু রায়, একটা-আধটা কথার ভুল হইতে পারেই, কিন্তু এমন গান বান্ধতে পারে কয়জন? টোলের ছাত্রগো সেই মস্করার কথা শুইন্যা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় রাম শিরোমণি ছাত্রগুলোরে বইক্যা, কইছিলেন, দাসু রায় যখন ল্যাখছেন, তখন ওড়া হইলো আর্ষ প্রয়োগ! আজ থিকা কোদণ্ডের অর্থ ধনুকও হবে, কোদালও হবে।

নবীনকুমার বললো, বাঃ, বেড়ে গল্পটি তো। দাসু রায়ের যে এসব দিকে এত সম্মান হয়েছিল, তা আমি জানতুম না। তবে গল্প শোনার চেয়ে গান শোনা ভালো। আরও গান গাইতে বলুন ওকে।

আরও তিন চারখানি গান শুনে উত্তরোত্তর মুগ্ধ হয়ে নবীনকুমার এক সময় বললো, একে আমি কলকাতায় নিয়ে যাবো। এমন চমৎকার এর সুরেলা কণ্ঠস্বর, শহরে গেলে এর যোগ্য সমাদর হবে। এর গান শুনে দাসু রায় সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভুল ভাঙবে।

ভুজঙ্গধর বললো, ওকে আপনি কলকাতায় নিয়া যাইবেন?

—হ্যাঁ। আমি যখন ফিরবো, ও আমার সঙ্গেই যাবে।

—বাঃ! অতি উত্তম প্রস্তাব। নিতাইচাঁদের কপাল খুইল্যা গেল। কী রে, নেতাই, ছোটবাবুর সাথে কইলকাতায় যাবি?

নিতাইচাঁদ গান থামিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির বয়স অন্তত ষাট হবে। কেশবিরল মস্তক, মুখখানি খুব সরু। তার আকৃতিতে কেমন যেন একটা শালিক পাখির ভাব আছে। গায়ে একটি নামাবলী।

ভুজঙ্গধরের প্রশ্ন শুনে সঙ্গে সঙ্গে সে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো। তারপর বললো, তেমন সৌভাইগ্য কি আমার হবে?

ভুজঙ্গধর বললো, তুই ছোটবাবুর নেকনজরে পইড়্যা গেছস, তোর আর চিন্তা কি? আইজ যাইতে কইলে আইজই যাবি?

নিতাইচাঁদ বললো, নিশ্চয়। আমার তো পিছুটান নাই। কোনো দিন র‍্যালগাড়িতে উঠি নাই, বড় শখ একবার র‍্যালগাড়িতে যাই। আর কইলকাতায় গিয়া একদিন বরফ খামু। বরফের কথা অনেক শুনছি, কোনোকালে চইক্ষে দেখি নাই, জীবনে যদি এই সাধটা মিটে।

ভুজঙ্গধর হাসতে হাসতে বললো, দ্যাখলেন, দ্যাখলেন ছোটবাবু। ও এক কথায় রাজি। এক্কেবারে এক পায়ে খাড়া। এই নেতাই বোষ্টমরে আমি কতকাল ইস্তক দেখতে আছি, কোনোকালে এই দুই তিনখান গেরামের বায়রায় যায় নাই, আর আইজ আপনার কথা শুইন্যা অমনেই কইলকাতায় যাইতে চায়।

নবীনকুমার বললো, আমি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ওর গান সবাইকে শোনাবো। এমন সুকণ্ঠের অধিকারী হয়ে শুধু শুধু গাঁয়ে পড়ে থাকবে কেন?

ভুজঙ্গধর এবার বিচিত্র মুখভঙ্গি করে বললো, গেরাম থিকা সব ভালো ভালো জিনিস যদি আপনেরা শহরে লইয়া যান তাইলে আমরা কী লইয়া থাকুম? শহর থিকা কিছু ভলো জিনিস ছিটেফোটা গ্রামে পাঠাইতে পারেন না?

নবীনকুমার বললো, এটাই এ যুগের রীতি। ভট্চাজমশাই, সুযোগ পেলে সব গুণী জ্ঞানীরা শহরে যাবেই। কারণ শহরে টাকা আছে। টাকাই তো মধু!

—হ। টাকা যে কতবড় মধু, তা আমি জানি। কিন্তু ছোটবাবু, শহরে সেই টাকার যোগান দেয় কে? এইসব গেরামের টাকাই শহরে যায় না? গ্রামই হইল গিয়া দেহ, এই দেহ'র সব রক্ত যায় শহর নামের মস্তিষ্কে। কি, ভুল কইতাছি? তবে, আপনেরাও এই কথাডা ভোলবেন না যে মানুষের হৃৎপিণ্ডটা থাকে দেহ'র মইধ্যেই, মস্তিষ্কে না। গ্রামই দ্যাশের প্রাণ।

নবীনকুমার নিজ গাত্র থেকে শালটি খুলে নিতাইচাঁদকে শিরোপা দিল। তারপর তার গুপীযন্ত্রটি নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো মনোযোগ দিয়ে।

সেইদিন থেকেই নবীনকুমার নিতাইচাঁদের কাছ থেকে সঙ্গীতশিক্ষা নিতে শুরু করলো। তার নিজের কণ্ঠেও বেশ সুর আছে, গান তুলতে পারে সহজে। এই শিল্পকলাটি সম্পর্কে তার মনের মধ্যে একটা তৃষ্ণা রয়ে গেছে অনেক দিন থেকেই। হরিশ মুখুজ্যের সঙ্গে সে মুলুকচাঁদের আখড়ায় যেত প্রধানত নৃত্যগীতের আকর্ষণেই। মনে মনে সে সঙ্কল্প নিয়ে ফেললো, এবার ফিরে গিয়ে সে বাড়িতে নিয়মিত গান বাজনার আসর বসাবে। গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে আরও ভালো ভালো গায়কের সন্ধান পেলে সে তাদেরও নিয়ে যাবে শহরে।

দিন দুয়েক পরে সে ভুজঙ্গধরের পেড়াপিড়িতে একপ্রকার বাধ্য হয়েই গ্রাম পরিদর্শনে বেরুলো। এবার অবশ্য পদব্রজে নয়, পালকিতে। সঙ্গে দুলালচন্দ্র এবং অন্য কয়েকজন সহচরও রইলো। ঘোরা হলো প্রায় চার-পাঁচটি গ্রাম। মধ্যে মধ্যে পালকি নামিয়ে নবীনকুমারকে বিশ্রাম দেওয়া হয়, সেই আসরে গ্রামের কিছু মানুষজনের সঙ্গেও দেখা হয়। অধিকাংশই রুগ্ন, শীর্ণ চেহারা। নবীনকুমার বিস্ময় বোধ করে। এখন নীলকর সাহেবদের অত্যাচার আর নেই, তবু গ্রামের মানুষদের এ দশা কেন?

এক স্থানে সম্ভবত আগে থেকেই কোনো ব্যবস্থা করা ছিল। নবীনকুমার একটি বড় আটচালাসমেত কাছারি বাড়িতে এসে পৌঁছোলো মধ্যাহ্নে।

ভুজঙ্গধর জানালো যে এখানেই নবীনকুমার আহার সেরে কয়েক ঘণ্টা জিরিয়ে নেবে। তবে তার আগে স্থানীয় প্রজাদের একবার সাক্ষাৎ দিলে ভালো হয়।

নবীনকুমার কাছারি থেকে আটচালার প্রান্তে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেল, সেখানে জমায়েত হয়েছে প্রায় হাজার খানেক মানুষ। ভুজঙ্গধর তাদের উদ্দেশে সাধু বাংলায় বললো, শুন, প্রজাগণ! আমাদের পরম পূজ্য জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত নবীনকুমার সিংহ মহাশয় তোমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত। কার্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় তিনি এতদিন আমাদিগের এ অঞ্চলে আসিতে পারেন নাই। তোমরা ইঁহার অগ্রজ বাবু গঙ্গানারায়ণ সিংহ মহাশয়ের পরিচয় এককালে জানিয়াছ। তিনি তোমাদের মঙ্গলের জন্য নিজের রক্তপাত পর্যন্ত করিয়াছিলেন, কারাগারের অন্ধকারে দুঃসহ ক্লেশের সহিত দিন কাটাইয়াছেন ইনি তাঁহারই সুযোগ্য ভ্রাতা, আমাদের পূজনীয়, মহানুভব ঈশ্বর রামকমল সিংহের পুত্র। এতকাল পরে তিনি এতদঞ্চলে আসিয়া, তোমাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া এবং পর পর দুই বৎসরের আকালের কথা বিবেচনা করিয়া, তিনি দয়াপূর্বক তোমাদের এই দুই বৎসরের খাজনা মকুব করিয়া দিলেন।

প্রজারা প্রথমে একেবারে নীরব থেকে মূল সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করে চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতে একেবারে ফেটে পড়লো।

ভুজঙ্গধর নবীনকুমারের দিকে চেয়ে বললো, হুজুর, এবার আপনি ঘোষণাটি একবার নিজের মুখে উচ্চারণ করুন

নবীনকুমারের কাছে ঘোষণাটি যেমনই অপ্রত্যাশিত তেমনই অদ্ভুত। সে কড়া গলায় বললো, এই প্রহসনের মানে কী? এখেনকার আদায়-তহশিল আপনি করেন, আমি নামেই শুধু জমিদার। আপনি নিজে মুখে স্বীকার করেচেন যে এখেন থেকে একটা আধলাও আমরা পাই না। তবে আর আমার এ খাজনা মকুব করা না-করায় কী আসে যায়?

ভুজঙ্গধর বললো, ছোটবাবু, আমি আপনেগো টাকা কড়ি দেই বা না দেই সেটা ভেন্ন কথা। সেটা আমার-আপনেগো ব্যাপার। আমি জানি, এই লোকগুলোর এখন খাজনা দেওয়ার ক্ষ্যামতা নাই। আমি হয়তো খাজনার জইন্যে অগো উপর চাপ দিলাম না, কিন্তু খাজনা না দিয়া জমিদারকে ঠকাইলে অগো মনের মইধ্যে একটা পাপের ভাব থাকে। অরা ভাবে, খাজনা না দিলে জমি পয়মন্ত হয় না। সুতরাং, আপনে জমিদার হইয়া যদি নিজের মুখে খাজনা মকুব কইরা দ্যান অরা স্বস্তি পায়।

দু' হাত তুলে প্রজাদের উদ্দেশ করে ভুজঙ্গধর আবার বললো, এই চুপ! চুপ! ছোটবাবু কথা কবেন, তোরা মন দিয়া শোন।

সকলে থেমে যেতে নবীনকুমার বললো, তোমাদের খাজনা মকুব।

ভুজঙ্গধর বললো, দুই বৎসরের জন্য

নবীনকুমার বললো, না। চিরকালের জন্য। আজ থেকে আমার এলাকার সব জমি নিষ্কর হয়ে গেল!

নবীনকুমার এইটুকু বলে থেমে যেতেই এমন কোলাহল শুরু হয়ে গেল যে কান পাতা দুষ্কর। কারুর কোনো কথা বোঝা যায় না। প্রজারা অনেকে ভ্যাবাচাকা হয়ে গেছে। জমিদার আছে, অথচ জমির খাজনা লাগবে না, এ আবার কেমন কথা! কয়েকজন লোক অতশত না বুঝেও ছুটে এলো

নবীনকুমারের পায়ে পড়ে প্রণাম জানাবার জন্য। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে নিরাপত্তার জন্য নবীনকুমারের পক্ষে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। ভুজঙ্গধর নবীনকুমারকে টেনে নিয়ে এলো কাছারি ঘরের মধ্যে।

এবার নবীনকুমারের মুখে মৃদু হাস্যের রেখা। ভুজঙ্গধরের চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে সে কৌতুকের সুরে বললো, কেমন জব্দ করলুম আপনাকে?

ভুজঙ্গধর বিমূঢ় ভাবে বললো, এ আপনে কী কইলেন ছোটবাবু? চিরকালের জইন্য খাজনা মকুব? তাও কখনো হয় না কি? এ তো পোলাপানগো মতন কথা!

নবীনকুমার বললো, আপনি ভেবেছিলেন, আপনি নিজে চিরকাল আমাদের জমিদারির রোজগার হজম করবেন! সে পথ মেরে দিলুম কি না?

ভুজঙ্গধর বললো, কিন্তু সরকারের ঘরে তো আপনাগো বৎসর বৎসর ট্যাকসো জমা দিতে হইবে ঠিকই—যদি কোনো আয় না থাকে, তাইলে···

—সে দেখা যাবেখন!

নবীনকুমারের ঘোষণায় বিরাট এক বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। ইব্রাহিমপুর পরগনায় অনেকগুলি গ্রাম, সেইসব গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে কার কার খাজনা মকুব হলো, কার হলো না, তা বোঝাই গেল না। যে-সব প্রজা সেদিন উপস্থিত ছিল জমিদারের সামনে, শুধু তারাই কি এই সুবিধে পেল? এর মধ্যে আবার কিছু এলাকা ছিল নীলকরদের কাছে ইজারা দেওয়া, সাহেবরা চলে যাবার পর চাষীরা আপনমনে চাষ করে চলেছে বটে কিন্তু জমি ইজারামুক্ত হয়েছে কি না তাই বা কে জানে!

নবীনকুমারের পক্ষে আর ইব্রাহিমপুরের কুঠীবাড়িতে টেকাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। দলে দলে লোক ধেয়ে আসছে, তারা প্রত্যেকে নিজের জমির খাজনা বিষয়ে জমিদারের মুখ থেকে আশ্বাসবাণী শুনতে চায়। সে এক অসম্ভব ব্যাপার, নবীনকুমারের স্নানাহার করারও সময় নেই, কারণ এই সব অবোধ মানুষগুলি এক কথা বারবার বুঝিয়ে বললেও বোঝে না। গ্রামে-গঞ্জে ঢাক পিটিয়ে জমিদারের বার্তা জানাবার জন্য ঘোষক পাঠানো হলো। কুঠীবাড়ি ছেড়ে নবীনকুমার আশ্রয় নিল বজরায়। সেখানেও তার সঙ্গী রইলো ভুজঙ্গধর।

বজরা ভেসে চললো কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য ছাড়াই। দিনে মাত্র একবার কোনো জনবিরল স্থানে থামে। ভুজঙ্গধরের কাছে প্রায় সর্বক্ষণ সে-গ্রামের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি বিষয় শোনে। এ যাত্রার প্রারম্ভে সে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল প্রকৃতি প্রেমে, এখন তার আগ্রহ জীবন্ত মানুষ সম্পর্কে। ইতিমধ্যেই নবীনকুমার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে ইব্রাহিমপুর থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত একটানা পাকা সড়ক সে নিজব্যয়ে নির্মাণ করে দেবে। পথের যোগাযোগের অভাবে গ্রাম্য পণ্য মার খায়।

একদিন মধ্যাহ্নে নদীর দক্ষিণ তীরের একটি গ্রামে বহু লোকের বিপন্ন হাহাকার শোনা গেল। মানুষজন ঘর বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। নবীনকুমার সেদিকে বজরা ভেড়াতে বলতেই ভুজঙ্গধর নিষেধ করলো। ঐ পারে সুখচরের জমিদারের এলাকা

ভুজঙ্গধর বললো, আপনের পক্ষে ওখানে পদার্পণ করা মোটেই উচিত হয় না। ঐ দ্যাখেন আর এক লাহামের জমিদার। ওনার নায়েব পাঁচখানা হাতি লইয়া গেরামে আসে। যে-সব দুষ্ট প্রজা খাজনা দেয় না, তাগো বাড়ি হাতির পায়ের গুতায় গুঁড়াইয়া দ্যায়। সেইজন্যই সুখচরের জমিদারের বাড়িতে সব সময় টাকা ঝমর ঝমর করে। সেই টাকায় বাবুরা কইলকাতায় বাঈজী নাচায় আর পায়রা উড়ায়। মন্দিরও বানাইছে দুই তিন খান!

একটু হেসে ভুজঙ্গধর জিজ্ঞেস করে, ছোটবাবু, আপনে কইলকাতায় মন্দির বানান নাই?

নবীনকুমার সে প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ না করে অন্যমনস্কভাবে বলে, সরকারের চোকে আমরা এখনো ইব্রাহিমপুরের জমিদার। আপনি আমাদের নায়েব। এখন থেকে আপনি নিয়মিত মাস পাইনে পাবেন। আপনার ওপর অনেক কাজের ভার দোবো। প্রতি দু'খানা গাঁ অন্তর ইস্কুল বানাতে হবে, আকালের বচরে বিনা সুদে চাষীদের বীজ ধান আর খোরাকি ধান দিতে হবে। আর···

ভুজঙ্গধর বললো, কইলকাতায় ফিরা গ্যালেই সব ভুইল্যা যাবেন জানি। কিংবা, বিধু মুখুইজ্যা এখনো বাঁইচ্যা আছেন না? তিনিই সব ঘুরাইয়া দিবেন।

নবীনকুমারের বজরার হাল ভেঙে পড়ায় মেরামতির জন্য এক স্থানে থামতে হলো। টানা প্রায় পাঁচ দিন বজরায় বসে থেকে হাত পায়েরও খিল ধরে গেছে। নবীনকুমার নেমে একটু ঘোরাঘুরি করতে চায়। স্থানটি ইব্রাহিমপুর সদর থেকে অনেক দূরে, সম্ভবত নবীনকুমারের আগমনবার্তা এতদূর এসে

পৌঁছোয় নি।

ভিনকুড়ি আর ধানকুড়ি নামে পাশাপাশি দুটি গ্রাম। গত কাল এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে গাছপালা আরও বেশী সবুজ। বাতাস খুব সুখপ্রদ। দুলাল ও ভুজঙ্গধর সমভিব্যাহারে নবীনকুমার হাঁটিতে হাঁটিতে চলে এলো অনেকখানি। তাদের পশ্চাতে ছোট একটি কৌতূহলী দলের ভিড় জমেছে। সেদিকে মন না দিয়ে নবীনকুমার সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলেছে।

একটি তাল গাছের নিচে বহুকাল আগে অগ্নিদগ্ধ এক কুটিরকে ঘিরে আগাছার এক জঙ্গল জন্মে গেছে। সেখান দিয়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ মনুষ্যকণ্ঠের ঘড় ঘড় শব্দ শুনে নবীনকুমার থমকে দাঁড়ালো।

সেই জঙ্গল ভেদ করে বেরিয়ে এলো একজন। অনেকটা মনুষ্যাকৃতি হলেও সে মানুষ না বন্যপ্রাণী তা সহজে ধরা যায় না। তার পরণে কোনো সুতির বস্ত্র নেই, কয়েকটি গাছের ডাল তার কোমরের ঘুনসীর সঙ্গে বাঁধা। বুকে মুখে মাটি মাখা। অন্তত পঁচিশ-তিরিশ বছর সে কোনো ক্ষৌরকারের সংস্পর্শে যায় নি। লোকটি এগিয়ে এসে সেই দলটির দিকে স্থির নেত্রে তাকিয়ে রইলো।

গ্রামবাসীদের কয়েকজন বলে উঠলো, সাবধান বাবুরা, ওর কাছে যাবেন না।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কে এই লোকটি ?

গ্রামবাসীরা জানালো যে, এই লোকটির নাম ত্রিলোচন দাস। এক সময় কয়েক বৎসরের খাজনা বাকি পড়ায় জমিদারের লোক-লস্কর এসে ওর বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। সব কিছু এখনো সেই অবস্থাতেই আছে।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, এখানে কাদের জমিদারি ?

ভুজঙ্গধর তাড়াতাড়ি বলে উঠলো যে, এটাও ইব্রাহিমপুরের মধ্যেই বটে, কিন্তু এই ঘটনা তার আমলে নয়। এ ঘটনার কথা সে জানে। ভুজঙ্গধর নায়েবী করছে গত বিশ বৎসর। তার আগেকার নায়েব উদ্ধবনারায়ণের নাম শুনলে এখনো অনেকে ভয়ে কাঁপে। প্রজাদের ঘর বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করা ছিল তাঁর শখের ক্রীড়া।

নবীনকুমার বললো, এতকাল ধরে এই বাড়ি সেই অবস্থায় আছে! আপনার আমলেও আপনি কিছু সুবন্দোবস্ত করেন নি ?

ভুজঙ্গধর জানালো যে, চেষ্টা করলেও করবার উপায় নেই। ও কারুকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

গ্রামবাসীরা আরও তথ্য জানালো যে, নায়েবের অত্যাচারে লোকটি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যায়। অনেক দিন ওর কোনো সংবাদ ছিল না, ওর ভিটে এই পোড়ো অবস্থাতেই ছিল। তারপর বেশ কিছু বছর পর ও একা ফিরে আসে ঘোর উন্মাদ হয়ে। নিজের ভিটেটুকু শুধু চেনে। আর কোনো মানুষ চেনে না।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ও এই ভিটের মাটি কামড়ে কামড়ে খায়। আর কোনো খাদ্য ওকে কেউ গ্রহণ করতে দেখেনি কখনো। এমন কি অন্য কেউ কিছু খাদ্য ছুঁড়ে দিলেও ও তা স্পর্শ করে না। শুধু মাটি খেয়েই ও বেঁচে আছে।

এই সময় ত্রিলোচন দাস ধীর স্বরে বললো, বাবু, একটু জল দেবেন, চিঁড়ে ভিজায়ে খাবো!

নবীনকুমার বললো, ঐ তো লোকটি জল চাইছে, চিঁড়ে চাইছে!

গ্রামবাসীরা চেঁচিয়ে বলে উঠলো, না, না, শুনবেন না, ওটা ওর কথার কথা। ও খুব সাঙ্ঘাতিক। কাছে যাবেন না। কিন্তু নবীনকুমার সে সব অগ্রাহ্য করে দু' এক পা এগিয়ে গিয়ে বললো, হ্যাঁ, তোমাকে চিঁড়ে দোবো, অন্য খাদ্য দোবো, তোমার চিকিৎসা করাবো, তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে ?

ত্রিলোচন দাস সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ব্যাঘ্রের মতন এক লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো নবীনকুমারের ওপরে। কেউ কিছু বোঝবার আগেই দেখা গেল, নবীনকুমার ভূতলশায়ী, আর ত্রিলোচন তার বক্ষস্থল কামড়ে ধরেছে।

সকলে মিলে হুড়োহুড়ি করে যখন ত্রিলোচন দাসকে টেনে তোলা হলো, তখন দেখা গেল তার মুখে নবীনকুমারের পোশাকের একটি টুকরো সমেত এক খাবলা মাংস।

তার প্রভুর এই দশা করেছে দেখে দুলাল ক্রোধে অধীর হয়ে তৎক্ষণাৎ লোকটির চুলের মুঠি ধরে ফেলে দিল মাটিতে এবং তারপর তার হাত ও পা সমানে চালাতে লাগলো। অন্যরাও যোগ দিল তার সঙ্গে। অল্পক্ষণের মধ্যেই উন্মাদ ত্রিলোচন দাস দুলালের প্রহারে খুন হয়ে গেল।

ভুজঙ্গধরের ক্রোড়ে শায়িত নবীনকুমার তখন সংজ্ঞাশূন্য। তার ক্ষতস্থান দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়ে আসছে।
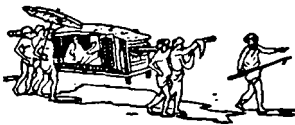
কলকাতার গঙ্গার তীর লোকে লোকারণ্য, তাদের সংযত ও সুশৃঙ্খল রাখার ভার নিয়েছে শ্বেতাঙ্গ ফৌজী বাহিনী। স্বাস্থ্যবান অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় গোরা সৈনিকদের অঙ্গে নতুন উর্দি, তাদের কৃতিত্বের মেডেলগুলি সদ্য মার্জিত হয়ে ঝকঝক করছে। প্রিন্সেপ ঘাটে এসে থেমেছে বিশাল এক রাজকীয় রণতরী। নতুন ভাইসরয় আজ ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীতে পদার্পণ করবেন।

তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। তাদের সকলের মুখমণ্ডলেই কৌতূহলের চিহ্ন পরিস্ফুট। নতুন ভাইসরয় হিসেবে যিনি আসছেন তিনি রাজনীতিজগতে প্রায় অপরিচিত। সমগ্র ব্রিটিশ রাজত্বের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানজনক পদটি কে পাবেন, তা নিয়ে অনেক দিন ধরে জল্পনা-কল্পনা চলে, প্রার্থীও থাকেন ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ সমাজের বেশ কয়েকজন। কিন্তু এবার এক বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে ভাইসরয় হয়ে আসছেন একজন আইরিশম্যান। এই লর্ড নাস-এর নাম কলকাতার শ্বেতাঙ্গরা প্রায় কেউই শোনেনি।

প্রধানমন্ত্রী ডিজরেইলি যখন লর্ড নাস-কে এই সর্বোচ্চ চাকুরিটিতে নিয়োগ করলেন, তখন প্রচুর সমালোচনার ঝড় উঠেছিল, কিন্তু ডিজরেইলি অটল। লর্ড নাস জাহাজ যোগে যাত্রা করলেন ভারতের উদ্দেশে। মধ্যপথে পৌঁছতেই এক নাটকীয় ঘটনা ঘটলো। পার্লামেণ্টে পতন হলো ডিজরেইলির দলের। প্রধানমন্ত্রী হলেন গ্লাডস্টোন। ভারতের ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেলের পদে প্রধানমন্ত্রীর নিজের পছন্দের লোক না রাখলে চলে না। ডিজরেইলি-গ্লাডস্টোনের রেষারেষি বহু বিদিত। ভারতের ভাইসরয় হিসেবে গ্লাডস্টোন নিজের লোক বসাবেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মধ্যপথ থেকে মনোনীত প্রার্থীকে ফিরিয়ে আনা সাম্রাজ্য শাসনের পক্ষে সম্মানহানিকর, মহারানী ভিক্টোরিয়ারও সেরকম অভিপ্রায় নয়, তাই গ্লাডস্টোন আপত্তি জানালেন না।

এই লর্ড নাস কিছুদিন আগে মেয়ো-র আর্লডম পাওয়ায় এখন লর্ড মেয়ো নাম নিয়েছেন।

তোপধ্বনি শুরু হবার পর লর্ড মেয়ো জাহাজ থেকে নেমে স্থলে পা দিলেন। তাঁকে প্রথম দর্শনেই সমবেত দর্শকদের মধ্য থেকে প্রশস্তিসূচক শব্দ উত্থিত হলো। এমন সুপুরুষ কদাচিৎ দেখা যায়। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের এমন সমন্বয়ই বা ক'জনের হয়। লর্ড মেয়ো দীর্ঘকায়, বৃষস্কন্ধ, মহাব্যূঢ়, অথচ তাঁর মুখখানি লালিত্যময়। তাঁর শরীরে তেজ, দীপ্তি এবং শ্রী একসঙ্গে মিশে আছে।

প্রিন্সেপ-এর ঘাট থেকে লাটভবন পর্যন্ত সামান্য পথটুকু তিনি পদব্রজেই গেলেন। প্রজাদের অভিভূত করবার জন্য বড়লাটের প্রথম আগমন উপলক্ষে প্রচুর জাঁকজমকের ব্যবস্থা থাকে। পথের দু'পাশে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হাইলাণ্ডার পোশাক পরিহিত বাদকরা শুরু করে ঐকতান, অস্ত্র ও ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী হয়। এই স্বল্প পথ পার হতেই লর্ড মেয়োর অনেক সময় লাগলো।

প্রথা অনুযায়ী, লাটভবনের সামনের সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে আছেন বিদায়ী ভাইসরয় জন লরেন্স। তার অঙ্গে আজ বড়লাটের সম্পূর্ণ পোশাক। পদক, তারকায় বক্ষস্থল প্রায় আবৃত। মধ্যবয়স্ক জন লরেন্সের মুখখানি ক্লান্ত, দেখলেই বোঝা যায় স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়েছে। তাঁকে বিদায় নিতে হচ্ছে সগৌরবে নয়, ভগ্নমনোরথে। ভারতের বহু যুদ্ধের বীর সেনানী জন লরেন্স ভাইসরয় হিসেবে তেমন সার্থক হতে পারেন নি। কলকাতা শহরটিকে তিনি পছন্দ করতে পারেন নি, কলকাতার কর্মচারীরাও পছন্দ করেনি তাঁকে। রণক্ষেত্রে হুকুমজারি করতে যিনি অভ্যস্ত, অসংখ্য ফাইলের লাল ফিতের বন্ধনে বাঁধা পড়ে তিনি ছটফট করেছেন। তরবারি ছেড়ে শাসকের কলম ধরলে যেকোনো নির্দেশ জারি করবার আগে তাঁকে অধীনস্থ কর্মচারীদের সূক্ষ্ম কূট যুক্তিজালের সম্মুখীন হতে হয়। তা ছাড়া তিনি সর্বক্ষণ লাট সাহেবের মতন কেতাদুরস্ত থাকতে পারেন না। কলকাতার গরম অসহ্য হলে যখন-তখন

কোট, ওয়েস্ট কোট, কলার, টাই খুলে ফেলেন, এমন কি জুতোর বদলে চটি পরে বেড়ান, মাঝে মাঝে দেশীয় লোকদের সঙ্গে হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বলেন। কোনো বড়লাটের পক্ষে এরকম ব্যবহার তো অকল্পনীয়। তিনিই প্রথম প্রতি গ্রীষ্মে কলকাতা থেকে রাজধানী সিমলা পাহাড়ে সরিয়ে নিয়ে গেলেন, তাতেও সিভিলিয়ানদের খুশী করতে পারেন নি। কখনো কখনো তাঁর কথাবার্তায় নেটিভদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন বলে আড়ালে তিনি তাঁর স্বজাতীয়দের উপহাসের পাত্র।

আজ সম্পূর্ণ ধড়াচূড়া পরে, আড়ষ্ট, ক্লান্তভাবে তিনি দাঁড়িয়ে বড়লাট হিসেবে শেষ কর্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত। লর্ড মেয়ো পরিধান করে আছেন সরল সকালের পোশাক। সেই সুদর্শন পুরুষটি প্রফুল্ল বদনে উঠে এলেন সিঁড়ি দিয়ে। তোপধ্বনি তখনও চলেছে।

নতুন ভাইসরয়ের আগমনের কারণে আজ গঙ্গায় সবরকম নৌকা ও জাহাজ চলাচল বন্ধ। নদীর মধ্যখানে সারি সারি যুদ্ধজাহাজ ঘাটগুলি ঘিরে রেখেছে। নবীনকুমারের বজরা এর মধ্যে এসে বড়ই অসুবিধেয় পড়ে গেল। উজানের টানে বজরাটি চলে এসেছে চাঁদপাল ঘাটের দিকে, কিন্তু এখন কূলে বজরা ভেড়াবার কোনো উপায় নেই। নবীনকুমার গুরুতর রকমের অসুস্থ। যত শীঘ্র সম্ভব তার সুচিকিৎসার প্রয়োজন। বজরার ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে দুলালচন্দ্র একেবারে দাপাদাপি করতে লাগলো। কিন্তু গোরা সিপাহীদের সে কী উপায়েই বা বোঝাবে! এখন ভাঁটা ঠেলে বজরা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াও তো সম্ভব নয়।

বজরার মধ্যে ছোট কামরায় নবীনকুমার নিদ্রিত। শিয়রের কাছে বসে আছে ভুজঙ্গধর। নবীনকুমারের বক্ষের ক্ষতস্থানে মস্ত বড় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা! ভুজঙ্গধর সেই সাঙ্ঘাতিক ঘটনার পর অনতিবিলম্বেই ধানকুড়ি গ্রামের এক প্রবীণ কবিরাজকে দিয়ে নবীনকুমারের ক্ষতস্থানে ওষুধ প্রয়োগ করে বেঁধে দিয়েছে। এবং আর কোনো ঝুঁকি না নিয়ে অতিরিক্ত দাঁড়িমাঝি নিয়ে বজরা চালিয়েছে ঝড়ের বেগে কলকাতার দিকে।

মাঝে মাঝেই নবীনকুমারের ব্যাণ্ডেজের সাদা কাপড় ভিজে যাচ্ছে লাল রক্তে। ঘুমের মধ্যে এক আধবার পার্শ্ব পরিবর্তন করলেই নতুনভাবে রক্তক্ষরণ হয়। এর মধ্যে দু'বার মাত্র জ্ঞান ফিরেছিল নবীনকুমারের।

মানুষের কোলাহল, ব্যাণ্ড বাদ্য এবং তোপের প্রচণ্ড গর্জনেও নবীনকুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হচ্ছে না দেখে ভুজঙ্গধর শঙ্কিত হয়ে উঠলো। নিজের কাছে সে একটি ছোট কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো দর্পণ রেখে দিয়েছে। এখন সেই দর্পণটি অতি সাবধানে নিয়ে এলো নবীনকুমারের নাসিকার কাছে। একটু পরে সেই আয়নার কাচ একটু ঝাপসা হতে দেখে ভুজঙ্গধর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

নদীতীর প্রহরীমুক্ত হবার পর নবীনকুমারকে নামানো হলো বজরা থেকে। তারপর একটি পালকিতে শুইয়ে দেবার পর ভুজঙ্গধর পালকিবাহকদের নির্দেশ দিল যে, তাদের প্রত্যেককে একসঙ্গে পা মেপে মেপে চলতে হবে ধীরে ধীরে। কোনোক্রমেই যেন পালকি না দোলে। দুলাল আর সে রইলো পালকির দু-পাশে। জোড়াসাঁকোর সিংহসদনে পৌঁছোতে পৌঁছোতে তাদের দ্বিপ্রহর পার হয়ে গেল।

গঙ্গানারায়ণ তখন গৃহে নেই, লোক ছুটলো তাকে সংবাদ দিতে। দুলাল তার মধ্যেই প্রায় সবলে ধরে নিয়ে এলো ডাক্তার সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তীকে। তিনি কিছুদিন যাবৎ এ বাড়ির গৃহ-চিকিৎসক। তিনি সদ্য তখন মধ্যাহ্নভোজে বসেছিলেন, দুলালের তাড়নায় আহার অসমাপ্ত রেখে তাঁকে ছুটে আসতে হলো।

ব্যাণ্ডেজ খুলে ক্ষত স্থান দেখে ডাক্তার সাহেব বলে উঠলেন, মাই গাড্! কোন্ ক্যানিবালের পাল্লায় পড়েছিলেন ইনি? মানুষ কখনো মানুষের মাংস এতখানি কামড়ে নিতে পারে?

তারপরই তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, উণ্ডের ওপর এত সব ধুলো বালি কেন? হট্ ওয়াটারে কটন ভিজিয়ে পরিষ্কার করে দেবার বুদ্ধিও কারুর হেড-এ আসে নি?

ভুজঙ্গধর কাঁচুমাচু ভাবে বললো, আজ্ঞে, তা দেওয়া হইয়াছে। এক কবিরাজ মশায় ঔষধ লাগাইয়া দিছেন।

সূর্যকুমার বললেন, ওষুধ না রাবিশ। দোজ কোয়াক্স্! একেই বলে অ্যাডিং ইনসাল্ট টু দি

ইনজুরি ! এর ফলে কত কমপ্লিকেশন দেখা দিতে পারে—

কবিরাজদের একেবারেই পছন্দ করেন না সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী। তিনি দ্রুত হাতে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে লাগলেন।

ডাক্তার আসবার আগে পর্যন্ত সরোজিনী এবং কুসুমকুমারী এই কক্ষে ছিল। যে কোনো বিপদের সম্মুখীন হলেই সরোজিনী ভীতি-বিহ্বল হওয়া ও কান্না ছাড়া আর কিছু জানে না। এখন তারা অপেক্ষা করছে পার্শ্ববর্তী কক্ষে। ডাক্তার সাহেবের মুখে ইংরেজী তর্জন গর্জন শুনে সরোজিনী আরও ভয় পেয়ে কান্না শুরু করে দিল আবার। সরোজিনী বাইরের কোনো লোকের সামনেই যায় না, তাদের সঙ্গে কথাও বলে না। কুসুমকুমারী এতটা পরদা মানে না। সে এগিয়ে এসে দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে বললো, দুলাল, ডাক্তারবাবুকে ভালো করে জিজ্ঞেস কর, কতখানি ক্ষতি হয়েচে ! কোনো সাহেব ডাক্তারকে ডাকতে হবে কিনা !

ডাক্তার বললেন, ভয়ের তো কিছু নেই। আউটওয়ার্ড ইনজুরি, ক-দিনেই শুকিয়ে যাবে। ইউ ক্যান কল্ ইওরোপিয়ান ডক্টরস, কিন্তু আমি তার কোনো প্রয়োজন দেখি না।

কুসুমকুমারী আবার বললো, দুলাল, তুই ডাক্তারবাবুকে বলিচিস, যে কামড়েচে সে একটা বদ্ধ পাগল ?

ডাক্তার উত্তর দিলেন, পাগল না হলে কোনো সেইন লোক কি কোনো মানুষকে এমনভাবে বাইট করে। ওহে, তোমার গিন্নীমাদের জানিয়ে দাও, চিন্তার কোন কারণ নেই।

ডাক্তার সাহেব ক্ষত পরিষ্কার করে, মলমের প্রলেপ লাগিয়ে পটু হাতে নতুন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। তারপর অন্য ঔষধপত্রের নির্দেশ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ফ্রেস ব্লিডিং যদি হয়, দেন অ্যা'প দেয়ার আমায় কল দেবে। নচেৎ আমি কাল সকালে নিজেই আবার আসবো।

ডাক্তার চলে যাবার পর দুলাল বাইরের অন্যান্য লোকদের ঘর ছেড়ে দিতে বললো। সঙ্গে সঙ্গে সরোজিনী, কুসুমকুমারী ও অন্য কয়েকজন আত্মীয় রমণী এসে ঢুকলো সেখানে এবং এক-একজন পালা করে বলতে লাগলো অন্য কবে কোথায় মানুষে মানুষকে কামড়ানোর ঘটনা শুনেছে বা দেখেছে। দেখা গেল, এই ঘটনা খুব দুর্লভ নয়। অনেকেই এ রকম বিষয়ে জানে।

এই সময় জুতো মসমসিয়ে ডাক্তার সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী ফিরে এসে দাঁড়ালেন দ্বারের কাছে। মহিলারা পালাবার পথ পায় না, যে যার দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে একগলা ঘোমটা টেনে দিল। শুধু কুসুমকুমারী স্থানচ্যুতা হলো না, চোখ নামালো মাটির দিকে।

ডাক্তারসাহেব বললেন, একটা ইম্পর্টান্ট কথা বলার জন্য আমি ফিরে এসেছি। ইউ মাস্ট নট ডিস্টার্ব দি পেশেণ্ট। এখানে শোরগোল করবেন না। শুধু একজন দু-জন থাকুন, যাতে জ্ঞান ফিরলে পেশেণ্ট হঠাৎ উঠে না বসতে চায়। ইংলণ্ডের রমণীরা এই রকম সময়ে বেশী কমপোজড্...আই মীন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়।

এবারে রইলো শুধু সরোজিনী ও কুসুমকুমারী। একটুক্ষণ থেকে থেকেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে সরোজিনী। কুসুমকুমারী তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতে লাগলো, ওলো, কাঁদিস নি বোনটি, মিছিমিছি কান্না যে অলুক্ষুণে, ডাক্তারবাবু তো বললেনই ভয়ের কিছু নেই।

সরোজিনী অশ্রুসজল মুখখানি তুলে বললো, ও দিদি, মানুষের দাঁতে যে সাঙ্ঘাতিক বিষ !

কুসুমকুমারী বললো, কে বললে তোকে ?

সরোজিনী বললো, হ্যাঁ আমি জানি ! পাগল যদি কারুকে কামড়ায়, তা হলে সেও পাগল হয়ে যায় ! আমার বাপের বাড়িতে একবার এমন হয়েছেল !

নিজের অজ্ঞাতসারেই কুসুমকুমারী নিজের বাম স্কন্ধে হাত রাখলো। মানুষে মানুষকে কামড়ায়। এমনকি কোনো পাগল কামড়ালেও যে তেমন কোনো ক্ষতি হয় না, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ তো সে নিজে। তার কাঁধে এখনো দাগ আছে।

কিন্তু সে ঘটনার উল্লেখ না করে সে আস্তে আস্তে বললো, না রে, ও সব ভুয়ো কতা ! তেমন কিছু ভয় থাকলে ডাক্তারবাবু বলতেন না ?

সরোজিনী দু দিকে মাথা নেড়ে বললো, বাড়িতে আর কোনো পুরুষমানুষ নেই, ও দিদি ভাসুরঠাকুর কখন আসবেন ? আমার বুকের মধ্যে এমন ধড়ফড় কচ্চে, আমি যে আর বসে থাকতে পাচ্চি নি !

গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেরি হলো। গঙ্গানারায়ণ নিজেদের কোম্পানির হৌসে

বেরিয়েছিল, সেখানে গৌরদাস বসাকের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়ে সে চলে গেছে স্পেনসেস হোটেলে।

বিলাত থেকে ফেরার পর মধুসূদনের প্রায় দুই বৎসর কেটে গেছে এই হোটেলে। এই ব্যয়বহুল স্থান ছেড়ে কোনো ভদ্র পল্লীতে বাসা ভাড়া করে থাকবার জন্য বন্ধু ও শুভার্থীরা অনেকেই পীড়াপীড়ি করেছিলেন, কিন্তু মধুসূদন কর্ণপাত করেননি। সাহেবগণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যারিস্টারি করতে গেলে সাহেবী চালচলন রক্ষা করতেই হবে। মধুসূদনের ভাষায় এটাই বামুনপাড়া।

স্ত্রীকে বিলাতেই রেখে এসেছেন, পুত্র-কন্যাদের শিক্ষাও চলছে সেখানে। প্রতি মাসে সেখানে অর্থ প্রেরণ করা এবং স্পেনসেস হোটেলে নিজের খরচ চালানো কয়েক মাসের পরেই মধুসূদনের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে এলো। ব্যারিস্টার মাইকেল এম এস ডাট যত খ্যাতনামা তত উপার্জনক্ষম নন। তাঁর কণ্ঠস্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা বলে আদালতে তাঁর স্পীচ্ ততটা মর্মস্পর্শী নাটকীয় হয় না। মাঝে মধ্যে তিনি বিচারকদের তির্যক বিদ্রূপ করতে ছাড়েন না। নিয়মিত আদালতে যাওয়াই হয়ে ওঠে না। মক্কেলদের সঙ্গে ব্রীফ নিয়ে আলোচনা করার বদলে বান্ধব সংসর্গে মজলিস করাই তাঁর বেশী পছন্দ। অর্থের সাঙ্ঘাতিক টানাটানি থাকলেও কোনো পরিচিতব্যক্তি মামলা নিয়ে এলে, এমনকি কোনো বন্ধুর সুপারিশ নিয়ে কেউ এলেও মধুসূদন তাদের মামলায় ফি নিতে চান না। তাঁরা নেহাত জেদাজেদি করলে বলেন, ঠিক আছে, তা হলে এক বোতল বার্গাণ্ডি, আধ ডজন বীয়ার আর শ'খানেক মালদার ল্যাংড়া আম পাঠিও

প্রবাসে নিরুপায় হয়ে যাঁর কাছে বার বার হাত পেতেছেন, স্বদেশে এসেও চরম আর্থিক বিপর্যয়ের সময় সেই বিদ্যাসাগরের কাছেই আবার ঋণ চাইতে শুরু করলেন। বিদ্যাসাগরেরও একেবারে নাজেহাল অবস্থা। তিনি অন্যের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে মধুকে টাকা পাঠিয়েছেন, এখন সেই সব মহাজনরা তাঁকে ঋণ শোধের জন্য বার বার তাগিদ দিয়ে এখন মামলার হুমকি দিচ্ছে। এবার বিদ্যাসাগর কঠোর হলেন। মধুসূদনের বর্তমান জীবনযাপন পদ্ধতি তাঁর পছন্দ হবার কথা নয়, বিশেষত এজন্য তিনি কেন অর্থের জোগান দিয়ে যাবেন!

মধুসূদন ব্যারিস্টারিতেও সার্থক হতে পারছেন না। এদিকে তাঁর কবিত্ব শক্তিও উধাও। এটা সেটা লেখবার চেষ্টা করছেন, কোনোটাই দানা বাঁধে না। ভিতরে ভিতরে দারুণ অস্থিরতা এবং তা নিবৃত্ত করার একমাত্র উপায় সুরাপান।

বিলাতে অর্থ প্রেরণ অনিয়মিত হয়ে যাওয়ায় হেনরিয়েটাও দারুণ দুর্বিপাকে পড়েছে। পুত্রকন্যারা আবার অনাহারের সম্মুখীন। এই অবস্থায় হেনরিয়েটা আবার কলকাতায় স্বামী সন্নিধানে ফিরে আসার সংকল্প নিল। নিজেই সে চেষ্টা করতে লাগলো কোনো জাহাজ কোম্পানির কাছে সস্তায় প্রত্যাবর্তনের টিকিট পাবার জন্য। এই সংবাদ পেয়ে মধুসূদন আরও অস্থির। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের তিনি যোগ্য সমাদরের সঙ্গে কোথায় রাখবেন, কেমনভাবে সংসার চালাবেন? এই চিন্তায় চিন্তায় মধুসূদনের মদ্যপানের পরিমাণ আরও বর্ধিত হলো।

বন্ধুরা সকলেই মধুর বর্তমান অবস্থার জন্য উৎকণ্ঠিত। এ রকমভাবে চললে মধু আর কতদিন বাঁচবে? তার শরীর অসম্ভব স্থূল হয়ে গেছে। কথাবার্তা সর্বক্ষণ জড়ানো। পানের মতন আহারের প্রতিও মধুসূদনের খুব ঝোঁক হয়েছে ইদানীং। হোটেলে ছ'কোর্সের কমে আহার করেন না। কখনো কখনো বিলাতি খাদ্যে অরুচি হলে কোনো বন্ধুর গৃহে গিয়ে সুক্তো-চচ্চড়ি-কুমড়োর ছক্কা খাবার জন্য বায়না করেন। এক একদিন হোটেলের খানসামাকেও বলেন কোনো দিশী পদ রন্ধন করতে। একদিন তাঁর মুগের ডাল খাবার শখ হলো, খানসামাকে হুকুম দিলেন মুগের ডাল বানাতে। হোটেলের পাকশালা থেকে খানসামা পোর্সিলিনের পিরিচে যে তরল পদার্থটি নিয়ে এলো, সেটি মুখে দিয়েই মধুসূদন থুথু করে উঠলেন। এর নাম মুগের ডাল? তৎক্ষণাৎ চিঠি দিয়ে এক আর্দালিকে পাঠালেন খিদিরপুরে এক বন্ধুর বাড়িতে। তাঁর আজই মুগের ডাল চাই। কিন্তু বাঙালী বাড়ির বাটি-গামলার মতন কোনো পাত্রে তুচ্ছ কোনো দেশী খাবার তো স্পেনসেস হোটেলে ঢোকানো চলবে না। তাই মধুসূদন আর্দালির হাতে পাঠিয়ে দিলেন একটি খালি মদের বোতল। সেই বোতলে ভরেই এলো মুগের ডাল এবং মদ্যপানের ভঙ্গিতেই সরাসরি বোতলে চুমুক দিয়ে সেই ডাল খেয়ে মধুসূদন তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, আঃ!

মধুসূদনের এই উদ্দাম মদ্যপান কিছুটা রহিত করতে না পারলে তাঁকে আর বাঁচানো যাবে না। তাঁর বন্ধুরা অনেকেই এজন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মধুর কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত চলে গেছে। নইলে সে মাননীয় বিদ্যাসাগর

মশাইয়ের কাছে সাক্ষাৎ করতে যাবার আগে চিঠি লিখে অনুরোধ জানায়, এক বোতল মদ সংগ্রহ করে রাখবেন !

কার্যসূত্রে গৌরদাসকে বাইরে থাকতে হয়, তাই সে গঙ্গানারায়ণকে অনুরোধ করেছে মধুর খবরাখবর নিতে। সেই জন্য গঙ্গানারায়ণ আজই এসেছে। আজও মধুসূদন আদালতে যাননি, একটি ড্রেসিংগাউন আলুথালুভাবে অঙ্গে জড়ানো। কক্ষটি উগ্র তামাকের গন্ধে ভরপুর। আগে মধুসূদন শখ করে শুধু সিগারেট টানতেন, এখন তিনি আলবোলাতেও ধূমপান করেন। মধুসূদনের হাতে দুটি কাঁচা লঙ্কা, তাদের ডগা ভেঙে তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বড় জিভ বার করে তাতে ঐ ভাঙ্গা লঙ্কা দুটি ঘষছেন।

গঙ্গানারায়ণের দিকে ফিরে মধুসূদন বললেন, গঙ্গা, মাই ডিয়ার বয়। এই লঙ্কা একটু চেকে দ্যাক তো ঝাল আছে কি না। আই কান্ট্ ফিল এনিথিং !

গঙ্গানারায়ণের দুই চক্ষে গভীর বিস্ময়। মধুসূদনের কথা শুনে সে প্রায় আঁতকে উঠে বললো, ওরে বাপরে, কাঁচা লঙ্কা...আমি জম্মে কখোনো খাইনি...।

মধুসূদন ঈষৎ হেসে বললেন, আমরা যশুরে বাঙাল, আমরা খুব ঝাল খেতে পারি...কিন্তু এখন আর জিভে কোনো সাড় নেই...যত লঙ্কাই ঘষি, ঝাল লাগে না...জিভের আর দোষ কী !

—মধু, তুই কেন এমন সর্বনাশ কচ্চিস ! তুই...

—ডোন্ট সারমনাইজ, মাই ডিয়ার...তুই এসিছিস, আয় সেলিব্রেট করা যাক। বোয় ! পেগ লাগাও !

—না, না না মধু, এই ভর-দুপুর বেলা তুই আবার শুরু করিস নি !

—ও, তুই তো নিরিমিষ্যি ! তা হলে আমি খাই ! না খেলে আমার শরীরটা কেমন দম্‌সম করে !

—মধু, আমি সারমন দিচ্চি নি। কিন্তু এ কতা তো আমরা বলবোই যে তুই এত খরচ-পত্তর করে বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এলি, এবার কোথায় বেশ গুচিয়ে বসবি, মন দিয়ে প্র্যাকটিস কর্বি, তা না, এই হোটেলে ছন্নছাড়ার মতন...।

—গুছিয়ে বসা আর আমার হলো না এ জীবনে !

একটু থেমে মধুসূদন দুঃখিত কণ্ঠে আবার বললেন, সবাই এসে বলে, কেন আমি মন দিয়ে প্র্যাকটিস করছি না ! কেউ তো বলে না, কেন আমি আর কাব্য রচনা করছি না ?

—না, না। সেটা তো আমাদেরও প্রশ্ন। মেঘনাদের মতন আর একখানা মহাকাব্য তুই কেন শুরু কচ্চিস না ? দেশবাসী তোর কাচ থেকে আরও অনেক কিছু প্রত্যাশা করে !

—আই অ্যাম ফিনিসড্ ! গঙ্গা, দি মিউজ হ্যাজ লেফট্ মি। আমার আর লেখার ক্ষমতা নেই। আমার পক্ষে এখন বাঁচা-মরা সমান ! বিষ খেতে ভয় পাই, তাই এইটে খাচ্চি !

আরও কিছুক্ষণ বসে গঙ্গানারায়ণ নানা রকম কথা বলেও মধুসূদনকে নিবৃত্ত করতে পারলো না। মধুসূদন তো শিশু নন যে অন্যের কথা শুনে চলবেন। তাঁর নেশার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। প্রায় হাহাকারের মতন তিনি বার বার বলতে লাগলেন, দি মিউজ হ্যাজ লেফ্‌ট মী !

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে গঙ্গানারায়ণ হোটেলের বাইরে এসে দেখলো তার জুড়িগাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুর্যোধন গোমস্তা। নানা সূত্র থেকে সে গঙ্গানারায়ণের সন্ধান পেয়ে এখানে এসেও সাহস করে সাহেবী হোটেলের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি।

সংবাদ পাওয়া মাত্র গঙ্গানারায়ণ বাড়ির দিকে ছুটলো। নবীনকুমারকে তখনও নিদ্রাভিভূত দেখে সে দুলাল ও ভুজঙ্গধরের কাছ থেকে একাধিকবার শুনলো সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ। তারপরই সে আবার বেরিয়ে গেল পর পর এই শহরের অ্যালোপ্যাথিক, কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথিক প্রধান তিন চিকিৎসকের কাছে। তিন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিল। একমাত্র কবিরাজ ব্যতীত বাকি দু'জন তেমন বিপজ্জনক মনে করলেন না। তবে সকলেই ক্ষতস্থান স্বচক্ষে পরীক্ষা করতে চান।

তারপর গঙ্গানারায়ণ গেল ডাক্তার সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তীর কাছে। সূর্যকুমার জেদী পুরুষ। তিনি বললেন, গঙ্গানারায়ণের ইচ্ছে হলে সে যত খুশী বিশেষজ্ঞ দেখাতে পারে। কিন্তু অন্য কেউ চিকিৎসা করলে তিনি আর ভার নেবেন না। সূর্যকুমারের দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি একাই সারিয়ে তুলতে পারবেন।

গঙ্গানারায়ণ ফাঁপরে পড়ে গেল। সূর্যকুমারও বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক এবং পারিবারিক শুভার্থী, তাঁর কথা অগ্রাহ্য করা চলে না। সুতরাং অন্তত আর একটি দিন অপেক্ষা করতেই হয়।

পরদিন সূর্যকুমার এসে দেখলেন, নবীনকুমারের সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে এসেছে। মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ, কিন্তু চক্ষু দুটি উজ্জ্বল। নবীনকুমারের মাথায় সদ্য গজানো ঘাসের মতন বাইশ দিনের চুল। সূর্যকুমার এসে শুনলেন, অতি প্রাতঃকালেই তাঁর রোগী ক্ষুধার কথা জানিয়ে এক বাটি দুগ্ধ পান করেছে।

শয্যার পাশে একটি চেয়ারে তিনি আসন গ্রহণ করবার পর নবীনকুমার পরিষ্কার কণ্ঠস্বরে বললো, ডক্তর চক্রবর্তী, কেমন অবস্থা আমার? বাঁচবো তো?

সূর্যকুমার বললেন, মরবার জন্য আপনাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। অন্তত আরও পঞ্চাশ বছর!

নবীনকুমার ক্ষীণভাবে হাসলো। তারপর বললো, কতখানি কামড়ে নিয়েচে? অনেকখানি?

ডাক্তারবাবু নিজের ডানহাতের আঙুলগুলো দিয়ে একটি ক্ষুদ্র গোল তৈরি করে বললেন, এই এইটুক খানি! দিস মাচ! নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট!

নবীনকুমার হঠাৎ উঠে বসতে যেতেই ডাক্তারবাবু তাকে ধরে ফেলে বলে উঠলেন, আরে ওকি, ওকি!

—এই বাঁধনগুলো একবার খুলুন তো, আমি একবার নিজের চক্ষে দেখবো!

এই কথার সমস্বরে প্রতিবাদ করলো গঙ্গানারায়ণ এবং সূর্যকুমার। কিন্তু নবীনকুমার কিছুতেই মানবে না। তার নিজের শরীরের কতখানি ক্ষতি হয়েছে তা সে নিজে না দেখে ছাড়বে না। সূর্যকুমার অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে দু-তিন দিনের মধ্যে ব্যাণ্ডেজ খোলা উচিত নয়। খুলতে গেলেও খুবই ব্যথা লাগবে। কিন্তু নবীনকুমার নাছোড়বান্দা। এই মানুষটি যে কত জেদী তার প্রমাণ সূর্যকুমার আগে অনেকবার পেয়েছেন, সুতরাং শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যাণ্ডেজ খুলতে বাধ্য হলেন। নবীনকুমারের দারুণ ব্যথা বোধ হচ্ছে নিশ্চয়, তবু সে মুখের একটা রেখাও কাঁপালো না।

নবীনকুমারের বাঁ দিকের বুকে একটি মুষ্টি পরিমাণ বৃহৎ ক্ষত। আবার রক্তক্ষরণ শুরু হওয়ায় লাল রঙের মাংস হাঁ করে আছে।

গঙ্গানারায়ণ অশ্রু সংবরণ করতে না পেরে ধরা গলায় বললো, ছোটকু, তুই কেন অমন উদবক্কা পাগলের কাচে গেলি? কেউ যায়?

সে কথার উত্তর না দিয়ে নবীনকুমার বেশ কিছুক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে রইলো নিজের বুকের দিকে। তারপর যেন আপন মনেই বললো, ঠিক হৃৎপিণ্ডের ওপরে···ওই গর্তটা দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ডটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসবে না তো?

সূর্যকুমার বললেন, সে কী কথা! একেবারেই সুপারফিসিয়াল ইনজুরি, পচন ধরেনি, ভয়ের কিছু নেই—।

আবার শুয়ে পড়ে চক্ষু মুদে নবীনকুমার বললো, ডক্টর চক্রবর্তী, আমায় তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলুন! আমায় এখন বেশী দিন শুয়ে থাকলে চলবে না, আমার অনেক কাজ!

ডক্টর সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী এর আগেও নবীনকুমারের চিকিৎসা করেছেন, কিন্তু এবার নবীনকুমার যেন অন্য মানুষ। এ রকম রোগী পাওয়া চিকিৎসকদের পক্ষেও সৌভাগ্যের বিষয়। এই রোগী চিকিৎসকের সঙ্গে সব রকম সহযোগিতা করবার জন্য প্রস্তুত, যে-কোনো ঔষধ-পথ্যে আপত্তি নেই এবং ব্যাণ্ডেজ খোলা-বাঁধার সময় একটুও ব্যথা বেদনার অনুযোগ করে না। সে শুধু বার বার বলে, ডক্তর চক্রবর্তী, আমাকে খুব শিগগির চাঙ্গা করে তুলুন, আমার এখন অনেক কাজ, মাতার মধ্যে হাজারো পরিকল্পনা গিসগিস কচ্চে।

এমনকি ব্যথা খুব বৃদ্ধি পেলে তার কিছুটা লাঘবের জন্য ডাক্তার যখন পরামর্শ দিলেন মাঝে মাঝে একটু ব্র্যাণ্ডি সেবন করতে, তখন নবীনকুমার বলে উঠলো, না, না, আমায় ওসব আর ছুঁতে বলবেন না। আমি ওসব থেকে মুক্ত হয়িচি।

সূর্যকুমার ভাবলেন, মানুষের জীবনের গতি কী বিচিত্র ! কয়েক বৎসর আগেও এই মানুষটিকে শত ঝুলোঝুলি করেও মদ্যপানের উৎকট স্বভাব ছাড়ানো যায়নি। আর আজ সে ওষুধের ডোজেও মদ্য স্পর্শ করতে অরাজি।

সপ্তাহখানেক কেটে যাবার পর সূর্যকুমার অন্য কয়েক জন চিকিৎসককে দিয়ে এই রোগীকে পরীক্ষা করাতে নিমরাজি হলেন। এমনিতে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ ঘটেনি, পূর্ণবয়স্ক যুবক নবীনকুমারের স্বাস্থ্যটি চমৎকার। মেদহীন মজবুত শরীর, ব্যাধির আর কোনো উপসর্গ নেই। এর মধ্যেই সে উঠে চলাফেরার শক্তি ফিরে পেয়েছে, শুধু ক্ষতস্থানটি শুকোচ্চে না। সেই রকমই দগদগে ভাব। গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে এমনও বলা যায় না। আর জখমটি এমনই মোক্ষম জায়গায় যে ওখানে সার্জারিরও তেমন সুযোগ নেই।

নবীনকুমার এখনই নিজেই স্নানাগার-শৌচাগারে যেতে পারে বটে, কিন্তু সামান্য চলাফেরা করলেই তার রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায়। সূর্যকুমারের কোনো ঔষধেই এই রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না, সেই জন্য তিনি অন্য পদ্ধতির ঔষধ একবার পরখ করে দেখতে চান।

প্রথমে মহেন্দ্রলাল সরকার এবং রাজাধিরাজ দত্ত নামে হোমিওপ্যাথির দুই চিকিৎসক এলেন। মহেন্দ্রলাল সরকার এদেশের হোমিওপ্যাথির প্রধান চিকিৎসক তো বটেই, অ্যালোপ্যাথিতেও এ দেশের সর্বোচ্চ উপাধি এম ডি পেয়েছিলেন। ভারতের তিনিই দ্বিতীয় এম ডি। তা সত্ত্বেও তিনি অ্যালোপ্যাথি ছেড়ে হ্যানিম্যান প্রবর্তিত হোমিওপ্যাথির সমর্থক হয়েছেন। রাজাধিরাজ দত্তও যথেষ্ট খ্যাতিমান। দু' জনেই মত প্রকাশ করলেন যে গ্যাংগ্রিন হয়নি। এই ক্ষত ঔষধেই নিরাময় করা যায়।

পরদিন এলেন দুই কবিরাজ ভৃগুকুমার সেন এবং বিষ্ণুচরণ সেন। তাঁদেরও ঐ একমত। চিকিৎসা বিভ্রাটেরও কোনো সম্ভাবনা দেখা দিল না, কারণ নবীনকুমার শুধুমাত্র ধনীর দুলাল নয়, সে যথেষ্ট খ্যাতিমান এবং নানা কারণে দেশবাসীর কাছে শ্রদ্ধেয়। সুতরাং চিকিৎসকরা নিজেদের অহমিকা প্রচ্ছন্ন রেখে রোগীর দ্রুত আরোগ্যের ব্যাপারেই মনোযোগী হলেন।

মহেন্দ্রলাল সরকার নিজেই বললেন, এখনই অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা বন্ধ করে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দেবার দরকার নেই। সূর্যকুমারের চিকিৎসা যেমন চলছে চলুক। সেই সঙ্গে কবিরাজি ওষুধও চলতে পারে, কারণ অ্যালোপ্যাথিক এবং কবিরাজি ওষুধ প্রয়োগের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই।

যে-হেতু রোগীরও পূর্ণজ্ঞান বর্তমান, তাই চিকিৎসকরা নবীনকুমারেরও মতামত জানতে চাইলো এ ব্যাপারে। নবীনকুমার মহেন্দ্রলাল সরকারের পরামর্শই মেনে নিল। গঙ্গানারায়ণেরও মনে হলো, এটাই উচিত ব্যবস্থা।

শয্যার ওপরে তিনটি বালিশে হেলান দিয়ে আধ-শোয়া হয়ে আছে নবীনকুমার। চক্ষু দুটি উজ্জ্বল। মুখে সামান্য পাণ্ডুর ভাব, তার কথা কওয়া নিষেধ হলেও সে মাঝে মাঝে চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিচ্ছে, দু-একবার হাস্য পরিহাসও করছে।

কবিরাজ ভৃগুকুমার সেন পরম বৈষ্ণব। তিনি শুধু ঔষধ দিয়েই চিকিৎসা সারেন না। রোগীর কল্যাণার্থে নামজপও করেন। অন্য চিকিৎসকরা গল্পে রত, কবিরাজ ভৃগুকুমার অনেকক্ষণ ধরে নবীনকুমারের এক হাতের নাড়ি ধরে কী যেন বলে চলেছেন অস্ফুট স্বরে। তাঁর দুই চক্ষু মুদিত, দেহ এমনই নিস্পন্দ যে মনে হয় ঘুমন্ত, শুধু ওষ্ঠ নড়ছে একটু একটু।

সেদিকে তাকিয়ে রাজাধিরাজ দত্ত এক সময় ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে বলে উঠলেন, ও কোবরেজ মোয়াই, আপনাদের বোষ্টমদের হরিসভায় কদিন আগে কী কাণ্ড হয়ে গেল, শুনেচেন ?

ভৃগুকুমার চোখও খুললেন না, উত্তরও দিলেন না।

বিষ্ণুচরণ জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে ?

বিষ্ণুচরণও বৈষ্ণব, তবে ততটা আচার অনুষ্ঠান মানেন না। এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে শাক্তমতে একটু কারণবারি পান করেন। ভৃগুকুমারের বেশী খ্যাতির জন্য তাঁর মনে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা ঈর্ষা আছে।

রাজাধিরাজ দত্ত বললেন, সে তো এক হুলুস্থুলু ব্যাপার। কলুটোলার কালী দত্তের নাম শুনেছেন ? যার বাড়িতে প্রকাণ্ড হরিসভা বসে ?

কালী দত্তের বাড়িতে হরিসভার আসর বসলে এমন জনসমাগম হয় যে সামনের পথ দিয়ে লোকজন গাড়িঘোড়া চলাচল করতে পারে না। সভার মধ্যখানে একটি বেদীতে পাতা থাকে একটি শূন্য আসন। সকলকে কল্পনা করে নিতে হয় যে ঐ আসনে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করছেন। তাঁকে ঘিরে ভক্তরা ভাগবত পাঠ করে। তারপর নৃত্য সহযোগে নামগান হয়।

সেই কালী দত্তের হরিসভার কথা কে না শুনেছে!

—কী হয়েছে সেখানে?

রাজাধিরাজ দত্ত বললেন, যা হয়েচে, তাতে বোষ্টম বাবাজীরা একেবারে স্ক্যাণ্ডালাইজড। কালীসাধক রামকৃষ্ণ সেখানকার চৈতন্যদেবের আসনের ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেল। শুধু তাই নয়, দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই অজ্ঞান।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, রামকৃষ্ণ কে?

—রানী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের পুজুরী। যে রামকুমার চাটুজ্জেকে দিয়ে রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির খোলালেন, এ তার ভাই।

বিষ্ণুচরণ বললেন, আমি গেছি দক্ষিণেশ্বরে। রামকুমারের ভায়ের নাম তো গদাধর।

রাজাধিরাজ দত্ত বললেন, হ্যাঁ, সেই গদাধর ঠাকুরই বটে। কোন্ এক নাগা সন্ন্যেসী নাকি এঁকে দীক্ষা দিয়ে অবধূত বানিয়ে ন্যাচেন। এখন নাকি তাঁর একেবারে ন্যাবড়া-জ্যাবড়া অবস্থা। যখুন তখুন ভাব হয়। একটা হাত ওপর দিকে উঠে আঙুল বেঁকে যায়।

বিষ্ণুচরণ বললেন, আমি মানুষটি সম্পর্কে অনেক রকম কথা শুনেছি। পূজ্যপাদ, ধন্বন্তরি গঙ্গাপ্রসাদ সেন কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে এঁর চিকিৎসা করেছেন। তাঁর মুখেই শুনেছি যে লোকটির ধরন-ধারণ অত্যাশ্চর্য। উন্মাদরোগ হয়েছে বলে মথুরবাবু নানা চিকিৎসক ডেকে এই পূজারীটির চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। কিন্তু এ কেমন উন্মাদ? দিনের পর দিন ঘুমোয় না, বুক-পিঠ লাল, কুকুরের সামনে থেকে খাবার তুলে নিয়ে নিজে খায়। কালীপূজা করতে বসে ফুল-বেলপাতা দিয়ে নিজেকেই পূজা করে, অথচ মুখখানি বড় করুণ। চক্ষু দুটি কান্না মাখানো। পূজ্যপাদ গঙ্গাপ্রসাদ সেন আমায় বলেছিলেন, কোনো ঔষধেই সেই মানুষটির কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি। বড়ই বিস্ময়কর।

রাজাধিরাজ দত্ত বললেন, সে যাই হোক গে, কিন্তু এটা কেমন ব্যাপার বলুন! এক শাক্ত কালীসাধক বোষ্টমদের আখড়ায় গিয়ে চৈতন্যদেবের আসনের ওপর উঠে দাঁড়াবে? অ্যাঁ?

ভৃগুকুমার এবার নবীনকুমারের হাত ছেড়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর চক্ষু খুলে বললেন, বেশ করেছেন তিনি! আমি সেই সভায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তিনি সাধারণ মানুষ নন। তাঁর মুখের পানে তাকালেই দিব্যভাব টের পাওয়া যায়।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন মানে? তাও কি সম্ভব?

ভৃগুকুমার বললেন, সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ওঁর হলো ভাব সমাধি। চক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মশায়, এই আমি বলে দিলুম, ঐ রামকৃষ্ণ ঠাকুর যে-সে লোক নন, ক্ষণজন্মা পুরুষ! দেখবেন, একদিন শত সহস্র লোক ওঁর পায়ে গিয়ে আছড়ে পড়বে।

নবীনকুমার বললো, তা হলে তো এই সাধুটির সঙ্গে একদিন দেকা করতে হয়।

গঙ্গানারায়ণ বললো, তুই ভালো হয়ে ওঠ, ছোট্‌কু, তারপর তোতে আমাতে একদিন একসঙ্গে যাবো।

শয্যায় শুয়ে শুয়েই নবীনকুমার নানা রকম বিষয়কর্ম পরিচালনা করতে লাগলো। ভুজঙ্গধর মারফত তাদের অন্যান্য জমিদারির নায়েবদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। নবীনকুমার নির্দেশ দিল, সমস্ত প্রজাদের খাজনা মকুব করে দেওয়া হবে। যার যা জমি আছে তাতে সে চিরস্বত্ব ভোগ করবে। সরকারের ঘরে জমিদারের দেয় খাজনা জমা পড়বে জমিদারের তহবিল থেকে।

কিন্তু খাজনা একেবারেই আদায় না করলে জমিদারের তহবিল থাকবে কী?

কেন, জমিদারের নিজস্ব অনেক খাস জমি, বাগান, জলকর আছে, তার থেকে আয় কম নয়। তাতেও ব্যয় সঙ্কুলান না হলে সেগুলি বিক্রয় করতে হবে একের পর এক। এর মধ্যেই উড়িষ্যার এক বিশাল জঙ্গল এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় দুটি বিল নবীনকুমার বিক্রি করে দিয়েছে। সেই টাকায়

শহরের উপকণ্ঠে কেনা হয়েছে অনেকখানি জমি সমেত একটি বাড়ি। সেখানে খোলা হবে কৃষি কলেজ। তার জন্য ট্রাস্টি বোর্ডও সে ঠিক করে ফেলেছে।

গঙ্গানারায়ণ একদিন কুণ্ঠিতভাবে বললো, তুই এ সব কী কচ্চিস, ছোট্কু ? আমাদের কলকাতার হৌসে খুব দুঃসময় চলচে, বহু টাকার শেয়ার গচ্চা গ্যাচে, এখন ঋণ করে খাতকদের টাকা শুধতে হবে। তুই এর মধ্যে দুহাতে সব উড়িয়ে দিচ্চিস ?

নবীনকুমার সে প্রসঙ্গে কান না দিয়ে অত্যুৎসাহের সঙ্গে বললো, কিন্তু, কৃষি কলেজের খুবই দরকার কিনা বলো ? হিন্দু কলেজের আগেই আমাদের এখেনে কৃষি কলেজ খোলা উচিত ছিল না ? চাষ-বাস থেকেই এ দেশের যাবতীয় আয়, আর সেই চাষীদের জ্ঞান বুদ্ধি দেবার কোনো ব্যবস্থা না করে আমরা শুধু কেরানি তৈরি কচ্চি ? দাদামণি,শুধু কলকেতায় নয়, আমরা গ্রামে গ্রামেও কৃষি বিদ্যালয় খুলবো। চাষীরা সেখেনে এসে ইংরিজি-বাংলা শিকবে না, চাষের নতুন নিয়ম শিকবে। আয়ারল্যাণ্ডের চাষীরা উত্তম সেচ ব্যবস্থা জানে, সেখেন থেকে আমরা শিক্ষক আনাবো।

দুপুরবেলা নবীনকুমার ঘুমিয়ে পড়লে সকলে ঘর ফাঁকা করে চলে যায়। শুধু মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়ে থাকে দুলাল। হঠাৎ এক সময় নবীনকুমারের ঘুম ভেঙে যায়, এই অনুভূতি নিয়ে যে সব কিছুর জন্যই বড় বেশী দেরি হয়ে যাচ্ছে। এখুনি সব কিছু সক্রিয়ভাবে শুরু করা দরকার। এ রকম ভাবে শয্যাশায়ী হয়ে থাকলে চলবে না।

আস্তে আস্তে উঠে বসে সে কিছুক্ষণ দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে। ঘরের সাদা দেয়ালটি বড় শান্ত, মায়াময়। বেশ একটা স্নেহের ভাব আছে। ওদিকে তাকালেই মনে হয়, এই পৃথিবী বড় উপভোগ্য স্থান।

নবীনকুমার নিজেই ধীরে ধীরে ব্যাণ্ডেজটা খুলতে শুরু করে। প্রতিবারই খোলার সময় খুব যন্ত্রণা হয়। নবীনকুমার ওষ্ঠ কামড়ে থাকে, টুঁ শব্দটি করে না। একেবারে খোলা হয়ে গেলে সে একবার ব্যথিত নিঃশ্বাস ফেললো। ক্ষতস্থানটি ঠিক যেন একই রকম রয়েছে।

ধীরে ধীরে খাট থেকে নেমে সে গিয়ে দাঁড়ালো আয়নার পাশে। হেঁটে আসতে তার কষ্ট হলো না, কিন্তু বুকের বাঁ দিকে তাকিয়ে তার মন খারাপ হয়ে গেল। অদ্ভুত ধরনের লাল একটা গর্ত। এই গর্তটা বুজবে না ? নবীনকুমারের আবার মনে হলো, এই গর্ত দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ডটা বেরিয়ে আসবে না তো ?

আস্তে আস্তে রক্ত গড়াতে লাগলো ক্ষত থেকে। নবীনকুমার আবার ব্যাণ্ডেজ জড়াতে গিয়ে হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, কে ?

সেখানে কেউ নেই।

অথচ নবীনকুমারের স্পষ্ট মনে হলো, আয়নায় সে অন্য একজনের ছায়া দেখেছে।

অবিবেচকের মতন একটু দ্রুতই এসে নবীনকুমার উঁকি দিল দরজার বাইরে। কারুর চিহ্ন নেই সেখানে। তাহলে কি মনের ভুল !

বুক থেকে ঝরঝরিয়ে রক্ত পড়ছে। নবীনকুমার এলোমেলোভাবে ব্যাণ্ডেজের গজ জড়িয়ে ফেললো বুকে। তারপর শয্যায় ফিরে আসবার সময় পালঙ্কে একটু হাঁটুর আঘাত লাগতেই সেই শব্দে জেগে উঠলো দুলাল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েচে, ছোটবাবু ?

নবীনকুমার বললো, না রে, কিচু না। একটু দেকচিলুম ঘোরাফেরা করতে পারি কিনা। বেশ পেরে তো গেলুম।

দুলাল বললো, না, ছোটবাবু। ডাক্তাররা বারণ করেচেন !

নবীনকুমার বালিশে মাথা দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে একটা চাদর চাপা দিল বুকের ওপর। তারপর বললো, দুলাল, শোন !

—কী ছোটবাবু ?

—যে লোকটা আমায় কামড়েছেল তাকে তুই একেবারে মেরে ফেললি ? কেন রে ?

—আমার মাথায় খুন চেপে গেস্‌লো।

—লোকটাকে তোর মারা ঠিক হয়নি কো। ধরে বেঁধে নিয়ে আসতে পারতিস।

—কী বলচেন, ছোটবাবু, সে কি মানুষ, না নরপশু ? ওকে যে আমি টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলিনি....

—তুই নিয়তিতে বিশ্বাস করিস, দুলাল ?

—নিশ্চয়, ছোটবাবু। নিয়তিই তো মানুষকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্চে !

—আমার নিয়তিই কি আমায় টেনে নিয়ে গেল ঐ লোকটার কাচে ? একটা সাধারণ পাগল, সে হঠাৎ আমাকেই কামড়ে দিল কেন ?

—আপনি ভালো হয়ে যাবেন, ছোটবাবু। এত সব তাবড় তাবড় ডাক্তার কোবরেজরা বলচেন।

—ভালো হয়ে তো উঠবোই। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে যাচ্চে রে !

পর মুহূর্তেই নবীনকুমার আবার চেঁচিয়ে উঠলো, কে ?

দুলাল বললো, কোতায় কে ছোটবাবু ?

—দরজার পাশ থেকে কে যেন স্যাঁৎ করে চলে গেল। দ্যাকতো দ্যাকতো ! কে উঁকি দিয়ে ফিরে যাচ্চে !

দুলাল ছুটে বাইরে বেরিয়ে এদিক ওদিক খুঁজে এলো। কারুর চিহ্ন নেই এবারেও।

দুলাল ফিরে এসে বললো, না ছোটবাবু, কেউ নেইকো।

নবীনকুমার ভুরু কুঁচকে রইলো।

পরদিন মধ্য দুপুরে নবীনকুমার আবার নামলো পালঙ্ক থেকে। বেশ কয়েক পা ঘুরে বেড়ালো। ব্যাণ্ডেজ আস্তে আস্তে লাল রঙে রঞ্জিত হয়ে যাচ্ছে বটে কিন্তু আজ সে আরও সাবলীলভাবে হাঁটতে পারছে। রক্তক্ষরণের ফলেও যদি শরীরের দুর্বলতা বোধ না হয়, তা হলে আর চলাফেরা করতে আপত্তি কী ?

গায়ে একটা মুগার চাদর জড়িয়ে নিয়ে নবীনকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। যেন সে একটা মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে, অনেক দিন ধরে সে বন্দী হয়ে আছে।

ওপর মহলে মানুষজন এমনিতেই খুব কম। দুপুরবেলা একেবারে সুনসান থাকে। সরোজিনীও দিনের বেলা নবীনকুমারের কাছে আসে না। এখন সে প্রায় সর্বক্ষণই ঠাকুর ঘরে থাকে।

এক সময়ে নবীনকুমারের মনে হলো, এই গৃহটি কার ? এত বড় বড় খিলান, প্রশস্ত সব কক্ষ, কারুকার্যখচিত দরজা, এ সব কে বানিয়েছে ? কারা থাকে এখানে ? নবীনকুমার যেন এক আগন্তুক, ভুল করে কোনো অচেনা বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। বড় সুন্দর তো এই বাড়িটি ?

কে যেন বড় সুমধুর স্বরে গান গাইছে। খুবই মৃদু কণ্ঠ, কিন্তু এই শূন্য পুরীতে সেই গানের তরঙ্গ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। নবীনকুমারের সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হলো। কেমন যেন অলৌকিক অনুভূতি হয়। এই ঘুমন্তপুরীতে কোনো রমণী একা একা গান গেয়ে চলেছে।

সেই সুরের টানে আকৃষ্ট হয়ে নবীনকুমার পায়ে পায়ে তার উৎসের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। বাম হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধরে আছে, যেন এইভাবে ধরে থাকলে রক্তক্ষরণ কম হবে।

একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে সে থামল। এবার সে চিনতে পেরেছে। এ তো তার জননীর কক্ষ। এখানে কে গান গায় ? তার জননী তো আর ইহলোকে নেই।

ডান হাত দিয়ে একটু ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলে গেল।

ভিতরে একটা জলচৌকিতে বসে আছে কুসুমকুমারী। তার আলুলায়িত কুন্তল পিঠের ওপর ছড়ানো। হাতে একজোড়া খঞ্জনী। তার সামনে পা ছড়িয়ে বসে গান গাইছে এক দাসী আর কুসুমকুমারী তাতে তাল দিচ্ছে।

গানের মধ্যে তন্ময় হয়ে ছিল দুজনেই, অকস্মাৎ দরজাটা খুলে যেতেই কুসুমকুমারী চমকিত হয়ে বললো, ওমা !

বিম্ববতীর কক্ষে যে গঙ্গানারায়ণ-কুসুমকুমারী অনেক দিন ধরেই রয়েছে, সে কথা নবীনকুমার ভালোভাবেই জানে। কিন্তু আজ যেন তার ঘোর লেগেছে, কিছুই মনে নেই। সে কয়েক মুহূর্তের জন্য কুসুমকুমারীকে চিনতে পারলো না।

দারুণ উৎকণ্ঠার সঙ্গে কুসুমকুমারী উঠে এসে বললো, কী হয়েচে, ঠাকুরপো ?

কথা শোনা মাত্র নবীনকুমারের ঘোর কেটে গেল। এ তো তার ভ্রাতৃবধূ কুসুমকুমারী। সে দুপুরবেলা দাসীর কাছে গান শুনচে, এর মধ্যে অস্বাভাবিক তো কিছু নেই।

নবীনকুমার লজ্জিত, বিব্রতভাবে বললো, না, না, আমার ভুল হয়ে গ্যাচে, আমি এখেনে ভুল করে এসিচি !

সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরে দাঁড়ালো।

কুসুমকুমারীর বারংবার ব্যাকুল প্রশ্নের আর কোনো উত্তর দিল না সে। আবার ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলো নিজের কক্ষের দিকে।

জুড়িগাড়ি থেকে দুলালের সাহায্য না নিয়ে নিজেই নামলো নবীনকুমার। হাতে তার পিতার রূপো-বাঁধানো ছড়ি। কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতির ওপর রেশমী বেনিয়ান, মাথার চুল এখন কদম ফুলের মতন, কখনো কখনো সে একটি জরির টুপী পরিধান করে। তার শরীর আগের তুলনায় শীর্ণ, গৌরবর্ণ মুখখানি ঈষৎ ধূসর, তাকে অনেকটা ইংলণ্ডীয় কবি জর্জ বায়রনের মতন দেখায়।

দুলাল, ভুজঙ্গধর ও আরও কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে সে ধীর পদে সম্মুখে অগ্রসর হলো। বিস্তীর্ণ জলাভূমির এক পাশে একটি খাপরার চালার কুটির, মধ্যে মধ্যে কিছু গাছ। সকলে গিয়ে কুটিরটির সামনে উপস্থিত হবার পর একজন লোক বললো, ঐ যে হুজুর, সামনে যে তালগাছটা দেকচেন, ঐ পর্যন্ত হলোগে একদিকের সীমানা। আর ডাইনে-বাঁয়ের সীমানা মাপ-জোক কত্তে হবে।

ভুজঙ্গধর জিজ্ঞেস করলো, কতখানি জমি ?

—উনপঞ্চাশ বিঘে।

নবীনকুমার বললো, জমি কোতায় ? এ তো জলা। আমি কি মাছের চাষ কত্তে চাইচি নাকি ?

লোকটি বললো, জল বেশী নেই, হুজুর, একটু ছেঁচলেই ডাঙ্গা জেগে উঠবে। ঐ দেকুন না, এদিকে ওদিকে ধান চাষ হচ্ছে।

স্থানটি রসাপাগলা গ্রামের সন্নিকটে। এদিকে ওদিকে দু'চারটি মাত্র বাড়ি দেখা যায়, আর সবই জলাভূমি আর ধানজমি আর নল খাগড়ার বন। এ স্থানের নাম বালিগঞ্জ। দিনের বেলাতেই ঝাঁক ঝাঁক মশা তেড়ে এলো আগন্তুকদের প্রতি।

নবীনকুমার ছড়িটি তুলে বললো, ওদিকে কি খাল কিংবা নদী আচে ? আমার খানিকটে জলও দরকার, তবে বহতা জল হলে ভালো হয়।

—নদী বলতে সেই আদি গঙ্গা। সে তো কিছুটা দূরে, হুজুর।

নবীনকুমার ভুজঙ্গধরকে জিজ্ঞেস করলো, কী, পছন্দ হয় ?

ভুজঙ্গধর দুদিকে মাথা নেড়ে জানালো, না।

নবীনকুমার বললো, হুঁ, আমিও তাই মনে কচ্চি। বহতা জল নেই, আর এই কাদা জমিতে তাড়াতাড়ি বালি তোলার অনেক হ্যাপা। একশো জনের থাকবার মতন বাড়ি বানাতে হবে, তা ছাড়া চাই মাস্টারদের কোয়ার্টার আর গুদোম ঘর—

জমির দালালটি বললো, দর অতি সস্তা হুজুর, এক্কেবারে জলের দাম বলতে পারেন, আপনি রাবিশ মাটি দিয়ে ভরাট করলেও খর্চা অনেক কম পড়বে—

নবীনকুমার ফেরার জন্য উদ্যত হয়ে বললো, চলো, অন্য কোতায় আর কোন জমি সন্ধানে আচে তাই দেকাও।

ভুজঙ্গধর বললো, আমি কই কি ছোটবাবু, নদীয়ায় আমাগো ঐখানে আপনের চাষের ইস্কুল খুলেন।

নবীনকুমার বললো, হবে, সেখেনেও হবে। সব জেলায় জেলায় হবে। কিন্তু আগে আমি কলকেতায় খুলবো কৃষি বিদ্যালয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের চেয়েও সেটা বড় হবে। ওরা হাফ এডুকেটেড কেরানী বানাচ্চে, আমি শিক্ষিত চাষা বানাবো। তারা শুধু চাষ শিখবে না। সেই সঙ্গে নাম সই আর সরল অঙ্কও শিখবে।

ফিরে এসে গাড়িতে ওঠবার পর নবীনকুমার খুব সন্তর্পণে তার বক্ষের বাম দিকে হাত রাখলো। কিছু বোঝা গেল না। তখন সে তার বেনিয়ানের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ব্যাণ্ডেজটি স্পর্শ করলো। একটু যেন ঠাণ্ডা, ভিজে ভিজে লাগছে। নবীনকুমার হাতটি বার করে চোখের সামনে মেলে ধরলো। না, কোনো রক্তের দাগ নেই। তখন নিশ্চিন্ত বোধ করলো সে।

চিকিৎসকরা অনেক যত্নে তার বুকের ক্ষতটি বুজিয়েছে বটে, কিন্তু সে স্থানটি স্বাভাবিক হয়নি। মাটির ঢিবির মতন সেখানে লাল মাংস উঁচু হয়ে আছে, এখনো যখন তখন সেখান থেকে ঘামের মতন বিন্দু বিন্দু রক্ত বেরিয়ে আসে। তাই সর্বক্ষণ ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রাখতে হয়। কতদিন আর সে শয্যাশায়ী থাকবে। তাই চিকিৎসকরাও তাকে অনুমতি দিয়েছেন সাবধানে চলা ফেরার। পুরো দস্তুর পোশাক করে নবীনকুমার যখন পথে বার হয়, তখন তাকে দেখে বোঝা যায় না যে তার পোশাকের নিচে রয়েছে ব্যাণ্ডেজ, যা প্রায়শই রক্তে ভিজে যায়।

শহরে এখন নবীনকুমারের নামে লোকে নানা কথা বলে, তার সম্পর্কে লোকের বিস্ময়বোধটাই বেশী। সকলেই জেনে গেছে যে ধনকুবের রামকমল সিংহের সন্তান নবীনকুমার সিংহ এখন ঋণগ্রস্ত। বেঙ্গল ক্লাব সমেত বড় বড় অট্টালিকাগুলি বিক্রয় হয়ে গেছে। জমিদারিও হাতছাড়া। মাত্র এই কয়েকটি বৎসরে এই অতুল বৈভব একজন মানুষের পক্ষে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব? নবীনকুমার এখন যুবা, সামনে তো কত বয়স পড়ে আছে। একসময় যার কাছ থেকে কোনো প্রার্থী ফিরে আসতো না, এখন সেই নাকি হুণ্ডি কাটছে অনবরত। এর পর বসতবাড়ি পর্যন্ত বাঁধা না পড়ে!

গঙ্গানারায়ণ কিছুদিন নবীনকুমারকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিল। এখন সে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। এই জমিদারি বা বিষয় সম্পত্তিতে তার কোনো অংশ নেই, বিম্ববতীর প্রতিনিধি হয়েই সে যেন বিষয়ের মোহে বাঁধা পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তার নিজস্ব তো কোনো প্রয়োজন নেই। অনাড়ম্বর জীবনে সে অভ্যস্ত। ছোট্‌কু যদি তার খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য সব উড়িয়ে দিতে চায় তো দিক। এ বিষয়ে সে কুসুমকুমারীর মতামত নিয়েছে। কুসুমকুমারীও নবীনকুমারকে বাধা দেবার পক্ষপাতী নয়।

আত্মীয়-বন্ধুদের ধারণা নবীনকুমারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। মহাভারত অনুবাদের মতন মহৎ পুণ্যকর্ম যে করেছে, সে এখন মেতে উঠেছে অদ্ভুত সব কাণ্ড কারখানায়। চাষাভুযোদের ইস্কুল। চাষীরা জমিজমা, চাষবাস ফেলে পড়তে আসবে কলকাতায়? সাহেব মাস্টাররা নাকি চাষাদের ধান চাষ শেখাবে? শুনলে হাস্য সংবরণ করা যায়?

যে-সব পণ্ডিত মহাভারত অনুবাদের কাজে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা কয়েক বৎসর ছিলেন দিব্যি খাতির যত্নে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নবীনকুমারকে বললেন, আপনি যে রামায়ণ, গীতা ইত্যাদি অনুবাদেরও পরিকল্পনার কথা পূর্বে জানিয়েছিলেন, তার কী হলো? নবীনকুমার প্রত্যেককে থোক কিছু অর্থ দান করে বলেছেন, আপনারা যদি পারেন তো করুন, আমি আর ওসবের মধ্যে নেই! যদি অনুবাদ সম্পূর্ণ করতে পারেন, তা হলে সে গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব আমার!

ভুজঙ্গধর ফিরে গেছে নদীয়ায়, সেখানে সে ছোট আকারে একটি কৃষি শিক্ষা কেন্দ্র চালু করে দিয়েছে। কলকাতাতেও জমি পছন্দ হয়েছে শেষ পর্যন্ত। তিলজলার সন্নিকটে একটি খাল সমেত বাহান্ন বিঘা জমি ও একটি ছোট কুঠি বাড়ি। পৌনে দু-লক্ষ টাকা দিয়ে সে সম্পত্তি কিনে ফেললো নবীনকুমার। সেখানে দ্রুত আবাস নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আয়ার্ল্যাণ্ডে চিঠি লিখে সেখান থেকে দু-জন অভিজ্ঞ চাষীকে আনবার ব্যবস্থাও পাকা। কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছে যে আইরীশ চাষীরা আলু চাষেই বেশী দক্ষ, আমেরিকাতে ভালো ধান হয়, সুতরাং সেখান থেকেও দু-একজন চাষাকে আনালে হয়। নবীনকুমার তাতেও রাজি। রাইমোহন নেই বটে, কিন্তু তার শূন্য স্থান পূরণ করার জন্য মানুষের অভাব হয় না। নবীনকুমারের কাছাকাছি এরকম কয়েকজন উপদেষ্টা জুটে গেছে, তারা এই সুযোগে কিছু টাকা পয়সা লুটেপুটে নিচ্ছে।

যখনই একা থাকে, তখনই নবীনকুমার তার হৃৎপিণ্ডের ওপর হাত রাখে। এক এক সময় তার হাতে লেগে থাকে রক্ত।

একদিন কৃষি বিদ্যালয়ের কাজের তদারকিতে যাচ্ছে নবীনকুমার, এমন সময় পথের পাশে একজনকে দেখে সে চমকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে চেঁচিয়ে উঠলো, ওরে রোখ, রোখ, গাড়ি রোখ!

গাড়িটা একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লো নবীনকুমার। একটা নিম গাছ থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নিমপাতা পাড়ছে উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়স্ক এক ছোকরা। তার মাথায় একটিও চুল নেই, দু-চোখে ভুরুও নেই। নবীনকুমার ঠিক চিনতে পেরেছে, এ সেই চন্দ্রনাথের চ্যালা সুলতান।

ছড়ি উঁচিয়ে নবীনকুমার ডাকলো, ওহে, এদিকে একটু শোনো তো—।

সুলতান মুখ ফিরিয়ে নবীনকুমারকে দেখেই চঞ্চল হয়ে উঠলো। এদিক ওদিক চেয়ে ছুট লাগালো বিপরীত দিকে।

নবীনকুমার বললো, দুলাল ধর তো ওকে!

সুলতান বেজীর মতন এঁকেবেঁকে ছুটতে লাগলো বিদ্যুৎ গতিতে। তবু দুলাল তাকে ধরে ফেললো এক সময়। টানতে টানতে নিয়ে এলো নবীনকুমারের কাছে।

মাটির দিকে চোখ রেখে ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইলো সুলতান।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো। কী হে, আমি তোমায় ডাকলুম, আর তুমি পোঁ পোঁ করে ছুটলে কেন? আমায় চিনতে পেরোচো?

সুলতান কোনো উত্তর দিল না।

—তোমার বাবু কোতা? সেই চন্দ্রনাথ ওঝা?

—জানি না!

—জানো না মানে? তুমি কি এখন একলা থাকো? সেই আগুন লেগে তোমাদের বাড়ি পুড়ে গেস্‌লো, তোমাদের আর সন্ধান পাওয়া যায়নি, আমি ঠিক জানতুম, তোমরা কোতাও লুকিয়েচো। সেদিন কে তোমাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়েছিল?

—জানি না।

—আমাকে তোমার ভয় কী? তোমার বাবুর সঙ্গে আমার একটা দরকার আচে—।

সুলতান বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে চাইলো না। খুব নরমভাবে তাকে অনেক বোঝাবার পর সে তাদের বাসস্থান দেখিয়ে দিতে রাজি হলো।

মারহাট্টা ডিচের ওপারে কিছু গোলপাতার ঘরের বস্তি, তার মধ্যে দু'তিনটি মাঠকোঠা। খালের ওপরে একটা নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো। নবীনকুমার সেই সাঁকোর ওপর পা দিতেই দুলাল কাতরভাবে বললো, ছোটবাবু, আপনি ওদিকে যাবেন না!

নবীনকুমার বিস্মিতভাবে বললো, কেন রে?

দুলাল বললো, কেন যাচ্ছেন? ওসব নোংরা জায়গায় যাওয়া কি আপনাকে মানায়?

দুলাল যেন বলতে চায়, ও রকম বস্তিতে নবীনকুমারের মতন মানুষের তো যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, এমনকি, তার সঙ্গী হিসেবে দুলালেরও যাওয়াটা মানায় না। মাত্র কয়েকদিন আগে নবীনকুমারের দেওয়া বরানগরের বাড়িটির দখল নিয়ে দুলাল সেখানে স্ত্রী-পুত্রকে রেখে সংসার স্থাপন করেছে। এখন সেও একজন মধ্যবিত্ত।

নবীনকুমার বললো, ঐ চন্দ্রনাথ ওঝার সঙ্গে আমার একবার দেখা করার বিশেষ দরকার।

—আপনি যাবেন কেন? হুকুম করুন, পাইক গিয়ে তাকে ডেকে আনবে!

—হুকুম করলে সে আসবে না। আমি জানি, সে মানুষটা বড্ড দেমাকী।

নবীনকুমার সাঁকোর ওপর এক পা এগোতেই দুলাল কাকুতি-মিনতি করে বললো, আপনি যাবেন না, ছোটবাবু! আপনার শরীর ভালো নেইকো—

—তুই সর, দুলাল!

—না, ছোটবাবু, আমার কতাটা শুনুন···

জেদী নবীনকুমার নিজের মতের বিরুদ্ধে কোনো কথা সহ্য করে না। অন্য যে-কোনোদিন সে

দুলালের এরকম ব্যবহার দেখলে হাতের ছড়ি তুলে কয়েক ঘা কষিয়ে দিত। কিন্তু আজ তার শরীরে ক্রোধের উষ্ণতা এলো না, সে দুলালের চক্ষের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীর, উদাসীন কণ্ঠে বললো, সরে যা, দুলাল। তুই যা, তোকে আমি মুক্তি দিলুম। আজ থেকে তোকে আর আমার প্রয়োজন নেই।

—আমি আপনাকে কক্ষনো ছেড়ে যাবো না, ছোটবাবু! ওখানে যাবেন না, গেলে আপনার আবার বিপদ হতে পারে—।

—আমার আবার কিসের বিপদ! তুই সর! এই সুলতান, চলো আগে আগে—।

খালটি কচুরিপানায় ভর্তি, তার নিচে কত জল আছে বোঝা যায় না। সেই সাঁকো কোনোক্রমে পেরিয়ে এ পারে চলে এলো নবীনকুমার।

বস্তির মধ্যে একটা দোতলা মাঠকোঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রনাথ। তাকে পূর্বেকার চন্দ্রনাথ হিসেবে চেনা খুবই দুষ্কর। যে সুঠাম সুপুরুষটি সর্বক্ষণ সাহেবী পোশাক পরিধান করে থাকতো, এখন তার পরণে একটি চৌখুপ্পি লুঙ্গি, উন্মুক্ত বক্ষে, মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। চন্দ্রনাথের একটি চক্ষু কানা, বাম বাহুতে চারটি আঙুল নেই, দক্ষিণ হস্তটি অবশ্য দারুণ সবল, সেই হাতে একটি লাঠি ধরা। প্রবল কোনো প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েও সে এখনো বেঁচে আছে।

ক্ষুদ্র দলটিকে দেখেই চন্দ্রনাথ হুংকার দিল, সুলতান!

সুলতান কাঁচুমাচু হয়ে বললো, আমি আনতে চাইনি, এই ছায়েবরা জোর করে আইলেন।

খালের ধারে রজকেরা ধপাধপ শব্দে কাপড় কাচছে। এই মাঠকোঠাটির ঠিক পাশেই গরু-মহিষের খাটাল, বৃহৎ জন্তুগুলি ফ-র-র ফ-র-র শব্দে নিশ্বাস ফেলছে এবং ভেসে আসছে বিকট দুর্গন্ধ। কিছু দূরে একজন স্ত্রীলোক পুরুষের ভাষায় অশ্রাব্য গালমন্দ করছে যেন কাকে। সমগ্র পরিবেশটি যেন ছাই ছাই রঙে ঢাকা।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে এক পা এক পা করে উঠতে লাগলো নবীনকুমার। প্রতিটি পদক্ষেপই যেন বেশী ভারি লাগছে, চাপা উত্তেজনায় কাঁপছে তার শরীর।

চন্দ্রনাথ কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, কী চাই?

নবীনকুমার চন্দ্রনাথের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্তভাবে বললো, সে কোথায়?

—কে?

—তুমি জানো···যে তোমার সঙ্গে ছিল···

—কামুক কুক্কুর, গন্ধ শুঁকে শুঁকে এতদূর পর্যন্ত এসেছো?

চন্দ্রনাথ হাতের লাঠিটি উঁচু করে তুলতেই দুলাল এগিয়ে এসে বললো, এই, সাবধানে কতা বলবে!

নবীনকুমার বললো, তুই চুপ কর, দুলাল।

তারপর আর এক পা এগিয়ে এসে সে বললো, চন্দ্রনাথ ওঝা, এই দেশ-কাল আর সমাজের ওপর তোমার রাগ হয়েছে, আমি বুঝি। কিন্তু তুমি একলা একলা লড়তে চাও কেন? এ ভাবে একা কি তুমি জিততে পারবে? দ্যাখো, আজ তোমার কী অবস্থা! এ তো মূর্খের গোঁয়ার্তুমি। তুমি আমার সঙ্গে যোগ দাও, আমরা দু'জনে মিলে—

—তুমিই তো আমার প্রধান শত্রু!

—আমি?

—নিশ্চয়ই! তুমিই আমার এই চোখ নষ্ট করেচো, তুমিই আমার ঘরে আগুন লাগিয়েচো।

—না, না, চন্দ্রনাথ, এ তোমার ভুল! আমি তোমার সুহৃদ্ হতে চেয়েছিলুম। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করার কতা চিন্তাও করিনি—

—আমি মোটেই ভুল বুঝিনি! তোমাদের হাতে কোতোয়ালি। সব স্ত্রীলোক তোমাদের ভোগের বস্তু! আমার সঙ্গে জোরে না পারলে তুমি পুলিস ডেকে এনে আমায় ধরিয়ে দেবে, আমার ঘরের মেয়েমানুষকে তুমি জোর করে কেড়ে নেবে, ভাড়াটে প্যায়াদারা আবার এ বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেবে—

—না, না, না।

—বাঁচতে চাও তো, এখেন থেকে দূর হয়ে যাও!

—চন্দ্রনাথ ওঝা, তোমাকে আমি নিজের বাড়িতে স্থান দোবো, আমি সেইজন্যই এসিচি—

—তোমার দয়ার ওপর এই আমি থুতু ফেললুম! থুঃ!

এই সময় ঘরের দ্বার খুলে গেল। নবীনকুমার চক্ষু তুলে দেখলো সেই রমণীকে। একটা কস্তা পেড়ে বিবর্ণ শাড়ী তার অঙ্গে জড়ানো, মুখখানি ধূলিমলিন। কিন্তু সেই চোখ, সেই ওষ্ঠের রেখা, সেই চিবুক, পিঠজোড়া দীঘল চুল, যেন অবিকল যৌবনের বিম্ববতীর প্রতিমূর্তি।

সহসা নবীনকুমারের চক্ষে জল, বুকে রক্ত এবং সারা শরীরে স্বেদ নির্গত হতে লাগলো। সে অপলক চেয়ে রইলো সেই রমণীর দিকে। কী করে এমন হয়, জননীকে কতকাল ভুলে ছিল নবীনকুমার, প্রবাসে অনাত্মীয় পরিবেশে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তবু সেই জননী মূর্তি কেন এমনভাবে ফিরে আসে? এই ক্লেদাক্ত পরিমণ্ডলে, এমন হীন অবস্থায়!

একটিও কথা বলতে পারলো না নবীনকুমার। দু' হাত দিয়ে সে তার মুখ ঢেকে ফেললো।

রমণীটি চন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে কী যেন বললো, তা নবীনকুমারের কর্ণে প্রবেশ করলো না। সে যেন তার দু' পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, এখনি চেতনা হারিয়ে ফেলবে। তবু প্রাণপণ মানসিক শক্তিতে সে স্থির থাকতে চাইলো, সে মনে মনে ভাবতে চাইলো, কেন আমি এমন দুর্বল হয়ে পড়ছি। শুধু শারীরিক সাদৃশ্য, তা ছাড়া আর কিছুই নয়, তার জন্য এতখানি বিচলিত হওয়া তো শোভা পায় না। তবু গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকের এক রহস্যময়তা তাকে ব্যাপ্ত করে ফেলছে।

বিপরীত দিকে ফিরে সে ধরা গলায় বললো, চল, দুলাল!

চন্দ্রনাথ বললো, দাঁড়াও নবীনবাবু, এতই যখন তোমার সাধ, তুমি নিয়ে যাও একে!

নবীনকুমার দু' হাতে কান চাপা দিল।

চন্দ্রনাথ বললো, আমি নিজের ভোগের জন্য একে আনিনি। পথের মধ্যে কয়েক কুলাঙ্গারের হাত থেকে একে উদ্ধার কবিচিলুম। তারপর এ আর আমার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। তোমার যখন এতই লোভ, তুমি নিয়ে যাও, আমি ছেড়ে দিচ্ছি—

নবীনকুমারের আর কথা বলারও সাধ্য নেই। দু' হাতে কান চেপে সে দুদ্দাড় করে নামতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। তারপর ছুটলো বাঁশের সাঁকোর দিকে।

সাঁকোতে পা দেবার আগেই দুলাল এসে তাকে ধরে ফেলে বললো, ছোটবাবু, কী কচ্চেন! আপনার কী হয়েছে!

নবীনকুমারের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। সে ঢলে পড়লো দুলালের বুকে। ব্যাণ্ডেজ ছাপিয়ে তার পিরানে ফুটে উঠেছে রক্তের ছোপ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন দেখতে এলেন, তখন নবীনকুমারের জ্ঞান নেই। কয়েকদিন ধরেই এমন চলেছে, অল্প কিছুক্ষণের জন্য তার জ্ঞান ফেরে, আবার সে তলিয়ে যায় অচৈতন্যের আঁধারে। তার বুকের ক্ষত আবার উন্মুক্ত হয়েছে, এবার বুঝি সত্যিই বেরিয়ে আসছে তার হৃৎপিণ্ড। রক্তপাতের বিরাম নেই। যেটুকু সময় তার জ্ঞান ফেরে, তখন নিশ্চয়ই তার অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হয়, কিন্তু মুখ দিয়ে সে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করে না।

বিদ্যাসাগর যখন এলেন, তখন তিনজন চিকিৎসক সেখানে উপস্থিত। তাঁদের মুখে ঘোর ছায়া। বিদ্যাসাগরের নিজেরও শরীর ভালো নয়, শিরদাঁড়ায় ব্যথা, মনেও নানারূপ অশান্তি। তবু তিনি নবীনকুমারের গুরুতর পীড়ার সংবাদ শুনে এসেছেন। এই ছেলেটির কোনো কোনো ব্যবহারে তিনি এক এক সময় বিরক্ত হয়েছেন বটে, আবার এর সম্পর্কে তাঁর বেশ দুর্বলতাও আছে। এই চপল, চঞ্চল যুবকটি কোনোদিন ধরা-বাঁধা পথে চলেনি। এর অর্থব্যয়ের মধ্যে এমন একটা রাজকীয়তা আছে, যা তিনি আর কোনো বড় মানুষের মধ্যে দেখেন নি। কৃষ্ণদাস পাল তাঁকে বলে এসেছিলেন যে নবীনকুমার বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত ভক্তি করে, তিনি গিয়ে দুটো কথা বললে এই ব্যাধির সময় সে সান্ত্বনা পাবে। কিন্তু তিনি কী কথা বলবেন এই নীরব, অচৈতন্যের সঙ্গে।

তিনি নবীনকুমারের কপালে নিজের দক্ষিণ হস্তটি রাখলেন। উত্তাপ বেশ স্বাভাবিক। বিদ্যাসাগরের মনে হলো, তা হলে চরম আশঙ্কা নেই। তিনি চিকিৎসকদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভালো হয়ে উঠবে, তাই না?

ডাক্তার সূর্যকুমার বললেন, তাই তো আশা করি।

বিদ্যাসাগর বললেন, এ ছেলেটি কোনো কাজ একবার ধরলে অসমাপ্ত রাখে না। মহাভারত যেমন শেষ করেছে, তেমন পরে যে কাজে হাত দিয়েছে, তাও নিশ্চয় শেষ করে যাবে।

ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে আসবার পর গঙ্গানারায়ণ তাঁর পদধূলি নিল। তারপর মৃদুস্বরে বললো, আপনি যদি দয়া করে একবার অন্দর মহলে আসেন···আমার পত্নী একবার আপনাকে প্রণাম করবে।

বিদ্যাসাগর বললেন, বেশ তো!

গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে তিনি গেলেন ভেতরের প্রকোষ্ঠে। গলায় আঁচল দিয়ে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে কুসুমকুমারী তার মাথা বিদ্যাসাগরের পায়ে ছুঁইয়ে প্রণিপাত জানালো। বিদ্যাসাগর অস্ফুটে আশীর্বাদ করলেন হাত তুলে। তারপর কুসুমকুমারী মুখ তোলবার পর সেদিকে চেয়ে তিনি ঈষৎ চমকিত হলেন। কিছু যেন তাঁর মনে পড়ে গেল। তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত বিধবা বিবাহের সবচেয়ে সার্থকতম জুটি এই দু'জন। নবীনকুমারই ছিল এই বিবাহের প্রধান উদ্যোক্তা।

তিনি গঙ্গানারায়ণকে বললেন, তোমাদের দুই ভাইয়ের কাছ থেকে এই দেশ আরও অনেক কিছু আশা করে।

সে গৃহ থেকে নির্গত হয়ে পাল্কিতে ওঠবার পর তিনি উড়ুনির প্রান্ত দিয়ে চক্ষু মুছলেন। কান্না তাঁর এক রোগ। কখন যে কান্না এসে যায়, তার ঠিক নেই।

আরও অনেকেই দেখতে এলো নবীনকুমারকে। দেখা শুধু এক পক্ষের, কারণ নবীনকুমার প্রায় অধিকাংশ সময়ই অজ্ঞান, কখনো জ্ঞান ফিরলেও সে মানুষ চিনতে পারে না। কোনো কথা বলে না। শহরে তাকে নিয়ে গুজবের অন্ত নেই। কেউ বলে, অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য তার যকৃৎ দুম্ ফটাস হয়ে গেছে। কেউ বলে, এক অবিদ্যার বাড়িতে রাত্রি যাপন করতে গেলে এক দুশমন তাকে ছুরি মেরেছে। কেউ বলে, এক পাগল মরণ কামড় দিয়ে তার কলিজার আধখানা খেয়ে ফেলেছে। আবার কেউ বলে, ঋণের অপমান থেকে মুক্তি পাবার জন্য নিজেই বিষ পান করেছে সে।

চতুর্থ দিন কেটে যাবার পর বিকারের ঘোরে নানা কথা বলতে লাগলো নবীনকুমার। কখনো তার চক্ষু মুদিত, কখনো খোলা থাকলেও শূন্য দৃষ্টি। গঙ্গানারায়ণ এবং সরোজিনী খুব কাছ থেকে সেই সব কথা শোনবার চেষ্টা করে। ওরা কেউ কোনো প্রশ্ন করলে নবীনকুমার কোনো উত্তর দেয় না।

এক এক সময় নবীনকুমারের কণ্ঠস্বর খুব স্তিমিত, আবার কখনো বেশ সাবলীল। তার কথাগুলি এই রকম:

···মায়ের গায়ের গন্ধ, আমি যখন নদীর ধারে শ্রাদ্ধ কত্তে বসেচিলুম···আগুনের ধোঁয়ায় আমার চোকে জল, আবার সেই আগুনেই মায়ের গায়ের গন্ধ···ঠিক যেমন ছোটবেলায় বুকের পাশটিতে শুয়ে থাকতুম···আমার সেই বেড়ালটা···

···কৃষ্ণকমল, কৃষ্ণকমল, তুমি ঠিক বলেচিলে, এত সব টাকা কোতা থেকে আসে···আচ্ছা কৃষ্ণ ভায়া, তুমিই কি চন্দ্রনাথ? যাই বলো, আমি তো মন্দির বানাইনি···

···গোলদিঘিতে ফড়িং ধরে বেড়াতুম দুপুরে···আঁক কষতে ভালো লাগে না, এক দুইগুলো যেন ডেঁয়ো পিঁপড়ের মতন তাড়া করে আসে, তবে কি না ইংরিজি, হ্যাঁ, ইংরিজি তো শিকেচি বটেই, রাজার জাত বলে কতা। কিন্তু এমন দেশও আচে, যেখেনে প্রজারাই রাজত্ব চালায়, হ্যাঁ, আচে, সত্যি আচে—·

···সধবার একাদশী···অনেকটা আমার নকশার মতন, সেই পোস্ট অফিসের বাবুটি লিকেচেন, নীলদর্পণ বড় খাসা, কত তেজ, আর এতে শুধুই রগড়···উনি একদিন আমায় দেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, কেন এত রাগ?

···আমার অনেক কাজ, আরও অন্তত তিরিশটা বচ্ছর বাঁচতে হবে, গুপুস্ গুপুস্ করে একপোঁটা তোপ পড়বে, নতুন সেঞ্চুরি আসবে, তখন দেকবে, সাহেবরাও ফরফরিয়ে বাংলা কতা বলচে—

···বাড়ির ছাদে বট-অশথ্ গাছ আপনা-আপনি গজিয়ে ওঠে, এমন তো আপনা আপনি গোলাপ ফুল গাছ গজায় না। এ ভারি অন্যায় ব্যাভার গাচেদের—

···হ্যাঁ, ভুল হয়েছেল, ভুল হয়েছেল, জানি হয়েছেল, সেইজন্যই তো বুকে এমন ব্যথা।

···ওকে আমি পাগল বলে বুঝতে পারিনি, ভেবেচিলুম একজন সাধু-টাধু হবে বোধহয়···তাই কামড়ে দিলে। তুমি কেন আমায় কামড়ে দিলে? আমি তো আর জমিদার নই! সব গ্যাচে! ভালোই হয়েচে। আমার ছেলেপুলেও নেই, জমিদারিও নেই···তা কামড়ে দিয়েচে, দিয়েচে, তা বলে দুলাল, তুই ওকে পিটিয়ে মেরে ফেললি?

···একদিন আমি থাকবো না, তুমি থাকবে না, কেউ থাকবে না, অন্য মানুষ আসবে, পৃথিবীটা অনেক

সুন্দর হয়ে যাবে—

…কে কাঁদে ? সারা রাত রাস্তায় রাস্তায় কে কেঁদে বেড়ায় ? নাকি ও হাওয়ার শব্দ ? হাওয়াও কাঁদে তা হলে ?

…সরোজ, আমি তোমায় কোনো সন্তান দিইনি। আমার মতন মানুষের বংশধর থাকতে নেই, জানো না ? সরোজ, আমি মলে বিদ্যেসাগরমশাই তোমার আবার বে দেবেন। তখন তুমি সুখী হবে।

এই বাক্যটি শুনে সরোজিনী ডাক ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। নবীনকুমারের কথা তবু থামে না। সে নানারকম কথা বলেই চলে, তাকে যেন কথায় পেয়ে বসেছে।

পঞ্চম দিনে সে হঠাৎ আবার চুপ করে গেল। তার চক্ষু দুটি খোলা। কোনো পথ্য তো সে এ-কদিন গ্রহণ করেই নি, ঝিনুকে করে ওষুধ খাওয়াতে গেলেও তা কষ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। নবীনকুমারের ডান হাতখানি তার বুকের ক্ষতস্থানের ওপর রাখা।

সরোজিনী সব সময় কাঁদাকাটি করে চোখ মুখ ফুলিয়ে থাকে, ওষুধ খাওয়াতে গেলে তার নিজেরই হাত কাঁপে। তাই কুসুমকুমারী গেল নবীনকুমারের মুখে ওষুধ দিতে।

তখন অপরাহ্ন কাল, সূর্য ঢলে এসেছে, সারা আকাশ ছায়া-মেদুর। নবীনকুমারের কক্ষের জানালাগুলি খোলা, সেখান দিয়ে আসছে তাপহীন, কোমল বাতাস।

নবীনকুমার চোখ চেয়ে আছে দেখে কুসুমকুমারী বললো, ঠাকুরপো, একটু ওষুধ দি ?

নবীনকুমার দেখলো, তার সামনে রাত্রিবেলার গন্ধরাজ পুষ্পের মতন একটি মুখ, দুটি নীল রঙের চক্ষু, নদীতটের মতন কপাল, ভ্রমরকৃষ্ণ, কুঞ্চিত চুল। সেই দৃষ্টিতে যেন আলো…

নবীনকুমার নিজের মুখটা ফিরিয়ে নিল এক পাশে। বুক ভর্তি নিশ্বাস টেনে সে খুব আস্তে আস্তে বললো, ব-ন-জ্যোৎ-স্না !

তারপর তার ঘাড় ঢলে গেল।

এ এক অদ্ভুত আলোক, ঊষা কিংবা গোধূলি, ঠিক বোঝা যায় না। ছায়া ছায়া, হিম, পট পরিবর্তনের সামান্য চঞ্চলতা মাখা। দীর্ঘ ঘুম অকস্মাৎ ভাঙলে যেমন হয়, সব কিছুই অচেনা লাগে, বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নিজের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের অবস্থানটা ঠিক ঠাহর হয় না। ঈষৎ শীতের আমেজে গায়ে লেপটে থাকে একাকিত্বের আলোয়ান, মনে হয় আর কেউ নেই, অথবা আত্মীয় বন্ধু শুভার্থীরা অন্য কোথাও এক স্থানে জড়ো হয়ে ডাকছে, এসো, এসো…শুধু একজনেরই সেখানে পৌঁছোতে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সেই রকম আলো আজ ছড়িয়ে আছে নগরীতে।

প্রকৃতি চলে নিজের নিয়মে, তেমনই এই জীবন। দ্বিপ্রহরে কালো মেঘ কিংবা কাক-জ্যোৎস্নায় প্রকৃত আলো-অন্ধকারের রূপের কোনো হেরফের হয় না। অপরাহ্নের পর ঠিকই সন্ধ্যা নামে।

রাত্রির প্রথম প্রহরে সকলেই জেগে থাকে। সদ্য অন্ধকার হওয়া রাজপথ মাঝে মাঝে জুড়িগাড়ির সহিসের তল্পিদারের হাতের মশালের আলোয় ঝলসে ওঠে। কোনো কোনো বৃহৎ অট্টালিকার ঝাড়লণ্ঠনের বিচ্ছুরিত আভা এসে বাইরে পড়ে। পগারের পাশ দিয়ে সাবধানে কোঁচা সামলিয়ে বাড়ি ফিরছেন হৌসের বাবুরা। অবস্থাপন্ন বাবুরা তখন বাড়ি থেকে নির্গত হচ্ছেন ফেটিং, সেলফ ড্রাইভিং, বগি বা ব্রাউহামে, ফ্রেণ্ড ও মোসাহেবদের সঙ্গে নিয়ে হাওয়া খেতে।

বেলফুলওয়ালা তার ধামায় গুছিয়ে রাখছে তার সন্ধের সওদা। দিন-আনি দিন-খাইরা মুদি দোকানে চাল কেনবার জন্য ভিড় জমিয়েছে।

শোনা যাচ্ছে শঙ্খের ফুঁ, কাসর ও ঘণ্টার আওয়াজ। পূজিত হচ্ছেন বড় বড় অট্টালিকাগুলির গৃহদেবতা এবং বিভিন্ন হরিসভা, কীর্তন সভা ও মন্দিরের দেবদেবীগণ। ব্রাহ্ম সমাজগুলির কয়েকটিতে উপাসকেরা জড়ের মতন নিস্তব্ধ—একমাত্র তাদের আচার্যরা অনর্গল সরব। অন্য কোথাও সদ্য প্রবর্তিত ভক্তিরস, নাচ-গান ও কীর্তনে ভক্তেরা প্রায় উন্মাদ, কেশবচন্দ্র সেনকে অনেকে স্বয়ং

চৈতন্যজ্ঞানে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে।

মসজিদে মসজিদে শেষ নামাজের পর মুসলমানদের পৃথক পৃথক জটলা, তাদের ভুরুর নিচে প্রগাঢ় ছায়া, বক্ষে আহত অভিমান। নতুন রাজশক্তির সঙ্গে হিন্দুদের কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষিতে এত দিন পর্যন্ত তাদের চক্ষে ছিল বিদ্রূপচ্ছটা, এখন দুশ্চিন্তা। লুপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য অনেকের হৃদয় ফুঁসছে, কেউ কেউ গা ভাসিয়ে দিচ্ছে হিন্দুদের সঙ্গে, কেউ কেউ এতদিন পর মনে করছে, এবার সন্তানদের মাদ্রাসা থেকে ছাড়িয়ে ইংরেজি শেখার ইস্কুলে আর ভর্তি না করালেই নয়।

গীর্জাগুলির শান্ত গম্ভীর পরিবেশে চলেছে সুমহান গান। কৃষ্ণাঙ্গ ধর্মান্তরিতরা এই স্বপ্নে মশগুল যে, এখন তারাও বুঝি রাজার জাতের সমান। হঠাৎ বিদেশী শিক্ষার আলোয় চক্ষু ধাঁধিয়ে যাওয়া যুবক, পথভ্রষ্টা কিংবা নির্যাতিতা রমণী এবং শত শত অনাহারক্লিষ্ট মানুষ শরণ নিচ্ছে করুণাময় প্রভু যীশুর। রোমান ক্যাথলিক, প্রটেস্টাণ্ট এবং অন্যান্য ডিনোমিনেশানের চার্চের প্রতিনিধিদের মধ্যেও শুরু হয়েছে সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতা, কে কত বেশী অজ্ঞ ভারতীয়কে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসবে।

সাহেবপাড়ার আদালিরা দ্বিতলের খোলা বারান্দায় ছোট বেতের টেবিলের ওপর সযত্নে সাজিয়ে রাখছে শেরি, শ্যাম্পেন, ব্র্যাণ্ডির বোতল এবং নানাবিধ ক্রকারি। গড়ের ময়দানে রাইডিং সেরে এসে তাদের মনিব শ্রান্তি মোচনের জন্য চোটা পেগ-এর হুকুম দেবেন। মেম বিবিরা শয়নকক্ষের দেয়ালে সাঁটা বিশাল বেলজিয়াম দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন সারবার আগে প্রায় মুক্ত-বসনা হয়ে শরীরের ঘামাচিগুলি মেরে নিচ্ছে। ভ্যাপসা গরমের দেশে এই এক জ্বালা।

উচ্চবর্ণের রাজপুরুষগণ সপ্তাহান্ত ব্যারাকপুরের প্যালেসে কাটাবার উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সেখানে ভাইসরয়ের পার্শ্বচর হয়ে মধ্যরাত্রে শৃগাল শিকার উৎসবে অংশ নিতে হবে।

সিমলে, হাটখোলা, আহিরীটোলা, বাগবাজারের বনেদী বাবুরা প্রকাণ্ড দিবানিদ্রা থেকে উঠে বিশ্রাম করে নিচ্ছেন একটু। নব্য বাবুদের বাড়ির ভিতর মহলে ঠাকুরঘরে শুরু হয়েছে সন্ধ্যারতি, মাইনে করা পূজুরি বামুন এসে নারায়ণ শিলার গায়ে গাঁদা ফুলের ঠোক্কর মেরে দ্রুত কাজ সারছে। আর বার-মহলে নব্যবাবু তাঁর সতীর্থদের নিয়ে নানা উচ্চাঙ্গের বিষয় ডিসকাশন করছেন।

সেই রকম এক আলোচনার নমুনা :

এক নব্যবাবু জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের মন্থর সন্ধ্যা ও পথের ধারে পুকুরের জলে গাছগুলির অপসৃয়মান রক্তিম ছায়া দেখে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে বললেন, কী বিউটিফুল সীনারি! এ যেন কাণ্টস্টেবল-এর আঁকা ওয়াটার কলারের এক ছবি!

তাঁর এক সুহৃদ্ প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, ওহে, কী বল্লে? কী বল্লে? ও নাম অমনভাবে প্রনানসিয়েট কত্তে নেই।

—কোন্ নাম?

—ঐ যে আর্টিস্টের নামটি বললে। ও নামের প্রথম সিলেব্‌লটি যে রুচি-দুষ্ট, অশ্লীল!

প্রথম বাবুটি প্রথমে একটু দমে গেলেও ইংরেজি জ্ঞানে তাঁর কোনো বন্ধুর কাছে হেরে যাবার পাত্র নন। তিনি হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, ও, তুমি কাণ্টস্টেব্‌ল-এর বদলে সেই থিংসটেবলের ব্যাপার বলচো? এ যে দেখি সাক্ষাৎ মিসেস গ্র্যাণ্ডি! জানো, শেক্সপীয়ার ঐ অবসীন শব্দটি কীভাবে ম্যানেজ করেছিলেন? টুয়েলফথ্ নাইটে আচে, 'বাই মাই লাইফ, দিস ইজ মাই লেডীজ হ্যাণ্ড! দিজ্ বী হার সিজ (বড় হাতের সি, বুঝলে?) হার ইউজ, (এটাও ক্যাপিটাল) অ্যাণ্ড হার টিজ (টি ক্যাপিটাল, আর ঐ অ্যাণ্ড-এর মধ্যে এন আছে)...তা হলে কী হলো?

—আরে ছি, ছি, ছি, ছি। ওটাই তোমার মনে পড়লো? শেক্সপীয়রই কি ঐ শব্দটির বদলে 'ডিয়ারেস্ট বডিলি পার্ট' কিংবা 'পিকিউলিয়ার রিভার' ব্যবহার করেননি?

—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! ডিয়ারেস্ট বডিলি পার্ট...পিকিউলিয়র রীভর...কী চমৎকার লাইভ্লি ডেসক্রিপশান! এও তো ছবি!

এইভাবে আলোচনা আরও উচ্চ থেকে উচ্চতর দিকে চললো। বাবুদ্বয় ইংরেজি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাতে লাগলেন। এবং মস্তিষ্ককে চাঙ্গা করবার জন্য খোলা হলো ব্র্যাণ্ডির বোতল।

শহর গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে শহরতলী। সাবেকী আমলে যেখানে ছিল ব্যবসায়ী থেকে রূপান্তরিত নগরবাসী জমিদারদের বাগানবাড়ি, এখন সে সব স্থান আর তেমন নিরালা নেই, ব্যাঙের ছাতার মতন গজিয়ে উঠছে ছোট ছোট বাড়ি, গ্রাম থেকে আসা এক পুরুষের চাকুরিজীবীরা সেখানে স্থায়ী আস্তানা গেড়ে বসছে। তাদের চাহিদা অনুযায়ী আসছে রজক, পরামানিক, তন্তুবায় প্রভৃতি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে ক্ষুদ্র কৃষকেরা জমি থেকে উৎখাত হয়ে পরিণত হচ্ছে ভূমিহীন দাসে, দিন মজুরির আশায় তারাও শহরে আসছে স্রোতের মতন। শুধু বাংলা নয়, উড়িষ্যা, বিহার, এমনকি সুদূর উত্তরপ্রদেশ থেকে।

শহরতলীর বাইরে গ্রাম। রোদ্দুর মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি নিস্তেজ। শত সহস্র যোজনব্যাপী সেই অন্ধকার নিস্তব্ধতা।

শহর আছে, শহরতলী আছে, গঞ্জ, গ্রাম আছে, কিন্তু দেশ নেই। কাবুল-কান্দাহার থেকে কন্যাকুমারিকা, বর্মা দেশ থেকে দ্বারকা পর্যন্ত ইংরেজ বেঁধে রেখেছে শাসন শৃঙ্খলে, কিন্তু এটা কার দেশ ? সিসিলি দ্বীপের এক উগ্র চরিত্রের পুরুষের সঙ্গে প্যারিস শহরের এক সুশিক্ষিত, নম্র, রুচিবান নাগরিকের যতখানি অমিল, একজন আফ্রিদি, বেলুচিস্থানের পাঠানের সঙ্গে আসামের কোনো ভদ্র বৈষ্ণব গৃহস্থের অমিল তার চেয়ে ঢের গুণ বেশী। এরা কেউ কারুকে চেনে না তবু এরা এক দেশের নাগরিক হিসেবে পরিচিত। এই অলীক দেশের অবস্থান নেই কারুর মনে। তবু কেউ দেশ খোঁজে মহাভারতের পৃষ্ঠায়, কেউ মুঘল ইতিহাসে, কেউ বা সার্ভে অফিসের মানচিত্রে।

এই বিপুলাকার ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে রয়েছে কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ। সেই সব দ্বীপে রাত্রির প্রদীপ জ্বালিয়ে এক একজন চিন্তা করে যাচ্ছে ধর্ম সংস্কারের, শিক্ষা বিস্তারের, নারী-মুক্তির, নিজস্ব সংস্কৃতির জাগরণের, রাজা-প্রজা সম্পর্কের উন্নতির, দারিদ্র্য নিবারণের কিংবা চরিত্র পরিশুদ্ধির। স্বাধীন দেশের নাগরিক হবার অতি গোপন স্বপ্নও ঝলসে উঠছে কারুর কারুর চক্ষে। অবশ্য সেই সব আলো তাদের নিজ গৃহের আঙিনা ছাড়িয়ে আর বেশী দূর যেতে পারে না। তবু কয়েকটি প্রদীপ জ্বলছে।

প্রদীপের চেয়েও শহরে উৎসবের আলোর রোশনাই চক্ষু ধাঁধিয়ে দেয়। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর ভোগীদের জন্য নির্দিষ্ট, এখন চলেছে তাদের তাণ্ডব।

রানী এলিজাবেথ জলদস্যু দলপতিদের নাইট উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, কারণ তারা এনেছিল ইংলণ্ডের জন্য ধন-সম্পদ। বর্তমান মহারানী ভিকটোরিয়া আগে থেকেই লর্ড বা ব্যারণ উপাধি দিয়ে নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরণ করছেন এই ভারতভূমিতে ; যাদের কাজ আরও অনেক বেশী ব্যাপক, লুণ্ঠন কার্যের সভ্য মার্জিত রূপ দেওয়া। এই মুহূর্তে ব্যারাকপুরের সুরম্য কাননের মধ্যে নয়নবিমোহন বৃটিশ-পসন্দ্ প্রাসাদের ভোজকক্ষে বড় লাট লর্ড মেয়ো সপারিষদ পানাহারে ব্যস্ত। টেবিলে সামান্য আদব-কায়দার ত্রুটি হলে তিনি বিরক্ত হন। তাঁর পোশাকে, চলনে-বলনে সূক্ষ্ম রুচি ও আভিজাত্যের পরাকাষ্ঠা, তাঁর সুন্দর মুখশ্রী দেখে কে বলবে যে তিনি আসলে একটি সুশিক্ষিত দস্যু দলের সর্দার হয়ে এখানে বিরাজ করছেন ! তাঁর স্বজাতীয় ইতিহাস লেখকরাই আবার নাদির শা, তৈমুর লংকে দস্যু আখ্যা দিয়ে হীন করেছে, যদিও মহারানীর প্রতিনিধিদের তুলনায় নাদির, তৈমুর নিতান্তই শিশু !

লুণ্ঠনের সময় স্থানীয় কয়েক জনের সাহায্য পেলে কিছুটা সুবিধে হয়। তারাও লুণ্ঠিত সম্পদের ছিটেফোঁটা ভাগ পায়। সেই ছিঁটেফোঁটার ভাগীদাররাই এখন দেশীয় সমাজের শিরোমণি ধনী। ঐশ্বর্যের আকস্মিকতায় বিহ্বল ভাবটা তাদের এখনো কাটছে না। অর্থ ব্যয়ের জন্য তাদের স্মৃতিতে আছে নবাবী আমলের বিলাস। সুতরাং তারই অনুকরণের চেষ্টা চলছে প্রাণপণে। এ রমণী ভোগ শুধু রতি সুখের জন্য নয়, এ সুরাপান নয় ইন্দ্রিয়ে আগুন জ্বালাবার জন্য, এ সব কিছুই অপরের চক্ষু ঝলসে দেবার উদ্দেশ্যে। তাই এত বেশী বেশী। এত ক্লেদাক্ত, এত অপৌরুষেয়। নেটিভপাড়ার ঝাড়বাতির আলো ঝলমল বাড়িগুলিতে এখন চলছে বিলাসের নামে নতুন ক্লীব ধনীদের দাপাদাপি। আসলে তারা দুঃখী। তারা মনে মনে জানে, তারা চোর কিংবা ছিঁচকে তস্কর, কোনোক্রমেই তারা শ্বেতাঙ্গ দস্যুদের সমকক্ষ হতে পারবে না। বালক যেমন বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তলোয়ার বানিয়ে মনে মনে সেনাপতি সেজে দারুণ বিক্রমে দু' পাশের ভেরেণ্ডা গাছ নিধন করে সেই রকমই এই সব উটকো বড় মানুষরা নিজেদের বিবেক খোওয়া গেছে বলে পয়সা ছড়িয়ে যত পারে অন্য মানুষের বিবেক চূর্ণ করে যাচ্ছে। ব্যতিক্রম দু-চার জন মাত্র।

মধ্যরাত্রির রাজপথে হঠাৎ হঠাৎ শোনা যায় অনেক মানুষের কোলাহল ও হাসির গর্‌রা। বাঘের

পশ্চাতে ফেউ-এর মতন কোনো নেশাখোর বড় মানুষের সঙ্গে চলেছে গাদাগুচ্ছের দালাল ও ফড়ে। এ দৃশ্য দেখলেই বোঝা যায়, আবার বাঙালদেশ থেকে কোনো উট্‌কো জমিদার শহরে এসে পয়সা ছড়াচ্ছে। পূর্ব বাংলার কোনো ধনী এলে শহুরে ফন্দীবাজদের মধ্যে বড় ধূম পড়ে যায়। এদের দু'চারটি উৎকট বাতিক সহ্য করতে হয় বটে কিন্তু এদের চিবিয়ে, চুষে, নিঙড়িয়ে সর্বস্বান্ত করতে বেশী দেরি লাগে না।

রাত্রির পর ভোর আসে। প্রতিটি ভোরই প্রতীক্ষার, মনে হয় নতুন কিছু ঘটবে।

নবীনকুমার বিভ্রান্তিকর আলোর স্বরূপ চিনে যেতে পারলো না। জীবনের শেষ কথাটি উচ্চারণ করে অপরাহ্ণে তার চৈতন্য বিলুপ্ত হয়েছিল, তার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল পরদিন প্রত্যূষে। তার সৌন্দর্য-পিপাসু মন পূর্ণ যৌবনে এসে একটা বাঁক নিয়েছিল, অকস্মাৎ তাকে চলে যেতে হলো।

বেলা এখন দশটা। সারা বাড়ি সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। সম্মিলিত কান্নার ধ্বনি থেমে গেছে কিছুক্ষণ আগে, এখন যেন কারুর চলাফেরারও কোনো শব্দ নেই। সব কটি ঘরের দরজা এবং সিংহদ্বার হাট করে খোলা। শোকের বাড়ি দেখলেই চেনা যায়।

সরোজিনী অজ্ঞান হয়ে আছে, তার মাথাটি কোলে নিয়ে পাষাণ মূর্তির মতন বসে আছে কুসুমকুমারী। তার দৃষ্টি একেবারে স্থির। পা টিপে টিপে অন্য স্ত্রীলোকেরা এসে উঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছে সেখানে। কেউ কেউ ফিসফিসিয়ে কথা বলছে। কিন্তু কুসুমকুমারী'র যেন বাহ্যজ্ঞান নেই। তার কানের কাছে দামামা ধ্বনির মতন বাজছে একটি নাম, এটা যে তারই অপর একটি নাম তাও ঠিক বলা যায় না, কারণ, এই নাম ধরে তো কেউ কোনোদিন তাকে ডাকেনি! তার পুতুল খেলার সঙ্গী, ভাগ্যচক্রে যে একদিন তার দেবর হয়েছিল, সে কি মৃত্যুকালে তাঁকে ঐ নাম ধরে ডাকলো, না নামটা শুধু মনে করিয়ে দিল? এ নামের যে কী সার্থকতা, তা তো কুসুমকুমারী জানে না। তার জীবনেরই বা কী সার্থকতা? এই প্রশ্ন কিছুদিন ধরেই কুসুমকুমারীর চিন্তায় ঘুরে ঘুরে আসছে। মানুষ বেঁচে থাকে কোন্ প্রত্যাশায়? তার জীবনটার বদলে কি নবীনকুমার বেঁচে থাকতে পারতো না? কাল সারা রাত কুসুমকুমারী ঈশ্বরের কাছে সেই প্রার্থনাই করেছে ব্যাকুলভাবে, হে ঠাকুর, আমার জীবনের কোনো মূল্য নেই, আমার জীবনের বিনিময়ে ওঁকে বাঁচিয়ে তোলো! হে ত্রিলোকেশ্বর, হে বিপন্নপালক, হে করুণাময়। আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনটা নিয়ে আপনি ওঁকে পৃথিবীতে রাখুন। উনি অনেক মানুষকে দেখবেন, আমি কাকে দেখবো?

কুসুমকুমারীর চক্ষু এখন শুষ্ক, কিন্তু যতক্ষণ অচেতন নবীনকুমারের বক্ষে প্রাণের ক্ষীণ স্পন্দনটুকু ছিল, সে তার সব অশ্রু ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেছে। কিন্তু তিনি বধির ও দৃষ্টিহীন, অথবা সামান্য কোনো নারীর অশ্রুর কোনো মূল্য নেই তাঁর কাছে।

সিংহদ্বারের কাছে এবার খানিকটা গুঞ্জন শোনা গেল, কয়েক জন ছুটে গেল সেদিকে। কুসুমকুমারী একই রকম অনড়ভাবে বসে রইলো।

বাইরে পাল্কী থেকে নামলেন বিধুশেখর। এখন তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না, তাঁর নাতি প্রাণগোপাল সঙ্গে এসেছে, তিনি তার স্কন্ধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে দেখলেন সিংহসদনের দিকে।

বিম্ববতীর গৃহত্যাগের পর তিনি আর এ গৃহে আসেন নি। অনেক বছর হয়ে গেল। এক সময় এখানে প্রতিদিন না এলে তাঁর চলতো না। বিম্ববতী চলে যাবার পর থেকেই বিধুশেখরের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। এই শতাব্দীর ঠিক প্রথম বছরে তাঁর জন্ম। এমন কী-ই বা বয়েস হয়েছে তাঁর, শতাব্দী শেষ হতে এখনো অন্তত তিরিশ বছর বাকি। হয়তো সেই পর্যন্ত এমন পঙ্গু অবস্থাতেই বিধুশেখর বেঁচে থাকবেন।

সমগ্র প্রাসাদটির ওপর বিধুশেখর তাঁর এক চক্ষুর দৃষ্টি বোলালেন। এতদিন পরে এলেও এখনো এ-বাড়ি তাঁর নিজের বাড়ি বলে মনে হয়। এ বাড়ির মানুষদের নিয়তিও তাঁর করায়ত্ত ছিল, তিনি ইচ্ছে করলে এই অট্টালিকা ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারতেন যে-কোনো দিন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিধুশেখর বললেন, চল্।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে এখন তাঁর শরীরের সব কটি হাড়ের জোড়ে অসম্ভব যন্ত্রণা হয়। মুখবিকৃতি না করেও কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠেই তিনি হাঁপাতে লাগলেন।

গঙ্গানারায়ণ ছুটে এসে অন্য দিক থেকে তাঁকে ধরতে আসতেই তিনি হাত তুলে বললেন, থাক, থাক, আমি নিজেই পারবো।

বিধুশেখর এখনও গঙ্গানারায়ণের স্পর্শ বাঁচিয়ে থাকতে চান। বরাবরই তিনি যত দূর সম্ভব অন্যের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলেন। তাঁর নাতি প্রাণগোপাল এখন বেশ বলিষ্ঠকায় কিশোর। সেও একলা দাদুকে টেনে তুলতে পারছে না

বিধুশেখর আবার দু'ধাপ উঠলেন। হাঁপরের মতন ওঠা-নামা করতে লাগলো তাঁর বুকের পাঁজরা।

গঙ্গানারায়ণ বললো, এক কাজ কল্লে তো হয়, আপনি একটা চেয়ারে বসুন, তারপর ক'জনে সেই চেয়ারসুদ্ধু আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে।

এ প্রস্তাবে আপত্তি না জানিয়ে বিধুশেখর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গঙ্গানারায়ণ নিজে ছুটে ওপরে গিয়ে তার পিতার লাল রেশমি গদি মোড়া মেহগনি কাঠের কেদারাটি নিয়ে এলো। বিধুশেখরকে সেটাতে বসিয়ে তিন-চারজন মিলে ধরাধরি করে নিয়ে এলো নবীনকুমারের ঘরে।

ধপধপে সাদা চাদরে গলা পর্যন্ত ঢাকা, হাত দুটি বক্ষের ওপরে আড়াআড়ি, নিমিলিত-চক্ষু নবীনকুমারকে দেখলে মনে হয়, কেউ নাম ধরে জোরে ডাকলেই সে জেগে উঠবে।

কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিধুশেখর চলে এলেন নবীনকুমারের শিয়রের কাছে। তারপর তাঁর ঠোঁট দুটি নড়তে লাগলো। যেন তিনি কোনো কথা বলছেন, কিন্তু কণ্ঠ দিয়ে কোনো স্বর বেরুচ্ছে না।

ঘরে বহু লোক এসে ভিড় করেছে। বিধুশেখরকে সমীহ মিশ্রিত ভয় করে না এমন কেউ নেই। সেই জন্য কেউ কোনো শব্দ করছে না এবং সকলেই চেয়ে আছে বিধুশেখরের দিকে।

একবার মুখ ঘুরিয়ে খানিকটা উদ্‌ভ্রান্তের মতন বিধুশেখর মানুষগুলিকে দেখলেন। তাঁর মুখে শোক-তাপের কোনো ছাপ নেই। তিনি যেন কাকে খুঁজছেন! তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? এ কি সত্যিই আমাদের সেই ছোট্‌কু?

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর হয় না, তাই সকলেই নীরব রইলো। পিছন দিকে ফুঁপিয়ে উঠলো ক'জন। শোকের বাড়িতে সকলেই যে শোকে কাঁদে তা নয়। কাঁদতে হয় বলেও অনেকে কাঁদে।

—ছোট্‌কুর এমন কঠিন ব্যামো হয়েছে, আমায় কেউ কোনো খবর দেয়নি কেন?

এ প্রশ্নেরও কোনো উত্তর হয় না। শয্যাশায়ী, রুগ্ন বিধুশেখরকে আগে খবর দিলে সুরাহা তো কিছু হতো না, বরং তাঁকেই অকারণে উদ্বিগ্ন করা হতো।

নাতির দিকে ফিরে বিধুশেখর বললেন, গোপাল, ছোট্‌কুকে যে আমি তোর মতন বয়েসী দেকেচিলুম, বড় দুরন্ত, বড় তেজী। কিন্তু কী মেধা! তারপর কবে সে এত বড়টি হলো, কিচুই তো মনে পড়চে না! আমায় কিচু না জানিয়ে ও চলে গেল? অ্যাঁ?

প্রাণগোপাল বললো, দাদু, আপনি অন্য কোনো ঘরে বসবেন চলুন।

বিধুশেখর শুষ্ক স্বরে বললেন, হ্যাঁ, তাই চ। আমি আর এখেনে থেকে কী করবো।

বৃদ্ধ দিবাকর এসে বললো, বড়বাবু, বলচিলুম কি···।

দিবাকর বুঝেছে যে বিধুশেখর যখন এসে পড়েছেন, তখন পরবর্তী কার্যকলাপগুলি সম্পর্কে তাঁর মতামত নিয়েই ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে তিনি ক্রুদ্ধ হবেন।

দিবাকর আবার বললো, বলচিলুম কী, বাইরে আরও লোকজন এসেচে, এখুন অনেক লোক আসবে। তাই জন্য খাটখানা ধরে নিচে নিয়ে রাকলে হয় না?

বিধুশেখর বললেন, তা ঠিক। অনেক লোক আসবে, শহর ভেঙে পড়বে। ছোটকু কত লোককে বিনিপয়সায় মহাভারত দিয়েচে। কত মানুষের সাহায্য করেচে···

প্রাণগোপাল আবার বললো, দাদু, আপনি অন্য ঘরে চলুন, সেখেনে বসে কতা বলবেন—

বিধুশেখর আর একবার মুখ ফিরিয়ে ভূতপূর্ব নবীনকুমারকে দেখলেন।

তারপর একেবারেই অকস্মাৎ প্রাণগোপালকে ছেড়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন নবীনকুমারের শবের ওপর। নদীর বাঁধ ভাঙা বন্যার মতন তীব্র হাহাকারে কান্নায় তিনি বলতে লাগলেন, ছোটকু, ছোটকু, তুই চলে গেলি! ওরে, আমার মুখাগ্নি কে করবে? ছোটকু···ছোটকু···ওরে, তুই যে আমার সব···আমাদের কত পুণ্যের ফলে তুই আমাদের ঘরে এসিছিলি···ছোটকু, ছোটকু। তুই তোর মায়ের কাচে যাচ্চিস···আমাকে ফেলে গেলি···।

এই সুদীর্ঘ জীবনে বিধুশেখর কম মৃত্যু দেখেন নি। সবাই বলে, ওঁর বুকখানা পাথর দিয়ে গড়া।

তাঁর চোখের সামনে তার স্ত্রী ও কন্যারা শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে, তাঁর ঘনিষ্ঠতম সুহৃদ রামকমল সিংহ শেষ চক্ষু বুঁজেছেন তাঁরই কোলে মাথা রেখে, তবু কখনো তিনি স্থৈর্য হারান নি। সেই বিধুশেখরকে এমনভাবে ভেঙে পড়তে কেউ কোনোদিন দেখেনি। সারা বাড়ি থেকে লোক ছুটে এলো এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখবার জন্য।

নবীনকুমারের মুখখানি চেপে ধরে প্রবল কান্নার সঙ্গে বিধুশেখর ঐ কথাগুলিই বলে চলেছেন। তাঁকে টেনে তোলা যায় না।

শেষ পর্যন্ত জোর করেই তাঁকে তুলে আনতে হলো। কারণ পোস্তার রাজার এক ভাই ও রানী রাসমণির জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাস নবীনকুমারকে শেষ দেখার জন্য এসেছেন। আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি অপেক্ষা করছেন নিচে।

বিধুশেখরকে এনে শুইয়ে দেওয়া হলো অন্য একটি কক্ষে। তিনি কিছুতেই বাড়ি যাবেন না। এখানে সব শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকবেন। তিনি বালকের মতন অবোধ হয়ে পড়েছেন। মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলছেন, না, না, না, তোরা আমায় যেতে বলিস না।

বার বার তিনি উঠে নবীনকুমারের কাছে যেতে চান। তাঁকে ধরে বসে রইলো প্রাণগোপাল।

সেই অবস্থায় বিধুশেখর রইলেন মধ্য দুপুর পর্যন্ত। তখন শোনা গেল এবার মৃতদেহ বাড়ির বার করা হবে। পুরোহিতগণ সেই রকমই নির্দেশ দিয়েছেন। সে কথা শুনে বিধুশেখর বললেন, তিনি আবার দেখতে যাবেন ছোটকুকে।

শয্যায় উঠে বসে তিনি এক হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে অশ্রু মার্জনা করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে তাঁর মুখখানি বদলে যেতে লাগলো। তাঁর সুস্থ চক্ষুটিতে ঝিলিক দিল পুরোনো কালের ব্যক্তিত্ব। একটু সামলে নেবার পর তিনি কঠোর গলায় বললেন, শুধু তাই নয়, আমি শ্মশানেও যাবো। ছোটকু অপুত্রক অবস্থায় মরেচে, আমি তার মুখাগ্নি কর্বো। গোপাল, তুই গিয়ে গঙ্গাকে বল—।

গঙ্গানারায়ণের এখন কান্নাকাটি করার অবকাশ নেই। সব কিছুর বন্দোবস্ত করার জন্য তার দিশেহারার মতন অবস্থা। অবশ্য দ্বিপ্রহরের পর তার বন্ধুদের মধ্যে গৌরদাস, রাজনারায়ণ ও বেণী এসে পড়েছেন। তাঁরা পরামর্শ দিতে লাগলেন।

একটি নতুন পালঙ্ক, নতুন গদি-বালিশ-চাদর ও ফুলমালা দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে শেষ শয্যা। নবীনকুমারকে সাজানো হয়েছে বর-বেশে, এখনো তাব মুখখানি তাজা। কয়েকজন মিলে যখন ধরাধরি করে নবীনকুমারের শরীরটি তুলছে, তখন প্রাণগোপাল সেখানে দাঁড়িয়ে।

প্রাণগোপাল এখন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করে, অতিশয় মেধাবী ছাত্র। এই বয়েসেই সে রুশো-ভলতেয়ারের রচনা পড়ে ফেলেছে এবং কোঁৎ-এর পজিটিভিজমের তুলনায় সে রুশোর সাম্যতত্ত্ব বেশী পছন্দ করে। নবীনকুমার অনুবাদিত মহাভারতও সে পড়েছে। নবীনকুমারকে সে ছোট মামা বলে ডাকতো। কিন্তু নবীনকুমারের সঙ্গে তার ঠিক ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়নি। দূর থেকেই সে নবীনকুমারের প্রতি ভক্তিমিশ্রিত অনুরাগ পোষণ করেছে।

প্রাণগোপাল দেখলো, নবীনকুমারকে তোলার পর তার প্রাক্তন শয্যা থেকে একটি কাগজ উড়ে গিয়ে নিচে পড়ল। কাগজটি নবীনকুমারের শরীরের তলায় চাপা পড়ে ছিল। তাতে অনেক কিছু লেখা। তার ওপর ছিটে ছিটে রক্ত লাগা। তবু, কৈশোরের কৌতূহলে সে তুলে নিল কাগজটি।

কিন্তু তখনই কাগজটির লেখাগুলি পাঠ করার সুযোগ সে পেল না। সেই মুহূর্তে একটি গোলযোগ ঘটলো।

আলুথালু পোশাকের একটি লোক ছুটে এসে দু' হাত তুলে নৃত্য করতে লাগলো ঘরের মধ্যে। নবীনকুমারের দেহের প্রতি ঝুঁকে পড়ে সে বলতে লাগলো, ওহে নবীন, ভুল, ভুল ! তুমি যা বলোচো, তাও ভুল ! দেবেন্দ্রবাবু, কেশববাবুও ভুল বলেচেন। ভগবান নেই! বুঝলে, নেই, নেই ! শালা খিদেই হচ্ছে ভগবান। খিদের চেয়ে আর বড় কিছু নেই !

চেহারা আর ভাবভঙ্গি দেখে অন্যদের চিনতে পারার কথা নয় যে এই লোকটিই যদুপতি গাঙ্গুলী। অনাহার ও অপমানের জ্বালায় কিছুদিন আগে তার এক ভাগিনেয় আত্মঘাতী হয়েছে। সেই থেকেই যদুপতির মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে একটু একটু।

যদুপতিকে ঠেলে সরিয়ে দেবার পর একজন মন্তব্য করলো, একটা আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানো, এরকম কোনো বিশিষ্ট মানুষের মৃত্যু হলেই দু'-চারজন লোক পাগ্‌লা হয়ে যায়। এরকম আমি অনেকবার দেকিচি।

শবযাত্রা শুরু হবার পর বিধুশেখর সত্যিই জেদ ধরে গেলেন শ্মশানে। তাঁকে তোলা হলো একটি পাল্কীতে। প্রাণগোপাল আর গেল না। এ বাড়ির অন্দরমহলে সে খুবই কম এসেছে, এখন ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো।

কুসুমকুমারীর কোল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সরোজিনীকে। কুসুমকুমারী তবু সেইরকম জোড়াসানে বসে আছে একই জায়গায়। কয়েকজন স্ত্রীলোক তাকে নানা কথা বলে তোলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কুসুমকুমারী নিশ্চুপ। দ্বারের পাশে দাঁড়িয়ে প্রাণগোপাল কুমকুমারীকে একটুক্ষণ দেখলো, তার মনে হলো, ইনিই কি সদ্য বিধবা হয়েছেন ?

শ্মশানের কাজ শেষ হলো অনেক রাত্রে। নিজের কক্ষে এসে শুতে যাবার আগে সেজবাতিটি নেভাতে গিয়ে প্রাণগোপালের মনে পড়লো সেই কাগজটির কথা। সে কামিজের পকেট থেকে কাগজটি এনে মেলে ধরলো আলোর সামনে।

কাগজটিতে নবীনকুমারেরই হস্তাক্ষর, তবে খুবই কাঁপা কাঁপা। অসুস্থ অবস্থায় একেবারে শেষ দিকে নবীনকুমার এতে লিখেছে, হয়তো সবাই যখন ঘুমন্ত সেই সময়ে জেগে ওঠে, বুকের প্রদাহ ভুলবার জন্য।

...আমি পুরোপুরি ভোগের মধ্যে কখনো ডুব দিতে পারিনিকো। কেউ যেন আমার ঘাড় ধরে পেছোনে টেনেচে, আবার পুরোপুরি মোহমুক্ত হতেও পারিনি, কেউ যেন আমায় ঠেলে দিয়েচে মোহের দিকে।

...এক দুর্ভাগা জাতির আমি সন্তান, যে জাতি আজিও পর-পদানত। এখন আমি নিজেকে দিয়া সেই জাতির সকলকে বিচার করিতেছি। আমি অনেক সময়েই কোন্ দিক সম্মুখ আর কোন দিক পশ্চাৎ-অপসরণ তাহা চিনতে পারি নাই।

...এ অজ্ঞানের ঘোর কবে কাটিবে ? পূর্ব পুরুষের পাপ আমারে দংশিল কি ?

...ধর্ম বলো, জাতি বলো, শিক্ষা বলো আর সাহিত্য বলো, যদি সকলকে এক সঙ্গে জড়াইতে না পারে, তা হইলে কোনো সুফল নাই...আর, আমার বুকে বড় ব্যথা, এ কি আমার সব ভুলের জন্য ? হ্যাঁ, ভুল করিচি, আবার ঠেকে শিকেচিওতো বটে...চন্দ্রনাথের নিকটে যে রমণীকে দেখিয়াছিলাম, কেন তাহার কথা এখনো এত মনে পড়িতেছে ? তিনি আমার কে ?...

...খুব বাসনা ছিল পরের শতাব্দীটি দেখে যাবো...কতই বা দূর ! সেই এক রাত্রে ঘন ঘন তোপধ্বনির মধ্যে এই শতাব্দীর অবসান হইয়া বিংশ শতাব্দী আসিবে...মনশ্চক্ষে যেন দেখিতে পাই...তাহা কত আলোকোজ্জ্বল...কত আনন্দময়...হে অনাগত যুগ, তোমার জয় হউক !

...মরিতে ইচ্ছা করে না, যে-যাহাই বলুক, আমার একেবারেই মরিতে ইচ্ছা করে না ! আমায় বাঁচিয়ে দাও, আমায় বাঁচিয়ে দাও, বড় সাধ...

এলোমেলো এবং অসমাপ্ত রচনা। প্রলাপের সময় নবীনকুমার যা বলছিল যেন তারই বাকি অংশ। প্রাণগোপাল সেই লেখাগুলি পাঠ করলো কয়েকবার।

কৈশোর বড় আত্মকেন্দ্রিকতার সময়। এই বয়েসে মানুষ শুধু ব্যক্তিগত দুঃখ ছাড়া অপরের দুঃখ সম্পর্কে মনোযোগ দিতে চায় না। কৈশোরে আগুন বড় বেশী। কান্না সেজন্য কম। আজ সারাদিনে প্রাণগোপাল একবারও অশ্রুপাত করেনি। এখনো সে কাঁদলো না। ঐ কাগজখানি হাতে নিয়ে সে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। শত শত তোপধ্বনির মধ্যে আলোকোজ্জ্বল বিংশ শতাব্দীর পদপাতের কথাটাই তার মনে লেগেছে বেশী। যেন সে সেই দিনটি দেখতে পাচ্ছে। তার চোখে এসে লাগছে সেই সুদূরের অন্যরকম আলোর আভা।

॥ সমাপ্ত ॥

লেখকের কথা

উনবিংশ শতাব্দীর চালচিত্রে আমি এই উপন্যাসটি রচনা করেছি। উপন্যাস, অর্থাৎ সময়ের পটভূমিকায় জীবিত মানুষের গদ্য গাথা। কিন্তু যেহেতু এই জীবিত মানুষগুলি অনেকেই ঐতিহাসিক চরিত্র, সেই হেতু তাঁরা ঔপন্যাসিকের ইচ্ছে মত চলাফেরা করতে পারেন কিনা, সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সে রকম প্রশ্ন অনেকে করেছেন। উপন্যাস উপন্যাসই, ইতিহাস নয়, বলাই বাহুল্য। ইতিহাসের সার্থকতা তথ্যনিষ্ঠায়, উপন্যাসের উপজীব্য হলো তত্ত্ব এবং শিল্পরস। উপন্যাসের চরিত্রগুলি কথা বলে এবং ঘুরে ফিরে বেড়ায়, কিন্তু ইতিহাস সংলাপের ধার ধারে না, এবং জীবনীগ্রন্থগুলিতেও দু-চারটি টুকরো গল্প ছাড়া জীবিত মানুষটির কীর্তিগুলির আক্ষরিক বর্ণনা থাকে না। সুতরাং যত দূর সম্ভব তথ্য আহরণ করে এঁদের জীবন্ত করার জন্য কল্পনাশ্রয়ী সংলাপ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করতে আমি বাধ্য হয়েছি। কারো কারো মনে হতে পারে, এটা লেখকের পক্ষে বেশী স্বাধীনতা গ্রহণ, কিন্তু আমি মনে করি, লেখকের স্বাধীনতার সীমানা টানা উচিত নয়। কারণ, পাঠকের স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষেই সীমাহীন। তবে, কোনো ঐতিহাসিক চরিত্রকেই আমি স্বস্থান থেকে কিংবা জীবনপর্বের নির্দিষ্ট সময়গুলি থেকে বিচ্যুত করিনি।

আমার কাহিনীর পটভূমিকা ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ। এবং এই কাহিনীর মূল নায়কের নাম সময়। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন, "১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতি বর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকল দিকেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল।" তিনি যাকে নবযুগ বলেছেন, পরে তারই নাম হয় 'বেঙ্গল রেনেশাঁস' এবং সে বিষয়ে অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেন। গত শতাব্দীর এই রেনেশাঁসের ধারণাটিকে নাড়াচাড়া করাই আমার এই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য। অনেক দিন ধরেই শাস্ত্রী মহাশয়ের এই বক্তব্য সম্পর্কে আমার মনে একটা খট্‌কা আছে। তিনি যে বিংশতি বর্ষের কথা বলেছেন, আমার ধারণা গত শতাব্দীর মূল ঘটনাকেন্দ্রটি তার কিছু পরে। তা ছাড়া, নবযুগ বা নবজাগরণ সত্যিই কি সারা দেশে এসেছিল, না তা শুধু সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তা নিয়েই প্রচুর ঢক্কানিনাদ হয়েছে, এই প্রশ্ন আমি নানান কাহিনীসূত্রে উত্থাপন করেছি বারবার। এবং শেষ দিকে আমার নিজস্ব মতামত দিতেও কসুর করিনি।

সময়কে রক্ত-মাংসে জীবিত করতে হলে অন্তত একটি প্রতীক চরিত্র গ্রহণ করতে হয়। নবীনকুমার সেই সময়ের প্রতীক। তার জন্মকাহিনী থেকে তার জীবনের নানা ঘটনার বৈপরীত্য, শেষ দিকে এক অচেনা যুবতীর মধ্যে মাতৃরূপ দর্শন এবং অদ্ভুত ধরনের মৃত্যু, সবই যে সেই প্রতীকের ধারাবাহিকতা, আশা করি তা আর বিশদভাবে এখানে বলবার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনীয় কথা শুধু এই যে, নবীনকুমারের চরিত্রে এক অকাল-মৃত অসাধারণ ঐতিহাসিক যুবকের কিছুটা আদল আছে। অন্য কোনো প্রসিদ্ধ পুরুষের নাম বা জীবনকাহিনী আমি বদল করিনি। কিন্তু যাঁকে অবল[illegible] করে নবীনকুমারকে গড়া হয়েছে তাঁর কয়েকটি কীর্তিচিহ্ন ছাড়া ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না, এতদিন পর আর জানবার উপায়ও নেই। সুতরাং দুই চরিত্রের মধ্যে সাযুজ্য না খুঁজে নবীনকুমারকে সেই সময়ের প্রতীক হিসেবে গণ্য করাই সঙ্গত হবে। নবীনকুমারের চরিত্রে যে আমি স্বকল্পিত বহু উপাদান সংযোজন করেছি, সেজন্য অনেকের সঙ্গে মতভেদ হতে পারে। হওয়াই স্বাভাবিক। সেই সময় সম্পর্কে যদি আমি আমার নিজস্ব কিছু ব্যাখ্যা না দিতে চাইব, তা হলে আর আমি এত বড় একটি গ্রন্থরচনা করলাম কেন?

মূর্তিপূজা এবং ব্যক্তিপূজার দেশ আমাদের। যেসব মানুষ নিজগুণে আমাদের চোখে শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন, তাঁদেরও দেবতার স্তরে উন্নীত করতে না পারলে আমাদের স্বস্তি হয় না। কিন্তু উপন্যাস রচনার সময় নির্লিপ্তভাবে এক একটি জীবনের সব ক'টি দিকই দেখাতে হয়: এতে ভক্তিমান পাঠকরা ক্ষুণ্ণ হন অনেক সময়। রামমোহন রায় কিংবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডিনার টেবিলে সুরাপান কিংবা দেশপ্রেমিক

হরিশ মুখুজ্যের পরদারগমন প্রভৃতির উল্লেখই অনেকের কাছে ভয়াবহ মনে হয়। অনেকের মতে, এসব তথ্য সত্য হলেও প্রকাশ করা অবাঞ্ছনীয়। আমি তা মনে করিনি। ব্লাসফেমি আধুনিক সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট আঙ্গিক, এর কুফল কিছু নেই, সুফল অনেক। পূর্ববর্তী কালের অনেক মহৎ চরিত্রকে পরবর্তী কালের লেখক ও ঐতিহাসিকরা আঘাত করেন, এর ফলে পাঠকসমাজে যে আন্দোলন হয়, তাতে সেই পূর্বকাল সম্পর্কে নতুনভাবে চেতনা জাগে, ইতিহাসের পুনর্বিচার হয়। টি এস এলিয়ট প্রবন্ধের খড়্গাঘাতে শেলীকে প্রায় খুন করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তাতে শেলীর কোনোই ক্ষতি হয়নি, বরং শেলী সম্পর্কে আগ্রহ পুনরায় জেগেছে। যাই হোক, আমি সেকালের কোনো মহৎ মানুষের প্রস্তরমূর্তির মুণ্ডচ্ছেদ করতে চাইনি একেবারেই, শুধু মাঝে মাঝে সেইসব প্রস্তরমূর্তির পূর্বতন খড়-মাটির পা দেখিয়েছি মাত্র।

কৈফিয়ত দেবার দায় নেই ঔপন্যাসিকের। পাঠক অনায়াসেই গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন। তবু, প্রায় আড়াই বৎসর ধরে উপন্যাসটি দেশ পত্রিকায় প্রকাশের সময় অনেক পাঠক-পাঠিকা নানা কৌতূহলী পত্র পাঠিয়েছেন আমাকে, সেইজন্যই কয়েকটি কথা এখানে জানালাম। সবচেয়ে মজার কথা এই যে, রচনাটির মধ্যপথে এবং শেষের দিকে অনেকে আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন বিন্দুবাসিনীকে যেন আমি বাঁচিয়ে তুলি, গঙ্গানারায়ণ যেন ফিরে আসে, হরিশের মতন নবীনকুমারের যেন আকস্মিক মৃত্যু না হয়। চরিত্রগুলি সবই গত শতাব্দীর মধ্যপাদের, এতদিনে তাঁরা সবাই পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছেন, এঁদের আমি এখনো বাঁচিয়ে রাখবো কী করে ? এ যেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমবেত সেনানীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সেই গীতার বাণী, এঁদের সকলকেই তো আমি আগে থেকে মেরে রেখেছি। তবু এ কথাও ঠিক, নবীনকুমারের মৃত্যুদৃশ্য রচনা করার সময় আমার মন বিবশ হয়ে গেছে, দু-চার লাইন লিখে আমি উঠে গেছি। দিনের পর দিন শেষ পরিচ্ছেদ রচনা অসমাপ্ত থেকেছে, আড়াই বছর ধরে সে আমার মানস-সঙ্গী, তাকে হারাতে ব্যথা বোধ করেছি। এক এক সময় এ কথাও মনে হয়েছে, ওকে আরও কিছু দিন বাঁচিয়ে রাখলে হয় না ? তখন গীতার ঐ উপদেশ আমার মনে পড়েনি।

যাঁরা পণ্ডিত এবং গবেষক, তাঁরা এই রচনায় নতুন কোনো তথ্যই পাবেন না। আমি কোনো লুপ্ত বা গুপ্ত তথ্যাবলী আবিষ্কার করিনি, এ যাবৎ ছাপা পত্র-পত্রিকা এবং বই থেকেই আমার উপাদান সংগৃহীত। অনেক বিষয়েই অন্যের সঙ্গে মতের অমিল হতে পারে, কিন্তু স্বেচ্ছায় কোনো ভুল তথ্য আমি দিইনি। এবং যা নতুন, তা সবই আমার কল্পনা। তবে অনেক পাঠক-পাঠিকা জানিয়েছেন যে, এ কাহিনীর অনেক ঐতিহাসিক তথ্যও তাঁদের অজানা ছিল এবং এর পর তাঁরা সেই সময়ের ইতিহাস ভালোভাবে জানার জন্য আগ্রহী হয়েছেন। সেটাও একটা লাভ। অনেকে আমাকে যখন বলেছেন যে এই বইটি লেখার জন্য নিশ্চয়ই আমি অনেক পড়াশুনো করেছি, তখন সে কথা শুনে আমি আশ্চর্যই হয়েছি বেশী। তেমন তো বেশী কিছু পড়িনি, আরও কত কিছু পড়া বা জানা বাকি রয়ে গেল। এরকম মনে হয়েছে বারবার। হায়, চার-পাঁচ বৎসর ধরে এরকম কোনো একটি বিষয় নিয়েই পড়াশুনো ও লেখার আলাদাভাবে সুযোগ পাওয়া তো আমাদের দেশে প্রায় অসম্ভব।

উৎসাহী পাঠকদের জন্য আমি একটি সংক্ষিপ্ত ও সুলভ গ্রন্থপঞ্জী এখানে দিলাম।

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী
আত্মচরিত। শিবনাথ শাস্ত্রী
সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র। বিনয় ঘোষ
সংবাদপত্রে সেকালের কথা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পুরাতন প্রসঙ্গ। বিপিনবিহারী গুপ্ত
আত্মচরিত। রাজনারায়ণ বসু
সেকাল ও একাল। রাজনারায়ণ বসু
কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা। মহেন্দ্রনাথ দত্ত
দেবগণের মর্ত্যে আগমন। দুর্গাচরণ রায়
কলিকাতার কথা। প্রমথনাথ মল্লিক
ভারতের অর্থনীতিক বিকাশের ধারা। সুনীল সেন
বাঙ্গলার পারিবারিক ইতিহাস। পণ্ডিত শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস । নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মুর্শিদাবাদ কাহিনী । নিখিলনাথ রায়
পুরনো দিন, পুরনো কথা । রঞ্জনবিলাস বসু
জনসভার সাহিত্য । বিনয় ঘোষ
বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস । দুর্গাচন্দ্র সান্যাল ও ফকিরচন্দ্র দত্ত
যশোহর-খুলনার ইতিহাস । সতীশচন্দ্র মিত্র
হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ । সুধীরকুমার মিত্র
কোম্পানির আমলে বিদেশী চিত্রকর । প্রদ্যোত গুহ
মুক্তির সন্ধানে ভারত । যোগেশচন্দ্র বাগল
দাদার কথা । সুরেশচন্দ্র ঘোষ
আত্মজীবন চরিত । দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়
সত্তর বৎসর (আত্মজীবনী) । বিপিনচন্দ্র পাল
রাজনারায়ণ বসু, জীবন ও সাহিত্য । শ্রীমতী অশ্রু কোলে
আমার জীবন । মীর মশারফ হোসেন
কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র । যোগেশচন্দ্র বাগল
ডেভিড হেয়ার । প্যারীচাঁদ মিত্র । অনুবাদ
রামকমল সেন । প্যারীচাঁদ মিত্র । অনু
দ্বারকানাথ ঠাকুর । কিশোরীচাঁদ মিত্র । অনু
মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র । মন্মথনাথ ঘোষ
গিরিশচন্দ্র । অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য । শিপ্রা লাহিড়ী
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত
ঈশ্বর গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্য । সঞ্জীবকুমার বসু
বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা । সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
মেট্রোপলিটন মন, মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ । বিনয় ঘোষ
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । অজিতকুমার চক্রবর্তী
সতীদাহ । গোরাচাঁদ মিত্র
মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত । যোগীন্দ্রনাথ বসু
মধুস্মৃতি । নগেন্দ্রনাথ সোম
মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রাবলী । সুশীল রায় । অনু
বিদ্যাসাগর । চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ । বিনয় ঘোষ
করুণাসাগর বিদ্যাসাগর । ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগর জীবন চরিত ও ভ্রম নিরাশ । শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ । বদরুদ্দীন উমর
কলকাতায় বিদ্যাসাগর । রাধারমণ মিত্র
প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর । যোগনাথ মুখোপাধ্যায়
পাদরি লঙ । অমর দত্ত
পাদরি লঙ, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী সমাজ । শঙ্কর সেনগুপ্ত
কেশবচন্দ্র । মণি বাগচি
আচার্য কেশবচন্দ্র । গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন । গিরিশচন্দ্র নাগ
উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্র । ঝরা বসু
ব্যঙ্গ কবিতা ও গানে স্বাদেশিকতা । সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
ডিরোজিও । যোগেশচন্দ্র বাগল
বিদ্রোহী ডিরোজিও । বিনয় ঘোষ

সাহিত্য সাধক চরিতমালা । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
পিতা পুত্র । অক্ষয়চন্দ্র সরকার
হুতোম প্যাঁচার নকশা । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত
বাদশাহী আমল । বিনয় ঘোষ
পুরনো লখনউ । আবদুল হলীম 'শরর' । অনু
ইতিহাসে বৈশ্য বা সাহা-সমাজ । দীপেন্দ্রলাল রায়
সুরলোকে বঙ্গের পরিচয় । অলোক রায় সম্পাদিত
বঙ্কিমচন্দ্র । অক্ষয় দত্তগুপ্ত
বঙ্কিমচন্দ্র । হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
বাংলার নবজাগরণের স্বাক্ষর । মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
১৮৫৭ ও বাংলা দেশ । সুকুমার মিত্র
লোকমাতা রাণী রাসমণি বঙ্কিমচন্দ্র সেন
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ । সম্পাদনা সনৎকুমার গুপ্ত
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা । যোগেশচন্দ্র বাগল
মনমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরি । সুনীল দাস সম্পাদিত
বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে । বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীপান্থের কলকাতা । শ্রীপান্থ
বাবু গৌরবের কলকাতা । বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা দর্পণ । রাধারমণ মিত্র
পুরনো কলকাতার কথাচিত্র । পূর্ণেন্দু পত্রী
গত শতকের প্রেম । পূর্ণেন্দু পত্রী
পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন । অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড) । অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কালীঘাট ইতিবৃত্ত । উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা, এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস । অতুল সুর
The History of Bengal. R.C. Mazumdar
British Paramountcy and Indian Renaissance. Part I & II,General Editor—R.C. Mazumdar
British Government in India/Curzon
Calcutta Old & New/H.E.A. Cotton. Ed. by N.R. Ray
Bengal under Lieutenant Governors/C.H. Buckland
The City of Dreadful Nights/Rudyard Kipling
The Good Old Days of Honourable John Company/W.H. Carey
Calcutta Past and Present/Kathleen Blechynden
Freedom Movement in Bengal/Nirmal Sinha
Calcutta Myths & History/S.N. Mukherjee
The Blue Mutiny/Blair B. Kling
On the Bengal Renaissance/Susobhan Sarkar
Calcutta Keepsake/Edited by Alok Ray
A General Biography of Bengal celebrities/Ram Gopal Sanyal
Reminiscences and Anecdotes of Great Men of India/Ram Gopal Sanyal
Awakening in Bengal in Early Nineteenth Century/Goutam Chattopadhyay
Social Ideas and Social Changes in Bengal/A.F. Salahuddin Ahmed
Rise of an Indian Public/Uma Dasgupta
British Orientalism and the Bengal Renaissance/David Copf
The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind/David Copf
History of Indian Social & Political Ideas/Bimanbehari Majumder
Voluntary Association and the Public Life in Urban Bengal/

Rajat Sanyal
Studies in Judicial History of British India/Bhawani Sankar Chowdhury
The Mutineers and the People/A Hindu (Shambhu Ch. Mookherjee)
Keshab Chunder Sen/F Max Mueller
I Point to India/F Max Mueller (Ed. by Nanda Mukherjee)
The Siege of Delhi/Alexander Llewellyn
The Last Mushairah of Delhi/Akhtan Qamber
Keshab Chunder Sen/Meredith Borthwick
David Hare/Peary Chand Mittra
The Writings of Girish Chunder Ghosh/Ed. by Manmatha Ghosh
The Life of Girish Chunder Ghosh/Ed. by Manmatha Ghosh
Memoir of Kaliprosanno Singh/Manmatha Ghosh
Counter Point/Ed. Alok Ray
Nineteenth Century Studies/Ed. Alok Ray

এই গ্রন্থ রচনাকালে আমাকে বইপত্র এবং নানাবিধ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন সরসীকুমার সরস্বতী, বিনয় ঘোষ, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রঞ্জনা মুখোপাধ্যায়, নিখিল সরকার, পার্থসারথি চৌধুরী, অরবিন্দ গুহ, পূর্ণেন্দু পত্রী, সুশীল রায়, ইন্দ্রনাথ মজুমদার, নবনীতা দেবসেন, বিনয় ভট্টাচার্য, চিত্রা দেব, আয়ান রশীদ খান, জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বরুণ চৌধুরী, পল্লব মিত্র, সুব্রত রুদ্র প্রমুখ। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।